দশটি উপন্যাস

দশটি উপন্যাস

মতি নন্দী
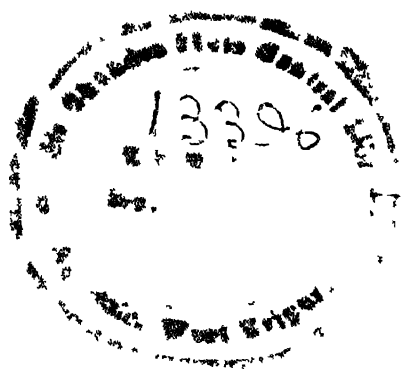
আনন্দ

নীতির জন্য

প্রকাশকের নিবেদন

এ-কালের বাংলা কথা-সাহিত্যের ধারায় মতি নন্দী এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নাম। আনন্দ পাবলিশার্সের 'দশটি উপন্যাস' গ্রন্থমালায় এবার সংযোজিত হল মতি নন্দীর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানা স্বাদের দশটি উপন্যাস। দ্বাদশ ব্যক্তি, নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান, বারান্দা, বাওবাব, ছায়া, দ্বিতীয় ইনিংসের পর, ভালো ছেলে, মালবিকা, ছোটবাবু এবং জীবন্ত— প্রত্যেকটিই প্রাথমিক প্রকাশের কালে পাঠককে দিয়েছিল মানুষের বিচিত্র ভুবনের সন্ধান। এই দশ ভুবনকে একই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে 'দশটি উপন্যাস' গ্রন্থমালা সম্ভারকে আমরা নিঃসন্দেহে আরও সমৃদ্ধ করলাম।

সূচি

দ্বাদশ ব্যক্তি

সকালে ঘুম থেকে উঠতে তারক সাতটা বাজিয়ে ফেলেছে। আটটার মধ্যে তিনবার সে কলঘরে গেছল। উঠোনের একধারে, কলঘরের বাইরের দেওয়ালের লাগোয়া নর্দমা পুরুষদের জন্য। প্রথমবার তারক ওখানে গিয়েই বসে। জ্বালা করে ওঠায় ঘাবড়ে গিয়ে সে দেখতে চেষ্টা করে পুঁজ বেরোচ্ছে কি না। কিন্তু হাত দশেক দূরেই বঙ্কুবিহারী রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলছে টুলে বসে।

কলঘরের ওধারে হাত ছয়েক ফালি জায়গাটায় দেওয়াল তুলে অ্যাসবেসটাসের ছাউনি দিয়ে রান্নাঘর হবে। বৈঠকখানাটার সঙ্গে এই রান্নাঘর দু'শো টাকায় ভাড়া নেবে বলে একজন তিন মাসের অগ্রিম দিয়ে গেছে। তারক ভরসা পেল না বঙ্কুবিহারীর সামনে এইভাবে মাথা নিচু করে দেখার চেষ্টা করতে। হয়তো ধমক উঠবে— "অ্যাই কী হচ্ছে ছোটছেলেদের মতো?"

দ্বিতীয়বার দেখবার চেষ্টা করার জন্য তারক কলঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বঙ্কুবিহারী তখন মিস্ত্রিকে নিয়ে ছাদে গেছে, সেখানে রাখা পুরনো ইটগুলো দেখাতে। কলঘরের ভিতরটা অন্ধকার। তারক ঘাড় হেঁট করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারল না পুঁজ বেরোচ্ছে কি না। তবে টের পাবার জন্য কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে আবার পেচ্ছাপ করল এবং জ্বালা করে উঠতেই বিমর্ষ হয়ে ভাবল,— তা হলে বোধ হয় হয়েছে।

এই সময় গজগজ করতে করতে বঙ্কুবিহারী নেমে আসছে বুঝেই সে তাড়াতাড়ি কলঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল, আর, যেন এই নির্মীয়মাণ রান্নাঘরটি ভাকরানাঙ্গলের মতো বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার, ভঙ্গিটা সেইরকম করে তাকিয়ে থাকল। সিমেন্ট আর বালি মিশিয়ে জল ঢেলে তাগাড় মাখছে মজুরটা। একটা সিমেন্টের ডেলা ছিটকে তার পায়ের কাছে আসতে সেটায় লাথি মারতে গিয়ে দেখল বঙ্কুবিহারী এসে পড়েছে। তারক নিচু হয়ে ডেলাটা কুড়িয়ে তাগাড়ের মধ্যে ছুড়ে দিল।

"আদ্দেক ইট নাকি চলবে না।" বঙ্কুবিহারী বিরক্ত হয়ে বলল।

ওকে খুশি করার জন্য অভ্যাসবশতই তারক যথোচিত অবাক হয়ে বলল,— "কেন, সবগুলোই তো আস্ত রয়েছে।"

'না বাবু, বেশির ভাগই পচা। কর্নিক মেরে তো দেখলুম ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে। আরও পঞ্চাশটা ইট এখনই আনিয়ে দিন।' মিস্ত্রি বিনীতভাবে বললেও বঙ্কুবিহারীকে চুপ করে থাকতে দেখে তারক বেশি অবাক হবার জন্য আর এগোল না। পঞ্চাশ ইট কিনে আনতে তাকে দোকানে যেতে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। সস্তায় ভাল ইট কেনার ক্ষমতা ছেলের নেই, সংসারের সাশ্রয় হয় এমন কোনও কাজেরই যোগ্যতা নেই, বঙ্কুবিহারী নিশ্চয় এখন, গত পনেরো বছর যাবৎ ঘোষিত সিদ্ধান্তটি বদলাবে না।

তারক সিঁড়ির দিকে এগোতেই বঙ্কুবিহারী বলল, "বৈঠকখানাটা চুনকাম হয়ে গেলে যদি চুন বাঁচে তা হলে তোর ঘরটাও করিয়ে দেব।

তারক ঘাড় নেড়ে সিঁড়ে দিয়ে উঠতে গিয়ে, কী ভেবে ফিরে বলল, "একটু বেশি করে চুন গুললেই তো হয়। তোমার ঘরটাও তা হলে হয়ে যায়।"

"বললেই তো হয় না, পয়সা লাগবে তো। একটা ঘর মানেই একদিনের মজুরি।"

তারক তাড়াতাড়ি উঠে এল দোতলায়। রান্নাঘরটা দোতলায় সিঁড়ির পাশে। আগে একতলায় ছিল। কিন্তু একতলার তিনটি ঘর পাঁচিল তুলে আলাদা করে সাত বছর আগে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। মাসের তিন তারিখে বঙ্কুবিহারী সাড়ে চারশো টাকা পায়। ভাড়াটের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। এমনকী প্রায় এক মাস ওদের কারুর মুখ পর্যন্ত দেখেছে বলে তারকের মনে পড়ে না। তারকদের এখন গলির মধ্য দিয়ে পিছনের দরজাটাকেই সদর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। আবার একঘর ভাড়াটে বসিয়ে একতলার একমাত্র ঘরটিকেও লোপাট করার সিদ্ধান্ত যখন বঙ্কুবিহারী নেয়, তারক খুবই আপত্তি

তুলেছিল মনে মনে। শুধু বঙ্কুবিহারীকে একবার বলে, "বাইরের লোকজন এলে বসবার একটা ঘর ছিল। সেটা আর থাকবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কুবিহারী খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, "বাইরের লোকজন কত যেন আসছে। আসে তো তোর শ্বশুরবাড়ির লোক। তাদের ওপরের ঘরে এনে বসানোও তো যায়। বউমার আবার সন্তান হবে, খাবার আর-একটা মুখ আসছে, আয় বাড়ানোর কথা ভাবতে হবে না? বছর বছর ক'টাকাই বা তোর মাইনে বাড়ে। দিনকাল কী পড়েছে সে হুঁশ আছে? এক কিলো চালের দাম যখন দশ-বারো টাকা হবে তখন ওই ক'টা মাইনের টাকায় কি বাপু চালাতে পারবে? যদি বলিস পারব তা হলে বৈঠকখানা থাক, বাইরের লোকজন আসুক তাকিয়া ঠেস দিয়ে গপ্পোগুজব কর।"

বঙ্কুবিহারী মিটমিট করে তাকিয়েছিল। তারক কথা না বলে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। রেণু যেন ওত পেতেই ছিল।

"এ-সব নিয়ে তুমি কেন বাবার সঙ্গে কথা বলতে গেছ। ওঁর বাড়ি, উনি যা খুশি করবেন, তাতে তোমার কী?"

"যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বোলো না। বাইরের লোককে কেউ শোবার ঘরে এনে তোলে না, ও-সব তোমাদের বাড়িতেই চলে।"

"বেশ তো তোমাদের বাড়িতে নয় এ-সব চলে না, তাই বলে আমার বাপের বাড়িতে ভাড়াটে বসানোরও দরকার হয় না। বাবা এইমাত্র যা বলল, তা মনে করে দ্যাখো।"

তারক শুধু তাকিয়ে রইল রেণুর দিকে। পোয়াতির পেট এবং পাছার মধ্যে লাথি কষাবার উপযুক্ত কোনটি, কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই স্থান নির্বাচনের সমস্যায় পড়ে গেল। কিন্তু এই সমস্যাটার মতো বহু সমস্যাই তার মনে ইতিপূর্বে দেখা দিয়ে অসমাধিতই রয়ে গেছে। এটিরও তাই হল। শুধু ঝনঝন করে মাথার মধ্যে একটা রেশ বেজে চলল।

ঘরে বসে তারক সেই রেশটা এখন অনুভব করল হঠাৎ-ই। কলঘরে যাওয়ার দরকার কী, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেখে নিলেই তো হয়। রাস্তার দিকে খোলা জানলা দুটোর দিকে সে তাকাল। পর্দাটা টেনে দেওয়া, সামনের বাড়ির সুধাংশুদের ঘর থেকে এ ঘরের সবই দেখা যায়। জানলাগুলো বন্ধ করে দিতেই ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। তখন সে আলো জ্বালল এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত লজ্জা তাকে পেয়ে বসল।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে হলে তার কোনওরকম সংকোচই হত না। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এইভাবে বন্ধ ঘরে আলো জ্বালিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষি কাজ করতে গেলে যে তার চোর-চোর ভাব দেখা দেবে সেটা তারক বুঝতে পারেনি। মোটামুটি নিজেকে নিয়ে তার হাসি পেয়ে গেল। এমন সময় দরজার ওপাশে বঙ্কুবিহারীর গলা শুনতে পেল। তাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দিয়ে, আলোটা নিভিয়ে তারক দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

"দরজা বন্ধ করে কী কচ্ছিলি?" বঙ্কুবিহারী ভ্রূকুটি করল।

"কিচ্ছু না।" থতমত হয়ে তারক একটা কারণ আবিষ্কারের জন্য চারধারে তাকাল।

"বউমাকে কখন আনবি, রাত্তিরে?"

"অফিসের পর যাব।"

"তা হলে রাতে খেয়েই তো আসবি। ইটের দোকানে যাচ্ছি, যাবার পথে গয়লাকে বলে যাব, কাল সকাল থেকেই যেন দেড় সের করে দেয়। বউমাকে বলে দিস, আসার সময় বাচ্চা দুটোকে যেন দুধ খাইয়ে আনে। নীচে গিয়ে একটু দাঁড়া, আমি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি।"

বঙ্কুবিহারীর সঙ্গেই একতলায় নেমে এসে তারক রান্নাঘরের দেয়াল তৈরির কাজ তদারক করতে দাঁড়িয়ে থাকল এবং বঙ্কুবিহারী হঠাৎ ফিরে আসবে না ধরে নিয়েই সে গত এক ঘণ্টার মধ্যে তৃতীয়বার কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

আর সঙ্গে সঙ্গে চার বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল তারকের। তাইতে আর ইচ্ছা করল না কলঘরে ছেলেমানুষ হতে। বেরিয়ে এসে টুলে বসল, বসে মনে করতে চেষ্টা করল— সেদিন অমুকে নিয়ে বাবার সঙ্গে খিটিমিটি হয়েছিল। ছেলের কাশি হচ্ছে দু'দিন ধরে অথচ ডাক্তার দেখাচ্ছি না, এই

নিয়ে বাবা এন্তার কথা বলে। তখনই ঠিক করি অহীনকে গিয়ে দেখিয়ে আসব। গেলাম অমুকে নিয়ে। গিয়ে বসেছি মাত্র, তখন—

"আমার রোগে ধরেছে ডাক্তার, ইনজেকশন লাগাও।" পুলকদা চেঁচিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে অহীনের ডাক্তারখানায় ঢুকল। হাতে পেনিসিলিনের শিশি আর ডিস্টিল ওয়াটারের অ্যাম্পুল। কয়েকজন রোগীও সেখানে ছিল।

"আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। এই নিয়ে ক'বার হল?" অহীন যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে লাগল। দু'বছর হল পাশ করে বাড়িতেই ঘর সাজিয়ে বসেছে। হাফপ্যান্ট পরে যখন ও গলিতে ক্যাম্বিস বল খেলত, পুলকদা রেফারি হত।

অহীনের কথাগুলো যেন শুনতেই পেল না পুলকদা, অমুর দিকে তাকিয়ে আমায় বলল,— "তারকা এটা কে রে, তোর ব্যাটা নাকি। বাঃ, বেশ দেখতে হয়েছে তো। নাম কী রে তোর?"

অহীন রোগী দু'জনের দিকে মন দিল। পুলকদা অমুর সঙ্গে ভাব জমাতে জমাতে বলল, "এটাকে খেলা শেখাবি। তুই তো রঞ্জি ট্রফিতে একবার টুয়েলফথ্‌ম্যান পর্যন্ত পৌঁছে আর তো এগোতেই পারলি না। নিজে যা পারলি না এইবার ছেলেকে দিয়ে দেখ না করাতে পারিস কি না।"

বললুম, "কী করাব ওকে দিয়ে?"

বলল, "টিমে ঢোকাবার জন্য তৈরি করা। আসল এগারো জনের টিমে ফালতু হয়ে বল কুড়িয়ে কুড়িয়ে কি ইজ্জত পাওয়া যায়? শেষমেশ বরাতে জুটবে তো গালাগাল। মনে আছে রে, হেমু অধিকারীর ক্যাচটা ফেলার পর কী খিস্তি খেয়েছিলি তুই? হারা ম্যাচটাকে জিতিয়ে নিয়ে গেল সেঞ্চুরি করে।"

এর জবাবে বললুম, "ইনজেকশন নিচ্ছেন যে, হয়েছে কী?"

বলল, "আর কী, তোরা তো আমার বিয়ের ব্যবস্থা করলি না, তাই পয়সা খরচ করে ঠিকেবউ জোগাড় করি। তাদেব কেউ ভালবেসে রোগ দিয়েছে।" পুলক গলা না চেপে, অপরাধীর ভাব না ফুটিয়ে এ-ভাবে এইসব কথা কী করে বলতে পারল ভেবে অবাক লেগেছিল। অহীনকে বিব্রতই দেখাল। সে তাড়াতাড়ি রোগী দেখা বন্ধ করে ইনজেকশনের ব্যবস্থা শুরু করল, পুলকদাকে বিদায় করতে।

"পাড়ার ডাক্তার হলে কত সুবিধে, ফি লাগে না।" ইনজেকশন নেবার সময় পুলকদা হাসতে হাসতে বলেছিল।

"আবার যদি হয়, তা হলে ফি চাইব।"

"দোব।" গা ঝাড়া দিয়ে পুলকদা উঠে দাঁড়াল। "তা হলে ওবেলা ঠিক আটটায় আসছি। থাকবি তো?"

"যদি না কলে বেরোই।"

"এই দেখ আবার কী ফ্যাসাদের কথা বললি। আটটার সময় বারো ঘণ্টা যে কাবার হয়ে যাবে। ওষুধের গুণ তো তা হলে কেটে যাবে।"

"কত তো ডাক্তারখানা রয়েছে, কোথাও থেকে নিয়ে নেবেন। ফুর্তি করতে পয়সা খরচ করেন আর এর বেলা বুঝি গায়ে লাগে।" অহীনের হেসে বলা কথাগুলোর মধ্যে রাগ ও বিরক্তি মেশানো পেশাদারি ঝাঁঝটা স্পষ্টই কানে বাজল।

পুলকদা গায়ে না মেখে বরং চোখে মুখে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, "ওর ব্বাপ। কী হয়েছে মশাই, কেন হল, কী করে হল, কোত্থেকে হল— সে এন্তার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। সত্যি বলতে কী এ-সব উত্তর দিতে গেলে, মাথা গরম হয়ে যায়। অপরিচিত উটকো লোককে প্রাইভেট ব্যাপার কি বলা যায়? তোর কাছে তো এ-সব ঝামেলা নেই?"

"তা তো নেই, তবে বারবার এ-সব হয় কেন, সাবধান হতে পারেন না?"

"দূর দূর, এমন এক সস্তার দাওয়াই বার করে গেছে ফ্লেমিং সাহেব আর আমি কিনা সুখ থেকে বঞ্চিত হই। বিয়ে কর বুঝতে পারবি সব। এই তো তারকটা ছেলের বাপ হয়েছে ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ, বলো না গো..."

"আচ্ছা আচ্ছা খুব হয়েছে, এখন আসুন তো।"

বেরিয়ে যাবার আগে পুলকদা অমুর গাল টিপে বলে যায়, "টেস্ট খেলতে হবে, বুঝেছ?"

অমুর তখন এক বছর বয়স।

পুলকদা গত বছর আফিম খেয়ে মরে গেছে। কারণটা কেউ জানে না। অহীন বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়তো হয়েছে। বিয়েতে নেমন্তন্ন করেনি। করার মতো অতখানি আলাপও এখন নেই। আর না থাকলে গিয়ে বলাও যায় না— অহীন রোগে ধরেছে। ইনজেকশন লাগা।

"বাবু কে একজন ডাকছে।"

তারক চমকে মজুরটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"গলিতে কে একজন ডাকছে অনেকক্ষণ।"

তারক ব্যস্ত হয়ে টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে ধপ করে বসে পড়ল। ডান পা ঝি ঝি ধরে অসাড় হয়ে গেছে।

"কে? কাকে চাই, এদিকে আসুন।" চিৎকার করল তারক।

"আমি নারান।"

"দরজা খোলাই আছে, এসো।" তারক ডান পায়ের পাতায় টোকা দিল। গোটা শরীর ঝনঝন করে উঠতেই সে ভাবল, ইনজেকশন নিলেই যখন সারিয়ে ফেলা যায় তখন আর চিন্তা কেন। প্রফুল্ল চিত্তে সে নারানকে দেখামাত্রই বলল, "আমার মনে আছে, মনে আছে। তোমার আবার আসার দরকার ছিল না।"

"বলেছিলেন মাসের গোড়ার দিকে একবার দেখা করতে।" নারান নামক বাইশ-তেইশ বছরের যুবকটিকে কাঁচুমাচু দেখাল। তাইতে তারক তৃপ্ত বোধ করল।

"তুমি বরং আজ দুটো-তিনটে নাগাদ আমার অফিসে এসো। যদি আজই ইন্টারভিউয়ের চিঠিটা বার করে দিতে পারি তা হলে হাতে হাতেই দিয়ে দোব। চেনো তো অফিসটা?"

"চারতলায়, স্টাফ সেকশন। আমি তো একবার গিয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, থার্ড ফ্লোর। তা হলে দুটো-তিনটেয়, কেমন?"

নারান চলে যাওয়ার পরও ঝি ঝি ছাড়েনি। খানিকক্ষণ বসতে হবে। তাই তারক হাঁক দিল, "দেবু, আজকের কাগজটা দিয়ে যাও তো।"

দোতলা থেকে কাগজ দিয়ে গেল দেবাশিস। নদিয়ার এক উদ্বাস্তু কলোনিতে ওর বাবা মা ভাই বোন মিলিয়ে পাঁচজন থাকে। কলকাতায় সরকারি অফিসে পিওনের কাজ করে, খাওয়া-থাকা তারকদের বাড়িতে। বিনিময়ে বাসন মাজা ছাড়া সব কাজই করে অফিস যাওয়ার আগে এবং ফিরে এসে। রেণু থাকলে অবশ্য রাঁধতে হয় না। ওকে বঙ্কুবিহারীই জোগাড় করেছে। এমন ভদ্রলোকের মতো দেখতে, চালচলন মার্জিত, স্কুল ফাইনালও পাশ, তাকে প্রথম উবু হয়ে ঘর মুছতে দেখে তারক অস্বস্তি বোধ করে। রেণু আঙুল দিয়ে আলমারির তলাটা দেখিয়ে বলছিল, "ওর তলাটা যে মোছা হল না। আগে যে লোকটা ছিল তাকে প্রথম দিন যা যা বলে দিয়েছিলুম, ঠিক করে যেত। একদিনও আর ফিরে বলতে হয়নি।"

তারক চোখ টিপে, ভ্রূ কুঁচকে রেণুকে চুপ করতে বলেছিল। রেণু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "কেন?" দেবাশিস কাজ শেষ করে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারক কথা বলেনি।

"ভদ্রঘরের ছেলে, তার সঙ্গে এ কী ধরনের কথা! ও কি চাকর? কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি?"

"ও তবে কী? কীভাবে কথা বলব!"

রেণুর বিস্ময়ে বিন্দুমাত্র খাদ না পেয়ে তারকের মাথার মধ্যে ঝনঝন করে উঠেছিল। ঘর থেকে তখুনি সে বেরিয়ে যায়। বঙ্কুবিহারীকে সেইদিনই বলে, "চাকরবাকর ক্লাসের কাউকে রাখলেই তো ভাল হত।"

"ও কি দয়া করে কাজ করে দিচ্ছে? দু'বেলা খাওয়া-থাকা, হিসেব করে দেখ তো কত হয়।"

"তা হলেও ভদ্রঘরের ছেলে, শিক্ষিতও—"

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কুবিহারী খেঁকিয়ে উঠেছিল, "দিনকাল যা পড়েছে আর ভদ্দরলোক থাকতে হবে না। শিক্ষিতও তো কত দেখলুম। তিনবারে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে এখন তুই ওকেই ভাবছিস শিক্ষিত। মোল্লার দৌড় আর কদ্দুরই বা হবে।"

অবশ এবং মাটিতে মিশে যাওয়া তারককে ফেলে চটি ফটফটিয়ে বঙ্কুবিহারী চলে যায়। তারক তখন প্রাণপণে মাটি থেকে ওঠার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু দেবাশিসকে 'দেখু' বলা ছাড়া আর উঠতে পারেনি।

তারক মাটিতে ডান পা ঠুকে দেখল ঝি ঝি একদম নেই। ইনজেকশন নিলে এইভাবেই সেরে যাবে রোগটা, ভাবতে ভাবতে সে কাগজ খুলে আইন-আদালতের খবর বার করল। প্রতিদিনই পড়ে, পড়তে ভাল লাগে।

আজকের প্রথম খবরটা তহবিল তছরুপের। পড়েই বুঝল ক্যাশিয়ারটা অবধারিত জেল খাটবে। পঞ্চান্ন হাজার টাকার বদলে তিন কি পাঁচ বছরের জন্য যদি জেলে যেতে হয় মন্দ কী। তারক ভাবল, এমন সুযোগ পেলে কিছুতেই সে ছাড়ত না। তবে ফিরে এলে, পাড়ার লোকেরা কি রেণুর বাবা-দাদারা নিশ্চয় খুব ছ্যা ছ্যা করবে।

তারক পরের মামলার খবরটায় চোখ বোলাল। এটাকে অতি বাজে বলে তার মনে হল। একটা মন্দিরের প্রণামির টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপার। রিসিভার বসানো হয়েছে। তারক ভাবল দিনে কতই বা প্রণামি যে তার ভাগ নিয়ে আবার মামলা হয়।

পরের মামলাটা খুব ছোট্ট করে বেরিয়েছে। এক স্ত্রীলোক তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে— তাকে বিয়ের সাত বছর আগে লোকটি আর একটি বিয়ে করেছে এবং সে বউ এখনও বেঁচে। দুটি ছেলেও আছে। সে-কথা গোপন করে অর্থাৎ ঠকিয়ে লোকটা তাকে বিয়ে করেছে। শুনানি মুলতুবি আছে।

এই ধরনের ব্যাপার কী করে লোকটা সাত বছর চালিয়ে গেল? তারক ভেবে দেখল, দুটো সংসার চালাতে লোকটার নিশ্চয় কম করে পাঁচ হাজার টাকা মাসে খরচ হয়। তা ছাড়া সাত বছর ধরে প্রথম বিয়ের কথাটা দ্বিতীয় বউয়ের কাছে লুকিয়ে রাখার জন্য লোকটাকে মারাত্মক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এইভাবে জীবনযাপন করে লোকটা সুখে থাকতে পেরেছিল কি? তারকের মৃদু ইচ্ছা হল, এইরকম একটা মামলা রেণুর নামে করতে। ওর পূর্ব স্বামী আছে সেটা গোপন করে বা ডিভোর্স না করেই সে বা ওর বাবা-দাদারা (ছ্যা ছ্যা করা বার করে দেব) বিয়ে দেয়। কিংবা এমন মামলাও তো করা যায়, রেণুর ছেলে (তবে অমু নয়), ছোটটা যার বয়স এখন দেড় মাস— ওর বিয়ে করা স্বামীর অর্থাৎ তারক সিংহের ঔরসে জন্মায়নি। অতএব বিবাহ বিচ্ছেদ করা হোক।

ভাবতে গিয়ে তারক ক্রমশই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। প্রমাণ করতে হবে যে রেণু অসতী। কিন্তু কার সঙ্গে তার অবৈধ যৌনসংসর্গ হয়েছিল আদালত যখন তা জানতে চাইবে লোকটার নাম তো বলতেই হবে। হঠাৎই তারকের মনে হল, সেই লোক দেবাশিস হলে কেমন হয়। কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মতো মিস্ত্রির দেওয়াল গাঁথার কাজ দেখল ধাক্কাটা সামলাতে। তারপর লজ্জায় মাথা নামিয়ে কাগজে চোখ রাখল। দেবু সম্পর্কে এই রকম মনে হওয়ার জন্য নিজেকে তার কিছুক্ষণ ধরে খারাপ লাগল।

বারো বছরের নাবালিকার উপর পাশবিক অত্যাচারের খবরটাতেও তারকের বিমর্ষতা কাটল না। একঘেয়ে গল্প। ছোটবেলায় কাগজে যা পড়েছে এখনও তাই। ওদের বয়স সব সময় বারো। ওরা কিছু জানত না। লোকটা ওকে ভুলিয়ে ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে কিংবা রিকশায় তুলে নিয়ে কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণ বা বলাৎকার বা পাশবিক অত্যাচার করে। শ্লীলতাহানিও কখনও লেখা হয়। তবে বয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রেই শ্লীলতাহানির কথাটা বেশি দেখা যায়। তারপর ওর মা বা পাড়ার লোকেরা পুলিশের সহায়তায় উদ্ধার করে। বাবার উল্লেখ কদাচিৎ তারকের চোখে পড়েছে।

গলিতে বঙ্কুবিহারীর চটির আওয়াজ হাতেই তারক কাগজটা মুড়ে উঠে দাঁড়াবার আগে চট করে দেখে নিল— 'আসামি বালিকাটির উপর তিনবার পাশবিক অত্যাচার করে।'

"ইট আসছে। কই কদ্দূর এগোল। অ্যাঁ এতক্ষণে এই হয়েছে।" বঙ্কুবিহারী মিস্ত্রি খাটাতে বসে গেল। তারক উপরে উঠে এল। দাড়ি কামিয়ে, চান খাওয়া করে ন'টা পনেরোয় তাকে ট্রামে উঠতেই হবে।

দাড়ি কামাবার সময় একটা ব্যাপার তারকের মনে পড়ে গেল।

—বছর এগারো আগে একদিন মা বলল, "হ্যাঁরে তারক, তোর নামের আগে এটা কী লেখা?"

খবরের কাগজ হাতে মা পাশে দাঁড়াল। ঠিক এইখানে। এইভাবেই দাড়ি কামাচ্ছিলুম। জানি'কী

লেখা আছে। আয়না থেকে চোখ না সরিয়েই বললুম, "দ্বাদশ ব্যক্তি, টুয়েলফথ্‌ম্যান।"

"তার মানে? তোকে নাকি খেলায় নেয়নি?"

"কে বলল?"

"সরলের মা শুনে এল, দত্তদের বাড়ির মেজছেলে বলছিল।"

বলতে পারতুম বাজে কথা বলেছে। কাগজে নাম বেরিয়েছে বলে হিংসে হয়েছে। তাতে মা খুশিই হত। মাকে খুশি করা সব থেকে সহজ ছিল। কিন্তু তার বদলে বললুম, "এগারোজনকে নিয়ে তো দল হয়, কিন্তু কারুর যদি হঠাৎ অসুখ করে কি চোট পায় তা হলে কী হবে? তখন দ্বাদশব্যক্তি তার জায়গায় খেলবে। একে কি দলে না নেওয়া বলে?"

দেখলুম মার মুখ থেকে উৎকণ্ঠা ঘুচে গেল। দেখে ভাল লাগল।

"আমায় নিয়ে যাবি?" মুখ ঘুরিয়ে লাজুক হয়ে মা বলল। এই সময় আমার বুকের মধ্যেটা নিংড়ে উঠল, হাত কাঁপল, আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকাতে ভয় করল। বললুম, "কোথায়?"

"তোর খেলা দেখতে। একদিনও তো দেখলুম না।"

ইচ্ছে হল রূঢ়ভাবে বলি, খেলার তো কিছুই বুঝবে না, তবে দেখে কী হবে। বোকার মতো পাঁচ-ছ' ঘণ্টা বসে থাকার কী দরকার। কিন্তু বললুম, "এ-খেলাটা থাক। পরে একটা খেলায় নিয়ে যাব।"

"কেন এটাতেই নিয়ে চল না।"

কথা না বলে দাড়ি কামাতে লাগলুম। জবাব না পেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মা চলে গেল। তখন আয়নাকে ঘুসি মেরে ভেঙে দিতে ইচ্ছা হয়। দ্বাদশ ব্যক্তি, যে দলের বাইরে, যার কাজ ফেউয়ের মতো দলের পিছনে ঘোরা, যে ব্যাট করতে পারবে না, বল করতে পারবে না, শুধু খাটুনি দিতেই যার ডাক পড়ে, যার কোনও ক্ষমতাই নেই দলকে বাঁচাতে, যাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেও আনবে না সেই সাধারণ অতি সাধারণ, দ্বাদশ ব্যক্তি। যে এগারোজনের মধ্যেও পড়ে না তার মা কী জন্য যাবে খেলা দেখতে? গিয়ে দেখবে একজনও তার ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে না— টি. সিনহা যতক্ষণ উইকেটে আছে কোনও ভাবনা নেই। কিংবা— সিনহা আউট! এবার তা হলে ইনিংস শেষ।

থুতনি জ্বালা করে উঠতে তারক ব্যস্ত হয়ে আয়নার খুব কাছে মুখ এনে দেখল, লাল সুতোর মতো রক্তের দাগ। নীচ থেকে বঙ্কুবিহারী চেঁচাচ্ছে, "কাগজটা পাঠিয়ে দে রে তারক, আমার পড়া হয়নি।"

খবরের কাগজটা খাটের উপর থেকে নেবার সময় তারক আর একবার ছবিটার দিকে তাকাল। বাংলার রঞ্জি ট্রফি দল। পিছনে সাতজন দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে তারক এক কোণে। দুটো হাত অন্যদের মতোই বুকে আড়াআড়ি রাখা। ছবির তলায় সকলের নাম লেখা। তারকের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে দ্বাদশ ব্যক্তি কথাটি। ঠিক মাঝখানে চেয়ারে বসে অরুণ মিত্তির। ওর নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ম্যানেজার লেখা। ছবিটা বাঁধিয়ে মা আয়নার উপরে পেরেকে ঝুলিয়ে দেয়। একতলায় নামার সময় তারক গামছাটা টেনে নিল বারান্দা থেকে। কাগজটা বঙ্কুবিহারীকে দিয়ে সে চান করতে কলঘরে ঢুকল। তখন সে ভাবছে ছবিটা তো খুলে ফেলতেই হবে। কলি করার জন্য গোটা ঘরের জিনিসই যখন বার না করে উপায় নেই।

দুই

অফিসে বেরোবার সময় দেয়ালঘড়িটার সঙ্গে হাতঘড়ি মিলিয়ে তারক দেখল দু' মিনিটের তফাত। কাল ছিল চার মিনিটের। দেয়ালঘড়িই গোলমাল করছে। কিন্তু বঙ্কুবিহারী ছাড়া ওটায় হাত দেবার অধিকার কারুর নেই। ঠাকুরদার আমলের ঘড়ি। ওই আমলের একজোড়া হরিণের সিং আর তিনটি পূর্বপুরুষের ছবি সে নিজের ঘরে রেখেছে। সিন্দুকটা বঙ্কুবিহারীর নিজের কেনা। ওর মধ্যে প্রচুর কাগজ আর স্ত্রী এবং পুত্রবধূর গয়না রাখা আছে। কাগজগুলো কীসের তারক তা জানে না। তবে বাড়ির দলিল এবং কোম্পানির কাগজ ওর মধ্যেই আছে সেটা অনুমান করতে পারে। বাড়িটা বঙ্কুবিহারীর নিজের নামেই। ট্যাক্স আর ইলেকট্রিক বিল ওর নামেই আসে। লোকে বউয়ের নামেই বাড়ি করে। মরে গেলে বিধবাকে

যাতে ছেলে-বউরা হেনস্তা করতে না পারে তারই রক্ষাকবচ। কিন্তু বঙ্কুবিহারী যেন ধরেই নিয়েছিল তার ছেলে মাতৃভক্ত হবে।

নিজের ঘরের দরজায় তারক তালা দিল। রেণু না থাকলে, এইটাই বঙ্কুবিহারীর নির্দেশ। বেরোবার সময় বঙ্কুবিহারী বলল, "দক্ষিণেশ্বর যাবি তো ওবেলা?"

"হ্যাঁ।"

গলির মোড় ঘুরতেই নির্মল চাটুজ্জে ব্যাজার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে। তারক বলল, "অফিসে যাবেন না?"

"আর অফিস যাওয়া। কাল রাত্তির থেকে পায়খানাটা বুজে আছে, ধাঙড়টাকে বললুম তো ব্যাটা বলে, দশ টাকা লাগবে।"

"তা কাল থেকে চালাচ্ছেন কী করে?"

"ওই কোনও রকমে ওর ওপরেই। পাঁচ টাকা পর্যন্ত দেব বললুম, রাজি হল না।"

"সবাই রেট বাড়াচ্ছে। ওই বা কেন ছাড়ে।"

তারক আর দাঁড়াল না। আর একটা মোড় ঘুরতেই মুখোমুখি হল অহীনের নতুন মোটরগাড়িটার। গলি জুড়ে ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে। কেউ উঠবে বোধহয়। মোটরের ধার ঘেঁষে একটু পথ রয়েছে, তাই দিয়ে গলে যাবে কি না ঠিক করতে করতে দেখল বাড়ি থেকে অহীনের বউ বেরিয়ে এসে মোটরের দরজা খুলে উঠল। তারক দেখল, বউটির রং ফরসা, একটু মোটা। নিচু হয়ে ওঠার সময় ব্লাউজের নীচে চর্বির থাক পড়ল। দেখেই চোখ সরিয়ে নেয়। কেউ দেখলে কী ভাববে। অহীনের বউ সুন্দরী, বি এ পাশ বলে শুনেছিল। তারকের মনে হল, সুন্দরীই। ডাক্তার স্বামী ভালই রোজগার করে। ক'বছরের মধ্যেই তো গাড়ি করল। অহীনকে বাড়িতে আনলে পঞ্চাশ টাকা ভিজিট দিতে হয়। বিলেত যাবে নাকি এম আর সি পি পড়তে।

মোটরটা সাবধানে পিছু হটছে। তারকও এগোতে লাগল। তার দিকে মুখ করে পাঁচ গজ দূরেই অহীনের বউ বসে। তারকের মনে হল তাকেই দেখছে। সে যে অহীনের বাল্যবন্ধু, মাধ্যমিক পর্যন্ত একই সঙ্গে পড়েছে, হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে প্রথম গড়ের মাঠ দেখতে যায়, মেয়েদের কোনখান দিয়ে ছেলে হয় তাই নিয়ে দু'জনে একবার তুমুল তর্ক হয়েছিল, এইসব কথাও জানে না। অহীনও নিশ্চয় বলেনি। বিয়েতে নেমন্তন্নই করেনি। কর্পোরেশন কাউন্সিলার হবার জন্য ও নাকি দাঁড়াবে সামনেরবার। পাড়ার দুর্গাপুজোয় দু'বছর ধরে পৃষ্ঠপোষক রয়েছে।

গলিটা চওড়া হতেই গাড়িটা জোরে পিছু হটে বড় রাস্তায় পড়ল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। অহীনের বউ তখনও সামনের দিকেই তাকিয়ে বসে। তারক ওর ঘোমটা থুতনি এবং কপালের খানিকটা দেখতে পেল। অহীন ট্রামরাস্তার উপর বড় ঘর ভাড়া নিয়ে ওষুধের দোকান করেছে। তার মধ্যেই খুপরিতে বসে রোগী দেখে। তারক ভাবল, এখন যদি কল আসে তা হলে ওকে রিকশায় যেতে হবে। তবে বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ থেকে কল আসবে না, অত বড় ডাক্তার এখনও হয়নি। ওর মতো হাজার হাজার ডাক্তার কলকাতায় আছে। বড়জোর হাটখোলা, কুমোরটুলি নয়তো দর্জিপাড়ার লোকেই ডাকবে। পাড়ার লোক ছাড়া কে ওকে ভোট দেবে! পয়সা তো করেছে, এক টাকার মিক্সচার দশ টাকায় বিক্রি করে। এখন পয়সা ছড়িয়ে যদি ভোট পায়। ভোট চাইতে নিশ্চয় বাড়ি বাড়ি যাবে। দেখা হলে আগের মতো 'কী রে তারকা' বলে ঘনিষ্ঠতা দেখাবে। তখন পাত্তা না দিলেই হল।

গুটি পাঁচেক ট্রামে এবং বাসে ওঠার চেষ্টা করেও তারক পারল না। ন'টা পনেরোর পর থেকেই এই অবস্থা হয়। আজ দেরি হয়ে গেছে আট মিনিট। আর দেরি করা উচিত হবে না। এবারেরটায় উঠতেই হবে, এই ঠিক করে তারক তৈরি হয়ে দাঁড়াল। দুটি স্ত্রীলোকও দাঁড়িয়ে অফিসে যাবার জন্য। ট্রাম আসতেই তারক দরজার হাতল ধরে একটা পা রাখার জায়গা কোনওরকমে করে নিল। ট্রাম ছাড়ার পরমুহূর্তেই স্ত্রীলোক দুটির একজন মরিয়া হয়ে তারকের পায়ের উপর পা রেখে খাবলে ধরল ওর ডান হাতটা। খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েই তারক দেখল, পড়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে দ্রুত স্ত্রীলোকটির কোমর বেড় দিয়ে টেনে ধরল বুকের কাছে। এইভাবে প্রায় এক মিনিট থাকার পর তার মনে হল, হাতটা স্ত্রীলোকটির দেহের এমন জায়গায় বেড় দিয়ে রয়েছে যে, এখন তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চার্জ আনা যেতে পারে। তবু তার মনে হল পুরুষমানুষের মতো কাজই সে করছে।

ভাঙা লাইনের উপর ট্রামটা হোঁচট খেতে খেতে চলছে। এক পায়ের উপর ভর দিয়ে, এক হাতে হাতল ধরে ও অন্য হাতে একটি দুর্ঘটনা রোধ করতে করতে তারক নিজেকে ঠিক পাঁচজনের একজন হিসাবে এখন ভাবতে পারছে না। অহীনের মোটরের সামনে হাঁটতে হাঁটতে তার যে রকম লাগছিল, এখন এতগুলো লোকের মাঝে একটি স্ত্রীলোকের কোমর ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে ঠিক তার বিপরীত অনুভবই হচ্ছে। এক সময়ে সে ট্রামের ভিতরের লোকদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, "একটু এগিয়ে যান না দয়া করে, জায়গা তো রয়েছে। এইভাবে একজন মেয়েছেলে কতক্ষণ থাকতে পারে?"

এগোল না কেউই। কিন্তু তারক নিশ্চিত হল তার কর্তব্যটুকু যথাযথ করে যেতে পারায়। কোমর ধরার জন্য নিশ্চয় মনে করছে না, লোকটা দুষ্ট চরিত্রের। তবুও উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল তারক। যদি পিঠটাকে বাঁকিয়ে হাতটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে বুঝতে হবে আপত্তি করছে। কিন্তু হাতটা তুলে নিতেও পারছে না, যদি পড়ে যায়! অবশেষে হাতটা সরিয়ে নেবার প্রথম সুযোগ আসতেই সে হাঁফ ছেড়ে পাশের লোককে বলল, "এইভাবে অফিস যাওয়া।"

স্ত্রীলোকটির মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটল না দেখে তারক দমে গেল। মনে হল, পাঁচজনের একজনের মতোই যেন তার কথাটা বলা হল। আড়চোখে সে দেখল ব্রেসিয়ারের ফিতেটা ব্লাউজের গলা দিয়ে বেরিয়ে। ময়লা তেল চিটচিটে। কিন্তু মুখখানি পরিচ্ছন্ন। বয়স তিরিশের উপরই হবে। মনে হয় অম্বল আছে। তারকের আর মনে হল, পতন থেকে রক্ষার জন্য নিতম্বের পিছনে যে অবরোধ বাম উরু দ্বারা রচনা করেছে, সেটি এবার সরিয়ে নেওয়া উচিত। এরপর সে স্পর্শ বাঁচিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বাকি পথ দাঁড়িয়ে থাকল। কোনও ভাবেই স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাল না। শুধু একবার তার মনে হয়, ঘাড় ফিরিয়ে চাহনি দ্বারা তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ছিল।

ট্রামটা লালদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে থামবার আগেই তারক নেমে পড়ল। রাস্তা পার হবার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে। ঘড়ি দেখল। একটা ছেঁড়া পোস্টার চোখে পড়ল যেটা কালও আস্ত ছিল 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই' পর্যন্ত রয়েছে। বাকিটা তার জানা— 'এ লড়াইয়ে জিততে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল হিরণ্ময়ের দাঁড়াবার ভঙ্গিটা। যখন সে বলছিল, "আমরা মশাই মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। স্লোগান দি, লাঠি খাই আর আন্দোলন করি" টেবলে বাঁ হাতের ভরে ঢ্যাঙা ছিপছিপে শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে রেখেছিল। চুলগুলো কপালের উপর ঝুলে পড়ছে আর ডান হাতে তুলে দিচ্ছিল। ঠিক মনে হচ্ছিল ব্যাট ধরে উইকেটে দাঁড়িয়ে।

"কিন্তু আপনারা? কখনও লড়াইয়ে নামবেন না অথচ লড়াই করে পাওয়া সুযোগ-সুবিধার ফসল ঠিকই গোলাজাত করবেন।" চোখের সাদা অংশ ঝকমক করে উঠেছিল। চিবুকটা অহংকারে আর একটু এগিয়ে এসেছিল। যেন হ্যামন্ডের মতো কভার ড্রাইভ মেরে বোলারের দিকে তাকাচ্ছে।

রাস্তা পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারকের মনে হল, হিরণ্ময় হাতের মুঠো দিয়ে টেবলে আঘাত করে 'ফসল গোলাজাত' কথাটা বলতে পেরে ভীষণ তৃপ্তি পেয়েছিল। হয়তো খুব অসাধারণ ভাবছিল নিজেকে। পাঁচজনের একজন। একটা পোস্টার দেখে আবার তার হিরণ্ময়কে মনে পড়ল। "মহার্ঘ ভাতার সর্বভারতীয় ফরমুলা চালু করতে হবে।" বাক্যটি হিরণ্ময়ের ঢ্যাঙা শরীরটার মতোই। ও যদি এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় আর চিৎকার করে স্লোগানটা বলে তা হলে ক'জন সাড়া দিয়ে বলবে, "করতে হবে করতে হবে।"

একজনও না। কারণ অফিসের শ-পাঁচেক ছাড়া লোক কেউ ওকে চেনে না। এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক। তিন বছর চাকরিতে আঠারোশো চল্লিশ টাকা মাইনে। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে যখন-তখন ঢোকে, সাসপেনশন রদ করতে পারে, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রোধ করতে পারে কিন্তু রাম [illegible]-শ্যামা।

[illegible] ডন ব্র্যাডম্যান যদি এখান দিয়ে হেঁটে যায়, তারক ভাবল, তা হলে কী হবে? ব্র্যাডম্যান যদি স্লোগান দেয় "কন্ট্রাক্ট [illegible] বাতিল করো।" কত লোক সাড়া দেবে? তারক মনে মনে হাসতে শুরু করল। "মূল্য বৃদ্ধি রোধ [illegible]ো।" কে করবে, গভর্নমেন্ট। তারকের হাসি বেড়েই চলল। ব্র্যাডম্যান যদি স্লোগান দেয় তাহলে সে মিছিলে কত লোক সামিল হবে আর হিরণ্ময় দিলে কত লোক হবে?

"১৩ই সেপ্টেম্বরের পাও[illegible] ছুটি" তারপরই 'তিসরি কসমের' পোস্টারে ওয়াহিদা রেহমানের বগল।

বগলের নীচে কী আছে?— রোধ করো, বাতিল করো, দিতে হবে, চালু করো, চলবে না, করতে হবে? প্রত্যেকটা কথা বগলের নীচে বসিয়ে মনে মনে গোটা স্লোগানটা বারবার আউড়ে পরখ করে শুনতে শুনতে তারক অফিসে পৌঁছে গেল।

লিফটে বারোজন নেওয়া হয়। তারক লাইনে দাঁড়িয়ে এগোতে এগোতে পৌঁছে দেখল লিফটের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরই হঠাৎ খুলে যেতে থাকল। লিফটম্যান এক গাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে!

"চলে আসুন।"

লিফটের মধ্যে পা দেওয়া মাত্র তারক নিজেকে অন্য রকম বোধ করল। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাইরে লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোর ব্যস্ত মুখ, ফ্যালফ্যাল চাউনি আড়াল পড়ে গেল। ঠাসাঠাসি হয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে তারকের মনে হচ্ছে, লিফটম্যান নিয়ম ভঙ্গ করল তারই জন্য, এই বারোটা লোকের কারুর জন্য-নয়। ভেবে সে পরম তৃপ্তি বোধ করল।

লিফটের উপরে ওঠা টের পাওয়া যায় না। শুধু শরীরটা শির শির করে, হালকা লাগে। লিফটের দরজার উপরে চৌকো আটটা সংখ্যার ঘর। সবাই সেইদিকে তাকিয়ে। এক এক তলায় এলেই সংখ্যার আলো জ্বলে উঠছে। কয়েকজন করে বেরিয়ে যাচ্ছে! এই ওঠার সময় তারক বদলে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে ভুলে যায় সে বঙ্কুবিহারী সিংহের পুত্র, রেণুকার স্বামী, দুই ছেলের বাবা, কোনওক্রমে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ এক নগণ্য কেরানি, একবার বাংলা রঞ্জি ট্রফি দলে দ্বাদশ ব্যক্তি হয়েছিল। শরীরের শিরশিরানিটা পাবার জন্য গত পাঁচ বছরে সে একদিনও অফিস কামাই করেনি। হরতালেও এসে বিদ্রূপ শুনেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে ওঠার কয়েক সেকেন্ডের আনন্দ তাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। পৃথিবীর লোকগুলোকে এই সময়টুকুর জন্য তার কাছে অকিঞ্চিৎকর লাগে। চোখ বুজে সে গোনে—দোতলা, তিনতলা এবার চারতলায় থামবে। তার মনে হয়, এখন ডালহৌসি পাড়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে— ওই যে তারক সিনহা বিরাট ক্রিকেটার, কতবার ভারতকে নিশ্চিত ইনি স ডিফিট থেকে বাঁচিয়েছে। হিরণ্ময় নিশ্চয় বলবে, আপনি স্লোগান দিলে সারা দেশ গলা মেলাবে।

"থার্ড ফ্লোর।"

লিফটম্যান তারককে উদ্দেশ করেই বলল। এই তলায় কেউ নামার নেই। কিন্তু ও জানে তারক স্টাফ সেকশানের লোক, তাই লিফট থামিয়েছে। অপ্রস্তুত হয়ে তারক বেরিয়ে এসেই ভাবল, লিফটম্যানের ছুটির দরখাস্ত বা মেডিকেল বিলের টাকা কি পড়ে আছে? থাকলে নিশ্চয়ই আজ আসবে তদ্বির করতে। এই ভেবেই তারক আবার তৃপ্ত হল, এবং তখন সে নিজেকে বলল, রোগটা জানা হয়েই গেছে, যখন ইনজেকশন নিয়ে সারিয়ে ফেলব।

অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইন্দ্র ভট্টাচার্য— অনেকের ইন্দ্রদা কিন্তু তারক বলে বড়বাবু— চিন্তিত হয়ে বলল, "এগারোটা তো বেজে গেল, সলিল গুহ তা হলে আর আসছে না। বরং ওই যে নতুন ছেলেটি জয়েন করেছে—"

"না না", তারক থামিয়ে দিয়ে বলল, "নতুন ফতুনের কর্ম নয়। এক ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টায় দাঁড়াবে তা হলে। আজকের দিনটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আক্কেল দেখুন সলিলের, জানে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে, পনেরো তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করতেই হবে। এখন কি কামাই করার সময়?"

"আমি কী বলব বলো, ডি. জি. এম.-এর লোক।" ইন্দ্র ভট্টাচার্য হতাশ ভঙ্গিতে তালু উপুড় করল। তারক বিরক্ত হল এই ভঙ্গি দেখে। কিছুই যদি বলতে না পারো তবে এই চেয়ারে বসা কেন!

"ডি. জি. এম-কে গিয়ে বলুন, পনেরো তারিখের মধ্যে এই পাঁচশো লোকের দশ মাসের মাইনের হিসেব এ-ভাবে চললে থার্ড উইকের আগে হতে পারে না। এ কি সোজা ব্যাপার! প্রত্যেকটা লোকের সার্ভিস ফোলডার খুলে তাদের নাম, ডেজিগনেশন, ছুটির জন্য মাইনে কাটা যাওয়ার হিসেব ইনক্রিমেন্ট কষে তারপর দশ মাসের এরিয়ার পেমেন্টের হিসেব বার করা, দু'জনে মিলে দিনে ছ'-সাতটার বেশি হয় না। আর পনেরো তারিখের মধ্যে চাই বলে দিলেই হল। ওদের আর কী হুকুম দিয়েই খালাস। লোক বাড়াতে বললে তো বাড়াবে না, এদিকে রাসকেলটা ডুব মেরেছে। আপনি বরং জানিয়ে দিন।"

এই সময় ফোন বেজে উঠতেই ইন্দ্র ভটচাজ হাত তুলে তারককে চুপ করতে ইশারা করে ফোনে

কথা শুরু করল। ওর ভঙ্গি দেখে তারক বুঝল সুপারিন্টেন্ডেন্টের ফোন। এই সময় সে দেখল, রতন দত্ত তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই মুচকি হেসে চোখ টিপল। তারক চোখ সরিয়ে ফোনে অপর দিক থেকে কী কথা বলছে বোঝবার জন্য ইন্দ্র ভটচাজের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে ঘাড়ের দাদটা দেখতে পেল। সেরে গেছে, কিন্তু বৃত্তাকার কালো দাগটা মিলোয়নি। প্রায়ই ওইখানটায় হাত বুলোতে দেখেছে তারক। ইন্দ্র ভটচাজের কাছ থেকে ফাইল এলে সে প্রথমেই গুহকে বলে খুলে দেখতে। ঘেন্না করে, সেটা কখনও জানায়নি। জানালেই গুহ বুঝে যাবে ব্যাপারটা। ছেলেটা বোকা নয়, ভাববে তারকদা স্বার্থপর।

"মিস্টার তেওয়ারি ডাকছেন। তুমি বরং চালিয়ে নাও আজকের দিনটা, আমি ওকে বলছি, লোক দেবার জন্য।"

ইন্দ্র ভটচাজ উঠতে উঠতে বলল। তারক নিজের চেয়ারে ফিরে এল। গুহ সম্পর্কে তার রাগ এখন অনেক কম। দাদটা ছোঁয়াচে তো বটেই, যদি গুহর হয়? এই কথা ভাবতেই গুহর আঙুলগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু ওখানেই যে হবে তার কোনও মানে নেই। ঘাড়েও হতে পারে, যত লোকের দেখা যায় সবই তো ঘাড়ে। ফরসা সলিল গুহর দাদ হলে খুবই ক্যাটক্যাট করবে। মুখচোরা ভালমানুষ ধরনের বটে, কিন্তু সাজগোজ চেহারার দিকে খুব যত্ন। মার্জিত গোটা গোটা উচ্চারণে কথা বলে— অরুন্ধুতি না বলে অরুন্ধতিই বলে। দাদ হলে নিশ্চয় ঘাড়ে মাফলার জড়িয়ে ঠান্ডা লাগার ভান করবে।

গুহর দাদ হলে দায়ী হব আমি, তারক যখন এইসব ভাবতে ভাবতে কাজ শুরুর উদ্যোগ করছে, রতন দত্ত এসে ফিসফিস করে বলল, "ইঁদুরটার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল?"

"কী আবার কথা হবে।"

"আহা বলোই না, তুমি তো খুব ডেঁটে বলছিলে মনে হল, ওভার টাইম?"

ডেঁটে কথাটা শুনে তারক খানিকটা মজে গেল। বলল, "ওভার টাইম তো এই বোববাবই কবলেন, আবার চাই?" তারক গলাটা সুপারিন্টেন্ডেন্টের মতো করার চেষ্টা করল। "আপনার বিলটা তেওয়ারি সাহেব চেয়েছেন।"

রতন দত্ত পাংশু হয়ে গেল।

"কেন কেন, ভুল হয়েছে কিছু?"

"ফোনে ইন্দ্রদাকে বলছিল শুনলুম। কেন চাইল শুনতে পেলুম না। এমনিতেই ফাঁকি দেন, ওভার টাইমেরও দু' ঘণ্টার কাজ ছ' ঘণ্টায় করেন বোধহয় তাই নিয়েই হবে।"

তারক প্রায়ই মজা করার জন্য রতন দত্তকে ভয় দেখায়। সেটা যখন বোঝে রেগে ওঠে।

"ফাঁকি আমি একাই দি? তুমি কি দাও না?"

"কবে দিয়েছি বলুন।"

"কবে আবার কী, রোজই দাও। যারা ফাঁকি দেয়, তেল দেয় তাদেরই উন্নতি হয়।"

"আমার কী উন্নতি হয়েছে?"

"তোমার হয়নি," রতন দত্ত থতমত হল, কিন্তু দমল না। "অন্যদের তো হয়েছে। জানো, ইঁদুরটা আমার চার বছরের জুনিয়ার? আমি তো বউকে জি এম-এর বেডরুমে পাঠাতে পারিনি তাই কেরানি হয়েই রইলুম আর ও অফিসার গ্রেডে উঠে গেল। সুপারসিড করে প্রমোশন! কই ইউনিয়নের বাবুরা এই নিয়ে তো লড়ল না।"

পিছনের টেবল থেকে গোরা মিত্তির বলল, "আপনি তো নন-ম্যাট্রিক, ইন্দ্র ভটচাজ বি কম। ইউনিয়ন লড়বে কোন গ্রাউন্ডে বলুন। শুধু সিনিয়রিটিতেই তো হয় না, কোয়ালিফিকেশন বলেও একটা ব্যাপার আছে।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ জানা আছে, কত তো কোয়ালিফিকেশনওলা সব। আমার বেলাতেই যত আইন আর রুলস। তারকই বলুক, ফল্স মেডিকেল বিল দিয়ে যারা ধরা পড়ল, তিন বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হল, ইউনিয়ন তাদের হয়ে লড়েনি? তারা ইউনিয়নের লিডার তাই এর বেলায় দরদ উথলে উঠল। বলো না তারক, চুপ করে আছ কেন।"

রতন দত্ত সপ্তাহে অন্তত একবার এ-ভাবে সকলকে শুনিয়ে গালিগালাজ করবে। কেউ বিশেষ কান

দেয় না যদি না রসালো কেচ্ছার গন্ধ থাকে। তারকের মায়া হয় এই লোকটির পাগলের মতো আচরণ দেখলে। শুনেছে ওর স্ত্রীর মাথা খারাপ। বছর পনেরো আগে বড়ছেলেটি পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। মেজছেলে স্কুল ফাইনাল পাশ করে জার্মানি গিয়ে আর ফেরেনি।

"রতনদা এবার চুপ করুন।" তারক অনুরোধ করল।

"হ্যাঁ চুপই করব, কী হবে এ-সব কথা বলে, আমার তো রিটায়ার করার সময় এসে গেল।"

রতন দত্ত নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। তারক টানা তিন ঘণ্টা কাজ করে, চোখ টনটন শুরু হতেই টিফিন করার জন্য দোতলার ক্যান্টিনে নেমে এল।

ঘরটা লম্বা, দু' পাশে টানা বেঞ্চের মতো টেবল আর স্টিলের চেয়ার, প্রায় ষাটজন বসতে পারে। ঘরটা অর্ধেক ভরা। দরজার পাশেই কুপন কাউন্টার, মেঝেয় দাঁড় করানো একটা ব্ল্যাকবোর্ড। খড়ি দিয়ে খাবারের নাম ও দাম লেখা। তারক পড়তে শুরু করেছে, ক্যান্টিন ম্যানেজার পা নাচাতে নাচাতে বলল, "আজ মাংস খেয়ে দেখুন, ছ' টাকা প্লেট।"

"শুধু তো হাড় আর চামড়া।"

"কী যে বলেন, তিন পিস মাংস, দুটো আলুর টুকরো। কে পারবে দিতে! আলু চার টাকা, মাংস আশি টাকা কিলো। বাড়িতেও এর থেকে বেশি পাবেন না।" বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কুপন ছিঁড়ে তারকের দিকে তাকিয়ে বলল, "রুটি নেবেন তো?"

যেন ধরেই নিয়েছে এরপর আর কোনও বিচার-বিবেচনা চলতে পারে না। তারক তাকে অগ্রাহ্য করবে না।

"না মাংস খাব না, শুধু চা আর টোস্ট।"

"সে কী খাবেন না।" আহত ভঙ্গিতে ম্যানেজার তারকের দিকে তাকিয়ে থাকল, "আমি যে কুপন কেটে ফেললুম।"

"আর কাউকে বিক্রি করে দেবেন।" তারক যতটা পারা যায় অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করল অন্যদিকে তাকিয়ে পকেট থেকে পয়সা বার করতে করতে। হ্যাঁ বা না-র তোয়াক্কা না করে কেন কুপন কাটল। আমায় ভেবেছে কী! ওর ইচ্ছে অনুযায়ী খেতে হবে নাকি! তোয়াক্কা শব্দটা তারকের মাথায় কয়েকবার ছোটাছুটি করে গেল।

খাবারের কাউন্টার থেকে চায়ের কাপ আর টোস্ট হাতে তারক ঘুরে দাঁড়াতেই পদ্মনাথবাবু চেঁচিয়ে ডাকল, "এই যে আসন এখানে।"

বসামাত্র তারককে জিজ্ঞাসা করল, "পনেরো তারিখের মধ্যে পাচ্ছি তো?"

"হয়তো দেরি হবে একটু।"

"না দাদা, দেরিটেরি বললে শুনব না। তা হলে লাইফ ইনসিওর করে ওইদিন আসবেন।"

তারক মুচকি হেসে উপভোগ করল পদ্মনাথের উৎকণ্ঠা। লোকটার কত মাইনে সে জানে। থোক দু'হাজার টাকার মতো পাবে, তার জন্য রোজ একবার করে খোঁজ নেবেই! অথচ লিফটম্যানটার পাওনা হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। সেদিন এ-কথা জানাতেই মাথা চাপড়ে বলেছিল, "চলুন মশাই গিয়ে ম্যানেজমেন্টকে বলি, আমাদের দপ্তরি, পিওন করে দিন। আমাদের বাড়বে মাসে এক শোটাকা আর ওদের পাঁচশো টাকা।"

একটু দূরেই কী একটা নিয়ে তকাতর্কি হচ্ছে। হঠাৎ জোর গলায় এক ছোকরা বলে উঠল, "সুইমিং কস্টুম পরেছিল তো কী হয়েছে? দেখুন গিয়ে কলকাতার হাজার হাজার বাড়িতে মেয়েরা সায়া-ব্লাউজ পরে না, বুক খুলে গঙ্গায় চান করে।"

"শুধু বুড়িরাই করে।"

"বেশ তাই-ই করে। সেটা কি দেখতে খারাপ লাগে না? বুড়ি বলে নয় ধরা গেল তার সেক্স নেই কিন্তু কথাটা হচ্ছে ভাল লাগা বা কুচ্ছিত লাগা নিয়ে, রুচি নিয়ে, তাই তো?"

"অতশত বুঝি না বাপু, তবে ইন্ডিয়ানদের চোখে এ-সব ভাল লাগে না। এ-সব বিলেতের মেয়েরা পরলে কিছু বলার নেই। পাত্রপক্ষ যদি তোমার বোনকে দেখতে এসে বলে নেংটি পরো, সৌন্দর্য আছে কি না দেখব, তখন তুমি কি বোনকে কস্টুম পরাবে?"

“পার্সোনাল টাচ দিয়ে কথা বলবেন না বোসদা, যা নিয়ে কথা হচ্ছে তাই নিয়ে বলুন।”

“কেন বলব না? নিশ্চয় বলব, একশোবার বলব। ইন্ডিয়ান মেয়ে মাত্রেই তোমার বোন। রিতা ফারিয়াও তোমার বোন। সে পরলে যদি আপত্তি না করো তা হলে নিজের বোনের বেলাতেও আপত্তি করবে না, বলো করবে?”

বোসদা নামক টাক মাথার লোকটি চেয়ার ছেড়ে টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, পাশের লোকেরা মিটমিট করে হাসছে। তারক দেখল ছোকরার মুখ লাল, নিরুপায়ের মতো এধার ওধার তাকাচ্ছে।

“না করব না।” টেবলে চাপড় মেরে ছোকরা চিৎকার করে উঠল, “করব না।”

অনেকগুলো চিৎকার ফেটে পড়ল এক সঙ্গে। ছোকরা উঠে চলে গেল। পদ্মনাথবাবু চাপা স্বরে বলল, “কী রকম বুঝছেন দিনকাল?”

তারক হেসে চুপ রইল।

“আমাদের জীবদ্দশায় মেয়ে দেখার এই সিস্টেমটা যদি চালু হয় তা হলে আবার বিয়েতে বসে যাব মশাই।”

হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকল পদ্মনাথবাবু। তারক পায়োরিয়ার গন্ধে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই দেখল হিরণ্ময় ঢুকছে, সঙ্গে ব্রাঞ্চ সেকশনের বিমল মান্না। হিরণ্ময় ঘাড় নেড়ে মান্নার কথা অনুমোদন করতে করতে তাকিয়ে দেখে নিল ঘরের লোকেদের। তারককে দেখে এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারে বসল।

“কাল ময়দানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় যাচ্ছেন তো?” তারকের মনে হল, যেন হালকা বিদ্রূপ রয়েছে সুরে।

“তাই নাকি।” বলেই সে ভাবল, এতে হিরণ্ময় কি বুঝতে পারবে ওকে তোয়াক্কা করি না।

“কাল আমরা ছুটির পর গেটের সামনে জমায়েত হচ্ছি। যদি পারেন তো আসুন। পদ্মবাবু সার্কুলারগুলো আজই কিন্তু আপনার ডিপার্টমেন্টে বিলি করে দেবেন, অন্তত তিনশো লোকের মিছিল এবার করতেই হবে।”

পদ্মনাথবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সে এখুনি বিলি করতে যাচ্ছে। একা মুখোমুখি হিরণ্ময়ের সঙ্গে বসে থাকতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল তাবক। বয়সে অন্তত সাত-আট বছরের ছোট কিন্তু চালটা এমন ভারিক্কি আর ব্যস্ত, তারকের অস্বস্তি হয় ওকে দেখলেই। ওর কথাবার্তার মধ্যে এমন বহু শব্দ থাকে, মনে হয় স্লোগান থেকে খুঁটে নেওয়া, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অভ্যেসে বলা যায়। বক্তৃতার সুর ওর কথাতেও এসে গেছে। ফলে মনে হয়, উপদেশ আর নির্দেশ দিচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে জানুয়ারি থেকে মাইনে বেড়েছে, হিরণ্ময়কে দেখে মনে হয় যেন একমাত্র ওর জন্যই সম্ভব হল। জি এম পর্যন্ত ওব খাতির করে। ক্ষমতাও আছে, নয়তো মিথ্যে মেডিকেল বিল দেওয়ার ব্যাপারে বিমল মান্নার তো চাকরি যাওয়াবই কথা।

“আচ্ছা তারকবাবু”, বোসদাকে ঘিরে বসা জটলা থেকে একটি ছেলে উঠে এল। “গ্যারি সোবার্সের মতো অলরাউন্ডার কখনও জন্মেছে কোনওকালে?”

তারক ছেলেটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “হঠাৎ আমাকে এ-প্রশ্ন কেন?”

ছেলেটি অপ্রতিভ হয়ে গেল। “আপনি তো খেলতেন টেলতেন, বেঙ্গল টিমেও এসেছিলেন, আপনার মতামতের মূল্য নিশ্চয় আছে। আমাদের থেকে নিশ্চয় বেশি বোঝেন। বোসদা বলছে কিথ মিলার নাকি সোবার্সের থেকেও বড়! উনি নাকি মিলারের খেলাও দেখেছেন!”

তারকের প্রথমেই মনে হল, ছেলেটি বাজে তর্ক করে সময় কাটাবার জন্য তাকে হাতিয়ার করতে চায়। তার বদলে, মতামতের মূল্য আছে-টাছে বলে খানিকটা দাম আগাম চুকিয়ে দিল। তারপর তারকেব মনে হল, হয়তো কাউকে পরে জিজ্ঞাসা করবে, টি সিনহার স্কোর কত ছিল? কোন বছর খেলেছিল?

“বলতে পারব না, আমি কারওর খেলাই দেখিনি।”

ছেলেটির চোখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল। “সে কী, হতেই পারে না।”

“বললুম তো।” তারকের গলা কঠিন শোনাল।

"আপনি সোবার্সের খেলাও দেখেননি!"

জবাব না দিয়ে তারক মুখ ফিরিয়ে রইল। ছেলেটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। তারক লক্ষ করল হিরণ্ময়ের চোখে কৌতূহল, কিছু একটা বলবে।

"আপনি এখন আর খেলেন না?" হিরণ্ময় দেশলাই কাঠি বার করল কান চুলকোবার জন্য। তারক প্রথমে ভাবল, জবাব দেবে না। তাই শোনার ভান করে রইল।

"আপনি কতদিন খেলা ছেড়ে দিয়েছেন?"

তারক এবার তাকাতে বাধ্য হল। হঠাৎ তার মনে হল নারানের ইন্টারভিউ পাওয়ার ব্যবস্থা তো একে দিয়েই করানো। ইনক্রিমেন্ট-বন্ধের শাস্তিও যখন মকুব করিয়ে দিতে পারে।

"দশ-বারো বছর মাঠে যাই না।"

তারক সতর্ক হয়ে বলল যেন বেশি দূরে কথা না গড়ায়। অবশ্য খেলার দিকে হিরণ্ময়ের ঝোঁক আছে বলে মনে হয় না। নারানের জন্য কিছু একটা উপায় করতে হবে ওকে দিয়ে।

"যান না কেন?"

"ভাল লাগে না।"

তারক ভাবল, এত ছোট উত্তর শুনে হিরণ্ময় খুশি হবে না। ধারণাটা যাতে ভাল হয় সেই রকম কিছু বলা উচিত।

"চাকরি আর সংসারের ঝামেলার মধ্যে থেকে খেলা সম্ভব নয়। অফিস তো আর খেলার জন্য মাইনে দেবে না।"

"ছুটির দিন তো খেলতে পারেন।" হিরণ্ময় সহানুভূতি দেখাল। তারক ভাবল একে বোঝানো যাবে না। খেলাটা তার কাছে শখের ব্যাপার নয়। তা ছাড়া খেলা নিয়ে কথা বলতেই এখন ক্লান্তি আসে। "একেবারে যা ছেড়ে দিয়েছি, তা আর ফিরে ধরা সম্ভব নয়। এখন মনে হয় খেলার সময়টুকুতে দু' পয়সা রোজগারের চেষ্টা করলে লাভ হবে। খেলে তো দেখেছি, কী হয়?"

তারককে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাতর দেখাল। হিরণ্ময় দেশলাই কাঠিটা বাক্সে ভরে রেখে বলল, "শুধু আপনি একা নন। লক্ষ লক্ষ লোক আজ আপনার মতোই হতাশ হয়ে পড়েছে। বাঁচবার জন্য, দুটো পয়সা রোজগারের জন্য মানুষ তার আনন্দগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছে।"

ঘোড়ার ডিম করছে। তারক বিরক্ত হয়ে ভাবল খালি বাঁধা বুলি আওড়ানো। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ফেলতে না পারলে যেন ওর কথা বলাই হয় না। ওই তো বোসদা দিব্যি আনন্দ করছে। কী বাতিল করার আছে ওর! ও আর আমি হিরণ্ময়ের কাছে লক্ষ লক্ষ লোকেরই দু'জন। দুটো সংখ্যা। লক্ষ লক্ষ থেকে আমি বাদ পড়লে কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু বাদ না দেওয়াতেই হিরণ্ময়ের আনন্দ।

"কাল থাকছেন, তো।"

"নিশ্চয়।"

তারক ভাবল, এখনই যদি নারানের কথাটা বলি তা হলে বোকার মতো কাজ হবে। লক্ষ লক্ষের একজন ধরে নিয়ে আমার প্রতি যে করুণাটা ওর মধ্যে তৈরি হচ্ছে ভেঙে যাবে। একদিন মিছিলে চিৎকার করলে যদি কাজটা করে দেয়, তা হলে নারানের জন্য চিৎকার করতে আপত্তি নেই।

তারক ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল।

"চললেন?"

হিরণ্ময় নিছক পোশাকি গলায় বলল না। 'গোলাজাত' বা 'বাতিল' ধরনের শব্দগুলো যে-রকম ধাতব, কঠিন করে বলে, সে তুলনায় খুবই বাস্তব এবং আটপৌরে। তারকের মনে হল ওকে পটানো যাবে। তাক বুঝে বললে নিশ্চয় চেষ্টা করবে। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের একজন হতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

তারক ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে পেচ্ছাপখানায় গেল এবং ইনজেকশন নেবার কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল। অথচ প্যান্টের বোতাম খোলার সময়ও লক্ষ লক্ষ লোকের একজন হওয়ার চিন্তাই মগজে ছিল। জ্বালা করে উঠতেই লক্ষ লক্ষ লোক, কয়েক লক্ষের পেনিসিলিন হয়ে গেল। সাতদিনের একটা

কোর্স নিলেই ভাল হয়ে যাব এবং আজ থেকেই নেওয়া শুরু করতে হবে, এই কথাটা মনে মনে আবার ঝালিয়ে নিয়ে সে কাজে বসল।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই সে বুঝে গেল কাজ এগোচ্ছে না। যত সহজ ভেবেছিল ইনজেকশন নিয়ে সারিয়ে ফেলবে, এখন মনে হচ্ছে মোটেই তত সোজা নয়। কোথায় কার কাছ থেকে নেবে? কী হয়েছে, কেন হল, কোত্থেকে হল এন্তার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তা হলে অহীনকেই তো বলা যায়। অহীন অবাক হবার ভান করে মনে মনে 'নিশ্চয়ই হাসবে। লোপ্পাই ক্যাচ ফেলে বালক সঙ্ঘের সঙ্গে জেতা ম্যাচটা হারিয়ে দিতে টেনে চড় কষিয়েছিলুম। হয়তো এখনও ভোলেনি। বউকে গল্প করতে করতে নিশ্চয়ই বলবে— আমাদের পাড়ারই, এক সঙ্গে ছোটবেলায় কত খেলেছি। রোজ তো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই অফিস যায়। দেখলেই চিনতে পারবে। প্রায়ই খয়েরি একটা টেরিলিন প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরে, বাঁ দিকের কাঁধটা উঁচু করে হাঁটে, বেঁটে, ফরসা আর পাঁচটা লোকের মতোই দেখতে। খেলত ভালই, একবার বেঙ্গল টিমে টুয়েলফ্‌থম্যান হয়েছিল। ওর যে এমন অধঃপতন হবে ভাবতেই পারা যায় না।

বউটা নিশ্চয়ই বলবে, টুয়েলফ্‌থম্যান আবার কী গা? অহীন বোঝাবার জন্য বলবে—থপথপে অহীন। স্টান্স নিয়ে ব্যাটের হ্যান্ডেলটা তলপেট চেপে, পোঁদটা ডেঁয়োপিঁপড়ের মতো তুলে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ত, চোখ বুজে ফরোয়ার্ড খেলত, সেদিন পর্যন্তও জানত না মেয়েদের কোথা থেকে ছেলে বেরোয়, সেই আহাম্মকটা বউকে বোঝাবে টুয়েলফ্‌থম্যান কাকে বলে!

তারক হিজিবিজি কাটছিল কাগজে। একদৃষ্টে কাগজটার দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই, সামনে একজন এসে দাঁড়াতেই চমকে মুখ তুলল।

"ওহ্, নারান এসেছ, বোসো।" ব্যস্ত হয়ে তাবক কাগজটা দলা পাকিয়ে ঝুড়িতে ফেলল।

"এমন দেরি করে বলল, ইন্টারভিউয়ের লিস্ট তো তৈরি হয়ে গেছে। এ জি এমের কাছে বোধহয় কালই পাঠানো হবে।" নারানের চোখে ঝকঝকে রংটার ম্লান হওয়া লক্ষ করল তারক। তাইতে দুঃখ পেয়ে সে ভাবল, সবে বাইশ বছর বয়স মাত্র। কেন যে কেরানি হতে চায়।

"তবে এখনও হাতছাড়া হয়নি। একজনকে বলেছি, সে পারে নাম ঢুকিয়ে দিতে। অ্যাপ্লিকেশন কবে এন্ট্রি করা হয়েছে, এ জি এম সেটা না-ও চেক করতে পারে। তবে কী জানো, জোব করে তো বলতেও পারা যায় না, ইংরেজিতে এত কম নম্বর পেয়েছ।"

নাবান মাথা নামিয়ে আঙুল দিয়ে টেবলের উপব কিছু একটা মকশো করা শুরু করল। তারক বুঝতে পারল না সেটা বাংলা চার কি পদ্ম ফুলের পাপড়ি।

"তোমাদের বাড়িতে তো সবাই ভাল ইংরেজি জানে, তবে তুমি এত কাঁচা হলে কী কবে?" তারক ভর্ৎসনার সঙ্গে অনুযোগও মিশিয়ে দিল, যাতে স্নেহেব সুরটা কানে প্রথমেই বাজে।

"বাবা মারা যাবাব পর কী হল জানেনই তো।" নারান নিচু স্বরে চোখে চোখ না রেখে যেভাবে বলল তাতে তারক আবার কষ্ট পেল। এই বয়সে এমন স্বরে কেন কথা বলে!

"বড়দা বছরে দু'-একবার মাত্র উঁকি দিয়ে যায়। শুনেছি শ্বশুর মারা যাওয়ায় তিন কাঠা জমি পেয়েছে টালিগঞ্জে, সেইখানেই বাড়ি করবে। মেজদা তো আর ফিরলই না। আমার এক বন্ধুর দাদা প্যারিস থেকে ফিরেছে, তার কাছে শুনলাম, বিয়ে করেছে মেজদা। রাঙাদা গত বছর ডি ফিল পেল, চেষ্টা করছে আমেরিকা যাবার। আমার লেখাপড়ার দিকে কে-ই বা নজর দেবে বলুন।"

নারানের গলায় ক্ষোভ ফুটে উঠলেও তারকের মনে হল দাদাদের নিয়ে যেন ঈষৎ গর্বিত। তারক এ-জন্য কিছু মনে করল না। বনেদি ঘরের ছেলে, ওর বাবা গগন বসুমল্লিক চাকরি না করেই সারাজীবন কাটিয়ে গেছে। কলকাতার বুকে সাত বিঘের উপর জমি আর বসত বাড়ি। এক এক কাঠার দামই তো কম করে দু' লাখ টাকা।

"তোমরা কাকারা এখন, গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকের কাঁঠালি চাঁপা গাছটার দিকে যে অংশ ওখানেই থাকেন, না?"

"ওরা এখন সামনের দিকে থাকে। পার্টিশন হবার পর ওরা তো প্রায় গোটা বাড়িই পেয়েছে, জমিও। আমরা পেছন দিকে থাকি।"

তারক শুনেছিল শেয়ারবাজারে টাকা খাটাতে গিয়ে গগন বসুমল্লিকের দেনা হয়। ভাইয়েদের কাছে সম্পত্তির অংশ বিক্রি করে দেন। বিক্রি না করলে শুধু জমি বাবদই এখন কত টাকা নারানের ভাগে থাকত তার একটা হিসেব তারক মনে মনে কষে ফেলল। কাকাদের এবং তিন দাদার অংশ বাদ দিলে প্রায় লাখ পনেরো টাকা। তারকের চোখে আক্ষেপ ফুটে উঠল। এতগুলো টাকা যদি নারানের আজ থাকত! গগন বসুমল্লিকের একটা ভুলের জন্য তার ছেলেরা গরিব হয়ে গেল। এমন ভুল বঙ্কুবিহারী কখনওই করত না। অবশ্য অত টাকাই বা কোথায় যে শেয়ারবাজারে নামবে। হাজার পঞ্চাশ টাকার দশ-পারসেন্ট সুদের ডিবেঞ্চার কেনা পর্যন্তই তো দৌড়। আর ঝি-চাকর-গয়লাদের শতকরা বাহাত্তর টাকা সুদে দু'শো-পাঁচশো করে ধার দেওয়া। তারক ভাবল, তবু তো একটা বাড়ি, পঞ্চাশ হাজার টাকা আর দুটো ভাড়াটে তার জন্য বঙ্কুবিহারী রেখে যাবে।

"আর কোথাও চেষ্টা করছ?"

"না, তবে শর্টহ্যান্ড শিখছি!"

"ওতে কিছু হবে না, ব্যবসার চেষ্টা করো না কেন?"

"টাকা কোথায়!"

"টাকা না হলে কি ব্যবসা হয় না। গুজরাটি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, মাড়োয়ারিরা কী নিয়ে এদেশে আসে? আসলে পরিশ্রমটা হচ্ছে মূলধন। বাঙালি জাতটাই এত বাবু হয়ে গেছে না, নইলে কলকাতার বুকে এসে অবাঙালিরা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি করে লাল হয়ে-গেল আর আমরা কিনা তাদের গোলামি করি!'

তারক হঠাৎ থেমে গেল। তার মনে হল সে যেন হিরণ্ময়ের গলা নকল করছে। অবশ্য হিরণ্ময়, বাঙালি-অবাঙালি বলে না। শোষকশ্রেণী আর জনগণ, মানুষ ওর কাছে দু'ভাগে বিভক্ত এবং খুব দ্রুত মানুষকে সে ভাগ করে ফেলতে পারে। তারকের ঈষৎ ইচ্ছা হল, নারানকে শোষক শ্রেণীভুক্ত হওয়ার দিকে উত্তেজিত করতে তুলতে।

কিন্তু নারানের বিষণ্ণ মুখে, ব্যবসা করে বড়লোক হবার কোনও ইচ্ছা ফোটেনি দেখে তারক অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য বলল, 'তোমাদের গেটের পাশেই একটা পামগাছ ছিল, আছে এখনও? অনেকদিন তোমাদের বাড়ির দিকে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।"

"আছে তবে পাতাটাতা আর নেই। গাছটা মরে যাচ্ছে। বয়স তো কম হল না।"

"কত?"

"তা ধরুন, বাড়ির বয়স প্রায় একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ, তখনকারই গাছ।"

"গাছটার পাশেই ইলেকট্রিক মিটারের ঘর। ওর দরজাটা ছিল টিনের। বল লাগলেই আওয়াজ হত। আর তখন তোমার সেজকাকার চিৎকার শুনতে হত। খুব খিটখিটে ছিল। তবে তোমার বাবা কিছু বলতেন না। প্রায় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেন। রাশভারী লোক। তুমি তো দ্যাখোনি কী মেজাজ ছিল। তোমাদের পাড়ার সার্বজনীন দুর্গাপুজো তো উনিই আরম্ভ করেন। প্রথমবার একাই সব খরচ দেন।"

"স্কুলে দেখেছি একটা পাথরে বাবার নাম লেখা আছে। কুড়ি হাজার টাকা ডোনেট করেছিলেন।"

"আমরা একবার ব্যাট-বল কেনার পয়সা চাইতে তোমাদের দোতলায় গেছলুম, ওঁর কাছে। গোপাল তোমার মেজদা, আমাদের সঙ্গেই খেলত। সে তো দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে হাওয়া। কেউ আর সাহস করে ঢোকেই না। এ ওকে ঠেলে, সে তাকে ঠেলে। এমন সময় ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় 'কী চাই', শোনামাত্র সবাই দুড়দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাল। কিন্তু আমি রয়ে গেলুম। তারপর ভেতরে ডাকলেন। কোনও রকমে তো চোখ বুজে বলে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে দিলেন।"

তারক দেখল নারান হাসবার চেষ্টা করে মুখখানা বুড়োটে করে ফেলেছে। কিন্তু তার নিজের মধ্যে একটা টগবগে ইচ্ছা ফেঁপে ওঠার উপক্রম করছে। এখন এন্তার কথা বলে যেতে পারে। যোলো-সতেরো বছর বয়সটা যেন অতীত থেকে তীব্রবেগে ধেয়ে এসে, তার শরীর ফুঁড়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

"আপনি তো আগে আমাদের বাড়ি খুব যেতেন। মা বলছিলেন, অনেকদিন আসেন না।"

"যাব। আসলে সময়ই পাই না। গোপালটাও বিদেশ চলে গেল, খুব বন্ধু ছিল আমার, বলতে গেলে একমাত্র বন্ধু। ও না থাকলে আমার খেলা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত, রঞ্জি ট্রফি পর্যন্ত আর হত না। তা ছাড়া—", তারক থেমে কী যেন ভাবতে গিয়ে চোখটা নারানের থেকে সরাতেই দেখল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তেওয়ারি ঘর থেকে বেরিয়ে রেফারেন্স সেকশনের দিকে যাচ্ছে। তারক হঠাৎ ভীত বোধ করল এবং সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় দুম করে বেপরোয়ার মতো বলল, "তোমার দিদি তো এখন বরানগর থাকে, তাই না?"

"পাইকপাড়ায়, জামাইবাবু আজ বছর চারেক হল বাড়ি করেছেন। পারচেজিং অফিসারের কাজ কবেন তো।" নারান চতুর চতুর মুখভঙ্গি করে বোঝাতে চাইল বাড়ি করার রহস্যটা। তাই দেখে তারক মনে মনে বলল, জানি, বাড়িটাও একবার দেখে এসেছি লুকিয়ে। চুরির পয়সায় মন্দ বাড়ি হাঁকায়নি! বউকে সুখেই রেখেছে বলে মনে হয়। তোমার দিদির ভাগ্য ভালই।

"ওকে ধরেও তো কোথাও ঢুকে পড়তে পারো।"

"লজ্জা করে। কুটুমের কাছে এ-সব ব্যাপাব নিয়ে বলতে যাওয়া কি ঠিক হবে।"

"তা বটে।"

তারক খুশি হল। নারানকে এখন তার খুব আপনজন লাগছে। হিরণ্ময়কে দিয়ে যে-ভাবে হোক ওব ইন্টারভিউয়ের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তারপর ভাগ্যে থাকলে হবে।

নারান চলে যাবার পর তারক কাজে মন বসাতে গিয়ে পামগাছটাকে বাব বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখল। 'সবাই দুড়দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাল। কিন্তু আমি রয়ে গেলুম।' কথাটা কি পুবো সত্যি? তারকেব মনে হল, এই শুনে নারান নিশ্চয় তাকে খুব সাহসী ভাবল।

তখন নাবান জন্মায়নি। দোতলার বৈঠকখানায় দেয়াল জোড়া মস্ত আয়নায় ঘরের আধখানা, দরজার কাছ থেকে দেখা যাচ্ছিল। গৌরীর পিঠটাই শুধু দেখেছিলুম। টেবলে ঝুঁকে কী যেন লিখছে। 'কী চাই' শুনে চট করে মুখ ফিবিয়ে গৌরী দরজার দিকে তাকাল। কিছু দেখতে না পেযে তখন আয়নাব মধ্য দিয়ে দরজার বাইরে আমাকে দেখেই অবাক হয়ে গেল। দূর থেকে ওকে অনেকবাব দেখেছি, যখন স্কুলে যেত বা জানলায় কি ছাদে এসে দাঁড়াত। এই প্রথম এত কাছ থেকে দেখলুম, খই-এর মতো গায়ের রং, কুচকুচে ভ্রূ, টান করে চুল বাঁধা, ফ্রকের রংটা ছিল হালকা গোলাপি। চোখটা আপনা থেকেই ওর বুকেব ওপর রাখলুম। তখন অসভ্য ব্যাপারগুলো সবে শিখেছি। গৌবী আমার থেকে বছব দুয়েকেব ছোট। মনে মনে বহুবার ওকে চুমু খেয়েছি বা উত্তেজনা তৈরির কাজে ওকে ব্যবহাব করেছি।

সেই গৌরী যখন আমার দিকে তাকিয়েছিল, খুব লজ্জা করল, ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে কী যেন সে বলল। আয়নার ওইদিকটা দেখতে পাচ্ছিলুম না। কী একটা জবাব পেল। তখন উঠে দরজার দিকে আসতে লাগল। আয়নায় দেখছি ও এগোচ্ছে। তখন মনে হল এবার পালিয়ে যাই। হঠাৎ আয়নায় দেখছি ভিতর থেকে বেবিয়ে এল যেন। একদম সামনে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। ঘাডটাকে বাঁ দিকে হেলিয়ে (কানের রিংটার সঙ্গে লাগানো ঝুমকোগুলো তখন কেঁপে উঠেছিল) হাসল, গালেব উপর দিয়ে আলতো করে যেন জল সরে যাচ্ছিল, হেসে বলল—

"সিনহা, এটা ভাই একটু মিলিয়ে দেখে দাও তো।"

পাশের টেবল থেকে লাইনবন্দি অঙ্কে ভরা একটা পাতা এগিয়ে এল। তারক একটানা পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে গেল।

তিন

বাসটা আসছে। ডান দিকে হেলে পড়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংসের ফুটপাত ঘেঁষে মোড় ঘুরল। টায়ারের সঙ্গে মাডগার্ড ঘষার কিচমিচ শব্দে শিউরে উঠল তারক। বাসের জানলাগুলো দিয়ে জমাট বাঁধা একসার বিষণ্ণ বিরক্ত মুখের মানুষকে সে চলে যেতে দেখল। তারক ভাবল, এইভাবে আমি দক্ষিণেশ্বরে যাব কী করে।

দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। চেনা কাউকে পেলে গল্প করবে। এধার ওধার তাকাল। একজনকে দেখে মনে হল বোধহয় সকালের সেই স্ত্রীলোকটি যাকে সে ট্রাম থেকে পড়ে যেতে দেয়নি। চুলে একটা গন্ধ পেয়েছিল। বুকের কাছে মাথাটা ঠেকেছিল আলতো। নিশ্বাস চেপে কেঁপে উঠেছিল একবার।

তারক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মনে করতে চেষ্টা করল। হাতটা রেখেছিল পিঠ আর বাহুর জোড়ে। ওর দেহের কিছু কিছু অংশ তার দেহের সঙ্গে ছুঁয়ে ছিল। একটা গন্ধ পাচ্ছিল চুল থেকে। মাথাটা বুকে আলতোভাবে ঠেকছিল। গৌরী অবশ্য এর থেকে আর একটু জোরেই চেপে ধরেছিল তার মাথা। ওর চুলের গন্ধও এই রকমই ছিল। বোধহয় সব মেয়ের চুলের গন্ধই এক। অন্ধকার সিঁড়িতে, চওড়া খিলেনের নীচে, বেলেপাথরের ধাপে দাঁড়িয়ে গৌরীর চুলের সঙ্গে দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ির গন্ধ মিলে, একটা প্রবল বন্য ইচ্ছা তৈরি করে দিয়েছিল। তখন সে বলেছিল, "আমায় বিয়ে করবে?" গৌরী মাথা নেড়ে অস্ফুটে "হ্যাঁ" বলেছিল আর গলাজড়ানো দু'হাতে মুখটা টেনে নামিয়ে ধরে উঁচু হয়ে চুমু খেয়েছিল পরপর তিন-চারটে। তারক মনে করতে চেষ্টা করল, গৌরী হঠাৎ ছুটে উপরে চলে গেল কেন! যাবার আগে ব্লাউজের বোতামগুলো কি ঠিক ঠিক লাগিয়ে নিয়েছিল? এর সপ্তাহ খানেক পরই গোপাল বলেছিল, "গৌরীকে বিয়ে করবি?" কী প্রসঙ্গে ও বলেছিল?

তারক মন্থরভাবে হাঁটতে শুরু করল। সূর্যটা জি.পি.ও-র গম্বুজের আড়ালে পড়ে গেছে। সার বেঁধে লোক চলেছে বউবাজার স্ট্রিট দিয়ে শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে। কাতর চোখে মেয়েরা বাস স্টপে অপেক্ষা করছে। বাসে জানলার ধারে বসা একটি বৃদ্ধ মুখ তুলে আকাশে কী যেন দেখছে। দুটি ইয়োরোপীয় পুরুষ ও নারী কথা বলতে বলতে মোটরে উঠছে।

পুরুষটি প্রৌঢ়, কিন্তু তার খাড়া শরীর আর চলনের সতেজ ভঙ্গি ভাল লাগল তারকের। সেই তুলনায় নারীটিকে নেহাতই ভেতোভেতো ঠেকছে। অনেকটা রেণুর মতো। দু'জনকে যতক্ষণ দেখা যায় দেখার পর, সিদ্ধান্তে এল পুরুষরা মেয়েদের থেকে বেশি আকর্ষণীয়। তারক ঠিক করে ফেলল, ফোন করে জানিয়ে দেব আজ যেতে পারলুম না রোববার সকালে গিয়ে নিয়ে আসব। তিন মাস থাকতে পারলে আর তিনটে দিন কি পারবে না? লিখেছে নতুন বাচ্চাটা নাকি হুবহু আমার মতো দেখতে হয়েছে। অমুটা রাত্রে 'বাবা-বাবা' বলে ফুঁপিয়ে উঠেছিল একদিন। ওকে ইংরেজি স্কুলে ভরতি করাব সামনের বছর।

তারক থেমে পড়ল একটা ওষুধের দোকান দেখে। ইনজেকশন নিতে হবে, এই কথাটা মনে পড়ায় দোকানটার দিকে এগিয়ে এসেও ইতস্তত করল। ভেবে দেখল, এখন নিলে বারো ঘণ্টা পর কাল ভোরেই পরেরটা নিতে হবে। ভোরবেলা কোথায় ইনজেকশন নিতে যাব? বরং আটটা-ন'টার সময় নিলে সকাল-রাত্রি দু'বেলাতেই সুবিধা হবে।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে তারক উত্তরমুখো চলতে শুরু করল। এই সময়টা রোজই তার একা লাগে। সকালটা খবরের কাগজ পড়ে আর অফিস বেরোবার তোড়জোড়েই কেটে যায়। অফিসই তার সব থেকে ভাল লাগে। সেখানে করার মতো নানান কিছুতে ব্যস্ত থাকা যায়। ছুটির পর লিফটে নামার সময় তার মনে হয় পাতালে চলেছে। তখন সে বন্ধুদের কথা ভাবে। আড্ডা দেবার মতো এখন একজনও নেই। বয়স বাড়লে কি সবাই এই রকমই একা হয়ে যায়? তার মতো সবাই কি চাকরি আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত? আত্মীয়দের বাড়িতে যেতেও তার ভাল লাগে না। সেই সব মামুলি কথাই শুনতে হয় আর বলতে হয়। বাড়ি ফিরে রেণুর সঙ্গে নতুন কিছু বলার মতো কথাও থাকে না। অমু এন্তার কৌতূহলে বহু প্রশ্ন করে, দু'-চার মিনিট ভাল লাগার পর বিরক্তি এসে যায়। মনটাকে চনমনে করার মতো একটা ঘটনাও ঘটে না। একঘেয়ে, ভীষণ একঘেয়ে।

তারক রাস্তা থেকে চোখটাকে উপরে তুলে উদ্ধত ভঙ্গিতে কিছু পথ হাঁটল।

'শুধু আপনি নন, লক্ষ লক্ষ লোক আজ আপনার মতো— আমার মতো? তারকের মাথাটা ঝট করে গরম হয়ে উঠল। ফুটপাথ জুড়ে একটা ভিড় গোল হয়ে কী যেন দেখছে। রাস্তায় নেমে ভিড়টা কাটিয়ে যেতে গিয়ে তারক গোবর মাড়িয়ে ফেলল। একটা লোককে সে জিজ্ঞাসা করল, ভিড় করে ওরা কী দেখছে? লোকটা বলল, কিছুক্ষণ আগে তিনতলা থেকে একটা বাচ্চাছেলে পড়ে গেছল। ওরা রক্ত দেখছে। ছেলেটা তখুনি মরে যায়।'

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে তারক ঢুকে পড়ল। এখনও জমাট বাঁধেনি, তাজাই রয়েছে। টকটকে লাল নয়, মেটে সিঁদুরের মতো। পরিমাণটা যা আশা করেছিল ততটা নয়। তবে বাচ্চাছেলে তো। দেহে কতই বা আর রক্ত থাকবে। রোমহর্ষণ হবে এমন কিছু দৃশ্য সে এর মধ্যে খুঁজে পেল না। কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েই সে বেরিয়ে এল।

তারপর দাঁড়িয়ে ভাবল, অনেকদিন নারানদের বাড়িটা দেখিনি, একটুখানি ঘুরে গেলে কেমন হয়!

পাশ দিয়ে দুটি লোক বলাবলি করে গেল, "বাপ-মাকে ধরে জেলে পোরা উচিত। এত অসাবধান হয়!"

দোতলার বারান্দায় কার্নিশ পর্যন্ত ছিল বাউন্ডারি। তার উপর লাগলেই ওভার বাউন্ডারি। ওদিক কাঁঠালিচাঁপা গাছটা। বাঁ দিকে গোপালের কাকাদের গ্যারেজের দেয়াল। বল দিচ্ছিল গোপাল। হাঁটতে হাঁটতে তারক মনে করতে চেষ্টা করল, বলটা যদি না লাফাত তা হলে সে ওইভাবে হুক করত কি না। ডান পা-টা আপনা থেকেই সরে গেল, ব্যাটটা আপনা থেকেই ধাঁ করে ঘুরে গেল। তখন নিজেকে আর সামলানো চলে না। অসম্ভব। না-হলে গৌরী যে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা তো আগেই দেখছিলুম। তবু সামলাতে পারলুম না।

বলটা সোজা ওর তলপেটে গিয়ে লাগল। সেটা স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলুম, ও কুঁজো হয়ে বসে পড়ল। বলটা ক্যাম্বিসের হলেও আঘাতটা যথেষ্টই হয়েছে। সবাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। হঠাৎ কেমন যেন সাহস এসে গেল। কোথা থেকে কীভাবে যে এল কে জানে, গৌরীকে পাঁজাকোলা করে, তুলে নিয়ে ভিতরের রকে শুইয়ে দিলাম। প্রায় অজ্ঞান। শুধু বুকের ওঠানামা আমরা সবাই দেখলাম। নন্দটা তখন লালুর সঙ্গে ইশারায় চোখাচোখি করে হাসল। একটু পরেই গৌরী ধড়মড় করে উঠে ভিতরে চলে গেল। তখন লালু বলল, "তারকটা এমন অসাবধানে মারে।" তারপর গলা নামিয়ে নন্দকে বলে, "শাল্‌লা জোড়া ক্যাম্বিস বল। ও দুটো নিয়ে খেলা যায় না রে?" নন্দ বলল, "চুপ কর, গোপ্‌লা শুনতে পাবে।" এরপর বেশ কিছুদিন আমার ভয়ে ভয়ে কেটেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন গৌরী হাসল। তারপব একদিন সন্ধ্যায়, অন্ধকার সিঁড়িতে হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে ছুটে উপরে উঠে গেল।

নারানদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে তারক। ডান দিকের গলিটায় ঢুকে আধমিনিট হাঁটলেই লম্বা পাঁচিলটার শুরু। এই গলিটা ছাড়িয়ে পরের গলিটাতেই তারকদের বাড়ি। ইতস্তত করল সে। বাড়ির কাছেই তবু প্রায় বছর দশেক এই গলি দিয়ে সে হাঁটেনি। গৌরীর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছি, তারক হিসেব করল, প্রায় বারো বছর আগে। তারপরও বার কয়েক এসেছি। গোপাল বিলেত চলে যাবার পর একদমই এ-গলি মাড়াইনি। অফিস যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাটার দরকার হয় না।

অবশেষে তারক কৌতূহল সামলাতে পারল না। ডান দিকের গলিতে গুটি গুটি ঢুকল। মোড়ের গ্যাসপোস্ট তুলে দিয়েছে। ডাস্টবিনটা যেখানে থাকত, একটা মুদি দোকান হওয়ায়, সেটা আর নেই। রাস্তার বাড়িগুলোকে তার খুবই দরিদ্রের মতো ঠেকল। নারানদের পাঁচিলের খানিকটা ভেঙে টিনের দবজা বসানো। তাতে সাদা রঙে ইংরেজিতে ওরিয়েন্টাল কার্ডবোর্ড বক্স ফ্যাক্টরি লেখা। খেলার জায়গাটা এখন টিনের চালা। স্তূপ করা রয়েছে কার্ডবোর্ডের বাক্স। মেশিন চলার শব্দ হচ্ছে। চাকা বসানো শিকওলা গেটের ধারে একটা টিউটোরিয়ালের সাইনবোর্ড। দোতলার গাড়ি-বারান্দায় আগের মতোই আলো ঝুলছে।

আর, পামগাছটা সত্যিই বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে বলে তারকের মনে হল। একটা পাতাও নেই। বাড়ি ঢোকার আগে গোপাল সিগারেটটা ওর ছাই ছাই রঙা গায়ে ঘসে নেভাতে নেভাতে বলেছিল,

"গৌরীকে বিয়ে করবি?" হতভম্বের মতো ওর দিকে তাকিয়েছিলুম নিশ্চয়। নয়তো গোপাল হঠাৎ রেগে উঠে বলল কেন, "প্রেম করতে পারিস আর এই কথাটার মানে বুঝতে এত সময় লাগে কেন?" মানে ঠিকই বুঝেছিলাম কিন্তু অতবড় বনেদি কায়স্থ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে সোনার বেনে বঙ্কুবিহারী সিংহের ছেলের যে বিয়ে হতে পারে, সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি বা সাহস আমার ছিল না। তাই নিয়ে ভাবিওনি। ঠাট্টা ভেবেই বলেছিলুম, "কেন করব না, দিলেই করব।" বুড়ো আঙুলটা মুখের কাছে নেড়ে গোপাল বলেছিল, "দিলেই করব, মানে? তুই কি ভেবেছিস আমাদের বাড়ি থেকে প্রস্তাব দেওয়া হবে তোকে জামাই করার জন্য? বা তুই যদি প্রস্তাব দিস, তা হলে রাজি হবে? ইডিয়ট।" বলেছিলুম, "তা হলে বিয়ের কথা বলছিস কেন?" ও বলল, "তা হলে প্রেম কচ্ছিস কেন?" প্রেম করা মানেই যে বিয়ে করতে হবে, এটা ভাবিনি। বিয়ে হলে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু আমি বা গৌরী দু'জনেই মনে মনে জানতুম বিয়ে ফিয়ে হবে না। তাই এই নিয়ে পরে আমরা কোনও কথাও তুলিনি! শুধু চিঠিতে প্রথম দিকে গৌরী একবার কোত্থেকে যেন টুকে লিখেছিল— নির্জন নদী তীরে দু'জনে ঘর বাঁধব। আর সারাদিন কী কী করব, দু'পাতা ভরতি তারই বিবরণ ছিল। "গাটস থাকে যদি গৌরীকে নিয়ে যা। ও তো সাবালিকা, আইনে আটকাবে না।"

ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গোপাল বলেছিল তারক দেখল সেখানে দুটো মরচে ধরা মাখনের কৌটো পড়ে। গোপালের খুব ভাইটালিটি ছিল, এই কথা ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

সদর দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। সাধারণত খিল দেওয়া থাকে। নতুন রান্নাঘরের একদিকের দেওয়াল গাঁথা হয়ে গেছে। বালি আর সিমেন্টে কিচকিচ করছে উঠোন। বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে দেখে তারক দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। চেয়ারে একটি রুগ্ণ মেয়ে কাত হয়ে হাতলে হেলান দিয়ে বসে। কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত, দুই কাঁধের পুট, বাহুর ডৌল, কণ্ঠা, হনু সব মিলিয়ে তারকের মনে হল তেরো-চৌদ্দ বছরের গোঁফ না ওঠা একটি ছেলের মতো। রংটা মাজা। তাঁতের শাড়িটা মড়মড়ে ফোলানো ফাঁপানো। উপরের বা নীচের মেয়েলি ঘাটতিগুলোকে সামাল দেবার জন্যই। তারকের দিকে সে তাকাল। চোখ দুটো ভাসাভাসা। সেই সময় দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিল সলিলের মুখ।

"গুহ যে, কী ব্যাপার! অফিস যাওনি কেন? কতক্ষণ এলে?"

তারক যৎপরোনাস্তি অবাক হয়ে বলল, সলিল দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, মেয়েটিও।

"তারকদা অনেকক্ষণ বসে আছি।"

"আজ হঠাৎ ডুব দিলে যে?"

তারক ঘরের মধ্যে এল। মেয়েটি গোছগাছ করে নিচ্ছে কাঁধের কাপড়। সলিল ওর দিকে হাত তুলে বলল, "এ হচ্ছে অনিতা। একটা দরকারে, মানে জরুরি দরকারে আমরা আপনার কাছে এসেছি।"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই অনিতা ঝটিতি তারককে প্রণাম করল। বাধা দেবার জন্য সে ঝুঁকে পড়তেই দেখল ব্লাউজটা কোমর থেকে উঠে যাওয়ায় শিরদাঁড়ার একটা গ্রন্থি ফুলে রয়েছে। তারক অস্বস্তি বোধ করল। প্রণামটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল বলে তার মনে হল।

"আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। এবার পার্ট টু দেবে।"

"ওহ তাই নাকি!" চাউনিতে প্রশংসা মিশিয়ে তারক তাকাল। মেয়েদের চোখে সে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারে না। সলিলকে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।"

"বসছি।"

কিন্তু ওরা কেউই বসল না। সেটা তারকের ভালই লাগল।

"আমার বোনের সঙ্গেই পড়ে, খুব বন্ধু ওরা। আমি ওদের বাড়ি অনেকদিন ধরেই যাচ্ছি।"

তারক মুখখানি স্মিত করে রইল। একবার ভাবল, রসিকতা করা যায় কি না। এই মেয়েটিকে দেখাবার জন্যই কি অফিস কামাই করেছে?

"তারপর যা হয় আর কী।" সলিল হাসবার চেষ্টা করল। অনীতা চোখ নামিয়ে নিল।

"একটু বোসো তা হলে। তোমার বউদিকে আজ আনতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু যা বাসের অবস্থা, উঠতেই পারলুম না। রোববার ছাড়া যাওয়া যাবে না।"

"বাচ্চা কেমন আছে?"

"ভাল।" তারকের মন্দ লাগল না দেড় মাস বয়সি পুত্রের কুশল জানায় সলিলের আগ্রহে।

"উনি প্রথম এলেন, যা হোক কিছু আতিথেয়তার ব্যবস্থা তো করতে হয়।"

এরপর যথারীতি টানাহ্যাঁচড়া শুরু হল কথাটা নিয়ে। অবশেষে, শুধু চা ছাড়া আর কিছু নয় এবং যেহেতু অনিতা কনিষ্ঠ তাই সম্বোধনে একজনকে তুমি, অন্যজনকে আপনি বলা চলবে না এই দুটি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তারক দোতলায় এল। তালা খোলার শব্দ পেয়ে বঙ্কুবিহারী তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

"আমি।"

"যাসনি?"

"না এই সময় কি বাসে ওঠা যায়? ফোন করে বলে দিয়েছি রোববার যাব।"

তারক মনে মনে ঠিক করে রাখল, কাল অফিসে গিয়েই ফোন করবে।

"আর এদিকে আমি গয়লাকে বলে এলুম—", ব্যস্ত হয়ে বঙ্কুবিহারী চটি পরতে পরতে বলল, "ওরা কারা, অনেকক্ষণ বসে রয়েছে?"

"আমাদের অফিসেরই। মেয়েটির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে।"

ঘরে ঢুকেই ঘড়ি দেখল তারক। চা খাইয়ে ওদের তাড়াতাড়ি বিদায় করেই বেরোতে হবে ইনজেকশন নিতে। বাইরের লোকেদের জন্য আশি টাকা কিলোর চা আলাদা কিনে রাখা আছে। রেণুর বাপের বাড়ির লোকেরাই খায়। ক'মাস রেণু নেই, তাই ওদের আর আনার দরকার হয়নি। হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে চায়ের পাতা। আলমারি থেকে চায়ের কৌটো বার করে তারক গন্ধ শুঁকছিল এমন সময় দরজার কাছে থেকে সলিল বলল, "তারকদা একটা কথা আছে।"

চমকে তারক ফিরে তাকাল। এত নিঃসাড়ে উপরে উঠে এসেছে কেন? দেখে মনে হয় ভূতে পেয়েছে।

"কী কথা?"

"আপনার সেই ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে।"

"কোন ডাক্তার?"

সলিল ঘরের মধ্যে দু' পা এগিয়ে এল। হাত দুটো মুঠো করা, নিশ্বাস দ্রুত, শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

"তোমার আবার ডাক্তারে কী দরকার?"

"তারকদা অনিতা প্রেগনান্ট, এর জন্য আমিই দায়ী।"

আনাড়ি অভিনেতার মতো কোনও মুখস্থ সংলাপ বলেই সলিল হাত দুটো দেহের সঙ্গে সেঁটে কাঠ হয়ে রইল।

"সে কী! কী করে হল?" বলেই তারক বুঝল তার বলাটাও আনাড়ির মতো হল। কী করে হল, সেটা জিজ্ঞাসা না করলেও চলত। হতভম্ব ভাবটা কাটাতে, আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়েছে। সামলাবার জন্য বলল, "তুমি এমন কাজ করে ফেললে, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে?"

"বিশ্বাস করুন, আমি ওকে বিয়ে করব।"

"তা হলে করে ফ্যালো, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার কী?"

"লোকে বলবে কী যদি বিয়ের ছ'-সাত মাস পরই বাচ্চা হয়? বিয়ে হতে হতেও তো কিছুদিন লাগবে।"

"লোকে বলবে কী।" তারক পুরোপুরি বিরক্তি চাপতে পারল না। সলিল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নাটকে লেখা নেই এমন একটা সংলাপ বলে তারক যেন তাকে বিপদে ফেলেছে। এবার কী বলতে হবে তার জানা নেই। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে সে তারকের পা জড়িয়ে ধরল।

"যদি না হেলপ করেন, তা হলে সুইসাইড ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। তারকদা আপনিই বাঁচাতে পারেন আমাকে।"

তারকের মনে হল, দামড়াটাকে একটা লাথি কসাই। আমায় কি মা-ঠাকুমা পেয়েছে যে মরার ভয় দেখাচ্ছে! নকশা করার আর লোক পেল না। কালকেই ক্যান্টিনে বোসদার মুখে 'নকশা' কথাটা শুনে

তার ভাল লেগেছিল। কথাটা যে এত শিগগির ব্যবহার করতে পারবে, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। মনে মনে ভাবার সঙ্গে চেঁচিয়ে বলায় আর তফাত কী!

"আমার মনে হয় তোমার বিয়ে করাই উচিত। এই সব রিস্কি কাজ না করাই ভাল।" তারক প্রায় বলে ফেলেছিল, পেট খসানোর মতো পাপ কাজ আর নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কথাটা খুব অশ্লীল শোনাবে বলে তার মনে হল।

"তা ছাড়া প্রেম করছ, বিয়ে করবে বলেই তো?"

শেষে এইটুকু জুড়ে দিয়ে তারক ঘাড় নিচু করে সলিলের দিকে তাকাল। চাঁদির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে, বোধহয় ওর টাক পড়বে। মেয়েটা একা নীচে বসে এখন নিশ্চয় ভাবছে— রাজি হয় যেন হে ভগবান, রাজি হয় যেন। ওর ভগবান— তারকের মনে হল— এখন তারক সিংহ ছাড়া আর কেউ নয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। তারক ধাক্কা দিল সলিলের কাঁধে। "উঠে দাঁড়াও, কে আসছে যেন।"

ধড়মড়িয়ে সলিল দাঁড়াল। দরজায় দেবাশিসকে দেখে তারক চায়ের কৌটোটা এগিয়ে ধরে বলল, "চটপট চা করে দাও। উনুন যদি না ধরে থাকে তো স্টোভে করো।"

"আপনি রাতে খাবেন তো?"

"না না এখনই বেবোব, খেয়েই ফিরব।"

দেবাশিস যাওয়া মাত্র তারক বলল, "এ-সব খুব রিস্কি ব্যাপার, লাইফ নিয়ে টানাটানি হতে পারে, খরচও অনেক।"

"আমার পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে আছে।"

তারক লক্ষ না করে পারল না, টানাটানির প্রসঙ্গটায় সলিলের মুখে উদ্বেগ বা শঙ্কা ফুটল না।

"ডাক্তার রাজি হবে কি না, তা-ও বলা যায় না।"

তারক ঘড়ি দেখল। এদের চা খাইয়ে বিদেয় করতে আরও আধঘণ্টা। তা হলেও ন'টা বাজতে অনেক বাকি থাকে। আশ্বস্ত হয়ে সে আলগাভাবেই বলে ফেলল, "তুমি ঠিক জানো কি, ওর পেট হয়েছে?"

"ও যা যা বলেছে, তার সঙ্গে বই মিলিয়ে দেখেছি, তা ছাড়া বাড়িতেও তো বউদিকে দেখেছি।" তারপর ইতস্তত করে সলিল বলল, "ওর ইউরিন টেস্টও করিয়েছি।"

"ও কী বলে?"

"কীসেব?"

"এই অ্যাবোরশন করানো সম্পর্কে?"

তারক সাবধান হল এবার। 'পেট' শব্দটা কেমন যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। বোসদা 'চুচি' বলায় একবার সলিল ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেছল। পরে বলেছিল, 'স্তনকে এমন কদর্য ভাষায় বলার কী যে কারণ, বুঝি না।'

"কী আবার বলবে, সব কিছু আমার ভরসায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন আপনি ছাড়া আর আমাকে বাঁচানোর কেউ নেই তারকদা।"

সলিলকে এগোতে দেখে তারক পিছিয়ে এল। আবার বোধহয় পড়বে। একটি যুবা দেহকে এই ভঙ্গিতে দেখার মতো কদর্য্য দৃশ্য আর কী হতে পারে। তাই তারক বলল, "নীচে চলো, ও অনেকক্ষণ একা বসে আছে।"

বলেই সে সলিলের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওদের দেখেই অনিতা সিধে হয়ে বসল। চোখে প্রভূত জিজ্ঞাসা। উপরে দু'জনের কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তা নিশ্চয় জানে। তারক ভাবল, এইটুকু তো মেয়ে এতবড় একটা ব্যাপার যখন ঘটেছে নিশ্চয়ই কাঁটা হয়ে আছে উদ্বিগ্ন চিন্তায়। ওকে কিছু একটা বলে আশ্বস্ত করা দরকার। কিন্তু কীভাবে শুরু করা যায়!

"তোমার বউদি এলে অনিতাকে নিয়ে একদিন আসবে, কেমন? নেমন্তন্ন করে রাখলুম।"

তারক সহজ ভঙ্গীতে, লঘু স্বরে সলিলের দিকে তাকিয়ে বলল এবং অনিতার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "আসবে তো?"

ঘাড় নাড়ার আগে অনিতা অনুমোদনের জন্য সলিলের দিকে তাকাল। ভাসাভাসা চোখ, হাত, গলা, ঠোঁট, চিবুক— সব মিলিয়ে করুণার উদ্রেক করে। গুহ যে কী দেখে মজল তারক ভেবে পাচ্ছে না। শাড়ির বদলে হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরে যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, কেউ তো ফিরেও তাকাবে না।

"আসব।"

"তুমি কী খেতে ভালবাসো?"

তারকের মনে হল, এই ধরনের কথাবার্তায় নেহাত বাচ্চাদের মন থেকে গুরুভার নামানো যায়। কলেজ ছাত্রীর জন্য অন্য ধরনের আলাপের ভাষা দরকার, সেটা সে একদমই জানে না। তবে একটা ব্যাপার অবশ্য ভালভাবেই সে জানে কোনওদিনই ওদের নেমন্তন্ন করা হবে না।

"যা পাই তাই খাই?"

এমনভাবে বলল যেন এইসব কথার কী উত্তর দিতে হবে, ওর জানা আছে। ওর স্বরে ক্লান্তি ফুটে উঠে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, এখন ধানাই-পানাই করে নষ্ট করার মতো মনের অবস্থা নেই। তারক ঘড়ি দেখতে দেখতে ভাবল চা করতে দেবুর এত দেরি হয় কেন?

"তারকদা তা হলে কাল আপনার সঙ্গে কখন দেখা করব?"

"অফিসেই তো দেখা হবে।"

"ভাবছি, ক'দিন ছুটি নেব।"

"আমার বন্ধু প্রণবের সঙ্গে কাল সকালে দেখা করে, তবেই তোমায় বলতে পারব। তুমি বরং দুপুরে একবার ফোন কোরো।"

চা নিয়ে দেবাশিস ঘরে ঢুকছে। তারক ভাবল, আবার একটা বেগার খাটার কাজ ঘাড়ে চাপল। গুহ যদি ওকে বিয়ে করে ফেলে বা বিষ-টিষ খেয়ে দু'জনের কেউ মরেও যায়, তা হলেই তো ল্যাঠা চোকে। কিন্তু এইভাবে কথাগুলো মনে হওয়ামাত্র তাবক বিরক্তবোধ করল নিজের সম্পর্কেই। টুয়েলফ্‌থম্যানের মতো ভাবা হল যেন। খেলার আগের দিন ঠিক এই রকম একটা ভাবনা কিছুক্ষণের জন্য তার মাথায় ঝিলিক দিয়েছিল—ধ্রুব মুখুজ্জের কি বরেন মিত্তিরের যদি এখন দারুণ অ্যাকসিডেন্ট হয়। তা হলে আমি টিমে এসে যাব। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তারক আড়চোখে ওদের দেখল। এদের কেউ বিষ-টিষ খেলে, সে ভাবল, আমি কোন টিমের ভেতর চলে আসব? টিম কোথায়!

চার

খাট আলমারি দেয়াল জানলা সব কিছুই যেন চেটে চেটে খাচ্ছিল। ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল চোখ দুটো। তখনই মনে হয়েছিল মা এইবার মরবে।

"তারু ছবিটায় আমার সিঁথেয় সিঁদুর দিতে বলিস তোর বউকে। আর তোলা উনুনটার শিকগুলো যেন ফেলে না দেয়। বলতে ভুলিস না। মনে থাকবে তো? কাশী মিত্তির ঘাট থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কিনেছিলুম।"

ফুলশয্যার রাতে রেণুকে বলেছিলাম মার ইচ্ছে ছিল ছেলের বউ তাঁর শাশুড়ির ছবিতে সিঁদুর দেয় যেন। রেণু ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, "সতী সাবিত্রী ছিলেন, তাই সিঁদুর বজায় রেখে চলে গেলেন।" রেণুকে তছনছ করে যখন পিষতে শুরু করি একটা অদ্ভুত আওয়াজ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, শেষ দিকে যে-ভাবে যন্ত্রণায় মা কাতরাত। মনে পড়া মাত্র বিরক্তি হয়—ছবিটা এ-ঘরে টাঙানো রয়েছে কেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছবির কথা ভুলে যাই। রেণুর মুখ থেকে গোঙানি শোনার ইচ্ছেটা তখন প্রবল বেগে শরীর তোলপাড় করছিল। পরের দিন মনে হয়েছিল, ছবি শুধুই ছবি। ওগুলো টাঙিয়ে রাখা হয় শুধু মনে খচখচ করানোর জন্য। অতীতকে জিইয়ে রাখে ব্যর্থ লোকেরা। যদিও আমি এগারোজনের টিমে আসতে পারিনি তবু ছবি তোলার সময় ওদের সঙ্গে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ-ছবি টাঙিয়ে রাখার মধ্যে গৌরব কোথায়?

সেদিন শেষরাতে বেশ শীত পড়েছিল, তাই বাবা যখন ঠেলে তুলল বিরক্তিতে লেপটা ছুড়ে ফেলে খিঁচিয়ে বলেছিলাম, "তা আমি কী করব?"

"ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন আর বলিস একটা ডেথ সার্টিফিকেটও যেন লিখে নিয়ে আসেন।"

বাবা এত আস্তে কথা বলতে পারে জানতাম না। কুয়াশার আবছা রাস্তা দিয়ে ডাক্তারের বাড়ি যেতে যেতে মনে হয়েছিল এইবার টুয়েলফ্‌থম্যান সেজে দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেব। ভাবতেই শরীর গরম হয়ে এসেছিল। শীত করেনি আর। মার জন্যই পারিনি, এবার পারব। মারা গেলেই ছবিটা খুলে ফেলা যাবে, কেউ বারণ করার রইবে না।

অথচ আজও খোলা হয়নি। গড়িমসি ছাড়া আর কী। দোকানটার সামনে পায়চারি করতে করতে তারক আপনমনে বলল, বাধাটা কোথায়? তবে ঢুকে পড়ায় কেন গড়িমসি করছি! রোগটা যখন জানা হয়ে গেছে, শুধু তো ইনজেকশন নেওয়ারই অপেক্ষা।

কিন্তু দোকানে বসা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী আর পরশ্রীকাতর। বাসে টিকিট কাটে না। বাজারে ওজন নিয়ে ঝগড়া করে। বউ জানলায় দাঁড়ালেই খেঁকায়। রাস্তায় ঝিয়েদের জঞ্জাল ফেলার সময় হলে রকে এসে বসে—তারক এইসব অনুমান করতে করতে কয়েকবার ভিতরে তাকাল। একটি মাত্র খদ্দের কীসের একটা কৌটো কিনে চলে গেল। তারক ভাবল এইবার ঢুকলে কেমন হয়। এই সময় একটি বৃদ্ধাকে ঢুকতে দেখে সে আর এগোল না।

ঘড়ি দেখে, খানিকটা হাঁটল উত্তর দিকে। সিনেমা ভাঙা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধাক্কা খেল। আবার ফিরে এল দোকানটার সামনে। একটিও খদ্দের নেই। লোকটা গালে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে পা দোলাচ্ছে তাইতে থলথলে ভুঁড়িটা কাঁপছে। কড়ে আঙুল মুখে ঢুকিয়ে পানের কুচি বার করে আঙুলটা তুলে দেখল তারপর জিভ দিয়ে কুচিটা টুক করে তুলে আবার চিবোতে লাগল।

তারক ভাবল এইসব লোক কৌতূহলীও হয় খুব। যদি বলে বসে হয়েছে কী? ইন্দ্র ভটচাজ দাদ সারাতে কি পেনিসিলিন নিয়েছিল? যদি বলে 'কই দাদটা দেখি?' ডাক্তারি করার সুযোগ পেলে এইসব লোক ছাড়ে না। কুঁচকিতে ফোড়া হলে নিশ্চয়ই দেখানোর কথা উঠবে না। বলা যায় না, পা দোলাতে দোলাতে হয়তো বলবে, 'তার জন্য তো কেউ পেনিসিলিন নেয় না।' কুতকুতিয়ে তাকাবে আর মুচকে হাসবে। দরকার নেই, অন্য অনেক দোকানই তো রয়েছে।

তারক কিছুটা হেঁটে আর একটা ওষুধের দোকান পেল। কাউন্টারের বাইরে দুটো লোক চেয়ারে বসে। হয়তো মিক্সচার তৈরি করতে দিয়েছে। কম্পাউন্ডারের মতো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যে লোকটা খাতা খুলে হিসেব মেলাচ্ছে বা কষছে সে নিশ্চয় মালিক। কে কী জন্য পেনিসিলিন নিচ্ছে তাই নিয়ে একদমই মাথা ঘামাবে না। শুধু চোখের সামনে নোট তুলে জলছাপ দেখে আবার হিসেব কষতে শুরু করবে। লোকটা নিশ্চয় ছেলেদের জন্য মাস্টার রেখেছে। ছেলেগুলো নির্ঘাত স্কুল পালিয়ে ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে ঝোলে। বউ হপ্তায় তিন দিন ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখে। কিন্তু কম্পাউন্ডারটা কোথায়? সুইং ডোরটার ওধারেই নিশ্চয় আছে। মিক্সচার বানাতে কত সময় লাগে? ইচ্ছে করেই দেরি করে ওরা। কিন্তু লোকটা জানে না এই দেরি করার জন্যই একটা ইনজেকশনের খদ্দের সে হারাতে চলেছে। পাঁচটা টাকা পেত। তাই দিয়ে আধ কিলো চাল কিনে কিংবা মটন কাটলেট খেয়ে আজ বাড়ি ফিরতে পারত।

তারক ঘড়ি দেখে আবার হাঁটতে শুরু করল। একটা দোকানে দেখল বেশ ভিড়। ডাক্তারকে ঘিরে অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষ বসে। তারকের খুব পছন্দ হল কাউন্টারে বসা লোকটিকে। ময়লা শার্ট, কাঁচাপাকা চুল, চোয়ালটা ছড়ানো, গালভাঙা, গলাটা অসম্ভব সরু। বলামাত্র নিশ্চয় সিরিঞ্জটিরিঞ্জ বার করতে শুরু করবে। সে ঠিক করল এর কাছেই নেবে।

ঢোকবার আগে আশপাশ দেখে নিতে নিতে তারকের চোখে পড়ল অফিসের একটা লোক। নামটা মনে করতে পারল না তবে নীচের তলায় বসে। মুখচেনা। রাস্তায় উবু হয়ে ব্লাউজ পছন্দ করছে। ওষুধের দোকানটার সামনেও ফেরিওলা, নিশ্চয় এখানে এসেও উবু হবে, তারপর এধারেও তাকাবে। যেই দেখবে ইনজেকশন নিচ্ছি অমনি একগাল হেসে নিশ্চয় বলবে, কী ব্যাপার, হল কী আপনার?

ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল, এই ভেবে তারক সরে পড়তে যাওয়ার আগেই লোকটা দেখে ফেলল।

"এখানে যে?"

শুনে জ্বালা করে উঠল তারকের সর্বাঙ্গ। এমনভাবে বলল যেন দিল্লি কি বোম্বাইয়ে দেখা।

"এই একটা ওষুধ কিনতে এসেছি। কোনও দোকানেই পাচ্ছি না।" তারক যতটা সম্ভব হেসে বলার চেষ্টা করল।

"কোনও জিনিসই দরকারের সময় পাওয়া যায় না। কাল খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হয়ে গেলুম ওয়াটার বটলের একটা গ্লাসের জন্য। ক্যানিং স্ট্রিট, মুরগিহাটা চষে ফেললুম, পেলুম না। তার আগে ছেলেটার স্কুলের বই নেওয়ার জন্য হ্যান্ডেল দেওয়া প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ খুঁজে খুঁজে পেলুম না। অথচ ক'দিন আগেই দোকানে দেখেছি। যে-জিনিসটি দরকার দেখবেন উধাও হয়ে গেছে।"

মনে মনে তারক বলল, কিনছিলে তো বউয়ের ব্লাউজ। ফুটপাত থেকে কেনার লজ্জা ঢাকতে এত বাজে কথার দরকার কী।

"যা দিনকাল পড়েছে, জিনিসের দাম কী, আগুন সব।" তারক গম্ভীর মুখে বলল।

"আজ একটা সুখবর পেলুম। স্ট্যাটিসটিকাল সেকশানের মিস্টার ঘোষাল আর আমি এক ট্রামেই এলুম। উনি বললেন, যা ফিগার পেয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে শিগগির একটা শ্ল্যাব হয়তো বাড়বে।"

লোকটা জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকল। তারক সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করে দেখল, তা হলে তার ডি. এ. তেত্রিশ টাকা বাড়বে। এই লোকটারও হয়তো তেত্রিশ টাকা বাড়বে। সেই আনন্দে বোধহয় বউকে পনেরো টাকার উপহার দিচ্ছে।

"যদি বাড়ে তা হলে তো ভালই।"

লোকটা যেন ক্ষুব্ধ হল। এমন আলগা উত্তর নিশ্চয় আশা করেনি। হয়তো ভেবেছিল শুনেই নৃত্য শুরু কবে দেবে। তারক ঘড়ি দেখে বলল, "একটু তাড়া আছে, চলি।"

তারক হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ সে একটিও ওষুধের দোকান পেল না। অবশেষে এক ডাক্তারখানায় একটি যুবককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরটা খুবই ছোট। দুটি মাত্র আলমারি। একটি টেবল, খান চারেক চেয়ার আর বেঞ্চ। আলমারি দুটির মাঝে দড়িতে পর্দার ওধারে নিশ্চয় তোশকপাতা বেঞ্চ বা চৌকি আছে, রোগী শুইয়ে পরীক্ষার জন্য। যুবকটি ছাড়া ঘরে কোনও লোক নেই। তারক আলমারির সামগ্রীগুলো লক্ষ করল। শিশি, কৌটা, অ্যাম্পুল যা ডাক্তারদের আলমারিতে থাকে উচিত তাই রয়েছে, তবে ঠাসাঠাসি নয়। বোধহয় ওষুধ কোম্পানির স্যাম্পেলগুলো জমিয়ে রেখেছে। দেখে মনে হয় বহু দিনের। তারক ভাবল, ওষুধগুলো টাটকা না বাসি তা দিয়ে আমার কী। ছেলেটা কি ইনজেকশন দিতে পারে?

তারক ডাক্তারখানায় ঢুকল। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ডাক্তারবাবু কলে বেরিয়েছেন, ফিরতে আধঘণ্টা দেরি হবে।"

"আপনি ইনজেকশন দেন?"

"কী ইনজেকশন?"

"পেনিসিলিন।"

"বসুন।"

খুশিতে তারক ধপ করে বসল। ডাক্তার বা অন্য কেউ আসার আগেই ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাবে।

"পেনিসিলিন এনেছেন?"

"এখানে পাওয়া যায় না?"

"না, ফুরিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা নিয়ে আসছি।"

"সঙ্গে জলও আনবেন।"

তারক হনহনিয়ে গেল। সরু গলা, গালে গর্ত, চওড়া চোয়ালওলা লোকটাকে বলল, "পাঁচ লাখ পেনিসিলিন আর একটা জল দিন তো।" দশটা টাকা দিয়ে, খুচরা পয়সা না গুনেই, হনহনিয়ে আবার ফিরে এল।

পর্দা তুলে যুবকটি বলল, "ভেতরে আসুন।"

তারক ভিতরে এসে দেখল, যা ভেবেছিল তাই। অয়েলক্লথের মতো কী একটা তোশকের উপর পাতা। তোশক দেখে মনে হয় ছারপোকা আছে। বসে থেকে সে দেখল স্পিরিট দিয়ে সিরিঞ্জের

শুদ্ধিকরণ করাতে ডিস্টিল ওয়াটার অ্যাম্পুলের মাথাটা ঘষে ঘষে মুট করে ভেঙে ফেলা, পেনিসিলিন শিশির টিনের পাতমোড়া মাথা থেকে ঢাকনা তুলে ছুঁচ ফুটিয়ে জল ঢুকিয়ে দেওয়া, শিশিটাকে ঝাঁকিয়ে গুঁড়ো পেনিসিলিন গলিয়ে ফেলা।

দেখতে দেখতে তারক খুব আরাম বোধ করল। রোগমুক্ত হওয়ার নির্ভাবনা আসা মাত্র তার গা দুলে উঠল, গ্রন্থিগুলোয় যত জট পাকিয়ে ছিল খুলে গেল, শরীর থেকে বছরের পর বছর ঝরে যেতে থাকল। সে দম বন্ধ করে রইল ভারশূন্য বোধটাকে লুটোপুটি খাওয়ার সুযোগ করে দিতে।

"ডান হাত না বাঁ হাতে?"

স্পিরিট ঘষে যুবকটি তার বাহু পরিষ্কার শুরু করল। এত অনায়াসে আগে কখনও কি কোনও অঙ্গ সে নাড়িয়েছে? তারক মনে করতে পারছে না।

"শুয়ে পড়ুন বাঁ কাত হয়ে।"

দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে তাকাতেই তারক দেখল নোনা লেগে বালি খসে ইট বেরিয়ে! স্কুলের ম্যাপে ভারতবর্ষের মতো রং। ইংরেজ আমলে ওই রং ছিল, এখন কী হয়েছে কে জানে! লম্বা লাঠির ডগাটা হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গঙ্গার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার সময় কেশববাবু বলেছিলেন, এই নদীই হচ্ছে ভারতের ইতিহাস, ভারতের আত্মা, ভারতের দর্শন। পানু ডুবে মরেছিল গঙ্গায়। আহিরিটোলা ঘাটে জেটির নীচে শেকল জড়ানো ফ্যাকাশে শরীরটা দু'দিন পরে পাওয়া যায়।

"শক্ত করবেন না তা হলে লাগবে।"

যুবকটির নিশ্বাসের শব্দ তারক শুনতে পাচ্ছে। পেনিসিলিন নিতে গিয়ে কেউ কি মরেছে? ছোকরার হাত কাঁপছে। ছুঁচ ফোটার সময় পট করে শব্দ হল না তো! আস্ত বড় মাছ কোটার আগে মা ডাকত, তারক আয়, পটকা ফাটাবি। গোড়ালি দিয়ে লাথি দিলেই পট করে ফেটে যেত।

"আঃ।"

"লাগছে? ভেতরে ঢোকার সময় একটু লাগবে।"

লাগুক! তারক চোখ বুজে ভাবল, এ তো খুবই সামান্য ব্যথা। মা বলল, তোর ভালর জন্যই মেরেছে। বড় হয়ে বুঝবি শুধু খেলে বেড়ালেই কি চলে? পরীক্ষায় ফেল করলে লোকে কী বলবে, তোর বাবার মাথাও তো হেঁট হবে। এইরকম জোরে জোরে নয়, আরও আস্তে আস্তে আলতো করে মা বুক পিঠ গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

"এখন কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন।"

মা চলে গেল রান্নাঘরে। তখন ভাবতে লাগলুম পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে বাবাকে অপমান করব। স্কলারশিপের টাকায় পড়ব। ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে যাচ্ছিল। শুনতে পেলুম মা চাপা ধমক দিচ্ছে, কচি ছেলেকে ওইভাবে মারে? দু'-একদিন যদি স্কুল কামাই করে খেলতেই যায়, তাতে কী এমন সব্বোনাশ হয় যে চোরের মার মারবে?

ওর ভালর জন্যই মেরেছি।

মরে গেলে তখন ভাল করা যে ঘুচে যেত।

ওর খেলা আমি ঘোচাব। কালই মল্লিকমশাইকে গিয়ে বলছি, আপনার বাগানে ছেলেদের খেলা বন্ধ করে দিন।

কাত হয়ে চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে তারকের হাসি পেল। গগন বসুমল্লিকের সামনে দাঁড়াবার কোনও যোগ্যতাই ছিল না বঙ্কুবিহারী সিংহের। তার ছেলেরও ছিল না। গোপাল বলেছিল, জাতে না মিলল তো কী হয়েছে, আসলে দেখতে হয় চরিত্র। তুই কি খারাপ ছেলে? রাজি থাকিস তো মাকে বলি।

"এইবার উঠুন।"

তারক উঠে বসল। পাঁচটা টাকা দিল যুবকটিকে।

"আপনি কি রোজ নেবেন?"

"হ্যাঁ।"

"ক'টা নেবেন?"

"সাতদিন, দু'বেলা করে।"

"সকালে ন'টায় ডাক্তারখানা খোলে।"

"কিন্তু এত দেরি করলে তো আমার চলবে না। ন'টায় অফিস বেরোই।" তারক ঘড়ি দেখল। ন'টা বেজে দশ। কাল সকাল ন'টা-দশে বারো ঘণ্টা পূর্ণ হবে।

"ঠিকানা দিন ন'টার মধ্যেই বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসব।"

আঁতকে উঠল তারক। বাড়িতে বঙ্কুবিহারীর সামনে ইনজেকশন।

"সকালে একজনের কাছে নিচ্ছি। রাতে তার অসুবিধা বলেই আপনার কাছে এলুম।" এই মিথ্যেকথাটুকু বলাব জন্য তারক দুঃখবোধ করল।

পাঁচটি টাকা হাতছাড়া হওয়ায় যুবকটি ক্ষুণ্ণ হল। পেনিসিলিনের খালি শিশিটা দেখে তারকের মনে হল অমুর খেলনা হতে পারে এটা। কিন্তু ওর মা বা দাদু যদি জানতে চায় কী করে সে পেল?

বাইরে এসে তারক প্রফুল্ল বোধ করতে লাগল। এক টাকার একটা সিগারেট কিনে, ধরিয়ে, ট্রাম বাস মানুষ ইত্যাদি দেখতে দেখতে তার মনে হল, রেণুকে এখন না আনাই ভাল। তিন মাস স্বামীসঙ্গ না পেয়ে ও নিশ্চয়ই কাতর। কিন্তু এলেও সাত দিন সবুর করতেই হবে। তা কি ওর পক্ষে সম্ভব? আসার সময় একটা চুমু দিয়েছিলাম, দিন পঁচিশ হয়ে গেল, তখন শরীরটাকে দুমড়ে বেঁকিয়ে দিচ্ছিল। পাউডারের গন্ধের সঙ্গে ব্লাউজ থেকে বাসি দুধের টক টক গন্ধও পেয়েছিলাম। সাত দিন ঠেকিয়ে রাখার জন্য ভাল মতো অজুহাত চাই। তাবক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বাত্রে ঘুম এল না। বেণুকে সাত দিন পর আনলেই হবে কিন্তু কাল সকালেই দ্বিতীয় ইনজেকশন কোথায় নেবে, এই ভাবনা তারককে পেয়ে বসল। ক্রমশ সে বিরক্ত এবং অসহায় বোধ করতে লাগল। এরপরও আছে প্রণবের কাছে গিয়ে অনিতাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। ওকে রাজি করাতে হবে। সে-জন্য বোঝাতে হবে এ ঘটনাব জন্য সমাজই দায়ী, নয়তো গতরই নাড়াবে না। কিন্তু কোন কথাগুলো বললে প্রণব পটবে তারক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। এইসব ঝুটঝামেলা আমার ঘাড়েই বা চাপে কেন?

তারক অক্ষম রাগে নিজেকেই দায়ী করতে থাকল। দয়া মায়া মমতা—যে ক'টা ছেঁদা আছে সব বন্ধ করে দেব, দেখি কোনখান দিয়ে ঝামেলাগুলো ঢোকে। ইন্টারভিউ পাইয়ে দাও, পেট খসিয়ে দাও, খালি আবদাব আর আবদার। ভেবেছে কী আমায়, বেগার খাটার লোক! শুধু ফিল্ডিং দেবার জন্যই ডাকবে?

পায়ের ডিম আব উরুর পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল তারকের। মাথার মধ্যে ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছে। ভেবেছে কী, ভেবেছে কী মনে মনে সে আউড়ে চলল। বালিশটাকে পাঁচ আঙুলে চেপে ধরে সে ভাবল এবার উপড়ে নেব ওর ড্যাবড্যাবে চোখ। শুধু দুটো খোঁদল দগদগ করবে। অন্ধ হয়ে হাতড়ে হাতড়ে চলবে। ছেলেদেব মতো রুগ্‌ণ হাত দেখলে মায়া হয়। ও-দুটো ছিঁড়ে নেব, শিরদাঁড়াটা পিঠ থেকে টান দিয়ে ছাড়িয়ে নেব—ভেবেছে কী, বেগার খাটার লোক? নেভাবার জন্য জ্বলন্ত সিগাবেট ঘষবে আমার গায়ে?

দয়া-মায়া-মমতা থেকে রেহাই পাবার জন্য তারক হিংস্রভাবে বালিশটাকে তলপেটের নীচে চেপে অনুভব করল, সকালে ট্রামে যে-ভাবে চুলের গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল, সেই রকম শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা। স্ত্রীলোকটিকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেখল, তেল চিটচিটে ব্রেশিয়ারের স্ট্রাপ। তারপরই দেখতে পেল, শিরদাঁড়ার একটা ফুলে ওঠা গ্রন্থি। তখন প্রাণপণে সে, গৌরীকে আঁকড়ে ধরতে গেল। দেড়শো বছরের বাড়ির অন্ধকার সিঁড়ির খিলেনের তলা দিয়ে গৌরী ছুটে উপরে উঠে গেল। কাতরস্বরে তারক বারকয়েক, গৌরী, গৌরী, বলে ডেকে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল বালিশে।

কিছুক্ষণ পর তারক উঠল। জল খেয়ে, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, পুরো একটি সিগারেট শেষ করতে করতে নিজেকে আর বেগার খাটার লোক বলে মনে করতে পারল না। সলিলের মতোই প্রায় শ্যামল গাঙ্গুলির পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল রবি বোস—"ইনিংস ডিফিট খাব? শ্যামল তুই থাকতে

বাংলার এ অপমান দেখতে হবে?" শ্যামল ছিল বাংলা দলে অটোমেটিক চয়েস। সেদিন সাতাত্তর রান করে শ্যামল ইনিংস ডিফিট থেকে বাংলাকে বাঁচায়।

এখন তারকের মনে হচ্ছে সে যেন শ্যামল গাঙ্গুলি। সলিল গুহ আর রবি বোস একই লোক। বাঁচাবার আবেদন দু'জনেরই হাতে। টুয়েলফ্‌থম্যানের কাছে কি কেউ করুণার পাত্র হয়ে আসে? তারক নিজের মনে হাসল এবং নিজেকে শুনিয়ে বলল—টি. সিনহা তা হলে বাপু সাতাত্তরটি রান করে এবার তোমার এলেম দেখাতে হবে।

পাঁচ

"তোর বোন?"

"না না আমার নিজের বোন কোথায়, মাসতুতো বোন।"

তারক ব্যস্ত হয়ে প্রণবকে শুধরে দিল। মেজমাসির ছোটমেয়ে ইলাকে ভেবে রেখেছে সে। বছর তিন বোধহয় দেখেনি, তখন শুনেছিল ক্লাস নাইনে পড়ে। অতএব এখন সে প্রেগনান্ট হবার মতো যুগ্যিমন্ত হয়েছে নিশ্চয়।

প্রণবকে আনমনা হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতে দেখে তারক কণ্ঠস্বর ধীর ব্যথিত করে বলল, "ব্যাপারটা এমনই, ওরা যে কী করবে ভেবেই পাচ্ছে না। মিশতে দিয়েছিল খোলা মনে। ভেবেছিল বিয়ে তো হবেই, ঠিকও হয়ে গেছল এই ফাল্গুনে, দুম করে ছেলেটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল। তারপরই জানা গেল মেয়ে ইতিমধ্যে প্রেগনান্ট হয়ে গেছে। এখন অ্যাবোর্শন ছাড়া আর কী উপায় আছে, তুই-ই বল?"

তারক ঝুঁকে রইল উত্তরের আশায়। প্রণব হয়তো বলতে পারে মিশতে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। সেটা মেনে নেওয়া যাবে। বলতে পারে মেয়েটার দিক থেকে নিশ্চয় আশকারা ছিল বা সংযত হওয়া উচিত ছিল, বাপ-মা ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারেনি, তা-ও স্বীকার করে নেব। তারক ঠিক করেই রেখেছে কোনও তর্কের মধ্যে যাবে না।

জানালার বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে প্রণব বলল, "পরিমল মারা গেছে জানিস?"

তারক প্রস্তুত ছিল না কথাটা শোনার জন্য। অবাক হয়ে বলল, "কে পরিমল?"

"কলেজে আমাদের সঙ্গেই তো পড়ত। কবিতা লিখত, পরিমল ভট্টাচার্য।"

তারককে তবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রণব বলল, "খুব নাম করেছিল, তিনখানি বইও আছে ওর। আমাদের ব্যাচে ওই একমাত্র যার নাম হয়েছে। কলেজে অবশ্য সবাই তোকেই চিনত।"

"কী করে মারা গেল?"

এতক্ষণ ধরে বলা মাসতুতো বোনের সর্বনাশের কথা প্রণব যে কিছুই শোনেনি এতে তারক ক্ষুণ্ণ হল। তবু আগ্রহ না দেখালে প্রণব যদি ক্ষুণ্ণ হয় এই ভেবে আর একটু যোগ করল, "ওঁর আছে কে?"

"ক্যানসারে মারা গেল। বউ আর পাঁচ বছরের একটা ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। কলেজের লেকচারার ছিল, কত আর মাইনে পেত। কাল একটা মিটিং আছে মহাবোধি হলে, যাবি?"

"কীসের মিটিং?"

বলেই তারকের মনে হল জিজ্ঞাসা করাটা ঠিক হল না। কেউ মরে গেলে শোকসভা ছাড়া কী হতে পারে।

"কালকে তো? যাব'খন।'

মনে হচ্ছে প্রণব খুশি হল। তাই তো তারক মাসতুতো বোনের প্রসঙ্গ আবার তুলল, "তোর সেই ডাক্তারের কাছে একবার চল। মেয়েটা দু'বার গলায় দড়ি দেবার চেষ্টা করেছিল। এখন সব সময় চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। কখন যে কী করে ফেলে। আত্মহত্যার এত জিনিস আজকাল হাতের কাছেই পাওয়া যায়।"

"ডাক্তার শুনেছিলাম পুরী গেছে, ফিরেছে কি না খোঁজ নিতে হবে। পরিমলের মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার পর থেকেই মনটা এত খারাপ হয়ে আছে।"

তারক বুঝতে পারছে না, ডাক্তারের পুরী থেকে ফেরার খবরটা নিতে বলার জন্য প্রণবকে এখন অনুরোধ করা চলে কি না। একটা মেয়ে মরতে চেষ্টা করেছে আর একটা লোক মরে গেছে, এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনটিতে মন বেশি খারাপ হয় এটা সে ঠিক করতে পারছে না।

"তা হলে রাতে একবার খোঁজ করব?"

"রাতে?" প্রণব কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "কাল মিটিং-এ তো দেখা হবে, তখন তোকে বলব। আচ্ছা, তোর ছেলেটা কত বড় হল, স্কুলে ভরতি করিয়েছিস?"

"চার বছর তো বয়েস, আর একটু বড় হোক। ভাল কথা, খরচ কী রকম পড়বে বল তো ওই ব্যাপারটায়?"

"তা আমি কী করে বলব, ডাক্তার যা বলবে তাই।"

প্রণবের কণ্ঠস্বর, উদাস চোখে জানালার বাইরে মাঝেমাঝে তাকানো এবং অ্যাশট্রে থাকা সত্ত্বেও মেঝেয় সিগারেটের ছাই ঝাড়া থেকে তারকের মনে হল, প্রণব তাকে পাত্তা দিতে ইচ্ছুক নয়। অথচ এই প্রণব পাঁচ বছর আগে একদিন বাড়ি বয়ে এসে টেস্ট ম্যাচের সিজন টিকিট চেয়েছিল। তখনকার প্রণবের মুখ আর এই মুহূর্তের টি. সিনহার মুখ হয়তো একই রকম, যেমন তখনকার টি. সিনহার মেজাজ আর এখনকার প্রণবের ঔদাসীন্যে কোনও তফাত নেই। সেদিন তারক শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এবার হয়তো প্রণব তার শোধ নেবে। একটা বিরক্তকর টেস্ট ম্যাচ না-দেখার দুঃখের সঙ্গে একটা মেয়ের মরণ-বাঁচানোর সমস্যাটা কি প্রণব মিশিয়ে ফেলবে?

তারক অতঃপর ভাবল, প্রণবকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। বড্ড বেশি যেন শোকাচ্ছন্নের ভান করছে। পরিমল তিনটি বই লিখেছে এবং আমি এক বছরে গড়ের মাঠে আটটা সেঞ্চুরি করেছিলাম। পরিমলের লেখা পদ্য পড়ার ইচ্ছে হলে দোকান থেকে বই কিনে আনলেই চলে, কিন্তু আমার সেঞ্চুরি মাঠে গেলেই দেখা যাবে না—এই জন্যই পরিমল খ্যাতনামা হয়ে থেকে যাবে। কিন্তু পদ্যের এক একটা লাইন যেমন হঠাৎ মনের মধ্যে ঝিলিক দেয় তেমনি এক একটা স্ট্রোকও কি দেয় না?

"তোর মনে আছে কি, কালীঘাট মাঠে পলাশ রায়ের একটা গুগলি ক্লাইভ লয়েডের মতো হাঁটু ভেঙে সুইপ করেছিলাম?" তারক আকুল চোখে তাকাল প্রণবের দিকে।

"লিগের খেলায়!" হঠাৎ এমন এক খাপছাড়া প্রশ্নে প্রণব অবাক।

"হ্যাঁ। তুই গেছলি সে খেলাটা দেখতে। আমি লাঞ্চের সময় তোকে দেখেছি স্কোবারের ঘাড়ের উপব ঝুঁকে স্কোরবই দেখতে। তারপরেই আমাদের ব্যাট ছিল।"

প্রণব কিছুক্ষণ ধরে মনে করার চেষ্টা করল এবং হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "কী জানি। বোধহয় অন্য মাঠে চলে গেছলুম। তবে রঞ্জি ট্রায়ালের ম্যাচটা দেখেছি।"

প্রণবের চোখে যেন চাপা হাসি ঝিলিক দিল। অন্তত তারকের তাই মনে হল। সেই ট্রায়াল খেলার প্রথম ইনিংস তারক প্রথম বলটা এগিয়ে খেলতে দিয়ে ফসকে যায়, বল প্যাডে লাগল। তার 'আউট' প্রার্থনা করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সারা মাঠ। আম্পায়ারের যে কয়েকটি মুহূর্ত লেগেছিল সিদ্ধান্ত জানাতে, সেই সময়টুকুর মধ্যেই তারক দেখে মৃত্যুশয্যায় শায়িত একটি লোককে ঘিরে কিছু লোক উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে। আম্পায়ার মাথা নেড়ে নাকচ করার পর তারকের মনে হল সে ঠিকই ব্যাট পেতেছিল কিন্তু বলটা হঠাৎ ছিটকে সরে এল মাটিতে পড়ে। কারণ অনুসন্ধান করবে কি না ভেবেছিল। কিন্তু করেনি। দ্বিতীয় বল সাবধানে পিছিয়ে খেলবে স্থির করে, ব্যাট ধরে যখন বোলারের দিকে তাকিয়ে তখন তার মনে হল প্রায় দু'গজ দূরে গুডলেংথ স্পটের উপর একটা কাঁকর। ছুটে আসা বোলারের থেকে লহমার জন্য চোখ সরিয়ে তারক সেই দিকে তাকিয়েছিল। তখন একবার মনে হয়েছিল, বোলারকে থামিয়ে পিচে কাঁকর আছে দেখে নেব কি না! সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বলটা পড়ল গুডলেংথ স্পটে এবং একচুলও না উঠে, মাটি ঘষড়ে এল। ব্যাট নামাবারও সে সময় পেল না। উইকেট কিপার ছিল তপন ঘোষ। ফ্যালফ্যাল করে ভাঙা উইকেটের দিকে তাকিয়ে থাকা তারককে বলেছিল, "সেকেন্ড ইনিংস তো আছে, ঘাবড়াসনি।" অপর উইকেটে দাঁড়ানো নন-স্ট্রাইকার অরুণাভ ভটচাজের চোখে তারক যেন

স্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিল। তারক বাদ পড়লে অরুণাভের টিমে আসার কথা। উইকেটে ছেড়ে আসার আগে তারক পিচের উপর ঝুঁকে সত্যি সত্যিই একটা মটর দানার মতো কাঁকর দেখতে পায়। সেটা খুঁটে তুলে নিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হয়েছিল—যদি আগেই এটাকে তুলে ফেলে দিতাম। আমার দ্বিধা-ই আমার সর্বনাশের কারণ হল। আর বোধহয় আমি টিমে আসতে পারলাম না।

দ্বিতীয় ইনিংস আর খেলা হয়নি। তবে মরিয়া হয়ে ফিল্ড করেছিল তারক। একটি রান আউট ও দুটি ক্যাচ ধরে সে স্থান পেল দ্বাদশব্যক্তি রূপে।

"বলটা শুট না করলে, মনে হয় তুই টিমে চলে আসতিস।" প্রণব এত বছর পর সান্ত্বনা দিচ্ছে, এতে তারক মনে মনে কুঁকড়ে গেলেও, ভেবে বিস্মিত হল, ব্যর্থতার এই দৃশ্যটি প্রণব মনে রেখেছে ঠিকই।

"বলা শক্ত, অরুণ মিত্তিরের ক্যান্ডিডেট ছিল অরুণাভ। ট্রায়ালে ও ফিফটি এইট করে সিলেকশান পায়।"

"যা বোলিং ছিল, তুই সেঞ্চুরি করতে পারতিস।"

"বরাত। নয়তো ইডেনের পিচে কাঁকর থাকবে কেন।"

"অরুণ মিত্তির তো তোকেও ব্যাক করেছিল।"

"কিন্তু অরুণাভ ওকে মদ খাওয়াত, বাড়িতে চাকরের মতো পড়ে থাকত, শুনেছি অরুণাভ যাকে বিয়ে করছে সে নাকি অরুণ মিত্তিরের কেপ্টের মেয়ে।"

তারক হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকল। প্রণব শুনতে শুনতে আবার জানলার বাইরে উদাসীন ভঙ্গিতে চোখ ফেরাল।

"ভেবেছিলুম আমাদের মধ্যে তুই-ই সব থেকে বেশি নাম করবি।"

তারক নিজের জন্য দুঃখে এবং অনুতাপে পীড়িত হয়ে নিরুপায়ের মতো চোখ নামিয়ে দেখল প্রণবের চেয়ারের তলায় একটা আলপিন পড়ে রয়ছে। সে ভাবল, ওটা খুঁটে তুলে নেবে কি না। তুলে না নিলে কারুর, বিশেষত প্রণবের, কোনও সর্বনাশ ঘটতে পারে এমন কথা তার মনে হল না। তবে ওটা যেমন আছে থাক, এই সিদ্ধান্তে এসে তারক বলল, "পরিমল তো নাম করেছে।"

"হ্যাঁ। তবে যাদের মধ্যে ও পরিচিত তারা পাবলিক নয়। খুবই সীমিত গণ্ডিতে পরিমলের খ্যাতি। ভাবছি একটা কিছু করা দরকার।"

"কার জন্য?"

প্রণব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তারকের আফশোস হল আবার নিজের জন্য। পাবলিকের মধ্যে পরিচিত থাকলে প্রণব এখন তার জন্য এর থেকেও বেশি চিন্তায় ডুব দিত। মৃত পরিমলকে হঠাৎ তার, একটা কাঁকর মনে হতে লাগল। প্রণবের মন থেকে খুঁটে ফেলে দিতে না পারলে, ওর ভাবনা তারকের সমস্যাকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। ছিটকে ছিটকে সরে যাবে।

"ইলার জন্য সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। বেচারা, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।" তারক গম্ভীর দুঃখ কষ্টে প্রকাশ করার চেষ্টায় নাটকীয় ভঙ্গিতেই মুঠো করে চুল টেনে ধরল। "মেয়েটা মারা যাবে ভাবতে পারছি না!"

"পরিমলের বউ আর ছেলে যে কী করে বাঁচবে এবার... কিছু একটা করা দরকার।"

"তুই একা আর কী করে বাঁচাবি। তা হলে মাসে মাসে তোকে সাহায্য করতে হবে যতদিন না ছেলেটা মানুষ হয়ে রোজগার করছে। তা কি সম্ভব?"

প্রণব সচকিত হয়ে বলল, "সে-রকম কিছু করার কথা ভাবছি না। তা হলেও, এই রকম একটা পরিস্থিতির কথা ভাবলে কিছু একটা করতে ইচ্ছে করত।"

"নিশ্চয় খুবই স্বাভাবিক। তা না হলে আমরা মানুষ কেন! ইলার জন্য আমার তা হলে মাথাব্যথা হবে কেন, তুই-ই বা ডাক্তারের কাছে যেতে রাজি হলি কেন? মানুষ বলেই তো?"

প্রণবের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। তারকের মনে হল, ওর ভাল লাগছে কথাগুলো। মানুষকে মানুষ বললে মানুষ খুশি হয়, এটা সে জানত। এতক্ষণে শব্দটা কাজে না লাগানোর জন্য আফশোস হল তার। দ্বিগুণ উৎসাহে সে বলল, "তুই ভাল করেই জানিস, ইলাকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার একটা পথই খোলা আছে। তুই পারিস সেই পথে সাহায্য করতে। তুই মানুষ, কিছুতেই পারবি না একটা মেয়ের মৃত্যু ঘটাতে।"

"আমি মৃত্যু ঘটাব?"

প্রণব সিধে হয়ে বসল। তারক অপ্রতিভ বোধ করল।

"এ-ক্ষেত্রে, সাহায্য না করা মানেই তো মৃত্যু ঘটতে দেওয়া। তোকে বললুম না, ইলা আত্মহত্যা করতে চাইছে।"

"কিন্তু ও আত্মহত্যা করলে কেউ কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?"

তারক চট করে জবাব দিতে পারল না। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "কিন্তু ও বেঁচে থাকলে, হয়তো পরে কেউ লাভবান হতে পারে।"

"এটা অনুমান।"

"তাই থেকেই সিদ্ধান্তে আসতে হয়।"

"কীসের ভিত্তিতে এই অনুমান? যে আত্মহত্যা করতে চায় তার তো কলকবজা সব ঢিলে হয়ে গেছে। তা ছাড়া এই ব্যাপারটা অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় প্রেগনান্ট হওয়া, এটা তো কোনওদিনই তোব মাসতুতো বোন ভুলতে পারবে না। ব্যাপারটা ওকে তাড়া করবে সবসময়। সুতরাং কলকবজা ওর ঢিলেই থেকে যাবে। তার থেকে বরং—"

তাবক টান হয়ে বলল। প্রণব আর কথা না বলে উদাস হয়ে গেল। যদি প্রণব ভয়ংকর ধরনের কিছু একটা বলে বসে, এই ভয়ে তারক উঠে দাঁড়াল।

"অফিস যেতে হবে, আজ চলি রে। কাল মিটিংয়ে দেখা হচ্ছে। তুই ইতিমধ্যে তা হলে ডাক্তার ফিবেছে কি না খোঁজ নিয়ে রাখিস।"

বিদায় নিয়ে বাস্তায় নেমে তারক দেখল প্রায় সাড়ে আটটা। এখুনি ইনজেকশন নিতে হবে। দ্রুত হেঁটে সে গাল তোবড়ানো লোকটার ওষুধের দোকানে ঢুকে বলল, "পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে পারবেন, পাঁচ লাখ।"

"বসুন।"

গাল তোবড়ানো লোকটা আর একটিও কথা বলেনি। তারক ভেবেছিল বেঞ্চে শুতে বলবে। কিন্তু বেঞ্চটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। চেনা কেউ দেখতে পেলে হয়তো কৌতূহলে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই কোনও কথা বলবার আগেই সে বাঁ হাতের জামার হাতা গুটিয়ে বলল, "বসে বসেই নিচ্ছি, পাঁচ লাখ তো মোটে, কিসসু হবে না।"

গাল তোবড়ানো শুধু ঘাড় নাড়ল। ইনজেকশন নেওয়া সারা হতে মিনিট দশেক লাগল। তারমধ্যে তারক ভেবে নিল,—দুপুরে গুহ ফোন করবে আর বিকেলে ময়দানে মিছিলের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে হিবণ্ময় জানতে পারবেই। সব ডিপার্টমেন্টে ওর চর আছে। তারপর কোনমুখে ওকে নাবানেব জন্য অনুরোধ করা সম্ভব। প্রণব ব্যবস্থা করে দেবে কি না বোঝা গেল না। মনটা সত্যিই ওর খাবাপ হয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। তাজা মন খুব কৌতূহলী হয়। যদি বলত, চল তোর মেসোর সঙ্গে আগে দেখা করি, তা হলে আবার ব্যাপারটা ম্যানেজ করার জন্য কিছু একটা বলতে হত। হল না, এইটাই আপাতত স্বস্তিকর।

টুলে বসে বঙ্কুবিহারী মিস্ত্রি খাটাচ্ছে। তারক কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল। বঙ্কুবিহারী ডাকল। বৈঠকখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "কালকের মেয়েটি এসে বসে আছে অনেকক্ষণ।"

অনিতা! তারক মোটেই প্রস্তুত নয় এই সময়ে ওর আসায়। কী দরকার? বঙ্কুবিহারীকে বিরক্ত ও সন্দিহান চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে মুখখানি ব্যাজার করে বোঝাতে চাইল, সে-ও খুব বিরক্ত হয়েছে।

"বসো বসো। কী ব্যাপার, গুহ কোথায়?"

"আমি একা এসেছি।" অনিতা চাপা গলায় বলল। তারক লক্ষ করল ওর চোখ দুটো ফোলা। বোধ হয় রাতে একদমই ঘুমোয়নি। শাড়িটা ঘরে কাচা, ইস্ত্রি হয়নি, শরীরে লেপটে। মনে হচ্ছে বাখারির ফ্রেমে কাপড় জড়ানো। তারকের ইচ্ছে করছে না ওর দিকে তাকাতে।

"এই সময়? এখনই তো অফিস বেরোব।"

"আপনাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি। ডাক্তারের কাছে আপনি যাবেন না।"

"কেন?" বলে তারক প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বঙ্কুবিহারীর কান যে এদিকেই পাতা, তাতেও সে নিঃসন্দিগ্ধ।

"তবে যে কাল এত কথা হল গুহর সঙ্গে! ব্যাপারটা কী?"

"আমার ভাল লাগছে না, মানে, কী রকম যেন মনে হচ্ছে।" অনিতা গুছিয়ে বলার জন্য দু'হাতের আঙুলগুলো জড়াল। তারক লক্ষ করল তিন-চারটে শিরা আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত ফুলে উঠে চুপসে গেল। "আপনি বরং ওকে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলুন।"

"সে তো বলেই ছিলুম। কিন্তু ও চায় আগে এই ব্যাপারটা সেরে নিতে। বিয়ে হলে তো এ-সবের দরকার নেই। আমিও অহেতুক একটা বাজে ব্যাপার থেকে মুক্ত হতাম।"

"না না আপনি ওকে আগে বিয়ের জন্যই বলুন।"

"তুমি তো বলতে পারো?"

"বলেছিলুম। আপনাকে, যা বলেছে তাই বলল।"

"তা হলে আমি বললে আর কী হবে। ও তো ছোটছেলে নয়, তা ছাড়া আমি ওর গার্জেনও নই।"

"কিন্তু ওর কারণগুলো কি নেহাতই বাজে নয়। বহু মেয়েরই তো প্রিম্যাচুওর ডেলিভারি হয় তাই নিয়ে কি কলঙ্ক রটে? তা ছাড়া এ তো ওরই বাচ্চা, অন্যের তো নয়?"

তারক মনোযোগ করে অনিতার মুখখানি দেখছিল। বাইরে বঙ্কুবিহারীর চড়া গলা শুনতে পেল, "দেবু ক'টা বাজে, অফিস টফিস কি আজ বন্ধ?"

"আচ্ছা পরে কথা হবে'খন। দুপুরে গুহ টেলিফোন করবে, তখন তো ও-সব কথা বলা যাবে না। রাতে ওকে আসতে বলব। তোমার সঙ্গে আজ দেখা হবে?"

"গিয়ে দেখা করতে পারি, কিছু বলতে হবে?"

"না থাক।"

"আপনাকে কিন্তু এইটুকু করতেই হবে তারকদা, ছোটবোনের মুখ চেয়েও অন্তত করুন। ও তো রেজিস্ট্রি বিয়েও করে রাখতে পারে, তা হলে স্বচ্ছন্দে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি।"

চান-খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তারকের মনে হতে লাগল, আবার একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছি। গুহ যদি আগে বিয়ে না করতে চায়, তবে আমাকে কি ওর সঙ্গে লেগে থেকে বোঝাতে হবে এই মেয়েটা চায় আগে বিয়ে হোক। দু'জনেই যদি গোঁ ধরে বসে তা হলে আমার ভূমিকা কী হবে? অবশ্য ওরা আমার কেউ নয়। ওদের বাঁচা-মরায় আমার কোনও লাভ লোকসান নেই। ওরা এটা জানে। তবু আমাকেই ওরা মাঝখানে রাখতে চায়। কী ভেবেছে যে ওরা আমাকে। আমার নিজের যে দু'বেলা ইনজেকশন নেওয়ার এত বড় একটা সমস্যা রয়েছে!

ঠিক হাঁটা বলা চলে না, ওয়াকিং রেসের প্রতিযোগীর মতো তারক ট্রাম স্টপে হাজির হল। কালকের সেই স্ত্রীলোকটি ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই তারক কুঁকড়ে গেল। তার মনে হল, হয়তো ভাবতে পারে কাল গায়ে হাত-টাত দিয়ে লোকটার লোভ ধরে গেছে। আজও ঠিক পিছু পিছু হাজির হয়েছে।

ট্রাম আসতে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে গেল এবং উঠল। তারক ক'মিনিট লেট হবে হিসেব করে, পরের ট্রামের জন্য অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে নিজেকেই বলল,—এ হচ্ছে এক ধরনের রোগ। ছেঁদাগুলো বন্ধ না করলে সারানো যাবে না। মেয়েটা আমার সম্পর্কে হয়তো ভাল-মন্দ কিছুই ভাবেনি। প্রায়ই হয়তো কেউ না কেউ ওকে কোমর ধরে পতন থেকে রক্ষা করে। হয়তো ভুলেই গেছে আমার চেহারাটা। আর আমি নিজেকে অপরাধী বানিয়ে অফিস লেট করে মুখ লুকোচ্ছি। আমি কে, যে অন্যে আমাকেই ভাবছে মনে হয়? আসলে তো লক্ষ লক্ষেরই একজন।

ছয়

"জিততে হলে ঐক্য চাই।"

"ঐক্য চাই ঐক্য চাই।"

"বাঁচতে হলে লড়তে হবে।"

"লড়াই করে বাঁচতে হবে।"

"লাইন ভেঙে কাউকে যেতে দেবেন না তারকবাবু।"

"কী করব জোর করে যে চলে যাচ্ছে।" অসহায় সুরে তারক বলল।

পিছন থেকে পূর্ণ দপ্তুরি পিঠে চাপ দিল—"ঘন হয়ে থাকুন, আপনি বড্ড ফাঁক রাখছেন।"

তারক লম্বা পায়ে এগোতে গিয়ে নিখিল চাটুজ্জের গোড়ালিতে ঠোক্কর দিল। বুড়ো মানুষ, অল্পদিনই আর চাকরিতে আছেন। তাবক খুবই লজ্জা পেয়ে ঝুঁকে বলল, "লাগল আপনার?"

বৃদ্ধ ঘাড ফিরিয়ে দেখে নিল কথাটা কে বলল। তারপর মাথা নাড়ল। তারক সকলের পা ফেলার তালটা ধরার চেষ্টা শুরু করল। আর মাঝে মাঝে মিছিলের মাথার দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়কে লক্ষ করে চলল। নানান অফিসের মিছিল, একটির পিছনে আর একটি জুড়ে জুড়ে কত বড় যে হয়ে গেল তারক আর ঠাওর করতে পারছে না। লাল শালুর ফেস্টুনগুলো আড়াল করে আছে সামনেটা। তারকের ইচ্ছে হল, চট করে লাইন থেকে বেরিয়ে একবার দেখে নেয়, পাশ থেকে মিছিলটাকে কেমন দেখাচ্ছে। কিন্তু সেটা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ হতে পারে ভেবে নিবস্ত রইল।

"আপনি কি আজই প্রথম মিছিলে যোগ দিলেন?" নিখিল চাটুজ্জে মুখটা পাশে ফিরিয়ে কিন্তু সামনে চোখ রেখে বলল।

"হ্যাঁ।"

"আমি প্রথম মিছিলে বেবোই ফর্টি টু-এ, বংপুরে। এই-যে কনুইটা বাঁকা দেখছেন, পুলিশেব লাঠিতে।"

তারক ভাবল, 'আহা' বলা উচিত। কিন্তু সেটা যেন খুবই সস্তা হয়ে যায়। চোখ মুখে শ্রদ্ধা ফোটালেও তো দেখতে পাবে না। হাত বাড়িয়ে সে কনুইটাকে ছুঁতে পারে। কিন্তু অল্পবয়সি হলেই অবশ্য সেটা সম্ভব, এই বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়ে তারিফ জানানোটা বেমানান হবে।

"তারকবাবু, শুনেছি নাকি ওই পাওনা টাকাটার দশ পারসেন্ট ইউনিয়নকে চাঁদা দিতে হবে।"

"কই শুনিনি তো!"

"হ্যাঁ, কালই তো শুনলুম অনেকে বলাবলি করছে। তা হলে তো আমাকে তেতাল্লিশ টাকা প্রায় চাঁদা দিতে হবে।"

তারক হিসেব কবে দেখল, তাকে দিতে হবে আটত্রিশ টাকা। "ইউনিয়নের জন্যই তো এতগুলো টাকা পাচ্ছি, মাইনে বাড়ছে, দিলেই না-হয়, একবারই তো।"

বিড়বিড় করে পূর্ণ কী যেন বলল, তারক বুঝতে পারল না। বিমল মান্না স্লোগান দিচ্ছে দুটো সারির মাঝে পিছু হটে চলতে চলতে, মুখের পাশে টার্জানের মতো হাত রেখে চিৎকার করে। তারকের খেয়াল হল, বহুক্ষণ সে গলা দেয়নি। হিরণ্ময়ের খুব কাছের লোক বিমল মান্না। অন্তত এটুকুও যদি বলে—তারক সিঙ্গি খুব গলা দিচ্ছিল দেখলুম।

"রেশন কোটা বাড়াতে হবে।"

"রেশনের দাম কমাতে হবে।"

"মূল্য বৃদ্ধি রোধ করো।"

"দ্রব্যমূল্য হ্রাস করো।"

"দেশের শত্রু জোতদার।"

"চোবাকারবারি মজুতদার।"

বিমল মান্না দেখছে। তারক ভাবল, যাক কাজ অনেকখানি হয়ে রইল। মিছিল সাজাবার সময় হিরণ্ময় দেখেছে, হেসেও ছিল। কালকেই ওকে নারানের জন্য বলা যেতে পারে। একবার তো শুধু এ

জিম এম-কে বলা—আমার লোক। চাকরি দেওয়ার অনুরোধ নয়। বাকিটা নারানের ভাগ্য।

লালবাজার পার হয়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ধরে মিছিল চলেছে। তারক দেখল দু'ধারের ফুটপাথে লোকেরা বিরক্ত মুখে তাকিয়ে। বহু মুখ দেখে তার মনে হচ্ছে কাল কি পরশুর কোনও মিছিলে ওরা ছিল। এইভাবে শ্লোগান দিতে দিতে ময়দান কি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গেছে। আটকা পড়া ট্রাম—বাসের লোকেদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলছে—আধঘণ্টার কম নয় দাদা, বিরাট লম্বা মিছিল। ভেদ করে কেউ রাস্তা পার হবার চেষ্টা করলে হই হই করে হয়তো ঠেলে দিয়েছে। বারো-চোদ্দো বছর আগে একবার চাষিদের একটা মিছিলের মধ্য দিয়ে তারক রাস্তা পার হয়েছিল। লুঙ্গিপরা মাঝবয়সি একজনকে গায়ে হাত দিয়ে বলে—কত্তা, ওপারে যাব? লোকটি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বলে—যায়েন।

চলতে চলতে তারকের বিরক্ত লাগল। ভেবেছিল অদ্ভুত কিছু লাগবে। যেমন ম্যাচের দিন ব্যাট হাতে নামার যে শিরশিরানি পেটের মধ্যে হত বা ফাঁকা মাঠে বাউন্ডারির ধারে দুটো লোকও বসে থাকলে যে-রকম ভয় ভয় করত, সেই রকমের কোনও অনুভূতি। এখন সে দেখছে দু'ধারের দৃশ্য খুবই গতানুগতিক। যে-সব লোক দাঁড়িয়ে বা চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে তাদের কারুর চোখে তারিফ বা সমীহ নেই। যেন বলতে চায়, খুটখাট করে আর কী হবে, তাড়াতাড়ি আউট হয়ে ফিরে এসো। এখন ফুটপাথের লোকেদের ইতর বলে তার মনে হচ্ছে।

অথচ বহুবার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছে, লোকগুলোর আস্ত নিজস্ব ঘুমোবার ঘর নেই, বুদ্ধিমতী বউ বা স্বাস্থ্যবতী প্রেমিকা নেই, কৌতূহলী ছেলেমেয়ে বা সহৃদয় বাবা নেই, ওদের ঘরে একটার বেশি জানলা নেই, বন্ধুরা আড্ডা দিতে আসে না। পরদিন অফিস যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা, সম্ভবত এইভাবে মিছিল করে সময় কাটাতে পারে। ওদের বোধহয় বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। নিষ্প্রাণ উইকেটে যেন টিকিয়ে টিকিয়ে তিনশো-চারশো রান করে চলেছে। কোনওক্রমে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকাই যেন উদ্দেশ্য।

হঠাৎ চমকে উঠল তারক। অরুণ মিত্তির না? সাদা ফিয়াটে অফিস থেকেই বোধহয় বাড়ি ফিরছে। মিছিলের জন্য আটকে পড়ে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে, ভ্রূ কুঁচকে মিছিলের দিকে তাকিয়ে। তারক রুমাল বার করে মুখ মুছতে শুরু করল যেন না চিনতে পারে। নিখিল চাটুজ্জের কানের কাছে, মুখটা ঝুঁকিয়ে দিল যাতে আড়াল পড়ে।

"আপনার তো এপ্রিলে রিটায়ারমেন্ট, ওরা কিছু বলল-টলল?"

"এক্সটেনশন? না, ধরাধরি করতে আমার লাগে না।"

"আপনার ছেলেরা এখন কী করে?"

"পঞ্চাশের দাঙ্গাতেই সব শেষ হয়ে গেছে।"

তারক মুখ টেনে নিয়ে অরুণ মিত্তিরের সাদা গাড়িটাকে আড়চোখে দেখল। পিছনের জানলা দিয়ে কতকগুলো প্যাকেট আর বই ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। এই লোকটাই বলেছিল, তোকে টিমে আনবই। সিলেকশন মিটিং-এ আমি লড়ব তোর জন্য। ওর রক্ষিতার মেয়েকে বিয়ে করলে নিশ্চয় এসে যেতাম।

একসময় মিছিলটা মনুমেন্টের তলায় পৌঁছল। মিটিং করে করে ঘাস উঠে গেছে। তারক রুমাল বিছিয়ে বসে সামনে তাকাল। দোতলা সমান উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটা লোক বক্তৃতা করে চলেছে। তারকের মনে হল এ-সবই তার বহু বছর আগেই শোনা আছে। মাঠ থেকে ফেরার পথে চানা-মটর খেতে খেতে বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে খানিক রোমাঞ্চিত হবার জন্য প্রায়ই শুনত। সেইসব কথা, ঠিক সেই গলায়ই লোকটা বলছে একই সুরে একই ভঙ্গিতে। তফাতের মধ্যে এই লোকটা নতুন।

এখানে একবার দেখা হয়েছিল সরোজদার সঙ্গে। পাড়াতেই ভাড়া থাকতেন, বিয়ে করেননি। এক দিন শেষ রাতে বাড়ি ঘেরাও করে পুলিশ সার্চ করেছিল ওর ঘর। ওর বোন প্রীতিদি পার্টি করত, গ্রামে গ্রামে ঘুরে থিয়েটার করত, থলি হাতে বাজারে যেত, ছেলেদের সঙ্গে হা হা করে হাসত। তাই নিয়ে পাড়ায় অনেকে আপত্তি তুলেছিল। সরোজদা ইংরেজি আর অঙ্ক পড়াতেন, টাকা নিতেন না। ওঁর বাড়িতে গিয়ে পড়তে হত। হরদম বিড়ি খেতেন, ইংরেজি ডিটেকটিভ বই পড়তেন আর কথায় কথায় বলতেন, এ-দেশে বিপ্লব হওয়া বড় কঠিন। মা প্রায়ই রান্না পাঠিয়ে দিত। এখানে সরোজদার সঙ্গে দেখা

হতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, মা কেমন আছেন। তারপর বলেছিলেন, কাগজে মাঝে মাঝে তোমার নাম দেখি। এবারে তো দুটো সেঞ্চুরি করেছ, আর হচ্ছে না কেন? খুব ভাল করে খ্যালো। পরে যেন বলতে পারি ওই যে টি. সিনহাকে দেখছ, ওকে আমি ইংরেজি পড়াতাম। বলতে পারব তো?

সরোজদা মোটেই ঠাট্টা করে বলছিলেন না। জবাব না দিয়ে মাথা নুইয়ে হেসেছিলাম। তখন লজ্জা পাওয়ার মধ্যে আমেজ লাগত। জেগে জেগেই তখন দেখতাম লর্ডসে, মেলবোর্নে, কিংস্টনে ছাতু করছি বোলারদের। তখনও জানতাম না; একটা কাঁকর আমায় চুরমার করে দিয়ে যাবে। দ্বাদশ ব্যক্তি হয়ে ফিল্ডিং দিতে নেমে আমারই ফেলে দেওয়া ক্যাচ বাংলাকে হারাবে আর তার ফলেই চিরকালের মতো বাদ পড়ে যাব। কাগজে লিখেছিল, সিনহার ফিল্ডিং দেখে মনে হচ্ছিল বড় ম্যাচে খেলার নার্ভ এখনও তার তৈরি হয়নি। অথচ খেলা শুরুর দিন সকালে বারবার মনে হয়েছিল—অরুণাভর যদি এখন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়! যদি পিছলে পড়ে পা মুচকে যায় কি হাত ভাঙে তা হলে আমি ওর জায়গায় টিমে এসে যাব। টিমের নাম সাবমিট করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলাম, কিছু একটা ঘটবে। আমি টিমে আসব। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু লজ্জা পেয়েছিলাম মনে মনে, অরুণাভর অ্যাকসিডেন্ট কামনা করার জন্য।

দ্বাদশ ব্যক্তি হয়ে আমার চরিত্রে একটা নতুন ছেঁদা দেখতে পেলাম। সেটা বুজে গেছে কি বড় হয়েছে বুঝতে পারছি না।

তারকের শরীর একবার কেঁপে উঠল। মাথার মধ্যে ঝনঝন করছে। ঠিক সেদিনকার মতো সেই গলায়, সেই সব কথা দিয়েই লোকটা কিংবা আর একটা লোক বক্তৃতা করছে। তারকের মনে হতে লাগল, এই জায়গাটা বিন্দুমাত্রও বদলায়নি। বটগাছ, মনুমেন্ট, স্লোগান, চানা-মটরওলা, লাল ফেস্টুন, পোস্টার সবই হুবহু সেদিনকার মতো। এক্ষুনি হয়তো সরোজদা এসে বলবেন, যেন বলতে পারি ওই যে—

তারক মাথা নিচু করে বসে রইল। সরোজদা যেন না দেখতে পান।

তখন ওর মনে পড়ল ইনজেকশন নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে মিটিং থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সে বাসে উঠল।

বাস থেকে নেমে তারক হনহনিয়ে ডাক্তারখানায় এল। কিছু রোগী নিয়ে ডাক্তার বসে। যুবকটি কাঁচুমাচু হয়ে ডাক্তারকে বলল, "উনি ইনজেকশন নিচ্ছেন।"

"তোমায় বারণ করেছি আমি না থাকলে কাউকে ইনজেকশন করবে না। বিপদ ঘটলে কে দেখবে?"

"অন্য কিছু নয়, পেনিসিলিন।"

ডাক্তার গোমড়ামুখে রোগীদের দিকে মন দিল। কাত হয়ে ইট বার করা দেয়াল দেখতে দেখতে তারকের মনে হল, এখন যদি মরে যাই! কিছুক্ষণ তার খুব ভয় করল।

বাড়ি এসে শুনল গুহ এসেছিল। বলে গেছে, ঘুরে আসছি। বিছানায় চিত হয়ে রইল সে। অনেক কথা, অনেক ঘটনা তালগোল পাকিয়ে মনে পড়ছে তার, এর মাঝে অনিতার কথাই বেশি করে তার মন জুড়ে ছেয়ে গেল। তারক ঠিক করল, গুহকে আগে বিয়ে করতে বলবে। দরকার হলে ভয় দেখাবে, অফিসে রটিয়ে দেব। মেয়েটা যা বলল, রেজিস্ট্রি বিয়েও তো করে রাখা যায়। তা হলে কারুর মনই আর খচখচ করবে না। বাড়ির আপত্তি আর ক'দিন টিকবে, তাদেরও তো বংশের বা ছেলের মানমর্যাদার কথা ভাবতে হবে। সে-সব ব্যাপার নয় বুঝিয়ে বলা যাবে গুহর বাবাকে।

তন্দ্রা এসেছিল, বঙ্কুবিহারীর ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠল।

"সেই ছেলেটা আবার এসেছে। কী ব্যাপার বল তো?"

"কী আবার ব্যাপার!"

"ও তখন জিজ্ঞেস করল আমায়, কোনও মেয়ে তোর কাছে সকালে এসেছিল কি না। এসেছিল বলতেই এমন একখানা ভাব করল। কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি?"

"না, গোলমাল আর কী।" তারক হেলাফেলার ভাব দেখাল। "যা হয় আর কী। বিয়েতে বাড়ির সবাই আপত্তি করেছে, আমাকে ধরেছে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে।"

"ছেলের বাড়িতে আপত্তি তো হবেই, যা পেত্নির মতো দেখতে। অবস্থাও তো মনে হয় ভাল না। তুই কিন্তু বেশি জড়াসনি। শেষে থানা-পুলিশ কোর্ট-ঘর না করতে হয়।"

"আজকাল তো আর অবস্থা দেখে, রূপ দেখে ছেলেরা বিয়ে করে না। প্রথমেই দেখে শিক্ষা-দীক্ষা।"

"তাই নাকি!" বঙ্কুবিহারী অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "তুই তা হলে কোন কালের ছেলে? দেখতে ভাল নয় বলে চারটে মেয়ে বাতিল করে, ত্রিশ হাজার টাকা নগদ পণ নিয়ে তবে তুই বিয়ে করেছিস।"

"টাকা আমি নিইনি। ও টাকার এক পয়সাও আমার হাতে আসেনি। টাকা আমি নিতেও বলিনি।" উত্তেজিত স্বরে তারক বলল।

"টাকা না নিলে বিয়ের খরচ, বউভাতের খরচ আসত কোত্থেকে? তা হলে আজকালকার যা ফ্যাশন, সই মেরে বিয়ে করলি না কেন? দু'-চারটে বন্ধুকে ডেকে রেস্টুরেন্টে খাইয়ে দিলেই বউভাত চুকে যেত।"

বঙ্কুবিহারী ঠোঁট মুচড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারক তখন মনে মনে তাকে উদ্দেশ করে বলল রেজিস্ট্রি বিয়ে করলে তুমি আমাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিতে। ঘর ভাড়া করে সংসার পাতার সামর্থ্য আমার নেই। তা ছাড়া এ-ভাবে কাকেই বা বিয়ে করব। আমার সঙ্গে কোনও মেয়ের প্রেম হয়নি। গৌরীর সঙ্গে যা-কিছু হয়েছিল তাকে প্রেম বলা যায় কি না ভেবে দেখতে হবে। চারটে মেয়ে অপছন্দ করেছি কেন না তারা গৌরীর থেকে রূপে নীরেস ছিল। এটা আমার দুর্বলতাই। তখন ইচ্ছে হয়েছিল সুন্দরী বউ নিয়ে একবার গৌরীকে দেখিয়ে আসব। বুঝিয়ে দেব, আমিও নেহাত হেঁজিপেজি নই, দুনিয়ায় তুমিই একমাত্র সুন্দরী নও। কিন্তু রেণু এত অমার্জিত নির্বোধ হবে ভাবিনি। কী প্রচণ্ড যে ঠকেছি। ওর বাবার পয়সা আছে ওর শরীরে প্রচুর মাংস আছে। তাই নিয়ে গগন বসুমল্লিকের মেয়ের সামনে দাঁড়ানো যায় না। বরং অনিতার মতো কুরূপা জিরজিরে মেয়েকেও গৌরীর সামনে রাখা যায়। একটা বড় ধরনের বোকামি করে ফেলেছে বটে কিন্তু ও ক্লান্তিকর নয়। মাংস খেয়ে খেয়ে পেট খারাপ হওয়া লোককে লুব্ধ করার মতো কিছু কিছু ব্যাপার এই শুকনো ডাঁটার মতো মেয়েটার মধ্যে আছে বইকী।

তারক একতলায় নেমে আসতেই ব্যগ্রকণ্ঠে সলিল বলল, "গেছলেন?"

"কোথায়?"

"ডাক্তারের কাছে।"

"বলছি, বাইরে চলো।"

আর কথা না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'জন পার্কে এসে বসল।

"বিয়ে করবে না কেন? "তারক অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করল। সলিলের মুখ দেখে সে স্পষ্টই বুঝল, প্রশ্নটা আশা করেনি। "কালকেই চলো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে।"

সলিল এতক্ষণে নিজেকে আয়ত্ত করে ফেলেছে। অনুত্তেজিত স্বরে বলল, "হয় না। ও এখনও মাইনর, কুড়ি বছর বয়স হয়নি।"

তারকের মাথা গরম হতে শুরু করল সলিলের হিসেব-কষা উত্তরে। বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, মাইনরের বিয়ে হয় না সে খবরটা তো জানো দেখছি, মাইনর কুমারীর পেট করতে নেই সেটা বুঝি জানো না! এই সব ছেলেকে চাবকে সিধে করতে হয়।

"তা নিয়ে ভাবতে হবে না। টাকা ঢাললেই মাইনরকে মেজর করে দেওয়া যায়।"

"অনিতা বুঝি সকালে এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"দুপুরে গেছল আমার কাছে, কান্নাকাটি করল খানিকক্ষণ। ও আগে বিয়ে করতে চায়।"

"সেটাই তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া ব্যাপার যা করেছ, তাতে ওর নার্ভাস হয়ে পড়াটাও অন্যায় নয়। হাজার হোক মেয়ে তো। করে ফ্যালো। বিয়ে তুমি তো করবেই, নয় আগেই করলে।"

সলিল মুখ ফিরিয়ে পার্কের মধ্যে লোকেদের শোয়া-বসা-চলা কিংবা বাইরের রাস্তায় মোটরের যাতায়াত দেখতে লাগল। কথা গায়েই মাখল না। তারক লক্ষ করতে লাগল ওর চোখে কী ধরনের ভাব ফোটে। মনে হল প্রণবের—"পরিমল মারা গেছে জানিস", বা নিখিল চাটুজ্জের—"ফর্টিটুতে প্রথম মিছিলে যোগ দিই", বলার সময় চোখ দুটোর যে অবস্থা ওরা করেছিল অনেকটা সেই রকম ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু গুহর রগের কাছটা হঠাৎ দপদপাল কেন? ভদ্র, মার্জিত এবং সদা স্তিমিত গুহর মুখে চাষাড়ে রাগও অপ্রত্যাশিত।

"কিছু যদি মনে না করো, একটা কথা বলব গুহ?"

"বলুন।"

"তোমার কি অনিতাকে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই?"

"ও-কথা বলছেন কেন?"

"কেমন যেন মনে হচ্ছে।"

সলিল আবার শোয়া-বসা-চলা বা যাতায়াত দেখার জন্য মুখ ফেরাতেই তারক বলল, "তা হলে অনিতার এই সর্বনাশ করলে কেন?"

"আমি করিনি।"

"সে কী! কে করল।"

সলিল ইতস্তত করে বলল, "আপনি বয়সে বড়, কী করে যে ব্যাপারটা বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। অনিতাব যা ঘটেছে সেটা আমার দ্বারাই তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ও এটা চেয়েছিল।" সিধে হয়ে বসে সলিল তার রগের দপদপানিটা গলায় এনে বলল, "অনিতা নিশ্চয় পারত ব্যাপারটা না ঘটাতে। কিন্তু সেই সময় ও আমাকে বাধা দেয়নি। আমার কাছে ব্যাপারটা একদমই নতুন, সিন্‌হাদা আপনি তো বিবাহিত, নিশ্চয়ই বুঝবেন কী রকম উত্তেজনা হয় তখন। বুঝলেন, আমি সামলাতে পারলুম না নিজেকে। ও বহুদিন ধরেই চেষ্টা করছিল আমাকে ফাঁদে ফেলতে, তিল তিল করে দুর্বল করে দিচ্ছে বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু কত পারব বলুন। আমি তো একটা মানুষ, কত সামলাব?"

সলিলের উত্তেজনা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, তারকের ইচ্ছে করছে ওর গায়ে হাত রাখতে। তার মনে হল ছেলেটা নির্দোষই। এ-রকম ক্ষেত্রে যে-কেউই ওর মতো হয়ে যেত।

"সত্যি বলতে কী, এখন মনে হচ্ছে ওকে মোটেই ভালবাসি না।"

সলিল একমুঠো ঘাস ধরে ছেঁড়ার জন্য টানতে থাকল। এই সময় রাস্তায় মোটরের ব্রেক কষার শব্দ হল। হইহই করে কিছু লোক ছুটে এল। কেউ চাপা পড়েছে কি না দেখাব জন্য তাবক ঘাড় ফিরিয়ে গলা লম্বা করে দেখল একটা ভিড় জমেছে। সলিল মুখ নিচু করে ঘাসই ছিঁড়ছে।

"তা হলে তুমি ওর সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করলে কেন?"

"কী করব!"

অসহায়ভাবে সলিল তাকাল। তারক দেখল একটা লোককে নিয়ে টানাটানি করছে সবাই। বোধহয় মোটর ড্রাইভার। তা হলে চাপা পড়েছে, সে ভাবল, এবার কি মোটবটায় আগুন ধরবে?

"আমার বয়স মোটে চব্বিশ। অনিতা যেমনই দেখতে হোক, একটা মেয়ে তো। আমি কী করতে পাবি?"

"তা হলেও এখন তো তুমি ওকে ত্যাগ করতে পারো না, সেটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনের মতো কাজ হবে।"

"জানি, হয়তো ওকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে হবে।"

"এত মনমরা হচ্ছ কেন।" তারক দেখল একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আসছে। "মানিয়ে নিয়ে চললে দেখবে আর অসুখী লাগবে না। সংসার, সন্তান হলে পরই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সলিল একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। দুটো লোককে ভিড় থেকে ফিরতে দেখে তারকের ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে মরার মতো অ্যাকসিডেন্ট নয়।

"বাড়িতে আপত্তি করে অনিতার সঙ্গে কথা বললে। ওরা তো জানেই না এখন কী অবস্থায় ব্যাপারটা পৌঁছেছে। জাতের মিল নেই তো বটেই, দেখতে-শুনতে বা ওদের বাড়ির যা অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে কাউকেই রাজি করাতে পারব না। মা তো একদিন স্পষ্টই অনিতাকে বলে দেয়, এত ঘনঘন আস কেন? আমার জন্য মেয়েও দেখতে শুরু কবেছে। এখন যদি জানতে পারে ওরা—" সলিল ছটফট করে একমুঠো ঘাস চেপে ধরল। "কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না। বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে কোথাও বাসা করে বিয়ে করব, না দূরে কোথাও পালিয়ে যাব, ভেবে পাচ্ছি না, আপনি কী বলেন? তারকদা আপনার যদি এমন হত?"

তারক হেসে উঠল। "ওঠো এবার।"

দু'জনের আর কথা হল না। পার্ক থেকে বেরিয়ে তারক দেখল জায়গাটা ফাঁকা। একটা লোকের কাছে সে জানতে চাইল শেষ পর্যন্ত কী হল। লোকটা জানাল, বাস ধরার জন্য সে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে, কিছুই জানে না।

ছাড়াছাড়ি হবার আগে সলিল আরও কিছু বলতে চাইল। "জানেন, ও যখন কাঁদছিল আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওর দুই দিদির বিয়ে হয়নি। বাবা সামান্য চাকরি করে, টাকার জোরে বিয়ে দেবে সে অবস্থাও নয়। অনিতারও বিয়ে হবার কোনও উপায় দেখছি না। আপনি কি বলেন, মানিয়ে চলা যাবে?"

শুকনো গলায় তারক বলল, "তোমার ব্যাপার তুমিই ঠিক করো। তবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিয়ে কাল সন্ধেবেলা কথা বলতে যাব। যদি বিয়ে করবে ঠিক করো, কাল বিকেলের মধ্যেই জানিয়ে দিয়ো, তা হলে আর যাব না।"

"আপনি যদি অনিতাকে একটু বুঝিয়ে বলেন।"

"কী বোঝাব?" তারক বিরক্ত হয়ে গলাটা রুক্ষ করল। "তার বিয়ে হওয়া দরকার আর আমি তাকে বলব বিয়ে কোরো না? আমার কী অধিকার আছে এ-কথা বলার?"

সলিল হতভম্বের মতো তারকের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর ধীরে ধীরে কালো হয়ে এল ওর মুখ। "এটা অধিকার থাকা না থাকার প্রশ্ন নয় সিন্হাদা। অন্যায় ঘটতে দেখলে মানুষ মাত্রেই তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। আপনি কি মনে করেন না, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে একটা অন্যায় ঘটবে? আপনি কি মনে কবেন এটা ভালবাসার বিয়ে হবে?"

"আমি যা মনে করি, তা দিয়ে তোমাদেব সমস্যার মীমাংসা হওয়া উচিত নয়। আমার বোধ বুদ্ধি ভাললাগা, মন্দলাগা, রুচি, অরুচি, আনন্দ, নিরানন্দ, তোমাব সঙ্গে মিলবে এমন কোনও কথা নেই। তুমি যদি মনে কবো অনিতা বিরক্তিকর তা হলে বিয়ে কোরো না। যদি মনে করো—"

"বলুন।"

তারক ফাঁপরে পড়ল। তার মনে হচ্ছে, এতক্ষণ ধরে সে শুধু বাজে কথাই বলে চলেছে। আসলে সে এড়িয়ে যেতে চায়। সলিলেব সমস্যাটা যেন অফস্টাম্প থেকে আউট সুইং করে বেরিয়ে যাওয়া বল, ব্যাট তুলে রেখে সে নিবাপদ থাকতে চাইছে। কিছু আগে সলিল বলেছিল, আপনার যদি এমন হত? তার জবাবে সে হেসে উঠে পড়ে, পাছা থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু মনে মনে তখন থেকেই সে সলিলকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার জন্য।

"যদি মনে করো ওকে ভালবাসি, তা হলে বিয়ে করবে—এই কথাই বলবেন তো?"

সলিল স্পষ্টই ব্যঙ্গ করে উঠল।

"হ্যাঁ। তোমার কি মনে হয় এ কথা বললে খুব অন্যায় বলা হবে? মানুষ তা হলে কীসের তাগিদে বিয়ে করে। সেক্স? সে তো জানোয়ারদের ব্যাপার।" কথাটা বলতে পেরে তারক নিখুঁত একটি লেটকাট করাব আত্মপ্রসাদ অনুভব করল।

সলিলের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। এল-বি-ডবল্যুর আবেদন করে সে যেন দেখছে আম্পায়ার মাথা নাড়ছে। হতাশ স্ববে সে বলল, "আপনি যে এই কথাই বলবেন, আমি তা আশা করেছিলাম। প্রমাণ আপনার হাতেই রয়েছে। কিন্তু ওকে বিয়ে করলে ওরই ক্ষতি হবে। সুখী হবে না। আমি ওকে সুখী করতে পারব না। এ-ক্ষেত্রে উচিত নয় কি, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে না গিয়ে ডাক্তারের কাছেই যাওয়া?"

"যদি তাই উচিত মনে করো, তা হলে তাই করো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ-সবই তোমার কেটে পড়ার অছিলামাত্র। একটা মেয়েকে তুমি ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছ শুহ, এটাই অন্যায়।"

"বিয়ে করলেই অনিতা ভেসে উঠবে, কেমন? তা-হলেই ন্যায় হবে!" সলিল হাঁফ ছাড়া ক্লান্তস্বরে বলল। তর্ক করতে আর যেন ইচ্ছুক নয়। তারকেরও ইচ্ছে করছে না। সারাদিন ধরেই ধকল চলেছে তার। এখন বিছানার জন্য সারা শরীর টনটন করেছে।

"থাক গে এ-সব কথা, আজ আমি ভীষণ টায়ার্ড।"

"আমিও। সারাদিন ধরে আমি একটা ডিসিসন্ নেবার চেষ্টা করেছি, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা না করতে হয়।"

শুনেই খরখর করে উঠল তারকের গায়ের ত্বক। জলতেষ্টা পাচ্ছে মনে হল। শুকনো স্বরে সে বলল, "তোমার কলকবজাগুলো সব ঢিলে হয়ে গেছে। এবার তুমি একটা যন্ত্রে পরিণত হবে তারপর মরচে ধরবে। কারুর কোনও উপকারেই আর আসবে না।"

এই বলে, বেগে স্থানত্যাগ করল তারক। সলিল কতক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে ফুটপাথে, তাই নিয়ে সে আর ভাবল না। ট্রামরাস্তা পার হবার সময় দেখল অহীন তার ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছে, হাতে স্টেথো আর ব্যাগ। হয়তো কলে যাচ্ছে। তারককে দেখে অহীন তাকাল এবং ব্যক্তিত্ব আনার জন্য চিবুক ঝুলিয়ে দিল। তারকও যথোচিত ঔদাসীন্য দেখিয়ে ওর পাশ দিয়েই চলে গেল।

তারক ভেবেছিল শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু শোয়ামাত্রই তার মাথার মধ্যে পাক দিতে শুরু করল, একটি কথা—আপনার যদি এমন হত? কিন্তু সলিলের এই প্রশ্নটা তার কাছে খুবই অন্যায় বলে মনে হতে লাগল। এ-রকম অবস্থায় পড়া আর পড়েছি বলে কল্পনা করার মধ্যে অনেক তফাত। এই তফাতটুকু হাজার যুক্তি দিয়েও জোড়া দেওয়া সম্ভব নয় জেনেও তারক প্রশ্নটার কী উত্তর হতে পারে তাই নিয়ে ভেবে চলল।

ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, নিজেকে সলিলের জায়গায় দাঁড় করালে আমার অনিতা তা হলে কে হবে? সঙ্গে সঙ্গে রেণুর মূর্তি ভেসে উঠল তার চোখে। অমনি মাথার মধ্যে ঝনঝনানি শুনতে পেল সে। বালিশটাকে খাবলে ধরে যখন সে বলতে চাইল, সব ছেঁদা বন্ধ করে দেব দেখি তুমি কোনখান দিয়ে ঢুকতে পারো, তখন তার মনে হল দুটো উপড়ে নেওয়া চোখ অন্ধকারে তাকে খুঁজছে।

বালিশে মুখ গুঁজে তারক ভাবল, ধরা পড়লে আমাকে শেষ করে দেবে। তার আগেই আমাকে কোথাও পালাতে হবে।

সাত

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারকের মনে পড়ল একদিন কলেজে ইউনিয়ন রুমের সামনে একটা শ্যামবর্ণ রোগা ছেলে হঠাৎ তাকে বলে, "আপনি তো তারক সিংহ? এখনও আপনার ছবিটা দিলেন না যে? তাড়াতাড়ি দিন ব্লক করাতে হবে। প্রেসের কাজ তো প্রায় শেষ হয়ে এল। আর শুনুন, ব্লেজার পরা ছবি দেবেন।" আরও কতকগুলো কথা বলেছিল মনে পড়ছে না। ছেলেটা কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

তারক ছবিটা দেখতে দেখতে ভাবল, এই তা হলে পরিমল ভট্টাচায্যি। একটা বিধবা, একটা ছেলে আর তিনটে কবিতার বই রেখে মারা গেছে। সে-জন্য গোটা চল্লিশ লোক সভা করে শোক জানাচ্ছে। আমি মরে গেলে রেণু ছাড়া কেউ কাঁদবে না। ছেলে দুটোর শোক বোঝার বয়সই হয়নি। এই লোকগুলো কি এখন নিজেদের পরিমলের বউয়ের জায়গায় দাঁড় করিয়েছে?

তারক ঘরের পিছনের দিকে বেঞ্চে বসে লোকেদের লক্ষ করতে লাগল। প্রণবকে তার মনে হচ্ছে উদ্যোক্তাদেরই কেউ। কাল বিমল মান্না ঠিক ওর মতো হাবভাব করেই ঘোরাফেরা করছিল। একটা টুলের উপর সাদা টেবল ক্লথ বিছিয়ে পরিমলের ফোটোটা রাখা। ফ্রেমটা নতুন। পরিমল খুব হাসছে। দেখে তারকেরও হাসি পেল। পরিমল বোধ হয় ছবিটা তোলার সময়ই টের পেয়েছিল, এটা তার শোকসভায় ব্যবহৃত হবে। বেশ কিছু লোক ছবিটার দিকে তাকাবে। রজনীগন্ধার ডজন চারেক ডাঁটি টুলের পায়ের কাছে রাখা। ধূপ জ্বলছে। তারকের মনে হল ঠাকুরঘরের মতো ভক্তিপূর্ণ ভাব সঞ্চারের উদ্দেশ্যই যদি হয় তা হলে পরিমলের হাতে সিগারেট রয়েছে এমন ছবি উদ্যোক্তাদের নির্বাচন করা উচিত হয়নি। পরিমলেরই দোষ। ওকি কখনও শোকসভায় রাখা মৃতের ছবি দেখেনি।

সামনের দিকে জনা সাত-আট স্ত্রীলোক বসে। তারক তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তবু মনে হল ওর কুরূপা নয়। পরিমল তা হলে রবি ঠাকুরের মতো কিছু লিখেছে কি? ওর একটা পদ্যও পড়িনি। পাবলিকের অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ লোকের মতো আমিও পড়িনি পরিমলের পদ্য। তারক অতঃপর যথেষ্ট ভরসা পেয়ে ভাবল জন চল্লিশ লোক যখন হয়েছে, তা হলে খুব কিছু খ্যাতনামা পরিমল নয়। বছর

বছর ওর জন্ম বা মৃত্যু দিন নিশ্চয় পালন করা হবে না। রবি ঠাকুরের হয়। গগন বসুমল্লিকের দোতলার হলঘরে হত।

গৌরী গান গাইত প্রতি বছর। প্রত্যেক বছরই শুরু করত 'হে নূতন দেখা দিক' গানটা দিয়ে। ওর বাবা বসত সামনের চেয়ারে। সবাই যখন বলত, আর একটা আর একটা, গৌরী তাকাত বাবার দিকে। গগন বসুমল্লিক ঘাড় নাড়লে আবার গান ধরত। তারকের মনে পড়ল একবার সে-ও চেঁচিয়ে বলেছিল, আর একখানা শুনতে চাই আর একখানা। গৌরী আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিল। একটি ছোট ছেলে বক্তৃতা মঞ্চের কিনারে বসে। তারকের পিছনে একজন বলে উঠল, "বোধহয় পরিমলের ছেলে।"

আর একজন বলল, "না। আমি দেখেছি একবার যাদবপুরে কবি সম্মেলনে, বাপের মতোই রোগা।"

"তা হলে এ কে?"

তারক ছেলেটিকে লক্ষ করতে লাগল। মনে হয় ছেলেটির যাবতীয় কৌতূহল মিটে গেছে। এখন ঘাড় গুঁজে জুতোর ফিতে টানাটানি ছাড়া আর কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে যখন তাকাচ্ছে চোখ দেখে মনে হয় বিরক্ত। ঘরের এইক'টা লোকের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে। একটা লোককে নিয়েই সবাই কথা বলছে, একই কথা কতক্ষণই বা শুনতে পারে! তারকের মনে হল ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, বাইরের গোলদিঘিতে গিয়ে ও চোর-চোর খেলুক, নয়তো সাঁতার কাটা দেখুক। হয়তো ওর বাবা পরিমলের বন্ধু। ছেলেকে বেড়াতে আনা আর বন্ধুর শোকসভায় যোগ দেওয়া একই সঙ্গে সেরে নিচ্ছে।

এরপর তারক বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করল। বক্তার চেহারাটা প্রায় দেবুর মতো কিন্তু গলার স্বর হুবহু হিরণ্ময়। মাইক্রোফোনটায় গোলমাল আছে তাই মাঝে মাঝে বঙ্কুবিহারীর মতো হয়ে যাচ্ছে।

পরিমলের কবিতায় কী কী ব্যাপার আছে বক্তা তাই বোঝাচ্ছে।

তারক মনোযোগে বক্তৃতা শুনল:

"সমাজ ও জীবনের অন্ধকার দিক অথবা প্রেম থেকে প্রেমহীনতার নিবিড় চেতনার ধ্যান-ধারণা, ভাবনা চিন্তা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিমলের কাব্যে। কবি-হৃদয়ের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ তাঁর কবিতায় সোচ্চার। মনীষার ব্যবহারে, ভাষার নিজস্ব শৈলীর সাহায্যে, বিচিত্র অপ্রচলিত বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়নের উপকরণ ব্যবহার করে, প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে অব্যবস্থিত বিপরীতকে আবিষ্কার করার বিদ্রোহী কৌতুকের সাহায্যে পরিমল তাঁর কাব্যের পরিমণ্ডল রচনা করেছে— যে পরিমণ্ডলের স্বল্প আয়তনের মধ্যে ধরা পড়েছে ক্লান্তপ্রাণ নাগরিক হৃদয় থেকে ক্ষরিত বিবর্ণ শোণিতে আঁকা এক নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ছবি।"

শুনতে শুনতে তারক যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হল। কোনও লেখা থেকে না পড়ে, গড়গড়িয়ে এ-সব কথা কী করে বলা সম্ভব! যা শুনল, সেগুলো মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে তারক বেকুব বনে গেল। 'বিদ্রোহী কৌতুক' আর 'নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ছবি' ছাড়া একটি কথাও তার মনে নেই। এর মধ্যেই ভুলে গেছে। অথচ টানা পনেরো মিনিট ধরে লোকটা বলে গেল, একবার বগলও চুলকোল না। প্রত্যেকটা শব্দের উচ্চারণে মটরভাজা চিবোনোর শব্দ। তারকের ধারণা জন্মাল, এই বক্তাটি খুবই পণ্ডিত এবং পরিমল হেঁজিপেজি কবি ছিল না।

তারক দেখতে পেল প্রণবকে। একটা খাতা নিয়ে প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছে। খাতাটা এবং কলম বাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকেরা ইতস্তত করে কী যেন লিখছে।

তারকের পিছনে তখন কথা হল দু'জন লোকের মধ্যে:

"চল বাইরে যাই, অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।"

"কেন, আর একটু পরে গেলেই তো হয়?"

তারক দেখল খাতা নিয়ে প্রণব ক্রমশ তাদের দিকেই আসছে।

"আজ শেয়ালদায় নাকি স্টেট বাস পুড়িয়েছে।"

"তাই নাকি, কখন?"

"বিকেলের দিকে। ট্রাম-বাস এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেল কি না কে জানে। তুই বোস, আমি বরং দেখে আসি।"

খাতাটা প্রণব এগিয়ে ধরল।

"কীসের।" তারক দ্বিধাগ্রস্ত হাতে খাতাটা নিল।
"বাঃ, শুনলি কী তা হলে? পরিমলের প্রবন্ধ আর কবিতাব একটা কালেকশন বার করা হবে, হাজার দশেক টাকার ব্যাপার।"
"গেছলি ডাক্তারের কাছে?"
প্রণব এমনভাবে তাকাল যেন বলতে চায়, এখন এই পরিবেশে ওই সব কথা, ছিঃ। তারক লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি খাতায় নিজের নামটা লিখে ফেলল। টাকার অঙ্ক বসাবার আগে অন্যরা কত দিয়েছে দেখল। পঞ্চাশ টাকার কম কেউ নয়। এ-রকম দেওয়াটা খুবই খারাপ দেখায়, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা এখন কোথায় পাব? তা ছাড়া আমার কী দায় পড়েছে পরিমলের বই বার করায়!
"তাড়াতাড়ি কর। টাকা পরে দিবি, এখন অ্যামাউন্টটা লিখে দে।"
প্রণব বিরক্ত হয়ে বলল কেন? ও বিরক্ত হয় এমন কাজ এখন কোনওমতেই করা উচিত নয়। এই ভেবে তারক লিখে দিল পঞ্চাশ টাকা। প্রণব চোখ বুলিয়ে পাশের লোককে খাতাটা এগিয়ে দিল হাসিহাসি মুখে।
তারক ভয়ে-ভয়ে ভাবল পঞ্চাশ টাকা দেখে প্রণব খুশি হল কি না কে জানে। হয়তো ডাক্তারেব সঙ্গে কথা হয়েছে কিংবা এখনও হয়তো যায়নি। পঞ্চাশ টাকা দেখে ওর মনেই পড়বে না আমার কথা। সবাই যা দিচ্ছে তা না দিয়ে অদ্ভুত কিছু, আটচল্লিশ টাকা বা একান্ন টাকার মতো কিছু লিখলে ওর মনে থাকত তাবক সিংহ নামটা। তা হলে কালকেই যেত ডাক্তারের কাছে।
একবার তারকের ইচ্ছে করল খাতাটা চেয়ে নিয়ে, টাকার পরিমাণ শুধরে দেয়। তারপর ভাবল. এ-ভাবে হয়তো ওকে মনে পড়িয়ে দেওয়া যাবে না। যদি অনিতা থাকত আলাপ কবিয়ে দিতুম। অনিতাকে দেখলে সহজে কেউ ভুলতে পারবে না। ছেলেদের মতো ওর শরীর। পঞ্চাশটা টাকা ওর জন্যই গচ্চা গেল, গুহর উচিত এটা দিয়ে দেওয়া। তবে পরিমল পড়ত আমাদের সময়, আমার ছবি ছাপিয়েছিল, লিখে নাম করেছে, ওর শোকসভায় জনা চল্লিশ লোকও হয়েছে।
তারকের হঠাৎ গর্ব হল পরিমলের জন্য। আমার বন্ধু ষোলো বছর আগের আলাপ, এখানে ক'জন আছে সে-কথা বলতে পারো? ঘাড় ফিরিয়ে তারক লোকেদের দিকে তাকাল। কারুর মুখ দেখেই তার মনে হল না, এরা পরিমলের বন্ধু। গুহকে পঞ্চাশ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথাটা বললে নিশ্চয়ই দিতে চাইবে। বলবে, আমার কাজেই তো গিয়ে পঞ্চাশ টাকা গচ্চা দিলেন। কিন্তু পরিমল আমার বন্ধু, একই ইয়ারে আমরা পড়েছি। গচ্চা শব্দটা এ-ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।
"কী বে ট্রাম-বাস চলছে দেখলি?"
"হ্যাঁ, লোকে যে কী প্যানিকি হয়েছে আজকাল। বাস-ট্রাম কিছু পোড়েনি। বাইরে গোলোকের সঙ্গে দেখা হল. বলল ছেলেটা পরিমলেরই।"
"যাঃ, আমি যে দেখলুম ওকে বাপের সঙ্গে, এই তো ছ'-সাত মাস আগেই। সবে তখন ক্যানসারটা ধবা পড়েছে। ছেলেকে সব সময়ই কাছে কাছে রাখত।"
"গোলোকটা তো এতক্ষণ ধরে ক্যানসারেরই গল্প শোনাল। ওর বউ নাকি কিছুতেই লুপ নেবে না, নিলে নাকি ক্যানসার হবে। গোলোক বলল, আরে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ও-সব ডাক্তারদের বাজে কথা, ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ হলে ওদের আয় কমে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। রোগের কারণটা জানলে তো তার ওষুধ বার করা সোজা। ক্যানসারের ওষুধ বেরোল না শুধু এই জন্যই। লুপ নেওয়ার কারণে ক্যানসার হয়, জানলে তো বিরাট আবিষ্কার হয়ে যেত।"
"গোলোকের বউ নিল?"
"নাঃ"
বাচ্চা ছেলেটির হাতে রজনীগন্ধার একটি ডাঁটি। সেটা নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুঁকছে। চোখ দেখে মনে হচ্ছে পুলকিত। এধার-ওধার তাকিয়ে গুটিগুটি হাত বাড়াল আর একটি ডাঁটি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।
তারকের বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। মরবে জানার পব ছেলেকে পরিমল কাছে কাছে রাখত। ছ'-সাত মাস মাত্র সময় পেয়েছিল। মা প্রায়ই বলত, তারু অত বাইরে-বাইরে থাকিস কেন? পরিমল কবিতা পড়তে গেলেও ছেলেকে নিয়ে যেত। নিশ্চয় ছেলেকে জানায়নি যে সে পিতৃহীন হতে

চলেছে। লুকিয়ে পরিমল নিশ্চয় কাঁদত, আর কোনওদিন ছেলেকে দেখতে পাবে না ভেবে।

তারকের মনে পড়ল কাল ইনজেকশন নেবার সময় তার ভয় করেছিল। তখন কি অমুর কথা ভেবেছিলুম? মনে করতে পারল না। হয়তো অমুকে ভালবাসি না কিংবা মরার ভয়টা সত্যিকারের ছিল না। তারক বক্তৃতামঞ্চের কিনারে বসা পরিমলের ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। এখন একটা কবিতা পড়া হচ্ছে, পরিমলেরই লেখা। ছেলেটি কিছু শুনছে না। পিটপিট করে এধার ওধার তাকাচ্ছে আর হাতটা বাড়িয়ে রেখেছে ফুলের দিকে। তাল বুঝে একটা হাতিয়ে নেবার জন্য। ও জানে না, আজ ওকে কেউ বকবে না। সবাই আহা বলার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে। বাবার মৃত্যুটা ও চোখে দেখেছি কি না কে জানে। হয়তো ঘুমিয়েছিল পাশের ঘরে। পরিমল মরার সময় নিশ্চয় চেয়েছিল ওকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতে। কাল মরে গেলে অমুর জন্য কিছু ভাববার সময়ই পেতুম না। কারুর জন্যই না। শীতের ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে মায়ের জন্য ডাক্তারের বাড়ি যেতে বলায় বাবার উপর ভীষণ বিরক্তি লেগেছিল। এই ছেলেটা তিরিশ বছর পর কতটুকু আর বাবাকে মনে করতে পারবে! তিন চারখানা বই আর ছবি ছাড়া পরিমলের আর কী থাকবে! অটোগ্রাফ ব্যাটটা আলমারির পিছনে রাখা আছে। ওটা দিয়েই শেষ সেঞ্চুরি করেছিলাম, মহামেডানের সঙ্গে লিগের খেলায়। অমু বড় হয়ে ছবিটা দেখবে। ওর কি কখনও মনে পড়বে ডাক্তারখানায় কে একজন গাল টিপে বলেছিল—টেস্ট খেলতে হবে, বুঝেছ?

এই মুহূর্তে অমুকে দেখার জন্য তারকের ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিল, কালকেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ওদের আনব। পরিমল ক্যানসারে মরেছে, কিন্তু আমাকে সেরে উঠতেই হবে। ঘড়ি দেখে চমকে উঠল তারক। ন'টা। প্রণবকে দেখতে পেল না। কিন্তু আর সে অপেক্ষা করল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল শোকসভা থেকে। ট্রামে কিংবা বাসে পৌঁছতে কম করে পঁচিশ মিনিট লাগবে। ডাক্তারখানাটা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে ততক্ষণে।

বেরিয়ে এসে দেখল চারদিক থমথম করছে। রাস্তায় কাপড়ের দোকানগুলো বন্ধ, ফলে তাদের আলোগুলো না থাকায় রাস্তা অন্ধকার। গোলদিঘির ওপারে ইউনিভারসিটি বাড়ি, প্রেসিডেন্সি কলেজ অতিকায় জন্তুর পিঠের মতো দেখাচ্ছে। ট্রাম-বাস বন্ধ। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে পুলিশের দুটো ভ্যান দাঁড়িয়ে। কিছু লোক, সন্তর্পণে দ্রুত চলাচল করছে। তারক একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, "আধঘণ্টা আগে শেয়ালদায় ফায়ারিং হয়েছে। সাতটা ট্রাম, দুটো স্টেট বাস পুড়েছে। বাড়ি চলে যান শিগগিরি।' হনহনিয়ে লোকটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

তারক ঘড়ি দেখল, এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতো রওনা হল। একটা খালি ট্যাক্সি দ্রুত যাচ্ছিল, হাত তুলতেই ড্রাইভার বলল, "শ্যামবাজার পর্যন্ত যাব।"

"তার বেশি আমিও যাব না।" বলতে বলতে দরজা খুলে উঠে পডল তারক। এই সময় এমন এক সহৃদয় ট্যাক্সিওলা কলকাতায় অকল্পনীয়।

ডাক্তারখানায় পৌঁছে দেখল একটা পাল্লা বন্ধ, অন্যটা আধভেজানো। তারক সন্তর্পণে ঠেলল।

"আজ এত দেরি করলেন। বন্ধ করে চলেই যাচ্ছিলুম।"

যুবকটি উঠে দাঁড়াল নিশ্চিন্ত মুখে। তারকও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ট্যাক্সি নিয়ে তা হলে ঠিকই করেছি। অবশ্য অত তাড়াহুড়ো না করলেও চলত। গালতোবড়ানো, চওড়া চোয়াল বুড়োটা দশটা পর্যন্ত থাকে। তা হলে পাঁচটা টাকা এ ছেলেটা পায় না। সে-জন্য সাড়ে আট টাকা খরচ করেও তারকের আফশোস হচ্ছে না।

"কী গো তারক চিনতে পাচ্ছ না?"

ঘরের কোণে বেঞ্চে যে একটা লোক বসে, তারক লক্ষই করেনি। ভ্রূকুটি করে সে তাকাল। গেরুয়া পাঞ্জাবি থেকে স্যান্ডাল পর্যন্ত লোকটা এমন একটি রেখা যা অমু ছাড়া আর কারুর পক্ষে আঁকা সম্ভব নয়। দাঁত, ঠোঁট, নাক, থুতনি, কোমর, পিঠ কোনওটাই সিধে নয়।

"আমাকে চিনলে না? আমি শম্ভু সরকার।"

"ওহ শম্ভুদা। আপনি এখানে যে?" তারক ওর পাশে বসল। "আপনার চেহারা একী হয়েছে!"

"আর চেহারা। মাঠে যাও?"

"না। সময় কোথায়?"

"মাঝে মাঝে আমি অবশ্য যাই। ওরা বলে ছেলেদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই, গিয়ে একটু দাঁড়াবেন, বলে-টলে দেবেন। বলব আর কী। দুটো ড্রাইভ করেই ভাবে সি কে, ওয়াজির হয়ে গেছি। আজকাল তো ওদের হিরো হয়েছে রিচার্ডস। এখনকার ছেলেদের তো বোঝই, কেউ কথা শোনে? তোমরা ছিলে এক রকম। এখন কচ্ছ কী?"

"চাকরি করি। আপনি কি ডাক্তারের জন্য বসে?"

"না না, এটি হচ্ছে আমার ছেলে।"

পর্দা সরিয়ে যুবকটি তখন তারককে ডাকল। তারক ভিতরে উঠে গেল।

"টাকাটা এখনই দিন বরং তা হলে বাবাকে বিদেয় করে দি।" যুবকটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল। তারক তক্ষুনি টাকা দিয়ে দিল।

দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকার সময় শম্ভু সরকার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল, "তা হলে চলি তাবক।"

"অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল।" তারক কাত হয়ে ঘাড় উঁচু করল, "আমি অনেকদিন খেলা ছেড়ে দিয়েছি শম্ভুদা।"

"ভালই কবেছ। আমি যোলো বছর বয়সে প্রথম খেলি ক্যালকাটার সঙ্গে, এখন সত্তর। কী লাভ হল! বয়স থাকতে থাকতে যদি সংসারে মন দিতুম, তা হলে কি আজ এই অবস্থা হয়? ঠিকই কবেছ।"

কালকের মতো আজ আর তারকের মরার ভয় হল না। শম্ভু সরকারকে প্রায় বারো বছর পর দেখে অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটা বহুবাব তাকে অকথ্য গালাগালি কবেছে। ক্লাবে নতুন ছেলে দেখলেই উপদেশ দিত। একটু ফুটফুটে হলেই বাড়িতে যেতে বলত। তাই নিয়ে হাসাহাসি হত আড়ালে। তবে লোকটা চমৎকার আউট সুইং করাত ওই বয়সেও, খেলা বুঝতও ভাল। শম্ভুদাই বলে দেয়, তোমার ভুল গ্রিপিং আর ব্যাকলিফটেব জন্যই স্লিপে অত ক্যাচ ওঠে, শুধরে নাও।

"আপনি কি ক্রিকেট খেলতেন?"

হাত থেকে ছুঁচটা টেনে বার করেই শম্ভু সরকারের ছেলে জানতে চাইল।

"আমরা দু'জনেই অরুণাচল ক্লাবে খেলতাম। সে আজ যোলো সতেরো বছর আগের কথা। দেখছি শম্ভুদাব শবীর খুবই ভেঙে গেছে।"

"অত নেশা করলে শরীরের আর দোষ কী।"

যুবকটিকে খুবই বিরক্ত মনে হল তারকের। এটা তার ভাল লাগল না। গম্ভীব হযে সে বলল, "ওব হাত দিয়ে অনেক ক্রিকেটার বেরিয়েছে।"

"বেরুতে পারে।" যুবকটি তালা হাতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তারক ডাক্তারখানা থেকে বেরোবার সময় বলল, "আমি রঞ্জি ট্রফিও খেলেছি। ওর কাছে খেলা শিখেছিলুম বলেই তো।"

"আপনি বেঙ্গল প্লেয়ার!"

শম্ভু সরকারের ছেলে অবিশ্বাস ভরে তাকিয়ে আছে দেখে তাবক অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। ও কেন, কেউই বিশ্বাস কববে না। চেহারা বা চলাফেরা অথবা বলার মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা কিছু ফুটে ওঠে, যা দেখলে কারুর মনেই হয় না যে একদা সে হরিণের মতো ছুটত বাউন্ডারি লাইন ধরে, ক্যাচ ধরার জন্য ব্যাটসম্যানের পায়ের উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত সিলি মিড-অন থেকে। পপিং ক্রিজ থেকে দু' গজ বেরিয়ে হাফভলি করে নিত মিডিয়াম পেসের বল। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে তার ভিতরে, অসুখের মতো, করে নিতে লক্ষ লক্ষ লোকের একজনে পরিণত করেছে। একটা কাঁকর, মনে হয় যেন সব সময় তার চেতনায় বিঁধে রয়েছে। সেটাকে খুঁটে ফেলে দিতে না পারলে দ্বাদশ ব্যক্তি হওয়া থেকে কোনও দিনই রেহাই নেই। কিন্তু সেই কাঁকবটাকে খুঁজে বার করতে যাবে কি যাবে না, এই দ্বিধা অবিরত তাকে দোলাচ্ছে। অথচ ঘটনা ছুটে আসছে এধার-ওধার থেকে। সে যে-কোনও সময় রান আউট হয়ে যেতে পারে।

"কতদিন আগে খেলেছেন, কার এগেনস্টে?" যুবকটি উৎসুক চোখে তাকিয়ে। তারক তাইতে উত্তেজনা বোধ করল।

"বারো বছর আগে, এগেনস্ট সার্ভিসেস।"

"বোলার না ব্যাটসম্যান ছিলেন?"

"অল-রাউন্ডার। আটটা উইকেট নিয়েছিলাম আর বিরাশি রানের মাথায় রান-আউট হয়ে গেলাম। কিন্তু জেতা ম্যাচটা আমরা হেরে গেলাম শুধু টুয়েলফ্‌থম্যানটার জন্য। হেমু অধিকারী তখন নাইনটির ঘরে, ওর একটা ড্রাইভ ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট খেয়ে মাঠ ছেড়ে এসেছি আর টুয়েলফ্‌থম্যান নামল। তিনটে বল পরেই অধিকারী হুক করতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লাগিয়ে স্কোয়ার লেগের মাথার ওপর সোজা ইজি ক্যাচ তুলল। অ্যান্ড হি ওয়াজ ড্রপড বাই আওয়ার টুয়েলফ্‌থম্যান। সেইখানেই ম্যাচ হাতের বাইরে চলে গেল।"

"কে ছিল টুয়েলফ্‌থম্যান?"

তারকের ইচ্ছে হল অরুণাভ ভটচাজের নামটা বলতে। কিন্তু মনে হল, বললে অন্যায় করা হবে। অবশ্য অরুণাভ সেই বিরাশি রানের জোরেই আরও দু'বছর খেলেছে, যতদিন অরুণ মিত্তিরের দাপট ছিল।

"মনে পড়ছে না নামটা, তবে এই একবারই দেখেছি। যা গালাগাল খেল তার চোটেই খেলা ছেড়ে দেয়। ওহ এখনও সেই ব্যারাকিং কানে লেগে আছে।"

"আপনি কবে লাস্ট খেলেছেন?"

তারক সালটা মনে করার ভান করতে করতে দেখল দূরে নির্জন রাস্তায় একদল ছেলে রাস্তায় বালব লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়ছে। কর্কশ শব্দে ডাস্টবিন টেনে আনছে রাস্তার মাঝখানে। রিকশাওয়ালারা সিনেমার নাইটশো ভাঙা সওয়ারি ধরার জন্য সার দিয়ে অপেক্ষা করছে, নিরুত্তভাবে।

"এখানেও শুরু হবে।" যুবকটি উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বলল।

তারক জবাব দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কাল তা হলে ট্রাম বাস বন্ধ। কী করে যে অফিসে যাব।"

"অফিস-টফিস আর হবে না। তবে দোকানদার ব্যবসায়ীদের লোকসান যাবে।" তারপর যুবকটি হেসে বলল, "কিন্তু ডাক্তারখানা খোলা থাকবে।"

"থাকলেই ভাল, কাল একটু তাড়াতাড়িই আসব'খন। আজ চলি ভাই।"

বাড়ির দিকে যেতে যেতে তারকের মনে হল, এইভাবে মিথ্যে কথাগুলো বলে কী লাভ হল। বলার সময় আত্মপ্রসাদ পাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু খানিকটা লজ্জা আর খানিকটা ভয় মিশিয়ে মনের মধ্যে চটচটে একটা কাদা যেন এখন লেপা হয়ে গেছে। ও জানতে পারবে না কে টুয়েলফ্‌থম্যান ছিল। ও না জানলেও, তারক ভাবল, আমি তো জানি। নিজেকে জেনে ফেলার মতো ভয়ঙ্কর অবস্থা আর কিছুতেই হয় না।

তারকের এখন নিজেকে অক্ষম দুর্বল মনে হতে লাগল। এই ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য সে চাইল ঝাঁকুনি দেবার মতো জোরালো একটা কিছু করতে যাতে সবাই চমকে তাকাবে। বেপরোয়ার মতো একটা কিছু, তাকাতেই হবে এমন একটা কাজ। লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ওয়েস হলকে সোজা সাইট স্ক্রিনের ওপর দিয়ে ছয়। লর্ডসে মানকড়ের মতো একটা ইনিংস!

আট

গলির মুখেই বঙ্কুবিহারী দাঁড়িয়ে। তারককে দেখে এগিয়ে এসে বলল, "সেই মেয়েটা এসে অনেকক্ষণ বসে আছে।"

শোনামাত্র তারক ভাবল পার্কে গিয়ে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসি, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবে। যা বলবে তা তো জানিই। কিন্তু গুরুকে কিছুতেই বলতে পারব না, বিয়ে করো। বলাবলি করা আমার কাজ নয়। যা পারো নিজেরাই ঠিক করে নাও। আমাকে আর জড়িয়ো না।

"গোলমাল হয়েছে নাকি শেয়ালদার দিকে?"

"কোথায়! ট্রাম-বাস তো চলছে।"

"আর দেরি করিসনি, ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বল, রাত হয়েছে। দেবুকেও তো শুতে হবে।"

তারক মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বাড়ি ঢুকল। বৈঠকখানার দরজা থেকেই সে দেখতে পেল টেবলে রাখা বাহুতে কপাল ঠেকিয়ে অনিতা কুঁজো হয়ে বসে। ওর পিছনে এসে তারক বলল, "কী ব্যাপার, এত রাতে আবার কী দরকার পড়ল?"

চমকে অনিতা উঠে দাঁড়াল। তারকের হাবভাবে অভ্যর্থনার লেশ না পেয়ে হাসবার চেষ্টা করল কোনওক্রমে।

"দরকার একটু পড়েছে তারকদা। আমি ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেছি, কী করব ভেবে পাচ্ছি না।"

ওর গলার স্বরে তারকের অস্বস্তি হল। মুশকিলে যাতে না জড়াতে হয় সে জন্য সাবধান হবার চেষ্টায় কবজিটা তুলে ঘড়িতে চোখ রেখে বলল, "বলে ফ্যালো।"

"আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"কে?"

"বাবা মা, সবাই।"

তারক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মাত্র। গুহ পরশু দিন ঠিক একই রকমই ধাক্কা দিয়েছিল ওপরের ঘরে। ঠিক এইভাবেই তখন সে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"কেন?" কোনওক্রমে তারক বলতে পারল।

"সলিল বিকেলে গেছল। আমাকে বলল বিয়ে হতে পারে না, তুমি বরং অন্য কাউকে বিয়ে করো।" দ্রুত উত্তেজিত কথাগুলো অনিতার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। "শুনে থ হয়ে গেলুম। ও যে মুখের ওপর স্পষ্ট এ-কথা বলবে ভাবতে পারিনি। কারণ জানতে চাইলুম, বলল তোমার সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই, বিরক্ত বোধ করি, বিয়ে হলে কেউই সুখী হব না তাই দু'জনের স্বার্থেই এ-বিয়ে হওয়া উচিত নয়। শুনে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল, বললুম তা হলে আমার এই অবস্থা করলে কেন? ও কী বলল জানেন?"

অনিতা এমনভাবে তাকাল যেন, আশা করছে তারক বলে দেবে বা অন্তত ঘাড় নেড়েও জানাবে সলিল কী বলেছিল। কিন্তু তারক গোটা শরীরটাকে জিজ্ঞাসা করে দাঁড়িয়ে থাকল।

"এই অবস্থা যে আমিই করেছি তার প্রমাণ কী, অন্য কেউও তো করতে পারে। ঠিক এই কথাই ও বলল, ঠিক এই কথাগুলো।"

অনিতা হাঁপাচ্ছে। তারক ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে ধাক্কা সামলাতে। বিমূঢ় না হয়ে বরং তার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল সলিলের এই কথাটায়। রান নেবার জন্য ডাক দিয়ে তারপর রান আউট করে দেবার মতো ব্যাপার।

"এমন নোংরা কথা ও বলবে আমি ভাবতেও পারিনি তারকদা। আজ চার বছর আমাদের পরিচয়। কত কথা, কত চিঠি। ওকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, পৃথিবীর আর কাউকে জানি না, সত্যি বলছি, অথচ এমন জঘন্য অপবাদ দিল! আমার কাছে ওর সব চিঠিই আছে এই দেখুন।"

চামড়ার থলিটা খুলছে দেখে তারক নিষেধ করল, কিন্তু শুনল না। দোমড়ানো একটা চিঠি বার করে অনিতা বলল, "আপনি পড়ে দেখুন কী লিখেছিল। মাত্র দেড় বছর আগের চিঠি—তোমায় বিয়ে করব, যত বাধাই আসুক না; আমরা ঘর বাঁধব আলাদা, দুটির বেশি ছেলেমেয়ে আমাদের হবে না, এমন কী তাদের নাম পর্যন্ত কী রাখা হবে তা-ও, তা-ও ওতে লেখা আছে।"

অনিতার চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ল। তারক সমবেদনায় ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে গর্ত খোঁড়া চলেছে। গাঢ় স্বরে বলল, "একটা বদমাস।"

"বলেছিল আমায় না পেলে বাঁচবে না।"

চিঠি এগিয়ে ধরা অনিতার হাতটা তারককে বাধ্য করল স্পর্শ করতে। তার মনে হল ভারী কোমল এবং উষ্ণ এই হাত যার ছোঁয়ায় প্রথম যৌবন বিচ্ছুরিত হয়। দরজার বাইরে দিয়ে কে চলে গেল। অনিতার হাত ছেড়ে তারক বলল, "তাড়িয়ে দিয়েছে, কেন?"

"আমাদের কথা সবই আড়াল থেকে বড়দি শুনেছিল! ওর জন্য এক পাত্র পাওয়া গেছে, দোজবরে। বাবা অফিস থেকে ফিরতেই তাকে সব বলে দেয়।"

"কী বলে দেয়?"

"সলিল বলেছিল প্রুভ করতে পারবে না আমিই এর জন্য দায়ী। তা হলে বলি, অ্যাবোর্শন আমি করাব না, তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। আমারও মাথার ঠিক ছিল না, আরও অনেক কিছু তখন বলেছিলুম। ও চলে যাবার পরেই বড়দি মেজদি আর মা আমাকে ঘিরে ধরে। শেষ পর্যন্ত সব কথা খুলে বলতেই হয়। বড়দি কাঁদতে শুরু করে, জানাজানি হলে তো ওর বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা অফিস থেকে ফিরে আমাকে—"

অনিতা মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। তারক ওর পিঠে হাতের বেড় দিয়ে কাছে টেনে বলল, "কেঁদো না।" আর কী বলবে সে ভেবে পাচ্ছে না। চুলের গন্ধ আসছে। মাথাটা বুকে ঠেকানো' নিশ্বাসের সঙ্গে দেহটাও কাঁদছে।

ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হতে শুরু করল তারক। ওর মনে হল অনিতা এইবার পড়ে যাবে অতএব ওর নিতম্বের পিছনে উরু দ্বারা একটা আগল তৈরি করা দরকার। এবং ওর শিরদাঁড়ার সেই ফুলে ওঠা গ্রন্থিটিকে পিটিয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে হবে মিহি পাউডারের মতো। একটা কাঁকরও যেন না থাকে।

"তারকদা, আমি—"

অনিতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তারকের মুখের দিকে। তারক হাতটা কোমর থেকে তুলে নিল।

"আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা। দবজা বন্ধ করে মুখ বেঁধে বাবা মেরেছে। আমি শুধু আজ রাতটুকু থাকব। শুধু রাতেব মতো আশ্রয় চাই। কাল ভোরেই চলে যাব।'

"কোথায় যাবে?" তাবকেব কণ্ঠস্বব উত্তেজনায় ঘড়ঘড় করছে।

"আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা তারকদা, বাবা ভীষণ মেরেছে।" অনিতা কাতর স্বরে ভিক্ষা চাওয়ার মতো ভঙ্গি করল দেহের। তারক চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "ওপরে চলো।"

অনিত৷ একইভাবে দাঁড়িয়ে। তারক বিবক্ত হয়ে বলল, "কী হল!"

"আমি সলিলকে এখনও ভালবাসি।"

"বেশ তো। কিন্তু তাই বলে সারারাত কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এ-ঘরে দেবু ঘুমোয়। তোমাব জন্য কি সে ঘুমোতে পাববে না?"

অনিতা আর কথা না বলে তারকেব সঙ্গে ওপরে এল। বারান্দার বঙ্কুবিহারী দাঁড়িয়ে।

"কী ব্যাপার। ও গাড়ি গেল না যে?" বঙ্কুবিহারী রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করল অনিতাকে দেখিয়েই।

"বাবা আজ এ থাকবে।"

উত্তব না দিযে বঙ্কুবিহারী নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তারক অপ্রতিভ মুখে অনিতার দিকে তাকাতেই সে বলল, "আমি ববং যাই।"

"কেন?"

"বোধ হয় আপনার বাবা-- '

"তাতে কী হয়েছে? তুমি আমাব ঘরে এসো।"

তারক হাত চেপে ধরল অনিতার। বোধহয় হাতে ব্যথা তাই অনিতা যন্ত্রণাসূচক কাতর ধ্বনি কবল। তারক গ্রাহ্য না করে ওকে হাত ধবে টেনে নিয়ে এল নিজের ঘরে। আলো জ্বালল।

"তুমি হঠাৎ ও কথাটা বললে কেন?" তারক ক্রোধে থরথর কেঁপে উঠল।

"কোন কথা!"

"সলিলকে ভালবাসো, এটা বলার কি দরকার ছিল? তুমি আমাকে কী ভাবো? দুশ্চরিত্র, পাজি, শয়তান? তোমার এই দুরবস্থার সুযোগ নিতে চাই? অ্যাঁ, জবাব দিচ্ছ না কেন? অ্যাঁ, সবাইকে কি সলিল ভাবো নাকি?'

"তারকদা আপনি ভুল বুঝছেন, আপনি আমায়—"

"থাক থাক আর সাফাই গাইতে হবে না। কিন্তু এখন যদি আমি তোমায় কিছু করি, পারবে তুমি আটকাতে আমায়?"

"কী বলছেন আপনি! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? আমি বরং চলেই যাই।" অনিতা গম্ভীর হয়ে দরজার দিকে এগোতেই তারক ওর সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

"তুমি আমায় অপমান করেছ। তোমার মতো একটা কুচ্ছিত থার্ডক্লাস মেয়ে, ফাঁদ পেতে ছেলে ধরার চেষ্টা করে যে, সে করবে অপমান আর আমি সহ্য করব! কেন, কেন বললে গায়ে ব্যথা? ভেবেছ আমি ন্যাকা, কিছু বুঝি না!"

"পথ ছাড়ুন। নয়তো আমি চেঁচাব। আমি লোক জড়ো করব।"

"করো তুমি। আমায় সলিল গুহ পাওনি।"

"আপনি সলিলের থেকেও জঘন্য। ভেবেছেন কিছু বুঝি না? যে-কোনও মেয়েই মতলব বুঝতে পারে গায়ে হাত দেওয়ার ধরন থেকে। আপনাকে দেখে বিশ্বাস হয়েছিল তাই ভরসা করে এসেছি। কিন্তু আপনি যে এমন লোক সেটা বুঝতে পারিনি। আপনার এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।"

অনিতা কথা শেষ করে তারকের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, দু'হাত ছড়িয়ে ওকে বুকের ওপর তারক টেনে আনল। তারপর ওর হালকা দেহটি অবলীলায় তুলে এনে খাটের ওপর নামিয়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

অনিতা স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে। দেহ কঠিন এবং সঙ্কুচিত। তারক উত্তেজনা লুকোবার জন্য নিশ্বাস বন্ধ করেছিল এইবার ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত একটা শব্দ করল নাক দিয়ে, অন্য কোনও পরিস্থিতিতে সেটা হাসির কারণ হত অনিতার। কিন্তু এখন দু'চোখে ভয় ফুটে উঠল। খাট থেকে হুমড়ি খেয়ে তারকের পায়ের ওপর পড়ে বলল, "তারকদা আমি পারব না। আমায় ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে ধরছি, আমি আপনাব ছোটবোন হই তারকদা।"

বিরক্তিতে সারা মুখ দুমড়ে তারক বলল, "চুপ করো। যাত্রার হিরোইন সাজতে হবে না আর।"

এই বলে সে মাথা নিচু করে অনিতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড সুখ অনুভব কবল। এই মুহূর্তে আর লক্ষ লক্ষ লোকের একজন নই, এই বোধ তার মধ্যে সঞ্চারিত হতে শুরু কবেছে। এই বোধকে দীর্ঘায়ত করতে হলে অনিতাকে এই ভঙ্গিতে রেখে দিতে হবে। ওকে দয়ার প্রত্যাশী করে রাখতে হবে এবং তা করতে হলে ওকে মুঠোর মধ্যে রাখতে হবে। সে-জন্য ওর দুর্বলতম স্থানটিতে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে এবং সেটি হচ্ছে সলিলের জন্য ওর ভালবাসা। দ্রুত এই সব ভেবে নিয়ে তারক গম্ভীর স্বরে, অনেকটা অনুতপ্ত লাঞ্ছনাকারীর অনুকরণে বলল, "ওঠো এবার। কাল তোমায় সলিলের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওর মার সঙ্গে কথা বলব।"

অনিতা মুখ তুলে তাকাল। দু'চোখের ভয় এখন বিস্ময়ের দিকে এগোচ্ছে। এই সময়েই পাশেব ঘব থেকে বঙ্কুবিহারী চেঁচিয়ে তারককে ডাকল।

"ব্যাপার কী?" তারক ঘরে ঢোকামাত্র বঙ্কুবিহারী মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডা গলায় প্রশ্নটা করল।

তারক সাবধান হয়ে গেল মনে মনে। এই স্বর প্রচণ্ড রাগ চেপে রাখারই ছদ্মবেশ। নিরাসক্ত কণ্ঠে তারক বলল, "যা বিপদে পড়ে এসেছে, কী আর করা যায়, থাকুক আজ রাতটা। কাল সকালে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"থাকবে মানে?" বঙ্কুবিহারী খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। "বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ নেই, আর সোমখ মেয়ে কিনা বাত কাটাবে! বিদেয় কর, এখুনি বিদেয় কর। ট্রাম বাস এখনও হয়তো বন্ধ হয়নি।"

"আগে শোনো ব্যাপারটা।" তারক রাগ চাপতে চাপতে ঠিক করল প্রথমেই বঙ্কুবিহারীর কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনতে হবে। অনিতা নিশ্চয়ই পাশের ঘরে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। গলা নামিয়ে তারক বলল, "মেয়েটি সত্যিই বিপদে পড়ে এসেছে। নয়তো এত রাতে কেউ এ-ভাবে আসে, নাকি আমিই ওকে রাতে থাকতে বলি। ও আমার ঘরে শুক, আমি বৈঠকখানায় শুচ্ছি।"

"এ বাড়ি কার?" বঙ্কুবিহারী ঈষৎ কুঁজো হয়ে শিকার দেখা জন্তুর মতো স্থির চোখে তাকিয়ে, দাঁত চেপে আবার বলল, "কে মালিক এ-বাড়ির?"

"তুমি!"

"তা হলে আমি বলছি, ও-মেয়েটিব এ-বাড়িতে রাত কাটানো চলবে না। এরপর কোনও কথা আর শুনতে চাই না।" বঙ্কুবিহারী হাত তুলে দরজা দেখিয়ে দিল।

"বাড়ি তোমার ঠিকই, কিন্তু আমি টাকা দিয়েই বাস করি। আমার রাইট আছে যাকে খুশি আনার।" তারক রাগে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

"রাইট! মাসে মাসে ক'টা টাকা দিলেই বুঝি রাইট জন্মায়? আমি যদি গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দি, পারিস তুই আইনের সাহায্য নিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকতে? পারবি তোর ওই ক'টা টাকা মাইনের ঘর ভাড়া করে বউ-ছেলেদের নিয়ে থাকতে? দশদিনও তো কুলোবে না।"

"কে বলেছিল আমার বিয়ে দিতে?" তারক বুঝছে সে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার সামান্য সুযোগ পেয়েই গলা চড়িয়ে নিজের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, "কেন একটা আকাট নির্বোধের সঙ্গে বিয়ে দিলে? তুমি দায়ী, তুমিই বদমাইসি করে এই বিয়ে দিয়েছ।"

"ছেলেমেয়ে যুগ্যিমতো হলে বাবা-মা তাদের বিয়ে দেয়, এটাই নিয়ম, এর মধ্যে বদমাইসির কী আছে। তুই কি কচি খোকা ছিলি? বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তো বাবা হলি।"

তারক জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেল না বঙ্কুবিহারীর এই অকাট্য বিদ্রূপের। বিশৃঙ্খল আবেগ দপদপ করে উঠল তার মাথার মধ্যে। স্নায়ুগুলো পোড়া কাগজের মতো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেকে অবিলম্বে সে স্তূপীকৃত ভস্মরাশিতে পবিণত হতে দেখছে। হতাশ ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, "আমার কাছে ব্যাপারটা একদমই নতুন ছিল। বাবা, তুমি তো বিবাহিত, নিশ্চয় বুঝবে তখন কীরকম উত্তেজনা হয়। আমি তো একটা মানুষ, কত সামলাব, কীভাবে সম্ভব?"

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ছুটে এল বঙ্কুবিহারী। তারকের মুখের কাছে মুখ এনে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "মানুষ! তুই একটা মানুষ! তিন মাস কাছে বউ নেই আর অমনি একটা মেয়েকে এনে ঘরে তুলেছিস। মুরোদ যে কত জানা আছে। দেখ, আমাকে দেখ।" বঙ্কুবিহারী টানটান হয়ে চিতিয়ে দাঁড়াল। "তোর মা মরার পর থেকে বারো বছর একইভাবে কাটিয়ে দিলুম। অথচ আমিও একটা পুরুষ। পারি, বুঝলি অনেক সইতে পারি। আর তুই?"

"আমি কী?"

উত্তর দেবার জন্য বঙ্কুবিহারী কয়েক মুহূর্ত সময় নিল। তারমধ্যেই তারকের ডান হাতটি ক্লান্ত ভঙ্গিতে উদ্যত হল এবং অশেষ শ্রমসহকারে নামিয়ে এনে বঙ্কুবিহারীব মুখে জোরে আঘাত করল। তারপর মৃদু চাপাকণ্ঠে সে বলল, "আমি জানি, আমি কী।" এ-কথা বলার পর তার মনে পড়ল, ঘুরে পড়ে যাবার সময় বঙ্কুবিহারীর মুখ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারক কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত অনুভব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মনে হতে লাগল, প্যাড পরে যেন সে অপেক্ষা করছে। যে-কোনও মুহূর্তে এবার তাকে মাঠে নামতে হবে। এখন সে এগারোজনের একজন। এখন সে স্টেডি ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান টি. সিনহা।

তারক নিজের ঘরে ঢুকে দেখল খাটের বাজু ধরে অনিতা কাঠের মতো দাঁড়িয়ে। গম্ভীর স্বরে তারক বলল, "তোমার তো এখনও কিছু খাওয়া হয়নি।"

"আমি চলে যাই বরং।" ফিসফিস করে অনিতা বলল।

"কেন?"

"আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। আমি জানতাম না যে—।"

"কী জানার আছে তোমার?" তারক ধমকে উঠল। "যা বলছি তাই করো। দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ো। সকালে তোমায় সলিলের বাড়ি নিয়ে যাব। তারপর দেখা যাক কী হয়।"

ঘর থেকে বেরিয়ে তারক নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। নীচে নেমে এসে দেখল দেবাশিস ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিভিয়ে চেয়ারে বসে তারক ছোট টেবলটায় পা তুলে দিল। দরজাটা খোলা। নতুন রান্নাঘরের সদ্য কলি হওয়া দেয়ালটা অন্ধকারে ওর চোখের সামনে ফ্যাকাশে আস্তরণ ধরে রেখেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে সে ভাবল, এই হচ্ছে বঙ্কু সিঙ্গির মুরোদ। শুধু ফিল্ডিংই খেটে যাবে, আর গলাবাজি করবে—সইতে পারি, অনেক সইতে পারি। একটিও ক্যাচ না ফেলে, লোকের হাততালি কুড়িয়ে, শেষমেশ, দারুণ এক টুয়েলফ্থম্যান হিসেবে নাম কিনে একদিন লক্ষ লক্ষের ভিড়ে বঙ্কু সিঙ্গি মিলিয়ে যাবে।

ভোরে দেবাশিস যখন ঘুম ভাঙাল তখনও তারকের ঠোঁটে হাসিটা লেগেছিল। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারক লাফিয়ে উঠল। কাল থেকে জামাটা পর্যন্ত খোলা হয়নি। দেবাশিস খানিকটা ইতস্তত করে বলল, "বড়বাবু এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। বললেন, দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি বউদিকে আনতে। আর আপনার ঘরে তালা দিয়ে গেছেন।"

কথা না বলে তারক কলঘরে ঢুকল। এবং বেরিয়ে এসে ভাবল ইনজেকশনটা এক্ষুনি নিয়ে নিলে কেমন হয়? তারপরই মনে হল, আমার ঘরে তালা দিয়ে যাবে কেন? অনিতা এত সকালেই চলে গেল না-জানিয়ে? কিন্তু সে-রকম তো হবার কথা নয়। তা হলে কি ওকে তালা দিয়ে আটকে রেখে গেছে।

ছুটে ওপরে এল তারক। প্রায় আড়াই সের ওজনের একটা তালা বন্ধ দরজার কড়ায় লাগানো। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলতেই আঙুল গলে যাওয়ার মতো পাল্লা দুটি ফাঁক হল। চোখ রেখে তারক শুধু অন্ধকার দেখল। ঘরের সবক'টা জানালা বন্ধ।

"অনিতা, অনিতা।" তাকে চাপা গলায় ডাকল।

"কী হবে তারকদা?" ঘরের মধ্য থেকে অনিতার ভয়ার্ত স্বর শোনা গেল।

"জানালাগুলো খুলে দাও, কোনও ভয় নেই। তালা এখুনি খুলে ফেলব। তোমায় চাবি দিচ্ছি, আগে আলমারি খুলে টাকা বার করে দাও।"

ফাঁক দিয়ে চাবি গলিয়ে দিল তারক। রাস্তাব দিকে একটা জানালা খুলে যেতেই অনিতাকে দেখতে পেল সে। ফ্যালফ্যাল করে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে। তারক অধৈর্য হয়ে বলল, "আগে টাকা বেব করে দাও। খুললেই ড্রয়ার দেখবে। তার মধ্যে একটা সিগারেটের কৌটায় আছে। যা আছে সব আনো।"

অনিতা কথামতো কাজ করল। নোটগুলো পকেটে ভরতে ভরতে তারক বলল, "আমি ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে আনছি। পাল্লা থেকে কড়া দুটো খুলে ফেললেই হবে। ভয়ের কিছু নেই। গায়ে এখনও ব্যথা আছে কি?"

"তারকদা যে-ভাবে পারুন খুলে দিন। কী লজ্জা, কী লজ্জা, আমি গলায় দড়ি দেব। আপনার বউকে আনতে গেছে আপনার বাবা। ওরা এসে পডার আগে যদি না আমায় বার করতে পারেন তা হলে ঠিক গলায় দড়ি দেব।" বলতে বলতে অনিতা উপুড় হয়ে ফোঁপাতে শুরু করল।

তারক প্রায় দশ সেকেন্ড জমাট বেঁধে রইল। তারপর গায়েব সবটুকু জোর জড়ো করে তালাটা ধরে টানল। কপালে চিটচিটে ঘাম ফুটছে। তালাটায় বার কয়েক হ্যাঁচকা টান দিল। ছুটে এসে দরজাব ওপর আছড়ে পড়ার উদ্যোগ করছে, দেখল দেবাশিস নীচে থেকে বিস্মিত মুখ নিয়ে উঠে এসেছে, শব্দ শুনে। ওকে মজা দেবার চেষ্টা না করে তারক দুড়দাড়িয়ে নীচে নামল। বাড়ি থেকে বেরোবাব সময় শুনল দেবাশিস পিছন থেকে বলছে, "আজ অফিসে যাবেন তো?"

বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছে সে চারধারে তাকাল। কাঁধের ওপর মুখবাঁধা থলি থেকে করাতের ডগা বা তুরপুনের হাতল বেরিয়ে আছে এমন একটা লোক দেখা যায় কি না খোঁজ করতে থাকল। জনাপাঁচ খাকি পুলিশ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য সময় তারক নিশ্চয় খোঁজ করত, কোথায় কীসের গোলমাল বেধেছে বা বায়ট শুরু হয়েছে কি না। চায়ের দোকানে যথারীতি ভিড়, বগলে থলি চেপে লোকেরা বাজার যাচ্ছে, ট্রাম স্টপে দু'-একজন, ফুটপাথে কাগজওলা, সেলুনে দাড়ি কামাচ্ছে দুটো লোক, রিকশায় বাসিচোখে একটি বেশ্যা, মনোহারী দোকানটা আধখোলা, কিন্তু ছুতোর দেখতে পেল না তারক।

"কাগজে লিখেছে, কাল শ্যামবাজারে ফায়ারিং হয়েছে।" পাড়ারই এক প্রবীণ বাজার সেরে হনহন করে যেতে যেতে তারককে দেখে, না থেমেই বলল এবং অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "বাজারে একদম মাছ নেই।"

লোকটার পিছনের দিকে তাকিয়ে তারক অস্ফুটে বলল, "তাই নাকি।" এবং ভাবল তা হলে কি ছুতোর পাওয়া যাবে না? নাকি এত সকালে ওরা বেরোয় না। বরং কোনও কাঠগোলায় খোঁজ নিলে হয়।

তারক এলাকার সমস্ত বাস্তা দিয়ে, মনে মনে, দ্রুত হাঁটতে শুরু করল দু'ধারে তাকিয়ে। নেই, নেই, নেই। একটার পর একটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে, চোখে পড়ছে না। সে ক্রমশই দমে যেতে শুরু করল।

এ-ভাবে খুঁজতে খুঁজতে সে কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার কিনারায় পৌঁছে ভাবল, এখন যদি পাই তা হলে ধরে আনতে আনতেই তো এক ঘণ্টা কেটে যাবে। ততক্ষণে রেণুকে নিয়ে বাবা পৌঁছে যেতে পারে যদি ট্যাক্সিতে আসে।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তারক ফিরতে শুরু করল অন্য পথ দিয়ে। পাঁচটা পুলিশ রাইফেল দেয়ালে ঠেকা দিয়ে চা খাচ্ছে। সাদা পোশাকপরা অফিসারটি ফুটপাথে সম্ভবত চায়ের দোকানেরই চেয়ারে বসে। তারক লক্ষ করল, লোকটা তাকে দেখছে। ভয় করল তার। গ্রেপ্তার করে যদি! মিছিলে স্লোগান দিয়ে হাঁটার খবর হয়তো জানে। পায়খানায় যেতে পারছে না বলে হয়তো তিরিক্ষে হয়ে রয়েছে। যদি ধরে নিয়ে যায়। তা হলে অনিতাকে আর রক্ষে করা যাবে না। রেণু ওকে শেষ করে দেবে। তারপরই মনে হল, ইনজেকশন নেওয়াই তো বন্ধ হয়ে যাবে।

মনে পড়া মাত্র অজান্তেই চোখ চলে গেল রাস্তার অপর পারে অহীনের ওষুধের দোকানটার দিকে।

অহীন দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে এমন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে, যার পায়ের কাছে একটি থলি এবং সেটির দড়িবাঁধা মুখের থেকে করাতের ডগা বেরিয়ে।

"একে কি তুই ডেকেছিলি?" তারক ছুটে রাস্তা পার হয়ে এসে বলল। "আমার ভাই ভীষণ দরকার, আমি নিয়ে যাই, পাঁচ মিনিটের কাজ, একটা কড়া খুলে দেবে দরজা থেকে, নইলে খুব মুশকিলে পড়ব।"

কাতর স্বরে তারক অনুনয় করল যথাসম্ভব এক নিশ্বাসে। অহীন আশ্চর্য হয়ে পড়ল বটে কিন্তু প্রভাবিত হয়েছে কি না বোঝা গেল না। ঠান্ডা, শুকনো গলায় সে বলল, "আমারও খুব দরকার। আগে আমারটা হয়ে যাক, তারপর নিয়ে যেয়ো।"

"বিশ্বাস কর, আমার খুব বিপদ হবে যদি এক্ষুনি দরজা না খুলতে পারি। একটা মেয়ে আটকা পড়েছে ঘরে। পাঁচ মিনিট, মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য।"

অহীন ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "কাল রাতে বই আর জুতোর দুটো দোকান লুঠ হয়েছে। আমার জানলার দুটো কবজা একদম ভাঙা।"

"লুট হলে দিনে তো আর হবে না। আমি তো বলছি পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। কী গো কতক্ষণ লাগবে একটা কড়া খুলতে?"

ছুতোর মিস্ত্রিটি একটি সামগ্রী হয়ে এতক্ষণ দুই খদ্দেরের কষাকষি শুনছিল। নিজেকে জাহির করার সুযোগ পেয়ে ভারিক্কি চালে দু'দিক বাঁচিয়ে বলল, "না দেখে কী করে বলি কতক্ষণ লাগবে। তবে এ-বাবুর কাজ বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি কাজ শুরু করো তো।" একজন রোগী আসতেই অহীন ঝামেলাটা শেষ করে দিতে চাইল, "আমার কাজটা হয়ে গেলেই তুমি নিয়ে যাও।"

অহীন তুই ইলেকশনে দাঁড়া আমি তোর হয়ে দোরে দোরে গিয়ে ভোট চাইব, পোলিং এজেন্ট হব, পঁচাত্তরটা ফলস ভোট দোব। শুধু এই ছুতোরটাকে ছেড়ে দে পাঁচ মিনিটের জন —এই বলে যদি ওর পায়ে আছড়ে পড়ি! তারক ভাবল, তা হলে কেমন হয়!

"আপনি একটু ঘুরে আসুন বা ততক্ষণ।" তারকের অসহায় ভাব দেখে ছুতোর গাঢ়স্বরে বলল, "আমি আপনার জন্য থাকব'খন।"

শুনে ভাল লাগল তারকের। লোকটা এখন তো আমার ভগবান, বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র ওই রাখে। এখন ওকে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না বলেই তার মনে হল। কেউ এসে ধরে নিয়ে যায় যদি।

তারক ফুটপাথে পায়চারি শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপে সে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। অহীন যদি ইলেকশনে দাঁড়ায়, তা হলে বিরোধী পক্ষকে প্রাণ দিয়ে সমর্থন করবার প্রতিজ্ঞা তখনই সে নিল। মাঝে মাঝে সে ছুতোরের কাছে এসে দাঁড়ায়, আবার অস্থির হয়ে দূরে সরে যায়। এই সময় রোগীটিকে বিদায় করে অহীন দরজায় এসে দাঁড়াতে, তারকের হঠাৎ মনে হল, ওর কোনও বন্ধু নেই, ও তুই-তোকারি ভুলে গেছে।

"ঘরে আটকা পড়েছে বলছিলে যেন?"

অহীন অনাগ্রহ প্রকাশের চেষ্টায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ওপারের খাকি পুলিশদের উপর। প্যান্টের পকেটে দেশলাই খুঁজছে।

"আমার এক বান্ধবী। কাল রাতে এসে পড়ে হঠাৎ।"

"বান্ধবী।"

অহীন পকেট থেকে হাত বার করতে পারল না। বাল্যকালের মতো করে চোখ দুটো সরিয়ে এনে তারকের উপর রাখল।

"রাতে ছিল। বউ কিছু বলল না?"

"বউ এখন বাপের বাড়ি।"

"তাই বল।"

অহীনের চাপা হাসি শুরু হল। দেশলাইয়ে সিগ্রারেট ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ যেন মনে পড়ল, সিগাবেটটা এগিয়ে ধরল, "নে, তুই খা।"

তাবকের সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে অহীন বলল, "রাস্তায় কতক্ষণ দাঁড়াবি ভেতরে এসে বোস।"

স্প্রিংয়ের দরজা দেওয়া খুপরির মধ্যে তারক ঢুকতেই অহীন জিজ্ঞাসা করল, "পেলি কী করে?"

তারক লক্ষ করল উত্তেজনা, অহীনের গালের থুতনির এবং চোখের কোলের চর্বিগুলোকে নিয়ে চটকাতে শুরু করেছে ফলে চোখদুটো উপচে উপচে উঠছে। দেখে কষ্ট হল তারকের। তাড়াতাড়ি বলল, "আমাদের অফিসেরই এক কলিগের ফিঁয়াসি।"

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে অহীন কথাগুলোর সঙ্গে ধাতস্থ হল। তারপরই আবার সারামুখে চর্বির ডলাই মলাই শুরু হল। "আর তুই তাল বুঝে অমনি ভাগিয়ে আনলি! শাব্বাশ। এ চিকি সিঙ্গল রান চুরি। তোর পেটে পেটে য়্যাত্তো! কাল কি তোদের প্রথম হল? আরে শালা বল না সব। দেখতে কেমন? উফ্ এলেম আছে বটে তোর।"

তারক দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে শুনে গেল। জবাব না দিয়ে অহীনের অধৈর্যতা চাগিয়ে তুলতে তুলতে ভাবল, শালা ছুতোরটাকে ছাড়লি না কেন। পনেরো-কুড়ি মিনিট তো মোটে লাগত, তাতে কী এমন তোর সর্বনাশটা হয়ে যেত?

"কী রে চুপচাপ যে? বল না?"

"কী আর বলব। দেখতে অবশ্য তেমন ভাল নয়, তবে ফিগারখানা ভালই। থার্টিসিক্স, হ্যাঁ আমি শিওর, থার্টিসিক্সের বেশি তো কম হবে না, টোয়েন্টিফোর অ্যান্ড—তা প্রায় থার্টি এইটই তো মনে হয়। ভীষণ হট। একজনের সঙ্গে বেশিদিন থাকে না। বড়জোব ছ'মাস। আমার আগে আবও চারজনের সঙ্গে ওব—"

"বাঃ বাঃ দারুণ তো! এই রকমই ভাল। একজনের সঙ্গে কি বেশিদিন থাকা যায়, কেমন বাসি বাসি লাগে। তোর লাগে না?"

"কাকে, বউকে?"

অহীন থতমত হয়েই সামলে ওঠার জন্য বখাটের মতো হেসে চোখ মারল। "আমারও একজনের সঙ্গে একবার জমে গেছল।"

তাবকের মনে হল অহীন এবার একটা মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলবে। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে পাল্লা দিতে চায়। সদ্য গোঁপ ওঠা ছেলেরা যে-সব কথাবার্তা বলে সম্ভ্রম কাড়তে চায় বন্ধুমহলে, অহীন এখন তাই শুরু করবে। ঘড়ি দেখে তারক হাই তুলল। ডান পা-টা টেবলের ওপর তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। অহীন গ্রাহ্য করল না পা-টাকে। ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, "ম্যারেড। হাতে একজিমা হওয়ায় ট্রিটমেন্ট করাতে এসেছিল। স্বামীটা ডিগডিগে ক্ষয়া রুগির মতো আর ওর স্বাস্থ্য, মাইরি কী বলব। দেখেই বুঝেছিলাম এই স্বামীর পক্ষে ওকে স্যাটিসফাই করা অসম্ভব।"

"তুই কী করলি?"

"আমি?" অহীন কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল. "একদিন গাড়িতে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছলুম। একটা চুমু খেয়েছিলুম মোটে। আর কিছু নয়।"

অহীনের স্বর বিষাদে মুহ্যমান হয়ে যাওয়ায় তারকের মনে হল বোধহয় ও সত্যিকথাই বলছে।

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বর কোমল করে সে বলল, "আমাকে বললি না কেন ব্যবস্থা করে দিতুম। আমাদের একতলার ঘরটা তো খালিই পড়ে আছে।"

অহীন কথা বলল না। তারক দেখল ওর কণ্ঠনালী পিপাসার্তের জল খাওয়ার মতো ওঠানামা করল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। নিশ্বাসের সঙ্গে দু'-চারবার করাত টানার শব্দ হল। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। পা নামিয়ে সিধে হয়ে বসে তারক দুম করে টেবলে ঘুসি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক আছে, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

"আস্তে বল আস্তে, কম্পাউন্ডার এসে গেছে। ও আবার বাড়িতেও যায় কিনা।" অহীন তটস্থ হয়ে সুইংডোরের তলা দিয়ে তাকাল। কয়েক জোড়া পা দেখা যাচ্ছে। রোগীদের বোধহয়।

"কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি, তোর সঙ্গে যার চলছে?"

"হ্যাঁ।" তারক ঘড়ি দেখে ভাবল, শালা, কালও তো আমায় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলি। ছুতোরটার কাজ কি এখনও শেষ হল না। ইনজেকশনটা এখনই তো নিয়ে নিতে পারি। ছুতোর নিয়ে গিয়ে কড়া খুলে অনিতাকে বার করে দিয়ে বঙ্কুবিহারী আর রেণুর জন্য তারপর অপেক্ষা করতে হবে।

"বয়স কত রে?"

"পঁচিশ ছাব্বিশ।"

ওরা এলে ফয়সালা হবে। তারক অন্যমনস্ক হয়ে ভাবল, কীসের ফয়সালা হবে? অনিতাকে অসদুদ্দেশ্যে বাড়িতে আনিনি। সলিলকে দিয়ে ভজিয়ে দিলেই চলবে। তা করা এমন কিছু শক্ত হবে না।

"খরচ-টরচ করতে হবে?"

"না না, সে টাইপই নয়।"

এখন আমার হাতের মুঠোয় সলিল। ওর কীর্তির কথা ফাঁস হোক নিশ্চয় তা চাইবে না। কিন্তু বঙ্কুবিহারী এমন একটা পরিস্থিতি পাকিয়েছে, সেটা এখন কী করে ছাড়ানো যায়? অনিতাকে হাতেনাতে ধরিয়ে দিলে কী করব? কী বলব রেণুকে তখন?

"হ্যাঁ রে নামটা কী?"

"রেণু।"

"উঠেছিস কেন, বোস না আর একটু। চা খাবি? শুধু রেণু না রেণুকা? একটু সেকেলে ধরনের যেন, তাই না?"

"আমায় একটা পেনিসিলিন নিতে হবে। বোস, চট করে তোর কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে আগে নিয়ে আসি, তারপর বলছি।"

অহীনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তারক ছিটকে খুপরি থেকে বেরোল। কম্পাউন্ডার তখন এক রোগীকে বলেছিল—"চালের বদলে গুলি দিয়ে কি ক্ষুধার্ত মানুষকে ঠান্ডা করা যায়, বলুন?" তারককে কাছে আসতে দেখে সে থেমে গেল।

ইনজেকশন নেবার সময় ঘড়ি দেখে তারক অধৈর্য হয়ে উঠল। ছুতোরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খুপরির মধ্যে আর না ঢুকে এখান থেকেই ছুতোরকে নিয়ে চলে যাবে স্থির করল। অহীন বেরিয়ে এল। জামার হাতা নামিয়ে তারক ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই অহীন ফুটপাথের কিনারে টেনে নিয়ে বলল, "রোগটোগ থাকলে কিন্তু চলবে না।"

"কার?"

"যার কথা বললি।"

"কোথায় বললুম।"

নিজেকে ঝরঝরে তাজা লাগায় তারক বিরক্তি প্রকাশ করল নির্ভয়ে। তাইতে অহীন থতমত হল।

"বাঃ আলাপ করিয়ে দিবি বললি না?"

"আরে দূর, সে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। ভাল ফিগার থাকা চাই, হ্যান্ডসাম হওয়া চাই, কিছু একটা গুণও থাকা চাই, এ-সব কি তোর আছে? রোগীর নাড়ি টেপা ছাড়া আর পারিস কী?"

ছুতোরের কাজ শেষ হয়ে গেছে দেখে তারক আবার বলল, "তোর দোকানে পেনিসিলিনের দাম পঞ্চাশ পয়সা বেশি নিল। এইভাবে লোককে ঠকিয়েই তো গাড়ি করেছিস।"

অহীন কিছুক্ষণ ওর দিকে পাংশু হয়ে তাকিয়ে থেকে, তাড়া খাওয়ার মতো অবস্থায় খুপরিতে ঢুকে গেল।

ছুতোরকে সঙ্গে নিয়ে তারক হনহনিয়ে বাড়ির দিকে চলল। কিছুক্ষণ অহীনের অদ্ভুত মুখটা চোখে ভেসেছিল, এখন অনিতা, রেণু, বঙ্কুবিহারীর মুখ। ঘড়ি দেখে হিসাব করল। বঙ্কুবিহারী পৌঁছনোর কতক্ষণের মধ্যে রেণু রওনা হবে সেটা নির্ভর করছে কীভাবে বঙ্কুবিহারী খবরটা জানাবে। সেই অনুযায়ী সময় লাগবে ধাক্কা সামলে উঠে, গোছগাছ করে, দুই ছেলেকে নিয়ে রওনা হতে। তারকের মনে হল, এ-জন্য আধঘণ্টা সময় যেতে পারে। ট্যাক্সি পাওয়া, সেটা বরাত। দুই থেকে পঞ্চাশ মিনিট এ-জন্য বরাদ্দ করা যায়। হিসাবটা সামলাতে সামলাতে মোড় ঘুরে সামনে তাকিয়েই সে পাথর হয়ে গেল।

ট্যাক্সিটা সবে থেমেছে। আধময়লা খয়েরি শাড়ি-পরা রেণুই প্রথম নামল। কোনও দিকে না তাকিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সে চলল বাড়ির উদ্দেশে। আর এক দরজা দিয়ে বঙ্কুবিহারী আর গেঞ্জিগায়ে লুঙ্গিপরা রেণুর দাদা নামল। ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিল বঙ্কুবিহারী। এরাও ব্যস্ত হয়ে গলি দিয়ে এগোল। ছেলেরা বা তোরঙ্গ-সুটকেস আনারও সময় দেয়নি।

এবার আমি কী করব?

তারক ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। বঙ্কুবিহারী কী বলে ওদের নিয়ে এসেছে তা অনুমান করে লাভ নেই। অনিতার ভাগ্যে কী আছে, তা ভেবেও লাভ নেই। তাবক শুধু ভাবল, এখনও তিরিশ-চল্লিশ বছর হয়তো বাঁচব, কিন্তু কীভাবে?

"চলুন বাবু দাঁড়ালেন কেন!"

ছুতোর মিস্ত্রি কিছুটা অবাক হয়ে গেছে। ট্যাক্সিটা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকিয়ে ঢোঁক গিলল তারক। স্কোরবোর্ডে শূন্য রানে নয় উইকেট। এখন তাকে ব্যাট করতে যেতে হবে। তলপেটে গুড়গুড় করছে। হাঁটু দুটো অবশ লাগছে। সে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাঠের এগারোজন তাকিয়ে রয়েছে একাদশ ব্যাটম্যানের অপেক্ষায়। চতুর্দিকে গুঞ্জন—টি. সিন্‌হা, টি. সিন্‌হা, টি. সিন্‌হা। হঠাৎ ছুটতে শুরু করল তারক।

নয়

সলিল সদর দরজায় এসে দাঁড়াতেই তারক ওকে হাত ধরে রাস্তায় দেয়ালের ধারে টেনে আনল।

"গুহ তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। এক্ষুনি। খুব বিপদে পড়ে গেছি।"

"আপনি বাইরের ঘরে এসে বসুন, আজ অফিস যাবেন না?"

"না না, আগে কথা দাও করবে।"

"আগে শুনি তারপর তো বলব।"

"ওঃ তুমি দেখছি বদলে গেছ একদিনেই। আগে তো এমন ছিলে না, কী ব্যাপার আমার উপর রেগে আছ?"

"রাগ করব কেন!"

"তা হলে কথা দিচ্ছ না কেন? খুব সামান্য ব্যাপার। তার বদলে তুমি যা করতে বলবে, করব। অনিতার ওই ব্যাপারটা যাতে হয়, কথা দিচ্ছি করিয়ে দেব। এবার বলো কাজটা করবে?"

সলিলের নিরাসক্ত ভাবটা এতক্ষণে বদলাতে দেখে তারকের আশা হল। ওপরের বারান্দায় একজন প্রৌঢ়া এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে ছেলেরা। সলিল বার কয়েক উপরে তাকিয়ে বলল, "চলুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।"

মিনিটখানেক পরই তারক শুরু করল।

"কাল রাতে অনিতা এসে হাজির। ওকে বাড়ি থেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"সে কী!" সলিল চাপা গলায় বলল। হাঁটাব বেগ কমে এল।

"তুমি কাল গেছলে ওদের বাড়ি। তোমাদের মধ্যে যা কথা হয়েছে বাড়ির লোক জেনে গেছে। তারপরই এই ব্যাপার। রাত্রে আমাদের বাড়িতেই ছিল। বাবা আপত্তি করে, কেন না তোমার বউদি নেই। সে ক্ষেত্রে একটি মেয়ে রাতে থাকবে, আপত্তি হওয়া স্বাভাবিকই। কিন্তু এই গোলমালের সময় অত রাতে ওকে চলে যেতে বলাটাও স্বাভাবিক হত না। তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়। আজ ভোরে বাবা যে-ঘরে অনিতা রয়েছে সেই ঘরে তালা দিয়ে, তোমার বউদিকে নিয়ে এসেছে। আমি এই পর্যন্তই জানি।"

"আসুন এই পার্কটায় বসি।"

সলিল এগিয়ে গেল। তারক ইতস্তত করে ভাবল, বসলেই দেরি হয়ে যাবে। ওদিকে কী ঘটছে কে জানে। ব্যস্ত হয়ে সে বলল, "বসার দরকার কী, কথা তো শেষ হয়ে এল। এখন তোমায় গিয়ে অনিতার কী হল দেখে আসতে হবে, আর—"

তারক থেমে গেল। সলিল পিছিয়ে গেছে। তারক চোখে চোখ রাখতে পারছে না। সলিলের চোখে ভয়, জিজ্ঞাসা, সন্দেহ।

"তুমি গিয়ে বলবে অনিতার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক।"

"না। কিছুতেই আমি বলতে পারব না।" হঠাৎ হিংস্র দেখাল সলিলকে। তারক সাবধান হয়ে গেল।

"কেন পারবে না, তুমি তো আর অনিতাকে বলছ না, বলবে আমার বউকে আমার বাবাকে।"

"না, কাউকেই বলতে পারব না। অনিতা কাল শাসিয়েছে, বিয়ে নাকি করতেই হবে, দরকার হলে কোর্টেও যাবে। আমি যদি নিজে মুখে স্বীকার করি তা হলে ওরাই তো কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দেবে।"

"দেবে না, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"বেশ দিল না, তাতেই বা আপনার সুবিধে কী। মামলা হলেই ওরা জানবে আমি ধাপ্পা দিয়েছি আসলে অ[illegible] তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আজ বেঁচে গেলেন কিন্তু দু'দিন পর ওরা তখন আপনাকেই সন্দেহ করবে।"

"আহা, তুমি ভুল করছ গুহ। মামলা করা অনিতার পক্ষে সম্ভব নয়। সে-জন্য টাকা পয়সা লাগে, ও পাবে কোথায়? আর অন্য যে ব্যাপারটা, সেটাও ওকে বুঝিয়ে রাজি করাব।"

"করাবেন যে তার গ্যারান্টি কী? আপনি নিজেকে বাঁচাবার জন্যই এই সব করবেন বলছেন, বেঁচে যাওয়ার পর যদি না করেন?"

"গুহ তুমি এমন কথা কী করে বলতে পারলে। তিন দিন আগেও আমি অনিতাকে চিনতাম না। তুমি আমায় পায়ে পর্যন্ত ধরলে উদ্ধার করে দেবার জন্য। কী দরকার ছিল আমার ডাক্তারের ব্যবস্থা করার জন্য ছোটাছুটির, তোমার মুখ চেয়েই তো? বলো, বলো, তোমার জন্যই আজ আমার এই অবস্থা. তুমিই তো ওই অখাদ্য পেত্নিটাকে এনেছিলে। না জানলে এ-সব কথা তোমায় বলতে আসতুম না। আমার সর্বনাশ তো তুমিই করেছ।"

"আমি করেছি! বাজে কথা, আপনি প্রথম দিনই ওকে খেদিয়ে দিলেন না কেন? কেন আশকারা দিলেন? রাতে ও কেন রইল? এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো?"

"তুমি বলতে চাও কী?"

"যা বলতে চাই ঠিকই বুঝেছেন।"

"তোমায় আমি মারব, প্রচণ্ড মারব।"

তারক এগিয়ে এল। মাথার মধ্যে ঝনঝনানি শুরু হয়ে গেছে। গুমোট হয়ে আসছে চারিদিক। তার মনে হচ্ছে নিশ্বাস নেবার জন্য একটা ছেঁদাও শরীরে নেই। এবার সে মারা যাবে। এখন গুহ যদি আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে দেয়!

"আমি মামলা করাব অনিতাকে দিয়ে। তুমি ওকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলাৎকার করেছ। পাশবিক অত্যাচার করেছ। আমি সাক্ষী দেব। ভেবেছ পালাবে? কোথায়, কোথায়? যেখানেই যাও পুলিশ তোমায় ধরে আনবেই।"

এমন সুযোগ আর পাবে না সলিল গুহ, তারকের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, এইবার তুমি আমার ছেঁদাগুলো আঙুল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করে দাও।

"তারকদা করবেন না, এ-সব করবেন না।" বলতে বলতে সলিল পিছু হটে যাচ্ছে দেখে, খপ করে তারক ওর হাত ধরল।

"আমি এই পার্কে বসে রইলুম। তুমি এসে খবর দেবে কী ঘটেছে। অনিতাকে ওখান থেকে নিয়ে আসা চাই। নইলে—"

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে সলিল ছুটে পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে তারকের অবসাদ এল। ভারী লাগছে শরীর। দুলতে দুলতে পার্কের মধ্যে ঢুকে সে ঘাসে শুয়ে পড়ল।

তারক ঘুমিয়ে পড়েছিল। শিশুকণ্ঠের কাকলিতে জেগে উঠল। দুটি বাচ্চা ওকে ঘিরে ছোটাছুটি করছে। তারক উঠে বসায় ওদের অসুবিধা হল, ওরা ইলেকট্রিক থামটার দিকে চলে গেল। পার্কে লোক কখন এল? বিকেল পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে ভেবে, তারকের খানিকটা অবাক বোধ হল। তারপরই মনে পড়ল গুহর আসবার কথা।

দাঁড়িয়ে সে চারধারে তাকাল। কোথায় গুহ! রাস্তাটা ফাঁকা-ফাঁকা। লোকেরা দ্রুত চলাফেরা করছে। এই দুটি ছাড়া পার্কে আর কোনও বাচ্চা নেই। লক্ষ করে বুঝল এরা ভিখারির ছেলে। এতক্ষণে একটিও বাস যেতে দেখেনি। মনোহারী দোকানটা বন্ধ। তার পাশের মিষ্টির দোকানের একটা পাল্লা খোলা, একজনের শুকনো মুখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গুহ কই?

তারক পায়চারি করতে করতে রাস্তার দিকে নজর রাখল। তারপর একটা বেঞ্চে বসে রইল। ক্রমশ বিকেল পড়ে এল। পার্কটা একই রকম ফাঁকা পড়ে আছে। রাস্তাটা এখন একদমই জনহীন। চারদিক থমথমে হয়ে উঠেছে। তারক দূরের একটা বাড়ির বারান্দায় একটি কিশোরীকে দেখতে পেল। ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা এসে যেন বকুনি দিচ্ছে। গোঁয়ারের মতো মাথা নেড়ে কিশোরীটি দাঁড়িয়েই থাকল। এত দূর থেকে তারকের ওকে গৌরীর মতো মনে হল। তারপর দেখল সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই একটা ট্রাক দাপিয়ে যাচ্ছে।

গুহ কি এসে ঘুরে গেছে। হয়তো বাইরে থেকে উঁকি দিয়েছে। শোয়া মানুষকে দেখতে পায়নি। তারক অনুমান করতে চেষ্টা করল। যদি না এসে থাকে, তা হলে কিছু একটা ঘটেছে। রেণুর দাদা অনিতাকে মারধর করতে পারে কি? করার কোনও যুক্তি নেই। অনিতা গলায় দড়ি দেবে বলেছিল, দিয়েছে কি? সময় লাগে দড়ির ব্যবস্থা করতে, তার আগেই রেণু এসে পড়েছে। তা হলে গুহ কি পালাল?

তারক স্থির করল এখন সলিলের বাড়িতে যাবে। সকালের ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে জানতে হবে। তবে একটা সন্দেহ আছে, আদৌ গেছে কি না! অত্যন্ত ভিতু, হয়তো গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে আছে। তা হলে গুহর বাড়ির কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই বোঝা যাবে পরিস্থিতিটা কী। গুহ যদি গিয়ে থাকে এবং বলে আসে অনিতার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, তা হলে রেণুকে (ওকেই এখন ভয়) বোঝানো যাবে, পুরোটাই বঙ্কুবিহারীর কারসাজি। যে-মেয়ে একজনকে ভালবাসে, তার পক্ষে কি সম্ভব আর একজনের সঙ্গে খারাপ উদ্দেশ্যে রাত কাটানো? তুমি কি পারো? এইভাবে বলে রেণুকে ঘায়েল করতে হবে। কিন্তু সলিল যদি না গিয়ে থাকে?

পার্ক থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ানো কিশোরীটির দিকে তারক আবার তাকাল। রেলিংয়ে গাল রেখে একদৃষ্টে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে। চুলের গোছা ঝুলছে। ঠিক এইভাবে গৌরী কখনও কখনও দাঁড়িয়ে থাকত। ফুটপাথের ধারে উনুন ধরাচ্ছে এক বিহারি-বউ। দূর থেকে মোটর ট্রাকের শব্দ আসতেই ভয়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের দোকানের পাল্লা ফাঁক করে বিক্রি চলেছে। ধূমপানের ইচ্ছা হল তারকের। দুটো সিগারেট কিনল। দোকানিকে জিজ্ঞাসা করল, "আজ হয়েছে কিছু?"

মিলিটারি নেমেছে।"

"তা হলে বেশ ঘোরালো হয়েছে। চলবে কিছুদিন।"

"হ্যাঁ। শুধু এই-সবই চলুক, আর দোকান বন্ধ রেখে ছেলে বউ নিয়ে আমি কোমরে গামছা বাঁধি।"

দোকানির বিরক্তি দেখে সান্ত্বনা দেবার জন্য তারক বলল, "নেশার জিনিস, লোকে ঠিকই কিনবে। যতই গুলিগোলা চলুক আর দাঙ্গা যুদ্ধ হোক না, আপনার কেনাবেচা বন্ধ হবে না।"

লোকটি হঠাৎ ফিক করে হেসে বললে, "হরতালেও।"

তারকও হেসে বলল, "নেশা এমনই জিনিস।"

"আমি কিন্তু বিড়ি সিগারেট এমনকী চা পর্যন্ত ছুঁই না। এ-সব খেলে ফুসফুসের রোগ হয়।" দোকানি হঠাৎ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর হয়ে উঠল।

"তা হলে আপনি এ-সব খারাপ জিনিস বিক্রি করেন কেন!"

"কী করব, পেট চালাতে হবে তো।" হঠাৎ তিরিক্ষে হয়ে গেল লোকটা। তারক সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করল।

সলিলদের বাড়ি যাবার গলিতে বেশ ভিড়। কিছুলোক জটলা পাকিয়ে আজকের নানাবিধ ঘটনা সম্পর্কে বলছে।

তারক দাঁড়িয়ে পড়ল। বছর কুড়ি-বাইশের একটি ছেলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তাই থেকে তারক বুঝল, আজ সারা কলকাতা বিপ্লবের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছে। পথে পথে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করতে ব্যারিকেড রচিত হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে কলকাতার রাস্তা। এখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তারক হঠাৎ দেখল নারান গলির মধ্য দিয়ে আসছে। সঙ্গে আর একজন। তখুনি উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করবে কি না ভাবতে ভাবতে শুনতে পেল—"আরে তারকদা! কাল যে আপনার খোঁজে বাড়িতে গেছলাম।"

যাক, আজ তো যায়নি! তারক প্রাথমিকভাবে স্বস্তি অনুভব করল এবং মুখখানি অমায়িক করে বলল, "তাই নাকি! যা ব্যাপার কাল থেকে শুরু হয়েছে, কখন গেছলে?"

"সন্ধে নাগাদ। আপনার বাবা বললেন এখনও ফেরেনি।"

"হ্যাঁ, কাল একটা শোকসভায় যেতে হয়েছিল। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কলেজে একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়েছি, নিশ্চয় নাম শুনেছ পরিমল ভট্টাচার্য, কবি ছিল।"

"পরিমল! আপনার বন্ধু ছিলেন পরিমল ভট্টাচার্য?"

তারক দেখল নারানের চোখে শ্রদ্ধা বিস্ময় ইত্যাদি উথলে উঠেছে। সেটা পরিমল না তারকের উদ্দেশে বুঝতে পারল না সে। তবে বুঝল, নারানের কাছে তার দাম বেড়ে গেল। এতদিনে পরিমল এই উপকারটুকু তার করল। আর একটা ব্যাপার সে লক্ষ করল, নারান প্রথমে শুধু পরিমল বলল। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলা হয়। যদি সে ব্র্যাডম্যান হত তা হলে নারান বলত—তারক!

তা হলে অত্যন্ত বিশ্রী শোনাবে। নিজের নামটা কোনওদিনই তারক পছন্দ করেনি। কয়েক বছর আগে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত টি. সিন্‌হা। 'টি'-কে চাপ দিয়ে আধসেকেন্ড প্রায় ধরে রেখে 'সিন্‌হা'-টা ফলো-থ্রুর মতো পিছনে টেনে আনত। কিন্তু এখন দেখছে কেউই সিংহ বলে না, বলে সিঙ্গি আর তারককে দুমড়ে মুচড়ে, তার্কা। কিন্তু ব্র্যাডম্যানের মতো হলে? অন্তত পরিমলের মতো হলেও—

"আমার খুব প্রিয় কবি ছিলেন। ওনার অটোগ্রাফ আমার কাছে আছে।" নারান হাতদুটো পিছনে রেখে পদস্থ অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে যেন কথা বলছে। এটা ভাল লাগলেও তারকের মনে হল পরিমলের জন্যই নারান এ-সব করছে।

"তুমি কি পদ্য লেখো নাকি?"

'এই সামান্য এক আধটা'—বলতে বলতে নারান লাজুক হয়ে গেল।

"তোমার ইংরেজি পেপারে ফেল হওয়ার ব্যাপারটা আবার ওরা তুলছে! বলছে, এত কম নম্বর পেলে তাকে কী করে অন্যদের টপকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা যায়।"

তারক যা চেয়েছিল তাই হল। নারানের চোখ এবং দেহভঙ্গি থেকে পরিমলের জন্য ভক্তি শ্রদ্ধা সমীহ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ল। হাতদুটো পিছন থেকে সামনে এল। কচলাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মন্থর গতিতে তারক এগোল। নারান পিছু নিল।

"ওটা ম্যানেজ করা যায় না তারকদা?" নারান নিচুস্বরে বলল যাতে ওর সঙ্গী শুনতে না পায়।

তারক ভাবল, আগাগোড়াই তো মিথ্যের ওপর দিয়ে চালাচ্ছি। মন্দ পাওনা হচ্ছে না। কিন্তু এটা তো এখন আমার সমস্যা নয়। আমাকে এখন দেখতে হবে সলিল কী করল।

'সেই চেষ্টাই তো ক'দিন ধরে করছি। কাল ওই শোকসভায় না যেতে হলে, অনেকদূর এগোতে

পারতুম। একজনকে ধরার চান্স কাল পেয়েছিলুম।" ঘাড় ফিবিয়ে তারক দেখল নারানের মুখের ভাব কেমন হল। "তবে জানো, পরিমলেব মধ্যে বরাবরই দেখেছি এক ধরনের বিদ্রোহী কৌতুক ছিল, তাই না? ওব পদ্যেব মধ্যে দিয়ে নাবান তুমি নিশ্চয় লক্ষ করেছ, একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ছবি ফুটে ওঠে।"

"আপনি কি আর একবার চেষ্টা করবেন তারকদা?" নারান যেন প্রাণপণে বিবক্তি চেপে বেখে বলল। তারক ভাবল, আব ওকে নিয়ে খেলা ঠিক হবে না। তা হলে হয়তো বিদ্রোহী হয়ে পরিমলেরই আনুগত্য করে ফেলবে। সলিলের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে দেখে তারক দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আমি কালই আবার লোকটাকে ধরব। চেষ্টা আমি করে যাবই। আফটার অল আই অ্যাম এ ক্রিকেটাব।" তাবক ভরসা দিতে নারানের কাঁধে দুটো চাপড়ও মারল। নারান বোকার মতো হাসল।

"এই বাড়িতে আমাদের অফিসেব একটি ছেলে থাকে তার খোঁজেই এসেছি।" তাবক কণ্ঠস্বরের দ্বাবা বোঝাবাব চেষ্টা করল এইবার আমাকে রেহাই দাও। যে-কাজে তুমি যাচ্ছিলে, যাও।

"কী নাম বলুন তো?" নারানের সঙ্গী এতক্ষণে মুখ খুলল।

"সলিল গুহ।"

"আবে! সলিলদাকে তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আফিম খেয়েছেন দুপুবে।"

তাবক কিছুক্ষণের জন্য ঝাপসা দেখল মুখটা। কিছুক্ষণ নিজেব হৃৎপিণ্ডের শব্দ ছাড়া আর কিছু তার কানে ঢুকল না। কিছুক্ষণ ধরে তার মনে হল, মাথা নিচু করে তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে বাখা হয়েছে। অবশেষে এই রকম অবস্থা থেকে সামলে উঠে কোনওক্রমে তারক বলল, "কেন?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। আমি ওদেব পিছনের বাড়িতেই থাকি।" নাবানেব সঙ্গী। ও সলিলেব প্রতিবেশী ভারিক্কি চালে বলল। "আজ সকালে ওদের বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছিল খুব।"

ওকে থামিয়ে তাবক বলে উঠল, "ক'টাব সময়?"

"দশটা-সাড়ে দশটা হবে। একজন বুড়ো মতন লোক সঙ্গে একজন মেয়েছেলেকে এনে ঝগড়া কবছিল।"

তাবক আবাব থামাল, "মেয়েছেলেটা বিবাহিতা না অবিবাহিতা?"

"সেটা লক্ষ কবিনি। তবে বোধহয় ঘোমটা ছিল।"

"কী রঙের শাড়ি পরেছিল?"

"বোধহয় খয়েরি।"

"কী কবে ঝগড়া হচ্ছিল?"

"ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে আমাদের ঝি বলছিল, ওদের বাড়িতে অনিতা নামে একটা মেয়ে আসত, তাকে নিয়েই নাকি গণ্ডগোল। বুড়ো লোকটা জানতে চাইছিল, সলিলদাব সঙ্গে অনিতাব বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে কি না। সলিলদা নাকি বলে, ও-সব বাজে কথা। তখন বুড়োটা বলে, বাজে কথাই যদি হয় তা হলে মেয়েটা বলছে কেন ওর পেটে বাচ্চা রয়েছে তোমার? সলিলদা বলে, মিথ্যে কথা। বাচ্চা থাকতে পাবে কিন্তু আমার নয়, অন্য কোনও লোকের। অনিতা নাকি আরও অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত। ওদেব আপিসের একজন, কী একটা নাম বলল যেন সলিলদা, তরুণ না তারা, তার সঙ্গেও নাকি অনিতাব ব্যাপাব-স্যাপার আছে।"

"তারপর?"

"তারপর সলিলদার বাবা-মা ওদের বার করে দেয় বাড়ি থেকে। বুড়োটা যাবার সময় নাকি শাসিয়েছে অনিতাকে নিয়ে এসে পাড়ায় সকলের সামনে ওর মুখ দিয়ে বলাবে ওই বাচ্চা কার।"

"অনিতাকে নিয়ে এসেছিল কি তারপর?"

নারানের সঙ্গী উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। সলিলদের বাড়ি থেকে এক প্রৌঢ় বেরোচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে নারানের সঙ্গী বলল, "জ্যাঠামশাই সলিলদার খবর পেলেন?"

"পটল এইমাত্র হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলল, ডেঞ্জার পার হয়ে গেছে আর ভয়ের কিছু নেই। আধঘণ্টা দেরি করে হাসপাতালে আনলে নাকি কোনও আশা থাকত না।"

"সলিলদার খোঁজ নিতে এই ভদ্রলোক এসেছেন।"

তারকের দিকে হাত তুলে দেখাল নারানের সঙ্গী। এই সময় বড় রাস্তার দিকে চাঞ্চল্য দেখা দিল। গলির মুখ থেকে কিছু লোক ত্রস্তে ভিতরে ঢুকে আসছে। পর পর সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হচ্ছে। চিৎকার করে বারান্দা থেকে ছেলেকে ডাকাডাকি করছে এক স্ত্রীলোক। কোনও এক বাড়ির ছাদ থেকে কেউ গম্ভীর গলায় কার প্রশ্নের উত্তরে বলল, "বোধহয় মানিকতলার দিকে আগুন দিয়েছে।"

"আমি আর সলিল একই অফিসে কাজ করি। আজ অফিস যায়নি, তাই ভাবলুম ফেরার পথে একবার খোঁজ নিই।" তারক এগিয়ে এসে বলল। প্রৌঢ়কে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে। ইনিই যে সলিলের বাবা সেটা বুঝতে তারককে মাথা ঘামাতে হল না।

"দেখুন তো সলিলকে বিপদে ফেলার জন্য কী জঘন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আচ্ছা আপনাদের অফিসে তারক বলে কেউ আছে কি?"

তারক সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেল গলা পর্যন্ত। শুধু আড়চোখে দেখল নারানের চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল। আপনা থেকেই ওর মুখ দিয়ে বেরোল, "কেন বলুন তো?"

"সেই লোকটাই এর মূলে। আপনি চেনেন কি এই তারক সিংহকে?"

"নাঃ। বোধহয় অ্যাকাউন্টস কি ব্রাঞ্চ সেকশনে কাজ করে। তিন-চারশো লোকের অফিস তো।" তারক অবিচলিত স্বরে বলল এবং লক্ষ করল নারানের চোখ বিস্ফারিত হয়েছে।

"আপনার নাম?"

"হিরণ্ময়," এক মুহূর্ত থমকে তারক যোগ করল, "মান্না।" বলেই সে ঘুরে দাঁড়াল। দুড়দাড় করে লোকেরা ছুটে আসছে গলির মধ্যে। ট্রাকের ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেশ দূরে দুটো মাঝারি ধরনের পটকা ফাটার শব্দ হল।

"জানেন হিরণ্ময়বাবু, ওই তারক সিংহের জন্য আজ আমার ছেলে মরতে বসেছে। জানেন, এই লোকটা একটা আইবুড়ো মেয়েকে ফাঁসিয়ে আমার ছেলের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। তার বাবা-বউ আজ এসে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছে। আর খোকা লজ্জায় অপমানে—" ফুঁপিয়ে উঠল প্রৌঢ়।

"পালান, পালান, পুলিশ ঢুকছে। হাতে রাইফেল।" বলতে বলতে কয়েকটি যুবক ছুটে আসছে।

ভীত স্বরে নারান বলল, "তারকদা আর দাঁড়াবেন না।"

"জানলেন হিরণ্ময়বাবু—"

"তারকদা বিপদ হবে, এবার পালান।"

"ওই তারক সিংহকে আমি দেখে নেব। আপনাদের অফিসে কালই যাব। সবাইকে খুলে বলব। আর—"

তখন ছুটতে শুরু করেছে তারক। গলির ভিতরের দিকে নয় বড় রাস্তার দিকে। রাস্তার আলো নেভানো। মোড়ে পৌঁছে দেখল অন্ধকার খাঁ খাঁ করছে। এবার কী করবে? তারক অসহায়ের মতো সামনে পিছনে তাকাল এবং এবার ইনজেকশন নিতে হবে, মনে পড়ে যাওয়ায় তখনই আশ্বস্ত হল। একটা উদ্দেশ্য আপাতত পেয়ে মন দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সে হাঁটতে শুরু করল।

দশ

রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে। দু'ধারের বাড়িগুলোয় কোনও প্রকার ব্যস্ততা নেই। রাস্তাটা হাত পঁচিশেক চওড়া। তার দু'পাশে ঘাসের পাড়। তারক দাঁড়িয়ে থেকে একবার দূরে ব্রিজটা দেখে কাছের টালা ট্যাঙ্কের দিকে চোখ তুলল। ব্রিজটা অন্ধকার। রেল ইয়ার্ডের ওধারের বাড়িগুলোর আলো দেখা যাচ্ছে। ইয়ার্ডের দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া। শুকনো গোবরের গন্ধ ছাড়া আর কিছু নাকে লাগছে না। রাতের এই সময় রোজই এই রকম নির্জন থাকে রাস্তাটা। মাঝে মধ্যে প্রাইভেট মোটর যায়। ছোটবেলায় টালা পার্কে ক্রিকেট খেলতে আসার জন্য এই রাস্তা তারক ব্যবহার করত। এখানে তখন ছিল মিলিটারিদের আস্তানা। পরে হয় আর্মড পুলিশদের। তখন টালা ব্রিজে ফুটপাথ ছিল দেড় হাত।

তারক পায়চারির ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল। এইভাবে এখন কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা

নিরাপদ নয়। ঘড়িতে দেখল আটটা বেজে দশ। বহুদূরে শব্দ হচ্ছে। কোনটা রাইফেলের কোনটা বোমার, তারক পার্থক্য করতে পারল না। বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। কে যেন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী কি? ইনজেকশন নেওয়া হয়নি এখনও তার। একটাও ডাক্তারখানা খোলা পায়নি। স্ত্রীলোকটি বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখছে রাস্তাটা। তারকের মনে হল বোধ হয় গৌরী নয়। যদিও বেশ কয়েক বছর সে গৌরীকে দেখেনি, তা হলেও এর মধ্যে নিশ্চয় এত মোটা হয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু ডাক্তারখানা খুঁজতে খুঁজতে গৌরীর বাড়ির সামনে এসে পায়চারি করছি কেন? সমস্যা তো ইনজেকশন নেওয়ার! গৌরী মোটা হয়েছে কি হয়নি, সেটা জানার জন্যই প্রাণ হাতে করে কি এখানে এসেছি? তারক এইসব চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়ে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। এবং প্রাণপণে সিদ্ধান্ত নিল। গৌরী নয়, ইনজেকশন নেওয়াটাই জরুরি। কিন্তু পরিস্থিতি বাদ সেধেছে। এইসব ঝামেলা ঠিক এই দিনেই বাধাবার কী দরকার ছিল? তারক নিজেকে ছেড়ে তার চোখের সামনে যা-কিছু পড়েছে, সেগুলিব উপরই বিরক্ত হতে শুরু করল। তার মনে হল, লক্ষ লক্ষের সমস্যার যোগফল এই হাঙ্গামা, এর মধ্যে আমার কোনওই অবদান নেই বা এইসব বোমা গুলি আগুন টিয়ারগ্যাস দিয়ে আমাব সমস্যাব সমাধান হবে না। সুতরাং আমি যখন লক্ষ লক্ষের সমস্যার সঙ্গে জড়িত নই বা জড়াবার প্রয়োজন হচ্ছে না, তখন আমায় রেহাই দেওয়া হোক। এখন আমার দরকার পাঁচ লক্ষের একটা পেনিসিলিন ইনজেকশন। না হলে কোর্সের মধ্যে ছেদ পড়বে। তা হলেই কেঁচে গণ্ডূষ।

কিন্তু কাকে বলব আমায় রেহাই দেওয়ার জন্য? তারক ঘুঁটে লাগানো দেয়ালেব পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, লক্ষ লক্ষের জীবন-যাপনের সঙ্গে জড়িত এই বিপ্লবেব এবং রক্তপাতের বিরুদ্ধে আমাব একার সমস্যাটাকে কোনওমতেই দাঁড় করানো যায় না। ভাবতেই কেমন হাসি পাচ্ছে। যদি পালাবাব কোনও উপায় বার করা যায়। হিরণ্ময়, বঙ্কুবিহাবী, প্রণব, রেণু, নারান, সলিল প্রভৃতি এদের সবাইযের কাছে যদি যথাযথ থাকতে পাবি! ওরা যে-ভাবে আমায় দেখতে চায়, সেইভাবেই যদি দ্বাদশ ব্যক্তি হয়ে আজীবন ফিল্ডিং খেটে যাই তা হলে আমার, শুধুই আমার, বলতে কোনও সমস্যাই আব থাকবে না। তা হলে হয়তো মুক্তি পাব। তখন নিশ্চয় বলতে পারব—সইতে পারি, সব সইতে পারি। কিন্তু আমাব দ্বারা চমৎকার একটা দ্বাদশ ব্যক্তি হওয়াও বোধহয় সম্ভব হবে না। ঠিকই ক্যাচ ফেলব, দু'পায়েব মধ্য দিয়ে ঠিকই বল গলে যাবে। জেতা ম্যাচ হারব আমাবই জন্য। আর গ্যালারিতে বসা লোকেরা গালাগাল দেবে—বেরিয়ে যা ব্যাটা, বেরিয়ে যা। উত্তেজিত মুখগুলোয়, স্লোগান দিতে থাকা বিমল মান্নাব মতো গ্যাঁজলা উঠবে। ক্রুদ্ধ হাতগুলো, প্যাভেলিয়ানের দবজা দেখাবে বঙ্কুবিহারীর মতো। আর আমি তখন ভাবব, বোলাবকে থামিয়ে কেন দেখে নিলাম না পিচের ওপর কোনও কাঁকর রয়েছে কি না।

থমকে দাঁড়াল তারক। তিন গজ দূরেই, সদর দরজার লাগোয়া দেয়ালে ওই কাঠের তক্তায় কী লেখা? নামের পরে, ডি-ফিল, এল এল বি, না এম বি বি এস? তারক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। দু'পা এগোলেই সাদা অক্ষরগুলো দৃষ্টির সীমানায় এসে যাবে কিন্তু তারক এগোতে পারছে না। পা দুটো জমিতে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা মনে হচ্ছে তার। ছমছম করছে বুক। যদি ডাক্তারের নামই লেখা হয়। ওদের কাছে কি পেনিসিলিন থাকে? স্যাম্পল দেয় না কি পেনিসিলিন কোম্পানিরা?

"কে? কাকে চাই?"

তারক চমকে ওপরে তাকাল। বারান্দা থেকে একটা ভারী জবরদস্ত মুখ ঝুঁকে দেখছে। তারকের স্বরনালী থেকে আলতো হয়ে বেরিয়ে এল, "ডাক্তারবাবু আছেন?"

"কী দরকার? এখন কোথাও যেতে টেতে পারব না।"

"আজ্ঞে, কোথাও নিয়ে যাবার জন্য আসিনি।" তারক মুখ তুলে গলা চড়িয়ে বিনীত কণ্ঠে বলল, "একবার নীচে আসবেন?"

"কেন?"

"একটা ইনজেকশন নেব। পেনিসিলিন।"

"সঙ্গে এনেছেন?"

"না।"

"তবে?"

"আপনার কাছে পাওয়া যায় না?"

"না।"

তারক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওপর থেকে ফেলে দেওয়া স্বরধারা হুবহু গগন বসুমল্লিকের মতো। শোনামাত্রই তারকের ভিতরটা কাঁচুমাচু হয়ে গেছে। একবার গোপালকে ডাকতে গিয়ে এইরকমভাবে তাকে কথা বলতে হয়েছিল। দোতলা থেকে গগন বসুমল্লিক বলেছিল, "কী দরকার এখন?" তারপর, "এখন ওর পড়ার সময়। এখন খেলতে যাবে না।" তখন তিনতলার ছাদের পাঁচিলের কিনার থেকে গৌরী হাত নেড়ে একটা চিঠি দেখাচ্ছিল দেবার জন্য। কিন্তু তারক লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। গৌরীর চিঠি তো সে নিলই না, নিজের লেখা চিঠিটাও পকেটে নিয়ে ফিরে আসে। তারপর দিন চার পাঁচ ওমুখো আর হয়নি।

দূর থেকে মোটরের হেডলাইটের আলো আসছে। তারকের মনে হল, এ-ভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটা উচিত। যদিও এখানে হাঙ্গামা হচ্ছে না এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার মতো জনতাও ত্রিসীমানায় নেই। তবু এই নির্জনতা, ছিনতাইকারীর এবং উত্তেজিত প্রেমিক যুগলের অনুকূল চতুষ্পার্শ্বের অন্ধকার, একক লোকের পক্ষে নিরাপদ বোধ হচ্ছে না। তারক হাঁটতে শুরু করল এবং একটি মোটর পিছন থেকে তাকে অতিক্রম করে ধীরে চলে গেল। তখন সে একপলক তাকিয়ে দেখতে পায়, ড্রাইভার আসনে বসা পুরুষটির কাঁধে মাথা রেখে একটি স্ত্রীলোক। এতে সে অন্যদিনের মতো আমোদ পেল না, বরং একটু অবাক হল। এমন সময়েও এরা বেরিয়েছে! নিশ্চয় অহীনের মতো কোনও উল্লুক। এরপর তার মনে হল, এবার আমি কি বাড়ি ফিরব?

গৌরী দোতলার বারান্দায় আবার এসে দাঁড়িয়েছে। তারক মন্থর হতে হতে বারান্দার তলায়ই দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে ঝুঁকে দেখছে। তারক মুখ তুলে তাকাল এবং অবিলম্বেই জেনে গেল গৌরীই। তারক পরিচিতের ভঙ্গিতে হাসল। হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে গৌরী বারান্দা থেকে সরে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদর দরজা খুলে গৌরী বলল, "একটু আগে দেখলাম তুমি পায়চারি করছিলে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তুমিই না অন্য কেউ।"

"এদিকেই এসেছিলাম ডাক্তারের কাছে। বাড়ি নেই, তাই ভাবলাম ঘরে বসে কেন আর অপেক্ষা করি। তোমরা এখানেই থাকো সেটা নারানের কাছে শুনেছিলাম। ও প্রায়ই আমার কাছে আসে চাকরির জন্য।"

"ভেতরে এসে বসো। উনি সেই সকালে বেরিয়েছেন। চারদিকে যা শুরু হয়েছে, ভেবে মরছি বিকেল থেকে।"

গৌরীর সঙ্গে বৈঠকখানায় এল তারক। ছিপছিপে গৌরী স্থূল শ্লথ হয়েছে। কণ্ঠস্বর চালে ভারিক্কি। গায়ের রং একটু ফ্যাকাশে, পরনে গৃহিণী সুলভ তাঁতের সাদা শাড়ি। হাতে কানে নাকে গলায় কিছু সোনার গহনা। অবয়বে অলস সচ্ছলতা। তারক কিঞ্চিৎ দমে গেল।

"অনেকদিন পর দেখা হল' বাড়ির সবাই কেমন, ক'টি ছেলেপুলে?" গৌরী একটি সোফায় তারকের মুখোমুখি বসে বলল।

"ভালই আছে। ছেলে এখন দুটি। তোমার ক'টি?"

"তিনটি। দুই ছেলে এক মেয়ে। কালকেই ওরা পিসির বাড়ি বেড়াতে গেছে। কথা ছিল উনি আজকে ওদের নিয়ে আসবেন। কিন্তু ওরা এখনও যে কেন আসছে না। ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেছি।"

"পিসির বাড়িতে ফোন করে দ্যাখো না, ফোন নেই তোমাদের?"

"আমার আছে কিন্তু ননদের নেই। ওরা বাড়ি করে এই সেদিন যাদবপুরে উঠে গেছে, এখনও ফোন পায়নি।"

তারকের মনে হল, কথা বলতে বলতে গৌরী তাকে যেন খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করছে। তারক আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ভাবল, কী দেখছে? আকৃতি, পোশাক না মানসিকতা? চেহারা, যতদূর মনে হয়, এই বয়সে যেমন হওয়া উচিত—পাতলা চুল, কোমরে ও তলপেটে চর্বি, দাঁতে পানের ছোপ, গলায় ও ঘাড়ে চর্বির

দাগ, প্রভৃতি দ্বারা বয়সোচিত। তবে দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি। মনে হওয়া মাত্র তারক তালু দিয়ে গাল ঘষল এবং ভাবল, তবে শার্ট এবং প্যান্ট যথেষ্ট ময়লাই। ঘরের এইসব আসবাব অর্থাৎ সোফা, দেয়ালে টাঙানো কয়েকটি নিসর্গ চিত্র, দুটি আলমারিতে কিছু মাটির ও পিতলের পুতুল এবং ঝকঝকে ভাস উজ্জ্বল সাদা দেয়াল, বিচিত্র নকশার পর্দা ও কার্পেট এবং এ-সবের সঙ্গে মানানসই একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবস্থান তার পক্ষে কিছুটা অপ্রতিভকর মনে হচ্ছে।

"আজকাল নতুন টেলিফোন পাওয়া খুব শক্ত। আমি চার বছর আগে অ্যাপ্লাই করেছি, এখনও পাইনি।" বলেই তারকের মনে হল, এইসব বলার জন্যই কি এতদিন পরে আমি এখানে এসেছি।

"তুমি কিন্তু একই রকম রয়েছ অথচ আমি কত মোটা হয়ে গেছি।"

"কই!" তারক অবাক হবার চেষ্টা করে বলল, "একই রকম তো রয়েছ, বরং আমিই তো মোটা হয়েছি।" বলার পর স্পষ্টই বুঝল, গৌরী বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ওর মুখের ওপর আরামের আস্তরণ পড়ল। তবে কি এই দেখার জন্যই এতদিন পরে এলাম!

"ডাক্তারের কাছে এসেছিলে বললে, কী হয়েছে?"

"অসুখ।" বলেই কথা ঘুরিয়ে তারক জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বোধ হয় অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওনি।"

"যাই, বিজয়ায় মাকে প্রণাম করতে। তা ছাড়া আর সময় কোথায়? তোমার বউ বছরে ক'বার বাপের বাড়ি যায় বলো তো? তা-ও তো আমার পাঁচ বছর পর তোমার বিয়ে হয়েছে। তোমার ছেলেরাও নিশ্চয় স্কুলে যায় না।"

"এইবার ভরতি করব। আমাদের ওদিকে একটা ভাল স্কুলও নেই। যে দু'-একটা আছে, তাতে এমন ভিড়, চেনাশোনা না থাকলে ভরতি করানোই যায় না। তোমার জানাশোনা কেউ আছে?"

"ওনার থাকতে পারে। কিন্তু দ্যাখো তো, আমি এখন কী করি! ছেলেমেয়েদের নিয়ে কখন যে আসার কথা, ক'টা বাজল?"

হাতঘড়ি দেখে পনেরো মিনিট কমিয়ে তারক সময় বলল।

"এখন ওদের শুয়ে পড়ার সময়। আচ্ছা, খুব হাঙ্গামা হচ্ছে কি? চাকরটা বলল, "শ্যামবাজারের দিকে নাকি খুব গুলি চলেছে। ওখান দিয়েই তো ওদের আসতে হবে। কী যে করব এখন ভেবে পাচ্ছি না। ওরা তো গাড়িটাড়ি পুড়িয়ে দেয়?"

"লাল ক্রশ চিহ্ন থাকলে ছেড়ে দেয়। ডাক্তারদের কিছু বলে না।"

"উনি তো ডাক্তার নন, তা ছাড়া মুখে যদি গন্ধটন্ধ পায় তা হলে তো মারধরও করতে পারে। কতবার বারণ করেছি তবু একদিনও কথা শোনে না।" অধৈর্য হয়ে গৌরী উঠে দাঁড়াল। রাস্তার জানালার পর্দা তুলে এধার ওধার তাকিয়ে ফিরে এসে আর সোফায় বসল না। "চা খাবে, কিংবা কফি?"

"নাহ্। সকাল থেকে অনেক খেয়েছি।"

হঠাৎ ঘর থেকে গৌরী বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা না ফেরায় উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত। অথচ আমি। তারক ভাবল, বাবা-বউয়ের সামনে আজীবন আমাকে দাঁড়াতে হবে। সলিল গুহের বাবা অফিসে গিয়ে সে-সব কথা বলে আসবে, তার সামনে আরও কুড়ি বছর বসতে হবে। রোগ সারাতে ইনজেকশন নিতে হবে। অথচ আমি এইসব ভাবনা মাথায় নিয়ে, এখানে বসে গৌরীর সঙ্গে সদ্য পরিচিত প্রতিবেশীর মতো আলাপ করছি। এখন বোধহয় আমরা অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করতে পারি—আজ কী রান্না হল? বা তোমরা কি এবার বড়ি দিয়েছ? অথচ বছর বারো আগে একেই আমি ভীষণ ভালবাসতাম!

অথচ, তারক সোফায় হেলান দিয়ে দেয়ালে ঝোলা একটি বাগানের নিসর্গ চিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবল, গৌরী আমার সঙ্গে পালাতে রাজি ছিল। যদি সেদিন পালাতাম দু'জনে। এতবছর পর তা হলে এই ঢঙেই আমাদের কথাবার্তা হত কি? প্রেম তো ওই ছবিটার ফুল গাছগুলোর মতো, প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জন শুধুই মালি! তাদের কাজ তো গাছকে জিইয়ে রাখা। যত ভাল সার জল রোদ হাওয়া দিয়ে পরিচর্যা হবে তত ভাল ফুল ফুটবে। সে-জন্যই কি প্রেমের কাণ্ড-কারখানায় ফুল দেখানো হয়, পাশে রাখা হয়, বিনিময় করে হুঁশ করিয়ে দেওয়া হয়? কিন্তু কী সার, কী জল দিতে হবে রেণু তা জানে না।

আমার মানসিকতা অনুযায়ী রেণু রোদ হাওয়া খেলাতে পারে না। কিন্তু গৌরীই কি পারত? শুধুই আবেগ আর শরীর আর রূপ দিয়ে কি প্রেম টিকে থাকতে পারে?

গৌরী অবসন্নের মতো ঘরে ঢুকল। মুখে উদ্বেগ। সোফায় বসে হতাশ স্বরে বলল, 'মিস্টার ভাদুড়িকে ফোন করলাম। উনি প্রায়ই ছুটির পর তাস টাশ খেলতে ওর বাড়িতে যান, আজ যাননি। আশ্চর্য, তা হলে কোথায় গিয়ে কী যে কচ্ছেন।"

"কে মিস্টার ভাদুড়ি?" তারক প্রশ্নটি করে, তিন সেকেন্ড থেমে একই স্বরে, হেলান দেওয়া অবস্থাতেই বলল, "আমাদের আগের কথা মনে পড়ে গৌরী?"

ধাক্কা সামলে ওঠার পরই, গৌরীব মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অস্ফুটে বলল, "মনে পডার মতো কোনও কথা আছে নাকি?"

"তা অবশ্য নেই, তবু মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে। হয়তো আর বছর দশেক পর একদমই মনে পড়বে না। সংসার, অফিস, অসুখবিসুখ নিয়েই ব্যস্ত থাকব। একটা বয়স পর্যন্তই এ-সব মনে থাকে। কিন্তু তোমার মনে আছে কি না এটা জানতে ভীষণ কৌতূহল হয়।"

"কেন মনে থাকবে না। তবে এখন তুমি ওগুলো নিয়ে নতুন করে নিশ্চয় সম্পর্ক ঝালাতে চাইবে না।" গৌরীকে আবার উদ্বিগ্ন দেখাল।

তারক মাথা নাড়ল। "তার কোনও উপায়ই আব নেই। কিন্তু মুশকিল কী জানো, একটা কাঁকর আমাব মাথাব মধ্যে ঢুকে রয়েছে। সেটা অনবরত খচখচ করে।"

"কী করে ঢুকল? অ্যাকসিডেন্টে?" গৌবী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে পিছনে মাথা হেলিয়ে তারক বলল, "আমি জানি না কী করে ঢুকল। জেনে এখন কোনও লাভও নেই।"

"কিন্তু একটা কাঁকর মাথায় নিয়ে কি মানুষ বাঁচতে পাবে? তুমি অপারেশন করাও।"

"কত লোকই তো এ-ভাবে বেঁচে রয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক!"

"বাজে কথা রাখো। কাঁকর লক্ষ লক্ষ লোকের মাথায় ঢোকে না। এগুলো অদ্ভুত ঘটনা, দু'-একটাই ঘটে।"

"তোমাব মাথাতেও আছে, গৌরী, কিন্তু তুমি তা জানো না।"

"তা হলে ঠাট্টা হচ্ছিল এতক্ষণ। ব্যাপার কী, ডাক্তারের কাছে এসেছিলে বললে না?"

তারক জবাব দিতে যাচ্ছিল, একটি আধবুড়ো লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। লোকটি গৌরীকে বলল, "বাবু ফোনে আপনাকে ডাকছেন।"

শোনামাত্র হাঁসফাঁস করে উঠে প্রায় ছুটে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাবক ভাবল, আমি কী সৌভাগ্যবান, এই মেয়েমানুষটিকে বিয়ে করতে হয়নি! এবার আমি চলে যেতে পারি এখান থেকে। গৌরী এখন চমৎকার ফিল্ডিং দিচ্ছে। হাততালি পাবার জন্য ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমারও উদ্বিগ্ন হবার মতো অনেক ব্যাপার রয়েছে অথচ বহুক্ষণ ধরেই তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আশ্চর্য!

গৌরী ফিরে এল মুখে হাসি নিয়ে। "ছেলেমেয়েদের আজ আর আনছে না। কলকাতা জুড়ে দারুণ গোলমাল চলছে। বাব্বাঃ, যা চিন্তায় পড়েছিলাম।"

"তোমার স্বামী আজ ফিরবেন তো?"

"না। এই হাঙ্গামার মধ্যে গাড়ি নিয়ে কেউ আসতে পারে নাকি? কোথাও রয়ে যাবে। রাত কাটাবার অনেক জায়গাই ওর আছে।"

গৌরীর মুচকি হাসিটা তারক লক্ষ করল। তার মনে হল যেন সামান্য অভাববোধ গৌরীর মধ্যে রয়েছে, যে-জন্য ও নিশ্চিন্তে ফিল্ডিং দিতে পারে না। অবশ্য এক সময় আর বুঝতেই পারবে না যে ওর কিছু নিজস্ব চাহিদা আছে। তখন ষোলো আনা সুখী বোধ করতে ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

"এই গোলমালের মধ্যে তুমি বাড়ি যাবে কী করে?" গৌরী আবার উদ্বিগ্ন হল।

"ভাবছি তোমার এখানেই থেকে যাব।" হালকা চালে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে তারক বোঝাতে চাইল এটা মজা করার জন্যই বলা।

"কিন্তু চাকরটা রয়েছে যে?" সামনে ঝুঁকে চাপাস্বরে গৌরী বলল। "উনি কাল বাড়ি ফিরলে হয়তো কথাপ্রসঙ্গে ওকে বলে দিতে পারে।"

"কী বলবে!"

"তুমি এখানে রাতে ছিলে।"

"কিন্তু এ-রকম হাঙ্গামার মধ্যে কোনও লোক এসে পড়লে, রাতে তার থেকে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া, তোমার স্বামী তো জানেই না আমি কে। তা হলে অত ঘাবড়াবার কী আছে?"

"কিন্তু তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, বলব কী?"

তারক দেখল গৌরী আবার উদ্বিগ্ন হয়েছে। এবার সে আর মজা বোধ করল না। গম্ভীর হয়ে বলল, "এক সময় আমার প্রেমিক ছিল, এ-কথা নিশ্চয় বলতে পারবে না বা দাদার বন্ধু বললেও অনেক রকম সন্দেহ করতে পারে। তার থেকে বরং তুমিই বলো, আমাকে দেখে কী মনে হয় অর্থাৎ যা বললে তোমার চাকর পর্যন্ত অবিশ্বাস করবে না?"

"কিন্তু তুমি কি সত্যিই রাতে থাকবে!" গৌরী বিব্রত চোখ মুখ নিয়ে বলল এবং দ্রুত প্রশ্ন করল, "কেন?"

"আচ্ছা আমাকে প্রাইভেট টিউটর কিংবা বাজার সরকার বলে চালানো যায় কি?"

"কিন্তু তুমি এতদিন পরে, এই রকম একটা সময়ে হঠাৎ এলে কেন, মতলবটা কী?"

তারক এইবার গৌরীর চোখে সত্যিকারের ভয় দেখল। কাল ঠিক এই সময়েই অনিতার চোখেও সে এই রকম চাহনি দেখেছিল। তারকের মাথাটা মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল। কঠিন এবং তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, "আমি এখন একটা পাঁচ লাখের পেনিসিলিন চাই। আমার অসুখ হয়েছে।"

"কী চাই?"

গৌরী হতভম্ব হওয়ায় তারক আবার বলল, "পাঁচ লাখের একটা পেনিসিলিন পেলে আমি এখানে রাতে থাকব না।"

"কোথায় পাব আমি? কোনও সুস্থ লোকের কাছে কি শুধু শুধু পেনিসিলিন থাকে! সত্যিই তোমার মাথার মধ্যে কাঁকর ঢুকেছে।" আশ্বস্ত হয়ে গৌরী এবার হাসল। ওর মুখ থেকে উৎকণ্ঠার দাগগুলো মুছে গেছে। অল্প আমোদ ঝকমক করে উঠল চোখে। এমনকী প্রগাঢ় স্বরে সে বলেও ফেলল, "এখানেই আজ খেয়ে যাও বরং। মুরগি কিনেছিলাম সকালে।"

এই বলে গৌরী দরজার দিকে এগোতেই তারকও উঠে দাঁড়াল। তাইতে গৌরী ফিরে তাকাল এবং এক-পা এক-পা করে পিছু হটে দরজার ওধারে পৌঁছে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"মুরগি নয়, পেনিসিলিন চাই। নয়তো তোমার মাথাতেও কাঁকর ঢুকিয়ে দেব।" তারক শাসানি দেবার যাবতীয় চেষ্টা স্বরনালি এবং মুখভঙ্গিতে প্রয়োগ করল। গৌরী পিছনে তাকিয়ে খুঁজল চাকরটি কোথায়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধারে বড়ছেলের ক্রিকেট ব্যাটটি দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে সেটা হাতে নিল।

তারক ঘর থেকেই দেখল স্কোয়্যার-কাট করার ভঙ্গিতে গৌরী ব্যাটটা তুলে অপেক্ষা করছে। শ্রান্ত পদক্ষেপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গৌরী উঁচু করে ব্যাট তুলে চাপা গলায় হুঁশিয়ারি দিল—"এখনই বেরিয়ে যাও, নয়তো মাথা ফাটিয়ে দেব।"

ধীরে এগিয়ে এসে গৌরীর থেকে দু'হাত তফাতে দাঁড়িয়ে খুবই ক্লান্তস্বরে তারক বলল, "পাঁচ লাখের একটা পেনিসিলিন কি জোগাড় করে দিতে পারো না? তা হলে অসুখটা সারিয়ে ফেলতে পারি।"

ব্যাটটা তুলেই রয়েছে গৌরী। কিন্তু ওর চোখে স্পষ্টই বিভ্রান্তি। তারক হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে আলতো করে ব্যাটটা নিয়ে যত্ন ভরে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। "বলের ছাপগুলো দেখছি ঠিক মাঝখানেই।" অস্ফুটে এই বলে তারক আবার গৌরীর সামনে দাঁড়াল।

"আমার চিঠিগুলো কি রেখে দিয়েছ?" গৌরী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

"না। আমার বিয়ের দিনই পুড়িয়ে ফেলেছি।"

"ভালই করেছ," হাঁফ ছেড়ে স্থির হয়ে গেল গৌরী, "বউয়ের হাতে পড়লে তোমার সুখশান্তি চিরকালের মতো ঘুচে যেত। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী?"

"গৌরী তোমার মাথাতেও কাঁকর ঢুকেছে।"

"কথা ঘোরালে কী হবে, শুনেছি দারুণ দেখতে। একদিন নিয়ে এসো না।"

"কিন্তু তুমি এখন আমায় একটা পাঁচ লাখ পেনিসিলিন দেবে।"

"ফাজলামো বাখো। এইভাবে বললে সত্যি সত্যিই কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দেব বলছি।"

গৌরী হাসিহাসি মুখে চোখ পাকিয়ে মাথাটা ঈষৎ বাঁ দিকে হেলিয়ে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ব্যাটটার কাছে সরে গেল। হাত বাড়ালেই এখন সেটি তার মুঠোয় এসে যাবে।

"আমাকে কি সাহায্য করবে না গৌরী? এই হাঙ্গামার মধ্যেও তোমার কাছে এসেছি যখন, বুঝতেই পারছ তোমাকে কতখানি মনে রেখেছি! কিন্তু তুমি কি একদমই ভুলে গেলে?"

"ও-সব কথা কি কেউ চিরকাল মনে করে রাখে নাকি? নাহ্ তোমার মাথায় ঠিকই কাঁকর ঢুকেছে নয়তো পেনিসিলিন চাইতে শেষে আমার কাছে এলে?"

"একদমই মনে নেই? একটুখানিও?"

"না, সত্যিই মনে পড়ে না। প্রথম প্রথম দু'-চারদিন মনে পড়েছিল। তখন কিন্তু কষ্ট হত তোমার জন্য, একটু মিথ্যে বলছি না।"

"কিন্তু এখন যদি এমন কিছু করি যাতে তুমি আব আমায় জীবনে ভুলতে পারবে না, যদি আমার অসুখটা তোমার মধ্যে ঢুকিয়ে দি?"

"তাব মানে!" গৌরী অস্বাভাবিক চেঁচিয়ে উঠল এবং হাত বাড়িয়ে ব্যাটটা তুলে নিল। তারক ব্যাটটাব দিকে তাকিয়ে তখন মনে মনে আবাব বলল, ঠিক মাঝখান দিয়েই বলগুলো খেলেছে।

"আমার কী এমন দায় পডেছে যে তোমাব মতো একটা লোককে মনে করে রাখতে হবে? তোমার মতো লক্ষ লক্ষ লোক ঘুবে বেড়াচ্ছে এই শহবে। তোমার কী এমন পরিচয় আছে যে-জন্য তাদের থেকে আলাদা করে দেখব, মনে কবে বাখব? তুমি কে?" গৌরী ব্যাটটা দু'হাতে আঁকড়ে ধীরে ধীরে তুলল।

"আমি জানি, আমি কে।" এই বলে তখন তারক মাথাটা সামনে ঝোঁকাল এবং পতনবত বঙ্কুবিহারীর মতো হাসিতে ঠোঁট দুটি মুচড়ে ক্রমশ আরও ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু যা চেয়েছে ঘটল না। অক্ষত মাথাটা তুলে সে দেখতে পেল, গৌরী চর্বিভবা বস্তার মতো নিতম্ব দুটি টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে আব সিঁড়িব মাথায় একটি বেঁটে মোটা লাঠি হাতে চাকরটি নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে।

সদর দরজা পার হয়ে রাস্তায় পা দেওয়া মাত্র তারকের একবার ইচ্ছে হল গৌরীকে ডেকে বলতে, তোমার ছেলের হাতে খেলা আছে, ওকে উৎসাহিত কোরো। তারপর অনেক দূর এগিয়ে তারক একবার পিছু ফিবে তাকাল। রাস্তার মাঝখানে একটা লোক পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা লাঠি! শূন্য রান করে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসার মতো হাঁটতে হাঁটতে তারক টালা ব্রিজের দিকে চলল।

এগারো

টি. সিন্হা এইবার তুমি কী করবে, এখন তুমি কোথায় যাবে? নিজেকে এই প্রশ্ন করে তারক ব্রিজের ঠিক মাঝখানে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবার পিছনে তাকাল। টালার জলের ট্যাঙ্কটা গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে আকাশে খানিকটা গহ্বর সৃষ্টি করে রয়েছে। দূরের রাস্তা আলো টিমটিমে অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সামনে, গ্যালিফ স্ট্রিটের মোড়ের দিকে শুধুই অন্ধকার। একটু আগেই ওদিকে দপ করে সাদা আলো ঝলসে উঠে তিন-চারটি বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। ফটাস-ফটাস রাইফেলের শব্দও তাবক পেয়েছে। আর এগোবে কি না, সে বুঝে উঠতে পারছে না। এখন ওই অঞ্চলটি নিশ্চয় পুলিশের রাইফেলের আওতায়। ওইখান দিয়েই বাড়ি ফিরতে হবে এবং তখন টি. সিন্হার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটি রাস্তায় পড়ে যাওয়ার শতকরা আটানব্বই ভাগ সম্ভাবনা আছে।

তা হলে আমি কি সারারাত এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব? তারক মুখ ফিরিয়ে গৌরীর বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটার দিকে তাকাল। আলোগুলো দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটা জনশূন্য। টি. সিন্হা তুমি টেকনিক জানো

না। জানলে মুরগির মাংসে পাকস্থলী ভরিয়ে গৌরীর বাড়িতেই আজ নিরাপদে রাত কাটাতে পারতে। এমনকী গৌরীর বিছানাতে একশো রানও হাঁকাতে পারতে। কিন্তু তোমার মাথায় ছিল কাঁকরের চিন্তাটা। ভুল ব্যাট চালিয়ে এখন টালা ব্রিজের উপর ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে তুমি ভাবছ কেমন করে বাড়ি ফিরবে। তারক ভাবল, ব্র্যাডম্যান হলে কি গৌরী বার করে দিত?

"বল হরি, হরি বোল।"

আচমকা, ধীর গম্ভীর স্বরে, তারকের অদূরেই কারা ধ্বনি দিল। তারক সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধে গেল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত। ভয় এঁকেবেঁকে শিরদাঁড়ায় ওঠানামা করছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা সাদা ছায়া তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতেই তারক ইউক্যালিপটাসের গন্ধ পেল। শববাহকেরা তাকে দেখতে পায়নি। গন্ধটা হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিল মাকে। তারক পুরো একটা শিশি মার গায়ে ঢেলে দিয়েছিল। শ্মশানে যাবার সারা পথটায় এই গন্ধটা তার ভাল লেগেছিল। মা একবার বলেছিল, 'তোর খেলা একদিনও তো দেখলুম না।'

"বল হরি, হরি বোল।"

অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই ওদের ধীর গম্ভীর সমবেত কণ্ঠ বিষণ্ণ বিলাপধ্বনির মতো তারকের কানে আঘাত করল। অভিভূতের মতো সে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে গলে রাস্তায় নামল। এইবার? টি. সিন্‌হা এইবার তুমি কী করবে? ওরা চলে যাচ্ছে, অনুসরণ করবে? তা হলে দাঁড়িয়ে থেকো না। মৃতেরা অত্যন্ত সাহসী হয়। যদি ভয় পেয়ে থাকো তা হলে ওর সঙ্গ নাও। তারপর তারক ভাবল, কিন্তু আমি ভয় পাব কাকে বা কী জন্য। এগারোজনের মধ্যে আসার সব সুযোগই আজ হারিয়েছি। সকাল থেকে মিস-ফিল্ড করে গেছি শুধু। অনিতা, বঙ্কুবিহারী, রেণু, সলিল, গৌরী বহু রান তুলে নিয়েছে, ইনজেকশন নেওয়াও ফসকেছি। এখন আমার ভয় পাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু ইউক্যালিপটাসের গন্ধটা বড় ভাল।

তারকের মনে হল এগিয়ে গেলে গন্ধটা আবার সে ফিরে পাবে, তাই হাঁটতে শুরু করল। বহুদূরে পুলিশ অথবা মিলিটারি ট্রাকের হেডলাইটের আলো দু'ধারের বাড়িগুলোকে একবার অস্বচ্ছভাবে ফুটিয়ে তুলেই নিভে গেল। অনেকদূরে আকাশের কিছুটায় পাটকেল রং ধরেছে। সামনের দিক থেকে চাপা গোলমালের শব্দ আসছে। কিন্তু তারক কিছুতেই গন্ধটা আর পাচ্ছে না। ক্রমশ সে দিশেহারা এলোমেলো বোধ করতে শুরু করল। কোথায় গেল ওরা? হেডলাইটের আলো যতটুকু জ্বলেছিল তার মধ্যে সামনের রাস্তায় কোনও গতিশীল ঘনত্ব দৃষ্টিতে আসেনি।

টি. সিন্‌হা, তা হলে! যদি তখনই ওদের সঙ্গে নিতে, তা হলে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ অনুসরণ করে বিপজ্জনক এলাকাটি পার হয়ে যেতে পারতে। পুলিশ বা মিলিটারি নিশ্চয়, শবদেহ বা তার বাহকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবে না। কিন্তু টি. সিন্‌হা তখন তুমি ইতস্তত করলে কেন? মৃতের দেহে ছড়ানো এই গন্ধ কি তুমি কখনও পাওনি? তারক মাথা ঝুঁকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে নিজেকে বলল, অন্ধকারে ওদের 'হরি বোল' ধ্বনি আমায় অভিভূত করেছিল।

হেডলাইটের সন্ধানী আলো আবার জ্বলে উঠল। তারক থমকে দাঁড়িয়েই ছুটে গিয়ে একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে আশ্রয় নিল। চোখ তুলে বারান্দায় জানলায়, ছাদে আবছা আবছা মুখ দেখতে পেল। মাঠের মাঝখান থেকে গ্যালারিতে সারিবদ্ধ মুখের মতো দেখাচ্ছে। সেই মুহূর্তে পরপর দুটো বিস্ফোরণ ঘটল তার দু'শো গজ দূরে।

"এ্যাই, এ্যাই মশাই, পালান। এখানে দাঁড়িয়ে কী কচ্ছেন?" ওপর থেকে একজন চিৎকার করে উঠল। তারক মুখ তুলে কাতর স্বরে বলল, "কোথায়? প্যাভেলিয়নে!"

"আরে মশাই, আপনাকে দেখতে পেলে যে ওরা এদিকেই ছুটে আসবে, বাড়ি বাড়ি হামলা করবে! পাশের গলিটা দিয়ে পালান। হাতজোড় করে বলছি, পালান।" তারকের পিছনেই জানালার একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন বলল। তারক সেখান থেকে সরে যেতে যেতে হতাশস্বরে বলল, কিন্তু সেকেন্ড ইনিংস আমি আর পাব না।

ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ হল। তারক হাত তুলে তালুর রেখাগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে এখন। ট্রাকের চাকা ভাঙাচোরা রাস্তার আলোটাকে কাঁপাচ্ছে। কে একজন সামনের ছাদ থেকে বলল, "ইট মার ব্যাটাকে। মেরে ভাগা, নয়তো নড়বে না।"

তাবক থমকে দাঁড়াল। এইমাত্র ইটের একটা বড় খণ্ড তার সামনে পড়ে ভেঙে ছড়িয়ে গেছে। একটা টুকরো ছিটকে দেয়ালে লেগে তার ছুঁচলো কোণটি তুলে পায়েব কাছে স্থির হয়ে। সেই তীক্ষ্ণতার দিকে তাকিয়ে তারক কেঁপে উঠে বলল, টি. সিন্‌হা কোথাও তোমার রেহাই নেই। তা হলে অসুখ সারিয়ে কী লাভ!

তারপর তারক পাশেব অন্ধকার গলিতে ঢুকল। হাঁটতে হাঁটতে একসময় আলো জ্বলা একটা রাস্তায় পৌঁছল। তার দু'ধারের বাড়িগুলো জীর্ণ, হতশ্রী, দরিদ্র। কিন্তু রাস্তাটা নিরুদ্বিগ্ন, জনহীন, শব্দবিহীন। বোঝাই যায় না কিছুদূরেই ভয় দাপাদাপি করছে। মোড় ঘুরতেই টিউবওয়েল দেখে তারকের তৃষ্ণা পেল। প্রচুর জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে, রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখল, টিনের চাল দেওয়া একটি বাড়ির দবজায় তিনজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। তাদেব দিকে এগিয়ে গেল সে। তখন তাদের একজন সাদামাটা ভাবে বলল, "আসবে নাকি গো?"

তারক শোনামাত্র প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে নোটগুলো স্পর্শ করল। যা টাকা আছে তাতে তিন-চাব কোটিব পেনিসিলিন ইনজেকশন নেওয়া যায়। আশ্বস্ত হয়ে সে বলল, "নিশ্চয়। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে, আগে কিছু খেতে হবে। পাওয়া-টাওয়া যাবে তো?"

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান

এক

ঝকঝকে আকাশি-নীল স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডটা, আট হাত চওড়া জয়রাম মিত্র লেন আর কুড়ি হাত চওড়া তারক কবিরাজ স্ট্রিটের মোড়ে, তারক কবিরাজের বাড়ির সামনে অসীমকে লক্ষ করেই থেমে গেল। অসীম তখন ভাবছিল, এখুনি ত্রিশটা টাকা কোথা থেকে জোগাড় করা যায়। ড্রাইভার-আসন থেকে প্রশ্ন হল, "এটাই কি জয়রাম মিত্র লেন?"

অসীম দাঁড়িয়েছিল বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে, কোবরেজদের রকে বাঁ হাত রেখে শরীরটাকে হেলিয়ে, যাতে ডান পা ভারমুক্ত থাকে। ডান পায়ের হাঁটুতে গত বছর চোট পেয়েছিল নবদ্বীপে এক শিল্ডের ফাইনালে খেলতে গিয়ে। দিন পঁচিশ ভুগিয়েছিল হাঁটুটা। তারপর একটু ভয়ে ভয়েই খেলত। মাঝে মাঝেই খচখচ করে ওঠে ব্যথাটা। লাফিয়ে ট্রামে উঠতে গিয়ে কি স্লাইডিং ট্যাকল করতে গিয়ে অসীম বুঝেছে চিকিৎসা করানো দরকার। ডাক্তার দেখিয়েছিল। এক্স-রে করানোর পরামর্শ নিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরে। করাব করাব মনে রেখে প্রায় একটা বছর তারপর কেটে গেছে।

গতকাল তারকেশ্বরের মাইল ছয়েক দূরে এক গ্রামে ফোর্থ রাউন্ড খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছে আবার ডান হাঁটুতে। রাইট-ইনটা প্রথম থেকেই পা চালিয়ে খেলছিল। হাফ-টাইমের আগেই অসীমের লেফট হাফকে মাঠ থেকে বার করে দিল মুখ ফাটিয়ে। অসীম রাইট-ইনের কাছে গিয়ে বলেছিল, "এটা কী খেলা হচ্ছে, ফুটবল?" রাইট-ইন কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দেয়, "তবে নয় তো কী।" দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অসীম বলেছিল, "বটে।"

"শুনছেন, এই গলিটাই কি জয়রাম মিত্র লেন?"

মোটর চালকের মুখ জানলা থেকে একটু বেরিয়ে এসেছে। তারক কবিরাজ স্ট্রিটের রাস্তার বাল্বগুলো খুলে ফ্লুরোসেন্ট টিউব লাগানো হয়েছে। কাউন্সিলর কুমার চৌধুরির এইটিই আপাতত সর্বশেষ কৃতিত্ব জনগণকে তার সেবা সরবরাহে। এই আলোয় মোটর চালকের গৌরবর্ণ কপালের, টিকালো নাকের এবং চিবুক ও গালের কিছুটা অংশ অসীমের চোখে পড়ল। ওর মনে হল, মুখখানি যেন চেনা-চেনা।

অসীম কৌতূহলী হয়ে, চোখ দুটি তীক্ষ্ণ করে তাকাল। কোথায়, কোথায়, কোথায় যেন দেখেছে।

হেরাল্ডের দরজা খুলে নেমে এল আরোহী। দোহারা গড়ন, লম্বায় প্রায় পাঁচ-দশ, ধুতি-পাঞ্জাবি, চুলগুলি অবিন্যস্ত। দরজায় চাবি দেবার জন্য পিছন ফিরতে ঘাড়ে দুটি ভাঁজ দেখতে পেল অসীম। ওর কাছে হেঁটে এল হালকাভাবে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দেহের ওজন জমিতে রেখে, মাথাটা ঝুঁকিয়ে।

সামনে এসে দাঁড়াতেই অসীম চমকে উঠল। আশ্চর্য, এতক্ষণ চিনতে পারেনি কেন সে। এই গলির মোড়ে, সন্ধ্যাবেলা এমন অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি, অসীমকে অভিভূত করে ফেলল।

"আলোটা বড্ড কম ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, আচ্ছা এটাই কি জয়রাম মিত্র লেন?"

সেই ভরাট গলা, নিরাসক্ত ভঙ্গি, শব্দগুলো শিথিল করে মুখ থেকে বার করে দেওয়া। বছর পাঁচেক আগের, নিউ থিয়েটার্স দু'নম্বর স্টুডিয়োর ফ্লোরের একটি দৃশ্য ঝলসে উঠল অসীমের চোখে। ডিরেক্টর শেষবারের মতো সিচুয়েশন বুঝিয়ে দিচ্ছে। শুনতে শুনতে একবার চোখ তুলে ওদের কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে, প্রথম ঘুসিটা খেয়েই পড়ে যাব। সেটা মারবে কে?" অসীমের মনে হয়েছিল স্বর কেমন যেন ক্লান্ত। ডিরেক্টর আঙুল দিয়ে দেখাল অসীমের পাশে দাঁড়ানো দাঁত উঁচু লোকটিকে। তখন হেসে বলল, "দেখবেন ভাই খুব জোরে কষাবেন না। তেবড়ে-তুবড়ে গেলে রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে।" তাই শুনে লোকটার দাঁত আরও খানিকটা বেরিয়ে আসে এবং চাপা গলায় একমাত্র অসীমকে শুনিয়ে বলেছিল, "গাল দুটো তো বাবা, লাখ টাকার ইনশিওর করে রেখেছ, রোজগার বন্ধ হলেই বা কী!" শুনে শিরশির করে উঠেছিল অসীমের দুই বগল। চাপা গলায় সে

বলেছিল, "এইরকম এক্সট্রার পার্ট করতে হয়েছিল ওকেও।" দাঁত-উঁচু তাই শুনে অসীমের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, "নায়ক হবার সাধ হয়েছে? ভাল, ভাল।" শুনে জ্বালা করে উঠেছিল অসীমের মাথার ভিতরটা।

"ক' নম্বরের খুঁজছেন?"

অসীম গলার স্বরে ব্যক্তিত্ববান হবার চেষ্টা করল। এ পাড়ায় তার ওজন আছে, এবাড়ি-ওবাড়ির মধ্যে ঝগড়া হলে মধ্যস্থতা করে, ছোটদের বেচাল দেখলে কড়কে দেয়, অন্য পাড়ায় গিয়ে সোডার বোতলও ছুড়ে আসে, নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনে যখন পুলিশ রাইফেল তুলে তাড়া করে, সে ইট ছোড়ে। জয়রাম মিত্র লেন তার স্টুডিয়ো ফ্লোর।

"নীরবালা ভট্টাচার্য, তিনের-বি, বছরখানেক এসেছেন, স্কুলে পড়ান।"

"বিধবা, একলা থাকেন, চুলগুলো ধবধবে, কর্পোরেশন স্কুলে পড়ান?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কতটা ভেতরটা হবে বলুন তো ভাই?"

অসীম দু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। উদাসীন বা ক্লান্ত, ভরাট কণ্ঠস্বরের 'ভাই' শব্দটি তার ভাল লেগেছে।

"চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"গাড়িটা কি ভেতরে নিয়ে যাব, না এখানেই রাখব?" অসীমের মুখের দিকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তাকিয়ে রইল নির্দেশের অপেক্ষায়। এটা অসীমকে অভিভূত করল আবার। তার ইচ্ছা হল, মোটরটা জয়রাম মিত্র লেনের মধ্যে ঝকঝকে এক টুকরো আকাশের মতো ভেসে আসুক।

"গলির ভেতরেই রাখুন। চোরের উৎপাত বেড়েছে আজকাল এখানে। এই সেদিন একটা গাড়ির হেড লাইট খুলে নিয়ে গেছে। আসুন, জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"তাই নাকি। কেবিয়ারের লকটা আবার ভেঙে গেছে, স্পেয়ার টায়ারটা ভেতরে। বলে ভালই করলেন।"

অসীমকে অনুসরণ করে ঝকঝকে আকাশি-নীল মোটরটা গলির মধ্যে ঢুকল। তেইশ নম্বর বাড়ির লাগোয়া কর্পোরেশন টিউবওয়েলে স্নান করছিল সত্যচরণ। দু'বেলা স্নান করে এবং অফিস যাওয়ার আগে ও ফিরে এসে তার একমাত্র কাজ বালতি বালতি জল টিউবওয়েল থেকে এনে সারা বাড়ি ধোওয়া এবং ভাতের কণা কি মাছের কাঁটা বাড়ির কোথাও পড়ে আছে কি না খুঁটিয়ে লক্ষ করা।

সত্যচরণের আট বছরের ছেলেটি হাতলে বুক দিয়ে পাম্প করে বালতিটা ভরে চলেছে। জলটা ঠান্ডা। মগে করে জল তুলে অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুজে মাথায় ঢেলে ঢেলে সত্যচরণ আনন্দ করছিল। মোটরের ইঞ্জিনের শব্দে চোখ খুলেই আঁতকে উঠল সে।

"দ্যাখো দ্যাখো, কাণ্ড দ্যাখো, চাপা দেবেন নাকি মশাই!"

গামছার কসি চেপে ধরে সত্যচরণ উঠে দাঁড়াল? অসীম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "চুপ করুন তো, কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, এখনও শিখলেন না।"

"কেন, ইনি কি চিফ সেক্রেটারি।" সত্যচরণ খিঁচিয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে বলল, "মাড়িয়ো না, মাড়িয়ো না, জুতো পরে মাড়িয়ো না, ধুয়ে রেখেছি যে জায়গাটা।"

অসীম টিউবওয়েলের চারপাশে ধুয়ে রাখা অঞ্চলের ওপর পা রেখেই সত্যচরণের কানের কাছে মুখ এনে শুধুমাত্র দুটি শব্দ চাপা স্বরে বলেই পিছিয়ে গেল। সত্যচরণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "আ মোলো, যত রাজ্যের গু-মুত লাগানো চাকা একেবারে চান করার জায়গায়!"

"এই গলির মধ্যে তিনের-বি, চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

অসীম হাত তুলে তাঁতিদের গলিটা দেখাল। চওড়ায় দু'হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় চল্লিশ হাত। এর মধ্যে আছে চারটি বাড়ির ঠিকানা। এ-রকম শাখা-গলি জয়রাম মিত্র লেনে গুটি পনেরো আছে। কোনওটির নাম উকিলদের গলি, কোনওটি চক্রবর্তীদের গলি, কোনওটির নাম ময়রাদের গলি।

"আপনি না থাকলে ট্রাবলে পড়তাম।"

তাঁতিগলির মুখেই কর্পোরেশনের আলো। অসীম লক্ষ করল, দু'জনের ছায়াই দৈর্ঘ্যে যেন সমান। কথা বলতে গিয়ে ঘড়ঘড় করে উঠল তার গলাটা।

"নতুন লোকের পক্ষে একটু ট্রাবল হবেই।"

তিনের বি-র দরজা বন্ধ। দরজার পাশেই জানলা। তার একটা পাল্লা খোলা। অসীম উঁকি দিয়ে দেখল পিছন ফিরে নীরবালা ভট্টাচার্য ঠোঙা থেকে কৌটোয় কিছু একটা ঢালছেন। অসীম গলা খাঁকারি দিতেই জানলার দিকে তাকালেন।

"আপনাকে একজন খুঁজছেন।" অসীম নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল।

"আমাকে?"

অবাক হয়ে তিনি জানলার ধারে এলেন। আবছা গলিতে ঠাওর করার চেষ্টা করছেন মুখটিকে, তখন অসীমের পিছন থেকে ব্যক্তিত্বে ভরাট স্বর বলে উঠল, "পিসিমা, আমি হাঁদু, দরজাটা খুলুন।"

অসীমের মনে হল, সাধারণ, তার মতো খুব সাধারণ একজন, এই লোকটা। বাড়ির এবং পাড়ার অনেকেই এখনও তাকে ফ্যালা নামে ডাকে। পিসিমা থাকলে তার বাড়ি গিয়ে হয়তো এইভাবেই সে বলত, "আমি ফ্যালা, দরজাটা খুলুন।"

অসীম এই কথা ভেবে, সমান-সমান একবকমের বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঝকঝকে আকাশি-নীল মোটরটির গায়ে সে যত্নে হাত রাখল। এটিকে এখন তার নিজের বলেই মনে হচ্ছে। এখন ইওসেবিওর পর্যায়ের ফুটবলার হিসেবে নিজেকে ভাবতে ইচ্ছে হল তার। ঝুঁকে ডান হাঁটুতে হাত ছোঁয়াল। মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল, "শাল্‌লা।"

পা-টা সরিয়ে নিতে মুহূর্তের জন্য দেরি হয়ে গেছল। রাইট-ইন বুট তুলেছে দেখতে পেয়েও অসীম এগিয়ে দিয়েছিল ডান পা, বলটাকে টাচ-লাইনের ওধারে ঠেলে দেবার জন্য। না দিলে বল যেত রাইট-আউটের কাছে। সে চিপ করলেই, ওত-পাতা সেন্টার ফরোয়ার্ড বল পায়। সেখান থেকে নেট করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। রাইন-ইনের পা-টা ঠিক হাঁটুতেই লাগল। বাকি সময়টা অসীম লেফট-আউটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেয়। খেলায় এক গোলে হেরেছিল। খেলা শেষে একদল লোক লাঠি নিয়ে তাড়া করে তাদের চারজনকে—যারা কলকাতা থেকে এসেছিল টাকা নিয়ে খেলতে। অন্ধকারে ধান খেতের মধ্যে দিয়ে ছোটবার সময় অসীম দু'বার পড়ে যায়। দু'মাইল ছুটে এসে বাসে ওঠে। বাসে উঠে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ওরা। অবশেষে একজন চাপা গলায় বলে, "বাকি টাকাটা আর [illegible]ল না রে।" আর একজন বলেছিল, "বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, জিতলে মুরগি খাওয়াবে কথা ছিল।" অসীম হাঁটু চেপে ধরে মাথা নামিয়ে শুধু বসে ছিল। হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছবার পয়সা মাত্র তার পকেটে। তখনও সে জানত না, বাড়িতে তার বাবা কী কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে।

"হ্যাঁ রে ফ্যালা, কাদের বাড়িতে এল রে?"

অসীম ওপর দিকে তাকাল। সতেরো নম্বরটা একতলা। ছাদে পাঁচিল নেই' ও-বাড়ির সেজমেয়ে শেফালি, বয়স প্রায় চল্লিশ, সময় পেলেই ছাদের কিনারে এসে বসে থাকে। বিয়ের ছয় মাস পরই স্বামীর ঘর থেকে চলে এসে, শেফালি পনেরো বছর যাবৎ বাপের বাড়ি রয়েছে। কেন রয়েছে তাই নিয়ে পাড়ায় প্রভৃত জল্পনা হয়ে গেছে এক সময়। নতুন ভাড়াটেরা কৌতূহল দেখালে শেফালি একই জবাব দেয়, "সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।" তবে পাড়ার প্রত্যেকেরই ধারণা, শেফালির কর্কশ কণ্ঠস্বর, রোমশ, কঠিন পেশি সম্বলিত দেহে কোমল বক্রতার নিদারুণ অভাব, পুরুষোচিত চলাফেরা, সতেরো বছরের কিশোরের মতো গোঁফ, কুচুটে স্বভাব ইত্যাদির জন্যই স্বামী সংসার ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলে, মোটেই সন্ন্যাসী হয়নি, আবার বিয়ে করেছে, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বউ নিয়ে দিব্যি সংসার করছে। বাগবাজারে স্টেশনারি দোকান আছে, বিশ্বাস না হয় যে-কেউ গিয়ে ভজিয়ে আসতে পারে। কিন্তু কেউ ভজিয়ে এসেছে বলে জানা যায়নি।

শেফালির বাবা মারা গেছে পাঁচ বছর আগে। দাদা এবং তিন ভাই বিবাহিত। সে থাকে রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে। বাড়ির আঠারো জনের রান্না করে যে সময়টুকু পায়, সেটা ব্যবহার করে ছাদের কিনারে বসে আর এবাড়ি-ওবাড়ি করে। শেফালির আনন্দ প্রতি বাড়ির থেকে সংবাদ সংগ্রহে ও বিতরণে। ছাদের কিনারা তার পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটি। পাড়ার বউ-ঝিরা দুপুরে সাজগোজ করে বেরোলেই ছাদ

থেকে অবধারিত প্রশ্ন ঝরবে—"কোথায় গো, সিনেমা?" ছোট ছেলেমেয়ের হাতে শালপাতার ঠোঙা কি ভাঁড় দেখলে প্রশ্ন হয়, "কে এসেছে রে?"

শেফালি যখন যে বাড়িতে হাজির হয়, সঙ্গে সঙ্গে চালু আলোচনা ধামাচাপা পড়ে। পাশের বাড়ির বউ ইলার শোবার ঘরের জানলাটি শেফালিদের ছাদের লাগোয়া। সন্ধ্যা থেকেই সে জানলা বন্ধ রাখে, যেহেতু গল্পচ্ছলে শেফালি তাকে জানিয়েছে, "বুঝলে গো, এ পাড়ার সব ঘরেই কোনও না কোনও ব্যাপার আছে, শুধু তোমাদের ঘরেই যা নেই।"

শুনেই ইলা বুঝে গেছে, শেফালি নজর রাখছে তার ঘরে এবং একটা 'ব্যাপার' আবিষ্কার না কবা পর্যন্ত ও স্বস্তি পাবে না। অশোক প্রায়ই রাতে মদ খেয়ে ফেরে। কিন্তু মাতলামো করে না। সে-কথা কি আর জানে না শেফালি, নিশ্চয় জানে। তবু বলেছিল, "সব ঘরেই আছে, জোর দিয়ে অমন কথা বলবেন না, ঠাকুরঝি।"

"বেশ, তা হলে বলো কোন ঘরে নেই?"

"তা কী করে বলব।" ইলা অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস করে ওঠে। কোনও ঘরের নাম করলে সেটাকে মোচড় দিয়ে শেফালি কী অর্থ করে পাড়ায় চাউর করবে কে জানে!

"তা হলে! বলতে তো পারলে না।" শেফালি খুশি হয়ে বলল।

ইলা তখন বলে, "প্রফেসারদের ঘরে কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না। বেশ ছিমছাম পরিবার, বউ, ছেলে আব শালি। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে রেডিয়োয় বলে, গলাটি বেশ। ওর বউ নাকি স্কুলে পডায। উনি বলছিলেন, মাসে হাজার দেড়েক টাকা রোজগার করে।"

শেফালি নিমীলিত চোখে, মুখে হাসি ফুটিয়ে কথাগুলি শুনে যায়। অবশেষে বলে, "তা ঠিকই বলেছ, তবে বউকে ফেলে আইবুড়ো যুবতী শালির সঙ্গে সিনেমা যাওয়া, দিদি বাড়ি থেকে বেরোলেই বোনেব অমনি ভগ্নিপতির গা-ঘেঁষে বসা, শ্বশুর তো বোর্ডিংয়ে রেখেই মেয়েকে পড়াতে চেয়েছিল, অমনি জামাই হাঁই-হাঁই করে বলে উঠল, 'আমি থাকতে আভা বোর্ডিংয়ে থাকবে কী!' লক্ষ করেছ, তোমার প্রফেসারের বউ কেমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! আসলে রস মরে গেছে, বুঝলে গো, রস মরে গেছে। আর ওদিকে বোনের চেকনাই ফুটেছে। নদীর এ-কূল ভেঙে ও-কূল গড়ে উঠছে। তুমি বাপু, বোজ ও লোকটার বেরোবার সময় জানলায় অমনভাবে দাঁড়িয়ো না, খারাপ দেখায়।"

শেষ বাক্যটিতে বিবর্ণ হয়ে গেছল ইলার মুখ।

"এই ফ্যালা, কাদের বাড়ি বল না?"

অসীম ভেবেছিল না শোনার ভান করে চলে যাবে। কিন্তু হাঁটুটায় হঠাৎ চিড়িক দিয়ে ওঠায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। আভাকে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের কার্ড দিতে গেছল অসীম, আধুনিক গানের দিন। আভা নেয়নি। বলেছিল, "একা কোথাও যাওয়া দিদি পছন্দ করে না। দিদির কাছে থাকি, সুতরাং তার পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলতে হবে তো।" অপ্রতিভ হয়ে অসীম বলেছিল, "আমি পৌঁছে দেব, নিয়েও আসব আপনাকে।"

"না, দিদি ভীষণ স্ট্রিক্ট, একা কিছুতেই যেতে দেবে না।"

কথাগুলো হয়েছিল চার মাস আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। জয়রাম মিত্র লেন, তারক কবিরাজ স্ট্রিট ছাড়িয়ে যেখানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে পড়েছে, সেই মোড়ে। আভা তখন কলেজ যাচ্ছিল। কিন্তু শ্যামলের কাছ থেকে অসীম তিনদিন পরই শোনে, "কী রে, কার্ড নিল না তো।" এবং শ্যামল জানায়, খবরটা সে বাড়িতে আলোচিত হতে শুনেছে মেয়েমহলে এবং শেফালি তখন হাজির ছিল।

"আপনাকে আর বলব কী, ঠিকই জেনে যাবেন।" অসীম মুখ তুলে বিরক্ত স্বরে বলল। "যে এসেছে, তার মতো লোক এ-গলির বাপের জন্মে ঢোকেনি, ঢুকবেও না।"

"কে, কে, নামটা বল-না রে।" শেফালি হামা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

অসীমের কী খেয়াল হল, নামটা চেঁচিয়ে বলল। শোনা মাত্র শেফালি লাফিয়ে উঠে ইলার বন্ধ জানলায় কিল মারতে মারতে চাপা চিৎকার শুরু করল, "শিগগিরি খোলো গো ইলা, পাড়ায় কে এসেছে দেখে যাও।"

এরপর অসীমের ইচ্ছা হল, খবরটা আভাকে দেয়। তিরিশের-একের বাড়ির একতলার ঘরগুলির জানলায় গাঢ় খয়েরি পর্দা। পিছনে এবং ওপরে তাকিয়ে, দেয়াল ঘেঁষে আস্তে চলতে চলতে অসীম তৃতীয় জানলায় একবার থমকে, পর্দার কিনারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকাল। দেখল আভা টেবিলটার ধারে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে। চেয়ারে বসা হিরণ্ময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। ঘরে টেবল ল্যাম্পের চাপা আলো।

দুই

"তোমাব দিদি জানে?"

"না।"

"কোথায় গেছে?"

"বলে যায়নি, টিপুকে নিয়ে বেরিয়েছে। বোধ হয় দর্জির দোকানে।"

হিরণ্ময় চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকাল। মুঠোয় চেপে চুল টানল। অভ্যাসমতো আঙুলগুলো চোখের সামনে ধরে দেখল ক'টা চুল উঠেছে। কয়েকটা ফুঁ দিয়ে ফেলার চেষ্টা করল। অ্যাশট্রের ওপর রাখা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে পেনসিলের মতো সরু হয়ে। হিবণ্ময় তাকাল আভার দিকে। ধোঁয়ার স্তম্ভটি পাতলা হয়ে ভেঙে যাওয়ার জায়গাটিতে স্থির চোখে তাকিয়ে ও। হিরণ্ময় সিগারেটটা তুলে ঠোঁটে রাখল।

"তা হলে?" হিবণ্ময় বলল।

আভা ওর মুখ থেকে চোখ সবিয়ে বুক-কেসের দিকে তাকাল। অর্থনীতির লেকচারাবের পড়ার ঘর। বই আর পত্রিকা ইতস্তত ছড়ানো। বুক-কেসের ওপর ব্রোঞ্জের বুদ্ধের মাথা। ধুলোয কালো হয়ে রয়েছে। তার পাশে একটি মাটির ফুলদানি। ফুল নেই। সরকারি এক কারু-শিল্প বিপণি থেকে শোভা বছরখানেক আগে ও-দুটো কিনে এনেছিল। প্রথম মাস দুয়েক মুছত, ফুল রাখত। লম্বা সোফার বিপরীতে একটি ছোট তক্তপোশ। পাতলা তোশকের উপর ঝালর দেওয়া গাঢ় খয়েরি খদ্দরের চাদর। তাতে পাখি উড়ছে ও.র তাই দেখায় ব্যস্ত ছেলে কাঁখে এক গ্রাম্য বধূর গুটি ত্রিশ ছাপে ভরা চাদরটি। লিখতে লিখতে বা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে হিরণ্ময় তাকিয়া টেনে তক্তপোশে শোয়। কখনও বা সোফায় হেলান দিয়ে নিচু ছোট্ট টেবিলটায় পা তুলে দেয়। ছাত্ররা এলে সে চেয়ারে বসে। ওদের সোফায় বসতে বলে।

"এমন যে ঘটবে জানতুম।" হিরণ্ময় চশমাটা হাতে নিয়ে টেবিল ল্যাম্পেব আলোর দিকে ধরল। জলেব দাগ লেগে আছে। ধুতিব খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, "তোমার কোনও দোষ নেই।" গলাটা সামান্য ধরা। কথা বলল চাপা গম্ভীব স্বরে। সাধারণত উত্তেজিত হলে ওর স্বর সরু হয়ে যায়।

"কেন, দোষ নেই কেন?" আভা যেন তর্ক করতে চায়। কিন্তু ভঙ্গিটা উৎকণ্ঠার।

"কীসের দোষ তোমার?" চশম.া চোখে এঁটে স্পষ্ট করে হিরণ্ময় তাকাল।

আভা উত্তর দেবার জন্য কথা খুঁজছে। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়েছে বলে হিরণ্ময় ওর নাভি থেকে ঊর্ধ্বাংশটুকু শুধু দেখতে পাচ্ছে। ভয়েলের ছাপা শাড়ির পাড় নেই। নাভির ওপরটা সামান্য উঁচু হয়ে রয়েছে কাপড়ের কুচির জন্য। আঁচলের কিনাবে কোমরের মসৃণ তেলতেলা চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। ভাটার সময় গঙ্গার পাড়ে যেমন ফেলে যাওয়া পলিতে ভাঁজ দেখা যায়। অমন ভাঁজ ওর গ্রীবাতেও দেখা যায়, যখন মুখটা ফিরিয়ে বা ঘাড় কাত করে থাকে। আভা বেশ লম্বা, বাঙালি মেয়েদের তুলনায়। কাঁধ দুটি পুরুষালি ঢঙে প্রশস্ত। ব্লাউজের গলার ঘের কাঁধের প্রান্তে এসে ঠেকেছে, পিঠে শিরদাঁড়ার চতুর্থ গ্রন্থিটিও দেখা যাবে যদি পিছন ফেরে। হাঁটলে, পুরুষমাত্রেই ওর নিতম্বে চোখ রাখতে বাধ্য হয়। ওর স্বাস্থ্যের দৃঢ়তা বিষয়ে যাবতীয় অনুমান দর্শকরা এইখান থেকে করতে শুরু করে এবং গলা পর্যন্ত পৌঁছে অভ্রান্তই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ওর থুতনি চাপা. গালের হনু উঁচু, ঠোঁট দুটি পুরু, মুখ গোলাকৃতি। চোখ দুটি বড় হওয়ায় মাত্রা-হারানো ভাব সারা মুখে।

"দোষ আমার, যেহেতু আমি বিবাহিত। স্ত্রী ছাড়া অপর কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার অধিকার আমার নেই। হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন অপরাধ, দেহ স্পর্শ করা পাপ। অথচ তিনটি অন্যায়ই আমি করেছি। সুতরাং আমি দোষী নয়তো কী?"

হিরণ্ময় থেমে থেমে এমনভাবে বলল, যেন ক্লাসের ছেলেমেয়েদের নোট দিচ্ছে—লিখে নিতে অসুবিধা না হয়।

"ভাল কথা, তুমি কি সিওব যে—", হিরণ্ময় অসমাপ্ত রাখল।

"হবার তাবিখ ছিল ফিফ্‌থ।" আভা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ও। সমুদ্রতীরে জেলে-ডিঙি, ঝাউবন এবং আবছা কয়েকটা মূর্তি ক্যালেন্ডারে। দিন গুনতে গুনতে মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল হিবণ্ময়ের মুখ।

"আজ টোয়েন্টি-ফিফ্‌থ, এতদিন বলোনি কেন?"

"ভেবেছিলাম—", আভা মাথা নামিয়ে রাখল।

"কী ভেবেছিলে?"

"এমন তো আগেও হয়েছে দু'-একবার। ছ'দিন, সাত দিন পর্যন্তও দেরি হয়েছে।" আভা ফিসফিস কবে বলল। ডান হাতে টেবিলের প্রান্ত আঁকড়ে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে। আঙুলগুলোয় উত্তেজনার প্রবাহ স্পষ্টই দেখতে পেল হিরণ্ময়। "আচ্ছা, আপনার যে একজন ডাক্তার বন্ধু আছে, সে তো ব্যবস্থা কবে দিতে পারে!"

আভা উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে। কথাটিব প্রতিক্রিয়া কী হয, সেটা আদ্যোপান্ত সে দেখতে চায়। আভাকে তার মনোভাব বুঝতে না দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে হিরণ্ময় বুদ্ধ-মস্তকটি তুলে নিল। হিমাংশুকে বললে বাবস্থা করে দেবে। একটা করুণ, শোচনীয়, বিয়োগান্ত গল্প বানিয়ে বললেই হবে। হিমাংশু আর্ত-আতুরকে সেবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না।

কিন্তু আমি তো জানতামই। আমি তো বহুদিন আগে, এক মাস, ছ'মাস, এক বছব আগে থেকেই জানতাম কিছু একটা ঘটবে। হিরণ্ময় বুদ্ধের মাথার ধুলো তর্জনী দ্বারা মুছতে মুছতে ভাবল। তোমার কোনও দোষ নেই আভা। আমি অপেক্ষা কবেছি বহুদিন কিছু একটা ঘটবার জন্য। কারণ আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বদল চাইছিলাম এই নিত্যদিনের একঘেয়েমির থেকে। যখনই কলকাতায় কোনও কাবণে পুলিশ গুলি চালায়, আমি রাস্তায় বেরিয়ে যেতাম এই আশায় একটা গুলি যদি গায়ে লাগানো যায়। তা হলে বেঁচে যেতাম রোজ এই চেয়ারে বসে ছাত্র-পাঠ্য বই লেখার দায় থেকে। ও ঘরের বিছানাটায় শোবাব দায় থেকে। ক্লাসে দম দেওয়া পুতুল হওয়ার দায় থেকে। আভা, আমি তৈরিই ছিলাম কিছু একটা ঘটাবাব জন্য।

"না, হিমাংশুর কাছ থেকে এ-রকম ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া যায় না। ও আমাকে শ্রদ্ধা করে খুব।"

"তা হলে?" ভয় এবং যন্ত্রণা, এক সঙ্গে আভার মুখের চামড়া টেনে ধরল। লাল ঢাকনা মোড়া টেবিল ল্যাম্পের আলো থুতনির নীচে গাঢ় অন্ধকার তৈরি করে মুখটাকে কঠিন করে দিয়েছে। হিরণ্ময়ের মনে হল, মেয়েটি মোটেই যেন আবেগপ্রবণ নয়।

"তা হলে আর কী।" বুদ্ধের মাথাটি বুক-সেলফের উপর যত্ন ভরে বসিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় লক্ষ করতে লাগল।

"যখন সবাই জানবে, দিদি জানবে? তখন আপনার কী হবে?"

"কিছু একটা নিশ্চয় হবে, সেটা এখনও জানি না।"

"আমি তা হতে দেব না।"

"কী ভাবে?"

"চলে যাব এখান থেকে।"

"কোথায়, বাবা-মার কাছে?"

"জানি না কোথায় যাব। তবে শেষ পর্যন্ত ট্রেনে কাটা পড়ার কি ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবার পথ তো খোলাই আছে।"

"আমিও তাই করব।"

শোনামাত্র আভা নিজের মুখগহ্বর তালু দিয়ে বন্ধ করে দিল। তবু একটা ক্ষীণ শব্দ হিরণ্ময় শুনতে পেল।

"না, লক্ষ্মীটি না। এমন চিন্তা কোরো না।" আভা টেবিলে অনেকখানি ঝুঁকে বলল।

হিরণ্ময় হেসে উঠল নিঃশব্দে।

"বিবাহিতদের এমন চিন্তা করারও অধিকার নেই। তা হলে স্ত্রী-পুত্রের কী দশা হবে, তাই না?"

এরপর আভা মুখ নিচু করে দু' হাতে টেবিলে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে শুরু করল। হিরণ্ময় উঠে দাঁড়াবার আগেই সে হাঁটু গেড়ে বসে টেবিলের পায়া জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠল বিকৃত স্বরে।

"আমি শত্রুতা করেছি নিজের দিদির সঙ্গে। আমি জানি, দিদিব সর্বনাশ করেছি, আমার জন্যই ছারখার হল এ-সংসার। আমি মুখ দেখাতে পারব না আর।"

"ওঠো, ওঠো। এটা বাইবের ঘর। রাস্তা থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে, ওঠো।" বিরক্তি চাপার চেষ্টা করতে করতে হিরণ্ময় ধমক দিল।

আভা টেবিলের পায়ায় মাথা ঘষতে শুরু কবেছে একগুঁয়েব মতো। হিরণ্ময় জানলার পাল্লাগুলো বন্ধ করে এসে বলল, "ও ঘরে চলো।"

"আমার জন্য তোমারও মান মর্যাদা বইল না।"

"আগে উঠে দাঁড়াও।" তীব্রস্বরে হিরণ্ময় বলল। এইবার সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আভা গ্রাহ্যে আনল না সে তীব্রতা। "কিন্তু আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না তোমার সম্মান। আমি দুঃখ দেব না দিদিকে।"

হিরণ্ময় নিচু হয়ে আভাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। এবং পারল না। দেহে যে পরিমাণ শক্তি থাকলে এ-কাজে সফল হওয়া সম্ভব, তা নেই বুঝতে পেরে একটা হিংস্র রাগে তাকে পেয়ে বসল। বগলের নাচ দিয়ে আভাকে দু'হাতে জড়িয়ে সে আবার টানল ওকে দাঁড় কবাবার জন্য। কুঁজো হয়ে টেবিলের পায়া আঁকড়ে আভা শবীরটাকে শক্ত কবে রেখেছে।

"ওঠো, ওঠো বলছি।" আভার কানের কাছে মুখ রেখে হিরণ্ময় অক্ষম রাগে চাপা চিৎকার করল। আবার ওকে টেনে তোলার জন্য সে নিজেকে ধনুকের মতো বাঁকাল। দম বন্ধ করে, আভাকে দু' হাতে বেড় দিয়ে সোজা হয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করে এবারও পারল না। আভাও হাঁফাচ্ছে। দশটা আঙুলকে বেঁকিয়ে থাবার মতো করে হিরণ্ময় ওব বুকের কোমল মাংসে বসিয়ে উপড়ে ফেলার জন্য টেনে ধরল। সাবা শবীর অন্ধ জেদে টনটন করছে। নিশ্বাস ফেলে আবাব বুক ভরে নিল। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু একটিই কথা—ভাঙব, ওর অবাধ্যতা আমি ভাঙবই। ধীরে ধীরে সে মোচড়াতে শুরু করল তার থাবা দুটো। একটু একটু করে আভার মুখ ঊর্ধ্বমুখী হল। যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তারপর জিভ দেখা গেল। গলার দুটো পেশি দড়ির মতো পাকিয়ে উঠল আর চোখের কোল বেয়ে জল কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নামল। এবং আরও জোরে সে আঁকড়ে ধরল টেবিলের পায়াটা।

হিরণ্ময় ওকে ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। কপালে চিটচিটে ঘাম ফুটেছে। দপদপ করছে রগের শিরা দুটো। নিজেকে তাব মনে হচ্ছে অক্ষম, দুর্বল, পরাভূত। শুধুমাত্র গায়ের জোরে আভা তাকে অগ্রাহ্য করতে পারল। আভা টেবিলের পায়ায় কপাল ঠেকিয়ে কাঁদছে। টেবিল ল্যাম্পের চাপা আলোয় ওকে দেখতে দেখতে হিরণ্ময়ের মনে হল একটা কুকুর টেবিলের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে কুঁইকুঁই করছে।

নিজের উপর সে হঠাৎ রেগে উঠল। বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে এসে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল খাটে। আলো থেকে চোখ আড়াল করতে ডান বাহু চোখের ওপর রাখল। মনে মনে বিড়বিড় করে বলল সম্মান, মর্যাদা, দুঃখ! আশ্চর্য নির্বোধ! আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাতে ট্রেনে কাটা পড়বে! যদি বলি এই মুহূর্তে ছাদ থেকে ঝাঁপ দাও, নিশ্চয় দেবে। পাড়ার লোকগুলো অমনি পিলপিল করে পিঁপড়ের মতো এসে ওকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াবে। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ঘাড়গুলো শুঁড়ের মতো নাড়াবে। আর আভার থেঁতলানো দেহ থেকে ছিটকানো রক্ত এত লাল কেন তাই নিয়ে বলাবলি করবে। আভা মরার আগে ওদের শুনিয়ে স্বীকারোক্তি দেবে—পাঁচিলে ঝুঁকতে গিয়ে ভার সামলাতে পারিনি। তারপর পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স আসবে। হাসপাতালে পোস্ট-মর্টেম করা হবে এবং তখন জানা যাবে—"ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো।"

আভা পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর এল। হিরণ্ময় আপাদমস্তক দেখল ওর। শোভার থেকে আট বছরের ছোট। একই উচ্চতা, একই গড়ন, একই রং দু'জনের। শুধু আলাদা হয়ে যায় চুম্বনেব সময়, চাহনিতে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষেপণে, দেহের তাপে।

"আমাকে—", আভা দ্বিধায় থেমে রইল। কিছু চুল ওর গালে লেপটে রয়েছে। ব্লাউজটা কুঁকড়ে কোমর থেকে উঠে গেছে খানিকটা। চওড়া কাঁধ যেন ঝুলে পড়েছে। ওকে দেখাচ্ছে ভগ্নস্তূপের মতো।

"বলো।" ধীর মৃদু হবার চেষ্টা করল হিরণ্ময়।

"আমাকে আর তুমি ভালবাসবে না নিশ্চয়।"

"কেন!"

"ক্ষতি করলাম।"

"আগেব থেকেও এখন বেশি ভালবাসব।"

আভার মুখের ওপর বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বোধহয় বিশ্বাস করছে না। হিরণ্ময় মমতা বোধ করল ওব জন্য। পোস্ট-মর্টেম থেকে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানা যাবে। সবাই তখন বুঝবে এটা আত্মহত্যা। কিন্তু এ-জন্য কে দায়ী, সেটা জানা যাবে না। তাকে ধবা যাবে না। হিরণ্ময় টের পেল, তার মনের কোথাও যেন একটুখানি স্বস্তি দানা বাঁধল। তাইতে সে এই বলে নিজেকে বোঝাল—আর পাঁচজনের মতো তা হলে আমিও নিবাপদে বাঁচতে চাই! সব মানুষের মধ্যেই জানোয়ার আছে, আমিও বাদ নই।

তা হলে গুলি খাবাব জন্য রাস্তায় বেবোই কেন? হিরণ্ময় পরমুহূর্তেই এলোমেলো হতে শুরু করল। মরতে চাওযা এবং বাঁচাব ইচ্ছার মধ্যে কোনটি খাঁটি? শোভা একটা সবল অঙ্কের ছকেব মধ্যে এসে গেছে। ধাপে ধাপে নেমে যাবে নির্ভুলভাবে। স্বাভাবিক একটা গেরস্ত উত্তরও পাওয়া যাবে। উত্তরমালা খুলে শুধু মিলিয়ে নেওয়া। আভা অন্য কিছু। ওর অঙ্কটাই প্রশ্নমালায় নেই। পাঁচজনের মতো নিরাপদে বা জানোয়ারবোধ দিযে এ অঙ্কের উত্তর মেলানো যায় না। সাবা জীবনই কষে যেতে হবে শুধু। হঠাৎ এমন এক উটকো অঙ্কে কেন হাত দিলাম।

সব মিলিয়ে হিরণ্ময় যখন একটা ফর্মুলা তৈরি করার চেষ্টা করছে তখন আভা বলল, "দিদি আপনাকে খুব ভালবাসে।"

"জানি।"

"যদি জানতে পাবে?"

"জানবে। আমিই ওকে সব বলব।"

"সে কী!" আভা দ্রুত কাছে এল হিরণ্ময়ের। "না, কিছুতেই না। তা হলে দিদিকে আমি জ্যান্ত মুখ দেখাতে পাবব না।"

মাত্র এক হাত উপরে ঝুঁকে রয়েছে মুখটা। হাত বাড়িয়ে কপাল, গাল অথবা চিবুক স্পর্শ কবা যায়। হিবণ্ময়েব মনে হল, আর বোধ হয় নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। আভাকে বুকের উপর চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে কিংবা টানতে টানতে ছাদের পাঁচিলের কিনারে নিয়ে যাবে ঠেলে ফেলে দেবাব জন্য।

"বড্ড ছেলেমানুষ তুমি আভা। এ-ভাবে ব্যাপারটার সমাধান হয় না। আত্মহত্যা আমিও তো করতে পারি। কিন্তু তাতে অপমানের হাত এড়াতে পারব মাত্র। কেউ হয়তো বড়জোর বলবে, লোকটার প্রবল আত্মমর্যাদা বোধ ছিল। তুমিও বোধ হয় আমার প্রতি আনুগত্য দেখাতে কিছু একটা করে বসবে। কিন্তু এ-সব করার জন্যেই কি আমরা ভালবেসেছি?"

"আমি যদি মুখ ফুটে না জানাতাম, হিরণ্ময়, তোমায় আমি ভালবাসি, তা হলে ব্যাপারটা এই পর্যন্ত গড়াত না।" কথাগুলো আভা কাঁপা গলায় বলল। হিরণ্ময়ের নাম উচ্চারণের সময় ওর ভিতরটা প্রতিবারই নড়ে ওঠে।

"একটা কিছুতে গড়াত।" হিরণ্ময় আনমনা হয়ে গেল সামান্য। যে-ভাবে ক্লাসে চাহিদা ও জোগান তত্ত্ব বোঝায়, সেই ক্লান্ত স্বরে থেমে থেমে বলল, "একটা কিছু ঘটাবার জন্য আমি অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু বুঝছি না, কেন আমি তা চাই। বাঁচার জন্য না মরার জন্য, সেটা বুঝছি না।"

রাস্তায় জানলার কাছে টিপুর গলা শোনা গেল। সদর দরজায় খিল দেওয়া। কড়া নাড়ার শব্দ হল।

ঠাকুর রান্নাঘর থেকে গিয়ে খিল খুলে দিল। টিপু বাড়ি ঢুকতে চাইছে না। শোভার ধমক শোনা গেল সদরের দরজায়।

আভা ফ্যাকাশে মুখে হিরণ্ময়ের দিকে তাকাল। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার আগে চাপা স্বরে শুধু বলল, "আমি তোমাকে মরে যেতে দেব না।"

হালকা চটির শব্দ ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে থেমে রইল। শোভা এসেছে। হিরণ্ময় প্রাণপণে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "কী ব্যাপার দাঁড়িয়ে রইলে!"

"আসব?"

"তার মানে!"

হিরণ্ময় সত্যিই অবাক হল এবং সেই সঙ্গে বুঝতে পারল স্নায়ুগুলো হঠাৎ প্রখর আলোয় ধাঁধানো চোখের মতো অনুভবরহিত হয়ে পড়েছে। শোভা কি জানতে পেরেছে? জানার পর লক্ষ করে যাচ্ছে? নিশ্চয় তুমুল একটা কিছু করবাব জন্য তৈরি হচ্ছে। বিশ্রী কুৎসিত একটা নাটক। রাস্তার জানলায় দর্শক জমবে, মনে মনে তারা হাততালি দিতে দিতে এনকোর এনকোর বলবে। দৃশ্যটি চকিতে ভেসে উঠল হিরণ্ময়ের চোখে। নিজেকে সে বলল, তার আগে আমিই ওকে সব জানাব। ওকে চিৎকাব করার সুযোগ দেব না। ওকে বলব, কেন আমি আভার সর্বনাশ করেছি।

চোয়াল কঠিন করে হিরণ্ময় বলল, "ভেতরে এসো তোমাকে একটা খবর দেব।"

"সে খবরটা আমিও জানি!" পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল শোভার মুখ। "রাস্তায় বেশ ভিড় জমে গেছে। আশ্চর্য, ওই টিচারের বাড়িতে আসবে ভাবতেই পারিনি। আভা কোথায়, ওর তো ফেবাবিট হিরো।"

তিন

জয়রাম মিত্র লেনের এক থেকে ত্রিশ নম্বর পর্যন্ত চুয়াত্তরটি বাড়ির রংই পাণ্ডুর, কলি-চটা। প্রায় দু'শোটি উনুনে আঁচ পড়ে প্রতি ভোরে। অধিকাংশ বাড়ির পলেস্তারা খসে জিরজিরে ইট বেরিয়ে পড়েছে। এই গলিতে ভোটার সংখ্যা সাতশো, খবরের কাগজ রাখে বত্রিশটি, বছরে বিয়ে হয় গড়ে তিনটি, শ্রাদ্ধ তিনটি, অন্নপ্রাশনও তিনটি। সাতটি আঁস্তাকুড়, একটি টিউবওয়েল, রাস্তায় আটটি ইলেকট্রিক বাতি, একটি খাটাল, একটি পাঠশালা, গুটি পঞ্চাশ রেডিয়োর শব্দ এবং কমপক্ষে আড়াইশো শিশুর চিৎকার জয়রাম মিত্র লেন দিয়ে হেঁটে গেলে চোখে বা কানে আসবে।

তারক কবিরাজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে গলির দিকে তাকালেই চোখে পড়বে তিন নম্বর বাড়ির ছাদে ভাঙা-ট্যাঙ্কের পাশে অশ্বত্থ গাছটাকে। ওটা বাড়তে চাইলেই ও-বাড়ির ভাঁটু বা হাবু লাঠি-পেটা করে ডালগুলো ভেঙে দেয়। ফলে গাছটা বাড়তে না পেরে ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। শিকড়ের ঝুরি নেমেছে দোতলা পর্যন্ত। বৃষ্টির জলের পাইপগুলো রাস্তা পর্যন্ত নামানো, কিন্তু ছেলেদের বলখেলার ধকল সইতে না পেরে সবকটিরই তলাব অংশ ভাঙা। বহু বাড়ির জানলার পাল্লা লটপটে বুক পকেটের থেকেও অর্থহীন—ঝড়, বৃষ্টি, রোদে সামাল দিতে পারে না।

জয়রাম মিত্র লেনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে হলে মুখটাকে তুলতে হয় যতক্ষণ না ঘাড়ে টান পড়ে। সূর্যকিরণ একমাত্র গ্রীষ্ম ছাড়া রাস্তা স্পর্শ করতে পারে না। সারা বছর স্যাঁতস্যাঁতে, ভ্যাপসা গন্ধ গলিতে অনড় হয়ে থাকে। নতুন মানুষরা ঢুকলেই অনুভব করে, দেড়শো বছরের বন্ধ সিন্দুকের ডালা যেন খুলে গেল। তারা কৌতূহলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে তাকাতে পথ চলে। পাড়ার বৃদ্ধদের সন্দিগ্ধ চোখ দ্রুত হয়ে যায়।

অনন্ত সিংহের মেয়ে পুতুল যোলোয় পড়েছে! দু'বছর আগে, ক্লাস সিক্সে ওঠামাত্র স্কুল ছাড়িয়ে ওকে সংসারের কাজে লাগানো হয় অনন্তের নির্দেশে। সেই সময় থেকে পাত্রের সন্ধান করে করে অবশেষে আহিরিটোলার শীলেদের পঞ্চম পুত্রটির খোঁজ পেয়ে অনন্ত দ্রুত কথা চালিয়ে ব্যাপারটা প্রায় পাকা করে এনেছে। ছেলেটি দু'বার স্কুল ফাইনালে ব্যর্থ হয়ে পৈতৃক হার্ডওয়ার দোকানে বসছে। পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক পেলে আলাদা দোকান করবে বরানগরে। অনন্ত পাঁচ হাজারকে চার হাজার

আটশোয় এবং পনেরো ভরি গহনাকে সাড়ে চোদ্দো ভরিতে নামাতে পেরেছে ছয় মাসে। পাত্রের বাড়ির মেয়েরা পুতুলকে দেখে গেছে। আজ আসবে পাত্র তার দুই বন্ধুকে নিয়ে। মাসখানেক আগে অনন্ত কলি ফিরিয়েছে বাড়ির। দেখলে মনে হয় গলিটার কপালে শ্বেতি হয়েছে।

ঝকঝকে নীল স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডটা যে টিউবওয়েলের ধারে রাখা হয়েছে, সেটি অনন্তর সদর দরজারই লাগোয়া। টিউবওয়েলটি এখানে বসানোর ব্যাপারে ওর সঙ্গে বাসুদেব ধরের প্রচণ্ড একচোট হয়ে গেছল। কুমার চৌধুবি কাউন্সিলর হয়েছে তারই কৃপায়, এ-রকম একটা ধারণা অনন্ত বরাবরই পোষণ করে আসছে।

পাড়ার প্রাচীন এবং বনেদি বাড়ি হিসাবে সিঙ্গিবাড়ি জয়রাম মিত্র লেনে বিদিত। তিনতলায় গোপীনাথ জিউয়ের বিরাট ঘর। তার মেঝে শ্বেতপাথরের। পালা-পার্বণে অনন্ত খরচ করে। এখনও পাড়ায় যে তিন-চারটি বাড়িতে বৈঠকখানা আছে, তার মধ্যে বৃহত্তমটি অনন্তের। চারটি নিচু তক্তপোশেব উপর শতবঞ্চি পাতা। দেয়ালে পাগড়ি মাথায় ওর ঠাকুবদা পূর্ণচন্দ্র এবং তাব ভাই নারায়ণচন্দ্রের তেলরঙা প্রতিকৃতি। ধুলোয় বিবর্ণ। পূর্ণচন্দ্র এক বান্ডিল কোম্পানির কাগজ এবং চাবটি বাড়ি দিয়ে যায় পুত্র গৌরচন্দ্রকে। বছর দশেকের মধ্যে তার অর্ধেক ফুঁকে দিয়ে যৌনব্যাধিতে ভুগে দুই পুত্র অনন্ত ও দুলালকে রেখে গৌরচন্দ্র মারা যায়। বাবা মারা যাবার আট মাসেব মধ্যেই সম্পত্তি ভাগ করে অনন্ত ও দুলাল আলাদা হয়ে যায়।

তেইশ নম্বরের ভিতরের অংশে থাকে দুলাল। পিতার দোষগুলি সে পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করে দু'খানি বাড়িই বিক্রি করে দিয়েছে। এখন সন্ধ্যা থেকেই দিশি মদের দোকানে বসে থাকে। অপরপক্ষে, অনন্ত পৈতৃক সম্পত্তি পূর্ণমাত্রায় রক্ষা কবে, নিজে একটি বাডি কিনেছে, শেয়াব বাজাবে দালালি থেকে অর্জিত অর্থ, তিনটি বাড়ির ও চারটি রিকশার ভাড়া এবং তেজারতি ও বন্ধকী কারবার থেকে মাসে তার যা আয়, তাতে জয়রাম মিত্র লেনের মধ্যে ধনী হিসাবেও সে খাতির পেযে থাকে।

কাজেই ইলেকশনের সময় কুমার চৌধুরি এ-পাড়ায় প্রথম অনন্তর কাছেই এসেছিল। ওকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার প্রতি বাড়িতে যায়। শুধু ছাব্বিশ নম্বর বাড়িটি ছাড়া। বাসুদেব ওব বাল্যবন্ধু কিন্তু বাক্যালাপ বন্ধ যৌবন থেকেই। কুমার সতেরো ভোটে জিতেছিল। বৈঠকখানায় তাকিয়া কোলে নিয়ে দুলতে দুলতে অনন্ত বলেছিল, "আমি না বেবোলে ওই সতেরোটা ভোট পেত কি?"

তাই শুনে সত্যচরণের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল। বিস্ময় দমন করে এক সময় বলতে পারল সে, "সিঙ্গিমশাই যার হয়ে নিজে ক্যানভাস করছেন, সে জিতবে না তো কে জিতবে! এগেনস্টে নেহরু দাঁড়ালেও যে হেরে যাবে। সামনেব বার আপনিই বরং দাঁড়ান, কমপক্ষে দু'হাজাব ভোটের মার্জিনে জিতবেন।"

অনন্ত অপ্রতিভ হয়ে বলে, "না না, ও-সব ঝামেলায় আমি যেতে চাই না। পাবলিক ওয়ার্ক বড় কঠিন কাজ সত্য, বড় কঠিন কাজ। ভাল করলেও ব্যাটা চোর, খারাপ করলেও ব্যাটা চোর। এ হচ্ছে শাঁখের করাত।"

কিন্তু শাঁখের করাত, অনন্তর মনেব মধ্যে তারপর থেকে প্রতিদিনই একটি কথা কেটে চলেছে— "কমপক্ষে দু' হাজার ভোটের মার্জিনে জিতবেন।" পাড়ায় পাড়ায় কুমারের খাতির, বৈঠকখানা ভরতি অনুগ্রহপ্রার্থীদের দেখে মাঝে মাঝে লোভ হয় অনন্তের। নিজের পাড়ার বাইরে কেউ তাকে চেনে না, পাত্তাও দেয় না। ইদানীং সেটা বেশি করে সে বুঝেছে। গত বছর সার্বজনীন পুজোর জেনারেল মিটিংয়ে সত্যচরণ সহ-সভাপতি পদে অনন্তের নাম প্রস্তাব করেছিল। বাসুদেব বানচাল করে বেপাড়ার এক আগরওয়ালার নাম ভোটে পাস করিয়ে নেয়।

তা ছাড়া আর একটি কারণ অনন্তর অবচেতনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে, যেটা সে কোনওক্রমেই তুলে ফেলতে পারেনি। কুমাব চৌধুরির বাবা ভুবনের ছিল সাইকেল সারাই ও ভাড়ার দোকান। স্কুল পালিয়ে অনন্ত একটানা ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া নিয়ে সাইকেল চালানো শিখত। সহায়ক ছিল বাসুদেব। অনন্ত সাইকেলে বসত, এক হাতে সিট আর অন্য হাতে হ্যান্ডেল ধরে বাসু নির্দেশ দিতে দিতে ছুটত— "চাকার দিকে তাকাচ্ছিস কেন? ম্যাড়া কোথাকার, সামনে তাকা... ব্রেক কর গাধা, ব্রেক কর... আরে রাঙামুলো বেলটা আছে কী করতে, বাজা, বাজা।"

কয়েকদিন পর হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়েই বাসু ছুটত। তারপর চুপিসারে সিট ধরা হাতটাও ছেড়ে দিত মাঝে মাঝে। অনন্ত যখন ব্যাপারটা বুঝত অমনি হাত কেঁপে বেটাল হয়ে পড়ে যেত। বাসু সামনের উঁচু দাঁত দুটো বার করে হাসত, "অমন টুকটুকে গতর নিয়ে কি আর সাইকেল শেখা হয় রে ব্যাটা। এবার আমায় দে দেখি।" বলেই তড়াক করে সাইকেলে উঠে পাঁই পাঁই চালিয়ে উধাও হয়ে যেত বাসুদেব। ওদের চুক্তিই ছিল, প্রথম আধঘণ্টা অনন্ত সাইকেল শিখবে, শেষ আধঘণ্টা বাসুদেবের। ভাড়ার পয়সা অবশ্য অনন্তের। বাসু আধঘণ্টায় ধর্মতলা কি শেয়ালদা কি কাশীপুর ঘুরে আসত। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ তখন কয়েক বছর মাত্র তৈরি হয়েছে। এত মোটর, ট্রাক, মানুষজনের ভিড় তখন ছিল না।

একদিন বাসুদেব ফিরল পিছনের মাডগার্ডটা তুবড়ে। সাইকেলটা অনন্তের হাতে গছিয়ে দিয়েই বাসুদেব সটকে পড়ে। ভুবন দেখামাত্র আট আনা ফাইন চেয়ে বসে এবং না-পেলে অনন্তর ঠাকুরদার কাছ থেকে আদায় করে আনবে বলে হুমকি দেয়। পূর্ণচন্দ্রের বয়স তখন উনসত্তর। বদরাগি, রাশভারী। কয়েকদিন আগেই চার পয়সার বদলে সাড়ে চার পয়সার গামছা কেনার জন্য লাঠি হাতে দুই সন্তানের পিতা গৌরচন্দ্রের দিকে তেড়ে গিয়ে বলেছিল, "রক্ত জল করা পয়সা আমার, আর বাবুয়ানি করে ফুঁকে দেওয়া হচ্ছে?" এমন লোকের কাছে আট আনা এবং পৌত্রের পিঠের চামড়া সমান বস্তু।

অনন্ত ভয়ে কেঁদে ফেলে। তাই দেখে হঠাৎ নরম হয়ে গেল ভুবনের মন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে ওকে দোকানের ভিতরে নিয়ে গেল ভুবন। ন'-দশ বছরের কুমার বসেছিল দোকানের মধ্যে। তাকে ধমক দিয়ে বার করে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। অনন্ত যখন বেরিয়ে এল তখন বাসুদেব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কুমারের সঙ্গে। অনন্তকে দেখে মিটমিট হেসে বলল, "ফাইন শোধ হয়ে গেছে তো, ব্যস। এবার থেকে তোর ভাড়ার পয়সাও আর লাগবে না।" শুনে কুমারও হেসে ওঠে।

ওইদিন থেকেই অনন্ত চটতে শুরু করে বাসুদেবের ওপর। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। বাসু যদি ব্যাপারটা রটিয়ে দেয়, লজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। তারপর পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে। ভুবন মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানও উঠে যায়। কুমার এখন একান্ন টাকা ফি-এর উকিল। ওকে দেখলেই অনন্তর মনে পড়ে, দোকান থেকে বেরোবার আগে কেমন অদ্ভুতভাবে ও তাকিয়েছিল তাদের দু'জনের দিকে আর হেসেছিল। নিশ্চয় বুঝেছিল ব্যাপারটা। এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে আর ভিতরে দুঃসহ জ্বালা বোধ করে অনন্ত। ইলেকশনে দাঁড়িয়ে কুমারকে হারিয়ে দিতে পারলে বোধহয় কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে -এই চিন্তা তখন জেঁকে বসে।

কিন্তু কুমার তাকে যথোচিত সমীহ ও সম্ভ্রম দেখায়। কুমারের নির্দেশে, তার সদর দরজার মাথায়ই রাস্তার আলো লাগানো হয়েছে তাই নিয়ে বাসুদেব গণ-দরখাস্ত সংগ্রহ করে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল কমিশনারের কাছে। টিউবওয়েলও বসেছে অনন্তর বাড়ির লাগোয়া।

"কর্পোরেশন কি কারুর বাপের সম্পত্তি।" টিউবওয়েল বসাবার সময় বাসুদেব চিৎকার করেছিল পাড়ার দু'-তিনজনকে দাঁড় করিয়ে। "দেখুন, কোথায় বসানো হচ্ছে দেখুন। এখানে টিউবওয়েল বসলে পাড়ার একটা বাড়ি ছাড়া আর কার লাভ হবে, বলতে পারেন? সকলের বেনিফিটের কথাটা ভাবুন একবার। আমরা কি ট্যাকসো দিই না? ধরুন, হঠাৎ কারুর রান্নার জল ফুরিয়ে গেল, বাড়িতেও তখন কোনও পুরুষ কি ছোট ছেলেপুলে নেই যে দৌড়ে এক বালতি জল এনে দেয়। এমন অবস্থা হতে তো পারে? বলুন, আপনারাই বলুন, তখন কি বাড়ির মেয়েরা এত দূরে এসে কল থেকে পাম্প করে জল নিয়ে যাবে? যুবতী মেয়েও তো অনেক বাড়িতে রয়েছে, তারা কি এখানে আসবে জল নিতে?"

বাসুদেবের কথা শুনে একজন বললে, "পাড়ার আরও ভিতর দিকে বসলেই ভাল হত, বেপাড়ার লোক এসে দিনরাত জল নিয়ে নিয়ে কলটা খারাপ করে দিতে পারবে না।"

আর একজন বলল, "ভিতরে বসাবার স্থান কোথায়! কল বসলে রিকশাও আর যেতে পারবে না। এখানে রাস্তাটা চওড়া, ঠিকই বসানো হচ্ছে। রাত্রদিন খ্যাচাং খ্যাচাং শব্দ আর জল-কাদায় রাস্তা মাখামাখি হয়ে তো থাকব, বরং বাইরের দিকেই বসানো ভাল। পিপাসা পাইলে বাইরের লোক এসে খ্যায়া যেতে পারব।"

"দেখুন মশাই, আপনাদের মাথায় মেয়েদের প্রেস্টিজ জিনিসটা একদমই আসে না। আপনাদের মেয়েরা যেটা অনায়াসে পারে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেয়েদের সেটা করতে বাধে। টিউয়েলটা এখানে

বসানো কেন উচিত নয়, সেটা অন্য পয়েন্ট থেকে দেখছি আমরা, আপনি আর কথা বলতে আসবেন না।" বাসুদেব এক বেঁটেখাটো নিরীহদর্শন লোকের নাকের কাছে ঘন ঘন হাত নাড়ল চপেটাঘাতের ভঙ্গিতে। এরপর দেখা গেল পাড়ার এক-চতুর্থাংশ বাসুদেবের বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং টিউবওয়েলও অনন্তের সদরের পাশেই বসেছে।

প্রথম জল নেয় সত্যচরণ। টিউবওয়েলকে স্নান করিয়ে চারপাশের তিন হাত পর্যন্ত রাস্তা জল দিয়ে ধুয়ে বালতি পাতার আগে সে চেঁচিয়ে বলেছিল, "যুবতী মেয়েদের জন্য ভেবে ভেবে তো আমাশা হয়ে গেল ব্যাটার। নিজের মেয়ের কী হল সেটা খোঁজ কর আগে।"

বাসুদেব কথাগুলো স্বকর্ণে শোনেনি। গল্পচ্ছলে শেফালি বলে আসে বাসুর বউকে এবং সত্যচরণ দোতলার পিছন দিকে লুকিয়ে একটা পায়খানা করেছে, সে-তথ্যও জানিয়ে দিল। বাসুদেব দ্রুত কর্পোরেশনে বেনামা চিঠি দিয়ে সত্যচরণের একশো টাকা খসিয়ে দেয়। রাগটা তাতে অনেকখানি কমে।

অনন্ত এই সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে দেখল, সদরের অর্ধেক আড়াল করে একটা ঝকঝকে নীল মোটর দাঁড়িয়ে। সুতরাং চিৎকার করল, "গাড়ি কার, অ্যাঁ, রাখার কি আর জায়গা পেল না। এটা লোকের বাড়ির সদর, সেটা খেয়াল হল না।"

"কী হয়েছে অত চেঁচাচ্ছেন কেন?"

পা টেনে টেনে অসীম এগিয়ে এল। ওর গম্ভীর গলা, যেটা 'চুপ কর শালা' বলার সময় প্রয়োগ করে—শুনে অনন্ত থতমত হল। আঠারোর-সির দ্বারিক চক্রবর্তী অর্থাৎ ভোম্বল দোতলার জানলা থেকে উঁকি দিল।

"আমিই বলেছি ওখানে রাখতে। পাড়ার মধ্যে মোটর রাখার আর জায়গা কোথায়? যা একখানা গলি। রিকশা ছাড়া আর কিছুতে চড়া মানুষ তো কোনও জন্মে ঢোকেনি। অসুবিধে হয় তো একটু ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি বরং।"

"একটু পরেই পুতুলকে দেখতে আসবে তো। তাই বলছিলুম," অনন্ত কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বলল, "কে এল অসীম, কার বাড়িতে?" ফ্যালা নামে ডাকার ভরসা হল না তার।

উত্তর পেয়ে অনন্ত অবাক হয়ে মোটরটার দিকে তাকিয়ে রইল। অসীম চলে যাচ্ছে একটু খুঁড়িয়ে। অনন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, "হল কী পায়ে?"

"চোট লেগেছে।" অসীম মুখটুকুও ফেরাল না।

"চিকিৎসা করাচ্ছ তো?" অনন্তকে চেঁচিয়ে বলতে হল, কেন না জবাব দিতে অসীম দাঁড়ায়নি।

কিন্তু শুনেছে। দাঁত চেপে অসীম নিজেকে শুনিয়ে বলল, "দরদ দেখাচ্ছে।" এখুনি তার ত্রিশটা টাকা দরকার, কেন না ওর বাবা এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। যে-ভাবে হোক এখুনি তাকে টাকা জোগাড় কবতে হবে।

অনন্ত চিন্তায় পড়ে গেল। গাড়িটা এখানে থাকলে, ওরা এসে দেখে কিছু ভাববে না তো। এ-সব লোক লম্পট দুশ্চরিত্র হয় বলেই তার ধারণা। ত্রিশ বছরে গুটি চারেক সিনেমা সে দেখেছে, কিন্তু ফ্যালাটা যার নাম করে গেল তার 'বই' একটাও দেখেনি। পুতুলের ডিসকোয়ালিফাই হবার কারণ, এই গাড়িটা হতে পারে কি না, সেটা কার কাছ থেকে জানা যাবে, তাই ভাবতে শুরু করল অনন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ঝি ভিতর থেকে এসে বলল—

"বাবু, মা তাড়া দিচ্ছে। আর বলে দিল সন্দেশগুলো বড় বড় আটআনাওলার আনতে। ওম্মা, গাড়ি কার গো, এসে গেছে নাকি!"

"অন্য লোকের গাড়ি।" অনন্ত গম্ভীর স্বরে বলল। এইসময় তার মনে হল, সদরে এমন ঝকঝকে একটা মোটর দাঁড়িয়ে থাকলে মন্দ দেখায় না। গৃহস্বামীর মানও বাড়ে। পুতুলের মামা কি মেসোর গাড়ি বলেও তো চালিয়ে দেওয়া যায়!

বাসুদেব ধর অফিস থেকে ফিরছে। দূরে ওকে দেখতে পেয়েই অনন্ত সিংহ মোটরটার বাম্পারে একটা পা তুলে দিল। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে, এটার মালিক তার খুবই নিকট আত্মীয়, এতই নিকট যে পা পর্যন্ত তোলা চলে, এমন একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে অনন্ত আকাশে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

যাবার সময় বাসুদেব আড়চোখে একবার মাত্র তাকাল।

চার

দ্বারিক ওরফে ভোম্বল জয়রাম মিত্র লেনে সব থেকে ভাল ছেলে হিসাবে ঘরে ঘরে সুখ্যাত। স্কুল ফাইনালে অঙ্কে লেটার পায়। বি. কম.-এ উঁচু সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে। কিছুদিন জোড়াবাগানে এক আখড়ায় কুস্তি শিখেছিল। লাইব্রেরি থেকে বই আনে হপ্তায় চারবার। দ্বারিক স্কুলজীবনে মোহন সিরিজ, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর শেষ করে ফেলেছে। কলেজে ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হয়ে কিছুদিন বিবেকানন্দ এবং মাও-সে-তুং পড়ে। ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকে এখন রবীন্দ্রনাথ পড়ছে। তবে ছোকরা লাইব্রেরিয়ানটি যে-দিন বসে, সেদিন ক্যাটালগে যৌন-বিজ্ঞানরূপে চিহ্নিত বইগুলি থেকেই একটি নেয়। নিজের ঘরে তোশকের নীচে সেই বই রাখে। দরজা বন্ধ করে গভীর রাতে পড়ে এবং শরীরে খুবই চঞ্চলতা অনুভব করে। লুকিয়ে হিন্দি ফিল্ম দেখছে প্রায়শই। সন্ধ্যার পর চৌরঙ্গি অঞ্চলে সে অলসভাবে হেঁটে ফেরে। সুগঠিতা মহিলারা এই অঞ্চলে মানসিক জড়তামুক্ত হয়ে চলাফেরা করে এবং তাদের দেখতে দেখতে দ্বারিক ঝিমঝিমে এক ধরনের অনুভবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে কাউকে কাউকে অনুসরণ করে, কখনও সিনেমায়, কখনও মনুমেন্টের নীচে রাজনৈতিক প্রতিবাদ সভায়, কখনও বাসে উঠে গড়িয়া বা হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর বাড়ি ফেরার সময় নিজেকে প্রভূত ধিক্কার দিতে দিতে প্রতিজ্ঞা করে—"এই শেষ। আর এ-ভাবে ইন্দ্রিয়ের দাস হব না। কিছুতেই না।" পরদিন থেকেই সে শীর্ষাসন শুরু করে, এবং সপ্তাহকাল অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসে। ট্রামে বা বাসে লেডিজ সিটের দিকেও তাকায় না। কিন্তু পরশু দিনই গড়ের মাঠ থেকে পিছু নিয়ে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের পার্ক সার্কাসের বাড়ির দরজায় পৌঁছেই বিবেকের এক প্যাঁচে নিজেকে মাটিতে ফেলে কষে লাথি মেরেছে আর বলেছে—"এই শেষ, এই শেষ।"

প্রকৃতপক্ষে দ্বারিক কিন্তু মুখচোরা, দায়িত্ববান যুবক। চাকরিতে ঢুকেই ব্যাঙ্কিং-এর প্রথম পরীক্ষা পাশ করে সাত টাকা ইনক্রিমেন্ট পেয়েছে, দ্বিতীয়টির জন্য তৈরি হচ্ছে। তা হলে আরও দুটি ইনক্রিমেন্ট পাবে। এখন তার বেতন প্রায় সাড়ে তিনশো। এম. কম. পরীক্ষা সামনের বছর দেবেই। অফিসে পরিশ্রমী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। দ্বারিকের বারো বছর বয়সে মা এবং ষোলো বছরে বাবা মারা যায়। দুই দাদার যৌথ সংসারে সে এখন মাসিক দেড়শো টাকার সদস্য। দোতলার রাস্তার দিকের ছোট ঘরটি তার ফলে সম্পূর্ণই তার একার। পাঁচ হাজার টাকার জীবনবিমা করেছে সে। ব্যাঙ্কে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা জমা দেয়। প্রতিদিন জমা খরচের হিসাব লেখে, রাত্রে শোবার আগে। প্রতি রবিবার কাগজে জমি-বাড়ি-সম্পত্তির বিজ্ঞাপনগুলি খুঁটিয়ে পড়ে। কলকাতার আশেপাশে চার-পাঁচ কাঠা জমি কিনে রাখার ইচ্ছা সম্প্রতি তার হয়েছে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

সাতটি নাবালকের বাবা অফিসের ভোলানাথ পাড়ুই এক বিকেলে ট্রামে উঠতে গিয়ে পিছলে বাসের চাকার নীচে চ্যাপটা হয়ে যায়। হাসপাতাল এবং শ্মশান হয়ে দ্বারিক ভোলানাথের বাড়িতে গেছল। সেখানে ছেলেমেয়েগুলির অসহায় মুখ এবং ভোলানাথের স্ত্রীর কান্না শুনে, দ্বারিকের বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। নিজেকে ভোলানাথের জায়গায় কল্পনা করে, তারপর থেকে সে মাঝে মাঝেই ভয় পাচ্ছে। সাবধানে রাস্তা পার হয়, নিশ্চল না-হওয়া পর্যন্ত ট্রামে-বাসে ওঠে না, কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে বসন্তের টিকা নিয়ে এসেছে। এমনকী বিয়ে না করার কথাও সে ভেবেছে। বড়বউদি তার বিবাহযোগ্যা এক মাসতুতো বোনের অসাধারণ রূপ ও গুণাবলির কথা ইদানীং দ্বারিককে প্রায়ই শোনাচ্ছে। মেজবউদি আড়ালে তাকে বলেছে, "সব বাজে কথা, মানুর থেকেও দেখতে খারাপ।"

মানু অর্থাৎ মনীষা এইবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে। বছর পাঁচেক আগে এ-পাড়া থেকে উঠে গিয়ে শ্যামপুকুরে রয়েছে। মেজবউদির থেকে বয়সে দশ-বারো বছরের ছোট, কিন্তু সখীস্থানীয়া। এ-পাড়ায় থাকার সময় ফ্রক পরে রোজই আসত। তখন ওকে দেখে দ্বারিকের সাধ হত হাস্য-পরিহাসের, সান্নিধ্যলাভের। কিন্তু ঘড়ঘড়ে গলায়, "এই যে" বলা ছাড়া আর কিছুই বলা হয়ে ওঠেনি।

তারপর হঠাৎ একদিন অফিস যাবার জন্য বাস স্টপে দাঁড়িয়ে দ্বারিক দেখল, মানু শাড়ি পরে কলেজে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে দ্বারিকের মনে হল মানু তো বেশ সুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বাসনার উদয় হল এবং তারই প্রকোপে সে মুগ্ধ হয়ে তাকাল। মানু ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় লাজুক হয়ে মাথাটা

নামিয়ে আঁচলটি বুকে টেনে দেয় এবং কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। এরপর, প্রায়ই দ্বারিক বাস স্টপে দাঁড়িয়ে তিন-চারটি বাস ছেড়েও অপেক্ষা করে। মাঝে মাঝে দেখা হয় মানুর সঙ্গে। কিন্তু প্রথম দিনের মতোই মানু মাথা নামিয়ে চলে যায় এবং দূরে গিয়ে তাকায়। দ্বারিকের খুব ইচ্ছা করলেও আজও কথা বলা হয়ে ওঠেনি।

মানু গড়নে রোগা এবং ঢ্যাঙা। মাথায় প্রচুর চুল, গায়ের রং মিশকালো। হাসে হো হো করে, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় শেষের দুটি ধাপ লাফিয়ে নামবেই, কণ্ঠস্বর অসম্ভব মিষ্টি এবং ভালই গান গায়, তর্ক করতে ভালবাসে, যুবকদের নাজেহাল করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না, কলেজ স্পোর্টসে দৌড়োয় এবং কলেজ ইলেকশনে বক্তৃতা দেয়। মা-বাবা এবং পাঁচ ভাইবোনের সংসারে কোনও কাজ করতে তার ভাল লাগে না। দ্বারিকের মেজবউদি প্রায়ই ভালমন্দ শখের রান্না করে, ঘরে হিটার জ্বেলে। কীভাবে যেন মানু তখন ঠিক হাজির হয়ে যায়। ও অসম্ভব খেতে ভালবাসে। অকপটেই বলে, "ভাত-ডাল-চচ্চড়ির বেশি তো আর জোটে না! তাই যেখানেই খাবার গন্ধ পাই ঠিক হাজির হই। কলেজে অ্যায়সা খিদে পায়, মাঝে মাঝে ভাবি বেশ পয়সাওলা ছেলে যদি পাই তো প্রেম করি!" তারপরই হো হো করে হেসে উঠে বলে, "যা রক্ষেকালীর মতো চেহারা আমার। একটা ছেলেও কাছে আসে না।"

এইসময় হঠাৎ মানু এসে হাজির। দ্বারিক তখন সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অসীমের চেঁচিয়ে বলা কথায় উঁকি দিয়ে ঝকঝকে আকাশি-নীল একটা মোটর দেখে কৌতূহলী হয়ে নীচে নেমে আসে। সত্যচরণ বালতি হাতে যাচ্ছিল জল নিতে। দ্বারিককে দেখে বলল, "হ্যাঁ গা, গাড়িটা এখানে রাখা কি উচিত হল, বলো তো তুমি?"

"কার গাড়ি?"

"ওম্মা, এখনও শোনোনি। ওই যে বায়স্কোপের হিরো গো। যাকে দেখলে মেয়েরা পাগল হয়ে যায়।"

নামটা শুনে খুবই অবাক হল দ্বারিক। বিশ্বাসই করতে পারল না। অসীমকে আসতে দেখে সে ইতস্তত করল, জিজ্ঞাসা করবে কি না।

"ওগো, এটাকে তো পাড়ায় ঢোকালে", সত্যচরণ অসীমকে লক্ষ্য করে বলল, "চাকায় চাকায় যত রাজ্যের গু-মুত এবার থেকে ঢুকতে শুরু করবে তো।"

"তা করবে।" অসীম তার প্রায় ছ' ফুট দেহটিকে তেরিয়া করে দাঁড়াল। সত্যচরণ কথা না বাড়িয়ে ডিঙি মেরে কিছু একটা অতিক্রম করে টিউবওয়েলে পৌঁছে গেল।

"চাকায় চাকায় আসে আর লোকের পায়ে পায়ে আসে না? রাস্তাটা কি আপনার শোবার ঘর?" অসীম আরও কিছু বলত, ওর ছোটভাইকে ছুটে আসতে দেখে চুপ করল।

"দাদা, সেই লোকটা এসেছে।"

"কিছু বলেছে?" চাপা গলায় অসীম বলল।

"হ্যাঁ, রাগারাগি করছে, টাকা ফেরত চাইছে আর তোমাকেও খুঁজছে।"

কিছুক্ষণের জন্য পাংশু হয়ে রইল অসীমের মুখ। দ্বারিক তাকিয়ে আছে দেখে ছোটভাইকে বলল, "আমি ঠাকুরের চায়ের দোকানে আছি, চলে গেলেই খবর দিবি।"

অসীম চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানু এল। দ্বারিক তখনও সদরে দাঁড়িয়ে। মানুকে দেখামাত্র বলল, "কার গাড়ি বলো তো?"

মানু অবাক হল। এমন উত্তেজিত ছেলেমানুষি গলায় দ্বারিককে কথা বলতে শোনেনি কখনও। তা ছাড়া চারটি শব্দবিশিষ্ট বাক্য দ্বারা কোনওদিন যেচে কথাও শুরু করেনি। মোটরের দিকে এক পলক তাকিয়ে সে বলল, "কী জানি।"

"যদি বলতে পারো তা হলে মিত্র কাফের ফাউল দোপেঁয়াজি খাওয়াব, ফুল প্লেট।"

"ওরে ব্বাস, তবে বলতেই হয়।" মানু কোমরে হাত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আকাশ-পাতাল ভাবার ভান করল। দ্বারিক সেন্টের মৃদু গন্ধ পেল। খোঁপায় লাল গোলাপ দেখল। শাড়িটি সিল্কের। ব্লাউজের হাতা নেই।

সত্যচরণ বালতি ভরে জল নিয়ে যেতে যেতে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে গেল। দ্বারিক তাইতে

অস্বস্তি বোধ করল। মেজবউদি বিকেলে বাপের বাড়ি গেছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। মায়ের নাকি অসুখ করেছে, রাতে ফিরবে। বড়বউদি ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী। অফিস থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দ্বারিকের কানে আসে বড়দা বাঁকা সুরে বলছে, "রান্নাঘরে যেতে হবে কিনা, তাই বোধহয় মায়ের অসুখ হয়েছে।"

মেজবউদি না থাকলে মানুর এ-বাড়িতে ঢোকার কোনও কারণই থাকে না। বড়বউদির সঙ্গে ওর আলাপটা নেহাতই সৌজন্যমূলক। দ্বারিক সাহস করে বলে ফেলল, "এখানে দাঁড়িয়ে ভাবলে আর বলতে পারবে না। মেজবউদি তো নেই, বরং আমার ঘরে বসে ভাবতে পারো।"

"কোথায় গেছে মেজবউদি।"

"বাপের বাড়ি, মায়ের অসুখ করেছে। কোথাও যাচ্ছ নাকি, এত সেজেছ যে?"

"ধ্যেৎ, একে আবার সাজা বলে নাকি। এই চেহারায় সাজবটা কোথায়।"

হেসে উঠতে গিয়ে, দ্বারিকের মুখের দিকে তাকিয়ে মানুর বুকের মধ্যেটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। দ্বারিকের চোখে ভর্ৎসনা এবং আহত হওয়ার মিশ্র একটা রূপ ফুটে রয়েছে। অস্ফুটে সে বলল, "চলুন।"

দু'জনেই পা টিপে চুপিসারে দোতলায় এসে দ্বারিকের ঘরে ঢুকল। কেন যে এমন করে লুকিয়ে এল, ওরা তার কৈফিয়ত খোঁজার জন্যই বোধহয় পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। দ্বারিকের চোখ চাপা উত্তেজনায় ঝকঝক করছে। খড়খড়ে গলায় সে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, বসো।"

"আপনার ঘরে এই প্রথম এলুম।"

"সে কী! এত বছর আসছ অথচ—"

"যা গম্ভীর আপনি। ভয় করে আপনাকে দেখলে।"

"এখন করছে না?" দ্বারিক খুশি হয়ে দরজার পর্দাটা ভাল করে টেনে দেবার জন্য পিছু ফিরল।

মানু ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে, টেবিলের উপর পাতা খুলে উপুড় করে রাখা একটি বই দেখে বলল, "পড়ছিলেন বুঝি?"

ফ্যাকাশে মুখে ঘুরে দাঁড়াল দ্বারিক। বইটা তোশকের নীচে রেখে একতলায় যাওয়া উচিত ছিল তার।

"হ্যাঁ, ব্যাঙ্কিংয়ের সেকেন্ড পার্টটা দেব ভাবছি।"

দ্বারিক পায়ে পায়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। তবু রক্ষে বইটা কালো মলাটে বাঁধানো। টেবিলে আরও কয়েকটা বই রয়েছে। মানুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বইটা চটপট গুঁজে দিল অন্যগুলোর মধ্যে।

"কী, বললে না তো, এখন ভয় করছে কি না?" হাঁফ ছেড়ে দ্বারিক মুখোমুখি চেয়ারে বসল।

"বলুন না গাড়িটা কার?"

"উঁহু, আগে আমার কথাটার উত্তর দাও।"

"কী উত্তর দেব।"

"বা-রে, সেটা কি আমি বলে দেব।"

"দিন না বলে।" হেসে মুখ ফিরিয়ে আলনায় ঝোলানো পোশাকগুলো দেখতে মন দিল। দ্বারিকের মনে হল, এত সুন্দর মুখ আর হয় না।

"বললে কী খাওয়াবে?"

"আমার পয়সা কোথায় যে খাওয়াব।"

"পয়সা লাগে বুঝি খাওয়াতে।"

মানু চট করে দ্বারিকের মুখটা দেখে নিল একবার। বেপরোয়া দুঃসাহসে পেয়ে বসল দ্বারিককে। জীবনে এই প্রথম একঘরে একটি বিংশোত্তীর্ণা অনাত্মীয়া কুমারীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সে পেয়েছে, জীবনে আর কোনওদিন আসবে কি না কে জানে। এলেও হয়তো তখন সে আর যুবক থাকবে না। কিংবা কালই ভোলানাথ পাড়ুইয়ের মতো বাস চাপা যেতে পারে।

"পয়সা লাগে না এমন জিনিসও তো মেয়েরা খাওয়াতে পারে!"

"সে আবার কী জিনিস?" মানু সন্ত্রস্ত হয়ে খোলা বাঁ-কাঁধটি আঁচলে ঢাকল। দ্বারিকের চোখে অদ্ভুত মিষ্টি এক চাহনি।

"বলব?"

হ্যাঁ, বলতে গিয়ে কিছু না বলে, মানু মাথা নুইয়ে চুপ করে রইল। দ্বারিক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ভাবল, শেষ পর্যন্ত বোধহয় যুবক হতে পারব।

মনে মনে সে দ্রুত বলল, আসলে আমি খুব ভিতু। কোনওদিন মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ তো হয়নি। আমার গাম্ভীর্যটা পুরোপুরিই নকল। আমায় তুমি ভয় পেয়ো না, কেমন।

দম বন্ধ করে উৎকণ্ঠিত চোখে দ্বারিক তাকিয়ে রইল। মানু মুখ তোলেনি।

"মনীষা, উত্তর দিচ্ছ না যে?"

মুখ তুলে মানু তাকাল। দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। দ্বারিকের বুকের মধ্যে মোচড় দিল। কী বলবে ভেবে না পেয়ে, অসহায়ভাবে এধার-ওধার তাকাল। দারুণ একটা কিছু বলতে ইচ্ছে করছে তার এবং কোনওক্রমে আবেগ সংযত করে বলল, "ওই নীল গাড়িটায় আমাদের পাড়ায় কে এসেছে জানো!"

নামটা শুনেও কোনও ভাবান্তর ঘটল না মানুর। তাইতে দ্বারিকের মনের গভীরে নিরুদ্বিগ্ন সুখের সঞ্চার ঘটল। হেসে বলল, "বেরিয়ে যখন মোটরে উঠবে আমার এই জানলা দিয়ে দেখা যাবে। তুমি ততক্ষণ বসবে?"

মানু ঘাড় নেড়ে বলল, "আমার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না দেখার।"

পাঁচ

"অ বউ, কোথায় গেলি, সন্ধে দেখিয়েছিস? অ বউ, শুনতে পাচ্ছিস? খোকাকে বলিস কাল বাজার থেকে যেন কচুবমুখি আনে। মনে করে দিস ওকে। বড়ি দিয়ে ঝাল করিস।"

থুত্থুড়ে শাশুড়ি একতলায় দালানের এক কোনায় সকাল-সন্ধে উবু হয়ে বসে থাকে। হামা দিয়ে নর্দমা পর্যন্তও যেতে পারে না। চোখে দেখে না, কানে কম শোনে।

"অ বউ, খোকা দোকান থেকে ফিরেছে?"

কোনও সাড়া না পেয়ে অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলল, "আঁটকুড়ির গেরাযি্যই নেই। মর তুই, খোকার আবার বিয়ে দেব, টুকটুকে বউ আনব, বছর বছর বিয়োবে, দেখি তোর দেমাক থাকে কোথায়।"

বুড়ি এখন ঘণ্টাখানেক এইভাবে বকবক করে যাবে। কিন্তু যাকে শোনাবার জন্য, সে তখন দোতলায় ইলার রান্নাঘরের দরজায়।

"বলিস কী লো, সত্যি!" পারুল ধাক্কাটা সামলে ওঠার জন্য দরজাটা চেপে ধরল।

"হ্যাঁ রে, গুঁপো-ঠাকুরঝি এই তো জানালা দিয়ে বলল। তিনের-বি-তে যে বিধবা মাস্টারনি থাকে, ওই যে রে, রাস্তায় কুকুরদের বিস্কুট কিনে খাওয়ায়, ওরই কাছে এসেছে।" ইলা বেগুনের পিঠ ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল।

"যাঃ, বাজে কথা, অন্য কেউ হবে।" পারুল বিশ্বাস করতে পারছে না। "এই গলিতে কী কত্তে আসবে, ওর মতো দেখতে কেউ হয়তো হবে।"

"তোর অমনি অবিশ্বাস।" ইলা চটে উঠল। বেগুনটাও পুড়ে গেছে। কড়াটা ঠকাস করে উনুন থেকে নামিয়ে রাখল। "কেন, আসতে পারে না নাকি এ পাড়ায়? এক সময় কত বড় বড় লোক ছিল জানিস! ওই যে ছুঁচিবেয়ে সত্যচরণ, ওর ঠাকুরদার নামে মেডিকেল কলেজে একটা বেড আছে। স্যাকরা বাড়ির পাশে বাসু ধর, ওদের বাড়িটা তো তিন মহলা ছিল, ওই পেছনের কালী ঘোষ স্ট্রিটে ছিল সদর দরজা, এখন তো ওরা থাকে আগের বাড়ির খিড়কির দিকে। সব বিক্রি হয়ে গেছে। ওর যে কাকা ব্রাহ্ম হয়ে গেছে, সে হাইকোর্টের জজ হয়েছিল, এই পাড়াতেই তো মানুষ! আর এখনও কি নেই ভেবেছিস? ওই প্রোফেসারের কাছে কত বড় বড় লোক আসে তা জানিস?"

ইলার রুদ্ধশ্বাস বাক্যস্রোতে পারুল ভেসে গেল। ধুপ করে উবু হয়ে বসে ইলার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "চল না, একটুখানি দেখে আসি। সিনেমায় কত দেখেছি, রক্ত-মাংসের মানুষটাকে সামনা-সামনি একবারও দেখিনি। দেখ না, রোজই তো বাপু এই সময় রাস্তার জানলার ধারে এটা করি

ওটা করি, কেউ গেলে চোখে পড়েই। আর আজকেই এমন বরাত যে—আরে বলব কী, বিকেল থেকেই বুড়িটা খালি খাব খাব করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। চুপ করে শুয়েছিলুম। মনে হল বটে মোটরগাড়ির মতো কী একটা যেন ঢুকল। বুড়ি যে কবে ঘাটে যাবে।"

অন্য সময় হলে পারুলের শাশুড়ির বিষয়ে শোনার সময় হত ইলার, এখন সে-ও ব্যস্ত হয়ে বলল, "ওনারও মাথা ধরেছে, শুয়ে আছেন খোকাকে নিয়ে।"

"ভালই তো হল, চট করে তাঁতিগলিতে ঢুকে জানালা দিয়ে দেখেই চলে আসব। মাইরি, একবার চল।" পারুল দু' হাতে ইলাকে জড়িয়ে শব্দ করে গালে চুমু খেল এবং বগলের নীচে খামচে ধরল।

"অই অই, আবার যা-তা শুরু হল তো।" ইলা সরিয়ে দিল পারুলের হাত। গলা নামিয়ে বলল, "উনি রয়েছেন ঘরে, পাগলামি করিসনি।"

"ওরে বাব্বা, আজ যে বড় তাড়াতাড়ি! দশটা-এগারোটার কম তো ফেরে না।"

"মাথা ধরেছে ভীষণ।"

"শনিবার দিন তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছল, আমি না থাকলে আর উঠতে হত না—বাব্বাঃ মুখে কী ভুরভুরে গন্ধ।"

ইলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল পারুলের দিকে। আঁটকুড়িটার বড্ড নজর অশোকের দিকে। রোজ রাতে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য জেগে বসে থাকে। যখন তখন উপরে উঠে আসে অশোক থাকলে। গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক থাকে না। ওর জন্যই শেফালিদের ছাদের দিকের জানালাটা বন্ধ রাখতে হয়। শনিবার রাতে অশোককে ধরে তুলেও দিয়েছে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ইলা, হঠাৎ মনে পড়ল দোকান থেকে আট গজ মারকিন আনিয়ে দিয়ে পারুল দাম নেয়নি।

"কী দেখছিস, যাবি তো তাড়াতাড়ি কর।"

পারুল এইভাবে ইলার তাকানোয় অস্বস্তি বোধ করল। তাও সে বলেনি, অশোক বারবার ঝুমি ঝুমি, তোমাকে ঝুমির মতো দেখতে, বলে ঘাড়ে চুমু খেয়েছিল। ঝুমিটা কে, ক'দিন ধরে পারুল তাই জানার চেষ্টা করেও জানতে পারেনি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নামটা ইলার সামনে করেছে কিন্তু ইলা কখনও শুনেছে বলে মনে হয়নি তার।

পারুল উঠে দাঁড়াল। শোবার ঘরের আধখানা দেখা যাচ্ছে। খাটে আট মাসের বাচ্চাটা ঘুমচ্ছে। তার পাশে অশোকের পিঠ আর মাথা। ফুটফুটে, উলের বান্ডিলের মতো নরম ছেলেটা। সারা দুপুর ওকে নিয়ে পারুল চটকায়, কাঁদায় হাসায়। অমন একটা বাচ্চা তার চাই। বাপের বাড়ি গিয়ে, লুকিয়ে সে ডাক্তার দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে। ডাক্তার বলেছে, বাঁজা নও। তোমার স্বামীকে পরীক্ষা করা দরকার, তাকে নিয়ে এসো। মৃত্যুঞ্জয়কে সে-কথা আজও জানায়নি পারুল। মা হবার ক্ষমতা তার আছে, এইটুকু জেনে সে স্বস্তি পেয়েছে। আঁটকুড়ি আঁটকুড়ি শুনে এখন তার প্রচণ্ড রাগ হয় অপদার্থ হোঁতকা স্বামীর ওপর। ময়না কিনে দিয়েছে, টিয়া কিনে দিয়েছে অথচ সাজানো তকতকে ঘরটা তছনছ নোংরা করে দেবার মতো একটা দস্যি নিয়ে আসার ক্ষমতা নেই। দোকান থেকে রোজ রাতে বাড়ি ফিরে টাকার হিসেব নিয়ে বসবে। একটা সিকি এধার-ওধার হয়ে গেলে রাতে ঘুমবে না। মাদুলি, জলপড়া, হত্যে দেওয়া, মানসিক করা—সব কিছুই মৃত্যুঞ্জয়ের নির্দেশে করে যায় পারুল। শুধু ডাক্তারের বলা কথাটা জানায়নি।

ইলা পিছন ফিরে রান্না ঢাকা দিয়ে রাখছে। পারুল শোবার ঘরে বাচ্চার দিকে আবার তাকাল। হঠাৎ অশোককে পাশ ফিরতে দেখে সে চোখ সরিয়ে নিল। ইলা ন্যাতা দিয়ে রান্নাঘরের মেঝে নিকোচ্ছে। পারুলের মনে হল যেন, অশোক ও-ঘর থেকে তার দিকে তাকিয়ে। সন্তর্পণে সে চোখ ফেরাল। সোজা তার মুখের উপর একদৃষ্টে অশোক তাকিয়ে। ওর চোখে পারুল কী যেন দেখতে পেল আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে থরথর করে উঠল।

"আমার শরীরটা কেমন করছে রে ইলা।"

"সে কী রে।"

"হ্যাঁ, বুকের ব্যথাটা শুরু হবে মনে হচ্ছে। বোধহয় আমি আর যেতে পারব না।" পারুল দেয়ালে হাতের ভরে শরীর রেখে চোখ বুজল।

"সে কী। তোরই তো লাফানি বেশি আর তুই-ই এখন যেতে পারবি না বলছিস। কী যে ঢং বুঝি না বাপু।" ইলা গরগর করে উঠল ক্ষোভে।

"আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, মাথা ঘুরছে, তুই বরং শেফালি ঠাকুরঝিকে সঙ্গে নে, আমি আর যাব না। শুয়ে পড়ি।" বলতে বলতে পারুল সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল দ্রুত। শেষের তিনটে ধাপ আগে পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে গেল সে। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে, আলো নিভিয়ে আছড়ে পড়ল খাটে। তার সারা শরীর এখন কেমন করছে।

দালানের কোণ থেকে শাশুড়ি বলে উঠল, "অ-বউ, কী পড়ল রে?"

অশোক এক দৃষ্টে পারুলের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আসলে সে পারুলকে দেখছিল না। ভাবছিল গত চার ঘণ্টার মধ্যে ঘটে যাওয়া কতকগুলো ঘটনা।

চার ঘণ্টা আগে সুকুমারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল চৌরঙ্গির পুব ফুটপাথে, বাস স্টপে। জেনারেল ম্যানেজারেব কাছে এগারো দফা দাবি পেশ করার জন্য ব্রাঞ্চগুলো থেকে যে মিছিল স্লোগান দিতে দিতে হেড অফিস পর্যন্ত আসে, তার মধ্যে অশোকও ছিল। গেটের সামনে জমায়েত হয়ে বক্তৃতা শুরু হতেই সে ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। একঘেয়ে কথাগুলো শোনার উৎসাহ তার আর নেই। *ধর্মতলা-চৌরঙ্গির মোড়ে পৌঁছে ভাবল, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কী করব। এখন সিনেমার ম্যাটিনি শো মাঝামাঝি অবস্থায়, ফুটবল লিগের খেলা শুরু হতেও ঘণ্টা দেড়েক বাকি। হাসপাতালে কেউ পরিচিত রোগী হয়েও নেই যে দেখে আসা যায়, শুঁড়িখানায় বসার মতো পকেটে যথেষ্ট টাকাও নেই। তা হলে কি ইউসিস্ লাইব্রেরিতে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে হবে?*

বিরক্ত হয়েই অশোক বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় সাহেবি পোশাক পরা পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে বেঁটেখাটো একটা লোক ওর সামনে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অশোক দেখেই বুঝল মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। লোকটা চেনার চেষ্টা করছে কিন্তু অশোক চিনতে পারল সুকুমারকে। বেশ মোটা হয়ে গেছে।

"অশোক ভাটাচারিয়া আই প্রিজিউম।"

"হ্যাঁ, আর তুমি সুকুমার গুহ।"

"অনেকদিন পর, কত বলো তো?"

"প্রায় আট বছর।"

"করছ কী?"

এইবার অশোক মনে মনে রেগে উঠল, কেন না সুকুমার দিব্যি মদ সাঁটিয়ে মেজাজে কথা শুরু কবেছে এবং বলছে ভারিক্কি চালে, যেন উত্তর দিতে বাধ্য এমন কারুর সঙ্গে। তখন অশোক স্থির করে ফেলে সুকুমার চাল মারতে পারে এমন একটা প্রশ্নও সে করবে না, অর্থাৎ কবে আমেরিকা থেকে ফিরলে, এখন কোথায় কাজ করছ, কত মাইনে পাচ্ছ, কলকাতার কোন মহল্লায় থাকো এবং কত ভাড়া দিচ্ছ, গাড়ি কিনেছ কি না, ছেলে বা মেয়ে কোন ফিরিঙ্গি স্কুলে পড়ে, পুজোয় কোথায় ঘুরে এলে— এইসব প্রশ্ন। আর স্থির করল চাল মেরে ব্যাটার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

"আপাতত একটা সিনারিও নিয়ে ব্যস্ত।"

অশোক মোটামুটি নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে হিসেব করে ফেলেছে কতটা দামি করা যায় নিজেকে। ধুতি-পাঞ্জাবি-চটি-ঘড়ি এবং চেহারাটা দিয়ে সিনারিও রাইটার, বড়জোর এম এল এ—এর বেশি ওঠা যায় না।

"বাংলা না হিন্দি?"

অশোক লক্ষ করল কথাগুলো জড়িয়ে গেল, এবং স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। মদ খেত না, এখন খাচ্ছে। কেন? একটু সদুপদেশ দিয়ে দিলে কেমন হয়। ওর বউ অর্থাৎ ঝুমি তো খুবই মাতালদের ঘেন্না করে বা একদা করত।

"হিন্দি।"

"পয়সা আছে হিন্দিতে।"

যেন তারিফ করল। এটা ভাল লাগল না অশোকের। ঈর্ষা করাতে না পারলে চাল মেরে সুখ নেই।

"তেমন আর কই, মাত্র পনেরো হাজার দেবে।"

"ওতেই রাজি হয়ে যাও। নয়তো অন্য কেউ দেখবে বাগিয়ে নেবে। কোথা থেকে টুকলে? লিখতে-টিখতে পারতে বলে তো শুনিনি।"

"কলিন কাউড্রের একটা ছোট গল্প থেকে।"

"হু ইজ কাউড্রে?"

"সে কী!"

আকাট মুখ্যু বানিয়ে দেওয়া যাক। এই ভেবে অশোক খুশি হল বিস্তর।

"ওহ্ তুমি কি খবর-টবর রাখো না নাকি?"

"না, মানে, আজকাল এত কাজের চাপ, কাউড্রে নামটা অবশ্য শোনা-শোনা লাগছে, ইজ হি এ ক্রিকেটার!"

"নো নো, এ কানাডিয়ান রাইটার।"

"ওহোঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি। ব্রিলিয়ান্ট তবে কিছুটা সেন্টিমেন্টাল, বোধ হয় আটলান্টিক মান্থলিতে ওকে নিয়ে"—

"না, না, তুমি ভুল করছ, এনকাউন্টারে একটা রিভিউ বেরিয়েছিল বিল লরির করা, বছরখানেক আগে।"

"আটলান্টিক মান্থলি নয়? আর ইউ সিওর? কী জানি পড়াশুনোর সময় একদমই পাই না তো। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শুধু.. টাকা টাকা টাকার পিছনেই তাড়া করে চলেছি। ব্যাপারটা এত অশ্লীল আগে বুঝিনি, এই সংসার-ধম্মো করা। তুমি কি বিয়ে করেছ?"

"ম্লাঃ", অশোকের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই শব্দটা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এল। সুকুমারের ঘোলাটে এলোমেলো চাউনিতে যেন এখনই সে পরশ্রীকাতরতা ফুটে উঠতে দেখল।

"আজকাল বড্ড বেশি খাটতে হচ্ছে। এক দিন এসো না আমাদের বাসায়। একটা ট্যাক্সি ধরার চেষ্টা করছি তখন থেকে অথচ পাচ্ছি না। কী যে জঘন্য এই চৌরঙ্গিটা।"

"কোথায় আছ?"

সুকুমার বাঁ হাতে কোটের ভিতর পকেট থেকে পার্স বার করল। হাতে ঝোলানো ব্যাগটা ফুটপাথে রেখে, পার্স থেকে কার্ড বার করে দিল। ঠিকানাটা পড়ে অশোক বলল, "টালায় আছ? আমি শুনেছিলাম যোধপুর পার্কে।"

"ঝুমির জন্য। দক্ষিণ কলকাতায় বাপের বাড়ি তাই ওদিকে যাবে না। জানোই তো ওরা আমাদের উপর কী ভীষণ খাপ্পা। বুঝি না অশোক, আমি এমনকী অপাত্র। ঝুমির মতো মেয়ে কি আমার থেকেও ভাল স্বামী জোটাতে পারত। তুমি জানো, স্বভাবটা ওর সত্যিই মিষ্টি কিন্তু কী ভীষণ ডাল।"

সুকুমারের কথা আরও জড়িয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দুলে উঠছে। গলা চড়ছে। দু'-একজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

"বড্ড একঘেঁয়ে, কোনও ভেরিয়েশান নেই। অথচ আমাকে ভীষণ ভালবাসে। জানো অশোক, আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছে করে?"

এলোমেলো চোখ দুটো অশোকের মুখের কাছে এগিয়ে এনে সুকুমার বলল, "ইচ্ছে হয় ওকে খুন করি। আমাকে ঠকিয়েছে। ওর সেক্স দিয়ে আমাকে চিট করেছে। তুমি খুব বেঁচে গেছ, ও যে তোমায় রিফিউজ করেছিল সেটা তোমার পক্ষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তবে শিগগিরই একদিন সকালে কাগজ খুলে দেখতে পাবে হেডিং—স্বামী কর্তৃক স্ত্রী খুন। কিন্তু নিশ্চিত জেনো, আমি ফেরার হব না। আমি পুলিশের কাছে সারেন্ডার করব। ডিফেন্ড করব না কোর্টে। শুধু বলব, জেল-টেল নয়, আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। আই ওয়ান্ট টু ডাই!"

ঝুঁকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সুকুমার কোনওরকম বিদায় না জানিয়ে হাঁটতে শুরু করল উত্তর দিকে। ভিড়ের মধ্যে একাকার হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত অশোক ওকে লক্ষ করল। শরীরটা ডান দিকে একটু হেলে রয়েছে, পা ঠিকমতো পড়ছে না, মাথা ঝুঁকিয়ে গুলি খাওয়া শুয়োরের মতো রাগে দিশাহারা হয়ে যেন ও লণ্ডভণ্ড করতে চলেছে।

অশোক ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটে মাত্র। সুকুমারের দেওয়া কার্ডটা তখনও হাতে। আর একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে রাখল। এখনও কয়েক ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। জয়রাম মিত্র লেনে রাত না বাড়লে কোলাহল থামে না। অশোক আনমনে রাস্তার ওপারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, আউটরাম ঘাটে বসে সূর্যাস্ত দেখবে ঠিক করে, রাস্তা পার হবার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে বাঁ দিকে তাকাল, তারপর ডান দিকে।

দূরে কী যেন হয়েছে। মানুষ ছুটে ছুটে জড়ো হচ্ছে রাস্তার মধ্যে। একটা ডবল-ডেকার বাস দাঁড়িয়ে। অশোক সময় কাটাবার রগরগে একটা উপলক্ষ পেয়ে আশ্বস্ত হল এবং জোরে হেঁটে ভিড়ের কাছে পৌঁছল। যা প্রথমে ভেবেছিল, তাই-ই ঘটেছে। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কী করে চাপা পড়ল?"

"যা করে পড়ে। চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে।"

"একদম শেষ হয়ে গেছে কি?"

"সঙ্গে সঙ্গে।"

অশোকের ইচ্ছা হল চটকানো মাংস আর রক্ত একটুখানি দেখে। ভিড় ঠেলে গোড়ালিতে ভব দিয়ে উঁকি দিল।

এ কী! থবথর কবে কেঁপে উঠল সে। কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাগটা পুলিশের জিম্মায় দেখেই চিনতে পারল। ভয় তাকে কোণঠাসা করে ফুটপাথের কিনারে হাজির করল। কাঁপুনি থামেনি। এখন কী করবে? ছুটে কোথাও পালাতে ইচ্ছে করল তার। যে চাপা পড়েছে আমি তাব বন্ধুস্থানীয় বা পরিচিত বললে অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে এসে যাবে। হাসপাতাল-পুলিশ-মর্গ-শ্মশান এত ঝঞ্ঝাটে জড়াতে হবে। অশোক বিরক্ত বোধ করল সুকুমারের উপর। এ-ভাবে তার উপর পাষাণ ভার চাপিয়ে দেবে, আট বছর পব, অযথা অকারণে, বুঝলে সে গঙ্গার ধারে গিয়ে সূর্যাস্তই দেখত। বক্ত মাখা নাড়িভুঁড়ি দেখতে আসত না। তবু কিছু একটা কবার দরকাব।

একটা লোককে দেখে অশোকের মনে হল অনেকগুলি সন্তানেব পিতা, স্বল্প আয় কিন্তু টাকা জমায়। ওর কাছেই বুদ্ধি নেওয়া যাক এই ভেবে সে জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্গে কেউ নেই লোকটাব?"

"থাকলে তো দেখতেই পাওয়া যাবে।"

"তা বটে, তবে থেকেই বা কী করত, করাব মতো কিছু তো আর নেই এখন।"

"তবু বাড়িতে খবরটা তাড়াতাড়ি পৌঁছত।"

"ঠিকানা কী?"

"কী জানি, পকেটে নিশ্চয় মানিব্যাগ-ট্যাগের মধ্যে আছে।" এই বলে লোকটা বুক পকেটের উপব হাত রেখে, সন্দেহের চোখে চারধারে তাকিয়ে ভিড়ের থেকে দূরে সরে গেল।

বাড়িতে খবর দেওয়া! ভারতী অর্থাৎ ঝুমিকে জানানো! তাড়াতাড়ি কার্ডটা বার করে অশোক পড়ল। পুলিশ নিশ্চয় খবর দেবে। সুকুমারের পার্সে অনেকগুলো এই কার্ড আছে। তাব আগেই পৌঁছে খবরটা দিতে হবে। সময় কাটাবার একটা চমৎকার কাজ পাওয়া গেছে। অশোক উত্তেজিত হয়ে ধাবমান একটি ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল। থামল না। আর একটি খালি ট্যাক্সি দেখে হাত তুলে ছুটে গেল। কিন্তু সেটিও ওকে গ্রাহ্য করল না। এর পর উন্মত্তের মতো অশোক ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ওর পৌঁছবার আগেই ঝুমি পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে গেছল। সুকুমারের কার্ডে ফোন নম্বর লেখা ছিল অশোক সেটা লক্ষ করেনি। বাড়িওয়ালারা বলল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গেছে। তাই শুনে অশোক হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়েছে। মাথা মোটেই ধরেনি। আসলে ইলার ভ্যাজভ্যাজানি বন্ধ রাখতে চায়। এখন চোখ বন্ধ করে বালিশটা বুকে আঁকড়ে ঝুমিকে ভাবতে ইচ্ছে করছে। আট-দশ বছর আগের ঝুমিকে। ভাবতে ভাবতে রান্নাঘরে পারুলের গলার শব্দ পেয়ে তাকাল সে।

পিঠ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত চড়াই-উৎরাইগুলো হুবহু ঝুমির মতো। গলার স্বরও। প্রথমদিন পারুলকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। গত শনিবার নেশার ঘোরে কী করেছে অশোক কিছুতেই মনে করতে পারেনি পরদিন সকালে। শুধু মনে হয়েছিল পারুল যেন বলছিল, "বড্ড নেশা হয়েছে। না না এ-সব এখন থাক। শুয়ে পড়ুনগে।" ঝুমিও বলেছিল, "বিয়ের কথাবার্তা এখন থাক। তুমি বরং বাড়ি চলে যাও।" আর সুকুমার বলল, "ঈশ্বরের আশীর্বাদ।"

অশোকের সঙ্গে এই সময়ই চোখাচোখি হল পারুলের। মনে পড়ল ঠিক ঝুমির মতো গলায় এই দুর্দান্ত স্বাস্থ্যের বউটি বলেছিল, "না না, এ-সব এখন থাক।" কী থাক? পারুলের শরীর বেয়ে অশোক চোখ নামিয়ে আনল। ঝুমিরই শরীর। ওই শরীরটাকে দখল করার প্রবল ইচ্ছা ন'-দশ বছর আগে ভর করেছিল তার সর্বাঙ্গ জুড়ে। তখন দু'জনেই ফিফথ ইয়ারে। ঝুমি প্রশ্রয় দিত। ওদের বাড়িতে যাতায়াতের সুযোগ করে দিয়েছিল। ইচ্ছে করলেই অশোক একতলার বৈঠকখানায় না বসে দোতলায় উঠে যেতে পারত। ওদের বাড়িতে তখন অনেকেই উপরে আসত।

সেদিন বারান্দায় ঝুমি দাঁড়িয়েছিল। অশোক ভেবেছিল তারই জন্য অপেক্ষা করছে। লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠল।

ঝুমি পিঠ ফিবিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর ঘাড়ে চুমু খাবার প্রবল বাসনা নিয়ে অশোক এগোচ্ছে আর তখুনি সুকুমারের কণ্ঠস্বর শোনা গেছল এক তলায়—"খবর দাও আমি এসেছি।" তখুনি নীচে নেমে গেল ঝুমি। শুধু যাবার আগে মাথা হেলিয়ে বলে, "আর একদিন, কেমন?"

সেই আর একদিন আর আসেনি। অশোকের মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ঠিক এই ভাবে, এখন যে-ভাবে পারুল নেমে গেল, এইভাবেই ঝুমি তাকে ফেলে রেখে, নেমে গেছল। এখন সিঁড়িব দিকে তাকিয়ে বালিশটাকে কামড়ে মনে মনে সে বলল: আসবে, যে ভাবেই হোক। তোমায় আমি দেখে নেব।

"খোকন রইল, ওকে একটু দেখো। আমি একবার ঘুবে আসছি শেফালি ঠাকুরঝির কাছ থেকে। জানো পাড়ায় কে এসেছে?" ইলা কাছে এসে দাঁড়াল।

"মাথা ধরেছে এখন বকবক কোরো না। যেখানে যাচ্ছিলে যাও।"

ছয়

মাস দুয়েক আগে শচীন দত্তগুপ্ত একদিন পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিরে চেয়ারে বসেই বাসুদেব ধরকে বলেছিল,

"এখানকাব মায়া কাটাবার নোটিস পেলুম বাসু। এক্সটেনশন দিল না। আমি নাকি ফিজিক্যালি আনফিট। পঁয়ত্রিশ বছর কাটালুম এই ঘরেই, সামনের মাস থেকে আর আসতে হবে না।' এই বলে ঘবেব সকলেব দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করেছিল ষাট বছরের শচীন দত্তগুপ্ত।

বাসুদেব অবাক হয়ে বলে, "শচীনদা, আপনি ফিজিক্যালি আনফিট! তা হলে আমরা কী হব?"

শচীন মাথা নামিয়ে যোগ-বিয়োগের হিসেবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাসুও মনে মনে হিসেব কষে নেয়, তাব রিটায়ার করতে আর ক' বছর বাকি। এখনও এগারো বছর। ছোটছেলেটার বয়স হবে, তখন চোদ্দো, ছোটমেয়ের এগারো। তাবপর ওদের লেখাপড়া বা বিয়ে দেওয়ার কী হবে? প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্রাচুইটির টাকা ফুঁকে দিলে বুড়ো বয়সে স্বামী-স্ত্রী খাব কী?

মোট চার মেয়ে ও দুই ছেলের হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত তার রেহাই নেই। তা ছাড়া সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। প্রদীপ নামে অ্যাকাউন্টসের ছোকরাটা ক'দিন আগে ক্যান্টিনে চেঁচিয়ে বলেছিল, ভ্যাসেকটমি করিয়ে এসেছে, যে-ভয় করেছিল তা হয়নি, বউ খুব হ্যাপি। কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। ওর দুটি মাত্র ছেলে।

বাসুদেব এরপর ফিজিক্যাল ফিটনেস ও ভ্যাসেকটমি, এই দুই জাঁতাকলে পড়ে পিষ্ট হতে শুরু করে। কখনও সে রেগে ওঠে নিজের উপর এই ভেবে যে, সাতটি সন্তানের পিতা কেন হতে গেল। কেন রাধারানি নামে একটা অশিক্ষিত মাংসের বস্তা তার বউ হল। আবার ভয়ে সিঁটিয়ে যায় জেনারেল ম্যানেজারকে দেখলে। এই বুঝি ফিজিক্যালি আনফিটরূপে তার নামের পাশে ঢেরা দিয়ে রাখল। এগারো বছর পর সেই ঢেরা দেখে নিশ্চয় মাথা নেড়ে বলবে—সরি, নো এক্সটেনশন।

বাসুদেব রাতে ঘুমোতে পারে না। রাধারানি গায়ে হাত রাখলে, দাঁত কিড়মিড় করে খাট থেকে নেমে মেঝেয় মাদুর পেতে শোয়। ফিজিক্যাল ফিটনেসের প্রমাণ দিতে হাঁটার চলন বদলে ফেলল। একজোড়া

ট্রাউজারস কিনেছে তিরিশ টাকায়, জুতো কুড়ি টাকায়। কলপ লাগাচ্ছে কানের ওপরের চুলে। দাড়িও কামাচ্ছে রোজ।

ওকে দেখে অফিসের অনেকেই টাট্টা করল। অল্পবয়সিরা বলল, "দাদার কি দ্বিতীয় পক্ষ নেবার ইচ্ছে হয়েছে?" তবে সমবয়সি দু'-একজন ঈর্ষাতুর গলায় যখন বলল, "ইয়ং-ইয়ং লাগছে হে বাসু, ব্যাপার কী?" তখন খুশিতে খান খান হয়ে গেছল বাসুদেবের ভিতরটা। কিন্তু এরা বললেই তো আর নিরাপদ বোধ করা যায় না। আসল লোকটির বলা চাই।

অফিসের একতলাটা রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। আট ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। জেনারেল ম্যানেজার আসে ঠিক দশটায়। মোটর থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে উঠেই লিফটে ঢুকে পড়ে। কোনওদিকে তাকায় না। বাসুদেব পৌনে দশটা থেকে উলটো ফুটপাথে অপেক্ষা করে। জি এম মোটর থেকে নামছে দেখলেই রাস্তা পার হয়। তারপর ওর সামনে দুই লাফে আট ধাপ সিঁড়ি টপকে উঠে যায়। পরপর তিনদিন করেছে। চতুর্থ দিন নতুন জুতোর জন্য পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ল। জি এম-ই ওকে টেনে তুলে বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "সাবধানে উঠুন, এই বয়সে হাত-পা ভাঙলে আর সারবে না।"

ভয়ে কুঁকড়ে গেল বাসুদেব। 'এই বয়সে' বলতে কী বোঝায়? শারীরিক অক্ষমতা? ফিজিক্যালি আনফিট? পরদিনই আঁশবটি দিয়ে জুতোর তলা ঘষে খরখরে করে নেয় এবং জি এম যাতে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারে সে-জন্য ওর চলাফেরার পথের ত্রিসীমানাও বাসু আর মাড়ায় না।

এর কিছুদিন পরই অফিসের স্পোর্টসের তারিখ নোটিস বোর্ডে টাঙানো হয়। দড়ি টানাটানি, ক্রিকেট বল ছোড়া, ফুটবলে লাথি মারা—এইসব বিষয়গুলোর উপর চোখ বোলাতে-বোলাতে বাসুদেব, পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করেছিল, "প্রাইজ দেবে কে?" উত্তর পেয়েই মাথায় বুদ্ধি খেলতে শুরু করে। একটা থার্ড প্রাইজও জি এম-এর থেকে যদি নেওয়া যায়, তা হলে সেটা এগারো বছর পরও কি কাজে লাগবে না!

স্পোর্টস সেক্রেটারির কাছে নাম দিতে হবে। বাসুদেব সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝল, দড়ি টানাটানিতে ডিপার্টমেন্টের টিম তৈরি হয়ে গেছে। টিমের কারুর ওজনই দু' মনের কম নয়। বল ছোড়ায় বা লাথি মারায় ছোকরাদের সঙ্গে সে পারবে না। শুধু আধ মাইল হাঁটার রেসে বয়স বেঁধে দেওয়া আছে—৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে। বাসুদেব ঠিক করে, হাঁটায় নামবে।

তারপর থেকে রোজ ভোরে উঠে পার্কে চক্কর দেয়, ঘড়ি ধরে আধঘণ্টা। শরীরের প্রত্যেকটি গাঁট জং-ধরা কবজার মতো ক্যাঁচক্যাঁচ করে। প্রথম প্রথম হাঁপিয়ে পড়ত বাসুদেব জোরে পনেরো মিনিট হাঁটলেই। তারপর সয়ে গেছে। ওয়াকিং রেসে যারা নাম দিয়েছে, গোপনে তাদের লক্ষ করে দেখেছে। একমাত্র রামরাজ সাইকেল পিওন ছাড়া আর কারুর সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তা নেই। ডেসপ্যাচের শৈলেন রায় এখনও ক্রিকেট খেলে বলে শোনা গেছে। কিন্তু ওর একটা পা ছোট, খুঁড়িয়ে হাঁটে। বাসুদেব তাইতে উদ্বিগ্ন হচ্ছে না। বেয়ারা ভক্তিপদ-র বয়সটা স্টাফ সেকশন থেকে জেনে এসেছে—চুয়াল্লিশ বছর আটমাস এগারো দিন। ওকে ডিসকোয়ালিফাই করার প্রমাণ বাসুদেব সংগ্রহ করে রেখেছে।

দিন দিন মেজাজটা খোশ হয়ে আসছিল বাসুদেবের। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে শুনল, বড়মেয়ে সুমি অর্থাৎ শর্মিলা বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বয়স হয়েছিল আঠারো। দেখতে ছোটখাটো, গত বছর পর্যন্ত ফ্রক পরে কাটিয়েছে, ক্লাস নাইনে পড়ে। বাসু শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। স্কুল যাবার পথে ছেলেটার সঙ্গে নাকি ভাব হয়। মেজমেয়ে প্রমীলা তাকে একবার মাত্র দেখেছে, পাড়া দিয়ে হেঁটে যেতে। আর কেউ তাকে দেখেনি বা জানে না কোথায় থাকে। ব্যাপারটা এমনই কারুর কাছে খোঁজ নিতে যাওয়া মানেই কেলেঙ্কারিটা ছড়িয়ে দেওয়া। সুমি দু'লাইনের চিঠি রেখে গেছে—"আর ফিরব না, সুতরাং খোঁজ কোরো না। মনে করো আমি মরে গেছি।"

"খোঁজ নেবে না?" রাধারানি ব্যাকুল স্বরে বলেছিল।

"কোথায়!" দিশাহারা বাসুদেব জানতে চেয়েছিল।

"সুমির স্কুলের বন্ধুরা হয়তো বলতে পারে।"

"খোঁজ নেব কেন, ফিরিয়ে আনবার জন্য?"

"তা হলে অনুষ্ঠান করে বিয়ে দেওয়া যায়। এখন লোকের কাছে বলব কী?"

"কী আবার বলবে, মেয়ে যা বলে গেছে তাই বলবে—মরে গেছে। গঙ্গায় চান করতে গিয়ে ডুবে মরেছে, ওলাওঠায় মরেছে। করো কী সারাদিন শুধু রান্নাঘরে বসে ঘুটুর ঘুটুর করা ছাড়া? নজর রাখতে পারোনি?"

বাসুদেব চাপা গলায় চিৎকার করেছিল। রাধারানির চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ছে। পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা না শোনার ভান করে কাঠ হয়ে বসে।

"বংশের মান গেল, কলঙ্ক লেপে দিয়ে গেল সকলের মুখে। ছি ছি, শেষে কিনা বেরিয়ে গেল! দু'দিন পরে তো মেয়েটাকে ফেলে পালাবে। তারপর গিয়ে উঠতে হবে সোনাগাছিতে। যাক, ওই ওর কপালে আছে। ফল ওকে ভুগতেই হবে। শুধু এত বড় বনেদি বংশের মাথাটা হেঁট করে দিয়ে গেল। মুখ দেখাব কী করে পাড়ায়, আত্মীয়দের কাছে।"

"যদি ও ফিরে আসে—"

"তা হলে পিঠের চামড়া তুলে নেব। তুমি, তুমি, তোমার জন্যই ছেলেমেয়ে একটাও মানুষ হল না।" বাসুদেব দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ঘরে দ্রুত পায়চারি করে। "শুধু দু'বেলা ভাত রাঁধা আর ছেলেপুলের জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কী পারো তুমি? একা রাস্তায় বেরোতে পারো না, লোকের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারো না, পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে জানো না, একটা বই কোনওদিন পড়তে দেখলুম না। এমন মায়ের মেয়ে বেরোবে না তো কী? সব ক'টা বেরিয়ে যাবে, আমি লিখে দিচ্ছি, একটাও মানুষ হবে না।"

চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাধারানি ঘর থেকে বেরিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। অফিস ফেরত স্বামীকে এখনও খাবার দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ পায়চারি করে বাসুদেব পাশের ঘরে এসে ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ করে বলে, "সবই জেনেছ তোমরা। তোমাদের বোন যে কলঙ্ক দিয়ে গেল তা যেন বাইরে না বেরোয়। তোমাদের মেজপিসিমা থাকে এলাহাবাদে, কেউ সুমির কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে, এলাহাবাদে গেছে, মেজপিসির খুব অসুখ। দেখাশোনার জন্য নিয়ে গেছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। মনে থাকবে তো?"

সবাই হাঁফ ছেড়ে ঘাড় নেড়েছিল।

এই ক'দিনে বাসুদেব যতটা ফিজিক্যাল ফিটনেস অর্জন করেছিল, সুমি তা ধসিয়ে দিয়ে গেছে। রাত্রে ঘুমোতে পারে না, দাড়ি কামাতে ভুলে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে, পরিচিতদের এড়িয়ে যাচ্ছে অফিসে এবং পাড়ায়, পিঠ নুয়ে পড়েছে, চোখে বিষাদ ফুটে উঠেছে। সুমির থেকেও তার ভাবনা, বংশের মান-মর্যাদা নিয়ে। জানাজানি হয়ে গেলে কী হবে? ছেলেমেয়েরা অবশ্য যথাযথভাবেই রটিয়ে দিয়েছে শেখানো কথাটা।

শেফালি একদিন এসে জেরা করে গেছে রাধারানিকে। "কই, আগে তো কখনও মেজপিসির বাড়ি থেকে খোঁজ-খবর করেছে বলে শুনিনি। যাক তবু, এলাহাবাদটা দেখা হয়ে যাবে এই তালে। ফিরবে কবে গা?"

রাধারানি নেহাতই ভালমানুষ। বেশিক্ষণ মিথ্যা কথা বলে যেতে পারে না। তবু প্রাণপণে বুদ্ধি খরচ করে বলল, "ফেরার কি কিছু ঠিক আছে। অসুখ না সারা পর্যন্ত থাকবে, আর কবে যে সারবে কে জানে।"

"তদ্দিন স্কুল কামাই হবে তো?"

"তা হবে।"

"ভালই হয়েছে। স্কুল যাবার পথে বখাটে একটা ছেলে বড্ড ওর পিছু লাগত। চিঠি-ফিটিও দিত। আর দেখছই তো আজকাল ছেলেমেয়েরা কী-না কাণ্ড করছে। এইভাবেই রাস্তাঘাটে ভাবসাব হয়, তারপর একদিন বাড়ি থেকে পালায়। আর বাপ-মা তার ঠ্যালা সামলাতে নাকানি-চোবানি খায়। তবে একটা উপকার বাপু করে দেয়, বিয়ে দিতে যে-খরচটা হত সেটা বেঁচে যায়। বলো, ঠিক কি না?"

রাধারানি কোনওমতে ঘাড় নাড়ে আর শুধুই তার মনে হয়, শেফালির কথাগুলো যেন কেমন বাঁকা ধরনের। রাত্রে চুপি-চুপি বাসুদেবকে বলা মাত্র, বাসু উঠে বসে বিছানায়।

"সর্বনাশ হবে, আমি জানি হবেই। ধুলোয় লুটোবে ধর-বাড়ির মান-মর্যাদা। তোমার জন্য, সব তোমার জন্য।" বলতে বলতে বাসুদেব কাটা তালগাছের মতো লুটিয়ে পড়ে।

রাধারানি স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবে, তার কী দোষ! কেন সব কিছুর জন্য সেই দায়ী! গভীর রাতে তার মনে হয় সুমি চুপিসারে ফিরছে। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোয় তাকে দেখা যাবে, এই ভয়ে সে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ময়রাগলিতে। রাধারানির ইচ্ছে হয়, বেরিয়ে গিয়ে সব রাস্তার আলো নিভিয়ে পাড়াটা অন্ধকার করে দেয়।

এক এক রাত সে সদর দরজার খিল খুলে একটা পাল্লা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে। সুমি আসছে দেখলেই ছুটে গিয়ে আঁচল দিয়ে ওকে ঢেকে ঘরে নিয়ে আসবে। মেয়েটা লজ্জায় আসতে পারছে না, নইলে সুমি তেমন মেয়ে নয় যে বাপ-মাকে কষ্ট দিয়ে বেশিদিন দূরে থাকতে পারবে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস সুমি ফিরে আসবেই, শুধু এত আলোর মধ্যে দিয়ে আসতে হবে বলে লজ্জায় পারছে না।

এক রাতে বাসুদেব নিঃশব্দে উঠে এসে সদরে দাঁড়ানো রাধারানির কাঁধে হাত রাখল। চমকে উঠে সিঁটিয়ে গেল সে। বোধহয় যাচ্ছেতাই করে এইবার কিছু বলবে।

"ও কি আর ফিরবে।" বাসুদেব ক্লান্ত স্বরে বলল। রাধারানি কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

"এমন কাজ করার কী যে দরকার ছিল ওর।" বিষণ্ণ সুর ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে। "কতই বা বয়স, জীবনের কী-ই বা দেখল, জানল। ও কি ভেবেছিল, বাবা বিয়ে দিতে পারবে না? গরিব হয়ে গেছি বটে, কিন্তু কোনওদিন কারুর কাছে তো হাত পাতিনি। যে-ভাবেই হোক, বাইশ বছর ধরে সংসার তো চালিয়ে আসছি। এত কষ্ট করি সকলের জন্য, কিন্তু আমার মুখ চাইল না।"

"এখনও ছেলেমানুষ। বুঝবে ঠিকই, ফিরেও আসবে।" রাধারানি আলতো করে হাত রাখল বাসুদেবের বুকে।

"চলো, দাঁড়িয়ে লাভ নেই।"

"ও এলে তুমি কিছু বোলো না। যা বলার আমি বলব। ওকে আমি মারব, ভীষণ মারব, এমন মারব যে জীবনেও ভুলতে পারবে না।" বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল বাধারানি। বাসুদেব ওকে টেনে নিয়ে গেল ঘরে।

অফিস স্পোর্টসে বাসুদেব চারজনের পর হাঁটা শেষ করল। প্রথম তিনজন প্রাইজ নিল জেনারেল ম্যানেজারের হাত থেকে। প্রাইজ দেবার সময় জি এম হেসে দু'-চারটে রসিকতা করে। কেষ্ট দত্ত একটা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি হাতে ডগমগ হয়ে বলল, "কী বলল শোন, আমি নাকি তিরিশ বছর বয়স ভাঁড়িয়ে রেসে নেমেছি। কালই সার্ভিস রেকর্ড খুলে বয়স চেক করবে।"

টেবিল ল্যাম্পটা ছেলের হাতে দিয়ে প্রমোদ বোস বলল, "আর আমায় কী বলল জানিস, নিশ্চয় মিসেস বোস এখানে আছেন, নয়তো এমন ইনসপায়ারড ফিনিশিং সম্ভব হত না।" ফুলদানিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে রামরাজ বলল, "এটা নিয়ে হামি কী কোরব। কৌন কামে লাগবে হামার।"

অদ্ভুত একটা শূন্যতাবোধ নিয়ে ফিরছিল বাসুদেব। পাড়ায় দূর থেকে দেখলে অনন্ত সিংহের বাড়ির দরজায় একটা নীল মোটর দাঁড়িয়ে। ওর মেয়েকে আজ দেখতে আসবে, বোধহয় গাড়িটা তাদেরই। পুতুলের থেকে সুমি দু'-তিন বছরের বড়। সুমির বিয়ে দেবার কথা এক-আধবার মনে এসেছিল, কিন্তু অন্যান্য চিন্তায় তলিয়ে যায়। এখন আর মনে করার দরকার হবে না।

অনন্ত মোটরের বাম্পারে পা তুলে দিল। বাসুদেব বুঝল, সেটা তাকে দেখেই। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার কায়দাটা যে অহংকার বোঝাবার জন্য সেটাও বুঝল সে। মাথার মধ্যেটাই গরম হয়ে উঠল বাসুদেবের। আজকাল বাড়িতে পা দিয়েই সে জিজ্ঞাসা করে, "প্রমি কোথায়?" সোলোয় পড়েছে। এখন থেকে আর চোখের আড়াল করা নয়।

"কোথায় গেছে?" বাসুদেব চিৎকার করে উঠল।

"আমায় বলেই গেছে", রাধারানি রান্নাঘর থেকে ছুটে এল। "কে এক সিনেমার হিরো এসেছে বুঝি তিনের-বি বাড়িতে, দেখতে গেছে।"

"কার সঙ্গে গেছে?"

"একাই গেছে।"

"শিগগিরি ডেকে পাঠাও। সিনেমার হিরো দেখে আর কাজ নেই।"

এই বলে বাসুদেব দ্রুত ঘরে ঢুকল; অফিস থেকে ফিরেই আর একবার পায়খানা যাওয়া তার

অভ্যাস। অভ্যাসটি পালন করতে গিয়ে টের পেল প্যানের মধ্যে কিছু একটা পড়ে রয়েছে, যার ফলে গর্তটা বোজা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে চিৎকার করে, "জেনে শুনেও কি তোমরা চুপ করে মজা দেখছিলে? যখন ঢুকলুম, তখন বলতে পারতে তো, বল পড়েছে। বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিতুম। এখন তুলি কী করে?"

এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রদ্বয়কে বেধড়ক কয়েক ঘা দিল বাসুদেব। "পড়াশুনো নেই, দিনরাত শুধু খেলা আর খেলা। এখন এই বল তুলবে কে?"

"একটা ধাঙড় ডেকে আনলেই তো হয়।" রাধারানি বুদ্ধি করে বলল। অবশ্যই ভয়ে ভয়ে।

"সন্ধের পর ধাঙড় বসে আছে বল তোলার জন্য।" বাসুদেব রাগে গজগজ করে কয়েক বালতি জল ঢেলে বাঁ হাতে বলটা তুলল।

বল আর বেড়ালে কোনও তফাত নেই। যেখানেই ছেড়ে এসো না ঠিক ফিরে আসবে। দূরে গিয়ে ফেলে আসতে হবে নয়তো ছেলে দুটো এই বল নিয়ে আবার খেলা শুরু করে দেবে। তারক কবিরাজ স্ট্রিটে যে ডাস্টবিনটা আছে তার মধ্যে ফেলার উদ্দেশে বেরোতে গিয়ে বাসুদেব সদরেই থমকে গেল। নীল ঝকঝকে মোটরে পা তুলে দাঁড়ানো অনন্তের ধোঁয়া ছাড়ার অহংকারী ভঙ্গিটি মনে পড়ল তার। আবার তাকে দেখলে আবার পা তুলবে, আবার ধোঁয়া ছেড়ে মিটমিট করে তাকিয়ে হাসবে।

হাসাচ্ছি তোকে! বাসুদেব তরতরিয়ে ছাদে উঠে এল। যেদিকে দু'চোখ যায় ছুড়ে দেবে! এধার-ওধার তাকিয়ে কোনদিকে ছুড়বে ঠিক করে উঠতে পারল না সে। বলটা ছাদের মেঝেয় রাখল। নর্দমার ঢালু দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে পা দিয়ে আটকাল। পা তুলতেই বলটা আবার গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ের চেটো দিয়ে বাসুদেব বলটাকে টানল। বলটা পিছিয়ে পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে আবার গড়িয়ে এল।

বাসুদেবের মন্দ লাগল না ব্যাপারটা। আস্তে শট করল বলটায়। পাঁচিলে লেগে আবার তার কাছেই ফিরে এল। অন্ধকার ছাদে ভাল করে নজর করা যাচ্ছে না, তবু বাসুদেব আন্দাজে ব্যাপারটা চালিয়ে যাওয়ার একটা মজা পেয়ে গেল। এখন তার মনে হচ্ছে চল্লিশ বছর আগের বয়সে যেন ফিরে যাচ্ছে সে।

সাত

অসীম কাল রাতে বাড়ি ফিরে শোনে, গুনোদা একজনকে পাঠিয়েছিল। বসিরহাটে সেমি-ফাইনাল খেলতে হবে। গুনোদার পেশা বিভিন্ন ক্লাবে খেলোয়াড় কম পড়লে জোগাড় করে দেওয়া। এ-জন্য কমিশন পায়। মফস্সল ক্লাব-কর্মকর্তাদের ভিড় লেগেই আছে ওর বাড়িতে। ট্রফি পাইয়ে দেবার কনট্রাক্টও গুনোদা নেয়। ওর তালিকায় জনা তিরিশ খেলোয়াড়ের নাম আছে, যাদের অর্ধেকই কলকাতা ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে। তাদের অনেকে ভারতের জার্সিও পরেছে। নাম অনুযায়ী গুনোদা ওদের দাম দেয়। গুনোদার অনুগ্রহে কেউ কেউ বছরে দু'হাজার টাকাও সংগ্রহ করে। ওর তালিকায় অসীমও আছে। দূর গ্রামাঞ্চলে, অখ্যাত টুর্নামেন্টে খেলতে 'নামীরা' যেতে চায় না। তখন অসীমের ডাক পড়ে।

কাল গুনোদার লোকটি অসীমের জন্য বাড়িতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। বার কয়েক রাস্তায় বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করে অবশেষে প্রভাতের হাতে অগ্রিম বাবদ তিরিশ টাকা দিয়ে, পরদিন সন্ধ্যায় আসবে জানিয়ে চলে গেছে। টাকা পাওয়া মাত্র তাই থেকে কুড়ি টাকা তখনই খরচ হয়ে যায়। বহুদিন পর রাত্রে ওদের উনুনে রুটি সেঁকার বদলে ভাতের হাঁড়ি চড়ে।

অসীমের বাবা প্রভাত রায় ত্রিশ বছর আগে রোভার্স কাপেও খেলেছে। আটাশ বছর আগে আই এফ এ শিল্ডের ফার্স্ট রাউন্ডের খেলায় গোড়ালিতে চোট পেয়ে জখম হয়। ফোর্থ রাউন্ডে ক্লাবকর্তারা জোর করে নামায়, ইনজেকশন দিয়ে ব্যথা অসাড় করে। সে খেলায় ওরা হেরে যায় এবং সমর্থকদের ধারণা প্রভাতের জন্যই। খেলা শেষে বাড়ি ফেরার সময় ময়দানের অন্ধকারে টেনে নিয়ে কারা ওকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে যায়। সেদিন থেকে প্রভাত রায় আর ফুটবলে পা দেয়নি। সেদিন অজ্ঞান হবার আগে ওর কানে শুধু এই কথা দুটি ঢুকেছিল: "ঘুষ নিয়ে বড়লোক হবি শালা? হওয়াচ্ছি।

ক্লাব কি টাকা দেয় না তোকে? তবুও অত লকলকে নোলা কেন রে বেইমান, নেমকহারাম। ঘুষ নিয়ে আমাদের ইজ্জত ডোবানো বার করছি।"

"ইজ্জত"! অসীম বুনো মোষের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'টাকা নেবার সময় মনে ছিল না ইজ্জতের কথা! এই পা নিয়ে আমি হাঁটতে পর্যন্ত পারছি না, আর খেলে এসে তোমার ইজ্জত বাঁচাব? কে বলেছিল, হাত পেতে টাকা নিতে? কে, কে, কে বলেছিল? আমার পা কি পা নয়? আমার জীবনটা কি আমার নয়? সব দান করে যেতে হবে তোমাদের খাওয়াবার জন্য?"

চিৎকার করতে করতে অসীম পায়চারি করে, মা, বাবা, ভাই, বোন আর ঠাকুমা মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে। ভাত খাওয়া এঁটো থালাগুলো বাইরে দালানে পড়ে। চেটেপুটে খেয়েছে ভাইগুলো।

"যেখান থেকে পারো, জোগাড় করে দিয়ে দাও। কাল এলেই দিয়ে দেবে। ইজ্জত আমারও আছে।"

"কোথায় পাব ত্রিশ টাকা, কালকের মধ্যেই।" প্রভাত করুণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকায়।

"কোথায় পাবে তার আমি কী জানি? এ সংসার কি আমি তৈরি করেছি?"

"তুই বড়ছেলে, তোরও তো খানিকটা দায়িত্ব নেওয়া উচিত। বড় তো হয়েছিস।" ঠাকুমা ভয়ে ভয়ে বলল।

"তুমি চুপ করো তো। আমি কি টাকা দিই না? আমার নিজের জন্য কি কিছুই খরচ করব না? এই পা দুটো আমার ভবিষ্যৎ, আমার জীবন। এর একটা শেষ হয়ে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াব? কে তখন আমায় দেখবে? পয়সার জন্য চোটটাও সারাতে পারছি না। চোট আছে জানলে কেউ আর পয়সা দিয়ে ডাকবে না। তাই জানাতেও পারি না।"

বলতে বলতে অসীম থেমে গেল। গলা আটকে গেছে অবরুদ্ধ বাষ্পে। প্রভাতের দিকে ঘরের সবাই তাকাল। পুরু কাচের চশমাটা খুলে প্রভাত গেঞ্জি তুলে মুছতে লাগল ঘাড় হেঁট করে।

"দেখি, অফিসে কারুর কাছে ধার পাই কি না। এই বাজারে একসঙ্গে তিরিশ টাকা পাওয়া—," প্রভাতের গলা ক্ষীণ হয়ে থেমে গেল।

ঘুম থেকে উঠেই অসীম আজ বেরিয়ে পড়ে। পাওয়া সম্ভব এমন লোকেদের কাছে চেষ্টা করে টাকা ধার পেল না। তারপর বেলা বারোটা পর্যন্ত ঠাকুরের চায়ের দোকানে কাটিয়ে বাড়ি ফেরে।

গুনোদার পাঠানো সেই লোকটা এসেছিল। ছোটবোন নিলি অসীমকে আড়ালে ডেকে বলল, 'বাবাকে যাচ্ছে-তাই করে বলে গেল লোকটা। বলল, কালকেই ম্যাচ খেলা আর এখন বলছে যেতে পারবে না, পায়ে চোট! সব বাজে কথা।"

"বাবা বলেছিল পায়ে চোট থাকার কথা!" অসীম অবিশ্বাস ভরে তাকিয়ে রইল।

"বারে, লোকটা যে বলল, প্যাঁচ কষে টাকা বাড়াবার জন্য মিথ্যে করে এখন বলা হচ্ছে চাকরির ইন্টারভিউ আছে। বাবা তো প্রথমে তাই বলেছিল। লোকটা চিঠি দেখতে চায়। বাবা বলে অসীমের কাছে আছে। তখন ওইসব বলতে শুরু করে। বাবা শেষকালে বলল, পায়ে লেগেছে, বিশ্বাস না হয় রাতে এসে দেখে যাবেন। হাঁটতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। তাইতে লোকটা বলে, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ইনজেকশনের খরচ আমরাই দোব। তাইতে বাবা কী ভীষণ রেগে উঠল। বেরিয়ে যান এখুনি, আপনার ট্রফির থেকেও আমার ছেলের জীবন দামি। লক্ষ টাকা দিলেও ও খেলতে যাবে না। ভারী তো আপনার তিরিশটা টাকা, নিয়ে যাবেন রাতে এসে। এইসব বলে খুব চেঁচাতে থাকে।"

"লোকটা কী বলল?"

'টাকা নিতে আসবে আজ রাতে। অন্য প্লেয়ার জোগাড় করতে টাকাটা আজই দরকার। না পেলে কেলেঙ্কারি করবে বলে শাসিয়ে গেল।

"হ্যাঁ, কেলেঙ্কারি করবে! শালাকে তা হলে আর জান নিয়ে ফিরতে হবে না।"

অসীম গা-ঝাড়া দিয়ে প্রসঙ্গটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু ওর ভাল লেগেছে প্রভাতের কথাগুলো। ছেলেকে কোনওদিন খেলায় উৎসাহ দেয়নি বা বারণও করেনি। ফুটবলের কথা উঠলে কখনও মুখ খোলেনি। মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছা করত অসীমের, বাবা কোনওদিন তার খেলা দেখেছে কি না! জানতে পারেনি। প্রভাত তার সময়ে নামকরা উঠতি প্লেয়ারদের একজন ছিল বলে, বুড়োরা যখন অসীমকে গল্প শোনায় তখন গর্ব হয় তার। প্রভাত রায়ের ছেলে বলে অনেক জায়গায় সে খাতিরও

পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল? একটা ভাল চাকরিও জোগাড় করতে পারেনি প্রভাত। পা খুইয়ে বিদায় নিল মাঠ থেকে। ক্লাবও আর খবর নিল না। এই রকমই হয়।

অসীম দুপুরে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখল। পর্তুগালের বেনফিকা ক্লাব থেকে লোক এসেছে জয়রাম মিত্র লেনে। প্রভাতের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা, হাতে চেক বই।

"আপনি টাকার ফিগারটা বসিয়ে নিন।"

প্রভাত দিশাহারা হয়ে আমতা-আমতা শুরু করেছে দেখে লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, "ইওসেবিওকে যত টাকা দিয়ে আমরা এনেছিলাম, তার থেকে বেশি দিতেও আমরা রাজি।"

"কিন্তু আমার ছেলেকে আপনারা নেবেন কেন?"

"তার মানে?"

সাহেবটা খুব অবাক হয়ে গেল। তারপর মুচকি হেসে বলল, "আপনার ছেলের খবর আমরা পেয়েছি, আমাদের ক্লাবের কোচ মারফত। তিনি জাপান যাচ্ছিলেন। কলকাতায় প্লেন বিগড়ে যাওয়ায় একদিন থাকতে বাধ্য হন। সেদিন মোহনবাগান মাঠে একটা খেলা দেখেন। সেই রাতেই ট্রাঙ্ককল করেন লিসবনে। বলেন, ইওসেবিওর থেকেও দারুণ একটা ছেলের খোঁজ পেয়েছি, এখনই ধরতে হবে। পরের প্লেনেই আমি কলকাতায় পৌঁছে পর পর অসীমের তিনটে খেলা দেখে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমরা ইওসেবিওকে রিপ্লেস করতে চাই। ক্লাব প্রেসিডেন্ট রওনা হওয়ার আগে বলে দিয়েছেন, যদি বোঝো কোচের কথা সত্যি, তা হলে সই করা সাদা চেক এগিয়ে দেবে।"

প্রভাতের হাতে চেক বই আর কলম দিয়ে পর্তুগিজ সাহেব হাসল। অন্যমনস্ক হয়ে প্রভাত একটা তিন আর শূন্য বসাল চেকের ওপব। তারপর কী ভেবে বলল, "লক্ষ টাকা দিলেও ওকে আমি খেলতে দেব না। ওর জীবনের দাম অনেক বেশি। পায়ে যদি চোট পায় তা হলে ও শেষ হয়ে যাবে।"

চেক বইটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রভাত উঠে দাঁড়াল, সাহেব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে।

"নো, নো, গেট আউট। আমি দেব না, লক্ষ লক্ষ টাকাতেও দেব না। গেট আউট, গেট আউট।"

ঘুম ভেঙে গেল অসীমের। এখুনি উঠতে ইচ্ছে করল না তার। কাত হয়ে শুয়ে রইল। স্বপ্নটা দেখার জন্য তার লজ্জা করছে। অথচ চাপা এক ধরনের মমতায় কেঁপে উঠছে তার বুকটা। চোখ বুজে সে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করল: "ওর জীবনের দাম অনেক অনেক বেশি।"

সাবা শরীরের ওপর কে যেন আদর বুলিয়ে যাচ্ছে। অসীম প্রবল সুখে আচ্ছন্ন হল। একবার সে হাসল আপনমনে। তিরিশের পাশে আরও চারটে শূন্য বাবা অনায়াসেই বসিয়ে দিতে পারত। তিন লক্ষ! গোটা জয়রাম মিত্র লেন কুড়িয়ে তিন লক্ষ টাকা বেরোবে না। শুনলে পাড়ার লোকগুলোর মুখ কেমন হয়ে উঠবে কিছুক্ষণ ধরে অসীম তাই ভাবল। ভাবতে ভাবতে আভার মুখটা ভেসে উঠল। তারপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত! আর অসীমের দেহ থেকে আচ্ছন্ন সুখটা উবে যেতে শুরু করল।

আভার মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটবে না। হাসবে ভদ্রতা করে। হয়তো বলবে, 'তিন লাখ টাকা ফুটবল খেলে পাওয়া যায়, জানতাম না তো! ভালই হল।" খুবই নিরাসক্ত গলায় বলবে। বি. এ, এম. এ. পাশ করার থেকে ফুটবল খেলা সোজা নয়—এটা ওদের কেউ বুঝবে না। কত খাটুনি কষ্ট সয়ে যে খেলা শিখতে হয় তা জানে না। শুধু বোঝে আর জানে চেয়ারে বসে খুচ খুচ করে লেখা, নাকের কাছে বই ধরে বিছানায় চিত হয়ে পড়ে থাকা, আর চিবিয়ে চিবিয়ে বড় বড় বাত ঝাড়া। একটা বাইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে অমন গম্ভীর, উদাসীন হয়ে থাকে কী করে? ওর কি কোনও প্রেমিক আছে?

অসীম বিরক্ত মনে উঠে পড়ে। ত্রিশ টাকা জোগাড় করে প্রভাত ফেরে কি না দেখার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। প্রভাত অফিস থেকে ফিরে সকলের দিকে তাকিয়ে যখন মাথা নামিয়ে জামার বোতাম খুলতে শুরু করল অসীম তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে তারক কবিরাজ স্ট্রিটের মোড়ে এসে দাঁড়ায়। তারপর আসে ঝকঝকে আকাশি-নীল স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডটা।

ঠাকুরের চায়ের দোকানে রাজনীতির তর্ক চলছে। ওরা কেউ তিরিশ টাকা এক্ষুনি দিতে পারবে না। অসীম এক ধারে চুপ করে বসে। লোকটা চলে গেলেই ছোটভাই এসে খবর দেবে। আধঘণ্টা কেটে গেল এখনও আসছে না। তা হলে কি কিছু ঘটেছে বাড়িতে?

লোকটা কি চিৎকার করে লোক জমিয়েছে? নাকি গুম হয়ে বাইরের রকে বসে আছে অসীমের

অপেক্ষায়। সত্যিই দেখে যাবে পায়ে চোট হয়েছে কি না। কিন্তু হাড়ভাঙা নয়, কাটাকুটি নয় যে প্লাস্টার কি ব্যান্ডেজ করা থাকবে। অসীম ডান হাঁটুতে হাত বোলাল। ওপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। মাথা ধরা পেট কামড়ানো কি দেখে বোঝা যায়? ব্যথা রয়েছে, ডান পায়ে ভর পড়লেই যন্ত্রণা হচ্ছে এটা কী করে বোঝাবে।

লোকটা কি অপমান করছে বাবাকে? সকালে জোর গলায় প্রভাত বলেছে, ভারী তো তিরিশ টাকা! লোকটা হয়তো এখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা দিয়ে কাটছে আর নুন ছিটোচ্ছে প্রভাতের গায়ে! পাড়ার খচ্চর লোকগুলো মুচকি হাসছে। এই দৃশ্য বার-বার ভেসে উঠতে লাগল অসীমের চোখে। ছটফট করে সে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ব্যাটাকে পুঁতে ফেলব যদি বাবাকে অপমান করে। যদি একটু বেইজ্জতি কথা বলে থাকে তা হলে জান নিয়ে ফিরতে দেব না।

অসীম দ্রুত বাড়ির দিকে চলল। পায়ের ব্যথাটা এখন লাগছে না। তারক কবিরাজ স্ট্রিট থেকে পাড়ার মধ্যে ঢুকতেই দেখল ছোটভাইটা ছুটে আসছে! ওর আসা দেখে ঠান্ডা হয়ে গেল অসীমের সর্বাঙ্গ।

"লোকটা বসে আছে দাদা।"

"চেঁচায়নি?"

"না। একবার ভেউভেউ করে কাঁদল। বলছে, এখনও প্লেয়ার জোগাড় হল না, শিল্ডটা বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেল। একজনের কাছে গেছল, সে পঞ্চাশ টাকা চেয়েছে। বাবার পায়ে ধরে বলল, হয় অসীমকে দিন, নয়তো টাকাটা এক্ষুনি দিন।"

"বাবা কী বলল?"

"চুপ করে বসে আছে। দিদি চুপিচুপি এইটে দিল তোমায় দেবার জন্য।"

পকেট থেকে একটা আংটি বার করে অসীমের দিকে এগিয়ে ধরল।

"অনন্ত সিংগির কাছে এটা বাঁধা দিয়ে তিরিশটা টাকা নিয়ে আসতে বলল দিদি।"

আংটিটা হাতে নিয়ে অসীম ইতস্তত করে বলল, "আচ্ছা যা।"

কোনওদিন নিলির আঙুলে এটা সে দেখেনি। অসীম অবাক হয়ে গেল। দেখতে ঝকঝকে, তার মানে ব্যবহার হয়নি তোলা ছিল। ওর কাছে এটা এল কী করে? বাবা-মা দেয়নি, দেওয়ার ক্ষমতাই নেই। নিলির হাতে দু'গাছা ফিনফিনে সোনার চুড়ি ছিল, গত বছরই অনন্তের সিন্দুকে উঠেছে। তা হলে এটা পেল কার কাছ থেকে? প্রেম-ট্রেম করছে নাকি!

অসীম রাস্তায় মাঝে দাঁড়িয়েই ভাবল, আংটিটি বাঁধা দেব কি, দেব না। চোখে পড়ল সত্যচরণ বালতি হাতে বেরিয়ে টিউবওয়েলের দিকে যেতে যেতে মোটরটার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর উবু হয়ে গাড়ির নীচে তাকিয়ে হুস হুস শব্দ করছে হাত নেড়ে। কিছু একটা তাড়াচ্ছে।

অসীম এগিয়ে এসে বিরক্ত স্বরে বলল, "কী করছেন?"

"দেখ তো ফ্যালা, একটা বেড়াল বাচ্চা কোত্থেকে এসে জুটল। আরে ঢুকবি তো একেবারে মোটরের নীচেই। গাড়িটা চললেই তো চটকে যাবে। রক্তে মাংসে রাস্তাটা কী না হবে! কাক এসে ঠুকরে নিয়ে এবাড়ি-ওবাড়িতে বসবে, ছড়াবে, ছয়লাপ হবে। ডেঞ্জারাস। এ-ভাবে তলায় বসে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।"

অসীম নিচু হয়ে দেখল। সত্যিই পিছনের চাকার সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটা বেড়াল বাচ্চা। মিউ মিউ করে যাচ্ছে অনবরত।

"আছে থাক। স্টার্টের আওয়াজ পেলেই সটকান দেবে।"

"বলছিস পালাবে?" বলেই সত্যচরণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কালীর মা অর্থাৎ আঙুরবালা টিউবওয়েলে জল নিতে এসেছে। আগে বাসন মাজত সত্যচরণের সংসারে। চারুশীলা বছর তিনেক আগে ওকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। আঙুর তারক কবিরাজ স্ট্রিটের বস্তিতে থাকে। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।

এই সময় অনন্তের সদরে ওর ভাই দুলাল এসে দাঁড়াল। অসীমকে লক্ষ করে বলল, "গাড়িটা কার রে ফ্যালা?"

প্রশ্নের সুরটা অসীমের পছন্দ হল না। তাচ্ছিল্য ভরে বলল, "কে জানে।"

দুলালের মুখে দিশি মদের গন্ধ। অনন্তের সঙ্গে ওর মুখ দেখাদেখি নেই যদিও একই বাড়ির পিছনের অংশে থাকে। অনন্তের সঙ্গে দেখা করতে হলে, ডেকে দেবার জন্য কাকে বলা যায়! কাউকে দেখার আশায় অসীম উঁকি দিল রাস্তা থেকেই। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করতে তার বাধল।

"কাকে খুঁজছিস?" দুলাল বলল,

"অনন্তজ্যাঠাকে।"

"ও ব্যাটাকে আবার কী কম্মে দরকার। আমায় বল।" দুলাল বিড়ি বার করল পকেট থেকে।

"পারসোনাল টক আছে।"

"ওরে বাব্বা, অনন্ত সিংগির সঙ্গেও লোকে পারসোনাল টক করে! কতই দেখব বাওয়া, দিনে দিনে। দেখ, দেখ, সত্যটা কেমন করে মাগিটার দিকে তাকাচ্ছে।"

অসীম দেখল ঘাড় ফিরিয়ে। প্রশ্রয় পেলে দুলাল অশ্রাব্য ভাষায় কেচ্ছা শুরু করে দেবে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলে অনন্ত একটা পয়সাও বার করবে না, দোরগোড়া থেকেই ভাগিয়ে দেবে। আংটিটা বাঁধা দিয়ে তিরিশ টাকা পাওয়া যাবে কি না অসীমের সন্দেহ আছে। এক আনা সোনাও বোধহয় নেই। দুলালের সঙ্গ এড়াবার জন্য সে এগিয়ে গেল সত্যচরণের দিকে। সত্য কী বলছিল কালীর মাকে, চুপ করে গেল।

"অনন্তজ্যাঠাকে কী করে ডাকি বলুন তো?"

"ও মা, সে তো এইখানিক আগে বেরোল। মিষ্টির দোকানে গেছে, এখুনিই ফিরবে। ওর মেয়েকে আজ যে পাত্র নিজে দেখতে আসছে। আইরিটোলার শীলেদের বাড়ির ছেলে।"

অসীম আর দাঁড়ানোর দরকার বোধ করল না। মোড়টা ঘোরার সময় মনে হল তিরিশের-একের বসবার ঘরের জানলার খয়েরি পর্দা সরিয়ে কেউ মাথা হেলিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। আভা কি না দেখার জন্য সে কৌতূহলী হয়ে উঠল। কাছাকাছি হতেই খুব অবাক হয়ে দেখল শোভা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

অসীম একটু দূরে সরে যেতেই সত্যচরণ থেমে যাওয়া কথাটার খেই ধরল।

"আমি কি তোমায় ছাড়িয়েছি গো। তোমার বউদিকে তো চেনোই কেমন মানুষ।"

"আপনিও কেমন মানুষ তা আমার জানা আছে। একজোড়া বালা মেয়েকে গড়িয়ে দেবেন বলে তো আজ পাঁচ বছর ধরে ঘোরাচ্ছেন।"

"ওমা, এই তো গত বছর সবে বললুম, আর বলছ পাঁচ বছর।"

কথা না বলে কালীর মা পাম্প করতে থাকল। সত্যচরণ প্রবল আগ্রহে প্রতিটি ঝাঁকির সঙ্গে ওর সারা শরীরের দুলুনি লক্ষ করায় তৎপর হল। তার মনে হল, আঙুরবালা আর অতটা আঁট-সাট নেই। একজোড়া বালা, চোদ্দো ক্যারেট হলেও, কম করে গোটা পঞ্চাশ টাকা খসবে। অত টাকা এখন আঙুরের উপর ইনভেস্ট করা উচিত হবে না বলেই তার মনে হচ্ছে। চারুশীলা যদি ওকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে চুক্তি ভঙ্গ করে, বাসনের সঙ্গে দুটোর জায়গায় তিনটে পোড়া বাব করে না দিত, তা হলে বালা গড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিটা হঠাৎ মুখ ফসকে কি বেরিয়ে যেত? তবুও আঙুর কাজ ছেড়ে দিল। দেখে দেখে চিমড়েপোড়া এক বুড়িকে চারুশীলা কাজে লাগিয়েছে। এর আগে তিনজনকে তাড়িয়েছে, একই ছুতোয়। ঝিগুলো আসে হতকুচ্ছিত রোগাপটকা চেহারা নিয়ে, তারপর চারুশীলার নজরে, কেমন যেন পরিপাটি হয়ে যায়, ঢলানি-ঢলানি ভাব ধরা পড়ে, আর সত্যচরণও যেন উঠোনের জানলার ধারে বসে বেশিক্ষণ সময় নেয় দাড়ি কামাতে। এই নিয়ে রাতে বহুবার তুলকালাম হয়ে গেছে ওদের। আঙুরের চতুর্থ মেয়েটির পাশে সত্যচরণের দুই মেয়ে ভুতি আর টুনুকে দাঁড় করিয়ে দিলে কার সাধ্য বলে ওরা তিন বোন নয়—এই কথাটি কে যেন একবার পাড়ায় চাউর করেছিল। সত্যচরণের দৃঢ় ধারণা কাজটা শেফালিরই। কেন না, একদিন শেফালিই বাড়ি বয়ে জানিয়ে গেছল, "সত্যদার মতো লোকের চরিত্র নিয়ে কথা বলার সাহস পায়, বউদি, কি হয়েছে যে পাড়ার কী বলব।"

জলের বালতি হাতে ঝুলিয়ে কালীর মা মিষ্টি করে হেসে নিচু গলায় বলল, "বড্ড ঠ্যাকায় পড়ে গেছি, পাঁচটা টাকা দিতে পারেন।"

"পাঁচ! এখুনি?" সত্যচরণ গামছার কসি আঁট করতে করতে হাসল। বাঁ হাতে ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিতে দিতে কালীর মা ঘাড় নাড়ল।

"আচ্ছা। আজই তা হলে দিয়ে আসব।"

সত্যচরণ হঠাৎ প্রফুল্ল বোধ করল। গুন গুন সুর বেরোল মুখ দিয়ে। পিছু ফিরে, আঙুরের চলন দেখে এখন তার মনে হল, মেয়েটাকে বালা গড়িয়ে দিতে কতই বা আর খরচ।

আট

"আশ্চর্য", শোভা উত্তেজিত হয়ে আবার ঘরে ঢুকল। "আভাকে এত করে বললাম, অথচ কানেই নিল না। সিনেমায় দেখা আর এমনি সামনা-সামনি দেখায় কত তফাত! আচ্ছা, তুমি কখনও কাউকে সামনা-সামনি দেখেছ?"

হিরণ্ময় বই থেকে মুখ তুলে তাকাল।

"না।"

"খুব ছোটবেলায়, এই টিপুর মতো বয়সে আমি একবার অশোককুমারকে দেখেছিলাম। তখন বাবা বোম্বাইয়ে বদলি হয়েছিলেন।"

খাটেব উপর খালি সিগারেটের প্যাকেটগুলো সাজিয়ে টিপু খেলা কবছে। নিজের নাম শুনে মায়ের দিকে তাকাল। হিরণ্ময় পা দিয়ে একটা প্যাকেট ফেলে দিল ওকে রাগাবার জন্য। প্রায়ই এমন করে সে।

টিপু একটা কিল মারল হিরণ্ময়েব পায়ে। "উঃ" বলে হিবণ্ময় পায়ে হাত বুলোতে শুরু করল। কিছুক্ষণ টিপু লক্ষ করবে না ব্যাপারটা। ক্রমাগতই উঃ, আঃ করে যেতে হবে। তখন ওব ডাক্তাবি শুরু হবে। সেটা দেখার জন্য মা এবং মাসির অবশ্যই হাজির থাকা চাই।

"আজ থাক।" শোভা একটু চাপা গলায় হিরণ্ময়কে বলল। "আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে কবছে, কী কবে দেখা যায় বলো তো?"

"জানলায় দাঁড়িয়ে থাকো। বেরিয়ে এসে যখন গাড়িতে উঠবে দেখে নেবে।"

"কী যে বলো। জানলায় হাঁ করে দাঁড়াই আর যত বাস্তার বাজে লোক তাকিয়ে যাক! তুমি কলেজ থেকে ফিরে খেয়েছ তো?"

"থাক গে। একদম খিদে নেই।"

"আভা দেয়নি? ঠাকুরকেও তো বলে গেছলাম। জানো, ব্লাউজের ছিটটা থেকে কুড়ি সি এম কাপড বাঁচবে, ওটা দিয়ে কী করা যায় বলো তো?"

হিরণ্ময় লক্ষ করল টিপু ঘনঘন তাকাচ্ছে তার পায়ের দিকে। গেঞ্জি বা ব্লাউজ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে, বগলে পেনসিল দিয়ে জ্বর দেখে, কাগজে ঘসঘস করে প্রেসক্রিপশন লিখবে। নিজেই ওযুধ কিনতে যাবে পাশের ঘরে। জলভরা একটা শিশি হাতে ঢুকবে এবং ঢক করে সবটা খেতে হবে। তারপর গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়ে ঘুমোতে বলবে। না ঘুমোলেই বিপদ। ঘুমের জন্য বারবিটুরেড ট্যাবলেটগুলো আছে আলমারিতে। শোভার কাছে চাবি। বার করে দেওয়ার জন্য বায়না ধরবে। ঘুমের ট্যাবলেট মাঝে মাঝে হিরণ্ময় খায়। হিমাংশুর ডাক্তারখানা থেকে শিশিভরতি এনে রেখে দিয়েছে। টিপুর হাতে কোনওক্রমে এই বিষাক্ত বস্তুটি যাতে না পড়ে, সে-জন্য আলমারির মধ্যে তোলা।

হিরণ্ময় বুঝতে পারছে, একবার পায়ে হাত দিয়ে যন্ত্রণার মুখ বিকৃতি করলেই টিপুর চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে। মাস ছয়েক আগে পা মচকে যাওয়ায় হিমাংশু এসে যা যা করেছিল সেইগুলিই হুবহু অনুষ্ঠিত হবে।

"টিপু, আজ নিয়ে পব পর তিন দিন তুমি পড়তে বসোনি। যাও মাসির ঘরে।"

"বাবার পায়ে যে ব্যথা হয়েছে।" টিপু মাসির ঘরে না যাওয়ার অজুহাত খাড়া করল।

"হোক ব্যথা, চলো।"

শোভা ওকে টানতে টানতে আভার ঘরের দিকে নিয়ে গেল। হিরণ্ময় হাতটা কপালের ওপর রাখল।

প্রায় প্রত্যেকদিনই এই ব্যাপার ঘটে। শুধু মজা লাগে টিপুর অজুহাতগুলো শুনতে। ওকে কিছুক্ষণ কাছে নিয়ে রাখার ইচ্ছা হল হিরণ্ময়ের। উঠে বসল সে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর দু'জনের ছবি মুখোমুখি। শোভা আর হিরণ্ময়। বিয়ের এক মাস পর, দার্জিলিংঙে তোলা। ফ্রেমের কিনারে হলুদ দাগ ধরেছে। সিগারেট ধরাতে ধরাতে হিরণ্ময় তাকাল। নিজেকে লক্ষ করল আয়নায়। বয়সের লক্ষণগুলো বেশ প্রকট মনে হচ্ছে। এক মাস আগে চুল কাটার সময় নাপিত বলেছিল, ঘাড়ের উপরে দু'-তিনটে চুল পেকেছে। শোভার চোখেই আজও পড়েনি, নয়তো ও নিজেই কলপ কিনে আনত দু'-তিনটে পাকা চুলকে ঘায়েল করতে। কোমরের বেড়ও বেড়েছে। চোখের চাউনিতে কীসের ছাপ ফুটেছে দেখার জন্য সে আয়নার কাছে এগিয়ে গেল।

"একদম পড়তে চায় না আজকাল, আর আভারও যে কী হয়েছে"---বলতে বলতে শোভা থেমে পড়ল ঘরে ঢুকেই। "কী দেখছ অমন করে?"

"বয়স।"

"তার মানে!"

"কতটা বেড়েছে দেখছি।"

শোভা ভেবে পেল না এরপর কী বলবে। বালিশটা চাপড়ে সমান করতে করতে একবার শুধু তাকাল হিরণ্ময়ের দিকে।

"তোমার কি মনে হয় খুব বুড়ো দেখাচ্ছে।" হিরণ্ময় ঘুরে দাঁড়াল।

"খুব আর কোথায়। তবে আগের মতো আর হাসিখুশি থাকো না, সব সময়েই মুখ গম্ভীর, একটুতেই খিটখিট শুরু করো।"

"কেন বলো তো?" হিরণ্ময় যেন ক্লাসে একচেটিয়া তত্ত্ব বোঝাতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এমনিই করে ফেলল।

"আমি কী করে বলব।" শোভার স্বর একটু গম্ভীর।

ধীরে পায়চারি শুরু করল হিরণ্ময় ঘরের অবশিষ্ট ফাঁকা মেঝের ওপর।

"আমার গায়ে আর জোর নেই। কোনওকালেই খুব বেশি অবশ্য ছিল না। কিন্তু এখন একদমই নেই। সেটা আজ বুঝেছি। কিন্তু আমি—"

হিরণ্ময় থমকে পড়ল। সিগারেটের ছাই ঝাড়ল মেঝের ওপর, যা দেখেও শোভার ভ্রূ কুঞ্চিত হল না।

"আজই কীভাবে বুঝলে?"

দ্বিধায় পড়ল হিরণ্ময়। একটা মেয়েকে দু'হাতে টেনে তুলতে পারিনি এবং সে মেয়েটি আভা, এ-কথা বলার সময় হয়েছে কি না বুঝতে পারছে না সে? যদিও এক সময় মনে হয়েছিল শোভাকে বলব---কেন আমি আভার সর্বনাশ করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বলার কোনও অর্থ হয় না যুক্তিও নেই। স্বীকারোক্তি দিয়ে কোনও লাভ হয় না। আসলে যা করার করে যেতে হয়।

"বুক-কেসের পিছনে এই বইটা পড়ে গেছল। কেসটা সরাতে পারলাম না একা। একটুও না। আভাকে ডাকলাম, ও এসে সরিয়ে বার করে দিল।"

"এইতেই বুঝলে!" শোভা স্পষ্টভাবে হেসে উঠল এবং উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি একটু মোটা হয়ে গেছি, না?"

হিরণ্ময় তাকাল এবং মনে মনে বলল, একটা সরল অঙ্ক ছাড়া আর কী? কিন্তু আমি জটিল অঙ্কে হাত দিলাম কেন? পুলিশ গুলি চালাচ্ছে খবর পেয়ে রাস্তায় বেরিয়েই বা গেছলাম কেন? আর আভা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে বলায় যৎসামান্যও আশ্বস্তবোধ করলাম কেন?

"দিদি দ্যাখো, টিপু পড়তে চাইছে না, ঘুম পাচ্ছে বলছে।"

আভা পর্দা সরিয়ে ঘরের দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। হিরণ্ময়ের দিকে একদমই তাকাচ্ছে না।

"ওই ওর বজ্জাতি। তিনটে স্লেট ভাঙল, চারটে প্রথম ভাগ ছিড়ল, এখনও ক, খ-র বেশি এগোল না। ঘুম পাবে না তো কি? সারা দুপুর চোখের পাতা এক করে?"

"খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। মন যখন নেই, তখন আর পড়া হবে না। মিছিমিছি যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কী?"

হিরণ্ময় শোভাকে উদ্দেশ করে বলল। অবশ্য সরাসরি আভাকেই বলতে পারত, কেন না টিপুকে খাওয়ানো ও ঘুম পাড়ানোর কাজটা তার। আভা তাকাল তার দিদির মুখে নির্দেশের জন্য। অবশ্য হিরণ্ময়ের কথা শুনেই সে টিপুকে খাইয়ে দেবার জন্য চলে যেতে পারত, কেন না, এর ওপর আব কারুব কথা খাটবে না।

"তাই দে।"

আভা চলে যেতেই আয়নার দিকে আবার তাকিয়ে শোভা বলল, "হাসিদি বলছিল, আমি আগের থেকে বেশ মোটা হয়ে গেছি। ট্যাবলেট খেতে বারণ করে দিল। যারা খাচ্ছে সবাই নাকি মোটা হয়ে পড়ছে।" কিছুক্ষণ ঘাড় হেলিয়ে চুপ থেকে অনিশ্চিত স্বরে বলল, "ভাবছি মাস দুই-তিন খাওয়া বন্ধ বাখব, কী বলো?"

"তোমাব খুশি।"

"আহা একা যেন আমারই খুশি।" আদুবি গলায় শোভা বলল এবং লাজুক চোখে তাকাল। পাউডাব পাফটা দিয়ে আলতো কবে গালে গলায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ শিউরে উঠে বলল, "না বাবা, একটাই থাকা ভাল। একজনকে সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছি, আর হয়ে দবকার নেই। তোমায় কিন্তু মনে কবিযে দিচ্ছি আর তিনটে ট্যাবলেট মাত্র রয়েছে।"

" তুমি নিজেই কিনতে পারো।"

"না বাপু, কেমন লজ্জা করে।"

শোভা ব্যস্ত হয়ে টেবিলে রাখা টাইমপিসটায় সময় দেখল। প্রতিদিন বাত আটটায় সে ট্যাবলেট খায়। কিছুতেই এর নডচড় হয় না।

আসলে যা করার করে যেতে হয়, এই কথাটা ভাবতে ভাবতে হিরণ্ময় বাইবেব ঘবে এল। ওব পিছনে শোভাও।

"কেউ বুঝতে পারবে না অথচ দেখাও হয়ে যায়, কীভাবে সেটা করা যায় বলো তো?"

হিবণ্ময় সোফায় গা এলিয়ে শোভার দিকে তাকিয়ে ভাবল একটা উত্তর বার করতেই হবে আভাকে নিয়ে এখন কী কবা যায়।

"আমার কী মনে হয় জানো", শোভা বসল হিবণ্ময়েব গা ঘেঁষে। "তোমার তো ব্লেড ফুবিয়ে গেছে, টুথপেস্টও কিনতে হবে। যদি এখন কিনতে বেরোই, যদি আস্তে আস্তে যাই আর ফিরি তাব মধ্যে কি দেখে নেওয়া যাবে না?"

"কিন্তু তাব মধ্যে যদি না বেবোয়!" হিরণ্ময় ভাবনাব মধ্যেই কথাটা বলে দিয়ে আবাব শুরু করল গুলি খাওয়াব ইচ্ছাটাই কি ছদ্মবেশ ধরে ভালবাসা হয়ে এল? একজনের মধ্যে এ-দুটো জিনিস এল কী কবে। মরা আর ভালবাসা কি একই ব্যাপার।

"ওই সিংগি বাড়িতে গেলে অবশ্য দেখা যায়, কিন্তু আমার সঙ্গে তো চেনা নেই।"

"চেনা করে নাও।"

"নাঃ। ও-বাড়িতে একটা মাতাল থাকে।" শোভার নাক কুঁচকে উঠল।

অতঃপর হিরণ্ময় শুরু কবল: দুটোর একটা বেছে নেওয়া দরকার। হয় হিমাংশুর কাছে গিয়ে আভার ব্যবস্থা করা, নয়তো যেমন আছে তাই থাক। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা প্রকাশ হোক। শোভা জানুক, ওর বাবা মা জানুক। ছ্যা ছ্যা করুক, আলাদা হয়ে যাক। তারপর পরিচিতরা জানুক, হাসাহাসি করুক, দুশ্চরিত্র লম্পট বলে নাক সিঁটকোক। আর তার মাঝে বেপরোয়ার মতো চলাফেরা, খাওয়া শোওয়া, কলেজ-পাবলিশার নিয়ে এক ধরনের বেঁচে থাকা। যা করার তাই করে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। জিনিসটা আভাকে বলা দরকার, এখুনি।

"তুমি ববং ওই ছেলেটার সাহায্য নিতে পারো। ওই যে ক'দিন আলাপ জমাতে এসেছিল। ফুটবল খেলে বেড়ায়।"

"অসীম।!"

"মোটরের কাছাকাছি যে-কোনও একটা বাড়িতে জানলা কি বারান্দায় ও তোমাকে হাজির করে দিতে পারবে।"

শোভা নির্নিমেষে তাকিয়ে কিছু ভাবল। তারপর জানলায় গিয়ে পর্দা সরিয়ে খুঁজতে লাগল অসীমকে।

অতঃপর হিরণ্ময় শুরু করল: আভাকে বলতে হবে, আমার মান-মর্যাদা, তোমার দিদির সংসার এ-সব নিয়ে চিন্তা না করে নিজের কথা ভাবো। যতক্ষণ না নির্দিষ্ট একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, অঙ্কটা কষেই যেতে হবে। তোমাকে টেনে তুলতে পারিনি, যেহেতু তুমি গায়ের জোরে আমার বিরুদ্ধতা করেছ, অথচ আমি বললেই তুমি ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই ধরনের উলটোপালটা ব্যাপারগুলোর মধ্যে একটা সমতা আনা দরকার। বিবেক দংশনের যন্ত্রণায় এ-ভাবে কাতর হয়ে পড়ার কোনও দরকার নেই। বিবেক চেহারা বদলায় তোমার-আমার অস্তিত্বের টানাপোড়েনের উপর।

আভার গলা শোনা যাচ্ছে শোবার ঘর থেকে। গল্প না শোনালে টিপু ঘুমোতে চায় না। ওকে ঘুম পাড়ানোর কাজও আভার। হিরণ্ময় কান পাতল আভার গল্প শোনার জন্য।

"ওই তো অসীম!" শোভা হাতছানি দিয়ে ডাকল।

অসীম কাছে আসতেই শোভা ফিসফিস করে বলল, "একটু দেখিয়ে দিতে পারো?"

"দেখবেন।" অসীম ঠোঁট কামড়ে ভাবতে শুরু করল কীভাবে দেখাবার ব্যবস্থা করা যায়।

"চার নম্বর বাড়ির একতলায় যারা ভাড়া থেকে, তাদের ঘরের জানলা আর ওই মাস্টারনির জানলাটা একদম মুখোমুখি, যদি চার নম্বরে যান, তা হলে—"

"ওরা কিছু মনে করবে না তো? আমি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকব না।"

"মনে আবার করবে কী, আমি নিয়ে যাচ্ছি না।" অসীম তার ক্ষমতার বহর গলার স্বর দিয়ে শোভাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

শেফালি আর ইলা সেই সময় তাঁতিগলিতে ঢুকেছে। তাই দেখে অসীম শোভাকে বলল, "দু'জন ঢুকছে, বোধহয় ওইজন্যই। দাঁড়ান, জিজ্ঞেস করে দেখি, তা হলে ওদের সঙ্গেই ভিড়ে যেতে পারবেন।"

অসীম দ্রুত গেল এবং এল। "হ্যাঁ, আপনি আসুন, ওরা নিয়ে যাবে।"

শোনামাত্র শোভা চটি গলিয়ে সদরের দিকে ছুটে গেল প্রায়। খিলে হাত দিয়ে আবার ছুটে এল শোবার ঘরে। ট্যাবলেট খাবার সময় হয়েছে তার। ওর দৃঢ় ধারণা প্রতিদিন ঘড়ি ধরে না খেলে কোনও ওষুধেই ফল ফলে না। চাবি দিয়ে আলমারি খুলে মোড়ক থেকে একটি ট্যাবলেট বার করে মুখে ছুড়ে দিয়ে, "খোলা রইল, চাবি বন্ধ করে দিস," আভাকে এই বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হিরণ্ময় শুনতে পেল রাস্তায় অসীম হতাশস্বরে বলছে, "আপনি একাই যাবেন?"

উঠে দাঁড়াল সে। টিপু ঘুমিয়ে পড়েছে কি? আভাকে বলতে হবে, হেস্তনেস্ত করে জীবনটাকে বেশ একটা নাড়া দেওয়া দরকার। সেইজন্যই তো ব্যাপারটা ঘটালাম। জেনেশুনে, ইচ্ছে করেই।

ইলা ভাবল সিল্কের শাড়িটা পরবে কি না। মনস্থির করতে করতে, চিরুনি টানল চুলে। একটু ক্রিমও লাগাল গালে। অবশেষে অশোকের মতামত নেওয়াই উচিত মনে করল।

"হ্যাঁ গো, এই শাড়িটা পরেই যাব?"

অশোক বিরক্ত হয়ে মুখ তুলল বালিশ থেকে, "তবে কী পরে যাবে? যাচ্ছ তো পাশের বাড়ি!"

ইলারও মনে হল কথাটা ঠিকই বলেছে। তা ছাড়া সিল্কের শাড়িটা সবে আড়াই টাকা দিয়ে কাচিয়ে আনা হয়েছে। এই রকম ব্যাপারে বার করলে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যায়।

নীচে এসে দেখল পারুলের দরজা ভেজানো। খুলে দেখল, পারুল শুয়ে, কপালে হাত, চোখ বন্ধ।

"কী রে, মাথা-ধরা কমল?"

"না ভাই, আরও যেন মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে। তুই বরং যা।" বলে পারুল মুখচোখে যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলল। তাই দেখে ইলা আর কথা বাড়াল না।

শেফালি ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে তর্জনী ঠোঁটে ঠেকিয়ে ইলাকে চুপ থাকতে ইশারা করল।

"বাড়ির কেউ জানে না। তা হলে বউয়েরা হাতে কাজ ধরিয়ে বেরোনো বন্ধ করে দেবে।" ফ্যান গালতে গালতে ফিসফিস করে শেফালি বলল। "বউগুলোকে জানোই তো। বিনি পয়সায় দু'মুঠো খাওয়া আর থাকার বদলে এই দাসীবৃত্তি আজীবন আমার ভাগ্যে লেখা আছে।"

সমবেদনায় ইলার অন্তর ভরে উঠল। শেফালি হাঁড়িটা মেঝেয় উপুড় করে বলল, "আসছি ভাই।"

রেডিয়োয় নাটক হচ্ছে। দুই ঘরে দুটি রেডিয়ো। বাড়ির সবাই দুই ঘরে ভিড় করে শুনছে। শেফালির হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে সিঁথেয় একটু চওড়া করে সিঁদুর দেয়। ঘরে এত লোক দেখে সে ফিরে গিয়ে অন্ধকার বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল। কী যেন তার হচ্ছে বুকের মধ্যে। হঠাৎই এখন পঞ্চাননকে মনে পড়ছে বারবার। মাস দুয়েক আগে দেখা করেছিল ওর সঙ্গে। বাগবাজারের দোকানটা আগেই সে চিনে রেখেছিল। অনেকদিন সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে, পঞ্চাননকে এক ঝলক দেখে নেবার আশায়। এক দিন সে বেপরোয়ার মতো ঢুকেও পড়েছিল।

পনেরো বছর পর দেখে চিনতে পারেনি পঞ্চানন। খদ্দের ভেবে এগিয়ে এসে কাউন্টারে ঝুঁকে বলল, "কী চাই বলুন।"

নিজের নাম বলতে শেফালির সংকোচ হল। শুধু কোনওক্রমে বলে, "কিছু কিনতে আসিনি।"

চশমার কাচের পিছনে পঞ্চাননের চোখে দুটিতে বিস্ময় ফুটতে ফুটতে হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল।

"তা হলে কী চাই?"

স্বরের গাম্ভীর্য পরিমাপ করে শেফালি বুঝল, চিনতে পেরেছে।

"কথা ছিল।"

পঞ্চানন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ডান গালের আঁচিলটার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি। গোঁফটা আগের থেকে ছোট হয়েছে, জামার কলার ময়লা, নখগুলো বড়, চামড়া খসখসে, অন্তত দু'দিন দাড়ি কামায়নি, অনেকগুলো চুল পেকেছে।

"আমার সম্বন্ধে কী ঠিক করেছ?" শেফালি স্পষ্ট স্বরে জানতে চাইল। তেজ দেখাবার বয়স আর নেই। লজ্জা করলেও চলবে না। বিয়ে করা বউ তো বটে, এই ভেবে সে সরাসরি পঞ্চাননের চোখের দিকে চেয়ে রইল।

"আমার তো ঠিক করার কথা নয়।"

"স্ত্রী সম্পর্কে স্বামী ঠিক করবে না তো কে করবে? সেটাই তো নিয়ম।"

"তুমি যে আমার স্ত্রী, কে বলল?"

"আইন বলবে।"

"ওঃ, আইন দেখাতে এসেছ।"

পঞ্চাননের শরীর শিকার দেখা হিংস্র প্রাণীর মতো কুঁজো হয়ে গেল।

"দরকার হলে তাই দেখাব।"

থতমত হল পঞ্চানন। ঝাড়ন দিয়ে কাউন্টারের ধুলো মুছতে শুরু করল। এই সময় এক খদ্দের এল পাঁউরুটি কিনতে। শেফালি একধারে সরে দাঁড়াল। যাবার সময় লোকটি অভিযোগ করল, "কালকের রুটি কিন্তু বাসি ছিল।"

"কী করব বলুন, কোম্পানি যেমন দেয়।"

"কোম্পানিকে জানান।"

লোকটি চলে যেতেই শেফালি বলে, "তা হলে? ভায়েদের সংসারে এই ভাবেই পড়ে থাকব? শাড়ি গয়নার তো আমার দরকার নেই, খাই-খরচ পেলেই চলবে।"

"যদি না দিই।"

"তা হলে মামলা করে আদায় করব।" শেফালি কাউন্টারে চাপড় মারল।

"যদি বলি স্বেচ্ছায় চলে গেছ, আমি বরাবরই তোমায় আমার কাছে রাখতে রাজি ছিলুম, এখনও রাজি?"

"এখনও রাজি!" শেফালি এবার থতমত হল। অবিশ্বাসের সুরে বলল, "আমি স্বেচ্ছায় আসিনি, তুমিই তাড়িয়েছিলে। মদ খেয়ে এসে আমায় লাথি মেরে কী বলেছিলে আজও আমার তা মনে আছে। আমি মেয়েমানুষ নই, আমাকে নিয়ে তোমার সুখ হয় না—"

কান্নায় গলা বুজে গেল শেফালির। দু'চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ল। পঞ্চানন কাউন্টারের তলার

ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। দোকানের দরজার পাল্লা আধ-ভেজিয়ে, ফিরে এসে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, এই টুলটায় বোসো।"

শেফালি বসল।

"এই তো দোকান দেখছ। মাসে কতই বা রোজগার, বড়জোর শ' দুই। এর থেকে তিরিশ-চল্লিশ টাকা খোরপোশ দিতে হলে আমার সংসার অচল হয়ে যাবে। তা ছাড়া তোমায় যদি বলি, এখন আমার কাছে এসে থাকো। পারবে?"

"ছেলেমেয়ে ক'টি?" ইতস্তত করে শেফালি বলল।

"বড়টি মেয়ে, তেরোয় পড়ল। এখনও স্কুলে পড়ছে। তবে আর পারব না। পরের চারটি ছেলে। এই আয়ে এতগুলোকে নিয়ে আর চালাতে পারছি না। ভিখিরিরও অধম হয়ে থাকি। চাকরি খুঁজছি। এই বয়সে পাবই বা কোথায়!"

পঞ্চানন করুণ চোখে তাকাল। শেফালি চোখ সরিয়ে অস্পষ্টভাবে বলল। "ওরা কি আমার কথা জানে?"

"জানে।"

"কিছু বলে?"

"তোমায় নিয়ে কোনও কথাই হয় না।"

"আর কেউ কিছু বলে না?"

"গীতা তোমায় শুধু একবার দেখতে চেয়েছিল।" পঞ্চানন ইতস্তত করে, কিছু ভেবে নিয়ে যোগ করল, "আমি বলেছিলাম কিনা তুমি ওর থেকেও সুন্দরী।"

শোনা মাত্র উঠে দাঁড়াল শেফালি।

"রোগে ভুগে ভুগে গীতার আর কিছু নেই। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। হয়তো আর বাঁচবেই না। তুমি একদিন এসে দেখে যেতে পারো, সত্যি বলছি কি না।"

শেফালি দরজার দিকে এগোল।

"আমার এই সামান্য আয়ে আর ভাগ বসিয়ো না। ছাপোষা মানুষ আমি। জোড় হাতে মিনতি করছি শেফালি। মনে করো তুমি বিধবা হয়ে গেছ।"

কথা না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে শেফালি।

দোতলা থেকে শেফালি নেমে আসতেই ইলা ব্যস্ত হয়ে বলল, "দেরি হয়ে গেল বোধহয় ঠাকুরঝি। আপনার সঙ্গে চেনা আছে তো ও-বাড়ির লোকেদের?"

"আমি এ-পাড়ার মেয়ে, জন্ম থেকেই রয়েছি। চার নম্বর বাড়ির ভাড়াটেদের সঙ্গে নাই বা চেনা থাকল, জানলা দিয়ে একবার দেখব, তা কি আর দেখতে দেবে না? ও-ঘরে আগে থাকত লক্ষ্মীরা। তখন কত যাতায়াত ছিল।"

ওরা দু'জন রাস্তায় নামল। অনন্ত সিংহ হাতে সন্দেশের বাক্স নিয়ে ফিরছে। শেফালি বলল, "পুতুলকে সাজাচ্ছে কে গো, কাশিমা?"

"হ্যাঁ। আর আজকালকার যা সাজগোজের বহর, নিজেরাই সেজে নিতে পাবে।"

অনন্ত এড়িয়ে গেল শেফালিকে। সত্যচরণ পাম্প করে যাচ্ছে টিউবওয়েল। শেফালি বলল, "কী গো সত্যদা, জল নেওয়া যে আর শেষই হয় না। তখন থেকে তো হ্যান্ডেল চালাচ্ছ।"

"দেখ না, কালীর মা কিনা কীসের একটা বালতি এনে জল নিয়ে গেল। সব ধুয়ে টুয়ে—"

"অ, কালীর মা জল নিচ্ছিল এতক্ষণ!" শেফালি মুখ টিপে ইলার দিকে তাকিয়ে হাসল। লক্ষ করে সত্যচরণের বুক টিপটিপ করে উঠল। কাল দুপুরে নির্ঘাত হারামজাদিটা গল্প করতে আসবে চারুশীলার কাছে। আঙুরকে পাঁচটা টাকা দিয়ে আসতে হবে। টাকা থাকে চারুর কাছে। চেয়ে নিতে হবে। কিন্তু আঙুরের সঙ্গে এই দেখা হওয়ার কথা কানে গেলেই, পাঁচ টাকার সঙ্গে সেটি গেঁথে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে। দাঁত কিড়মিড় করে সত্যচরণ তাঁতিগলির দিকে তাকাল। সেখানে অসীমের সঙ্গে কথা বলছে শেফালি।

শোভা আসতেই শেফালি বলল, "আপনি এতদিন রয়েছেন পাড়ায়, অথচ ভাবসাব হয়নি। যাক, আজ হয়ে গেল।"

"আমার কেমন আড়ষ্টতা লাগে। একদমই মিশুক নই, তবে ইচ্ছে করে খুবই।" শোভা নম্রস্বরে বলল।

"বউদিকে সে-জন্য পাড়ায় বলে ডাঁটিয়াল।" অসীম হাসল শোভার দিকে তাকিয়ে।

"ও-সব পাড়ার লোকের কথায় কান দিতে হবে না আপনাকে। সবাইকে আমার চেনা আছে। চলুন।" শেফালি তাঁতিগলির মধ্যে ঢুকল।

ইলা এতক্ষণ শোভার আপাদমস্তক দেখছিল খুঁটিয়ে। তাঁতিগলিতে ঢুকে শোভার পিছনে যেতে যেতে বলল, "আপনার বোন এল না?"

"ও পড়ছে। ফাইনালের তো আর বেশি দেরি নেই।"

"আমি আর যাব না।" অসীম চার নম্বর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কেন রে, তুইও আয় না!"

"আপনাবা দেখুন, আমি অনেক দেখেছি, কথাও বলেছি।"

অসীম গলি থেকে বেরিয়ে অনন্ত সিংহেব বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল। তাবপব কড়া নাড়ল।

নয়

"আপনি সিগারেট খান!"

ভোম্বল অর্থাৎ দ্বাবিক সিগারেটের বাক্সটা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

"কেন, আমি কি খেতে পারি না?"

"কোনওদিন তো দেখিনি।" মানু অর্থাৎ মনীষা খাটের উপব বালিশে কনুই ভর দিয়ে হেলে পড়ল।

"দেখবে কী করে, কোনওদিন কি তাকিয়ে দেখেছ?"

"আহা, এতবার এসেছি এ-বাড়িতে আপনাকেই তো দেখতে পাই না।"

"মিথ্যে কথা বোলো না। বাস স্টপে একদিনও তো ফিরে তাকাওনি। বড্ড ডাঁট তোমার।"

"আহা-হা, ডাঁট আবাব কোথায় দেখলেন। আমি রোজই দেখতে পাই, আপনিই তো গম্ভীর হয়ে থাকেন। কথা বললে উত্তর দেবেন কি দেবেন না—", মনীষা মুখ টিপে হাসল।

দ্বারিক জোবে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়ার রিং তৈরি করতে করতে ভাবল, এই নিয়ে দু'বার 'গম্ভীর' শব্দটি ব্যবহার করল। গম্ভীর লোক তা হলে একদমই পছন্দ কবে না ও। কিন্তু মুখ টিপে হাসলে মানুকে দারুণ দেখায়, আর কী বলা যায়, যাতে মানু এই ভাবে হাসে।

"আমাকে তা হলে তুমি খুবই অভদ্র মনে করো।"

"করিই তো।" বলেই মনীষা ভাবল, ভোম্বলদা কি আবার গম্ভীর হয়ে যাবে এই শুনে! বড্ড হাসি পায় এই ভাবে ওকে দেখলে।

"বেশ তা হলে আর কোনও কথা বলব না।"

ভোম্বল খুব খুশি হয়ে মুখখানাকে থমথমে করে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত হল। চপল লঘু সুরে কথা বললেই মানুকে মানায়।

"না বললে আমার বয়েই গেল। আমি এখন কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তা হলে গল্প করব।"

"মেয়ে না পুরুষ বন্ধু?" ভোম্বল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল।

"পুরুষ বন্ধু।" মনীষা মুখ টিপে হাসল, ভোম্বলের মনে হল খুনসুটি না করলে মানু এমন করে হাসবে না।

"তোমার তো অনেক পুরুষ বন্ধু।"

"আছেই তো।"

"আমার কোনও মেয়ে বন্ধু নেই।"

"হবে কী করে, আপনি নামেও ভোম্বল, কাজেও ভোম্বল।"

"মোটেই না। অনেকেই এসেছিল বন্ধুত্ব করতে, কাউকেই পাত্তা দিইনি। সব বাজে চিপ টাইপের।" কথাগুলোকে যুক্তিবান করার জন্য ভোম্বল আর একটু যোগ করল, "ব্যাঙ্কিংয়ের সেকেন্ড পার্টটা পাশ করলে অফিসার গ্রেডে যাবার চান্স আরও সহজে পাব, জানে তো, তাই এসে জুটেছে।"

শুনতে শুনতে কালো হয়ে উঠল মনীষার মুখ। অন্যমনস্কের মতো আলতো আঙুলে খোঁপার গোলাপটি স্পর্শ করার জন্য তুলতেই কাঁধ থেকে সিল্কের শাড়ির আঁচলটি পড়ে গেল।

"তুমি আবার কবে থেকে হাত কাটা ব্লাউজ পরা শুরু করলে?"

আঁচলটা বাহুর ওপর টেনে সিধে হয়ে বসল মনীষা। বিব্রত স্বরে বলল, "অনেকেই পরছে, ভাবলুম, দেখি একবার পরে।"

ভোম্বল গম্ভীর হয়ে সিগারেট ধরাল। দরজার পর্দাটা মনে হল যেন একটু সরে রয়েছে। বড়দা দেখে ফেলতে পারে ভেবে, টেনে-টুনে ঠিক করে দিল।

"এইরকম ব্লাউজ চিপ মেয়েরা পরে। আর ওইভাবে কোমরের অত নীচে শাড়ি পরা।"

"আমি তো চিপই।"

ভোম্বল আহত চোখে তাকাল। মানু কি রাগ করল তার কথায়? হয়তো চলে যেতে চাইবে এখুনি।

"তবে অনেককে পরলে ভাল দেখায়। বিশেষত যাদের গায়ে চর্বি নেই, ছিপছিপে লম্বা। তোমাকে বেশ মানিয়েছে।" বলে ভোম্বল হাঁফ ছাড়ল। মনীষা তব মেঝের দিকে তাকিয়ে। মুখটা থমথমে হয়ে আছে।

"তোমাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।"

মনীষা মুখ তুলে একবার তাকাল। একটু হাসি ঠোঁটে লাগিয়ে বলল, "আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।"

"মোটেই না, যা সত্যি তাই বলছি।" সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ভোম্বল জানলায় গেল।

"চিপ মেয়েরা আবার সুন্দর হয় নাকি।"

ভোম্বলের আর ছাই ঝাড়া হল না। পাংশু মুখে ফিরে তাকাল সে।

"তুমি রাগ করেছ?"

"না না, রাগ কবব কেন, আপনি তো ঠিকই বলেছেন। সবাই তো আমায় তাই ভাবে।" মনীষা শান্ত গলায় বলল বটে, কিন্তু অভিমান চাপতে পারল না।

"সবাই কী ভাবে, তা দিয়ে কিছু এসে যায় না।" ভোম্বল খাটের উপর বসল। "আসলে পাত্তা না দিলেই হল। সত্যিই তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ইচ্ছে করছে ফুলটা চেয়ে নিই।"

"সুন্দর বলে তো ঠাট্টা করলেন। তার উপর ফুল চেয়ে আর নুনের ছিটে দিতে হবে না।"

"সত্যি সত্যিই চাইছি।" ভোম্বল সিগারেট ধরা হাতই বাড়াল।

"নিয়ে কী করবেন?"

চট করে উত্তর দিতে পারল না ভোম্বল। দারুণ একটা কিছু বলার জন্য সে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল। এমন একটা কিছু বলতে হবে যাতে এইসব ধানাই-পানাই শেষ হয়ে আসল ব্যাপারে আসা যায়। অর্থাৎ, ভোম্বল ভাবল, মানু যেন ঠাট্টা না করে এবার সিরিয়াস কথা বলতে শুরু করে।

গোলাপটা খোঁপা থেকে হাতে নিয়ে মনীষা গন্ধ শুঁকছে। মুখে চাপা হাসি। ঠোঁটে হালকা বেগুনি রং, আঁচলটি পিঠের দিকে সরে যাওয়ায় ডান বাহুটি অনাবৃত, বাঁ পায়ের উপর ডান পা-টি রেখে ধীরে ধীরে নাচাচ্ছে।

"আজ একজন ঠিক আপনার মতোই চাইল ফুলটা।"

ভোম্বলের মনে হল ভূমিকম্প ঘটছে, দাঙ্গা হচ্ছে, আগুন লেগেছে, বন্যা হচ্ছে। নিশ্বাস ত্যাগের প্রথম ফুরসত পেয়েই সে বলল, "কে?"

"নাম বললে আপনি চিনবেন না।"

"কেন চাইল?"

"তা কী করে বলব!"

"কে হয় তোমার? কোনও বন্ধু?"

"কে আবার, কেউ না।"

"তা হলে চাইল কেন?"

"আপনিই বা চাইছেন কেন, আপনি কি কেউ হন? তা ছাড়া কেউ না হলে বুঝি চাইতে পারে না!"

"নিশ্চয় পারে যদি চাইবার মতো ঘনিষ্ঠতা থাকে।"

মনীষা এবার থেমে উত্তর খোঁজার জন্য খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তাই গোলাপটি হাত থেকে পড়ে গেল খাটের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বল সেটি তুলে নিল। মনীষা চমকে বলল, "একী!"

ঘরের আলো নিভে গেছে।

"বোধহয় মেন ফিউজ হয়ে গেছে।" ভোম্বল উঠে দরজার দিকে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর এবং আবেগপূর্ণ স্বরে বলল, "মনীষা, অন্ধকারে ভয় পেয়ো না।"

"না।"

ভোম্বলের বুক চিতিয়ে উঠল তাই শুনে। একটা চাপা কলবর শুনতে পেল সে। সারা পাড়া যেন হঠাৎ একবার হইচই করে উঠল। জানলায় এসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেরেছে। আজও আবার হল! শুধু আমাদের বাড়িতেই নয়, গোটা পাড়াটাই। দেখবে এসো, কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে রাস্তাটা, বাড়িগুলো এই অন্ধকারে।"

মনীষা উঠে এসে ভোম্বলের পাশে দাঁড়াল। সেন্টের গন্ধ পেল ভোম্বল। মিষ্টি একটা আবেশ তাব মাথাব মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। ফিসফিস করে বলল, "আমি এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় ।"

বৈঠকখানার তক্তপোশে চারটি যুবক ভব্যযুক্ত হয়ে বসে। অনন্ত ঝিয়ের হাত থেকে চায়ের ট্রে তুলে নিয়ে ওদের সামনে রাখল।

"প্রায়ই তো আসে। গাড়িটা বরাবর আমার বাড়িব সামনেই রাখে। একদিন পুতুল দোতলার ঘরে গাইছে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়েই শুনে পিসিকে গিয়ে বলে, একটি মেয়ের গলা শুনলাম, ভারী মিষ্টি তো! জিজ্ঞেস করো তো যদি সিনেমায় গান গাইতে রাজি থাকে, তা হলে এখনই কনট্রাক্ট কবব। পুতুলের মার কাছ থেকে শুনে আমি বললুম, দরকার নেই বাপু। আগে বিয়ে হোক, তাবপর শ্বশুরবাড়ি যদি চায় তখন নয় সিনেমা-জলসায় গাইবে। আমি আবার একটু সেকেলে ধরনের মানুষ। অনেকে তো তাই বলে, অনন্ত সিংগি মরে গেলেও বনেদিপনা ছাড়বে না, কিছুতেই।"

খাবারের প্লেট হাতে ঝি ঢুকতেই অনন্ত কথা বন্ধ করে প্লেটগুলি ওদের সামনে সাজিয়ে রাখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন যুবক চতুষ্টয় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—

"গলির মধ্যে তাই হেরাল্ডটা এনেছে। নয়তো ছ'টা হেডলাইটওয়ালা সেই ফোর্ডটাতেই চড়ে।"

"জিতু বলছিল, ওটার কারবুরেটারটা গোলমাল করছিল বলে ওদের গ্যারেজে একবার পাঠিয়েছিল।"

"জিতুর কথা তো! চেপে যা বাবা। কোনওদিন হয়তো শুনবি বোম্বাই থেকে রাজ কাপুর গাড়ি এনেছেল অ্যাক্সেল বদলাতে।"

যে যুবকটি কথা বলেনি, অর্থাৎ পুতুলের হবু স্বামীকে অনন্ত বলল, "নাও বাবাজি, আগে একটু মিষ্টি মুখ হয়ে যাক।"

এইসময় সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। অনন্ত বৈঠকখানা থেকেই হাঁক দিল, "কে?"

"আমি অসীম।"

শুনেই উদ্বিগ্ন হয়ে অনন্ত বেরিয়ে এল।

"কী ব্যাপার?"

আংটিটা বার করে অসীম বলল, "তিরিশটা টাকা দিতে পারেন এক্ষুনি।"

"এখন তো পারব না, সিন্দুক আজকের মতো বন্ধ করে ফেলেছি। কাল সকালে বরং এসো।"

এরপর অনন্ত আংটিটা হাতে নিয়ে আলতোভাবে দু'বার লুফে বলল, "গোটা দশেক টাকার বেশি তো হয় না।"

"আমার এখুনি তিরিশ টাকা দরকার।"

"কাল সকালের আগে দিতে পারব না। এখন আমি খুবই ব্যস্ত রয়েছি, কাল বরং এসো গোটা পনেরো পর্যন্ত দিতে পারব।"

অনন্তের পা দুটো জড়িয়ে ধরবে কি না অসীম ভাবল। লোকটা হয়তো এতক্ষণে আবার চিৎকার শুরু করেছে। ঘরের কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে প্রভাত মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করছে। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

অসীম হাত বাড়িয়ে নিচু হতে যাচ্ছে, অনন্ত এক পা পিছিয়ে গেল।

"একী, এ-সব কেন! বলছি তো কাল এসো। আজ কিছুতেই পারব না! লোক বসে রয়েছে, তুমি এখন এসো, আমি খুব ব্যস্ত।"

বলতে বলতে অনন্ত পিছিয়ে যেতে লাগল। এই সময় ছাদের ঠাকুরঘরে ঝনঝন শব্দ উঠল বাসন পড়ার। দোতলার বারান্দায় উবু হয়ে যারা বৈঠকখানার জানলা দিয়ে পুতুলের হবু বরকে দেখার চেষ্টা করছিল, তাদের কেউ ছুটে গেল তিনতলায়।

অসীম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখল অনন্ত বৈঠকখানায় ঢুকে গেল। রাগে অন্ধকার হয়ে এল তার দৃষ্টি। বাবা মা ভাইবোন ঠাকুমা, প্রত্যেককে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে নিজের ডান হাঁটুতে কিল মারতে শুরু করল। "এইটে, এইটেই যত নষ্টের গোড়া।"

"এই এক ঝামেলা", বৈঠকখানায় ঢুকেই অনন্ত চারজনের প্লেটের উপর চোখ বোলাল, "একী হাত যে চলছে না। অ্যাঁ, ইয়ংম্যান সব, এখনও এতগুলো পড়ে রইল যে।"

"এত দিয়েছেন, দশজনেও যে শেষ করতে পারবে না।"

"তার উপর আসার আগে রেস্টুরেন্টে একটা করে কাটলেট সাঁটিয়ে এসেছি।"

"অবিশ্যি আমাদের পল্টুকে আনলে কোনও ভাবনা ছিল না। মনে আছে রে, গত বছর দমদমের সেই পিকনিকে?"

ওরা সবাই মুচকি হাসল।

"কাউন্সিলর কুমার চৌধুরি আবার লোক পাঠিয়েছিল। এই এক ঝামেলা" অনন্ত গুছিয়ে বসল, "আমিই ওকে দাঁড় করিয়েছি। ছোট থেকেই বলতে গেলে আমাদের বাড়িতেই মানুষ। বাবা তো একটা সাইকেল মিস্তিরি ছিল, সাইকেল ভাড়া দিত। আমরা শিখেছি ভুবনের সাইকেল ভাড়া নিয়ে। সেই ভুবনের ছেলে কুমার। কিছুতেই রাজি ছিল না ইলেকশনে নামতে। জেতার কোনও চান্স অবিশ্যি ওর ছিল না। পাড়ার লোকেরা ধরল এসে, অনন্তদা তুমি বেরোও একবার, কুমারও এসে ধরল। একদিন বেরোলুম ওর জন্য। আমার যত মামলা-মোকদ্দমা সব তো ওই করে, এক পয়সাও ফি নেয় না। ওকী, সন্দেশটা পড়ে রইল কেন! না, না, কিচ্ছু ফেলা চলবে না। এইমাত্র কুমার একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিল, যদি আমার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারে, তবেই ওকে কর্পোরেশনে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে। আমি না বললে হবে না। ছেলেটা তো পা জড়িয়ে ধরল, এ যে কী জ্বালা কী বলব! দিনরাত কড়া নড়েই চলেছে। কী? না, কুমারবাবু পাঠিয়ে দিল। এমন শত্রুতা করবে জানলে কি আর ওটাকে জেতাতুম।"

অনায়াসে কথাগুলো বলার সুখে ঝকমক করতে লাগল অনন্তের চোখ। লক্ষ করল, যুবক চতুষ্টয়ের বসার ভঙ্গিতে সমীহের ছাপ লেগেছে। ঝি ব্যস্ত হয়ে এসে বলল, "বাবু একবার ভেতরে আসুন, কাণ্ড হয়েছে এক।"

অনন্ত বেরিয়ে দেখে ওর স্ত্রী দাঁড়িয়ে, হাতে একটা সবুজ রবারের বল।

"এই দ্যাখো, কে ছুড়ে মেরেছে ঠাকুরঘরে সোজা গুপীনাথের গায়ে। গুপীনাথ উলটে পড়ে গেছেন। কী যে অমঙ্গল ঘটবে। আমার কেমন বুক কাঁপছে ভয়ে। কে এমন শত্রুতা করল গো।" ডুকরে কেঁদে উঠল অনন্ত-গৃহিণী।

ভয়ে অনন্তের মুখ শুকিয়ে গেল। হঠাৎ এই সময় কে বল ছুড়ল? তাও সোজা গোপীনাথের গায়ে! নিশ্চয় কোনও খারাপ উদ্দেশ্য আছে। ক্ষতি করতে চায়, নয়তো অত ভারী বিগ্রহ পড়ে যাবেই বা কেন। কাছে থেকেই ছুড়েছে। ঠাকুরঘরের দরজার সামনেই তো বাসুদেবের ছাদটা।

"হ্যাঁ গা, কী হবে!"

"গুপীনাথ কি পড়েই আছেন?"

"হ্যাঁ, মেঝেয় একেবারে মুখ থুবড়ে।"

"থাকুন ওই ভাবে, কেউ যেন ওঁকে টাচ না করে। আমি থানায় ডায়রি করে আসছি। মন যেন কেমন কু গাইছে। দেখি, বলটা দাও তো।"

বলটা ফুটো। টিপতেই হাওয়া বেরিয়ে চুপসে গেল। হঠাৎ অনন্তর মনে হল, এটা যেন চেনা। আজই সকালে তার বাড়ির সামনে বাসুদেবের ছেলেটা একটা সবুজ বল টিপে টিপে চোপসাচ্ছিল।

"হারামজাদা।" দাঁতে দাঁত ঘষে অনন্ত তির বেগে সদর দরজার দিকে ছুটে গেল। লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ল। ভারী শরীরটা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে সামনের বাড়ির দেয়ালে ধাক্কা খেল। ঘুরে সোজা হয়েই দেখল বাসুদেব তাঁতিগলির মুখে দাঁড়িয়ে ছোট-ছেলেকে বলছে, "যা দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়, আর বাড়ির বাইরে থাকতে হবে না। বল বাবা ডাকছে, এখুনি না এলে জুতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেবে।"

"শালা তোরই চামড়া তুলব।" চিৎকার করে অনন্ত এগিয়ে গেল বাসুদেবের দিকে।

বাসুদেবের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল অনন্তের কথাগুলো কার উদ্দেশে, বুঝতে। বোঝার পর আর সময় পেল না।

"এটা কী রকম্ ছোটলোকমি হল, অ্যাঁঃ? আমি থানা-পুলিশ করব।" অনন্ত রবারের বলটা তুলে ধরল। সেটা দেখে বাসু মিইয়ে গেল।

"কেন, থানা-পুলিশ কী জন্য?"

"ন্যাকা, জানো না? এ বল আমার ঠাকুরঘরে ছুড়ে গুপীনাথকে ইনজিওরড করা হয়েছে, আর এ বল তোরই ছেলের।"

"কে বলেছে ওটা আমার ছেলের বল?" বাসু তেরিয়া হবার চেষ্টা করল।

"বলটা তবে কার?"

"কার তা আমি কী করে বলব! উইদাউট এনি প্রুফ বললেই হল? ও-রকম বল হাজার হাজাব, থাউজেন্ড অ্যান্ড থাউজেন্ড ছেলের কাছে পাওয়া যাবে।"

"তোর ছেলের হাতে আজ সকালেই আমি দেখেছি। এই দেখ, এইভাবে"—বলটা বাসুর মুখের সামনে ধরে অনন্ত টিপল। "তোর ছেলে, এই তো এই ছেলেটাই, টিপছিল।"

বাসুর ছেলে তখন তার দিদি প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোচ্ছে তাঁতিগলি থেকে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে কেঁদে উঠল ভয়ে।

"হোয়াট ইজ দিস!" বলের হাওয়া মুখে লাগতেই বাসু আঁতকে পিছিয়ে গেছল। "অ্যাঁ, নোংরা বলেব হাওয়া মুখের ওপর? আমার ছেলেকে থ্রেট করে কাঁদানো? আই উইল কল পুলিশ। আমিও থানায় যাব। তেল বার করে ছাড়ব।"

বাসুদেব চিৎকার শুরু করল লোক জড়ো করার জন্য। বারান্দা এবং জানলা ভরে গেল। বাড়ির থেকে অনেকে বেরিয়ে এল। পথ-চলতিরা কৌতূহলে দাঁড়াল।

"কী হয়েছে বাসুবাবু?" একজন জিজ্ঞাসা করল।

"এই দ্যাখো না ভাই", বাসু খুশি হল প্রশ্নটা হওয়ায়। "অনন্তর ঠাকুরঘরে কে ওই বলটা ছুড়েছে, আর এসে গালাগাল দিয়ে বলছে, বলটা আমার ছেলের অর্থাৎ ওই ছুড়েছে। আমি জানতে চাই", বাসু বাঁ তালুতে ডান হাতের চাপড় মারল। "আই ডিমান্ড, আমার ছেলেকে কেন, কীসের ভিত্তিতে দায়ী করা হল? প্রুফ নেই, উইটনেস নেই। আর তম্বি করা হচ্ছে থানা-পুলিশ করবে! করুক না, দেখি কত তেল হয়েছে।"

অনন্ত থিতিয়ে যাচ্ছিল। বাসুর শেষ কথাটায় ভেসে উঠল। "হয়েছেই তো। একশো বার তেল হয়েছে। তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে না। জানেন মশাই, ব্যাটা কী বলেছে মুদিকে! আমার ঠাকুর্দা নাকি নোট জাল করত, ডাক্তারবাবুকে বলেছে, আমার বাবার নাকি খারাপ রোগ ছিল!"

"কোন শালা আমার বাপ-ঠাকুর্দা তুলে কথা বলেছে।"

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল দুলাল। নাকে কাপড় দিয়ে কাছের লোকেরা একটু সরে গেল।

"আমি বলেছি," বাসু সমান তেজে চিৎকার করল, "গরম, পয়সার গরম দেখাবে অনন্ত সিংগি?

গাড়িতে পা তুলে একদিন আমার বাপ-ঠাকুর্দাও দাঁড়াত রে, তখন তোর বাপ-ঠাকুর্দা এসে আমাদের বৈঠকখানায় জুতো খুলে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকত, বসতে বললে তবেই বসতে পারত। পয়সা আজ আছে কাল নেই, কিন্তু বংশের শিক্ষা-দীক্ষা চিরকাল রক্তে থেকে যায় রে, থেকেই যায়।"

"ব্যাটার মাসের মধ্যে দশ দিন তো উনুন ধরে না।" অনন্ত ভাইকে পেয়ে প্রচণ্ড বলশালী বোধ করছে। নিশ্চিন্তে এবার সে বলটা বাসুর নাকের কাছে আবার টিপল।

"আমার উনুন ধরে কি না ধরে তোর বাপের কী?"

"চোপরাও শালা, বাপ তুলবি না," দুলাল টলে পড়ে যাচ্ছিল, অনন্তই ধরে ফেলল। "রক্তারক্তি করে দেব। অনন্ত সিংগিকে যা খুশি বল শালা, বাপ-ঠাকুর্দা নিয়ে টানাটানি করলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।"

"ব্যাটা, ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারিস না। বড়মেয়েটা তো সে জন্যই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।" অনন্ত বলটা কচলাতে লাগল মুঠোয়।

"থাক গে অনন্তবাবু, ও-সব পারিবারিক কেলেঙ্কারি আর রাস্তার মাঝে বলার দরকার কী।" একজন শ্রোতা অনুরোধ জানাল অনন্তকে উসকে দেবার জন্য।

"বাসুদা বাড়ি যাও, বাড়ি যাও। আর চেঁচাতে হবে না। তোমার আবার ব্লাডপ্রেসার আছে।" এক শুভানুধ্যায়ী বাসুর হাত ধরে টানল।

বিমূঢ় বাসুদেব ফ্যালফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অনন্ত গোলাকার ভিড় থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির সদরের দিকে এগোল। গোলমাল শুনে তার বাড়ির সবাই এসে সদরে দাঁড়িয়েছে। ঝি এসে ফিসফিস করে অসমাপ্ত পারিবারিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পাত্রী দেখতে আসা চার যুবকও সদরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। অনন্তর মনে হল, তার প্রতাপের সম্যক পরিচয় পেয়ে নিশ্চয় ওরা পুতুলকে পছন্দ করার সময় খানিকটা কন্সিডার করবে।

হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে গিয়ে বাসুদেব হাত ধরল অনন্তের।

"বলব? সেই কথাটা বলব? কেন তুই কুমার চৌধুরিকে দেখলে ভয় পাস, কেন তুই কুমারের কথায় ওঠ-বোস করিস—এবার বলে দিই পাড়ার লোককে? ভেবেছিস ভুলে গেছি, অ্যাঁ, পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা বলে, ভেবেছিস ভুলে গেছি, অ্যাঁ—আমার মেয়ে পালিয়েছে, অ্যাঁ।"

অনন্ত দেখল সারা জয়রাম মিত্র লেন আবার কৌতূহলে তাকিয়ে। এমনকী চার যুবকও। হঠাৎ তার চোখে সব কিছু অন্ধকার হয়ে এল। মাথার মধ্যে শুধু সোঁ সোঁ শব্দ। তার মনে হল বন্যা ছুটে আসছে—এবার সে ভেসে যাবে। আশ্রয়ের জন্য সে এধার ওধার তাকাতেই দেখল টিউবওয়েলের পাশে একটা আধলা ইট পড়ে।

"এবার বলি ব্যাটা বাঙামুলো? বলি, ভুবন চৌধুরি তোকে ওই কুমারের সামনেই দোকানের মধ্যে—"

এই সময়ই অনন্তের ছোড়া ইটটা ওর মুখে এসে পড়ল। আর তখনই দপ করে সারা জয়রাম মিত্র লেনের বাড়ির আলোগুলো নিভে গেল।

"আবার!" একজন বলল।

"দ্যাখো, আজ কতক্ষণ অন্ধকার থাকে।" আর একজন বলল।

"চল চল, দরজা খোলা রয়েছে, চুরি-টুরি না হয়।"

ভিড়টা খসে পড়তে লাগল অন্ধকারে।

"ও বউ, কোথায় চললি। খোকা ফিরল? অ বউ, সাড়া না দিয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

"যমের বাড়ি।" দাঁতে দাঁত চেপে পারুল বলল।

'অ বউ, কাল খোকাকে বাজার যাবার সময় মনে করিয়ে দিস।"

পারুল ততক্ষণে বেড়ালের মতো হালকা পায়ে নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেছে। শোবার ঘরের দরজা খোলা, অশোক চোখ বুজে চিত হয়ে শোওয়া, বাচ্চাটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

পারুল সামান্য ইতস্তত করে, ঘরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলল, "মাথা ধরার ওষুধটা আছে।"

অশোক চমকে উঠল। এতক্ষণ ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে সুকুমার আর ঝুমিকে নিয়ে কতকগুলো দৃশ্য তার

মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করছিল। এইমাত্র তার দেখতে ইচ্ছে করছে ঝুমিকে। মেডিক্যাল কলেজ না গিয়ে বাড়ি ফিরে আসাটাকে সে অন্যায় বলে মনে করতে শুরু করেছে। এখনই ঝুমির দরকার একজন পুরুষমানুষের। অথচ কেন যে সে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে এল, পথে চিনেবাদামও কিনেছিল, তার কারণ বুঝে উঠতে পারছে না অশোক। হয়তো ঝুমিকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখবে এবং সে দৃশ্য না দেখার ইচ্ছাতেই ফিরে এসেছে। .কিংবা সুকুমারকে দেখলেই বরাবর যে এক ধরনের আড়ষ্টতা বোধ করত এবং তুলনায় নিজেকে নগণ্য বোধ করার সেই ভয়টা থেকেই মেডিক্যাল কলেজে যায়নি। সুকুমারকে মাতাল অবস্থায় পেয়েছিল বলেই না ওর সঙ্গে তামাশা করতে পেরেছিল। নয়তো বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপে-ব্যক্তিত্বে মদ না খাওয়া সুকুমার অন্য ব্যাপার।

অশোক নিজেকে অল্পবিস্তর কাপুরুষও মনে করল। একটা মাতালকে যে-কেউই পরিহাস করতে পাবে। তাব বোধশূন্যতাব সুযোগ ভাঙিয়ে ব্যঙ্গ করার মধ্যে সাহস নেই। দুঃসংবাদ পাওয়া ঝুমির, যে একদিন একটা চুমু দেবে বলেও দেয়নি, সামনে যেতে পারেনি এই সাহসের অভাবের জন্যই। জীবনে কোনও উন্নতিই করতে পারেনি সে সাহসহীনতার জন্য।

ভাবতে ভাবতে অশোক তেতে উঠতে শুরু করে, সাহসী একটা কিছু করার জন্য। এমন একটা কিছু, যাতে তাব মনে হয়, ঝুমিকে সে অনায়াসেই পেতে পারত, নেহাতই সুকুমাবেব প্রতি অনুগ্রহবশত—

"ছিঁড়ে পড়ছে মাথাটা।"

পারুল দু'হাতে কপাল চেপে যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ করল অস্ফুটে। অশোক উঠে বসল।

"ওষুধ তো ফুরিয়ে গেছে।"

অশোকের মনে হল, এ-কথা শুনে ঝুমির শরীরওলা বউটি মোটেই হতাশ হল না।

"তা হলে কী করি?"

"আসুন, ববং মাথাটা টিপে দি।"

"থাক থাক। বউ নেই কিনা তাই খুব সাহস দেখাচ্ছেন।"

'সাহস' কথাটা শুনেই অশোকের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, আপনা থেকেই দুই চোয়াল শক্ত হয়ে পড়ল। এই অশিক্ষিত বউটিব ঠাট্টা তার ভাল লাগেনি। কেমন যেন চ্যালেঞ্জ বয়েছে ওর গলাব স্বরে।

"বউয়ের সামনে অনেক সাহস না দেখানোই তো সাহসেব কাজ।"

"খুব বীরপুরুষ আপনি।" পারুল মাথা হেলিয়ে চোখ দুটো আধবোজা করে হাসল। "শনিবার যা ধাক্কা দিয়েছিলেন মাথায়।"

"আমি! মাথায় ধাক্কা!" অশোক খুব অবাক হবার চেষ্টা করল।

"শুধু ধাক্কা!" পারুল পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। "ঘাড়ে এই দাঁতেব দাগ কীসের?"

"কই দেখি।" অশোক এগিয়ে গেল। পারুলের পিঠ-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওর মাথার নারকোল তেলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আলতো কবে কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল। "এইখানে?"

"শুধু ওখানে?" পারুল হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, "ব্লাউজের একটা বোতামও তো আস্ত রাখেননি। ইলা যদি তখন এসে পড়ত।"

"এখন তো আব ইলা নেই।"

"এখন তো আপনি মদও খেয়ে নেই। সাহস হবে কী করে।"

অশোকের আঙুলগুলো কুঁকড়ে চেপে বসল পারুলের কাঁধে। হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে সে পারুলকে গায়ের উপর এনে ফেলল।

"মদ না খেয়ে সাহস হয় কি না দেখবে?"

পারুল ঘাড় ফিরিয়ে অশোকের চোখে চোখ রাখল। ধীরে ধীরে ঠোঁটের কোল মুচড়ে হাসল এবং দেহটিকে আলতো করে চেপে ধরল অশোকের সঙ্গে।

"ঝুমি হলে নিশ্চয় আপনার সাহস হত।"

শোনামাত্র অশোকের শরীরের ভিতরে এবং বাইরে শক্ত হয়ে উঠল। একটু পিছিয়ে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, "ঝুমিকে জানলে কী করে।"

"জেনেছি।" পারুল ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে ত্যারছা চোখে তাকাল। "ভয় নেই, ইলা জানে না।"
"জানুক, আমি কেয়ার করি না।"
"ঝুমিটা কে?" পারুল বলল।
"একটা মেয়ে। এখন দুটো ছেলের মা। কয়েক ঘণ্টা আগে বিধবা হয়েছে।"
"প্রেম ছিল?"
"হ্যাঁ।"
"বিয়ে হল না কেন?"
"আমি ভিতু, তাই সাহস নেই। নিজের উপর ভরসা নেই, তাই তোমাকে--"
হাত বাড়িয়ে অশোক বুকের উপর পারুলকে টেনে এনে চেপে ধরল। প্রচণ্ডভাবে চুমু খেল এবং ছেড়ে দিল। স্থির দৃষ্টিতে পারুল তাকিয়ে রয়েছে।
"দেখলে তো। ঘরে আলো জ্বলছে, দরজাও খোলা, সাহস আছে কি না দেখলে?" অশোক হাঁফাচ্ছে। চোখের জ্বালা বাড়ছে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে বউটির মুখ। সেখানে ঝুমির মুখ সে বসাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বসছে না।
"আপনি মদ খেয়ে আসুন।"
"কেন।" অশোকের মনে হল তার গালে এই অশিক্ষিত বউটি ঠাস করে চড় মারল।
"আপনি সত্যিই ভিতু।"
শোনামাত্র অশোকের চোখ থেকে মুছে গেল ঘরের আলো এবং পারুল। ঠিক এই গলাতেই ঝুমি বলেছিল। আট-ন'বছর আগে। একই কথা। সেদিন লজ্জা পেয়েছিল, আজ রাগে দিশাহারা হয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে সে পারুলের গলাটা দু'মুঠোর মধ্যে ধরল।
"আঃ।" অস্ফুটে পারুল চাপা চিৎকার করল। আর তখনই দপ করে নিভে গেল ঘরের আলোটা।
"কী হল!" পারুল ছিটকে সরে গেল দরজার দিকে।
"হয়তো আবার সেদিনের মতো নিভল।"
পারুল জানলায় গিয়ে উঁকি দিল। সারা পাড়া অন্ধকার।
কোথায় চিৎকার করে কে চেঁচাচ্ছে। নীচে থেকে বুড়ির গলা ভেসে এল, "অ বউ, কোথায় আছিস, খোকা ফিরল?"
তখন অশোক টেনে আনল পারুলকে খাটের উপর।

টিপু ঘুমিয়ে পড়েছে। আভা ওর পাশে কাত হয়ে শুয়ে। টিপুর গায়ে ডান হাতটা আলতো করে রাখা। হিরণ্ময় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গলায় শব্দ করল। আভা ব্যস্ত হয়ে গায়ের কাপড় ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়াল।
"কী ভাবছ?" দরজার কাছ থেকেই হিরণ্ময় প্রশ্ন করল।
"কিচ্ছু না।" মুখ নামিয়ে আভা উত্তর দিল।
"হ্যাঁ ভাবছিলে। বলব? তোমার দিদির কথা। জানাজানি হলে আমার মানমর্যাদা ধুলোয় লুটোবে, সেই কথা। আর নিজের কথাও ভাবছিলে।"
"আমার কথা?" আভা মুখ তুলল। "ও-সব আমি ভাবিনি।"
"মিথ্যে কথা, মানুষ মাত্রেই নিজের কথা ভাবে। আমিও ভাবি। ভাবাটা অন্যায় নয়, স্বার্থপরতাও নয়। আমি চাই তুমি নিজের কথা ভাবো।"
"কী ভাবব?"
"তোমার ইচ্ছা, যা তোমার নিজস্ব, সেগুলো যাতে পূর্ণ হতে পারে। মায়া-মমতার মতো বাজে জিনিসগুলো যাতে তোমায় চেপে কুঁকড়ে ছোট করে না দেয় সে-জন্য পথ খুঁজে বার করার উপায় ভাববে। সে-পথ ট্রেনে কাটাপড়া বা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া নয়।"
"কিন্তু আর কী পথ আছে?" আভা অসহায় স্বরে বলল। "আপনি যদি অবিবাহিত হতেন, যদি আমার ভগ্নিপতি না হতেন তা হলে--"

"তা হলে কী?" হিরণ্ময়ের চোখও তীক্ষ্ণ হল, কথার মতো।

"তা হলে কোনও সমস্যাই উঠত না।"

"তার মানে বিয়ে?"

আভা মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। হিরণ্ময় বিরক্ত স্বরে বলল, "এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না? বিয়ে করলেই কি মোক্ষলাভ হবে, বিয়ে করলেই কি ভালবাসা প্রেম সার্থক হয়ে উঠবে?"

"হ্যাঁ।" হঠাৎ উদ্ধত ভঙ্গিতে অধৈর্য স্বরে আভা বলে উঠল। এতক্ষণ ধরে হিরণ্ময়ের ক্রমান্বয় প্রশ্নে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়তে পড়তে খেপে উঠছিল। কথাগুলোর মধ্যে নিছকই কথা ছাড়া, আসল এবং আসন্ন বিপদ থেকে রেহাই পাবার কোনও উপায় সে খুঁজে পাচ্ছিল না।

"তা হলে আমায় ভালবাসলে কেন?" হিরণ্ময়ের স্বরে এতক্ষণে রাগ ফুটে উঠল। "তা হলে আমায় বাধা দিলে না কেন? তোমার এই অবস্থা করার সুযোগ দিলে কেন? তুমি কি জানতে না বিয়ে করার উপায় আমার নেই? বলো, জবাব দাও আমার কথার?"

আভা কথা না বলে হিরণ্ময়ের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরোবার জন্য এগোতেই, হাত তুলে দরজা আটকে দাঁড়াল হিরণ্ময়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, আভার গায়ের জোর তার থেকেও বেশি। ইচ্ছে করলে তাকে ঠেলে সরিয়ে, বেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আভা তা করল না। তাইতে হিরণ্ময় মনে করল, এটা ওর বিনয়। উত্তেজিত স্বরে আবার প্রশ্ন কবল, "জানতে না, তুমি অন্যায় কাজ করছ। জানতে না, তুমি পাপ করছ?"

"না। আমি জানতাম না, সত্যি বলছি বুঝতে পারিনি তখন আমি কী কবছি। কিন্তু আমি ভালবাসি আপনাকে, এখনও ভালবাসি। আপনি আমায় ছেড়ে দিন। আমি পারব না আপনার মতো নিষ্ঠুর হতে। আপনি যা চাইছেন তা হয় না।"

আভা কান্নার দমকে কাঁপতে শুরু করল। হিরণ্ময় দরজা থেকে হাতটা নামাল। আভা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে বলে উঠল।

"সারাক্ষণ আমি ভেবেছি আর বারবার মনে হয়েছে, কী অপরাধ আমি করেছি! কার কাছে আমি অপরাধী?"

"তোমার দিদির কাছে।"

"হ্যাঁ, তাই। জানেন, একদিন স্বপ্ন দেখেছি দিদি মারা গেছে ট্রেনে কাটা পড়ে। আমার কতদূব যে অধঃপতন হয়েছে! আমি ওর মৃত্যু নিশ্চয় চুপিচুপি কখনও কামনা কবেছিলাম। ভাবতে পারেন, আমি খুনি হতে চেয়েছিলাম!"

"আমিও চেয়েছি। স্বপ্নে নয়, জেগেই আমি চাই। তোমায় বিয়ে করতে পারব বলে নয়, শুধুই রেহাই চাই। কীসের রেহাই, কেন রেহাই, অত বোঝাতে পারব না এখন। তবে, হাত-পা ছড়িয়ে আমি একা ঘুমোতে চাই ওই বিছানাটায়। আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।"

মুখ থেকে হাত নামিয়ে ফেলেছে আভা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। শুকনো স্বরে বলল, "আপনি চাইতে পারেন কিন্তু আমি পারব না। আমি জানি, আমি পাপ করেছি, তার জন্য শাস্তিই আমাব প্রাপ্য।"

"শাস্তি তা হলে আমারও প্রাপ্য। কিন্তু নিজেকে তিল তিল খুন করে অপরকে সুখী করতে হবে, এমন কোনও শর্ত পূরণ করার কথা আমাদের আছে কি?" হিরণ্ময়ের স্বর তীব্র। চোখ দুটি জ্বলজ্বলে। সে উত্তেজনায় কাঁপছে।

"অনেক কিছুই তো নেই আমাদের।" আভা কথাগুলোকে টেনে টেনে বলল। "সবই কি আমরা চাইলে পেতে পারি?"

"যা পাওয়া সম্ভব, তা কেন চাইব না?"

"আপনি দিদিকে খুন করতে পারেন?"

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল হিরণ্ময়। আভা লক্ষ করে হাসল। হিরণ্ময় ক্ষিপ্ত, মরিয়া স্বরে বলল, "পারব। আভা, তোমার জন্য আমি পারব। তুমি যদি—"

আভার চিৎকারে চমকে উঠে চুপ করে গেল হিরণ্ময়। "চুপ করুন। আমি আর সহ্য করতে পারছি

না, আপনার এইসব কথা। জেনে রাখুন, আমি আর আপনাকে ভালবাসি না। হ্যাঁ, তাই। আপনাকে কেউ ভালবাসতে পারে না, পারে না, পারে না। আমি ভুল করেছি, ভীষণ ভুল করেছি। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।"

বলতে বলতে আভা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে যখন, তখনই দপ করে নিভে গেল সব আলো। রান্নাঘব থেকে ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠল, "আবার আজও!"

হিরণ্ময় একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হচ্ছে, অন্ধকাব আবার তাকে ঘিরে ধরবে। আবার তাব ইচ্ছা হবে রাস্তায় পুলিশ গুলি চালাচ্ছে খবর পেলে বেরিয়ে পড়তে। আবার সহজ অঙ্কটা কষে কষে যেতে হবে। আবার মরে যাওয়া!

মনে মনে বলল, আমি ব্যর্থ, ব্যর্থ, ব্যর্থ।

"ওই ঘবটা।" শেফালি বলল।

শোভা আর ইলা তাকাল। ঝুপসি অন্ধকার, ভাঙাচোরা দেয়াল, ভ্যাপসা গন্ধ আর ছেঁড়া কাগজে ভবে আছে একতলাটা। তিনটির মধ্যে দুটি ঘব ভাড়া দেওয়া রাস্তায়-কুড়োনো ছেঁড়া নোংবা কাগজের এক কারবারিকে। শুধু সিঁড়ির পাশের ঘরটিতে বাস করে এক ফেরিওলা পরিবার। ওরা দেখতে পেল ঘরের মধ্যে একটি বছর তিনেকেব শিশু মেঝেয় উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। একটি বছর পনেবো-ষোলোর মেয়ে কলাইয়েব থালায় কিছু একটা মাখছে আর তার সামনে দুটি ছেলে, আট থেকে বারোর মধ্যে বয়স, একদৃষ্টে থালার দিকে তাকিয়ে। ঘরের আলো অনুজ্জ্বল, পাণ্ডুর। কোনও আসবাব ওদের চোখে পড়ল না। দেয়ালের তাকে কয়েকটা মাটিব হাঁড়ি আর পুরনো কৌটা।

শোভা ফিসফিস করে বলল, "ওদেব মা নেই?"

"কী জানি।" শেফালি বোধহয় এই প্রথম পাড়ায় একটি পরিবার সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ কবল।

"জানলাটা কোথায়?" শোভা আবার বলল।

"ডান দিকে। ঘবে ওই একটাই জানলা।"

বোধহয় ওদেব কথার শব্দ পেয়েই, ঘবের তিনজন তাকাল। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। শীর্ণ দেহে ফ্রকটি ঢোলা দেখাচ্ছে। মেয়েটির চোখ দু'টি বড়, গায়ের রং ফ্যাকাশে।

ওবা তিনজন ঘবেব দরজায় এসে দাঁড়াল। এইবাব পুরো ঘরটা দেখতে পাচ্ছে। ডান দিকে জানলাটা বন্ধ। তাব নীচেই ছেঁড়া চিটচিটে তোশকের উপর একটি স্ত্রীলোক শুয়ে, চোখ আধবোজা, মণি দুটি কোণে সরে গিয়ে অংশটিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, হাত দুটি পাশে এলানো। স্ত্রীলোকটির মুখ খোলা। হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। দেহের কাঠামো দেখলে মনে হয় বহুকাল বিসর্জিত প্রতিমা জল থেকে তুলে এনে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বসন বিস্রস্ত। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠে-থাকা পা দুটি যেন প্লাস্টিকের দু'গাছা লাঠি পেতে রাখা। ব্লাউজেব বোতাম উন্মুক্ত। জিরজিরে বুকেব দুটি চর্মসার স্তন। পায়ের আঙুলে হাজা। স্ত্রীলোকটির নিশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা গেল না।

শেফালির মনে হল, মবে গেছে। শোভারও তাই মনে হল, ইলারও। ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ঘরের ডান দিকের কোণে একটি সাত-আট মাসের বাচ্চা মেঝে থেকে খুঁটে খুঁটে মুড়ি খাচ্ছে এক মনে। তিনজনকে দেখে সে ভয় পেল। হামা দিয়ে স্ত্রীলোকটির কাছে সরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল।

"কী চাই আপনাদের?" বড়মেয়েটি জানতে চাইল। ওর কণ্ঠ কর্কশ। বলার ভঙ্গি শীতল নিস্পৃহ।

"কী হয়েছে তোমার মায়ের?" শেফালি আন্দাজেই ধরে নিল স্ত্রীলোকটি এদের মা।

"অসুখ।"

"কী অসুখ, কতদিন ধরে?" শেফালিই বলে গেল।

"অনেকদিন হাসপাতালে ছিল, ছেড়ে দিয়েছে।"

"সেরে গেছে?"

"না। বাঁচবে না বলে ছেড়ে দিয়েছে।"

ওবা তিনজন আবার তাকাল স্ত্রীলোকটির দিকে। এক সঙ্গে তিনজনের মনে হল, মরে গেছে। এক

সঙ্গে তিনজন ভাবল, তা হলে জানালাটা খুলতে বলা উচিত হবে কি! বিছানাটা না সরালে জানলা দিয়ে দেখা যাবে না।

"জনিলাটা বন্ধ কেন, খুলে দাও না।" শোভা বলল। কেন খুলতে হবে, তার কারণটা বলতে আটকাল তাব।

"না। বাবা বারণ করেছে। এরা চিৎকাব গোলমাল করে, পাশের বাড়ির লোকেরা খুব বিরক্ত হয়।"

"বাচ্চা ছেলেপুলে থাকলে গোলমাল তো হবেই। তাই বলে অসুস্থ মানুষটার কথাও তো ভাবতে হবে। এই বন্ধ ঘবে থাকলে অসুখ তো বেড়ে যাবে। খুলে দাও, বলুক ওরা যা বলার।" শেফালিব স্বর কোমল এবং অন্তরঙ্গ।

"না, বাবা বকবে।" মেয়েটি গোঁয়ার গলায় বলল।

"তা হলে?" ইলা ফিসফিস করে শেফালির কাছে জানতে চাইল। শেফালি তা গ্রাহ্য না করে মেয়েটিকে বলল, "বাবা কখন আসবে?"

"এগারোটা-বারোটা হয়ে যায়।"

"তুমি করছিলে কী?"

"ছাতু মাখছিলুম।"

"ভাত কিংবা রুটি করোনি?"

"না। মাঝে মাঝে ভাত হয়।"

ওরা কথা বলছে সেই ফাঁকে ছেলে দুটি থালা থেকে খামচা দিয়ে মাখা ছাতু তুলে নিল। মেয়েটি দেখতে পেয়ে ধমকে উঠল।

"তুমি স্কুলে পড়ো না?" শোভা প্রশ্ন করল।

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে, ছাতু মাখায় ব্যস্ত হল। ইলা আবার বলল, "তা হলে?"

"তা হলে আবার কী!" শেফালি ঝাঁঝিয়ে উঠল বিরক্ত হয়ে। "দেখছ একটা মানুষ মবছে, এতগুলো বাচ্চা ভাই-বোন নিয়ে একা ওইটুকু মেয়ে হিমসিম খাচ্ছে, আব এখনও তোমার শখ গেল না।"

ইলা লজ্জায় একটুকু হয়ে গেল। শোভা মনে মনে অপ্রতিভ হল। স্ত্রীলোকটি নিথব হয়ে পড়ে বয়েছে, তাব বুকে উপুড় হয়ে বাচ্চাটি স্তন চুষছে। মেয়েটি ছাতুর একটা গোল্লা পাকিয়ে ডাকল, "আয়, বাবু আয়।" বাচ্চাটি সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুক থেকে হামা দিয়ে মেয়েটির কাছে গেল। ওকে কোলে বসিয়ে মেয়েটি একটু একটু করে খাওয়াতে লাগল।

শেফালি এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকটির হাঁটু থেকে কাপড়টা গোড়ালি পর্যন্ত নামিয়ে দিল। ঝুঁকে কপালে হাত বাখল। শোভার মনে হল, তারও কিছু একটা করা দরকার। করার মতো কিছুই সে দেখতে পেল না। ইলা তাকে বলল, "ঘরটায় একদম হাওয়া নেই, কী ভ্যাপসা।"

শেফালি বলল, "বোধহয় ডাক্তার ডাকতে হবে! তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না। জানলাটা খুলে দাও তো ইলা।"

মেয়েটি কী বলতে যাচ্ছিল, শেফালি হাত নেড়ে চাপা দাবড়ানি দিল, "যা বলার আমিই বলব তোমাব বাবাকে। যা করছ তাই করো। দাঁড়িয়ে কেন? খুলে দাও, হাওয়া আসুক।"

বিছানা ঘেঁষে ইলা দাঁড়াল। ছিটকিনিটা আঁট হয়ে রয়েছে। টানাটানি করতে ওর মনে হল কাব ঠান্ডা হাত যেন তার পায়ে ঠেকল। শোভা তাকিয়েছিল জানলার দিকে। ওর মনে হল, আধ-বোজা নিথর চোখে কে যেন তার দিকে তাকিয়ে। দু'জনেই হঠাৎ শিউরে উঠল। আর জানলাটা যে মুহূর্তে খুলল, তখনই দপ করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। ইলা জড়িয়ে ধরল শোভাকে। বাচ্চাটা ভয়ে ডুকবে উঠল। শেফালি স্থিব গলায় বলল, "আঁচলে পয়সা বাঁধা আছে। খুলে দাও তো ইলা, মোমবাতি আনুক ও।"

তখন ভোম্বল আর একটু কাছে সরে এল মানুর।

এতক্ষণে অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। এখন মানুর অবয়ব জমাট বেঁধে গেছে। ভোম্বলের চোখ সেটি খোদাই করে অন্ধকার থেকে একটা মূর্তি বার করে নিয়েছে। দীর্ঘ, ছিপছিপে, মাথায় প্রচুর চুল, নাকেব ডগাটি তীক্ষ্ণ। ভোম্বল তার হাতের গোলাপটি মানুর গালে বুলিয়ে দিল।

"আমি কিন্তু সত্যি বলেছি।" মানু খুব সহজভাবে বলার চেষ্টা করল।

"তুমি তাকে দিলে না কেন?" ভোম্বল লঘু হতে গিয়েও পারল না।

"ইচ্ছে হল না, তাই।" মানু সহজভাবে বলার চেষ্টা করল।

"আমাকে দিলে যে?" ভোম্বল লঘু হতে গিয়েও পারল না।

"দিয়েছি নাকি! পড়ে গেল আর আপনি তুলে নিলেন।" মানু সহজভাবে বলার চেষ্টা করল।

"তা হলে দরকার নেই আমার, এই নাও।" ভোম্বল আর লঘু হবার চেষ্টা করল না। গোলাপটি এগিয়ে ধরে রইল। অন্ধকারে মানু দেখতে পায়নি। বুঝতে পাবল হালকা মিষ্টি গন্ধটা নাকে যেতেই আর তাইতে কেঁপে উঠল ওর অন্তব। ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের মতো ঝরল চোখের জল। অন্ধকারে ভোম্বল দেখতে পায়নি। বুঝতে পারল হাতের উপর পড়তেই।

"মানু, কাঁদছ!" ভোম্বল ঝুঁকে ফিসফিস কবে বলল, "এই মানু কী হয়েছে, কাঁদবার কী হল?"

"আমি সত্যিই বলছি, দ্বারিকদা। যে চেয়েছিল এই গোলাপটা, সে আমায় চাকরি করে দেবে তার অফিসে।"

"কে সে?" ভোম্বলের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হল, নিশ্বাস ফেলতে পারল না।

"চিনবেন না। আমার এক বন্ধুর বাবা। বড় অফিসার একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের। আজ যেতে বলেছিল অফিসে, গেছলাম। লোকটা ভাল নয়।"

"বন্ধুকে সে-কথা বলে দাও।"

"না। আমার চাকরি দরকার।"

"কী জন্য?"

'বাবা আর পারছে না। আমবা সাত মাসের ভাড়া দিতে পারিনি বলে বাড়িওলা রোজ এসে চিৎকাব অপমান করে যাচ্ছে, উঠে যেতে বলছে, মামলা করবে শাসাচ্ছে। একটা কিছু আয়ের ব্যবস্থা আমাদেব দরকার। বাবা যথাসাধ্য করছে, আমাকেও কিছু করতে হবে।"

"তাই বুঝি সেজেগুজে গেছলে। তাই বুঝি হাতাকাটা ব্লাউজ, কোমরের নীচে শাড়ি!"

মানু চুপ করে রইল। ভোম্বল গোলাপটা ছুড়ে ফেলে দিল। ফুল পড়ার শব্দটুকু মানু শুনতে পেল।

"এই বাজারে চাকরি পাওয়া শক্ত। আমার তো কোনও যোগ্যতাই নেই।" মানুর ধীর স্বর অন্ধকারে সাদা হয়ে ফুটে উঠল। পিছিয়ে এসে ভোম্বল খাটের উপর বসল।

"তুমি আর যেয়ো না লোকটার কাছে।" ভাঙা ভাঙা স্বরে ভোম্বল বলল।

"কেন যাব না?"

গলা পরিষ্কার করার জন্য ভোম্বল ঢোঁক গিলিল পরপর। প্রশ্নটার জবাবে সে বলতে চাইল—আমি চাই না, কেউ তোমার দেহ স্পর্শ করুক। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে বুঝল গলার মধ্যে কিছু একটা জমে আছে। তখনও বলতে চাইল—এ খবরটা আমায় না বলে চেপে যেতে পারতে তো।

"আমার কোনও যোগ্যতাই নেই। না বিদ্যে-বুদ্ধি, না রূপ।"

"কে বলল তোমায়?"

"আমি জানি। এ-সব কাউকে বলে দিতে হয় না। তবে থাকলেই বা কী হত!" মানুর হতাশ স্বর ভোম্বলের কানে করুণ হয়ে বাজল।

"বিদ্যে-বুদ্ধি, রূপ-গুণ এ-সবই তো একটি মাত্র পুরুষকে সুখী করার জন্য। সে যদি সুখী হবে মনে কবে তা হলে তোমার আর কীসের পরোয়া।"

"পরোয়া করি আমার এই মনটাকে। যদি ছেলে হতুম, তা হলে এই নিয়ে চিন্তাই করতুম না। যে

আমায় ভালবাসে তাকে বিয়ে করে ফেলতুম। কিন্তু মেয়েদের বাপের বাড়ি ছাড়তে হয়। গরিব বাপ-মা, ভাইবোনদের সে আর সাহায্য করতে পারে না।"

"তুমি কি বিয়ে করবে না?" ভোম্বল অবাক হয়ে অন্ধকারের ভিতর একটা মূর্তিকে ভেঙে পড়তে দেখল।

তখন দরজার বাইরে বড়দার গলা শুনল সে। মোমবাতি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, "তোর কি চাই একটা?"

ধড়ফড় করে উঠে গিয়ে ভোম্বল মোমবাতিটা নিয়ে এল। ঘরে ম্লান ছায়া পড়ল দু'জনের। মানু সামলে নিয়েছে নিজেকে। দরজার দিকে সে এগোল।

"চললে? রাস্তায় অন্ধকার, দাঁড়াও আলো জ্বলুক। অন্ধকার বেশিক্ষণ থাকবে না, আগেরবার আধঘণ্টা মতো ছিল।"

"না আমি যাই। এ-ভাবে দু'জনের থাকাটা ঠিক নয়, পরে কথা হবে।"

"হোক। আমি তাতে ভয় পাই না।" মোমবাতির শিখা এবং ভোম্বলের কণ্ঠস্বর, দুটোই কেঁপে উঠল।

"এ-সব বীবত্ব দেখিয়ে কী লাভ দ্বারিকদা।" মানু স্পষ্টভাবে তাকিয়ে রইল ভোম্বলের চোখের দিকে। তাইতে ভোম্বলের বুকের মধ্যেকার দাপাদাপিটা বন্ধ হয়ে গেল। সে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মোমবাতিটা।

"এ কী করলেন!" মানু দ্রুত দরজার দিকে এগোল। ভোম্বল ওর হাত চেপে ধরল।

"একটা কথা বলব?"

"মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন কেন?"

"আলোয় বলতে পারব না, তাই। অন্ধকারে তো অনেক সময় ভরসাও পাওয়া যায়, তাই। বলব?"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল অন্ধকার ঘর। রাস্তায় কিছু একটা ঘটছে। চিৎকার আসছে ঘরে। কার ট্রানজিস্টর রেডিয়োতে সেতার বাজছে। অন্ধকারে ভয়-পাওয়া শিশুরা মাঝে মাঝে ডুকরে উঠছে। ভোম্বল নিশ্বাস রোধ করে অপেক্ষা করছে।

"বলুন।"

ভোম্বলের মনে হল এইবার সে প্রচণ্ডরূপে যুবক হতে চলেছে। এইবার সে দারুণ একটা কথা বলে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সে মৃদুস্বরে বলল, "মনীষা।" তারপর বলল, "আমিও বিয়ে করব না তা হলে।" এই বলে ভোম্বল বুকের মধ্যে একরাশ গোলাপের গন্ধ পেল।

অনন্ত আর বাসুর ঝগড়া দেখতে চারুশীলা ছাদের পাঁচিলে ঝুঁকে রয়েছে। সত্যচরণ সেই ফাঁকে দোতলার ঘরে এসে আলমারির চাবি খুলে পাঁচটি টাকা বার করেছে মাত্র, তখনই আলোগুলো নিভে যায়। হকচকিয়ে গেছল প্রথমে। তারপর ব্যাপারটা বুঝে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় বেরোয়। ওর মনে হল, ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত যেন কিছু একটা গুরুতর ব্যাপারে গড়িয়েছে। কিন্তু ওখানে খোঁজ নিতে যাওয়া মানে মূল্যবান এই অন্ধকারের খানিকটা নষ্ট করা। মরুক ব্যাটারা ঝগড়া-মারামারি করে।

অন্ধকারে মোটরটা একটা কচ্ছপের মতো পড়ে রয়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় সত্যচরণ থমকে দাঁড়াল। বেড়ালবাচ্চাটা তলায় মিউমিউ করে যাচ্ছে। ওটাকে বের করে দেবে কি না ভাবল। অবশেষে সাব্যস্ত করল, মরুক ব্যাটা চাপা পড়ে।

তারক কবিরাজ স্ট্রিটের বস্তির পরিচিত সরু গলিটা অন্ধকারে চেনা যায়। সত্যচরণ খুশি হল, কেউ তাকে ঢুকতে দেখবে না। আঙুর চটপট ব্যাপারটা চুকিয়ে দিলে অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে আসা যাবে। কেউ জানবে না। শুধু চারুশীলা পাঁচটা টাকা চুরি যাওয়ার জন্য কাল বড়ছেলে কি মেজমেয়েটাকে ঠ্যাঙাবে।

সত্যচরণ গলিতে ঢুকতে গিয়েই একজনের সঙ্গে জোর ধাক্কা খেল। মাথায় একটা মোটরের চাকা নিয়ে সে-ও ঢুকছে বস্তির গলিতে। সত্য ঘাড়ে ব্যথা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, "চোখের কি মাথা খেয়েছে গা।"

"এই অন্ধকারে কি চোখ থাকে কারুর?" অসীম পালটা খেঁকিয়ে উঠল। স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডের চাকার ভারে সে বিব্রত নয়, কিন্তু সত্যচরণকে গলার স্বরে চিনে সে তাই হয়ে পড়ল। একটু আগে ভয়

পেয়েছিল বেড়ালবাচ্চাটার মিউমিউ শুনে। ভাঙা কেরিয়ারের ডালা তুলে চাকাটা বার করার সময় যখন তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি কেউ চেঁচিয়ে উঠল চোর-চোর বলে, তখনই বেড়ালবাচ্চাটা ডেকে ওঠে। অসীম ভয়ে কিছুক্ষণ জমাট বেঁধেছিল।

"এই অন্ধকারে বস্তিতে ঢুকছেন যে?" অসীম গলাটাকে ষড়যন্ত্রকারীদের মতো নামিয়ে বলল।

"এটা কার গাড়ির চাকা রে ফ্যালা?" সত্যচরণ শিশুর মতো কৌতূহল প্রকাশ করল।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝ বার বা বোঝাবার চেষ্টা করল অন্ধকারে। এরপর দু'জনেই আর কথা বাড়াল না। এক সঙ্গে ঢুকল বস্তিতে।

হাউ হাউ করে বাসুদেব কেঁদে উঠল।

"তোমার জন্য, সব তোমার জন্য। এ সংসার ফেলে রেখে চলে যাব। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। কেউ আমার মুখ চায় না। কেউ না, কেউ না!"

বাড়ির উঠোনে বাসুদেব উবু হয়ে বসে। ছেলেমেয়েরা একটু তফাতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। বকের উপর লম্ফ জ্বলছে। রাধারানি ন্যাকড়া বেঁধে দিচ্ছে মাথায়।

"বুঝবে তখন, কী কবে আমি চালাচ্ছি। কত অপমান সয়ে আমায় চলতে হয়।" বলতে বলতে বাসুদেব উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, কুঁজো হয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। লম্ফটা দপদপ করছিল, এই সময় সামান্য এক দমকা হাওয়াতেই নিভে গেল। উঠোনটা আবার অন্ধকার হয়ে পড়ল। আর তখন রাধারানির মনের মধ্যে হঠাৎ অন্ধ একটা আশা ছলাৎ করে উঠল।

কেউ দেখতে পাবে না। কেউ দেখতে পাবে না ওকে আসতে। সদর দরজা খুলে রাধারানি দাঁড়াল। গাঢ় অন্ধকার জয়রাম মিত্র লেনকে একাকার করে দিয়েছে। দরজায় হেলান দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাধারানি খুব ক্লান্ত বোধ করল। বিড়বিড় করে সে বলল, "আয় একবার। মারব, ভীষণ মারব, এমন মারব যে জীবনেও ভুলতে পারবি না।"

"ও বউ, খোকা এসেছে? কাল কচুরমুখি আনতে বলবি তো? বড়ি দিয়ে ঝাল করে দিস। কতকাল যে খাইনি।"

অন্ধকারে বেড়ালের মতো পারুল নেমে এল। মাথাধরা সেরে গেছে তার। ঘরের মধ্যে এসে আলমারির আয়নার সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। কিছুই দেখা যায় না। আলতোভাবে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। অস্ফুটে একটা ক্লান্ত শব্দ বেরোল মুখ থেকে।

"কথা কস না কেন, অ-বউ। দ্যাখো আঁটকুড়ির গেবাম্যিই নেই। আবার আমি খোকার বিয়ে দেব। দেমাক ভাঙব তোর।"

"দে না তোর খোকার বিয়ে।" পারুল গলা না চড়িয়ে পাশের লোককে বলার মতো করে বলল। বলে খিলখিল করে হাসতে হাসতে নিজের তলপেটে হাত রাখল আর আলতোভাবে সুখ নেমে এল ওর সর্বাঙ্গে।

"চাঁদপানা বউ আনব। দেখিস বছর বছর বিয়োবে। আহা, ঘর ভরে উঠবে গো। কচুরমুখি আনতে বলবি তো বউ?"

সে-ও আঁটকুড়ি থাকবে। পারুল মনে মনে বলল, সে-ও আমার মতো হবে। মানত, জলপড়া, মাদুলি, হত্যে দেওয়া, যত্তোসব বাজে। ইলার ছেলে হয়েছে—পারুল পাশ ফিরে ভাবল, আমারও হবে।

অন্ধকারে হিরণ্ময় জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। পর্দা সরানো। রাস্তায় যেন অন্ধকারটা আরও বেশি মনে হচ্ছে তার।

খসখস শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল। কে যেন ঢুকেছে ঘরে। আলমারির পাল্লা খোলার শব্দ হল। চোর? হিরণ্ময় সন্তর্পণে এগোল। একটা টিনের ঢাকনা পড়ার শব্দ হল। নিচু হল যেন কুড়োতে। চিনতে পারল সে।

"কী করছ তুমি?"

"আলমারিটা খোলা ছিল, বন্ধ করতে ভুলে গেছি।" আভার গলার স্বর বিচলিত হয়ে কথাগুলোকে কাঁপিয়ে দিল।

হিরণ্ময় এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল।

"দেখি কী নিচ্ছ।"

"কিছু না।"

"মুঠো খোলো।"

হিরণ্ময় চেষ্টা করল আভার মুঠো খুলতে। পারল না। আভা টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে রাগে কেঁপে উঠল হিরণ্ময়। গায়ের জোর বেশি। শুধু এইটুকুর জোরে তাকে অগ্রাহ্য করল। হাতটা পিছনে অনেকখানি তুলে চড় মারার জন্য হিরণ্ময় তৈরি হতেই আভা ঝাঁপিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল।

"আমি রেহাই চাই। হিরণ্ময়, হিরণ্ময় আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি যে তোমাকে ভালবাসি। কী করব বলে দাও আমায়, দয়া করে বলে দাও।" টপ টপ করে আভার হাত থেকে ঘুমের ট্যাবলেটগুলো মেঝেয় পড়তে থাকল।

"আমি জানি না আভা। সত্যি বলছি, আমি কিছুই জানি না। বেঁচে থাকার কি মরে যাওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ এখনও খুঁজে পাইনি।"

আভাকে খাটের উপর বসাল হিরণ্ময়। রাস্তায় কীসের একটা গোলমাল চলছে। আভার থুতনি ধরে ওর মুখটি তুলে হিরণ্ময় নিজের মুখ নামিয়ে এনে বলল, "এইসব ছোটখাটো বাজে কারণে মরার কোনও অর্থ হয় না। ভয় নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি এখন হিমাংশুর কাছে যাব। তুমি এগুলো কুড়িয়ে তুলে রাখো। আর এবার থেকে আমরা সাবধান হব।"

এই বলে হিরণ্ময় পাঞ্জাবি পরতে শুরু করল।

শেফালির মনে হল, কিছু একটা বলতে চাইছে যেন। ঝুঁকে মুখটা নিয়ে গেল মুখের কাছে। শুধু একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুনল।

বাচ্চাটা শোভার কোলে চুপ করে বসে। দু'হাতে আঁকড়ে রয়েছে তার হাত। ইলা গা ঘেঁষে রয়েছে শোভার। ছেলে দুটি মোমবাতি কিনতে গেছে এখনও ফেরেনি।

"জানলাটা খোলা মাত্রই—", ইলা চুপ করে গেল হঠাৎ। শোভা কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরেছে।

"আমার কেমন ভয় করছে।" ইলা আবার বলল, "দেখেছেন কী ঠান্ডা মেঝেটা। মরা মানুষের গায়ের মতো। যেন একটা মড়ার ওপর বসে আছি।"

"চুপ করুন তো।" শোভা চাপা ধমক দিল। শির শির করে উঠছে তার বগলের দু'পাশ। মোমবাতি এলেই চলে যেতে হবে। তার মনে হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে অন্ধকার তার গায়ে ঠান্ডা হাত রাখবে।

শেফালি আবার ঝুঁকে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, "আমি আছি, ওদের আমি দেখব, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন?" তারপর মাথা তুলে ঘরের সবাইকে শুনিয়ে বলল, "বোধহয় মারা গেল।"

তাই শুনে কেউ একটা কথাও বলল না।

এগারো

আলো জ্বলে উঠেছে জয়রাম মিত্র লেনে। আকাশি-নীল স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডটা কখন যে চলে গেছে অন্ধকারের মধ্যে কেউ খেয়াল করেনি। বাড়িতে বাড়িতে রেডিয়ো বাজছে, পাখা ঘুরছে। রাস্তা দিয়ে লোক চলছে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বাভাবিক হয়ে গেছে পাড়াটা।

সত্যচরণ বালতি হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল। "দেখলে গা, যা বলেছিলুম। তাই হল। এখন কাক-চিলে ওই মরা বেড়ালবাচ্চা নিয়ে টানাটানি করে পাড়াটা ছয়লাপ করুক!"

ব্যস্ত হয়ে চলেছে শেফালি। এই নিয়ে তিনবার সে তাঁতিগলিতে ঢুকল দু'ঘণ্টায়। ওকে দেখে সত্যচরণ বলল, "কী রে, তখন থেকে দেখছি যাচ্ছিস আর বেরোচ্ছিস।"

"সত্যদা, গোটা পঞ্চাশ টাকা না হলে তো মড়া বার করা যাচ্ছে না। দিতে পারো?"

"আমি," সত্যচরণ এতবড় বিস্ময়ের সম্মুখীন জীবনে এই প্রথম হল যেন। "আমি পাব কোত্থেকে? পাঁচটা টাকাও হাতে নেই।"

"কী যে করি।" শেফালি উৎকণ্ঠা ভোগ করতে করতে বলল, "অনন্তদার কাছে চাইলে পাব?"

"দেখ চেষ্টা করে।" সত্যচরণ টিউবওয়েলে জোরে জোরে পাম্প শুরু করল। পঞ্চাশ টাকার মতো লাগবে মেয়েটাকে বালা গড়িয়ে দিতে। মড়া পোড়াবার খরচ জোগাতে গিয়ে আঙুরকে হারানোর মতো বোকামি করতে সে রাজি নয়। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সত্যচরণ। আঙুরের মেয়েটার মুখ ভুতি-টুনির মতোই। হুবহু ওদের বোন বলেই মনে হয়।

অনন্ত সিংহ বাড়ি নেই। আহিরিটোলায় শীলেদের বাড়ি গেছে, এখনও ফেরেনি। আলো নিভে যাওয়ায় মেয়ে দেখানো যায়নি। ওরা যাতে আর একবার দেখতে আসে তারই তদ্বির করতে গেছে। ফেরার পথে কুলগুরুর বাড়িতেও যাবে। গোপীনাথের গায়ে বল লাগার ফলে কোনওরকম সর্বনাশ ঘটতে পারে কি না, সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আসবে।

শেফালি ফাঁপরে পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। অসীমকে আসতে দেখে বলল, "ফ্যালা, ভাই একটা উবগার করবি? শুনেছিস তো বউটা মরে গেছে। লোকটার হাতে দশটা টাকাও নেই, তুই কোথাও থেকে গোটা তিরিশেক টাকা অন্তত যদি জোগাড় করে দিস—"

"কত টাকা?" অসীম হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

"তিরিশ। ঘাট খরচের টাকাটাও অন্তত যদি পাওয়া যায়।"

অসীম ঘাড় বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে বলল, "আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। সব খরচ আমার।"

"স—অব!"

"দেখুন না, এমন সাজিয়ে নিয়ে যাব যে দেখলে আপনারই মরতে ইচ্ছে করবে।" বিরাট একটা বোঝা নামবার স্বস্তি অসীমের হাসিতে ফুটে উঠল। ডান পা টেনে টেনে সে দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হল টাকা আনার জন্য। আভাদের জানলার সামনে দিয়ে যাবার সময় তার ইচ্ছা হল একবার উঁকি দিতে। বসবার ঘরটা অন্ধকার। হিরণ্ময়ের শোবার ঘরের জানলার পর্দা পাখার হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। অসীম দেখতে পেল হিরণ্ময় পাঞ্জাবি খুলছে। শোভা চুল আঁচড়াচ্ছে। আভাকে দেখতে না পেয়ে সে একটু ক্ষুণ্ণ হল মাত্র।

পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে হিরণ্ময় বলল, "খালি চিৎকার চেঁচামেচি আর ঝগড়া। তিষ্টোনো যায় নাকি। এর মধ্যে কারুর পড়াশোনা হতে পারে। আভাকে হস্টেলে রাখব ভাবছি।"

এই বলে হিরণ্ময় পকেট থেকে খামের মতো একটি ট্যাবলেটের প্যাকেট বার করল। তাই দেখে শোভা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, "বাব্বা, কতগুলো ছেলেমেয়ে ওই বউটার। মরে রেহাই পেল।"

হিরণ্ময় অস্ফুটে "রেহাই" শব্দটি উচ্চারণ করে শোভার থেকে চোখ সরিয়ে হেসে বলল, "তুমি কিন্তু মোটা হয়ে গেছ।"

"থাক আর নজর দিতে হবে না।" শোভা পিঠ ফিরিয়ে চুল আঁচড়ে চলল।

লঘু স্বরে হিরণ্ময় বলল, "পাড়ার সেই গম্ভীর ছেলেটিকে একটু আগে দেখলাম, একটা কালো ঢ্যাঙা মেয়ের সঙ্গে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।"

মনীষাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর অনেকক্ষণ পার্কে শুয়ে ছিল দ্বারিক। বাড়িতে ঢোকার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, "তা হলে অফিস ছুটির পর আমরা মিট করব অ্যাসেম্বলির দক্ষিণ দিকের গেটে, কেমন?" মানু ঘাড়টা হেলিয়ে দিয়েছিল শুধু। সেই হেলানো মাথাটি বুকে নিয়ে ভোম্বল বহুক্ষণ ঘাসের উপর শুয়েছিল।

অবশেষে বাড়ি ফেরার জন্য পাড়ায় ঢুকে দেখল তাঁতিগলির মুখে একটি খাট রাস্তার ওপর। অসীম

এবং আরও পাঁচ-ছটি ছেলে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধছে ঘাটের সঙ্গে। খাটে একটি শীর্ণ নারীমুখ দেখা যাচ্ছে। দেহটি প্রচুর গোলাপে ঢাকা।

একরাশ গোলাপের গন্ধে দ্বারিকের বুকের মধ্যেটা মোচড় দিয়ে উঠল। টুকরো টুকরো কথায় সে বুঝল ওদের সাহায্যকারী দরকার। অসীমের কাছে গিয়ে সে বলল, "যদি দরকার হয় তো আমি যেতে পাবি তোমাদের সঙ্গে।"

"তা হলে বোঁ করে বাড়ি থেকে একটা গামছা কি তোয়ালে নিয়ে চলে আয়।"

অসীম তুই বলায় দ্বারিক খুব খুশি হল।

ওরা খাটটাকে কাঁধে তোলামাত্র ডুকরে কেঁদে উঠল বড়মেয়েটি। তাই দেখে শেফালির কোলের বাচ্চাটিও। ওকে ভোলাবার জন্য শেফালি নাচাতে নাচাতে বলল, "না না, কাঁদে না, ওই তো মা এক্ষুনি আসবে। আমি ধরে নিয়ে আসব মাকে। চুপ করো সোনামণি, কাঁদে না।"

খাট নিয়ে ওরা জয়রাম মিত্র লেন থেকে তারক কবিরাজ স্ট্রিটে পড়ামাত্র, যে লোকটা টলতে টলতে সামনে দিয়ে আসছিল হঠাৎ কীসের ভয়ে যেন দেয়ালে সেঁটে গেল। ওর পাশ দিয়ে খাটটা অতিক্রম করার সময় ঘাড় উঁচিয়ে দেখল, কে খাটের ওপর। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "যাক, সুকুমার নয় তা হলে।"

দরজায় খিল দেওয়া। অশোক রোজকার মতো খুটখুট করে কড়া নাড়ল। রোজকাব মতো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গিয়ে দরজার পাল্লা ঘেঁষে কেউ একজন দাঁড়াল না। বার কয়েক কডা নাড়াব পর ইলা এসে খুলে দিল। সিঁডি দিয়ে ওপবে ওঠার সময় অশোক বিডবিড় করল, "সব সমান, সব সমান।"

এবপর জয়রাম মিত্র লেন নিশুতি হয়ে গেল। শুধু রাধারানি দরজার একটা পাল্লা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। সে শুধু ভাবছে, আলোর মধ্যে দিয়ে আসতে ওর লজ্জা করবে। হে ভগবান, গলিটাকে অন্ধকার কবে দাও, আব একবাব অন্ধকার করে দাও।
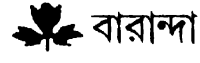
এক

কলকাতার বহু পঞ্চাশ বছর বয়েসি বাড়িতে এইরকম বারান্দা পাওয়া যাবে। রাস্তার দিকে হাত চারেক বেরিয়ে, কোমর উঁচু জাফরি কাটা ঢালাই লোহার রেলিং, বারান্দাগুলো প্রতি তলায় থাক দিয়ে উঠে গেছে, মাথায় আচ্ছাদন নেই। উপরের বারান্দা থেকে নীচেরটি সম্পূর্ণ দেখা যায়। রেলিংয়ে বছর কুড়ি রং পড়েনি। তার উপরের কাঠগুলি হাত, কনুই, কাপড়, তোশক, রোদ ও বৃষ্টির ঘষায় মসৃণ। পিছনে সাধারণত দুটি ঘর থাকে, বারান্দা তাদের অন্যতম সংযুক্তকারী পথ। দরজা ছাড়াও ঘরের আয়তন অনুযায়ী একটি বা দুটি জানলা থাকে বারান্দার দিকে। এই সব দরজা-জানালায় পর্দা থাকা না থাকা প্রধানত নির্ভর করে ঘরের বিপরীত গৃহের অধিবাসীদের রুচির ওপর। গ্রীষ্মে, যখন সন্ধ্যায় দক্ষিণ থেকে বাতাস বয়, তখন অনেকেই লোভ সামলাতে না পেরে পর্দাগুলি গুটিয়ে স্প্রিংয়ের দড়িতে বা দরজার মাথায় তুলে দেয়।

তিনতলার বারান্দায়, ভারী সেগুন কাঠের চেয়ারে বসে গিরি, অর্থাৎ গিরিজাপতি জাফরিকাটা রেলিংয়ের ফাঁকা দিয়ে অঘোর ঘোষ স্ট্রিট ধরে পুব দিকে তাকিয়ে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর প্রায় কুড়ি মিটারের একটা চাকলা, একটা মোটর গ্যারেজের টিনের দরজা, চায়ের দোকানের বেঞ্চ, ফুটপাথে শিবমন্দিরের একদিকের দেয়াল এবং বাস স্টপে প্রতীক্ষমাণদের সে চেয়ারেবসা অবস্থায় দেখতে পায়।

ভোরের রেশ এখনও কাটেনি। ফিকের ছাই থেকে আকাশটার কিছু অংশ ফিকে হলুদ হয়েছে মাত্র। দ্রুত-সাইকেলে খবরের কাগজওলা, কিছু লরি, দুধের বোতল হাতে জনাতিনেক গেরস্থ, চায়ের দোকানের ধোঁয়া, ভোরের ট্রেন ধরার জন্য সুটকেস নিয়ে বাস স্টপে অপেক্ষমাণ একজনকে ছাড়া গিরি আর কিছু লক্ষ করেনি। কারণ তার মন ও কান রয়েছে পিছনের ঘরে।

মাঝে মাঝে কথার টুকরো ভেসে আসছে। শব্দগুলো অস্ফুট হয়ে যাচ্ছে পর্দা ভেদ করে আসতে আসতে। ঘাড় ফিরিয়ে গিরি তাকাল। পর্দাটা একটুখানি সরিয়ে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে ঝুঁকেও হাতটা ফিরিয়ে আনল।

"...মোজা জোড়া বড্ড ছেঁড়া... ক'টা লাগে বছরে!"

"এখন চাইলে পাব না, লিগ শুরু হলে..."

"তোমাদের অফিসের ক্যান্টিনে ক'টা থেকে ভাত পাওয়া যায়?...ওখানেই রাখো আমি কেচে দেবখন। রুমাল আর আছে তো?"

"না। তোমারটা..."

গিরি আর কিছু শুনতে পেল না। সম্ভবত ওরা খাবার টেবিলটার দিকে সরে গেছে।

স্থির হয়ে সে বসে রইল; অদ্ভুত ধরনের অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য সে বোধ করছে, কিন্তু কেন, বুঝতে পারছে না। মনে মনে সে এখন ওদের দু'জনকে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

দালানের মতো জায়গাটা প্রায় চৌকো, আয়তনে অনেকখানি। একদিকে জুতোর র‍্যাক, তার পাশ দিয়ে দেড় গজ চওড়া গলি। লম্বায় পাঁচ গজ। গলিতে আছে পর পর কলঘর ও পায়খানা। জুতোর র‍্যাকের পিছনে জানলা। পাল্লা খুলেই সিঁড়ির তিনতলার চাতালটা দেখা যায়। মাস দশেক আগে জানলাটার শিক খুলে চোর ঢুকেছিল। গিরি বা রুনু কিছুই টের পায়নি। তার ঘুম গভীর কিন্তু রুনু তো বেড়াল হেঁটে গেলেও জেগে ওঠে। ঘুমের মধ্যে গায়ে হাত লাগামাত্র হাতটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু রুনুও শুনতে পায়নি শিক ভাঙার, চোরের বা চোরেদের চলাফেরা, জিনিস নাড়ানাড়ির শব্দ। রুনু নিজেই বহুবার অবাক হয়ে বলেছে, "আমার এত গভীর ঘুম! অফিসে তো সেদিন খুব বেশি কাজ ছিল না।"

চোর বা চোরেরা বিশেষ কিছুই পায়নি। অ্যালুমিনিয়ামের একটা সসপ্যান, একটা ডেকচি, স্টিলের

হাতা আর দড়িতে শুকোতে দেওয়া একটা ভয়েলের শাড়ি। মাস দুয়েক আগে রিডাকশানে শাড়িটা কিনেছিল রুনু ছত্রিশ টাকায়। আসল দাম নাকি আটচল্লিশ। সাদা শাড়ি, এক বিঘৎ নীল নকশার পাড়। ওটা সে লন্ড্রিতে দিত না পাছে জখম হয়। নিজে কেচে ইস্ত্রি করত। ওটার জন্য সে মুষড়ে পড়ে। গিরি কিন্তু অন্য কারণে খুশি হয়ে বলেছিল, "দেখলে তো, চিনেমাটির প্লেট কত পয়সা বাঁচল। স্টিলেব থালা পেলে ঠিক নিয়ে যেত।"

দুটি লোকের জন্য বাসন কয়েকটি মাত্রই যথেষ্ট ছিল। ঝি-চাকর নেই, প্রয়োজনও হয় না। দুটো ঘরের একটি এতকাল অব্যবহৃত বন্ধ ছিল। রান্না, কাপড়কাচা, বাসনধোয়া, ঘরের মেঝে পরিষ্কাব গিরিই করত, দুপুরে। রুনু আপত্তি জানিয়েছিল।

"কেউ তো আর দেখতে পাচ্ছে না, ঘরে কী কচ্ছি, না কচ্ছি।"

"তা হোক। পুরুষমানুষের এ-সব কাজ করা মানায় না। লোকে জানলে আমায় কী বলবে? তা ছাড়া উবু হয়ে বসে এ-সব কাজ করায় তোমার যে কষ্ট হয়, আমি তা বুঝতে পারি।"

প্রায় জল এসে গেছল রুনুর চোখে। গিরি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বাঁ হাত তুলে বলেছিল, "না না, কষ্ট হয় না। তোমার সামনে একদিন নয় কাপড় কেচে দেখাব।"

"কিচ্ছু দেখাতে হবে না।"

"আচ্ছা আর করব না।"

"বাসন যেমন এঁটো থাকে থাকবে, আমি অফিস থেকে ফিবে মাজব।"

জানলার শিকটা চোর নিয়ে গেছে। ওখান দিয়ে একটা মানুষ গলে আসতে বা বেবোতে পাবে। গিরিব স্থির বিশ্বাস, আর চোর আসবে না। বাসন বা কাপড় যা আছে সেগুলোর জন্য খাটুনিব মজুবি তুলতে পারবে না, এটা নিশ্চয় ওরা জেনে গেছে। গহনা কিছুই নেই একটা সোনার বালা ছাড়া। সেটা রুনুর হাতেই থাকে। ওব হাতঘড়িটা টেবিলের উপর থাকে। সেটা নিতে হলে খাটটাকে ঘুবে মাথার কাছে আসতে হবে। চোরের পক্ষে তা হলে খুবই ঝুঁকি নেওয়া হবে। কাঠের আলমারিতে রুনুব মাইনের টাকা থাকে শাড়ির ভাঁজে। অল্প কিছু থাকে হাত ব্যাগটায়, একটা সিগাবেটের তামাকেব কৌটোয় রেজগি। সাড়ে চারশো টাকা মাইনের যতটুকু অবশিষ্ট থাকে চোরকে আগ্রহী কবার পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়।

রুনুর ধারণা আবার চোর আসবে। তারই পীড়াপীড়িতে গিরি মাপমতো একটা শিক কিনে এনে জানালায় লাগিয়েছে। কোনওরকমে ওপর-নীচে কাঠের গর্তে শিকটাকে ঢুকিয়ে রাখা মাত্র। যে-কেউই খুলে নিতে পাবে। তলার গর্তটা বড় কবে দিয়ে গেছে চোবেরা। গিবি বলেছিল, "কাঠটা না বদলালে শিক লাগাবাব মানে হয় না। কীরকম ঘুণ ধবে ক্ষয়ে গেছে দেখেছ?"

"তা হোক। চট করে কেউ বুঝতে পারবে না। তলাটা নড়নড় করছে, খানিকটা পুডিং দিয়ে এটে দিলেই হবে।"

"তা হবে।" শিকটায় ঝাঁকুনি দিয়ে সে কতটা আলগা পরীক্ষা করে।

"এ বাড়ির কেউ কি দেখেছে?"

"দেখেছে মানে!"

"শিকটা যখন লাগাচ্ছিলে, কেউ কি তখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেছে?"

"লক্ষ করিনি, মনে তো হয় না।...ওহ্, ওপরের পাগলিটা তখন একবার নেমেছিল বটে। আমাদের তলা পর্যন্ত নামেনি, সিঁড়িতে কী একটা কুড়িয়ে আবার উঠে চলে গেল।"

"আর কেউ?"

"কেন, দেখলেই বা।"

"শিকটা আলগা, এটা বাইরের লোকের না জানাই ভাল।"

গিরির হেসে উঠতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু তা না করে সে গম্ভীর হয়ে বলে, "জানালাটা বন্ধই থাকুক। ওর পেছনে এমন একটা কিছু রাখা যাক, পাল্লা খুললেই যাতে সেটা পড়ে গিয়ে শব্দ হবে।"

রুনু ভেবেচিন্তে কয়লা ভাঙার লোহাটাকে জানলার চৌকাঠের লাগোয়া ইঞ্চি চারেক জায়গাটায় লম্বালম্বি পাল্লার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে দেয়। লোহাটা মোটরগাড়ির অ্যাক্সেলের হাতখানেক লম্বা

একটা টুকরো। ইউনিভার্সাল মোটর সার্ভিসিং-এর থেকে বছর পনেরো আগে এনেছিল গিরি। ওটাকে দেখলে কখনও কখনও তার অস্বস্তি হয়। চুরি করে আনা জিনিস। ইউনিভার্সালের ফোরম্যান গিরিজাপতি বিশ্বাসকে গেটের দরোয়ানরা তল্লাস করবে না, এই সুযোগ নিয়ে সে কয়লা ভাঙার জন্য লোহাটাকে আনে। শীতকাল ছিল। কোটের মধ্যে ঢুকিয়ে বগলে চেপে সে যখন দরোয়ানটার সামনে পৌঁছয় তখন হঠাৎ একটা চাপা আতঙ্ক তার হৃৎপিণ্ডটাকে আঁকড়ে ধরে। হাতটা কেঁপে ওঠে মনে হয়েছিল ওটা বোধ হয় পড়ে যাবে। লোহাটা প্রাণপণে মুঠোয় ধরে ঘাতকের মতো সন্তর্পণে সে দরোয়ানকে অতিক্রম করে। বহু দূরে এসে অকারণেই পিছনে ফিরে তাকায়।

সেই মুহূর্তের আতঙ্কটা গিরির মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। তখন বুকের মধ্যে ড্রাম বাজানো মতো, ক্ষীণ গুড়গুড় শব্দ ওঠে। কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হয়, কারা বোধ হয় সদলবলে আসছে। তারা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ইউনিভার্সালের ম্যানেজার প্রকাশ মেহরার সামনে তাকে দাঁড় করাবে। মেহরা তোবড়ানো গাল দুটো আরও চুবড়িয়ে বলবে, "আপনাকে তো অনেস্টম্যান বলেই জানতাম।" ইদানীং এইরকমই তার মনে হয় এবং অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে সে গুম হয়ে ওঠে। বাচ্চাদের মতো অসহায় বোধ করে। লোহাটাকে চোখের আড়াল করার জন্য মাসখানেক রান্নাঘরের তাকে তুলে রেখেছিল। তাতে কোনও কাজ হয়নি।

"চা অত বেশি খাও কেন, উঁউ? খুব খারাপ।"

রুনুর বলার ধরনটায় গিরি আবার অস্বস্তি বোধ করল। চা তৈরি হয়ে গেছে। ওরা তা হলে এখন টেবিলে। রুনু দাঁড়িয়ে থাকবে ওর অভ্যাস মতো। নাভিটা টেবিলের কিনারে চেপে দাঁড়ায়। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে কি? কীভাবে তাকাচ্ছে? কাপটা এগিয়ে দেবার জন্য ঝুঁকবে, দরকার না থাকলেও ঝুঁকবে; ব্লাউজের গলাটা ঢিলে হয়ে তখন রাক্ষুসে হাঁ করবে আলজিভ দেখিয়ে। অম্বরের চোখ কোথায় থাকবে? তখন কি হাতটা বাড়িয়ে রুনুর হাত বা আর কোথাও—।

রুনুর হাসি শুনতে পেল গিরি। হাত বাড়িয়ে পর্দাটা তুলে সে মাথা হেলাল। কোনও কথা, বা ধ্বনি পেল না। হতাশ হল। সে আশা করেছিল কিছু একটা বুঝতে পারবে। ওরা দু'জন কতটা সম্পর্কিত এটা তার জানা দরকার। না জানা পর্যন্ত সে নিজেকে কোথাও স্থিরভাবে রাখতে পারছে না। ভালবাসা, ঘৃণা বা দীনতা—এর মধ্যে একটা কোথাও সে বাস করতে চায়।

"তোমার চা।"

গিরি মুখ তুলল। রুনু তার দিকেই তাকিয়ে। গিরির মনে হল চাপা একটা আভা ওর মসৃণ পাতলা কফি রঙের চামড়ার নীচে সারা মুখে ছড়ানো। তাজা ঝরঝরে দেখাচ্ছে, যেন এইমাত্র স্নান করে উঠেছে। নিতম্বচুম্বী দীর্ঘ ভারী চুল হাত-খোঁপা করে ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখছিল আধঘণ্টা আগেও। কিন্তু এখন পিঠে কেন ছড়িয়ে?

গিরি হাত বাড়িয়ে কাপটা ধরল। রুনুর নখে চটা ওঠা লাল রং। টসটসে আঙুলগুলো পুরন্ত কাঁচালঙ্কার মতো। পনেরো-ষোলো বছর আগে এমন ছিল না। তখন গাঁটগুলো উঁচু দেখাত।

"চুলগুলো জটের মতো দেখাচ্ছে।"

রুনু বাঁ হাতে এক গোছা চুল সামনে ধরে বলল, "আজ শ্যাম্পু করব।"

শ্যাম্পু! গিরি বিস্ময় চাপতে চায়ে চুমুক দিল ঘাড় নিচু করে। সে ভালভাবেই জানে তাদের সংসারে ও বস্তুটি নেই। তা হলে রুনু বলল কেন? অম্বরের ঘরে কি শ্যাম্পু আছে!

"অনেকদিন পর পরশু তোমাকে বেণি ঝোলাতে দেখলাম।"

রুনু হাসল। "কেমন দেখাচ্ছিল?"

গিরির মনে হল কণ্ঠস্বরে আগ্রহ নেই। "কলেজে তুমি এইরকম বেণি ঝুলিয়ে যেতে।"

"কেন, তারপরও তো বেণি করেছি।"

গিরি মনে করার চেষ্টা করল। সম্ভবত এই ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর নয়। হাসপাতালে যখন তাকে দেখতে যেত, তখন বোধ হয় দু'-চারদিন রুনুর বেণি দেখেছে।

"অফিসে কেউ কিছু বলেনি?"

"কী বলবে!"

"ঠাট্টা করেনি, বুড়ো বয়সে বেণি ঝুলিয়েছ বলে?"

রুনু উত্তর দিল না। পাশের ঘরে অম্বর সুর ভাঁজছে। ফিল্মের গান। গিরি কান পেতেই বুঝল এখন সে চুল আঁচড়াচ্ছে।

"দত্তগুপ্তর ব্যাপারটা এখনও চলছে, না মিটে গেছে?"

রুনুর অফিসে অশোক দত্তগুপ্ত নামে একটি ছেলে বিয়ের পরই মরে গেছে। তার বিধবাকে চাকরি দেওয়ার দাবিতে ইউনিয়ন লড়াই করে যাচ্ছে এক মাস ধরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

"মিটে যাবে। গ্র্যাজুয়েট নয় মেয়েটা, নইলে অ্যাতো ঝামেলা হত না।"

"বউদি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ো।"

রুনু ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে বলল, "ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

রাস্তাটা তিরিশ ফুট চওড়া। সামনের বাড়িব জানলা খুলে একটি লোক ওদের দিকে তাকিয়েই একটা পাল্লা বন্ধ করে পিছিয়ে গেল। লোকটি এখন যোগব্যায়াম করবে। তারপর জানলা খুলে দিয়ে দুটি ছেলেকে পড়াতে বসবে এবং মিনিট পাঁচেক পরই জানলা আবার বন্ধ করবে। তখন বন্ধ জানলার ওপার থেকে ছেলে দুটির আর্তনাদ ভেসে আসবে।

অম্বর দ্রুত পায়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে চলেছে। টকটকে লাল নাইলনেব গোলগলার গেঞ্জি, চামড়াসাঁটা ঘিয়ে প্যান্ট, প্রায় ছ'ফুট লম্বা শরীরটা চাবুকের মতো দেখাচ্ছে চলনের দোলায়। সরু কোমব, দেহটা বিরাট নয়, কিন্তু সর্বত্র মাংস মানানসই হয়ে ছড়ানো। ঘাড ঢেকে রয়েছে লম্বা রুক্ষ চুলে। অতিরিক্ত চুলের জন্যই ওর শরীরে একমাত্র মাথাটাকে বেঢপ দেখায়। কপালটার আধখানা ঢেকে চুল।

গিরি তীক্ষ্ণ চোখে ওর হাঁটা দেখতে লাগল। সপ্তাহ তিনেক ধরে রোজই দেখছে। দেখাব জন্য সে ভোর থেকে অপেক্ষা করে। সামনে ঝুঁকে হাঁটছে ছোট ছোট দ্রুত পদক্ষেপে। উরুর ও পাছার মোড়ের পেশি টেরিলিন প্যান্টে ভাঁজ ফেলছে। পায়ের ডিমের কাঠিন্য আঁটো কাপড়ে ফুটে উঠছে। কোমর সামান্য দোলে কিন্তু হাত দুটি দোলে না হাঁটার সময়।

রুনু অলস চোখে তাকিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে। গিরি শূন্য কাপ ওর হাতে দেবার সময় দেখল মৃদু চাপা একটা হাসি ওর ঠোঁটে। কিছু মজার ব্যাপার মনে পড়লে এরকমভাবে ঠোঁটে সেটা ফুটে ওঠে।

চোখাচোখি হতেই ঠোঁট দুটো চমকে কুঁকড়ে গেল। গিরি ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

অম্বর বাস স্টপ থেকে ফিরে আসছে লম্বা পা ফেলে। বারান্দায় রুনুকে দেখে দূব থেকেই হাত তুলে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল।

"কী ব্যাপার ফিরে আসছে যে! কিছু ভুলে গেছে বোধ হয়। যা ভুলো মন।"

গিরি শেষ বাক্যটিব সুরে যেন খানিকটা স্নেহের আভাস পেল।

"রোববারও ওদের প্র্যাকটিস থাকে নাকি?"

"সোমবারে বন্ধ থাকে।"

গিরি তা জানে। অম্বরের প্রতিদিনের গতিবিধি, অবশ্য ফ্ল্যাটে বসে যতটুকু জানা সম্ভব, গিরির তা মুখস্থ। তবু সে জিজ্ঞাসা করেছিল অম্বরকে কথার মধ্যে ধরে রেখে রুনুর অভিব্যক্তি বা কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে দেখতে।

"বউদি থলিটা।"

বাস্তা থেকে অম্বর চেঁচাল। চেয়ারে বসে গিরি রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছে না। রুনু ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলল।

"থলি কী জন্য?"

কথার উত্তর না দিয়ে রুনু ভিতরে ছুটে গেল। লঘু পদক্ষেপ, কোনও শব্দ হল না। অল্পবয়সি মেয়েদের মতো। গিরি সামনের বাড়ির দিকে তাকাল। জানলাটার পাল্লা এখনও বন্ধ। রবিবারে লোকটি ছেলেদের পড়ায় না।

বাজারের থলিটা পাকিয়ে ধরে বারান্দা থেকে রুনু ঝুঁকেছে।

"পারবে?"

হাত থেকে ছেড়ে দিল। তিন-চার সেকেন্ড পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। অম্বর তা হলে থলিটা লুফেছে।

"কী হবে থলি?"

"আজ আর তোমায় বাজার যেতে হবে না। ফেরার সথে অম্বর মুরগি আনবে নিউ মার্কেট থেকে।"

"কেন?"

"বলল আনব। হোটেল-ফোটেলে তো প্রায়ই খায়। খেয়াল হয়েছে আমার রান্না মুরগি খাবে আজ।"

"তুমি নিশ্চয় রাঁধার কথাটা তুলেছ। নিশ্চয় বলেছ, হোটেলের থেকে ভাল রান্না করি।"

"আমি!" রুনু অবাক হল। "আমি তো মুরগি একদমই ভালবাসি না, খাওয়ার কথা ভাবলেই কেমন যেন লাগে।"

"তা হলে বারণ করলে না কেন। কে খাবে?"

"তোমরা দু'জন খেয়ো।"

"ওর খরচ কবার কথা নয়। এ-সব বাড়তি বাজার কেন করবে? যা টাকা দেয়, আমরা যা দিতে পারি, তার বেশি আমরা চাইও না, দিতেও পারব না।"

"এগুলো শখের ব্যাপার, এব সঙ্গে হিসেব নিকেশের সম্পর্ক কী?"

রুনুর কণ্ঠে ক্ষোভ এবং কিছুটা বিরক্তির আভাস পেয়ে গিরি আপসকারীর সুরে কথা বলার ভঙ্গি বদলাল।

'আমি তো বারণ করছি না। আসলে কেমন যেন লাগে ও খরচ করলে। ও সংসারের কেউ নয়, নিছকই পেয়িং গেস্ট। মাসে মাসে দেড়শো টাকা যেমন দেয় তেমনি ভাবেই খাবে থাকবে। তার বেশি আমাদের কিছু নেওয়া উচিত নয়।"

"কিন্তু কিছু আনলে তখন তো মুখের উপর না বলা যায় না। ও তো তোমার দূর সম্পর্কের ভাই।"

গিরির বাবার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে অম্বর। ওকে সে কখনও দেখেনি, চিনতও না। মাস ছয়েক আগে গত পুজোর ঠিক পর, মানিকতলায় পিসিমার বাড়িতে বিজয়া করতে গিয়ে গিরির সঙ্গে পরিচয় হয় অম্বরের। মেসে থাকে কিন্তু থাকতে ভাল লাগছে না। তার গোটা একটা ঘর চাই। গ্রামের বাড়ি হাসনাবাদের থেকে চার মাইল ভিতরে। সেখান থেকে কলকাতায় এসে খেলা এবং চাকরি সম্ভব নয়।

"গিরি তোর তো ঘর আছে একটা। অম্বরকে রাখ না। তোর সংসারেই খাবে, মাসে মাসে টাকা দেবে। অসুবিধে কী, তোরা তো মোটে দুটো লোক।"

পিসিমার প্রস্তাবটা গিরির কাছে ভালই লাগে। টাকার বিশেষ দরকার। রুনুর মাইনেতে চলে না, চালিয়ে নিতে হয়। জিনিসের দাম অসম্ভব গতিতে চড়ছে। আয় বাড়াবার এই সুযোগ অপ্রত্যাশিত মনে হল তার কাছে।

সতর্কভাবে সে বলে, "ঘরটা দেওয়া যায় বটে কিন্তু খাওয়াদাওয়ার তো অসুবিধে হবে। রুনু ন'টায় অফিসে বেরোয়, রান্না কিছুই হয় না, অফিস ক্যান্টিনেই ভাত খেয়ে নেয়। আমি নিজে যা-হোক রান্না করে খাই। রাত্রেও আমাদের---"

"ও আপনি কিছু ভাববেন না দাদা।" অম্বর হাত তুলে গিরিকে থামিয়ে দেয়। "আমারও বাইরে বাইরেই বেশির ভাগ দিন খাওয়াটা হয়।"

গিরির মনে হয়েছিল চৌকো মুখ কৃষ্ণবর্ণ, স্কুল ফাইনাল পাশ তার এই জ্ঞাতি ভাইটি কিঞ্চিৎ চপল, ছটফটে অমার্জিত। দু'-তিন মিনিটের বেশি এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। সামনের দুটি উঁচু দাঁত, কালো পুরু ঠোঁট, ব্রনের দাগে ভরা গাল, কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত ফুলে থাকা শিরার শাখা প্রশাখা এই সবের মধ্য দিয়ে বৃষ্টিভেজা বুনো ঝোপের গন্ধের মতো একটা তাজা অনুভব গিরি পাচ্ছিল।

কলকাতায় ফুটবলে অম্বরের এখন নাম হয়েছে। এটা গিরির কাছে কোনও ব্যাপার না। বছর কুড়ি ফুটবল খেলা দেখেনি। খেলা তার কাছে প্রাগৈতিহাসিক জিনিসে পরিণত হয়েছে।

"রুনুকে একবার জিজ্ঞাসা না করে আমি কিছু বলতে পারছি না।"

"আমি গিয়ে বউদিকে বলব, রাজি না হলে পায়ের ওপর পড়ব। দাদা, আর মেসে বাস করা সম্ভব

হচ্ছে না। নানা ঝামেলা, টিকিট-ফিকিট তো আছেই তা ছাড়া রাতে ঘুমোতে পারি না, বড্ড চেঁচামেচি হয়।"

গিরি উপভোগ করল নাটুকে ভঙ্গিতে হাতজোড় করা অম্বরের কৃত্রিম কাতরতা। মনে মনে সে তখন কিন্তু ভাবছিল, কত টাকা চাওয়া যায়। কত রোজগার করে? এখন ফুটবল খেলে হাজার-হাজার টাকা নাকি পাওয়া যায়। ক্লাব থেকে। তা ছাড়া শ'-চারেক টাকার চাকরি নিশ্চয় করে। ব্যাঙ্কে তো এখন ভালই মাইনে দেয়. বিয়ে করেনি। বাড়িতে দাদারা ছাড়া কেউ নেই, সেখানে টাকা দিতে হয় না। ঠাকুর্দার আমলে সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় ধান জমি আর বিলগুলো ওরাই নিয়েছিল।

রুনুর সঙ্গেই বরং কথা বলুক। সম্পর্কিত ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার ব্যাপারে গিরি সংকোচ বোধ করেছিল। শ'খানেক টাকা হয়তো দিতে পারবে, তাই বা মন্দ কী। রুনুকে তাই বলে দেব।

"নেতাজি সুভাষ রোডে রুনুর অফিস লামসডেন অ্যান্ড মেহরোত্রা। দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকে হলঘর, পূর্বে ঠিক জানলা ঘেঁষে। ওর টেবিলে আরও দু'জন মেয়ে একজন পুরুষ বসে। রুনু বিশ্বাস বললেই যে-কেউ দেখিয়ে দেবে। ওখানে দেখা করাটাই সুবিধে। তোমার অফিসের কাছেই হবে।"

"খুব কাছে। অফিসটা আমি চিনিও। বউদিকে খুঁজে নিতে কিছু অসুবিধে হবে না। অম্বর বিশ্বাস হাজির হলে চার-পাঁচজন তো এগিয়ে আসবেই।"

অম্বরেব বড় দাঁত দুটো হাসিতে বেরিয়ে এল। গিরির তখন মনে হয়েছিল তাদের বংশে এত বড় দাঁতওলা আর কেউ নেই। রুনু দেড়শো টাকা চেয়েছিল, অম্বর এককথাতেই বাজি হয়ে যায়।

"হলেই বা জ্ঞাতি ভাই, অম্বর বাইরেরই লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনওকালে সদ্ভাব ছিল না। ওব বাবা অত্যন্ত মামলাবাজ ছিল। তার জন্যই আমাদের সব গেছে, মানে, আমরা সম্পত্তি বিক্রি করে পাট চুকিয়ে পরানহাটি থেকে চলে আসি। তারপর থেকে বছর তিরিশ কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু ওই পিসিমা ছাড়া আমার যে আর কেউ আছে—"

গিরি থেমে গেল। তার রুনু আছে। বস্তুত পৃথিবীতে একমাত্র রুনুই আছে। গত পনেরো বছব ধবে একমাত্র তার কাছেই সে নিরাপদ বোধ করে। জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগেব নিকটতম সূত্র।

রুনু অপেক্ষা করছে বাকি কথাটা সম্পূর্ণ হবার জন্য। গিরি সেটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে হেসে বলল।

"পরশু গরমের কথা বলছিল?"

"ওর ঘরটায় হাওয়া তেমন ঢোকে না।"

দুটো ঘরে পাখা নেই। তিনতলায় পুব খোলা ঘরে গ্রীষ্মে যতটুকু হাওয়া আসে তাতে ওরা প্রয়োজন বোধ করেনি পাখার। কখনও কখনও গুমোট পড়ে। দবদর ঘাম ঝরে। ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার বারান্দায় গিরি খালি গায়ে বসে। রুনু মাদুর পেতে শোয় ব্রেশিয়ারের উপর আঁচল মেলে। কিন্তু গুমোট যখন দিনে হয় এবং প্রায়ই হয়, তোয়ালে ভিজিয়ে গায় জড়িয়ে থেকে ফ্যাকাশে হয়ে যায় চামড়া। দিনের অনেকটাই অন্তত আট ঘণ্টা রুনু বাইরে থাকে, যে-সময় দিনের তাপ সর্বাধিক। ওদের অফিস এয়ারকন্ডিশনড।

"তা হলে একটা পাখা কিনুক, কিংবা ভাড়া নিক। আমার মনে হয় ভাড়া নেওয়াই উচিত।"

"আমিও তাই বলেছি।"

বলা তা হলে হয়ে গেছে। গিরি মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ছুটির দিন সকালে বাস স্টপে ভিড়টা বেশি হয়। এখনও তেমন হয়নি। সপরিবার যাত্রীই বেশি দেখা যায়। সামনের রাস্তাটায় আজ বয়স্ক ছেলেরা রবারের বল খেলতে শুরু করবে দশটা-সাড়ে দশটা থেকে। ওদের মধ্যে দু'-চারজন চাকুরে, বিবাহিতও থাকে। প্যান্ট গুটিয়ে একদিন অম্বরকে ওদের সঙ্গে খেলতে দেখেছে গিরি। তাতে ওরা যেন সম্মানিত বোধ করছিল। পাশের ফ্ল্যাটে তাসের আড্ডা বসবে, চলবে সারা দুপুর।

রুনু বারান্দায় নেই। ঘরে বালিশ চাপড়ানোর শব্দ হচ্ছে। বিছানা ঠিক করছে। এরপর ঘর ঝাঁট দেবে। তারপর পাশের ঘরে যাবে। গিরি অন্যদিনের মতো আজও ফুলঝাড়ুর মসৃণ খসখসানি শোনার জন্য কান পেতে রইল।

"কাগে এ এ জ।"

রাস্তা থেকে কাগজওলার চিৎকার শুনেই গিরির মাথার উপরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হল।

দড়ি বাঁধা পাকানো কাগজটা তার চোখের সামনে দিয়ে উড়ে চারতলায় বারান্দায় পড়বে। নিখুঁত টিপ লোকটার। কবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, কাগজটা আবার নীচে পড়ে যাবে, গিরি প্রত্যেকবার সেই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে। একদিনও পড়েনি।

কাগজটা ফুড়ুত করে লম্বাভাবে উড়ে গেল। গিরি উপর দিকে তাকাল। এইবার একটা কাড়াকাড়ির শব্দ হবে। তারপর গম্ভীর গলায় ধমক। সব শান্ত। রুনু খবরের কাগজ পড়ে না। অম্বর শুধু খেলার পাতাটুকু দেখে এবং সে-জন্য তার কাগজ কেনার দরকার হয় না। ডিটেকটিভ আর সিনেমা মাসিক পত্রিকা প্রায়ই আনে। রুনুর হাতে একবার সে ডিটেকটিভ পত্রিকা দেখেছে। গিরি কোনওরকম আগ্রহ বোধ করে না খবর জানার জন্য। তার কাছে কাগজ পড়ার অর্থ অযথা ঝামেলা বাড়ানো।

পাশের ঘরে শব্দ বন্ধ হল। কয়েক মাস আগেও শব্দের প্রতি গিরির আকর্ষণ এত বেশি ছিল না। আগের থেকে অনেক বেশি জোরে সে এখন শুনতে পায়। সামনের বাড়ির ছেলে দুটো মার খেয়ে যখন চেঁচায় তখন তার কানে যন্ত্রণা শুরু হয়। রুনু এখন কী করছে? ফুটবলারের ঘরে হয়তো এক ধরনের কঠিন ঘেমো আঁশটে গন্ধ থাকে। অনেকক্ষণ ধরেই ও-ঘরে রয়েছে। রুনুর কি ভাল লাগে এই গন্ধ? ইউনিভার্সাল থেকে ফেরার পর এক একদিন রুনু বলত, "ঘরে ঢুকলেই কেমন একটা গন্ধও তোমার সঙ্গে ঘরে আসে।"

"কেন খারাপ গন্ধ?" গিরি উদ্বিগ্ন স্বরে খোঁজ করেছিল। ভাল করে সাবান ঘষে চান করে, তবেই বেরিয়েছি।"

"গন্ধটা বেশ লাগে আমার।"

ফুটবলারের গায়ে, জামা-প্যান্টে নিশ্চয় পেট্রল, ডিজেল, মোবিল অয়েল বা গ্রিজের গন্ধ নেই। একদিন অম্বরের গেঞ্জি সে শুঁকে দেখেছে। পাউডারের গন্ধের সঙ্গে শুকনো বাসি ঘামের গন্ধ ছাড়া আর কিছু গিরি পায়নি।

কিংবা সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছে। স্টিলের ছোট টেবিলটায় অনেকগুলো পত্রিকা আছে। সকালে রুনু যখন ঘরটা পরিষ্কার করে তখন খোলা দরজার সামনে দিয়ে গিরি যাতায়াত করে এক পলক দেখেছিল ট্রানজিস্টর রেডিয়োটা বিছানায়, দেয়ালে কাগজ আঁটা তার উপরে হ্যাঙ্গারে দুটো প্যান্ট ঝুলছে, টেবিলে অনেক রকমের শিশি, পেস্টের টিউব, আয়না এবং রঙিন ছবির মলাট দেওয়া পত্রিকা। খাটের নীচে পুরনো একজোড়া বুট। দরজার পাশের দেয়ালের দিকে কী আছে সে জানে না। ওদিকে একটা দেয়াল-তাকও আছে

ঘরের চাবি থাকে রুনুর কাছে। অথচ এক-একদিন অম্বর দুপুরেই ফিরে এসে তালা খুলে ঘুমোয়। চাবি কি আর একটা আছে নাকি, রুনুর অফিসে গিয়ে চাবিটা আনে? হয়তো একটাই চাবি। রুনুর সঙ্গে গল্প করতে, সান্নিধ্য পেতে চাবি আনার ছুতো করে যায়। কিন্তু অফিসে কাজ করার মধ্যে গল্প করতে কি দেবে? রুনু বলেছিল, ওদের বসার জায়গা নতুন করে সাজানো হয়েছে। ওর টেবিলের মুখোমুখি নতুন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের টেবিল। গম্ভীর ছোকরা। মেয়েদের প্রতি একটু বেশি কড়া।

হয়তো ক্যান্টিনে বসে ওরা কথা বলে। কিন্তু কতক্ষণ বসতে পারে? এখন নাকি ঘড়ি ধরে টিফিনে যাওয়া-আসার সময় রাখছে ডেপুটি ছোকরা। এমনকী ইউনিয়নের ছোটখাটো লিডাররাও হুট হুট সিট ছেড়ে ঘোরাঘুরি বন্ধ করেছে।

কিংবা এ-সব কিছুই হয়নি। আগের মতোই লামসডেন অ্যান্ড মেহরোত্রা অফিস চিৎকার, ঝাগড়া, খিস্তিতে ভরা আছে। অম্বর গেলেই রুনু উঠে পড়ে। পাশের চেয়ারে ওর বন্ধু সবিতাকে হয়তো বলে যায়—"কেউ খুঁজলে বলিস, ওষুধ কিনতে বেরিয়েছি।" রুনু একদিন অফিসের গল্প করতে করতে বলেছিল, "সবিতার বয়-ফ্রেন্ড এলেই ওরা অফিস থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে। আর আমাকে তখন সামলাতে হয় ওর কাজের ঝামেলাগুলো।"

রুনু যে ওইভাবে অফিস থেকে বেরোয় না বা বেরোবার কোনও উপায় নেই এটা বোঝাবার জন্যই হয়তো নতুন করে সাজানো বসার ব্যবস্থার, নতুন এক কড়া ছোকরা উপরওলার গল্প বানিয়ে বলেছে।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িটার গা ঘেঁষে সূর্য এবার উঠে এসেছে। রোদ্দুরটা মুখে এসে লাগছে গিরির। কাল রাতে মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙেছে, যা কখনও আগে হত না। হাতটা সন্তর্পণে এগিয়ে দিয়ে দেখেছে রুনু বিছানায় আছে কি না। বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে থেকেছে।

চোখ জ্বালা করছে গিরির। খানিকটা ঘুমোলে চোখ দুটো ঠিক হয়ে যাবে। ওঠার জন্য সে হাত বাড়াল দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ক্রাচ দুটোর দিকে। সেই সময় তার নজরে পড়ল মোহন স্কুটারে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে অঘোর ঘোষ স্ট্রিটে ঢুকেছে।

ক্রাচ দুটো বগলে লাগিয়ে গিবি উঠে দাঁড়াল। মোহন মুখ তুলে তাকে দেখে হাসল। ফুটপাথ ঘেঁষে স্কুটারটা থামাল।

গিরি ঝুঁকে চিৎকার করে বলল, "রাস্তায় রাখিসনি, ফুটে তুলে দেয়াল ঘেঁষে রাখ। ছেলেরা এখুনি বল খেলা শুরু করবে।"

দুই

অম্বর বেবিয়ে যাবার পর দবজা বন্ধ করেনি রুনু। পাল্লা দুটো খুলে গিরি অপেক্ষা করতে লাগল।

পাশেব ফ্ল্যাট থেকে ঝগড়াব শব্দ আসছে। প্রায়দিন সকালেই বউটির সঙ্গে স্বামীব কথা কাটাকাটি মিনিট দুয়ের মধ্যেই চিৎকারে পৌঁছয়। সাত বছরের দম্পতি ওরা। লোকটি দু'-চাববার জোরে কথা বলেই নীরব হয়ে যায়। বউ একদা তার ছাত্রী ছিল। বয়সের পার্থক্য কুড়ি বছরের। লোকটি অঙ্কেব অধ্যাপক, প্রচণ্ড নেশা কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলাব।

চারতলা থেকে, টাক মাথা গম্ভীর দত্তবাবু বাজাবেব থলি হাতে নামতে নামতে শুকনো হাসল গিরিকে দেখে। পালটা হাসল গিরি। লোকটির বিধবা বোনেব মাথার গোলমাল আছে।

মোহন উঠতে দেরি করছে।

"দাঁড়িয়ে যে, কেউ আসছে নাকি?"

রুনু উনুনে কয়লা সাজাচ্ছে কলঘরের গলিতে। গিরি অস্পষ্ট স্বরে বলল, "মোহন আসছে।"

"অনেকদিন পব।"

সে তাকাল না রুনুর দিকে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দটা উঠে আসছে। খুবই ধীরে, অসুস্থ মানুষের পদক্ষেপেব মতো শব্দগুলো সময় নিচ্ছে। মোহন আসছে প্রায় তিন মাস পর।

মাথাব সামনের চুল উঠে গিয়ে অর্ধেক খুলি মসৃণ বাদামি। বাকি চুল ঘন কালো। কপালটা উঁচু এবং গড়ানে। রগ থেকে কেঁচোর মতো একটা শিরা কানের উপরে পড়ে। সিঁড়ির বাঁকটায় মোহন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। গিরি শুধু দেখতে পাচ্ছে মাথাটুকু।

নীল বুশ শার্টের দু'ধাবে শীর্ণ ফ্যাকাশে দুটি হাত ঝুলছে। চোয়ালের নীচে প্রবাল রঙের আঁচিল। গিরি ইউনিভার্সালে প্রথম যখন মোহনকে দেখে সর্বাগ্রে আঁচিলটাতেই চোখ পড়ে। এত ঝকঝকে, নিটোল এবং এমন লাল আঁচিল কখনও সে দেখেনি। ষোলো-সতেরো বছরে ওটা এখন প্রায় বৈঁচির আকার পেয়েছে। ওর হাতে সিগারেট তামাকের কৌটো। গিরি দরজা থেকে সরে দাঁড়াল পথ ছেড়ে দিয়ে।

"কী রে, এত সকালেই এদিকে?"

মোহন বেলেঘাটায় থাকে। বউ এবং দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। ইউনিভার্সালে সে সিনিয়ার ফোরম্যান ছিল। মোহনই বলেছিল অ্যাক্সেলের টুকরোটা কোটের মধ্যে লুকিয়ে নিতে। প্রতিদিনই টুকটাক যন্ত্রপাতি মোহন এইভাবে নিয়ে বেরিয়ে যেত। বছর বারো আগে সে ইউনিভার্সাল ছেড়ে একটা রিপেয়ারিং গ্যারেজ খোলে। ধীরে ধীরে সেটা বড় করে তুলেছে। এখন এন্টালিতেও ছোটখাটো একটা কারখানা খুলেছে দুটো লেদ মেশিন নিয়ে। সল্ট লেকে পাঁচ কাঠার প্লট কিনেছে।

মোহন প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে রুনুকে লক্ষ করে বলল, "এক গ্লাস জল দাও রুনু, তারপর চা।"

ঘরে এসে মোহন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল চটি পরা পা দুটো খাটের বাইরে রেখে। চটির তলায় ধুলোর চিহ্ন দেখতে পেল না গিরি। নানা সময়ে ব্যবহারের জন্য মোহনের নানারকম জুতো আর চটি। এইটাই ওর বাবুয়ানি।

গিরি মোড়াটায় বসে ক্রাচ দুটো খাটের উপর শুইয়ে রাখল। বাঁ পা টান করে সামনে ছড়িয়ে আবার গুটিয়ে নিল।

"বউদি কেমন আছে?"

"ভাল। ভালই আছে।"

রুনু জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়াতেই মোহন উঠে বসল। জল খাওয়ার সময় ওর চোখ রুনুর মুখে নিবদ্ধ। রুনু মুখ ফিরিয়ে একবার গিরির দিকে তাকাল। রুনু গ্লাস নিয়ে চলে যাচ্ছে, মোহন কোনওরকম সংকোচের বালাই না রেখে ওর নিতম্বের দিকে যে-ভাবে তাকিয়ে থাকল তাতে গিরি অস্বস্তি বোধ করল।

মোহনকে সে চেনে, অসৎ এবং ইতর চরিত্রের। মোহন মারফতই রুনুর বা রুনুদের বাড়ির সঙ্গে সে পরিচিত হয়। তখন রুনু উনিশ-কুড়ি বছরের রোগা একটি মেয়ে, সবেমাত্র আই এ ক্লাসে ভরতি হয়েছে।

"তোর বউ তো দিনদিন বেশ সুন্দরী হয়ে উঠছে। আগেরবার এসে যা দেখেছিলুম, তার থেকেও বেশ —"

মোহন দু'হাতে গোলাকার একটা কিছু সন্তর্পণে শূন্যে তৈরি করে সেটিকে আলতো ধরে রইল।

গিরি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। রুনুর যত বয়স বাড়ছে, ততই যেন লাবণ্য বাড়ছে। ভরাট হয়েছে, নিটোলত্ব পেয়েছে, ভাঁজ পড়েছে দেহের বহু জায়গায়। রাস্তায় পুরুষরা ফিরে ফিরে তাকায়। যখন তারা দু'জন একসঙ্গে বেরোয়, লক্ষ করেছে, পা-কাটা খোঁড়া লোকটার পাশের মেয়েটির দুর্ভাগ্যের জন্য পথচারীদের চোখে সমবেদনা ফুটে উঠত।

কিন্তু মোহন যে রুনুর জন্য সমবেদনায় কাতর হবে না, এটা গিরি জানে। বরং তার মনে হয় গিরিকে সে ঈর্ষা করে রুনুর জন্যই। হাসপাতালে থাকার সময়ই নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটাতে কাটাতে প্রায়ই তার মনে হত এবার রুনু বোধহয় তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারা বিবাহিত নয়। কিন্তু তারপরও পনেরো বছর তারা একসঙ্গে রয়েছে, রুনুকে কষ্ট কম করতে হচ্ছে না। কিন্তু কখনও সে অভিযোগ অবহেলা বা বিরক্তি জানায়নি। এ-জন্য গিরির কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

একবার মাত্র গিরি বিয়ের কথা তুলেছিল। হাঁটছিল ওরা সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে। কাশী মিত্র শ্মশানটা দেখিয়ে গিরি বলে, "এখানে বাবাকে পোড়ানো হয়েছিল। আমি তখন বারো বছরের। রেঙ্গুন দখল করে জাপান তখন এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে। কলকাতার লোক ভয়ে পালাচ্ছে। ব্ল্যাক আউটের মধ্য দিয়ে আমি আর —"

তারপরই মনে পড়ে এ-সব কথা রুনুকে সে আগেও বলেছে। কিন্তু রুনু অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে যখন শোনা-কথাই আবার শোনে, গিরি বুঝতে পারে ও ভান করে আছে। তার বাল্য ও কৈশোরের দুঃখ দুর্দশার গল্প বহুবার বলেছে এবং দেখেছে প্রত্যেকবারই রুনুর চোখ ছলছল করে ওঠে।

একটা মৃতদেহকে পোড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল। ওরা রাস্তা থেকেই দেখছিল। অল্পই বয়স বউটির। সিঁথিতে কেউ উপুড় করে দিয়েছিল সিঁদুর কৌটো। লাল বেনারসিতে ঢাকা। পা দুটি আলতায় লাল। রুনু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, "বউটা যেন দোল খেলেছে। এমন লাল আমি দেখিনি।"

"মোহনের আঁচলটা দ্যাখোনি?"

কেন হঠাৎ মোহনের কথা তার মনে এসেছিল! রুনু হাসবার চেষ্টা করে বলেছিল, "আমিও যেন এইরকম সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে যেতে পারি।"

"কোথায় যেতে পারো?"

"স্বর্গে।"

"সেখানে তো পাপীরা যেতে পারে না।"

রুনু আহত চোখে তাকিয়েছিল। গিরি দ্রুত বলে, "মানুষ মাত্রেই পাপ করেছে। নিশ্চয় কখনও নিজের অজান্তে করেছে।"

"আমি কখনও করিনি। আর অজান্তে পাপ করলে কোনও দোষ হয় না।"

রুনু গম্ভীর হয়ে গিরির পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। ক্রাচের খটখট শব্দটা যখন দু'জনের নৈঃশব্দ্যের মাঝে অসহ্য হয়ে উঠল তখন গিরি বলেছিল, "সিঁদুর পরো বটে কিন্তু আমাদের বিয়ে এখনও হয়নি।"

বেললাইনের ধারে, কুমোরটুলির দিকে মোড় ফেরার রাস্তাটায় যে মৃদু মলিন আলো, তার দ্বারা গিরি দেখেছিল, রুনুর চোখ বিস্ময়ে ভরে গেল যেন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

"কেন?"

"কী কেন!"

"বিয়ের কথা তুললে কেন। বিয়ে করা বউ কি স্বামীকে ত্যাগ করে না?"

"ও-কথা তো আমি বলিনি।"

"আমার মনে হল, তুমি বোধহয় এইরকম কিছু একটা ভাবছ।"

"রুনু, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"আমিও।"

রুনু আলতো করে তার বাহুতে হাত রাখল। গিরি মুখ নামিয়ে বলল, "পাপেব কথাটা এমনিই বলেছি। কিছু মনে কোরো না।"

"না, মনে কবিনি। এ-ভাবে আমি কিছু ভাবি না। তবে মনে হচ্ছে তুমি যেন অসুখী।"

সেই মুহূর্তে দারোয়ানেব সামনে দিয়ে লোহাটা নিয়ে বেরিয়ে আসার মতো বহুকাল আগের আতঙ্কটা তাকে পেয়ে বসেছিল কেন? ছোটখাটো সাংসারিক কাজ আর সাবাদিন বাবান্দায় নয়তো খাটে বসে অপেক্ষা করা রুনুর ফেরার জন্য। অজস্র রকমের চিন্তা তখন তাকে ছেঁকে ধরে। চিন্তা করার জন্য তার সময়ও অজস্র। হয়তো তার স্নায়ুগুলো অত্যধিক চিন্তায় দুমড়ে গেছে বলেই আতঙ্কটা হয়েছিল।

"তুমি কাছে থাকলে আমি অসুখী বোধ করি না।"

"আর যখন কাছে থাকি না?"

"তখন অপেক্ষা করতে করতে ভাবি, কখন তুমি ফিরবে।"

"অজান্তে তোমাকে কি কখনও ব্যথা দিয়েছি?"

"না।"

মোহনকে ধীরে ধীরে দু'হাত দিয়ে নিজের গাল চেপে ধরতে দেখে এই মুহূর্তে গিরির মনে হল, এই লোকটা জীবনে কখনও সুখী হবে না। যেমন কোনও কোনও লোককে দেখে বলে দেওয়া যায়, তার মনেব মধ্যে কোনও কুটুরি আছে কি না, প্রবল অশান্তি ঘটলেই যেখানে সে পালিয়ে যেতে পারে। মোহনকে দেখে মনে হচ্ছে, পালাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"আংটিতে ওটা কী? নতুন মনে হচ্ছে।"

"গোমেদ।"

"এইসবে তোর বিশ্বাস এখনও গেল না।"

"অবিশ্বাসেরই বা কারণ কী! রত্ন ধারণ করে অনেকেরই তো অনেক কিছু হয়েছে।"

"আমি তো কুষ্ঠি-ঠিকুজি গ্রহ নক্ষত্র বিশ্বাস করি না তা হলে আমার কেন এ-রকম হল?"

গিরি মিটিমিটি করে হাসতে লাগল। ইউনিভার্সালের অনেকের মতো তারও ধারণা মোহনের গাফিলতিতেই দুর্ঘটনা হয়েছে। হয়তো মোহনও মনে মনে সেটা স্বীকার করে।

ইউনিভার্সালের সেই দেড় টনের হাইড্রলিক লিফটটার বসানোতেই গোলমাল থাকায় ব্যালান্সের হেরফের ছিল। একদিকে সামান্য হেলে থাকত। তাতে গ্যাসকেটে জখম হয়ে নিয়মিত তেল বেরিয়ে যেত। হেলে থাকার জন্য লিফটের মোটা লোহার থামটা, হাওয়া বার করে দেবার পরও নামত না, সিলিন্ডারের গায়ে আটতে থাকত। ধাক্কা দিলে ঝপ করে নেমে আসত গাড়ি সমেত। ঘষাঘষিতে মসৃণ ঝকঝকে থামটার গায়ে আঁচড় পড়ে গেছিল। এ ছাড়া হাওয়া বার করে দেবার ভাল্‌ভেও লিক দেখা দিয়েছিল। ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো ভাল্‌ভ সিট ও ভাল্‌ভ ককের ফাঁক দিয়ে প্রচণ্ড চাপের হাওয়া নিঃসাড়ে

বেরিয়ে যায়, একথাটাও মোহনকে জানিয়েছিল একজন মেট। সে বলেছিল, "আচ্ছা দেখছি।"

যদি দেখত! গিরি ডান পায়ের কাটা উরুর দিকে চোখ নামাল। মোহন চোখ সরিয়ে নিল কেন?

ইউনিভার্সালে যারা মাল সরবরাহ করে তাদের সঙ্গে ওর কমিশনের বন্দোবস্ত আছে, এ-রকম একটা কথা সে ফিটার-মেকানিকদের মহলে শুনেছিল। প্রকাশ মেহরাও নাকি তার ভাগ পায়। মোহন কী বলবে— "নীচস্থ বুধ তৃতীয়ে ছিল" বা "রাহু সাড়ে বাইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থেকে সোজা তাকিয়ে আছে!"

কৌটো থেকে তামাক বার করে ও তালুতে চটকাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে অধৈর্য, বিরক্ত এটা বোঝা যায়। গিরির মনে হল ওগুলো বার করে দেবার জন্যই সে এসেছে।

"ছেলেটার কার্ডিয়াক রিউম্যাটিসম। ডাক্তারের কাছ থেকেই এখানে আসছি। কার্ডিয়োগ্রাম করে ধরা পড়েছে। মেয়েটার অ্যামিবিক কোলাইটিসের চিকিৎসা চলছিল, তারপর বলল অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ইউরিন টেস্ট করে এখন বিকোলাইয়ের জার্ম পাওয়া গেছে! রমুকে পনেরো দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, ভাত খাওয়া বন্ধ, চান করা বন্ধ, মাটিতে শোয়া কোনওদিনই চলবে না, বৃষ্টিতে ভিজতে পারবে না।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে মোহন এত নির্লিপ্তভাবে সিগারেট পাকাচ্ছে, তার মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ, অবশ্যই নিজের ভাগ্যের প্রতি, ধিকিধিকি জ্বলছে। গিরি দুঃখ বোধ কবল রমুর জন্য। ছটফটে তেরো বছরের ছেলেটা পনেরো দিন বিছানায় থাকবে কী করে! সে নিজে সাড়ে চার মাস বিছানায় ছিল। গোছ থেকে গ্যাংগ্রিন ধরা পা কাটাতে উরু পর্যন্ত বাদ দিতে হয়েছে। তখন বয়স ছিল তিরিশ আব রমুর তেবো। অঙ্গ না হারিয়ে চৌকো একটা প্রায় ৩০ বর্গফুট এলাকায় বন্দি থাকার অসহনীয়তা কিছুটা সে আন্দাজ কবতে পারে।

"ভাবলে কষ্ট হয়।"

"রমুর জন্য?"

মোহন ফিকে হাসল। সে যেন প্রত্যাশাই করছিল রমুর দুঃখেই গিরি এ-কথা বলবে। একটা অস্পষ্ট অভিমান ওর ঠোঁটে চিবুকে নড়াচড়া করে পালাবার মুহূর্তে গিরির নজরে ধরা পড়ে গেল।

"তোর জন্যই।"

"কেন?"

"বউদির সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে?"

"অসম্ভব।"

গিরি মোহনের বউকে শেষবার দেখেছে হাসপাতালে। রক্তাল্পতায় ভোগা, হাড় আর চামড়া সর্বস্ব, খিটখিটে, অশিক্ষিত স্ত্রীলোক। গিরি প্রথম যখন মোহনের বাড়িতে যায়, তখন রমু জন্মায়নি, বড়মেয়ে ডলি তিন-চার মাসের। আলমারির মাথার উপর থেকে দিশি মদের বোতলটা নামিয়ে মোহন অপ্রতিভ চোখে তাকিয়েই সেটা দেয়ালে ছুড়ে মাবল। কাচ ছড়িয়ে পড়ল। ওতে এক ফোঁটা মদও নেই। তিন-চার পা এগিয়েই বউয়ের গালে প্রচণ্ড চড় কষাল।

বাধা দেবার সময় পাওয়া গেল না। গালে হাত দিয়ে, চোখ দুটোকে ঠেলে বার করে এনে মোহনের বউ চিৎকার করেছিল, "মারলে, মারলে, বাইরের লোকের সামনে বউয়ের গায়ে হাত তুললে?... বে-এ-এশ করব, আবার আনো নর্দমায় ফেলে দোব।"

কাছের এক বস্তিতে খাটিয়ার উপর বসে চোলাই খেতে খেতে মোহন বলেছিল, "জীবনটা নষ্ট করে দিল এই মাগি, তুই আর যাই করিস, বিয়েতে যাসনি। পুরুষমানুষের মন মেজাজ বোঝার ক্ষমতা খুব কম মেয়েরই আছে। ওদের ধারণা পুরুষরা বুঝি শুধু শরীরের ওই একটা জায়গাই চায়।"

মোহন এ-রকম ভাবে সেদিনও খেদভরে মাথাটা নাড়ছিল।

"অসম্ভব কেন? বছর কুড়ি তো কাটিয়েছিস। বাকিটাও কেটে যাবে।"

মোহন দ্রুত টান দিচ্ছে সিগারেটে।

"বাকিটাকে আমি আর নষ্ট করব না। আমি ঠিক করে ফেলেছি নষ্ট করার কোনও মানে হয় না, যুক্তি নেই। এবার আমি নিজের কিছু করছি।...আচ্ছা, এক কাপ চা করতে রুনু এত সময় নিচ্ছে কেন! জনতা জ্বেলে করলেই তো হয়।"

মোহন খাট থেকে নেমে ঘরের বাইরে যাচ্ছে, রুনু দু' কাপ চা হাতে ঢুকল।

"আজ মুরগি রাঁধছে রুনু, খেয়ে যা।"

"বটে, কোথা থেকে কিনলি?"

"আমি নয়, অম্বর কিনে আনবে মাঠ থেকে ফেরার পথে।"

প্রথম চুমুক দেওয়ার পর কাপ নামিয়ে মোহন বলল, "বড্ড চিনি দিয়েছ, একটু লিকার এনে দাও।"

মোহন এবার তাকাল না রুনুর পিছনে। গিরি ভেবে রেখেছিল মোহন তাকাবে এবং ভ্রূকুটি করে সে বিরক্তি প্রকাশ করবে।

"অম্বর খেলে কেমন? অনেকদিন আর মাঠের খোঁজ খবর রাখি না।"

"আমি দেখিনি কখনও, শুনেছি নাম হয়েছে।"

মোহন যেন কিছু একটা বলতে চায়, ছেলেমেয়ের অসুখের কথাই শুধু জানাতে এসেছে মনে হয় না। গিরি আন্দাজ করার চেষ্টায় বলল, "হাসপাতালে আমাকে দেখতে বউদি একদিন একা এসেছিল, তুই তো তা জানিস?"

"জানি, অনেক পরে আমায় বলেছিল।"

"আমার খুব ভাল লেগেছিল। দুটো কমলালেবুও হাতে করে এনেছিল।"

রুনু ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে গিরি বলল, "বউদির হাসপাতালে গিয়ে আমাকে দেখাব কথাটা বলছিলুম। তুমিও তো তখন ছিলে।"

"সেই আমি প্রথম দেখলাম। তোমাব কপালে বুকে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন।"

মোহন যেন অস্থির হচ্ছে। সিগারেটের মতো চা-টাও দ্রুত শেষ কবে, কাপটা এগিয়ে দিল রুনুব দিকে। "কী রাঁধবে, রোস্ট?'

"ওরে বাবা, ঘি পাব কোথায়?"

"ঠিক আছে, রোস্টই হোক। ঘি-ফি সব এসে যাবে। ফ্রায়েড রাইসও তা হলে। কী কী আনতে হবে লিস্টি করে দাও।"

রুনু বিব্রত চোখে গিরির দিকে তাকাল। গিবি মাথা হেলাল।

"তা হলে তো চালও আনতে হবে।"

"নিশ্চয়ই। চটপট লিখে দাও। আজ এখানেই চারটি খেয়ে যাব।"

রুনু বেরিয়ে যেতে মোহন আবার তামাক বাব করল। মাথা নিচু কবে মন দিয়ে চটকাচ্ছে। গিবি অপেক্ষা করতে লাগল।

"একটা মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে।"

মৃদু ফিসফিস স্বরে মোহন বলল, 'ভাব' শব্দটা ওব মুখে বেমানান। 'পটিয়েছি' বললে গিরি এতটা অস্বস্তি বোধ করত না। মেয়েটি কে, কীভাবে, কবে. কত বয়স, কী কবে নানাবিধ কৌতূহলের মধ্যে গিরি বাছাবাছি কবে চলল।

"ঠিক কবেছি আমরা দু'জন একসঙ্গে থাকব। একসঙ্গে মানে, ওকে একটা এই রকম ফ্ল্যাটে রাখব, আমি মাঝে মাঝে এসে থাকব। ফ্ল্যাটের অ্যাডভান্স করেই তোর কাছে আসছি।

"ডাক্তারের কাছ থেকে নয়?"

"প্রথমে ডাক্তারের কাছে তারপর বাড়িওলা হয়ে আসছি। ফ্ল্যাটটা এই পাড়াতেই, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ঠিক ওপারে বনমালী সরকার লেনের একটু ভিতরে। তোর বারান্দা থেকে দেখা যাবে না।"

গিরি হঠাৎ কৌতূহল ও উত্তেজনার প্রকোপ অনুভব করতে শুরু করল। মোহনকে এত আন্তরিক কখনও সে দেখেনি।

"কী করে ভাব হল?"

"আমার ফিটারের মেয়ে। প্রাইভেটে গত বছর স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। আমিই খরচ করেছি। বয়স হয়েছে কিন্তু বোঝা যায় না, ম্যালনিউট্রিশন। সতেরো বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মর্নিং-এ প্রি-ইউতে ভরতি করালাম, পড়ুক।"

মর্নিং-এ কেন, ডে-তে দিতে পারত। নাকি ছোকরাদের সঙ্গে পড়াবার ভরসা পাচ্ছে না। মোহনের

বয়স এখন কত হবে, আটচল্লিশ-সাতচল্লিশ। দেখায় প্রায় ষাটের মতো। বছর দুয়েকের মধ্যে শরীরটা হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। গিরি ওর থেকে বছর তিনেকের ছোট।

"লোকটার চার মেয়ে। শুধু বড়টারই বিয়ে দিতে পেরেছে। আর তিনটের পারবে না। হাঁপানিতে শেষ হয়ে এসেছে। মিস্ত্রি হিসেবে খুবই ভাল। ওকে বলেছি বুলিকে হোস্টেলে রেখে পড়াব।"

ফর্দ হাতে রুনু ঘরে ঢুকতেই মোহন উঠে দাঁড়াল।

"পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

মোহন চাহনিতে সাবধান করে দিল গিরিকে। আধ ইঞ্চি মাথা হেলাল গিরি। মিনিট দুয়েক পরে রাস্তায় স্কুটার স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনে সে উঠে বারান্দায় এল। মোহনকে বাঁ দিকে বেঁকে যেতে দেখল। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ওপারে বনমালী সরকার লেনের বাড়িগুলোর দিকে সে তাকাল। রাস্তাটা তিরিশ গজ পরেই বাঁক নিয়েছে। তারপর কোনও একটা বাড়িতে সেই ফ্ল্যাটটা।

গিরি সন্তর্পণে চেয়ারে বসল। একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে সে আপন মনে বলল, "মোহনের এতটা বাড়াবাড়ি করার কী দরকার।"

মোহন একদিন ছুটির পর হাতে তরল সাবান মাখতে মাখতে বলেছিল, "বাড়ি ফিরে কী করবি?"

"কী আবার করব। গল্পের সেই বই পড়ব নয়তো সিনেমায় যাব।"

"তা হলে চল, এক জায়গায় নিয়ে যাব তোকে আজ।"

"আগে বল কোথায়।"

"চলই না। ভাল লাগবে তোর।"

কলে হাত ধুয়ে, হাতটা ঝাড়তে ঝাড়তে মোহন বলেছিল, "আমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে। প্রাইভেট নার্স।"

মোহনের হাসিটা বিরাট নিঃশব্দ এবং অর্থবহ ছিল।

"মাঝে মাঝে যাই।"

একতলা টালির চালের বাড়ি। বাইরের দরজায় সাদা অক্ষরে লেখা, "মিসেস এস মজুমদার। প্রাইভেট নার্স।" দরজার পাশে সরু রক। জায়গাটা আধো অন্ধকার। গেঞ্জি গায়ে একটা লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। মোহন আঙুলের গাঁটে ঠুকে টোকা দেবার মিনিট খানেক পর দরজা খুলে দাঁড়াল একটি স্ত্রীলোক। ঘরের আলো ওর পিছনে, মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। পরনে কালো পাড় সাদা বুটিদার তাঁতের শাড়ি।

"আরে, মোহনবাবু, কী ভাগ্যি, আসুন ভেতরে।"

পাশ দিয়ে সরে দাঁড়াতে গিরি ওকে সম্পূর্ণ দেখতে পেল। চল্লিশ ছুঁয়েছে বা সদ্য অতিক্রম করেছে। শ্যামলা রং, টিকোলো নাক, চোখে হালকা সুরমা, পাউডারের গুঁড়ো থুতনির কাছে। স্থূল কোমর এবং তলপেট চর্বিতে ঝুলে পড়েছে, বুকের উপর মাংসের স্তূপকে জমাট করে রেখেছে ব্রেসিয়ার। কঠিন চাপের ফলে ব্লাউজের গলা উপচে ফুলে রয়েছে মাংস। গিরি অনাস্বাদিত উত্তেজনা বোধ করে ওকে দেখে।

"আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এলাম, আলাপ করিয়ে দিতে। মাঝে মাঝে ও আসবে।"

মিসেস মজুমদারের চাহনি গাঢ় হল, মাথা হেলিয়ে বললেন, "নিশ্চয়, এলে খুশি হব।"

"একা একদমই একা ছেলেটা। অত্যন্ত কুনো, জোর করেই ধরে আনলাম।"

"ভালই করেছেন। চা খাবেন?"

মিসেস মজুমদার ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের কোণের দিকে তাকালেন। একটা নীল পর্দা ঝুলিয়ে ঘরটার কিছুটা আলাদা করা। একটা টেবিল, তাতে সারি দিয়ে সাজানো বই। দেয়ালের দিকে মুখ করে একটি রোগা মেয়ে খোলা বইয়ের উপর ঝুঁকে। ওর পিঠ এবং ডান বাহুর অংশ মাত্র দেখতে পেল গিরি।

"রুনু, দু' কাপ চা করে দিতে পারবে?"

অনুরোধের স্বর, কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুত রুনুর উঠে যাওয়া থেকে বোঝা যায় ওটা আদেশ।

মোহন এবং মিসেস মজুমদারের হালকা এবং অবান্তর কথাবার্তার মধ্যে গিরি চুপ করে থাকে। ঘরটায় ভ্যাপসা গন্ধ। প্রতিটি আসবাব জীর্ণ এবং মলিন। হাস্যকর লাগছিল দেয়ালে ঝোলানো পশমে

বোনা একটি কাকাতুয়াকে। কাচটায় এত ধুলো যে কাকাতুয়াটাকে চিল মনে হচ্ছে। একটি বছর পাঁচ-ছ'য়ের ফ্রক পরা মেয়ে, চশমা পরা একটি লোকের কোলে সম্ভবত ছবি তোলবার লজ্জাতেই বা কোলে ওঠার জন্যই বুকে মুখ লুকোতে চাইছে। গিরির মনে হয়েছিল এটি ওই রুনু নামের মেয়েটি এবং লোকটি ওর বাবা।

রুনু চা আনল। নিস্পৃহ মুখে সে হাতে তুলে দিল। এবং চা খাওয়ার পর মিসেস মজুমদার হাতঘড়ি দেখে বললেন, "আমার একটা কল আছে, ন'টায় বেরোতে হবে কিন্তু।"

"ওহ্, তাই নাকি। একটা কথা বলার ছিল।" মোহন ইতস্তত করল।

"প্রাইভেট কথা?"

"একটু প্রাইভেট।"

"তা হলে ও ঘরে চলুন।"

একা বসে থাকতে থাকতে গিরির চোখ বারবার সেই নিথর পিঠটির ওপর গিয়ে পডছিল। মেরুদণ্ডে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রোহের রেশ। দুটি কাঁধ করুণা প্রত্যাশায় ঝুঁকে রয়েছে ভ্যাপসা জীর্ণ নীরব ঘবটার মধ্যে। মেয়েটিব পিঠ তাকে অসাড করে বেখেছিল।

প্রায় আধঘণ্টা পর মোহন ফিরে এল একাই। বাস্তায় বেবোবার সময় গিরি মুখ ফিবিয়ে দেখেছিল পিঠটা একই রকম রয়েছে। রকেব লোকটাও একই ভঙ্গিতে বসে। ফেবার পথে গিরি জিজ্ঞাসা করেছিল, "রুনুও কি -"

"হতে পারে।"

তিন

"কী হতে পাবে?"

গিরি চমকে পাশে তাকাল।

"বিড়বিড় করে কী বকছ?'

মুখ তুলে গিবি বিভ্রান্তের মতো রুনুব দিকে তাকিয়ে বলল, "বাতে ঘুম হযনি, ঘুমিযে পডেছিলাম। বিশ্রি একটা স্বপ্ন .. যাক গে। ক'টা বাজল অম্বব এসেছে?"

"না, তুমি কি পেঁয়াজ আদা ছাডিয়ে দেবে? আমি চানটা করে নিতে পাবি তা হলে।"

"এখানেই ছুরিটা আর ওগুলো দিয়ে যাও।"

তাবপর মোহনকে আব জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সংকোচে নয়। যদি বলে হ্যাঁ মায়েব মতো রুনুও । অনেক সময়ে সে বড়াই করে, বিশেষত মেয়েদের সম্পর্কে, মিথ্যাও বলে। গিবি ভয়ে জিজ্ঞাসা করেনি, পাছে বিষিয়ে ওঠে তার মন। ওই রকম একতলা বাড়িতে, প্রাচীন আসবাবের মধ্যে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবে পিঠ ফিবিয়ে বসে থাকা একটি রোগা মেয়ে তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল।

অভ্যস্ত দক্ষহাতে আদার খোসা ছাডাতে ছাড়াতে গিরি রেলিংয়ের মধ্য দিয়ে সামনের বাড়ির দোতলার ঘরে তাকাল। ঠিক এই সময়ই ফ্রক-পরা মেয়েটি রাইফেল বগলে ধবে সামনে তাক করে। মিনিট পনেরো মূর্তিব মতো দাঁড়িয়ে ড্রাই প্র্যাকটিস করে যায়। অসাধারণ ধৈর্য। বহুদিন গিরি ওব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, চেয়ারে বসেই একটা ক্রাচ তুলে রাইফেলের মতো ধবে থেকেছে। কিছু পরেই হাত ভাব হয়ে আসে কেঁপে ওঠে। আড়চোখে দেখত মেয়েটি তখনও ধরে আছে কি না। তারপর লজ্জা পেত। ক্রাচের তলাটা ভারী লোহায় মোড়া। চলার সময় শব্দ হত। নীচের ফ্ল্যাটের জাঁদরেল গিন্নি একদিন রুনুকে ডেকে রবার লাগিয়ে নিতে পরামর্শ দেয়। রুনুই অফিসের স্টিলের চেয়ারেব পায়া থেকে দুটো ববাব খুলে নিয়ে আসে।

"এ-ভাবে নিয়ে আসাটা কিন্তু চুরিই।"

"ভারী তো চার আনা দামের জিনিস।"

খুব হালকা চালে বললেও রুনুর মুখ অপ্রতিভ হয়ে গেছল। গিরি বেদনা বোধ করেছিল উদ্দীপ্ত

মুখটি হঠাৎ নিভিয়ে দেওয়াব জন্য। রবারের টুপি দুটো ক্রাচে লাগিয়ে ঘরে বার কয়েক চলাফেরা করল। রুনু কান পেতে শুনছে শব্দ হচ্ছে নাকি। একপায়ের উপর শরীরের ভর রেখে হালকাভাবে ক্রাচ ফেলে গিবি ঘোরাফেরা করতে করতে দেখল রুনুর মুখে স্বস্তি ফুটে উঠেছে।

"বড্ড ঝগড়ুটে। নিজেদেব সুবিধেটুকু ছাড়া আর কিছু বোঝে না। খটখট শব্দে নাকি বালি খসে পড়ে।"

"বাড়িটা অবশ্য পুবনো।"

"যত পুরনোই হোক, তাই বলে বালি খসে পড়াব মতো অবস্থা হয়নি। ওপরের ছেলেগুলো কম শব্দ করে? কই, আমরা তো বলতে যাই না।"

"চলো একবার বেরিয়ে ট্রায়াল দিয়ে আসি।"

"খেয়েদেয়ে বেবোব।"

"না, না, আজ বাইরেই খাব। অনেকদিন কচুরি খাইনি, খাওয়াবে?"

রুনু অত্যন্ত খুশি হল। গিবি তাব কোনও ইচ্ছা বা সুখেব কথা সহজে বলে না। তা হলে রুনুকে আর্থিক চাপেব মধ্যে পড়তে হবে তো বটেই, তা ছাড়া ওব কাছ থেকে কিছু চাওয়াব কথা ভাবলেই রুনুব বাবাকে তাব মনে পড়ে।

বহুদিন আগে তখনও ওবা একসঙ্গে বসবাস শুরু কবেনি, তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে গিরি বলেছিল, "তোমাদেব বাড়িতে যতবার গেছি, বকে একটা লোককে বসে থাকতে দেখেছি। বরাবর একই ভঙ্গিতে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে, উপবেব দিকে তাকিয়ে।"

রুনু ইতস্তত কবে বলে, "আমাব বাবা। ব্যাঙ্কে চাকবি করতেন। তাবপব একটা ব্যাপাবে কিছুদিন জেলে ছিলেন।"

গিবি এরপব বহুদিন ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে, কৌতূহলবশে রুনুকে তাব বাবাব কথা যদি কোনওভাবে জিজ্ঞাসা করে ফেলে। রুনুও সাবধানে এড়িয়ে চলে সেই সব বিষয়, যা তাব বাবাকে টেনে আনতে পারে।

রুনু কখনও তাব সামনে শাড়ি বদলায় না। কিন্তু সেদিন সায়া পবেই সে আলমাবি থেকে ঘন বেগুনি রঙেব সিল্কেব শাড়িটা বাব কবল। ওই কাপড়েব ব্লাউজটাও বাব কবে, কী ভেবে আবাব রেখে দিল।

'রাখলে কেন।'

"পবব?'

গিবি মাথা হেলাল। রুনু নিশ্চয় এখন ব্রেসিয়ার খুলবে না। স্নান এবং শয়ন ছাড়া ওটা সে ত্যাগ করে না। সেই মুহূর্তে গিবি, স্তনদ্বয় দেখাব তীব্র ইচ্ছায় বশীভূত হয়ে পড়েছিল। দূর থেকে সে কখনও দেখেনি কেন না খাটের চৌহদ্দির বাইরে রুনু কখনও উন্মুক্ত থাকেনি।

হয়তো রুনু বুঝতে পেরেছিল। ব্লাউজ খোলাব পব কনুই তুলে কাঁধেব ওপর দিয়ে হাত দুটি পিঠের দিকে এনে হুকটা খোলাব চেষ্টা কবতে কবতে বলল, "ঘামে ভেজা পরতে বিশ্রী লাগে।"

"আমি খুলে দি।"

তিন গজ দূরে রুনু। কোনও রকম খুকিপনা না কবেই পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। এক পায়ে হালকা তিনটে লাফ দিয়ে গিবি ওব কাছে পৌঁছল। হুকটা খুলে স্ট্র্যাপ দুটো কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। মসৃণভাবে ব্রেসিয়ারটা ঝবে পড়ল মেঝেয়। কাঁধে হাত রেখে ঝুঁকে সে তাকিয়ে রইল। এখনও দৃঢ়, বৃত্তটা পনেরো বছর আগের থেকেও ভবে উঠেছে। গিবি চুমু খেতে শুরু কবল, গলায়, ঘাড়ে বাহুতে, বুকে। রুনু চোখ বন্ধ কবে অস্ফুট শব্দ করল। দু'হাতে বেড় দিয়ে গিরি ওকে নিজের দেহে চেপে ধরল।

"ফিবে এসে।"

"না এখুনি।"

"আলো নেভাও।"

"না।"

হঠাৎ গিবি ওকে পাঁজাকোলা তুলে নিলে আগেব মতো। সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেছল তার আর একটা পা নেই। খাটেব দিকে হেঁটে যেতে গিয়ে সে টলে পড়ল। প্রচণ্ড শব্দে দু'জনে মেঝেয় আছড়ে পড়তেই কাতরে উঠল রুনু।

অপ্রতিভ গিরি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে খাটের গায়ে হেলানো ক্রাচের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, "আশ্চর্য আমি ভুলেই গেছলুম।"

রুনুর কনুইটা ফুলে উঠেছিল। গিরিকে একাই বেরোতে হয়েছিল বরফ কেনার জন্য।

স্কুটারের শব্দ শুনে গিরি রেলিংয়ের মধ্য দিয়ে রাস্তায় তাকাল। দেখতে পেল না। খোসা ছাড়ানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আঙুল শুঁকল। সাবান দিয়ে পেঁয়াজের গন্ধটা তোলা দরকার। উঠে দাঁড়াল সে।

মোহন থলি থেকে জিনিসগুলো টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, "রুনু কোথায়? মাংস এসেছে?"

"রুনু চান করছে। অম্বর এখনও ফেরেনি।"

গিরি দেখল কাগজে মোড়া একটা বোতল আর তেলেভাজার ঠোঙা মোহন বার করছে।

"এটার জন্যই একটু দেরি হয়ে গেল। তোদের পাড়ায় একটা ভাল দোকান নেই। জল আর দুটো গ্লাস নিয়ায়, রাম এনেছি।"

পনেরো বছর গিরি কোনওরকম মদই খায়নি। স্বাদ কেমন, তা প্রায় ভুলেই গেছে। খাওয়ার ইচ্ছা বা দবকারও বোধ করেনি। মাথা নাড়ল সে।

"খাবি না! কেন?"

"দরকার কী, বেশ তো চলে যাচ্ছে।"

মোহন আর কিছু না বলে. প্যাঁচ কাটার জন্য ছিপিটা মোচড়াতে লাগল।

অম্বরকে দবজায় দেখা গেল। হাতেব থলিটা ভাবী। ভিতরে এসে মোহনের হাতে বোতলটার দিকে বার কয়েক তাকাল। গিরি অস্বস্তি বোধ করে বলল, "আমার বন্ধু মোহন। অনেক দিনের বন্ধু। ও আজ এখানে খাবে।"

ইচ্ছে করেই বলার ভঙ্গি এবং স্বর গম্ভীর করল যাতে অম্বর বোঝে, এখানে মোহনের গুরুত্ব তার থেকেও বেশি।

"বউদি কোথায়?"

"কলঘরে।"

কুঁজোটা ঘরের টেবিলের উপর। মেঝেয় রাখলে গিরির অসুবিধা হয় নিচু হয়ে জল গড়াতে। মোহন বোতল থেকে গ্লাসে ঢালছে। বহু বছর পর গন্ধটা গিরির নাকে এল।

"দু'জনে খাব বলে বড় বোতল কিনলুম।"

জল ঢেলে গ্লাসটাকে প্রায় ভরিয়ে, মোহন সেটা তুলে ধরল।

ঠোঙা থেকে একটা আলুর চপ তুলে গিরি সেটা উঁচু করে ধরে বলল, "তোর নতুন জীবনের সুখ কামনা করে।"

চপটা মুখে পুরল গিরি। গ্লাসটা ধরে থেকে মোহন অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

"রুনুর স্বাস্থ্য কামনা করে।"

এক চুমুকে মোহন গ্লাসের কফি রংটা অর্ধেক নামিয়ে আনল। গিরির মনে হল তরল উত্তাপ তার নিজেরই কণ্ঠনালি থেকে পাকস্থলীর দিকে চুঁইয়ে নামছে। বাসি গুড়ের স্বাদে মুখ ভরে গেছে। গুলিয়ে উঠল তার পেট।

"রুনু খুব ভাল মেয়ে, বুলিও। তোর সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দেব, দেখবি লাখে একটা মেলে কি না সন্দেহ। ছ'মাস হয়ে গেল, এখনও আমি ওকে টাচ করিনি। চুমু পর্যন্ত খাইনি।"

মিথ্যে বলছে। নিজের চারিত্রিক সততা আবিষ্কার করার কৃতিত্ব দেখাতে নয়, দুষ্প্রাপ্য প্রণয় সংগ্রহের সৌভাগ্য জাহির করতেই বানিয়ে বলছে। গিরি আর একটা আলুর চপ ঠোঙা থেকে বেছে নিয়ে বলল, "টাচ না করে কি সুখ পেয়েছিস?"

মোহনের মুখে রহস্যময়তা ছড়িয়ে পড়ল মুচকি হাসি মারফত। মাথা দুলিয়ে বলল, "আমাকে ভীষণ বিশ্বাস করে।"

আমিও করেছিলাম। গিরি ওর মাথা দোলানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে করল, লিফটে রাখা লরিটার কথা। তার তলায় দাঁড়িয়ে সে পরীক্ষা করছিল কিং পিন ও টাই রডের মধ্যবর্তী ক্ষয়ে আলগা হয়ে যাওয়া

কবজির জোড়গুলো। ড্রাইভারের সিটে বসে তার নির্দেশে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল একজন মেট। সেই সময়ই লরি সমতে লিফটটা নেমে আসে আচমকা। ইঞ্জিনের তলার লুব্রিকেটিং অয়েলের গামলাটা প্রথমে মাথায় আঘাত করে। গিরি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। তখন লিফটটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। কে একজন চিৎকার করে উঠেছিল, "বিশ্বাসবাবু বিশ্বাসবাবু, শুয়ে পড়ুন।"

গিরি তা না করে বেরিয়ে আসতে গেছল তলা থেকে। ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু চিন্তা করার ভগ্নাংশ সেকেন্ড সময়ও তখন ছিল না। হয়তো মানুষে-জানোয়ারে কোনও পার্থক্য থাকে না, প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারে। সে পালাতে গেল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছল।

এই লোকটা পঞ্চাশের কাছাকাছি, অর্ধেক টাকপড়া, চুলে কলপ দেওয়া, রোগা লোকটা পালাচ্ছে, জীবনের অর্ধেক অংশ ফেলে রেখে। গিরির হঠাৎ মনে হল, ওকে কি ঈর্ষা করছি?

মোহন গ্লাস খালি করে আবার বোতল থেকে ঢালছে। তখন তাজা, ঝকঝকে রুনু সাবানের গন্ধ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ভ্রূ কুঞ্চিত করল। গিরির হাতে গ্লাস নেই দেখে আশ্বস্ত হল। চুল থেকেও মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে, শ্যাম্পুর। চিরুনি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সে ঠোঙাটা ফাঁক করে দেখল।

"নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আমি খাব না, গিরি তুই?"

মাথা নাড়ল গিরি। শ্যাম্পু নিয়ে যখন কলঘরে যায়, তখন অম্বর বাড়ির বাইরে। ওকে না বলেই শ্যাম্পু ব্যবহার করেছে। হয়তো তোয়ালেও ব্যবহার করে। গত পনেরো বছর রুনুকে চুল নিয়ে শৌখিন হতে দেখা যায়নি।

রুনু ঠোঙাটা তুলে নিল।

"রান্নাঘরে যা গরম। আজ সকাল থেকে গুমোট শুরু হয়েছে।... বিরিয়ানিটা তুমি করবে?"

"না, তুমিই করো। অম্বর তো আছে হেল্প করার জন্য।"

গিরি তাকান রুনুর মুখের দিকে। ছোট রান্নাঘর। ঘেঁষাঘেষি করে ওরা বসবে। রুনু নিচু টুলটায়, অম্বর হাতকাটা সাদা গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে চৌকাঠের কাছে উবু হয়ে।

"ভাল কথা, ঠাকুরপো তিনটে থিয়েটারের টিকিট এনেছে, আজকেরই। ওদের ক্লাবের একটা ছেলে অভিনয় করে, মুক্তাঙ্গনে আজ তাদের প্লে।"

অম্বর নয় ঠাকুরপো! গিরির কানে ধরা পড়ল। আগে কখনও ঠাকুরপো বলেনি। সন্দেহ এড়াবার জন্যই এটা বলা.

"আমি যাব না। থিয়েটার আমার ভাল লাগে না।"

"বাঃ টিকিট তা হলে নষ্ট হবে?"

"তোমরা দু'জনে যাও।"

"তা কী করে হয়।"

গিরির মনে হল রুনুর মুখে চাপা উত্তেজনা, সারা সন্ধ্যা পাশাপাশি দু'জন কাটাতে, অন্ধকার অডিটোরিয়ামে দু'জনে মুঠো জড়াজড়ি করতে পারবে।

"না হবার কী আছে? একটা টিকিট বিক্রি করে দিলেই হবে।"

"টিকিট নয়, পাস।"

"কাউকে দিয়ে দেবে। নেবার অনেক লোক পাবে।"

গিরি এক দৃষ্টে রুনুর মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখে হতাশা ছায়া ফেলেছে। মুখ নামিয়ে রুনু অন্যমনস্কের মতো চিরুনি দিয়ে চুলে আঁচড় টানল। গিরির বুকের মধ্যে একদলা বাতাস চাপ দিয়ে তাকে বিষণ্ণ করছে।

"ক'দিন ধরে ভাল ঘুম হচ্ছে না, শরীরটা কেমন লাগছে। ভাবছি সন্ধেবেলায় ঘুমোব।"

মোহন চুপ করে শুনে যাচ্ছে— আর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।

"মুক্তাঙ্গনটা সাউথে না? রাসবিহারির মোড়ে তো?"

গিরি মাথা নাড়ল।

কথা না বলে রুনু বেরিয়ে গেল। দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু নতুন কোনও জায়গায় রুনুর সঙ্গে যেতে তার অস্বস্তি হয়, বিশেষ করে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকতে হলে। একবার মাত্র সে রুনুর অফিসে গিয়েছিল।

সকলের নজর প্রথমেই ক্রাচের উপর, তারপর রুনুর মুখে পড়ে। প্রত্যেকের চোখে সে একটি কথাই ফুটে উঠতে দেখেছিল: এমন সুশ্রী মেয়ের কিনা এমন খোঁড়া স্বামী, বেচারা। হয় তার জন্য, নয়তো রুনুর জন্য লোকে করুণা বোধ করে। বাড়ির এক মাইল বৃত্তের মধ্যে কেউ এখন আর তাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় না। সকলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

"বুলি ভীষণ থিয়েটার দেখতে ভালবাসে। একসঙ্গে বার চারেক আমরা দেখেছি।"

"ওর বয়স কত?"

"বেশি নয়, ডলির থেকে বছর চারেকের বড়।"

"তোর তো প্রায় মেয়ের বয়সি।"

মোহন যেন সুখবোধ করল কথাটা শুনে। খালি গ্লাসটা দু'হাতের তেলোয় ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "বয়সটা কাঁচাই তবে মেনটালি যথেষ্ট ম্যাচিওরড। আমাকে খুব খরচ করতে দেয় না। বাড়ির খোঁজখবর, তোর বউদির কথা, এ-সব জিজ্ঞাসা করে।"

"তুই ওর বাবাকে কত টাকা দিস?"

ওর ত্রস্ত সতর্ক হয়ে ওঠা দেখে গিরি মনে মনে হাসল।

"তার মানে? বুলি সে টাইপের মেয়েই নয়। টাকা কামাবার ধান্দা একদমই নেই। ওর বাবাও খুব সরল, সিম্পল মানুষ।"

"তা হলে তোদের সম্পর্কটা কী দাঁড়াচ্ছে? বুলি চিরকাল এইভাবে বসবাস মেনে নেবে?"

মোহন কুঁজো হয়ে ঝুঁকে গলাটা লম্বা করে বলল, "তোরাও তো সেইভাবে বসবাস কচ্ছিস আজ প্রায় ষোলো বছর। অবশ্য অ্যাডভানটেজ তোর রয়েছে, পেছনে বউ ছেলেমেয়ে এ-সব নেই।"

গিরি চুপ করে শুধু একদৃষ্টে লাল আঁচিলটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"রুনু আর তুই, তাই বলে কি সুখী নোস? খোঁড়া লোককে নিয়ে রুনু পনেরো বছর কাটাল, তুই কি ভাবিস অসুখী হলে ও থাকত? কবে লোক জুটিয়ে নিয়ে ভেগে পড়ত!

হাতটা তুলে প্রচণ্ড একটা চড় কষাল গিরি মনে মনে। পনেরো বছর ধরে অপেক্ষা করে আসছে, পনেরো বছর যথেষ্ট সময়। সব কিছুই ঘটতে পারে এমন অনুমানের, যে কোনও ধরনের সর্বনাশ সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পক্ষে প্রচুর সময় সে পেয়েছে। আর সেই ভাবনাটাই মোহন...

সে হাসল।

"কী কষ্ট করে রুনু যে তোকে..."

পুষছে। মোহন উচ্চারণ করতে পারল না শব্দটা কিন্তু ওটা হওয়া উচিত "সহ্য করছে।"

"...শ্রদ্ধা হয়। মেয়েমানুষ যে কীসে সুখী হয়, বোঝা বড় শক্ত। বুলিকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলুম।"

ডান দিকে ঝুঁকে, টেবিল থেকে বোতলটা তুলে নিল মোহন। "বড্ড তাড়াতাড়ি খাচ্ছি, মাসখানেক পর তো। বুলির জন্যই কমিয়ে দিয়েছি। ও পছন্দ করে না।"

গিরি ক্রমশ বিরক্ত বোধ করছে। একটি কুদর্শন অতীত আড়মোড়া ভেঙে পিট পিট করছে তার মাথার মধ্যে। রান্নাঘর, খাওয়ার টেবিল থেকে কথাবার্তার টুকরো ভেসে আসছে। নিচু স্বরে ট্রানজিস্টারে হিন্দি গান হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাশের ঘরে পায়ের শব্দ।

"তুই কি একদমই খাবি না?"

"না।"

মোহন গ্লাসটা মুখের কাছে ধরে যেন চিন্তায় ডুবে গেল। বোধহয় চাইছে, কৌতূহলে ছটফট করিয়ে অবশেষে ঘোষণা করবে ওর বুলির বক্তব্যটি। গিরি বাঁ পা ছড়িয়ে মালাইচাকিটা নাড়াতে লাগল হাত দিয়ে।

"রমু পনেরো দিন বিছানায় কী করে থাকবে। ভাবতে পারিস? দুরন্ত ছটফটে ছেলে নয়তো সিরিয়াস দিকে টার্ন নিতে পারে অসুখটা। এ-সব রোগে মারাও যায়।"

"তোর খরচ অনেক বাড়ল।"

"ডাক্তার যা বলল তাতে মনে হল খুব একটা খরচের ব্যাপার নয়।"

"চিকিৎসার খরচের কথা বলছি না। তোর নিজের সংসার, বুলিকে নিয়ে আর একটা সংসার। রোজগার কত তোর?"

"এ-কথাটা ও তুলেছিল। কারখানা আর গ্যারেজ থেকে যা পাই তাতে আরও দুটো সংসার মোটামুটি চালিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার পয়েন্টটা হচ্ছে টাকা খেটেখুটে আয় করা কী জন্য, সুখের জন্য নিশ্চয়?"

মোহনের গলা ক্রমশ চড়ে উঠছে। গিরির মনে হল, উত্তেজনাটা শুধু মদের কারণেই নয়। বহু বছর ধরে যে-সব জট ওকে ঘিরে রয়েছে তাই থেকে বেরোবার জন্য নিজেকে শানাচ্ছে আর ভাবছে এবার লণ্ডভণ্ড করে মুক্ত হবে। কিন্তু হওয়া যায় কি!

"টাকা আমি উড়িয়ে যাব, কিছু রাখব না। ওদের জন্য একটা বাড়ি করে দিয়ে যাব আর ব্যবসাটা, ব্যস।"

"বুলির কী হবে? তুই তো বুলির অনেক আগে মরবি, ও তখন করবে কী?"

মোহন বোধহয় এতটা দূর পর্যন্ত ভেবে দেখেনি। থতিয়ে গেল।

"তার এখন অনেক দেরি।"

"কত আর দেরি। বছর পনেরো-কুড়ি তুই বাঁচবি। তখন ওর বয়স কত হবে! দেখতে কেমন?"

মোহনকে আশ্বস্ত দেখাল। গ্লাসে নিশ্চিন্ত মনে চুমুক দিয়ে বলল, "বুলির একটা চোখ কানা। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না। ছোটবেলায় পক্স হয়েছিল। মুখে এখনও দাগ আছে, ও আর মিলোবে না।"

দালানে দু'জনের হালকা হাসি শোনা যাচ্ছে। মোহন দরজার দিকে তাকাল। কিছু দেখতে পাবে না। খাট থেকে রান্নাঘরের দিকটা দেখা যায় না। গিরি কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

"থাক থাক। আর অত সেবা করতে হবে না।... বারণ করছি না।"

"বড্ড ঘেমে গেছ।"

ঘেমে গেছে রুনু। সেবা করছে অম্বর। কীভাবে? ও কি তোয়ালে দিয়ে মুখ, গলা ঘাড় মুছিয়ে দিচ্ছে! গিরির ইচ্ছে করছে কোনও একটা ছুতোয় উঠে গিয়ে দেখে আসে। অম্বর যতক্ষণ ফ্ল্যাটে থাকে সে নিশ্চিন্ত বোধ করে না। রুনু যতক্ষণ বাইরে থাকে সে নানা নোংরা সন্দেহে ছটফট করে। তখন রুনুর আগের এবং এখনকার কথা, আচরণগুলো অন্য আর এক অর্থ পায়। একমাত্র সে আর রুনু যখন একা থাকে, তখনই এ-সব ভাবনা তার হয় না। কিন্তু কতক্ষণই বা। সব থেকে কষ্ট পায় যখন তার মনে হয় এই সব চিন্তার কোনওটাই অসম্ভব নয়, বেশির ভাগ লোকই রুনু সম্পর্কে এই রকমই ভাবতে পারে হয়তো, ভেবেও থাকে। সে নিজেও তাদের মতো ভাবছে।

"গিরি, এ-সব কথা কিন্তু রুনুকে বলিস না।"

"কেন, বললেই বা।"

"দরকার কী বলার। মেয়েরা এ-সব ব্যাপার খুব অপছন্দ করে। ওরা সব সময় স্ত্রীর পক্ষ নিয়েই বিচার করে তো।"

"রুনু তা করবে না। ও তোকে জানে।"

"জানুক, সে জানা দিয়ে মানুষকে বোঝা যায় না। ও জানে আমি মাতাল লম্পট। ওদের বাড়িতে যেতুম শুধু— ভাল কথা, ওকি তোর সেইটে জানে?"

গিরি সচকিত হল।

"কোনটে?"

"সেই যে একদিন দুপুরে তুই—"

মোহনের ধূর্ত চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারল না গিরি। অবধারিত দৃষ্টি আঁচিলে সরে গেল। ওখানে একটা গভীর গর্ত নিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে শুকিয়ে ডেলা হয়ে রয়েছে যেন। ভাবল বলে— হ্যাঁ, রুনু জানে।

"আমি জানি, তুই ওকে সেটা বলতে পারবি না।"

গিরির মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। মোহনের এই নিশ্চিত স্বরটা তার পছন্দ হচ্ছে না। অন্যে কি পারবে বা পারবে না, সেটা ওর ইচ্ছানুসারেই যেন ঠিক হয়ে যাবে। তার সঙ্গে রুনুর বোঝাপড়া কতদূর পর্যন্ত হতে পারে, এটা যেন ও মেপেই রেখেছে।

কিন্তু মোহনের মাপে ভুল নেই। ও ঠিকই অনুমান করেছে গিরি সে-কথাটা বলতে পারেনি। বাকি জীবনটাকে চেটেপুটে নিয়ে মোটামুটি সেটাকে সম্পূর্ণ করতে ব্যগ্র এই লোকটা তাকে একটা পর্যায়ে ফেলে রেখেছে, অক্ষম কাপুরুষদেব পর্যায়ে।

"আমি সে-কথা রুনুকে বলেছি।"

"বলতে পারলি!"

"কেন পারব না। লুকিয়ে কী লাভ।"

"সত্যি! আমি কিন্তু রুনুকে জিজ্ঞাসা করব।"

"করিস।"

করবে না। জিজ্ঞাসা করতে সাহস দরকার। ক্রাচে ভর দিয়ে গিরি উঠে দাঁড়াল।

"আমি চানটা করে আসি, তুই একটু বোস।"

শব্দ না কবে গিরি ঘর থেকে বেবোল। ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় সে দেখতে চায়।

রুনু রান্নাঘরে টুলে বসে। চুল পিঠে ছড়ানো। এত গরমেও মুখটি তাজা, শ্রান্তির ছাপ নেই। ঠোঁট চেপে বয়েছে। এইমাত্র যেন একটা হাসি সম্পূর্ণ করল। খাওয়ার টেবিলে কনুইয়ে হেলান দিয়ে অম্বর চেযাবে। টেবিলে একটা রঙিন হাতপাখা। নিশ্চয়ই ওটা তারই। গায়ে গেঞ্জি।

টেবিলেব তলায় ওর নগ্ন বাম হাঁটুর উপর ডান পায়ের গোছ দেখতে পেল গিরি। খেলার খাটো প্যান্টটাই পরে আছে। তাকে দেখেই অম্বর ডান পা নামিয়ে নিল।

গিরি সেটা লক্ষের মধ্যে না এনে, রুনুকে শুধু বলল, "চান করতে যাচ্ছি।"

ছোট্ট কলঘর। চৌবাচ্চাটা ফুট তিনেক উঁচু। তার গায়ে দেয়ালে ফুট চারেক উঁচুতে জলেব কলটা বেবিয়ে। বাঁশেব ডোঙা লাগিয়ে কল থেকে চৌবাচ্চায় জল আসে। প্লাস্টিকের বালতিতে সাবান-জলে ডোবানো কিছু কাপড। গিরি আঙুল দিয়ে তুলে দেখল রুনুর ব্লাউজ সায়ার নীচে অম্বরের মোজা রুমাল গেঞ্জি।

গিরি আবাব মুখেব মধ্যে বাসি গুড়ের স্বাদ অনুভব করল। চৌবাচ্চার পাডে বসে, দুটো ক্রাচে বগলের ভার রেখে সে বালতিটার দিকে তাকিয়ে থাকল। কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান অম্বরের। রুনু যেন ক্রমশ অম্ববকেও তাব অন্ধকাবেব গণ্ডির মধ্যে টেনে নিচ্ছে।

বাগ হচ্ছে না তাব। কোনও ব্যাপারে কখনও সে রুনুর সঙ্গে রাগারাগি করেনি। বরং সে অবাক হয়েছে, দিনে দিনে অভিভূত হয়েছে ওর আন্তরিকতায়, একটা অকেজো মানুষকে মুখ বুজে সহ্য করায়। এক সময় সে নিজেই ভেবেছিল, রুনু যদি কিছু করে, ও যদি চায় কারুর সঙ্গে...

সাত-আটজনেব কথা সে ভেবেছিল। অফিসের সহকর্মী, বিশেয করে দত্তগুপ্ত। রুনু ওব নামটা প্রায়ই করত। দত্তগুপ্ত মাবা গেছে। পাশেব ফ্ল্যাটের অঙ্কের অধ্যাপক, সামনের বাড়ির যোগব্যায়ামকারী, বাডির নীচে লন্ড্রির মালিক কাপ্তান ছোকরা, এদের মুখ একবার করে ভেসে উঠেছিল।

কিন্তু সব থেকে জ্বালা বোধ করেছিল মোহনের মুখ মনে পডায়। কেন মনে হয়েছিল! সব কথাই ও বলে, কিন্তু রুনু সম্পর্কে একবারও কিছু বলেনি গিরিকে। রুনুও কিছু বলে না মোহন সম্পর্কে। নিশ্চয় চেষ্টা করেছিল। হয়তো সফলও হয়েছে। রুনুর মা চেয়েছিল মেয়েকে তার পথেই আনতে। মোহনকে হয়তো সুযোগ দিয়েছিল রুনুকে বাধ্য করাতে।

এ-প্রসঙ্গ তোলা যায় না রুনুর কাছে, মোহনের কাছে। এখন তুললে তো হাস্যকর হয়ে পড়বে। কিন্তু এ-সব কথা এখন কেন মনে হচ্ছে?

"... আমি জানি তুই ওকে সেটা বলতে পারবি না।" ঠিকই, রুনুকে সে বলতে পারেনি। এখন সে-কথা বলার অর্থ হয় না।

একদিন দুপুরে গিরি একা হাজির হয়েছিল রুনুদেব বাড়ি। সেই লোকটি বাইরের রকে বসে ছিল দেয়ালে ঠেক দিয়ে। পুরনো ঢিলে ফুলশার্ট বোতাম ছিল না। একদৃষ্টে ফাঁকা আকাশে তাকিয়ে। তখনও সে জানত না লোকটি রুনুরই বাবা।

মোহনের মতোই সে আঙুলের গাঁট দিয়ে দরজায় টোকা দেয়। এই সময় রুনু কলেজে থাকে। কিন্তু কোনও কারণে যদি বাড়ি ফিরে এসে থাকে স্ট্রাইক বা প্রোফেসার আসেনি কিংবা শরীর খারাপের জন্য! ভয় হয়েছিল টোকা দেবার সময়। একটা অজুহাত অবশ্য তৈরি ছিল। যদি রুনুই দরজা খোলে, তা হলে বলবে, "কাল মোহন একটা চাবি ফেলে গেছে।"

কাল ওরা দু'জন এসেছিল। যথারীতি 'প্রাইভেট কথা' বলতে মোহন উঠে গেছল ভিতরের ঘরে। গিরি একা বসে তাকিয়েছিল পর্দার ওধারে ফাঁকা চেয়ারটায়। রুনু ঘরে ছিল না। কথা প্রসঙ্গে ওর মা জানিয়ে দিয়েছিল, রুনু একটা টিউশনি পেয়েছে।

পুরনো ভ্যাপসা, ম্লান ঘরটা হঠাৎ গিরিকে কোণঠাসা করে ফেলে। অন্যান্য দিন আর একটি মানুষের উপস্থিতি তাকে সজাগ রাখত। বিষণ্ণতার মতোই একটা অনুভব, নিঃসঙ্গ ঘরে সে বোধ করতে শুরু করে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছল ভিতরের ঘরটার দিকে।

দরজা বন্ধ ছিল। সে আশা করেছিল, অশ্লীল বইয়ে পড়া, নানাবিধ শব্দের মতো কিছু কিছু শব্দ শুনতে পাবে। হতাশ হয়ে সে বাইরের ঘরটায় ফিরে আসে। নৈঃশব্দ্যে ধীরে ধীরে তাকে পুরুষোচিত উত্তেজনায় আক্রান্ত করে।

ফেরার সময় সে মোহনকে বলে. "বড্ড দেরি করিস, অতক্ষণ লাগে কেন?"

"কোথায় দেরি করেছি? বরং আজ তো তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তোর কি বিরক্তি লাগে?"

"লাগবে না!"

"তোর কথা আজ বলছিল, এসে শুধু শুধু বসে থাকে ছেলেটা। আমি বললুম, এখনও এ-সব করে-টরেনি, লজ্জা পাচ্ছে। বলল, একা আসতে বলুন না। যাস তো চলে যা একদিন। টাকা দশেকের তো ব্যাপার, দুপুর-টুপুরেই যাস।"

গিরি পরদিন দুপুরেই যায়।

ভিতরের ঘরে সে দেয়ালে একটা যুবতী স্ত্রীলোকের কোলে একটি শিশুর ছবি দেখেছিল। প্যান্ট খুলতে খুলতে সে ছবি থেকে চোখটা সরিয়ে নেয়। স্ত্রীলোকটি তার সামনেই নিজেকে শিথিল করে দিয়ে খাটে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু শিশুটি কি রুনু?

কোনওদিনই সে রুনুকে জিজ্ঞাসা করে কৌতূহলের নিবসন ঘটাতে পারেনি। ভিতরের ঘরের কোনও কিছুর উল্লেখ করলে তার থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে, যেটা সে রুনুকে জানাতে চায় না। একবার মনে হয়েছিল রুনুর মাকে বলে, তার এই আসার কথা কাউকে যেন না জানায়। লজ্জায় বলতে পারেনি। রুনুর মা তখন বিছানা ঠিক করায় ব্যস্ত। এই বিছানাতেই রাত্রে রুনুও মার সঙ্গে হয়তো শোয়।

"কী হল, এত দেরি হচ্ছে কেন?"

বন্ধ কলঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে রুনু। উৎকণ্ঠিত, শঙ্কিত স্বর।

গিরি চৌবাচ্চার পাড়ে বসেই চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক আছি। ভয়ের কিছু নেই।"

গিরি একবার কলঘরের শ্যাওলায় ক্রাচ সমেত পিছলে পড়ে কোমরে চোট পেয়েছিল। রুনু ওকে তুলেছিল। সেই থেকে প্রতিদিন কলঘরের মেঝে, রুনু ঝাঁটা দিয়ে একবার ঘষবেই।

"এতক্ষণ ধরে কী করছ?... মোহনবাবু চলে গেলেন এইমাত্র।"

"কেন?"

"বললেন, ছেলেটা হয়তো হুটোপাটি করছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে শোয়াতে হবে। কিছুতেই আর বসলেন না।"

স্নান সেরে ঘরে এসে গিরি দেখল মোহন আধ ভরতি অবস্থায় বোতলটা ফেলে রেখে গেছে।

চার

রুনু যখনই বাইরে যায় গিরি তখন বারন্দায় এসে দাঁড়ায়। দ্রুত পায়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ অভিমুখে যেতে যেতে রাস্তা পার হবার আগে অন্তত একবার ও ফিরে তাকাবেই বারান্দায় দাঁড়ানো গিরির দিকে। সেই মুহূর্তে প্রতিবারই বুকটা ধক করে ওঠে। হয়তো বিদায় নিচ্ছে। এই বোধহয় শেষ বারের জন্য তাকে দেখে নিচ্ছে। আর ফিরবে না।

রাস্তা পেরিয়ে বাস স্টপ বোর্ড আঁটা পোস্টের সামনে দাঁড়াবে না। একটু সরে দাঁড়ায় যেখানে গিরি তাকে দেখতে পাবে না। ও চলে যাবার পর গিরি কিছুক্ষণ অসহায় বোধ করে। মুহ্যমান হয়ে বসে থাকে। আবার বিকেলে বারান্দায় দাঁড়ায় রুনুর ফেরার সময়।

সেই সময় তার দোতলার ফ্ল্যাটের বারান্দায়ও দাঁড়ায় নতুন বউটি। তার স্বামীরও অফিস থেকে ফেবার সময় হয়েছে। গিরি ওকে বারান্দায় দেখলেই পিছিয়ে আসে। স্ত্রী অফিস থেকে ফিরবে তাই স্বামী অপেক্ষা করছে এটা ভাবলেই সে কুঁকড়ে যায়। ব্যাপারটা ঠিক উলটো হওয়াই রীতি। রুনু প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় বেরোয়, বাসে অফিসে রাস্তায় দিনের অনেকটা সময় অপরিচিত একটা জগতে কাটিয়ে ফিরে আসে। কত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা, কাজ, গল্প করে যাদের গিরি চেনে না, দেখেনি বা শুধু নামটুকু মাত্র জানে। রুনুর সেই জগতে তার কোনও ভূমিকা নেই, অংশ নেই।

এ-জন্য তার কোনও ঈর্ষা হয় না। শুধু তার ভয়ংকর অসহ্য মনে হয় রুনুর অপসৃয়মাণ দেহটিকে। ওর অস্তিত্ব, প্রয়োজনীয়তা তখন সে তীব্রভাবে অনুভব করে।

এই মুহূর্তে রুনু আর অম্বর সিঁড়ি দিয়ে নামছে। দু' জোড়া পায়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে। দরজাটা বন্ধ করতে করতে গিরির মনে হল পনেরো বছর আগে রুনুই এইভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত। কান পেতে তাব পায়ের শব্দ শুনত, তারপর ছুটে আসত বারান্দায়। বুকটা রেলিংয়ের বাইরে রেখে ঝুঁকে দাঁড়াত।

ওরা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। গিরি ধীরে বারান্দায় দরজার কাছে এসে পর্দাটা একটুখানি সরিয়ে রাস্তায় চোখ রাখল। রুনু তাকে আবার অনুরোধ করেছিল। অম্বরও তাকে একবার বলেছিল।

গিরি একই উত্তর দিয়েছে, "থিয়েটার আমার ভাল লাগে না। কিন্তু আমার ভাল লাগে না বলে তোমরা কেন যাবে না?"

"না আমি যাব না।"

রুনু দুই মুঠো কোলে রেখে খাটে বসে থাকে অবাধ্য মেয়ের মতো।

পাশের ঘরে অম্বরের শিস শোনা যাচ্ছে। গিরি লক্ষ করেছে, গায়ে পাউডার দেবার বা জুতোব ফিতে বাঁধার সময় ও শিস দেয়। বেরোবার জন্য ও তৈবি হচ্ছে। গিরি কঠিন, বিরক্তি মাখানো স্ববে বলল:

"বসে রইলে কেন?"

দরজার বাইরে অম্বরের জুতোর শব্দ শোনা গেল, "বউদি আমি কিন্তু রেডি।"

রুনু ফিসফিস করে বলল, "আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"তোমার জন্য পাস আনল..."

"আমি আনতে বলিনি।"

"না বললেই বা। তোমার কথা ভেবেই তো এনেছে।"

রুনু একদৃষ্টে গিরির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি যাই, এটা তুমি চাও না।"

"কে বলল চাই না?"

"আমি বুঝতে পারি।"

গিরি সচকিত এবং সাবধানী স্বরে বলল, "কী বুঝতে পারো?"

রুনু কথা না বলে খাট থেকে উঠে পড়ল। দেরাজ খুলে শাড়ি বার করল। বেলেরপানা বঙের তাঁতের শাড়ি, যেটা একদিন সারা দুপুর ধরে গিরি রিপু করেছিল।

গিরি বারান্দায় বেরিয়ে এল। অম্বর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। গিরিকে দেখেই সে ব্যস্ততার ভঙ্গিতে বলল, "দাদা, আপনার চেনা ইলেকট্রিকের কোনও দোকান আছে? একটা পাখা ভাড়া না করলে আর চলছে না।"

"সিলিং ফ্যান?"

"হ্যাঁ। টেবিল ফ্যানে ঠিক করে সব জায়গায় হাওয়া পাওয়া যায় না। আপনি একটু দেখবেন?"

গিরি ঘাড় নাড়ল।

"আপনি থিয়েটারে যাবেন না?"

না প্রশ্ন না অনুযোগ। বার বার একই কথার জবাব একইভাবে দিতে হবে ভেবে গিরি বিরক্তি বোধ করে বলল, "ফ্ল্যাটগুলোয় আজকাল চুরি হচ্ছে। একদম খালি ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।"

"শুনেছি বটে। শিক ভেঙে ঢুকেছিল আমাদের ফ্ল্যাটে।"

নিশ্চয়ই রুনুই বলেছে। গিরি মুখ ফিরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে গাড়ি চলাচল লক্ষ করতে লাগল।

"কই ঠাকুরপো, চলো।"

গিরি মুখ ফিরিয়ে তাকালও না। শুধু চোখের কিনার দিয়ে হলুদ রঙের একটা ঝলক দেখতে পেল বারান্দার দরজার কাছে।

বেরিয়ে যাবার সময় রুনুই চেঁচিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিতে।

বন্ধ করতে আসার সময় দরজার পাশেই জানলাটায় বসানো শিকটার দিকে তাকাল। কয়লা ভাঙা লোহাটা জানলায় হেলান দিয়ে রাখা থাকে, সেটা নেই। রুনু তা হলে রান্নাঘরে নিয়ে রেখেছে।

এরপর সে ধীরে ঘরে ঢুকে বারান্দার দরজার কাছে এসে পর্দাটা একটুখানি সরিয়ে রাস্তায় চোখ রাখল। ওরা দু'জন পাশাপাশি চলেছে। রুনু একবারও পিছন ফিরে বারান্দার দিকে তাকাচ্ছে না। অম্বর দু'হাত নাড়ল কিছু একটা বুঝিয়ে বলতে। রুনু মাথাটা হেলাল। দু'জন খুব কাছাকাছি হয়ে হাঁটছে। অম্বরের কনুই বোধহয় রুনুর বাহুতে লাগছে।

রাস্তা পার হবার জন্য ওরা দাঁড়িয়ে। অম্বর কী একটা বলতেই রুনু ওর মুখের দিকে তাকাল। অম্বর হাত তুলে ট্যাক্সি থামাল। রুনু ইতস্তত করছে। অম্বর দরজা খুলে কী যেন বলল। তারপর কনুই ধরে আলতো আকর্ষণ করতেই রুনু ট্যাক্সিতে উঠল।

গিরি অবসাদ বোধ করল। রুনুকে নিয়ে প্রথম ট্যাক্সিতে ওঠা মনে পড়ছে। তখন ওদের আলাপ সদ্য আপনি থেকে তুমি হয়েছে। ইউনিভার্সালের কাছে বাস স্টপে প্রতি শনিবার রুনু এসে দাঁড়িয়ে থাকত। মোহনকে এড়িয়ে সে আগেই বেরিয়ে পড়ত। ওরা হাঁটত, কোনওদিন কার্জন পার্কে, কখনও আউট্রাম ঘাটে, কখনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে। সন্ধ্যা হবার আগেই রুনুকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হত। গিরি বাদাম কিনত, রুনু খোসা ভেঙে দানাগুলো ওর হাতে তুলে দিত। মাঝে মাঝে গিরি আঙুলগুলো চেপে ধরত। কখনও কখনও পারত না। রুনু আগে বুঝে নিয়ে দানাগুলো তালুর উপর ফেলেই হাতটা সরিয়ে নিত।

এক শনিবার গিরি হঠাৎ একটা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে বলল, "চলো লেকে যাই।"

"বাসে করেই তো যাওয়া যায়।"

"তা যায়, কিন্তু আজ যাব না?"

"কেন পয়সা কি কামড়াচ্ছে?"

ট্যাক্সিওয়ালা ভ্রূ কুঁচকে ওদের লক্ষ করছে দেখে গিরি দরজা খুলে ওর কনুই ধরে ফিসফিস করে বলল, "চটপট মোহন আসছে।"

ব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সিতে ঢোকার সময় রুনুর মাথাটা ঠুকে গেছল। রুনুর একমাত্র ভয় ছিল মোহনকে। যদি মাকে বলে দেয়।

এইমাত্র অম্বর ট্যাক্সির দরজা খুলে কী বলল? গিরি অধৈর্য হয়ে কথাটা তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগল।

"ওঠো ওঠো, বারান্দা থেকে দেখতে পাবে না।"

কিংবা, "বারান্দায় কেউ নেই চটপট উঠে পড়ো।"

কিংবা "দেখছে তো দেখুক, ওঠো।"

অম্বর রুক্ষ অমার্জিত। হয়তো 'ল্যাংড়া' শব্দটাও ব্যবহার করে থাকতে পারে। পাশের ফ্ল্যাটের তাসের আড্ডায় তর্কাতর্কি চলছে। রাস্তায় বাচ্চারা চিৎকার করে খেলা করছে। সামনের বাড়ির

যোগব্যায়ামবীরের স্থূলাঙ্গী স্ত্রী গিরির নীচের ফ্ল্যাটের গিন্নির সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প করে যাচ্ছে।

শব্দ আর শব্দ। মাথার মধ্যে শব্দের আঘাতে দুমড়ে যাচ্ছে অতীত। অবাস্তব চেহারা নিচ্ছে। গিরি ভেবে উঠতে পারছে না, কী করে সে তার দুটি পা নিয়ে অসম্ভব-প্রায় সেই অদ্ভুত জীবনটার মধ্যে বাস করে এসেছে। দুঃখ পাচ্ছে না, তিক্ততা বোধ করছে না, শুধু বিস্ময় লাগছে এখন। পনেরোটা বছর এক পায়ে কাটাল। তারা দু'জন তবু একসঙ্গে, এক ঘরে রয়ে গেছে। এই পনেরোটা বছর সে অপেক্ষা করেছে প্রতিদিন একটি কোনও অমোঘের জন্য।

এবং সেই অবশ্যম্ভাবী এইবার আসছে। অত্যন্ত ধৈর্যবান সে। সারাজীবনই ধৈর্য ধরে রয়েছে। সে জানে কীভাবে অপেক্ষা করতে হয়, প্রতিদিনই সে করে। রুনু কি সত্যিই সুখী এই পনেরো বছর? চিন্তাটা তাকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চিবিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মিনিট পঙ্গুর সঙ্গে কাটিয়ে কেউ কি হাঁফিয়ে পড়বে না? নিশ্চয় পড়বে।

মোহন কি পড়েছে?

গিরির চিন্তা মোহনকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে উঠতেই তার মনে পড়ল কয়লা ভাঙা লোহাটা কোথায়?

রান্নাঘরে এল গিবি। ডেকচির ঢাকা খুলে দেখল বিরিয়ানির প্রায় অর্ধেক রয়েছে। নোংরা, অগোছালো করে রান্নাঘর রুনু কখনও রাখে না। সে সপ্রশংস চোখে সার দিয়ে রাখা কৌটো এবং শিশিগুলোকে দেখল। বাসনগুলো ঝকঝকে। খেয়ে উঠে দুপুরেই মেজে রেখেছে রুনু।

লোহাটা রান্নাঘরে নেই। দালানের কোথাও নেই। কলঘরের গলিটা পরিষ্কার। জুতোর র‍্যাকে থাকা সম্ভব নয়। কলঘবের মধ্যেও উঁকি দিল সে। প্লাস্টিকের বালতিটা বোধহয় ফাটা। সাবান জল চুঁইয়ে মেঝে দিয়ে নর্দমায় গেছে।

গিরি বিব্রত হয়ে পড়ল। যখন তার দুটি পা ছিল, তখনকার একমাত্র অবশিষ্ট জিনিস এই লোহাটি। ওটাব জন্য তার অস্বস্তি এবং দুর্বলতা, উভয়ই আছে। রুনুকে সে বলেছিল, পুরনো লোহার দোকান থেকে দু'টাকায় কিনে এনেছে। মিথ্যা কথা সে অনেক বলেছে, কিন্তু চুরি এই প্রথম।

মোহনই তাকে চুরি করতে বলে। কীভাবে গেটের দাবোয়ানের সামনে দিয়ে বেরোতে হবে দেখিয়েও দেয়। মোহনই জানে একটা দুপুরে সে রুনুদের বাড়িতে গেছল। এই দুটি কথা রুনুকে কখনও গিবি জানায়নি। রুনুকেও সে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি মোহনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল কি না; রুনুর মা নিখোঁজ হবার পর মাস দুয়েক রুনু আর তার বাবার সংসারটি কীভাবে চলেছিল গিরি আজও তা জানে না। এটি ওর জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সময় যেখানে ও কখনও ঢোকে না। সযত্নে পাহারা দিয়ে গেছে, যাচ্ছে কৌতূহলীদের কাছ থেকে। রুনু তাকে এ সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি, এমনকী মার নিখোঁজ হওয়ার কথাও চেপে গেছল। সেই দুপুরের পর থেকে গিরি আর ওদের বাড়ি যায়নি। যাতায়াত থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পারত।

জানত মোহন। সে-ও চেপে গেছল। কেন? শুধু চাপাচাপি আর গোপনীয়তা বক্ষা। আজও তার জের টেনে চলতে হচ্ছে। রুনুব মার রোজগারেই তাদের চলত। তার অবর্তমানে দুটি মাস কীভাবে চলেছিল, কে চালিয়েছিল? মোহন!

বারান্দায় চেয়ারে বসে গিরি রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে ব্যথা অনুভব করল। দিনের আলো পড়ে আসছে। দুর্বিষহ চিন্তাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া ছাড়া আর কোনও কাজ তার নেই।

অম্বরের পাখা ভাড়ার ব্যাপারটা আছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতেই পাশাপাশি দুটো দোকান। বৃহস্পতি না রবিবারে বন্ধ থাকে? সিলিংয়ে হুকের দুটো ঘরেই লোহার 'এস' ঝুলছে। এই ফ্ল্যাটে আগে যারা থাকত তাদের পাখা ছিল।

গিরি দরজায় তালা লাগিয়ে অভ্যাসমতো টানল। সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে প্রতিবারই নামে। প্রথম কয়েকদিন রুনু পাশে পাশে নামত। বাহুটা শক্ত করে ধরে থাকত। টাল হারিয়ে তার একশো চৌদ্দ পাউন্ড ওজনের শরীবটা উলটে পড়লে যেন ও সোজা কবে রাখতে পারবে!

হাসি পেল গিরির এবং একতলার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিটা মুখে রেখেই সামনে তাকাল।

রুনু আসছে। গিরিকে দেখতে পেয়েই দূর থেকেই লাজুক হাসল। মুখ নামিয়ে চলার বেগ দ্রুত করল।

"ভীষণ মাথা ধরেছে, তাই ফিরে এলাম।"

গিরি পিট পিট করে তাকিয়ে হাসছে।

বিব্রত হয়ে রুনু বলল, "হাসছ যে?"

"চলো একটু হাঁটি।"

ওরা একবারও থিয়েটারের কথা তুলল না। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে পৌঁছে বাঁ দিকে ঘুরল।

"ইলেকট্রিকের দোকানে যাব ভেবেছিলুম।"

"এখনই যাবে না ফেরার সময়?"

"বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

দুটি দোকানের একটি খোলা। কাউন্টারের ওধারে মালিকের চেয়ারটি শূন্য। এধারে দুটি মিস্ত্রিগোছের লোক গল্পে ব্যস্ত। তাদেরই একজন জিজ্ঞাসু চোখে গিরির দিকে তাকাল।

"পাখা ভাড়া পাওয়া যাবে? সিলিং ফ্যান।"

"একটু অপেক্ষা করুন, মালিক একশো টাকার নোট ভাঙাতে গেছে।"

লোক দুটি গল্প করছে। গিরি দাঁড়িয়ে রইল।

"বাচ্চাটাই ছিল পাখার তলায়, অথচ একদম আঁচড় লাগেনি। মায়ের মাথাটাই থেঁতলে গেছে।"

"আজেবাজে নতুন ছেলে দিয়ে এইসব পাখা লাগানোর কাজ করলে এইরকমই হয়। সহজ কাজ, কিন্তু দ্যাখো একটা লোকের জীবন চলে গেল সামান্য ভুলে। একটা পেরেকও যদি বুদ্ধি করে গর্তে ঢুকিয়ে রাখত তা হলে লোহাটা সরত না, পাখাটাও পড়ত না। পুরনো আমলের পাখায় এই এক ফ্যাচাং। এখনকার পাখা ধরো আর ঝুলিয়ে দাও।" গিরি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল শুনতে শুনতে। জিজ্ঞাসা করল, "পাখা খুলে পড়ে গেছে?"

"লাগিয়ে দিয়েছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পড়েছে। তলায় বাচ্চা নিয়ে মা শুয়েছিল, সেকেলে ক্লাইড ফ্যানের অন্তত দশ কিলো ওজনের হাঁড়িটা একেবারে মায়ের মাথায়।"

লোকটি দু হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরল।

"কী করে হল?"

"বরাতে ছিল তাই হল। পাখাটা ঝোলে যে লোহাটার ভরে সেটা সরে গেলেই পাখা পড়বে। যাতে না সরে সে-জন্য পিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর নড়াচড়া করতে পারে না। পিন ঢোকাতে ভুলে গেছল, কি হয়তো ছিল না। এইভাবেই তো আজেবাজে দোকানের মিস্ত্রিরা কাজ করে।"

মালিকও এসে গেছে।

"পাখা ভাড়া পাওয়া যাবে, সিলিং ফ্যান?"

"কবে চাই?"

"আজ বা কাল।"

"কাল দুপুরে লোক যাবে। মাসে দশ টাকা ভাড়া।"

"ঠিক আছে, বাড়ির ঠিকানাটা লিখে নিন।"

লোকটি হাত তুলে বলল, "জানি। আপনাদের দোতলার ফ্ল্যাটে দিন দশ আগেই তো পাখা দিলুম। আপনি তো তিনতলায় থাকেন।"

ইতস্তত করে রুনু বলল, "একজন ভাল লোক পাঠাবেন।"

"না না. কোনও ভয় নেই। এইসব ঘটনা লাখে একটা হয়।"

হাসি মুখেই লোকটি কঠিন চোখে লোক দুটির দিকে তাকাল। দুটো কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করতে হাসতে ও ধমকাতে।

"কী হচ্ছে, মুখটা অমন কচ্ছ কেন?"

গিরি দু' ধারে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "তুমি লক্ষ করোনি লোকটা কেমন করল?"

"শুনতে বিচ্ছিরি লাগছিল।"

রাস্তা পার হয়ে ওরা উত্তর দিকে এগোতে থাকল। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মাঝখানে কালী মন্দির। তার পুবের রাস্তাটাকে দেখিয়ে গিরি বলল, "এটাকে ছোটবেলায় আমরা রাজা রাস্তা বলতাম। রাস্তার দু'ধারেই শোভাবাজার রাজবাড়ি। পুজোয় এখানে মেলা বসত।"

"এখন আর বসে না বোধ হয়।"

"একটা দুটো নাগরদোলা হয়তো বসে। ছবি তোলার দোকানগুলো আর কোথাও বোধহয় বসে না। এখন বড্ড বেশি ছবির দোকান হয়ে গেছে, ক্যামেরাও লোকের হাতে হাতে।"

"আমাদের একটাও ছবি নেই।"

"তোমার ছোটবেলার ছবি?"

রুনু মাথা নাড়ল। ছিল, ভিতরের ঘরে মায়ের কোলেচড়া ছবি। গিরি সেটার উল্লেখ করতে পারল না। রাজা রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে চলতে লাগল।

একবার পুজোর সময় সে ম্যাজিকওলার তাঁবুতে ঢুকেছিল দু' পয়সার টিকিট কেটে। স্টেজের সামনে শতরঞ্চিতে বসেছিল। ম্যাজিক চলার মধ্যেই সে দেখল এক মাঝবয়সি স্ত্রীলোক তাঁবুতে ঢুকে দর্শকদের পাশ দিয়ে স্টেজের কাছে এসে জুতো খুলছে। স্টেজ থেকেই ম্যাজিসিয়ান খেলা দেখাতে দেখাতে বলল, "দেরি হল যে?"

স্ত্রীলোকটির মুখে রং মাখা। চুলটা ফাঁপিয়ে কান ঢেকে রাখা, কানে মস্ত কানপাশা। জুতো খুলতে খুলতে লাজুক হাসল মাত্র। স্টেজের পাশের পর্দাটা তুলে ভিতরে ঢুকল আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্টেজে ঢুকে নাচতে শুরু করল। মিনিট তিন-চার নেচেই সে আবার স্টেজের পাশে চলে গেল। গিরি ছেঁড়া পর্দাটার মধ্য দিয়ে তখন দেখল স্ত্রীলোকটি সিগারেট খাচ্ছে।

একটা মাঠ ছিল তার পিছনে পুকুর। বিরাট বাড়িটা দেখে তার মনে পড়ল, ছোটবেলায় কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুলে পড়ার সময়, সে এই মাঠে আসত। পুকুরে রাজহাঁস চরত। ফুটবল খেলা হত মাঠে। গোলের পিছনে দাঁড়াতে তার ভাল লাগত। একবার প্রচণ্ড শট তার মাথায় লেগে মাঠে বল ফিরে যায়। লোকেরা হো হো করে হেসে উঠেছিল। গিরির মাথা ঝনঝন করছিল অনেকক্ষণ।

বিশেষ কিছু কথা ওরা বলল না। মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ওরা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর সঙ্গেই বাঁক নিল পুবে শ্যামবাজারের দিকে। কাঠগোলায় একটা আলনা তৈরি হচ্ছে। রুনু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "একটা মিটসেফ আমাদের দরকার।"

এরপর তারা শ্যামস্কোয়্যার পার হয়ে গেল। রুনুর কলেজের সামনে আসতেই গিরি বলল, "তোমার জন্য প্রথম দিন দাঁড়িয়েছিলাম এই বাস স্টপে, তখন একটা মেয়ে এসে আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল।"

"বাণীকে পাঠিয়েছিলাম, তোমাকে বলতে মিনিট পনেরো আমার দেরি হবে। এস এন বি-যে কখন ক্লাস থেকে বেরোবে কেউ জানে না। হঠাৎ বাণীকে যে মনে পড়ল?"

"এমনিই। এক একটা জায়গায় এলে অদ্ভুত সব ঘটনা, দৃশ্য, মানুষের কথা মনে পড়ে। তোমার মনে পড়ে না?"

রুনু মাথাটা হেলাল।

গিরি অপেক্ষা করল রুনু কিছু বলবে মনে-পড়া সম্পর্কে। কিন্তু রুনু নীরবে চলেছে মনে পড়ার মতো ঘটনা বা মানুষের কথা হয়তো বলতে চায় না। কিংবা এখন যা দেখেছে তা তাকে কিছু মনে পড়াচ্ছে না।

"শনিঠাকুরের মন্দির দেখলে আমার কেমন গা ছমছম করে। মা প্রত্যেক শনিবার, আমাদের পাড়ার শনি মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে বসে থাকত। বাবা মারা যাচ্ছেন, তখনও বসে। আমি ছুটে গিয়ে খবর দিলাম মাকে, কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। না, মরতে পারেন না। বাজে কথা বলছিস। কী অসম্ভব যে ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস, দেখে আমার ভয় করেছিল।"

"তোমার বোধ হয় ক্লান্তি লাগছে, ফিরবে?"

"না না, কিচ্ছু লাগছে না।"

"বগলে আর ব্যথা হয় না?"

গিরি মাথা নাড়ল। রাস্তায়, দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তায় এখন প্রচণ্ড ভিড়। ফুটপাথে

ক্রমশই ভাঙা, গর্ত, ঢিপি বাড়ছে। চলতে অসুবিধা হচ্ছে গিরির। ওরা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পার হল।
"এবার গলি দিয়ে ফেরা যাক।"
"এদিকের গলি আমি ভাল চিনি না। এদিকটা কি শ্যামপুকুরের মধ্যে?"
"হ্যাঁ।"
"বাণীরা এদিকেই থাকত। খুব গরিব ছিল। আমরা দু'জনেই ভীষণ বন্ধু ছিলাম। কিন্তু কখনও বাড়ি নিয়ে যেত না। তোমার কথা ওকে সব বলতুম।"
"কী বলতে?"
"সে-সব কি মনে আছে?"
"বলো না কী বলতে?"
"কী আবার বলতুম, মেয়েরা যা বলে থাকে ওই সময় তাই।"
গিরি চুপ করে রইল। এখন রাস্তায় আলো কম, লোকের চলাচলও; এখানে একটা মাঠ ছিল, প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজোয় জলসা হত। মাঠ খুঁজে পাচ্ছে না সে।
"বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে তোমার সঙ্গে প্রথম কথা বলার গল্পটা বাণীকে করেছিলাম।"
"সম্মেলনে নয়, বাইরে রাস্তায়। আমিই প্রথম কথা বলি।"
"তাই বলেছিলাম। বাসের জন্য অপেক্ষা করছি বাস আসছে কিন্তু ভিড়ে উঠতে পারছি না। তুমিও উঠতে পারছিলে না..."
"এটা ঠিক বলোনি। আমি উঠে যেতে পারতাম। তোমার সঙ্গে উঠব বলেই বাস ছেড়ে দিচ্ছিলাম।"
"সেটা ও বুঝে নিয়েছিল। যে লোক রোজ খুঁজে খুঁজে আমার পাশে কি পিছনে এসে বসে, সে যে ভান করছিল, এটা যে শুনবে সেই বুঝে নেবে।"
"হেঁটে বাড়ি ফেরার কথা বলামাত্র তুমি রাজি হয়ে গেলে, এটা শুনে ও কিছু বলেনি?"
"বলামাত্র মানে!"
"তা নয় তো কী? দু' মিনিটের বেশি আমাকে বলতে হয়নি।"
"আমি ওকে বলেছিলাম, বলার সঙ্গে সঙ্গেই।"
"মেয়েরা একটা বয়সে বাহাদুরি নেবার জন্য মিথ্যে কথা বলে।"
রুনু হাসল। একটা বয়সে না সব বয়সে! ও আজও কি মিথ্যা বলে যাচ্ছে না? চোখের কোণ থেকে গিরি দেখল ওর মুখে হাসির রেশ লেগে আছে। একটু মন্থর হল সে রুনুর গোটা শরীরটা দেখার জন্য। কলেজে পড়ার সময় রুনুকে এত সুশ্রী মনে হত না। হয়তো তখনও তা ছিলও না। গিরি তাই নিয়ে মাথা ঘামায়নি। রুনু একটি মেয়ে এটাই যথেষ্ট ছিল। স্তন বা নিতম্ব আছে কি না বোঝাই যেত না। ও যে এত বদলে গেছে, এটা টের পেতে গিরির অনেক বছর সময় লেগেছে। প্রকৃতপক্ষে কয়েক মাস আগে সে আবিষ্কার করেছে। এখন আর ওকে লাজুক, অভিমানী দেখায় না। বরং ধীর সংযত, কোমল প্রকৃতির ভদ্রমহিলা রূপে ওকে ভাবা যায়।
রাস্তার আধখানা রঙিন কাপড়ে ঘিরে নিমন্ত্রিতদের জন্য চেয়ার পাতা হয়েছে। বিয়ে অথবা বউভাত। ওরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বাড়িটার ভিতর দিকে তাকাল। বিয়ে। মখমলের তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটি যুবক বসে। কপালে চন্দন, গরদের পাঞ্জাবি পরা। সামনে ফুলদানিতে তোড়া। একটা ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে। বরটি অত্যন্ত গম্ভীর হতে চাইছে ব্যক্তিত্ব ফোটাবার জন্য।"
"দেখেছ?"
"হ্যাঁ।"
আর কিছু বলার দরকার নেই। দৃশ্যটা দু'জনেই মনের মধ্যে ধরে রেখেছে। ওরা স্মৃতির অজস্র খোপের একটার মধ্যে দৃশ্যটাকে ভরে রাখল। পরে যদি দরকার হয়, আজকের সন্ধ্যার কথা যদি মনে করতে হয় তা হলে খোপ থেকে এটা বার করলেই সব মনে পড়ে যাবে। প্রতিদিনের এ-রকম অজস্র টুকরো অপ্রয়োজনীয় কথা, ইঙ্গিত, ভঙ্গি, গিরির স্মৃতিতে ভরা আছে।
রুনুর বাবার রকে বসে থাকা ভঙ্গির থেকে বেশি মনে আছে আকাশে তাকিয়ে থাকা চোখ দুটো।

পৃথিবীটার কোনও অস্তিত্ব চোখে ছিল না। মৃত মানুষের চোখ, গিরি একমাত্র নিজের বাবার ছাড়া আর দেখেনি। রুনুর মার শুয়ে থাকার ভঙ্গি। পিছনের ছবিটা। দুটো এক সঙ্গে তার মনে তিক্ত একটা গাছের বীজ বপন করে দিয়ে গেছে।

অস্বস্তি ভরে গিরি মনের মধ্যে খোপটা বন্ধ করতে চাইল।

"বড্ড জোরে হাঁটছ।"

"কই!"

"তুমি কী ভাবছ এখন?"

"বিশেষ কোনও একটা কিছু নয়। আচ্ছা, আমরা একবারই বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খেয়েছি, মনে আছে? তোমাদের গ্যারেজের এক মেকানিকের মেয়ের বিয়ে ছিল। আমার ভীষণ দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল। যাব না বলেছিলুম, তুমি জোর করে নিয়ে গেছলে।"

"তুমি তখন অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলে। জোর ফলাতে।"

"এখন জোর ফলাই না? আজও তো একগুঁয়েমি করলাম থিয়েটারে না গিয়ে।"

"গেলে না কেন? অম্বর পাস এনেছে বলে?"

"এ-কথা কেন বললে?"

"মনে হল। আজকাল প্রায়ই অনেক কিছু মনে হয়। তুমি কিন্তু ঘামছ, চলো এবার ফিরি।"

কথা না বলে ওরা এগোতে লাগল। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে অঘোর ঘোষ স্ট্রিটে ঢুকতে গিয়ে গিরি থমকে দাঁড়াল। রাস্তার ওপারে বনমালী সরকার লেনের দিকে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে চলতে লাগল।

"দাঁড়িয়ে পড়েছিলে কেন?"

"এমনিই।"

"তুমি সুখী হবার চেষ্টা করো।"

"চেষ্টা করে হওয়া যায় না।"

"আমাকে বিশ্বাস করতে তো পারো।"

গিরি মুখ তুলে তাকাল। রুনুর মুখে কোনও হালকা ব্যাপার নেই। চোখে বিষণ্ণ, অনুনয়ের চাহনি। কিন্তু গিরি নিজেকে হঠাৎ হালকা ঝরঝরে বোধ করল। এই কথাটা শোনার ইচ্ছা অনেকদিন ধরেই মনে জমে উঠেছিল।

"অম্বরকে চলে যেতে বলেছি। আমাদের অসুবিধে হচ্ছে, বিশেষ করে তোমার।"

বাড়ির দরজায় ওরা এসে গেছে। গিরি নীরবে সিঁড়ি দিয়ে উঠল। অত্যন্ত কৌতূহলী দোতলার লোকেরা। একটি দুটি কথা থেকেই ওরা পুরো ব্যাপারের অর্থ নিংড়ে বার করে নিতে পারে। তিনতলায় পাশের ফ্ল্যাটে তাসুড়েদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। রুনু তালা খুলে সরে দাঁড়াল। এটা ওর অভ্যাস। অন্ধকার ফ্ল্যাটে ঢুকতে ওর ভয় করে।

গিরি দালানোর আলো জ্বেলে দিয়ে শোবার ঘরে এল। অতি ক্ষীণ রামের গন্ধ ঘরে ভাসছে। বারান্দায় এসে চেয়ারে বসল। রুনু শাড়ি বদলাচ্ছে ঘরে, তারপর আলো জ্বালবে। দুপুর থেকে বোতলটা টেবিলের উপরই পড়ে আছে।

মোহন সত্যিই বদলে গেছে নয়তো অতখানি রাম ফেলে রেখে যেত না। অসৎ, মিথ্যাবাদী, লোভী লোকটা স্থিরভাবে বাকি জীবনটাকে নাড়াচাড়া করতে চায়। ওকে প্রশংসা করা উচিত। মোহন অত্যন্ত উদ্যমী। চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নেমে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছে। ওর এক ধরনের ধৈর্য আছে। গিরি অনুভব করল, সেটা তার ধৈর্যের থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। হয়তো মোহনের দুটো পা আছে বলেই।

ঘরে আলো জ্বলল।

"তুমি কি এখন চা খাবে?"

"না।... কিন্তু কী অসুবিধের কথা ওকে বলেছ?"

"বলেছি, ওই ঘরটা আমাদের দরকার। মাথার যন্ত্রণায় রাত্রে তোমার ঘুমের অসুবিধা হয়। ডাক্তার বলেছে সম্পূর্ণ নির্জন ঘরে না ঘুমোলে, যন্ত্রণা সারবে না।"

"এ-সব মিথ্যে কথা।"

"আমি নিরুপায়। অম্বর অবশ্য বিশ্বাস করেনি।"

"কী বলল?"

"ও বুঝতে পেরেছে কেন আমি চলে যেতে বলেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছে?"

কতটা চেঁচিয়ে উঠেছে, সেটা গিরি অনুমান করতে পারল রুনুর এক-পা পিছিয়ে যাওয়া থেকে। লজ্জা পেল সে।

"আমি ওর চলে যাওয়া চাই না। আমি অপেক্ষা করতে চাই সুখী হওয়ার জন্য। তুমি ওকে থাকতে বলো।"

শেষের কথাগুলো এত মৃদু হয়ে গেল, গিরি নিজেই শুনতে পেল না। ঘাড়ে রুনুর হাতের আলতো চাপ অনুভব করল।

"আমি তো যথাসাধ্য করি।"

জানি জানি, সে-জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞও। কিন্তু গিরি কথাগুলো বলতে পারল না। গলায় বাতাস জমে উঠছে।

"অম্বর চলে গেলে দেড়শো টাকা কমে যাবে।"

"তবুও। আমি পারব চালিয়ে নিতে। ও আসার আগে কি চলেনি?"

রুনু চলে গেল বারান্দা ছেড়ে। গিরি একদৃষ্টে রেলিংয়ের জাফরির মধ্য দিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবসন্ন বোধ করল। আবার তার মনে পড়ল টেবিলের উপর আধ ভর্তি বোতলটা রয়েছে।

হাত বাড়িয়ে পর্দা সরাল। রুনু ঘরে নেই। দরজার কাছেই টেবিলটা। গিরি ক্রাচের সাহায্য ছাড়াই দেয়াল ধরে হালকা লাফে ঘরে এল। দ্রুত বোতলটা তুলে নিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে চেয়ারে বসল। দালান থেকে রুনু বলল—

"তুমি কি এখন খাবে? তা হলে গরম করি।"

"না, একদম খিদে নেই। ঢাকা দিয়ে টেবিলে রেখে দাও।"

"আমারও খিদে নেই। আমি শুয়ে পড়ছি, ক্লান্তি লাগছে।"

গিরি ছিপির প্যাঁচ খুলে, বোতল থেকেই মুখে ঢালল। গন্ধে, ঝাঁঝে গুলিয়ে উঠল পেট। বহু বছর পর আবার। স্বাদটা, ভুলেই গেছে প্রায়। ঠোঁট চেপে, বেরিয়ে আসতে চাওয়া রামকে আবার পাকস্থলীতে ফিরিয়ে আনার জন্য সে চোখ বুজে নিশ্বাস বন্ধ করল। মিনিট দুয়েক পর সে অনুভব করল তার শরীরের মধ্যে সেই বিস্মৃতপ্রায় উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে। আর এক ঢোঁক খেয়ে বোতলটা চেয়ারের নীচে রাখল।

কলঘরে কাপড় থোবানোর শব্দ হচ্ছে। নিজের ব্লাউজই নয়, অম্বরের রুমাল, গেঞ্জিও কাচছে। গিরি হাতটা নাকে ধরে পিঁয়াজের সামান্য গন্ধ পেল। উপরের বারান্দায় গুনগুন সুর। পাগলি গান গাইছে। একতলায় লন্ড্রির রোলার শাটার বন্ধ করার কর্কশ শব্দ উঠেই অঘোর ঘোষ স্ট্রিটকে আবার নৈঃশব্দ্যে ডুবিয়ে দিল।

গিরি বোতলটা তুলে নিয়ে কোলে দুই উরুর মধ্যে রাখল। মাথার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ, চোখে ঝাপসা লাগছে। বনমালী সরকার লেনের মুখ, বাস স্টপে দাঁড়ানো কয়েকটি লোক মাঝে মাঝে দৃষ্টি থেকে ছিটকে যাচ্ছে। গুম হয়ে সে বসে থেকে, বিরক্ত বেপরোয়ার মতো বোতলটা মুখে তুলে ধরে বাকিটুকু ঢেলে নিল।

প্রায় আধঘণ্টা পর তার মনে হল অম্বর হেঁটে আসছে। দেখার জন্য একপায়ে দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়ল। রুনু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। দরজাটায় হয়তো খিল দেওয়া। উঠে এসে কড়া নাড়লে পর দেখা যাবে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সে অন্ধকার বারান্দায় চোখ বুজল। নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে, বুকে টান লাগছে। এত বছর পর এ-ভাবে ঢকঢক করে গেলা ঠিক হয়নি। গিরি মাথা নাড়তে লাগল।

পাশের ঘরে আলো জ্বলল। বারান্দার দরজা খুলে অম্বর বেরিয়ে এসে রেলিং ধরে একবার দাঁড়িয়েই

আবার ঘুরে ঢুকে গেল। খোলা দরজা দিয়ে আলো পড়েছে বারান্দায়, জংধরা ময়লা রেলিংয়ে। জাফরিতে।

গিরি চোখ খুলে একবার মেঝেয় আলোটার দিকে তাকিয়েই আবার মাথা ঝুঁকিয়ে দিল বুকের ওপর। মাথার মধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণি। পাকস্থলী থেকে একটা চাপ ঠেলে উঠছে গলা পর্যন্ত।

দরজাটা কি খোলাই ছিল? কিন্তু চুরি হবার পর থেকে সন্ধ্যা হলেই রুনু খিল দিয়ে রাখে। দরজার কড়া কি নেড়েছিল? গিরি মাথাটাকে ঠেলে ঠেলে তুলে সিধে করল। শুনতে পাইনি তো। রুনু কি দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল? সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই খুলে দিয়েছে। তারপর?

ঝুঁকে দু'হাত বাড়িয়ে গিরি রেলিংয়ের জাফরি মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে, মাথাটা ঝুলিয়ে দিল। কেন নয়? সবই সম্ভব। হাঁফাচ্ছে সে। হাঁ করে আছে। গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল। কীসের অসম্ভব? মাকে দেখেছে রুনু। টাকার জন্য সেই আধবুড়ি, পেটমোটা মেয়েমানুষটা লোক নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। দরকার রুনুরও আছে। ওর মজবুত নরম শরীর উচ্ছল প্রাচুর্যে ভরিয়ে নেবার দরকার কি বোধ করে না? করে নিশ্চয় করে।

রেলিংটা ধরে গিরি ঝাঁকাবার চেষ্টা করল। চোখ খুলতে পারছে না। মাথার মধ্যে নাগরদোলার ওঠা-নামা চলছে। হাতড়ে হাতড়ে ক্রাচ দুটো ধরে উঠে দাঁড়াল। এখুনি কলঘরে গিয়ে তাকে বমি করতে হবে।

অন্ধকার ঘরে রুনু খাটে শুয়ে আছে কি না দেখার জন্য গিরি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। না থাকলে কোথায় যাবে। কলঘরে? দালানটা অন্ধকার। ওর মুখস্থ কোথায় কী আছে। বাঁ দিকে দরজা তার পাশে জুতোর র‍্যাক, তার পিছনে জানলা, তাতে কয়লা ভাঙার লোহাটা... ওটাকে সে আজ দেখতে পায়নি স্নান করে বেরিয়ে। চোরাই মাল। গেছে ভালই হয়েছে।

কলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গিরি নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল। ভারী চোখের পাতা তুলতে গিয়েও পারল না। কেউ কি কলঘরে রয়েছে নাকি?

"কে?"

গিরি অপেক্ষা করল সাড়া পাবার জন্য। "ধ্যাৎ!" কলঘরের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেই অস্পষ্টভাবে মনে হল, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কেউ যেন তার ক্রাচজোড়া টানছে তলা থেকে। রুনু কি? সামনে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ল গিরি এবং মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারাবার আগে মুহূর্তের জন্য তার মনে হল কয়লা ভাঙা লোহাটা তার মাথায় কে যেন মারল।

পাঁচ

হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে আসার পর যে-লোকটি তাকে প্রশ্ন করেছিল, "আপনার কি মনে হয় কেউ আপনাকে আঘাত করেছিল?" তার মুখটি গিরি মনে করার চেষ্টা করল।

নীল বুশ শার্ট। অতি সাধারণ মুখ। দাঁতগুলোয় পানের ছাপ। দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল।

"কেন?"

"থানা থেকে আসছি। এ-রকম কেসে আমরা স্টেটমেন্ট নিয়ে থাকি। আপনার একটা পা নেই, তার ওপর মদ খেয়েছিলেন, তবু ফর্মালিটিজ শেক..."

"না আমার কিছু বলার নেই।"

বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল গিরি। লোকটার স্বর, বসার ভঙ্গি, দাঁত খোঁচানো তার অসহ্য লাগছিল।

বিকেলে রুনু এসেছিল। একা। মুখটা শুকনো। গিরি নার্সের কাছে শুনেছিল প্রায় আটাশ ঘণ্টা পর তার জ্ঞান আসে। সকালে পুলিশের লোকটা যে-টুলে বসেছিল সেটাই টেনে নিয়ে রুনু বসে। চোখে উদ্বেগ ও স্বস্তি একের পর এক ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রুনু আলতো করে হাত রাখল তার বুকে। ওর বসার ভঙ্গিতে করুণা, চাহনিতে মমতা।

তখন হঠাৎই গিরির মনে হয়েছিল, গত পনেরো বছরে তারা পরস্পরের এত কাছাকাছি কখনও আসেনি। এত কাছে, যার থেকে দুটি প্রাণের পক্ষে আরও বেশি সম্ভব নয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাসপাতালে রুনু তার পাশে বসল। মাঝে পনেরোটা বছর। হয়তো ও বদলায়নি।

গিরি তখন প্রতিটি সেকেন্ডে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তার শরীর ও মন আরও তীক্ষ্ণ অনুভূতি লাভ করছে, হৃৎপিণ্ড থেকে আবেগ ছিটকে পড়ছে সারা দেহে। মাথার মধ্যে যন্ত্রণাটা অসহ্য লাগছে না। মনের মধ্যে বুদবুদের মতো ফেটে পড়ছে অজস্র দ্রুত চিহ্নসমূহ—হঠাৎ ধরাপড়া কোনও কথার সুর, তীব্র গন্ধ, পলকে দেখা কোনও চাহনি, শয়নের ভঙ্গি, এমনকী রাস্তা থেকে ভেসে আসা চিৎকারও। অন্য আর এক পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগসূত্র এইসব ছবি, গন্ধ, ধ্বনি খোদিত হয়েছে পনেরো বছর ধরে।

রুনু বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

"পুলিশের একটা লোক এসেছিল। জিজ্ঞাসা করছিল কেউ আমাকে মেরেছে কি না।" সঙ্গে সঙ্গে রুনুর হাতটা একবার আড়ষ্ট হয়ে গেছল।

"তুমি কী বললে?"

গিরি একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু চোখ দুটোয় ছিল না। কৌতূহল নয় কেন? ওটাই স্বাভাবিক হত! সে অপেক্ষা করে ছিল কতক্ষণে আতঙ্কটা অপহৃত হয়। রুনুর চোখে অস্বস্তি ফুটে উঠেছিল।

"আমি কিছু বলিনি।"

অস্বস্তিটা যেন আরও বাড়ল।

"কিছু বলোনি?"

"না। বলার কিছু নেই। একটা পা নেই, তার ওপর মদ খেয়েছিলাম, পড়ে গিয়ে চোট পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।"

"কলঘরটা সাবান জলে হড়কানো ছিল। যখন আমি আর অম্বর তোমায় তুলছিলাম তখন ও একবার হড়কে গেছল।"

"জানলে কী করে?"

"অম্বরই শব্দ পেয়েছিল, আমাকে ডেকে তোলে।"

"তুমি ঘুমোচ্ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"ও কি ঘরে ঢুকে ডেকে তুলল?"

"হ্যাঁ।"

মাথার মধ্যে যন্ত্রণাটা আবার ফিরে আসছে। গিরির মনে হল সে আবার তার নিজের জগতে, অন্ধকার দমচাপা কুটুরিতে ঢুকছে। চোখ বন্ধ করে বুকে হাত রাখল। রুনু তার হাতটা আগেই তুলে নিয়েছে।

"ডাক্তার বলেছে দিন চার-পাঁচ তোমাকে এখানে থাকতে হবে। এক্স-রে করে খুলিতে ক্র্যাক পাওয়া গেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই।"

"তুমি কি অফিস থেকে আসছ?"

"না। টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছি এক সপ্তাহ যাব না।"

"একা আছ?"

গিরি চোখ খুলল না মুখের দিকে তাকাবার জন্য।

"অম্বর আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ও চলে যাবে। আপাতত এক বন্ধুর বাড়িতে উঠবে।"

গিরি চুপ রইল।

"ওকে ক'টাদিন থাকতে বলেছি তোমার জন্যই, আমাকে সাহায্য করতে।"

"পাখা দিয়ে গেছে?"

"আজ দুপুরে দিয়েছে।"

"কেমন পাখাটা, ঠিক মতো লাগিয়েছে তো?"

"রেগুলেটর ছিল না, এনে লাগাল। পাখাটা বেশ পুরনো, হাঁড়িটায় অনেকগুলো ঘুলঘুলি। তবে ভাল হাওয়া দেয়।"

"বাতে কাপড় কেচে তুমি কলঘরের মেঝেয় জল ঢেলে দাওনি!"

"বোধহয় না।"

"কিন্তু তুমি তো এ-সব ব্যাপারে খুঁতখুঁতে।"

রুনুর মুখের অভিব্যক্তি দেখার জন্য গিরি চোখ খুলল। মুখটা নামিয়ে রাখা। অপরাধীর মতো।

"পুলিশের লোকটা জানতে চাইল, কেউ আমাকে মেরেছে কি না।"

"কে মারবে? মারার মতো কে আছে?"

গিরি উত্তর না দিয়ে জানলার দিকে মুখ ফেরাল। একটা দোতে বামনা ঘুড়ি আকাশে তোলপাড় করছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। দ্বিতীয় কোনও ঘুড়ি দেখা যাচ্ছে না।

"আমারই দোষে হল। যদি জল ঢেলে ধুয়ে দিতুম..."

"কয়লাভাঙা লোহাটাকে সেদিন সকাল থেকে দেখিনি।"

গিরি আড়চোখে দেখল। মনে হল রুনুর মুখ থেকে যেন রক্ত শুষে নেওয়া হয়েছে।

"আমি তো খেয়াল করিনি। কয়লা তো ভেঙেই দোকান থেকে পাঠিয়ে দেয়, তাই ওটার কোনও দরকারই হয় না।"

"আমি আগের দিনও ওটা দেখেছিলাম।"

গিরি ডান হাতের দুটো আঙুল মাথার ব্যান্ডেজে ছোঁয়াল। রুনুর চোখে বিভ্রান্তি।

"লোহাটা খুঁজেছিলাম যখন তুমি বেরিয়েছিলে অম্বরের সঙ্গে, পাইনি কোথাও। অম্ববেব ঘরটা অবশ্য তালা দেওয়া ছিল।"

ওরা অনেকক্ষণ কথা বলেনি।

"তুমি একটা ভয়ংকর রকমের বাজে চিন্তা করছ।"

রুনু উঠে চলে যাওয়ার পর গিরির মনে হয়েছিল, বোধহয় ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু ওবাও কি ভয়ংকর চিন্তার প্রভাবে এই কাজটা করেনি?

বালিশে থুতনি রেখে গিরি উপুড় হয়ে শুয়ে। খোলা বারান্দার দরজা দিয়ে তার দৃষ্টি, জাফরির ওপারে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। আট দিন হল সে হাসপাতাল থেকে ফিরেছে।

যে ক'দিন সে হাসপাতালে ছিল রুনু প্রতিদিন গেছে। চুপ করে বসে থাকত। গিরিও কথা বলত না। কখনও তাদের চোখাচোখি হত। দু'জনেই চোখ সরিয়ে একই সঙ্গে জানলার বাইরে তাকাত। সাধারণ কথা মাঝে মাঝে বলেছে যখন নীরবতাটা তিক্ত হয়ে পড়ত। যেমন, "বাসে কি খুব ভিড় ছিল আজ? নার্স বলেছিল আজ ট্রাম ধর্মঘট হয়েছে।"

"না তেমন কিছু ভিড় নয়।"

কিছু পরে গিরি আবার জিজ্ঞাসা করে: "ট্যাক্সিতে শেয়ারে যেতে পারো।"

"কী দরকার।"

কিছু নয়। কী দরকার। গিরির কাছে এ-সব কিছু নয়, এ-সবের দরকার নেই কারণ গিরি ওই জগতের কেউ নয়। ও-সব নিয়ে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে বলেই দায়সারা উত্তর। "তেমন কিছু নয়"। প্রতিদিনই যখন বাড়ি ফেরে তখন দেখে মনে হয় না কষ্টকর একটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এল। জীবনের স্রোত থেকে যেন সরে এল। বিশেষ একটা জীবনের, যেটা অনেক উত্তেজক ঘটনাবহুল ঘরে যাপন করা তার জীবন থেকে।

রুনুকে সে জীবনে কী দিতে পেরেছে?

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গিরির চোখ জ্বালা করছে। বালিশে মুখ চেপে ধরল। তারা স্বামী-স্ত্রী নয় বটে, কিন্তু পুরুষ এবং নারী। বহু বছর একসঙ্গে বাস করছে, একই বিছানায় শুচ্ছে। ও ভোরে উঠে উনুন ধরায় বাসন মাজে, ঘর মোছে, চা করে অফিস যায়। ফিরে এসে ঘরের মধ্যে কাটায়। আত্মীয় নেই,

প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করে না, বন্ধুদের বাড়ি যায় না। কখনও হয়তো তারা দু'জনে পথে বেরোয়, একই পথ ধরে একই বাড়ি, একই দোকান, একই দৃশ্য দেখে ফিরে আসা। ভরা যৌবনা মেয়েমানুষের পক্ষে এটা কি কোনও জীবন? তার কি কোনও অধিকার আছে রুনুকে এই সংকুচিত জীবনের গণ্ডির মধ্যে দণ্ডভোগ করতে বাধ্য করানোয়?

কিন্তু এরজন্য একটা দীর্ঘদিনের পরিচিত লোককে মেরে ফেলতে চাওয়া কেন? রুনু তো অনায়াসেই তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারে। যে-কোনও লোকের সঙ্গে এমনকী অম্বরের সঙ্গেই যেতে পারে। অম্বর নিশ্চয় ওর থেকে সাত-আট বছরের ছোট। তাতে কিছু এসে যায় না। স্থূল ধরনের রুচি, সরল এবং ভোঁতা বুদ্ধি। শুধুই শরীরের ভরে জীবনটাকে দাঁড় করিয়েছে, রুনুর মাংস ছাড়া আর কিছু ওর প্রয়োজন হবে না। রুনু পাবে দু' পাওয়ালা একটা লোক, যে ওকে খুশি রাখার জন্য ব্যস্ত হবে, আমোদ দেবে। ওকে দু'হাতে তুলে নিয়ে অন্তত এক হাত হাঁটার ক্ষমতা তো অম্বরের আছে।

দুরত্বটা কম করেই সে ধরেছে। হাসপাতাল বেড থেকে চাকা লাগানো চেয়ারে বসে লিফটে এবং একতলায় ট্যাক্সির কাছে সিঁড়ি পর্যন্ত তাকে আনা হয়েছিল। ক্রাচ দুটো নিয়ে আসার কথা রুনুর মনে ছিল না। কিন্তু অম্বরকে সঙ্গে এনেছিল। চেয়ার থেকে উঠে কারুর কাঁধে ভর করে এক পায়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামলে মাথায় ধাক্কায় লাগবে।

দু'জন ওয়ার্ড বয়কে ডেকে গিরিকে তুলে ট্যাক্সিতে বসাবার কথা যখন হচ্ছে, তখন অম্বর ওকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করায় এবং পরমুহূর্তে পাঁজাকোলা তুলে সিঁড়ির চারটে ধাপ নেমে ট্যাক্সির দরজার কাছে এসে নামিয়ে দেয়।

বড়জোর পনেরো সেকেন্ড। গিরি নিজেকে অত্যন্ত অসহায়, পরনির্ভরশীল বোধ করেছিল। বিশেষত রুনুর সামনে এটা ঘটায়।

রুক্ষ স্বরে সে বলেছিল. "ক্রাচ আনোনি কেন?"

পাঁচ দিন সে হাসপাতালে ছিল, পাঁচ দিন পাঁচ রাত ওরা দু'জন এই ফ্ল্যাটে ছিল। ওই পাঁচটি দিনের যে-সময়টুকু অজ্ঞান হয়ে বা ইনজেকশন দ্বারা ঘুমিয়েছে তার বাইরে জাগ্রত অবস্থাটুকু অসহনীয় হয়ে উঠেছিল শুধু এই চিন্তায়। ডাক্তার বলেছিল আরও চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে। সে রাজি হয়নি।

সম্ভবত এই বিছানায় দু'জনে শুয়েছে। গিরি বালিশ শুঁকল। রুনুর চুলের গন্ধ। উপুড় হয়ে শুঁকতে শুঁকতে বিছানাটার প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করল। অম্বরের অস্তিত্ব না পেয়ে হতাশ হল। ওর গায়ের গন্ধটা তার জানা। হয়তো অম্বরের বিছানায় রুনুর গন্ধ পাওয়া যাবে।

ওরা স্বাধীন ছিল পাঁচটা দিন-রাত।

বিছানায় বসে আছে গিরি। রেলিংয়ের উপর দিয়ে রাস্তা দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ মোহনকে দেখল স্কুটারে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। অপেক্ষা করছে গাড়ি দেখার জন্য পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে। ডান দিকে বনমালী সরকার লেনে ঢুকবে। ও জানে না গিরি মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে ছিল। জানলে নিশ্চয় দেখতে যেত। গিরির ইচ্ছা করল ওকে চিৎকার করে ডাকতে।

ক্রাচটা বগলে দিয়ে সে দ্রুত বারান্দায় এল। মোহনের স্কুটার তখন বনমালী সরকার লেনে ঢুকে পড়েছে। তা হলে এখন বুলি এখানেই থাকে।

গিরি অদ্ভুত রকমের একটা অনুভবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কুৎসিত ভয়ংকর চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া যায় কী করে। চাবি ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেডিয়ো বন্ধ করার মতো চিন্তা বন্ধ করার কোনও উপায়ের কথা বার বার ভেবেছে। কিন্তু একটা চাবিও পাওয়া সম্ভব হয়নি।

বহুবার চোখে ভেসে উঠেছে রুনুর বাবার বসার ভঙ্গি, আকাশে তাকানো চোখজোড়া। তখন লোকটির স্ত্রী হয়তো ভিতরের ঘরে প্রাইভেট কথা বলায় ব্যস্ত। রুনুর কি এমন কোনও ভিতরের ঘর আছে? চোখ বন্ধ করেও গিরি ছবি দেখা বন্ধ করতে পারেনি। বরং এই ছবির পরই ভেসে উঠেছে আর একটা—সে নিজে বসে আছে শূন্য দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

তা হলে বুলি এখন মোহনের ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে রয়েছে। নয়তো মোহন এই দুপুরে কী জন্য আসবে। একটা চোখ নষ্ট হওয়া, মুখে বসন্তের আঁচড়, বয়সে মোহনের মেয়ের থেকে দু'-চার বছরের বড়, সবে কলেজে ঢুকেছে। গিরি আঁচ করার চেষ্টা করল বুলিকে কেমন দেখতে।

রোদটা বারান্দা থেকে সামনের বাড়ির দেয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বারান্দার মেঝে এখনও তেতে। গিরি ঘরের মধ্যে ফিরে এল। ঘামছে সে। পাশের ঘরে সারারাত খটখট শব্দ হচ্ছিল পাখাটা থেকে। পুরনো পাখার বুশ বেয়ারিং ক্ষয়ে গেছে নিশ্চয়। এই ঘরের জন্য একটা পাখা ভাড়া করলে মন্দ হয় না। ইচ্ছাটা সে মুহূর্তেই পরিত্যাগ করল, কেননা পাখা ভাড়ার টাকা রুনুকেই দিতে হবে। উপরন্তু দেড়শো টাকা কমে যাচ্ছে সামনে মাস থেকে। অম্বর কয়েক দিন পরই সম্ভবত চলে যাবে।

ঘাড়ের পিছনে দুটি বালিশ দিয়ে মাথাটাকে উঁচু রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে শুরু করল, বুলিকে কেমন দেখতে। ছিপছিপে, লম্বায় পাঁচ-চার কি পাঁচ-তিন, শ্যাম বর্ণ। একটা চোখ না থাকায় অন্যটি কোমল এবং বিষণ্ণ। নাকটি উঁচু যার ফলে পাশ থেকে অন্যদিকের চোখটি দেখা যায় না। ওর কোন চোখটা নষ্ট? বাঁ দিকের হলে ডান দিক থেকে লোকে যাতে দেখে সেইভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকে নিশ্চয়ই। হাতের আঙুল লম্বা কিন্তু তালুটা তুলনায় ছোট, নরম এবং রেখাগুলো গভীর। হয়তো কনুইয়ের নীচে লোমগুলো বড়।

গিরি হেসে উঠল শব্দ করে। প্রায় ষোলো-সতেরো বছর আগের রুনুকেই সে মনে করার চেষ্টা করছে। বুলি এখন সেই বয়সিই। নিশ্চয়ই তখনকার রুনুর মতোই হাসে ঠোঁট দুটি দু'পাশে ছড়িয়ে নাকের পাশে ভাঁজ তৈরি করে, দাঁত না দেখিয়ে। ওই বয়সি মেয়েরাই, যখন ব্যক্তিত্ব সংগ্রহ করতে শুরু করেছে, তখন তাদের মধ্যে অনেক মিল ধরা পড়ে। চলায়, চাহনিতে, বসায় এমনকী বিস্ময় বা বিরক্তি প্রকাশেও।

বুলিকে মনে মনে গড়ে তুলতে গিয়ে বারবার গিরি দেখতে পেল রুনুকে। গিরিই বলেছিল, "তোমার মা-র কাছে যাব এবার।"

"কেন?"

অসম্ভব চমকে উঠেছিল রুনু।

"কোনও দরকার নেই যাবার।"

"তা হলে কাকে বলব বিয়ের কথা? তোমার বাবা তো..."

"কাউকে বলতে হবে না। আমি নিজেই আমার গার্জেন।"

এই ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারা কথা বলছিল। আগের ভাড়াটেদের ফেলে যাওয়া ছেঁড়া কাগজ, ঝুড়ি, ভাঙাচোরা জিনিসগুলো তখন ছড়ানো। বিনা সেলামিতে মোহনই ফ্ল্যাটটা পাইয়ে দিয়েছিল। তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে রুনুকে দেখাতে এনেছিল সে।

দিন চারেক পরই সন্ধ্যাবেলা কড়ানাড়া শুনে গিরি দরজা খুলে দেখে রুনু। কাঁধে ঝোলা ভরতি বই, হাতে ছোট সুটকেস।

"চলে এলাম।"

"মানে!"

"এখানেই থাকব আজ থেকে।"

সেইদিন থেকে ওরা একসঙ্গে বাস করছে। নিজের গার্জেন যে ও নিজেই সেটা আজও গিরি ভুলতে পারে না। বিয়ের কথা ওরা তোলেনি, তার দরকারও বোধ করেনি। এতই ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

কিন্তু বুলির পক্ষে এটা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই রুনুর মতো শুধুই ভালবেসে মোহনের সঙ্গে সে পরিবার ছেড়ে বাস করতে আসেনি। গিরি তখন যুবক, অবিবাহিত, মোহনের এই সুবিধা নেই। হয়তো টাকা দিয়ে ঘাটতিটা ঢেকে নিয়েছে। বুলির বাবার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে হয়তো।

অত্যন্ত চতুর। মোহন ঝোঁকের মাথায় কখনও কখনও কিছু কাজ করেছে সেটা ব্যবসা সংক্রান্ত, কিন্তু জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে অতি কৃপণ, সাবধানী।

"মিসেস মজুমদারের কাছেও আমি ও-সব পকেটে নিয়ে যাই।"

বুলি যদি কুদর্শনা না হত, মোহন ওকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কিছুতেই করত না। কেউ ওর দিকে তাকাবে না, কারুর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কও গড়ার প্রশ্নই উঠবে না। মোহন নিশ্চিন্ত। এই রকম একটা ভাবনা রুনু সম্পর্কেও গিরির মাথায় মাসখানেক আগে এসেছিল। কুদর্শনা বা বিকলাঙ্গ হয়ে যাক কিংবা হঠাৎ বৃদ্ধা হয়ে যাক রুনু। তা হলে সব লোক গিরির দিকেই তাকাবে সমবেদনার দৃষ্টিতে, পুরুষদের ক্ষুধার্ত চাহনি চাইবে না রুনুর শরীর।

মোহনকে বয়সের তুলনায় অন্তত পনেরো বছর বেশি দেখায়। এটা ও জানে বলেই খুঁতওলা মেয়ে বেছে নিয়েছে। গিরির মনে হল, সে নিজেও কি তা হলে বুড়ো হয়ে গেছে? নয়তো রুনু সম্পর্কে সে এত ভীত সন্দিগ্ধ হয় কেন!

এইসব চিন্তা আর নয়। গিরি চোখ বুজে দ্রুত মনে করে যেতে লাগল প্রতিবেশীদের, ইউনিভার্সাল গ্যারেজের লোকদের, হাসপাতালের রুগি, ডাক্তার, নার্সদের, নিজের বাপ-মা, স্কুল এবং কিছুক্ষণে মধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলতে শুরু করল।

মিনিট পনেরো পর গিরি চোখ মেলে মাথা তুলল। টিপটিপ যন্ত্রণা। আলনায় রুনুর ব্লাউজ এমনভাবে ঝুলছে, সামান্য বাতাসেই পড়ে যাবে। গুমোট গরম, বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই। ঘরের সব কিছুই অনড় নিস্পন্দ। ব্লাউজটার রাখা দেখে বোঝা যায় রুনু তাড়াহুড়ো করে অফিসে বেরিয়েছে। হাতাবিহীন চোলিধরনের ব্লাউজটার আর একটা জোড়া আছে, সেটা পরেই বেরিয়েছে। অন্তত ছয় ইঞ্চি পিঠ ও পেট দেখা যায়।

গিরি পছন্দ করে না খাটো ঝুলের হাতাবিহীন ব্লাউজ। দু'জনে রাস্তায় বেড়াবার সময়, গিরি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছে এই রকম জামা পরা মেয়েদের দেখে। তবু পুজোর সময় রুনু ওই ব্লাউজ করিয়েছে।

"আমি যা-তা বলেছি দর্জিকে। করতে দেবার সময় বার বার করে বলে দিয়েছিলাম ঝুল বেশি হবে, হাতা হবে। এত দামি রুবিয়া ভয়েলের কাপড়টাই নষ্ট হল।"

গিরি বিরক্তি প্রকাশ করেছিল দর্জির অন্যমনস্কতা সম্পর্কে। কিন্তু এখন সে বিশ্বাস করে রুনুর নির্দেশেই এটা তৈরি হয়েছে। গিরি যা পছন্দ করে না সেটা পরা ওর উচিত কি অনুচিত সে প্রশ্ন উঠছে না। নিজে থেকেই ব্লাউজ দুটো তুলে রাখতে কিংবা অফিসের কাউকে দিয়ে দিতে পারত উপহার হিসাবেই। টাকা তিরিশেক খরচ হয়েছে। গিরির জন্য এটা অনায়াসেই করতে পারত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুনু সুন্দর হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু শরীরের অংশ দেখিয়ে সেটা জাহির করা কিংবা পুরুষদের দৃষ্টি টেনে আনার কী এমন দরকার হল? ওকি শুধুমাত্র গিরির চাহনি বা স্পর্শে খুশি নয়? ভালবাসা, পোশাক বা প্রসাধনের তোয়াক্কা করে না, ভালবাসাই লাবণ্য এনে দেয়। গিরির ভালবাসা এতই অভ্যেসমতো হয়ে গেছে যে এটাকে নিশ্চয় স্থায়ী একটা কিছু হিসাবে ও ভাবে। এটা জিইয়ে রাখার আর দরকার মনে করে না। কেন?

গিরি বিছানা থেকে নামল। একটু চা হলে ভাল লাগবে বা গুমোট কিছুটা সহনীয় হবে। তারপর মনে হল মোহনের সঙ্গে দেখা করে এলে কেমন হয়! খুঁজে বাড়িটা বার করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। স্কুটারটা নিশ্চয় বাইরেই থাকবে। ওটা দেখেই বাড়িটার খোঁজ পাওয়া যাবে। বুলি নিশ্চয় রান্না করে খায়। চা ওখানেই পাওয়া যাবে।

গিরি কাচানো পাজামা-পাঞ্জাবি পরল। এটা বুলির কথা ভেবেই। পরিচ্ছন্ন হয়ে সে ওর সামনে প্রথমবার হাজির হতে চায়। আয়নায় দাড়ি দেখল। চার দিনের দাড়ি, অর্ধেকই পাকা। সাবান মাখিয়ে কামাতে গেলে দেরি হবে। জলে ভিজিয়ে ক্ষুর দিয়ে চাঁছতে শুরু করল।

তখনও মুখের চামড়ায় জ্বালা করছে যখন সে রাস্তায় নামল। রোদের ঝাঁঝে চোখ মেলে দূরে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। বাড়ির ছায়ায় বসে এক বুড়ি ভিখিরি বাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। একবার মুখ তুলে তাকাল। তারপাশেই একটা ষাঁড় উদাসীন চোখে জাবর কেটে চলেছে। বাড়ির রকে মাথার নীচে ব্যাগ রেখে জুতো সারাইওয়ালা গামছায় মুখ ঢেকে ঘুমোচ্ছে। নরম পিচে টায়ারের চড়চড় শব্দ ছাড়া গিরির কানে আর কিছু ধাক্কা দিল না।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পার হয়ে সে বনমালী লেনে ঢুকল। তিন-চার বারের বেশি সে এই রাস্তায় ঢোকেনি। পুরনো বাড়িগুলোর মধ্যে নতুন তৈরি একটা বাড়ির দরজা ঘেঁষে মোহনের স্কুটারটা দেখতে পেল।

দরজাটা খোলা। তিনতলা বাড়ির প্রতি তলায় দুটি করে ছোট বারান্দা। অর্থাৎ ছটি ফ্ল্যাট। এর কোনটিতে মোহনকে পাওয়া যাবে?

দরজা পেরিয়েই মিটার বক্সগুলো। তার পাশে দেওয়ালে সারি দিয়ে চারটি লেটার বক্স। একটিতেও

মোহনের নাম নেই। প্রত্যেক নামের আগেই মিস্টার শব্দটি আছে। নামের নীচে ফ্ল্যাট নম্বরগুলো থেকে গিরি বুঝে গেল একতলার দুটি ফ্ল্যাটের একটিতেই মোহন থাকতে পারে।

গ্রীষ্মের দুপুরে ভুল দরজার কড়া নেড়ে ঘুমভাঙানো ঝুঁকির কাজ। দুটি দরজা একই রকমের। একটি পাল্লায় খড়িতে লেখা, "মধুমিতা"। বিবর্ণ হয়ে গেছে নামটা, এটা হতে পারে!

পিছনে দরজা খোলার শব্দে গিরি মুখ ফেরাল। এক প্রৌঢ়া মহিলা। চশমা, সাদা শাড়ি এবং ছাতা দেখে মনে হয় পড়ানোই পেশা। তার পিছনে একটি বছর সাত-আটের মেয়ে দরজা বন্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে সে ক্রাচ দেখছে।

এই ফ্ল্যাট কিছুতেই নয়। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য গিরি বিপরীতের বন্ধ দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "নতুন ভাড়াটে?"

মেয়েটি মাথা হেলাল।

"নাম জানো?"

"না।"

"কে কে আছে?"

"একজন মেয়ে একা থাকে।"

"একটা চোখ কানা, মুখে বসন্তর দাগ?"

গুটিয়ে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো পাজামার পায়ের দিকে কৌতূহলে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি আবার মাথা হেলাল এবং গিরির মাথার ব্যান্ডেজে চোখ রাখল।

কড়া থাকলেও গিরি টোকা দিল। মোহন এইভাবে টোকা দিত রুনুদের বাড়ির দরজায়। সেটা মনে পড়তেই, তখুনি সে কড়া নাড়ল মৃদুভাবে। পিছন ফিরে তাকাল। মেয়েটি লক্ষ করছে তাকে।

মোহন দরজা খুলল। অত্যন্ত অবাক হয়েছে।

"তুই, এখন!"

গিরি হাসল। মোহন খালি গায়ে লুঙ্গি পরে। জিরজিরে বুক। পায়ে হাওয়াই চটি।

"পড়ে গেছলাম কলঘরে, ক'দিন হাসপাতালে ছিলাম। দেখ, খুঁজে ঠিকই বার করেছি। তোকে দেখলাম স্কুটারে ঢুকলি, তাই—"

"ভেতরে আয়," এই কথাটা শোনার জন্য গিরি অপেক্ষা করতে লাগল। দরজার একটা পাল্লা বন্ধ রেখে মোহন দাঁড়িয়ে।

"এই দুপুরে, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, কেউ বেরোয়!"

মোহন শুধু ভর্ৎসনাই করল না, বিরক্তিও ফোটাল গলার স্বরে।

"একা দুপুর কাটানো যে কী কষ্টকর।"

"এত বছর তা হলে কাটল কী করে? রুনু তো অনেক বছর চাকরি করছে।"

"তুই এত কাছে আস্তানা করেছিস, দেখে আর থাকতে পারলাম না।"

"আসার সময় রুনুকে যেন দেখলুম, এসপ্ল্যানেডে কে সি দাসের সামনে। রাস্তা পার হবাব জন্য দাঁড়িয়ে।"

"ওখানে! এখন?"

"তাই তো দেখলুম। হাতে ব্যাগ, ডিপ খয়েরি রংয়ের শাড়ি।"

গিরির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মোহন ঠিকই দেখেছে। কিন্তু রুনু অফিস থেকে বেরিয়ে এখন কোথায় যাচ্ছে? সিনেমায়?"

"রুনু তো সাদা শাড়ি পরে বেরিয়েছে।"

"তা হলে অন্য কেউ।"

"চা খাওয়াতে পারবি। আসলে চা খাব বলেই তোর এখানে এলুম। নিজে হাতে তৈরি করে খেতে ইচ্ছে করল না।"

মোহন কয়েক সেকেন্ড কী ভেবে দরজার বন্ধ পাল্লাটা খুলে সরে দাঁড়াল। লম্বা এক ফালি গলি। তার একদিকেই ঘর। কলঘর, রান্নাঘর তারপর বড় শোবার ঘর। সেটাকে ক্যানভাসের পার্টিশনে দু'-ভাগ

করা। একটি বেতের সোফা, স্টিলের ফোল্ডিং টেবিল প্লাস্টিকের রঙিন চাদরে ঢাকা। তাতে পরিপাটি রাখা বই ও খাতা, পেনসিল, কলম। দুটি স্টিলের চেয়ার। দরজা জানালায় নতুন পর্দা। পার্টিশনেও পর্দা। সেদিকে গিরি তাকাল না।

মোহন সোফায় বসে গিরিকে একদৃষ্টে দেখছে। ঘরে আর কোনও জিনিস নেই তাকাবার মতো। গিরি টেবিলে কনুই রেখে চেয়ারে বসে। মনের মধ্যে ঝাপসাভাবে রুনুকে সে দেখতে পাচ্ছে রাস্তা পার হতে। মোহন অত্যন্ত ধূর্ত, ওর চোখ ভুল দেখে না। সাদা শাড়ির কথাটা নিশ্চয় বিশ্বাস করেনি।

"বুলি।"

মোহনের মৃদু গলার ডাক ঘরের অর্ধেকও অতিক্রম করেনি, গিরি তার পিছনে পর্দা সরাবার শব্দ পেল। সে মুখ ফেরাল।

ফ্রক পরিয়ে তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। রুগ্‌ণ, অপুষ্ট দেহ। মুখে বসন্তের ক্ষতের দাগ যে এতটা গভীর হবে সে ভাবেনি। বাঁ চোখটিতে মণি নেই তাই বন্ধ পাতা ভিতরে ঢুকে আছে। বুলিকে কখনও কোনও যুবক কামনা করবে না। এটা মোহন জানে, বুলিও হয়তো জানে। গিরি জানল।

"গিরি।"

বুলি পলকে গিরির দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা ঝোঁকাল। গিরি তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে টলে গেল এবং টেবিলটাকে ধরে সামলাল।

বুলি দু'হাত এগিয়ে ঝুঁকেছিল তাকে সাহায্য করতে এটা সে লক্ষ করল। ঠিক রুনুরই মতো। প্রথম সাক্ষাতেই গিরি কৃতজ্ঞতাবোধ দ্বারা বিব্রত হয়ে নমস্কার করবে কি করবে না দ্বিধায় পড়ে, ঠিক করল এতটুকু মেয়ের কাছে এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

"আমার কথা বুঝি ওকে বলেছিস?"

"গিরি চা খেতে এসেছে, হবে?"

"হ্যাঁ করে দিচ্ছি।"

"আমাকেও দিয়ো।"

বুলি ঘর থেকে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। ভ্রূ কুঁচকে মোহন ওর বেরিয়ে যাওয়া দেখল।

"এখন এসে তোর অসুবিধা করলাম।"

"না, কী আর অসুবিধে। বুলি এই সময়টায় পড়ে।"

মিথ্যে কথা, পড়ার কোনও চিহ্ন টেবিলে নেই। নিশ্চয় দু'জনেই শুয়েছিল পার্টিশনের ওপারে। চা খেয়েই চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল গিরি।

"একা পড়ে?"

"আমার কি পড়াবার মতো বিদ্যে আছে। অনেক এম এ বি এ পাশ মেয়ে তো টিউশনি করে দুপুরে, তাদেরই কাউকে রাখার কথা বলেছি।"

"ছেলে মাস্টারই ভাল পড়ায় শুনেছি।"

মোহন আঙুলের নখ চোখের সামনে ধরে মনোযোগে দেখতে দেখতে বলল, "হুঁ।"

বিনা পয়সায় পেলেও পুরুষ মাস্টার রাখবে না। মোহন চায় না, বুলির মনে বয়সোচিত এমন কোনও আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন ঝলক দিক, যা পয়সা বা স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে মেটানো যাবে না। এই ভাবে ব্যাপারটা দেখতে গিয়ে গিরি অস্বস্তিতে পড়ল। রুনু সম্পর্কেও তো সে এই রকমই ভাবে। রুনু কি এখন সিনেমা হলে অম্বরের পাশে বসে ইংরেজি ফিল্ম দেখছে। ইংরেজি ছবিতে চুমু, জড়িয়ে ধরা, কাপড় খুলে বিছানায় যাওয়া এ-সব তো সামান্য ব্যাপার। ইংরেজি কথা দু'জনেই বোঝে না, ওরা যাবে শুধু দেখতে।

মাথাটা টিপ টিপ করছে। গিরি ব্যান্ডেজে আঙুল ছোঁয়াল। রুনুর আকাঙ্ক্ষা যে কত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, এটাই তার প্রমাণ।

"কী করে পড়লি? হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হল!"

"তোর জন্য এটা হয়েছে। বোতলটা রেখে এলি, লোভ সামলাতে পারলাম না। ঢক ঢক শেষ করে

রাত্রে কলঘরে গিয়ে পড়লুম কলটার উপরে। মাথায় এমন গর্ত হয়েছে যে ডাক্তারেরা মনে করেছিল যেন কেউ ডান্ডা দিয়ে মেরেছে।"

"ও-ভাবে খাওয়াটা উচিত হয়নি। অনেক দিন পরে তো।"

"রুমু কেমন আছে?"

"ভালই। এখনও স্কুলে যাওয়া বারণ, তবে বাড়ির মধ্যে হাঁটা-চলা করে। হপ্তাখানেক পর আর একটা কার্ডিওগ্রাম করতে হবে। ...তুই বুলির কথা কাউকে বলেছিস নাকি?"

"রুনুকে? নাঃ।"

"বলাবলি না হওয়াই ভাল।"

"রাতে থাকিস?"

"না।"

"এই বাড়ির কি পাড়ার লোকেরা কৌতূহল দেখাবে কিন্তু।"

মোহন হাসল। এ-সব ওর জানা আছে। রুনুদের বাড়ি সম্পর্কে পাড়ার লোক হাসাহাসি করত। কেউ কথা বলত না। প্রতিবেশীদের সম্পর্কে রুনুর আড়ষ্টতা আজও কাটেনি। ওর মা যে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল! মোহনই একদিন ইউনিভার্সালে রুনুর বাবার খবর দেয়।

"রুনুকে বলিস ওর বাবা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

"সে কী, কবে?"

"দিন পাঁচেক আগে। পচা গন্ধ পেয়ে পাশের বাড়ির লোক পুলিশে খবর দেয়। আজই আমি শুনলুম, ও-পাড়ারই কাছাকাছি থাকে এক ফিটারের কাছে। ঘরের জিনিসপত্তর বেচেই খাচ্ছিল। শেষে বেচার মতোও কিছু ছিল না। দিন দশেক উপোস দিয়ে আর সহ্য করতে পারেনি।"

গিরির প্রথমেই মনে হয়েছিল, রুনুর ছবি দুটোও কি বেচে দিয়েছে? যে-ছবিতে ও বাবার কোলে। ভেবেছিল শোনামাত্র রুনু কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু এত ঘৃণা ওর মধ্যে আছে গিরি জানত না।

"ভালই করেছে, বেঁচে গেল।"

গিরি থ' হয়ে তাকিয়েছিল। রুনু তখনও মর্নিং কলেজের ছাত্রী, দু'বেলা রান্না করে। সারা দুপুর বাড়িতে থাকে।

"তোমাকে তো হবিষ্যি টবিষ্যি করতে হবে।"

"কিছু করব না।"

রাত্রে বুকে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল রুনু।

"আমার মা অমন হত না। শুধু বাবার জন্যই... শুধু বাবার অক্ষমতার জন্যই।"

গিরি তখন জানত না সে নিজে কিছুদিন পর অক্ষম হয়ে পড়বে। রুনু কি কারুর কানের কাছে মুখ রেখে এখন বলছে, "আমি এমন ছিলাম না, আমি ভালবাসতাম ওকে!"

গিরি আবার ব্যান্ডেজে আঙুল ঠেকাল।

"যন্ত্রণা হচ্ছে? দাঁড়া ট্যাবলেট দিচ্ছি।"

মোহন ক্যানভাস পার্টিশনের পর্দা সরিয়ে ভিতরে গেল। সেই সময় গিরি ঘরের ভিতরটা দেখার জন্য মুখ ফেরাল এবং চমকে পাংশু হল তার মুখ।

ভাঙা অ্যাক্সেলের টুকরোটা খাটের পিছনে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। খাট থেকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। আরও দেখল, সিঙ্গল বেড খাটে নতুন পালিশ, রঙিন বেডকভার, পাশাপাশি দুটো মাথার বালিশ।

গিরি ঝপ করে যেন একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। এখানে কেন লোহাটা? কী করে এল?

তা হলে মাথায় ওটা দিয়ে কেউ মারেনি। এতদিন অযথা বাজে সন্দেহ করে এসেছে। রুনুকে তো প্রকারান্তরে জানিয়েওছে এই সন্দেহের কথা। বেচারা রুনু।

"দুটো ট্যাবলেট একসঙ্গে খা। দাঁড়া জল আনি।"

মোহন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গিরি ঝুঁকে পর্দাটা তুলল।

সেইটেই। একদিকের মাথার ইঞ্চি খানেক ত্যারচা কাটা, লম্বায় সেই মাপেরই, কালচে। ওটার দিকে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে গিরির মনে হল, সে গর্তের আরও নীচে নেমে যাচ্ছে। শুধু নিজেই সে এতদিন একটা কদর্য ভয়ংকর চিন্তার চাপে নুয়ে থাকেনি, সেটা রুনুর মধ্যেও ঢুকিয়ে দিয়েছে। রুনু হয়তো অম্বরকেও বলেছে। ওরা কী ভাবছে গিরির সম্পর্কে!

এখন সে কী বলবে রুনুকে? লোহাটা পাওয়া গেছে মোহনের এই গোপন ডেরায়, তোমরা নিরপরাধ! মনের কুৎসিত চেহারাটা ওরা দেখে ফেলেছে। সেটা ঢাকতে, গোপন রাখতে দেরি হয়ে গেছে।

মোহন চুরি করে এনেছে। রুনু বা অম্বর লক্ষ করেনি। দরজার পাশেই জানলা, টুক করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। চুরির পুরনো অভ্যাসটা মোহন ছাড়তে পারেনি। ওদের লক্ষ করা উচিত ছিল। নিশ্চয় নিজেদের রান্নার ছলে দু'জনে ব্যস্ত ছিল। কেন ব্যস্ত থাকে? শাস্তি ভোগ করুক তা হলে অপরাধী সন্দেহের পাষাণভার বুকে নিয়ে।

গর্ত থেকে খানিকটা উঠে গিরি যখন নিরাপত্তার কথা ভাবছে তখনই চোখে পড়ল ঘরের দরজায় বুলি, হাতে চায়ের কাপ। ওর একমাত্র চোখটি বিস্ময়ে ভরা। গিরি অপ্রতিভ হয়ে ধরে থাকা পর্দাটা ছেড়ে দিল। বুলির পিছনে মোহনকে দেখা গেল জলের গ্লাস হাতে।

"আগে এ-দুটো খেয়ে নে, তারপর চা।"

ট্যাবলেট দুটো জল দিয়ে পাকস্থলীতে নামিয়ে গিরি চায়ের কাপ তুলে নিল বুলির হাত থেকে। আঁচলটা বুকে পিঠে জড়িয়ে বাঁ হাতে ধরা। দেখার মতো কিছুই নেই। যথাসাধ্য সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা ও নম্রতা ছাড়া।

"সেদিন থিয়েটার দেখতে গেছলি?"

"না। আমি আর রুনু বিকেলে বেরিয়েছিলাম।"

"রুনুও যায়নি!"

অবাক হবার কী আছে! ওর কি ধারণা রুনু খুব ফুর্তিবাজ চপল?

"দাঁড়িয়ে কেন?"

গিরি এখন ঠিক করতে পারছে না বুলিকে আপনি না তুমি বলবে। বয়সে অত্যন্ত ছোট, কিন্তু অপরিচিত তো বটে। যদি রাস্তায়, দোকানে বা ট্রামে এই বয়সি কোনও মেয়েকে কিছু বলার দরকার হয় তা হলে কি সে "আপনি" সম্বোধন করবে না?

আর একটা চেয়ার দেয়ালে ঠেস দেওয়া। সেটা পেতে বুলি আলতোভাবে বসল।

"গিরির কথা তো তোমায় বলেছি, খুব কাছেই থাকে।"

"এখান থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পড়লেই ওপারে তিনতলার বারান্দাটা।"

"এত কাছে!"

গলার স্বরটি গিরির ভাল লাগল। সরল কৌতূহল ঝিকমিক করছে একটা চোখে।

"আমার সম্পর্কে কী বলেছে ও?"

বুলি একবার তাকাল মোহনের দিকে।

"বলেছিলেন গিরি নামে এক বন্ধু আছে, তার একটা পা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল অনেকদিন আগে। তখন আপনারা দু'জনে এক জায়গায় কাজ করতেন।"

"আর?"

"আপনার স্ত্রী চাকরি করেন, খুব সুন্দর দেখতে।"

গিরি দেখতে পাচ্ছে মোহনের মুখ। রুনু সম্পর্কে কী গল্প করেছে বুলির কাছে? নিশ্চয় বলেনি অবিবাহিত দম্পতি, পাতানো বউয়ের রোজগারে বসে বসে খায়। বন্ধুকে ছোট করে দেখালে মোহন নিজেই গুরুত্ব হারাবে বুলির কাছে।

"আমি কিন্তু তুমি বলব।"

"নিশ্চয়, কত ছোট আমি আপনার থেকে।"

"বাজার করে কে?"

"বুলি মাছ খায় না। বাজারের যা-কিছু আমিই এনে দিয়েছি। তিন-চার দিনের মতো। একজনের জন্য

আর রেশনকার্ড করাবার দরকার কী, চাল-টাল বাজার থেকে কিনলেই হবে। গ্যাসেই রান্না হয়, বাসন মাজামাজির পাট নেই। ক'টা বাজে দেখো তো।"

বুলি উঠে পার্টিশনের ভিতরে গেল এবং মোহনের হাতঘড়িটা আনল।

"পৌনে চার! সাড়ে চারটের মধ্যে আমায় কয়লাঘাটায় পৌঁছতেই হবে।"

মোহন খাড়া হয়ে বসে ঘড়িটা পরছে। গিরিকে তা হলে এবার উঠতে হবে। ইচ্ছে করছে কিছুক্ষণ থাকতে।

এতক্ষণ সে রুনুকে, দুপুরে তার অফিস পালিয়ে কোথাও যাওয়ার কথাটা ভুলেছিল। আবার একা ফ্ল্যাটে চিন্তাগুলো পিঁপড়ের মতো ছেঁকে ধরবে।

ক্রাচ বগলে দিয়ে গিরি দরজার দিকে এগোল।

"চলি রে।"

"আচ্ছা।"

বলল না আবার আসতে। চায় না তার এই ডেরাটায় ভিড় হোক। কিংবা দ্বিতীয় কোনও পুরুষ বুলির সামনে আসুক। গিরিকে পুরুষ হিসেবে মোহন ভাবে কি?

পিছনে বুলি দরজা বন্ধ করতে আসছে। দরজার উপরে ছিটকিনিটা লাগানো রয়েছে। খুলতে গিরির অসুবিধা হবে ভেবে সে পিছন থেকে হাত বাড়াল। ব্যান্ডেজ ঘেঁষে বুলির হাতটা উঠতেই, লাগার ভয়ে আপনা থেকেই গিরি অস্ফুটে "আঃ" বলে মাথাটা সরিয়ে নিল।

"লাগল?"

বুলির ডান হাতের আঙুলগুলো গিরির বাম বাহুটা আঁকড়ে ধরল অপ্রস্তুত হয়ে। গিরি ওর একমাত্র চোখটিতে, ভয় লজ্জা বেদনা একসঙ্গে দেখতে পেল।

বুলি ধরে আছে হাতটা। গিরির মনে হল তার সারা শরীর থেকে স্নেহলোভী একটা উত্তাপ হাতের ওই জায়গাটার দিকে হামা দিয়ে এগোচ্ছে। আলতো করে সে বুলির আঙুলগুলোর ওপর ডান আঙুল রাখল।

"সামান্য। এখনও ভাল শুকোয়নি।"

মিথ্যাকথা। কিন্তু মিথ্যা বলার এত ভাল সময় কমই জীবনে আসে।

"ব্যথা দিলাম তো। আমারই দোষ।"

রুনুর মতো স্বর কিন্তু আরও অস্ফুট, কোমল, করুণায় ঘন। গিরির অনেক ভাল লাগল বুলির একটা চোখের দুঃখ, সমবেদনা। ও আমাকে অনেক বেশি বুঝবে রুনুর থেকে।

"দেখবি শরীর কেমন ঝরঝরে ফিট হয়ে যায়। ব্যথাট্যাথা একদম মিলিয়ে যাবে।"

ঘরের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে মোহন বলল। গিরি হাতটা তুলে ছিটকিনি খুলল।

"ব্যথা লাগেনি আমার।"

"ঠিক বলছেন!"

"হ্যাঁ।"

বুলি দরজা বন্ধ করছে। একটা পাল্লা ভেজিয়েছে। একটা চোখ আর ক্ষতভরা একদিকের গাল গিরি দেখতে পাচ্ছে।

"আবার আসব।"

অনুমতি নয়, প্রশ্ন নয়, ঘোষণাও নয়। একটা সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের মতো গিরি বলল।

বুলি মাথা হেলিয়ে দরজা বন্ধ করল।

ছয়

রুনু ফিরল সন্ধ্যা নামার পর।

বারান্দায় অন্যদিনের মতো গিরি আজও অপেক্ষা করছিল চেয়ারে বসে। জাফরির ফাঁক দিয়ে সে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে তাকিয়ে একটার পর একটা বাসকে উত্তরে যেতে দেখলেই ভেবেছে, এইটায় রুনু আছে। অফিস থেকে ফেরার বাস অঘোর ঘোষ স্ট্রিট থেকে পঞ্চাশ গজ উত্তরে থামে।

এত দেরি আর কখনও হয়নি। গিরির হিসাব কষাই আছে। লামসডেন অ্যান্ড মেহরোত্রা থেকে বেরোবে পাঁচটা দশ বা পনেরোয়, লালদিঘিতে আসতে মিনিট পাঁচেক। বাস পাওয়া এবং উঠতে পারার সময়ের হিসাব করাটাই হয় মুশকিলের। তবে পৌনে ছ'টা নাগাদ প্রায় প্রতিদিনই রুনু ফেরে।

বাস বা ট্রাম বন্ধ থাকলে হেঁটে ফেরে। তাতে আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেশি লাগে। ছ'টার পর রুনু বাইরে থেকেছে, গিরির মনে পড়ে না।

মোহন ঠিকই দেখেছে। আজ রুনুর দেরি হওয়ারই কথা। যদি সিনেমায় গিয়ে থাকে, তা হলে ওরা পাঁচটা কুড়ি বা সাড়ে পাঁচটায় হল থেকে বেরুবে। তবু ছ'টার মধ্যেই ফেরা সম্ভব। ছ'টা বেজে গেছে। তা হলে ওরা কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। সেখানে কম করেও আধ ঘণ্টা। সাড়ে ছ'টায় ফিরতে পারে।

রুনু ফিরল প্রায় সাতটায়।

তার আগে গিরি একবার চা তৈরি করে খেয়েছে। তখন সে মোহন এবং বুলির কথা ভেবেছিল। তার ভাল লাগছিল বুলিকে। অতটুকু মেয়ের পক্ষে বিপজ্জনক কাজই, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা। মোহন নিশ্চয় এমন কোনও চাপ তৈরি করেছে যে-জন্য বুলি ওর সঙ্গে বসবাসে বাধ্য হয়েছে। মোহনকে ভালবাসার প্রশ্ন ওঠেই না।

মোহনই খাটের পাশে লোহাটা রেখেছে। ওখানে রাখার কী দরকার? কেউ আক্রমণ করলেই হাত বাড়িয়ে যাতে পায়। কে আক্রমণ করবে কাকে ওর ভয়? ওর বউ, বুলির বাবা নাকি বুলিকেই ভয়!

কলেজে বা মোহনের সঙ্গে থাকার সময় ছাড়া বুলি কীভাবে সময় কাটাত? বই পড়ে? সম্ভব কি পড়ার বই নিয়ে বসে থাকা! গিরির নিজের কথা মনে পড়ল। পনেরো বছর এই ফ্ল্যাটে সে কাটাচ্ছে। দিনে একবার হয়তো বেরোয়। দু'-তিন দিন রাস্তায় পা পড়েনি এমনও হয়েছে।

দ্বিতীয়বার সে চা তৈরির জন্য কেটলিতে জল ভরছে তখন দরজায় কড়া নড়ল।

রুনু এসেছে। প্রতিদিনের মতো একই ভঙ্গিতে শব্দটা হয়েছে।

"যাই।"

প্রতিদিনের মতো গিরি সাড়া দিল। রুনুর হাতে প্যাকেট। দরজায় খিল দেবে রুনু। তাই দিল।

"চায়ের জল বসাচ্ছিলাম।"

"আমারও দিয়ো।"

রুনু ঘরে গেল কাপড় বদলাতে। অন্যান্য দিনের থেকে আজ চঞ্চল দেখাচ্ছে। লাবণ্য যেন অনেক বেড়ে গেছে। জ্বলজ্বল করছে চোখ মুখ।

চায়ের কেটলি বসিয়ে গিরি অপেক্ষা করতে লাগল টেবিলে। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে রুনু এল।

"কী আছে?"

রুনু শুধু হাসল দড়ির গিঁট খুলতে খুলতে।

"তোমার পাঞ্জাবি একজোড়া, খদ্দরের।"

গিরি উৎসাহভরে ঝুঁকে পড়ল।

"কোথায় কিনলে?"

"খাদি গ্রামোদ্যোগের রিডাকশনে। কত দাম নিয়েছে বলো তো?"

পাঞ্জাবি দুটো হাতে নিয়ে কাপড় পরীক্ষা করার ছলে গিরি দামের টিকিট দেখে নিল। এত দেরি করে ফেরার কারণ পাঞ্জাবি কিনতে যাওয়া নয়। এই দিয়ে অজুহাত তৈরি নেহাতই ছেলেমানুষি হবে। ও নিজে থেকেই বলুক কেন দেরি হল, দুপুরে বেরিয়েছিল কেন।

"পঁচিশ টাকা।"

"হল না।"
"আরও বেশি?"
"মোটেই না... আঠারো টাকা জোড়া। দারুণ সস্তা নয়?"
"সত্যি!"
"ছেঁড়া আছে পকেটের কাছে। বোঝাই যায় না এত সামান্য। সেলাই করে দেব।।"
"আর কী আনলে।"
"টাকা কোথায় যে আনব। অফিসে তরুণবাবু বলল কাল দুটো কিনেছে আর গোটা তিন-চার আছে। এখুনি গেলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।"
"তখুনি চলে গেলে?"
"অফিসের সময়ের মধ্যে বেরোই কী করে। ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে গেলাম, কম দূর!"
"সঙ্গে কেউ ছিল?"
"সবিতা ছিল। ও কিছু কেনেনি।"
"আর কেউ?"
"না।"
কেটলির জল ফোটার শব্দ হচ্ছে। রুনু চা করতে উঠল। গিরি পাঞ্জাবি ভাঁজ করে রাখল।
"অম্বরকে আর দেখতেই পাই না। কখন আসে কখন যে যায়। রাত্রে পাখার শব্দটায় বুঝি ও আছে।"
"একটু রাত করে ফেরে। যখন আসে কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাও না?"
"বুঝতে পারি না। খুব আস্তে আস্তে নাড়ে বোধহয়। ও কি রাত্রে খায়?"
"মাঝে মাঝে খেয়ে আসে।"
"বাইরে মাঝে মধ্যে খাওয়া মন্দ নয়।"
গিরি অপেক্ষা করল রুনুর জবাবের জন্য। কাপে চিনি ঢালছে একমনে হয়তো ও বলবে: "চলো-না তা হলে আজ বাইরেই খেয়ে আসি। একদিন কচুরি খেতে বেরোব বলেও তো বেরোনো হল না।"
কিন্তু রুনু একমনে চামচ নাড়ছে। গিরি অপেক্ষায়।
হয়তো বলবে: "আজ আর রাঁধতে ইচ্ছে করছে না।"
"তা হলে চলো বাইরে কিছু খেয়ে আসি।"
"কোথায়?"
"যেখানে কম খরচে খাওয়া যায়।"
"কচুরি! মনে পড়লেই একটা দিনের কথাও মনে পড়ে।"
চায়ের কাপ কাছে টেনে নিয়ে গিরি চুমুক দিল। রুনু টেবিলের ওধারে মুখোমুখি বসল। ওরা কথা বলছে না কিছুক্ষণ।
বোধহয় সিনেমা থেকে বেরিয়ে কোথাও বসে ওরা খেয়েছে, তাই আর বাইরে বেরিয়ে খাওয়াব ব্যাপারে উৎসাহ নেই। রাতে কি রুনু খাবে? লক্ষ করতে হবে।
"অনেকদিন পর ব্লাউজটা পরলে আজ।"
তাড়াতাড়ি রুনু আঁচল টেনে কাঁধ ঢাকল।
"পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, তাই ভাবলুম..."
"তোমাকে কিন্তু ভালই দেখায়, অনেক কমবয়সি লাগছে।"
"কত কম?"
"বছর পনেরো।"
"তার মানে কুড়ি-একুশের মেয়ের মতো?"
"হ্যাঁ, যখন এই ফ্ল্যাটে প্রথম তুমি এলে।"
"তখন আমায় কেমন দেখতে ছিল মনে আছে তোমার?"
"আছে।"

"আমি কিন্তু জানি না কিছুই। যদি ছবি থাকত তা হলে সেটা দেখে মনে করার চেষ্টা করতে পারতুম। খুব শক্ত নিজের চেহারা মনে রাখা।"

"তোমার তো তবু ছোটবেলার ছবি ছিল, আমার তা-ও ছিল না।"

"সে-ছবি আমায় খুব কষ্ট দিত। ভাবলে আজও দেয়।"

"কেন?"

খালি চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রুনু হাতটাও কাপের পাশে রেখে দিয়েছে। গিরি তার ওপর নিজের হাত রাখল। রুনু চোখ নামিয়ে নিরুত্তর রইল।

"আমি তোমার দুটো ছবিই দেখেছি।"

গিরি ভেবেছিল রুনুর চোখ সন্দিগ্ধ হবে। দুটো ছবি তাদের পক্ষেই দেখা সম্ভব যারা ভিতরের ঘরে গেছে। সে-ঘরে একটি উদ্দেশ্যেই বাইরের লোক যায়।

হঠাৎ ম্লান, ক্লান্ত দেখাল রুনুকে। ওর দিকে তাকিয়ে থেকে গিরি নিজেও ক্লান্তি বোধ করল। হয়তো রুনু জানে, গিরি এক দুপুরে গিয়েছিল ভিতরের ঘরে।

একটা ভোঁতা যন্ত্রণা গিরির মাথার মধ্যে ফেঁপে উঠছে। তার ইচ্ছে করছে সেটার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিতে। আর ইচ্ছে করছে রুনুর সঙ্গে কথা বলতে। মনের মধ্যে যত ধোঁয়াটে সন্দেহ, কুৎসিত ধারণা দমবন্ধ করছে, যখন তখন কুরে খাচ্ছে, সেগুলো গলগলিয়ে বার করে দিয়ে হালকা হতে।

একটা সুযোগের অপেক্ষা সে অনেকদিন ধরে করছে। কথা বলে মনটাকে হালকা করার সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হত বোঝা নামানো মানেই রুনুর মনের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। ব্যাপারটা নিছকই স্বার্থপরতা হবে।

"চলো বারান্দায় গিয়ে বসি।"

একটি মাত্র চেয়ার। দু'জনে মেঝেয় বসল। পর্দার তলা দিয়ে ঘরের আলো বারান্দায় পড়েছে। রুনু তার গোড়ালিতে আঙুল ঘষছে চেয়ারে ঠেস দিয়ে। রেলিংয়ে পিঠ দিয়ে গিরি।

"তোমার আর ব্যথা করে রাত্রে?"

ঘুমের মধ্যে নড়াচড়ায় গিরির মাথায় লেগে যেতে পারে, তাই রুনু এখন মেঝেয় শোয়।

"দিনেরবেলায় করে।"

"দুপুরে ঘুমোও?"

"না।"

"তা হলে কী করো, বসে বসে শুধু ভাবো?"

"হ্যাঁ।"

"কী ভাবো? আমার কথা?"

"হ্যাঁ, তোমার কথা। তোমাকে সুখী করতে না পারার কথা।"

"আমি সুখী নই, এটা বুঝলে কী করে?"

"নিজের দিকে তাকিয়ে। কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা ভাবতে ভাল লাগে। নিজেকে শক্তিমান বিচক্ষণ স্বাবলম্বী এইসব, আমাকে ছাড়া পৃথিবীতে তোমার কোনও ভরসা নেই, কোনও প্রয়োজন নেই, অবলম্বন নেই।"

রুনু কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। হাত বাড়িয়ে গিরির বাম উরুর 'পরে রাখল। মাথা নাড়ল গিরি।

"আমি কিন্তু সুখী।"

"আমি সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি।"

"দিনরাত কি তুমি এই চিন্তাই করো?"

গিরি ইতস্তত করল।

"একা থাকলে মানুষ চিন্তা করবেই। যখন তুমি বেরিয়ে যাও কেমন অদ্ভুত একটা অস্বস্তি, ভয় আমাকে পেয়ে বসে।"

"আমি তা হলে চাকরি ছেড়ে দেব?"

"না না না, এটা পাগলের মতো কথা হল। খাওয়া পরার কথা বাদ দিলেও তুমি তো আর আমার মতো অঙ্গহীন নও। তোমার শরীরের, মনের জন্যই এই ছোট্ট জায়গায় বন্দি হয়ে থেকে কী লাভ?"

"তা হলে..."

"দাঁড়াও শেষ করতে দাও আমাকে।"

নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে গিরি বুঝল সম্ভব নয়। আবেগ তাকে মথিত করছে।

"আমি বেঁচে আছি তোমারই হাতে... তুমি বাইরে যাও, সেটা অন্য জগৎ... যখন ফিরে আস সেই জগতের রূপ রস গন্ধ মনে মাখিয়ে নিয়ে। আমরা দু'জনে দু'রকম মন নিয়ে বাঁচছি। আমি আমার এই খুদে জগতে বসে নানা দুঃস্বপ্ন গড়ছি আর তার মাঝেই চাইছি, আন্তরিকভাবেই, তোমাকে ভালবাসতে। কী যে কঠিন ব্যাপার একা এ-ভাবে সময় কাটানো। মাঝে মাঝে তোমার বাবাকে মনে পড়ে। একা চুপচাপ বসে আকাশে তাকিয়ে দিন কাটাতে সত্যিই ক্ষমতার দরকার।"

"আমরা অন্য কোথাও বাসা বদল করি..."

রুনু জবাব দিল না। রুনু হাত বুলোচ্ছে তার উরুতে। স্থান বদল করলে মন বদলাবে যে-সব ব্যাপারে, এটা তা নয়। সে জানে, অম্বর চলে গেলেও সন্দেহের জ্বালা থেকে রেহাই পাবে না।

"কিংবা তুমি একটা কিছু কাজ নিয়ে যদি ব্যস্ত থাকতে পারো।"

"ঠোঙা বানানো?"

"ঠাট্টা নয়। সিরিয়াসলিই বলছি। মোটরের কাজটাজ কি একদম ভুলে গেছ?"

"হ্যাঁ।"

"ভাবছিলুম, মোহনবাবুর তো কারখানা আছে, সেখানে গিয়েও যদি রোজ বসো। আবার সব মনে পড়ে যাবে।"

"অনেক কিছুই মনে পড়ে যাবে।"

ছড়ানো বাঁ পায়ের পাশে ডান হাঁটুর নীচে অদৃশ্য পায়ের ওপর গিরি চড় মারল। মেঝেয় শব্দ হতেই সে হেসে উঠল।

"শব্দটা হত না যদি মোহন কথাটা কানে নিত। ওকে তিন দিন আগে একজন মেট জানিয়েছিল লিফটে লিক করছে, ভাল্‌ভ ব্লক থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। লিফট বিপজ্জনক জেনেও আমাকে লরিটা চেক করতে পাঠিয়েছিল তলায় ঢুকে। হয়তো আশা করেছিল অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে—আমি মরেও যেতে পারি।"

"কেন, তোমার মনে হল কেন?"

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু অন্যের চোখের সাদা অংশটুকু ছাড়া ওরা আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার দ্বারা বুঝতেও পারছে না, কী ভাবছে অপরে। নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠতে গিরি অবশেষে বলল,

"তোমার প্রতি দুর্বলতা ছিল।"

গিরি সাবধানে 'আছে' শব্দটি এড়িয়ে গেল।

"বহুকাল আগের কথা।"

"তোমার মা চলে যাওয়ার পর দু'মাস কীভাবে তোমার চলেছিল?"

রুনু চমকাল না। স্বাভাবিক স্বরে বলল, "ভিক্ষে করে চলেছিল।"

"এড়িয়ে যাচ্ছ প্রশ্নটা।"

"তোমার কী মনে হয়?"

"মোহনের কথাই মনে হয়।"

"তুমি তা হলে জানো।"

"কী জানি? তুমি আমায় কিছু তো বলোনি।"

"বলার মতো নয় বলেই জানায়নি। দু'মাস হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তোমার কাছে হাত পাততে পারতুম, কিন্তু ওকেই বেশি পাকা লোক মনে হয়েছিল। এমন ক্ষেত্রে, বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। শরীরকে শরীর দিয়েই বাঁচানো ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না। এত বছর পর

ছেঁদো কথা বলে, তর্ক করে লাভ নেই। পছন্দ-অপছন্দ বা ভালবাসাবাসি এ-সব আমাদের মধ্যে ছিল না। মোহন টাকা দিয়েছে আমি শোধ করেছি। জানতাম যতটুকু পাওয়া যায় তার বেশি কিছু ও চাইবে না। আত্মমর্যাদার প্রশ্ন নয়, বাঁচার ব্যাপারটাই বড় ছিল।"

গিরি চমকাল না, আহত বোধ করল না। তার বহুদিনের অনুমান মিথ্যায় পর্যবসিত হয়নি। রুনুকে দু'মাস টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে মোহন। সে দুঃখবোধ করল রুনুর জন্য। কুৎসিত, রুচিহীন, স্বার্থপর একটা লোককে দু'মাস সহ্য করতে হয়েছে, এর থেকে অত্যাচার আর কী হতে পারে!

"ও রোজ আসত?"

"প্রায়ই।"

"থাকত?"

"রাতে? ...মাঝে মাঝে থেকেছে।"

এত অসংকোচ স্বীকারোক্তি গিরি আশা করেনি।

"আমার সম্পর্কে কিছু বলত?"

"চাইত না তোমার সঙ্গে মেলামেশা করি।"

"কেন!"

রুনু হাসল, "ও জানত তোমার আমার মধ্যে গভীর কিছু একটা আছে। সেইটাই ও নিজে চাইত।" রুনু আবার হাসল।

"আশ্চর্য, এ-সব কিছুই জানতাম না। "তখন রোজই আমাদের দেখা হত কিন্তু তোমায় দেখে কিছুই বুঝতে পারতাম না। মোহনের সঙ্গেই তো তুমি থেকে যেতে পারতে।"

"সম্ভব নয়। ও লোকটা অন্যের জীবন দখল করে, জীবন পেতে চায়। কিছুদিন ধার দেওয়া যায়, চিরকাল কি সম্ভব?"

"আমিও তো তোমার কাছে জীবন ধার করে এখন বাঁচছি।"

"ও-কথা বোলো না। দুটো একরকম নয়। এখনই আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা করছি। একটা উদ্দেশ্য কিংবা একটা দায়িত্ব যাই বলি না কেন, পালন করছি। তৃপ্তি পাই, খাটুনিকে বিরক্তিকর মনে হয় না। আমার জীবনের সব থেকে সুখের সময় এখনই বোধ হয়।"

"যা-সব বললে, তাতে তোমার ভয় করছে না? মনে হয়নি কি, আমি রেগে যাব, ঘেন্না করব তোমাকে?"

"বলার সুযোগ পেলে আগেই ওই ব্যাপারটা বলতাম। আমি তো জানি তুমি আমায় কত ভালবাস।"

রুনু ঘুরে বসে গিরির বুকে হাতের পাঁচ আঙুলই স্পর্শ করল। অনুভবটা আজ দ্বিতীয়বার সে পেল। বুলি যখন ছুঁয়েছিল, সেটা প্রথমবার এত অসংকোচে তারা কখনও কথা বলেনি।

"আমারও একটা কথা বলার আছে। একদিন দুপুরে তোমার মার কাছে..."

"জানি।"

গিরি প্রশ্ন করল না কার কাছে ও শুনেছে। মোহন ছাড়া আর কেউ বলার নেই। হঠাৎ একটা ক্রোধ তাকে ঝাঁকুনি দিয়েই রগের কাছে কেন্দ্রীভূত হল। সেখান থেকে তার সারা দেহে একটা তরঙ্গ কেঁপে কেঁপে বয়ে গেল বার কয়েক। প্রাণপণে সে নিজেকে সংযত করে রাগ থেকে নিজেকে মুক্ত করল। বহুকাল ঘরের কোণে রাখা সিন্দুক সরিয়ে নিলে মেঝেয় তার পায়ের দাগ রয়ে যায়। বুকের মধ্যে গিরি দাগ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু বুকটা বড় লাগছে, ফাঁকা বোধ করছে।

হঠাৎ সেই ফাঁকা জায়গাটায় একটা লোহাকে সে দেখতে পেল। দেয়ালে হেলান দেওয়া, খাট থেকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। রুনুকে এটার কথা জানানো যায়। ওর বুক থেকে পাষাণভার তুলে নিয়ে ওকে সে মুক্তি দিতে পারে।

"লোহাটা অম্বরের ঘরে আছে কি না দেখেছ?"

"লোহা! কোন লোহা?"

রুনুর বিস্মিত ত্রস্ত স্বরে গিরি মায়া বোধ করল। বুক থেকে হাতটা আস্তে তুলে নিল।

"তোমার কি ধারণা..."

গিরি মনে মনে হাসল। বলুক কী বলবে।

"অম্বর তোমার মাথায় মেরেছে? কেন মারবে?"

"আমি কি তাই বলেছি? তুমি অযথা সন্দেহ করছ। আমাকে মেরে ফেলবে কেউ এটা চিন্তাই করতে পারি না।"

"সেই বকম ইঙ্গিতই দিয়েছ এর আগে।"

"তোমাদের মধ্যে কোনও ব্যাপার ঘটেনি?"

রুনু দু'হাতের ভরে সামনে ঝুঁকে গিরির মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "তুমি এইসব চিন্তা শুরু করেছ, তার মানে বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার এই ব্যাপারটা, সন্দেহ করাটা আমার বিশ্রী লাগে। আমি ঠিকই বুঝতে পারি, কিন্তু কেন, কেন? আমার মধ্যে কী দেখলে যাতে মনে হতে পারে আমি... অন্যে আসক্ত? তোমার মন নোংরা হয়ে গেছে, আমি বলছি।"

কাঁচা পিঁয়াজ আর রাই-এর গন্ধ গিরি পাচ্ছে রুনুর মুখ থেকে।

দুপুবে সিনেমা দেখে তা হলে ওরা রেস্টুরেন্টেই গেছল। কাটলেট, চপ, মোগলাই পরটা, ফিশ ফ্রাই এ-গুলোর সঙ্গেই কাঁচা পিঁয়াজ, রাই দেয়। পনেরো বছর লুকিয়ে রেখেছিল অনেক কথা। লুকিয়ে বাখতে ও পারে।

"বোধ হয় বুড়োই হয়ে গেছি।"

গিরি স্থির করল লোহাটার কথা রুনুকে বলবে না।

সাত

অন্যদিনের মতো গিরি ভোববেলায় বারান্দায় এসে চেয়াবে বসল।

শেষ বাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাস স্থির। অঘোর ঘোষ স্ট্রিট ভোরে আবছা আলোয় স্যাঁতস্যাঁত করছে। চেয়ারটা ভিজেছে। নিলাম থেকে কেনা কোনও এক বনেদি বাড়িব জিনিস। অত্যন্ত ভাবী। গত বছর এক দুপুরে বৃষ্টির সময় গিরি এটাকে টেনে ঘরে ঢোকাবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

অফিস থেকে ফিরে রুনু চেয়ারটাকে ঘরের মধ্যে আনে। চৌকাঠ পার করার জন্য তুলতে হয়েছিল। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে যখন তুলছিল, গিরি তখন লক্ষ করে ওর ফুলে ওঠা কাঁধের পেশি, সংকুচিত কোমব, কঠিন নিতম্ব!

রুনুর দেহে তারুণ্য লুকিয়ে আছে, গিরি কাল থেকে এটা আবার আবিষ্কাব করেছে। খেলোয়াড়ের মতো মেদবিহীন মসৃণ গড়ন। গত রাত্রে রুনুকে খাটে এসে শোবার জন্য বলতে ইচ্ছে করছিল। কাল সন্ধ্যা থেকে ওকে অপবিচিত একটা মেয়ের মতো মনে হচ্ছে। ওর গতিবিধি, কণ্ঠস্বর, চাহনি অশ্লীল অভিপ্রায়গুলোকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করছিল।

স্বচ্ছ এবং স্থির ভোরের বাতাস দীর্ঘ গভীর শ্বাস-দ্বারা ফুসফুসে টেনে গিরি তাজা বোধ করছে। রেলিংয়ের জাফরিব ফাঁক দিয়ে সে রাস্তায় তাকিয়ে। প্রতিদিনের ভোরের মতোই একটি ভোর। শান্তভাবে একটি দিন শুরু হচ্ছে।

রুনু চা করছে। অম্বর এইমাত্র কলঘর থেকে বেরোল। ওরা আর গল্প করে না। দুটি সিদ্ধ ডিম খোসা ছাড়িয়ে টেবলে রাখবে রুনু। একজোড়া কলা থাকবে তার পাশে। অম্বর যখন খাবে, রুনু তখন কাজে ব্যস্ত হয়ে শোবার ঘর থেকে রান্নাঘর যাতায়াত করবে। নিশ্চয় অম্বরের চোখ অনুসরণ করবে ওকে।

"তোমার চা।"

গিরি হাত বাড়িয়ে কাপ নিল। রুনু ব্লাউজটা বদলেছে। বাসিচুল কানের পাশে ঝুলে রয়েছে। এখনও স্নান করেনি।

"আজ বাজারে যেতে হবে।"

"তোমার মাথা এখন কেমন?"

"ভালই। বেলায় বাজারে ভিড় থাকে না, ধাক্কা লাগার ভয় নেই।"

"টাকা রেখে যাব।"

চা খেয়ে গিরি কাপটা মেঝেয় নামিয়ে রাখল। অম্বর মাঠে যাবে এখন। সামনের হপ্তা থেকেই লিগ শুরু হচ্ছে। তখন প্র্যাকটিস বন্ধ হবে। সকালে মাঠে যাবে না, ভাত এখানেই খাবে। ভিতর থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে না। ওরা বোধ হয় চুক্তি করে ফেলেছে গিরির সন্দেহ উদ্রেকের মতো কিছুই করবে না।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত রাস্তাটা জাফরির একটা ফাঁক দিয়ে গিরি দেখতে পাচ্ছে। ওপারে বাস স্টপে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। ছাপা সবুজ শাড়ির তলার অংশ দেখা যাচ্ছে। সে কুঁজো হল মেয়েটিকে দেখার জন্য।

বুলি!

হাতে খাতা বা বই ছাড়া আর কিছু নেই। এত দূর থেকে ওর কানা চোখটি দেখা যায় না। কলেজে যাচ্ছে। স্টপে আর কোনও লোক নেই। উত্তরে মুখ করে বাসের জন্য তাকিয়ে। ও হয়তো ভুলে গেছে রাস্তার ওপারে তিনতলার বারান্দায় গিরি থাকে। নয়তো কৌতূহলভরে দু'-একবার অন্তত তাকাত।

গিরি উঠে দাঁড়াল।

অম্বর এগোচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে। লাল গেঞ্জিটার বদলে আজ হলুদ নকশার বুশ শার্ট। দ্রুত পা ফেলা।

বুলি একবার মুখ ফিরিয়ে বাস স্টপে এসে দাঁড়ানো নতুন লোকটিকে দেখল। অম্বর ওর হাত দশেক তফাতে দাঁড়াল। দেখল বুলিকে। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে গুনল এবং দ্বিতীয়বার বুলির দিকে তাকাল, গিরি জানে এই দ্বিতীয়বার তাকানোটা কোনও মেয়ের দিকে নয়, বুলির কুরূপতার দিকে। এটার জন্য অন্তত দু'বার বুলির দিকে তাকাতে হয়।

সাধারণত যতক্ষণ তাকানো উচিত অম্বর তার থেকে বেশিক্ষণই তাকিয়েছে। বুলি আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। হাত ঘড়িতে সময় দেখার জন্য মুখটি নামিয়ে রাখল। গিরির কষ্ট হচ্ছে বুলির এই করুণ অবস্থার জন্য। সে নিজে জানে কত অসহায় লাগে এই সময়টায়।

হয়তো বুলি অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই রকম চাহনির সঙ্গে। তবু একটি যুবকের চোখ থেকে মুখ সরিয়ে নিতে হচ্ছে এই বয়সি মেয়েকে, গিরি নিজেই আহত বোধ করল। বুলি জানে তার মুখে ওরা কী দেখে।

ক্রাচ দুটো রেলিংয়ে হেলান দিয়ে রেখে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গিরি দু'হাত ওপরে তুলল। আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে। বুলির চোখ যদি এদিকে ফেরে। কিন্তু ও আবার উত্তরে তাকিয়ে রয়েছে। অম্বর আর ওর দিকে তাকায়নি। বুলি নিশ্চয়ই জানে, কেন তাকাচ্ছে না।

আর একটি লোক এসেছে। মাঝবয়সি, হাতে রেশনব্যাগ, খুবই অস্থির। বুলির কাছে সময় জানতে চাইল। জানার পর বিরক্তমুখে কিছু বলল। বুলি জবাব দিল। তারপরই একসঙ্গে তিনজন উত্তরে তাকিয়ে দু' তিন পা এগোল।

বাসটা চলে যাবার পর গিরি আবার চেয়ারে বসল। প্রতিদিনের দেখাশোনা জানা রুটিন-মাফিক ব্যাপারগুলো চারদিকে হয়ে চলেছে। সে ঘরে এল। রুনু এইমাত্র ঘর মুছে গেছে, মেঝেটা ভিজে। খাটে শুয়ে তার মনে হল আর একটু ঘুমিয়ে দিনটাকে ছোট করে আনা যায়। সে চোখ বন্ধ করল।

ঘুমোতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল গিরি। রুনুর অফিসে বেরোবার তোড়জোড় চোখ বুজেই সে দেখতে পেল।

"টাকা টেবিলে রেখে যাচ্ছি।"

"হুঁ।"

"দরজা বন্ধ করো।"

"যাচ্ছি।"

প্রতিদিন এই সময়ে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। আজ আর গেল না। বাইরের দরজা ভেজিয়ে রুনু নেমে যাচ্ছে। গিরি শব্দ পেল না। আগে পেত।

ওপরতলার ছেলে দুটি স্কুলে যাচ্ছে। গিরি উঠে বসল। চার-পাঁচটা সিঁড়ির উপর থেকে ওরা গিরির ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাওয়াটায় লাফিয়ে পড়ে। প্রত্যেক তলায় ওরা এ-ভাবে লাফিয়ে পড়বে।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। রাস্তায় এখন ভিড় ব্যস্ততা শব্দ। বনমালী সরকার লেনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বাজারে যাবার কথা ভাবল। দু'-তিন দিন ঘরে রাখা যায় এমন আনাজ সে কেনে। এ-ছাড়া অম্বরের জন্য ডিম ও কলা। রুনু পনেরো টাকা রেখে গেছে। অর্থাৎ মাছ কেনা যাবে না।

বাজারে মিনিট কুড়ির বেশি গিরি থাকে না। একসময় তার অভ্যাস ছিল বার দুয়েক বাজারটার দুই প্রান্ত ঘুবে দরদাম করে জিনিস কেনা। এখন আর তা করে না। ছক কেটে রেখেছে, সেই অনুযায়ী পরপর কিনে বেরিয়ে আসে। থলি ভরে উঠলে মুশকিল হয় একসঙ্গে ক্রাচ ও থলি ধরে চলতে।

বাজার থেকে বেরিয়েই বুলিকে তার মনে পড়ল। কৌতূহল বোধ করল, কী করছে এখন? কলেজ থেকে এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়। রান্না করে খাবে। হয়তো তারই ব্যবস্থা করছে। একবার দেখে এলে হয়!

দরজার পাল্লা দুটো ভেজানো। ইঞ্চি খানেক ফাঁক রয়েছে। গিরি দরজায় টোকা দিল।

বুলি অবাক হয়ে গেল ওকে দেখে।

"আমি ভাবলাম এইসময় কে আবার!"

"মোহন বুঝি এ-সময় আসে না?

"না। সকালে তো কারখানায় যেতেই হয়।"

"চা খেতে এলাম। কালকের চা খুব ভাল লেগেছিল। তা-ছাড়া, আসব বলেছিলাম মনে আছে।"

"ভেতরে আসুন।"

বুলি বেশ কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছে। স্নান হয়ে গেছে। ভিজে চুল দু' ভাগে পাট করে আঁচডানো। মাথায় চুল কম। কপালের চামড়া খসখসে এবং ফ্যাকাশে। সারা শরীর হাহাকাব করছে ভিটামিন ও স্নেহ পদার্থের জন্য। শাড়িটায় কোরা গন্ধ। বোধহয় মোহন কিনে দিয়েছে এখানে আসার পর।

"কী করছিলে, রান্না?"

"না। সামনের ঘরের একটা বাচ্চা ছেলে আছে, লজেন্স দিয়ে ভাব করে ফেলেছি। কলেজ থেকে ফেরার সময় দাঁড়িয়ে থাকে আমার জন্য। ও ছিল এতক্ষণ। বারবার আসে-যায় তাই দরজা খোলাই রেখেছি। একা কি চব্বিশ ঘণ্টা কাটানো যায়?"

বুলি হাসছে। গিরিও হাসল। মোহন কি পছন্দ করবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব জমানো?

"আমারও একই অবস্থা। তবে রুনু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অন্তত পনেরো ঘন্টা থাকে।"

"তা হলে একই অবস্থা হল কী করে?"

"কেন, মোহন এখানে বেশ কয়েক ঘণ্টা তো থাকে।"

বুলির অক্ষত চোখটা স্থির হয়ে গিরির মুখ থেকে কিছু একটা পেতে চাইছে। অশ্লীলতা? গিরি অপ্রতিভ হতে থাকল।

"বাজার করে এলেন?"

চেয়ারটা বুলি এগিয়ে দিল।

"দু'-তিন দিন অন্তর বাজারে যাই। আজ সকালে তোমায় দেখলুম বাস স্টপে।"

"কী করে? ওহ, আপনার বারান্দা থেকে তো দেখা যায়। দাঁড়ান চায়ের জল বসাই।"

বুলি বেরিয়ে যেতেই হাত বাড়িয়ে গিরি পার্টিশনের পর্দাটা তুলল। লোহাটা একই ভাবে রয়েছে। চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে মোহন। গিরি পর্দা আর একটু তুলল। দেয়ালের কোণে ঘেঁষা খাটের দু'পাশে এক গজের মতো জায়গা। দেয়ালের ধারে বোধ হয় আলনা আছে। শাড়ির অংশ দেখা যাচ্ছে।

চটির শব্দ হল। গিরি পর্দা নামিয়ে দিল। বুলি চটি পরে ঘরের মধ্যে। রুনু এটা পছন্দ করে না।

"বাস বড্ড দেরিতে আসে।"

"ন' নম্বর রুটে এই রকমই। দেখলুম একটা লোক তোমার কাছে সময় জানতে চাইল, তারপর কী বলল ও যেন!"

"বলল, সাতটার মধ্যে মেটেবুরুজ পৌঁছতেই হবে, সেখান থেকে কাজ সেরে কালীঘাট। আমাকে জিজ্ঞাসা করল সময়ে পৌঁছতে পারবে কি না। আচ্ছা আমি কী করে বলি সাতটার মধ্যে পৌঁছতে পারবে কি পারবে না। খুব হাসি পাচ্ছিল। আর একজন দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, পৌঁছতে পারবেন।"

"আর একজন ছিল নাকি, দেখিনি তো।"
"হ্যাঁ ছিল।"
বুলি উপেক্ষা করে গেল অম্বরকে। অর্থাৎ গিরির কৌতূহলকে। গিরির তা ভাল লাগল।
"তুমি রাঁধবে না?"
"আমি তো আলুভাতে-ভাত ঘি দিয়ে খাব। মিনিট পনেরোতেই হয়ে যাবে।"
"মাছ তো খাও, না, ডিম?"
"মাঝে মাঝে।"
গিরি মেঝে থেকে বাজারের থলিটা তুলে নিয়ে দুটো মুরগির ডিম বার করল।
"আমি জানি তুমি আপত্তি করবে, ঠিক কি না?"
"করবই তো।"
গিরি ডিম দুটো থলির মধ্যে রেখে দিল।
"তা হলে আর আমার খাওয়া হল না।"
"কেন?"
"অনেক দিন খাই না তাই ভেবেছিলুম ওমলেট করিয়ে খাব।"
বুলি হেসে উঠল।
"দিন তা হলে?"
"না থাক। আমি একা খাব আর তুমি দেখবে তাই কখনও হয়! চক্ষুলজ্জা আছে না?"
"আচ্ছা আচ্ছা, আমি নয় একটু খেয়ে আপনাকে লজ্জা থেকে রেহাই দেব।"
গিরি চারটে ডিম বার করল। বুলি ভ্রূকুটি করেছে।
"এইটুকুটুকু দুটো ডিমের থেকে ভাগ দিলে আমার তো কিছুই থাকবে না। চারটের কমে হয় কখনও?"
"তা তো বটেই। আমার একটা চোখ, আপনার দুটো! লজ্জা তো আমার থেকে আপনার ডবল হওয়ারই কথা।"
বুলি কয়েক সেকেন্ড গাম্ভীর্য বজায় রেখে গিরির সঙ্গে হাসতে শুরু করল।
ওরা রান্নাঘরে এল। ঘরটা প্রায় ফাঁকাই। প্লাস্টিকের জালি থলিতে কয়েকটা আলু, ঠোঙায় চাল, ডাল, নুন। ঘিয়ের বোতল, আর একটা বোতলে চিনি। কনডেন্সড মিল্কের কৌটো। দেখলেই বোঝা যায় এখনও গুছিয়ে বসেনি। বুলি অ্যালুমিনিয়ম বাটিতে চায়ের জল গরম করতে বসাল।
"সারাদিনই ঘরে থাকি, তাই সংসারের অনেক কাজ সময় কাটাতেই করি। অবশ্য রুনু সেটা একদমই পছন্দ করে না। কিন্তু কী করব, কিছু একটা না করে মানুষ কি শুধুই বসে বসে দিন কাটাতে পারে?"
"কিছু একটা হাতের কাজ, পুতুল তৈরি কি কাঠের শৌখিন জিনিস বানানো, তা হলে কিন্তু সময় কাটানো শক্ত হয় না।"
"আর পয়সাও আসে।" গিরির চোখ হাসিতে ঝকঝক করতে লাগল, "আসলে আমি ভীষণ কুঁড়ে। নয়তো ইচ্ছে ছিল বাটিকের কাজ শেখার।"
"আমি জানি। শিখবেন।"
"কোথায়? এখানে?"
দু'জনের তিনটি চোখ কয়েক মুহূর্ত স্থির নিবদ্ধ থেকে আলোচনাটাকে এখানে ছেড়ে দিল।
গিরি ক্রাচে ভর দিয়ে সামনে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, বুলি ডিম ফাটাচ্ছে একটা কাচের গ্লাসে। ঠং ঠং শব্দ হচ্ছে।
"কতদিন হয়েছে আপনার অ্যাকসিডেন্ট?"
"পনেরো বছর।"
বুলি ঘুরে তাকাল গিরির মুখের দিকে। পায়ের দিকে তাকাবে না এটা সে জানে।
"তোমার?"
"তেরো বছর। বাড়ির সকলেরই হয়েছিল। একটা ছোট ভাই ছিল, মারা গেল।"

"অসুবিধা হয় না?"
"হত, এখন হয় না। আপনার কি হয়?"
গিরি জবাব দিল না। বুলি বার্নার থেকে বাটি নামিয়ে তার মধ্যেই চায়ের পাতা দিল।
"হয়।"
বুলি আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চোখে প্রশ্ন।
"আমার এখন প্রায়ই ছুটতে ইচ্ছে করে, লাফাতে ইচ্ছে করে। পারি না বলেই অসুবিধা হয়।"
গিরি হাসতে লাগল। একটা চোখ আর একটা পা, দুটোর মধ্যে উপযোগিতার গুরুত্ব অনুযায়ী সে চোখের বিনিময়ে পা চাইবে বুলি নিশ্চয় চাইবে চোখ।
"আমি না থেমে সাতশো আঠাশ পর্যন্ত একবার স্কিপ করেছি।"
"ছোটবেলায়?"
"পাঁচ বছর আগেও। বাচ্চাটা স্কিপিং রোপ এনেছিল। আপনি আসার একটু আগে, একশো দশের পর হাঁফ ধরল, ছেড়ে দিলুম।"
"আহ্, আর একটু আগে এলেই তো ভাল হত।"
"আপনার সামনে কি তাই বলে স্কিপ করতুম নাকি!"
"আমাদের বাড়ির সামনে একটা মেয়ে আছে, শ্যুটার। রাইফেল তুলে তাক প্র্যাকটিস করে একটা চোখ বন্ধ করে থাকে, চোখটা তখন ওর কোনও কাজেই আসে না, একেবারে অদরকারি হয়ে পড়ে। ভাবতে পারো?"
"ওগুলো সাময়িক। খাটে শুয়ে কি মনে হয় পায়ের তখন কোনও কাজ আছে? কিন্তু আমরা তো সারাক্ষণ শুয়েই থাকি না।"
বুলি কড়াই চাপিয়ে ঘি দিল। গলে যেতেই সাঁড়াশিতে ধরে কড়াইটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘি-টা মাখিয়ে দিতে লাগল।
"বেগুনের বোঁটা থাকলে চট করে মাখিয়ে দেওয়া যেত।"
"আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম।"
"তোমরা বাঙাল, না?"
"হুঁ, তবে দেশের কিছুই মনে নেই। আপনি মনে করতে পারেন বাচ্চা বয়সের কথা?"
গিরি পারে। কিন্তু সেগুলো কষ্টের যন্ত্রণার স্মৃতি, দারিদ্র্য এবং গঞ্জনার। মাথা নেড়ে বলল, "না, মনে পড়ে না।"
"আমার দু'-একটা মনে পড়ে। তবে দেশের নয়। রিফিউজি হয়ে আসি যখন বছর ছয়েক বয়স। মা ঠিকে ঝিয়ের কাজ করত। আমি সঙ্গে থাকতাম, হেল্পার।"
"সাঁড়াশিটা দাও, চা অনেকক্ষণ ভিজছে। কড়া চা আর বিষ একই জিনিস।"
গিরি একটু বেশি ব্যস্ত হয়েই কথাগুলো বলল। বুলির বাল্যস্মৃতি সে শুনতে চায় না। এ-সব কথাবার্তা এখন অর্থহীন। বুলি নীরবে সাঁড়াশিটা এগিয়ে দিল।
ডান ক্রাচটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে বাম ক্রাচে ভর দিয়ে গিরি বাটিটা সাঁড়াশিতে ধরে কাপে লিকার ঢালতে শুরু করল। বুলি একবার দেখল মাত্র।
"তুমি তো পাথরের চোখ লাগিয়ে নিতে পারো!"
"উনিও সে কথা বলেছেন।"
উনি! গিরির অদ্ভুত লাগল শব্দটা। বুলি অন্যের সামনে কী বলে মোহনকে সম্বোধন করে? মোহনদা! মোহনকাকা। মোহনমামা!
"ওতে কোনও লাভ হবে না আমার। মুখের অবস্থাটা দেখেছেন! মানুষ সব থেকে ভালবাসে নিজের মুখটাকেই তো? প্রত্যেকেই সুন্দর বা সুন্দরী মনে করে নিজেকে আয়নার সামনে। নিজেকে আমায় ভয় করে, বীভৎস মনে হয়।"
স্বরে কোনও রকম আবেগ নেই, কাঠিন্যও নেই। মুহূর্তের জন্য গিরি রুনুর বাবার বসার ভঙ্গিটা দেখতে পেল। সে অনুভব করল তার হাতটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

"নিজেকে তুমি ভালবাস না?" গিরি যথেষ্ট সংকোচ এবং ভয় নিয়ে প্রশ্নটা করল। বুলি তার একমাত্র দৃষ্টি পূর্ণভাবে নিক্ষেপ করল গিরির মুখে।

"না। কোনও কারণ আছে কি? একটা আস্ত সুন্দর জিনিসকেই মানুষ চায়, খুব স্বাভাবিক। আমি আস্ত নই, সুতরাং আমাকে কেউ চাইবে বা ভালবাসবে, তাই কি মনে করব?" বুলির হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত ঠোঁটের উপর দিয়ে ভেসে গেল। "ভালবাসা কোনওদিনই পাব না, দেবও না।"

হঠাৎ সন্ত্রস্তের মতো বুলি থেমে গিয়ে তার চাহনিকে গুটিয়ে আনল। ভয় পেয়েছে? গিরির মনে হল, 'দেবও না' কথাটা যদি মোহনের কানে যায় সেইজন্যেই। মেয়েটা নিজেকে ভালবাসে না। ও অন্যকে ভালবাসবে কী করে! অথচ মোহনের ধারণা, তাকে নাকি ভালবাসে। গিরি মনে মনে হেসে উঠল।

"তা হলে তুমি এখানে এলে কেন?"

বুলির পিঠটা শক্ত হয়ে গেল। বাড়াবাড়ি করা হল বোধহয় কথাটা জিজ্ঞাসা করে। জবাব না দেওয়ায় গিরি কুঁকড়ে গেল। বুলি গভীর মনোযোগে ওমলেট ভাঁজ করছে। রুনু কি আজও দেরি করে ফিরবে?

"মোহন আসবে কখন?"

"ঠিক নেই, না-ও আসতে পারে।"

যদি এখন এসে পড়ে তা হলে গিরিকে দেখে কী ভাববে, কী বলবে? কাল ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে বিরক্ত হয়েছে। ট্যাবলেট খাইয়েছে বটে কিন্তু সেটা আত্মতৃপ্তি পাবার জন্য।

"চলুন ও-ঘরে যাই।"

প্লেট এবং কাপ হাতে বুলি শোবার ঘরে এল, পি ন গিরি। বেতের সোফাটায় বসল। বুলি স্টিলের চেয়ারে।

"কলেজ ছাড়া আর কোথাও বেরোও না।"

নিজের লোকেদের কাছে যায় কি না জানার জন্য প্রশ্ন করা। এগিয়ে ধরা ওমলেটের প্লেটটা গিরি হাতে নিল, চামচ দিয়ে খণ্ড করতে লাগল।

"ইচ্ছে করে না বেরোতে। এদিককার কিছুই তো চিনি না। তা ছাড়া যা ভিড় আর নোংরা হাঁটতে ইচ্ছে করে না।"

"কলেজের বন্ধুদের বাড়িতে যেতে পারো।"

"আমার বন্ধু নেই।"

"আমারই মতো।"

বুলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। গিরির মনে হল একই চিন্তাতরঙ্গে তারা পাশাপাশি উপস্থিত। তারা দু'জনেই একটি করে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হারিয়ে পরস্পরকে বুঝে নিতে অসুবিধা বোধ করছে না। পনেরো আর তেরো বছর ধরে একটা বিশেষ ভঙ্গি তারা অর্জন করেছে যার দ্বারা বাস্তবের কঠিন জায়গায় সেঁধিয়ে যেতে পারে। ভঙ্গিটা হচ্ছে, সন্দেহ।

"উনি কি আপনার বন্ধু নন?"

"নিশ্চয়। ওর সব কথাই আমাকে বলে। ওই একজনই আমার বন্ধু। মোহনেরও আমি ছাড়া বোধ হয় আর বন্ধু নেই।"

গিরি একটু বেশি ব্যস্ত হয়েই বলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, মোহনই তাকে বলে দিয়েছিল, অ্যাক্সেল টুকরোটা কীভাবে লুকিয়ে দারোয়ানের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। দুটো মাস রুনুর রক্ষাকারীর ভূমিকা নিয়েছিল, অথচ একইসঙ্গে কাজ করলেও সে-কথা জানায়নি। অবশ্য রুনুও তা গোপন করেছে, গত সন্ধ্যা পর্যন্ত।

"আমার কথাও নিশ্চয় তা হলে বলেছেন।"

"অল্পক্ষণের জন্য এসেছিল। বেশি কথা বলার সময় ছিল না। শুধু বলল, এখানে ফ্ল্যাট নিয়েছে জীবনের বাকিটুকু ভোগ করতে।"

গিরি স্পষ্টই দেখছে বুলির মুখে অপ্রতিভতা ফুটে উঠল। 'ভোগ' শব্দটার মধ্যে অশ্লীলতা আছে। হয়তো অপমানিত বোধ করেছে। কিন্তু ওর বদলে আর কী শব্দ ব্যবহার করা যায়! মোহন তো ভোগই করতে চায়।

খালি প্লেট ও কাপগুলো নিয়ে বুলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আড়ালে গিয়ে নিজেকে 'ভোগ' শব্দটা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। ওর সঙ্গে মোহনের সম্পর্কটা গিরি জানে, মুখোমুখি আলোচনার বিষয় নয়।

বুলি ঘরে ঢুকল, চোখে স্বচ্ছ প্রফুল্লতা।

"ক'টা বাজে?"

"সময় দিয়ে কী হবে, বসুন না। আপনার সমস্যা তো সময় কাটানো, গিয়ে রান্না করবেন?"

"রুনুই সকালে রেঁধে রেখে যায়, তবে কোনও কোনও দিন ও অফিস ক্যান্টিনে খায়, আমি নিজে রেঁধে খাই।"

"আপনি রাঁধতে পারেন! কী কী রান্না জানেন?"

"পোলাও, কোপ্তা, কাবাব, বিরিয়ানি।"

পিছনে হেলান দিয়ে গিরি হাসছে। বুলিও।

"তা হলে তো আপনার রান্না একদিন খেতে হয়।"

গিরি সামনে ঝুঁকে পড়ল।

"কবে? কালকেই?"

অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণে বুলি থতমত হয়েছে, তবে হেসে যাচ্ছে।

"তুমি এলে আমার খানিকটা সময় কাটবে, পনেরো বছর আমাদের ফ্ল্যাটে কোনও মেয়ের পা পড়েনি রুনু ছাড়া।"

বুলির হাসিটা ভেঙে গেল দুই ঠোঁটের চাপে। চাহনি কোমল। নিজের কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো গিরির কানেই ধরা পড়েছে।

"আপনার খুব..."

বুলি ইতস্তত করল।

"কষ্ট?"

ও মাথা নাড়ল।

"কষ্ট ঠিক নয়, কী রকম যেন একটা একা, নিঃসঙ্গ ভাব... বোঝানো শক্ত। আমার মাঝে মাঝে লাগে।... তখন আনন্দ কি কষ্ট কিছুই বোঝা যায় না।... নিজেকে খুব ফালতু অ-দরকারি মন হয়। হয় না তোমার?"

রুনুর বাবার মতো! গিরি ম্লান হাসল।

"ফাঁসির হুকুম পাওয়া লোকের মতো?"

"অনেকটা। আমিও তো আস্ত মানুষ নই।"

গিরি নিজের গোটানো পাজামার দিকে তাকাল।

"আমি নিজের সম্পর্কেই কথাটা বলেছিলাম। আপনার কথা তখন মনে ছিল না যে আপনি আমার মতো কুৎসিত নন। ভালবাসা আপনি পান... হয়তো পান, তাই ভালবাসেনও, হয়তো। আসলে 'আস্ত' শব্দটা আমার ব্যবহার করা উচিতই হয়নি। আপনি নিশ্চয় আঘাত পেয়েছেন।"

"একটুও না। এটা আমার নিজেরই মনে হয়। বহু সময় ভাবি রুনু কি ভালবাসে, মানে তা কি সম্ভব? চিন্তাটা র‍্যাঁদার মতো ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে দিয়ে একটা গর্ত তৈরি করে ফেলেছে। ভয়ংকর গর্ত, যার মধ্যে আমি অনবরত পড়ছি আর থ্যাঁতলাচ্ছি। আসলে আমাদের যত কিছু আঘাত তা নিজেদেরই তৈরি, তাই না?"

"ব্যাপারটা, অর্থাৎ থ্যাঁতলানিটা একদমই ঘটবে না যদি ভালবাসা জিনিসটাই না থাকে।"

"তা হলে মানুষে মানুষে সম্পর্কটা কী দিয়ে তৈরি হবে? ভান, অভিনয় দিয়ে? নিছক শরীরের ব্যাপারগুলো দিয়ে? কতদিন তা টিকবে?"

গিরি বুঝতে পারল তার গলা দরকারের চেয়েও বেশি চড়ে গেছে। বুলি পাংশু মুখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।

ওরা কথা বন্ধ রেখে দিল।

থলিটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে গিরি উঠল।

"কাল, এই সময় যাব। আমি কিন্তু নিরামিষ খাই।"

দরজার কাছে এসে গিরি ঘুরে দাঁড়াল আচম্বিতে। বুলি ছিল পিছনেই, প্রায় বুকের কাছে এসে পড়ল।

"কিন্তু দুটো ভাঙা জুড়ে একটা আস্ত হয়, হতে পারে!"

বুলি পিছিয়ে যাবার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করল না। মুখ তুলে শুধু গিরির মুখে তাকিয়ে রইল। ভাবখানা, যা বলার বলে যাও। গিরি বাঁ হাতটা ওর কাঁধে রাখতেই ক্রাচটা টলে পড়ছিল, ডান হাতে বুলি সেটা ধরে ফেলল।

"নিজেকে তুমি কুৎসিত ভাবো কেন? তুমি সুন্দর, খুব সুন্দর।"

"স্তোক?"

"কী লাভ দিয়ে। যা মনে হচ্ছে তাই বললাম। আমরা আস্ত হতে পারি, পারি না?"

"কীভাবে? ভালবেসে!"

সরাসরি এবং সহজ স্বরে বুলির মুখ থেকে 'ভালবাসা' শব্দটা গিরিকে অপ্রতিভ করল।

"আর একজন মাঝে আছে ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

"কে মোহন?"

"আপনার স্ত্রী।"

"থাকুক। আমাকে সম্পূর্ণ করার সাধ্য তার নেই।" গিরি কাঁধ থেকে হাতটা বুলির ঘাড় বেয়ে গালে তুলল। চোখ বুজল বুলি।

"আমি এখন আসি, তা হলে কাল?"

"হ্যাঁ। আপনার কথা আমি ভাবব?"

বনমালী সরকার লেন ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পৌঁছে গিরি রাস্তা পার হবার জন্য অপেক্ষা করছে। মোহনের স্কুটার তখন বাঁক নিল। স্কুটার থামাল না। একবার গিরির দিকে তাকিয়ে সে ভ্রূ কোঁচকাল মাত্র। চোখে কালো চশমা থাকায় বোঝা গেল না ওর মনের অবস্থা। রাস্তা পার হয়ে গিরির মনে হল, বুলিও তো কালো চশমা পরতে পারে।

চারটে ডিম কমে গেল। কেন, তা বলা যাবে না রুনুকে। কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার। পকেটমার হয়েছে... দোকানেই ভুলে ফেলে এসেছি... হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে... হঠাৎ ইচ্ছে করল তাই খেয়ে ফেললাম!... একটার পর একটা ভেবে গেল সে, আর অস্বস্তি বাড়তেই লাগল। রুনুকে সে বুলির কথা জানাতে চায় না।

রুনুকে কৈফিয়ত দিতে হবে যেহেতু টাকা তার। চারটে ডিমের দাম পূরণ করার ক্ষমতা গিরির নেই। সে যতটা না অসহায় বোধ করল তার থেকেও বেশি রেগে উঠল। ছোটবেলায় পায়ের ধাক্কায় সরষের তেলের বাটি উলটে যাওয়াতে বাবা চড় মেরে বলেছিল, "পারবি কিনে পূরণ করে দিতে?" আধ ছটাক তেল বোধহয় বাটিটায় ছিল।

গিরির মনে হল, রুনু কৈফিয়ত শুনে কিছুই বলবে না, তাকাবে মাত্র। সেটাই চড়। সাবধান হও না কেন, পয়সা যখন নিজের নয়! বিশ্বাস্য একটা কৈফিয়ত এখন তাকে খুঁজতে হবে। ডিমগুলো খরচ না করলেও কিছু এসে যেত না, তবে এ-জন্য তার অনুশোচনাও হচ্ছে না। বহু বছর পর একজনকে সে আসতে বলেছে।

গিরি বাজারের থলি থেকে জিনিসগুলো রান্নাঘরে গুছিয়ে রাখল। বাঁশের ধামায় আনাজ, কলা, কৌটোয় ডাল, মশলা। দশটি ডিমের ছ'টা রয়েছে। এনামেল-চটা ফুটো বাটিটায় কালকের জন্য দুটো ডিম রেখে দিয়ে ঢোঙাটা উঁচু তাকে তুলে রাখল। দরকারের আগে রুনুর চোখে যেন না পড়ে।

বুলিকে কী খেতে দেবে? বেগুনভাজা ডাল ছাড়া রান্নার মতো আর কিছু নেই। রুনু অফিসে বেরিয়ে যাবার পর চটপট এর বেশি আর কী করতে পারে সে। দই? কেনার পয়সা কোথায়? গিরি হতাশ বিরক্ত হয়ে পড়ল।

রুনুর ফিরতে দেরি হয়নি। গিরি সন্ধ্যাটা বারান্দায় কাটিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।
"মাথায় কি যন্ত্রণা হচ্ছে?"
"টিপটিপ করছে।"
"আলো নিভিয়ে দোব?"
"দাও। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, রাতে খাব না।"
আর তাদের কথা হয়নি।

আট

ভোরে বারান্দায় এসে গিরি তাকিয়ে রইল বনমালী সরকার লেনের দিকে! বুলি তাকে দেখার আগে সে হাত তুলল। ওর পরনে গতদিনের শাড়ি। হাতে একটি খাতা। থমকে পড়ে তাকাল এবং খাতাটা কানের পাশে তুলল। গিরি মাথাটা কাত করে মুখে গ্রাস তোলার ভঙ্গি করল। বুলি মাথা হেলিয়ে দিল।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বুলি মাঝে মাঝে বারান্দার দিকে তাকাচ্ছে।

গিরির সারা শরীরে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে চাপা উত্তেজনা। রুনু এখুনি চা এনে দেবে। এতদূর থেকে চোখ দেখা যাচ্ছে না, মুখের গর্তগুলোও নয়। সবুজ শাড়িতে একটি অবয়ব যার সঙ্গে কুশ্রীতার কোনও সম্পর্ক গিরি দেখতে পাচ্ছে না। বুলি ওখানে একা দাঁড়িয়ে। ওর উদাসীন নির্মোহ অবস্থানের সঙ্গে অচঞ্চল থমথমে ভোরবেলা। পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তার কথা বুলি ভেবেছে হয়তো। বুক ভরে বাতাস নিতে নিতে গিরির মনে হল সে বুলিকে শুষে নিচ্ছে। মৃদু একটা গন্ধে সে ভরে যাচ্ছে।

তখনই একটা দোতলা বাস এল।

"তোমার চা।"

হাতটা এগিয়ে দিল গিরি পাশে। রুনুর দিকে সে তাকাল না। দাঁড়িয়েই চা খেল। অম্বরকে যেতে দেখল বাস স্টপের দিকে। আজ ওর দেরি হয়েছে বেরোতে। লিগ শুরু হলে একদিন ময়দানে গিয়ে ওর খেলা দেখে আসবে। অবশ্যই টিকিট কেটে খেলাটা দেখবে, কাউকে না জানিয়ে।

ঘরে এসে গিরির চোখে পড়ল আলমারিতে চাবিটা লাগানো। কান পেতে বুঝল রুনু পাশের ঘরে। বালিশ থাবড়ানোর শব্দ হচ্ছে। অম্বরের বিছানা গুছিয়ে ঘর ঝাঁট দেবে।

গিরি দ্রুত আলমারির কাছে এসে চাবি ঘোরাল। পাল্লা খুলেই ঘন বেগুনি সিল্কের শাড়ির ভাঁজ তুলল। পাঁচ-ছ'টি দশ টাকার নোট আর একটি এক টাকার বান্ডিল। পিন থেকে কতকগুলো এক টাকার নোট নিয়ে আলমারি বন্ধ করে যখন খাটে এসে বসল তখনও আঙুলগুলো কাঁপছে। রুনু জানতে পারবেই, তবে দিন দশেকের আগে নয়।

অস্থিরতা কাটাবার জন্যই গিরি দাড়ি কামাতে বসল। অন্যদিনের থেকে দ্রুত শেষ করল। ক'টা টাকা নিয়েছে জানে না। পকেট থেকে বার করে গুনে দেখতেও ভয় করেছে, যদি রুনু এসে পড়ে। বারান্দায় এসে গুনল, ছ' টাকা। চারটে ডিমের দাম বাদ দিয়ে সে বাকিটায় দই-সন্দেশের কথা ভাবল।

"তুমি শুধু নিজের জন্যই ভাত কোরো। আমি এবেলাও কিছু খাব না।"

রুনু উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল।

"শরীর এখনও খারাপ? জ্বর হয়েছে নাকি?"

"জ্বর নয়। ম্যাজম্যাজানি, গায়েও ব্যথা। ফ্লু কি না কে জানে। উপোস দেব এ-বেলাটা।"

"তা হলে আর রেঁধে কী হবে। অফিসেই খেয়ে নোব।"

রুনু যখন অফিসে বেরোল গিরি তখন স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছে। রাস্তায় যেতে যেতে রুনু পিছু ফিরে বারান্দায় তাকিয়েছিল অভ্যাসমতো। বারান্দা থেকে গিরিও হেসেছিল। সে তখন ভাবছিল অন্য কথা।

পর্দাটা সরিয়ে গিরি দাঁড়িয়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। বাড়িগুলোর ছায়ার, গাড়ি চলাচলের, পথিক সংখ্যার, শব্দের তীব্রতার পরিবর্তন লক্ষ করার মেজাজ তার নেই। বুলির জন্য সে অপেক্ষা করছে।

বুলি আসছে।

হৃৎস্পন্দনের আঘাত সে অনুভব করছে। বাঁ পায়ের হাঁটুটা দুর্বল লাগছে। সাদা শাড়ি, কালো ব্লাউজ, পিঠে ছড়ানো চুল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে গিরি রেলিংয়ে ঝুঁকে বাড়ির দরজা দেখাল আঙুল দিয়ে। বুলি মাথা নেড়ে বোঝাল সে জানে।

বুলি ঢুকে যেতেই গিরি লাফিয়ে লাফিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার জন্য এগোল। পাল্লা দুটো মেলে দিয়ে সে কান পেতে রইল। বহুদিন এইভাবে সে অফিস-ফেরত রুনুর জন্য দাঁড়িয়েছে।

চটির শব্দ উঠে আসছে। গিরি দরজার বাইরে গেল। বুলি সিঁড়ির বাঁক ঘুরে দেখতে পেল ওকে।

"তিনতলার বাইরের দিকের বারান্দা তো, আমি ঠিকই বার করে নিতুম।"

"তা নয়, তা নয়। ফ্ল্যাট খুঁজে বার করা কী এমন শক্ত ব্যাপার। তোমাদেরটা বার করলাম কী করে।"

রুনু বেরিয়ে যাবার পরই পেনসিল দিয়ে সাদা কাগজে বড় অক্ষরে 'গিরিজাপতি বিশ্বাস' লিখে সে আটাগোলা মাখিয়ে দরজায় সেঁটে দিয়েছিল। দই কিনে ফেরার সময়ও দেখেছে, ছিল। এখন নেই। ওপরের ছেলে দুটো স্কুলে যাবার সময় হয়তো খুলে নিয়েছে।

কৌতূহলী চোখে বুলি ঘর দেখছে। যতটা পারা যায় গিরি গুছিয়েছে। বিছানার চাদর বা বালিশের ওয়াড় ধবধবেই আছে। আসবাব কিছুই প্রায় নেই। দেয়ালটাই শুধু ময়লা, বহু জায়গায় বালি খসা। ভাড়া নেওয়ার পর আর কলি-ফেরানো হয়নি। গিরি খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছে। পকেটের ছেঁড়া জায়গাটা সেলাই করে দিয়েছে রুনু। দই ও সন্দেশ কিনে একটা আধুলি ফিরেছে, সেটা এখন পকেটে।

"তোমার দেরি হয়েছে।"

"মোটেই না। এখন সাড়ে বারোটাও বাজেনি।"

"তোমার বোধহয় দেরি করে খাওয়া অভ্যাস।"

"মর্নিং স্কুলে পড়লে এই বদ অভ্যাসটা হয়।"

বুলি পর্দা সরিয়ে বারান্দায় এল। গিরি ওর পিছনে।

"লাভলি বারান্দা তো। অনেকখানি দেখা যায় তিন দিকেই।"

"বেশির ভাগ সময় আমার এখানেই কাটে।"

বুলি রৌদ্রের তাতে দাঁড়াতে পারল না। ঘরে এসে খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। গিরি মোড়ায়।

"কাল যখন আসছি তখন মোহন যাচ্ছে। আমাকে দেখল।"

"জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি এসেছিলেন কি না।"

গিরি উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল। বুলি কী বলেছে!

"বললুম আসেননি।"

কেন বলল মিথ্যে কথা! সত্যিই কি ও তাই বলেছে? গিরি বিভ্রান্তির মধ্যেও আলগা একটা সুখের আমেজ পেল। বুলি তাকে গোপন করেছে, সে-ও করেছে রুনুর কাছে। কেন? অযথাই কি? একদৃষ্টে সে বুলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এবং তার মনে হল, সত্যিই সুন্দর। দুই কাঁধের উঁচু হাড়, কবজির উপর জড়ানো শিরা, শীর্ণ বাহু, অনুন্নত বুক প্রভৃতি সত্ত্বেও, সুন্দর।

গিরির চাহনি লক্ষ করে বুলি বিব্রত হল।

"আপনারা দু'জনেই এই ঘরে থাকেন?"

"হ্যাঁ, আবার কোথা থাকব! ওহ, তুমি বলছ আলাদা শুই কি না?"

"না না, ধ্যেৎ। পাশে একটা ঘর রয়েছে তাই বললুম।"

"ওটায় আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই থাকে। ফুটবলার। দু'চারদিনের মধ্যেই চলে যাবে। ওর অসুবিধে হচ্ছে।"

"কী রকম গুমোট পড়েছে। বাইরে একদম হাওয়া নেই।"

বুলি মুখ তুলে সিলিংয়ে তাকাল।

"পাশের ঘরে পাখা আছে, ভাড়া করা। ও চলে গেলে পাখাটা রেখে দেব। তবে পর্দা তুলে রাখলে হাওয়া আসে।"

গিরি দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াতেই ব্যস্ত হয়ে বুলি পর্দাটা দরজার পাল্লার ওপর গুটিয়ে রেখে আবার খাটে এসে বসল।

"এখন খাবে?"

"আপনার কি খিদে পেয়েছে?"

গিরি মাথা নাড়ল।

"গল্প করার লোক পেলে আমি এক বছর না খেয়ে থাকতে পারি।"

"গল্প করার কেউ নেই আপনার?"

বুলিকে বিষণ্ণ দেখাল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

"কারুর সঙ্গে মিশতে আমারও ভাল লাগে না, আপনার লাগে?"

গিরি মাথা নাড়ল।

"যদি পারি তা হলে দুপুরে আমি আসব। অসুবিধে হবে না তো?"

"কিন্তু দু'-চারদিনেই তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে।"

বুলি গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তায় মগ্ন। ঠোঁটে একটা হাসি ফুটিফুটি করছে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না, বোধ হয় হব না।"

"কেন হবে না?"

"মনে হচ্ছে। আমার এ-রকম বহু ব্যাপারই মনে হয়। পরে দেখেছি ঠিক মিলে গেছে। আচ্ছা, কাল যে গর্তের কথা বললেন না, আমি সেটা নিয়ে ভেবেছি।"

"কেন ভাবলে? তোমার তো গর্ত হবার কোনও কারণ নেই। তুমি তো ভালবাসার প্রত্যাশা করো না।"

"আমি কিছুরই প্রত্যাশা করি না। একসময় আমি আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলুম।"

"প্রেমিক ছিল?"

"আমার এই চেহারা হবার পর সে আর দেখা দেয়নি। ওকে আর দোষ দিই না। পরে ভেবে দেখলাম, আত্মহত্যা যদি করতেই হয় তা হলে এমনভাবে করা উচিত যাতে অন্যরা উপকৃত হয়।" বুলি স্বচ্ছকণ্ঠে হেসে উঠল। "আমার বাবা এখন নামকাওয়াস্তে কারখানায় যায় আর মাসে আড়াইশো টাকা পায়।"

শুনতে শুনতে গিরি মেঝেয় চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তুলে দেখে বুলির চোখ রাস্তায় আটকে রয়েছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে বসার ভঙ্গি। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে।

গিরি যথাসম্ভব ঝুঁকে দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। এতদূর থেকে জাফরির মধ্য দিয়ে রাস্তাটা দেখা যায় না।

"আমি যাচ্ছি। আর একদিন এসে..."

বুলি ছুটল দরজার দিকে। হতভম্ব গিরি উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। স্কুটারে মোহনের পিঠ দেখতে পেল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে বনমালী সরকার লেনে ঢুকছে। গিরি একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল বুলি প্রায় ছুটেই চলেছে অঘোর ঘোষ স্ট্রিট ধরে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পার হবার জন্য একটু থামল। গিরি আশা করল, একবার অন্তত পিছনে মুখ ফেরাবে। ওর পিঠ ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভার কিছু বলল। বুলি বনমালী লেনে ঢুকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত গিরি দাঁড়িয়ে দেখল।

"কেন।"

রাগে সে থরথর করে একা ঘরে কেঁপে উঠল।

রুনু যখন অফিস থেকে ফিরল তখনও সে শুয়েছিল। বুলির জন্য টেবিলে সাজিয়ে রেখেছিল ভাত-ডাল, ভাজা, দই-সন্দেশ। দুপুরেই সেগুলো হাঁড়িতে ভরে, রাস্তায় বেরিয়েছিল ভিখিরির খোঁজে। বুড়ি ভিখিরিটা অবাক চোখে প্রথমে তাকায়, তারপর বিড়বিড় করে: "ভগবান তোমার মঙ্গল করুক বাবা, রাজা হও, ছেলে-বউ নিয়ে সুখে থাকো বাবা।"

"শুয়ে ছিলে?"

রুনু কপালে হাত দিয়ে তাপ দেখল।

"মনে হচ্ছে জ্বর-জ্বর। কিছু খাবে? হরলিকস?"

তাদের হরলিকস নেই, অম্বরের আছে।

"না।"

আর কথা না বলে গিরি শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে গেল একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে। বারান্দায় ঝুঁকেছে দোতলার ঘরে নতুন বউটির কাপড় ছাড়া দেখার জন্য। তখন সে বেতাল হয়ে বারান্দা থেকে রাস্তায় পড়ে গেল।

নিশ্চল হয়ে সে বিছানায় শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। জলতেষ্টা পেয়েছে ডান পাশ ফিরল খাট থেকে নামার জন্য। মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে রুনু শুয়ে আছে। সাবধানে পা ফেলার জন্য তাকিয়ে থেকে অন্ধকারের সঙ্গে চোখ সইয়ে নিল। রুনু শুয়ে নেই।

কোথায় তা হলে। একমাত্র পা-টি বেয়ে কার যেন ঠান্ডা হাত উঠছে। গিরি ভয় পেল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, তা হলে কি সে কালা হয়ে গেছে! দরজার পর্দাগুলো তোলা। রাস্তার আলোয় সামনের বাড়ির দেয়াল অবাস্তব জগতের মনে হচ্ছে। হঠাৎ গিরির মনে হল সে গ্যারাজে একা। রুনু এখন কোথায়? পাশের ঘরে? লিফট, তার উপর আড়াই টন ট্রাক, নীচে সে দাঁড়িয়ে। গিরি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল।

ক্রাচের জন্য হাত বাড়িয়েও হাতটা ফিরিয়ে নিল। শব্দ হবে। হামা দিয়ে সে বারান্দায় এল। চেয়ারটা ছাড়া, আর কিছু নেই। মাটি শুঁকে এগোনো কুকুরের মতো ঝুঁকে গিরি এগোল অম্বরের ঘরের দরজার দিকে। প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারে মানুষে-জানোয়ারে কোনও পার্থক্য নাকি থাকে না। রুনুই প্রাণ, প্রাণই রুনু। এখন রুনু ছাড়া তার চেতনায় কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

দরজাটা বন্ধ। মুখটা এগিয়ে দিয়ে সে দরজায় কান পাতল। ঠিক এইভাবেই সে রুনুদের বাড়ির ভিতরের ঘরে দরজায় একদিন কান পেতেছিল। তখন দু' পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়াত।

ভিতরে কি কথা বলল কেউ? একটা অস্পষ্ট ধ্বনি যেন ভেসে আসছে অম্বরের ঘরের মধ্য থেকে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল। কঙালটা মেঝেয় রেখে দু'হাতের ভর থেকে দেহটা নামিয়ে দিল। এইভাবে সামনের বাড়ির লোকটাকে একদিন সে যোগব্যায়াম করতে দেখেছে। দরজার তলার ফাঁক দিয়ে ধ্বনিটা দীর্ঘ হয়ে তীব্র হয়ে বেরিয়ে এসে একটা চিৎকারের আকৃতি নিল।

"বিশ্বাসবাবু, বিশ্বাসবাবু, শুয়ে পড়ুন।"

গিরি সেই নির্দেশ শুনেই উপুড় হয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ল।

"এইবার কি আমি বেঁচে যাব।"

উপুড় হয়ে হাঁফাতে লাগল গিরি। এখন বুঝতে পারছে, গভীর গর্তের তলদেশে সে পড়ে রয়েছে। এখান থেকে তার আর উদ্ধার নেই। বাঁচার কোনও উপায় নেই। সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত।

ভোরে সে চেয়ারে বসে জাফরির মধ্য দিয়ে তাকিয়ে। বুলি বাস স্টপে দাঁড়িয়ে। বারান্দার দিকে বারবার তাকাচ্ছে।

"তোমার চা।"

নেবার সময় একবার রুনুর মুখের দিকে তাকাল। কোনও তফাত নেই অন্যান্য দিনের থেকে।

"তুমি কি কাল রাতে বাথরুমে গেছলে?"

"হ্যাঁ।"

চা খেতে খেতে সে দেখল বুলিকে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ার ইচ্ছে তার হচ্ছে না। বাস এল এবং বুলিকে নিয়ে চলে গেল। অম্বরের দ্রুত চলাও সে দেখল।

দরজাটা আজও খোলা।

টোকা না দিয়ে গিরি ভিতরে ঢুকল। বুলি কথা বলছে। কচি গলায় পালটা প্রশ্ন হচ্ছে।

গিরিকে দেখে বুলি দাঁড়িয়ে উঠল সোফা থেকে। লাজুক হাসল। খালি গায়ে জাঙিয়া পরা বছর তিন বয়সি হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে।

"তোমার নতুন বন্ধু?"

"হ্যাঁ। কাল বলেছিল চকোলেট আনতে, এনেছি লজেন্স। তাই এতক্ষণ ক্ষমাপ্রার্থনা করছিলুম। কিন্তু মন গলাতে পারছি না। মোড়ের দোকান থেকে এখুনি কেন এনে দিচ্ছি না, এটাই ওর অভিযোগ।"

"বেশ সুন্দর দেখতে।"

বুলি আদরভরা চোখে বাচ্চাটার দিকে তাকাল।

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠের "বাপি" ডাক শুনেই ছেলেটি তড়াক করে সোফা থেমে নেমে ছুটে বেরিয়ে গেল।

"মাকে ভীষণ ভয় পায়।"

"সব বাচ্চাই পায়। আমিও পেতাম।"

"এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে বেরিয়েছেন। কী রকম ঘেমেছেন যে! ভিতরে খাটে বসুন, টেবিল-ফ্যান আছে।"

"অসুবিধে হচ্ছে না আমার।"

"আমার হচ্ছে। এমন দরদরে ঘাম দেখলে অস্বস্তি হয়।"

বুলি পার্টিশনের ওপারে গেল এবং ভোমরা ওড়ার শব্দের সঙ্গে পর্দাটা কাঁপতে শুরু করল। "আসুন এখানে।"

ভিতর থেকেই বুলি ডাকল। ইতস্তত করে গিরি ভিতরে এল। ঘরের প্রত্যেকটা জিনিসই নতুন। পাখা, খাট, আয়না, এমনকী আলনার কাপড়গুলোও। খাটে বসেই আরাম বোধ করল। গদিটা ফোম রাবারের। মোহন অনেক খরচ করেছে। জীবন ভোগ করতে তা হলে সত্যিই বদ্ধপরিকর।

"পাখার তারটা এত ছোট যে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না।"

"একটা সিলিং-ফ্যানেই ভিতরে-বাইরে হাওয়া পাওয়া যাবে।"

দু'জনেই গতকালের ঘটনা এড়িয়ে কথা বলে গেল। গিরি জানে, বুলির কাছে এ সম্পর্কে হতাশা বা অনুযোগ প্রকাশ করলে ওকে বিব্রত করা হবে। তাবা দু'জনেই এটা জানে।

"পাখা কি সারারাত চালাও। সর্দি হবে কিন্তু।"

"কিছুক্ষণ পরেই বন্ধ করে দিই। হাত বাড়ালেই রেগুলেটারটা পাওয়া যায়।...আপনি বালিশটা ঘাড়ে রেখে ঠেস দিয়ে বসুন না।"

"তুমিই বা দাঁড়িয়ে কেন?"

"মাথার চোট কেমন?"

"প্রায় সেরে এসেছে।"

গিরি অসুবিধা বোধ করতে লাগল কথা চালিয়ে যেতে। বুলিও জানে একসময় প্রশ্নটা উঠবেই। হয়তো জবাব নিয়ে তৈরি হয়ে আছে।

"চুলটা এইভাবে দু'পাট করে রাখলে তোমাকে ভাল দেখায়।"

"আমাকে ভাল...!"

বুলির চোখটি অবিশ্বাস্যতায় বিস্ফারিত হল না। নিঃশব্দে হেসে উঠল মাত্র।

"সত্যি?"

"আমার তো লাগে।"

বুলির হাসি মিলিয়ে গেল।

"তুমি কালো চশমা পরতে পারো।"

"ক্লাসের একটা মেয়েও আমায় বলেছিল। তাতে কী হবে? আমাকে ভাল দেখাবে কি?"

গিরি চট করে উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। বুলি তাকিয়ে আছে।

"ওটায় চোখটা তা হলে ঢাকা পড়বে।"

"কার কাছ থেকে? চশমা পরে থাকলেও আপনি সব সময়ই মনে রাখবেন আমার একটা চোখ নেই। আর রাস্তায়, বাসে, কলেজে কে কী ভাবল তা আমি গ্রাহ্য করি না।"

"কেন করবে না।"

"তাদের কোনও দরকার নেই আমাকে। আমিই বা তাদের দরকারি ভাবব কেন?"

"আমার দরকার আছে।"

"আপনার!"

অস্ফুটে বুলি আর একটা শব্দ করল।

"কী দরকার? হাড় চামড়া ছাড়া আমার আর কিছু নেই।"

"কাছে এসো।"

বুলি ঘাড় বেঁকিয়ে বসে আছে। গিরি হাত বাড়াল। পৌঁছল না। বালিশ থেকে মাথাটা তুলে কনুইয়ে ভর রেখে কাত হয়ে সে তাকিয়ে থাকল।

"আমার কাউকে কিছু দেবার নেই, আমাকে কারুর দরকার হতে পারে না।"

"আমারও সম্বল কিছু নেই। সব আমি হারিয়েছি। আমি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি। আমি নিজেকে পর্যন্ত আর বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়ে এবার বাঁচতে হবে।"

"দুটো ভাঙা জোড়া দিয়ে একটা আস্ত? হয় কখনও? দাগ একটা রয়েই যাবে।"

বুলি সরে এল গিরির পাশে। বালিশে হেলান দিয়ে গিরি হাসল। বিছানায় বুলির হাত। তার ওপরে সে আলতো হাত রাখল।

"কী হারিয়েছেন বলছিলেন?"

গিরি নিজের বুকের ওপর হাত রাখল।

"আপনি তো বেঁচে আছেন।"

"না।"

বুলি এগিয়ে এসে ঝুঁকে গিরির বুকে কান পাতল।

"দপদপ করছে।"

আলতো ওর মাথায় হাত রাখাল গিরি।

"করছিল না, এইমাত্র করে উঠল।"

বুকের উপর গলিত অন্ধ চোখ আর ক্ষতে খোদলানো মুখটা বুলি চেপে ধরল। গিরি চোখ বুজল। দু'হাতে বুলির মুখটা তুলে ওর কপালে চুমু দিল। ঠোঁট দুটি সরু করে এগিয়ে দিয়ে বুলি হাসতে লাগল চোখ বন্ধ রেখে। গিরি মুখের মধ্যে বুলির ঠোঁট ভরে নিল।

খসখসানি শব্দ হল। চোখ খুলল গিরি। পর্দা সরিয়ে মোহন তাকিয়ে রয়েছে। দু'চোখ ভরে অবিশ্বাস। গিরির চোখ আটকে রইল লাল আঁচিলটায়। মুহূর্তে সেটা টকটকে হয়ে উঠল, তারপর সারা মুখ হিংস্র রাগে কুঁচকে গেল।

মোহন হাত বাড়িয়ে বুলির চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে আর্তনাদ করে বুলি দাঁড়িয়ে উঠতেই মোহন ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা বুলির মুখের উপর মোহন ডান পা রেখে চেপে ধরল। গোঙিয়ে উঠল বুলি।

ছয়-সাত সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটল। কিছু চিন্তা কবার সময় নিল না গিরি। নিছক প্রবৃত্তিবশে সে খাট থেকে হাত বাড়াল। অ্যাক্সেলের ভাঙা খণ্ডটা ওর জন্যই যে অপেক্ষা কবছে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল এক পায়ে। টলে পড়ার আগেই সে বুলির মুখ পা দিয়ে মেঝেয় ঘষায় ব্যস্ত, কুঁজো হওয়া মোহনের মাথার পিছনে সজোরে লোহার ঘা মারল।

মোহন স্থির হয়ে রয়েছে। পার্টিশনে হাত রেখে গিরি মাথাটাব দিকে তাকিয়ে। পাতলা চুলের মধ্যে দিয়ে নারকেল শাঁসের মতো সাদা একটা দাগ। সেটায় ক্রমশ গোলাপি রং ফুটে উঠছে। মোহন পাশে হাত বাড়াচ্ছে কিছু একটা ধরার জন্য।

একটা শ্রান্ত লোকের মতো, পর্দাটা মুঠোয় আঁকড়ে, মোহন একটু একটু করে দুমড়ে মুচড়ে মেঝেয় বসে পড়ল। পার্টিশনটাকে কাঁপিয়ে একবার ওঠার চেষ্টা করল এবং নিজের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত ধস্তাধস্তির পর যুক্তিগ্রাহ্যভাবে নিজের প্রাণহীন দেহটাকে শুইয়ে দিল কাত করে। বুলি উঠে বসেছে। গিরি লোহাটা তুলে দেখাল।

"আসলে এটা ইউনিভার্সাল গ্যারাজের।"

অ্যাক্সেল টুকরোটা আস্তে মেঝেয় নামিয়ে রাখল। কর্কশ শব্দে গড়িয়ে সেটা মোহনের পিঠে লেগে থেমে গেল। মোহনের মুখটা পার্টিশনের দিকে ফেরানো। মাথা থেকে রক্ত কাঁধ বেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে।

"কী হয়েছে ওর, মারা গেছে?"

বুলি থরথর কাঁপছে। গিরি উবু হয়ে বসে মোহনের ডান হাত তুলে নাড়ি দেখল এবং মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"আঃ।"

বুলি নিজের মুখে হাত চাপা দিল চিৎকারটা চাপা দিতে। টাল সামলাতে অন্য হাত রাখল খাটের ওপর।

"দরজাটা খোলা ছিল। বাপি যাওয়ার পর আর বন্ধ করা হয়নি।"

গিরি জবাব দিল না।

"বন্ধ করে দিয়ে আসব?"

গিরি মাথা নাড়ল।

"তা হলে?"

"বুলি, আর আমাদের কিছু করার নেই। তুমি আত্মহত্যা কবতে চেয়েছিলে না একসময়ে?"

"হ্যাঁ।"

গিরি মুখ ফিরিয়ে মোহনের দিকে তাকাল। ঝুঁকে ওর বাহুতে একবার হাত বোলাল। "বেঁচে গেল। আর কোনও বোকামি করার সুযোগ পাবে না।"

"আমরাও কি?"

গিবিকে সচেতন কবে দিল বুলির স্বর। শান্ত, আবেগবর্জিত কিন্তু উদ্দেশ্যহীন। বুলির গালে ধুলো। হাত বাড়িয়ে মুছে দিতে দিতে সে বলল, "লেগেছে খুব? চলো বাইরে বসি।"

সোফায় ওরা পাশাপাশি বসে রইল। পার্টিশনের পর্দার তলা থেকে কাবুলি জুতো পরা মোহনের মসৃণ পায়ের গোড়ালি দেখা যাচ্ছে।

"স্কুটারের শব্দও আমরা পাইনি।"

গিরি ফিকে হাসল।

"এবার কী করব আমরা? হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে?"

"মরে গেছে, দরকার কী।"

"পুলিশে খবর দিতে হবে?"

"দরকার কী, ওরাই খুঁজে নেবে।"

বুলি যেন কেঁপে উঠল। গিরি ওকে কাছে টানল কাঁধ ধরে। বুলি সরে এল। রাস্তায় বাসনউলির ক্লান্ত গলা জানলার কাছে ডেকে উঠল দু'বার। বুলি ফিসফিস করে বলল, "ওর কাছে একটা স্টিলের হাতা কিনেছিলুম।"

দু'জনে গোড়ালিটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। জানলার পর্দা নড়তে দু'জনেই তাকাল।

"বাতাসে।"

"আজ এই প্রথম দিল।"

গিরি হাসল। বুলির হাতটা তুলে নিল হাতে।

"ভয় করছে?"

বুলি ফিকে হেসে গিরির হাত কোলের উপর টেনে আনল।

"আমরা ভাগাভাগি করে নোব।"
"না। ঠিক যা দেখেছ তাই বলবে পুলিশকে। ডান্ডাটা আমিই মেরেছি।"
"পুলিশ আসবে!"
"আসবে, আজ না হোক, কাল কিংবা পরশু।"
"আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঘটবে। আমাদের দু'জনের জীবনেই।"
"এই রকমই কিছু, না অন্য রকম?"
"অন্য রকম। কিন্তু এখন ও-সব কথা বলে কী লাভ।"
"কথা বলতে আমারও ভাল লাগছে না।"

কিছুক্ষণ পর গিরি বলল, "তোমার ওপরই ভরসা করে তোমাদের সংসার। তোমার থাকাটা দরকার। আমি না থাকলে রুনু অসুবিধায় পড়বে না। কাজেই ভাগাভাগির প্রশ্ন ওঠে না।"

"যা কিছু করেছি, নিজের জন্য একটিও নয়। আপনিই প্রথম...আমার নিজের জন্য প্রথম।" দু'হাতে মুখ ঢাকল বুলি। তার কানা চোখটা দিয়েও জল গড়াচ্ছে।

বিকেল এল এবং ক্রমশ চলে যাচ্ছে। ওরা একই ভাবে বসে। মোহনের গোড়ালিটা ম্লান হয়ে গেছে। বেলা অবসানে নীচের তলায় ঘরের আলো দ্রুত কমে যায়।

"ওর জন্য এক একসময় মায়া হত।" বুলি ফিসফিস করে বলল। "হয়তো আমাকে ভালবেসেছিল।"

"অনুতাপ?"
"কী জানি! বোধহয়।"
"তালাচাবিটা নাও।"
গিরি উঠে দাঁড়াল।
"আমরা চলে যাব?"

"হ্যাঁ। এখন তুমি বাড়িতেই যাও। যা হোক একটা কিছু ওদের বোলো। তোমার কি নেবার আছে নিয়ে নাও।"

"কী লাভ।"
"তবু তিন-চারটে দিন পাবে।"
বুলি মাথা নাড়ল।
গিরি জানলা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি দিল।
তালা লাগিয়ে চাবিটা হাতে নিয়ে বুলি ইতস্তত করছে।
"কোথাও ফেলে দিয়ো, যাবার পথে।"

বাড়ির দরজার পাশে স্কুটারটা রাখা। ওরা তাকাল না। রাস্তার বেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে এগোতেই ঝিয়ের কোলে বাপিকে আসতে দেখল। সে কৌতূহলে গিরির ক্রাচ এবং চলা লক্ষ করছে। বুলির দিকে তাকালই না। তাকে অতিক্রম করে যাবার পর বুলি পিছনে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল।

"চকোলেটের কথা বলতে ভুলে গেল।"
"আমাকে দেখতে গিয়েই।"
সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর বাস স্টপে ওরা দাঁড়াল। বুলি দক্ষিণ দিকে যাবে।
"কাল আমার জন্য বেচারা অপেক্ষা করবে, ভাবতে খারাপ লাগছে।"
"আমি এসে ওকে চকোলেট দিয়ে যাব।"
"ঠিক।"
গিরি মাথা কাত করল। আধুলিটা এখনও আছে।

ওদের মধ্যে আর একটিও কথা এর পর হয়নি। অপেক্ষমাণদের থেকে একটু তফাতে রাস্তার যতদূর দেখা যায়, সেই পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকে বাসের জন্য। দূরে বাস দেখে বুলি কয়েক পা এগিয়ে যায়। গিরি দাঁড়িয়েই থাকে। ভিড় রয়েছে বাসে। ওঠার লোকও অনেক। ঠেলাঠেলির মধ্যে বুলির হাতটা সে দেখতে পেল হাতল ধরেছে। পাদানিতে উঠল। গিরির দিকে তাকাতে চেষ্টা করছে।

পিছন থেকে অধৈর্য ঠেলায় তাকে ভিতরে পাঠিয়ে একটা লোক পাদানিতে উঠে দাঁড়াল।

বাসটা গিরির সামনে দিয়ে চলে গেল। বুলিকে দেখতে পেল না। উত্তর থেকে একটা বাস এসে বিপরীতে দাঁড়াল। দরজায় মানুষ ঝুলছে, বাসটা হেলে রয়েছে। অফিস ফেরত ভিড়। রুনু কি এই বাস থেকে নামবে, নাকি এসে গেছে! কিংবা সেদিনের মতো দেরি করে ফিরবে।

সাবধানে দু'ধারে তাকিয়ে সে রাস্তা পার হল। অঘোর ঘোষ স্ট্রিটে ঢুকতে গিয়ে সে তার বারান্দার দিকে তাকিয়ে একবার দাঁড়াল। এখনও দিন চার বা পাঁচ ওখানে বসার সুযোগ পাবে। মোহন পচে গন্ধ ছড়ালে পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরাই পুলিশ ডাকবে। অবশ্য তালা বন্ধ দরজার সঙ্গে স্কুটারটা যুক্ত করে আগেই সন্দেহ করবে। ওরাই পুলিশকে বলে দেবে, একটা খোঁড়া লোকের সঙ্গে তারা মেয়েটাকে চলে যেতে দেখেছে। খোঁড়া লোকটাকে এ অঞ্চলে অনেকেই দেখেছে ওপারে তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে।

গিরি এগোতে শুরু করল। পুলিশ তালা ভেঙে মোহনকে বার করবে। তার এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে মোহনের বাড়িতে। সেখানে থেকে গ্যারাজে, কারখানায়। বসন্তের দাগ কানা মেয়ের খোঁজ পেতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগবে না।

তালা খুলে গিরি ফ্ল্যাটে ঢুকল। রুনু এখনও আসেনি। আলো জ্বালল না। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখন সে ক্লান্তি বোধ করছে। একটু গরম চা পেলে ভাল হয়। আগামীকাল চকোলেট কিনতে হবে, এটা মনে পড়তেই সে রেলিংয়ের জাফরিতে হাত বুলোল।

রুনু আসছে অফিস থেকে। অভ্যাস মতো হাত তুলতে গিয়ে সে বুঝতে পারল অন্ধকারে রুনু তাকে দেখতে পাবে না।
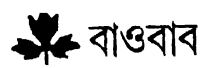
দিনটা নভেম্বর ১৭। কলকাতায় সেদিন সন্ধ্যা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি আর দমকা হাওয়া। গত সাত দিনে তিনটি সন্ধ্যা বৃষ্টির হাতে মার খেল।

শীত আসছে আসছে করেও ভাইফোঁটা পর্যন্ত মোটামুটি গরম ছিল। রাতে পাখা চালিয়ে ঘুমিয়েছে কলকাতার মানুষ। শুধু শেষরাতে একটা চাদর গায়ে টেনে দিত। সাত দিন আগে সকাল থেকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। আন্দামানের তিনশো কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে—এই রকম একটা খবর রেডিয়ো জানিয়ে দিতেই ঝানু লোকেরা গরম পোশাক বার করে তৈরি হয়ে যায়। নভেম্বরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শীত এবার একটু তাড়াতাড়িই এল।

দমকা উত্তুরে হাওয়ার এক একটা ঝাপটার সঙ্গে এক ডিগ্রি করে শীতের দাঁত শরীরে বসে যাচ্ছে, তার উপর বৃষ্টির প্রলেপ। এসপ্ল্যানেডে কাঁপতে কাঁপতে মিনিবাসে ওঠার সময় উমা নিজেকে ধিক্কার দিল, কার্ডিগান বা অন্তত আলোয়ান নিয়ে তার বেরোনো উচিত ছিল এবং ছাতাটিও। যদি ছাতা খুবই হাস্যকর অবস্থা তৈরি করত এই হাওয়ার মধ্যে। এইমাত্র সে দেখেছে ছাতার শিক উলটে গিয়ে একটি মেয়েকে অপ্রতিভ হয়ে যেতে।

মিনিবাসের মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। বাসে উঠে দরজার সামনের সিটটা খালি দেখেই, বিরল সৌভাগ্যে হৃষ্টচিত্তে উমা ঝপ করে বসে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খোলা দরজা দিয়ে আসা কনকনে হাওয়ায় কেঁপে উঠে সে বুঝল অন্য যাত্রীরা কেন এই সিটটা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রচুর চর্বিওলা এক পুরুষ যখন তার পাশে বসল যে স্বস্তি বোধ করল। তারপর সে ভাবল মানিকতলা মেইন রোডে কতটা জল জমবে, কাঁকুড়গাছির মোড়ের বা তার আগের স্টপে বাসটা দাঁড়ালে কতটা জল ভেঙে হাঁটতে হবে।

"এক মাসের আগে আর পিচ রেডি হচ্ছে না।"

"তারপরই লিগ শুরু বিনা প্র্যাকটিসেই!"

উমার পিছনেই দুই তরুণ। তারই অঞ্চলে কোথাও ওরা থাকে। গুণেন ভবনের সামনের মাঠটায়, পুজোর পর মাঝে সাঝে সকালে ব্যাট-বল নিয়ে ওরা নামে। গুণেন ভবনের দোতলায় তার পাশের ফ্ল্যাটের পুলকও সকালে খেলত এদের সঙ্গে। দু'বছর আগে পুলু শেষবারের মতো খেলেছে।

একদিন সকালে খেলার সময়ই গুটি পাঁচেক ছেলে হঠাৎ কোথা থেকে এসে মাঠের মধ্যেই পুলুকে ঘিরে ধরে। উমা শুনেছে, ক্ষুর দিয়ে পুলুর গলার নলিটা কেটে ওরা অপেক্ষা করে। দু'হাতে গলা চেপে পুলু বাড়ির দিকে ছুটে আসছিল। পথ আটকে মাঠের দিকে ওরা বারবার তাকে ঠেলে দেয়। পুলুর সহখেলোয়াড়রা, প্রায় জনা ছয়েক, যাদের মধ্যে এই ছেলে দুটিও, নিস্পন্দ হয়ে ব্যাপারটা দেখে যায়। ওরা পরে বলে, তাদের দেহে তখন নাকি সাড় ছিল না। শান্ত, নিখুঁত এবং এমন দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যায় যে মাঠের ধারের রাস্তা দিয়ে একটি লোক তখন যাচ্ছিল, তারা বা গুণেন ভবনের কোনও ফ্ল্যাটের কেউ জানতেও পারেনি। পুলু মাটি আর রক্তে মাখামাখি হয়ে যখন ঘাসের উপর মুখ রগড়াচ্ছে ছটফটাচ্ছে তখন অদ্ভুত এক ধরনের চিৎকার করতে করতে ছুটে এসেছিল হাবা। একটা বাঁশের খোঁটা ছিল হাবার হাতে। দু'হাতে সেটা মাথার উপর তুলে সে ছুটে আসতে গিয়ে পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। আততায়ীরা গোটা দুই-তিন পটকা ফাটিয়ে চলে যায়। সেই ঘটনার দু' বছর পর হাবার লাশ মাঠে পড়ে থাকতে দেখা গেল, মাত্র পাঁচ দিন আগে ভোরবেলা।

গত পাঁচ দিন সুনীতও বাড়িতে নেই। উমা আজও দুপুরে সুনীতের অফিসে ফোন করেছে। চিন্ময় ঘোষ একই উত্তর দিয়েছে। গুণেন ভবনের 'এ' ব্লকের আটটি ফ্ল্যাটের কেউই এখনও জানে না তার স্বামী পাঁচ দিন নিরুদ্দেশ। 'বি' ব্লকের কারুর সঙ্গে তাদের আলাপ পরিচয় নেই। সুবল দিনে অন্তত

চার-পাঁচবার ব্যাপারটা তোলে, উদ্বেগ প্রকাশ করে, উমাকে তাগিদ দেয় আরও খোঁজ-খবর নেবার জন্য। বুড়ো মানুষটি গত পাঁচ বছরে একবারও নিজেকে রাঁধুনি বা চাকর ভাবতে পারেনি। সুনীত বাচ্চাছেলে নয়, বয়স প্রায় আটত্রিশ, তাই কি, বোধহয় সাঁইত্রিশ।

উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারটা অনর্থকই আঁচড়ে যাচ্ছে বৃষ্টিধারাকে কাচের উপর লেপে দিয়ে। তাইতে রাস্তার আলোকে আরও ঘোলাটে দেখাচ্ছে কাচের ওধারে। পাশে বসা বিরাটকায় যাত্রীটি উমার স্পর্শ বাঁচাতে যথাসম্ভব কুঁকড়ে বসেছে। ফলে দেহের অর্ধেকটাই সিটের বাইরে। চাকা গর্তে পড়ে বাসটা ঝাঁকিয়ে উঠলেই লোকটি সামনের সিট আঁকড়ে ধরছে টাল সামলাতে। উমা একবার ভাবল, ওকে সরে বসতে বলবে। শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়নি। মানিকতলার মোড়ে লোকটি নেমে গেল।

স্টপ থেকে তিরিশ গজ এগিয়ে মিষ্টির দোকানের গাড়িবারান্দার সামনে সম্ভবত দয়াপরবশ হয়েই ড্রাইভার বাসটা থামাল। উমা ছুটে বারান্দার নীচে এল। হাওয়ার বেগ এখন একটু কম, বৃষ্টিও। স্তিমিত চোখে মিষ্টিওলা তার দিকে একবার তাকাল। জনা চারেক পথচারী, একটি কুকুর ও এক ঝালমুড়িওলা বারান্দার নীচে আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তার ওপারে ইলেকট্রিকের ও মদের দোকানের সিঁড়িতে এবং দেয়াল ঘেঁষেও কিছু লোক দাঁড়িয়ে রাস্তার বাতিগুলোর বালব ঘিরে বাতাসে শ্যামাপোকার মতো ভনভন করছে বৃষ্টির জল। ব্রিজের উপর জানলা বন্ধ ট্রেন গড়গড় শব্দে একটা কালো আঁচড় টেনেই আবার তা মুছে গেল।

একটা স্টেট বাস এল। সেটা থেকে কয়েকজন নামল, দু'জন ছুটে এল বারান্দার নীচে। কেউই কথা বলছে না। কনকনে হাওয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে চোয়াল শক্ত মুখগুলোয় হতাশ ও বিরক্তি নিঃশব্দে ছড়িয়ে আছে। নীরব বিষণ্ণ একটি সন্ধ্যা কাঁকুড়গাছির মোড়ে।

উমা হাত বাড়াল। মনে হল কমেছে। আরও দু'-তিনজন হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ধারাবেগ অনুমান করল। ইতস্তত করে একজন হাঁটা শুরু করতেই বাকিরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

আঁচলটা মাথায় ছড়িয়ে, ব্যাগটা বগলে চেপে উমা রাস্তাটা পার হবার আগে দু'-ধারে তাকাল। রাস্তায় দুই বাতিস্তম্ভের মাঝে ঘন ঝোপের মতো অন্ধকার। তার মধ্য থেকে একটা রিকশা বেরিয়ে এসে আবার সেঁধিয়ে গেল আর এক অন্ধকারে। শাড়িটা বাঁ হাতে পায়ের গোছের উপর তুলে, ডান হাতে মাথার আঁচলটা চেপে ধরে কুঁজো হয়ে সে দ্রুত রাস্তা পার হল। চুলকাটার সেলুনের পাশ দিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে গোলাপবাগান রোড। উমা সেটায় ঢুকল।

তাকে মিনিট চারেক হাঁটতে হবে। দু' পাশের বাড়িগুলোর চেহারা বলে দেয় অঞ্চলটি পুরনো। পুবে দেড়শো মিটার দূরেই নতুন পাতা সি আই টি রোড, দমদম এয়ারপোর্টে যাতায়াতের পথ। দু'ধারের সারিবদ্ধ নতুন বাড়িগুলো পাঁচিলের মতো খাড়া হয়ে দমচাপা, ঘিঞ্জি পুরনো অঞ্চলকে আড়াল করে রয়েছে।

গোলাপবাগান রোডের বাতিগুলোয় তেজ কম। একটি করে বালব একটি করে স্তম্ভে। কয়েকটি প্রায়শই জ্বলে না। রাস্তা অসমান এবং গর্তবহুল। উমা যথাসম্ভব সতর্ক হয়েই দুটি বাঁক অতিক্রম করল। এরপরই এলাকাটি তার প্রাচীনত্বের অবসান ঘটিয়েছে। বাড়ির সংখ্যা এখান থেকে কমে গেছে। তিরিশ বছর আগে গোলাপবাগান রোড এই পর্যন্ত এসে থেমে ছিল। তারপর ছিল জঙ্গল। শিয়াল ডাকত। ষোলোটি ফ্ল্যাট নিয়ে চারতলা গুণেন ভবন এবং আরও কিছু বাড়ি তৈরি হবার পরও দীর্ঘকাল এদিকটা ফাঁকাই ছিল। এখন যতটুকু বসত, গত দশ বছরে তা গড়ে উঠেছে।

গোলাপবাগান রোড থেকে 'দ'-এর আকৃতিতে একটা কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে শেষ হয়েছে গুণেন ভবনের কোলাপসিবল গেটে। তারপর পাঁচিল ঘেরা একখণ্ড জমি, যেটায় ছোট্ট একটা বাড়ি উঠেছে। রাস্তাটার বাঁ ধারে কাঁচা দেয়ালের খাটাল, তার পিছনে বিহারি গোয়ালাদের টালির চালের ঘর। ডান দিকে মাঠ যেখানে ছোটরা ক্রিকেট, ফুটবল খেলে। মাঠেরই কিছুটা জমি নিয়ে গোলাপবাগান রোডের ধারে ছেঁচাবেড়া ও টিনের চালায় তৈরি তিনটি দোকান—কয়লার, মাংসের এবং চায়ের।

উমা ইতস্তত করল কাঁচা খাটালের রাস্তাটায় ঢোকার আগে। ভাঙা ইটে, কাদায় ও গর্তে ভরা এই রাস্তা বৃষ্টির জলে এখন বিশ্বাসঘাতকের মতো মসৃণ হয়ে আছে। এই খাটালের রাস্তা ছাড়িয়ে, তিনটি দোকান অতিক্রম করে গজ পঁচিশেক এগিয়ে মাঠে নেমে গুণেন ভবনের গেটে পৌঁছানো যায়। ব্যস্ততা

না থাকলে সে মাঠের উপর দিয়েই যায় অবশ্য যদি রাস্তার বাতিটা নিভে না থাকে।

বাতিটা আজ জ্বলছে। দিন দুই আগেও বালবটা কাটা ছিল। একটা জিপ মাঠের ধারে গোলাপবাগান রোডের উপর দাঁড়িয়ে। দেখেই চেনা যায় এটা পুলিশের। এই অঞ্চলের ওয়াগন ব্রেকারদের কাজকর্মের জন্য প্রায়ই গাড়িগুলো আসা-যাওয়া করে। সোমবারও একটা পুলিশের ভ্যান এসেছিল হাবার খুনের তদন্তে।

বৃষ্টি এখনও একটানা ঝিরঝিরে। উমার দেহে শাড়িটা সপসপে লেপটে রয়েছে। দমকা হাওয়া কিছুটা শান্ত কিন্তু ঠান্ডায় অসাড় হয়ে যাচ্ছে তার পাঁজরের দু'-পাশ। কুঁকড়ে থাকার জন্য পিঠের পেশিতে ব্যথা করছে।

উমা খাটালের রাস্তা ধরল। 'দ'-এর বাঁকটা পার হয়ে, বাঁ দিকে খাটালের শেষ ও গুণেন ভবনের পাঁচিলের মাঝে হাত পাঁচেক লম্বা ও হাত তিনেক চওড়া ক্যানেস্তারা চালার একটা নিচু মাটির ঘর। বউকে নিয়ে হাবা এটায় থাকত। ওর খুনের তদন্তেই কি আবার পুলিশ এসেছে? উমা তার ডান দিকে মাঠের ওপারে পুলিশ জিপটার দিকে তাকাল। ক্যানভাসের পর্দাটা জানলায় নামানো। ভিতরে কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। সে বাঁ দিকে হাবার ঘরের দিকে তাকাল। দরজা জানলার কোনও ব্যাপার নেই। একটা ছেঁড়া চট পর্দার মতো ঝুলছে। উমার মনে হল চটটা সরিয়ে কেউ যেন তাকে দেখল। নিশ্চয় হাবার বউটা। গুণেন ভবনের দুটি ঘরে ও বাসনমাজার কাজ করে।

কোলাপসিবল দরজার উপরেই একটা বালব আছে। এখন জ্বলছে না। দরজার পরেই একটা ছোট চত্বর। তার দু'-ধারে 'এ' ও 'বি' দুটি ব্লকের সিঁড়ি, লেটার বক্স ও ইলেকট্রিক মিটারগুলো সারি দিয়ে সিঁড়ির দু'-ধারে। চত্বরের পরেই দারোয়ান চরিত্তর সিংয়ের ও জলের পাম্পের ঘর এক বিরাট এবং ঢাকা চৌবাচ্চা। চল্লিশ ওয়াটের একটা বালব চত্বরটাকে যতটা সম্ভব আলোকিত রাখার চেষ্টা করছে। একটা লোক 'এ' ব্লকের সিঁড়ির গোড়ায় দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতে ওয়াটারপ্রুফ, ডান হাতের আঙুলে সিগারেট। উমাকে দেখেই সিধে হয়ে দাঁড়াল।

কারুর জন্য অপেক্ষা করছে। উমা একবার মাত্র তাকিয়ে লোকটির পাশ দিয়ে সিঁড়িতে উঠল এবং তার সহজাতবোধ থেকেই টের পেল লোকটি তাকে লক্ষ করছে এবং দৃষ্টি যে কোথায় তা-ও অনুভব করল। ভারী নিতম্বে চামড়ার মতো সেঁটে থাকা শাড়ির উপর আঁচল টানার জন্য হাতটা পিছনে আনতে আনতে সে একবার মুখ ফেরাল। লোকটি মুখ নিচু করে গামবুট দিয়ে সিগারেট চটকাচ্ছে।

কলিংবেলের বোতামে চাপ দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল সুবল। যেন দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল।

"নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে কি?"

"হ্যাঁ।"

"পুলিশ। প্রথমে দত্তবাবুদের ঘরে এসেছিল, তারপর এখানে।"

"এখানে।"

উমার মনে হল সে শুনতে বোধহয় ভুল করছে। সুবলের কথা মাঝে মাঝে জড়িয়ে যায় বিশেষত যখন উত্তেজিত হয়। বয়স ওর প্রায় তিন কুড়ি।

"কেন?"

"দাদার খোঁজ করল। ক'দিন বাড়ি নেই, ইতিমধ্যে কেউ এসেছিল কি না, আমি কদ্দিন কাজ করছি, কারা কারা এখানে আসে..."

কলিংবেল বেজে উঠল।

"কাপড় ছাড়ো, সর্দিজ্বর লেগে যাবে।"

দরজার খিলে হাত দিয়ে সুবল অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না উমা শোবার ঘরে ঢুকে দরজা ভেজায়।

কলিংবেলে দু'বার সংকেত বেজে উঠল। জরুরি, অধৈর্য, কর্তৃত্বব্যঞ্জক। আলনা থেকে শুকনো শাড়ি টেনে নেবার সময় উমার কানে এল সুবলের বিনীত স্বর, "বসুন, বউদি এখন কাপড় পালটাচ্ছেন।"

দালানে খাবার টেবিলের চেয়ার সরানোর শব্দ হল। বাইরের লোক এলে সাধারণত এখানেই বসে।

শুকনো ব্লাউজের পিঠের হুক লাগাতে লাগাতে দু'হাত পিছনমোড়া অবস্থাতেই উমা মেঝেয় পড়ে থাকা ভিজে কাপড় পা দিয়ে সরিয়ে দেয়াল ঘেঁষে রাখল। মাঝের হুকটা কিছুতেই গর্তে লাগানো যাচ্ছে না। চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে উমা ঘর থেকে বেরোল।

বৃষ্টির জন্য ফ্ল্যাটের সব জানলাই বন্ধ। গুমোট এবং ভ্যাপসা গন্ধ। লোকটি তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে।

"বসুন।"

যথাসাধ্য মিষ্টি করে উমা হাসার চেষ্টা করল। "বৃষ্টি বোধহয় ধরে গেছে, জানলাগুলো খুলে দি।"

অনুমতি দেবার ভঙ্গিতে লোকটি মাথা হেলাল। উমা অস্বস্তি বোধ করল। পুলিশ, ইনকাম ট্যাক্স, হাসপাতাল, কোর্ট ইত্যাদি সম্পর্কে সুনীতের মতো তারও অস্বস্তি মেশানো ভয় আছে। তবে এই লোকটা জাঁদরেল ধরনের নয়। বয়স বোধহয় সুনীতেরই কাছাকাছি। গাল দুটো ভারী হতে শুরু করেছে, থুতনি ও ঘাড়ে ভাঁজ পড়েছে। আঙুলে দুটি আংটির মধ্যে একটি পলার। নিস্পৃহ চাহনির আড়ালে গেরস্ত সহৃদয়তা উঁকি দিচ্ছে। কালো প্যান্টে যেখানে সাদা শার্টটা গোঁজা সেখানে ফেঁপে উঠছে চর্বির সামান্য উচ্ছ্বাস।

জানলা খুলতে খুলতে উমা আবার টের পেল লোকটির চাহনি এখন তার দিকেই। মাঝের হুকটি লাগানো নেই, পিঠ অনেকটা খোলা। লোকটির চোখের উপরই আঁচল টেনে ঢেকে দেবার ভরসা সে পেল না। সেকশান ইনচার্জ বিনয় মৈত্র কথা বলতে বলতে যখন বুকের দিকে বারবার তাকায় তখন ওকে দেখিয়ে আপনা থেকেই হাতটা উঠে এসে বিন্যস্ত কাপড়টাকে অনাবশ্যকই বুকের উপর টেনে দেয় এবং মধ্যবয়সি লোকটির মুখ মুহূর্তের জন্য পাংশু হয় আর হালকা একটা বেদনা মুখের উপর দিয়ে ভেসে যায়। তারপর বিনয় মৈত্র সারাদিনের জন্য খিটখিটে হয়ে যায়, নানা ছুতোয় কাজের ভুল ধরে। উমার মনে হল, এই লোকটিকে অর্থাৎ পুলিশকে ব্যাজার না করাই ভাল।

"প্রায় থেমে গেছে।"

লোকটি অনুমোদনসূচক মাথা নাড়ল। ঠান্ডা ভিজে হাওয়ার ঝাপট মুখের উপর দিয়ে বয়ে যেতেই উমা জানলা থেকে সরে এসে একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়াল। নীরবে কয়েক সেকেন্ড তারা পরস্পরকে লক্ষ করল। রান্নাঘরে চামচ নাড়ার শব্দ হচ্ছে। দু'কাপ চা দিয়ে যাবার মতো বুদ্ধি সুবলের নিশ্চয়ই আছে। উমা মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের ডগার জল ঝাড়ল। জবজবে ভিজে রয়েছে শায়াটা।

"লালবাজার থেকে আসছি, ইনস্পেকটার বসাক।"

মুখস্থ বলার মতো। বহুবার নিজের পরিচয় জ্ঞাপনের অভ্যাস থেকে ভঙ্গিটা তৈরি হয়েছে। উমা নার্ভাস বোধ করল।

"সুনীত মুখার্জি আপনার স্বামী, কতদিন বাড়িতে নেই?"

"আপনার স্বামী" বলার পর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই প্রশ্ন। দত্তদের ফ্ল্যাটে নাকি একটু আগে গেছল। উমা সতর্ক হল।

"পাঁচ দিন, গত রবিবার থেকে।"

"কোথায় গেছেন?"

"জানি না, কিছু বলে যাননি।"

ভ্রূ কুঁচকে উঠল। উমা এতক্ষণে লক্ষ করল ইনস্পেকটারের দুই ভ্রূর মাঝে একটা কাটা দাগ আছে।

"খোঁজ করেছেন?"

"কেন, কিছু হয়েছে কি ওর?"

উমা ঝুঁকে পড়ল টেবিলে। ইনস্পেরটার ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ধীরে মাথা নাড়ল।

"জানি না। স্বামী পাঁচ দিন বাড়ি আসেনি, স্ত্রীর তো উচিত খোঁজ নেওয়া।"

"সোমবার দুপুরে ওর কলিগ চিন্ময় ঘোষকে ফোন করেছিলাম।" উমা দেখল ইনস্পেকটারের হাতে বলপয়েন্ট কলম ও নোটবুক। তিনি বললেন, "পুলিশে আর হাসপাতালের খোঁজ নেবেন।"

"কোথা থেকে ফোন করেছিলেন?"

"আমার অফিস, ওরিয়েন্টাল ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে। রাত্রেই উনি এসে জানিয়ে যান কোথাও

খবর মেলেনি। আর কী করতে পারি এ ছাড়া। বাচ্চাছেলে তো নয় যে হারিয়ে যাবে বা চুরি যাবে?"

"কী বলে বেরিয়েছিলেন, রোববার তো ছুটির দিন, কোথায় যেতে পারেন বলে মনে হয়?"

"কিছুই বলেননি? শুধু, ফিরতে রাত হবে আর খাব না, এইটুকুই বলেছিলেন।"

"কী পরে বেরিয়েছিলেন?"

"কালোর উপর ছাই রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া প্যান্ট, ফিকে নীল বুশশার্ট আর পাম্প শু।"

ইনস্পেকটার লেখায় ব্যস্ত। সুবল দু'কাপ চা এনে টেবিলে রাখল। একটি সসারে চারখানি বিস্কুটও। ইতস্তত করে ইনস্পেকটার চায়ের কাপ তুলে নিয়ে, "বেশ ঠান্ডা পড়েছে" বলতে বলতে চুমুক দিল। চাপা আরাম ছড়িয়ে পড়ল মুখে। আশ্বস্ত হয়ে উমাও কাপ তুলল।

"উনি কি কোনও রাজনৈতিক দলে আছেন, মানে কোনও রাজনৈতিক মতবাদে..."

উমা একটু জোরেই মাথা নাড়ল।

"কোনওদিন নয়। রাজনীতি ওর কাছে ভীষণ বিরক্তকর ব্যাপার। ইলেকশনের সময় সামনের মাঠে মিটিং হবে শুনলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। প্রায়ই বলতেন এত অশিক্ষিত এত দরিদ্র দেশে পার্লামেন্টারি ডিমোক্রেসি একটা ঢলঢলে জামার মতো আমাদের গায়ে ঝুলছে৷ আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেমটা মাপজোক করে বানানো হয়নি।"

"তার মানে উনি কি এখনকার এই সিস্টেমটা বদলাবার পক্ষপাতী?"

"আমি ঠিক বলতে পারব না। হয়তো বদলাবার পক্ষেই।"

"কীভাবে, ভায়োলেন্স দিয়ে? খুন করে... শ্রেণী শত্রুদের উৎখাত করে?"

উমা সচেতন হয়ে উঠল প্রশ্নের ধরনে। এ-সব কথা কেন? তার সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা করতে কি এই কনকনে ঠান্ডায় লালবাজার ইনস্পেকটার পাঠিয়েছে।

"পাশের ফ্ল্যাটের পুলক দত্ত ছেলেটিকে কারা খুন করে যায় শুনেছেন কি কিছু সে সম্পর্কে?"

"না।"

"ওর সঙ্গে আলাপ ছিল আপনাদের?"

"সামান্যই।"

"আপনার স্বামী ওর সঙ্গে কি রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন?"

"কখনও শুনিনি বা দেখিনি, তা ছাড়া ছেলেটা নেহাতই বাচ্চা।"

"আপনার বয়স কত?"

"তেত্রিশ।"

"আপনার স্বামীর?"

"সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ।"

"ক'বছর বিয়ে হয়েছে?"

"নয়।"

"লাভ ম্যারেজ?"

"হ্যাঁ।"

"সন্তান?"

"নেই।" একটু থেমে, "আমরা চাই না।"

ভ্রূ কোঁচকাল। উত্তরটা যেন মনঃপুত হয়নি।

"আপনাদের পড়াশুনো?"

"আমি এম এ ফিলজফিতে, ও ইকনমিক্সে পড়তে পড়তে ছেড়ে দেয় ফিফথ ইয়ারেই, হাই সেকেন্ড ক্লাস ছিল অনার্সে।"

"কেন ছাড়েন?"

"অর্থনৈতিক কারণে। স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যান জয়নগরের দিকে একটা গ্রামে। মাস চার-পাঁচ পড়িয়েছিলেন?"

"তারপর।"

"এখন যে অফিসে। জনসন ফোকস অ্যান্ড হাজরা লিমিটেড, ইলেকট্রনিক্স আর ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্র তৈরির কোম্পানি। পাবলিক রিলেশনসে আছেন।"

"চৌরঙ্গির হেড অফিসে?"

উমা মাথাটা কাত করল।

"আপনাদের আলাপ, বিয়ের কতদিন আগে?"

"চার বছর আগে, টাইপ স্কুলে।"

ইনস্পেকটার নোটবই থেকে চোখ তুলে আর কী প্রশ্ন করবে ভাবার জন্য দালানে রাখা ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"আপনারা দু'জনে রোজগার করেন, সচ্ছলই।"

উমা শুকনো হাসল।

"কিন্তু আপনি কেন এসেছেন বুঝতে পারছি না।"

"মার্ডারটা সম্পর্কে খোঁজখবর করতে।"

"ওই হাবাটার খুনের...।"

উমা বিস্ময়ে কথা শেষ করতে পারল না।

"পুলককে যারা মার্ডার করে তাদের বাধা দিতে গেছল এই হাবা একটা বাঁশ নিয়ে।"

"কিন্তু সে তো দু' বছর আগে! এতদিন পরে রিভেঞ্জ নেওয়া? কী লাভ তাতে, লোকটা রুগ্‌ণ দুর্বল নিরীহ, ভীষণ গরিব।"

ইনস্পেকটাকে স্পষ্টতই বিব্রত দেখাল।

"হয়তো ওর পলিটিক্যাল কানেকশনস ছিল। সবই অনুমান। হয়তো আপনার স্বামীরও পলিটিক্যাল কানেকশনস আছে। আপনি তা জানেন না বা জেনেও চেপে যাচ্ছেন। দুটো ঘটনাই একই সময়ের— হাবার খুন আর সুনীত মুখার্জির নিরুদ্দেশ।"

"তার মানে! ও খুন করেছে হাবাকে। কেন, কী উদ্দেশ্যে? ভিখিরি বললেই হয়, ওকে খুন করে লাভ?"

"খুনটা আপনার স্বামীরই কাজ এমন কথা বলিনি। শুধু বলেছি কোয়েন্সিডেন্সটা অদ্ভুত—খুন আর নিরুদ্দেশের। আচ্ছা, ওর প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"কার, হাবার?"

"আপনার স্বামীর।"

"ওর প্রাইভেট লাইফ, তা তো আমার সঙ্গেই..."

"না না, বাইরের জীবন সম্পর্কে..."

ইনস্পেকটার অপ্রতিভ হয়ে একটা বিস্কুট তুলে নিল।

"কিছুই জানি না। খুবই কম কথা বলেন ঘরে কিংবা বাইরে। এক সময় কবিতা লিখতেন, আট-ন' বছর আগে একদমই ছেড়ে দেন। একটা বই নিজের টাকায় বার করেছিলেন তার একটা কপিও নিজের জন্য রাখেননি।"

"কেন লেখা ছাড়লেন?"

"বহুদিন আগে কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, ছন্দটন্দ মেলাতে পারলেই তো আর কবি হাওয়া যায় না। যা নই তার পিছনে সময় নষ্ট করে লাভ?"

"অনেস্ট ম্যান। বন্ধু-বান্ধব কারা?"

"বোধহয় কেউ নেই, অন্তত আমি দেখিনি। শুধু ওর অফিসের চিন্ময় ঘোষ মাঝে মাঝে আসে।"

"আত্মীয়স্বজন?"

"আছে কিন্তু কারুর সঙ্গেই সম্পর্ক নেই। বাবা থাকেন কৃষ্ণনগরে, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, নাম, অদিতিকুমার মুখার্জি, বয়স এখন প্রায় সত্তর। 'বিজয়ায় একটা পোস্টকার্ড' পাঠানো ছাড়া ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে।"

"আপনার শ্বশুরের ঠিকানা?"

"বলতে পারব না, শুনেছি গোয়াড়ি না কোথায় যেন থাকেঘ।"

ইনস্পেকটার লিখে নিল।

"আর এক কাপ চা?"

রান্নাঘরের দরজায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুবলের দিকে তাকিয়ে উমা মাথা নাড়ল। সুবল ব্যস্ত হল চায়ের জল বসাতে।

"শোবার ঘরটা একবার দেখব।"

ঘরটা যথেষ্ট প্রশস্ত। ডবল বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল, স্টিল আলমারি, বইয়ের র‍্যাক, ছোট একটা টেবিল, আলনা প্রভৃতি সত্ত্বেও চলাফেরার কিছুটা জায়গা আছে। খুঁটিয়ে ঘরের প্রতিটি বস্তু দেখতে দেখতে ইনস্পেকটার র‍্যাক থেকে বই তুলে নিল। সেই সময় উমা মেঝে থেকে ভিজে কাপড় তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দালানে খাটানো দড়িতে মেলে দিতে দিতে ঘরের ভিতরে তাকাল।

ইনস্পেকটারের হাতের বইটা মাঝামাঝি জায়গায় খোলা। মুখে পাতলা হাসি। সুনীতও অনেকটা এইভাবেই বই পড়তে পড়তে হাসে।

উমা ঘরে ঢুকতেই বইটা বন্ধ করে র‍্যাকে রেখে দিল।

"পথের পাঁচালি যতবারই পড়বেন... এই জানলাটা দিয়ে...।"

ইনস্পেকটাব নিজেই জানলাটা খুলল। কপালটা গরাদে চেপে মাথাটা কাত করে কত দূর পর্যন্ত দেখা যায় সেটা পরিমাপ করতে লাগল। উমার মনে পড়ল ঠিক এইভাবেই সুনীতকে সে বহুদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে জায়গাটায়। পুরুষরা বহু ব্যাপারে একই ভঙ্গি নেয়।

"এখান থেকে দেখছি সারা মাঠটাই দেখা যায়... আপনার স্বামী কি মদ খান?"

"না তো।"

"কখনও খাননি? ঘরে বসে একটু আধটু বা বাইরে থেকে খেয়ে কখনও আসেননি।"

"না।"

ইনস্পেকটার র‍্যাক থেকে দু'খানা মোটা বই বার করে ফাঁকা জায়গাটার দিকে আঙুল তুলল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল উমার মুখ।

ইনস্পেকটার সন্তর্পণে বোতলটা বার করল।

"হোয়াইট হর্স, প্রায় অর্ধেক খালি।" ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, বোতলটা যথাস্থানে রেখে সন্তর্পণে ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করে দিল বই দুটি দিয়ে।

"আপনি খান?"

"না।"

"আপনাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের কি কোনও রকমের হেরফের ঘটেছে, মানে প্রাইভেট লাইফ এখনও কি আগের মতোই আছে?"

উমা ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এই লোকটি নিঃশব্দে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে দিয়েছে। বুকের ভিতর হঠাৎ শূন্য বোধ করায় বা মাথার মধ্যে অসাড় হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সে এমন করে কখনও পায়নি। তার যাবতীয় ব্যক্তিত্ব এখন চুরমার। সুনীতের চরিত্র সম্পর্কে ভাল একটা ধারণা লোকটাকে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ধীরে ধীরে সে খাটের উপর বসল।

"বোতলটা যে ওখানে আছে, বিশ্বাস করুন আমি তা জানতাম না। হ্যাঁ প্রায়ই খান, বাড়িতেও বাইরেও!"

ইনস্পেকটারের চোখ দুটো ঠান্ডা স্থির। গলার স্বরও বদলে গেছে।

"কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক আছে কি না, কোনও মতবাদ সমর্থন করেন কি না, এবার কি সত্যি কথাটা বলবেন?"

উমা মাথা নাড়ল।

"নেই। যত দূর জানি নেই। এত বছর তো দেখছি, ও সত্যিই ঘেন্না করে, ডান-বাম অহিংসা-হিংসা সব রাজনীতিকেই। জীবন থেকে ও সরে গেছে গত পাঁচ-ছ' বছর, নিছক যান্ত্রিক ওর প্রাইভেট লাইফ, আমাদের দু'জনের সম্পর্কও।"

দু'জনে কয়েক সেকেন্ড চোখে চোখ রাখল। বিভ্রান্ত ও কঠিন দু' জোড়া চাহনির মাঝখান দিয়ে ঠান্ডা এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল।

"ছবিটা আপনার স্বামীর?"

ড্রেসিং টেবিলে স্টিল ফ্রেমে বাঁধানো মুখোমুখি দুটি ছবি। সুনীত ও উমার।

"হ্যান্ডসাম... কত বছর আগে তোলা?"

উমার ছবিটি এবং তার এখনকার চেহারাব সঙ্গে মিলিয়ে দেখে যে-কেউই প্রশ্নটা করতে পারে।

"বিয়ের পরেই তোলা, প্রায় ন'বছর আগে।"

"চশমার পাওয়ার কত, প্লাস না মাইনাস?"

"দু' বছর আগে আরশুলা রঙেব মোটা ফ্রেম করায়, কাচও বদলায়, নতুন পাওয়ার কত জানি না, আগে ছিল মাইনাস ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ।"

ফ্রেম থেকে সুনীতের ছবিটা খুলে নিল ইনস্পেকটার।

"এটা আমি নিচ্ছি।"

হঠাৎ উমা ফিসফিসিয়ে বলল, "অসম্ভব, অবাস্তব... সুনীত খুন করেছে ওই হাবাকে তাও কিনা পলিটিক্যাল মোটিভে, হাস্যকর।"

ইনস্পেকটারের ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠেই ছড়িয়ে পড়ল পাতলা হাসিতে। সুবল চা নিয়ে এসেছে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আপন মনে বলল, "শীতটা তাড়াতাড়িই এল তা হলে।" দাঁড়িয়ে থাকা সুবলের দিকে ভ্রূকুটি করল। পায়ে পায়ে সুবল ঘব থেকে বেবিয়ে গেল।

"নানান দিক থেকে সন্দেহ আমরা কববই। পলিটিক্যাল মার্ডার যে এটা নয় তা আমবা বুঝি। তা হলে কী জন্য লোকটা খুন হল? ওর সম্পত্তি বা টাকাকড়ি নেই, টি-বিতে ভুগছিল, থাকার মধ্যে একটা বউ. .।"

"সুনীতকে কেন সন্দেহ?"

"মাঠেব চা-ওয়ালাটা দোকানেই রাতে ঘুমোয়। বোববার রাতে ওর ঘুম ভেঙে যায় শব্দ শুনে। কেউ যেন হাঁসফাঁস করছে, ঝটাপটি হচ্ছে বলে ওর মনে হয়, এরপর শক্ত জায়গায় লাঠি ঠোকাব মতো দু'-তিনটে শব্দ আর চাপা চিৎকার। ছ্যাঁচা বেড়ার দেয়ালের ফাঁক দিয়ে চা-ওয়ালাটা তখন দেখে একটা লোক মাঠেব মধ্যে, নিচু হয়ে কী একটা কুড়োল তাবপব মাঠ থেকে ছুটে এসে ওর দোকানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বৃষ্টি পড়ছিল, রাস্তার আলোটা টিমটিমে আরও দূরেও তাই চিনতে পাবল না। তখন ও "কে কে" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। লোকটা চ্যাঁচানি শুনেই এধার ওধার তাকিয়ে গোলাপবাগান রোড ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটতে শুরু করে। ওদিকটা অন্ধকার, বাড়িও কম। চোখে চশমা ছিল কি না, চা-ওয়ালা তা বলতে পারেনি তবে ডেডবডিব কাছে চশমার একটা লেন্সের টুকরো পাওয়া গেছে, পাওয়ার টেস্ট করতে পাঠানো হয়েছে।"

একচুমুকে চাটুকু শেষ কবে ইনস্পেকটার আর একবার ঘরের আসবাবে চোখ বোলায়। হাতের নোটবইটায় চোখ বোলাল।

"আপনার স্বামী কত টাকা সঙ্গে নিয়ে বেবিয়েছিলেন?"

"বলতে পারব না, তবে সাধারণত পঞ্চাশ-ষাট টাকা সঙ্গে রাখে।"

"ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে?"

"এই মোড়েই স্টেট ব্যাঙ্কে, আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট।"

"ওটা কীসের দরজা?"

"একটা ছোট ঘরের মতো, মালপত্র রাখার জায়গা।"

"একবার দেখব।"

ইনস্পেকটার আলনাটা টেনে সরিয়ে ছিটকিনি নামাল। পাল্লা দুটো ধাক্কা দিয়ে খুলতে হল। ঘরের যতটুকু আলো পড়েছে তাতে দেখা গেল ভাঙা বেতের চেয়ার, পুরনো ট্রাঙ্ক, পাকিয়ে দড়ি বেঁধে রাখা লেপ, নারকেল দড়ির বান্ডিল, ছেঁড়া শতরঞ্চি, খালি বোতল। দেশলাই জ্বেলে জায়গাটা দেখে

ইনস্পেকটার নিজেই দরজাটা বন্ধ করল।

"এদিকটায় নতুন করে আবার অ্যাকটিভিটিজ শুরু হয়েছে।"

ইনস্পেকটার চলে যাবার পর সুবল তোয়ালেটা উমার হাতে দিয়ে বলল, "মাথাটা মুছে নাও।"

উমার মনে হচ্ছে সচরাচর যে-ভাবে কাজ করে থাকে মস্তিষ্কটা সেইরকমভাবে আর কাজ করছে না। গত পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এমন একটা পরিবেশ তার চারধারে গজিয়ে উঠেছে যেখানে যুক্তির পারম্পর্য নেই, কথাবার্তাগুলোও আগের মতো অর্থ বহন করছে না বা জিনিসপত্রের চেহারাও যেন বদলে গেছে। সে দুঃখিত বা অভিভূত নয়, ক্রুদ্ধও নয়। বরং নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলার মতো অনুভূতিটাই বেশি। এখন সে নিজের গায়ে চিমটি কেটে নিশ্চিত হবার জন্য দেখতে পারে সত্যিই সে উমা মুখার্জি কি না।

বৃষ্টি হঠাৎ আবার জোরে নামল। সুবল ব্যস্ত হয়ে ঘরে এসে জানলা বন্ধ করতে করতে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকা উমাকে বলল, "তোমাদের ছেলেপুলে থাকলে ভাল হত।"

অন্যমনস্কের মতো মাথা নেড়ে কথাটার অর্থ বোঝার জন্য উমা ধীরে ধীরে আবার খাটের উপর বসল।

দুই

সুনীত স্বপ্ন দেখছিল—এবং সে তা জানে—কিন্তু জানে না কীসের স্বপ্ন।

এমনভাবে মনের উপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছিল বিভ্রান্তিকর বিশৃঙ্খল ছবিগুলো, এত দ্রুত চলে যাচ্ছিল যে কোনওভাবেই সে একটিকে ধরে রাখতে পারছিল না। একটিরও পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট রূপ সে মনে রাখতে পারেনি।

তার আবার এইরকম ঘটল। ঘুম ভাঙার পর সে বলতে অক্ষম কী নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ছবিগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য এবং তাই করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠে নিজেকে প্রায় নিঃশেষ করে তুলেছিল ঘুমের মধ্যে। ছবিগুলোর মধ্যে এমন কিছু তাৎপর্য নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন আছে যেটা তাকে মূল্যবান সূত্র ধরিয়ে দিতে পারত এবং তাই ভেবে ধীরে-ধীরে সে মনমরা হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্নের একমাত্র যে ব্যাপারটি সে মনে করতে পারছে... কিন্তু সে কীভাবে যে কথাগুলোকে সাজিয়ে প্রকাশ করবে তা ঠিক করতে পারছে না। একটাকেও সঠিক মনে হচ্ছে না। মনের মধ্যে যতই নাড়াচাড়া করছে, শব্দ ও বাক্যগুলো ততই পরস্পরের বিরোধিতা করতে করতে গুটিয়ে যাওয়া ছিটিয়ে পড়া এক ধরনের ঝাঁঝালো রাগ তৈরি করছে। এমন ধরনের রাগ যাতে আক্রমণের মেজাজ নেই, যেটা মানুষের জগতের থেকেও বেশি করে নির্গত হয় জড়বস্তুর এবং বহু দূরে দেখতে পাওয়া ঝাপসা দৃশ্যাবলির অচেতন জগৎ থেকে।

তার স্বপ্নের মধ্যে কোনও মানুষ ছিল কি? হয়তো ছিল। থাকলে নিশ্চয় তাদের মুখ ছিল না। তার আরও চেষ্টা করা উচিত ছিল। তা হলে ভাসা-ভাসা ছবিগুলোর মধ্য থেকে জমাট স্পষ্ট কিছু একটা বার করতে পারত। এই অক্ষমতাটা বুঝে ওঠার পর থেকেই সে মনমরা হতে শুরু করে।

সুনীত এবার সচেতন হল সময় সম্পর্কে। আধা-ঘুমে আধা-জাগরণের মধ্যে সে ঘরের বাইরে মাটির উঠোনে ঝাঁট দেওয়ার শব্দ পাচ্ছে। দরজার কাছে এসে কেউ ফিরে গেল। সম্ভবত বাদলবাবুর বড়মেয়ে শুভ্রা। জানলার বাইরে বাছুর ডাকল। সুনীত অপেক্ষা করল আর একটা ডাক শোনার জন্য। বাড়ির ভিতর দিকের গোয়াল থেকে সেটা ভেসে এল। সে হাসল। কাত হয়ে দরজা দিয়ে তাকাল। সামনেই পলেস্তরা খসা জীর্ণ ইটের পাঁচিল। বাড়িটা পাঁচিলে ঘেরা।

পাঁচিলের মাথায় ছোট্ট ঝোপ। সুনীত বুঝতে পারছে না ওটা কীসের ঝোপ। চশমাটা প্যান্টের পকেটে রয়েছে। ঘরের কোণে দড়িতে ঝুলছে তার প্যান্ট-শার্ট। চশমার একটা কাচ নেই, ওটা চোখে পড়লে লোকেরা মুখের দিকে তাকাবে, অবাক হবে এবং মনে করে রেখে দেবে।

ওরা যদি জিজ্ঞাসা করে? ধরা যাক স্টেশনের টিকিট কালেক্টার যে অত সকালেও প্ল্যাটফর্মের

শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করছিল। মুখের দিকে তাকায়নি বললেই চলে। কিন্তু এককাচ-ভাঙা চশমা দেখলে নিশ্চয় কৌতূহলী হত। সাক্ষীর কাঠগড়ায় লোকটা কী বলত?

"ফার্স্ট ট্রেনে উইকডেজে বিশেষ করে সোমবারে খুব কম লোকই কলকাতা থেকে আসে। রোববাবে একটু ভিড় হয়, মাছটাছ মাবতে অনেকেই আসে। ...না আমি সচরাচর মুখটুখ অত লক্ষ করি না কিন্তু অচেনা অপরিচিত লোকের একটা কাচ ভাঙা দেখে একটু যেন কেমন লাগল।"

"কেমন লাগল?"

"এককাচ-ভাঙা চশমা তো কেউ পরে না, তাই। তা ছাড়া চোখ ফুলোফুলো, লালও হয়েছিল, যেন সারারাত ঘুমোয়নি। প্যান্টের তলার দিকে কাদা, জামার কাঁধে, বুকের কাছেও কাদা।"

চোখ দুটো ফুলো-ফুলো এবং লাল হওয়াটা বাদলবাবু প্রথমেই লক্ষ করেছিলেন, জামা-প্যান্টের কাদাও।

সুনীত স্টেশনের বেঞ্চে সময় কাটিয়ে বকরিহাটি হাই স্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। শীত করছিল খুব। স্কুল ফটকের পাশেই গোপালের মিষ্টির দোকান। বাঁশের ঠেকনোয় তুলে বাখা ঝাঁপটাব নীচে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁপছিল। দোকানের মধ্যে উনুনে বড় একটা কড়াই চাপানো, সেটাকে বেড় দিয়ে লাল আগুনের গনগনানি। লোভীর মতো সুনীত দোকানে ঢুকে উনুনের কাছের বেঞ্চটায় বসে। গায়ে ময়লা গেঞ্জি, রুগ্ণ একটি ছেলে কাছে এসে দাঁড়ায়।

কতগুলো শিঙাড়া নিমকি আর কাঁচাগোল্লা সে খেয়েছিল মনে নেই। পকেটে সাতাত্তর টাকা আর কিছু খুচরো ছিল। উনুনের ওমে শরীরে সাড় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও ফিরে আসে। তখন ক্লান্তিতে তার চোখ জুড়ে আসছিল। ঘুমোতে চেয়েছিল সে, দিনের পর দিন ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

ঘুমের জন্য প্রবল সেই ইচ্ছাটা গত পাঁচ দিন তাকে ফেউয়ের মতো তাড়া করে আছে। এই ঘরের বাইবে সে কদাচিৎ বেরিয়েছে। বাড়ির বাইরে গেছে তিন-চারবার। তার পুবনো সহকর্মীদেব মধ্যে শরৎ মুখুজ্জে এক সন্ধ্যায় দেখা করতে এসেছিল। টিপটিপ বৃষ্টি আব ঠান্ডা লাগার ভয়ের ভান করে সে ঘরের মধ্যেই রয়ে গেছে।

ন' বছর আগে বকরিহাটি হাই স্কুলে পাঁচ মাসের জন্য সুনীত শিক্ষকতা করেছিল। তখন থাকত বাদল নস্করেব এই ঘরটিতেই। তেইশ বছব মাস্টারি করে বাদলবাবু এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। বেঁটে চেহাবাটা গোলগাল হয়েছে, টাক পড়েছে পিছন দিকে, চুল পেকেছে। সুনীতের প্রথমে অসুবিধা হয়েছিল ওকে চিনতে।

মিষ্টির দোকানের বাইরে ঝাঁপটার নীচে দাঁড়িয়ে সে ছাত্রদের দেখছিল। একজনকেও সে চিনতে পাবল না। তিনজন শিক্ষককে চিনল। একজন দোকানে এসে একটা টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে গেল। তখন একবার সুনীতের দিকে তাকিয়েছিল। সে তখন অস্বস্তি বোধ করেছিল প্যান্ট ও শার্টে লেগে থাকা কাদার জন্য।

নিশ্চয় ওবা জানতে পাববে একদা এই স্কুলে পড়াতাম। খোঁজ নিতে আসবে। তখন লংক্লথের পাঞ্জাবি পবা, বোধহয় বিপুলবাবু এর নাম... এই বিপুলবাবু বলবে, "সোমবার সকালে গোপালের দোকানের সামনে একজনকে দেখেছিলুম বটে। হ্যাঁ, অনেকটা যেন সুনীতবাবুর মতোই লেগেছিল। তবে যে-রকম ফিটফাট থাকতেন সে-বকম তো লোকটা ছিল না। কেমন যেন উসকোখুসকো, মুখটা শুকনো, প্যান্ট-জামায় কাদা, চোখে চশমাটাও ছিল না। তাই বুঝতে পারিনি যে উনিই... ন' বছর আগের দেখা তো। তা ছাড়া উনি তো আমাদের সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা বলা কি মেলামেশা করতেন না। ক্লাস না থাকলে টিচার্স রুমের এককোণে বই মুখে দিয়ে বসে থাকতেন। ঘণ্টা পড়লেই ক্লাসে যেতে এক মিনিটও দেরি করতেন না। না..., ছাত্রদের কখনও মারতে বা বকতেও দেখিনি। হি ওয়াজ এ গুড টিচার, আইডিয়াল টিচার, একটু আত্মম্ভরী হলেও, এ গুডম্যান।"

সুনীত ঠিক করে বকরিহাটে এসে পড়ে ভুল করেছে, এখুনি ফিরে যাওয়াই ভাল। এবং কোথায় সে যেতে পারে, এই ভাবনাটা যখন তার মাথার মধ্যে কুরে-কুরে গর্ত তৈরি করছে তখনই পাশ থেকে শুনল, "কী আশ্চর্য সুনীতবাবুই তো!"

অথচ বাদল নস্কর তার সামনে দিয়েই স্কুলের দিকে হেঁটে গেছে। তারপর ফিরে এসে কথাটা বলেছিল।

"ভেবেছিলাম চিনতে পারবেন না। স্টেশন থেকে বেরিয়েই রাস্তায় পিছলে পড়ে দেখেছেন কী অবস্থা হয়েছে, চশমাটাও ভেঙেছে। যাক তা হলে চিনতে পেরেছেন।"

"না পারার কী আছে, আপনাকে যে দেখবে সেই মনে রাখবে।"

শুনেই সিঁটিয়ে গেছল সুনীত। কেউ মনে রাখুক এখন সে তা চায় না।

"এখানে দাঁড়িয়ে কেন, স্কুলের ভিতরে আসুন। দেখবেন কত বদলে গেছে, সে-স্কুল আর নেই। দেখছেন তো দোতলা হয়েছে, ও-ধারটায় ল্যাবরেটেরি। আসুন আসুন।"

"না না বাদলবাবু এ-ভাবে এই কাদামাখা অবস্থায়... পরে দেখব। স্ত্রীকে বারাসাতে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ভোরের ট্রেনেই শেয়ালদায় নেমে ভাবলাম সাত দিন তো ছুটি নিলাম, ঘরেও কেউ নেই তা হলে এখন কী করা যায়! স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল বকরিহাটিকে, আপনাকে। অনেকদিন প্রায় ন' বছর আপনাকে দেখিনি।"

বাদলবাবু ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে।

"য়্যাঁ, আমায় মনে পড়ল! কী আশ্চর্য। থেকে যান তা হলে ছুটির ক'টা দিন আমার বাড়িতে। না না, কোনও কথা শুনব না, দাঁড়ান স্কুল থেকে চট করে ঘুরে আসি, দু'মিনিট।"

সুনীত আবার তখন ভেবেছিল, এই ফাঁকে চলে যাই। কিন্তু কোথায় যাব? স্টেশন থেকে বেরিয়েই পিছলে পড়ায় কাদা লেগেছে বলাটা বোধহয় বোকামি হল। স্টেশন থেকে স্কুল পর্যন্ত পিচের রাস্তায় কোথাও কাদা নেই।

অপ্রত্যাশিত আচমকাই ঘটেছিল। সে-জন্য কোনও প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা ছিল না। নিয়তি বা দৈবের হাত ছিল কি না তা সে জানে না। কখনও সে কোষ্ঠীঠিকুজি, তাবিজ মাদুলিতে বিশ্বাস করেনি। ঈশ্বর সম্পর্কে তার কোনও মতামত নেই।

গুণেন ভবনের গেটের আলোটা নেভানো। রাত তখন অন্তত দেড়টা। গেটে তালা দেওয়া, তার একটা করে চাবি সব ফ্ল্যাটেই আছে। সুনীত কিছুক্ষণ আগেই ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। এত রাতে গোলাপবাগান রোডে ট্যাক্সি নিয়ে সে ঢুকবে না। ঢুকতেই হবে। পয়সা দোব যখন যাবে না কেন?

বৃষ্টি আর ঠান্ডার জন্য পথে একটি লোকও ছিল না। পানের দোকানটারও ঝাঁপ বন্ধ। সুনীত ঠিক করে ফেলে ট্যাক্সি থেকে নামবে না। "থানায় চলো", সম্ভবত এই কথাটাই বলেছিল।

ট্যাক্সিওলার সঙ্গীটি তখন, "নিকুচি করেছে মাতালের," এই বলে দরজা খুলে গলার কাছে জামাটা ধরে হিঁচড়ে তাকে নামায়। লোকটা চড় মেরেছিল। তখন সুনীতের ছড়ানো ঝাপসা দৃষ্টি ধীরে-ধীরে সংকুচিত হয়ে জমাট এবং তীক্ষ্ণতা লাভ করে। টলুনি থেমে যায়।

ট্যাক্সিটা চলে গেল। গুম হয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। অপমানের জ্বালাটা আবার সে অনুভব করতে শুরু করে। গত ছ'ঘণ্টার মধ্যে দু'বার ঘটল। এবারের অপমানটা চড় খাওয়ার জন্য নয়। ভাড়া না নিয়েই ট্যাক্সিটা চলে গেল। অন্তত দশ টাকা পাওনা হয়েছিল। ট্যাক্সিওয়ালারা গরিবই হয় তবু টাকাটা ছেড়ে দিল। এটা কি অনুগ্রহ, দান, তাচ্ছিল্য, অবহেলা... সুনীতের মাথার মধ্যে বাষ্পের মতো ঝাঁঝালো একটা রাগ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। রাগটা তাকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আনল গুণেন ভবনের কাছে।

বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিল না। টিপটিপ বৃষ্টিটা তখন হঠাৎ জোরে-নামল। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল অসহায়ভাবে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো শীতল সুঁচ ঢোকাচ্ছে শরীরে, চটের পর্দাটা তুলে কে যেন দেখছে তাকে। সুনীত এগিয়ে গেল সেদিকে। কেন? বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই কি?

সে জানে না। এখনও সে বুঝতে পারছে না কেন হাবার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার কিছুটা চোখে সয়ে এসেছিল। দূরে গোলাপবাগান রোডের বাতি থেকে আলো চুঁইয়ে আসছে বৃষ্টিধারা ভেদ করে অতি স্তিমিতভাবে। সেই আলোয় গুণেন ভবনকে অতিকায় আবছা একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো দেখাচ্ছিল।

সুনীতের আবার গোলমাল ঘটতে শুরু করে। ঝড়ের বেগে একটা দমকলের গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মাথার মধ্যে ছুটে আসছে। সে দেখতে পাচ্ছে শুধু দুটো হেডলাইট, সাদা দুটো বিন্দুর মতো।

আর একটু ঝুঁকে সে ভাল করে তাকাল। মুখে ভাতের গন্ধ, সর্ষের তেলের গন্ধ, চ্যাপটা নাক, পুরু ঠোঁট এইসব নিয়ে চৌকো মুখের মাঝখানে বড় বড় গোল চোখ দুটোর সাদা অংশ স্থির হয়ে আছে। কালো মণি দুটো এক একবার ছড়িয়ে গিয়ে সাদাকে ঢেকে দিয়েই আবার গুটিয়ে আসছে। সুনীত হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'হাতে হাবার বউকে মেঝেয় ফেলে দিয়ে।

আঁকড়ে ধরেছিল হাবার বউ তার দুটি কাঁধ। ওর দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠা-নামা করছে বুক। ও যখন কামড়ে ধরে সুনীতের ঠোঁট চুষছিল তখন সে মার বুকে হামলাকরা কুকুরছানার কুঁইকুঁই শব্দের মতো কিছু একটা শুনতে পাচ্ছিল। তখন সে ধীরে ধীরে ওর নিটোল স্তনে দুটি হাত রাখে।

সেই সময়ই হাবা তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে...।

"কে, কে, কে ওখানে?"

সুনীত ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘুম ভাঙার পর চেতনায় ছড়ানো কুয়াশার মতো তন্দ্রায় স্নায়ুকোষগুলি তখনও স্তিমিত। তার মনে হচ্ছিল, ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ তার দিকে এগিয়ে আসছে। কার চোখ সে বুঝতে পারছিল না।

"কাকাবাবু আমি, চা এনেছি।"

সুনীত অপ্রতিভ বোধ করল। শুভ্রার হাত থেকে চায়ের কাপ নেবার সময় তার মনে হল মেয়েটি তাকে নিবিষ্টভাবে লক্ষ করছে।

"স্বপ্ন দেখছিলাম... বাবা উঠেছে?... সেই ডান দিকের শিংভাঙা গোরুটা আছে?"

কথাগুলো বলেই সুনীত বুঝতে পারল বোকার মতো সে অপ্রতিভতা কাটাতে চাইছে। স্বপ্ন দেখাটা, চেঁচিয়ে ওঠার কারণ হতে পারে না; গ্রামের মানুষ ভোরেই বিছানা ত্যাগ করে সুতরাং জিজ্ঞাসা করাটা অহেতুক; গোরু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ ঘুম থেকে উঠেই! শুভ্রার জন্য লক্ষ করার টোপ তো সে নিজেই দিয়েছে।

"বছর দুই হল মরে গেছে, এখন যেটা দেখছেন সেটা ওর মেয়ে। বাবা জাল ফেলাচ্ছে বড় পুকুরে দেখে আসুন না।"

সুনীত বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি বার করল।

"সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে!"

শুভ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ধীরভাবে গ্রামটি সক্রিয় হয়ে উঠছে কিন্তু তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। জাম গাছের পাতাগুলো বৃষ্টিতে ধুয়ে গাঢ় সবুজ, আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি থেমে গেছে। একটা কাঠবেড়ালি পাঁচিলের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। এ-সবই সে বিনা চশমায় ঝাপসাভাবে বুঝল। কলকাতায় সে এইসময় চা এবং খবরের কাগজের অপেক্ষায়। সাতটার আগে খবরের কাগজ এই গ্রামে পৌঁছয় না।

হয়তো আজকের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। কিংবা না-ও বেরোতে পারে। অতি তুচ্ছই ঘটনা, এমন ব্যাপার প্রতিদিন কলকাতায় আট-দশটা ঘটছে। সবই কি বেরোয়?

কী ভাবল শুভ্রা, কিছু কি অনুমান করল? সন্দেহ? যদি ওরা জিজ্ঞাসা করে, কী সাক্ষী তা হলে দেবে?

"সাড়ে ছ'টায় চা দিতে যাই।"

"অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলে?"

"কেমনভাবে যেন 'কে কে ওখানে' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন।"

"তাতে কী মনে হল?"

"স্বাভাবিক মানুষ ও-রকমভাবে চেঁচিয়ে ওঠে না।"

"কী মনে হল?"

"কেউ যেন ওকে তাড়া করছে তাই লুকোবার জন্য জায়গা খুঁজছেন আর বারবার পিছনে তাকাচ্ছেন। প্রথম থেকেই দেখেছি উনি মানুষ এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, ঘর থেকে বেরোতেনই না। বলতেন, চশমা নেই, সর্দিকাশির ধাত।"

"কে কে ওখানে বলে চেঁচালেন কেন?"

"স্বপ্ন দেখেছিলেন বললেন।"
"কী স্বপ্ন?"
"বলেননি, তবে মনে হল লজ্জা পেয়েছিলেন চেঁচিয়ে।"
"ওকে প্রথম দেখে কেমন লেগেছিল? ন' বছর আগে যেমন দেখেছিলে, সেই লোকটিই কি?"
"তখন আমার বয়স সাত-আট বছর ছিল। শুধু মনে আছে এখনকার থেকে আরও ফরসা, আরও ছিপছিপে ছিলেন, মাথায় অনেক চুল ছিল। অনেকটা... অনেকটা সিনেমায় নামবার মতো চেহারা ছিল। মজার মজার গল্প বলে আমাকে বাবাকে হাসাতেন। মা কখনও ওর সামনে আসত না। পোস্ত আর ট্যাংরামাছ ভালবাসতেন। হাসি-খুশিই ছিলেন, স্কুলের স্পোর্টসে দৌড়তে দেখেছি, গানের সুন্দর গম্ভীর গলা, মাঝে মাঝে গাইতেনও। আমাকে 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানটা শেখাবেন বলেছিলেন কিন্তু শেখাননি, তারপরই চলে যান। হ্যাঁ, প্রতি শনিবারই কলকাতায় যেতেন। একবার একজন মেয়ে... মহিলা, শুনেছিলাম অফিসে চাকরি করেন, সুনীতকাকুর সঙ্গে বিয়ে হবে, তিনি এখানে এসে দু'দিন ছিলেন, নাম উমা।"
"কোথায়, ওর ঘরে?"
"না না, আমাদের ঘরেই রাতে ছিলেন, আমি, মা আর তিনি একসঙ্গে খাটে শুয়েছিলাম।"
"আর অন্য সময় তিনি কি ওর ঘরেই কাটাতেন!"
"সব সময় নয়, মাঝে-মাঝে যেতেন। মার সঙ্গে রান্নাঘরেও গল্প করতেন, দু'-একটা রান্নাও শিখে নিয়েছিলেন। মা পরে বলেছিল, 'হিসেবি মেয়ে মেপে চলতে জানে।' ওরা দু'জন সারা বিকেল গ্রামটা ঘুরে খালের ধারে গিয়ে বসেছিল; আমিও সঙ্গে ছিলাম।"
"কী কথা বলছিল ওরা?"
"তেমনি কিছু নয়, তা ছাড়া সব কথা শুনতেও পাইনি। আমি কাছে থাকলে ওরা আজেবাজে কথা বলত। শুধু একবার কানে আসে সুনীতকাকাকে উনি বলছেন, 'পদ্য টদ্য লেখার পক্ষে জায়গাটা ভালই... এখানেই পড়ে থাকবে নাকি'?"
"কী বললেন তাইতে?"
"বললেন পদ্য আর লিখি না।"
"এবার যখন ওকে দেখলে কীরকম মনে হল?"
"কেমন যেন গম্ভীর অন্যমনস্ক। আমায় দেখে শুধু বললেন, 'অনেক বড় হয়ে গেছ।' তাকালেন আমার দিকে কিন্তু মনে হল কিছুই দেখছেন না। কী যেন সব সময়ই ভাবছিলেন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, অর্ধেকই পাকা, চোখ দুটো লাল, মনে হচ্ছিল রাতে ঘুমোননি। মা বললেন, আগের থেকে পেটটা একটু বেড়েছে। সব মিলিয়ে বুড়োটে বুড়োটে লাগছিল। দু'বার বলেছিলেন 'বড্ড টায়ার্ড'। আমিই লেপ তোশক বার করে বাইরের ঘরে বিছানা করে দি।"
"আর কিছু?"
"ওর জামা আর প্যান্টে কাদা লেগেছিল। বললেন কেচে দিতে। আমিই সাবান দিয়ে কেচে দি। সেদিন স্কুলে আর যাওয়া হয়নি।"
সুনীত অস্বস্তি বোধ করল এইভাবে এক উদ্ভিন্ন যৌবনার দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে। কথোপকথন যে ঠিক এইভাবেই হবে তার কোনও সঠিকতা নেই বটে কিন্তু এ ছাড়া আর কী বলবে! ন'বছরে কতটা বুড়ো হয়েছি নাকি সেদিন ন'ঘণ্টাতেই বয়স বেড়ে গেছে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে সে দেয়ালে তাকাল। শেয়ালদা থেকে একটা আয়না কিনে এনে ওখানে সে রেখেছিল। আয়নাটার তলার দিকে তাকালে মুখটা ফজলি আমের আঁটির মতো লম্বা হয়ে যেত।
দাড়ি যদি রাখা যায় তা হলে নিজেকে অনেকখানি আড়াল করা যাবে। ওরা নিশ্চয় আমার ছবি জোগাড় করে ফেলেছে। ড্রেসিং টেবিলের উপর যেটা আছে সেটাই নেবে। খুব বড় একটা গোটা মুখ, মিলিয়ে চিনে নিতে সুবিধাই পাবে। অ্যালবামেও আছে গ্রুপ ফটোর মধ্যে। দু' বছর আগে অফিসের পিকনিক হয়েছিল উলুবেড়িয়ায় ফুলেশ্বরে। জনা সাত-আটের একধারে সে দাঁড়িয়ে। তার পাশে রুবি। তারপর চিন্ময় ঘোষ আর তার বউ। অনেকেই বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে গেছল, সুনীত বাদে। ছবিটায়

তাকে অনেক তাজা, তরুণ মনে হয়। উমা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে বলেছিল, "তোমাদের এই রুবি দেখতে স্মার্ট বটে কিন্তু বয়সও অনেক হয়েছে।"

দাড়িটা রাখা দরকার। সুনীত লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরল। পকেটে যা আছে বার করল। পাঁচদিন সে প্যান্ট পরেনি। বাদলবাবুর লুঙ্গি আর আলোয়ানেই কাজ চালিয়েছে। পার্স, ট্রেনের টিকিট, দেশলাই, চশমা, গুণেন ভবনের গেটের চাবি, আর মেরুন জমিতে ছাই রঙের চৌকো ঘরকাটা একটা রুমাল।

রুমালটা কী করে এল পকেটে। রুবি হাতে দিয়ে বলেছিল মুখটা মুছে নাও। কিন্তু তারপর কি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি? তখনই কলিংবেলটা বেজে ওঠে আর রুবির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছল। তাদের দু'জনের চোখাচোখি হতেই রুবি বলেছিল, বম্বে থেকে তো ওর সোমবারের ইভনিং ফ্লাইটে ফেরার কথা।

ও অর্থাৎ পঙ্কজ আচার্য, যিনি জনসন, ফোকস অ্যান্ড হাজরার পাবলিক রিলেশনস অ্যান্ড পাবলিসিটি ম্যানেজার, রুবি কাঞ্জি যার একান্ত সচিব, সুনীত যার তিনধাপ নীচের কর্মচারী, রুবির এই ফ্ল্যাটের ভাড়া যিনি দেন এবং সপ্তাহে দু'-তিনদিন মধ্যরাত পর্যন্ত এখানে থাকেন।

রুমালটা যদি ওরা পায়? ওরা নিশ্চয় অফিসে যাবে, পঙ্কজ আচার্য, রুবি, চিন্ময়কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। রুবির রুমাল পকেটে পাওয়া গেছে সুতরাং একটু বেশি করেই ওকে জিজ্ঞাসা করবে। কী প্রশ্ন করবে?

"আপনার সঙ্গে কতদিনের আলাপ?"

"বছর চারেকের। অফিসেই হয়।।"

"আপনি একা থাকেন?"

"হ্যাঁ, ঝি আছে।"

"আপনার ফ্ল্যাটে উনি কি যেতেন?"

"মাঝেমাঝে।"

"রাতে থাকতেন?"

"কোনওদিন নয়।"

"ওর সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

"ভাল ছাত্র ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বড় কিছু একটা হবে। ইদানীং অসুখী অতৃপ্ত মনে হচ্ছিল ওকে। উলটোপালটা কথা বলত, অস্থির হয়ে উঠত। প্রায়ই বলত চারদিকটা কেমন একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছে, শরীরে তেমন করে আর রক্ত চলাচল করছে না।"

"কখনও কি খুন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন?"

"না।"

"খুব কি ভিতু ছিলেন?"

"পরীক্ষা করে দেখিনি। তবে প্রাণের ভয় করত না।"

"কীভাবে জানলেন?"

"আমার বাবা-মা, ভাই-বোনরা থাকে মানিকতলায়। মাসে একবার যাই টাকা দিয়ে আসতে। বোমা, গুলি ছুরির আমলের কথা। রাতে আমি যেতে ভয় পাচ্ছিলাম। সুনীত আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। যখন আমরা পাড়ায় ঢুকছি ঠিক তখনই বোমা পড়তে শুরু করে। আমি পিছিয়ে আসি। সুনীত আমার হাত ধরে টানতে টানতে গলিতে ঢোকে। অচঞ্চলভাবে হেঁটে যায়। পরে বলেছিল, বিপদের মধ্যে ঢুকলে রক্ত চলাচল হয়। একঘেঁয়েমিটা কিছুটা কাটে।"

"আপনার রুমালটা কী করে উনি পেলেন?"

"বলতে পারব না, হয়তো আমি ওর টেবিলে ফেলে গেছলাম।"

এটা অবশ্যই মিথ্যা কথা। রুবি কখনও কিছু টেবিলে ফেলে যায় না, নিজের টেবিলেও নয়। তা ছাড়া আর যা বলেছে সেগুলো সত্যি। কোনও না কোনও সময় সুনীতকে সে কথাগুলো বলেছে। অসুখী, অতৃপ্ত, অস্থির এগুলো রুবি নিজের সম্পর্কেও তো বলত।

সুনীত বড় পুকুরের দিকে যাবার সোজা পথটা ছেড়ে ঘুরপথে এগোল। এদিকটায় বাড়ি কম,

লোকজনও কম। প্রায়ই সে স্কুল থেকে ফেরার সময় এই পথটা দিয়ে ঘুরে আসত। তখন ভাবত, এখানেই থেকে যাবে। স্টেশনের ধারে কয়েকটা দোতলা বাড়ি উঠেছিল, উমাকে বিয়ে করে ওই বাড়িগুলোরই কোনও একটায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবে। এক একদিন সকালে খালি পায়ে গেঞ্জি আর পাজামা পরে সে গ্রামের প্রান্তে এসে দাঁড়াত। 'ছিন্নপত্রের' নানা অংশ তখন তার মনে পড়ত। সেই সঙ্গে মাটির সোঁদা গন্ধ, হঠাৎ কোনও পাখির ডাক, দূরে জমিতে হাল দেওয়ায় ব্যস্ত চাষি আর জগৎজোড়া শান্ততা তাকে আপ্লুত করত।

কিন্তু ধীরে ধীরে টানাপোড়েন শুরু হল তার মনে। মাস দুয়েকের পরই সে দূরের খড়ের চালাবাড়ি, গাছ, সবুজ চারাধান, ভিজে বাতাসে মাটির গন্ধ আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অস্থির বোধ করতে শুরু করে। তার মনে হয়, এই তুষ্ট, জড় ভূপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে পড়লে নিথর অপরিবর্তনীয় এক ক্লান্তির গর্ভে সে নিক্ষিপ্ত হবে। মারমুখো, বিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বময় কলকাতার কাছ থেকেও সে ক্লান্তি পায়। কিন্তু তার মধ্যে ঝাঁঝালো একটা আমেজ আছে, দ্রুত পরিবর্তনীয় এবং তাতে সংকীর্ণতা নেই। পছন্দ বা বাছাই করার সুযোগ আছে। সে বুঝতে পারে এখানে রয়ে গেলে তার অপমৃত্যু ঘটবে, উমারও তীব্র অনিচ্ছা ছিল। সে তার বিছানা ও সুটকেস নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটি পড়তেই কলকাতায় চলে আসে। ট্রেনে তুলে দিতে এসে বাদল নস্কর তার দুটি হাত ধরে বলেছিল, "সত্যি সত্যিই ফিরে আসবেন তো? কলকাতার মানুষ পাড়াগাঁয়ের স্কুলে থাকতে চায় না। দু'জন এসেছিলেন, দু'-তিন মাস থেকেই চলে গেলেন। আপনি কিন্তু আসবেন।"

সুনীত ঘাড় নেড়েছিল এবং তার ন'বছর পর ফিরে এল। কী জন্য? অন্য কোথাও তো যেতে পারত সে! বাদল নস্করের সহৃদয় সরল এই আবাসটি অবচেতনে ন'বছর ধরে কি অপেক্ষা করছিল ভয়ংকর কোনও উৎক্ষেপের জন্য। স্নেহ মমতা যত্নের আকাঙ্ক্ষায় তার ভিতরে অতৃপ্তি তিলতিল করে জমে উঠেছিল কি? পকেট থেকে চশমাটা বার করল। একটা কাচ না থাকলেও দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু কাচবিহীন চোখে চাপ পড়ছে ফলে অন্য চোখের দৃষ্টি প্রকৃতির কোনও বিষয়ের উপরই সঠিক মাত্রায় বসতে পারছে না। পিছলে যাচ্ছে। একটা চোখ বন্ধ করে সে বলল, "আমার জীবন?"

বড় পুকুরের দিকে যাবার পথে একটা নির্জন এবং খেজুরগাছের আড়াল পাওয়া জায়গায় দেশলাই জ্বেলে রুমালটা পুড়িয়ে দিল। পায়ের চাপে ছাইগুলো গুঁড়িয়ে দিতে দিতে মুখ তুলেই অবশ হয়ে গেল তার বুকের মধ্যেটা। একটা লোক!

ফতুয়া, রঙিন লুঙ্গি, থুতনিতে নুর, পায়ে চটি। ঢ্যাঙা লোকটি আদব জানাল।

"মাস্টারমশায়ের কাছে শুনলাম আপনি এয়েচেন। বললেন, এখন খুব বড় কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছেন তাই দেখা কত্তি যাচ্ছিলাম। আমারে অবিশ্যি মনে থাকার কথা নয়... কাগজ পোড়ালেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

আর একজন সাক্ষী ওরা পেল। রুমালটাকে ইটে জড়িয়ে পানাপুকুরটায় ফেলে দিলেই তো হত। বোকামি করছে সে।

"ঠিক চিনতে পাচ্ছি না তো তোমায়।"

"আপনি যখন এখানে পড়াতেন তখন আমার ছেলে ইদ্রিস কেলাস সেভেনে। ফেল করল চারটে বিষয়ে।"

সুনীতের মনে পড়ল লোকটিকে। শেখ মঞ্জিল এর নাম। এক সময় নাকি ডাকাত দলে ছিল, জমিজমা যথেষ্টই আছে। অ্যানুয়েল পরীক্ষার ফল বেরোবার পরদিনই ছেলেটাকে মারতে মারতে টিচার্স-রুমে ঢুকেছিল। 'ধিক তোরে ধিক। মাস্টারমশায়রা অ্যাতো কষ্ট করে যত্ন নিয়ে পড়ান আর তুই ব্যাটা ভক্তিভরে তা মগজে নিলি না? বেশ হয়েছে ফেল করেছিস, ...যা পরণাম কর সকলকে, বল এবার থেকে ছদ্ধাভরে পড়ালেখা করব... যা যা পায়ে ধরে...' মঞ্জিল ছেলের পাছায় দারুণ এক লাথি কষায়। ইদ্রিস নতমস্তকে প্রস্তুতই ছিল যেন। গোলকিপারের মতো ডাইভ দিয়ে সামনেই যে দুটি পা পেয়েছিল আঁকড়ে ধরে এবং তা সুনীতেরই। হাঁ হাঁ করে উঠেছিল সে। 'না না, ধরতে দ্যান। বলুক কেলাস এইটে মন দিয়ে পড়বে আর ফেল করবে না।' মাস্টারমশাইদের একজন তখন বলেন, 'ক্লাসে তুলে

দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। কমিটির মিটিং হবে তারপর যা হয়। তুমি পাঁচ-ছ' দিন পরে এসো।'

"ইদ্রিস কী করছে এখন।"

"সে আর বলবেন না। এইট কেলাসে তো আপনারা তুলে দিলেন, তারপর ছোঁড়া মাতল ফুটবল নিয়ে। কলকাতার কেলাবে দু'বছর খেলে হাঁটু জখম করে খেলা ছাড়ল।"

"গোলে খেলত?"

"আজ্ঞে না, হাফে খ্যালত, ভালই খ্যালত... তারপর শাদি দিলাম, এখন দুটো ব্যাটার বাপ, বসে আছে আমার ঘাড়ে কাজকম্মো নাই, বেকার। আপনে তো বড় কাজ করেন শুনলাম, একটা পিওন-বেয়ারার চাকরি করে ওরে দ্যান বাবু।"

শেখ মঞ্জিল ঝপ করে বসে সুনীতের পা চেপে ধরল। সুনীত 'একী একী,' বলে তিন-পা পিছিয়ে গেল।

এ-সব ব্যাপার খুব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়া যায় রাজি হয়ে গিয়ে। তাড়াতাড়ি সে বলল, "আচ্ছা দেখবখন, তুমি বরং আমার অফিসে সামনের হপ্তায় যে-কোনওদিন ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ো। ঠিকানাটা মাস্টারমশায়ের কাছে রেখে যাব!"

বাদল নস্কর আসছে পিছনে জাল হাতে দুটি লোক। মঞ্জিলকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তারপরেই কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "কিছুই পেলাম না, পুজোর সময় সব বিক্রি করলাম তো। তবে দুটো হাফ কেজি মিরগেল, কই আর গলদার বাচ্চা..."

"কী দরকার ছিল!"

"বলেন কী? অ্যাতো বছর পর পায়ের ধুলো দিলেন। একটু যত্ন করে শান্তি পাব নাকি তা-ও পেতে দেবেন না।... তুই কী কত্তে, ছেলের চাকরির জন্য? আর সময় পেলি না।" মঞ্জিল মাথা চুলকোতে লাগল। বাড়ি ফেরার পথে বাদল নস্কর বকবক করে চলল। "জোষ্টি আষাঢ়ে আসবেন। আম, লিচু, কাঁটাল যত খেতে পারেন খাওয়াব, ওনাকেও আনবেন নেমন্তন্ন করে রাখলাম। আর খাওয়াব ওল। কী আপনারা সাঁত্রাগাছির ওলের কথা বলেন, খাবেন বকরিহাটির ওল, মনে হবে ছানার ডালনা খাচ্ছি। আপনি তো খেয়ে গেছেন, সে-কথা কালই শুভ্রার মা বলল, আপনাকে রেঁধে দিয়েছিল খেয়ে বুঝতেই পারেননি। তারপর যেই শুনলেন ওল খেয়েছেন অমনি গলা কুটকুট করার বাতিকে পেয়ে বসল। হয়, ও-রকম হয়।"

শেখ মঞ্জিল সংকোচভাবে বলল, "আমি বরং ও-বেলা একটা মুরগি দিয়ে যাব।"

"আজ নয়, বরং কাল সকালে এনো। আমি রাতে মাংস খাই না।"

"সেই ভাল আজ শুধু মাছ দিয়েই হোক। তুই এবার কেটে পড় তো। বিশ্রাম করতে এয়েছেন উনি, চাকরি-বাকরির কথা কলকাতায় গিয়ে বলিস।"

শেখ মঞ্জিল রাস্তা থেকেই বিদায় নিল।

বাড়িতে ঢুকে বাদল নস্কর রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। সুনীত ঘরে ঢুকে তক্তপোশে বসল। চোখ বন্ধ করে সে ভাবল, বকরিহাটি এবার অসহ্য এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ক্রমশই তার অবস্থিতি জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। অবাঞ্ছিত কাজ ঘাড়ে চেপে বসেছে।

গতরাত্রে ভূগোলের মাস্টারমশাই শরৎবাবু আবার এসেছিলেন।

"আচ্ছা সুনীতবাবু আপনি বাওবাব গাছ দেখেছেন কি? শুনেছি বালিগঞ্জের লেকের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা নাকি আছে, খুবই ছোট আকারে এই সজনেগাছের মতো।"

সুনীত অবাক হয়ে শরৎবাবুর চশমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। বাওবাব শব্দটাই সে এই প্রথম শুনল।

"কী গাছ ওটা?"

'গীতার সেই ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং', সাগর মন্থনে উঠেছিল যে কল্পতরু, বাওবাব হচ্ছে সেই। বছরে ছ'মাস বাওবাবের পাতা থাকে না তখন এর ডালগুলোকে ঠিক শেকড়ের মতো দেখায়, মনে হয় যেন শেকড়গুলো আকাশের দিকে উঠেছে আর গাছটা নীচের দিকে বেড়েছে। আসলে এ-গাছ পূর্ব আফ্রিকার। এর গুঁড়ির বেড় তিরিশ মিটার পর্যন্ত নাকি হয়, কল্পনা করতে পারেন তি-রি-শ-মি-টা-র।"

"এত মোটা গুঁড়ি ভাবতেই পারি না। হয় নাকি?"

"আছে আছে প্রয়াগের কাছে গঙ্গার পুব তীরে শুনেছি একটা আছে। ভাবছি একবার দেখে আসব। তার আগে ওটাকে দেখতে হবে। আপনি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবেন সত্যিই ওটা বাওবাব কি না।"

"দেখে কী হবে, কল্পতরুর কাছে কি কিছু চাইবেন?"

কথাটা বলেই সুনীতের মনে হয়েছিল, এ-রকম একটা গাছ থাকলে ভাল হত। তা হলে সে চাইত হাবাটা বেঁচে উঠুক। যথারীতি গোলাপবাগান রোডে বসে চিনেবাদাম বেচুক আর তার খকখক কাশি সন্ধ্যা থেকে গুণেন ভবনের মানুষদের জ্বালাক।

কিন্তু এই মুহূর্তে তক্তপোশে একা চোখ বন্ধ করে বসে তার মনে হচ্ছে, কল্পতরুর কাছে সে চাইবে চিরকালের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে থাকার এমন একটা জায়গা যেখানে চেষ্টা করলেও মানুষের সঙ্গ পাওয়া সম্ভব নয়। যেখান থেকে ওরা তাকে খুঁজে বার করে কোমরে দড়ি বা হাতে হাতকড়া দিয়ে কোর্টে নিয়ে যেতে পারবে না। ফাঁসি না হলেও অন্তত সাত কি দশ বছরের জন্য জেল তো বটেই।

সুনীত ঢোক গিলতেই গলা ব্যথা বোধ করল। কপালে হাত দিয়ে তাপ বোঝার চেষ্টা করল। চোখ জ্বালা করছে, শরীর শ্রান্ত লাগছে। প্রতি বছরই তাকে শীতকালে সর্দিজ্বরে ভুগতে হয়। ধীরে ধীরে সে বিছানাটায় নিজেকে এলিয়ে দিল। এই রকম সময়ে উমা ট্যাবলেট আর জলের গ্লাস এগিয়ে দেয়। উমা...।

"কাকাবাবু।"

শুভ্রার হাতে অমলেট আর হালুয়ার প্লেট। সুনীত উঠে বসল। কালকের মতো চিঁড়েভাজা দিলে ভাল লাগত।

"তোমার তো পরীক্ষা এসে গেল, কেমন তৈরি হয়েছে।"

মেয়েটি রুগ্ণ। বাড়িতে ফ্রক পরে। হাত-পা দেখলেই বোঝা যায় যত রকমের ভিটামিন লভ্য সবই ওর শরীরে দরকার। ওকে দেখে মায়া হয়।

"এক রকম হয়েছে।"

"আমি যখন ছিলাম তখন কোন ক্লাসে পড়তে?"

সুনীত চামচ দিয়ে অমলেট কাটতে কাটতে ওকে লক্ষ করল।

"তখন স্কুলে ভরতি হইনি।"

"ওহ, হ্যাঁ, মনে ছিল না। তুমি কলকাতায় যাও?"

"খুব কম! এ-বছর কালীপুজোর আলোর সাজ দেখতে গেছলুম।"

"এবার যখন যাবে, আমার ওখানে যেয়ো, কেমন।"

ঘাড় নেড়ে শুভ্রা দাঁড়িয়ে রইল। কী যেন বলব বলব করছে। তারপরই খাপছাড়া প্রশ্ন করল: "আপনি তো পদ্য লেখেন, কাল রাতে মা বলছিল একটা বইও আছে।"

মুখে অমলেট রেখে সুনীত তাকিয়ে রইল। কী ব্যাপার! এই পরিবারটি ক'দিন ধরেই ন'বছর আগের স্মৃতিগুলোকে খোঁড়াখুঁড়ি করে যাচ্ছে। ন'বছর আগে কুমারী উমা এক মধ্য রাতে শুভ্রাদের ঘর থেকে চুপিসাড়ে এই ঘরে এসে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে গেছল। ফিরে গিয়ে কিছু পরেই সে টের পেয়েছিল শুভ্রার মা জেগে রয়েছে। এই তথ্যটি কি আলোচিত হয়েছে, অবশ্যই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে!

অস্বস্তি এবং বিরক্তিতে ভরে উঠল সে। এই জায়গাটায় কেন যে এলাম।

"সব মানুষই ভুল করে, আমিও করেছিলাম। আর করি না... আর পদ্য লিখি না।"

"আমি একটা-দুটো লিখেছি। দেখবেন?"...

সুনীত এর থেকে বেশি আশ্চর্য হত না যদি এখুনি চারটে পুলিশ ঘরে ঢুকে পড়ত। গ্রামের এই এগারো ক্লাসের মেয়ে পদ্য লেখে!

"স্কুলের ম্যাগাজিনে লিখেছি, ছাপা ম্যাগাজিন। আর বকরিহাটি লাইব্রেরির যখন থিয়েটার হল, তার বইয়েও একটা বেরিয়েছে। দেখবেন?"

"পরে দেখব।"

লাজুক মুখটা হতাশ হল। সুনীত আন্দাজ করছে, নিশ্চয় প্রকৃতি বিষয়ক নয়তো স্বাদেশিক ব্যাপার নিয়ে।

"আপনি লেখেন না কেন?"

কী বলা যায়। এই সামান্য কৌতূহলের জবাব দিতে হলে তাকে গত ন'-দশ বছরের মধ্যে সেঁধিয়ে উত্তর সংগ্রহ করতে হবে। সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

"সময় পাই না আর... অফিসে খাটুনি, বাড়ি ফিরে এত টায়ার্ড লাগে।"

পদ্য লেখা ছেড়ে দেবার এটা এক-চতুর্থ কারণ। বাকিটা, একে বললেও বুঝতে পারবে না। আদতে আমি কবি নই, যা লিখেছি সেগুলো কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে শব্দের পর শব্দ বসিয়ে যাওয়ায় যা হোক একটা কিছু হয়ে যাওয়া। নতুন শব্দ, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা রূপকও নয়। শব্দ জড়ো করে যাওয়ার মজুর মাত্র। এ-সব কথা ওকে বলে লাভ কী।

"দেখবেন আমার লেখা?"

"ছাপা লেখা?"

"খাতাও আছে। আমি আনছি।"

কী নিস্তব্ধ এই গ্রামটা। বাদলবাবু বোধহয় স্কুলে যাওয়ার জন্য তোড়জোড়ে ব্যস্ত। এক সময় কিছু লিখেছিলাম বটে, তখন উমার সঙ্গে প্রণয় চলছে। প্রেমই বিষয় হয়ে উঠত। বছর বারো আগে সাতাশ জন তরুণ কবির কবিতা সংকলনে তারও একটা কবিতা স্থান পেয়েছিল। কাব্যগুণে নয়, বইটি প্রকাশের খরচ বাবদ পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছিল। বইটা সে শুভ্রার বাবাকে দেখিয়েছিল।

এই ঘরে বাস করার সময় প্রথম মাসেই সে গুটিচারেক কবিতার খসড়া করেছিল। যত দূর মনে পড়ে প্রকৃতিই যেন প্রাধান্য পেয়েছিল। তারপরই কেমন যেন ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করে। কাগজগুলো ফেলে দিয়েছিল।

বিয়ের পর লেখার কথা আর সে ভাবেনি। কবিত্বের আবহাওয়া থেকে একটু একটু করে ভেসে চলে যায়। সে আর উমা, নিম্নমধ্যবিত্ততার স্তর থেকে ওঠার জন্য, সুখ সংগ্রহের অভিলাষে তখন থেকে শুধু বৈষয়িক উন্নতির কথাই ভেবেছে, খেটেছে আর ক্লান্ত হয়েছে। পরস্পরের কাছে তারা বিবর্ণ, অপ্রফুল্ল, বিস্ময়সৃষ্টিতে অসমর্থ দুটি আয়নার মতো বসবাস করছে।

সঠিকভাবে সে মনে করতে পারবে না কবে, কখন, কে তাদের মধ্যেকার যোগসূত্রটা ছিঁড়ে দেবার কারণ হয়েছে। বছর চারেক আগে হয়তো রুবির সঙ্গে পরিচয় হওয়া থেকেই সে বুঝতে পারছিল উমা আর তার মধ্যে কোনও যোগ নেই। এখন হয়তো তাদের দু'জনের কল্পনায়ই শুধু যোগসূত্রটা টিকে আছে।

কিন্তু কারুর সঙ্গে কোনও প্রকারের একটা যোগ চাই, যার মারফত নিজেকে বার করে দেওয়া যায়, ভরিয়ে নেবার মতো কিছু পাওয়া যায়। ধর্মে নয়, রাজনীতিতে নয়, প্রতিষ্ঠানে নয়, কবিতায় সে যোগসূত্র পেতে চেয়েছিল। সেটাও গেছে। জগদীশ আধ-মাতাল অবস্থায় কিছুদিন আগে হো হো অট্টহাসিতে শরাবখানার লোকেদের চমকে দিয়ে বলেছিল, "আমি যে কবি নই, এটা বুঝতে বুঝতেই কুড়ি বছর কেটে গেল। তুই ব্যাটা চালাক আগেই বুঝে ফেলেছিস।... মুশকিল কী জানিস আমার পক্ষে লেখা ছাড়া এখন আর সম্ভব নয়... বিখ্যাত হয়ে গেছি যে। অসমালোচিত জীবন কোনওক্রমেই যাপনযোগ্য নয় এটা কি জেনেছিস?"

হালুয়াটা সুনীত খেতে পারল না। তেতো লাগছে, অত্যন্ত গুড় দেওয়া। শুভ্রা একটু যেন বেশি সময় নিচ্ছে অর্থাৎ কবিতা জড়ো করছে। স্তূপ হাতে আসবে।

কী অবশিষ্ট রইল তার জন্য? দু'জনের সংসার, চাকরি, বিছানা, চারপাশের বোকামি আর রুবি কাঞ্জি? প্রথমে সে তাই-ই আশা করেছিল। তবে উমার জায়গাটা রুবি নিয়েছে এমন দাবি করলে সেটা ভুল করা হবে। রুবি কারুরই জায়গা নেয়নি। সে একটা শূন্যতা ভরিয়েছে, এই শূন্যতার কারণ...।

ওদের মাথায় এই ধারণাটা একবারের জন্যও আসেনি যে, ওরাই তাকে ডুবিয়েছে। ওদের দু'জনের কেউ-ই তাকে কিছু দেবার জন্য ব্যস্ত হয়নি। ...কী দেবার জন্য? শব্দটা কী খুঁজতে শুরু করল। এবং বুঝতে পারল খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। "দেওয়া" শুধু এইটুকুই তো... ব্যস, যথেষ্ট। কিছু একটা তাকে দেবে সেটাই তো দেওয়া।

খুবই ব্যস্ত হয়ে বাদল নস্কর ঘরে ঢুকল। সারা গায়ে সর্ষের তেল। বাহুর উপর থেকে নীচ দ্রুত তালু ঘষতে ঘষতে বলল,

"আড়াইশো-টাক মৌরলা মাছ পেয়েছে শুভ্রার মা, বাড়িতেই বেচতে এসেছিল... কী করবে, ভাজা না টক? টকই করুক, তাই বলেছি। মঞ্জিলকে আপনার অফিসের ঠিকানা দেব কি? গিয়ে তো ভ্যাজর ভ্যাজর করে জ্বালিয়ে মারবে... আজ একটু তাড়াতাড়িই ইসকুলে যেতে হবে, হেডমাস্টারমশাই এইমাত্র খবর পাঠালেন, দারোগা নাকি আসবে...।"

সুনীতের উঠে বসার ভঙ্গিতে বাদল নস্করের কথা থমকে গেল। দারোগা! ওরা কি জেনে গেছে সে বকরিহাটিতে রয়েছে। বাদলবাবু অমন অবাক চোখে তাকিয়ে কেন! মাথার মধ্যে তালগোল পাকানো ভয়টাকে দমিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টাটা যেন কিছুতেই মুখের উপর ভেসে উঠতে না পারে। জিভটা অসাড় লাগছে, একটা সিগারেট পেলে ভাল হয়।

"কেন?"

সুনীত তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। বাদল নস্করের মুখের একটি পেশিরও নড়াচড়া সে দৃষ্টি থেকে হারাতে রাজি নয়। কোনও রকম সন্দিগ্ধতা, কিছু চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে কি না, জানতে হবে।

"কে জানে কেন, এই অঞ্চলে নিত্যই তো কত ঘটনা ঘটছে...।"

কী ঘটছে? খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ... ওরা কি আমার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে? গ্রামে নতুন লোক এসে রয়েছে সোমবার থেকে, এ খবর নিশ্চয় পেয়ে গেছে।

"গত এক মাসে তিনটে খুন হয়েছে, তার একটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের স্কুলেরই একটা ছেলে, অমিয়... গা-ঢাকা দিয়েছে। হয়তো ওর সম্পর্কেই... আপনার জ্বর এসেছে নাকি!"

"না না, ভালই আছি। কাকে খুন করেছে?"

"আর বলবেন না, বুড়ি বিধবা পিসিকে হামানদিস্তে দিয়ে থেঁতলে মেরেছে মাত্তর আটটা টাকার জন্য। বুড়ির সোনাদানা ছিল তাতে হাত দেয়নি... এখনকার ছেলেরা কী যে হয়েছে, কত অল্পেই যে প্রাণ নিয়ে বসে। আমি তো ইসকুলে কারুর গায়ে আর হাত দিই না, মাস্টারমশাইদেরও বলে দিয়েছি ঝামেলার মধ্যে যাবেন না, দিনকাল আর আগের মতো নেই। .. তা হলে টকই করুক আর দু'-চারটে ভেজে দিক।"

বাদল নস্করকে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হচ্ছিল যতক্ষণ কথা বলে যাচ্ছিল। সে জানে লোকটি কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু ওর একটি কথাও কানে ঢুকছিল না কিংবা কোনও অর্থ তৈরি করছিল না। তার কেমন যেন মনে হচ্ছিল জীবন থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, একটা কৃত্রিম পৃথিবীতে সে আটকে পড়ে স্থির হয়ে রয়েছে। ভয়ে দিশাহারা হয়ে সে বেরিয়ে আসতে চায় এবার। এই লোকটা সম্পর্কে কিছুই সে জানে না। এই গ্রামটা সম্পর্কেও। এদের আছে নিজস্ব সমস্যা, নিজস্ব জীবন, নিজস্ব ছোটখাটো পৃথিবী যাকে ঘিরে এরা আবর্তিত হচ্ছে খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে। এটা তার জায়গা নয়। এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে। স্থানান্তর ঘটাতে হবে।

কোথায় যাব? চোখের মধ্যে শিরা উপশিরাগুলো দপদপ করছে। সুনীত জানলা দিয়ে আকাশে তাকাল। চশমাটা পরতে গিয়েও পরল না। হলুদ রেখাটা বিস্তৃত হয়েছে আকাশে। হলুদটা উজ্জ্বল হয়েছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। কালো একটা বিন্দু ভেসে যাচ্ছে অলস ঝম্বর গতিতে।

শুভ্রা একটা গামলা হাতে টিউবওয়েলের দিকে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। গামলাটা তুলে সুনীতকে দেখাল।

"মাছগুলো কাটতে বসিয়ে দিল। .. স্কুল থেকে এসে দেখাবখন।"

সুনীত শান্তভাবে মাথা হেলাল। তার মাথার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। এখন সে জানে বাদল নস্কর ও শুভ্রা বাড়ি থেকে বেরোলে কিছু সময় অপেক্ষা করে সে-ও বেরিয়ে পড়বে।

এখন যদি সে কল্পতরুর দেখা পেত। তা হলে বলত, "পৃথিবীটা ঝিরঝিরে গুমোট ভ্যাপসা আর অচেনা কিন্তু তবু একটা পৃথিবী তো বটে। এখানে এই শরীরটাকে ভয় থেকে মুক্তি দেবার মতো একটা জায়গা দিতে পারো... বাওবাব, বাওবাব!"

দু'হাত তুলে জানলার গরাদ ধরে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

তিন

বারুইপুর স্টেশনে ট্রেন প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে। কামরায় ভিড় নেই। এই সময় কলকাতার দিকে যাওয়ার লোক কমই থাকে। চাপদাড়িওয়ালা বৃদ্ধটি এখানে নেমে যেতেই সুনীত জানলার ধারে সরে এসেছে।

লোকটির দাড়িই শুধু নয়, চওড়া চৌকো কপাল আর টিকোলো নাকের সঙ্গেও মিহিরের অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে। ফটোগ্রাফার মিহির অফিসে মাঝে মাঝে আসত রুবির কাছে। দু'-চারটে কথা বলেই চলে যেত। কাচের প্যানেলের ওধারে দু'জনের ভাবভঙ্গি, চাহনি, ঠোঁট নাড়া থেকে ওদের সম্পর্কটা বুঝে নেবার জন্য সুনীত ইন্দ্রিয়গুলোকে যথাসাধ্য সজাগ করে তুলত। রুবি সেটা লক্ষ করেছিল।

একদিন মিহির চলে যেতেই রুবি ভ্রূ কুঞ্চিত করে কাচের ওধার থেকে সুনীতের দিকে তাকায়। তারপর সুনীতদের ঘরে আসে।

"মুখার্জি, অমন প্যাটপ্যাট করে কী দেখছিলে?"

রুবি তখন সুনীতকে 'মুখার্জি' বলত।

সামনের টেবিলে চিন্ময় মুখটা একবার তুলেই নামিয়ে নেয়। সুনীত না তাকিয়েই টের পায় চিন্ময় মুচকি হাসছে। রুবি চলে গেলেই ও আদিরসাত্মক টিপ্পুনি কাটবে।

টেবিলে দু'হাতে ভর দিয়ে রুবি ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। হাতাবিহীন ব্লাউজের বড় ফাঁদের গলা এবং নাভির নীচে শাড়ির কষি সুনীতকে সন্ত্রস্ত করছিল। কোথায় চোখ রাখবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওর শরীর কিছুই অবহেলায় নয়, উদ্বৃত্ত নয়।

"ঈর্ষা বোধ করছিলাম।"

দু'জনের সম্পর্কটা তখন হাস্যপরিহাসের থেকে অন্তরঙ্গতায় নেমেছে।

"বেল পাকলে কাকের কী? তোমার ঈর্ষায় তুমিই শুধু জ্বলে মরবে।"

"বেলটা তো একদিন খসে মাটিতে পড়ে ফাটবে, সে-জন্যই কাক অপেক্ষা করে।"

"আপাতত খসছে না, আর যখন পড়ে ফাটবে দেখবে ভেতরটা একদম পচা।"

খইয়ের মতো সাদা সাজানো দাঁতের উপর হালকা গোলাপি ঠোঁটদুটি রুবি টেনেছিল তখন। উপরের পাটি সামান্য এগিয়ে নীচেরটির থেকে। এ-জন্য ওর মুখমণ্ডলে গা শিরশির করা শ্বাপদ তীক্ষ্ণতা ফুটে ওঠে যখন হাসে, মুখের হনু চওড়া, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে এবং ক্ষুদ্র। হাসলে পাতায় চোখ ঢেকে যায়। কফি রঙের গায়ের চামড়ার নীচে পাতলা চর্বির স্তর ঔজ্জ্বল্য এবং নিটোলত্ব দিয়েছে অবয়বে।

রুবি একটু চাপা স্বরে বলেছিল, "হয়েছে হয়েছে, তোমার সঙ্গে মিহিরের পরিচয় করিয়ে দেবোখন; ছেলেটি ভাল, সাদাসিধে তবে একটু খ্যাপাটে। ভাল লাগবে।"

সুনীত জানলা দিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে তাকাল। বিনা চশমায় ঝাপসা লাগছে। চশমার জন্য বুক পকেটে হাত দিয়েই, নামিয়ে নিল। হঠাৎ ভাঙা চশমা পরতে দেখলে লোকে তাকাবে। সন্তর্পণে সে সামনের বেঞ্চে বসা তিনজনের মুখ লক্ষ করল। উদাস, বিরক্ত, উদ্বিগ্ন তিনটি মুখ। ট্রেনের হল কী! তার কেটেছে? কারেন্ট বন্ধ? ফিশপ্লেট খুলে নিয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? যে-কোনও একটা হতে পারে, ভেবে লাভ নেই। রুবির হাইহিলের টকটক শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর চিন্ময় বলেছিল, "অবগাহনের নিমিত্তই বিধাতা কর্তৃক রমণী-রূপ সরোবর নির্মিত হইয়াছে... ব্রেশিয়ার পরেনি নিশ্চয় লক্ষ করেছিস।"

শেষের অংশটি এড়িয়ে সুনীত বলে, "কাকে কোট করছিস?"

"কালিদাস, রঘুবংশ... কমনীয় ভুজলতাদ্বয় তার মৃণাল, মুখ তার পদ্ম, লাবণ্যের তরঙ্গ-লীলা সেই সরসীর জল, নিয়তচঞ্চল সশঙ্ক নয়ন সরোবরের শফর-মৎস্য, ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ তার শৈবাল, পীনপয়োধর যুগল সরোবরের চক্রবাক মিথুন আর নিতম্বতট সেই জলে অবতরণের সোপান... বৎস সুনীত মনে হচ্ছে মদনের শরানলে দগ্ধ হয়ে তুমি সরসীতে অবতরণ করে জুড়োতে চাও।"

"এতটা মুখস্থ করে রেখেছিস?"

"ক্ল্যাসিক জিনিস মনে গেঁথে থাকে রে। এই বয়সেও ব্রেশিয়ার দরকার হয় না, ওটাও ক্ল্যাসিকাল ব্যাপার।"

"তোর মুখ থেকে শোনার আগে পর্যন্ত কালিদাসকে এমন ভালগার মনে হয়নি।"

চিন্ময় উঠে এসে সুনীতের টেবিলে রাখা প্যাকেটটা থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। ওর মুখে আর হাসি নেই।

"মানুষের শরীর ব্যাপারটা খুবই সুখের, তাই দরকারি। তোর কি সুখ দরকার নেই?"

"নিশ্চয় আছে।"

"একই মেয়েমানুষের সঙ্গে রাতের পর রাত... একই শব্দ, একই ভঙ্গি, একই কথা, একই গন্ধ, একই স্বাদ, একই বিরক্তি, একই... যদি সুখ বলা যায়, তা হলে ওই সুখ তোর ভাল লাগে?"

সুনীত উত্তর দেয়নি। হাত বাড়িয়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাতে ব্যস্ত হয়। চিন্ময় কি খুব বাজে কথা বলছে? মনের মধ্যে উমার ছবিটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে পাঁচ বছরেই, তার উপর নতুন একটা ঝকমকে ছায়া পড়েছে, রুবি। রসিকা, বুদ্ধিমতী এবং কামনা জাগাবার মতো শরীর। এর বেশি আর কী চাই। ইদানীং রুবির সঙ্গে প্রায়ই সে উমার তুলনা করতে শুরু করেছে। তার ফলে উমা ক্রমশই আবছা হয়ে যাচ্ছে।

"কীসের অন্যায় যদি আমি মেয়েমানুষের পিছনে ছুটি, যদি কাউকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একঘেঁয়েমি ভাঙাই, তাজা হই শরীরটাকে সুখ দিয়ে। আমার তো আঁতেল মার্কা চেহারা নয়, পদ্যও লিখি না যে রুবি এসে টেবিল ঝুঁকে বুক দেখাবে, সাদা ভাল্লুকের মতো ক্ষমতাবানও নই, বছরে সওয়া লাখ মাইনেও পাই না যে রুবিকে বেঁধে রাখব।"

চিন্ময়ের চোখে মুখে কর্কশ তিক্ত আবেগ ফুটে উঠেছিল। ওর ভিতরে প্রচণ্ড একটা রাগ, বোধহয় স্ত্রীর বা সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই, ফেঁপে উঠে ফেটে পড়তে চাইছে। জীবনে ওর কি কিছু আকাঙক্ষা ছিল? বোধহয় নিজেও তা জানে না।

"যদি পারিস তো লুটে নে, তবে সাদা ভাল্লুকটা যেন টের না পায়। তা হলেই পাটনা কি গৌহাটিতে বদলি করে দেবে... যারা মেয়েমানুষ পোষে তারা ভীষণ ঈর্ষাপরায়ণ হয়, বিশেষ করে বুড়োরা।"

"সাদা ভাল্লুক" পঙ্কজ আচার্য। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, অন্তত একশো কেজি, দেহভার। গায়ের চামড়া সাদা। ভারী জমাট ঘাড়ের উপর বড় মাথাটায় ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল কান ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত নামানো। বক্সারদের মতো চাপা নাক। বিরাট দেহটি সামনে ঝুঁকিয়ে দু' বাহু দোলাতে দোলাতে হাঁটে। তালুতে মানানসই মোটা আঙুল। রুক্ষ মেজাজি পঙ্কজ আচার্য সুপুরুষ না হলেও প্রবলভাবে পুরুষ, ছাপ্পান্ন বছরেও। "সাদা ভাল্লুক" নামটি চিন্ময়েরই দেওয়া, অফিসের দু'-তিনজন তা জানে, রুবিও জানে এবং শুনে হো হো করে হেসে বলেছিল, "নামটা ঠিকই দিয়েছে চিন্ময় ঘোষ, কিন্তু ওকেও একটা নাম দেওয়া দরকার... বাদামি ছুঁচো, ঠিক দিলাম কি সুনীত?"

সুনীতের মুখে একচিলতে হাসি ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটা ছাড়ল। চোখ বন্ধ করে সে মাথাটা পিছনের কাঠে চেপে ধরল। বাদল নস্করের বাড়িতে নিশ্চয়ই এখন হুলুস্থুলু। অত রান্না খাবে কে। পদ্য দেখাতে পারল না শুভ্রা, বেচারা।

"এবার কোথায় যাব।"

শিয়ালদায় প্ল্যাটফর্মের গেটে কালো কোট করা লোকটির হাতে টিকিট জমা দিয়ে সুনীত ব্যস্ত স্টেশনের একধারে দাঁড়াল। যে বেঞ্চটায় বসে গত রবিবার রাতটা কাটিয়েছিল এখন সেটায় ঘেঁষাঘেঁষি সাতজন বসে। গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে থাকা লোকটার পা সরিয়ে সে ঘণ্টা তিনেক ওই বেঞ্চে বসেছিল। একবার লোকটা পা দিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়, বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখছিল। বুকে জড়িয়ে ধরা থলিটা দেখে সুনীতের মনে হয়েছিল ও কোনও ফেরিওয়ালা, শেষ ট্রেনে ফেরি করার পর আর বাড়ি ফেরেনি। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠা, প্রকট হওয়া চোয়ালের হাড়, শিরাভরতি পুরোবাহু দেখতে দেখতে তার মনে পড়েছিল ন'বছর আগে ট্রেনে ঠিক এইরকম চেহারার এক কলম ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সে ডটপেন কিনে বাদল নস্করের ছোট্ট মেয়েটিকে দিয়েছিল। তখন সে বকরিহাটি স্কুলের শিক্ষক, সপ্তাহান্তে কলকাতায়

আসত।

লোকটিই তাকে মনে পড়িয়ে দেয় তাই সে বকরিহাটি গেছল। এখন কি কেউ তাকে এমন কারুর কথা মনে পড়িয়ে দিতে পারে যার কাছে সে যেতে পারে।

সুনীত এলোপাথাড়ি দেখতে শুরু করল মানুষের মুখ। কোনওদিন সে এ-ভাবে অজানা অচেনা মুখের দিকে তাকায়নি। সবাই যেন একটি মুখোশই লাগিয়ে রেখেছে—ক্লান্ত, অনিশ্চিত, উদ্বিগ্ন দুটি চোখকে ঘিরে নানা রঙের নানা আকৃতির এক-একটি মুখ তার বুকের মধ্যে একটা হিমবাহ ভেঙে গিয়ে শিরাগুলোর মধ্য দিয়ে কনকনে স্রোত সারা দেহে ছড়াল।

ড্যাবড্যাবে দুটি চোখ, চৌকো মুখ, পুরু ঠোঁট এবং কালো চামড়ার একটি বউ দুটি খালি আনাজের ঝুড়ি বগলে চেপে উবু হয়ে বসে। ওর একটি স্তন দেখা যাচ্ছে এবং তাইতেই সুনীতের মনে পড়ল...। কিন্তু যাকে মনে পড়াল এখন তার কাছে যাবে কী করে?

চাষি-বউটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের উপর ঝলসে উঠল ঘটনাটা!

হাবাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে, কিছু না ভেবেই সে পালাবার জন্য অন্ধকার মাঠের দিকে ছুটে গেছল এবং দশ-বারো গজ গিয়েই পিছলে পড়ে যায়। তখন তার মাথার মধ্যে বিকট একটা লজ্জা পাগলাঘন্টি বাজিয়ে যাচ্ছিল, "ধরা পড়েছ... এবার বাঁচার চেষ্টা করো।"

বাঁশের খোঁটাটা সেই সময় তার মাথা ঘেঁষে মাটিতে আঘাত করে। অন্ধকারে হাবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, না হলে খুলিটা কয়েক টুকরো হত। তখন সে আত্মরক্ষার তাগিদে লাথি ছোড়ে, সেটা হাবার হাঁটুতে লাগে, ও পড়ে যায়। লাফিয়ে উঠে সুনীত ওর হাত থেকে খোঁটাটা যখন কেড়ে নিচ্ছিল তখন হাবা, গর্জনের চাপা ভারী একটা শব্দ করে।

তাই শুনে সুনীতের স্নায়ুগুলো কুঁকড়ে স্প্রিংয়ের মতো তার ভয়কে টেনে রাখে। অপ্রত্যাশিত অপ্রতিভতায় সে ছেয়ে যায়। শব্দটার মধ্যে বীরত্বের একপ্রকার ধরন ছিল, যা সে আশা করেনি এই অকিঞ্চিৎকর লোকটির কাছ থেকে, যা সে নিজেও প্রকাশ করতে পারেনি ট্যাক্সিওয়ালার সাগরেদের কাছে চড় খেয়ে বা তারও কয়েক ঘণ্টা আগে সাদা ভাল্লুকের থাবার আঘাতে ছিটকে পড়ে।

এইখানেই তার ঘাটতি, তার কাপুরুষত্ব। পুলুকে ঘিরে ধরে ক্ষুর দিয়ে যখন ওর নলিটা কেটে দেয় তখন সে জানলার একটা পাল্লা বন্ধ করে তার আড়ালে দাঁড়িয়ে, হাবার বউ তখন উবু হয়ে বসে গোবর চটকাচ্ছিল ঘুঁটে দেবার জন্য। সুনীত সেইদিকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটা সে আগাগোড়া এবং স্পষ্ট দেখেছিল। জানলার অপর পাল্লা বন্ধ করে, বিছানায় এসে খবরের কাগজটা তুলে নেয়। শুনেছিল হাবা একটা খোঁটা নিয়ে পুলুকে বাঁচাতে বা আততায়ীদের আক্রমণ করতে ছুটে গেছল।

মাটি থেকে হাবার উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস দেখতে দেখতে তার গোটানো স্নায়ুর স্প্রিং তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে ছাড়া পায়। হাবা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। উপহাস করতে? বীরত্বের জন্য? তার মেয়েমানুষকে দখল করার বিরুদ্ধে?

মাথার মধ্যে দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। তারপর সে জানে না কী করেছিল। গত পাঁচ দিনে অন্তত চল্লিশবার সুনীত মনে করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

সম্ভবত আধ মিনিট সে অন্ধকারের গর্ভে ডুবে ছিল। তারপর চশমাটা কুড়িয়ে নেয় অভ্যাসবশেই। পিছনে পায়ের শব্দের মতো কিছু একটা শুনে সে দ্রুত এগিয়ে চায়ের দোকান ঘেঁষে দাঁড়ায়। দোকানের মধ্য থেকে তখন একজন চেঁচিয়ে উঠেছিল—"কে, কে ওখানে?"

শেয়ালদা সাউথ স্টেশন থেকে বেরিয়ে সুনীত পথে দাঁড়াল। এখন তার মনে হচ্ছে, অত্যন্ত গরিব, সরল বোকা অকালবৃদ্ধ লোকটার পৃথিবীতে একমাত্র সম্পত্তি ছিল ওর বউ। ওর পৌরুষে, অধিকারে বা ব্যক্তিত্বে হয়তো এগুলো ছিল এবং সুনীত সেগুলোকে আঘাত দিয়ে ওকে আহত করে। রাস্তায় বসে চিনেবাদাম বিক্রি করে রোগগ্রস্ত ফুসফুস সম্বল করা অতি তুচ্ছ জীবনকে সে হয়তো এই একবারই উচ্চতা দেবার চেষ্টা করেছিল।

সুনীত বিমর্ষ বোধ করতে লাগল। নানাবিধ যানবাহনের শব্দ, ব্যস্ত চলাফেরা এবং ম্লান বিকেলের কিনারে দাঁড়িয়ে সে হাবাকে স্মরণ করল। হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা লুঙ্গি, জিরজিরে বুক, রুক্ষ চুল হাত

নেড়ে জানোয়ারের মতো শব্দ করে ভাবপ্রকাশ, এ-ছাড়া আর কিছু তার মনে পড়ছে না। ওর থাকা-না থাকায় কারুরই কিছু এসে যায় না। ওর বউয়ের এ-জন্য কোনও অভাববোধ হবে না। এটা নিছকই অনুমান কেননা জীবনধারণের ব্যাপারে বউটি স্বাবলম্বী।

তবু হাবার একটা প্রাণ ছিল এবং সেটি হরণ করে সে এখন খুনি। এই মুহূর্তে যত লোককে সে দেখতে পাচ্ছে, এদের মধ্যে কেউ কি তার মতো ত্রস্ত ভীত! কিন্তু যে লোকটির জীবনের কোনও অর্থ হয় না তার জন্য জেলে ঢোকার কী মানে হয়? উমাকে হেয় বা করুণার পাত্রী করারও অধিকার তার নেই।

কতজন জেনেছে ইতিমধ্যে? কেউই তো দেখেনি। কেউ নিরুদ্দেশ হলেই তো আর খুনি প্রমাণ হয় না। তবে জড়িয়ে ফেলে ওরা দীর্ঘকাল মামলা চালাবে। হাবার বউ অন্ধকারে না দেখতে পেলেও সেই প্রধান ও একমাত্র সাক্ষী। কী বলবে ও?

"খোঁটাটা কোথায় থাকত?"

"আমার ঘরে।"

"তুমি দেখলে এটা তুলে নিয়ে তোমার স্বামী ওর পিছনে দৌড়ল?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তখন কী করলে?"

"আমিও দৌড়লুম।"

"তারপর?"

"শব্দ হল। কে যেন খোঁটাটা দিয়ে মারছে।"

"ক'টা শব্দ?"

"দুটো।"

"গিয়ে কী দেখলে?"

"হাবা পড়ে আছে, সাড় নেই।"

"তখন কী করলে তুমি?"

সুনীত জানে না তারপর কী হয়েছিল। সে জানে না হাবার বউ কী বলবে।

মাঝবয়সি এক পুলিশ সাব-ইনস্পেকার স্টেশনের ফটকে দাঁড়িয়ে। ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সুনীত একবার তার মুখের দিকে তাকাল। কোনও কৌতূহল বা তীক্ষ্ণতা চাহনিতে নেই। তবু অস্বস্তি থেকে সে নিজেকে ছাড়াতে পারল না। সে ইতস্তত করেনি। ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মতো একটা ব্যস্ততা চলনে এনে সামনে দিয়ে হেঁটে এল। প্রতিদিন লাখদশেক লোক এই ফটক দিয়ে এইভাবেই তো ঢোকে এবং বেরোয়।

কিন্তু এই ভিড়ের ধাক্কাধাক্কির মধ্যে কেন দাঁড়িয়ে? হয়তো ডিউটি এখানেই কিংবা বাড়ির কেউ ট্রেনে উঠবে তাই তুলে দিতে কিংবা খবর আছে কোনও পলাতক ট্রেন ধরতে আসবে বা ট্রেন থেকে নামবে।

ও কি জানে তার চেহারাটা কেমন?

হয়তো কোনও ফটো দেখানো হয়েছে ওকে। একটা কপিও হয়তো পকেটে আছে।

যদি সেটা পুরনো, বেশ কয়েক বছরের পুরনো চেহারার ফটো হয়?

তা হলে চিনে নেওয়া শক্ত হবে।

ও কি জানে পরনে কী কী আছে?

নিশ্চয় জানে, সে-সব খোঁজ ওরা অবশ্যই নিয়ে রাখে। জামা প্যান্ট জুতো ঘড়ি চশমা...।

কিন্তু পলাতক তো ওর ইউনিফর্ম দূর থেকে দেখলেই সটকে পড়বে। এ-সব কাজ তো সাদা পোশাকের গোয়েন্দারাই করে।

তা করে। হয়তো এই বিস্কুটওলাটাই।

সুনীত স্থির করল এখুনি জামাটা বদলাতে হবে। চশমাটা পরা চলবে না, জুতোর বদলে চটি, ঘড়িটা পকেটে রাখা দরকার। প্যান্টটাও চিনিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যত টাকা কাছে রয়েছে তাই দিয়ে কি এত বদল সম্ভব?

দক্ষিণে কয়েক পা হাঁটলেই ফুটপাথে সার দেওয়া দোকান। সুনীত চোখ ফেলতেই দোকানি হা-হা করে উঠল।

"কী চাই দাদা, প্যান্ট বুশ-শার্ট? এদিকে আসুন দেখে পছন্দ করুন।"

খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। দরাদরি নয়, বাড়তি কথা নয়।

"শার্ট আছে?"

"আছে, টেরিকট, আপনার?"

"হ্যাঁ, কত পড়বে?"

"আগে দেখুন না, পছন্দ করুন, দামের কথা পরে।"

"দামটা আগে জেনে নিই।"

"চল্লিশ, সত্তর, তিরিশ...।"

"ওর কমে, টাকা তিরিশের মধ্যে, সুতির?"

"হবে।"

হলুদ জমিতে কালো ডোরা তার মাঝে লাল ফুটি ফুটি শার্টটা পছন্দ করল সুনীত। একটু ছেলেমানুষি ভাব থাকা দরকার। ওরা যা-সব শুনে তার রুচি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করবে, শার্টটা তাই থেকে কিছুটা আড়াল হয়তো করবে।

তিরিশ টাকা দাম। কাগজে মুড়ে দিতে যাচ্ছিল সুনীত ইতস্তত করে বলল, "পরে দেখি ফিট করল কি না।"

বুশ-শার্টটা খুলে জামাটা পরল। একটু আঁটো লাগছে। কাচলে আরও ছোট হবে নিশ্চয়, কাচার দরকার কী?

"পরাই থাক বরং এই জামাটা মুড়ে দিন।"

এইবার একটা চটি। ফুটপাথে তক্তার উপর দু'-তিনটি দোকান। দূর থেকে দেখে সে ঠিক করল জামা কেনার মতো প্রথম দোকানটা থেকেই চটি কিনবে। দোকান ঘুরে ঘুরে নিজেকে চিনিয়ে রাখাটা বোকামি হবে।

কুড়ি টাকার চটি পায়ে দিয়ে দুটি কাগজের মোড়ক হাতে সুনীত বউবাজারের মোড়ে এক ঘিঞ্জি অপরিচ্ছন্ন চায়ের দোকানে ঢুকল। কেউই তাকাল না বা তার উপস্থিতি লক্ষ করল না। আশ্বস্ত বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রবল ক্ষুধায় আক্রান্ত হল।

চা, টোস্ট, অমলেট দ্বারা আধঘণ্টা সময় অতিক্রম করে আবার যখন সে রাস্তায় নামল তখন স্রোতের মতো ঘরমুখো মানুষ স্টেশনে চলেছে। এর মধ্যে একজনও কি চেনা লোক তাকে দেখতে পাবে না।

গজ পঞ্চাশ দূরে ব্রেক কষার কর্কশ শব্দে সুনীত তাকাল। কিছু লোকের মতো সে-ও চমকে উঠে এবং কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। নীল শাড়ির কিছুটা সে দেখতে পাচ্ছে বাসটার ওপাশে রাস্তায় লুটিয়ে। ঊরু পর্যন্ত অনাবৃত। মনে হল কিশোরী। দেহের উপর চাকা ওঠেনি, হয়তো বেঁচে যাবে। ভিড়ের একটা চাক বাসটাকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু ওই লোকটা। গুণেন ভবনের 'বি' ব্লকে, সুনীতের ফ্ল্যাটের উলটোদিকেই থাকে, কান্তি নামের লোকটিকে দেখে সে আর এগোল না। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বেঁটে, রুগ্ণ, বউবাজারে আয়নার দোকান আছে কান্তির। সাদা শার্ট আর ধুতি পরে কিন্তু সুনীত কখনওই সেগুলো পরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখেনি। দাঁতগুলো হলুদ, দেশলাই কাঠি দিয়ে সর্বদাই খোঁটে। ওর থেকে অন্তত পঁচিশ বছরের ছোট দ্বিতীয় পক্ষের বউ। বহুবার কান্তিকে সে দেখেছে কটমটিয়ে সুনীতের উপরের ফ্ল্যাটের দিকে তাকাতে। ওখানে এক যুবক আছে। খাবার টেবিলে বসে সুনীত বহুদিন লক্ষ করেছে, শান্ত নিরীহ বউটি সর্বদাই কিছু না কিছু গেরস্তালির কাজ করেই যাচ্ছে।

উমা প্রশংসা করে বলেছিল, "ছেলেমেয়ে তিনটে যে ওর নিজের পেটের নয়, বোঝাই যায় না। কী যত্নটাই না করে। আদর্শ মা।"

এবং আদর্শ বউ, মনে মনে সুনীত তখন বলেছিল। বলদের মতো সারাদিন মুখ বুজে কাজ করে, যা দেবে খাবে, যা দেবে পরবে। এইসব বলদ এদেশেই পাওয়া যায় এবং কান্তিদেরও।

কয়েকটা লোক বাসের ড্রাইভারকে হিঁচড়ে টেনে নামাচ্ছে, তার মধ্যে কান্তিও। ড্রাইভার দরজা আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। কান্তি চিৎকার করছে, কানের নীচে মোটা দড়ির মতো পেশি, চিৎকারের দমকের সঙ্গে সেটা ফুলে ফুটে উঠছে। ঘুসি পাকানো সরু পুরোবাহুর শিরাগুলো বা দুই কণ্ঠার মাঝের গর্তটার

থেকেও সুনীতের কাছে আকর্ষণীয় মনে হল চোখ দুটো। যে কোনও মুহূর্তে গর্ত থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে পারে। সাদা ফেনা ঠোঁটের কোণে। ও যেন কিছু একটা বার করে দিতে চায়, যেটা দীর্ঘকাল ধরে মনে জমে আছে। কান্তি স্বাভাবিক হতে চাইছে।

"শালাকে মেরে ফেলুন... গাড়ি চালায় এমনভাবে যেন মনেই করে না রাস্তায় মানুষ আছে, ভাবে সবাই গোরু ভেড়া। মারুন, মারুন মেরেই ফেলুন। গোরু ভেড়া...।"

কান্তি কাউকে উদ্দেশ করে বলছে না। সুনীতের সঙ্গে চোখাচোখি হল। সাদা ম্যাপে আঁকা নদীর মতো লাল শিরা কান্তির চোখে।

"মেরে ফেলা উচিত এদের, শিক্ষা পাওয়া উচিত। তা হলে অন্য ড্রাইভাররাও...।"

তাকে চিনতে পারেনি।

সুনীত পিছিয়ে এল। এখন এমন এক মানসিক অবস্থায়, চেনা লোককেও কান্তি চিনতে পারবে না। লোকটা খেপে গেছে। হয়তো এই রকম খেপে উঠেই হাবাকে... কিন্তু সুনীত মুখার্জি আর এই লোকটার মধ্যে কি একই বোধ, একই অনুভূতি, একই প্রবৃত্তি কাজ করছে? দু'জনে কি একই স্তরে? সুনীত অস্বস্তিতে পড়ল।

"একটা নয়, সব ক'টা বাসের ড্রাইভারকে ধরে-ধরে পেটানো উচিত।"

মাঝবয়সি একজন ধীরগম্ভীর স্বরে সুনীতের পাশেই বলল।

"যত বাস এখান দিয়ে যাচ্ছে থামিয়ে, এক একটাকে টেনে..."

কে একজন ফিসফিস করল: "পুলিশের গাড়ি।"

সুনীত চমকে তাকিয়ে দেখল একটা কালো ভ্যান।

মাথা নিচু করে হনহনিয়ে সে জগদীশ বোস রোড ধরে হাঁটতে শুরু করল। এবার বাস ধর্মঘট শুরু হবে হয়তো।

এখন কোথায় যাব!

মৌলালির মোড়ে দাঁড়িয়ে সে ইতস্তত তাকাল। কোথায় যেতে পারি? রাশি রাশি সময় এখন হাতে। কিন্তু একটা আশ্রয় চাই। নিজের পরিচয় মুছে দিয়ে... ধ্বংস করে এবার বাঁচতে হবে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরিচয়হীন কাটাতে হবে। কতগুলো বছর! আরও পঁচিশ, তিরিশ। বংশে দীর্ঘজীবীদের সংখ্যা কম নয়। ঠাকুর্দা বিরাশি পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এলাহাবাদে মেজজ্যাঠা এখনও বেঁচে, আশি চলছে বোধহয়। বাবা কৃষ্ণনগরে সত্তর-বাহাত্তর।

সুনীত আকাশে তাকাল। বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। বাতাসটা বন্ধ হয়ে গেছে। কনকনানি ব্যাপারটাও বন্ধ বরং গুমোটে একটা অস্বস্তি সে বোধ করল। হয়তো আঁটো জামাটার জন্যই। আবছা মেঘের আড়ালে অস্পষ্ট নীল দেখা যাচ্ছে কি? চশমাটা বার করে সে পরল। একচোখ বন্ধ করে অন্য চোখে কাচের মধ্য দিয়ে তাকাল। কাচের সঙ্গে চোখটাকে মানিয়ে নিতে এখন অসুবিধা হচ্ছে। চশমাটা সে পকেটে রেখেছিল। কয়েকদিনেই চোখজোড়া অভ্যস্ত হয়ে গেছে চশমা ছাড়াই পরিবেশকে দেখার পক্ষে। হালকা ধূসর একটা আলো মেঘ থেকে চুঁইয়ে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া তৈরি করেছে।

এখন তাকে ঘিরে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ, দোকান, অফিস, সিনেমা, থিয়েটার, বাজার; তার অফিসের সহকর্মীরা, কলেজের সহ-পড়ুয়ারা, বিস্মৃত কবিবন্ধুরা, ওরা সবাই তারই মতো এই মুহূর্তে কোনও না কোনও সমস্যায় পীড়িত, অন্তত ওদের কোনও একজন হয়তো তারই মতো ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে এখন সময় কাটাচ্ছে। এই মুহূর্তে কোথাও হয়তো কেউ ওত পেতে রয়েছে, অনেকেই হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই অবিশ্রান্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ চলমানতার মধ্য থেকে তাকে সরিয়ে একটা বন্দিশালার মধ্যে আটকে রাখার জন্য। সারা পৃথিবীটাই পড়ে রয়েছে আর এখানে প্রায় উনচল্লিশ বছরের একটা লোক দাঁড়িয়ে, যার হাতে অফুরন্ত সময় এবং যার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

সুনীত স্থির করল সে কৃষ্ণনগর যাবে, বহু বছর বাবাকে দেখেনি।

গত দশ বছরে সে এমন চাপা ঠাসা দমবন্ধ করা পরিবেশের মধ্যে পড়েনি। তার ধারণা ছিল না অফিস ছুটির পর ট্রেনগুলির কী অবস্থা হয়।

কয়েক হাজার উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন ও শ্রান্ত মানুষের সঙ্গে তিন ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার পর সে

ট্রেনে ওঠে। অ্যামপ্লিফায়ারের নির্দেশ শুনে দু'বার তারা ছুটে গেল অন্য প্ল্যাটফর্মে। কোন স্টেশনের জনতা নাকি ট্রেনের সামনে বসে আছে, সময় ধরে ট্রেন চলাচলের দাবিতে। তাই শুনে সুনীতের পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘ ঝুলফি, ঝোলানো গোঁফ এবং নিখুঁত গ্রন্থিতে টাই পরা সুশ্রী তরুণটি, যার হাতের ভারী ব্যাগটা দেখে মনে হয় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি, তিক্তস্বরে বলেছিল, "তিনদিন আগেও এই অবস্থা হয়েছিল... চালের চোরাচালানিদের সঙ্গে পুলিশের ক্ল্যাশ, গুলিও চলে।"

"আমিও একবার রাত দু'টায় বাড়ি পৌঁছেছিলাম।" মুখ ঘুরিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলল সুনীতের সামনে দাঁড়ানো স্ত্রীলোকটি। অবিবাহিত, যৌবনের রেশ মুখে লেগে আছে, পিঠটা একটু কুঁজো। হয়তো রাইটার্সে চাকরি করে।

সুনীত শিউরে উঠল, এ-ভাবে যদি তাকে রোজ অফিসে যাতায়াত করতে হত। বহুদিন সে আধমাইল হেঁটে টার্মিনাসে গিয়ে বাসে উঠে অপেক্ষা করেছে। এ-জন্য তাকে বেরোতেও হয় আধ ঘণ্টা বা তারও আগে যখন উমা স্নানে ব্যস্ত থাকে। ভিড়ে উমা অসুবিধা বোধ করে না। শুধু মানসিকতারই নয়, শরীরের সহনশীলতার ধরনটাও তাদের আলাদা। ঘাম, দুর্গন্ধ, ময়লা কাপড়, চাপাচাপি, অপরিচ্ছন্ন শরীর প্রভৃতিতে উমা বাল্য থেকেই অভ্যস্ত। বিয়ের আগে সুনীত কুমারটুলিতে ওদের কাকা-জ্যাঠার যৌথ পরিবারে একখানি ঘরের সংসারে তিন-চারবার গেছল।

ধাক্কাধাক্কি, ঝগড়া, গালাগালি, হাতাহাতি এবং নির্বিকারতা ভেদ করে সুনীত কামরাটায় উঠতে পেরেছে। ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে কামরার মানুষগুলোর মতো সে-ও দুলছে আর ঘামছে। নভেম্বরকে আর অনুভব করা যাচ্ছে না।

একটা জলবিন্দু সুনীতের রগ থেকে চোখের কোণে চুঁয়ে চিবুকের দিকে নামছে। অসহ্য একটা শিরশিরনিতে মুখটা কুঁকড়ে উঠল। প্যাকেট দুটো একহাতে, অন্য হাত ধরে রডে ঝোলানো আংটা। বাহুর জামায় সে মুখ ঘষল। কয়েক সেকেন্ড পরই আর একটা বিন্দু রগ থেকে নামতে শুরু করল।

সামনে, পিছনে, দু'পাশ থেকে মানুষের চাপ; শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য মধ্যিখানের সবাই হাত তুলে রডটা ধরে আছে। পাশে যারা কামরার দেয়াল বা সিটের পিঠ ধরেছে। অনেকে কিছুই পায়নি হাত দিয়ে ধরার মতো। শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘাম ও নোংরা কাপড়ের গন্ধে সুনীত বার দুই দীর্ঘক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে হাঁফিয়ে পড়ল।

ঘামের বিন্দুটা চিবুকের কাছে আসতেই সে আবার বাহুতে মুখ ঘষল। সামনের লোকটির মুখ দেখার চেষ্টা করল। মুখটা ফেরানো। মাংসহীন গাল, তীক্ষ্ণ চোয়ালের হাড়। মাঝে মাঝে ঢোক গিলছে, নলিটা ফুলে উঠছে। কনুইয়ে সাঁটা ময়লা তুলোর কিনারে শুকিয়ে আসা ঘা।

পাশের লোকটির মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসছে, সম্ভবত পাইওরিয়ার। সুনীত মুখ ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করতে গিয়েও করল না। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, গোলাকার একটা তামাটে মুখ, কপাল থেকে মাথার মাঝ বরাবর চুল ওঠা। সুনীতের চোখে চোখ পড়তেই লোকটি মুখ নামিয়ে নিল।

আর একটা ঘামের বিন্দু নামছে। বিরক্তিটা এবার চাপা রাগ হয়ে সুনীতকে ঝাঁঝাতে শুরু করল। হাঁটুর কাছে একটা শক্ত থলির কোনা চেপে রয়েছে। অবস্থান বদলাবার জন্য পা সরাতে চেষ্টা করল। পিছনের লোকটি কিছু যেন বলল। পাশের লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসে কানে গরম হাওয়া লাগছে। অনেকেই কথা বলছে কিন্তু কারুরই ঠোঁট নড়ছে না। সবাই একই ছন্দে দুলছে। কান্তিকে মনে পড়ল তার।..."মেরে ফেলা উচিত...।"

প্রেসিডেন্সি বা আলিপুর জেল কি এর থেকেও জঘন্য? তিন ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা এই চোয়াল, এই ঘায়ের তুলো, এই পাইওরিয়া, এই ভ্যাপসানি, পায়ে থলির খোঁচা সহ্য করার থেকে কি একটি সেলে দশ বছর বাস করা বেশি অসহনীয়? সুনীতের চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। ট্রেনের দুলুনি, চিটচিটে ঘাম, ভিড়ের চাপ এবং গরম, অদ্ভুত একটা ঘোর তৈরি করছে তার মধ্যে। স্টেশনে ট্রেন থামছে এবং ছাড়ছে এইটুকুমাত্র সে বুঝতে পারছে। চারদিক থেকে যে জমাট রক্তমাংসের চাপটা তাকে পিষে আছে, সেটা হালকা হচ্ছে না। তবে সে জানে, ট্রেন যত এগোবে কামরাটা ক্রমশ হাঁফ ছাড়বে।

কিন্তু আপাতত, এই ঘোরটা তার রাগটাকে দমিয়ে রাখছে। রাগ যে কার উপর সে বুঝতে পারছে না। সম্ভবত নিজের উপর। কেন? ট্রেনে ওঠার জন্য...নাকি যে কাজটা করে ফেলে পালিয়ে বেড়াতে

হচ্ছে, তার জন্য? যদি বাস-ড্রাইভারটা মরে যায়, তা হলে কান্তি এবং অন্যান্যরা কি ফেরার হবে?

দেশলাই কাঠি দিয়ে হলদে দাঁতের ফাঁক থেকে আবর্জনা খোঁটা বন্ধ রেখে কান্তি দু'হাতে জড়িয়ে বউকে চুমু খাচ্ছে, এমন একটা ছবি সুনীতের মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। "...ভাবে সবাই গোরু ভেড়া?...মারুন মারুন।"

সুনীত চোখ খুলল। চোখের পাতা চটচট করছে। পাতলা বাষ্প চোখের সামনে। এখন আর কোনও গন্ধ পাচ্ছে না সে। জামাটা গায়ে আছে কি না বুঝতে পারছে না। চামড়ায় চিটচিটে একটা আবরণ। ইন্দ্রিয়গুলো বোধশক্তি হারিয়েছে। সকলের মাথার উপর দিয়ে সে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করল।

হাতগুলো উপর দিকে তোলা। রড থেকে ঝোলানো আংটাগুলোকে আঁকড়ে রয়েছে। অনেকগুলো হাত...ঊর্ধ্বমূলধঃশাখমশ্বত্থং? মূল ঊর্ধ্বদিকে শাখা অধোদিকে কিন্তু বকরিহাটির ভূগোলের মাস্টারের মতে ওটা অশ্বত্থগাছ নয়, বাওবাব। এই গাছ নাকি ঢাকুরিয়া লেকের উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে, অথচ কেউ জানে না।

ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেক বকবক করছিলেন। সুনীত চোখ বন্ধ করে মনে করতে চেষ্টা করল: "ভুল বলেছেন কৃষ্ণ।" মাস্টার বুঝিয়েছিল, "উনি এমন এক গাছের কথা বলেছেন যা পথেঘাটেই দেখা যায়। অশ্বত্থ কি অব্যয়? শ'খানেক বছর তো মাত্র বাঁচে, বাওবাব বাঁচে দু'-তিন হাজার বছর। তা ছাড়া কৃষ্ণ কেনই যা বললেন, না রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে...এই গাছের স্থিতি, রূপ, আদি অন্ত মধ্য কিছুই বোঝা যায় না। অশ্বত্থের কি কিছুই বোঝা যায় না? গোলমালটা কোথায় জানেন, কেউ আর মিলিয়ে দেখেনি কৃষ্ণ যা বলেছেন সে-রকম গাছ এদেশে আছে কি না। তা ছাড়া বাওবাব তো ভারতে দু'-পাঁচটার বেশি নেই যে চট করে মিলিয়ে নেওয়া যায়। বুঝলেন এই বাওবাবই হচ্ছে কল্পতরু যা সাগরমন্থনে উঠেছিল, ইলোরা গুহায় নাকি পাথরে খোদাই কল্পতরুর চেহারা আছে, সত্যি? আপনি জানেন?"...সুনীত মাথা নেড়েছিল। সে কিছুই জানে না। কিন্তু সে বাল্যকাল থেকে জানে কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায় তাই নাকি পাওয়া যায়।

সুনীত আবার চোখ খুলল। পাতাঝরা গাঁটওলা শুকনো ডালের মতো কনুই, শিরা , হাড় আঙুল নিয়ে এক একটা হাত উঁচু হয়ে রয়েছে। শূন্যে ছড়ানো শিকড়! কৃষ্ণও জানে না, ভূগোলের মাস্টারও জানে না কল্পবৃক্ষের স্বরূপ।

"জীবন্ত বোধ করার জিনিসগুলো এখুনি আমার শরীরে ফিরিয়ে দাও," বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে সে হাতগুলির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "শুধু এইটুকুই...বাওবাব।"

চার

কালো কাঠের বোর্ডে বাংলায় সাদা অক্ষরে লেখা ছিল নামটা: ডাঃ অদিতিকুমার মুখার্জি (হোমিও)।

রাস্তার ইলেকট্রিক আলো যথেষ্ট দূরে এবং দেয়ালটা শ্যাওলায় কালো হয়ে আছে। সুনীত দরজার একবিঘত কাছে মুখটা এনে তন্ন তন্ন খুঁজল। তারপর হাত বুলিয়ে দেয়ালে পোঁতা দুটো হুকের মাথা পেল। বোর্ডটা আর নেই।

সে উপরে তাকাল। বড়ঘরটা অন্ধকার। তার পাশে ছোট্ট ছাদটাও অন্ধকার। রাস্তা থেকে এর বেশি দোতলার কিছু দেখা যায় না। বাবা কি বাড়িতে নেই? এই সময় কোথায় যেতে পারেন, কোনও মন্দিরে বা কোনও আড্ডায়? কখনও সে বাবাকে ধর্মপ্রাণ হতে দেখেনি, আড্ডা একটা ছিল বটে সত্যসখাবাবুদের বাড়িতে, কিন্তু সে শুনেছে, লোকজনের সঙ্গে বাবা আর মেলামেশা করেন না। তা হলে কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

সুনীত ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল। সামান্য আলোয় কালো ডায়ালে সে কাঁটার অবস্থান বুঝতে পারল না। রিকশা থেকে নামার সময় একটা ওষুধের দোকানের দেয়ালঘড়িতে দেখেছিল আটটা-পঞ্চান্ন। দু'ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ট্রেনে ছিল। রিকশা নিয়ে গলিতে ঢুকতে চায়নি। অনেকেই আছে যারা এত বছর পরও হয়তো তাকে চিনে ফেলতে পারে। কৌতূহলী দৃষ্টি সে এড়াতে চায়। তা ছাড়া এখানকার

থানায়ও নিশ্চয় খবর এসেছে, রিকশাওয়ালাটা ইনফর্মার কি না কে জানে। এই বাড়িতে নতুন কোনও লোক এলেই হয়তো থানায় খবর দেওয়ার নির্দেশ আছে।

সদর দরজা ভেজানো। ফাঁক দিয়ে ভিতরে আলো দেখা যাচ্ছে। দরজার পাশের জানলায়ও আলো। ঘরের ভিতর রেডিয়োয় সম্ভবত নাটক হচ্ছে, নীচের পাল্লা দুটো বন্ধ থাকায় ভিতরটা সে দেখতে পেল না। এক বুড়ি এবং বাচ্চা একটা মেয়ে সুনীতের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। সে চেনার চেষ্টা করল বুড়িটিকে এবং চিনতে না পেরে আশ্বস্ত হল।

নিঃশব্দে লোকটি যে কখন দবজা খুলেছে সে টের পায়নি। কী যে বলবে, এই মুহূর্তে ভেবে উঠতে পারল না। বাবাকে চাই? নিজের কানে কথাটা হাস্যকর শোনাবে। এত রাতে নিজের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যদি কেউ বলে "বাবাকে চাই", তা হলে সেটা মনে রাখার মতো একটা ব্যাপার হবে। তার মানে আর একজন সাক্ষী তৈরি করা।

"ডাক্তারবাবুকে চাই।"

অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও লোকটির চুপ কবে থাকা দেখে সুনীত বুঝতে পারল অবাক হয়েছে। বছর পাঁচেক আগে বাবা লিখেছিলেন, একতলাটা ভাড়া দিয়েছেন। লোকটি হয়তো ভাড়াটেদেরই কেউ।

"ওপরে থাকেন যে বুড়ো ভদ্রলোক? অদিতিবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"দাঁড়ান।"

লোকটি ভিতরে চলে গেল সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে। ফিরে এল মিনিট তিনেক পর।

"আপনার নাম?"

"বলুন কলকাতা থেকে..."

অনুভূতি সুনীতকে নির্দেশ দিল নাম না বলাব জন্য।

..."গাবলু এসেছে।"

লোকটি আবার দরজা ভেজিয়ে ফিরে গেল।

গাবলু। সুনীত অবাক হয়ে ভাবল, নামটা কী করে তাব মনে পড়ল। শেষবার এই নাম ধরে, বছর সাত-আট আগে বাস থেকে চেঁচিয়ে ডেকেছিল প্রিয়ব্রত। কৃষ্ণনগরে তারা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে।

তাকাতেই, প্রিয়ব্রত বাসের জানলার রডে থুতনি চেপে দ্রুত বলেছিল, "তোকে খুব দরকাব, কোথায় পাব? কোন অফিসে আছিস?"

সুনীত তার অফিসের নামটি বলেছিল, তবে চেঁচিয়ে নয়। বাস স্টপে তখন অনেক লোক এবং তাদের শুনিয়ে চিৎকার করে অফিসের নাম বলতে সে আড়ষ্ট বোধ করেছিল।

"কী নাম..জোরে বল।"

বাসটা তখনই ছেড়ে দেয়। প্রিয়ব্রতর দরকারটা আর জানা হয়নি। পাড়ার অনেকেই এবং বন্ধুরা তাকে 'গাবলু' নামে ডাকত, আর এই বাড়িতে একমাত্র মা। বাবা 'সুনীত' ডেকে গেছেন বরাবর। তার এগারো বছর বয়সে ক্যানসারে যখন মা মারা যায় তখন বাবা মধ্য-চল্লিশ, কঠিন পেশিতে মোড়া দীর্ঘদেহী পুরুষ। যুবকরা ম্লান হয়ে যেত তার কান্তি ও সমুন্নত ভঙ্গির পাশে।

"আপনার নাম কি সুনীত?"

"হ্যাঁ।"

"ওপরে যান...ডান দিকে সিঁড়ি।"

সদর দরজার পাশের ঘরটা ছিল রোগীদের বসার এবং ডিসপেনসারি। তার পিছনের ঘরটায় বাবা বসতেন, দরজায় পর্দা ঝুলত। সকাল-সন্ধে ভিড় লেগেই থাকত। সিঁড়ির বালবটা আগের মতোই কম পাওয়ারের এবং বিষাদময়, যে-জন্য সন্ধ্যার পর থেকেই বাড়িটাকে তার বিষণ্ণ মনে হত।

সিঁড়িটা ঘুড়ে উঠে দোতলার দালানে পৌঁছেছে। দালানের মাঝখানে বাবা দাঁড়িয়ে। সিলিং থেকে ঝোলানো আলো মাথা এবং ঘাড় বেয়ে ঝরে পড়ছে। সুনীল মুখের কয়েকটা জায়গায় অন্ধকার দেখতে পেল।

"কী ব্যাপার, হঠাৎ এত রাত্রে?"

"এমনি। বহরমপুর গেছলাম অফিসের এক কলিগের বাড়িতে। ফেরার পথে ভাবলাম...।"

কণ্ঠস্বরে একটুও তারতম্য ঘটেনি। গম্ভীর, স্পষ্ট এবং জুয়ারি। মিথ্যা বলতে বুক কাঁপে।

"আমি ভাবলাম কিছু একটা...বউমা ভাল আছে?"

"হ্যাঁ।"

উমাকে উনি এখনও পর্যন্ত দেখেননি।

"ঠান্ডা পড়েছে, গরমজামা গায়ে দাওনি কেন?"

"কোট ছিল। কাল কাদার উপর পিছলে পড়ে এমন অবস্থা হল যে কোটটা কাচার জন্য বহরমপুরেই রেখে এলাম। বন্ধুর শার্ট পরে এসেছি, জুতোটাও কাদায় গেছে।"

"ঘরে বোসো।"

সুনীত বড় শোবার ঘরটায় সন্তর্পণে ঢুকল। চটিটা সিঁড়ির শেষ ধাপে খুলে রেখে এসেছে। কেমন যেন তার মনে হচ্ছে নিজের বাড়িতে সে আসেনি; শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন যেন এখানে সে কাটায়নি। কীসের একটা কুণ্ঠা তাকে চেপে ধরেছে।

দীর্ঘকাল বাবার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার জন্যই কি! বছরে একটা দুটো চিঠি লেখালেখি তো হয়ই। স্বাভাবিক সৌজন্য, কুশল কামনা, টুকিটাকি দু'-চারটে খবর ছাড়া বাবার চিঠিতে কোনও কৌতূহল, দুঃখ, হতাশা বা বিরাগ কখনও প্রকাশ পায়নি। কখনও বাড়িতে আসার আমন্ত্রণও জানাননি।

কাঠের দেরাজ খুলে উনি জামা-কাপড়ের স্তূপের মধ্যে বাছাবাছি করছেন । কাঠে হেলান দিয়ে সুনীত দেয়ালে ঝোলানো মায়ের ছবিটার দিকে তাকিয়ে। বহুদিন আগে তার একবার মনে হয়েছিল, ছবিটা সে চাইবে। রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কারুর ছবি চোখের সামনে থাকলে একটা ভরসা পাওয়া যাবে, মনে হবে খুঁটি আছে, শিকড় আছে, শ্যাওলার মতো ভাসছি না। কিন্তু বাবার কাছে চাইতে সাহস হয়নি। এখন যদি চাওয়া যায় দেবেন? নাকি বলবেন, "তেজ দেখিয়ে বলেছিলে এ-বাড়ির কুটোটি পর্যন্ত ছোঁব না, এ-বাড়ির উপর সব দাবি ত্যাগ করলাম, তা হলে কেন...।"

"ওটা চাই?"

সুনীত চমকে উঠল। নস্যি রঙের গরম পাঞ্জাবিটা খাটের উপর রেখে অদিতিকুমার বললেন, "দ্যাখো তো এটা গায়ে হয় কি না। সিজন চেঞ্জের সময় সাবধানে থাকা উচিত।"

"আমার খুব একটা শীত লাগছে না।"

"না লাগলেও পরা উচিত, চোরা ঠান্ডা ঠিক বোঝা যায় না। তোমার তো সর্দির ধাত।"

মনে রেখেছেন! সুনীত অস্বস্তি ভরে ওধার-এধার তাকাল। ঘরটা মিউজিয়মের মতো সাজিয়ে রাখা। জ্ঞান হওয়া থেকে সে এই ঘরের যে জিনিসটা যেখানে দেখেছে, আজও সেটি সেখানে। ঘরের কোণে রঙিন খদ্দরের ঘেরাটোপে সেলাইয়ের মেশিন, তার পাশে গ্রামোফোন। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো পশমে বোনা ফুলের সাজি, আয়নার সামনে কাঠের ব্র্যাকেটে ধূপদানি এমনকী জলচৌকিতে কাঁসার পানের বাটাটিও। প্রত্যেকটি ধাতু, কাঠ, কাচ ও কাপড় ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। বোঝা যায় নিয়মিত যত্ন নেওয়া হয়। ঘরের আর এক কোণে টেবিলে অর্ধসমাপ্ত চিঠি, ফাউন্টেন পেন, মোটা ফ্রেমের চশমা এবং টেবিল ল্যাম্প। এগুলো আগে ছিল না। টেবিলটা ছিল ডিসপেনসারিতে। চশমাটা সুনীত এই প্রথম দেখল।

"নিশ্চয় খিদে পেয়েছে? আমি অবশ্য আটটার মধ্যেই খেয়ে নিই।"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুনীত লক্ষ করছে যা কিছু কথাবার্তার উদ্যোগটা ওনারই, সে শুধু উত্তরদাতা। বহুদিন পর একমাত্র ছেলেকে দেখে কোনও ভাবান্তর বা আচরণে কোনও বিহ্বলতা নেই। আওতার মধ্যে পেয়ে ব্যক্তিত্বের দাপট দেখাচ্ছেন, তা-ও নয়। এ-সবই ওঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি। শুধু একবার...সুনীত সেই ঘটনাটা ভেবে একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল।

মা মারা যাবার পর সে আর বাবা এই খাটেই শুত। এর আগে পাশের ছোট ঘরটা, যেখানে একটি চৌকি এবং টেবিল ছাড়া কিছু নেই, বাবা সেখানেই শুতেন। তখন রান্না, বাসন মাজা, ঘর মোছা ইত্যাদি সাংসারিক কাজ করত ভোলার মা। বুড়ি নিখুঁতভাবে পেরে উঠত না সব কাজ। একদিন সে নিজেই

অবসর নিয়ে পনেরো মাইল দূরে তিতলেপোতায় ছেলের কাছে ফিরে যায় এবং পাঠিয়ে দেয় নাতনি কমলাকে।

সুনীতের ভাল লেগেছিল ওকে। বছর বাইশ বয়স। গ্রামের মেয়েরা যেমন হয়, ভীরু, শান্ত ঠান্ডা স্বভাবের। সুনীত তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। ভীরুভাবটা কেটে যাবার পর প্রচুর কথা বলত তার সঙ্গে। বয়সের ব্যবধানটা ঘুচে গেছল কমলার মানসিক অপরিণতি এবং সারাক্ষণ প্রায় একাকী জীবনযাপনের জন্য। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই বাবা থাকতেন একতলায় বা বাড়ির বাইরে। সুনীত এবং কমলা ছাড়া দোতলায় আর কেউ ছিল না। দু'জনের মধ্যে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

সুনীত ওকে অক্ষর পরিচয় করাবার দায়িত্ব নিয়েছিল। বর্ণপরিচয় কিনে পড়াতেও শুরু করে। সন্ধ্যায় যখন সে টেবিলে পড়ত কমলা মেঝেয় বসে শ্লেটে দাগা বুলোত। সুনীত জীবনে সেই প্রথম নিজের ব্যক্তিত্ব ঘনিয়ে ওঠার অনুভব পায়। কমলা তার অনুগত বাধ্য ছাত্রী ছিল। দু'মাসের মধ্যে সে প্রথমভাগের মাঝামাঝি পৌঁছে যায়।

একদিন সন্ধ্যায় কমলা টেবিলের ধারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সুনীতকে হাতের লেখার খাতা দেখাচ্ছিল। কী একটা বলার জন্য সুনীত মুখ তুলতেই দেরাজের পাল্লায় বসানো আয়নায় দেখতে পায়, ঘরের দরজায় বাবা দাঁড়িয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

সুনীত সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে খাতাটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। কমলা সচকিতে পিছনে তাকায় এবং খাতাটা তুলে নিয়ে আঁচলে ঢাকে। বাবা ভিতরে ঢুকতেই সে বেরিয়ে যায়।

দেরাজ থেকে একটা চওড়া খাম বার করে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে বাবা থমকে দাঁড়ান।

"কী করছিল ও?"

"আমার কাছে পড়ে।"

"তোমার নিজের পড়া নেই? সময় নষ্ট করো কেন?"

রাত্রে দালানে সুনীত একা যখন খাচ্ছে, কমলা হঠাৎ বলে, "বাবাকে তুমি ভয় পাও, না?"

সুনীত জবাব দেয়নি।

"আমারও ভয় করত...এখন আর করি না।"

ওর কণ্ঠস্বরে কী একটা যেন ছিল...চপল তাচ্ছিল্য, যে-জন্য সুনীত মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল। বাবাব প্রতি এমন হালকা ভঙ্গি কোথা থেকে সংগ্রহ করল জানার জন্য কমলার চোখের দিকে তাকিয়ে সেদিন কিছুই বুঝতে পারেনি।

এর মাস ছয়েক পরেই কমলা মারা যায়। রাতে ঘুমিয়ে থাকার জন্য সুনীত জানতেই পারেনি পাশের ছোট ঘরে কমলা রক্তস্রাব করতে করতে মারা যাচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে যাবার জন্য দরজার কাছে আসতেই সে শুনতে পায়: "কী ব্যবস্থা করবে?...হাসপাতালে?...বরং পুলিশে আগে...।"

বাবার কণ্ঠস্বরে, উত্তেজনা ছাপিয়েও ফুটে উঠেছিল ত্রাস যা কখনও সে শোনেনি।..."জানাজানি হবেই, আমি মুখ দেখাতে পারব না...সুনীতও জানবে।" একটা অস্ফুট ক্রোধ হঠাৎ আর্তনাদে পরিণত হয়ে কাতরে উঠল "...আমাকে সুইসাইড করতে হবে।"

বাবা দালানে পায়চারি করছিলেন, মুখ ফ্যাকাশে। চোখ বসে গেছে। সেই প্রথম তার চোখে পড়ে, বাবা যেন একটু কুঁজো হয়েছেন। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল সুকুমারবাবু, বাবার কম্পাউন্ডার। সুনীতকে দেখেই বাবার চোখে ভয় ফুটে উঠেছিল। অসহায়ভাবে সুকুমারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

"সুনীত ক'টা দিন নয় আমার বাড়িতেই থাকবে।"

বৃদ্ধ সুকুমারবাবুর স্বর ছিল অনুত্তেজিত। সুনীত কৌতূহলী চোখে তাকায়।

"কমলা অসুস্থ, রোগটা ছোঁয়াচে তাই তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।"

ছোট ঘরের পাশ দিয়ে কলঘরে যাবার সময় সে তাকায়। কমলা মেঝেয় শুয়ে। চোখ বন্ধ। বাবার একটা ধুতি তার দেহের উপর গলা পর্যন্ত বিছানো। কলঘরের একধারে সে দেখে রক্তমাখা কমলার শাড়ি।

সুকুমারবাবুর বাড়িতে তিন দিন থেকে সুনীত ফিরেছিল এবং তিন মাস পরে অ্যানুয়াল পরীক্ষার

ফল বেরোতেই তাকে হাওড়ার সেন্ট পিটার্স স্কুলের বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই তিন মাসের মধ্যেই সুনীত জানতে পেরে যায় কেন কমলা মারা গেল।

অদিতিকুমার ডিসপেনসারি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বাড়ি থেকেও বেরোতেন না। সদর দরজাটা সারাদিনে কদাচিৎ খোলা থাকত। একতলার যে-ঘরে রোগী দেখতেন সেখানেই ক্যাম্পখাট পেতে রাতে শুতেন আর সেগুন কাঠের ভারী ইজিচেয়ারে সারাদিন হেলান দিয়ে থাকতেন ঘরের জানলা বন্ধ করে।

ছেলের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন একতলার ঘরে নিজেকে বন্দি করে, কিন্তু বাইরের জগৎ থেকে ছেলেকে আড়াল করতে পারেননি। জানতেন, পারা সম্ভবও নয়। কানাঘুষোগুলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে সুনীতের কানে আসছিল। সে লক্ষ করে, পাড়ার বয়স্ক লোকেরা তাকে দেখলেই তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেয়। জানলায় বা বারান্দায় মেয়েদের কথা বন্ধ হয়ে যায় তাকে দেখে এবং মুখ টিপে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে। ক্লাসে তার বিশেষ এক বন্ধু ছিল না প্রিয়ব্রত ছাড়া।

এই প্রিয়ব্রতই তাকে একদিন বলে, "সবাই তোর বাবার নামে যা-তা বলছে। তোদের ওই ঝিয়ের সঙ্গে নাকি তোর বাবার..."

সুনীতের ফ্যাকাশে মুখ দেখে সে থেমে যায়। এক রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতে সুনীত দেখেছিল বাবা বিছানায় নেই। কিছু ভাবেনি তাই নিয়ে। এখন সে ভাবল এবং প্রিয়ব্রতর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলে, "সব বাজে কথা।"

"তোর বাবা নাকি ওষুধ খাইয়ে পেট খসাতে গিয়ে মেরে ফেলেছে।"

"সব বাজে কথা।"

"পুলিশকে কুড়ি হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে ধামাচাপা দিয়েছে নয়তো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হত।"

"এ-সব কে বলেছে তোকে?"

"কে আবার বলবে, সবাই জানে। সবাই বলছে তোর বাবা দুশ্চরিত্র, খুনি।"

সুনীত রাগে থরথর কেঁপেছিল। কারুরই জানার কথা নয়, সে নিজে পর্যন্ত কিছুই জানে না। চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে স্বর বেরোল না, চোখের সামনে একটা কালো পর্দা কাঁপছে। পর্দাটার পিছনে দাঁড়িয়ে দু'-হাতে ওটাকে ধরে কেউ যেন দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। সুনীত আবার চিৎকার করার চেষ্টা করে।

"কী ব্যাপার, স্বপ্ন দেখছিলে নাকি।"

চোখ খুলে সুনীত দেখল সে খাটের উপর শুয়ে। কখন শুয়ে পড়েছে জানে না, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি। বাবা ঝুঁকে রয়েছেন। মুখে মৃদু হাসি। সুনীত উঠে বসল।

"আলুভাতে-ভাত হয়ে গেছে, একটু দই কিনে আনি!"

"তুমি বাইরে বেরোও।"

অপ্রতিভতার একটা ঝলক দু'জনের মুখের উপর দিয়ে পিছলে গেল। দু'জনেই চোখ সরিয়ে নিল। কথা না বলে অদিতিকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বোকার মতো মুখ ফসকে কেন যে কথাটা বেরোল।! সুনীত কপালে তালুর উলটোদিকে ঠেকিয়ে ভাবল, জ্বর আসবে বোধহয়।

পসার, প্রতিপত্তি, মর্যাদাচ্যুত হয়ে, নিজেকে বন্দি করে রাখতে বাধ্য হওয়া লোকটি এখন বৃদ্ধ। বেঁচে থাকলে কমলা এখন পঞ্চাশের কাছাকাছিই হত। ও মরে না গেলে, দু'জনে এখন কীভাবে জীবনযাপন করত! বাবা এতগুলো বছর ধরে এই বলে কি আক্ষেপ করেছেন, শারীরিক তাড়না এড়াতে পারলে জীবনে এমন বিপর্যয় নেমে আসত না! উনি কি জানেন, তার ছেলে এখন ঠিক তাঁর মতো অবস্থায় পড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জানলে কি অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন? বলবেন কি, "পুত্র আমাকে তুমি রক্ত মাংস মেদ মজ্জায় বহন করছ, আমায় আর ঘৃণা কোরো না। তার থেকে পাপ, আর কিছু হতে পারে না। এইবার আমি মুক্ত।"

জিজ্ঞাসা করতে হবে, এখন তুমি কী ভাবছ, কী করে দিন কাটাও! কখনও কি স্ত্রীর কথা তোমার মনে পড়ে? বলেছিলে আত্মহত্যা করবে যদি আমি জানতে পারি, জেনেছি, কিন্তু করোনি। কেন? জীবন সম্পর্কে কোনও লেকচার নয়, শুধু জানতে চাই আত্মহত্যা করোনি কেন?

কী জবাব দিয়েছিলে যখন সেন্ট পিটার্স স্কুল বোর্ডিঙের ফাঁকা ভিজিটার্স রুমে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম?

"তুমি এখন ছোট, তুমি বুঝবে না..."

"কী বুঝব না, কেন বুঝব না?"

"আগে তোমার দেহ তৈরি হোক, সম্ভোগের সুখ জানুক, তারপর আমায় জিজ্ঞাসা কোরো। এ-সব কথা এখন থাক, তুমি আমার সঙ্গে কৃষ্ণনগরে যাবে কি?"

"না।"

"কেন, লজ্জা করছে?"

"কোনওদিনই আমি যাব না, ও-বাড়িতে আর পা দেব না...।"

আরও অনেক কথা সে বলেছিল প্রচণ্ড রাগে। বাবা শুধু শূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। যাবার সময় বলেছিলেন: "শরীরকে অগ্রাহ্য কোরো না সুনীত, সে কখন যে কী চেয়ে বসবে তা কেউ জানে না, আমিও জানতাম না। এখনও আমার শরীর বাঁচতে চায়, তাই আত্মহত্যা করিনি।"

তাই কি আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি? এই শরীর, উমার কাছ থেকে দীর্ঘকাল যত্ন সেবা সান্ত্বনা ইত্যাদি পেয়েই কি লোভী হয়ে পড়েছে! বাবার ক্ষেত্রেও কি ঠিক এই রকমই ঘটেছিল? সুনীত ভেবে পাচ্ছে না হঠাৎ কেন হাবার বউয়ের শরীরটাকে দখলের ইচ্ছা তার হল। ওর থেকে কিছুটা ভাল...চিন্ময় যাদের কাছে যায়, তেমন মেয়েদের কাছেও তো সে যেতে পারত...এটা কি অনুকরণের ইচ্ছা থেকে? কমলার জায়গায় হাবার বউ...বাবার সমকক্ষ হওয়ার জন্য একটা বাসনা তার মধ্যে সুপ্ত কোনও বোধকে কি জাগিয়ে তুলেছিল যেটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সে কোনওদিনই সন্দিহান হয়নি বা যেটা দীর্ঘদিন উমার সঙ্গে সহবাসের জন্য চাড়া দিয়ে ওঠেনি?

কিন্তু এটা কি তার অধিকারের মধ্যে পড়ে না? প্রত্যেকেরই এই অধিকার কি নেই, জীবনে এক-আধবার বিশেষ কিছু করার, এমন কিছু যেটা নিত্যনৈমিত্তিকের বাঁধা গৎ থেকে কিছুটা উপরে তুলে দেবে?

সুনীত তার মায়ের ছবির সামনে দাঁড়াল। কপালের কাছে সিঁদুরের টিপ ছিল, এখন নেই। সে ভাবল, ছবিটা নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ আছে কি? বাবার জীবনে এবং তার জীবনেও এই মহিলার কোনও অবদান নেই।

সে টেবিলের কাছ ঝুঁকে দেখল অদিতিকুমার যা লিখছিলেন।

চিঠিই, কেউ বোধহয় টাকা চেয়েছে, তাকে জবাব দিচ্ছেন। "বীরু, গতমাসে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছিলাম এবং সেইসঙ্গে জানাইয়াছি আগামী দুইমাস কিছু পাঠাইতে পারিব না, কিন্তু...।"

"তুমি কি প্যান্টটা ছেড়ে একটা ধুতি পরবে?"

সুনীত চমকে পিছন ফিরেই চিঠিটাকে হাত দিয়ে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল। পরের চিঠি পড়ার অন্যায় কাজটা ধরা পড়ত না যদি কৌতূহলটাকে সে সামলে নিতে পারত। একটার পর একটা অপ্রতিভ ব্যাপার বাবার প্রতি তার মানসিক বিরোধিতাগুলোকে যে ধসিয়ে দিচ্ছে এটা সে এবার বুঝে পারছে। অবশ্য এত বছর পর এখানে আসাই তো তার দুর্বলতাকে বাবার কাছে ধরিয়ে দিয়েছে।

দালানের কোণে দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট্ট টেবিল। তার উপর ডেকচিতে গরম ভাত। সুনীত চেয়ারে বসে কয়েক হাতা ভাত তুলে থালায় রাখল। অদিতিকুমার গাওয়া ঘি ঢেলে দিলেন। ভাত থেকে ধোঁয়া উঠে তার মুখটা ভিজিয়ে দিতেই সে প্রচণ্ড খিদে বোধ করল। বিকেলে রেস্টুরেন্টেও সে এমন খিদে অনুভব করেছিল। এক ডেকচি ভাত আর এই ক'টা আলু, তার মনে হল খুবই কম, খিদের তুলনায়।

সুনীত গোগ্রাসে গরম ভাত খেতে শুরু করল।

বাবা দাঁড়িয়ে দেখছেন। একটা আরাম গলা দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। ঝিম লাগছে, ভারী হয়ে আসছে শরীর। মদ খেতে খেতে ঘোর যখন প্রথম আক্রমণ করে, সুনীতের মনে হল, সেই রকম এখন লাগছে। বাস্তবতা ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাবার ব্যবস্থাটা এবার যেন ভেঙে পড়বে।

"তুমি দাড়ি কামাওনি কেন?"

"ব্রণর মতো কয়েকটা ফুসকুড়ি হয়েছে, প্রায়ই হয়।...রান্নাবান্না কি নিজেই করো?"

'না...একটি মেয়ে করে। ক'দিন হল সে বাড়ি গেছে, কালই আসবে।"

"একটি মেয়ে," শুনেই সুনীত মুখ তুলে একবার তাকিয়েছিল। নির্বিকার ধৈর্যপরায়ণ অদিতিকুমারের মুখ, মৃদু আলোয় প্রস্তরফলকের মতো লাগছে।

"মেয়েটি কমলার ভাইঝি।"

সুনীত চমকাল না বা আবার মুখ তুলে প্রশ্নবোধক চাহনি দেখাল না। কথাটা বললেন কেন? কমলার নামটা তো না করলেও পারতেন। করেছেন অযথা, ইচ্ছে করেই, কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। কী প্রতিক্রিয়া হয় ছেলের মধ্যে তাই দেখতে চান?

দেখাব না। সুনীত ভাতে দই মাখতে মাখতে ঠিক করে ফেলল বাবাকে সে জানিয়ে দেবে বয়সের সঙ্গে তারও বোধবুদ্ধি বেড়েছে। চিন্তা ও বিচার ক্ষমতা তার আছে। কমলা নামক ব্যাপারটাকে সে স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত হিসাবেই গণ্য করে।

"দোকান-বাজার কি ওই করে?"

"হ্যাঁ। বহুবছর পর আজ বাড়ি থেকে বেরোলাম, প্রায় পনেরো বছর।"

"পনেরো।"

হতভম্বের মতো সুনীত তাকিয়ে রইল তার বাবার মুখের দিকে।

"দু'-তিন বছর কমও হতে পারে। সুকুমারবাবু মারা যেতে দেখতে গেছলাম ওর বাড়িতে, তারপর আর বেরোইনি। নীচের ভাড়াটেরাই আছে বছর পাঁচেক।"

"আর এই মেয়েটি?"

"চার বছর...এখন বছর একুশ বয়েস।"

বয়স জানানোর দরকারই ছিল না। নিশ্চয় চাইছেন ছেলের কাছে নিজের আত্মম্ভরিতা জাহির করতে কিংবা তাকে অপমান করতে।

"এত বছর, এ-ভাবে জীবন কাটাবার উদ্দেশ্য?"

"এমনি। দইটা কেমন? ষষ্ঠী ঘোষ মারা গেছে কিন্তু এখনও সেইরকমই দই ওর ছেলে করে।"

"বাপের গুণ পেয়েছে।...কিন্তু এমনি এমনি এইরকম বন্দি জীবনযাপন, মানুষ পারে কী করে!"

"জেলে কয়েদিরা কী করে পারে?"

"তাদের বাধ্য করানো হয়।"

'আমাকে বাধ্য করিয়েছে...আমি নিজেই।...হাত ধোবার জল ছাদে বালতিতে রয়েছে।"

স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই সে হাত ধুয়ে ঘুরে এসে খাটে বসল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অদিতিকুমার তার দিকে তাকিয়ে যেন পরের প্রশ্নটির অপেক্ষায়। সুনীত ঠিক করেই ফেলেছে, কৌতূহল দেখাবে না।

"আমি নিজেই ঠিক করি শাস্তি নেব। নেওয়া উচিত, নেওয়া দরকার। খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করি, রেডিয়োটা ভাড়াটেদের দিয়ে দিই। মাঝে মাঝে দু'-চারজন রোগী আসত, তাদেরও আসা বন্ধ করে দিই, একটা চাকর ছিল দোকানবাজার করে দিত। খাটে শুতাম না। নিজে হাতে কাপড় কাচা, ঘর মোছা, রান্না সবই করতাম, চাকরটা বসে থাকত। পৃথিবীতে কী ঘটছে, এমনকী পাড়াতেও, আমি কিছুই জানি না। বাইরের জগৎ, জীবনের সঙ্গে যেখানে যত রকমের সম্পর্ক ছিল, সব ছিঁড়ে ফেলি একে একে। শুধু একটা-দুটো চিঠি, কয়েদিরা তো চিঠি পেয়ে থাকে, তাই আর বন্ধ করিনি। মাসে একবার ভাড়াটেদের একজন এসে টাকা দিয়ে যায়।"

"কত দেয়?"

"নব্বুই।"

"চলে?"

"হাতে কিছু তো আছে, ক্যাশ সার্টিফিকেট আর জমিজমাগুলো বিক্রি করে দিয়েছি।"

"মা-র গহনা?"

"নেই। ওই ব্যাপারটাতেই বাঁধা দিয়ে তক্ষুনি টাকার জোগাড় করে বাঁচতে হয়েছিল। ওগুলো আর ছাড়ানো যায়নি।"

সুনীত বালিশটা টেনে নিয়ে বিছানায় কাত হয়ে শুল। তার মনে হচ্ছে, কারুর কাছে বিবৃতি দেবার জন্য বাবা যেন এতকাল অপেক্ষায় ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক কাঠিন্য ভেঙে পড়েছে। কিন্তু বলার ভঙ্গিতে কুণ্ঠা নেই, এটাই শুধু তাকে অবাক করছে।

"তুমি খাটের ওই দিকটায় লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে পড়ো, আমি এদিকটায় শোব।"

"খাটে শোবে! এই যে বললে..."

'আমি এখন খাটেই শুই, আট বছর ধরে শুচ্ছি।"

"যেদিন থেকে মেয়েটিকে রাখলে?"

সুনীত বিদ্রূপটা স্পষ্ট করার জন্য ঠোঁট টিপে হাসির ভান করল। সেটা উপেক্ষা করে অদিতিকুমার দালানের আলো নিভিয়ে ঘরে এসে চেয়ারে বসলেন। সুনীতের চোখের পাতা ভার লাগছে। তার ঘুম পাচ্ছে।

"আমার তখন মনে হয়েছিল যথেষ্ট শাস্তি আমি পাচ্ছি না। বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কষ্ট হচ্ছিল বটে কিন্তু ক্রমশ সেটায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। লক্ষ করলাম আর কষ্ট লাগছে না। শরীর সব অসুবিধাই নিয়ে নিচ্ছে। তাই—তোমার বোধহয় এই সময় সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস।"

"না, ঠিক আছে।"

"নীচে গিয়ে একটা চেয়ে আনতে পারি।"

"দরকার নেই।"

কথাটা অগ্রাহ্য করে অদিতিকুমার উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুনীত বালিশটা জড়িয়ে চোখ বুজল। বাসি সোঁদা গন্ধ উঠছে বালিশটা থেকে। সারা বাড়িটা থেকেই গন্ধ উঠছে। পলেস্তরা-খসা দেয়াল, ভাঙা জানালা, সিমেন্ট-চটা মেঝে, শ্যাওলামাখা ছাদ, পাঁচিলের কিনারে বটের ঝোপ, তার মনে হল না শুধু এগুলোর জন্যই সে গন্ধটা পাচ্ছে।

আসলে এই বৃদ্ধ লোকটির অস্তিত্বই এই বিশেষ গন্ধটা তৈরি করেছে। সুনীত ভাবল, বোধহয় এর একটা বিশেষ কার্যকারিতা আছে নয়তো মাথার মধ্যে এমন অবশ করা প্রশান্তি ঘনিয়ে আসছে কেন।

কাল সকালে, মেয়েটি আসবে। দেখতে হবে কতটা মিল আছে কমলার সঙ্গে। বোধহয় মিল আছে বলেই বাবা ওকে রেখেছে। কমলার স্মৃতি জাগিয়ে রাখা? কিন্তু মায়ের স্মৃতি...অদিতি মুখুজ্যে তার স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে কী করেছে। একটি পুত্র উৎপাদন এবং পুত্রটি তার পিতাকেই অনুকরণ করেছে।

আমাকেও কি এইরকম বন্দিদশায় পচতে পচতে বৃদ্ধ হতে হবে? এইরকম একটা গন্ধ তৈরি করতে হবে? তবু ভাল, সন্তান নেই। সুনীত পাশ ফিরে দেরাজের আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরের দরজার ফ্রেমে চৌকো একটা অন্ধকার আয়নায় প্রতিফলিত।

বন্দিত্বের বদলে ফেরার হয়ে থাকা। কোথায় থাকব? সুনীতের দিশাহারা হবার উপক্রম হল। এর বাড়ি তার বাড়ি ক'দিন করা সম্ভব! ওরা একদিন ধরে ফেলবেই। কিংবা হাজার মাইল দূরে কোথাও চলে গিয়ে, নিজের পরিচয় মুছে এমন চাকরি করা যাতে সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না।...চায়ের দোকানের চাকরি, স্টেশনের কুলি, ধোপার সহকারী। বাবার থিওরি অনুযায়ী বলা যায়, এটাও এক ধরনের শাস্তি নেওয়া। কয়েদিদের তো পাথর ভাঙা, ঘানি ঘোরানোর কাজ করতে হয়।

দরজার ফ্রেমের অন্ধকারটা বিস্রস্ত করে ঢুকলেন অদিতিকুমার।

"ওরা শুয়ে পড়েছে, ডেকে তুলে আর বিরক্ত করলাম না।"

"আমার সিগারেট না হলেও চলে। এ-জন্য ব্যস্ত হতে হবে না।"

"না, ব্যস্ত ঠিক নয় তবে যার যেমন অভ্যাস তাকে সেইভাবে রাখলে সে খুশি হয়।"

অদিতিকুমার চেয়ারে বসলেন। একদৃষ্টে মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, "বহু বছর পর তোমায় দেখছি, আমি তো ভেবেছিলাম জীবনে আর দেখতে পাব না। তোমাদের তো সন্তান হয়নি।"

"না।"

"তোমার চেহারা যতটা বদলানো উচিত ছিল, ততটা বদলায়নি।"

"আমি আসায় তুমি খুশি না অখুশি?"

বিব্রত না হয়ে অদিতিকুমার হাসলেন।

"মানুষ আমার কাছে খুব দরকারি জিনিস নয়। তোমার কি অসুবিধা হবে যদি আলোটা নিভিয়ে দিই?"

'না।"

আলো নিভিয়ে উনি আবার চেয়ারেই বসলেন।

"তোমাকে তখন যা বলছিলাম...এক সময় মনে হল যথেষ্ট শাস্তি আমি পাচ্ছি না। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাহ্যিক কতকগুলো অসুবিধা, কষ্টের মধ্যে পড়েছি মাত্র, ভিতরে কিন্তু আমি শান্ত, বিশেষ কোনও কষ্ট নেই। ভাবলাম, তা হলে কি আমার ফাঁসি হয়ে গেল, আমি মরে গেছি, কিন্তু ফাঁসি হওয়ার মতো অপরাধ তো আমার নয়। যে অপরাধের যে শাস্তি সেটাই আমি নেব, তার কম বা বেশি নয়..."

সুনীত ভাবল অট্টহাসির কি এই একটা চমৎকার সুযোগ। বৃদ্ধের মুখে কি ছেলেমানুষের মতো কথা, 'কম বা বেশি' উনি নেবেন না! হিসেব জ্ঞানটা টনটনেই ছিল।

"কমলার ভাই বীরু এল দেশ থেকে। ওকেও কিছু টাকা দিতে হয়েছিল, তাই দিয়ে একজোড়া বলদ কেনে। বলল, মেয়েটাকে বাড়ির কাজে লাগাতে চায়, যদি কোথাও আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বললাম, আমি পারব না। বলল, আপনার কাছেই রাখুন, বললাম, দরকার নেই। তখনও পর্যন্ত মেয়েটিকে আমি দেখিনি। বীরু নেমে গেল, আমি জানলায়। ওরা রাস্তায় বেরোতেই চোখে পড়ল মেয়েটিকে। আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না সেই কিশোরীকে দেখে। হুবহু কমলা। দপ করে জ্বলে উঠল শরীর, আমি বহু বহু বছর পর কামনা অনুভব করলাম। এক পা এক পা করে ও বাবার সঙ্গে চলে যাচ্ছে আর আমার শিরাগুলোকে গোছা করে ধরে শরীর থেকে টেনে বার করে নিচ্ছে। ওদের ডাকলাম। আমি যে চেঁচাতে পারি এটা জানতাম না। এরা ফিরে এল।"

অন্ধকার ঘরে নিচু গলায় থেমে থেমে অদিতিকুমার বলে যাচ্ছেন। মন্থর গম্ভীর ধ্বনিপুঞ্জ তাদের দূরত্বকে বিস্তৃত করে ভেসে বেড়াচ্ছে। একঘেঁয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরের এই স্বীকারোক্তি সুনীতকে যেন আবেদন জানাচ্ছে এই বৃদ্ধের প্রতি করুণা দেখাবার জন্য।

"মেয়েটিকে আমি যখনই দেখি তখনই আমার এই বৃদ্ধ শরীর..." অদিতিকুমার গলা আরও নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "সুনীত তুমি তো কমলাকে দেখেছ, কল্পনা করো তাকে। মেয়েটির রূপ নেই, লাবণ্য নেই কিন্তু আগুনের চাবুকের মতো শরীর। শুধুই রক্ত মাংস চামড়ায় তৈরি একটা প্রলোভন, যার থেকে রেহাই পাবার জন্য নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছি। যতই ওর ভাবভঙ্গি চলাফেরা তাকানো আমাকে খেপিয়ে দেয়, ততই ইচ্ছে করে ওকে শরীর দিয়ে ধ্বংস করে ফেলি। আর আমি নিজেকে তখন নিরস্ত করি। কী কষ্ট যে হয় নিজেকে ধরে রাখতে। এক একদিন পাগল হয়ে যাই প্রায়, নিজেকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখার কথাও ভাবি।"

"মেয়েটি কিন্তু এ-সবের কিছুই জানে না। চার বছর ধরে আমি এই চাবুক খাচ্ছি, ভাবতে পারো, চা-র-ব-ছ-র! কিন্তু এটাই চাই, এই জন্যই ওকে রেখেছি। চার বছরে তিলেতিলে চাবুকটা যত তীক্ষ্ণ হয়েছে, ততই অসহ্য বোধ করছি আর...এই শাস্তিটা, সুনীত, দাগড়া দাগড়া করে দেয়। ওকে কিছুই বুঝতে দিই না...আমাকে ও 'দাদু' বলে।"

"তোমার শরীর এখনও এই সবে সাড়া দেয়?"

"দেয়।"

"বাবা, তুমি কি সুখী?"

সুনীত উত্তর পেল না।

"বিপজ্জনক খেলা এটা। যে-কোনও সময়ই নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারো।"

'কিন্তু চার বছর তো হারাইনি!"

"তাতে প্রমাণ হয় না পাঁচ বছরে হারাবে না। তখন কী করবে?"
উত্তর নেই।
"তুমি একটা মনস্টার।"
অস্ফুট একটা আর্তনাদ শুনে সুনীত স্থির করল, কাল ভোরের ট্রেনে সে কলকাতায় ফিরে যাবে।

পাঁচ

একদিন মিহিরের স্টুডিও থেকে বেরিয়ে তারা তিনজন হাঁটছিল পার্ক সার্কাসের দিকে আমির আলি অ্যাভিনিউ ধরে। রাত প্রায় ন'টা। ট্র্যাফিক কমে গেছে। পথচারীও যৎসামান্য। মোটরগুলো বেগে ছুটে যাচ্ছে। যেখানে আলোর স্তম্ভ তার পনেরো গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে আলোকবৃত্তের বাইরের রাস্তা আবছায়া।
মিহির হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। একটা স্টেটবাস আসছে। সে হতাশায় মাথা নাড়ল। সুনীত এই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ বুঝতে না পেরে রুবির মুখের দিকে তাকাল।
"অ্যাই মিহির, বারণ করেছি না। আর এ-সব খেলা নয়।"
রুবি এগিয়ে এসে মিহিরের হাত ধরল।
প্রায় ষাট কিলোমিটার বেগে একটা ফিয়াট আসছে। রুবির হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মিহির ফুটপাথের কিনারে এল।
"মিহির না।"
মোটরটা তখন পনেরো থেকে কুড়ি গজ। মিহির রাস্তা পার হবার জন্য আলোকবৃত্তের দিকে এগোল। মোটরটা এবং সে একই লাইনে।
সুনীত চোখ বন্ধ করে রাস্তায় টায়ার ঘষার কর্কশ শব্দ এবং ড্রাইভারের নোংরা গালাগাল শোনার পর চোখ খুলে দেখল মিহির ট্রামলাইন পেরিয়ে ওধারে নেমেছে ততক্ষণে।
রুবির ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে সুনীত বলেছিল, "মাথা খারাপ নাকি?"
"ও বলে, ড্রাইভারের রিফ্লেক্স পরীক্ষা করছি। একদিন এইভাবেই ও মারা যাবে।"
ওপার থেকে মিহির হাতছানি দিচ্ছে।
"চলে এসো, চলে এসো এপারে।"
"সুনীত যেয়ো না, খবরদার যেয়ো না। ও এখন বার বার এই খেলা খেলবে যতক্ষণ আমরা ওর সঙ্গে থাকব...ট্যাক্সি, ট্যাক্সি।"
রুবি ট্যাক্সি থামিয়ে ছুটে গিয়ে উঠেছিল, ওর সঙ্গে সুনীতও। ট্যাক্সিটা ছাড়তেই সুনীত মুখ ফিরিয়ে কাচ দিয়ে দেখেছিল, মিহির অভিমানী বাচ্চাছেলের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে।
"ও কি আত্মহত্যা করতে চায়?"
"জানি না, অন্তত পঞ্চাশবার আমি ওকে এমন কাণ্ড করতে দেখেছি। এইভাবেই ও মরবে।"
রুবির কণ্ঠস্বরে তার মনে হয়েছিল মিহিরকে ও ভালবাসে। ঈর্ষার ছোট্ট একটা দংশন সে রোধ করতে পারেনি।
ট্রেনের জানলা দিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দৃষ্টি মেলে, কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার দিকে যাবার সময় সুনীতের মনে পড়ল ঘটনাটা। এমন নিস্তব্ধ শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ মিহিরকে কেন সে মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল? রুবি সেদিন পালিয়েছিল মিহিরকে সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে সরিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু আমার এই পালানোটা নিজের জন্য, তবে মিহিরের স্মৃতি এখন কেন? মিহির মারা গেছে, মোটরের ধাক্কায় নয়। পিন দিয়ে দাঁত খোঁটার অভ্যাস ছিল। মাড়িতে খোঁচা লেগে সেপটিক হয়। শেষ সময়ে ও নিজেই হাসপাতালে যায়। মারা যাবার চার দিন পর রুবি খবর পেয়ে সুনীতকে জানাবার সময় বলেছিল,, "কতদিন ওকে বারণ করেছি, পিন দিয়ে দাঁত খুঁটো না।" ওর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় জানতাম না বরাবরের জন্য সেই অভিমানী মুখটার ফটো তুলে রাখছি। প্রকৃতির মধ্যেও কি অভিমান আছে।

সকালের প্রথম ট্রেন। অন্ধকার থাকতেই সুনীত নিঃশব্দে উঠে পড়ে। জামা-প্যান্ট পরে সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছে, তখন বাবার চাপা গলা শুনতে পায়।

"ছবিটা নেবে না?"

"না।"

"গরম পাঞ্জাবিটা পরে যাও।"

"দরকার হবে না।"

"তোমার জুতো আর জামাটা?"

সুনীত ভুলে গেছল। বাবা ও-দুটো হাতে নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। হাত থেকে নেবার সময় সুনীত বলেছিল, "যা বলেছি ভুলে যাও।...আর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করো।"

"স্বাভাবিক!"

সুনীত চেষ্টা করেও অন্ধকারে মুখটা দেখতে পায়নি। রাগ না অভিমান, কী ছিল সেই মুখে?

ভোরের ট্রেনে এত ভিড় হবে ভাবেনি। যখন সে কামরায় ওঠে তখন খালিই ছিল। একটার পর একটা স্টেশন এসেছে আর যাত্রী বেড়েছে। সুনীত কৌতূহল বোধ করল না কারুর মুখের দিকে তাকাতে, বা হকারদের চিৎকারে কান দিতে। জানলা দিয়ে কখনও তাকিয়ে, কখনও চোখ বন্ধ রেখে সে আড়াই ঘণ্টা পর শিয়ালদায় পৌঁছল।

আবার সেই সমস্যা, কোথায় যাব? এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। অন্তত পকেটে যে ক'টা টাকা এখনও আছে তা ফুরিয়ে যাবার আগেই। নিজেকে কপর্দকহীন ভাবতেই সুনীতের বুকের মধ্যে একটি নতুন অনুভূতি কেঁপে উঠল। সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঁকি দিল—আর কখনও কি স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচা সম্ভব?

ট্রামলাইনের কাছে গেট দিয়ে বেরোবার সময় সুনীত দু'ধারে তাকিয়ে পুলিশ আছে কি না দেখল এবং হাসল। ভয় ব্যাপারটাই এমন। বাদল নস্কর আর তার মেয়েকে মনে পড়ল ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে। জীবনে আর বকরিহাটি সে যাবে না। গতদিন বিকেলে যে রেস্টুরেন্টে খেয়েছিল, সেটিতেই ঢুকল। একই জিনিস খেল। ভেবেছিল ছোকরাটি তাকে চিনবে কিন্তু তার ব্যস্ততার মধ্যে চেনাচেনির কোনও লক্ষণ সে পায়নি। সুনীত একমনে খেতে খেতে ভেবে গেছে, এখন কী করবে।

কী করে তারা যাদের কোনও কাজকর্ম নেই। ঘুরে বেড়ায় নয়তো কোথাও আড্ডা দেয়, নয়তো ঘুমোয়। সুনীত ঘোরাঘুরি বা আড্ডা বাতিল করে দিল। বাকি রইল ঘুম। বহুদিন আগে, উমার সঙ্গে সে একটা বাংলা ফিল্ম দেখেছিল। বেকার নায়ক চাকরির খোঁজে হাঁটছে আর হাঁটছে, অফিসে অফিসে ঢুঁ দিচ্ছে আর ম্লান বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে আসছে। অবশেষে কার্জন পার্কে গাছতলায় ক্লান্ত হয়ে বসল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

অফিসযাত্রীদের ভিড় এইবার শুরু হবে। ট্রামগুলোয় বাসের তুলনায় কম ভিড়। হাসপাতালের স্টপে একটা ট্রাম প্রায় পুরো খালি হয়ে যেতেই সুনীত উঠে পড়ল এবং বসার জায়গাও পেল। সে ঠিক করল ট্রামটার টার্মিনাস পর্যন্ত যাবে।

কন্ডাক্টরকে টাকাটা দেবার সময় সে বলল "কোথায় যাবে?"

"পার্ক সার্কাস।"

শোনা মাত্র ধক করে উঠল তার বুক। রুবির ফ্ল্যাট পার্ক সার্কাসেই। ওর কাছে গেলে কেমন হয়! কিন্তু আজ শনিবার, এখন ও অফিসে বেরিয়ে গেছে। যাক, কোথাও অপেক্ষা করব। আজ ও চারটের মধ্যেই ফিরবে।

নভেম্বরের শেষাশেষি, দুপুরের রোদে জাদু আছে। ক'দিন আগের বৃষ্টি পেয়ে ঘাসগুলো তরতর বেড়েছে, পুষ্ট ও সবুজ হয়েছে। পার্কের রেলিংয়ের ধারে গাছের ছায়াটা পেয়ে সুনীত প্যাকেটের উপর মাথা রেখে চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তিন ঘণ্টায় ছায়াটা সরে গিয়ে তাকে রোদের মধ্যে রেখে গেছে।

ঘুম ভাঙতেই সে মুখ ফিরিয়ে রেলিংয়ের মধ্য দিয়ে, বিরাট ফ্ল্যাট বাড়িটার গেটের দিকে তাকাল। ঘড়ি দেখল এবং সময়ের হিসাব করে আবার চোখ বুজল। রুবির ফিরতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক অন্তত বাকি। চারটের মধ্যেই কি ফিরবে? কিংবা না-ও ফিরতে পারে।

কোথায় যেতে পারে? সিনেমা, বাবা-মা'র কাছে, কিংবা ভাল্লুকটার সঙ্গে কোথাও?

কোথাও বলতে তো এই ফ্ল্যাট। দিনের বেলা শ্বেত ভাল্লুক এখানে আসে না, তা ছাড়া ওর আসার দিন ঠিক করাই আছে—বুধ আর শনি। আজ আসবে। ঘড়ি ধরে সাতটায় আসে।

গত রবিবার অপ্রত্যাশিত আচমকা এসে পড়েছিল, তখন সুনীত ছিল ফ্ল্যাটে। পঙ্কজ আচার্য শনিবার সকালের প্লেনে বোম্বাই গেছল, কথা ছিল সোমবার ফিরবে। হঠাৎ রাত সাড়ে ন'টায় কলিংবেল বেজে ওঠে। রুবির ঝি সাধু ছুটে এসে ফিসফিস করে "সাহেব এসেছে", বলার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজ আচার্যের বিরাট দেহটা শোবার ঘরের দরজায় দেখা যায়। সুনীত জামাটা পরে নেওয়ার সময়টুকু পায়নি। তবে রুবির মুখ থেকে স্কচের উষ্ণ রংটুকু বা চোখ থেকে ঔজ্জ্বল্য মুহূর্তে মুছে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

শ্বেত ভাল্লুক দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই টেবিলের উপর স্কচের বোতলটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে। আলমারিতে যতগুলো বোতল বা রেফ্রিজারেটার বা ফোম রাবারের শয্যা, যাবতীয় আরামদ্রব্যই পঙ্কজ আচার্যের অর্থে কেনা। এরপর ওর চোখ পড়ে দেয়ালে টাঙানো ছবিটার উপর। দেয়াল থেকে ঝোলানো পুরু পর্দার আড়ালে রুবির ছবিটা সর্বদাই ঢাকা থাকে। শ্বেত ভাল্লুকের নির্দেশেই ছবিটা আড়াল করা থাকে কেননা একমাত্র তিনি ছাড়া এই ছবি দর্শনের অধিকার আর কাউকে দিতে তিনি রাজি নন।

পর্দা তখন সরানো ছিল। দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে উন্মুক্ত ছবিটার উপর পর্দা টেনে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান রুবির দিকে। ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলে আবার ধীরে ধীরে নামালেন, তারপর সুনীতের দিকে এগোলেন।...এর কয়েক ঘণ্টা পরই হাবা মরে।

সুনীত ঝাঁকড়া নরম ঘাসের উপর দিয়ে একপাক গড়িয়ে আবার চিত হয়ে রইল। মুখের উপর রোদ। মোটরের হর্নের শব্দে তাকাল মাথা তুলে। মোটরেও আসতে পারে রুবি, শ্বেত ভাল্লুক বাড়ি যাবার পথে বহুদিন নামিয়ে দিয়ে গেছে। রংটা দেখে নিয়েই সুনীত আবার চোখ বন্ধ করল, এটা মাখন রঙের নয়।

বেশ কিছু লোক এখন পার্কের ঘাসে গড়াচ্ছে। ঝুড়ি মাথায় একটা লোক পার্কে ঢুকল। নিঃসন্দেহে চিনাবাদামওলা, সুনীত হাত নেড়ে ডাকল। দেখতে পেল না ও।

"অ্যাই, অ্যাই বাদাম।"

চেঁচিয়ে উঠেই তার মনে হল, এটা তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। চারধারে তাকাল। কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না।

"অ্যাই বাদামওলা।"

সুনীত আরও জোরে, প্রায় চিৎকারই করল এবং হাত তুলল। লোকটা ফিরে তাকিয়ে এগিয়ে এল। প্রথমে পঞ্চাশ গ্রাম কিনল। পরিমাণ দেখে আরও পঞ্চাশ গ্রাম। বেশ কিছুটা সময় একটা কিছু নিয়ে তাকে কাটাতে হবে।

এখন সে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। বাদামওলাকে ডাকার জন্য এমন জোরে চিৎকার শেষ কবে সে করেছে। বরাবরই মৃদু, ধীর, নম্র স্বরের লোক হিসাবে সে আলাদা একটা দূরত্ব পেয়ে এসেছে। দূরত্বটার মধ্যে মেশবার বা সাধাবণভাবে কথাবার্তা বলার যত চেষ্টাই সে করেছে, নিজের কাছেই তা কৃত্রিম ঠেকেছে। আবেগ বা অনুভবগুলোকে যদি কান্তির মতো সঙ্গে সঙ্গে কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারত, তা হলে হয়তো সে অনেক সরল জীবনযাপন করত।

খোসা ভেঙে একটি একটি করে বাদামের দানা মুখে দেওয়ার সঙ্গে সুনীত চোখ রেখেছে গেটের দিকে। একটা মোটর স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে। নোংরা দেওয়াল, চওড়া ছোট ছোট ধাপের সিঁড়ি ধরে তিনতলায়। পরপর তিনটি দরজা, শেষেরটি রুবির, বাড়ির পিছন দিকে ওর ফ্ল্যাটটা।

গেটের পাশেই ফোটোগ্রাফারের দোকান। সাইনবোর্ডের অক্ষরগুলো ময়লা। পকেট থেকে চশমাটা বার করে সুনীত চোখে দিল, 'ইউনির্ভাসাল আর্ট...' তারপর আর পড়া যাচ্ছে না। দরজার দু' পাশের শো-কেসে ছবি সাজানো। নানান মুখ। বসা এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো যা হয়ে থাকে। সুনীত দেখতে না পেলেও জানে স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম বা পারিবারিক গ্রুপ ছবিতে কে কেমনভাবে অবস্থান করছে। কৃষ্ণনগরে দাদু, জ্যাঠা, বাবা এবং তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে তেরোজনের একটা ছবি ছিল। বয়স্করা

চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে, দুই উরুর উপর হাত রেখে, সোজা হয়ে বসে। তাদের পায়ের কাছে বাচ্চারা, পিছনে দাঁড়িয়ে যুবকরা। সুনীত ছিল মায়ের কোলে, বয়স তখন চার মাস।

বহুদিন সুনীত চার মাসের শিশুটিকে মন দিয়ে লক্ষ করেছে, তার আকার গঠন এবং বাইরের রূপ থেকে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে, সে কোন কোন জায়গায় এই শিশুটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কোনও মিল খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে যেত।...প্রথম যেদিন রুবির ফ্ল্যাটে সে যায়, ওর শোবার ঘরের দেয়ালে ফাঁক করা পর্দার মাঝে ফ্রেমে বাঁধানো একটা বিভ্রান্তিকর জিনিসের দিকে তার চোখ পড়েছিল।

রুবি মুখ টিপে হেসে বলেছিল, "ওটা কী বলো তো?"

সুনীত চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকে। প্রথমে মনে হয়েছিল শঙ্খের একটা টুকরো তারপর মনে হয় বালিয়াড়ির স্ফীত একটু অংশ। অসহায়ভাবে সুনীত মাথা নাড়তেই রুবি দু'ধারের পর্দা আর একটু সরিয়ে দেয়।

"এবার বলো।"

"বুঝতে পারছি না।"

রুবি আরও ইঞ্চি চারেক সরায়। সুনীত আবার মাথা নাড়ে। তার মনে হচ্ছে ঘোড়ার মসৃণ পিঠ...পাথরে গড়া কোনও ঢালু উপত্যকা যদি উঁচু থেকে দেখা যায়...বা মেঘের অংশ।

পর্দাটা সম্পূর্ণ সরিয়ে, রুবি হাসতে থাকে। এক জানলা থেকে অন্য জানলা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ফুট বিস্তৃত দেওয়ালে ছবিটা সাঁটা। এক রমণী সোফায় উবুড় হয়ে শুয়ে। মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নগ্ন। অন্ধকারের মাঝে পাশ থেকে আসা মৃদু আলোয় দেহটির উপর নরম আলোছায়ার রহস্য। বালিশে ডোবানো মুখ ঘিরে অন্ধকার। তুলির একটা জোরালো টানে যেন কাঁধ থেকে নিতম্বের বহিঃরেখা আঁকা হয়ে আছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা তরল হয়ে গলে পড়েছে আলোর মধ্যে।

রুবি হেসেছিল।

"কে তুলেছে?"

"মিহির। বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করবে বলে দু'বছর আগে একদিন ওর স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে আমার অনেকগুলো ছবি তুলেছিল। তারই একটা এনলার্জ করে, বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে। আমি তো কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। তবে মিহিরকে না বলা খুব কঠিন। ভাল হয়নি?"

সুনীত স্তম্ভিত হয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। ছবির কারিগরি না দেহটি, কার যে প্রশংসা করবে ভেবে পায়নি।

"এ-ভাবে ঢেকে রেখেছ কেন?"

"সবাই দেখুক এটা আমি চাই না।"

"বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হলে, লক্ষ লক্ষ চোখ দেখবে।"

"তারা তো জানবে না ছবিটা কার।"

"তোমার তখন কিছু হচ্ছিল না?"

"কিছু! তুমি বলছ লজ্জাটজ্জা?...নাহ্।"

'নাহ্' ধ্বনিটি খুব স্বাভাবিকভাবেই রুবির মুখ থেকে বেরিয়েছিল। তারপর একটা ইংরেজি ইঞ্জিনিয়ারিং পত্রিকা খুলে বিজ্ঞাপনটা দেখায়...বিরাট একটা যান্ত্রিক হাতুড়ির নীচে দেহটি, যেন থেঁতলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চিন্ত সারল্যে। সুনীত শিউরে উঠেছিল।

"কী ভয়ংকরভাবে ব্যবহার করেছে তোমাকে।"

"মিহির ওই রকমই, এক এক সময় মনস্টার হয়ে যায়।"

'মনস্টার' শব্দটা তা হলে রুবিই মাথায় পুঁতে দিয়েছিল। মিহির এবং বাবা দু'জনেই উত্ত্যক্ত হতে চায় হয়তো জীবন্ত থাকার জন্য। সুনীত ভাবল তাকেও কি উত্ত্যক্ত হতে হবে নাকি। কী ভাবে?

ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসল। খেয়াল করেনি কখন রুবি এসে পড়েছে। গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে খয়েরি সিল্কের শাড়ি পরা একজন, কোমর থেকে নিম্নাঙ্গের সুঠাম চলনেই বোঝা যায় রুবি। ওকে কিছুক্ষণ সময় দিতে হবে। তিনতলায় উঠবে, শোবে বা বসবে, ফ্রিজ থেকে জল বার করে খাবে, আয়নার সামনে দাঁড়াবে তারপর হয়তো স্নান করতে বাথরুমে ঢুকবে। কিন্তু এই ঠান্ডার দিনে কি স্নান করবে?

সুনীত ঠিক করল, মোটামুটি আধ ঘণ্টা সময় রুবিকে দেবে ক্লান্তি ও বিরক্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য।

আধ ঘণ্টা পর সুনীত কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল। একটু সময় নিয়ে দরজার পাল্লা ফাঁক হল। সুনীতকে দেখেই রাধুর মুখটা পাংশু হল এবং দরজার পাল্লা খুলবে কি না, তাই নিয়ে যেন দ্বিধায় পড়ল।

"কে?"

ভিতর থেকে রুবির স্বর ভেসে এল।

"আমি।"

এই দ্বিতীয়বার সুনীত আজ গলার স্বর চড়াল। নিজেই পাল্লাটা ঠেলে, রাধুকে সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। খাবার টেবিলের পাশে রুবি চেয়ারে বসে। টেবিলের উপর যে জিনিসগুলো রয়েছে তাই থেকে সুনীত অনুমান করল মাছের চপ তৈরিতে রুবি ব্যস্ত।

শুকনো হেসে রুবি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। অস্বস্তি বোধ করল সুনীত , তার মনে হচ্ছে এখানে সে অবাঞ্ছিত। রবিবারের পর রুবি নিশ্চয়ই তাই ভাবতে পারে; শ্বেত ভাল্লুক শুধু অফিসেই কর্তা নয়, এই ফ্ল্যাটেও।

"তুমি অফিস যাওনি?"

সুনীতের মনে হল অফিস থেকে ফিরে আধ ঘণ্টার মধ্যেই এমন জাঁকিয়ে খাবার তৈরিতে বসে যাওয়া সম্ভব নয়। নিশ্চয় সে তা হলে অন্য কাউকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেছে। যার শরীরের গড়ন রুবিরই মতো।

"না, ছুটি নিয়েছি। তুমিও তো যাচ্ছ না।"

সুনীত বলতে যাচ্ছিল, 'কে বলল?' নিশ্চয় শ্বেত ভাল্লুকই খবরটা দিয়েছে। ওরা এসেছিল কি না, রুবি সে সম্পর্কে কিছু জানে কি?

"কেউ কি খোঁজখবর করেছে?"

"জানি না।"

"আসার কথা আছে?"

"কেন?"

রুবি তাকে বসতে বলেনি। প্যাকেটটা টেবিলে রেখে সুনীত চেয়ার টেনে বসল। রুবি একবার তাকিয়েই সিদ্ধ আলুর মোড়কে পুর ভরার কাজে মন দিল। সুনীত জবাব দিল না।

রুবি থালাটা ঠেলে সরিয়ে রাখল। কাজ শেষ হয়ে গেছে। সুনীত গুনে দেখল সতেরোটি চপ। শ্বেত ভাল্লুক অন্তত গোটা দশেক খাবে।

"কেন?"

"চাকরি ছেড়ে দেব।"

রুবি ভ্রূ কোঁচকাল তারপর হাসল। হাতঘড়ি দেখে আবার ভ্রূ কোঁচকাল।

"ব্যস্ত? কেউ আসবে?"

'নাহ্, প্যাকেটে কী আছে?"

"জামা আর জুতো।"

"কোথাও যাচ্ছ নাকি! এটা কী গায়ে পরেছ?"

"রবিবার থেকে আমি বাড়ি যাইনি।"

অবাক চোখে রুবি তাকাবে এটা সে ধরেই রেখেছিল। কিন্তু এতটা রুক্ষতা ফুটে উঠবে ভাবেনি।

"কেন যাওনি?"

না যাওয়ার কারণটা সুনীত বলতে পারল না। তার মনে হচ্ছে, সহ্যক্ষমতার কিনারে এখন সে পৌঁছেছে। খুন করেছে শুনলে, রুবির হৃদয়ের দরজাগুলো অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাবে। এখন কিছু একটা অবলম্বন তার চাই যেটা ধরে সে খাড়া থাকতে পারে। তার মস্তিষ্ককে সজাগ ও সক্রিয় রাখা দরকার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে, জেলে যাবে না নিজের পরিচয় ঘুচিয়ে কোথাও নিজেকে গোপন করে রাখবে?

"কোথায় ছিলে তা হলে এই ক'দিন?"

"রাস্তায়। ভাবছি কোথাও চলে যাব।"

"বউকে সঙ্গে নিয়ে?"
"না, একাই।"
"চাকরি ঠিক করে ফেলেছ?"
"না।"
"তবে?"

সুনীত মুখ নিচু করে, থালায় সাজানো চপগুলো আবার গুনল। এগুলো ভাজা হলে রং কেমন হবে? শ্বেত ভাল্লুকের তালুর রঙের মতো কি? সুনীতের চোখের সামনে ডান হাতের তালুটা উঠেছিল এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার বাঁ-গালের উপর বিস্ফোরিত হয়েছিল। সে ছিটকেই পড়ত, যদি স্টিল আলমারিটা আর এক হাত দূরে থাকত। বিশ্রী একটা শব্দ হয়েছিল আলমারির গায়ে আছড়ে পড়ার। আশ্চর্য, চশমাটা কিন্তু নাকের উপরই ছিল ওই প্রচণ্ড ধাক্কা সত্ত্বেও। পঙ্কজ আচার্যের মার্জিত শিক্ষিত সুসভ্য মুখটা থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসছিল অনিয়ন্ত্রিত হিংসা এবং আবেগ। যখন দু'হাতের থাবায় তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিল তখন ওই বিশাল দেহের কাছে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়েছিল। দেহের আকার একটা বড় ব্যাপার! রুবির সামনে অপমানিত, নিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সুনীতের তখন মনে হয়েছিল, এই লোকটা নির্ভরতা পাবার জন্য একটা দখল চায়।

সেই দখলে সে হাত বাড়িয়েছিল। তার কয়েক ঘণ্টা পর হাবাও দখলচ্যুত হতে চায়নি। কিন্তু কী ভাগ্য বেচারার। পঙ্কজ আচার্য দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, "থিফ...ইউ ব্লাডি থিফ।" হাবাও নিশ্চয় কিছু একটা বলেছিল।

"ভাবছি নতুন করে জীবন শুরু করব।"

"সেটা কী ব্যাপার? জীবনটা পুরনো হল কবে?"

কী করে একে বোঝাব জীবনে কী ঘটে গেছে। সুনীত ফাঁপরে পড়ে চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে হাতে নিল। রুবি লক্ষ করেছে একটা কাচ নেই কিন্তু কিছু বলল না।

"এ-সব আলোচনা এখন থাক।"

"সেই ভাল।...বলো কী জন্য এসেছ।"

"এমনিই, কেন আমি কি অকারণে আসতে পারি না?"

চোখে চোখ রেখে পরস্পরকে যেন মেপে নিচ্ছে, এমনভাবে ওরা তাকিয়ে রইল। কে প্রথম চোখ সরাবে।

সুনীতই সরাল। রুবির চোখে অনাগ্রহ এবং প্রত্যাখ্যান লুকোনো নেই। সুনীত ধীরে মুখটা ফিরিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকাল। দরজার পর্দাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। তার মনে হল কী যেন একটা সে দেখতে পাচ্ছে না। চশমাটা পরল। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের দেওয়ালটা দেখা যাচ্ছে। ছবিটা নেই।

সুনীত তাকাল রুবির মুখের দিকে। রুবি দ্রুত মুখ ফিরিয়ে থালাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'রাধু, এগুলো নিয়ে যা তো।"

রুবি শোবার ঘরের দিকে যেতে গিয়েও থমকে ফিরে এসে, টেবিলে এক হাতের ভরে শরীর রেখে ঝুঁকে পড়ল।

"আর তুমি এসো না। আমাকে ভুলে যাও...পারবে, অনায়াসেই পারবে, খুব ছেঁদো শোনালেও ভুলে যাওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয়...আমার অসুবিধে আছে, সুনীত খুব অসুবিধে আছে। খেয়েপরে বেঁচে থাকাটাই সব থেকে বড় ব্যাপার...ভালবাসা, আত্মা, স্বাধীনতা এ-সব নিয়ে এখন আর কিছু বোলো না।"

রুবির কাঁধ, ঘাড়, গলা বা ব্লাউজের স্ফীতি সুনীতকে আর উত্ত্যক্ত করছে না। এখন ভয় তাকে গ্রাস করতে এঁকেবেঁকে উঠে আসছে শিরদাঁড়া বেয়ে। রুবির প্রথম চুম্বনের সময় সে এই অনুভবই পেয়েছিল। মনে হচ্ছিল রুবি শুষে নিচ্ছে তার মস্তিষ্ক। বাস্তব বোধ এবং যুক্তি সে বোধহয় আর ফিরে পাবে না।

"চাকরিটা আমি হারাতে পারব না, কিছুতেই পারি না। তুমি তো জানো, বাবা-মা ভাই বোন, আটজনের সংসার আমাকেই দেখতে হয়। আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার জন্য ওদের তো বিপন্ন করতে পারি না, পারি?"

রুবির কণ্ঠস্বর শুকনো, আবেগবর্জিত। নিশ্চয় এই ক'দিন ধরে ও ভেবেছে, সিদ্ধান্তে এসেছে। সুনীত ভাবল, তা হলে আমার কী সিদ্ধান্ত!

"কেন পারা যায় না? বাঁচাটাই যদি বড় কথা হয় তা হলে চুটিয়ে বাঁচো। আমাদের জীবনের মাপ খুবই ছোট, তার অর্ধেকেই তো কেটে গেল। বলদের মতো আর কেন অন্যদের ভার বওয়া। ঝুঁকি নাও, আধপেটা শরীরকে পুষিয়ে দেবে তোমার মনের...।"

রুবি হাত তুলেছে। হাতটা টেবিলে আছড়ে নামাল। বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকানো। কণ্ঠস্বরে তিক্ততা।

"তুমি যে এইসব বলবে মোটামুটি তা আমি জানি।...প্লিজ সুনীত তর্কাতর্কি নয়। অভাব আর খিদে কী জিনিস তা তুমি জানো না।"

"তা হলে...।"

"চাকরি ছাড়ার পাগলামি কোরো না, এত টাকা মাইনের চাকরি কোথাও পাবে না। ঘরে বউ আছে, দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে এটা মনে রেখো।"

সুনীত উঠে দাঁড়াল। এবার তাকে যেতে হবে, কিন্তু কোথায়? সোজা থানায় গিয়ে ওদের চমকে দিয়ে কি বলবে, "আত্মসমর্পণ করতে এসেছি...আর পারলাম না, কোথাও জায়গা নেই।"

রুবির ছবিটা তার দেখতে ইচ্ছে করল। কিন্তু দেয়ালে নেই। কেন খুলে ফেলল, ব্যাপার কী!

"আমি চলে যাবার পর, কিছু কি হয়েছিল তোমার সঙ্গে?"

"না।"

"ছবিটা কোথায়?"

"ঘরেই আছে।"

এত অনিচ্ছুক ক্লান্ত উদাসীন স্বর কেন!

সুনীত এগিয়ে এসে পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে তাকাল। সামনে নেই, ডাইনে বামে দেওয়ালেও নেই, তার গা ঘেঁষে দরজার পাশেই প্রায় একমানুষ লম্বা...চমকে এক পা পিছিয়ে এল সে।

স্মিত হাসি ভরা মুখে পঙ্কাজ আচার্য তাকিয়ে। বিরাট শরীরটা বারান্দার রেলিংয়ে হেলিয়ে রাখা। পিছনে ময়দানের কয়েকটা গাছ এবং তার পিছনে আকাশ। ঊর্ধ্বমূল নয়, লোকটি যেন হাজার বছরের একটি কাণ্ড। ওরই পাতাবিহীন শাখাপ্রশাখাগুলো, সুনীতের সন্দেহ হল, বোধহয় তার নিজের শরীরের মধ্যেই বিছিয়ে আছে। ফটোটার দিকে মুখ তুলে সে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মধ্যে তীব্র কটু একটা গাছের গন্ধ পেল। নিজের বাহুতে হাত বুলোল—কর্কশ রুক্ষ পুরু ছাল!

এখন যদি আকাশমুখো হাত তুলি, সুনীত ভাবল, তা হলে কি বাওবাব হয়ে যাব?

ছয়

গুণেন ভবনের দক্ষিণ ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে একতলা বাড়িটা। তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে এখন অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, পুব দিকে পাঁচিলের খানিকটা খোলা লরিতে মাল আনার জন্য। বাড়ির পিছন দিকে পশ্চিমে ফুটবল মাঠটা। এই বাড়ির পরই বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা সদ্য তৈরি বাড়ি আর অপেক্ষায় আছে ঝোপঝাপ ভরা প্লট। তারপর অযত্ন অবহেলায় ক্ষতবিক্ষত একটা পিচ ও পাথরকুচির রাস্তা যেটা এঁকেবেঁকে সি আই টি রোডে পড়েছে। গুণেন ভবনের দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটগুলো থেকে বিস্তীর্ণ জমি এবং গাছপালা দেখা যায়। দক্ষিণের ঘরগুলোয় এত হাওয়া যে হালকা ছবি দেয়াল থেকে পড়ে যায়। অধিকাংশ সময় জানলা বন্ধ রাখতে হয় হাওয়ার উৎপাতে।

মশারা ছেঁকে ধরেছে সুনীতকে। শব্দ না করে সে ঘাড়ে চাপড় দিল। তালুতে আঙুল ঘষে ভিজে ভিজে নরম একটা জিনিস অনুভব করল। এই নিয়ে বোধহয় এগারোটা। ঠান্ডায় আড়ষ্ট শরীরে মশার কামড়ের জ্বলুনি কমই লাগে।

মুখ তুলে তাকাল সে। গুণেন ভবন অন্ধকার। জানলাগুলো বন্ধ। গোলাপবাগান রোডের দিকে রাস্তায় আলো জ্বলছে না। সি আই টি রোডের আলো জ্বলছে। পরিষ্কার আকাশে ঝকঝকে তারাগুলোর

জন্য অন্ধকারটা পাতলা হয়ে সুনীতকে সাহায্য করছে তার চারপাশের জিনিসগুলোকে দেখতে।

সে বসে আছে সারিবদ্ধ ইটের মাঝে একটা তক্তার উপর ইটে ঠেস দিয়ে। হাত কয়েক দূরে ইট ভেজাবার চৌবাচ্চা। বৃষ্টির জল জমে আছে বোঝা যায় তারার আলোর প্রতিবিম্ব থেকে। বাঁশ আর তক্তা এবং ভাঙা ইট ইতস্তত ছড়ানো। বহুবার তার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করেছে, কিন্তু পকেটে হাত দিয়েও বার করতে ভরসা পায়নি। অন্ধকারে বহু দূর থেকে আগুনের ফোঁটা দেখা যায়।

সে ঠিক করে ফেলেছে কীভাবে কাজটা করবে। পাঁচিলটা টপকে গুণেন ভবনের গা ঘেঁষে নামতে হবে। গলা সমান উঁচু পাঁচিল। সে এটুকু জানে, দু' হাতের চাড় দিয়ে নিজেকে টেনে তোলার মতো জোর শরীরে নেই। ব্যায়াম না করলে এটা সম্ভব নয় এবং কোনওদিনই সে করেনি। কিছু ইট পাঁচিলের কাছে নিয়ে গিয়ে ধাপ বানাতে হবে।

সুনীত নড়েচড়ে বসল। বার কয়েক দাড়িতে তালু ঘষল। সিগারেট কেনার সময় দোকানটার আয়নায় মুখ দেখেছিল। কামিয়ে ফেলবে কি না ভেবেছিল। তারপর ঠিক করে থাকুক। দাড়িটা সাত দিনে এমন কিছু বড় হয়নি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে বরং ব্যক্তিত্ব বদলে সাহায্যই করছে। জামা এবং চটিই বরং বেমানান লাগছে দাড়ির সঙ্গে।

পকেটে ছিল প্রায় এগারো টাকা। এগুলো রেখে দেবার কোনও যুক্তি সে পেল না। উমা খুশি হবে টাকাটা পেলে। সঙ্গে সঙ্গে মাটির ঘটের মধ্যে ফেলবে নোটগুলো ভাঁজ করে করে। তারপর একদিন ঘটটা ভেঙে রেজগি আর নোটগুলো গুনতে বসবে ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাবার আগে।

শেষবারের মতো কী খাওয়া যায়, যা আর সম্ভব হবে না। সুনীতের বহু রকম খাদ্যের কথা মনে পড়ে এবং ভেবে দেখে আশ্চর্য হয় সব খাবারই সে উমাকে দিয়ে আনাতে বা তৈরি করিয়ে নিতে পারে। তবে মদ আনানো সম্ভব নয় এবং এখন তার কাছে মদ খাওয়ার মতো টাকাও নেই বা থাকলেও সে খাবে না। তখন সে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে আটটা রাজভোগ খায়। খেতে কোনও রকম অসুবিধা বোধ করেনি।

দোকান থেকে বেরিয়ে সে এক কনস্টেবলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, গোলাপবাগান রোড কোনদিক দিয়ে যাবে? লোকটি কিছুক্ষণ ভেবে বলেছিল, জানে না। তার ইচ্ছা হয়েছিল তর্ক করতে, মানিকতলার মোড়ে দাঁড়ানো পুলিশ কেন বলতে পারবে না? গোলাপবাগান রোড বেশি দূরে নয়, তা ছাড়া বোমা, ছোরা, খুনের জন্যও রাস্তাটার খ্যাতি আছে। কিন্তু কথা না বাড়িয়ে সুনীত সরে যায়। নিশ্চিন্ত হয়, তার ফটো এই লোকটা দেখেনি বা তার পোশাক ও দৈহিক বিশেষত্বগুলি জানিয়ে সুনীত মুখার্জিকে দখলেই পাকড়াও করার নির্দেশ একে দেওয়া হয়নি। হয়তো পুলিশবাহিনীর কাউকেই দেওয়া হয়নি কিংবা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই কনস্টেবলটি বোকা ধরনের কিংবা কর্মতৎপর হওয়ার কোনও ইচ্ছা এর নেই।

সিনেমা-বাড়ির গেটের লাগোয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এক থুড়থুড়ে বুড়ি বসেছিল আলোর নীচেই। ডান হাতটি জমির উপর পেতে রাখা, তালুতে একটি পাঁচ পয়সা। বুড়ি মুখ তুলে ঘোলাটে চোখদুটিও পেতে রেখেছে পথচারীদের মুখে। সুনীত থমকে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঢোকায়। বাকি পয়সা একেই দিয়ে যাবে। বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হয় এইরকম চোখ সে আগে দেখেছে। ধীরে ধীরে তার মনে পড়ে বহু বছর আগে, প্রায় তেরো-চোদ্দো বছর হবে, এই সিনেমা হলেই উমার সঙ্গে একটা হিন্দি ফিল্ম দেখেছিল। গল্পটাও তার মনে পড়ছে, এমনকী কোন সিটে তারা বসেছিল তা-ও। সেই ফিল্মে ঠিক এইরকম এক বুড়ি ভিখারিকে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য দেখা গেছল। তারপর আরও খুঁটিনাটি তার মনে ভেসে ওঠে—সিনেমা হল থেকে ম্যাটিনি শো দেখে যখন তারা বেরোয় তখন রোদের ঝাঁঝ কেমন ছিল, আকাশের রং কী ছিল, দু'জনে একটা দোকানে চা খায়, দোকানটার নাম বিষ্ণু কেবিন।

আর একটু চেষ্টা করলে সে মাস, সপ্তাহ এমনকী বার-এর নামও মনে করতে পারে। এই সিনেমা হলটার সামনে দিয়েই সে প্রতিদিন অফিসে যাতায়াত করে কিন্তু কখনও তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠেনি। তারা দু'জনে আর কখনও এই হলে সিনেমা দেখেনি। তার আফসোস হল, মনের এই প্রাঞ্জলতা, তৎপরতা দেখার মতো কেউ এখন সঙ্গে নেই। ফটোগ্রাফি মাফিক পুঙ্খানুপুঙ্খতায় তার স্মৃতি এখন

কাজ করছে। কাহিনীর ক্ষুধার্ত নায়ক গোগ্রাসে যখন একটা পাঁউরুটি খাচ্ছিল তখন এক বুড়ি ভিখারি জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে। নায়ক তক্ষুনি আধখাওয়া রুটিটা তার হাতে দিয়ে চলে যায়।

পকেটে বাকি যা ছিল, প্রায় সাড়ে তিন টাকা, সুনীত ওই বুড়ির তালুর উপর রাখে। তালুটা সঙ্গে সঙ্গে মুড়ে ফেলে ঘড়ঘড় শব্দে সে কিছু একটা বলে। সুনীত বুঝে যায়, বুড়ি জানে না কত পয়সা এখন তার মুঠোয় রয়েছে।

বুড়িকে রেখে সে হেঁটেছিল। পরে তার মনে হয় বুড়িকে না দিয়ে ওই পয়সায় রাত্রির শো-এ সিনেমা দেখলে সময় অনেকখানি কাবার করা যেত। সুনীত ভেবে রেখেছিল, জামা এবং চটি ত্যাগ করবে। যা পরে গত রবিবারে বেরিয়েছিল তাই পরেই ফিরবে।

জামা ও চটি জলের মধ্যে ফেলে দেওয়াই নিরাপদ। রেললাইনের ধারে টানা একটা খালের কথা তার মনে পড়ে। কিন্তু রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে মানুষ দেখলে রেলরক্ষী পুলিশ যদি চ্যালেঞ্জ করে? এই ভেবে সে রেললাইনের বাঁধের তলা থেকেই ফিরে এসেছে।

সুনীত এখন ভাবল জামা এবং চটি ইট ভেজানোর চৌবাচ্চাটায় ডুবিয়ে রাখলে কেমন হয়! মিস্ত্রি মজুরদের মধ্যে যে প্রথম দেখবে তারই লাভ হবে। কাগজের মোড়ক খুলে সে নীল বুশশার্ট ও পাম্প শু বার করে পরে নিল এবং পরিত্যক্ত জিনিস দুটি চৌবাচ্চায় ফেলে দিল। তারপর গোটাদশেক ইট বয়ে নিয়ে গেল পাঁচিলের তলায়।

পাঁচিল টপকাতে খুব অসুবিধা হল না। অপর দিকের জমিতে পা রাখার পর সুনীতের দুটো কনুই জ্বালা করতে শুরু করেছে। পাঁচিল থেকে লাফ দিলে, কনুই ঘষড়ে ঝুলে নামার দরকার হত না। কিন্তু লাফ দেবার মতো জোর, সে জানে, তার হাঁটুতে নেই।

সে ভেবেই রেখেছে এবার কী করবে। ডান দিকে গুণেন ভবন, বাঁ দিকে মাঠ এবং সর্বত্র অন্ধকার। এখন শেষরাত, ঘুম এখন গাঢ়তম। কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া। ভিতরের আলো নেভানো। সুনীতের মনে হল তার জন্য যেন পরিবেশটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চাবিটা সাত দিন ধরে তার পকেটে। তালা খুলে, একটি মানুষ গলে যাবার মতো ফাঁক করল। ভিতরে এসে গেট বন্ধ করে তালা দিল। চরিত্তর সিং ভোরবেলায় গেটের তালা খোলা দেখে যেন অবাক না হয়। অবাক হওয়ার কারণটা খুঁজে পাওয়ার বাতিক অনেক মানুষেরই থাকে।

সে ভেবেই রেখেছে এরপর কী করবে। উঠোনে সিমেন্টের ঢাকা ট্যাঙ্কটায় এবার উঠতে হবে। ট্যাঙ্কের তলা পরিষ্কার করতে ভিতরে নামার জন্য এর উপর উঠতে হয় এবং ওঠার জন্য চারধাপ পাকা সিঁড়ি আছে। সেখান থেকে, সে যাকে 'ব্রিজ' বলে, সেই চারগজ লম্বা দোতলার বারান্দাটায় পৌঁছতে হবে দেয়ালের খাঁজে পা রেখে, পাইপ ধরে। বারান্দাটাকে সে 'ব্রিজ' বলে যেহেতু কলঘর পায়খানা তাদের ফ্ল্যাট থেকে একটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন এবং খোলা বারান্দাটার দ্বারা যুক্ত। প্রত্যেক ফ্ল্যাটেরই এই 'ব্রিজ' রয়েছে চারতলা পর্যন্ত থাক দিয়ে।

উমা বলেছিল, খোলা বারান্দা দিয়ে কলঘরে যাওয়া-আসাটা অশ্লীল ঠেকে। সুনীত মিস্ত্রি এনে বারান্দার কোমর সমান পাঁচিলের উপর কাঠের ফ্রেম বসিয়ে তাতে ত্রিপল লাগিয়ে দেয়। রোদ, বৃষ্টি, বাতাস প্রভৃতি কালক্রমে জীর্ণ করে দেওয়ায় এখন ত্রিপলের সবটাই খসে গেছে, ফ্রেমের কাঠও খুলে গেছে দু'-তিন জায়গায়।

বহুবার মাঝরাতে কলঘরে আসার জন্য দরজা খুলে সুনীত দাঁড়িয়ে থেকেছে। কেন যেন তার মনে হত, কেউ হয়তো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। বুকটা কেঁপে উঠত। যদি চোর এসে লুকিয়ে থাকে! বারান্দা দিয়ে কেউ এলেই মাথায় ডান্ডা মেরে অজ্ঞান করে, ফ্ল্যাটে ঢোকার জন্য হয়তো অপেক্ষা করছে। তখন সে ভাবত, চোরটা কীভাবে আসতে পারে? সেই ভাবনা থেকেই সে বারান্দায় উঠে আসার ঘাঁতঘোঁতগুলো বার করে ফেলে।

সুনীত খসে যাওয়া ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে বারান্দায় উঠে এল। চমৎকারভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে এ পর্যন্ত সে প্রতিটি কাজ করেছে, চরিত্তরের ঘরটা ট্যাঙ্কের পাশেই, ভয় ছিল যদি শব্দটব্দ হয়।

কেউ দেখেনি, কারুরই ঘুম ভাঙেনি এই শীতের ভোর রাতে। কিন্তু সুনীত ঘামছে। কনুই দুটো জ্বালা করছে ঘাম গড়িয়ে নামায়। এবার সব থেকে কঠিন অংশটা বাকি। তাকে অপেক্ষা করতে হবে। ভোরের

আলো ফুটলেই আর এই ব্রিজের উপর অপেক্ষা করা চলবে না। 'বি' ব্লকের কেউ দেখে ফেলতে পারে বিশেষত কান্তির ফ্ল্যাট থেকে।

প্রথমে ওঠে সুবল। দরজার খিল খুলে সে পেচ্ছাব করতে আসবে। কিন্তু কোথায় করতে আসবে, কলঘরে যে নর্দমাটা আছে সেখানে না পায়খানায়? সুনীত এইবার দিশাহারা হল। সুবল এতদিন কোথায় পেচ্ছাব করে আসছে এই তথ্যটা তার জানা নেই। যদি কলঘরে যায় তা হলে সে পায়খানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকবে। কাজ সেরে ফেরার পর ও বারান্দার দরজাটা বন্ধ করবে না। যতক্ষণ না দুধ আনার জন্য ফ্ল্যাট থেকে বেরোবে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সুবল খুঁতখুঁতে সাবধানী লোক।

পায়খানা ও কলঘর পাশাপাশি। সুনীতের মনে হল কলঘরে গিয়ে এবার সে সিগারেট খেতে পারে। আকাশে তাকিয়ে বুঝল আর কিছু পরেই ভোর হবে। পরপর লরি চলার শব্দ এবার শুরু হয়েছে। উপরের ফ্ল্যাটে কাশতে কাশতে কে দরজা খুলল কলঘরে যাবার জন্য। কাছাকাছি একটা বাড়ির ছাদে পোলট্রি আছে। একটা মোরগ কয়েকবার ডেকে উঠল।

সুনীত সিগারেট ধরিয়ে প্রথম টান দিয়েই নিভিয়ে ফেলল। এতটা অসাবধানী সে কী করে হল। সিগারেটের গন্ধে কলঘর ভরে থাকলে সুবল কি চমকে উঠবে না?

এইবার থেকে তাকে সাবধানে, হিসেব করে প্রতিটি মুহূর্ত চলতে হবে। একটি ভুল করলেই সে ফাঁস হয়ে যাবে। বন্ধ, সংকুচিত, গতিহীন জীবন, তার সঙ্গে উদ্বেগ আর ভয় এবার থেকে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। সুনীত বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবী তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে। চৌবাচ্চার পাড়ে বসে দু'হাতে সে মুখ ঢাকল।

দরজা খোলার শব্দ হয়েছে।

সুনীত ভেবে পাচ্ছে না কোথায় লুকোবে। সময় নেই ভাববার। যা থাকে বরাতে...সে প্রায় লাফিয়ে পায়খানায় ঢুকে দরজার পাল্লা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিল।

সুবলের পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। সদ্য ঘুমভাঙা মানুষের অনিশ্চিত মন্থর পদক্ষেপ। জড়ানো গলায় কী যেন বিড়বিড় করল। কলঘরে বালতি সরাবার শব্দ। সুনীত উৎকর্ণ হয়ে রইল এবার আর একটা শব্দ শোনার জন্য এবং তা পেতেই বুকের মধ্যে জমে ওঠা বাতাস আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল।

জল ঢেলে সুবল বারান্দা দিয়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে ফিরে গেল। নীচে খড়মের শব্দ হচ্ছে, চরিত্তর উঠেছে। গেটের তালা খুলে বাইরে যাবে, দাঁতন করবে। পাল্লা ফাঁক করে সুনীত তাকিয়ে দেখল গুণেন ভবনের দেওয়ালে, জানলায় এবং সিমেন্টের উঠোনে ভোরের ফিকে আলো হালকাভাবে পড়েছে। কুয়াশার মধ্য থেকে যেন বাড়িটা ফুটে উঠছে। সুবল আলো জ্বেলেছে দালানের। ওর ছায়াটার চলাফেরা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় দালানের জানলা দুটোও খুলেছে।

সুবল দালান ঝাঁট দিল। বালতি নিয়ে কলঘরে এল এবং জল নিয়ে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে বেরোবার জন্য দরজা খুলল। ফ্ল্যাট অরক্ষিত যেহেতু উমা এখনও ঘর থেকে বেরোয়নি সুতরাং বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে দুধ আনতে যাবে। সুনীত পায়খানা থেকে বেরিয়ে হাঁটু ভেঙে, কুঁজো হয়ে, দেয়াল ঘেঁষে নীচের দিকে তাকাল। সিঁড়ির শেষ তিনটে ধাপ এখান থেকে দেখা যায়। ওই ধাপ'ক'টা দিয়ে সুবলের পাজোড়া নেমে যাবার পরই সে একটা নিশ্চিন্তির মধ্যে এবার আশ্রয় নিতে পারবে। চারপাশে দেয়াল, মাথায় ছাদ এবং প্রয়োজন মেটাবার জিনিসগুলো অন্তত পাবে।

উমা নিশ্চয় এখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। ও কি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। সুনীত কোনওদিন তা দেখেনি কিন্তু এখন সে নেই বলে যদি খিল দেয়! ভাবতে গিয়ে সে বিরক্ত হল। বুড়ো সুবল ছাড়া চড়াও হবার মতো আর কে আছে এই ফ্ল্যাটে।

হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা, সুবলের লিকলিকে পা দুটি দেখামাত্র সুনীত প্রায় ছুটেই বারান্দা অতিক্রম করে দালানে এল। আলো জ্বলছে, জানলা দুটো খোলা। সুনীত ঝপ করে বসে পড়ল। পর্দা ঝুলছে বটে কিন্তু জানলার সবটা ঢাকা নেই। কান্তির বউ খুব ভোরে রান্নাঘরে এসে উনুন ধরাবার তোড়জোড় শুরু করে। সেখান থেকে এই দালান দেখা যায়।

শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে যাওয়ার সময় তার মনে হল, জুতো পরে বারান্দা দিয়ে ছুটে আসাটা বোকার মতো কাজ হয়েছে। হামাগুড়ি দেওয়া উচিত ছিল। মৃদু আলোর

মধ্যে, দুই তিন কি চার সেকেন্ডের জন্য হলেও, একজন ছুটে গেল, এবং তা যদি কেউ ঘুমভাঙা চোখে দেখে থাকে তা হলে সেটা গল্প করার মতো বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

দরজায় চাপ দিতেই খুলে গেল। ঘর অন্ধকার, জানলাগুলো বন্ধ। ঘুমন্ত মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই অন্ধকারে উমাকে গায়ে হাত দিয়ে জাগালে ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসবে এবং চিৎকার করতে পারে। আলো জ্বেলে নিলে? ঘুমভাঙা অসাড় অসংলগ্ন চেতনায়, একটা সাত দিনের দাড়িওলা, উসকোখুসকো চুলভরা মুখ যদি হঠাৎ ছায়া ফেলে তা হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে? তার থেকে বরং স্বাভাবিক ওর ঘুমভাঙার জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকতে পারে। এটা তার নিজের ঘর।

ঘরের কোথায় কোন জিনিস সে জানে, অবশ্য এই সাত দিনে যদি উমা অদলবদল করে না থাকে। সন্তর্পণে জানলার পাল্লা সে একটু ফাঁক করল। কোমল আলোর ভাপ ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে অন্ধকারকে ঠেলে সরাতে পারল না। কাত হয়ে কুঁকড়ে থাকা উমাকে সে বুঝতে পারছে।

সুনীত বিছানার কাছে এগিয়ে এল। সাবধানে খাটে বসল। প্রায় অসহায় সরল ঘুমন্ত মুখখানি ঘিরে কালোচুলের রাশ। ঘুমের গভীরে নেমে প্রশান্তির মধ্যে উমা এখন অবগাহনে ব্যস্ত। ব্লাউজের উপরের বোতাম দুটি খোলা, রাত্রে শোবার আগে ও ব্রেশিয়ার খুলে রাখে।

মনে পড়ছে না তার, এতখানি বয়সেও সে এমন অসামান্য বিমোহনকারী কোনও দৃশ্যের সম্মুখীন হয়েছে। হয়তো দিনের এই প্রথম আলোর মায়া কিংবা আশ্রয় লাভের স্বস্তি তাকে মুগ্ধ হতে সাহায্য করছে। শূন্য থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসা তুলোর আঁশের মতো সন্তর্পণ কোমলতা এখন উমার সারা অবয়বে। নীচের ঠোঁট আলগা হয়ে নেমে রয়েছে। অভিমানীব মতো। ওর কাঁধ, বালিশ চাপা গাল, ভুরু, চোখেব পাতা সে আজই প্রথম খুঁটিয়ে লক্ষ করতে করতে আবিষ্কার করল, উমা একটি শিশু। পুতুল বুকে জড়িয়ে এইভাবে ওরা ঘুমোয়।

রুবির ছবিটা তার মনে পড়ছে। সুপরিণত একটি রেখা, এক টানে কাঁধ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত আঁকা। তাকিয়ে থাকলে প্রগাঢ় ইচ্ছার বাষ্পে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। চাপ চাপ বলিষ্ঠ মাংস রেখাটির তলায় ছড়িয়ে রাখা। রুবি আলাদা, এমন মৃদু কোমলতা ওর মধ্যে নেই। সুনীত নিচু হয়ে উমার দিকে হাত বাড়িয়ে কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল। একটা ক্ষীণ কম্পন উমার শরীর দিয়ে বয়ে গেল; যেন এই স্পর্শ পথ কেটে ওর স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করল।

কাঁধ থেকে আঙুলগুলো ধীরে ধীরে সে নিয়ে গেল ব্লাউজে। মমতা শব্দটি সুনীত বহুকাল শোনেনি, নিজেও ব্যবহার করেনি, এমনকী চিন্তায়ও। অথচ মমতাভরেই সে উমার উন্মুক্ত স্তনে হাত রাখল। নাতিউষ্ণ এবং ভারী বোধ করল সে মুঠোর মধ্যে। উমা ঈষৎ চমকে উঠল এবং মোমের আলোর ক্রমশ বিস্তারের মতো একটা চাপা স্নিগ্ধ হাসি ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

কেন যে এমন ইচ্ছা তার হল সুনীত তার কোনও ব্যাখ্যা বা অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করল না। বিছানা থেকে উঠে সে জানলার ধারে দাঁড়াল। ফাঁকটুকু দিয়ে সে ফুটবল মাঠ, গোলাপবাগান রোড, কিছু পথিক এবং বাড়ি দেখতে পাচ্ছে। ধীর বাতাসের ছোঁয়া, রৌদ্রের এবং কোলাহলের প্রস্ফুটন অনুভব করছে। সে একটি জিনিস সম্পর্কে নিশ্চিত সারাজীবনে নিজেকে কখনও তার এত বিশুদ্ধ মনে হয়নি।

উমা আড়মোড়া ভাঙার সঙ্গে 'উ উ উ উ' শব্দ করতেই সুনীত ফিরে তাকাল। দু' হাত মুঠো করে মাথার উপর তুলে চোখ পিটপিট করছে।

"ক'টা বাজে,...সুবল কি এখনও চা দিয়ে...।"

সুনীত যে-জন্য অপেক্ষা করছে এইবার তা ঘটতে যাচ্ছে। উমার চোখ বিস্ময়ে বড় হচ্ছে, মুখগহ্বর বড় হচ্ছে।

"না।"

সুনীত চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করল, হাত তুলে। ভয়ে, উমা নিজের মুখ চেপে ধরল।

বাইরে দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ হতেই সুনীত ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে খিল দিল।

"জোরে কথা বলবে না।"

উমা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে।

"যা কিছু বলার পরে বলব, এখন প্রশ্ন কোরো না। শোনো, আমি এখানে থাকব...তুমি ছাড়া কাকপক্ষীতেও যেন তা জানতে না পারে, সুবলও নয়। জানাজানি হলে আমি শেষ, সেই সঙ্গে তুমিও।"

"কেন?"

"আমাকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখার জন্য!"

"কেন, কেন তুমি লুকোবে? তুমিই কি...।"

"হ্যাঁ, আমিই। অবাক হওয়ারই কথা, কিন্তু ও-সব পরে হবে আপাতত যা বললাম মনে রেখো...কেউ টের যেন ঘুণাক্ষরেও না পায়। মনে থাকবে?"

সুনীতের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে চাপা একটা হুমকি তার নিজের কানেই বাজল। এটা সে চায়নি কিন্তু বিনা প্রয়াসেই ওটা গলায় এসে গেছে। সে বুঝতে পারছে ভয় তার সঙ্গ ছাড়েনি। এতক্ষণ অনুসরণ করে এসেছে, এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

উমা ঘাড় নাড়ল।

কী বুঝল ও? এবার তাকে কীভাবে গ্রহণ করবে, কীভাবে মানিয়ে নেবে এই পরিস্থিতি।

"বউদি উঠেছ? চা দোব?"

দরজায় তিন-চারটে টোকা পড়ল।

"হ্যাঁ...দাও, যাচ্ছি।"

উমার স্বর যান্ত্রিক। এখনও সে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে ওঠেনি। সুনীত ট্রানজিস্টারের চাবি ঘোরাল। কোনও এক মহাপুরুষের বাণী পাঠ করা হচ্ছে। একটা শব্দের জটলা এখন দরকার যাতে তাদের কথোপকথন ডুবে যায়। সে আলনাটা টেনে ভিতরের ঘরের দরজাটা খুলতে গিয়ে ভাবল আগে জানলাগুলো খোলা দরকার।

পর্দাগুলো টেনে বিছিয়ে সে দুটো জানলা খুলল। আলোয় ভরে যাবার পর সে ভিতরের ঘরের দরজা খুলল। ভ্যাপসা গন্ধটা সইয়ে নিয়ে সে একটা ছোট্ট জানলা আছে এবং সেটিও মাঠের দিকে। জানলা খুলবে কি না, তাই সে দ্বিধায় পড়ল। বরাবরই এটা বন্ধ আছে হঠাৎ যদি কেউ খোলা দেখে তা হলে কী ভাববে? নিশ্চয় ওয়াচ রেখেছে ওরা। অস্বাভাবিক ব্যাপারটা নজরে পড়বেই।

এখন বন্ধই থাক, রাতে খুলবে। ঘরের মেঝেটায় অসম্ভব ধুলো, ভাঙাচোরা এবং আজেবাজে জিনিসগুলো এক ধারে সরিয়ে জায়গা করতে হবে। ভাঙা চেয়ারের উপর ছেঁড়া তোশকটা তুলতেই দুটো আরশুলা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল। সুনীত হাত থেকে তোশকটা ফেলে দিল। আরশুলা সে সহ্য করতে পারে না। জায়গাটা পরিষ্কার করতে গেলে প্রায় সব জিনিসই বার করে রাস্তায় ফেলে দিতে হবে। কিন্তু কে বার করবে। সুবল? উমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়, ব্যাপারটা চোখে পড়ার মতো হবে। তা হলে কি এই সব জঞ্জাল, পোকামাকড় নিয়ে বাস করতে হবে?

সুনীত শোবার ঘরের দিকে তাকাল। উমা খাটে বসে রয়েছে দরজার দিকে মুখ করে। ওর পিছনে এসে কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় সে বলল, "আমি ওই ঘরটায় থাকব।"

সে ভেবেই রেখেছে কীভাবে দিন এবং রাত কাটাবে। অসহ্য লাগবে, কিন্তু দিনের পর দিন একটা ছোট্ট আবদ্ধ জায়গায় তো অধিকাংশ বউই কাটাচ্ছে, যেমন সামনের ফ্ল্যাটের কান্তির বউ। এটা অভ্যস্ত হওয়ার জিনিস। বাবা কী করে কাটিয়েছেন?

"রাতে এই খাটেই শোব, সকালে সুবল যখন বাজার যাবে তখন কলঘরে যাব...খাওয়ার ব্যাপারটা তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে। কীভাবে করা যায় সেটা..."

উমা থরথর করে উঠে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে ফোঁপাতে শুরু করল। সুনীত বিভ্রান্ত হয়ে কাঁধ ধরে চেষ্টা করল ওকে টেনে তোলার।

"করছ কী? সুবল যে শুনতে পাবে।"

থামল না উমা। গোঙানির মতো শব্দ করে যেতে লাগল। সুনীত ভেবে রেখেছিল, ভয় পাবে, রেগে উঠবে, ধিক্কার দেবে আর যদি কান্নাকাটি করেও তা হলে এ-ভাবে নয়, নাটকীয়ভাবে করবে।

"প্লিজ চুপ করো, তোমাকে পরে বলছি সব। আগে এদিকের ব্যাপারগুলো বুঝে নাও..."

"বউদি দরজা খোলো, কী অ্যাতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছ...চা জুড়িয়ে যাচ্ছে আর...রোববার বলে কি...।"

সুবলের বিরক্ত স্বর রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই উমা খাট থেকে নেমে কাপড়ে চোখ মুছল।

"বেরিয়েই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ো। সুবল কি এ ঘরে আসবে?...যাতে না আসে সেই ব্যবস্থা করো। ওকে বাজারে পাঠাও, আমি পায়খানায় যাব আর চা করে দিয়ো তখন। খিদে পাচ্ছে...কলঘরে তোয়ালে সাবান, ব্রাশ সব রেখে এসো..."

বলতে বলতে সুনীত ভিতরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। যদি সুবল হঠাৎ শোবার ঘরে আসে!

দেয়ালটা পাতলা, ওপাশে রান্নাঘর। সুনীত দেয়ালে কান লাগিয়ে বাসনের শব্দ এমনকী কথাবার্তার চাপা আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না তবে দেয়ালের কাছে এসে যখন বলছে শুনতে পাচ্ছে।

"পাঁউরুটি দুটো।...এই পরশু বললে খরচ কমাতে হবে...ডিম আনব? দুটো..."

পাল্লার জোড়ে সাদা রেখা দেখা যাচ্ছে। দুটো কাঠের মধ্যে ফাঁক। আলো আসছে। সুনীত চোখ রাখল সেই ফাঁকে। বিছানার আধখানা, শোবার ঘরের দরজা, তার পাশে হাতখানেক দেওয়াল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে আবার রান্নাঘরের দেওয়ালে কান চেপে ধরল। মনে হল সুবল বাসন মাজছে। ট্রানজিস্টারটা খোলাই, পুরুষগলায় রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে। দূর থেকে মোটরবাইকের শব্দ এল, উপরের ঘরে কেউ স্কিপিং করছে। বাইরের জগতের সঙ্গে কান দিয়েই যোগাযোগ রাখতে হবে এটা সে বুঝতে পারছে।

এখন তার খিদে পাচ্ছে। কীভাবে উমা তাকে খাওয়াবে। সারাদিনই তো সুবল থাকবে, তার নজর এড়িয়ে কী করে দু' বেলা ভাত দেবে? উমা অফিসে বেরিয়ে যাবে সাড়ে ন'টার মধ্যে, তারপর সুবল একা। এখন থেকে অবশ্য দু'জন...সুবল নিশ্চয় দুপুরে বাইরের দালানে ঘুমোবে। উমা ফিরবে সন্ধ্যায়, তখন এইভাবে এই ঘুপচি জায়গাটায় দুর্গন্ধের মধ্যে আরশুলাগুলোর সঙ্গে সময় কাটাতে হবে!

কিন্তু খাব কীভাবে? খাওয়া যে এতবড় ব্যাপার তা, হৃদয়ঙ্গম করার মতো অবস্থায় সে কখনও পড়েনি। "খিদে কী জিনিস তা তুমি জানো না।" সুনীত হাসল। রুবির সঙ্গে কখনও দেখা হলে বলতে হবে, জেনেছি। এইবার সে বুঝতে পারছে তার টিকে থাকার জন্য বাতাস ও জলের মতোই খাদ্য দরকার এবং সেটা সংগ্রহ করতে বিরাট অসুবিধা তার সামনে, অন্য সময় এটাকে সে হাস্যকর অসুবিধা ভাবত কিন্তু এখন নয়।

অসুবিধাটা সুবল।

সুবল না থাকলে তার অসুবিধা নেই, তা হলে ওর না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। সুবলকে ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তার বদলে একটা ঠিকে ঝি রাখা যেতে পারে। সকালে এসে, দোকান বাজার বাসনমাজা লন্ড্রি, রেশন আনা আর কী দরকার? রান্নাটা উমা নিজে করবে। অফিসে যাওয়ার সময় বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যাবে।

খসখস শব্দ শোবার ঘরে। সুনীত পাল্লার জোড়ে চোখ রাখল। উমা তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে অর্থাৎ বন্ধ দরজার দিকে। সুনীত পাল্লাটা ফাঁক করল সামান্য তারপর আরও। ইশারায় জানতে চাইলে সুবল বেরিয়ে গেছে কি না। উমা মাথা হেলাল।

সুনীত বেরিয়ে এল।

"কলঘরে সব দিয়ে এসেছি।"

কথা না বলে সুনীত শোবার ঘর থেকে দালানে বেরিয়েই যেন কারুর ধাক্কা খেয়েই পিছিয়ে এসে ঘরে ঢুকল, "দালানের পর্দা ফেলে দাও। সামনের ওরা দেখতে পায়...বরং জানালাগুলোই ভেজিয়ে দাও।"

বারান্দার দরজায় এসে সুনীত থমকে গেল। বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে কেউ দেখে ফেলবেই। ছেঁড়া, ঝুলে পড়া ত্রিপল তাকে আড়াল করতে পারবে না। অসহায়ভাবে সে উমার মুখের দিকে তাকাল।

হামাগুড়ি দিয়ে তাকে চার গজ জায়গাটা পার হতে হবে। ব্যাপারটা হঠাৎ তার মনে হল লজ্জাকর, নিজের ব্যক্তিত্বকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে ফেলা, ভাগ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা এবং এ-সবই নিছকই এই শরীরটাকে জিইয়ে রাখার জন্য।

সুনীত উবু হয়ে হাত দুটি মেঝেয় রাখল। পিঠটাকে নামিয়ে দিল এবং এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। কলঘরের কাছাকাছি এসে উঠে দাঁড়াবার আগে সে একবার মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকাল।

উমা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে তার দিকে। ওর চাহনি তার হৃৎপিণ্ডটাকে একবার কচলে নিয়ে ছেড়ে দিল। নতুন জাতের কোনও জানোয়ার উমা যেন দেখছে। এবার থেকে উমাই খাওয়াবে পরাবে। সুনীত কলঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে ভাবল, বিশ্বস্ত কুকুর হতে হবে!

একইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে সে ফিরে এল। কিছু আলুভাজা, ফুলকপি ভাজা আর রাতে জল দিয়ে রাখা মুঠো কয়েক ঠান্ডা ভাত খাওয়ার টেবিলে রেখে উমা বসে আছে।

"আর কিছু ঘরে নেই এ ছাড়া।"

কোনও কথা না বলে সুনীত মিনিট দুয়েকের মধ্যে সেগুলো শেষ করে ফেলল।

"এখন মাসের শেষ...।"

সুনীত ঘাড় নাড়ল।

"প্লেটগুলো তাড়াতাড়ি ধুয়ে রাখো, সুবলের চোখে পড়তে পারে।"

সুনীত শোবার ঘরে ঢুকল। জামা এবং প্যান্ট বদলাতেই হবে। স্টিল আলমারির হাতল ঘোরাতে গিয়ে বুঝল চাবি দেওয়া।

"উমা শোনো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কলিংবেল বেজে উঠল। সুবল? ভিতরের ঘরের মধ্যে এসে সুনীত পাল্লা দুটো আধভেজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

উমা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কথার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল সুনীত। সুবল নয়, অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠস্বর।

"পিসিমা আমি আর বসব না, এখুনি যাব সেজকাকার বাড়ি সেই কসবায়। যদি আজকেই যেতে চান তা হলে বিকেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশের স্টিল এক্সপ্রেসে যেতে পারেন।"

"বড়দার একটা চিঠি মঙ্গলবার অফিসে পেয়েছি কিন্তু এর মধ্যেই যে অবস্থা এতটা খারাপ হবে...আমি নিশ্চয় যাব, তবে আজকেই পারব কি না...তুমি কি একটু বসবে না?"

"না না, আমি এখুনি যাব।"

"তোমার নামটা কী বললে?"

"অংশুমান।"

"খুব ছোট্ট দেখেছি তোমায়। বছর বারো আগে একবার জামসেদপুর গেছলাম, তখন তোমার বয়স বোধহয় ন'-দশ বছর ছিল। তোমার পরে তো এক বোন ছিল, বিয়ে হয়ে গেছে?"

"না।"

"তুমি কী করছ?"

"যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। পিসিমা আমি এবার আসি।"

"হ্যাঁ এসো... কেউ তো আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। বড়দারই সব থেকে বেশি আপত্তি ছিল আমার বিয়েতে। বাবা বললেন, জীবনে আর আমার মুখদর্শন করবেন না, সত্যিই করেননি। ওঁর মৃত্যুর খবরটা পর্যন্ত কেউ দিল না তাই শেষ দেখাও হয়নি। দু' হপ্তার পর ছোটবউদির চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম। কী যে কষ্ট হয়েছিল। মাকে জামসেদপুর নিয়ে গেল বড়দা তা-ও জেনেছি ছোটবউদির চিঠিতে...হ্যাঁ এসো। আমি নিশ্চয় যাব।"

দরজা বন্ধ হবার শব্দর পর সুনীত বেরিয়ে এল।

"কী ব্যাপার, তোমার মা-র কিছু হয়েছে নাকি?"

"বড়দার ছেলে খবর এনেছে মা-র এখন-তখন অবস্থা। আমাকে দেখতে চেয়েছে।"

"তুমি জামসেদপুর যাবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কী হবে গিয়ে।"

"মাকে শেষবারের মতো একবার দেখব না!"

"দেখে কী লাভ। এত বছর তো দ্যাখোনি, কোনও অসুবিধা হয়েছে কি? ওদেরও কোনও অসুবিধা হয়নি তোমায় না দেখে। যেমন দিন কাটছে তেমনই কাটুক না, কী দরকার যাবার।"

উমার চোখে বিরক্তি এবং ক্ষোভ লক্ষ করে সুনীত সাবধান হয়ে গেল।

"তুমি চলে গেলে আমি কিন্তু মুশকিলে পড়ব।"

"সে-জন্য কি আমি মাকে দেখতে যাওয়া বন্ধ করব? তোমার কী হবে না হবে তাই বিবেচনা করে কি এখন আমায় চলতে হবে!"

"ব্যাপারটা তুমি...।"

"পুলিশ এসে জিজ্ঞাসা করেছিল কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে কি না। কিন্তু আমি জানি রাজনীতি তুমি জীবনে করোনি, করতে পারবেও না। তা হলে এ-কাজ কেন করলে...কেন কেন? আমি এই ক'দিন ঘুমোতে পারিনি, খেতে পারিনি, শুধু ভেবেছি তোমার পক্ষে সম্ভব হল কী করে একটা মানুষ খুন করা!"

"আস্তে উমা, আস্তে।"

সুনীতের এখন একটাই ভয়। বোধবুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে উমা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ওর চাহনি থেকে জানোয়ারের নখ বেরিয়ে আসছে।

"পরশু রাতে বোমা পড়েছে, পুলিশের সঙ্গে পাইপগান নিয়ে লড়াই হয়েছে মাঠে, সামনের রাস্তায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে পাশের বাড়ির পাঁচিল টপকে ওরা পালায়। সেই রাতে আমাদের ফ্ল্যাটে পুলিশ এসেছিল।

"কেন?"

"তোমার খোঁজে। ওদের ধারণা তুমিও দলে আছ।"

শুনতে শুনতে সুনীতের মনে হল একটা সুযোগ তার সামনে এসে গেছে, এটা হাত ছাড়া করা উচিত হবে না। গোলাপবাগান রোডের এক বাড়ির দেয়ালে এক সময় লেখা দেখেছিল, "খতম মানে খুন নয়, শ্রেণীঘৃণার চরম প্রকাশ মাত্র।" হাবা খুন হয়নি খতম হয়েছে, এইভাবে উমার কাছে ব্যাপারটা তুলে ধরলে সেই রাতের ঘটনার চরিত্রটাই আমূল বদলে যাবে।

"তোমার এ ধারণা কী করে হল যে আমি রাজনীতিতে যেতে পারি না, মানুষ খতম করতে পারি না?"

"পারার মতো বয়স তোমার নেই, পারার মতো মনের জোর তোমার নেই, জীবন সম্পর্কে কৌতূহল তোমার নেই, তুমি এক ধরনের ভীরু, তোমার অতৃপ্তি আমাকে নিয়ে... আমি জানি, আমি জানি রুবি কাঞ্জি সম্পর্কে অনেক কথাই জানি...তুমি খতমের রাজনীতিতে ঢুকবে, মরে গেলেও তা বিশ্বাস করব না। মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, নিজেকে ছাড়া তুমি আর কিছু ভাবতে পারো না।"

সুনীতের মাথার মধ্যে একটা রাগ এবার দপদপ করে উঠল। রুবি সম্পর্কে অনেক কথা কে বলল উমাকে? চিন্ময় ঘোষ হয়তো। নিশ্চয় কারও কাছ থেকে তার নিরুদ্দেশের খবর শুনে এখানে এসেছিল সহানুভূতি বা সাহায্য দেবার ছলে। হয়তো তখন কুটকুট করে লাগিয়েছে।...ব্যাটা ছুঁচো। এখন প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়া দরকার।

"জামা-প্যান্ট বার করে দাও, এগুলো বদলাতে হবে, গন্ধ ছাড়ছে।"

উমা নিজেকে সামলে নিয়েছে, কথার জের টেনে কথা বাড়াল না।

আলমারি খুলে বলল, "যা যা দরকার বার করে নাও।"

একটি প্যান্ট এবং নীল টেরিলিন গেঞ্জি টেনে নিয়ে সুনীত ইতস্তত করল হাতকাটা সোয়েটারটাও বার করবে কি না। স্নান করে শীত-শীত লাগছে।

"তুমি কি মাকে দেখতে যাচ্ছ?...না না অন্য কিছু নয়। এইভাবে একা আমি থাকব, বুঝতেই পারছ কী ধরনের অসুবিধে হবে।"

"আমি কী করতে পারি বলো। তুমি যে এ-ভাবে আসবে, আমার ধারণারই বাইরে। কিন্তু মাকে তো দেখতে যেতেই হবে, বোধ হয় আর বাঁচবে না, প্রায় পঁচাত্তর হল।"

"আজই তো যাচ্ছ না।"

"হাতে টাকা নেই, নইলে যেতাম। কাল মাইনের দিন, অফিসে গিয়ে টাকাটা নিয়ে ওখান থেকে স্টেশন চলে যাব।"

সুনীতের মনে পড়ল তারও মাইনের তারিখ দিন পাঁচেক পর। কিন্তু সে আনতে যেতে পারবে না।

"কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে যেতে পারবে? বিস্কুট বা চিঁড়েমুড়কি বা ওই ধরনের কিছু আর—"

কলিংবেলের শব্দ হল। সুনীত কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে পিছিয়ে গেল।

দরজার পাল্লা বন্ধ করে সে প্যান্ট শার্ট বদলাল। এখন তার ঘুম পাচ্ছে। মেঝেটা পরিষ্কার করা হল না। বেডকভার আর একটা বালিশ যদি আনার কথাটা তার মনে থাকত। চটপট এখনও আনা যায়। শোবার ঘরে সুবল দু'-তিনবারের বেশি সারাদিনে আসে না।

পাল্লা ফাঁকা করে সুনীত দেখল উমা দরজাটা মাত্র ভেজিয়ে রেখেছে। বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে সে বেডকভার ও একটি বালিশ টেনে নিয়ে ভিতরের ঘরে এল। কাঁপছে তার হাঁটু এবং হাত, তারপর সে হাসল। কিন্তু কেন যে হাসল, তা সে জানে না।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে সুনীত অনেকক্ষণ ভাসতে ভাসতে, গত পাঁচ দিনের নানান টুকরো সংলাপের এবং বিভিন্ন দৃশ্যের তরঙ্গে দুলতে শুরু করেছে। কিছু মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পেল, যেমন বুড়ি ভিখারির, ট্যাক্সি ড্রাইভারের সহকারীর, পুলুর এবং মুখে পাইওরিয়ার গন্ধওলা লোকটির।

"...বুঝলেন সুনীতবাবু লেকের উত্তর-পশ্চিম কোণে গাছটা আছে। একবার গিয়ে দেখে আসতে হবে। মুশকিল কী জানেন, চিনতেই পারব না। কল্পতরু...বাওবাব নাকি বিশাল, কিন্তু শুনেছি এটা নাকি খুবই শিশু, আইডেন্টিফাই করতেই হয়তো পারব না।"

"যদি করতে পারেন তা হলে কল্পতরুর কাছে কী চাইবেন?"

"কী আর চাইব, টাকাপয়সা সুখশান্তি এই সবই তো দরকার... তবে বুঝলেন, লিভিংস্টোন প্রথম দর্শনেই থ হয়ে গেছল, বলেছিল বিশ্বের অষ্টম বিস্ময়। আসলে আমি চাইব অবাক হয়ে যেতে...বিরাট কিছু জীবনে তো আর দেখলুম না।"

সুনীত ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল দরজায় খুটখুট আওয়াজে।

"কে কে?"

সুনীত ধড়মড় করে উঠে বসল।

দরজাটা খুলে গেল। উমা প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে।

"খেয়ে নাও, সুবলকে পাঠিয়েছি দুটো কোসাভিল কিনতে। এক্ষুনি এসে পড়বে।"

উমা মেঝের উপর ভাতের প্লেট রেখে চলে যাচ্ছে, সুনীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল: "জল, আমার ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছে।"

"দিচ্ছি।"

"একটা বালতিতে দাও, পরেও তো তেষ্টা পাবে।"

ভাতের মধ্যে গর্ত করে ডাল। আর একটি গর্তে ডিমের ঝোল। ডিমটি আধখানা। একটা ছোট্ট কাচের বাটিতে টোম্যাটোর চাটনি। সুনীত তাকিয়ে দেখতে দেখতে অসম্ভব খিদে বোধ করল। ডাল এবং ঝোল একসঙ্গে চটকে, গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

একটা ছোট প্লাস্টিকের বালতিতে জল আনল উমা, একটি কাচের গ্লাসও।

"আর নেই, ভাত?"

"দু'জনের মতো মাপ করে সুবল চাল নিয়েছে, আমার ভাগ থেকে তোমাকে দিয়েছি। সে-জন্যই তো সুবলকে ছুতো করে বাইরে পাঠালাম।"

"ওকে ছাড়িয়ে দাও।"

"সেকী!"

"ও থাকলে অসুবিধে হবে, বরং একবেলার জন্য একটা ঠিকে ঝি রাখো, কাজ তো সামান্যই।"

"তা হয় না। বুড়ো মানুষ হঠাৎ ছাড়িয়ে দিলে যাবে কোথায়, খাবে কী?"

"কিন্তু আমার যে অসুবিধাটা হচ্ছে সেটা কি দেখবে না!"

দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে সুনীত বুঝতে পারল, সুবল থাকবে। ওকে উমার দরকার। হয়তো তার থেকেও বেশি দরকার।

ভাতের শূন্য প্লেটের দিকে তাকিয়ে সুনীতের মনে হল, গৃহপালিত জীবকে যে-ভাবে খেতে দেওয়া হয় অনেকটা সেই রকমই এখন দেখাচ্ছে পরিবেশটাকে। তার পেটে এখনও প্রচুর খিদে কিন্তু সে-কথা বলতে পারল না।

"এখানে ফিরে না এলেই পারতে।"

উমার কণ্ঠে এবং চাহনিতে বিষণ্ণতা, দুঃখ। সুনীত ভেবে পাচ্ছে না কী জবাব দেবে। ও কি চায় সে চিরতরে আড়ালেই থাকুক, তার প্রয়োজন কি উমার কাছে ফুরিয়ে গেছে?

"সুবলকে ছাড়ানোটা খুবই অন্যায় হবে। তা ছাড়া এ-ভাবে ক'দিন তুমি লুকিয়ে কাটাবে! মানুষ কি এ-ভাবে থাকতে পারে? নিজেও তো বুঝতে পারছ এটা অসম্ভব ব্যাপার।"

"ভেবে পাচ্ছি না আমি কী করব। দূরে কোথাও চলে যেতে হবে কিন্তু কোথায় থাকব, কী খাব। চাকরি পাব না, কিছু টাকা পেলে বরং ব্যবসা করা যায়।"

সুনীত মাথা নামিয়ে রইল। উমা নীরবে প্লেটটা তুলে নিয়ে গেল। দরজাটা আর বন্ধ করল না সুনীত।

কলিংবেল বাজছে। দরজা ভেজানোর জন্য সে ব্যস্ততা বোধ করল না। সে জানে উমা শোবার ঘরে সুবলকে এখন আসতে দেবে না।

"একেবারে তিনটে ট্যাবলেট আনলুম, বারবার অত দূরে কে আর যায়।"

"ভালই করেছ...আর শোনো কাল আমি মাকে দেখতে জামসেদপুর যাব।"

সুনীত কান চেপে ধরল দেওয়ালে। ওরা এখন রান্নাঘরে। কী বলছে ওরা বোঝা যাচ্ছে না। উমা কী ব্যবস্থা করে যাবে? বুড়ো মানুষটা বাইরে বেশি যায় না। সারাদিন তা হলে তো তাকে এই ছোট জায়গাটাতে কাটাতে হবে, শোবার ঘরেও তখন রাত্রে ছাড়া যাওয়া যাবে না। উমাকে বলতে হবে শোবার ঘরের দরজায় যেন তালা দিয়ে না যায়। কলঘরে যাওয়া তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে।

একমাত্র সুবল ঘুমিয়ে পড়ার পর, গভীর রাতে ছাড়া সে বেরোতে পারবে না। উমার দরকার কী মাকে দেখতে যাওয়ার? ন'বছর কোনও সম্পর্ক নেই, সে-জন্য কোনওদিনই হা-হুতাশ করতে দেখিনি অথচ এখন ওকে যেতেই হবে! কেন? স্মৃতিগুলোকে ঝালিয়ে নেবার জন্য? সেইজন্যই কি সে-ও কৃষ্ণনগরে গেছল! নিজের সম্পর্কে একটা চাপা রাগ সুনীতের পা থেকে মাথায় উঠে এল। এ-ভাবে চলা যায় না, এ-ভাবে বাঁচা সম্ভব নয়। কোনও কিছুই আর আগের মতো অর্থ নিয়ে তার মগজে ধাক্কা দিচ্ছে না। তার অবাক লাগছে ভাবতে, এই ছ'-সাতটা দিন সে এ-ভাবে কাটাতে পারল কী করে! সব থেকে ভয়ংকর ব্যাপার, এই সন্দেহটা তার মনে জন্মাতে শুরু করেছে যে সবাই যেন ঠিকঠাক রয়েছে, এমনকী তার বাবাও। এটা তার নিজেরই দোষ।

প্রভূত পরিশ্রম করে সে সচ্ছল অবস্থায় এসেছে এবং এটাই তো তার নিজের উপর আস্থা বাড়াতে পারত কিন্তু তা হয়নি। চাকরি এবং বৈষয়িক উন্নতির দিকে যদি না যেত তা হলে হয়তো কবিতা লেখার কথাই ভাবত, দু'চারটে ভাল কবিতা লিখেও ফেলত।

সন্দেহ নেই সে ঠকিয়েছে, সবাইকে মিথ্যা কথা বলে গেছে। সকলকেই। বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা। কখনই সে একই মানুষ থাকেনি, বাদল নস্করকে এক রকম, বাবাকে অন্য রকম। শেখ মঞ্জিল, রুবি, উমা প্রত্যেককে আলাদা আলাদা। যখন যেখানে তখন সেই ভূমিকায়। অফিসে চিন্ময়ের সঙ্গে শ্বেত ভাল্লুককে নিয়ে হাসাহাসি, আবার পরমুহূর্তে পঙ্কজ আচার্যের সামনে তটস্থ। আবার সে বদলে যাচ্ছে রুবির শোবার ঘরে, উমার সামনে খাবার টেবিলে।

এগুলোরই যোগফল, সে কিছুই নয়। একটা শূন্য মাত্র। তার সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, মানসিক বিন্যাস ও ভঙ্গি, যার দ্বারা বিশিষ্ট হওয়া যায়, সে-সবের কিছুই তার মধ্যে নেই। শুধু কয়েকটা প্রাকৃতিক অনুভূতি ছাড়া। আজ সকাল থেকে, গত সাতদিন ধরে, বছরের পর বছর সে খুঁজে চলেছে হয়তো নিজেকেই—এটাই হল আসল ব্যাপার।

মাঠ থেকে বিরাট এক সমবেত চিৎকার সুনীতের কানে ধাক্কা দিল। ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। শুনেন

ভবন থেকে বেরিয়ে মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়াবার তীব্র একটা ইচ্ছা তার বুকের মধ্যে ফেঁপে উঠল। রাস্তার লোক, গাড়ি, বাস, দোকানের দ্বারা আবার পরিবৃত হবার প্রয়োজন সে বোধ করছে।

হাবার বউ নিশ্চয় পুলিশকে বলেনি হাবার মৃত্যুর পিছনে কী কারণ ছিল। তা হলে পুলিশ এটাকে রাজনৈতিক খুন হিসাবে গণ্য করত না। পুলিশরা অবশ্য সহজ ব্যাপারকে জটিল করে তুলতে না পারলে তৃপ্ত বোধ করে না। হাবার বউ কেন বলেনি এখন তার জানতে ইচ্ছে করছে। ও কি ভাবছে, সুনীত আবার কখনও এসে সেই রাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে? ওর চোখের ঝকঝকে সাদা অংশটা হাবা কি কখনও দেখেছে বৃষ্টির দিনে, দূর রাস্তার আলোয় সন্ধ্যার পর বা রাতে ফেরার সময় সুনীত ওকে চালাঘরটায় দেখতে পেত রান্নায় ব্যস্ত অথবা শুধু বসে আছে চটের পর্দাটা তুলে। তাকে দেখলেই ওর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত, পুরু ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যেত। সুনীতের মনে হত যেন তার জন্যই অপেক্ষা করে। যতক্ষণ দেখা যায় চোখ দিয়ে অনুসরণ করে যেত।

সুনীত তখন নিজেকে একটু অন্য রকম বোধ করত। যদি কোনওদিন হাবার বউকে না দেখতে পেত, সে মনে মনে দমে যেত, ছটফট করে উঠত। সে ঘুরে উলটোদিকে হাঁটত। চায়ের দোকানে কিছু সময় কাটিয়ে আবার সে গুণেন ভবনের দিকে আসত। যদি ওকে দেখতে পেত অজানা এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করত যা উমা বা রুবির কাছ থেকে সে পেত না। ক্ষীণভাবে কৈশোর তার দেহে ফিরে আসত, কমলাকে মনে পড়ত।

সে ভয় পেয়ে গেছল নিজের এই রকম ব্যাপারটাকে আবিষ্কার করে। এটাকে সে অধঃপতন বলবে কি না ভেবে পায়নি। বউটির শরীর, চাহনি, পুরু ঠোঁট, স্তন, নিতম্ব সব মিলিয়ে তাকে নিংড়ে অবশ করে দিত। মনে হত এটা হয়তো তার মুখে ছাপ রেখে যাচ্ছে, যে-কেউই ধরে ফেলতে পারে। এক এক সময় মনে হয়েছে, কাউকে ব্যাখ্যা করে তার খুলে বলা উচিত। সবাইকে নয়, শুধু একজনের কাছে। হয়তো বাবাই একমাত্র তার সমস্যাটা বুঝতে পারত, কিন্তু তখন মনে পড়েনি। আর কখনও দেখা হবে কি না কে জানে!

আজকের এই অবস্থার সূত্রপাত কবে? শেখ মঞ্জিল তাকে কেওকেটা ভেবে ছেলের জন্য চাকরি চেয়েছে। এখন সে নিজেই দূরে কোথাও একটা চাকরি চায়। কতলোকই তো তাদের সমস্যা জানিয়ে তাকে সমাধান বাতলাতে অনুরোধ করেছে, আর এখন দুনিয়ায় এমন একজনও নেই যাকে সে ওই অনুরোধই করতে পারে। তাকে বোধহয় কেউ ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি। নিজের দুর্বলতা, ত্রুটি, ঘাটতি সম্পর্কে সে বরাবরই সচেতন, এটাই তাকে উদ্যমী করেছে স্কুল মাস্টারি ছেড়ে চাকরিতে ঢোকায়, স্টেনোগ্রাফার থেকে ছোটখাটো অফিসার হওয়ায়। একদিন হয়তো শ্বেত ভাল্লুকের চেয়ারেও সে বসত। অন্যদের থেকে তার মনের জোর বেশি এটাই সে ভাবত। একদমই ভুল ভাবনা।

উমা যে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে আছে সুনীত তা বুঝতে পারেনি, নিজের ভাবনায় ডুবে থাকার জন্য। হঠাৎ চোখ পড়তেই সে অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল। শূন্য, নিস্পৃহ চোখে তার স্ত্রী যেন একটা আসবাবের দিকে তাকিয়ে।

"তুমি খাটে এসে শুতে পারো।"

সুনীত বেরিয়ে এল। শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল দেওয়া। উমা বিছানার ধার ঘেঁষে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে। ঘরের একটি জানলা খোলা। পর্দার উপরের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায় উমার পিঠ থেকে একহাত দূরে। সুনীত শীতের আমেজ শরীরে পাচ্ছে। ডান তালু বাম বাহুতে বুলোতেই কাঁটা উঠল চামড়ায়। বই আকারের ছোট্ট রোদটুকু উপভোগের জন্য সে প্রলুব্ধ হচ্ছে কিন্তু উমার অত কাছে, পিঠ ঘেঁষে শুতে কুণ্ঠা হল। সন্তর্পণে সে উমার থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে শুল।

উমার চাহনিটাই তার কুণ্ঠার কারণ। সুনীত ড্রেসিং-টেবিল, বইয়ের র‍্যাক, আলনা, আলমারির উপর দিয়ে চোখ বোলাল। এ ঘরে যা কিছু কাঠের আসবাব তারই পছন্দে কেনা। এই খাটটাও। প্রায় আট বছর বয়স হল এটার। উমা চেয়েছিল রবার-ফোম বিছানার খাট। তীব্র আপত্তি এবং শিরদাঁড়ার নানাবিধ ব্যাধির ভয় দেখিয়ে সুনীত তুলোর গদির খাট কেনে।

প্রত্যেকটা আসবাবই তার জীবনের পটভূমির এক একটা অংশ। একদিন আর তা থাকবে না। উমা

একার রোজগারে সংসার চালাতে হয়তো পারবে না। এগুলো একে একে বিক্রি করে দেবে। এই খাট, আলমারি, র‍্যাক অন্য কারুর ঘরে গিয়ে সেখানকার জগতের সঙ্গে মিশে যাবে। এগুলো সাক্ষীও বটে কিন্তু সুনীত যে ভিতরে ভিতরে বদলে গেছে, সেই বদলের সাক্ষী এরা নয়। দীর্ঘকাল ধরে গৃহসজ্জার অংশ হিসাবে ওরা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে তাই বদল সম্পর্কে এদের কোনও সাড়া আর নেই। অনেকটা উমারই মতো।

সুনীত মুখ ফিরিয়ে তাকাল উমার দিকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দ থেকে বুঝল ঘুমোয়নি। সহজে ঘুম আসার কথাও নয়। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি ওর জীবনে হঠাৎ আজ এসে পড়েছে।

"তোমার নিশ্চয় কৌতূহল হচ্ছে জানার জন্য?"

উমার তরফ থেকে সাড়া এল না।

"পরে সব বলব, তুমি জামসেদপুর থেকে ঘুরে এসে...ক'দিন থাকবে?"

সুনীত জবাব পেল না। উমার কাছ থেকে জবাব পাবার জন্য হাত বাড়িয়েও ঠেলা দিল না। হাতটা ফিরিয়ে এনে সে কাত হয়ে চোখ বুজল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে উমাকে বুকের নীচে চেপে ধরে সুনীত চুমু খেতে খেতে অনুভব করল ভিজে কাগজের একটা তাল যেন সে জড়িয়ে ধরেছে। ধীরে ধীরে সে নিজেকে নামিয়ে নিল।

"কী হল তোমার?"

"কাল সকালে বাজারে যাব। তোমার জন্য যা পারি কিনে আনব....সুবলকেও ছাড়িয়ে দেব, কয়েকটা দিন যাক।"

অপ্রত্যাশিত উক্তি! শক্ত হয়ে গেল সুনীতের যাবতীয় পেশি। অপ্রতিভ হবার জ্বালাটা সইয়ে নেবার জন্য সে উঠে বসল। তখনই পরপর দুটি বিস্ফোরণ হল গোলাপবাগান রোডের উত্তর দিক থেকে।

সুনীত জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। চশমাটা ভিতরের ঘরে রেখে এসেছে। পর্দা সরিয়ে দেখতে পেল, ফুটবল মাঠ, রাস্তা, রাস্তার আলো এবং বাড়িগুলোকে, যে ভঙ্গিতে সে দেখতে অভ্যস্ত তেমনই রয়েছে তবে ঝাপসাভাবে। দূর থেকে মোটর ইঞ্জিনের দ্রুত গমনের শব্দ ভেসে এল।

খুব কাছেই, খাটালগুলোর দিকে আবার একটা বিস্ফোরণ। সুনীতের আপাদমস্তক পেশিগুলো আবার শক্ত হয়ে আসছে। পুলুর গলাকাটার দৃশ্যটা মনে পড়ল, তখন সে এই জানলায়ই দাঁড়িয়ে হাবার বউকে লুকিয়ে দেখছিল। পুলু যখন ছটফট করতে করতে ঘাসে মুখ রগড়াচ্ছিল তখন সে জানলাটা বন্ধ করে পিছিয়ে আসে। একটা জানোয়ার...

একটা বিক্ষোভ সুনীতকে গ্রাস করছে। তার মায়া মমতা করুণা মড়মড় করে ভেঙে হিংস্র আবেগ তার মধ্যে দমকলের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। জানলার গরাদ আঁকড়ে সে ঝুঁকে পড়ল।

দুটো ছায়া জানালার নীচ দিয়ে ছুটে গেল পাশের অর্ধসমাপ্ত বাড়ির পাঁচিলটার দিকে। সুনীত ঠিক যেখানটায় টপকে এসেছে, সেখানেই ওরা থামল। গোলাপবাগান রোডে একটা পুলিশের ভ্যান দেখতে পেল সুনীত।

"চটপট...ওরা এসে গেছে।"

সুনীত ফিসফিস করল। গরাদ ধরে সে কাঁপছে।

"টপকাও। শাবাশ। এবার দৌড়োও, দৌড়োও, মিলিয়ে যাও অন্ধকারে।"

সুনীত কাঁপতে কাঁপতে জানলার নীচে বসে পড়ল। দৃষ্টি আবছা হয়ে এসেছে, মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়। মাঠের উপর দিয়ে টর্চের রশ্মি ঘুরে বেড়াচ্ছে আনাচে-কানাচে তল্লাশ চালিয়ে। রশ্মিটা গুণেন ভবনের উপর দিয়েও ঝলসে গেল। তখন সুনীত ঘরের ভিতরে দেয়ালটা দেখতে পায়। একদমই সাদা।

সাত

প্যাকেটের ছেঁড়া কাগজগুলো পায়ের কাছে ছড়ানো। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জোড়া হাঁটুতে থুতনি রেখে সুনীত বসে। বিস্কুটের তিনটি প্যাকেট রেখে গেছল উমা। দু'দিনেই তা শেষ হয়ে গেছে। আজ নিয়ে চারদিন কাটল ওর জামসেদপুর যাওয়ার। খিদে এখন হাঙরের মতো তাকে খোবলাচ্ছে।

পাল্লার জোড় দিয়ে সুতোর মতো আলোর রেখা। সুবল শোবার ঘরের আলোটা জ্বেলে রেখে গেছে। দেয়ালে কান পেতে সে রান্নাঘর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পায়নি অনেকক্ষণ। সুবল ফ্ল্যাটের মধ্যে আছে কি না সে বুঝতে পারছে না।

তলপেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। পাকস্থলীটা মুচড়ে উঠছে। সুনীত গত ছত্রিশঘণ্টা কিছু খায়নি। প্লাস্টিকের বালতিটা শূন্য আজ সকাল থেকে। জিভটা বারবার গলার ভিতরে নেমে যাচ্ছিল। ঢোঁক গিলতে এখন গলা ব্যথা করছে। মুখে আর থুথু উঠছে না। উমা নেই তাই চা হয় না। সুবলও ভোরে দুধ আনতে যায় না। সুনীত এই নরক থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরের দরজার ওপাশে যেতে পারেনি চারদিন। রাতে সুবল দালানে ঘুমোয়।

দুর্গন্ধ জমাট হয়ে রয়েছে। ছোট্ট জানলাটা সে খুলতে পারেনি। বছরের পর বছর বন্ধ থাকায় পাল্লা দুটো এঁটে আছে। ছিটকিনির মুণ্ডিটা এতই ছোট যে শক্ত করে ধরা যায় না। টানাটানি করে খোলার মতো জোর তার আঙুলে নেই। চারদিন সে কলঘরে বা পায়খানায় যেতে পারেনি। প্রাণপণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাখতে গতকাল দুপুরে আর পারেনি। এই ঘরের মধ্যেই...সুবল যখন শোবার ঘরে আসবে তখন গন্ধ পাবে কি! জোড়ের ফাঁকটা ছাড়া আর কোনও রন্ধ্র নেই যেখান দিয়ে বাইরের সঙ্গে এই ঘরের সম্পর্ক রয়েছে। এই ক'দিন রাত্রে সে শোবার ঘরে বসে থেকেছে জানলার ধারে। দরজার কাছে গিয়ে দালানে উঁকি দিয়েছে। অন্ধকারে ঠিক কোন জায়গাটায় সুবল শুয়ে আছে ঠাওর করার চেষ্টা করেছে।

সাহস হয়নি ঝুঁকি নেবার। অন্ধকারে সুবলকে মাড়িয়ে ফেললে বা ও যদি জেগে থাকে আর খসখস শব্দ পায় তা হলে কী হবে?...কী হবে, কী হবে?

সুনীত ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁটু থেকে মুখটা তুলল। দুর্গন্ধ, খিদে, তৃষ্ণা, অন্ধকার, বায়ুহীনতা। এর মাঝে আরও কতদিন তাকে যাপন করতে হবে সে জানে না। যাপন...অসমালোচিত জীবন নাকি যাপনযোগ্য নয়। কিন্তু কী সমালোচনা করব! একটা কাতর শব্দ তলপেট থেকে উঠে গলায় এসে আটকে রইল। আলোর সুতোটা ছিঁড়ে গেছে, সুবল এখন ঘরে রয়েছে।

যাবার আগে উমা বিস্কুটের প্যাকেটগুলো, এক কেজি টোম্যাটো, শাঁকআলু দিয়ে বলেছিল "হাতে টাকা নেই...দু'দিনের বেশি থাকব না, এতেই চালিয়ে নাও। সুবলকে বলেছি শোবার ঘরের দরজা সব সময় খুলে রাখতে।"

অতি সহজ সাদামাঠাভাবে যেন মুক্ত স্বাধীন কোনও মানুষকে জানাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে উমা বলেছিল। আর কোনও কথা সে বলেনি। সুবলকে সে বাজার করার জন্য কিছু টাকা দিয়ে গেছে। দেয়ালে কান রেখে সুনীত শুনেছিল সুবলের কথা, "অত কেন, পাঁচটা টাকা দিয়ে যাও।"

ঝিমুনি এসেছে সুনীতের। সন্ধ্যা থেকেই সে অবসন্ন বোধ করছে। বার কয়েক খিদের কথাটা মনে করার চেষ্টা করেছে, যদি তাতে শরীরটা চনমনে হয়ে ওঠে। কিন্তু হয়নি। তার মনে হচ্ছিল মস্তিষ্কও অবশ হয়ে আসছে। একবার কবজিতে আঙুল রেখে নাড়ির স্পন্দন দেখেছিল। অতি ধীর একটা দপদপানি তখন আঙুল বেয়ে তার চিন্তায় উঠে আসে মৃত্যু।

তখন থেকেই মাঝে মাঝে সে স্পন্দন পরীক্ষা করে গেছে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে দপদপানিটা যেন আর হচ্ছে না। ভয় পেয়ে সে বুকে হাত রাখল, জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বুকের ওঠানামা অনুভব করল। পৃথিবীর অসাধারণ যন্ত্রটা রক্ত পাম্প করছে কি করছে না, এখন সেটাই তার বাঁচা বা মরার একমাত্র নির্দেশক। পড়া, দেখা, শোনা এবং নিজস্ব বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে যা-কিছু আহরণ করে সে মাথার মধ্যে জমিয়ে রেখেছে তার কিছুই এখন কাজ করছে না, একমাত্র খিদের বোধটুকু ছাড়া।

সুনীত নখ দিয়ে পায়ের পাতা আঁকড়ে ধরল। নখগুলো চেপে বসাল। জ্বালা করছে কি না বুঝতে

পারল না। মাথাটা পিছনের দেয়ালে ঠুকল বার কয়েক। ব্যথা করল না। এবার সে ভয় পেল। শরীরে সাড় নেই কেন?

সে হাবার বউয়ের শরীরের এক-একটি অংশ মনে করার চেষ্টা করল। স্মৃতি যেন পিছলে যাচ্ছে। কিছুতেই সে ধরে রাখতে পারছে না নরম মাংসগুলোকে, চুম্বনের স্বাদ বা গন্ধ মনে পড়ছে না, তার শরীরে কোনও সাড়া লাগছে না।

হায় পিতা, তোমাকে অনুসরণ করা আর সম্ভব হল না। সুনীত বন্ধ দরজাটা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল। সে নিশ্চিন্ত জেনে গেছে এইভাবেই তাকে মরতে হবে। দেহটা এইভাবেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পড়ে থাকবে। তারপর পচতে শুরু করবে।

দুর্গন্ধ...সুনীত নাক কুঁচকে শুঁকল। হয়তো এটা তারই পচনের গন্ধ।

মোটর ইঞ্জিনের শব্দ গোলাপবাগান রোড দিয়ে ছুটে গেল। সুনীত উঠে দাঁড়িয়েই টলে গেল। হাঁটুতে জোর নেই, শরীর ভেঙে পড়ছে অবসন্নতায়। নিশ্চয় পুলিশের গাড়ি। এবার গাড়িটা যখন যাবে জানলায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকবে। চেঁচিয়ে বলবে:

"সারেন্ডার, সারেন্ডার করতে চাই।"

দরজা খুলে দেয়াল ধরে সে জানলায় এল। চশমাটা আজও চোখে নেই। কিন্তু সেই একই রকম রয়ে গেছে মাঠটা। জীবনে অজস্র ভুল আর দুর্বলতা তাকে ঠেলতে ঠেলতে এই মাঠে এনে ফেলেছিল। ঠিক কোথায় ঘটেছিল? মাঠের একটা জায়গা সে চিহ্নিত করার জন্য খুঁজতে শুরু করল। ঠিক কোথায় সে হাবাকে...

দুটো বিস্ফোরণ ঘটল সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রিভলবারের শব্দ। সুনীত থরথর কেঁপে উঠল। কিছু একটা ঘটছে, কাছাকাছিই। আরও দু'বার রিভলভারের শব্দ হল। এগুলো মৃত্যুর শব্দ। কেউ বা কারা এখন মৃত্যুকে উপেক্ষা করছে বা আত্মসমর্পণ করছে। যেই হোক, সুনীত ভাবল, আমার মতো পচে গলে যাওয়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছে না।

জানলার গরাদ ধরে সে নিজেকে ঝাঁকাল। আমি বেরোব, যাই অপেক্ষা করুক, পচে মরা সম্ভব নয়। বাইরে গিয়ে বাঁচার জন্য একটা সুযোগ নেব। দৌড়তে দৌড়তে মিলিয়ে যাব। ওরা কাছাকাছিই রয়েছে, এদিকে হয়তো আসবে। আসার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

"পিণ্টু জোরে ছোট...আমি এগোচ্ছি।"

"হাঁটুর নীচে চালিয়েছে...।"

সুনীত নীচের দিকে তাকাল।

একটা ছায়ামূর্তি নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এগোতে গিয়ে চাপা আর্তনাদ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুনীত দেখতে পেল সাদা পাঁচিলের উপর উঠছে আর একটা ছায়া।

"পিণ্টু যে-ভাবেই হোক...আমি টেনে তুলে..."

একটা বিস্ফোরণ সুনীতের মাথার মধ্যে এবার ঘটে গেল। টুকরো টুকরো খসে পড়ছে তার স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড, শিরা-উপশিরা।

"অপেক্ষা করো...আমি যাচ্ছি।"

সুনীত ঘর থেকে দালানে এল। সুইচটা কোথায় কে জানে। বুড়ো মানুষটাকে মাড়িয়ে জখম করতে সে চায় না। আলো জ্বলে উঠতেই সুবল "আহ্" বলে চোখ খুলল।

ওর পাশ দিয়ে সুনীত দ্রুত এগিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। পিছনে সুবলের ভীত কণ্ঠস্বর সে শুনতে পাচ্ছে: "কে, কে, কে গেল?"

আর সে নিজেকে নিয়ে বিব্রত হবে না। এইবার তার শেষ। যা-কিছু দেখাশোনা বোঝার সব নিয়েই এবার সে শেষ করবে। কিছু কি বাকি রয়ে গেল? এখন আর ভেবে লাভ নেই।

যদি রুবি...

কিন্তু কোন রুবি? অন্য কেউ হলেও একই ব্যাপার ঘটত। হাবার বউ...বেচারা। ওকে দোষ দিয়ে কী লাভ।...এক এক জায়গায় এক এক রকম মিথ্যা, বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়া।

যেহেতু সে ভীরু...বাবাও ভীরু, শ্বেত ভাল্লুকও।

কোলাপসিবল গেটে তালা। সুনীত পকেট থেকে চাবি বার করে খুলল।

কোথায় সে? পিন্টু!

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুনীত খুঁজল। দেয়ালের কাছাকাছি কী যেন নড়াচড়া করছে।

কোনওদিনই তার নিজের উপর আস্থা ছিল না।

কিন্তু এখন নয়। এখন...বিশুদ্ধ হওয়ার বোধ আর কি ফিরে আসবে না?...আর একবার, উমা।

টর্চের তীব্র আলো সুনীতের পিঠে এসে পড়ল। পিছনে পায়ের শব্দ, চিৎকার।

"হ্যান্ডস আপ।"

আরও কী সব গোলমাল হচ্ছে কিন্তু সে শুনতে পাচ্ছে না। দু'হাত ধীরে ধীরে তুলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। টর্চের আলোয় তার ছায়াটা সাদা পাঁচিলে পড়েছে। সে দেখতে পেল বিরাট একটা গাছের কাণ্ডের মতো তার দেহ তার উপর যেন দুটি শাখা আকাশের দিকে বাড়ানো।

তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

ছায়া
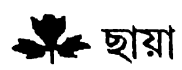
কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত আবির্ভাব

"দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজের শ্রীতিরুপতি মন্দিরে এই কলিযুগে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল, যে-জিনিস আপনারা আজ পর্যন্ত চোখে দেখেননি। বর্তমানে মন্দিরে একটি সর্প বাহির হয়। ওই মন্দিরের পূজারি ইহা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যান। তখন ওই সর্প ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বলেন, 'ওহে পূজারি ঘাবড়াইয়ো না। আমি যাহা বলিতেছি, ভাল করিয়া শোনো। আমি কিছুদিন পর পৃথিবীতে আবির্ভূত হইব এবং যে ধর্মকে বিনাশ করিতেছে তাহাকে ধ্বংস করিব। যে-কেউ কৃষ্ণের নামে এই সংবাদ ১০০০ ছাপাইয়া বিতরণ করিবে—তাহার ১৪ দিনের মধ্যে মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আর যে পত্রটি পাইয়া ১৪ দিনের মধ্যে না বিলি করিবে তাহার প্রভূত ক্ষতি হইবে।' এই বলিয়া সর্পরূপী ব্রাহ্মণ তিন পা পিছনে হাঁটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।"

পুলিন পাতলা হলুদ কাগজের হ্যান্ডবিলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ডাকটিকিট মারা খামটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল। একটু আগে লেটারবক্স খুলে পেয়েছে। সাদা খামে পরিষ্কার বাংলায় লেখা তারই নাম, শ্রীপুলিনবিহারী পাল। প্রোঃ ইউনিক ফার্নিচার অ্যান্ড কেবিনেট মেকার। স্টেশন রোড, বাগুইপাড়া। রথতলা, জেলা ২৪ পরগনা।

তাকে চেনে এমন কেউ কাজটা করেছে। হয়তো কাছাকাছিই থাকে। আমাকেই শুধু নয়, নিশ্চয় আশপাশের অনেকেই পেয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

পুলিন খামটা পকেটে রেখে বাকি অংশটা পড়ল।

"এই সংবাদ শুনিয়া বোম্বাই-এর এক ব্যক্তি ২০০০ পত্র ছাপাইয়া বিলি করেন এবং ৩-৪ দিনের পর তিনি ১২ লক্ষ টাকা লটারিতে পাইয়াছিলেন। অন্য এক ব্যক্তি ৪০০ পত্র ছাপাইয়া বিলি করেন এবং তাহার ১৪ দিনের পর ১০ হাজার টাকা লাভ করেন। ধানবাদের এক রিকশাচালক ১৪০টি পত্র বিলি করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের ঘরে এক ঘড়া মোহর পান। অপর এক ব্যক্তি এই পত্রটিকে মিথ্যা বলিয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট করেন। ইহার পরই তাহার বড়ছেলে ১৪ দিনের মধ্যে মারা যায়।

"এই কথা সত্য মানিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রচার করিবেন। যিনি এই পত্রটি পাইবেন তাঁহাকে নিবেদন করা হইতেছে যে এই পত্রটি ছাপাইয়া ক্ষমতা অনুযায়ী বিলি করিবেন অথবা হাতে হাতে দিয়া দিবেন। পত্রটি যেন অবেহেলা করিয়া নষ্ট করিবেন না।"

বিনীত—
জনৈক ভক্ত

একচিলতে হাসি পুলিনের ঠোঁটে ভেসে উঠল। খামের মধ্যে কাগজটা ভরে রাখার আগে উলটেপালটে দেখল, কোথাও ছাপাখানার নাম নেই। থাকবে যে এমন আশা অবশ্য করেনি।

এক ধরনের ভীরু লোক এখনও প্রচুর আছে, যারা এমন কাগজ পেলে তখুনি গাঁটের পয়সা দিয়ে ছাপিয়ে খামে ভরে লোকের কাছে পাঠাবে। যেমন, একজন তাকে পাঠিয়েছে। এই আশায়, সে-ও বারো লাখ টাকা লটারিতে পাবার লোভে দু' হাজার ছাপিয়ে আর পোস্ট অফিস থেকে দু' হাজার খাম কিনে তাতে ভরে, দু' হাজার লোকের কাছে পাঠাবে। অবশ্য হাতে হাতেও বিলি করে খরচ বাঁচানো যেতে পারে।

হাসিটা তার সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। শুধুই কি লোভ? ভয়ও দেখানো হয়েছে—বড়ছেলে মারা যাবে।

পুলিনের ছেলেমেয়ে নেই, সে মোটেই শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রচারে আগ্রহী নয়। লটারির টিকিট জীবনে দু' বার কিনেছে, যখন বয়স তেইশ, কলেজের এক দরিদ্র সহপাঠীকে সাহায্য করার জন্য। তার নাম ছিল শোভনেশ। বছর সাতেক পর একদিন বউবাজারের মোড়ে শোভনেশ স্কুটারে বসেছিল ট্র্যাফিক সিগন্যালের অপেক্ষায়। পুলিনকে দেখেই চিনতে পেরে হেসেছিল।

"করছ কী?" পুলিনই জিজ্ঞাসা করেছিল।

"ইন্টিরিয়ার ডেকরেটিং-এর ব্যবসা।"

"ভাল আছ?"

"এই একরকম, তোমার খবর কী?"

বিয়ের পর পুলিন আর শিবানী তখন শ্যামপুকুরে ঘরভাড়া করে চার মাস বসবাস করছে।

"চলে যাচ্ছে।"

"করছ কী, চাকরি?"

"হ্যাঁ।"

পুলিনের মনে হয়েছিল, চাকরি শব্দটা শোভনেশের গালের পেশিতে সুড়সুড়ি দেওয়ায় মুখটা কুঁচকে ওঠে।

"আমি চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছি।"

"আমার বউও বলছে একটা সাইড বিজনেস ধরতে। দু'জনের রোজগারেও দেখছি চালানো যাচ্ছে না।"

"বউও চাকরি করে? নেমে পড়ো, নেমে পড়ো,... আমি তো লোহার স্ক্র্যাপের ব্যবসাও ধরেছি।"

"ভাগ্য চাই ভাই। লটারির টিকিট তো কত বেচলে, একজনও কি প্রাইজ পেয়েছে?"

ট্র্যাফিক চলার সংকেত পেয়ে শোভনেশ তখন স্কুটারে গিয়ার দিয়েছে। পুলিনের কথার সঙ্গে সঙ্গে একমুখ হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সফল হয়ে কাজ হাসিলের পর এমন হাসিই ফোটে। হাতটা তুলে বিদায় জানিয়ে শোভনেশ চলে যায়।

সাত বছর পর দেখা রাস্তার ওপর। কতক্ষণের জন্য? বড়জোর দু' মিনিট। আর তার মধ্যেই পুলিনের মনে হয়েছিল, শোভনেশ কত সহজ, স্বচ্ছন্দ, হালকা। জীবনটাকে উপভোগ করার পদ্ধতিগুলো ওর হাতের মুঠোয়।

ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সে ঈর্ষা বোধ করে নিজেকেও স্বচ্ছন্দ সচ্ছল দেখাবার জন্য বলেছিল স্বামী-স্ত্রী চাকরি করি। কথাটা ঠিকই কিন্তু বলার কি কোনও দরকার ছিল?

লটারির কথাটা তখন বলার কি কোনও কারণ ঘটেছিল? এটাও ঈর্ষা থেকে। ওকে মনে করিয়ে দেওয়া, তুমি এক সময় গরিব ছিলে। তোমাকে লটারির টিকিট বেচার জন্য অন্যের অনুগ্রহ চাইতে হত আর সেই অন্যদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু খোঁচা দিয়ে কী লাভ হল? শোভনেশ হেসে চলে গেল। অতীতকে ও আর গ্রাহ্য করে না।

পুলিন হলুদ কাগজটা খাম থেকে আবার বার করল। 'লটারি' শব্দটা শোভনেশের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। বারো লাখ টাকা! সারাজীবনে সে অত টাকা রোজগার করতে পারবে না। অবশ্য আফসোসও তার নেই। তার কাঠের ব্যবসা, এই দোকান নিয়েই সে যথেষ্ট ভাল রয়েছে।

উদ্যম, পরিশ্রম আর ধূর্ততা ছিল শোভনেশের মূলধন। মিশুকে, লোকের মন আর সময় বুঝে কথা বলত। কলেজের বেয়ারা থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের অনেকেই ছিল তার লটারি টিকিটের খদ্দের। ওর গছাবার ভঙ্গিটাই ছিল চমৎকার।

"বাড়িতে এগারোটা মুখ। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে বাবার ঘোরতর অনাস্থা, ট্রাম কোম্পানিব কেরানি, সংসারের একমাত্র রোজগারি। বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থাটা। আধপেটা খেয়ে সবাই থাকি। কিন্তু আমরা তথাকথিত ভদ্রলোক, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে সম্মানে বাধে। আমি বাবার বড়ছেলে, আমার উচিত তাঁকে সাহায্য করা। তাই করতেই এই টিকিট বিক্রি করছি। মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট বোঝেনই তো, ভিক্ষে তো সোজাসুজি চাইতে পারব না তাই সেটাকে কাজের একটা ছদ্মবেশ পরিয়ে নিয়েছি। তাতে এটুকু সান্ত্বনা পাই—আমি, ভিখিরি নই। আপনারাও স্বস্তি পান এই ভেবে, ভিক্ষে দিয়ে

অপমান করছি না। শুধু একটা কথা, টিকিট কিনলেই যে ফার্স্ট প্রাইজটা পাবেন সে সম্ভাবনা খুব কম। তবে ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার আছে। ভাগ্যটা কেমন সেটা জানার কৌতূহল থেকেই কিনবেন, বড়লোক হবার ইচ্ছেয় নয়।"

ডজন ডজন টিকিট শোভনেশের এইসব কথাতেই বিক্রি হত। উদ্যমী, একটার থেকে আর-একটা ব্যবসায় চলে যাবার সাহস আছে। এরাই সফল হয়। হয়তো স্কুটার ছেড়ে এতদিনে মোটরগাড়ি চড়ছে।

পুলিন দোকানের ভিতরে চোখ বুলিয়ে প্রসন্ন মনটা প্রকাশ করল আলতো হেসে। সেই হাসি দেখার জন্য তখন সামনের দুটো চেয়ারে কোনও লোক ছিল না।

অন্তত পঁচিশ হাজার টাকার মাল এখন তার চোখের সামনে। স্কুটার কেনার ইচ্ছা কয়েকবার মনে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু দরকারই বা কীসের জন্য, সে তো বেশিরভাগ সময় দোকানেই থাকে, খুব দূরেও তাকে কোথাও যেতে হয় না।

পাশের দোকান "রত্না স্টুডিও"-র মালিক সুকুমার বিশ্বাসের স্কুটার আছে, তাতে বার দুয়েক সে চড়েছে। সুকুমার বলেছিল, "দাদা, একটা কিনে ফ্যালো, হাজার ছয়-সাতে পুরনো পেয়ে যাবে। খোঁজ করব?"

পুলিন গলাটা কঠিন করে বলেছিল, "কিনলে নতুনই কিনব।"

সুকুমারের দোকান, স্কুটার শ্বশুরের টাকায়। পুলিন তার "ইউনিক ফার্নিচার অ্যান্ড কেবিনেট মেকার" গড়ে তুলেছে পরিশ্রম আর সততায়। এখন শুধু "ইউনিক" বললেই রথতলার এবং তার কাছেই নতুন গড়ে ওঠা দুটি উপনগরী ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরী-র লোকেরা চিনে নিতে পারে। মিনিট সাতেক দূরে বাগুইপাড়া স্টেশনের রিকশাওয়ালাদের ইউনিক বললে পৌঁছে দেয় দোকানে।

ইউনিকের মতো রাস্তার উপর পঁচিশ ফুট চওড়া কাঠের আসবাবের দোকান সারা বাগুইপাড়ায় আর দুটি মাত্র আছে, রেল লাইনের ওপারে স্টেশনের পশ্চিমে। ওই দিকেই প্রধান বাজার আর পুরনো অঞ্চল। রথতলা রেললাইনের পুবে, নতুন বসতির অঞ্চল।

ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরীই পুলিন এবং ইউনিকের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। এই দুই উপনগরীর অন্তত চল্লিশটি বাড়ির দরজা-জানলা এবং যাবতীয় কাঠের কাজের বরাদ্দ ইউনিক সংগ্রহ করে। দোকানের পিছনে চালাঘরের একটা কারখানা, এক সময় সারাদিন এবং রাতেও কাজ করেছে কাঠমিস্ত্রিরা। আজও করে, তবে দরজা-জানলার থেকে বেশি তৈরি হয় খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবল, ড্রেসিং টেবল।

বিক্ষুব্ধ সাগরে তরণীকে সামাল দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটা সময়ে প্রচণ্ড বাষ্পের চাপ দরকার হয়েছিল। ইউনিককে দাঁড় করাতে কয়েকটা বছর পুলিনকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। এখন আর তার দরকার হয় না। ইউনিক এখন স্থির সাগরে তরতরিয়ে চলেছে। খদ্দেররা এখন খোঁজ করে পুলিনেরই কাছে আসে। ইউনিক যে টাকায় যে কাজ যত ভালভাবে করে আর কেউ তা পারে না।

সাড়ে আট বছর আগে ইউনিকের নাম ছিল সারদামাতা টিম্বার। মালিক ছিল নিরঞ্জন পোদ্দার। স্থানীয় লোকেরা বলত নিরঞ্জনের কাঠগোলা। তক্তপোশ, বেঞ্চ, পিঁড়ি, আলনা তৈরি হত। নিরঞ্জন মারা যাবার পর তার একমাত্র ছেলে সুখরঞ্জন কিছুদিন দোকানে বসে। কিন্তু নামমাত্র কেনাবেচার এই ব্যবসাটা তাকে হতাশ ও বিরক্ত করে তোলে। তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার জন্য সে বাংলাদেশে চোরাচালান দেওয়া এবং সে-দেশ থেকে আনার কাজে নামে। অতঃপর কলকাতায় আস্তানা করে জুয়ার চক্রে জড়িয়ে অবশেষে এমন একটা অবস্থায় আসে যে জেল খাটা রোধ করতে বাগুইপাড়ার সম্পত্তি বিক্রি না করে উপায় ছিল না।

পুলিন তখন উকিলের বাড়ি যাতায়াত করছিল নিজের মামলার ব্যাপারে। সেখানেই সুখরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। একজনের তক্ষুনি টাকা দরকার, আর একজন তখন ভাবছিল চেনা পরিচিতদের দৃষ্টির বাইরে কোথাও গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে।

কলকাতা থেকে ট্রেনে চল্লিশ মিনিট দূরে মুখ থুবড়ে পড়া একটা ছোট কাঠের আসবাবের দোকানের মালিক হওয়ার সুযোগ পুলিন হাতছাড়া করেনি। মৃত শিবানীর গহনা, ব্যাঙ্কে জমানো টাকা, প্রভিডেন্ড ফান্ড, ঘরের আসবাব বিক্রি করে সে সারদামাতা টিম্বারের ঘর ও সাড়ে চার কাঠা জমি কিনে নেয়। ঘরের মধ্যে তখন হাজার টাকারও মাল ছিল না।

টালির চালের একটা লম্বা ঘর, মাটির মেঝে, তিন ফুট পাকা গাঁথুনির উপর ছিটে বাঁশের দেয়াল। ঘরের পিছনে আড়াই কাঠার মতো জমি। পুরো সাড়ে চার কাঠাই ঘেরা নিচু পাঁচিলে। এই ছিল সারদামাতা টিম্বার। পিছন দিকে একটা গৃহস্থ পাড়া। বাঁ দিকে একটা ফাঁকা জমি তারপর মাটির দেয়াল আর টালির চালের টিমটিমে একটা মুদির দোকান। তার পাশে মিষ্টির আর চায়ের দোকান।

ওইখানেই রথতলার মোড়। তিনদিক থেকে তিনটে রাস্তা এসেছে। প্রধান রাস্তাটা বাগুইপাড়া স্টেশন থেকে, হেঁটে মিনিট সাতেক লাগে রথতলায় পৌঁছতে। পুলিন যখন প্রথম এল স্টেশনের পুব দিকের এই অঞ্চলে হাজার খানেকের বেশি অধিবাসী ছিল না। ইলেকট্রিক খুঁটি রথতলার মোড় পর্যন্ত পৌঁছেছে, অনেকের বাড়িতে বিজলীর সংযোগ হয়নি। পুরনো কিছু দোতলা বাড়ি ছাড়া, একতলা বাড়িই ছিল বেশি, তারও বেশির ভাগ টিনের চালের। রথতলা থেকে একটু ভিতরে গেলেই, ধানখেত, পুকুর, ফলের বাগান, ঝোপ জঙ্গল, পোড়ো জমি দেখা যেত। রেললাইন পেরিয়ে যেতে হত মাধ্যমিক স্কুলে।

শেয়ালদা থেকে বাগুইপাড়া তেইশ কিলোমিটার কিন্তু রথতলাকে তখন মনে হত দু'শো তিরিশ কিলোমিটার দূরে পড়ে আছে। কলকাতায় যা পাওয়া যায় বাগুইপাড়ায় তা অলভ্য নয়।

তখনই পাঁচটি ব্যাঙ্কের শাখা পুলিন দেখেছে। এখন সাতটি ব্যাঙ্ক। দুটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়, সিনেমা হল সিকি মাইলের ব্যবধানে দুটি, একটি নার্সিংহোম, কলকাতা থেকে বাগুইপাড়া স্টেশনে যাত্রীবাস আসে। সাইকেল রাখার তিনটি গ্যারেজে অন্তত বারোশো সাইকেল জমা পড়ে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারদেব জন্য বহু দোকান রাত এগারোটা পর্যন্তও খোলা থাকে।

পুলিন একটা জিনিস প্রথমেই বুঝে গেছিল, বাগুইপাড়া থেকে কেউ খাট বা আলমারি কিনতে ইউনিক-এ আসবে না। চারটি বড় ফার্নিচারের দোকান সেখানে আছে। তাকেই অর্ডার ধরতে বেরোতে হবে। সে নজর দিয়েছিল তৈরি হচ্ছে বা হবে এমন বাড়িগুলোর দিকে। দরজা জানলার ফ্রেম, পাল্লা, দেয়াল আলমারি, পর্দার পেলমেট এমনকী লেটার বক্স তৈরির কাজ ধরার জন্য সকাল থেকে রাত, সে দিনের পর দিন হেঁটেছে, খোশামোদ করেছে, যৎসামান্য লাভে কাজ নিয়েছে, টাকা মাব গেছে, অপমানিত হয়েছে কিন্তু হাল ছাড়েনি। তখন সে নিজে রান্না করে খেত।

তার ভাগ্যটা ফিরতে শুরু করে অপ্রত্যাশিত দুটি উপনগরীর যখন পত্তন হল রথতলারই কাছে। বাড়ি করার জন্য জমি কেনার যে ঝোঁক সত্তরের দশকের শুরুতেই দেখা দেয় তারই পরিণতিতে জমির দাম ঘনবসত অঞ্চলে যতই বেড়ে উঠতে লাগল, জমি যতই ফুরিয়ে আসতে লাগল, অবহেলিত, অনুন্নত জায়গার দিকে তখন জমির সন্ধান শুরু হয়।

বাড়ি করার এই ঢেউয়ের একটা ধাক্কা রথতলাকে হঠাৎ গুরুত্ববান করে ফাঁপিয়ে দিয়ে গেল। বহুলোক তখন জমি কেনাবেচার দালালিতে নেমে পড়ে। অনেকেই মুনাফার গন্ধ পেয়ে জমি কিনে রাখতে শুরু করে, পরে চড়াদামে বিক্রির জন্য।

স্টেশনের পুবে বাস চলাচল, রাস্তার দু'ধারে গত তিরিশ বছরের মধ্যে তৈরি হওয়া সারিবদ্ধ পাকাবাড়ি। জমির দাম সেখানে বরাবরই বেশি। যতই দিন গেছে বাগুইপাড়ার ভিতরের অঞ্চলের ফাঁকা জমির সংখ্যা দ্রুত কমেছে। এই বাস রাস্তারই সমান্তরাল, ভিতরে রথতলার ইট বিছানো কাঁচা রাস্তা, যেখান দিয়ে সাইকেল রিকশা ছাড়া আর কোনও যান চলত না, সেখানে একদিন অপরিচিত মুখের যাতায়াত শুরু হল। জমির খরিদ্দার আর দালাল।

সেই সময় এক রবিবার সকালে ইউনিকে হাজির হয়েছিল দুটি লোক। মাঝবয়সি, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, চেহারায় মধ্যবিত্ত। গরমের দিন, ওরা দরদর ঘামছিলেন।

সারদামাতা টিম্বারের বোর্ডটি খুলে রাখা ছাড়া দোকানের সামনের দিকে কোনও রূপান্তর তখনও ঘটেনি। টেবলে খবরের কাগজ পেতে পুলিন মাথা নিচু করে পড়ছিল।

'এখানে অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

পুলিন তখন চার-পাঁচজন গেরস্ত ছাড়া এলাকার লোকেদের নাম জানে না, যদিও অনেকের মুখ চেনে। বিব্রত মুখে সে কাগজটা ভাঁজ করতে করতে স্বগতোক্তির মতো 'অবিনাশ...অবিনাশ' বলতে থাকে।

'রথতলায়' নাম বললেই নাকি বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

"আমি এখানে নতুন। আচ্ছা আপনারা একটু বসুন আমি দেখছি।"

ভিতরে এসে বেঞ্চে দু'জনে বসলেন। পুলিন পাশের মিষ্টির দোকানের কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করতে গেল।

'অবিনাশ তো দু'জন আছে এখানে। ভেতর দিকে থাকে একটা রোগা মতন, ফরসা অল্পবয়সি ছেলে যার বাবা ক'দিন আগে আপনার কাছে এসেছিল দেয়াল আলমারির কাঠ কিনতে। ওদের পদবি মুখুজ্জে। আর একজন, এই পুব দিকে গিয়ে টিউকল, তার পাশ দিয়ে, একতলা পুরনো বাড়ি, ওখানে আছে এক অবিনাশ। বুড়ো লোক। ওরাও মুখুজ্জে।'

পুলিন মজা পেল, দুই মুখুজ্জে অবিনাশের খোঁজ পেয়ে। মুদির দোকানের বসন্ত একই কথা বলল।

"মুশকিল হয়েছে। এখানে দু'জন অবিনাশ মুখুজ্জে আছে। একজন অল্পবয়সি আর একজন বয়স্ক।"

লোকদুটি হতাশ হয়ে পুলিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আপনাদের দরকারটা, মানে, এদের মধ্যে কাকে মনে হয় আপনাদের দরকার?"

আমরা এসেছি জমি দেখতে। আমাদের অফিসের একজনের কাছে খবর পেলাম এদিকে বাড়ি করার জমি আছে। তা আজ সোজা চলেই এলাম। স্টেশনে একটা সিগারেটের দোকানে জিজ্ঞাসা করতে বলল, রথতলার দিকে জমি আছে বিক্রির জন্য, অবিনাশ মুখুজ্জে থাকে ওখানে তার কাছে খোঁজ করুন, নাম বললেই দেখিয়ে দেবে বাড়ি।'

'এদিকে জমিটমি বিক্রি হচ্ছে বলে তো শুনিনি।'

'কিন্তু আমরা তো শুনেছি এদিকটা খুব ডেভেলাপ করবে, নতুন দু'-তিনটে কলোনি তৈরি হবে, রাস্তা বাঁধানো হবে, ইলেকট্রিকও এসে যাবে আর সে-জন্য নাকি বহু লোক এদিকে জমি কিনছে। এইসব শুনেই তো আমরা এলাম।'

পুলিন অবাক হয়ে যায়। বাইরের লোক এত জানে অথচ সে জানে না তার চারপাশে কী হতে চলেছে। সত্যিই যদি এই রকম উন্নতি ঘটে তা হলে রথতলার চেহারাই তো পালটে যাবে। উত্তেজনা বোধ করলেও, সে শান্ত থাকার চেষ্টা করল।

'আমি অবশ্য এখনও কিছু শুনিনি, তবে আপনারা পুব দিকে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা টিউবওয়েল দেখতে পাবেন, সেখানে একজন অবিনাশ মুখুজ্জে থাকেন, একতলা পুরনো বাড়ি। আমার মনে হয় ওঁকেই হয়তো আপনারা খুঁজছেন।"

'দেখি একবার।'

লোক দুটি পুব দিকে এগিয়ে গেল। পুলিন তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তখন তার মনে হয়েছিল জীবনটা আবার ভাল করে আরম্ভের জন্য প্রস্তাব নিয়েই যেন লোক দুটি এসেছে।

লটারিতে বারো লক্ষ টাকা পাওয়ার মতোই একটা শিহরন সেদিন সে পেয়েছিল। তছনছ হয়ে যাওয়া, তার মন, শরীর এবং সামাজিক উপযোগিতাকে গুছিয়ে নেবার একটা সুযোগ সে দেখতে পায়। আবার তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, লোকজনের সামনে মাথা তুলে বেরোতে হবে আর সে-জন্য পৃথিবীর সঙ্গে সব সংযোগ ছিঁড়ে এক বগ্গা হয়ে শুধু ইউনিককে নিয়েই সে থাকবে। লোহার মতো কঠিন এই সংকল্পটা সেদিন তার চেতনায় ঢুকে গিয়েছিল।

পুলিন তাই-ই থেকেছে প্রথম পাঁচটা বছর। দোকানের পিছন দিকে নিরঞ্জন পোদ্দারের করে রাখা ছোট টালির ঘরটায় একটা তক্তপোশ, কেরোসিন স্টোভ, হ্যারিকেন, রান্নার দু'-তিনটি বাসন আর সারদামণি টিম্বারের একটা কাঠের আলমারিতে কিছু খাতা, ব্যাঙ্কের পাসবই নিয়ে সে নতুন জীবন এবং প্রতিষ্ঠা পাবার কাজ শুরু করেছিল। তখন বয়স তার মাত্র পঁয়ত্রিশ এবং এই পঁয়ত্রিশটা অতিক্রান্ত বছরকে সে চেষ্টা করে করে খসিয়ে দিয়েছে তার জীবনের কাণ্ড থেকে। এই বছরগুলোকে আর তার দরকার নেই, সে ওগুলোর অন্তর্গত থাকতে চায় না। নতুন একটা অধ্যায় শুরু করার জন্য সে বদ্ধপরিকর হয়ে পরিশ্রম করেছে, এবং তার ধারণা, সে পেরেছে।

"কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!"

পুলিন কথাটা বলেই হলুদ কাগজটা মুঠোর মধ্যে দলা পাকাতে পাকাতে রাস্তার ওপারে দর্জির দোকানে সে ঢুকল।

দুই

সোম থেকে শনি, দিনে দু'বার তার দোকানের সামনে দিয়ে ও যায়। সকাল আটটা-ছত্রিশের ট্রেন ধরতে। ফেরে ছ'টা দশ বা ছ'টা আটত্রিশের ট্রেনে, কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সপ্তাহে বারোবার পুলিন ওকে দেখতে পায়। কখনও কখনও ছুটির দিনেও দেখা যায়, তবে সেটা অনিশ্চিত।

আজ ব্যাঙ্কের হাফ ইয়ার্লি ক্লোজিং। গত পরশু রথ ছিল। পুলিন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তালপাতার ভেঁপু বাজিয়ে বাচ্চাদের রথ টানা দেখছিল। তখনই ও ফিরছিল। প্রতিদিন যেমনভাবে হাঁটে, হালকা পায়ে মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে।

একটা কমদামি একহাত উঁচু রথ, তাতে গাছের পাতা কিছু ফুল, মাটির একটা পুতুল সম্ভবত জগন্নাথের আর জ্বলন্ত মোমবাতি সহ গর্তে পড়ে উলটে গেল। বাচ্চা দুটি রথটাকে সোজা করে তুলল। তোলা দেখে মনে হল আগেও কয়েকবার এমন ব্যাপার ঘটে গেছে।

ছুটে গিয়ে ও মুখটা নামিয়ে ঝুঁকে বাচ্চা দু'জনকে কী বলল। তারপর উবু হয়ে বসে পাতাগুলো ঠিকঠাক করে সাজিয়ে দেবার সময় একটা গোলাপ ফুল বসিয়ে দিল রথের চুড়োয়। পুলিন প্রথমে লক্ষ করেনি গোলাপটিকে। আরও তিন-চারটি দেখতে পেয়ে তার মনে হল ফুলগুলি টাটকা সম্ভবত বাড়ির গাছের। জগন্নাথকে যথাস্থানে বসিয়ে, নেভা মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ও এধার ওধার তাকাচ্ছে।

পাঞ্জাবির পকেটে আপনা থেকেই চলে গেল পুলিনের হাত। দেশলাই বার করে সে দ্রুত এগিযে গেল।

'আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি।'

'দিন তা হলে।'

পুলিন এই প্রথম ওর কণ্ঠস্বর শুনল। তার কাছে মিষ্টিই মনে হল। তার থেকেও বেশি মনে হল বলাব ভঙ্গিটা স্বচ্ছন্দ, আর কেমন একটা ছেলেমানুষি ধরন রয়েছে।

বাতিটার সলতে নিচু করে ধরে দাঁড়িয়ে পুলিন কাঠি জ্বালিয়ে সলতেয় ছোঁয়াবাব আগেই বাতাসে নিভে গেল।

'এ-ভাবে হবে না। আপনি কাঠিটা জ্বালিয়ে দু' হাতের মধ্যে রাখুন আমি ধরিয়ে নিচ্ছি।'

পুলিন তাই করল। যখন ও তার দুই তালুর মধ্যে মোমবাতিটা ধরাচ্ছে তখন সে তিন-চার সেকেন্ড সময় পেয়েছিল মুখের দিকে তাকাবার। ছ'-সাত গজ দূর থেকে দেখা চলমান নৈর্ব্যক্তিক মুখ আর মনোযোগে কাজে ব্যস্ত এই স্থির মুখের মধ্যে অনেক তফাত। একটা মানুষের ভিতরের চেহারাটা আয়নার মতো বিম্বিত হয় যখন একাগ্র হয়ে কিছু করে।

দেশলাইয়ের আলোয় মুখের রং মোমের মতোই দেখাল। টিকোলো নাক, পুরু ঘন ভুরু, চোখ একটু ভিতরে ঢোকানো, এবং ভ্রমরের মতো কালো মণি। পাতলা দুটি ঠোঁট টিপে ধরে থাকায় গালে টোল পড়েছে। কানের লতিতে দুটি মুক্তো, বোধহয় আসলই। তেল না দেওয়া চুলে সিসে রং, চিবুকের নীচে একটা নরম ভাঁজ।

সারা মুখে কৌতূহল মাখানো এমন একটা সারল্য যেটা শিশুদের মুখেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিভ্রান্তি হয় ওই মুখটিকে বহনকারী দেহটির দিকে তাকালে। ছাপা শাড়িতে সতর্ক যত্নে, গোড়ালি থেকে ঘাড় পর্যন্ত মোড়া তবু প্রবল স্বাস্থ্য, তারুণ্যের প্রাচুর্য ছিটকে ওঠে প্রতি পদক্ষেপে। আত্মপ্রত্যয়ের একটা ঘূর্ণি সঙ্গে সঙ্গে চলে ওকে ঘিরে। পুলিন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন ব্যক্তিত্ব আর সবলতা যদি শিবানী পেত! দেহের প্রতিটি অংশের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য! যেন মাপজোক করে গড়া।

বহুবার মনের গভীরে তার ইচ্ছা হয়েছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন সমন্বয়টাকে স্পর্শ করে বুঝে নিতে। অবাস্তব ইচ্ছা, তবু ভাবতে গিয়ে একটা অস্বস্তিকর মাদকতা সারা শরীরে ছড়াতে ছড়াতে মাথার ভিতরে স্থান করে নেয়।

এত কাছের থেকে পুলিন আগে কখনও ওকে দেখেনি। দূর থেকে দেখলে যে সরলতা আপনা থেকেই সমীহের মতো একটা ব্যবধান গড়ে দেয়, কাছের থেকে ওকে কিন্তু তার খুব সাধারণই মনে হয়েছিল। মোমবাতিটা কাত করে কয়েকটা ফোঁটা মোম রথের কিনারের কাঠে ঝরিয়ে বাতিটা তাতে বসিয়ে দিল।

'কতক্ষণ যে থাকবে। ...এবার আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে চলো।'

'আপনার বাড়ির রথ?' পুলিন অযথা প্রশ্ন করেছিল।

'হ্যাঁ।...দাঁড়াও বুলু দাঁড়াও। তোমরা রথটাকে সামলে ধরো আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি।'

এগিয়ে গিয়ে রথের দড়িটা ধরে ও ধীর গতিতে টেনে নিয়ে চলল। বাচ্চা দুটো রথটাকে দু' পাশ থেকে ধরে আছে। রথের চুড়োয় গুঁজে রাখা গোলাপটার পাপড়িতে অদ্ভুত এক সজীবতা পুলিনের চোখে লাগল। এত উজ্জ্বল ফুল সে কখনও দেখেনি।

মোমবাতিটা বাতাসে আবার নিভে গেল। পুলিন শুনতে পেল ওর গলা, 'থাক গে আর জ্বালাতে হবে না।'

দলাপাকানো হলুদ কাগজটা পুলিনের হাতেই রয়ে গেছে। সে ওপারের শ্রীময়ী টেলর্সের দিকে তাকিয়ে রইল।

"দাদা সত্তরটা টাকা দিন, অজিত কলকাতা যাচ্ছে।"

পুলিন বিস্মিত চোখে দেবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। দেবুকে সে ম্যানেজার বলে পরিচয় দেয়। বাইরের কাজের তদারকি ছাড়া দোকানেও বসে পুলিন উপস্থিত না থাকলে। চতুর, অল্পবয়সি, খাটিয়ে ছেলে। বাগুইপাড়া স্টেশনের পশ্চিমে থাকে।

"কাল বললাম না আলমারি আর টেবিলের জন্য লক কিনে আনতে হবে, তা ছাড়া আধ ইঞ্চি রডও..."

"কেন, রড তো এই সেদিন কিনে আনল। দেখ তো পেছনের আলমারির মাথায় রয়েছে কি না।"

"দেখেছি, হয়তো হাত দুয়েক মতো একটা পড়ে আছে। চৌধুরিদের পাঁচটা পেলমেটে অন্তত আট মিটার লাগবে। সেই সঙ্গে চার ডজন পর্দার রিংও নিয়ে আসুক।"

শ্রীময়ী টেলর্সের দিকে একবার তাকিয়ে পুলিন দোকানের কোণে ঘেরা জায়গাটায় গেল। সারা ঘরটাই আসলে শো-রুম। ঘরজুড়ে তৈরি জিনিস সাজিয়ে রাখা। পালিশ করা কাঠে, আয়নায় নানা রঙের সানমাইকায় চারটে নিয়ন টিউবের আলো যখন পড়ে দোকান ঝলমল করে। কোণের ঘেরা জায়গায় তার অফিস। দু'দিকে পাকা দেয়াল, একদিকে ছ' ফুট উঁচু কাঠের পার্টিশন চতুর্থ দিকটা খোলা। একটা চার ফুট বাই দু' ফুট স্টিলের টেবল তাতে তিনটি ড্রয়ার। পুলিন বসে ফোম রাবারে মোড়া স্টিলের চেয়ারে। সামনে দুটি হাতলওলা কাঠের চেয়ার। খাতা, বিল বা চালানের কাগজপত্র সবই থাকে ড্রয়ারে। টেবলটা তাই পরিষ্কার। দেয়ালে ইংরেজি ও বাংলা ক্যালেন্ডার, একটিতে বিবেকানন্দর ও অন্যটিতে ডালিয়া ফুলের ছবি। ব্রাকেটে ধুলো মাখা একজোড়া মণিপুরি পুতুল, তার উপরের ব্রাকেটে গণেশ।

চেয়ারে বসে চাবি দিয়ে ড্রয়ার খোলার সময় পুলিন পলকের জন্য সামনে তাকাল। আলমারির পাল্লায় লাগানো আয়নায় এই সাত ফুট বাই দশ ফুট অফিস কামরার প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। ওই জায়গাটায় সব সময় সে আয়না দেওয়া আলমারি রাখে। বিক্রি হয়ে গেলেই আবার একটা রেখে দেয়। নিজেকে দেখতে তার ভাল লাগে।

দেবু টাকা নিয়ে চলে যাবার পরই সে ড্রয়ার থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াল। চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা চওড়া দেখাচ্ছে। সে জানে, ঘন চুলের আড়ালে একটা চরা তার চাঁদিতে দেখা দিয়েছে। কানের উপরে কিছু চুল পেকেছে। কোমরের দু'ধারে আর আগের মতো শক্ত ভাঁজ নেই। নাভি ঘিরে মসৃণ রবারের ব্লাডারের মতো হালকা চর্বির বেড়া। বয়স তো হচ্ছে!

কিন্তু বয়সের কথা এখন ভাবতে গেলে শ্রীময়ী টেলর্সের কাউন্টারে কেউ তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। খামটা কোথায়? পুলিন পকেটে হাত দিয়ে দলাপাকানো কাগজটাও পেল খামের সঙ্গে।

সলিল বসাক পুরনো ব্লাউজটা কাউন্টারে বিছিয়ে বলল, "গলা, ঝুল, হাতা ঠিক এই রকমই থাকবে তো?"

"হ্যাঁ, শুধু ঝুলটা এক ইঞ্চি বাড়বে।"

সলিল ব্লাউজ পিসটা ফিতে দিয়ে মাপতে শুরু করল। সেই সময় পুলিন দোকানে ঢুকল।

"এই দেখ একটা কী পেয়েছি।"

হলুদ কাগজটা সে এমনভাবে কাউন্টারে রাখল যেন ওর চোখে পড়ে। পুলিন লক্ষ করল, ওর দৃষ্টি কাগজটার ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল, কিন্তু কৌতূহলী হল না।

"কী এটা?"

"পড়েই দেখ না।"

"আপনার নাম?"

"তুষারকণা মুখার্জি।"

"ঠিকানা?"

"কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখার্জি, রথতলা।"

যে কৌতূহলটা এতদিন কুয়াশায় ঢাকা থেকে পুলিনের কাছে রহস্যময় লাগত, হঠাৎ প্রকাশিত সূর্যকিরণে সেটা উবে গেল। নাম আব বাড়িটা জানা হল। একটা প্রফুল্ল আমেজ তাকে ছুঁয়ে গিয়ে ঝরঝবে বোধ করাল।

রশিদটা হাতে নিয়ে তুষারকণা ভাঁজ করতে করতে বলল, "কবে পাব?"

"সামনের রোববার. হ্যাঁ খোলা থাকে, আমাদের সোমবার বন্ধ। শনিবারও পেতে পারেন, যদি তৈরি হয়ে যায়।"

"আপনারা বাচ্চাদের মানে সাত-আট বছরের ছেলেদের জামা প্যান্ট করেন?"

"করি।"

তুষারকণা চলে গেল। পুলিনের উৎসাহ রইল না কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নিয়ে আব কথা বলার।

"কী এটা পুলিনদা?"

"এমন জিনিস দেখেছিস কখনও?"

সলিল কয়েক লাইন পড়ে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "নতুন কিছু নয়, অনেক দেখেছি, তুমিই প্রথম দেখছ।"

পুলিন একটু হতাশ হল। সলিল তার থেকে কম করে বাবো বছরেব ছোট। অভিজ্ঞতায় ওব থেকে পিছিয়ে থাকলে নিজেকে খাটো মনে হয়।

"অবিনাশ মুখুজ্জেকে দেখেছিস?"

"কে?"

"এই যে বিলে লিখলি, কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখুজ্জে।"

"না। দেখে কী লাভ, সায়া ব্লাউজ কবাবে?"

"সাত-আট বছর আগে কলকাতা থেকে দুটো লোক আমার দোকানে এসেছিল অবিনাশ মুখুজ্জের খোঁজে। তখন এখানে বাগান, ডোবা, এই রাস্তাটা ছিল কাঁচা, বর্ষা হলে কাদায় আর হাঁটা যেত না। এই কমলাপুরী ছিল তখন ধানখেত। এখন কল্পনা করতে পারবি না, দুটো কেউটে সাপ মেরেছি দোকানে।

"তা সেই লোক দুটো এসেছিল জমি কিনতে। অবিনাশ মুখুজ্জে নাকি জমি বেচবে। আমার তখন মনে হল, অঞ্চলটা যদি ডেভেলাপ করে তা হলে জমির চাহিদা হবে আর সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়বেই। কিছু জমি কিনে বাখলে মন্দ হয় না। কিন্তু তখন জমিতে ঢালার মতো টাকাও হাতে নই। তবু ভাবলুম গয়নাটয়না দিয়ে পাঁচ-দশ কাঠা জমি যদি আটকে রাখি তা হলে হাতে টাকা পেলে বাকিটা শোধ কবে কিনে নেব আর টাকা জোগাড় না হলে রিসেল করে দেব।

"ফিরে যাবার সময় লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করে জানলাম জমি পছন্দ হয়নি, আরও বড় প্লট চায়। ওদের আসার তিন-চার দিন পর গেলুম অবিনাশ মুখুজ্জের কাছে। বুড়ো মানুষ। প্রচুর জায়গা-জমি একসময় ছিল। বসে বসে খেয়ে আর মামলা মোকদ্দমা করে সবই গেছে, শুধু ওই ভিটে আর সঙ্গে পাঁচ কাঠা জমি তখন অবশিষ্ট। দুই মেয়ে দুই ছেলে। এক ছেলে কলকাতায় আর একজন দুর্গাপুরে, তাদের কোনও ইন্টারেস্ট নেই এই ভাঙাবাড়িতে। টাকা পয়সাও দেয় না, বাপ-মাকে দেখতেও আসে না। মেয়ে দু'জনের বিয়ে তিরিশ বছর আগে হয়ে গেছে। বুড়োবুড়ি একা, খেতে পায় না বললেই চলে। টাকার খুবই দরকার।

"আমি বললুম, পাঁচ কাঠাই নেব। তখন এখানে পাঁচ হাজার করে কাঠা, আর ওই জমি কিনা আঠারো হাজারে বিক্রি করল মদন গোঁসাই, চার মাস আগে। তাও রাস্তার ওপর নয়, ভিতরে।"

"তুমি তখন নিলে না?" সলিল অকৃত্রিম আফসোস জানাল।

"টাকা ছিল না। আমি অবশ্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম, মাসে মাসে পাঁচশো করে দিয়ে যাব তারপর যেমন যেমন পাব পঁচিশ হাজারের বাকিটা থোক দিয়ে দেব। ওদের তো খাওয়া-পরা ছাড়া টাকার আর তো কোনও দরকার নেই। কিন্তু বুড়ো রাজি হয়েও হচ্ছিল না। রোজ একবার করে গিয়ে বোঝাতাম। দেখি, ভাবি, ছেলেদের জিজ্ঞেস করি, এই সব বলত। ছেলেরা জানতে পেরে আর টাকার গন্ধ পেয়ে বাপের কাছে ছুটে এল। যা হয় আর কী! মদন গোঁসাইও খোঁজ রাখছিল। পুরো টাকা নিয়ে হাজির হল। দু'দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি করে, দুই ভাই টাকা ভাগাভাগি করে সেই যে কেটে পড়ল, আর এ-মুখো হয়নি।"

"বাপ-মার জন্য কিছু রাখল না?"

"ভাঙা বাড়িটা রেখে গেল।"

"তাতে কী হল! বাড়ি দিয়ে তো আর রান্নাবান্না হয় না। সে-জন্য পয়সা লাগে চাল ডাল কিনতে হয়!"

"এত খবর আর রাখি না।"

"ইনি তা হলে অবিনাশ মুখুজ্জের কে হন? পদবি দেখে তো মনে হচ্ছে আত্মীয়ই।"

জানবার ইচ্ছাটা পুলিনেরও কম নয়। কিন্তু সলিলের কাছে তা প্রকাশ করতে কেমন বাধো বাধো ঠেকল। অবিনাশ মুখুজ্জের আত্মীয় কি না সেটা এক সময় বার করে ফেলা যাবে কিন্তু তুষারকণা সধবা, বিধবা না কুমারী সেটা আগে জেনে নেওয়া আরও জরুরি। সিঁথি সাদাই দেখেছে, হাতেও শাঁখা বা রুলি নেই। অবশ্য অনেক সধবাই এ-সব এখন পরে না। কিন্তু মুখুজ্জে বাড়ি যথেষ্ট সেকেলে, কয়েকবার ওই বাড়িতে গিয়ে এটা সে বুঝতে পেরেছে। বিয়ে হলে এই পরিবারের মেয়ে বা বউ সিঁদুরটুকু পরবে না, তা কিছুতেই হতে পারে না।

"কী দরকার আমার এ-সব খবর জেনে, খাট আলমারি যদি কেনে তো মাথা ঘামাতে রাজি।"

"টাকা রোজগার ছাড়া পুলিনদা তোমার আর অন্য চিন্তা নেই। কে খাবে তোমার টাকা?"

"শ্যাল কুকুরে খাবে।"

ইউনিকের সামনে ছোটখাটো, শীর্ণ চেহারার এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে ভিতরে কেউ আছে কি না খুঁজছেন। পুলিন তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে এল।

"এই যে।"

পুলিনকে দেখে লোকটি আশ্বস্ত হল। আধময়লা সাদা ফুলশার্ট, ধুতি। কালো ফ্রেমের চশমা, গাল দুটি বসে যাওয়ায় হনু উঁচু, গায়ের রং আবলুস। জুতোয় বহুদিন কালি পড়েনি। কাঁধ দুটি সরু। চোখ দুটি স্তিমিত।

লোকটি পেছনেব পাড়ার কেন না পুলিন এঁকে দোকানের পাশের গলি থেকে বেরোতে এবং ঢুকতে দেখে প্রতিদিন। নাম জানে না, আলাপও নেই। এখানকার পুরনো বাসিন্দা। ধীর গতিতে হাঁটেন মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে। জটিল কোনও অঙ্কের মধ্যে ডুবে যাবার মতো একটা অবস্থা ওঁর মুখে তখন ফুটে থাকে। জামা আর কাপড়টা সোমবার পাটভাঙা ধবধবে থাকে, এক-একটা দিন যায় আর পেনসিলে টানা দাগের মতো হয়ে যায় ভাঁজগুলো।

"আসুন দাদা, ভেতরে আসুন।"

তুষারকণা সপ্তাহে ক'টা শাড়ি পরে? কাল পরেছিল তাঁতের, সাদা খোলে খয়েরি ডুরে প্রায় দেড় বিঘৎ সবুজ-মেরুন পাড়।

মেরুণ রংটা সবুজের সঙ্গে ভালই ম্যাচ করে যদি রং ফরসা হয়। প্রায় এমনই একটা শাড়ি শিবানীরও ছিল। সেই রাতে ওটাই ছিল ওর পরনে, তবে পাড়টা এত চওড়া নয়।

"আমার বড়মেয়ের বিয়ে। খাট আর ড্রেসিং টেবল,... কেমন পড়বে?"

"নানান কোয়ালিটির আছে, দামও সেই অনুযায়ী।"

"আমার তো কোনও আন্দাজ নেই তাই দরটা জানার জন্য এলাম।"

হাতল ধরে কুঁকড়ে বসে আছেন চেয়ারে। দুটি কাতর চোখে ভয় ভয় ভাব, পুলিন যেন এমন একটা অঙ্ক না বলে যেটা ওর সাধ্যের বাইরে হবে। নাকটা কুঁচকে উঠেছে বোধ হয় পালিশের গালা আর স্পিরিটের গন্ধে। অনেকেরই গন্ধটা সহ্য হয় না।

"আপনি আগে জিনিস দেখুন, দামের জন্য চিন্তা করছেন কেন।"

পুলিন মুখ ফিরিয়ে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা সানমাইকা লাগানো নানান রঙের এবং নকশার খাটের দিকে তাকাল।

"না না, দেখব তো বটেই, তবে দামের একটা আন্দাজ আগে পেলে ভাল হয়।"

"খাট তো বিয়েতে দেবেন, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির পাঁচজনে দেখবে, মোটামুটি চলনসই, বারোশো-র কমে ইংলিশ ডবলবেড হয় না। টিকবেও, সাত-আট বছর হেসেখেলে ব্যবহারও করতে পারবে।"

"আর ড্রেসিং টেবল?"

"বেলজিয়ান গ্লাস বসানো, একটা টুল সমেত, দুটো টানাওলা, তা...আটশো-র মতোই ধরুন।"

"এটা কি বেশি দামেরটা?"

লোকটির বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে পুলিনের মায়া হচ্ছে। হয়তো আবও দু'-তিনটি মেয়েব বিয়ে দেওয়া এখনও বাকি। রিটায়ারমেন্টের বয়সও তো হয়ে এল।

"বেশি দামেবটা দিয়ে দাদা কোনও লাভ নেই। একটু হয়তো ডিজাইনের এধার ওধার, পালিশটা দু'পোঁচ বেশি, কাঠ অবশ্য ভালই হবে কিন্তু গেরস্ত বাড়িতে অত ফ্যাশনেবল জিনিসের দরকারটা কী? কাজ চলে অথচ টেকসই এমন জিনিসই দরকার, তাই কি না?"

যন্ত্রের মতো লোকটি সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন। দোকানের ভিতরটায় আলতোভাবে চোখ বুলিয়ে অস্ফুটে বললেন, "দু' হাজার মিনিমাম!"

"খাটের সঙ্গে গদিও তো দেবেন?"

চোখে আবার অসহায় দৃষ্টি ফিরে এল। অন্তত দশটি বিয়েতে ইউনিক থেকে খাট বিছানা, আলমারি, ডাইনিং টেবল, চেয়ার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। পুলিন এই রকম দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত।

"দামের জন্য ভাববেন না, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি পাড়ার লোক, যত কমে হয় সে আমি দেখব। তা ছাড়া একেবারে দিতে যদি অসুবিধা হয় ইনস্টলমেন্টে দেবেন।"

"ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যাবে?"

লোকটির কণ্ঠস্বরে কিছুটা জোর ফিরে এল। পুলিন সিগারেট প্যাকেট এগিয়ে দিল।

"না, খাই না।" জোড়হাতে প্রত্যাখ্যান জানালেন।

"তা হলে চা...গদা, এই গদাই।"

দোকানের পাশের দেয়ালে একটি দরজা। এটা দিয়ে বেরোলেই দোকানের ও জমির পাঁচিলের মধ্যে প্রায় ছ' ফুট চওড়া পথ, যেটা রাস্তা থেকে সোজা দোকানের পিছনে গেছে। দোকানে না ঢুকে এই খিড়কি পথই মিস্ত্রিরা ব্যবহার করে, মালপত্রও এই পথে আনা হয় কারখানায়। সেখানে পুলিনেরও ঘর। আগে সেটা টালির চালের ছিল। দু' বছর আগে দোতলার ভিত করে দুটি ঘর, গ্রিল ঘেরা খাওয়ার দালান এবং রান্নাঘর করেছে। টিউবওয়েল ও পায়খানা এমনভাবে করা যাতে মিস্ত্রিরাও ব্যবহার করতে পারে। এ ছাড়া বাকি জমিটায় অ্যাসবেসটস চালে ঢাকা কারখানা, সেখানে সারাদিন এবং প্রয়োজনে রাতেও কাজ হয়। কারখানার জন্য বেল ও পেয়ারা গাছটা কেটে ফেলতে হয়েছে।

পাশের দরজা দিয়ে গদাই এল। তেরো বছর বয়স, শিক্ষানবিশ এবং ফাইফরমাশ খাটে। রাত্রে দোকানেই থাকে। পুলিনের রান্না আর ঘরের কাজ করে দেয় গদাইয়ের মা গিরিবালা।

"কী করছিলি?"

"টেবলের পায়াগুলোয় শিরিষ ঘষছিলুম।"

"দুটো চা বলে আয়। বিস্কুটও দিতে বলবি।"

"এই অবেলায় আবার..."

"চায়ের আবার বেলা অবেলা কী। আপনাকে তো কয়েক বছর ধরেই দেখছি...আলাপ আমার কারুর

সঙ্গেই করা হয়নি, করব কী, সময় কোথায়, সকাল থেকে রাত এই দোকান নিয়েই...আমার নাম পুলিনবিহারী পাল।"

"আমার নাম অরুণপ্রকাশ মজুমদার, বেলঘরিয়ায় একটা স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। এখানেই আমরা সত্তর বছর আছি।"

সত্তর বছর! তা হলে পুরনো বাসিন্দাদের তো অবশ্যই চেনেন, খোঁজ খবরও রাখেন। অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়িতে কারা বাস করছে তা-ও হয়তো জানেন।

"আমি মাত্র সাত-আট বছর।"

"হ্যাঁ, এটা তো নিরঞ্জনের গোলা ছিল। কী ছিল আর আপনি কী করে তুলেছেন।"

"যা হয়েছে সবই আপনাদের আশীর্বাদেই। তখন বাড়িঘর কত কম ছিল, দোকান বলতেও তিন-চারটে চালা। তবু স্থানীয় কোনও লোকের সঙ্গে আমার এখনও ভাল করে পরিচয় হয়নি। এই দেখুন না, এইমাত্র ওই সামনের শ্রীময়ী টেলর্সের সলিলকে এক মহিলা ব্লাউজ করতে দিয়ে গেলেন, ঠিকানা দিলেন কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখার্জি। আমি তো বলতেই পারলাম না এখানে অবিনাশ মুখার্জির বাড়িটা কোথায়।"

"মারা গেছেন। এই পুব দিকে কিছুটা গিয়েই ওর বাড়ি। একসময় যথেষ্ট জমিজমা ছিল। আমাদের বাড়িতে আসতেন বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে। ওদের বাগানে একটা কলমের ল্যাংড়া আমের গাছ ছিল, ছোটবেলায় গাছে চড়ে খেয়েছি।"

কাচের গ্লাসে চা আর প্লেটে দুটো নিমকি বিস্কুট দিয়ে গেল সুবোধের দোকান থেকে। রথতলার মোড়ের তিন দিকে পাকা দোতলা এবং একতলা বাড়ি উঠেছে, শুধু একদিকের পুরনো টালির চালের কালাচাঁদের মিষ্টির, সুবোধের চায়ের আর দেবনাথের পান-সিগারেটের দোকান তাদের আগের চেহারা বজায় রেখেছে। জমির মালিক স্থানীয় এক গৃহস্থ, জমি বিক্রির জন্য লোভনীয় দর পেয়েও বিক্রি করতে পারেনি। দোকানিরা জায়গা ছাড়তে রাজি নয়, ওদের তোলার জন্য নানান চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বৃথাই।

"এখন বোধহয় ওদের সঙ্গে আর আপনার যোগাযোগ নেই।"

"নাহ্।"

পুলিন ধরেই নিল এর কাছ থেকে কৌতূহল মেটাবার মতো কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের বোধহয় মনঃপূত হল না নিজের ছোট্ট উত্তরটা। বললেন, "অবিনাশকাকা মারা যাবার আগে বাড়িটা বিধবা বড়মেয়ে বাসুকে লিখে দিয়ে যান। এখন তারাই রয়েছে। সময় কোথায় যে যোগাযোগ রাখব। স্কুল তারপর কোচিং সেরে ফিরতে ফিরতে...তখন শরীরে আর কিছু থাকে না।"

"ওনার বড়মেয়েও মুখুজ্জে নাকি?"

"হ্যাঁ। বাসুব স্বামী রাইটার্সে কাজ করত, বিয়ের চার বছরের মধ্যেই ক্যানসারে মারা যায়। একটি মেয়ে কোলে নিয়ে ও বিধবা হয়। শ্বশুরবাড়িতেই আলাদা থাকত। শুনেছি অবিনাশকাকা সাহায্য করতেন জমি জায়গা বিক্রি করে। ভাইয়েরা বোনেরা বোধহয় কিছু কিছু দিত। বাসু খুব স্ট্রাগল করেছে।"

অরুণপ্রকাশ হঠাৎ যেন তাঁর বাল্য কৈশোর এবং যৌবনকে জীবনের শেষ পর্যায়ের মধ্যে টেনে আনার একটা সুযোগ পেয়ে খুশিই হলেন। পিছনের দিকে তাকিয়ে বলার মতো কথা এবং তা শোনার মতো একজন মানুষ যে থাকতে পারে এটাই তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। রুটিনে বাঁধা নিরুত্তাপ দৈনন্দিনের মধ্যে একটা উষ্ণ আবহাওয়া যেন তৈরি হচ্ছে। খাট, ড্রেসিং টেবলের দাম জানতে এসেছেন কিন্তু এখন সেটা আর তত জরুরি ব্যাপার নয়।

পুলিনও এখন দোকানদারির জন্য ব্যস্ত নয়। তুষারকণাদের সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়ার এই সুযোগটা অপ্রত্যাশিতই এসে গেছে। বিয়ের জন্য যা দেবার, এই লোকটিকে তা কিনতেই হবে এবং ইউনিক থেকেই যে কিনবেন সে-বিষয়ে পুলিনের কোনও সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আরও কয়েকটা দোকান ঘুরবেন কিন্তু এত কমে, ইনস্টলমেন্টে কে দেবে?

"তা হলে মা আর মেয়েই রয়েছেন।"

"তাই তো থাকার কথা। অবশ্য মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে কি না বলতে পারব না।"

"একটা বাচ্চা ছেলেকে যেন দেখলাম রথের দিন। ওই মহিলা রথ টানছিলেন ছেলেটির সঙ্গে,

আজও শ্রীময়ীতে খোঁজ করলেন ছেলেদের জামা প্যান্ট তৈরি করে কি না। তাইতে মনে হল হয়তো ওরই ছেলে।"

"হবে। বাসুর মেয়ের বয়স তো তিরিশের ওপরই হওয়ার কথা, ওরই তো পঞ্চান্ন মতন হল।"

"আপনার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কোথায়?"

"নৈহাটিতে, ছেলেটি অনার্স গ্র্যাজুয়েট, প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছে। বিয়ে দেওয়া যে কী কঠিন কাজ। মেয়ের পায়ে একটা ডিফেক্ট আছে, ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙে। ভাল চিকিৎসা হয়নি তার ফলে ডান পাটা একটু ছোট হয়ে গেছে। সম্বন্ধ অনেক করেছি কিন্তু যা খাঁই পিছিয়ে যেতে হয়। আমার বড়ছেলেটা পড়াশুনোয় ভাল, পরীক্ষা দিয়ে জলপাইগুড়িতে চান্স পেয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। মেয়ের বিয়ের জন্য রাখা টাকাটা তখন ওখানেই দিয়েছি।"

পুলিনের মনে পড়ল, একটি রং কালো, সাদামাটা খোঁড়া মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখত গলি থেকে বেরোতে। বছর চারেক আর চোখে পড়েনি।

"ভালই করেছেন। মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজে পেতে একটা না হলে আর-একটা ঠিকই পাওয়া যাবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ দ্বিতীয়বার তো আর পাবে না।"

"স্ত্রীকে আমি ঠিক এই কথাটাই বলেছিলাম। আর ভগবানের কৃপায় পেয়েও গেলাম। দাবি-দাওয়াও খুব বেশি নয়। খাট ড্রেসিং টেবল আমরাই দিচ্ছি ওরা চায়নি। তিন ভরি গয়না, টিভি সেট আর যে ঘরটায় থাকবে তার ছাদটা ঢালাই বাকি সেটার খরচ, শুধু এইটুকু ওরা চেয়েছে। মেয়ের যখন খুঁত রয়েছে তখন এটুকু তো করতেই হবে, নয় কি?"

"নিশ্চয়। আমি তো বলব কমের ওপর দিয়েই হচ্ছে।"

"খাওয়া-টাওয়া ধরে হাজার তিরিশ-পঁয়ত্রিশের মতো পড়বে। সবাই বলছে আমার লাক ভাল।"

পুলিন উদ্ভাসিত মুখটির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য করুণা বোধ করল। প্রৌঢ়ত্ব আর কয়েক বছর পর শেষ হবে। এতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুন্দর উপভোগ্য নানাবিধ জিনিস থেকে নিজের জীবনকে বঞ্চিত করে অবিশ্রান্ত খেটেছেন শুধু কি এই একটি কথা শোনার ইচ্ছা নিয়ে, 'আমার লাক ভাল?'

"আপনার আর মেয়ে আছে নাকি?"

"নাহ্, বেঁচে গেছি। আর মাত্র দুটি ছেলে, দু'জনেই স্কুলে পড়ে। ওদের মানুষ করতে পারলেই আমার কাজ শেষ।"

অরুণপ্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন। চোখে আবার উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। "তা হলে বলছেন ইনস্টলমেন্টে...আরও কিছু কমসম করে দেবেন?"

পুলিন অনেকক্ষণ একা চেয়ারে বসে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের আলমারির আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। 'আমার কাজ শেষ', এ-ভাবে যদি সে-ও বলতে পারত!

অথচ সে নতুন করে শুরু করতে চাইছে। কী তার চাওয়া? অনেক টাকা? ...একটা সাংসারিক জীবন? তুষারকণার প্রতি তার আকর্ষণের কারণ কী? যে-কোনও মেয়ের প্রতি যে-কোনও পুরুষেরই কামনা জেগে উঠতে পারে, তাতে হয়টা কী? সে কি তুষারকণাকে নিয়ে সংসার পাতার কথা ভাবছে?

সে কী! পুলিন অবাক হয়ে গেল নিজের বাসনার বহর দেখে। একজন ভদ্রমহিলা, যাঁর সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, কখনও পরিচয়ও হয়নি, তার দোকানের সামনে দিয়ে শুধু দু'বেলা যাতায়াত করেন, সুরূপাই বলা যায় এবং দেহটি মজবুত, আর তাঁকে নিয়ে সে কিনা আকাশকুসুম ফোটাতে শুরু করেছে! এ-সব তো গোঁফ ওঠার বয়সেই মানায়। এখন তার তেতাল্লিশ, একটা বিয়ের অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে।

মনে মনে লজ্জা পেল পুলিন। আয়নায় নিজেকে হাসতে দেখে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।

দুটো দিন সে তুষারকণার যাওয়া আসার সময়ে দোকানের সামনে গেল না। এ-জন্য বিশেষ কোনও কষ্ট বা যন্ত্রণাবোধ করল না, বোধহয় সচেতন থাকার জন্য। তৃতীয় দিন সে ত্রিদিবনগরে গেল। নতুন দোতলা বাড়ি উঠছে, মালিক এবং তার স্ত্রী এসেছেন দোতলার মেঝে ঢালাইয়ের কাজ দেখতে। এক তলার দরজা, জানলা তৈরি করার বরাদ্দ ইউনিক পেয়েছে। আলাপটা জমিয়ে নেওয়া দরকার দোতলার জন্য অর্ডারটা ধরতে। এ-সব কাজ দেবুকে দিয়ে করানো চলে না।'

কর্তা ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন শিক্ষা বিভাগে, রিটায়ার করেছেন। নরম প্রকৃতির মানুষ, একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন দিল্লিতে। বাড়িটা মেয়েই পাবে। গিন্নিকে পুলিন এই প্রথম দেখল। তিনি যে জর্দাখোর এটা সে জানত না, জানা থাকলে বড়বাজার থেকে এক ভরি কাশীর জর্দা আনিয়ে অবশ্যই নিয়ে যেত। অবশ্য মিনিট পাঁচেক কথা বলেই সে বুঝে যায় ভদ্রমহিলাকে খুশি করার সহজ পদ্ধতি, মেয়ে-জামাইয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়ে দিয়ে চুপচাপ থাকা। উনি একাই কথা বলে যাবেন।

"না বাবা আমি প্লেনে চাপতে রাজি নই। ছোটবেলায় একবার নাগরদোলায় চেপে যা অবস্থা হয়েছিল, তারপর আর কখনও মাটি থেকে দু' হাত ওপরেও উঠিনি।"

"সে কী বলছেন মাসিমা, বিয়ের সময় পিঁড়িতে বসিয়ে আপনাকে কি ঘোরায়নি?"

"ওই একবারই যা বাপু শূন্যে উঠেছি। খুকু বলে তোমার জামাই তো বছরে দু'বার আমেরিকা যায়, টানা আট-দশ ঘণ্টা প্লেনে কাটায়, কই কিছু তো হয় না আর কলকাতা থেকে দিল্লি মাত্র দু' ঘণ্টার পথ, তুমি এইটুকু আসতে পারবে না? আমি বলেছি রিকশায় চেপে দিল্লি যাব তবু প্লেনে নয়।"

"আপনার মেয়েকে এই বাড়ি দেখিয়েছেন?"

"বাড়িটা পুরো তৈরি হোক আগে। পাঁচিল ঘেরাও না হলে বাগান তো করা যাবে না। খুকুর প্রচণ্ড শখ গোলাপের, দিল্লিতে যে বাংলোটা পেয়েছে তাতে নাকি অনেকটা জমি, এগারো রকমের গোলাপ লাগিয়েছে। লিখেছে এই নতুন বাড়িতে ও নিজের হাতে গোলাপ লাগাবে, অন্তত তিন কাঠা জমি ওর চাই-ই।"

"তিন কাঠার বেশিই থাকবে।"

"থাকত না। উনি যা প্ল্যান করেছিলেন তাতে থাকত না। একতলায় দুটো বাথরুম, দুটো পায়খানা, দুটো রান্নাঘর, সব দুটো দুটো। আমি বললুম সে কী, ফ্ল্যাট বাড়ি বানাচ্ছ নাকি? খুকু কি এখানে ফ্ল্যাটে থাকবে? উনি বললেন, যদি কখনও দরকার হয় ভাড়া দেবার, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্ল্যান করেছি। একদিকে ভাড়াটে থাকবে আর একদিকে নিজেরা। শোনা কথা, জামাইয়ের তিন লাখ টাকার ইনশিওরেন্স, খুকু নমিনি। বললুম, নিরাপত্তটত্তা ভাবতে হবে না, মোটকথা বাড়িতে ভাড়াটে বসানো চলবে না।"

কথাবার্তা যখন চলছিল কর্তা তখন ঠিকাদারের সঙ্গে ঢালাইয়ের কাজ দেখতে ছাদে উঠেছেন। পুলিন মনে মনে উশখুশ করছিল। খুকুর কথা বন্ধ করিয়ে দিলে খুকুর মা ক্ষুণ্ণ হবেন, সেটা বিরুদ্ধে যাবে দোতলার জন্য অর্ডার বিবেচনার সময়। অথচ এই সময় কেন জানি তার ইচ্ছা করছে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

দুটো দিন সে নিজেকে বশে রাখতে পেরেছে, কোনওরকম মানসিক উপদ্রব ঘটেনি। সে আজও ভেবেছিল ব্যাপারটা মন থেকে সরে গেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে তুষারকণা সরেনি। ওকে মনে পড়ার পিছনে কোনও কারণ তো থাকবে। কোনও এক খুকুর গোলাপের শখই কি তাকে উসকে তুলল? রথের চুড়োয় যে গোলাপটা বসিয়ে দিয়েছিল মনে হয়েছিল সেটা এবং অন্যগুলো বাজার থেকে কেনা নয়। তুষারকণার কি গোলাপ বাগান আছে? অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়ির পাঁচিল উঁচু, রাস্তা দিয়ে চলার সময় ভিতরের কিছুই দেখা যায় না।

"গোলাপের বাগিচা হলে শুধু এই বাড়িরই নয় গোটা পাড়ারই চেহারা অন্য রকম হয়ে যাবে। মাসিমা, আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, কয়েকটা চারা নেব। গোলাপ আমার সবথেকে প্রিয় ফুল।"

পুলিনের স্বরে কিছুটা আবেগ এসে পড়ল শেষের কথাটি বলার সময়। সে নিজেও এটা বুঝতে পারল।

"আসলে শুকনো কাঠের সঙ্গে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে মনে হয় ভেতরটাও কাঠ হয়ে গেছে। ভুলেই গেছি ফুলের রং, ফুলের গন্ধ কেমন! এবার একটা বাগান করব।"

"খুকুকে বলবখন।"

মন্মথ কর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। পুলিনকে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"পুলিনবাবু, একটা কথা ছিল।"

"আসছি... তা হলে মাসিমা বলা রইল, দিদিকে জানিয়ে দেবেন কয়েকটা চারা নেব। পরে আবার দেখা করব।"

ওঁর মুখে প্রসন্নতা লক্ষ করে পুলিন যতটা সুখ বোধ করল তার থেকেও বেশি আরাম পেল ফুলবাগান করার ইচ্ছাটা তার মনে এসে যাওয়ায়। হঠাৎ বলে ফেললেও কথাটা তো ঠিকই। তার ভিতরটা শুকিয়েই গেছে। কোমল সুকুমার কোনও জলধারা বইয়ে আনার জন্য খাদ কাটার কথা সে বহু বছর ভাবেনি। এবার চেষ্টা করতে হবে। আবেগে ভরা না হলে জীবনকে ভোগ করা যায় না।

"ব্যবসায়ী সমিতি গড়ার যে-কথাটা বলেছিলুম, সেটা নিয়েই একটা কথা বলার ছিল।"

"সময় করে উঠতে পারিনি।"

পুলিন লজ্জিত বোধ করল। রথতলায় এখন ছোট বড় মিলিয়ে তেরোটি দোকান। গত বছর তারা চাঁদা তুলে কালীপুজো করেছে। তখনই হালকা চালে মন্মথ কর কথাটা একবার বলেছিল, 'আমাদের একটা সমিতি থাকা দরকার। সব ব্যবসার জায়গাতেই আছে, আমাদেরও হওয়া উচিত। বাগুইপাড়া স্টেশনের পুব আর পশ্চিমে দুটো আছে। রথতলা এখন বিজনেস সেন্টার হচ্ছে... এখন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার।'

কথাটা শুনে সব দোকানদার, ব্যবসাদার তখন সায় দিয়েছিল। তারপর মাঝে মাঝে বিষয়টা ওঠে যখন কোনও উপলক্ষ আসে। যেমন মাস চারেক আগে পূর্ব বাগুইপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি থেকে একজন এসে জানাল, কাল দোকান বন্ধ রাখতে হবে কারণ, তাদের প্রেসিডেন্ট টিভি ডিলার সর্বেশ্বর ভটচাজের দোকানে সমাজবিরোধীরা হামলা করে দুটো টিভি-সেট ভেঙেছে, সর্বেশ্বরবাবুর কাঁধে পিঠে ছুরি মেরেছে। এরই প্রতিবাদে বন্ধ ডাকা হয়েছে।

বন্ধ রাখবে কি রাখবে না তাই নিয়ে রথতলায় দ্বিধা দেখা দেয়। পূর্ব বাগুইপাড়ায় জমজমাট বাজার, কলকাতার সব জিনিসেরই দোকান সেখানে আছে। রথতলা ওখান থেকে একটু দূরে। ওদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কোনও দরকার আছে কি নেই তাই নিয়ে তর্ক হয়েছিল।

'আমরা কোনওভাবেই ওদের উপর নির্ভর করি না। তা ছাড়া ওখানে যা ঘটেছে তার পিছনে পলিটিক্যাল কারণও আছে। লোকসভা ইলেকশনের সময় সর্বেশ্বর ভটচাজ এমন অনেক কাজ করেছিল এই ব্যবসায়ী সমিতি ভাঙিয়ে, যে-জন্য তার বিরুদ্ধে অনেক অ্যালিগেশন ওঠে।' রত্না স্টুডিয়োর সুকুমার দোকান বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল। মিষ্টির দোকান কালাচাঁদ আর মুদি বসন্ত বলেছিল, 'খুলে রেখে দেখিই না, যদি ওরা এসে জোর জবরদস্তি করে তখন নয় বন্ধ করে দোব।'

মন্মথ করের কাপড়ের দোকান। তাঁতের এবং মিলের ছাপা শাড়ি ছাড়াও প্যান্টের ও ব্লাউজের কাটপিস বিক্রি হয়। কাউন্টার, শো-কেশ, সিলিং ইত্যাদিতে দোকান সাজাতে যে কাঠের কাজ তা পুলিনই করেছে। বারো হাজার টাকা সে নিয়েছে মন্মথ বস্ত্রালয় থেকে।

রাতে মন্মথ এসে তার সঙ্গে কথা বলে।

'পুলিনবাবু, এখানে নানান ধরনের লোক নানান মত। কিন্তু আপনি, আমি, বা সিদ্ধেশ্বরী বিল্ডিং কনসার্ন কি রথতলা ভ্যারাইটি স্টোর্স, যাদের তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকার উপর মালপত্তর, ব্যবসা, তাদের তো অন্যভাবে চিন্তা করা দরকার। কালই যদি আমার দোকানে বোমা মেরে ক্যাশ লুঠ করে, আপনার দোকানে আগুন ধরায়, কী করতে পারি? লক্ষ করেছেন কি স্টেশনে যাবার পথে যে পাঠশালাটা, সন্ধের পর সেখানে চোলাই মদের ঠেক বসে?'

পুলিন তখুনি রাজি হয়েছিল সমিতি গড়ার ব্যাপারে, মন্মথকে বলেছিল, অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে তাকে জানাবে।

"আমি, বিশ্বাসবাবু আর অমিতাভ এটা নিয়ে কিছুটা এগিয়েছি। সমিতি রেজিস্ট্রি করার আগে তো কমিটি ঠিক করতে হবে।"

তা হলে ওরাই দায়িত্বটা নিয়েছে। পুলিন হাঁফ ছাড়ল। এই সব কাজে জড়িয়ে পড়তে তার ভাল লাগে না। লোকজনের সামনে নিজেকে বার করার সম্ভাবনা দেখা দিলেই সে এড়িয়ে গেছে। গত দশ বছব ধবে এই অভ্যাসটা তৈরি করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে।

"আপনি এখানকার পুরনো আর সব থেকে পরিচিত..."

"পুরনো ঠিকই কিন্তু পরিচিত বোধ হয় নয়। ইউনিকের পরিচয় আছে, আমাকে কেউ বিশেষ চেনে না, খদ্দেররা ছাড়া।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা কথা বলছে। পুলিন মুখ ফিরিয়ে একটা বাড়ির দিকে তাকাল। ত্রিদিবনগরে ঢুকতে এটাই প্রথম বাড়ি। এর যাবতীয় কাঠের কাজ ইউনিক করেছে। জানলা দরজায় আর রং পড়েনি, সিঁড়ির ছাদ এখনও পাকা হয়নি। টাকা শোধ করতে সাত মাস সময় নিয়েছিল, তাও শ' চারেক টাকা শেষ পর্যন্ত আর সে পায়নি। এখন আর নতুন করে চাওয়া যায় না।

"কী বললেন?"

পুলিন অবাক হয়ে মন্মথর মুখের দিকে তাকাল। সে চারশো টাকা শোধ না করা লোকটির কথা ভাবছিল। ইউনিকের সামনে দিয়ে যাবার সময় কেমন সংকুচিত হয়ে যায় চলনটা, এখনও।

"আপনিই প্রেসিডেন্ট। আমরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"না। এটা করবেন না। আমার আপত্তি আছে।"

"এতে আর আপত্তির কী থাকতে পারে!"

হঠাৎই পুলিন উত্তেজিত হয়ে গলা চড়িয়ে বলল, "পারে পারে আপত্তি থাকতে পারে। অন্য কাউকে করুন, আমাকে ছেড়ে দিন।"

অপ্রত্যাশিত আচরণ পেয়ে মন্মথ হতভম্ব। ওর মুখভাব লক্ষ কবে পুলিন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আপনি বুঝবেন না, নেহাতই খুব ব্যক্তিগত কারণ।"

তিন

মন্মথ আহত বোধ করেছে। এই নিয়ে আর একটি কথাও বলেনি বাকি পথটায়। দোকানে এসে পুলিন দেখল শম্ভু বসে রয়েছে। মেঝেয় বসাবার টালি আর লোহার গ্রিল, ফটক তৈরি করে এমন তিন-চারটি ব্যবসা সংস্থার দালাল। অল্পবয়স থেকে সে এই কাজে রয়েছে। পুলিনের সঙ্গে পাঁচ বছরের পরিচয়। মার্জিত পরিশ্রমী এবং দায়িত্ববান। এমনও হয়েছে শম্ভু তিন-চার দিন টানা থেকে গেছে ইউনিকে। এই শীর্ণকায় যুবকটিকে পুলিন পছন্দ করে, ভালবাসে। সাহায্য করেছে অর্ডার পাইয়ে দিয়ে।

"অনেকদিন আসিস না, খবব ভাল?"

"একবকম।"

"কমলাপুরীর সেটা করে দিয়েছিস?"

"কেন, আমি তো পরের দিনই টালি বদলে নতুন বসিয়ে দিয়েছি! আপনাকে কিছু তাবপর বলেছে নাকি?"

"না বলেনি। বদলে যে দিয়েছিস সেটা তো আমাকে জানিয়ে যাবি। আমার তো জেনে রাখা দবকার, কমপ্লেন আমাব কাছেই করেছিল না? এরপর দেখা হলে ভদ্রলোককে বলতে পারব, 'বলেছিলাম অনেস্ট কনসার্ন, দেখলেন তো?' বল, চলছে কেমন, মা ভাল আছেন?"

শম্ভু মাথা কাত করল। কী যেন ভাবছে এবং সেটা প্রকাশের জন্য নিজেকে তৈরি করছে। পুলিন অপেক্ষা করতে লাগল।

বৃষ্টি হবে হবে করেও হচ্ছে না। আকাশে ঘন মেঘ জমে রয়েছে। গতবছর এই সময় চারদিন টানা বৃষ্টি হয়েছিল। রথতলার মোড়ে কতকগুলো গর্ত সেই সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কয়েকজন পথচারীর পা মচকেছে। রিকশা নিয়ে যেতে হত হাত দিয়ে টেনে। গাড়ির চাকা গর্তে পড়লেই কাদা জল ছিটকে দোকানের ভিতরেও এসেছে। মিউনিসিপ্যালিটিকে চিঠি দিয়েছিল ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরীর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ওখানে কিছু মাঝারি পর্যায়ের সরকারি অফিসার ও ব্যবসায়ী থাকেন। তাঁদেরই ব্যক্তিগত চেষ্টায় অবশেসে রথতলার মোড়ে কিছু ইট আর খোয়া পড়েছিল।

কিন্তু সেই গর্ত আবার বেরিয়ে পড়েছে। মিনিট পনেরো টানা বৃষ্টি যদি হয় তা হলে দু'-তিন বর্গ মিটারের কয়েকটা দ্বীপ তৈরি হয়ে যাবে।

"ওদের ভরসায় না থেকে নিজেদেরই ব্যবস্থা করা উচিত।"

"কীসের কথা বলছেন?" শম্ভু অবাক হয়ে গেল অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে।

"মিউনিসিপ্যালিটির যা ব্যাপার। রাস্তাটার অবস্থা দেখেছিস? বৃষ্টিতে কী দাঁড়াবে ভাব তো? মানুষ তো হাঁটতেই পারবে না। কত লোক স্টেশন যাতায়াত করে, বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থাটা কী হবে? আফিস যাচ্ছে সেই সময় যদি চটি থেকে কাদা ছিটকে কাপড়ে লেগে কি লরির চাকা গর্তে পড়ে নোংরা জলে চান করিয়ে দেয়!"

"পুলিনদা আমি একটা মুশকিলে পড়ে এসেছি।"

করুণ মুখে শম্ভু কথাটা বলেই মুখ নামিয়ে নিল। পুলিনের বুকের মধ্যে একটা মোচড় লাগল। অশুভ কোনও খবর নিশ্চয়। মা তো, বলল ভাল আছে, তা হলে আর কী হতে পারে?

"বোন তো উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিল, পাশ করেছে?"

"ও প্রেগনান্ট!"

"য়্যাঁ?"

দু'জনেই পরস্পবের মুখেব দিকে তাকিয়ে। এই বিমূঢ়তা পুলিনের পক্ষে স্বাভাবিক। শম্ভুবও নিশ্চয় প্রথমে এই অবস্থা হযেছিল।

একসময় এমন একটা খবব শিবানীর কাছ থেকে শুনতে হতে পারে, এই চিন্তায় সে কাঁটা হয়ে থাকত। কবে তাবা পবস্পবকে স্পর্শ-কবা বন্ধ কবেছিল? তাব আগে পর্যন্ত প্রতি মাসে কয়েকটা দিন উৎকণ্ঠা নিযেই সে থাকত। এ ব্যাপাবে তাব থেকে শিবানীই বোধ হয় বেশি দুর্ভাবনায় ভুগত। ও কোনও সন্তান চায়নি।

"লোকটা কে?"

"ছেলেটা পাড়াবই।"

"বিয়ে কবতে বল।"

"ওর বাড়ির কেউ রাজি নয়। ভীষণ আপত্তি।"

"কেন?"

"ওবা বামুন। বৈশ্যর মেয়ে ঘরে নেবে না, গবিবের মেয়ে ঘবে নেবে না, বাঙাল মেযে ঘবে নেবে না।"

"কাব সঙ্গে কথা বলেছিস?"

"বাবার সঙ্গে।"

"করে কী?"

"পাটের দালাল। দুটো বাড়ি কবেছে, বড়ছেলেকে ওযুধেব দোকান করে দিয়েছে, মেজছেলে আব বডজামাই জয়েন্টলি জ্যাম-জেলি এই সবেব হোলসেল ডিলাব, মেজজামাই প্রাইভেট ফার্মে চাকবি করে, সেজছেলে বর্ধমানে জমি-জায়গা দেখে চালেব আড়ত আছে।"

"এ তো ঘুঘু লোক। তা এমন বাড়িব ছেলের সঙ্গে তোর বোনের আলাপসালাপ হল কী কবে? বোন দেখতে শুনতে নিশ্চয় ভাল?"

"হ্যাঁ ভাল, সুন্দরীই বলা যায়। কী করে আলাপ হল তা আর জানব কী করে, এখন তা জেনে লাভই বা কী। আমি আর কতক্ষণ বাডি থাকি। দাদাব স্কুটাব আছে তাইতে চেপে বাড়ির সামনে ঘোবাঘুবি করত। যাত্রা হল বাড়ির কাছেই মাঠে, পরপর তিন দিন। মা আব বোনের জন্য দুটো সিজন টিকিট নিজের পয়সায় ছেলেটা কিনে দিয়েছিল।"

"তখনও কিছু বুঝতে পারিসনি?"

"না। মা লুকিয়ে গেছল আমার কাছে। বলেছিল নন্দ ভটচাজ পাস দিয়েছে। লোকটা পাশের বাড়িতেই থাকে, যাত্রার মেইন অর্গানাইজার, এইসব করেই চালায়, মা প্রথম দু'দিন গেছল, বোন তিন দিনই যায়।"

"তৃতীয় দিনে একা গেছল।"

শম্ভু স্থিরদৃষ্টিতে পুলিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল ইঙ্গিতটা সে বুঝেছে।

"এখন কী করা যায়?"

"ছেলেটা কী বলছে?"

"ভয় পেয়ে গেছে। তেইশ-চব্বিশ বয়স, মাধ্যমিক ফেল। মায়ের আদরের ছেলে। এই সব পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলেরা যেমন হয়। ভাত-কাপড়ের চিন্তা নেই হাতে টাকা পায়, আড্ডা মেরে দিন কাটায়। ফিল্ম স্টারদের নকল করে সাজগোজ, ওর পক্ষে বাড়ির বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়।"

"তা বললে তো চলবে না। বিয়ে ওকে করতেই হবে।"

"ও রাজি। বলছে বিয়ের পর অনু বাপের বাড়িতেই থাকুক, ইতিমধ্যে ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, বউকে নিয়ে আলাদা ঘর ভাড়া করে থাকবে। মনে হল ছেলেটা সিনসিয়ারলিই বলেছে।"

"খুব সোজা যেন নিজের পায়ে দাঁড়ানো। ও-সব গাঁজাখুরি সিনেমাতেই হয়। টাকা নেই, মাধ্যমিক ফেল, হাতের কাজকর্মও বোধ হয় জানে না, পরিশ্রমও কখনও করেনি—এ ছেলে দাঁড়াবে যে, কীসের ওপর ভর করে? তোর বোন কী দেখে পছন্দ করল?"

"সেটা আমিও বুঝি, দাঁড়ানোটা অত সোজা নয়। তবে বিয়েতে যখন রাজি, আমার মনে হয় ওটা করিয়ে নেওয়াই ভাল। আপনি কী বলেন?"

"আমি আর কী বলব। ছেলেটাকে বা তোর বোনকে চোখেই দেখিনি। বিয়ের পর ব্যাপারটা কী যে দাঁড়াবে সেটা আঁচ করে নেবারও উপায় আমার নেই।"

"পেটে বাচ্চা এসে গেছে, নইলে তো এত জট পাকানো কিছু হতই না। প্রথমে ভেবেছিলাম অ্যাবোর্শন করিয়ে দিই। কাগজে কত বিজ্ঞাপন, ট্রেনে সাঁটা কত হ্যান্ডবিলই তো রোজ দেখি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বাড়ি চলে আসতে পারবে, খরচও খুব নয়। অনুকে বলেছিলাম।"

"রাজি হয়নি, কেন?"

"পাস করে চাকরি করবে, সন্তানকে নিজেই মানুষ করবে, গলগ্রহ হয়ে থাকবে না।"

"শক্ত মেয়ে, ভয় পায়নি! বয়স কত?"

"আঠারো সবে ছাড়িয়েছে। বলেছিলাম এখন যা মনে করছিস ভবিষ্যতে সে-রকমটা নাও হতে পারে। কিন্তু গোঁ ধরে আছে অ্যাবোর্শন করাবে না।"

পুলিন চুপ করে রইল। এইটুকু মেয়ের এত মনের জোর? সাহস, জেদ সে কি কখনও আগে দেখেনি?

প্রায় এই বয়সেই ছায়া এসেছিল তাদের শ্যামপুকুরের সংসারে। পুলিনের জীবনকে ওলটপালট করে লজ্জা আর ভয়ের একটা বীভৎস গ্লানির জগতের মধ্যে তাকে নামিয়ে দিয়ে যায়। সেখান থেকে একটু একটু করে সে উঠে এসেছে গত দশ বছরে এবং আলাদা আর-এক জগতে যেখানে সে একা, নিঃসঙ্গ এবং সন্তুষ্ট।

"তোর বোন যা চায় তাই কর।"

"বিয়েটা দিয়েই দি। এ-রকম ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করাই ভাল।...পরে অস্বীকার করতে পারবে না। কলকাতায় নিয়ে গিয়েই করাব, জানাজানি হয়ে গেলে ছেলের বাড়ি থেকে হাঙ্গামা বাধবেই। আমাকে ওরা থ্রেট করেছে।"

"কী থ্রেট?"

পুলিনের বুক কেঁপে উঠল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছায়া একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিল যখন ম্যাজিস্ট্রেট রায় পড়ছিলেন। সেই চাহনিতে ছিল জমাট ঘৃণা, হিংস্র বাসনা। বুক কেঁপে উঠেছিল পুলিনের। 'থ্রেট' শব্দটার অর্থ তার হৃদয়ে গাঁথা আছে।

"অনুকে সাফ করে দেবে বলেছে ওরা। বংশে কলঙ্ক লাগতে দেবে না। এ-জন্য যত টাকা লাগে খরচ করবে। আবার আমাকে চাপও দিচ্ছে অ্যাবোর্শনের জন্য। পাঁচ হাজার টাকা অফার করেছে বড়ভাই। আর সেইজন্যই আপনার কাছে আসা।"

"আমি কী করব?"

"ওকে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করে দিন?"

"আমার কাছে? পাগল নাকি?"

"নইলে ও খুন হয়ে যাবে।"

"তোর আত্মীয়স্বজন নেই? তাদের কারুর কাছে বরং পাঠিয়ে দে।"

"তা হলে সব কথা তো তাদের বলতে হয় আর সব ব্যাপার শুনলে কেউই রাখতে রাজি হবে না। আমি জানি পুলিনদা। কেউই রাখবে না অনুকে।"

"তা হলে পাঁচ হাজার টাকাটা নিয়ে ব্যাপারটা করিয়ে ফেল। তাতে অনুও নিরাপদ হবে, তুইও ভয় ভাবনা লজ্জা থেকে মুক্তি পাবি।"

"বললাম তো, জেদ ধরে আছে। এমনকী এও বলেছে, শঙ্কর যদি বিয়ে নাও করে তবুও ।"

পুলিন ঘড়ি দেখল। অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে শম্ভু নয়, তার বোনের এই গোঁয়ার্তুমি। এটাও একটা আত্মসম্মানবোধের ব্যাপার মেয়েটার কাছে, নয়তো প্রাণের মায়া ত্যাগ করবে কেন? হয়তো ওরও কিছু যুক্তি আছে, সেটা বুঝে ওঠা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়।

"কেন এই জেদ সেটা কি ওকে জিজ্ঞেস করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

পুলিন তাকিয়ে রইল। শম্ভু নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় দিচ্ছে।

"সবাইকে দেখিয়ে দেবে। আমাদের পাড়াতেই একটা মেয়ে, অনুরই বন্ধু, আত্মহত্যা করেছিল। বাড়ির অমতে প্রেম করে বিয়ে করে একটা লুম্পেন মস্তান টাইপের ছেলেকে। ছেলেটার মা প্রস্টিটিউট। মেয়েটা স্বামীর ঘর করেছিল তিন সপ্তাহ। বাপের বাড়িতে ফিরে আসে মোহভঙ্গ হয়ে। চার মাস পর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগায়। পেটে বাচ্চা সমেত।

"বন্ধুর বিয়ের পক্ষে ছিল, ওদের প্রেমের ব্যাপারেও সাহায্য করত, মেয়েটির বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়াও করেছে, 'কেন বিয়ে দেবেন না? খারাপ ঘরের ছেলে তো কী হয়েছে, জন্মের জন্য তো মানুষ নিজে দায়ী নয়।' এই সব কথার পর ওরা অনুকে বাড়ি থেকে বার করে দেয়, আমার কাছেও অভিযোগ করে 'তোমার বোন আমাদের সর্বনাশ করছে, ওকে সামলাও, কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের মেয়ের মাথা খাচ্ছে।' আমি ওকে প্রচণ্ড ধমকাই। 'পরের বাড়ির মেয়ে, ওর ব্যাপার ও বুঝবে তুই কেন নাক গলাচ্ছিস?' তাইতে আমাকে বলেছিল, 'দু'জনের ভালবাসার কি কোনও দাম নেই?'

"পুলিনদা এই সব ছেঁদো কথা অনেক শুনেছি। কেমন রাগ ধরে গেল। ওকে চড় মারলাম। বলেছিলাম এই সব এঁচোড়েপাকা কথা শুনতে চাই না এতটুকু মেয়ের মুখে। দামটাম কষার মতো বুদ্ধি তোর যেদিন হবে সেদিন শুনব। জীবনে কোনও অভিজ্ঞতাই যার নেই তার মুখে এ সব কথা শোভা পায় না। মেয়েটার বাড়ির লোকেরা পাড়ায় কী করে মুখ দেখাবে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের কাছে কী বলবে সেটা ভেবে দেখেছিস? মেয়েটা কি আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবে? মিশতে পারবে? ওর ছেলেমেয়েরাও তো মানুষ হবে না।' শুনে গুম হয়ে যায়।

"তারপর মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে। কেন আবার বাপের বাড়ি ফিরে এল জানি না, আমি ও সব খবরও রাখি না, তবে একদিন শুনলাম গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে। অনুকে আমি বলেছিলাম, 'দেখলি তো পরিণতিটা, এর জন্য তুইও পার্শিয়ালি দায়ী।' ও শুধু বলেছিল, 'এদের মরাই উচিত। দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন ফাইট করার ক্ষমতা নেই।' ওর মুখে ঘৃণা দেখেছিলাম। এক এক সময় কেন জানি মনে হয়েছে, অনু ইচ্ছে করেই যেন ব্যাপারটা বাধিয়েছে।"

শম্ভু বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে। পুলিন মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার ওপারে শ্রীময়ী টেলর্সের কাউন্টারে কাশীনাথকে দেখতে পেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিল্ডিং কনসার্নের কর্মচারী। পিছনের ঘর তোলার সময় সিদ্ধেশ্বরী থেকে পুলিন লোহা, সিমেন্ট, বালি, ইট ইত্যাদি নিয়েছিল। তখন 'আই লাভ ইউ' ছাপমারা রঙিন গেঞ্জি গায়ে, ফুল প্যান্ট পরা, কামানো ঘাড়ে চুলের বোঝা মাথায় এই ছিপছিপে যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়। নাম জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, 'কাশীনাথ সদ্দার, সিদ্ধেশ্বরীর কেয়ারটেকার।'

নিজে থেকেই বলেছিল, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। সিদ্ধেশ্বরীর গোডাউনের একধারে খাটিয়ায় রাতে শোয়, নিজেই রান্না করে খায়।

কাশীনাথ কী যেন জিজ্ঞেস করল সলিলকে। মেশিনে কাজ করছে সলিল। তার জবাব খুব মন দিয়ে শুনছে কাশীনাথ। এখানে ওর কী দরকার। শ্রীময়ীতে তো শুধু মেয়েদের আর বাচ্চাদের জিনিস তৈরি হয়।

তুষারকণা খোঁজ নিচ্ছিল বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট তৈরি করা হয় কি না। রথ টানছিল যে দুটি তার একটি কি ওর? নাও হতে পারে। কিন্তু নিজের বাচ্চার রথ না হলে অমন ছুটে গিয়ে রথটাকে সাজিয়ে দিয়ে নিজেই টানা শুরু করবে কেন?

বিবাহিতা। কিন্তু সঙ্গে কখনও কোনও পুরুষ তো দেখিনি! পুলিন আশ্চর্য বোধ করল। এটা তো কখনও সে ভাবেনি! এতদিনে নিশ্চয় একবারও অন্তত স্বামীকে নিয়ে একসঙ্গে বেরোত। তা হলে হয়তো সধবা নয়। বাচ্চা ছেলেটা অন্য কারুর, ভাইপো, ভাগ্নে বা এইরকম কেউ।

"অনুর বিয়েটা এখুনি সেরে ফেল। ছেলেটা পরে বিগড়ে যেতে পারে, দেরি করিসনি। আব বিয়ে হোক বা না হোক মা হব, এ-সব কথাও ভাল নয়। কলকাতায় গিয়েই রেজিস্ট্রি করা। চেনা লোক আছে?"

"আমার এক বন্ধু রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। এন্টালিতে। ওকে বলেছি, মানে এত সব ব্যাপার বলিনি, শুধু বলেছি বোন প্রেম করেছে বিয়েটা হয়ে যাক। যা-সব করার ও করে দেবে। তিন মাস আগে নাকি অ্যাপ্লাই করতে হয়, রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ের নোটিস টাঙায়?"

"তারপরের ব্যাপারটা?"

"বুঝতে পারছি না কী করব। ছেলেটার বাড়ি থেকে কিছু একটা ঘটাবেই।"

"আমায় কী করতে হবে?"

শম্ভু চুপ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। ও কী বলতে চায় পুলিন তা আঁচ করে ফেলেছে।

দেবু এল।

"দাদা গেছলেন?"

"হ্যাঁ। দোতলার মেঝে ঢালাই শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে বাকি কাজটাও পাব। আরে শোন, ভোলাবাবু দেয়াল আলমারির জন্য ক'দিন আগে বলে গেছলেন..."

"গেছলাম। তিনি যা চান, তাতে এগারোশো টাকা পড়বে বলেছি। সাত ফুট দুটো পাল্লা, পাঁচটা তাক।"

"করাবে?"

"মনে হয় না। ওঁর ধারণা চারশো টাকাতে এ-সব কাজ হওয়া উচিত। কী বোঝাব কী বলব!"

"বর্ষা এসে গেল, রাস্তার হাল কী হবে বুঝতে পারছিস?"

"হলে আর কী করা যাবে। গত বছরের মতো এবারও ধরাধরি কবতে হবে। নিজেরা চাঁদা তুলে অন্তত মোড়টুকুতে মাটি ফেলে ইট বিছিয়ে যদি নেওয়া যেত...সব দোকানদারেরই তো অসুবিধা হয়; মিউনিসিপ্যালিটি করে দেবে তবেই হবে, তা হলে বসে থাকো আর জলকাদায় মাখামাখি হও! আমি এখন যাচ্ছি।"

ছুটির দিন ছাড়া সকালের দিকে সাধারণত দোকানে কেনাবেচা কমই হয়। ফাঁকাই থাকে। খদ্দেররা বেশির ভাগই পুরুষ, অফিস করে বাড়ি ফেরার পথে তারা আসে। সকালগুলো খবরের কাগজ পড়ে, কারখানায় দুটো কথা বলে, তারপর একঘেঁয়ে লাগে। প্রায়ই তার মনে হয় অন্য ধরনের কিছু একটা কাজের মধ্যে লেগে যেতে পারলে ভাল লাগবে। কিন্তু কাজ কোথায়?

শম্ভু একটা সমস্যা এনেছে। এটাকে কাজের মতো ভেবে নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত থাকা যেতে পারে।

"কী রে, চুপ কেন? বোনটাকে তো বাঁচাতে হবে!"

"সেটাই আমার বড় চিন্তা। প্রাণ যায় যাক, অনু বলতে পারে কিন্তু আমি তো স্থির থাকতে পারি না। এক এক সময় মনে হয় কী জানেন পুলিনদা, সবাইকে খুন করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই।"

"কোথায় যাবি, কেমন করে থাকবি?"

"যেদিকে দু'চোখ যায় চেনাশোনা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ খুঁজে পাবে না এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকব।"

"তা হলে খুনটুন সেরে আগুনটাগুন লাগিয়ে আমার এখানে চলে আয়, কেমন?"

"ঠাট্টা নয় সত্যিই এমন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি যেটা চব্বিশ ঘণ্টা মনের মধ্যে জাঁতা পেষাই করছে। ওরা ডেসপারেট, ছেলেকে ওরা বিয়ে করতে দেবে না।"

"রেজিস্ট্রির দিন আমায় বলিস আমি হাজির থাকব। এখন ভেতরে চল দুটো ভাত খেয়ে নিবি।"

"আমি খেয়েই বেরিয়েছি।"

"পাবদা মাছ বেঁধেছে গদাইয়ের মা, ওর রান্না কখনও খাসনি তো, আজ একটু খেয়ে যা, দাঁড়া, আগে গদাইকে বলি দোকান বন্ধ করতে।"

চার

পাশাপাশি দুটো ঘর, যার একটিতে সানমাইকার চাদব, কয়েকটা আয়না, টিন, বোতল, কিছু কার্ডবোর্ডের বাক্স ইত্যাদি মেঝেয় ছড়ানো। দোকানের ভাঁড়ার হিসাবে ঘরটা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মেঝেয় মোজাইকের টালি, জানলায় পদ্মফুল নকশার লোহার গ্রিল থেকে বোঝা যায়, ঘরটা বসবাসের জন্যই তৈরি।

দ্বিতীয় ঘরটিতে পুলিন থাকে। একটি সিঙ্গল খাট, স্টিলের আলমারি, ভাঁজ করে রাখা ইজিচেয়ার আব নিচু ত্রিপদ টেবল ছাড়া আর কিছুই মেঝের জায়গা দখল করেনি। দেয়াল আলনা থেকে হ্যাঙ্গাবে জামা, প্যান্ট এবং পাজামা ঝুলছে। ছবিবিহীন একটি ইংরেজি ক্যালেন্ডাব আর মশারিব দড়ি লাগাবার চারটি হুক ছাড়া হালকা সবুজ প্লাস্টিক পেইন্ট করা চার দেয়ালে এক ফোঁটা দাগ পর্যন্ত নেই।

ভিতবে চোখ বোলালেই মনে হবে, শুধু শোওয়া ছাড়া আর কোনও কাজে এই ঘরের দরকাব হয না এবং সেটাই ঠিক। এই ঘরে পুলিন শুধু শোয়ই। জামা প্যান্ট বদলানো আর আলমাবি থেকে টাকা বার করা ও রাখা ছাড়া ঘরটা আর কোনও দরকারে লাগে না। একটা ট্রানজিস্টর বেডিয়ো আছে, সকালে মাঝে মাঝে খোলে খবর শোনার জন্য। বন্ধু বা পরিচিত এমন লোক একজনও নেই যাকে এনে সে শোবার ঘরে বসিয়ে গল্প করবে।

বোধ হয় শম্ভুই প্রথম বাইবের লোক যে এই খাটে বসল।

"খুব নিট পরিচ্ছন্ন আপনার ঘরটা। আমারও ইচ্ছে করে এমন ঘরে থাকতে।"

পুলিন জামা খুলতে খুলতে হাসল। পিছনের বাড়ির দেয়ালের উপর দুটো চড়াই উড়ে এসে বসল। রান্নাঘরের জানলা খোলা থাকলে ওরা ঢুকে পড়ে। দালানে খাওয়ার ছোট টেবলে ঢাকা দেওয়া আছে দুপুরের খাবার। চেয়ার একটা।

"তুই বোস, আমি চানটা কবে আসি।"

কলঘরে যাওয়ার আগে সে গদাইকে ডেকে দোকান থেকে একটা চেয়ার আনতে বলে দিল।

আধঘণ্টা পর খাওয়া শেষ কবে শম্ভু হাত ধুয়ে এসে বলল, "পুলিনদা আপনি যাবেন তো বেজিস্ট্রি অফিসে?"

"তোর বিয়ে হলে হয়তো যেতাম না কিন্তু এটা অন্যরকম কেস, আমি তোর অবস্থাটা মনে মনে বুঝতে পারছি। দেরি করাটা ঠিক হবে না। বিয়ের জন্য অ্যাপ্লাই, নোটিস এ-সবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। টাকা দিয়ে বন্দোবস্ত কর, ব্যাক ডেটে অ্যাপ্লাই কবে একদিনেই বিয়ে হয়ে যায়, আমার জানা দুটো বিয়ে এ-ভাবে হয়েছে।"

শম্ভু চলে যাবার পর পুলিন ঘুমিয়ে পড়ে। মেঘের ডাকে ঘুম ভেঙে যেতেই, বালিশ থেকে মাথা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তার মনে হল সন্ধ্যা নেমে গেছে। কতক্ষণ সে তা হলে ঘুমিয়েছে? টেবল থেকে হাতঘড়িটা হাত বাড়িয়ে তুলে সময় দেখে অবাক হয়ে আবার বাইরে তাকাল।

ছ'টা দশ মাত্র। খাট থেকে নেমে পুলিন জানলায় দাঁড়াল, কালো মেঘে আকাশ ভরে গেছে। জলভরা, থমথমে। হঠাৎ একটা দমকা ঠান্ডা বাতাস বয়ে এল। সারা দেহে একটা স্নিগ্ধ চাঞ্চল্য সে অনুভব করল। কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। নারকোল গাছের মাথায় দোলা লাগল। সাঁ সাঁ শব্দ আসছে। দুটো কাক অসহায় ডানা ঝাপটে বাতাসে ভেসে গেল। পাঁচিলের ওপারে চাঁপা গাছের মগডাল নুয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি আসছে তা হলে। বাতাসে মেঘ যদি উড়িয়ে নিয়ে যায়? ক'দিন আগে এমনই হয়েছিল। হব হব করেও বৃষ্টি আর হল না।

বহু দূরে মেঘের কিনারে সাদা আকাশ দেখা দিয়েছে। পুলিন হতাশ হল। ওই সাদাটা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। আকাশের উপর দিয়ে ময়লা কাপড় টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো মেঘ সরছে। তবে কিছু বৃষ্টি ঝরিয়ে যাবে। তার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করল।

"গদা...চা আছে কি না দেখ তো?"

কারখানাটা ফাঁকা। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখেই বোধহয় ওরা বাড়ি চলে গেছে। দালানের একধারে বালতিতে জল রাখা। পুলিন চোখেমুখে জল দিল।

"চা করে দোব?...লেবু চা করব?"

"কর। জানালা সব বন্ধ আছে কি না আগে দেখ।"

"সব বন্ধ।"

পুলিন পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দোকানে এল। দরজা জানলা বন্ধ থাকায় অন্ধকার ভিতরটা, ভ্যাপসা গরমও। বাইরে থেকে বড় ফোঁটার বৃষ্টির শব্দ আসছে। ছড়ানো মালপত্রের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গিয়ে সে বাইরের দরজার ছিটকিনিটা খুলল। সতর্কভাবে পাল্লাটা একটু ফাঁক করে দেখল বৃষ্টির ছাট কোনদিকে!

পাল্লাটা আর একটু খুলে দিল। ছাট উলটোমুখো। ওপারের দোকানগুলোর সব দরজা বন্ধ। রাস্তার শুকনো মাটি আর ধুলো জল শুষে বসে যাচ্ছে। একটু পরেই চিটচিটে কাদা হবে। হাতের ব্যাগ দিয়ে মাথা আড়াল করে একটি বয়স্ক লোক লম্বা পা ফেলে প্রায় দৌড়েই যাচ্ছে। দুটি তরুণ ছুটে গেল অকারণ মজা পাওয়ার জন্য চিৎকার করতে করতে।

পুলিনের মনে হল কেউ যেন দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াল। ছাদের কার্নিশ অনেকটা বেরিয়ে থাকায় এবং বৃষ্টির ছাট পিছন থেকে আসায় দোকানের সামনে দু'-তিনহাত পর্যন্ত বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মতো আশ্রয় রয়েছে।

কে এসে দাঁড়াল দেখার জন্য সে আধ খোলা পাল্লাটা পুরো খুলে দিল এবং স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শাড়ির নীচের আলগা অংশ জড়ো করে দুই উরুর মধ্যে গোঁজা, উলটে যাওয়া ছাতার শিকগুলো সোজা করার কাজে বিব্রত তুষারকণা, সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে। চুল থেকে জল গড়িয়ে নাকের ডগায় পৌঁছতেই পুলিন প্রায় দশ সেকেন্ড সময় নিল। বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে। "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে! ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন।"

"না না, এই তো বেশ আছি।"

"দমকা একটা ছাট আসবে আর ভিজে যাবেন। ভেতরে এসে বসুন...ভিজে তো অনেকটা গেছেনই।"

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে পুলিন বাইরে দাঁড়াল। ঠান্ডা জলকণায় তার মুখ ভিজে গেল। তার সৌভাগ্যই বলতে হবে, সেই সময়ই বাতাস এলোমেলো হয়ে এক ঝাঁক বৃষ্টি দোকানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুষারকণা জলের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল আঁচলে মাথা মুখ ঢেকে।

"একদম ভিজে যাবেন, আপনি ভিতরে আসুন।"

কথা না বাড়িয়ে তুষারকণা সিঁড়ি ধরে সরে এসে দোকানে ঢুকেই ভিতরটা অন্ধকার দেখে থমকে গেল। পুলিন তাড়াতাড়ি সুইচ বোর্ডে গিয়ে দরজার কাঁছের টিউবটা জ্বেলে দিল।

"বসুন।"

সার দেওয়া রয়েছে তিনটি নতুন ডাইনিং চেয়ার। তুষারকণা ইতস্তত করছে।

"এ-বৃষ্টি কমতে এখনও পনেরো মিনিট। আপনার ছাতার যা অবস্থা...দেখি দিন আমাকে।"

পুলিন হাত বাড়িয়ে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটু দূরত্ব রাখা উচিত এখন। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ছাতাটা ওর হাতে দিয়ে তুষারকণা বলল, "নতুনই বলতে গেলে, মাসখানেক আগে কিনেছি।"

"কোথা থেকে, শেয়ালদা?"

"অফিসের এক কলিগ আনিয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি থেকে, বলেছিল জাপানি ছাতা।"

শিকগুলো সোজা করার জন্য চেষ্টা করতে করতে পুলিন বলল, "কলিগকে বলবেন, এ ছাতা চল্লিশ টাকায় পাওয়া যায় শেয়ালদার যে-কোনও দোকানে, কত নিয়েছে?"

"তিরিশ দিয়েছি, সামনের মাসে আরও তিরিশ দেব।"

ঠকে গেছি শুনতে কারুরই ভাল লাগে না। নিশ্চয় ওরও ভাল লাগছে না। ব্যবসাদার পুলিন এবার স্বরটা গম্ভীর করে বলল, "ছাতার কাপড়টা কিন্তু হাই কোয়ালিটির, বেশ দামি জিনিস। এত ভাল কাপড় খুব কম দেখেছি। ফুলের ডিজাইন দেখেই বোঝা যায় জাপানি। হালকা গোলাপির উপর সাদা সাদা আবছা আবছা ফুল, আরও আবছা সবুজ ডাঁটি।"

একটু থেমে গলাটা মৃদু করে বলল, "আপনার শাড়ির সঙ্গে দারুণ ম্যাচও করেছে।"

পুলিন চট করে ওর মুখটা দেখে নিল। চোখটা ঝকঝকে হয়েছে, ঠোঁট দুটি একটু টিপে ধরা, মাথাটি নিচু করে এক পলক দেখে নিল নিজের শাড়িটা। পদ্মের কুঁড়ি পা থেকে উঠেছে হাঁটু পর্যন্ত, জলে ভাসছে পদ্মপাতা। সুতি মেশানো সিন্থেটিক কাপড়। খুব বেশি এটা পরতে সে দেখেনি।

"নিন।"

ছাতাটা বার তিনেক খোলা বন্ধ করে পুলিন এগিয়ে ধরল আর সেই সময়ই এক কাপ চা হাতে নিয়ে গদাই এল। পুলিন তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে এগিয়ে ধরল তুষারকণার দিকে।

"ধরুন।"

"না না, আমি চা এখন খাব না। আপনি খান।"

"আমি তো খাবই, এমন বৃষ্টিতেই তো চা জমে। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ধরুন, ধরুন।"

এমনভাবে সে পিরিচ ধরা হাতটা বাড়িয়ে রাখল যে তুষারকণার উপায় রইল না।

"আপনার?"

"গদাই, আমার চা নিয়ে আয়।"

কিন্তু গদাইয়ের মুখ দেখেই সে বুঝল এক কাপই চা সে তৈরি করেছে।

"চট করে সুবোধের দোকান থেকে নিয়ে আয়। আমার ছাতাটা সঙ্গে নে।...এবার বসুন।"

"ও, হ্যাঁ।...আপনার জন্য করা চা অথচ আমি খাচ্ছি। কেমন যেন লাগছে।"

কথাটা সরিয়ে রেখে পুলিন হালকা চালে বলল, "গদাই যদি আপনাকে দেখত তা হলে দু'কাপই করত। লেবু চা, কেমন করেছে?"

পুলিন মুখোমুখি একটা ড্রেসিং টেবলের উপর আলতো হয়ে বসে ওর প্রথম চুমুকটা লক্ষ করতে লাগল। ঠোঁট দুটো গুটিয়ে কাপের কিনারায় ঠেকাল, শব্দ হল না।

"খুব ভাল। অফিসে মাঝে মাঝে করে, বেশ লাগে।"

"বাড়িতেও তো করে খেতে পারেন।"

বৃষ্টি এখন সমান লয়ে এসেছে। শব্দটা একঘেঁয়ে এবং আমেজ জাগানো। পুলিনের মনে হল, গত দশ বছরে যে কটা দিনকে স্মরণীয় গণ্য করেছে তার মধ্যে আজকেরটাকে সে উপরের দিকে রাখবে।

"মুশকিল হল, মার একদমই ভাল লাগে না এই টক টক স্বাদটা। আলাদা করে অবশ্য নিজের জন্য করে নেওয়া যায়..."

"কিন্তু লেবুটা সবসময় বাড়িতে থাকে না।"

তুষারকণা হেসে ফেলল। উপরের মাড়ির কিছুটা দেখা গেল। ডান দিকে কষের একটা দাঁত নেই।

"ঠিকই বলেছেন। এ-রকম দু'-তিনবার হয়েওছে। আচ্ছা...আপনার এখানে খাটের দাম কেমন একটু বলবেন?"

পুলিনের মনে হল, অনেকক্ষণ ধরেই যেন প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ওর মনে জমেছিল, আচমকাই করে ফেলল।

"নানান রকমের খাট, তার দামও নানান রকমের, কেন, আপনি কিনবেন?"

"ইচ্ছে আছে।"

"তৈরি যা রয়েছে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় আপনার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি করে দেব।"

গ্লাসে চা নিয়ে গদাই ঢুকল। সপসপে ছাতাটা দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, "কাপগুলো ভাঙা তাই গেলাসে আনলুম।"

"বেশ করেছিস।"

তুষারকণার চা খাওয়া হয়ে গেছে। মেঝেয় পিরিচ রাখতে যাচ্ছিল গদাই হাত থেকে নিয়ে নিল। পুলিন বাকি টিউব লাইটগুলো জ্বেলে দিয়ে বলল, "দেখুন। কত বড় চাই আপনার?"

"ছোটখাটো চাই...মানে সিঙ্গল খাট। এখন আট বছরের তবে বড় হয়েও যাতে শুতে পারে, সেই রকম চাই। বেশ মজবুত, একটু নিচু, মাথার দিক ছাড়া তিন দিক খোলা।"

"আপনার ছেলের জন্য?"

"হ্যাঁ।"

তুষারকণা খাট দেখার জন্য পা বাড়াতেই পুলিন তাড়াতাড়ি এগিয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে পরপর রাখা পাঁচ-ছ'টি খাটের অংশ সরিয়ে সরিয়ে ওকে দেখাল।

"সানমাইকা লাগালে, কেমন যেন চিপ, খেলো দেখায়। শুধুই কাঠের হলে...।"

"এই তো রয়েছে।" পুলিন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল। ইউনিকের রুচি সম্পর্কে এই ধরনের অস্বস্তিকর মন্তব্য এই প্রথম। সে কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার মনে করল।

"অল্পদামের কাঠ তো সানমাইকাটা প্রোটেকশনের জন্য, পালিশটালিশ উঠে যাওয়ারও ভয় নেই। তা ছাড়া রং-বেরঙের ডিজাইন অনেকেরই ভাল লাগে, আর সে-জন্যই তো শাড়িতে, ছাতায় কত বাহারি রঙিন ফুলের..."

পুলিন ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করল না। প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মুখের দিকে তাকাল না। বৃষ্টির শব্দটা কমে এসেছে। রাস্তা দিয়ে ছাতা মাথায় লোক যেতে দেখল।

"আপনাকে আমি ভাল সিজনড কাঠ দিয়ে করে দেব।"

"আপনারা পুরনো খাট আলমারি কেনেন?"

"কিনি।"

পুলিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। নিশ্চয় বিক্রি কবার মতো কিছু আছে। অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়িতে পুরনোকালের আসবাব থাকা স্বাভাবিকই।

"দালানে একটা কাঠের আলমারি বহু বছর পড়ে আছে। দাদামশায়ের আমলের. .ভাবছি ওটা বিক্রি কবে সেই টাকায় একটা খাট কিনব।"

"দাদামশাই কি অবিনাশ মুখুজ্জে?"

তুষাবকণা এবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে। ভাবখানা, সে কী এটাও জানেন না?

"সামনের দর্জির দোকানে সেদিন আপনাকে বলতে শুনলাম, কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখার্জি, তাই বলছি।"

"হ্যাঁ উনিই।"

"আপনাদের পিছনে যে পাঁচ কাঠা জমি মদন গোঁসাই সেদিন বিক্রি করল, ওটা কিনব বলে আমি আপনার দাদামশায়ের কাছে যেতাম একসময়। উনি আমাকে না দিয়ে গোঁসাইকেই বেচলেন।'

"কেন?"

"একসঙ্গে দিয়ে কেনার মতো অত টাকা, পঁচিশ হাজার—আমার ছিল না। তখন অবশ্য ওঁর স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ থাকতেন না।"

"দাদামশাই মারা যাবার পর আমরা এসেছি, তিন বছর হল। আপনি এখানে কতদিন?"

"ন'বছর হতে চলল। এখন যা দেখছেন তখন কিন্তু জায়গাটা মোটেই এ-রকম ছিল না। আমাব দোকানেরও অন্য চেহারা ছিল, স্রেফ একটা কাঠগোলা. টালির চালের ঘর।"

গলায় প্রচ্ছন্ন গর্ব, পুলিন নিজেই বুঝতে পারল, কীভাবে যেন এসে গেল। হয়তো ওর কাছ থেকে তারিফমাখা একটা চাহনি পাবার জন্য! সে লজ্জা বোধ করল।

"এখানে কোনও ভাল স্কুল নেই? কিন্ডারগার্টেন?"

"ছেলেকে ভরতি করাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"না নেই। তবে লাইনের ওপারে একটা বাচ্চাদের স্কুলের কথা, পাঁচ-ছ' মাস আগে, কাপড়ে লেখা

দেখেছিলাম, স্টেশনের কাছে টাঙানো ছিল। ঠিক কোথায় যে হয়েছে বলতে পারব না। আসলে এ-সবে আমার দরকার নেই তাই ভাল করে নজরও দিইনি।"

"আপনার ছেলেমেয়েরা পড়ে কোথায়?"

"কোথাও না, কেননা আমি এ ব্যাপারে নির্ঝঞ্ঝাট, মুক্ত, স্বাধীন! একেবারে একা।"

একটু নাটকীয় সুরে বলা হয়ে গেল। হোক, তার জীবনে নাটকের মতো ঘটনাই ঘটে গেছে। বাড়াবাড়ি কোথায় নেই? এই-যে এখন নির্জন দোকানে আমরা কথা বলছি এ-রকম কি কখনও ভাবতে পেরেছি? এটা তো অপ্রত্যাশিত!

"আমার বউ, ছেলেমেয়ে কিছুই নেই। দু'খানা ঘর আছে দোকানের পিছন দিকে, এই গদাইয়ের মা দু'বেলা রান্না করে দেয়...চলে যাচ্ছে।"

বৃষ্টি ধরে গেছে। টিপ টিপ যা পড়ছে তাতে ছাতা ছাড়াই চলা যায়। ওপারের দোকানগুলোর পাল্লা খোলা, আলো জ্বলছে। সন্ধ্যা নেমে যাওয়াটা তারা এতক্ষণ লক্ষ করেনি।

"আলমারিটা আমি একবার দেখব।"

"নিশ্চয়, কবে বলুন?"

"আপনার সময় হবে কখন? অফিস আছে তো!"

"আজই দেখুন না।"

পুলিন বলতে যাচ্ছিল, আজ নয়, হাতে কাজ আছে। তার বদলে বলল, "দোকানে এই সময়টা একটু থাকা দরকার। যদি সাড়ে আটটা নাগাদ যাই অসুবিধে হবে?"

"না। আপনি তো বাড়ি চেনেন?"

পুলিন মাথা কাত করল। শ্রীময়ী থেকে সলিল দু'-তিনবার তাকিয়েছে। নিশ্চয় জিজ্ঞাসা কববে, কেন এসেছিল।

দোকান থেকে বেরিয়ে তুষারকণা, "চায়ের জন্য ধন্যবাদ", বলল। পুলিন হেসে শুধু মাথাটা সামনে ঝোঁকাল।

সুকুমাবের স্কুটাব রত্না স্টুডিয়োব সামনে থামল। পুলিন লক্ষ করল, সুকুমাবেব চোখে বিস্ময়। তুষারকণা তখন শাড়ি মুঠোয় ধরে সামান্য তুলে কাদাটা ডিঙিয়ে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছে।

"শুনুন,...আমি কি খোঁজ নেব বাচ্চাদের স্কুল আছে কি না জানার জন্য?"

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। দু'পা পিছিয়ে এসে বলল, "দেখুন না। খুব ভাবনায় রয়েছি, একটা ভাল স্কুল যদি পাওয়া যায়।"

কণ্ঠস্বরের মিনতি, পুলিনকেও ওর উৎকণ্ঠার শরিক করে নিল। সে আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমি দেখব।"

তুষারকণা ফিরে চলে যাচ্ছে। পুলিন দাঁড়িয়ে রইল সে-দিকে তাকিয়ে। সুকুমার স্কুটার রেখে এগিয়ে এল।

"কিছু কিনতে এসেছিল নাকি?"

"না। বৃষ্টি এসে পড়েছিল তাই দোকানে ঢুকে পড়েছিলেন।"

"তাই বলো দাদা। তোমার দোকানে তো আজ পর্যন্ত একা কোনও মেয়েছেলেকে দেখিনি।"

"দ্যাখোনি যেহেতু চোখ নেই, বহু মেয়েছেলেই একা এসেছে।"

সুকুমারের গায়েপড়া স্বভাব। কথাবার্তায় আদিরসের টান থাকে। প্রথম আলাপেই 'তুমি' দিয়ে শুরু করেছিল।

'দাদা আমি তোমার ছোটভায়ের মতো...অভিজ্ঞতা কম, ব্যবসার ফরমুলাগুলো একটু বলেটলে দিয়ো।'

'তোমার ব্যবসা ছবি তোলা, আমি তার কিছুই জানি না, বুঝিও না।'

'কীযে বলো দাদা! ব্যবসা ইজ ব্যবসা, সব একই নিয়মে চলে। কাঠও যা ফ্লিমও তাই, খদ্দেরকে টুপি পরিয়ে মাল বেচা, তাই কি না?'

পুলিন গম্ভীর হয়ে যায়। কথার ধরন দেখে সে বুঝতে পারছে এই অর্ধশিক্ষিত সবজান্তার সঙ্গে

আলাপের গণ্ডিটা সর্বাগ্রে টেনে দেওয়া দরকার। পাঁচটা লোকের সামনে বেকুবের মতো কখন যে কী বলে বসবে!

'টুপি পরানোর চিন্তা নিয়ে ব্যবসায় এলে, খুব বেশিদিন টিকতে পারবে না, আর এটাই হল আমার প্রথম ফরমুলা।'

সুকুমার অপ্রতিভ হয়ে বোকার মতো হেসেছিল।

'না দাদা আমি সিরিয়াসলিই ব্যবসা করব। ষোলো বছর বয়স থেকে ক্যামেরা চালাচ্ছি। টাকা গচ্চা দিয়েছি, জল খেয়েছি অনেক ঘাটের। এবার বউয়ের বাবার টাকায় নেমেছি। জায়গাটা অবশ্য ফোটোর দোকান দেবার মতো এখনও হয়নি, কিন্তু একদিন তো হবেই।'

দোকানের ভিতরে বসে থাকলে বোঝা যায় না পাশেই সুকুমারের দোকানে ছবি তোলাতে কেমন লোকজন আসছে। তবে পুলিনের ধারণা, খরচটা উঠে আসে এবং সে বাইরের নানান রকমের ছবি তোলার কাজ করে। ওকে বিয়ে বাড়িতে আর গৃহপ্রবেশের ছবি তোলার কাজ পুলিন জোগাড় করে দিয়েছিল। সুকুমারের নিজেরও আন্তরিক চেষ্টা আছে আর সে-জন্যই বাচালতা সত্ত্বেও পুলিন ওকে পছন্দ করে।

সুকুমার আবার বলল, "ভদ্রমহিলা একবার আমার দোকানে ছবি তুলিয়েছিল, পাসপোর্ট ছবি।"

"কী জন্য?"

"অফিসের আইডেনটিটি কার্ডের জন্য। ফেসটা এত সফট, নরম না কী বলব তোমায়! লোভে পড়ে প্রোফাইলেরও একটা ছবি তুলে নিয়েছিলাম শো-কেসে ডিসপ্লে করার জন্য। একটা আলো ঘাড়ের পাশ থেকে আর-একটা তলা থেকে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক...কত লোককে ধোঁকা দিয়ে বলেছি শ্রীদেবীর ছবি, কেউ সন্দেহ করেনি।"

"ছবিটা কোথায়?"

"কেন, শো-কেসেই তো রয়েছে! তুমি তো চোখ থাকতেও অন্ধ, একবার আমার দোকানের দিকেও ভাল করে তাকালে না।"

"দেখি তো।"

সুকুমার দোকান খুলে, শো-কেসের সামনে কাঠের পাটা সরিয়ে আলোটা জ্বেলে দিয়ে বলল, "খুঁজে নাও, দেখি কেমন তোমার নজর।"

ছোট বড় নানান আকারের অন্তত পনেরোটি সাদাকালো ও রঙিন ছবি। ছাঁদনাতলায় বর-বউ, সভাপতিকে মাল্যদান, স্টেজে বাচ্চাদের নাচ, উপনয়ন, শিল্ড নিয়ে ফুটবল দল এবং বসা ও দাঁড়ানো নানান বয়সি পুরুষ ও নারীর সঙ্গে অন্তত সাতটি মেয়ের নানান কোণ থেকে নেওয়া মুখও রয়েছে।

ডান দিকে উপরের কোণে ইউনিকের ভাউচার ফর্মের সাইজের সাদাকালো ছবিটায় পুলিনের চোখ আটকে গেল। এটাই।

সুকুমারের শ্রীদেবীটি যে কে, তা সে জানে না, নিশ্চয় বোম্বাইয়ের কোনও অ্যাকট্রেস হবে। কিন্তু এই ছবিটার মতোই যদি তাকে দেখতে হয় তা হলে...। সুকুমারটা ছবি তুলতে জানে। কী একটা বোধ ওর মধ্যে আছে নইলে এত সহজভাবে মুখটাকে বুঝে নিল কী করে!

"খুঁজে পেলে?"

পুলিন সতর্ক হল। পেয়েছি বললে সুকুমার এমন কিছু ফোড়ন কাটতে পারে যেটা তার পক্ষে অস্বস্তির কারণ হবে। পাইনি বললে ভাববে, ন্যাকামি করছে।

"ওইটে মনে হচ্ছে।"

"দাদাকে যা ভাবতুম তা তো নয়, নজর তো দারুণই!...জাস্ট লাইক শ্রীদেবী, ঠিক কি না?"

ছবিটার দিকে পুলিন আর একবার তাকাল। ছ'-সাত সেকেন্ড, তারমধ্যেই সে দু'চোখ দিয়ে আলোছায়া মাখা মুখটা থেকে যতটা সম্ভব, শুষে নিল রক্ত, পেশি, কেশ, রোম, চোখের পল্লব, ত্বকের ভাঁজ, ওষ্ঠের কুঞ্চন, চোখের কোলের অন্ধকার, গ্রীবার মসৃণতা...তার স্মৃতির কোষগুলিকে ভরিয়ে। যেন শেষবারের মতো, যেন আর কখনও তুষারকণাকে সে দেখতে পাবে না।

"উনি জানেন কি ওঁর ছবি এ-ভাবে টাঙানো আছে রাস্তার লোকজনের চোখের সামনে?"

"টাঙানো থাকলে তো কী হয়েছে!"

সুকুমার অবাক হয়ে গেল। এমন অর্থহীন একটা কথা কেউ বলতে পারে, এটাই বোধগম্য না হওয়ার ছাপ তার মুখে পড়ল।

"কত লোক, কত মেয়ে সেধে বলে...শো-কেসে জায়গা পাওয়া মানে...আপনাকে কী আর বলব।"

"উনি হয়তো নাও পছন্দ কবতে পারেন।"

"কেন, উনি কি জানেন না? দু'বেলাই তো হাঁটছেন দোকানের সামনে দিয়ে একবারও কি চোখে পড়েনি? আপত্তি থাকলে নিশ্চয় বলতেন।"

পুলিন আবার সতর্ক হল। সুকুমার সম্ভবত ঠিকই বলেছে। হয়তো তুষারকণা জানে তার ছবি শো-কেসে রয়েছে আর এ-ভাবে থাকায় তার আপত্তি নেই।

এনিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার! সে তুষারকণার গার্জেন নয়। কেউই নয়। ওকে নিয়ে তাব মাথাব্যথাটা বাড়াবাড়িই, চোখে পড়ার মতো। সুকুমার এই নিয়ে তাকে দুটো বাঁকা কথা শুনিয়ে দিতে পারে। বরং ওকে নরম করে দেওয়াই ভাল।

"ছবিটা সত্যিই দারুণ তোলা, যতটা না সুন্দব তাব থেকেও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। আচ্ছা সুকুমার, আমাকে ছবিতে কেমন দেখাবে?"

সুকুমাব ফিক ফিক হাসল। "কাল দাড়ি কামিয়ে এসো, সকালেই। আগে তুলে দিই তাবপব বোলো,...পয়সা দিতে হবে না।"

পুলিন চমক খেল, মুখে দাড়ি! আজ মনেই ছিল না কামানোর কথা! সাড়ে আটটায় ওদেব বাড়ি যাবাব আগে কামিয়ে নিতে হবে।

"ঠিক আছে কালই তা হলে একটা. .।"

দুই তালু দিয়ে দুটি গাল ঘষতে ঘষতে পুলিন ইউনিকে ফিবে আসার সময় কাশীনাথকে আসতে দেখল। পরনে টকটকে লাল গোলগলা গেঞ্জি আর সস্তা জিন্‌স। চুড়ো হয়ে বয়েছে মাথার চুল। উঁচু গোড়ালির জুতোর জন্য খপখপিযে হাঁটছে। পবিচ্ছন্ন, ফিটফাট। পুলিনকে দেখে সে হাসল। পুলিন যান্ত্রিক ভঙ্গিতে হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

সাড়ে আটটায় তাকে বেরোতে হবে।

পাঁচ

ভিতর থেকে গলার স্বব বা কোনওরকম শব্দ পাওয়া যায় কি না শোনার জন্য সে কড়া নাড়াব আগে চুপচাপ অপেক্ষা করল। অন্ধকাব জায়গাটা। ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর শব্দ নেই। দরজার চৌকাঠেব ফাঁক দিয়ে দালানের আলো বেরোচ্ছে। টর্চ জ্বেলে পুলিন হাতঘড়ি দেখল।

ঠিক সাড়ে আটটাতেই সে বেরিয়েছে। একটু তাড়াহুড়োই করতে হয়েছে। ভোলাবাবু দেয়াল আলমারির জন্য আবাব এসেছিলেন। পাঁচশো টাকার মধ্যে কেন করানো যাবে না, সেটা তাঁকে বোঝাতে হয়েছে। শচীন হালদার কাঠেব জন্য সাড়ে চার হাজার টাকার বিল দু' সপ্তাহ আগে পাঠিয়েছিল। তার লোককে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করতে কিছুটা সময় গেছে। ওষুধের দোকান খুলবেন এক ভদ্রলোক, লাইনের ওপারে বাড়ি। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ঘরের মালিক যে সেলামি চেয়েছে, সেটা কমাবাব জন্য পুলিন যদি অনুরোধ কবে! দোকানে ডাক্তার বসার ব্যবস্থা থাকবে। রথতলার এই অঞ্চলে ডাক্তার নেই।

এদের সঙ্গে কথা বলার পর পুলিন ভিতরে গিয়ে দাড়ি কামায়। খাবার দালানের একধারে দেয়ালে আয়না, তার নীচে ব্র্যাকেটে সেফটি রেজার, টুথব্রাশ টুথপেস্ট, সাবান ইত্যাদি। সাবান মাখিয়ে দাড়ি নরম করার মতো সময় ছিল না, গালে জল মাখিয়ে হাত দিয়ে ঘষে সে কামিয়ে নেয়। জ্বালা করেছে। কামাবার পর গালে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারে মসৃণ হয়নি, গোড়াগুলো আঙুলে ঠেকছে। তবে বোঝা যাচ্ছে না।

একসময় দাড়ি কামানোটা একটা অনুষ্ঠানের মতো ব্যাপার ছিল। বাটিতে জল, শেভিং ক্রিমের টিউব ব্রাশ আর সেফটি রেজারের বাক্সটা টেবলে সাজিয়ে, চেয়ারে বসে আয়নাটাকে টেবলে ঠিকমতো হেলিয়ে মুখটা কাচের মাঝখানে রাখা তারপর ব্লেডের কোন ধারটা দিয়ে কামাবে সেটা ঠিক করা। একটা ব্লেডে এ-পিঠ ও-পিঠ করে সে আটবার কামাত, প্রতি ধারে দু'বার করে। মনে রাখতে পারত না কোনধারটা দিয়ে ক'বার কামানো হয়েছে।

একটা গোঁফ ছিল যেটা নাকের তলা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত ঢালু হয়ে নামা। তার আকার রক্ষায় সময় লাগত, লম্বা পুরু ঝুলপি ছিল। ছোট্ট কাঁচি নিয়ে সে খুঁজত, বড় হয়ে গিয়ে কোনও চুল ভারসাম্য নষ্ট করছে কি না।

কামাবার কাজে মনোযোগ সত্ত্বেও সে টের পেত ছায়া তাকে লক্ষ করছে, তাকে অর্থাৎ তার মুখটা। তখনই সে দালান মুছতে শুরু করত কিংবা রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে কুটনো কোটা। আয়নাটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে সে অনেক দিনই ওকে পেয়ে যেত। তার মনে হত, অদ্ভুত একটা মুগ্ধতা যেন গোগ্রাসে ছায়ার দু'চোখ থেকে বেরিয়ে তাকে গিলছে। সে মাথা ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে তাকাত। ছায়া চোখ সরিয়ে নিত। মজা পেয়ে সে হাসত।

শিবানীর চোখে পড়েছিল। সে দাড়ি কামাতে বসলেই ছায়াকে কাজে ব্যস্ত রাখত।

"কাপড়গুলো তাড়াতাড়ি কেচে দে।" কলঘর থেকে দেখা যেত না দাড়ি কামানো।

গত দশ বছর গোঁফ, ঝুলপি আর সে রাখে না। আয়না ছাড়াই সে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে পারে।

স্নানও করেছে। দরকার ছিল না, তবুও। আলমারি থেকে ধুতি আর পাঞ্জাবি বার করার পর তার একবার মনে হয়েছিল, হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে না কি এইভাবে সাজগোজ করাটা! আসলে সে একটা ব্যবসায়িক কাজেই তো যাচ্ছে, পুরনো আলমারি দেখতে, কেনার মতো হলে একটা দাম বলবে।

কড়াটা অত্যন্ত মৃদুভাবে নাড়ল। অপেক্ষা করল। শুনতে পায়নি। জোরে তিনবার শব্দ করল।

"কে এসেছে দেখ তো।" বৃদ্ধার গলা। বোধহয় মা।

তুষারকণা দরজা খুলল। "ওহ এসেছেন। আসুন।"

দরজার পর হাত চারেক চওড়া ইট বিছানো পথ উঠোনে গিয়ে মিশেছে। বাঁ দিকে তিনধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা লম্বা দালান। তার একদিকে তিনটি ঘর, অন্যদিকে নিচু খিলেন, সিঁড়ি তারপর উঠোন।

"ওই যে সামনে।"

দালানের শেষে আলমারিটা। হয়তো আগে ঘরেই থাকত কেন না অবিনাশ মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলতে এসে এই জায়গায় এটাকে পুলিন দেখেনি।

নীচে দুটো টানা, উপরেব তিনটি তাকে সামনেব পাল্লা নেই। সেখানে প্রয়োজন ফুরানো কিন্তু মায়া ছাড়তে না পারা ছেঁড়া জুতো, পাউডারের লম্বা কৌটো, প্লাস্টিকের রেলগাড়ি, মরচে ধরা দুধের টিন, চিনেমাটির ফুলদানি, ভাঙা টি পট, তালপাকানো নারকেল দড়ি, ন্যাকড়া, খবরের কাগজ। প্রায় সাত ফুট লম্বা আলমারিটার মাথায় কাপড় মুড়ে পাকিয়ে রাখা লেপ, তার নীচে গাদা করা পুরনো পত্রিকা।

কাঠের আসল রং কী ছিল তা বলা সম্ভব নয়, অন্তত চল্লিশবছর এতে পালিশ পড়েনি। সামনের দুটো পায়া ছিল সিংহ বা বাঘের থাবার, তার একটি নেই। আঁচড়াতেই কাদার মতো ময়লা পুলিনের নাকের মধ্যে ঢুকল।

আলোর জোর কম। তার উপর দেয়াল, দরজা জানলাগুলোও বালিখসা, রংচটা, মেঝের সিমেন্ট ফাটা, কয়েক জায়গায় দাগরাজি করা। গোটা দালানটাই ম্লান, দমচাপা।

একটু ঝুঁকে, টর্চের আলো বুলিয়ে সে যা ভেবেছিল সেটারই সমর্থন পেল। বার্মা সেগুন। আড়াই হাজার টাকা তো শুধু কাঠেরই দাম!

"আলমারিটা এ-ভাবে অযত্নে রেখেছেন কেন?"

"কী করব এটা ঘরে রেখে, কত জায়গা জুড়ে থাকে।"

ঘর থেকে এক বিধবা প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন।

"বাবা, আরশুলা আর ইঁদুরের উপদ্রব থেকেও বেঁচেছি। রাতে সারাঘরে ঘুরে বেড়াত আর দিনে ওর মধ্যে ঢুকে থাকত।"

"ওপরের পাল্লা দুটো কোথায়?"

"আমরা এসে আর দেখিনি, মা তুমি নিশ্চয় দেখেছ?"

"দেখব না কেন! ছোট থেকেই দেখেছি, সব ভাইবোনের জামাকাপড় তো এতেই রাখা হত।"

"জলের ছিটে লেগে লেগে তলার দিকটার কাঠে..."

পুলিন টর্চ নেভাল। তুষারকণা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "কাঠ কি পচে গেছে?"

"না।"

"এটা কি বিক্রি করা যাবে?"

"যাবে।"

"আপনি বসুন। মা চায়ের জল বসাবে?"

দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চ। এটাও পুরনো, পুলিন এই বেঞ্চে বসেই কথা বলে গেছে।

"আপনার দাদামশাই একটা চেয়ারে বসতেন, সেটা কোথায়?"

"ওটা ঘরে রেখেছি, পায়া ভেঙে গেছে...আচ্ছা কীরকম দাম এটায় পাওয়া যাবে?"

তুষারকণার ব্লাউজের হাতাটা খুবই ছোট। গরমের আর বাড়িতে পরার জন্যই হয়তো এ-ভাবে তৈরি করিয়েছে। শাড়িটা কমদামি ছাপা। গোছের কাছে উঠে রয়েছে, পিঠের আঁচলটাও খাটো। পুলিনের চোরা চাহনি বারদুয়েক ওর কোমর থেকে গড়িয়ে নামল উরুর উপর দিয়ে। সুখদায়ক একটা অস্বস্তিতে সে ভরে গেল। কেমন যেন একটা জটিলতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে ওর খোলাবাহুর ডৌল, কোমরের ভাঁজ, তলপেটের স্ফীতি, পাছার বক্রতা। ব্যগ্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে। পুলিন ওর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হল। কত সরল ওর চোখদুটি!

"দাম নেবেন না এটার বদলে জিনিস নেবেন?"

"একটা খাট কি এটা দিয়ে হয়ে যাবে?"

"কণা জল ফুটে গেছে।"

রান্নাঘরের দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে যখন, তুষারকণার গোটা শরীরটা তখন দেখে নেবার সুযোগ পুলিন নিল। ধীরে ধীরে সে আড়ষ্ট হয়ে গেল। এ-ভাবে সে একসময় ছায়াকেও দেখত। মাঝেমাঝে ধরাও পড়ে যেত। ছায়া চোখ নামিয়ে নিত। ষোলো বছর বয়স, বুঝতে পারত। কম কথা বলত...বলতই না প্রায়।

"নিন, খেয়ে দেখুন, লেবু চা।"

"তা হলে বাড়িতে লেবু ছিল।"

"একটা ছিল...এখানে ভাল চা পাওয়াই যায় না। ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে এনে দিয়েছে আমাদের কাজের মেয়েটা...বাজে।"

"স্টেশনে একটা দোকান আছে জুপিটার টি হাউস, ভাল চা রাখে, ওখান থেকেই কিনি আমি...বাহ্ চমৎকার করেছেন তো। গদাইটা ভাল করতে পারে না। আপনার যদি দরকার হয় গদাইকে টাকা দেবেন, ও কিনে আপনাকে দিয়ে যাবে।"

পুলিন দ্বিতীয় চুমুক দিল। লেবুটা বেশিই পেকে গেছে। চিনিও একটু বেশি।

"একটা ভাল ডাবল বেড হয়ে যাবে। এই ত্রিদিবনগরেই একজনকে করে দিয়েছি, মাস দেড়েক আগে, চব্বিশশো টাকায়।"

"চব্ বিশ্ শো!...এটার দাম?"

বিশ্বাস না হবারই কথা। কাঠের মর্ম সবাই বোঝে না। পুলিন মিটমিট চোখে তাকিয়ে রইল। এখন সে তুষারকণার অনেক কাছে এসে গেছে বলে নিজেকে মনে করল।

"আপনার কি মনে হচ্ছে দামটা কম হল? পড়াশুনোর জন্য একটা ছোট ডেসক আর চেয়ারও দিতে পারি আপনার ছেলের জন্য...কী নাম ওর? খুব সুন্দর ছেলেটি। ঘুমোচ্ছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরই বাবুই ঘুমিয়ে পড়ে।"

"তবে খাটটা কিন্তু তা হলে আর অত ভাল হবে না।"

"আচ্ছা, একটা ডবলের বদলে দুটো সিঙ্গল খাট হবে?"

"হতে পারে।"

তুষারকণা অভিভূত। ও যদি তিনটে খাট চায় তাতেও সে রাজি হয়ে যাবে। খালি পেয়ালাটা মেঝেয় নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, তুষারকণা হাত বাড়িয়ে নিল।

"আপনার কি দুটো খাটই চাই?"

"হ্যাঁ একটা আমার আর একটা ওর জন্য।"

"আপনি কালই গিয়ে পছন্দ করে আসবেন। যদি পছন্দমতো না পান, তৈরি করে দেব। আর কালকে লোক পাঠাব এটা নিয়ে যাবার জন্য, কখন আসবেন?"

পুলিন উঠে দাঁড়াল।

"যখন হোক, দাঁড়ান মাকে জিজ্ঞেস করি, আমি তো আটটার মধ্যে বেরিয়ে যাব।"

ও রান্নাঘরের দিকে গেল। পুলিন ধীরে-ধীরে এগিয়ে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তখন চোখে পড়ল উঠোনের একধারে তিন চারটি গোলাপগাছ। একটিতে ফুটেও রয়েছে।

"দশটা-এগারোটা নাগাদ পাঠান। আলমারির জিনিসগুলো নামাতে হবে তো।"

"বেশ।...আপনারও গোলাপের শখ! আমার খুব প্রিয় ফুল।"

উত্তরের জন্য পুলিন কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। কোনও উত্তর না পেয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে সদর দরজার কাছে গিয়ে সে খিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিতে তুষারকণা এসেছে।

"আপনি কি রত্না স্টুডিয়োয় ছবি তুলিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ," প্রশ্নের আকস্মিকতায় অপ্রস্তুত দেখাল, "খুব তাড়া ছিল ছবিটার জন্য, দেখলাম বাড়ির কাছেই রয়েছে দোকানটা।"

"দুটো ছবি তুলেছিল, তার একটা দোকানের শো-কেসে রাখার জন্য।"

"হ্যাঁ, তাই-ই বলেছিল। আমি এককপি চেয়েছিলাম। তারপর আমারও আর মনে নেই, লোকটাও বোধহয় ভুলে গেছে।"

"আপনি দেখেছেন কি ছবিটা?"

"নাহ্, শো-কেসে রেখেছে নাকি! দেখতে হবে তো! আপনি দেখেছেন?"

"অপূর্ব।...আপনাকে চাইতে হবে না, আমিই চেয়ে নেব। কলেজ স্ট্রিটে চেনা দোকান আছে ফোটো বাঁধানোর, একেবারে বাঁধিয়ে নিয়েই আসব।...আচ্ছা চলি, তা হলে কাল লোক পাঠাচ্ছি এগারোটা নাগাদ, আর আপনি খাট পছন্দ বা অপছন্দ যাই হোক করে যাবেন।"

ফেরার সময় পুলিন কৃতজ্ঞ বোধ করল। তুষারকণা বড় নরম একটা অনুভব তাকে দিয়েছে। বহুদিন হল সে এমন একটা পূর্ণতার স্বাদ নিজের মধ্যে পায়নি।

কিছুই নয়, সাধারণ কথাবার্তা, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যেমনটা হয়ে থাকে। ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের সঙ্গেও তো সে এইভাবেই কথা বলেছে।

উপযাচক হয়ে একটার পর একটা কাজ নিয়েছে সে। ছেলের জন্য স্কুলের খোঁজ করার প্রতিশ্রুতি, চা কিনে দেব বলা, দোকান থেকে ফোটো চেয়ে নিয়ে বাঁধিয়ে দেবার দায় নেওয়া...মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে! কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে তো তার মনে হচ্ছে না। বহুদিনের পরিচিতের মতোই সাবলীল কথাবার্তা হয়েছে।

'অপূর্ব' শব্দটা মুখ ফসকে কীভাবে যে বেরিয়ে এল! বলেই সে ভয় পেয়ে গেছল। একমাত্র এটাই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আলোর দিকে পিছন ফিরে ছিল তাই ওর মুখে তখন কী ভাব ফুটে উঠেছিল বুঝতে পারেনি। যদি বিরক্তি দেখত তা হলে বলত, 'সুকুমারের হাতটা অপূর্ব।'

পুলিন আপন মনে হেসে উঠল। হিন্দি গান গাইতে গাইতে কাশীনাথ আসছে। তারই মতো করে হয়তো কোথাও সময় কাটিয়ে ফিরছে, সুখকর কোনও সান্নিধ্য, প্রফুল্ল কোনও পরিবেশ থেকে। পুলিন মন্থর হল।

কাশীনাথ সম্ভ্রমভরে দাঁড়িয়ে পড়ল গান থামিয়ে।

"সিনেমা দেখতে গেছলে নাকি?"

“আজ্ঞে না, ওপারে গেছলাম গ্রামের এক মাসির কাছে, নার্সিংহোমটায় আয়ার কাজ করে।”

“তোমার দেশ কোথায়? কথার টান শুনে মনে হচ্ছে দোখনো!”

পুলিন টর্চটার কাচ পাঞ্জাবির হাতায় ঘষতে শুরু করল। যেন এই কাজটার জন্যই সে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

“ক্যানিং লাইনে ঘুটিয়ারি শরীফ ইস্টিশনে নেমে ছ'-সাত মাইল ভেতরে।”

হৃৎপিণ্ডের একটা স্পন্দন ফসকে গেল পুলিনের। ক্যানিং! ওই দিকেই ছিল ছায়ার দেশ। শিবানী বাপের বাড়ি থেকে ওকে আনিয়েছিল। তার ছোটশালা মহাদেব তালদি থেকে এসে একদিন সন্ধ্যায় ছায়াকে পৌঁছে দিয়ে যায়।

“বাড়িতে আছে কে?”

“সবাই আছে। বাপ মা ভাই বোন।”

“বাড়িতে মাসে মাসে কিছু পাঠাও টাটাও নাকি সবই...”

“আজ্ঞে বাবু, ছ' বছর কাজ করে দু'শো দশ টাকা মাইনে হয়েছে, খেয়ে পরে আর থাকে কী যে পাঠাব? বড়বাবুকে বললুম একটা চালাঘর করে দিন, তা হলে ঘরভাড়াটা বাঁচে।”

“একা মানুষ এখানে ভালই তো আছ, ঘর ভাড়া নিয়ে থাকার দরকার কী?”

“চিরকাল কি আর পুরুষমানুষ একা থাকে।”

কাশীনাথের এটা প্রশ্ন নয়, প্রমাণসহ যেন একটা উপলব্ধি পেশ করা। টর্চের আলো ওর মুখের উপর ফেলে পুলিন বলল, “বিয়ে করছ?”

চোখ পিটপিট করে মুখটা পাশে ঘুরিয়ে কাশীনাথ লাজুক হাসল, পুলিন টর্চ নিভিয়ে, “আচ্ছা”, বলেই হাঁটতে শুরু করল।

সামনের দরজা বন্ধ। ভিতরে ঠুকঠাক শব্দ শুনে পাশের দরজা দিয়ে সে দোকানে ঢুকল। গদাই টুকরো কয়েকটা ফালিকাঠ নিয়ে বসে পেরেক মারছিল, পুলিনকে দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

“করছিস কী আলো জ্বেলে?”

“পিঁড়ি বানাচ্ছি।”

“কার জন্য?”

“ভোলার মা বলেছিল,'কেমন কাজ শিখেছিস দেখি, একটা পিঁড়ি বানিয়ে দিস তো,' তাই...।”

চোখ জ্বলজ্বল করছে। নিজের হাতে বোধহয় এটাই ওর প্রথম কাজ...সৃষ্টি! ভয় রয়েছে যদি বকুনি খায়, দ্বিধান্বিত গর্বকে আড়াল করে লজ্জাও ফুটে রয়েছে।

“কাল সকালেই শ্যামসুন্দরকে খবর দিবি এসে যেন দেখা করে একটা আলমারি আনতে হবে...ভুলবি না।...দেবার আগে পিঁড়িটা পালিশ করে দিস।”

পুলিন যাবার জন্য ঘুরেই আয়নায় নিজেকে দেখে থমকে গেল।

কেউ কি বিশ্বাস করবে এক সময় সে সুদর্শনই ছিল। একটাই ছবি ছিল তার, পোস্টকার্ড সাইজের। অফিসের অনিল মল্লিক বিয়েতে উপহার দিয়েছিল। কবজা দেওয়া নিকেলের ফ্রেম, পাশাপাশি দুটো ছবি রাখা যায়। ফ্রেমটা সামান্য ভাঁজ করে মুখোমুখি ছিল তার আর শিবানীর ছবি কাঁধ সমান উঁচু স্টিলের আলমারিটার উপর।

বউভাতের দু'সপ্তাহ পর সন্ধ্যাবেলায় ছবি তুলতে হাতিবাগানে একটা স্টুডিয়োয় তারা গেছল। ফিরে আসার পরই শিবানীর হাঁপানির টান ওঠে। পুলিন সে-দিনই জানতে পারে রোগটা ওর ছোটবেলার, তার কাছে এটা লুকিয়ে গেছল।

একবার সে ছায়াকে দেখেছিল ঘর মুছতে মুছতে একদৃষ্টে ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমার পাশে তোমার বউকে শাঁখচুন্নির মতো দেখায়।' খাটে উপুড় হয়ে থাকা ছায়া বলেছিল।

'শাঁখচুন্নি কখনও দেখেছিস?' পুলিন বলে ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে থুতনি রেখে।

'কুচ্ছিরি দেখতে মেয়েমানুষকেই শাঁখচুন্নি বলে...যেমন হাড় জিরজিরে সিড়িঙ্গে, কালো, তেমনি খ্যাঁচখ্যাঁচে, কী দেখে বিয়ে করেছিলে?'

'কী করব, তোকে তো আগে দেখিনি, দেখলে ওকে আর বিয়ে করতাম না।' হালকা সুরে সে

বলেছিল, ফ্রকের পিঠের হুক খোলায় ব্যস্ত থেকে।

মুখ পিছন দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে পুলিনকে দেখার চেষ্টা করে ছায়া বলেছিল, 'তা হলে আমাকে করতে?'

'হুঁ,...করতাম।'

বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিতেই মশারির গায়ে চৌকো সাদা কাগজের চাঁদের আলো সাঁটা হল। এত মেঘ, এত বৃষ্টির পরই জ্যোৎস্না! পুলিনের মনে হল, তার জীবনেও আলো আসবে।

ছয়

শম্ভু এসে জানিয়ে গেছে শুক্রবার তিনটের সময় শেয়ালদা স্টেশনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে অনুকে নিয়ে থাকবে। শম্ভুর বন্ধু প্রিয়ব্রতও আসবে। শঙ্কর আর তার এক বন্ধু মৌলালির মোড়ে অপেক্ষা কববে। সেখান থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে সবাই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে যাবে।

'ছেলেটা তা হলে রাজি আছে?'

পুলিন তার ঘেরা কামরায় বসে গলা নামিয়ে বলেছিল। শম্ভুর চোখে সে নিশ্চিন্তি দেখতে পায়নি।

'শঙ্কর তো প্রথম থেকেই বলছে, বিয়ে করব। একটা ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে ওকে বিধাননগর স্টেশনের গায়ে ট্রাম স্টপে দেখা করতে বলি। পাড়ায় দেখা করতে বলিনি কেন না ওর মুভমেন্টের ওপব নজব রাখতে বাড়ি থেকে চব লাগিয়েছে।

'ঠিক সময়েই এসেছিল। ওকে বললাম শুক্রবার চব্বিশ তারিখে রেজিস্ট্রির দিন ঠিক হয়েছে। ওটা বিয়েরও দিন, তিনটে থেকে লগ্ন শুরু ন'টা পর্যন্ত থাকবে। ও বলল, ভাববেন না, আমি শেয়ালদা স্টেশন থেকে দূবে কোথাও অপেক্ষা কবব। নিজেই বলল যুবকল্যাণ অফিস বাড়িব নীচে দাঁড়াবে।'

'বাড়ি থেকে কি এখনও প্রেসার দিচ্ছে বিয়ে না করার জন্য?'

'তা তো কিছু বলল না। আর জিজ্ঞেস করেই বা কী হবে, জানিই তো ওদের বাড়ির মনোভাব। তবে মতলব কিছু একটা এঁটেছে মনে হয়। পরশু ওর মেজদা বাস স্টপে খুব অমায়িক ভঙ্গিতে আমাকে বলল, আগে অ্যাবোর্শনটা করিয়ে নিন তারপর বিয়েতে ওরা উদ্যোগ নেবে। এমাসে না হোক পরের মাসেই বিয়ে দিয়ে দেবে।'

'না না না, খবরদার নয়।' পুলিন আঁতকে ওঠার মতো চেয়ারে সোজা হয়ে দু'হাত নাড়ে।

'আরে আমিও কি বুঝি না মতলবটা, কার্যোদ্ধার হয়ে গেলেই কলা দেখাবে! এতেই বুঝলুম ব্যাপারটা নিয়ে ওরাও ভাবছে...ভাবুক, শুক্রবার চুপচাপ কাজটা চুকে যাক তো! আমি আব দেরি করতে রাজি নই পুলিনদা, কেলেঙ্কারি যা হবার তো হয়েইছে, আরও কিছু ঘটার আগে...।'

'আর কে কে জানে?'

'শঙ্কব বলেছে একজন বন্ধু সঙ্গে থাকবে, তা হলে সে জানে আর এ-দিকে শুধু মা আর আমার বন্ধুটি। পুলিনদা প্লিজ, শুক্রবার...উইদাউট ফেল।'

ওদের একটা কিছু উপহার দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু ওদের তো ঘরই নেই সুতরাং ঘরে রাখার জিনিস দেওয়া নিরর্থক। ববং কাজে লাগবে এমন কিছুই ভাবা উচিত। অবশেষে পুলিন ভেবেচিন্তে ঠিক করে, শাড়ি আর শার্ট পিস দেবে। আড়াইশো টাকার কাছাকাছি বোধহয় পড়বে। এর কমে, দেবার মতো কাপড় হয় না। দুটো জিনিসই মন্মথ বস্ত্রালয়ে পাওয়া যাবে।

এরপর পুলিনের মনে হয়েছিল, শাড়িটা পছন্দ করে দেবার জন্য তুষারকণাকে বললে কেমন হয়! কিছু কি মনে করবে? এ-সব কাজ তো মেয়েরা ভালই বাসে। ইউনিকে জিনিস কিনতে আসে কি শুধু একা খদ্দেরই! তাদের পছন্দ করিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে একটি-দু'টি মহিলা তো প্রায়ই থাকে।

তুষারকণার একটা খাটও পছন্দ হয়নি। ইউনিকে এসে চারটি সিঙ্গল খাট দেখেছিল। অফিস থেকে ফেবার সময়।

'আপনি বরং দুটো খাট করিয়েই দিন। নকশাটকশা, ফুল লতাপাতা এ-সব থাকবে না, খাঁজে ধুলো

জমে বিশ্রী দেখায়। মশারির জন্য চারকোণে শুধু চারটে স্ট্যান্ড, ছত্রিমত্রির দরকার নেই।'

পুলিন শুধু বলে, 'তাই হবে।'

'আলমারিটা নিয়ে এসেছেন?'

'এনেছি। দেখে বুঝতে পারিনি কতটা ভারী! দুটো লোক গেছল, তারা তো তুলতেই পারেনি, আর একটা লোক গিয়ে নিয়ে আসে।...ওটাকে ভেতরে কারখানায় রেখেছি, ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।'

'ওটার কাঠগুলো তো খুলে ফেলবেন?'

'থাক তো এখন, পরে দেখা যাবে। অনেকে তো পুরনো ডিজাইনের আসবাব ঘরে রাখে বনেদি প্রমাণ করার জন্য। পাল্লা দুটো আর একটা পায়া তৈরি করে নিতে হবে।'

তুষারকণা দোকান থেকে বেরোতেই পুলিন ডেকেছিল, 'শুনুন...আপনার ছবিটা দেখে যাবেন।'

'ওহ্ ভুলেই গেছলাম।'

রত্না স্টুডিয়োর শো-কেসের সামনে গিয়ে ও দাঁড়াল। ইউনিকের সিঁড়ির ধাপ থেকে পুলিন লক্ষ করে ওর মুখ, প্রসন্নতায় ঝলমলিয়ে উঠেছে। নিজেকে সুন্দর করে দেখতে পেলে সবাই খুশি হয়। সুকুমার কী যেন বলছে, শুনতে শুনতে ওর চোখে লজ্জা ফুটে উঠল, ঠোঁট টিপে হাসি চাপার জন্য গালে টোলও পড়ে।

পুলিন তখন এগিয়ে যায়।

'দিদিকে বললুম, ছবিটা যদি রাজ কাপুরকে পাঠিয়ে দিই তা হলে পনেরো দিনের মধ্যে বোম্বাইয়ে স্ক্রিন টেস্টিং-এর জন্য প্লেনের টিকিট যদি না আসে তো সুকুমার না বলে ছারপোকা বলবেন...দাদা তোমারও বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'কে বলল হচ্ছে না?' পুলিন মজা পাচ্ছিল। সুকুমারকে ফরমুলা শেখাবে কে? বরং ওর কাছ থেকেই শেখা যায়।

'আমাকে এককপি দেবেন বলেছিলেন।'

কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে। লজ্জাটা লুকোতে আঁচল দিয়ে মুখ মোছে, একপায়ে ভর রেখে, মাথাটা একটু হেলিয়ে, ভ্রূ কুঁচকোয়, ভাবখানা যেন এ-সব কথা অনেক শুনেছে।

'সে আর বলতে! আজ সকালেই দাদা এসে তাগিদ দিয়ে বলে গেছে, কথা দিয়ে কেন কথা রাখিনি...আপনি নাকি খুব চটে গেছেন আমার উপর, এখুনি যেন এনলার্জ করে একহাত লম্বা একটা প্রিন্ট করে দিই।'

তুষারকণার বিস্ময়টা স্বাভাবিকই ছিল। পুলিন অপ্রতিভ হয়ে ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। সুকুমার যে এ-ভাবে সামনাসামনি বলে দেবে সে ভাবতে পারেনি।

'আমি কি বলেছি একহাত লম্বা প্রিন্ট করে দিতে?...এখুনি কবে দিতে?'

কিছু একটা প্রতিবাদ না জানালে ওই সময় নিজেকে বড় খেলো মনে হত। সে বুঝতে পারছিল না তুষারকণার গম্ভীর হয়ে যাওয়াটা তার হেনস্থা দেখে মজা পেয়ে নাকি গায়ে পড়ে অযাচিত কাছে আসার চেষ্টার জন্য? বুদ্ধিমতী...কিছু একটা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে।

'জানেন দিদি, একটা ছবি তুলে দিয়ে তবে দাদাকে শান্ত করি...পুলিনদা, ছবি যা একখানা হবে না...'

'এটা দেব আনন্দকে পাঠালে কী হবে?'

তুচ্ছতার স্তরে কথাবার্তাকে নামিয়ে দেবার জন্য পুলিন বলেছিল। কিন্তু মনে মনে অসম্ভব রেগে উঠেছিল সুকুমারের উপর। ফক্কুড়ির একটা সীমা আছে।

তুষারকণা তখন ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে, 'যেদিন হোক সুবিধামতো একটা কপি আমাকে দেবেন, সাইজটা ছোট হলেও চলবে।'

ও চলে যাবার পর পুলিন গনগনে স্থির চোখে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের ভাষা পড়ে নিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল, 'মুখের আগল আমার কম, ক্ষ্যামাঘেন্না করে দিয়ো...একটু মজাটজা না থাকলে জীবনটা বাজে হয়ে যায়। তিন দিনের মধ্যে দুটো ছবিই পেয়ে যাবে।'

মনের মধ্যে খচখচ করেছিল পরের দুটো দিন। কী ভেবে নিয়েছে কে জানে। তুষারকণার আসা-যাওয়ার সময়টায় সে কামরার মধ্যে বসে থেকেছে। নিজেকে ওর দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখার জন্য।

ক্ষুদ্র হয়ে গেছি ভেবে যে আড়ষ্টতা বোধ করছিল সেটা কেটে যায় শম্ভু এসে যখন বলল, শুক্রবার রেজিস্ট্রির দিন ঠিক হয়েছে, শেয়ালদায় তিনটের সময় যেন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সে থাকে।

"দেবু আজ দুপুরে আমি কলকাতায় যাব। দোকানে থাকিস, সন্ধে হয়ে যাবে ফিরতে ফিরতে।"

"আমার একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে।"

"কতদূরে?"

"পাড়াতেই।"

"আমি এলে পর যাস।"

পুলিন মন্মথ বস্ত্রালয়ে গেল।

"বিয়েতে দিতে হবে শাড়ি আর শার্টের পিস।"

নিচু তক্তপোশে সাদা চাদর পাতা। মন্মথ কর ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে। পুলিনের কথা শুনে মন্মথ বলল, "বাজেট কত?"

"শ' দুই।" একটু কমিয়েই সে বলল। ইউনিকেও এই প্রশ্নটা সে করে। খদ্দের বাজেটের যে অঙ্কটা বলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা ছাপিয়ে গিয়ে জিনিস কেনে। সেটা হয় তার জিনিস দেখানোর কায়দায়। মন্মথ করও নিশ্চয় বিক্রির কায়দা করবে!

"তাঁতের নেবেন না বোম্বাই প্রিন্ট?"

"যা হোক হলেই হল, আমি তো আর পরব না।"

"আপনি ওই শো-কেসে শার্ট পিস, প্যান্ট পিস রয়েছে, ওগুলো দেখুন, দাম লেখাই আছে।"

"জেনুইন মিলের তো?"

"নির্ভাবনায় থাকুন। এখানে দু'নম্বরি মাল পাবেন না।"

পুলিন উঠে গিয়ে কাচের সামনে দাঁড়াল। ভাঁজ করে রাখা কাপড়গুলো পিন দিয়ে আঁটা, তাতে দাম লেখা কাগজ সাঁটা। লাল কাপড়ে সাদা ফুটি দেওয়া একটা জামার পিস সে পছন্দ করল। পঁচাত্তর টাকা দাম লেখা। তা হলে শাড়ির জন্য রইল একশো পঁচিশ।

যথেষ্ট, শম্ভুর বোনের জন্য...তার নিজের নয়। বাড়িতে পরা যাবে, বাইরেও পরা যাবে এমন শাড়িই বেশি দরকার হয়।

"কোটা নিয়ে যান, এখন খুব চলছে।"

"দিন।"

লাল একটা শাড়ি সে বেছে নিল। তার আগে একশো কুড়ি টাকা দামটা পাড় উলটে দেখে নিয়েছিল। পাঁচ টাকা বাঁচল বাজেট থেকে। দু'-চার টাকা কমানোর জন্য সে অনুরোধ করল না। এই দোকানের কাঠের যা কিছু কাজ ইউনিকেরই করা। বারো হাজার টাকা দেবার পর মন্মথ হাত জোড় করে বলেছিল, বাকি তিনশো আর নাই বা নিলেন। সে ছেড়ে দিয়েছিল।

পলিথিনের থলি হাতে ঝুলিয়ে সে মন্মথ বস্ত্রালয় থেকে বেরিয়ে দেখল সুকুমারের কাঁধে ব্যাগ, স্কুটারে স্টার্ট দিচ্ছে।

"ছবিটা আজ পেলে ভাল হত সুকুমার, কলকাতায় যাচ্ছি, বাঁধাতে দিয়ে আসতাম।"

"কাল ঠিক দোব, প্রমিস...খুব ব্যস্ত, গায়ে হলুদের ছবি তুলতে যাচ্ছি, কাল না হলে পরশু অবশ্যই।"

সওয়া দুটোর ট্রেনটা ধরার জন্য পুলিন কুড়ি মিনিট আগে বেরোল। হাতে পলিথিন থলিটা। শম্ভু যা বলে গেছে তাতে লোক হবে ছ'জন। রেজিস্ট্রি সেরে সবাইকে নিয়ে মিষ্টিমুখ করাবে, এই সিদ্ধান্তটা সে আজ সকালে নিয়েছে। কাছাকাছি নিশ্চয় মিষ্টির দোকান পাওয়া যাবে। সেখানে বর-বউয়ের হাতে কাপড় তুলে দেবে। ছ'জনের মধ্যে সে বয়সে বড়, তারই খরচ করা উচিত যদিও এটা শম্ভুর দায়। ছ' জনে কত টাকার খাবে? খুব বেশি হলে সত্তর-আশি। রেজিস্ট্রার আর সেখানকার লোকেদেরও একবাক্স সন্দেশ দিতে হবে।

প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার সময় তার মনে হল একটা কৌটোয় সিঁদুর নিয়ে যাওয়া উচিত। সই করবার পর স্বামী সিঁদুর দিয়ে দেবে স্ত্রীর সিঁথিতে। এটাই সে শুনেছে, শম্ভুও নিশ্চয় জানে। কিন্তু যদি ও ভুলে যায়! লাইনের ওপারে বিশ্বকর্মা ভাণ্ডারেই কাঠের কৌটো আর সিঁদুর পাওয়া যাবে। সে কয়েক

পা গিয়েই ফিরে এল। যদিও ঠিক সময়ে কখনওই আসে না, ট্রেনটার আসার সময় হয়ে গেছে। যদি আজ কারেক্ট টাইমে এসে যায়।

আশ্চর্য, প্রায় এসেও গেল! মাত্র দেড় মিনিট দেরি করেছে। এটা কোনও লেটই নয়। কোনও কামরাতেই ভিড় নেই, পুলিন জানলাতে বসার জায়গা পেল। পাখা প্রত্যেকটাই ভেঙে নেওয়া কিন্তু আজ ভ্যাপসা গরমটা নেই। পাঞ্জাবি গায়ে লেপটে থাকবে না ঘামে। মেঝেও নোংরা নয়। জানলার অধিকাংশ পাল্লা তুলে নেওয়া, বৃষ্টি নামলে ভিজতে হবে কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পুলিনের মনে হল, সকাল থেকে সবকিছুই ঠিকঠাক মসৃণভাবে চলেছে...

তিনটে বাজতে পাঁচ, তখন পুলিন প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল। কালেক্টরের চোখ ও মন ঝুড়ি মাথায় একটি লোকের উপর গেঁথে যাওয়ায় পুলিনের টিকিট হাতেই থেকে গেছে। সেটা দিয়ে ঘাড় চুলকে নিয়ে সে দূরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে তাকাল।

শম্ভুকে সে দেখতে পেল। সেই একই শার্ট, প্যান্ট আর হাতের ব্যাগটা, যা গত এক বছরেরও বেশি ওর ছোটখাটো, দুবলা চেহারার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। রাস্তা পার হবার সময় ওর পাশের দু'জনের দিকে পুলিনের নজর পড়ল। নিশ্চয় ওর বোন আর বন্ধুই হবে।

"ঠিক সময়েই এসেছি, ঘড়ি দেখ।"

"পুলিনদা এই আমার বোন অনুরাধা আর আমার বন্ধু প্রিয়ব্রত।"

প্রথমে মুখে, তারপরই পুলিনের চোখ ওর পেটের দিকে নিবদ্ধ হতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। ব্যাপারটা যে সে জানে, অনুকে তা বুঝতে দিলে নিষ্ঠুরতাই হবে।

"থাক থাক সুখী হও বোন, শান্তিতে থাকো।"

পুলিন ঝুঁকে ডান হাতের আঙুল অনুর মাথায় ছোঁয়াল। এটাই কি জীবনে একটি মেয়ের কাছ থেকে তার প্রথম প্রণাম পাওয়া? বিজয়ার দিনে শিবানী তাকে প্রণাম করত। ওকে কি মেয়ে বলা যায়? তার থেকে শিবানী এক বছরের বড়ই ছিল, যেটা সে জেনেছিল মামলার সময়।

নমস্কার জানাল প্রিয়ব্রত। শম্ভুর মতোই ছোট্ট দেহ-কাঠামো, সৌম্য, শান্ত চাহনি, চশমার কাচটা মোটা। চুল উঠে গিয়ে কপালটাকে প্রশস্ত করেছে। শম্ভু বলেছিল কলেজে ফিজিক্স পড়ায়, ছাত্রীকে বিয়ে করেছে রেজিস্ট্রি করে।

"এই তা হলে আজকের নায়িকা।"

অনুর মুখের উপর দিয়ে হাসি ভেসে গেল। চমৎকার মুখ, শম্ভু বলেছিল ঠিকই . সুন্দরীই। বাড়ির প্রবল বাধা আপত্তি সত্ত্বেও ছেলেটা কেন বিয়ে করতে চায়, সেটা পুলিন এখন বুঝতে পারল। কিন্তু তুষারকণার মুখটা যে মনের মধ্যে এক ঝলক কেন ফুটে উঠল, সেটা তার বোধগম্য হল না। সে কি তুলনা খুঁজছে?

"পুলিনদা, এখান থেকে হেঁটেই যাই, মৌলালি তো কাছেই।"

শম্ভুর ভিতরে চাপা অস্থিরতা কাজ করছে। গলার স্বর কঠিন, দ্রুত।

"এইটুকু পথ, হেঁটে ছাড়া কি ট্যাক্সিতে যাব?"

সে আর শম্ভু আগে, পিছনে ওরা দু'জনে। শেয়ালদা কোর্ট ছাড়াতেই পুলিন বলল, "আর দেখা হয়েছে কি?"

"কে শঙ্কর?...না।"

ওরা আর কথা বলেনি, শম্ভু মাঝে মাঝে হাঁটার গতি বাড়িয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, ভ্রূ কুঁচকে। নীলরতন হাসপাতালের দেয়াল আর ট্রাম লাইনের মধ্যে সরু পথ। কাদা, পেচ্ছাপের গন্ধ, আবর্জনায় পথটা হাঁটার অযোগ্য। তা ছাড়া পিছন থেকে ট্রাম আসছে কি না দেখার জন্য বারবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতে হচ্ছিল।

"লাইনের ওদিক দিয়ে চল বরং, নিশ্চিন্তে হাঁটা যাবে।"

পুলিনের কথা মতো ট্রামলাইন পেরিয়ে এল ওরা।

"এইখানে দাঁড়াই।"

লাল ইটের বাড়িটার সামনে ট্রাম স্টপে শম্ভু তাদের অপেক্ষা করতে বলল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দু'ধারে এমনকী পিছনে জগদীশ বোস রোডের ওপরেও তাকাল।

"এখনও তো এসে পৌঁছয়নি," পুলিন হাতঘড়ি দেখল, "তিনটেয় কি আসার কথা?"
"হ্যাঁ। বলা ছিল আমরা স্টেশন থেকে তিনটেয় রওনা দিয়ে হেঁটে আসব।"
"তা হলে আসার সময় পেরিয়ে যায়নি।"
প্রিয়ব্রত চুপচাপ। হয়তো অনুর সঙ্গে পথে দু'চারটে কথা বলে থাকতে পারে। অনু মুখ তুলে বাড়িটার দেয়ালে রঙিন চিনেমাটির টুকরো দিয়ে গড়া বিরাট ম্যুরালটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে।
এক যুবকের ডান হাতে জ্বলন্ত মশাল, বাঁ হাতটা সামনে বাড়িয়ে, এক লালপাড় শাড়ি পরা যুবতীর হাতে ধানের শিষ। পুলিনের মনে হল দেয়ালের মেয়েটির আদল রয়েছে অনুর মুখে। দুজনেরই অনুত্তেজিত টলটলে চোখ। দিঘির মতো।
শঙ্করকে বা তার বন্ধুকে পুলিন কখনও দেখেনি। তবু সে লোকজনের, বিশেষ করে অল্পবয়সি ছেলেদের লক্ষ করা যাচ্ছে। দু'জনকে তার মনে হয়েছিল শঙ্কর হতে পারে। কালো ডোরা দেওয়া সাদা স্পোর্টস শার্ট পরা ছেলেটি তাদের কাছ দিয়েই চলে গেল। যাবার সময় অনুর দিকে দু'-তিনবার তাকায়। না তাকালেই পুলিন আশ্চর্য হত। ছেলেটি একা, সুতরাং শঙ্কর নয়। তার সঙ্গে একজন বন্ধু থাকার কথা।
অন্য ছেলেটি সুন্দর দেখতে, বয়স আরও কম। আজকের দিনে শঙ্করের যেমন সাজগোজ করা উচিত ছেলেটি সেই ভাবেই সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরেছে। সঙ্গে প্যান্ট শার্ট পরা সমবয়সি একজন। পুলিন আশ্বস্ত বোধ করেছিল। কিন্তু ওরা জগদীশ বোস রোডে একটা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল।
'শম্ভু সাড়ে তিনটে বেজে গেল।'
পাংশু হয়ে গেছে শম্ভুর মুখ। সে ব্যাকুলভাবে শেয়ালদার দিকে তাকিয়ে ট্রাম বাস মোটর এবং কয়েক হাজার লোকের মধ্যে থেকে শঙ্করকে খোঁজার চেষ্টা করল।
"কিছু বুঝতে পারছি না পুলিনদা! আমি তো ওকে পরিষ্কারভাবে বলেছি, শুক্রবার, চব্বিশে, তিনটেয়, মৌলালির মোড়ে যুবকল্যাণ অফিস বাড়ির সামনে, তিন-চারবার বলেছি।...ওর কিছু হল না তো?"

"কী আবার হবে?"
শম্ভু কথা বলতে পারল না। উদ্বেগ ফুটে উঠেছে প্রিয়ব্রতর মুখেও। সে ঘড়ি দেখল, এই নিয়ে অন্তত চারবার।
"শম্ভু, রেজিস্ট্রারকে বলা আছে চারটের মধ্যে পৌঁছব।"
"কিন্তু শঙ্কর না এলে তো..." শম্ভু তাকাল বোনের দিকে। "অনু তোর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কি দেখা হয়েছে?"
"না।"
মৃদু অথচ ঋজু স্বর। পুলিনের মনে হল মেয়েটি যেন এই রকম একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরিই হয়ে রয়েছে।
পুলিন লক্ষ করেনি দুটি ছেলেকে ট্রামলাইন পেরিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে। লক্ষ না করার কারণ, ওদের কাউকেই তার শঙ্কর মনে হয়নি। দু'জনেরই শীর্ণ দেহ, কালো রং এবং মুখে নিচু স্তরের রুচি, চাহনিতে সতর্ক ধূর্তামি। একজনের চোয়ালটা লণ্ঠনের মতো, অন্য জনের মুখটা চ্যাপটা। ওদের চোখ অনু এবং শম্ভুকে পর্যায়ক্রমে দেখে যাচ্ছে।
দু'জনে শম্ভুর সামনে দাঁড়াল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল শম্ভুর মুখ।
"শঙ্কর আসবে না, মিছিমিছি আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন।"
"য়্যাঁ!" ফ্যালফ্যাল করে শম্ভু তাকিয়ে।
"বাড়ি চলে যান।"
"আসবে না!" শম্ভুর স্বর ভূতে পাওয়ার মতো।
"যা বলছি শুনুন, শঙ্কর জীবনেও আর আসবে না...অন্য ভগ্নীপতি খুঁজুন।"
ধীরে ধীরে, অচঞ্চল ভঙ্গিতে যেন সুপরামর্শ দিচ্ছে বিপন্ন বন্ধুকে এমনভাবে লণ্ঠন-চোয়াল কথা বলে

গেল। পুলিনের শরীরের মধ্যে একটা কম্পন শুরু হয়েই থেমে গেল ক্রোধ এবং ভয়ের মাঝামাঝি জায়গায়।

"তোমরা কে?"

দু'জনে আড়চোখে পুলিনের দিকে তাকাল। লোকটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে কি আনবে না, এমন একটা দ্বিধা ওদের চাহনিতে দেখা গেল।

"আমরা কে, তা জেনে আপনার কোনও লাভ হবে না...দাঁড়িয়ে থাকতে চান তো থাকুন, তবে বিয়ে কবতে শঙ্কর আসছে না।" লণ্ঠন-চোয়াল এরপরই আঙুলটা শম্ভুর দিকে তুলে গলাটা খাদে নামিয়ে শান্ত স্বরে বলল, "আপনাদেব পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে...নিজে থেকে না যান তো বাধ্য করা হবে, আটকাতে পারবেন না।"

যেমন আচমকা এসেছিল তেমনিভাবেই দু'জনে চলে গেল। মন্থরগতিতে ট্রামলাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদার দিকে যাচ্ছে। একজন কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়াল সিগারেট ধরাতে। একবারেব জন্যও তাকিয়ে দেখল না পিছনে কী ভগ্নস্তূপ তারা বেখে যাচ্ছে।

"এরা কারা?... আমরা এখানে কী জন্য দাঁড়িয়ে তাই বা জানল কী করে!"

"ব্যাপার কী শম্ভু? এরা তো গুণ্ডা মনে হচ্ছে!"

প্রিয়ব্রতর স্বর বসে গেছে ভয়ে। শান্ত, নির্বিরোধী লোক, ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলার রাস্তা খুঁজে পাবাব জন্য সততই উৎকণ্ঠায় থাকে, চারধারে তাকিয়ে বোধহয় আরও কিছু গুণ্ডা আসছে কি না খোঁজ নিল।

অনুর মুখে কোনও বিকার নেই, অদ্ভুত গা-ছাড়া ভাব, তবে বিব্রত হয়েছে যে, বোঝা গেল তাব কথায়। "দাদা দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, ফিরে চলো।"

"কোথায়?" শম্ভু একটা ঘোরের মধ্য থেকে শব্দটা টেনে বার করল।

"বাড়ি চলো।"

"পাড়ায় থাকতে দেবে না!.. আসার সময় এই দু'জনকে দমদম স্টেশনে দেখেছি, এদের একটা গ্যাং আছে। এদের ভাড়া করেছে শঙ্করের বাবা।"

শম্ভু অসহায় চোখে পুলিনের দিকে তাকাল। ভরসা চাইছে। কিন্তু ভরসা দিতে হলে বাজে কথা ছাড়া তার আর কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা জীবন নিয়ে টানাটানিব পর্যায়ে চলে গেছে। শম্ভুব কোনও সামর্থ্যই নেই যে পালটা হাঙ্গামায় নামতে পারে।

"চল শম্ভু, লাভ নেই আর দাঁড়িয়ে।"

"আমার একটা কাজ আছে, শম্ভু, আমি যাচ্ছি...ঘাবড়াসনি, বাড়ির অমতে বিয়ে তো, প্রথম প্রথম এইরকম হয়, তারপব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রিয়ব্রত হনহনিয়ে কয়েক সেকেন্ডেই তিনজনেব থেকে তার ব্যবধানটা বাড়িয়ে ফেলল।

ফেরার জন্য অনুই প্রথম পা বাড়াল। মুখ থমথমে। নিশ্চয় মনে আঘাত পেয়েছে। অপমানটা ওবই তো বেশি লাগার কথা। দাদা, মা, বিপন্ন তার জন্যই, এই চিন্তায় কি নিজেকে অপবাধী ভাবছে না? পুলিন ওর মুখ দেখার চেষ্টা করল। একই রকম থমথমে। ওর সামনে মাটিতে কাদাজল। হিসেব কবে লম্বা পা ফেলে সাবধানে সেটা ডিঙিয়ে গেল। শম্ভুর মতো ওর অনুভূতিগুলো অসাড় হয়ে যায়নি।

এতক্ষণে পুলিনের খেয়াল হল, তার হাতে পলিথিন থলিটা ধরা রয়েছে। আশ্চর্য, মনেই ছিল না!

সে-ও কি তবে ভয় পেয়েছে!... বাড়ি ফিরছিল রাত পৌনে বারোটায় অফিসের বলাই আর তাব বউয়ের সঙ্গে হাতিবাগানে সিনেমা দেখে। ওরা চলে গেল রায়বাগানের দিকে। গজগজ করতে করতে সদর খুলে দিয়েছিল একতলার পান্নাবাবুর বউ। তিনতলায় উঠে দরজায় ঠুকঠুক শব্দ করেছিল। দরজা খুলে দিয়েছিল ছায়া। একটা আলো জ্বলছে না। ভিতরটা পুরো অন্ধকার।

ঘন, জমাট একটা ছায়ার মতোই ও দাঁড়িয়ে ছিল। ছায়া তাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরল, আচমকা, অপ্রত্যাশিত... থরথর কাঁপছিল ওর শরীর, শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক গভীরতা, নখ দিয়ে তার বগলের নীচের মাংসে খামচে ধরেছিল। প্রসব যন্ত্রণার মতো শব্দ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। জোর করে ওকে বিচ্ছিন্ন করার সময় পুলিন চাপাস্বরে না বলে উঠেছিল।

...শোবার ঘরের দরজার পাশে দালান আর রান্নাঘরের সুইচ। দালানের আলো জ্বেলে সে ঘরের ভিতরে তাকায়। আলোটা ত্রিভুজের আকার নিয়ে শোবার ঘরে খাটের পায়া পর্যন্ত মেঝেয় ছড়ানো। ত্রিভুজের কিনারে লাল তরল পর্দাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রগুলি ছিঁড়ে গেছল তার মাথার মধ্যে।

"য়্যাঁ কী বললি?"

"এখন বাড়িতে গিয়ে কী দেখব কে জানে!"

"পাড়া প্রতিবেশীরা কেমন লোক?"

শম্ভু শুধু মাথা নাড়ল। সাবওয়ে দিয়ে নেমে আবার আবর্জনা, কাদা মাড়িয়ে ভিড় ঠেলে ওরা স্টেশনের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় এল।

"ফাঁকা থ্রেট করেনি পুলিনদা।"

অনু একটু পিছিয়ে হাঁটছে। পুলিন গলা নামিয়ে শম্ভুর গা ঘেঁষে বলল, "ওরা চায় না ছেলের অপকর্মটা জানাজানি হোক, চায় না এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোক... তা বোনকে আবার বুঝিয়ে বল। নিজের চোখেই তো দেখল ব্যাপারটা কোথায় গড়িয়েছে... যে ছেলে বিয়ে করতে আসব বলেও এল না, দুটো গুণ্ডা পাঠিয়ে দিল... জানাজানি হল কী করে? নিশ্চয় ও বাড়িতে বলে দিয়েছে..."

"হয়তো ওকে আটকে রেখেছে।"

চমকে দু'জনে ফিরে তাকাল। অনু তা হলে শুনেছে তার কথা! খেয়াল রাখা উচিত ছিল ও পিছনেই রয়েছে।

"তা-ও হতে পারে। কিন্তু বলবে কেন বাড়ির লোকেদের?"

"বন্ধুকে বলেছিল, হয়তো সে বাড়ির লোককে জানিয়ে দিয়েছে।"

পুলিন চুপ করে গেল। সিঁড়ি ভেঙে তারা স্টেশনের ঢাকা চত্বরে উঠল। আর ঘণ্টা খানেক পর থেকে ভিড় শুরু হবে। একধারে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা মেঝেয় বসে থাকা যাত্রীদের স্কেচ করছে। কিছু লোক তাদের কাজ দেখছে। উঁচুতে ইলেকট্রনিক টাইম টেবলে লেখা ফুটে রয়েছে, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে কখন কোন গাড়ি এখন ছাড়বে। আধঘণ্টা পর ছাড়বে কল্যাণী সীমান্ত, শম্ভুর মুখের দিকে পুলিন তাকাল।

"এটাতেই চল ... তাড়াতাড়ি ফেরাই ভাল।"

কিছু একটা অস্থিরতা ওকে জাঁতায় ফেলে যেন পিষছে। মুখটা কুঁকড়ে যন্ত্রণা সইতে সইতে শম্ভু বারবার উদ্দেশ্যহীন তাকাচ্ছে চারধারে। ভয় পেয়েছে তো বটেই। ও কি ধরে নিয়েছে গুণ্ডারা এখানেই ঝাঁপিয়ে পড়বে? ... ছুরি মারবে, বোমা ছুড়বে? অবশ্য এখন সব জায়গাতে সব কিছুই হতে পারে! তাই বলে এখুনি কিছু হচ্ছে না, ওরা সময় বেঁধে দেয়নি পাড়া ছাড়ার জন্য।

পুলিন পকেটে হাত ঢোকাল। "আমি টিকিট কেনে আনছি... দুটো দমদম তো? তুই এটা একটু ধর।"

পলিথিন থলিটা শম্ভুর হাতে দিয়ে সে টিকিট কাটতে লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। দূর থেকে থলিটার দিকে তাকিয়ে পুলিন মাথা নাড়ল। এতক্ষণে কোনও মিষ্টির দোকানে বসে তাদের খাবার কথা। ভেবে রেখেছিল তখন সে শাড়ি আর শার্ট পিসটা দু'জনের হাতে দেবে। ...শম্ভু কী সঙ্গে করে সিঁদুর এনেছে? ওরও কী একবার মনে হয়নি, সিঁদুর এতক্ষণে অনুর সিঁথিতে লেগে থাকার কথা।

"অনু চা খেয়ে আসি, চলো।"

"এখন থাক।"

"শম্ভু?"

"চলুন ... আয় অনু।"

পুলিন চায়ের সঙ্গে তিনটে দরবেশও কিনল। প্লেটটা অনুর সামনে ধরতে সে মাথা নাড়ল, তারপর কী ভেবে একটা তুলে নিল। শম্ভুও নিল এবং গোটাটা মুখে পুরেই গিলে ফেলল। পুলিন অবাক হয়ে গেল ওর খাওয়ার রকম দেখে।

"ব্যাপারটা যে এ-রকম দাঁড়াবে, আমি ভাবতে পারছি না পুলিনদা।"

"থাক, তোকে আর ভাবতেও হবে না। চা-টা খেয়ে নে, সময় হয়ে এল গাড়ি ছাড়ার।"

গরম চা বড় বড় চুমুকে খেয়েই শম্ভু হেঁচকি তুলল। মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে এদিক ওদিকে তাকিয়ে ছুটে রাস্তার দিকে চলে গেল বমি করার জন্য।

ট্রেন ছাড়বে দু' নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে, কিন্তু তখনও ট্রেন এসে পৌঁছায়নি। ওরা সামনের দিকে গিয়ে অপেক্ষা করলে লাগল। প্ল্যাটফর্মে ক্রমশই লোক বাড়ছে।

"লোডশেডিং হয়েছে নাকি?... এখনও ট্রেন এল না, পাঁচটায় তো ছাড়ার কথা।"

পুলিনকে উদ্দেশ করেই লোকটা বলেছে।

"ঠিক সময়ে লাস্ট কবে ট্রেন চলেছে মনে করতে পারেন?" ভারিক্কি চালে সে উত্তর দিল।

"এমার্জেন্সির সময় চলেছিল।"

"গুঁতো খেয়ে, চাকরি যাবার ভয়ে তখন সবাই কাজ করত। আবার গুঁতোর ব্যবস্থা হোক..."

পুলিন কথা শেষ না করেই ঘুরে দাঁড়াল। মান্নাবাবু আর তার বউ...ওরা সামনের বাড়ির দোতলার লোক, আলাপ নেই কিন্তু পুলিনকে নিশ্চয় চেনে। বহুদিন বাদে সে শ্যামপুকুর পাড়ার লোকের মুখ দেখল। এ-ভাবে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ানোর কোনও মানে হয় না, দশ বছরে কেউ আর চেহারাটা তার মনে করে রাখেনি নিশ্চয়। শুধু ভয়ংকর কোনও ব্যাপার নিয়ে কথা উঠলে তাদের নাম হয়তো দু'-চারজন করবে।

তবুও সে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারল না। গলির প্রত্যেকে তাকে দেখলেই তাকিয়ে থাকত অদ্ভুত দৃষ্টিতে। অবশেষে সে ভয় পেতে শুরু করেছিল। দৃষ্টিগুলো তাকে হুমকি দিত দূর হ, দূর হ। এমনও হয়েছে, পরপর তিন দিন সে তিনতলা থেকে নামেনি।এদের দৃষ্টি থেকে পালিয়েই সে বাগুইপাড়ায় গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। মান্না-দম্পতিকে দেখে দশ বছর আগের লুকিয়ে পড়ার সেই চেষ্টাটাই ফিরে এসেছে। এখন এ-সবের কোনও মানে হয় কি।

পুলিন আবার ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা সরে গেছে পাখাব নীচে। অনু সামনেই, সে তার সঙ্গে কথা বলার ছলে মান্নাদের চোখের উপর নিজেকে হাজির রাখতে চায়।

"তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট তো শিগগিরই বেবোবে, পরশুর কাগজেই দেখলাম, বোধহয় শনিবারে।"

"আমিও দেখেছি।"

"পাস তো করবেই... শম্ভু বলেছিল লেখাপড়ায় তুমি ভাল।"

হাসল। মান্নাবাবু বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখটা ঘোরাচ্ছেন। পুলিনের সঙ্গে চোখাচোখি হল, দু'-তিন সেকেন্ড চাহনিটা রেখে সরিয়ে নিলেন।

চিনতে পারেনি... কিংবা পেবেছে। এখন তাকে চিনে, স্মৃতিকে খোঁচাখুঁচি করে বোমগুলোকে সুড়সুড়ি দেবার উৎসাহটা বোধহয় আর নেই।

"পাশ করে কী করবে? কলেজ?"

"দেখি।"

ট্রেন আসছে দু' নম্বরেই। লাইনের ধার থেকে ওরা পিছিয়ে এল। সেই সময় কে যেন হাত চেপে ধরতেই পুলিন চমকে শিউরে উঠল।... শম্ভু।

"তোমার বাড়িতে গিয়ে আজ রাতে আমরা থাকব, অনুর জন্যই।"

ফিসফিস করে যেন মিনতি জানাল। ট্রেনটি মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছে। জানলার ধারে বসার জন্য যারা কামরার হাতল ধরতে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে দৌড়চ্ছে তাদের একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পুলিন টলে পিছিয়ে যেতেই শম্ভুর হাতটা ছেড়ে গেল।

ওঠার জন্য ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি শেষ হবার পর তারা উঠল। তিনজনের জন্য আসনে চারজন বসাটাই রীতি হয়ে গেছে এবং তারই সুবাদে অনু বসার জায়গা পেল। আর-একটা জায়গাও ছিল। শম্ভু প্রায় ঠেলেই পুলিনকে বসিয়ে দিল।

"একটা স্টেশন পরেই তো নামব।"

একদৃষ্টে তার মুখের দিকে শম্ভু তাকিয়ে রয়েছে। কী যেন তখন বলছিল!.. রাতে থাকতে চায়। থলিটা কোলের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। শাড়ির একটা কোণ থলি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল অস্বাভাবিক তৎপরতায়।

কামরাটা ভরে গেছে। জানলা দিয়ে সে প্ল্যাটফর্মে তাকাল। ব্যস্ত পুরুষ ও মেয়েরা কামরাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে চলেছে। একটু ফাঁকা দেখলেই উঠে পড়বে।

তুষারকণাকে দেখতে পেল পুলিন। প্রায় চেঁচিয়েই ফেলছিল : 'এই যে' বলে। সামনে দিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে তাদের কামরাতেই ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। দেখতে না পেলেও পুলিন অনুমান করল, দরজা জুড়ে পথ বন্ধ করে নিশ্চয় এখন পাঁচ-ছ'জন দাঁড়িয়ে। হয়তো উঠতে পেরেছে কিংবা আবার অন্য কোনও কামরায় ওঠার জন্য ছুটেছে। মনটা হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠল অযথা ক্ষোভে।

শম্ভু রাতে থাকতে চেয়েছে। তা আমার কাছে কেন? এইসব ঝামেলার মধ্যে আমি কেন জড়াব! বিবক্ত চোখে পুলিন তাকাল শম্ভুর দিকে। তখনই ট্রেনটা ছাড়ল।

সাত

দমদমে নেমে যাবার সময় শম্ভু বলল, "চলি পুলিনদা, যা হয় আপনাকে জানাব... আয় অনু।"

প্ল্যাটফর্মে নেমে শম্ভু জানলা দিয়ে তাকাল। পুলিন হাতটা তুলে মাথা হেলাল। ও ম্লান হাসল।

"আসিস কিন্তু।"

শম্ভু কথাটা বুঝতে পাবেনি তাই ঝুঁকে জানলার কাছে মুখ এনে যখন, "কী বললেন?" বলল, তখনই ট্রেন ছেড়ে দিল। জানলাব পাশে ছুটতে ছুটতে সে আবার বলল, "কী বললেন?"

পুলিন কিছু বলেনি। সে তখন তুষারকণাকে দেখতে পেয়েছে। চোখ ও মনেব ব্যস্ততাটা বদলে গেল এক লাইন থেকে ট্রেনের অন্য লাইনে যাওয়াব মতো।

ঝাঁকুনিটা মাথাব মধ্যে স্থির হয়ে যেতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে তুষারকণার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাত নাড়ল।

"এই যে... এই যে।"

ঠাসাঠাসি যাত্রী, এমনকী দুই বেঞ্চের মধ্যে সরু জায়গাতেও কেউ কেউ মুখ ঘুরিয়ে দেখল, কাকে এ-ভাবে ডাকছে? ভিড ঠেলে এগিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব।

পুলিনকে দেখতে পেয়ে তুষারকণা মাথা হেলিয়ে, এক চিলতে হাসি ফোটাল।

"চলে আসুন, বসার জায়গা আছে।

হাত তুলে তুষাবকণা জানিয়ে দিল, আমি ঠিক আছি। পুলিন ধীরে ধীবে বসে পড়ল।

বাগুইপাড়া স্টেশনেব অনেক আগেই উঠে পড়ে সে দরজার দিকে এগোল।

"এইটুকুর জন্য ভিড় ঠেলে যাওয়া আবার নামার জন্য আসা... তার থেকে এখানে দাঁডিয়ে থাকা অনেক ভাল।"

"তা যা বলেছেন.. তবে ভিড়ের মধ্যে নানান রকমের লোক থাকে তো, .. "

মৃদু স্বরেই পুলিন বলেছে। দু'জন যাত্রী মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে তারপর তুষারকণার দিকে তাকাল। তাদের দৃষ্টিতে কৌতূহল। অস্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠল তুষারকণার মুখে।

"খাট শুরু করেছেন নাকি?"

"আপনার কি খুব তাড়া আছে?"

"না, তা নেই।"

"আমার ভাল মিস্ত্রিটা জ্বরে পড়েছে, ওকে দিয়েই করাব ঠিক করেছি .. তিন-চার দিনের মধ্যেই এসে যাবে।"

তুষারকণা আর কথা বলল না। স্টেশন এসে গেছে। নামার যাত্রীদের চাপে পুলিনের বাহুতে তাব বাহুর চাপ পডেছে। এই প্রথম স্পর্শ!... একেবারে অন্য রকম অনুভূতি জেগেছিল ছায়াকে স্পর্শ কবে। রক্তের ছোটাছুটির ঘষায় শিরাগুলো গরম হয়ে ফুটে উঠেছিল, পেশির মধ্যে হামা দিয়ে এগোচ্ছিল বাঘ.. আর এখন হাতটা অসাড় লাগছে, মনে হচ্ছে কেউ বরফ চেপে ধরেছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে লাইন পার হয়ে তারা পুব দিকে এল।

"চা খাবেন?"

"আমি দোকানে চা খাই না।"

"যে চায়ের দোকানটার কথা বলেছিলাম, জুপিটার, সেটা অশথতলার বাঁ দিকে, কিনবেন?"

"এখন থাক, ফুরোয়নি।"

ওরা কথা বিনিময় না করে আরও কিছুটা হাঁটল। অশথতলায় পৌঁছে ডান দিকে ঘুরল।

"বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থাটা কী হয় দেখেছেন!"

পুলিন হাঁটছে মাথা নিচু করে। তুষারকণার গোড়ালি, সায়ার লেস দেখতে তার ভাল লাগছে। একটা সাইকেল রিকশা পিছন থেকে ভেঁপু দিল। ওরা রাস্তার কিনারে সরে গেল। রিকশায় অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার অরুণপ্রকাশ ও এক প্রৌঢ়া, বোধহয় স্ত্রী।

"রিকশায় যে গেল তাকে চেনেন?"

"না।"

"আমার পিছন দিকের পাড়ায় থাকেন, উনি ছোটবেলায় নাকি আপনাদের বাড়ির গাছের আম খেতেন, আপনার মাকেও চেনেন... ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে, ড্রেসিং টেবল আর খাট দেখতে এসেছিলেন দোকানে।"

"কী নাম?"

"অরুণপ্রকাশ মজুমদার।"

"মার কাছে এখানকার এক মজুমদারের কথা শুনেছি।"

নিরাসক্ত স্বরে যে-ভাবে বলল, তাইতে পুলিনের মনে হল এক মজুমদার প্রসঙ্গে ওর আগ্রহ নেই।

রত্না স্টুডিয়ো দেখা যাচ্ছে। শো-কেসে কনুই রেখে সুকুমার দুটি কিশোরীর সঙ্গে কথা বলছে। ... কালাচাঁদ এই সময় শিঙাড়া ভাজে, ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরীতে ওর কিছু বাঁধা খদ্দের আছে। .. মুদির দোকানে সবুজ আর গোলাপি কাগজে মোড়া সাবানগুলো ভালই সাজিয়েছে. . মন্মথ কব এখন দোকানে, যদি তাকে এখন থলি হাতে ফিরে আসতে দেখে তা হলে পরে জিজ্ঞাসা...

পুলিন থলিটা পাকিয়ে বগলে রাখল। ...শাড়ি আর শার্টের কাপড়টা নিয়ে সে এখন কী করবে? শার্ট নিজের জন্য করা যায় কিন্তু শাড়িটা? অনুকেই দিয়ে দেওয়া উচিত, ওর জন্যই তো কেনা। কিন্তু কী কারণ দেখিয়ে এটা দেবে?... বিয়েতে তোমাকে দেব বলে কিনেছিলাম!... তোমার জন্মদিন তাই দিচ্ছি। কিন্তু জন্মদিন কি পালন করে? ...শম্ভু কেমন ভাবে যেন তাকিয়েছিল হাতটা চেপে ধরে... 'তোমার বাড়িতে গিয়ে আজ রাতে আমরা থাকব, অনুর জন্যই'... কেঁপে গেছে ছেলেটা, এত ভয় পাওয়ার মতোই কি ব্যাপারটা? ... সে নিজেও কি এই রকম ভয় পেয়েছিল যখন থানার সেকেন্ড অফিসার তাকে বলেছিল, 'থানায় চলুন।' তিনতলা থেকে রাস্তা পর্যন্ত বাড়ির আর পাড়ার লোক গিজগিজ করছিল। তখন প্রায় মাঝরাত।

ইউনিকের সামনে এসে তুষারকণা শুধু মাথাটা হেলিয়ে অস্ফুটে "চলি" বলে এগিয়ে গেল। পুলিন অন্যমনস্কের মতো বলল, "আচ্ছা।"

দেবু চেয়ারে বসে সামনের টেবলে পা তুলে বই পড়ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

"এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন যে?"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই পুলিনের মনে পড়ে গেল... 'শম্ভুর কাছে শুনলাম তুমি পাশ করেছে, এই নাও।'

থলিটা শোবার ঘরে রাখতে গিয়ে সে আলমারিটার সামনে দাঁড়াল। তলার টানা দু'টো আধ-খোলা, উপরের তাকগুলোর কোণে কোণে ধুলো, মাথার নকশাদার কার্নিশে ঝুল, মাকড়সার সাদা ডিম। অজিত সরু কাঠের টুকরো থেকে একমাপে ছোট ছোট বাতা তৈরি করছে। করাত চালানো থামিয়ে সে তাকাল।

"জিনিসটা কেমন?"

"পেলেন কোথায়? আসল বার্মা টিক!"

পুলিন হাসল।

"গদাইকে পরিষ্কার করতে বলেছিলাম, গেল কোথায় ও?"

"করছিল তো। মাথার উপর থেকে ছেঁড়া কাগজ, বইটই বার করল।... খেলতে টেলতে গেছে হয়তো।"

ঘরে ঢুকেই তার চোখ পড়ল, নিচু টেবলটায় মলাটছেঁড়া, দোমড়ানো একটা বাংলা ম্যাগাজিন, পাতাছেঁড়া অ আ ক খ শেখাব বই আর একটা পকেট ইংরেজি-বাংলা অভিধানের অর্ধেক। গদাইয়ের কাজ! দরকারি ভেবে রেখে গেছে।

কাপড়ের থলিটা আলমারিতে তুলে রেখে সে অ আ ক খ-র বইটা তুলে নিল।

"দাদা আমি যাচ্ছি।"

"এখুনি!... সুবোধকে চা বল, খিদে পেয়েছে, চারটে শিঙাড়া নিয়ে আয়, তুই খাবি?"

"না, আমি তাড়াতাড়ি যাব।"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগ বার করার সময় পুলিনের আবার মনে পড়ল, রেজিস্ট্রির পর মিষ্টি খাবার জন্য যে টাকা নিয়ে গেছল, সেই টাকা থেকেই শিঙাড়া আনাচ্ছে। শম্ভু আর অনুরও নিশ্চয় এখন খিদে পাচ্ছে।

"এই যে, আপনি আছেন দেখছি।"

অরুণপ্রকাশ দোকানে ঢুকতে ঢুকতে ছাতাটা বন্ধ করলেন। বৃষ্টির প্রথম দমকাটা কেটে গেছে। কাছাকাছি যারা যাবাব বিনা ছাতায় এখন তারা বেরিয়েছে।

"তখন রিকশা করে আসার সময় দেখলাম আপনাকে একটি মেয়ের সঙ্গে ফিরছেন।"

"উনিই অবিনাশ মুখুজ্জের নাতনি।"

"হ্যাঁ, আমার বউও তাই বলল, বাসুর মেয়ে। আমি অবশ্য আগে দেখিনি, চিনিও না। ... ওর স্বামী তো এখন জেলে রয়েছে।"

পুলিন ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা তার চুলের গোড়া স্পর্শ করল। খুলির চামড়া শিরশির করছে। সামনে মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে বলল, "কী বলছেন?"

"তাই তো বাড়িতে শুনলাম। ব্যাঙ্কে ম্যানেজার ছিল ... কাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করে... মানে ছ'-সাত লাখ টাকা ঠকায়। ধরা পড়ে গেল। কাগজে তখন খবরটা বেরিয়েছিল, অবশ্য আমি আর জানব কী করে যে এই ম্যানেজারই বাসুর জামাই। পাড়ার বিকাশবাবু ওই ব্যাঙ্কের চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চে কাজ করে, ওর বউয়ের কাছ থেকে আমার বউ শুনেছে।"

"আপনি ঠিক বলছেন?... এরই স্বামী?"

"বাসুর তো আর জামাই নেই, তা হলে এরই স্বামী হবে!"

"ক'বছরের জেল হয়েছে?"

"পাঁচ বছরের... আরও বেশিই হত। কিন্তু পুলিশ টাকাটা উদ্ধার করায়... অবশ্য বিকাশবাবুর ধারণা সবটা উদ্ধার হয়নি, এদিক সেদিকে বেশ খানিকটা সবিয়ে রেখেছে।"

"কিন্তু ওরা যে-ভাবে রয়েছে, দেখে তো মনে হল না টাকাকড়ি আছে।"

"কী জানি, যা শুনেছি তাই বললুম... যা বলতে এসেছি পুলিনবাবু, এদিকে এক মুশকিল হয়েছে, ছেলের বাড়ি থেকে বলছে খাট চাই না, সোফা কাম বেড চাই।"

"বেশ, তাই দিন।"

"আপনার এখানে তো ওটা পাওয়া যাবে না।"

"স্টেশনের ওপারেই তো দোকান আছে, যুগল দত্তর দোকানে পেয়ে যাবেন।"

"কিন্তু ইনস্টলমেন্টে কি দেবে?"

"আপনি কথা বলে দেখুন... আচ্ছা কদ্দিন জেলে আছে?"

"বোধহয় বছর চারেক।"

"ছাড়া পাবার সময় হয়ে গেছে।"

পুলিন রাস্তার দিকে তাকিয়ে প্রায় আপনমনেই বলল।

রাস্তা দিয়ে শব বহন করে যাচ্ছে দশ-বারোজনের একটি দল। নিচু স্বরে হরিধ্বনি দিল। রজনীগন্ধার

গোছা বাঁধা রয়েছে খাটের চারকোণে চারটে তোড়ার মতো। শ্বেতপদ্মের পাপড়ি ছড়ানো সারা দেহে। শবের গলায় গোড়ের মালা, কপালে চন্দন ফোঁটা, পায়ের চেটো দু'টি আলতা মাখা। শ্মশানে যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই কম বয়সি, ফুলপ্যান্ট পরা, কোমরে গামছা বাঁধা। পিছনে মন্থরগতি একটি মোটরগাড়িতে কিছু স্ত্রীলোক। খই ছড়াতে ছড়াতে ওরা রথতলার মোড় ঘুরে গেল।

"ত্রিদিবনগরের, এ ব্লকের ... ওঁর বাড়ির কাজ আমি করেছি।"

"চেনেন?"

পুলিন চুপ করে রইল। মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। হাড়ের উপর শুধু চামড়া পরানো। চোখের পাতা তন্দ্রাচ্ছন্ন মতো। এইখানে বসেই চা খেয়ে গেছেন চার বছর আগে।

"কী হয়েছিল?"

"স্টমাক ক্যানসার।"

"তা হলে তো শমন ধরিয়েই দিয়েছিল। ... পুলিনবাবু ড্রেসিং টেবলটা কালই নেব, বিয়ে পরশু।"

"পবশুই।"

এইবাব নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করবে। পুলিন অস্বস্তিতে দেহের ভার বদল করতে নড়ে বসল। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধের কিছু নিমন্ত্রণ সে পেয়েছে গত চার-পাঁচ বছরে, একটিতেও যায়নি। পরে অবশ্য কেউ বলেওনি, 'কেন এলেন না?'

"নিয়ে যাবেন, তৈরি তো আছেই. . দাম সে যখন হোক... পিছনেই তো থাকেন।"

ওঁর সঙ্গে পুলিনও উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত সঙ্গে গেল।

"তা হলে... একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল আপনার কাছ থেকে।"

হঠাৎ পুলিন স্বচ্ছন্দ বোধ করতে শুরু করল। তুষারকণাকে ঘিরে থাকা হালকা গাম্ভীর্য, কাঠিন্য, নিরাসক্ত ভঙ্গি অথচ সহজ কথাবার্তা যে দূরত্ব তৈরি করে দেয় সেটা যেন অনেক কমে গেল। সে যেন একটা সুড়ঙ্গর সন্ধান পেল, যেটা দিয়ে এগোনো যায়।

কিন্তু কোথায় পৌঁছতে চায় সে! তুষারকণার হৃদয়ে? স্বামীকে কি আর গ্রহণ করবে? সবাই জানে, অন্তত চেনা পরিচিতরা, আত্মীয় প্রতিবেশীরা তো মনে করে রেখেছেই। তাদের কাছে কী করে মুখ দেখাবে। ছেলে আর মাকে নিয়ে এখানে লুকিয়েই রয়েছে বলা যায়।

প্রতারককে কি ও ভালবাসবে? এক বিছানায় কি শুতে পারবে?... সিঙ্গলবেড খাট, একটা নিজের আর একটা ছেলের জন্য তৈরি করাচ্ছে। টাকা কি সরিয়ে রাখতে পেরেছে? পুলিশ নিশ্চয় বাড়ি তল্লাশ করেছে। কীভাবে সরানো টাকা রাখবে, কোথায়ই বা বাখবে? গহনাগাটি তৈরি করিয়েছে? কিন্তু গলায় সরু একটা হার, কানে দুটো পাথর ছাড়া তো গায়ে আর কোনও সোনা নেই, অবশ্য ওগুলো ইমিটেশনও হতে পারে!

জমি জায়গা কিংবা বাড়ি কিনেছে কি বেনামিতে? বোধহয় নয়, ধরা পড়ে যাবেই।... হয়তো টাকা সরিয়েছিল কিন্তু মামলা চালাতে গিয়ে উকিল আর পুলিশের খাঁই মেটাতে সবই গেছে... দেনাও হয়ে থাকতে পারে।

স্বামীকে কি ঘৃণা করে? ছাড়া পাবার পর লোকটা তো এখানেই আসবে। ও জেলে গিয়ে স্বামীব সঙ্গে কি দেখা করে? গেলে, কখন যাবে? অফিস থেকেই তো যাবে। রবিবার তো বেরোয় না, তা হলে চোখে পড়তই।... বোধহয় দেখা করে না। না করার কারণ? মুখ দেখতে চায় না, সম্পর্কও আর রাখতে চায় না! চাকরি করছে, সংসারে লোকও কম, বাড়ি ভাড়া লাগছে না, স্বামী ছাড়াই তো চলে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও যাবে।

কিন্তু শুধুই জীবনযাপন, যেমন তেমন করে... এত কষ্ট করে, এটা কি মেনে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব? শুধু শরীর নিয়েই তো জীবন নয়! মন বলেও একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস আছে, আর সেটা অনড় অচল নয়, বদলায়... যত দিন যায়, বছর যায় মন বদলায়।

"আরে দাদা, তখন থেকে কী বিড়বিড় করছ আর মাথা নাড়ছ!"

সুকুমারের মুখের দিকে পুলিন হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল। একেবারে অপরিচিত মুখ, পরিষ্কার... একটা আঁচড়ও নেই যা দেখে বোঝা যাবে লোকটা নষ্ট চরিত্রের না ধার্মিক!

"আজ একটা বিয়েতে গেছলাম কিন্তু বিয়েটা হল না।"

"সে কী! কোথায়?... মেয়ের তা হলে কী হবে? আজ রাতের মধ্যেই তো বিয়ে দিতে হবে নইলে...।"

"নইলেটইলের ব্যাপার এটা নয়। রেজিস্ট্রি বিয়ে, মেয়েকে নিয়ে শেয়ালদায় অপেক্ষা করলাম রেজিস্ট্রি অফিসে যাব বলে, পাত্র এল না।"

"ওহ্ প্রেমের বিয়ে, তাই বলো। এ-সব কেস আমার জানা আছে, ও-পাত্রটি আর কোনওদিনই আসবে না, কেটে গেছে।"

সুকুমারের মুখে দাগ পড়ছে। পুলিন এবার ওকে শনাক্ত করতে পারছে।

"আমারও তাই মনে হয়। দুটোই কম বয়সি, বাচ্চা। তার ওপর ছেলেটার বাড়ি থেকেই ঝামেলা করছে। ...মুশকিলটা তো এইখানেই, রোজগারপাতি নেই, বাপের হোটেলে রয়েছে, বাপকে অমান্য করে কিছু করার জোর পাবে কোত্থেকে।"

"সে-দিক থেকে বরং কাশীনাথই সাকসেসফুল। যাই রোজগার করুক একটা মেয়ে ঠিক জুটিয়ে নিয়েছে, বিয়েও করবে বলেছে।"

"কাশীনাথ।"

"হ্যাঁ কাশীনাথ, তা হলে বলছি কী? ওপারে মঙ্গলা নার্সিংহোমে মেয়েটা আয়া না ঝি কী যেন একটা কাজ করে।"

"আমায় বলেছিল ওর কে এক মাসি..."

"আরে সে তো হল মাসি আর এটা একটা ছুঁড়ি। মাসিরই কী যেন হয়টয় ...আজ দুপুরে মেয়েটাকে এনে বলে ছবি তুলব, তা-ও কালারে... বুঝুন।"

পুলিন হাসল। সে নিজেও তো ছবি তুলিয়েছে। কাশীনাথ তোলালেই সেটা একটা বলার মতো বিষয় হয়ে ওঠে।

"রীতিমতো পোজ করে... পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে... হাসতে বললুম অমনি সে কী বিরাট হাসি, দন্ত বিকশিত পাতাল রেল যেন... দু'জনেরই। বাধ্য হয়ে বললুম, ওরে আর হাসতে হবে না ক্যামেরার লেন্স ঘাবড়ে যাচ্ছে।"

"কত টাকা নেবে ছবিটার জন্য?"

"কুড়ি।"

পুলিন চোখ দুটো যতটা সম্ভব বড় করল। কাশীনাথের এটা তো তিন দিনের মাইনে।

"পুরো টাকাটাই অ্যাডভান্স দিয়ে গেছে, আর কে দিল, জানেন, মেয়েটা। আর কাশীনাথ বাবাজি ওকে দিল একটা ব্লাউজ, ওই শ্রীময়ী থেকে করিয়েছে।"

"বিয়ে করে থাকবে কোথায়, সিদ্ধেশ্বরী বিল্ডার্সের গোডাউনে?"

"সে ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে।"

ঠিক এইভাবে যদি শম্ভুও বলতে পারত তার বোন সম্পর্কে। এবার যখন আসবে তখন ওকে কী বলবে পুলিন সেটা ঠিক করে ফেলল। 'আর ঝামেলার মধ্যে যাসনি, অ্যাবোর্শনটা করিয়ে ফেল। দেখলি তো, গুণ্ডা পর্যন্ত লাগিয়েছে। জানাজানি হবার আগে ব্যাপারটা চুকে যাওয়া ভাল। এরপর ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দে। আকছার এ-রকম হচ্ছে।'

খাওয়ার পর পুলিন, ছেঁড়া বইগুলো টেবলের উপর দেখে বিরক্ত হল। কোনওটাই কাজে লাগার মতো নয়। বই পড়ার অভ্যাস তার নেই। শিবানী অফিস লাইব্রেরি থেকে ডিটেকটিভ গল্পের বই আনত। কয়েকবার পড়ার চেষ্টা করেছিল। সাত-আট পাতার বেশি এগোতে পারেনি।

ঘর থেকে এগুলোকে বিদেয় করতে হবে। সকালে তার ঘুম থেকে ওঠার আগেই গদাইয়ের মা এসে ঝাঁট দেওয়া, মোছা, বাসনমাজার কাজ সেরে ফেলে। ছেঁড়া বইগুলো বাইরের দালানে ফেলে রাখলে, জঞ্জাল গণ্য করে গদাইয়ের মা রাস্তায় ফেলে আসবে নয়তো উনুন জ্বালাতে বাড়ি নিয়ে যাবে।

খাটের উপর বসে পুলিন প্রথমে বর্ণপরিচয়টা ছুড়ল। দরজার মাঝখান দিয়ে উড়ে গিয়ে দালানে পড়ল। অভিধানের আধখানা কিছুটা ভারী। দু' আঙুলে ধরে দোলাতে দোলাতে ছুড়ে দিল।

বর্ণপরিচয়ের উপর পড়ে ছিটকে গেল। ম্যাগাজিনটাও সে একইভাবে দু' আঙুলে চিমটের মতো ধরে দুলিয়ে দুলিয়ে ছাড়ল।

দরজার ফ্রেমে লেগে ঘরের মধ্যেই পড়ল পাতাগুলো ছত্রাকার হয়ে। এটাই কিনা শেষকালে বেধে গেল। পুলিন সামান্য অপ্রতিভ হয়ে উঠল বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবার জন্য।

কুড়োবার জন্য নিচু হয়েই সে মূর্তির মতো নিথর হয়ে গেল। খোলা পাতা দুটোয় মুখোমুখি তিনটে রঙিন ছবি। তার একটিতে আটকে গেছে তার চোখ।

একটা উঠোনে লাইন দিয়ে জনাকুড়ি মেয়ে, কেউ ফ্রক, কেউ শাড়ি পরে। তাদের হাতে থালা। টিনের ড্রামে ভাত। তার সামনে উবু হয়ে বসে একজন স্ত্রীলোক বাটিতে ভাত তুলছে। থালা বাড়িয়ে রয়েছে একজন।

লম্বা হলঘর। কয়েক হাত দূরত্বে পরপর সারিবদ্ধ চৌকো রক। শোবার জায়গা। রকগুলোর মধ্য দিয়ে চলার পথ, বহু মেয়ে রকগুলোর উপর বসে রয়েছে।

তৃতীয় ছবিটায় চারটি মেয়ে বসে সেলাই করছে। পিছনে দুটো রঙিন ডুরে শাড়ি শুকোচ্ছে। পাঁচিলের পিছনে গাছের ডাল। হলুদ কাপড়ে লাল সুতো দিয়ে একজন ফুল তুলছে আর একজন বুনছে। চটের আসনে পশমের নকশা। অন্য দু'জন কী সেলাই করছে দেখা যাচ্ছে না। খুব কাছ থেকে তোলা ছবিটা। মুখগুলো বড় আর স্পষ্ট। এই চারজনের মধ্যে একটি মুখ পুলিনকে ঠান্ডা করে দিয়েছে।

ছায়া। ...কোনও সন্দেহ নেই। মুখ নিচু করে গভীর মনে সেলাই করছে।

পুলিন ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে, একবার ত্রস্ত চোখে বাইরে তাকিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল। পা ঝুলিয়ে খাটে বসে ছবিটা চোখের সামনে ধরল। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না আবার ছায়াকে দেখতে পাবে।

যৌবনের মধ্যাহ্নে পৌঁছনো একটা মুখ। ভরন্ত গাল, গলা, কাঁধ। দশ বছর আগেও ছায়া গোলগাল ছিল। বয়সের তুলনায় বড়ই দেখাত। ভারী হবার প্রবণতা ছিল ওর শরীরে। রংটা একটু উজ্জ্বল লাগছে। তখন মাগুর মাছের মতো ছিল গায়ের চামড়া। মুখটা সেইরকম চৌকোই, ঠোঁট দুটো পুরু, ভুরু মোটা, ছড়ানো নাকে একটা সবুজ পাথরের নাকছাবি। চুলটা কান ঢেকে পিছন দিকে টেনে বাঁধা। কপালটা চওড়া আর উঁচু দেখাচ্ছে।

পুলিন নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। মুখ নামিয়ে থাকায় বোঝা যাচ্ছে না চাহনির মধ্যে কী রয়েছে। সে খুঁজে পাচ্ছে না, কোর্টে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা সেই দুটো চোখকে, যেখান থেকে ধক ধক করে বেরিয়ে আসছিল ঘৃণা। ... একটা বীভৎস হিংস্র ইচ্ছা।

ঠোঁট দুটো চেপে ধরা, অত্যন্ত কোমল ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে না পায়ের থ্যাবড়া পাতা, হাতের বেঁটে আঙুল, সবসময় ময়লা জমে থাকত নখের মধ্যে। কথা বলাব সময় উপরের মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। গলার স্বরটা থেকে জলে শূন্য কলসি ডোবাবার মতো শব্দ পাওয়া যেত। কথা বললে শব্দগুলো জড়িয়ে যায়।

বাঁ কানের পাশে গালে একটা আধ ইঞ্চি কাটা দাগ আছে। ছবিতে সেটা দেখা যাচ্ছে না। এগারো বছর বয়সে, চার মাইল দূরে সারা রাত যাত্রা দেখে ফেরার পর ক্রুদ্ধ বাবা ইট ছুড়ে মেরেছিল। নয় ভাইবোনের মধ্যে সপ্তম, ওর বাঁচা-মরায় কিছু এসে যায় না। বাবা ভ্যান রিকশা চালাত। এখনও চালায়।

লোকটা এসেছিল তার কাছে।

'বাবু আমার মেয়েটার কী হবে? ...ফাঁসি?'

'না না, এইটুকু মেয়ের কি ফাঁসি হয়? দেশের আইনে বলা আছে কমবয়সিদের ফাঁসি দেওয়া যাবে না।'

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, 'ওর জন্য উকিল দিয়ে আপনি মামলা লড়বেন না?...ওকে তো আপনিই নষ্ট করেছেন।'

পুলিন চমকে উঠেছিল।

'কে বলল আমি নষ্ট করেছি?'

লোকটা চুপ করে থাকে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একগুঁয়ে ভাবটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল, যা বলেছে তার থেকে একচুলও কথা বদলাবে না।

'ও তো নষ্ট হয়েই এখানে এসেছিল। তালদিতে যে বাড়িতে ওকে কাজে লাগিয়েছিলে সে-বাড়ির চাকরের সঙ্গে বাড়ির কর্তার রাতে মারামারি হয়েছিল কেন তা ওখানকার অনেকেই জানে, তুমিও জানো, ... দু'জনের কাছেই ও রাতে যেত।'

সেই একগুঁয়ে ভঙ্গিটা বদলাল না। শুধু মুখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ওকে বিয়ে করবেন বলেছেন।'

'আমি! ...ছায়াকে! পাগল হয়েছ নাকি? কে বলেছে এ-কথা?'

'কাল জেলে দেখা করেছি ওর সঙ্গে... বলল।'

পুলিনের মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। এটা আবদার না স্পর্ধা! একটা নিরক্ষর কুৎসিত, লোভী, নির্বোধ, অজ পাড়াগেঁয়ে, সে কিনা হতে চায় তার বউ! এমন অসম্ভব স্বপ্ন দেখবার সাহস পেল কোথা থেকে?

'তুমি কি ওর কথা বিশ্বাস করো?'

'হ্যাঁ।'

পুলিন ফ্যালফ্যাল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার ব্যবস্থাগুলোও শরীরের মধ্যে ভেঙে পড়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপরই সে খ্যাপার মতো চিৎকার করে উঠেছিল।

'ব্ল্যাকমেল করতে চাও, ব্ল্যাকমেল?... বেরোও, বেরোও এখান থেকে।'

লোকটা ঘাবড়ে গেছল তার চোখমুখ দেখে। কলকাতায় তিনতলার ঘর গ্রামের রাস্তায় ভ্যান রিকশা চালানো কঠিন পা দু'টোকে নড়বড়ে করে দেয়। বিদেশে পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলা লোকের মতো ওকে দেখাচ্ছিল।

'বাবু, ছ'-সাতটা মুখে দু'বেলা ভাত জোগাতি হয়। ...ও মেয়েকে আমার আর দরকার নেই, আপনি আমাকে কিছু টাকা দিন। আমি আর আসব না।'

ছায়ার বাবা আর একদিন কলকাতায় এসেছিল সল্টলেকের জুভেনাইল কোর্টে সাক্ষী দিতে। এক হাজার টাকা নিয়ে উকিলের শেখানো কথা বলে, কাঠগড়া থেকে নেমে সেই-যে চলে গেছে আর কখনও পুলিশ তার মুখ দেখেনি। লোকটা কথা রেখেছে।

ওর সাক্ষীতেই পুলিন খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। অবশ্য পান্নাবাবুর বউয়ের কাছেও সে কৃতজ্ঞ।

একটা লেখার সঙ্গে ছবিগুলো ছাপা হয়েছে। বিষয়টা কী, সেটাই এতক্ষণ দেখা হয়নি। পাতা ওলটাল:

"অন্ধকারের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছিল যারা"

হাসিতে পুলিনের ঠোঁট বেঁকে উঠল। কী অদ্ভুত হেডিং। 'সাড়াটা কে দিয়েছিল'... শুধুই কি ছায়া?

ধীরে ধীরে বিছানায় এলিয়ে সে বালিশে মাথা রাখল। চোখ বুজে রইল। কিছুক্ষণ, ভেঙে পড়া সাহস আর ছড়িয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে জড়ো করার জন্য।

বাইরে হালকা শব্দ উঠল। ঠান্ডা হাওয়া ঘরে এল জানলা দিয়ে। বৃষ্টি নেমেছে। পুলিন ম্যাগাজিনটা চোখের সামনে তুলে ধরল।

আট

লেখাটা দুটি মেয়ের। ওরা কিশোর অপরাধীদের নানান রকম অপরাধের নমুনা সংগ্রহ করেছে জুভেনাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে। তারপর একটা সাক্ষাৎকার হাসপাতালের এক মনোবিদের সঙ্গে আর গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে পাওয়া কিছু তথ্য। তারপর জেলে গিয়ে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেও তারা কথা বলেছে।

লেখাটার উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বোলাতে বোলাতে সে সেই জায়গায় পৌঁছল যেখানে ছায়ার সঙ্গে লেখকরা কথা বলছে।

"খুন করে আট বছর জেল খাটছে এই মেয়েটি। বয়স বলল চব্বিশ। শহুরে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের মতোই তার সাজসজ্জা, কথাবার্তা অথচ বাঁকুড়ার এক গ্রামের মেয়ে এই লতিকা ঢালি।"

পুলিন অবাক হয়ে গেল। বাঁকুড়া?... লতিকা? কিন্তু এ তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার খেজড়ি গ্রামের ছায়া ঢালি। পদবিটা তো ঠিকই রয়েছে। সে আবার নজর বুলোল লেখার উপর দিয়ে। একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল: "গোপনীয়তার প্রয়োজনেই নাম বা বাসস্থান বদলাতে হয়েছে।"

"স্বচ্ছ দৃষ্টি তুলে ধরে খুশিয়াল কণ্ঠে এই যুবতী বলল, 'সামনের মাসে আমি ছাড়া পাব।' তার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। বললাম, 'বাইবেব পৃথিবী তুমি এই আট বছর কি দ্যাখোনি?'

'না দেখারই মতো।'

"ওর চোখে তীব্র কৌতূহল। জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য যেন আকুলি বিকুলি করছে লতিকার মন।

'খুন করেছিলে কেন?'

"প্রশ্নটা শুনে যেন লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে বলল, 'তখন মাথার মধ্যে কী যে হয়ে গেল, মাথাটা আমার অল্পেই গরম হয়ে যেত। দিনরাত আমাব পেছনে লাগত, হাতে কাজ না থাকলেও যেমন ত্যামন কবে কাজ বানিয়ে আবার কাজ ধবিয়ে দিত। হাঁপানির রুগি ছিল। অপিসে কাজ করত, স্বামীর সঙ্গে একই অপিসে। সে-দিন হাঁপের টান ওঠায় অপিস যায়নি। সকাল থেকে আমার পেছনে লেগেছিল। শেষে আব রাগ সামলাতে না পেরে বাটনা বাটার নোড়াটা দিয়ে...'

"মনে হল লতিকা যেন সে-দিনের দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। শিউরে উঠে চুপ করে রইল। মনে হল কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু তারপরই উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'কতদিন বাড়ির লোকেদেব দেখি না, এবাব দেখব।'

'কেন বাড়ি থেকে কেউ দেখা করতে আসত না?'

'শুধু বাবা আসত।'

'বাড়িব লোকেরা তোমাব সম্পর্কে কী ভাবে? কী করবে তুমি ফিরে গিয়ে, বিয়ে?'

'জানি না আমাকে ওবা কীভাবে নেবে। ভাইটাইবা তো বড় হয়ে গেছে। একটা ভাই সাঁতার কাটে, তার নাকি খুব নাম হয়েছে। দিদিব বিয়ে হয়ে গেছে, পাশের গ্রামেই। ওখানে কেউই আমায় বিয়ে কববে না। একটা কাজকম্মো দেখে কোথাও চলে যাব। বাড়িতে না থাকাই ভাল, সবার তা হলে অসুবিধে হবে।' চাপা কুণ্ঠিত স্বরে সে বলল।"

ছায়ার সঙ্গে কথাবার্তাব শুধু এইটুকুই ওবা লিখেছে। ম্যাগাজিনটা বুকের উপর বেখে পুলিন চোখ বন্ধ করে বৃষ্টিব শব্দ শুনতে লাগল। জলের ছাট এসে মেঝে এবং আলমারির ধার ভিজিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে উঠল না জানলা বন্ধ করতে।

শিবানীকে মেরেছিল কাটাবিব উলটো দিক দিয়ে, বাটনা বাটার নোড়া দিয়ে নয়। ছায়া বা লতিকা মিথ্যা কথা বলেছে। ডাক্তারি বিপোর্টে বলা হয়েছিল, অন্তত সাত-আটবার ঘুমন্ত শিবানীর খুলির পিছন দিকে আঘাত করা হয়েছিল। ঘটনাটা বিকেল ছ'টা নাগাদ ঘটেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে শিবানী তখন ঘুমোচ্ছিল।

রাত বারোটায় পুলিন সিনেমা দেখে না ফেরা পর্যন্ত অন্তত ছ' ঘণ্টা ছায়া ছিল লাশের কাছাকাছি। তখন ওর মনের মধ্যে কী চিন্তা হচ্ছিল, এটা বহুদিন পর্যন্ত তাকে বিভ্রান্ত করেছে। ঘর অন্ধকাব করে ছ' ঘণ্টা থাকতে হলে প্রচুর সাহস অথবা উন্মাদেব স্তরে চলে যাওয়া দরকার। বোধহয় শেষেরটাই ঘটেছিল।

ছায়া তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তারপর সে আলো জ্বালল, তারপর সে ঘরের মধ্যে মেঝেয় রক্ত দেখতে পায়। আলোটা সাদা ত্রিভুজের মতো অন্ধকার ঘরের মেঝেয়।

'তারপর একটা চিৎকার শুনলুম। একবার দু'বার তিনবার।'

'তখন আপনি কী করছিলেন?'

'পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম, স্কুল ফাইনাল... ইতিহাসের।'

'চিৎকারটা কোথা থেকে এল বলে আপনার মনে হয়েছিল?'

'ঠিক আমার ওপরতলা থেকে।'

'তখন কী করলেন?'

'ভাবলুম আমার স্ত্রীকে তুলে বলি, একটু দ্যাখো তো ওপরে কে যেন পাগলের মতো চিৎকার করল। গলাটা তো পুরুষমানুষের মতোই লাগল। কিন্তু আমার স্ত্রী তখন ঘুমিয়ে কাদা। তাই আমি নিজেই ওপরে গেলাম।'

'বাড়ির অন্য লোকেরা... তারাও কি বেরিয়েছিল?'

'একতলায় কথার আওয়াজ পেয়েছি, ওরাও কী হল কী হল করছিলেন।'

'ওপরে গিয়ে কী দেখলেন?'

'দরজা বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিলাম। দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিতেই দড়াম করে পাল্লা খুলে বেরিয়ে এলেন পুলিনবাবু। চোখ-মুখ উন্মাদের মতো।'

'কিছু বললেন কি তিনি?'

'হ্যাঁ। বললেন, চিৎকার করেই বললেন, খুন, খুন ও খুন করেছে আমার বউকে... আঙুল দিয়ে দেখালেন ওর কাজের মেয়েটাকে... আমি করিনি ও করেছে।'

'আসামিকে তখন কী অবস্থায় দেখলেন?'

'দেখে অবাক লেগেছিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে, যেন আধঘুমে, এমনভাবে তাকিয়ে ছিল। মুখে পাতলা একটা হাসি।'

ম্যাগাজিনটা বুক থেকে গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে যেতেই পুলিনের চটকা ভাঙল। সেটা তুলে নিয়ে আবার চোখের সামনে ধরল। অক্ষরগুলো আর আগের মতো দেখাচ্ছে না। ইরেজার দিয়ে যেন কেউ ঘষে দিয়েছে। ...আবছা লাগছে, কোথাও একেবারেই সাদা, কোথাও কালো কালো ছোপ। তার স্মৃতিও অনেকটা এই রকমই হয়ে এসেছে। গত দশটা বছরের এই পালিয়ে থাকার কঠিন, নিঃসঙ্গ চেষ্টা ঘষে দিয়ে গেছে তার জীবনটাকে। কিছু কিছু জায়গায় চামড়া উঠে কাঁচা মাংস বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে স্পর্শ করলেই জ্বালা করে।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, মধুর এক দাম্পত্য জীবন। কী করে যে এমন একটা বাসনা তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল তার কোনও হদিশ সে পায়নি। আবেগপ্রবণ সে ছিল না। কিন্তু কয়েক মাস হল তার মধ্যে এটা দেখা দিয়েছে। কী যেন একটা অস্থিরতা, জীবনকে ভোগ করার একটা ইচ্ছা তার মধ্যে তোলপাড় করছে। আর পাঁচটা মানুষের মতো স্বাভাবিক গৃহস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা... এত যন্ত্রণা এত কষ্ট সহ্য করার পর, সে কি দাবি করতে পারে না?

ছায়া এখন কোথায়? দশ বছরে নিশ্চয় সে অনেক বদলে গেছে। ছবিতে, কথাবার্তাতে মনে হচ্ছে 'কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।' বয়স বেড়েছে, কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে, নিশ্চয় বুঝেছে কী বোকার মতোই না স্বপ্ন দেখেছিল, পুলিনের বউ হবে।

কিন্তু ওর তো জেল হয়েছিল আট বছরের জন্য? দশটা বছর কেটে গেছে তারপর! তা হলে ম্যাগাজিনে যে বলছে সামনের মাসে ছাড়া পাবে? উঠে বসল সে বিছানার উপর।

পুলিন সূচিপত্রটা খুঁজে পেল না। প্রতিটি পাতা তন্নতন্ন করে দেখল, কোথাও সাল তারিখ পেল না।

কবে এই লেখিকাদের সঙ্গে ছায়ার দেখা হয়েছে? পুলিন মুহ্যমানের মতো বিছানায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পর তার মনে হল, ম্যাগাজিনটা পুরনো, সম্ভবত দু'বছর আগের।

ছায়ার দু'বছর আগেই জেল থেকে বেরিয়ে আসার কথা। নিশ্চয়, পুলিনের খোঁজ করবে। এটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হবে। কিন্তু শ্যামপুকুরে যাবে কি? সেখানকার লোকেদের মধ্যে, সবাই না হলেও, কেউ কেউ ওকে চিনবে। প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি... দুটো মাথাওলা শিশু বা হলুদ রঙের জবা ফুল... দেখার মতো বিস্ময় নিয়ে সবাই তাকিয়ে থাকবে ছায়ার দিকে। মুহূর্তে খবরটা রটে যাবে, আর এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে মুখগুলো বারান্দা বা জানলা থেকে উঁকি দিতে শুরু করবে।

কিন্তু গিয়েছিল কি?

ছায়ার মতো মেয়ে কি ছেড়ে দেবে তাকে? ম্যাজিস্ট্রেটের রায় শুনে কীভাবে তাকিয়ে থেকেছিল তার দিকে। একটা খুন করার মতো কাজ যে জন্য করেছে, সেটা আদায় না করে ও ছাড়বে না। আজীবন ও

খুঁজে বেড়াবে পুলিনকে। দেখা হলে প্রথমেই ও বলবে, 'এখন তো বউ করতে আর কোনও বাধা নেই।'

ছায়া নিশ্চয় শ্যামপুকুরে ইতিমধ্যে গিয়েছে। সেখানে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে যাবে তার অফিসে। অফিসেও কয়েকজন তাকে দেখেছে। মামলা চলাব সময় অনিল, দেবজ্যোতি আর বিজিতবাবু কোর্টে গিয়েছিল কয়েকদিন অফিসে ছুটি নিয়ে। ওরা গেছল নিছকই রসালো কেচ্ছার হাঁড়িটা কীভাবে ভাঙা হচ্ছে তাই দেখতে। বিজিতবাবু বেঁচে থাকলে বয়স হবে সাতষট্টি, নিশ্চয় রিটায়ার করে গেছেন। কিন্তু অনিল, দেবজ্যোতি আছে অবশ্য যদি না মরে গিয়ে থাকে বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

শ্যামপুকুরের পাড়ার দু'-তিনজনকেও পুলিশ কোর্টে দেখেছে। বোধহয় কাজকর্ম নেই। সময় কাটাতেই যেত। ওরা তাব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত শুধু। ছায়াকে জেবা করার জন্য কাঠগড়ায় তুললে ওরা ছায়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাত।

'যাকে তুমি খুন করেছ তাব স্বামী পুলিনবিহারী পালের সঙ্গে তুমি বিছানায় শুয়েছ কি?'

'না।'

'পুলিনবিহাবী পাল কি দুপুরে অফিস থেকে বাড়ি চলে আসত?'

'না।'

'হ্যাঁ, আসত।'

'না।'

'বাড়ির অনেকেই দেখেছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'তোমাকে দুপুরে পুলিন পালেব সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছে সামনের বাড়িব লোক।'

'আমি শুইনি।'

'শিবানী পাল তোমাকে সন্দেহ করেছিল তোমাব সঙ্গে তার স্বামীব অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাই তুমি তাকে খুন কবেছ।'

'না।'

ছায়া এখন কোথায়?

উকিল অনেকক্ষণ জেরা করেছিল ওকে। তার আর ছায়ার মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল, এমন একটা কথা ওর মুখ দিয়ে বলাতে চেয়েছিল। পারেনি। একগুঁয়ের মতো ছায়া শুধু 'না' বলে গেছল। .. কেন? তাকে বাঁচাবার জন্য?

শ্রান্ত লাগছে। পুলিনের চোখের পাতা ভারী হযে নেমে আসছে। আধ ঘুমেব মধ্যে ছায়াব মুখটা গলে যেতে যেতে ঝাপসা হয়ে শুধুই একটা মুখ হয়ে গেল। এটা যে-কোনও যোলো বছর বয়সি মেয়ের মুখ হতে পারে। ঘুমের মধ্যেই সে ভয়ে ঘেমে উঠল।

সকালে ঘুম ভাঙল মুখে রোদ লাগায়। শূন্য চোখে দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে রইল। রাতে আলোটা নেভানো হয়নি। গদাইয়ের মা কি এখনও কাজে আসেনি? মাথা তুলে দেখল দালানটা পরিষ্কার।

টেবলে রাখা চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। গদাইয়ের মা আলোটা নিভিয়ে দিতে পারত। প্রতিদিনই পুলিনের দাঁত মাজা হয়ে যায় চা তৈরি হবাব আগেই। ম্যাগাজিনটা টেবলে রাখা। তার মনে পড়ল, এটা সে নিজে টেবলে রাখেনি। হয়তো মেঝেয় পড়ে গেছল, গদাইয়ের মা কুড়িয়ে তুলে রেখেছে।

সে খাট থেকে নেমে আলো নেবাল, রাতে বৃষ্টি হাওয়ায় জানলা দিয়ে তাজা একটা গন্ধ পেল, গাছপালা, মাটির কিন্তু ভ্যাপসানি ভাবটা কাটেনি।

গদাইয়ের মা ঘরে এল।

"চা কি গরম করে দোব?"

"দাও।"

"আপনি কি বাজাব যাবেন না গদাইকে পাঠাবেন?"

"কেন, কী হয়েছে আমার যে বাজার যেতে পারব না।"

পুলিন নিজেই অবাক হয়ে গেল তার হঠাৎ রুক্ষ হয়ে ওঠার জন্য। কিছু গোলমাল তার মধ্যে ঘটেছে। ছায়া দু'বছর আগে ছাড়া পেয়েছে, এটাই কি তাকে ভয় পাইয়েছে?

"ঠিক আছে গদাইকে ডেকে দাও।"

দোকানে বসে সে দেখল তুষারকণা স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে তাকাল একবার কিন্তু চোখ ইউনিকের দিকে নয়। সুকুমার বোধহয় দোকানে বসে আছে।

আরও কিছু লোক ব্যস্ত হয়ে পুলিনের চোখের সামনে দিয়ে স্টেশনের দিকে গেল। এরা রোজ কলকাতায় যায় অফিস করতে। এক সময় তার মনে হত, এইভাবে গোঁতাগুঁতি করে ট্রেনে উঠে রোজ অফিস যাওয়া আবার একইভাবে ফিরে আসা, ভ্যাপসা গরমে দরদর ঘাম, দুর্গন্ধ, ঝগড়া, ট্রেনের মাঝপথে থেমে যাওয়া, লেট হওয়া আবার বাসে বা ট্রামে ওঠা, আবার সেই ট্রেনেরই মতো অবস্থার মধ্যে পড়া, এ-সবের হাত থেকে সে বেঁচে গেছে।

কিন্তু ইদানীং তার ক্লান্তি লাগছে এই একইভাবে প্রতিদিন দোকানে বসায়। রথতলা আর বাগুইপাড়া স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া, তাও প্রতিদিন নয়, গোনাগুনতি কয়েকটা লোকের মুখ দেখা, কথা বলা এবং কথাগুলোও মামুলি।

এক ধরনের স্থবিরত্বর মধ্যে সে দিন কাটাচ্ছে, পোড়ো বাড়ির মতো নিজেকে মনে হচ্ছে। এখন তার ঈর্ষা হয় এই ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের দেখলে। ঝক্কি ঝামেলা কষ্ট নিয়েই ওরা নদীর স্রোতের মতো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের, সারা দিনে ওরা বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুযোগ বেশি পায়। নদীর নীচে থিতিয়ে পড়া পলির মতো সে জমে উঠছে প্রতিদিন। জমতে জমতে পাথর হয়ে যাবে কিংবা ইতিমধ্যে হয়তো হয়েও গেছে। পুলিন অশান্ত বোধ করল। এখনই বেরিয়ে গিয়ে খানিকটা ঘুরে আসতে ইচ্ছা করছে।

কোথায় যাওয়া যায়? দিল্লি, বোম্বাই, কাশী, হরিদ্বার, দার্জিলিং, পুরী... শশুর বাড়ি? ওদের কিছু ঘটেছে কি না, শঙ্কর কেন এল না, এ-সব জানা দরকার। তার মধ্যে কৌতূহল ব্যাপারটাই কি মরে যাচ্ছে? জীবন্ত বোধ করার বড় লক্ষণ তো এটাই।

দেবু এখনও আসেনি। ওকে দোকানে রেখে তা হলে বেরিয়ে পডতে পারত। দুপুরে খাওয়াব পর ছাড়া আব যাওয়ার সময় করা যাবে না।

"পুলিনবাবু, তা হলে কখন ওটা পাঠাচ্ছেন?"

অরুণপ্রকাশ দোকানের দবজায় দাঁড়িয়ে।

"এখুনি পাঠাচ্ছি।"

"ঘণ্টাখানেক পরে আসব?"

"আপনাকে আর আসতে হবে না, বাড়ি তো জানাই, আপনার নাম বললে..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ নাম বললে যে-কেউই দেখিয়ে দেবে।

তৃপ্ত দেখাল মাস্টারমশাইকে। উনি চলে যেতেই পুলিন গদাইকে ডাকল।

"শ্যামসুন্দরকে বলে আয় একটা ড্রেসিং টেবল এই পিছনের পাড়ায় দিয়ে আসতে হবে, এখুনি।"

দেবু বিকেলেও এল না। দোকান ফেলে পুলিনও বেরোতে পারল না। ওর না আসার কারণ হিসাবে সে ধরে নিল, নিমন্ত্রণ খাওয়ার অন্যতম প্রাপ্তি, পেটের গোলমাল দেবুর ঘটেছে।

বিকেলে কাশীনাথ এল এবং কিন্তু কিন্তু করে যা বলল তাতে পুলিন অবাকই হল।

"খুম কম দামি একটা খাট, দু'জনে শোয়ার মতো, কত পড়বে?"

"খাট কী হবে! তাও দু'জনের জন্য? তুমি তো একা মানুষ।"

সরাসরি উত্তর না দিয়ে হাসল। পুলিনও বুঝতে দিতে চায় না ওর বিয়ের উদ্যোগটা সে জানে।

"বলুন না কত পড়বে?"

"আগে আমার কথার উত্তর দাও।"

"খাট কেনে তো শোবার জন্য।"

"এতকাল কোথায় শুতে?"

"চিরদিন কি বেঞ্চিতে শোয়া যায়?"

"তা যায় না। কিন্তু দু'জন কেন?"

"বউও শোবে।"

"বিয়ে কচ্ছ। মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কে ঠিক করল, বাবা? ...মা?"

"আমিই ঠিক করেছি।"

লাজুক হল কাশীনাথ। পুলিন মজা পাচ্ছে। সুকুমার বলেছিল, 'মাসিরই কী যেন হয়টয়।' মেয়েটা মঙ্গলা নার্সিংহোমে আয়া বা ঝি।

"তুমি তো সবসময় এখানেই থাকো, এরমধ্যে আবার পাত্রী জোগাড় করার টাইম পেলে কখন। বাহাদুর ছেলে তো! অবশ্য দেখতেও তো সিনেমার হিরো হিরো মতন।"

কাশীনাথ মাথা চুলকোতে লাগল। দু'শো দশ টাকা মাইনে পায়। ওর গেঞ্জি বা জুতোর দিকে তাকালে সেটা বোঝা যাবে না। নিশ্চয় আধপেটা খেয়ে এইসব কিনেছে। তা হলে বাড়িতে টাকা পাঠাবে আব কী কবে। এইসব অশিক্ষিত গাড়োলদেব মাথা খায় হিন্দি সিনেমা... পুলিন বিরক্ত হল।

"এই মাইনেতে দু'জনের চলবে?"

"ও কাজ করে। ওপারে মঙ্গলা নার্সিংহোম, চারতলা বাড়ি, খুব বড় সাইন বোর্ড, নীচে ওযুধের দোকান, সেখানে আয়াব কাজ কবে। দিনে কুড়ি টাকা, অবশ্য ঠিকে কাজ। বারোটা বেড আছে, সব সময়ই ভবতি থাকে।"

"তা হলে তো ভালই আয় করে। তা আলাপ হল কী করে?"

"আপনাকে সেদিন বললাম না, গ্রামের মাসির কথা, নার্সিংহোমটার প্রথম দিন থেকেই আছে, আজ এগাবো বচ্ছব। ওব সেজবোনেব মেয়ে...ওপারেই বাপুজি কলোনিতে ঘবভাড়া নিয়ে মাসি থাকে। সেখানেই...।"

"খাটের তো দাম বেশি, তক্তপোশ কিনে নাও না কেন।"

"আমিও তাই বলেছিলুম, ও বলেছে খাটই কিনবে।"

"ও কিনবে, তুমি নয়?"

"আমাব অত টাকা কোথায়। মাসির কাছে থাকে, খায় একশোটা করে টাকা দেয় আর বাকি টাকা জমায়।"

"কোন খাট নেবে পছন্দ করো... আটশো হাজার, আবাব পাঁচশো টাকাবও আছে। তোমার তো ডবল বেড লাগবে, খাট রাখার ঘব আছে তো?"

"ঘর একটা ঠিক কবে ফেলেছি ওই কলোনিতেই, ঘরটা বড়ই।"

"তা হলে এখানে যে কাজটা করছ...?"

"ছেড়ে দেব। নার্সিং হোমের মালিক যে ডাক্তাবদিদি, তাকে মাসি বলে রেখেছিল..দু'মাস পবেই কাজে লাগব। এখন যে লোকটা দারোয়ান সে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে।"

"ভাল। কবে খাট চাই? বিয়েটা কবে?"

"এখনও দিন ঠিক হয়নি। ...খাট আমি তো পছন্দ করব না, ও পছন্দ করবে। তা হলে ওকে এনে দেখাই।"

"তাই দেখাও।"

"কমসম করে দেবেন তো?"

"দোব দোব, তৈরি দামেই তোমায় দোব। বিয়েতে আমাদের সবাইকে বলবে তো?"

একগাল হেসে কাশীনাথ মাথা কাত করল। তারপর ঝপ করে পুলিনের পায়ের ধুলো নিল।

"থাক থাক।"

টগবগে ভঙ্গিতে গোড়ালি তুলে তুলে কাশীনাথের হাঁটার ধরন দেখে পুলিন আপন মনে হাসল। এখন ওপারে যাচ্ছে। রথতলাটা এখন নিলাম হলে বিনা দ্বিধায় সবার উপরে দর দেবে কাশীনাথ।

দেবু তিন দিন এল না।

তিন দিন পুলিন দোকানে বসে, ঘরে শুয়ে আর তুষারকণার জন্য দুটো খাট তৈরির ব্যাপারে মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলে কাটাল।

ম্যাগাজিনটা সে আলমারিতে তুলে রেখেছে। বার করে পড়বার ইচ্ছা কয়েকবার হয়েছিল, কিন্তু সেটা দমন করে শুধু এই জন্যই, নিজেকে একটা অসুস্থ, ভীত পশুর মতো অনুভব করতে আর সে চায় না। ছায়া কোথায় আছে, কীভাবে আছে তা নিয়ে সে মাথাব্যথা করতে রাজি নয়। গত দু' বছরের মধ্যে যখন তাদের দেখা হয়নি তখন আর দেখা হবেও না।

তবু চোখের উপর সবাক চলচ্চিত্রের মতো ভেসে ওঠে কিছু কিছু ঘটনা।... ওর চলার ভঙ্গি... কৌতূহলী চাহনি... বসা বা দাঁড়ানো... কণ্ঠস্বরের ফিসফিস, চেঁচিয়ে ঝগড়া করা... থুথু ফেলা, দাঁতে নখ কাটা, গায়ের গন্ধ, মুখের গন্ধ...নরম পেশি, চর্বি...।

পুলিন চেয়ারের হাতল ধরে বা বিছানায় বালিশ আঁকড়ে ছায়া নামক স্মৃতির সঙ্গে যুঝেছে। ম্যাগাজিনটা সে আলমারি থেকে বার করেনি।

দেবুটা ঠিক এই সময়েই কামাই করল। ও থাকলে দোকানে ওকে রেখে কলকাতায় গিয়ে সময় কাটিয়ে আসতে পারত। কত জায়গা রয়েছে, বেলুড় মঠ, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ব্যান্ডেল চার্চ. . পুরনো অফিসে গিয়েও অনিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওকে চমকে দিতে পারত।

'কীরে চিনতে পারিস?'

অনিল কি আঁতকে উঠবে ভূত দেখার মতো! পুলিন দশ বছরে নিশ্চয় কিছু বদলেছে। ওজন নিলে দেখা যাবে অন্তত দশ কেজি বেড়েছে আর সেটা চর্বিই। দুই গালে, ঘাড়ে, বাহুতে, বুকে আর পেটে তো বটেই। মোটা হলে চেহারাটা বদলাবেই কিন্তু ঘনিষ্ঠরা এক নজরেই চিনে নেবে। আর অনিল খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, কলেজ জীবন থেকে। কেমিক্যালস, লোহার পাইপ, জুট মিল, কয়লার কারবারি এই অফিসে অনিলের তদবিরেই চাকরিটা সে পেয়েছিল।

শিবানীর সঙ্গে বিয়েতে উদ্যোগ আব চেষ্টা ছিল ওবই। অফিসের বড় হলঘরটার শেষ প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে টেবলটায় মুখোমুখি দুটো টাইপ মেশিনে দু'জনে বসত, অনিল আর শিবানী। পুলিনেব টেবল ছিল হলেব মাঝামাঝি, দেবজ্যোতি আর বিজিতবাবুর সঙ্গে বসত।

একদিন অনিলই বলেছিল, 'বিয়ে কর এবার।'

'কাকে? কোথায় মেয়ে. আর বেশ তো আছি।'

'একটা ঘরে থেকে আব হোটেলে দু'বেলা খেয়ে কিছুদিন চলে...একটা সংসাব পাত এবাব। তুই শিবানীকে বিয়ে কর।'

পুলিন প্রথমে তার প্রতিক্রিয়াটা মুখে ফুটিয়ে তোলার মতো অনুভূতি স্নায়ু মাবফত পেশিতে পাঠাতে পাবেনি। বজ্রাহতই হয়েছিল। পরে বলেছিল, 'শিবানীকে!' অফিসে যে চারটি মেয়ে কাজ করে তাদেব মধ্যে ওকেই প্রথম দিনে চোখে পড়েছিল। ওর মুখ আর শরীর স্বাভাবিকত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে মজা বা করুণার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। ওর ছবি আঁকতে হলে পেইন্টারের থেকে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে কার্টুনিস্ট।

'দেখতে ভাল নয়, আমি মানছি। এই নিয়ে ওকালতি কবব না। ওর থেকে ভাল দেখতে দশ হাজাব মেয়ে লাইন দিয়ে আসবে তোকে বিয়ে করতে।' অনিল যে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েই সওয়াল করতে নেমেছে পুলিন তা বুঝে গেছল।

'একই অফিসে স্বামী-স্ত্রীর চাকরি এটা বিরাট সুবিধের, দু'জনের মোট আয় কত দাঁড়াবে ভেবে দেখ। অসুখ বিসুখে সেবা পাওয়া, আরও ঘর, বড় জায়গা নিয়ে থাকা। ভাসমান জীবনে একটা সিকিউরিটি, আস্থা, নোঙ্গর ফেলা। তা ছাড়া শিবানীদের অবস্থা খুবই ভাল, এক মেয়ে, একটা ভাই। যথেষ্ট জমিজায়গা, মাছের আড়ত আছে। ও নিজে চাকরির টাকা খরচ করে না, বাড়িতেও দিতে হয় না, জমিয়ে জমিয়ে সোনার গয়না করেছে, খুব হিসেবি। সব দিক দিয়েই তোর লাভ। চেহারা, যৌবন, সৌন্দর্য চিরকাল কি থাকে কারও?'

পুলিনের মনে হয়েছিল বস্তাপচা এইসব যুক্তির মধ্যে একটাই শুধু গ্রাহ্য করা যায়। শিবানীর সঙ্গে অনেক টাকা আসবে। এই বাস্তব তথ্যটিই তার মনে ধরে। তার খুব দরকার...সচ্ছলতা।

'শিবানী কি জানে, তুই আমাকে বলবি?'

'জানে না। আগে তোর কাছেই কথা পাড়লুম, এবার ওকে গিয়ে বলব যদি তুই হ্যাঁ বলিস।'

'তোর এত উৎসাহ কেন?'

'আট বছর চাকরি করছে শিবানী আমি পাঁচ, সামনা সামনি বসি, দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বই বলতে পারিস হয়ে গেছে। অনেক সুখ-দুঃখেব কথা আমাদের হয়। ওর বাড়ি থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, উত্তরে অনেক চিঠিও এসেছিল। কিন্তু সাহস পায়নি ও এই চেহারা নিয়ে পাত্রপক্ষেব সামনে বেরোতে। জানতই সবাই রিজেক্ট করবে।'

'আমিও তো করতে পারি।'

'সেটা ও জানতে পারবে না, শুধু আমিই জানব।'

পুলিন রাজি হয়ে যায়। একদিন অফিসের পর অনিল ওদের দু'জনকে একটা ইংরেজি গুপ্তচর কাহিনীর সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। পাশাপাশি বসেছিল পুলিন আর শিবানী। সে মৃদু গন্ধ পেয়েছিল সেন্টের। বিদেশিই হবে। শিবানী এ-সব মাখে বলে সে জানত না। আড়ষ্ট হয়ে সারাক্ষণ ছিল। হাতলে একবার হাতে হাত ঠেকে যেতে হাত নামিয়ে নেয়। প্রচুর ঘুসোঘুসি, ক্যারাটে, পিস্তল, বিছানায় মেয়ে পুরুষেব প্রায় নগ্ন শরীর ছবিটায় ছিল। সিনেমা ভাঙার পর অনিল বউকে বাপের বাড়ি থেকে আনার অজুহাত দিয়ে ওদের দু'জনকে রেখে চলে যায়।

এরপর সে শিবানীকে ট্রেনে তুলে দিতে যায়। রাত হয়ে গেছে, একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় তাই পুলিন ওর সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। শিবানী যেতে দেয়নি। 'এত বছর ধবে এ লাইনে যাতায়াত করছি, কিছু ভাববেন না, আমি ঠিক পৌঁছব।'

'কাল অফিসে আসছেন?'

অর্থহীন প্রশ্ন কিন্তু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আর কী বলা যায় রাত সওয়া ন'টায়। শিবানী মাথাটা হেলিয়ে ছিল খুকিব মতো।

শিবানীকে এই প্রথম সে উজ্জ্বল দেখেছিল। গভীর প্রত্যাশা এবং তা পূরণের সম্ভাবনা যে আব মবীচিকা নয়, এটা বুঝে গিয়ে ওর চাহনিকে প্রশান্তি দিয়েছিল আর কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল। পুলিনের বুকেব মধ্যে তখন একটা মোচড় দেয়। সেটা প্রেমের জন্মকালীন ব্যথা ওঠার জন্য ঘটেছিল এমন সিদ্ধান্তকে সে কোনওদিনই মানতে পারেনি। মোচড়টাকে সে মমতার বেশি অন্য কিছু বলে গণ্য করেনি।

ওদের বিয়ে হবে শুনে অফিসে অনেকে প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। প্রেম করে বিয়ে হচ্ছে না শুনে তারা আশ্বস্ত হয়। তবু পুলিন লক্ষ করে, তাব সঙ্গে কথা বলাব সময় অনেকেবই মুখেব ভাব, গলার স্বর বদলে যায়। একটা বুদ্ধিহীন, সরল ভাল লোক ঠকতে চলেছে অথচ তাবা বাবণ কবতে পারছে না, এমন একটা অসহায় ভঙ্গি তাদের আচরণে ফুটে উঠত।

অনিল সেটা লক্ষ করে একবাব বলেছিল, 'বিয়েটা হয়ে যাক। সুখী দাম্পত্য জীবন কাকে বলে তারপর সেটা এরা দেখতে পাবে।'

অনিল হৃদয়ের গভীব থেকে কথাগুলো বলেছিল। পুলিনকে তা ছুঁয়ে ছিল।

কিন্তু এখন গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালে অনিল কী কববে, কী বলবে? মামলার রায় বেবোবাব পব ওর কথামতোই সে চাকরিটা ছেড়ে দেয়। 'পুলিন এই অফিসে আর তুই টিকতে পারবি না, এখানকাব চোখগুলো তোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে।' অনিল সত্যিই বন্ধু ছিল।

'চিনতে পারব না কেন? তুই পুলিনই তবে তখন তোকে চিনতে পারিনি।'

'তখন এই জীবন এই জগৎ সম্পর্কে তোর ধারণাটা কাঁচা ছিল, আমারই মতো। বলেছিলি আমার নিজের জন্য নাকি আস্থা, নোঙ্গর আরও কী কী সব দরকার। অথচ কত রকম ঘটনা যে জীবনে ঘটতে পারে, জীবনের ধারাকে বদলে দিতে পারে সেটা হিসাবে ধরিসনি।'

'সাবধানে অনুমান করা উচিত ছিল। পুলিন এখন তুই কী করছিস?'

'একটা জীবন কাটাচ্ছি।'

'কেমন জীবন?'

'মোটামুটি নিশ্চিন্ত জীবন। সকালে ঘুম থেকে উঠি রাতে ঘুমোতে যাই। কিছুতে জড়িয়ে নেই, কিছুই আমাকে জড়ায়নি।'

'তুই বেঁচে আছিস তো!'

টেবলে খট করে একটা শব্দ হতেই পুলিন চোখ খুলল। সুকুমার দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে হলুদ রঙের বড় একটা খাম। ডান হাতে পেপার ওয়েট।

"দাদা স্বপ্ন দেখছিলে?"

"আমি ঘুমোইনি তো।"

"তা হলে বিড়বিড় করে কাকে বলছিলে, বেঁচে আছি বেঁচে আছি... হাগি মুতি, খাই শুই...।"

"তা হলে বোধহয় স্বপ্নই দেখছিলাম... মনে করতে পারছি না কী দেখেছি।"

"লাকি ম্যান। স্বপ্ন যত কুইক ভুলে যাবে ততই ভাল। নইলে ল্যাজের মাছির মতো ভনভন করে বড্ড ডিস্টার্ব করে।"

"হাতে ওটা কী?"

"এই নাও ছবি দুটো। তোমার আর ওনার...সাইজটা ঠিক হয়েছে?"

পুলিন নিজের ছবির দিকেই তাকিয়ে রইল। চেনা যায় না, তাকে এত কমবয়সি দেখায়।

"যা বলেছিলাম, এখনও তোমাকে...।"

"থাক থাক।"

"একটুও বাড়িয়ে বলছি না, ছবিটা আমার তোলা বলেও নয়, এখনও ছাঁদনাতলায় তোমাকে বসানো যায়।"

"কার সঙ্গে বসব?"

"মেয়ের অভাব আছে নাকি!... করবে?"

সুকুমার ঝুঁকে পুলিনের হাত চেপে ধরল। চোখের মণি বড় হয়ে উঠেছে। আশা... স্বপ্ন ওব চোখে।

"কে ভোগ করবে এই বিষয়-আশয়, ব্যবসা? কে খাবে তোমার পয়সা?"

"সবাই এই কথাই বলে। আমি বলি শ্যাল কুকুরে খাবে।"

"কোনও মানে হয় এইভাবে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার?"

"তা হলে মানুষ সন্ন্যাসী হয় কেন?"

"তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে, পারপাস আছে। তারা ঈশ্বরকে খোঁজে, বুঝতে চায়, যা বোঝে সেটা মানুষকে জানায়... তুমি কী করছ? দিনের পর দিন দোকানে বসে বসে শুধু কাঠের গন্ধ শুঁকছ আর ব্যবসার কাজে একটু-আধটু বেরোচ্ছ। তার থেকে বরং একটা বিয়ে করো... আগে কি তা করেছ?"

"করেছি।"

"মরে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আর সেই জন্য বুকে তাজমহল গড়ে শাজাহান হয়েছে? .. দ্যাখো দাদা, প্রেমট্রেম খুব ভাল জিনিস কিন্তু একা একা এ-সব হয় না। ভালবাসা নেবার জন্য একটা লোকও তো চাই ধকধক করে, নড়াচড়া করে এমন একটা প্রাণও তো চাই। তোমার মরা বউ কি তোমার কাছে এসে কথা বলে না পা টিপে দেয়?"

পুলিন শুধু ওর হাত নাড়াটা লক্ষ করে যাচ্ছে। কথায় বাধা দেবার চেষ্টা করল না। সুকুমার ধরেই নিয়েছে, বউয়ের স্মৃতি জিইয়ে রাখার জন্য সে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। ওর দোষ নেই, চিন্তার এই ছাঁচটাই সবাই মেনে নিয়েছে। ছাঁচটা খুব হৃদয়গ্রাহী।

"আমার পিসতুতো বোন, স্কুল ফাইনাল পাস। দেখতে এনার থেকে কম নয়। বয়সও এনার থেকে অনেক কম।"

পুলিন সচকিত হল। সুকুমার এ-ভাবে কথাটা বলল কেন। তুষারকণার সঙ্গে তুলনাটা আসছে কেন? ওকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা কেন? সুকুমার কিছু কি লক্ষ করেছে... হাবভাব, চোখ মুখ, গলার স্বর। তুষারকণার সঙ্গে কথা বলার সময় সে কি বদলে যায়? এমনকী এই ছবিটার দিকে তাকিয়েও!

"সাত ভাই বোনের মধ্যে থার্ড, অবস্থা ভাল নয়, শুধু বড়ভাইটি চাকরি করে, বাবা নেই। তোমাকে আমি ছবি দেখাব, যদি পছন্দ হয় তা হলে পিসিমাকে আসতে বলব।"

পুলিন স্মিত হাসল শুধু। হ্যাঁ বা না, কোনওটাই সে বলল না। অনিলও একসময় এই ভাবে তাকে বোঝাতে চেয়েছিল।

"আমাকে পছন্দ হবে? বয়স কত জানো?"

"পুরুষমানুষের আবার বয়স। বুলিকে শুধু একবার দেখবে আর সঙ্গে সঙ্গে পনেরো বছর বয়স কমে যাবে।"

"পনেরো!"

"কেন, আরও কমাতে চাও নাকি?"

আদি রসাত্মক কিছু টিপ্পনী কাটতে গিয়েও সুকুমার সংযত হল, বোধহয় পিসতুতো বোনের তাতে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায়।

"আমি আসছি। এ-দুটোর জন্য কিছু তোমাকে দিতে হবে না।"

পুলিনের চোখ টেবলে পাশাপাশি পড়ে থাকা ছবি দুটোর দিকে। একদৃষ্টে সে তুষারকণার মুখের দিকে তাকিয়ে। পার্টিশনের ওধারে পায়ের শব্দ উঠল। পুলিন মুখ তুলে আলমারির আয়নায় তাকিয়ে দেবুকে দেখতে পেল।

"এসেছিস, ভালই হল। আমি একটু কলকাতা যাব।"

নয়

শেয়ালদা স্টেশনের পশ্চিমের ফটক থেকে বেরিয়ে ফ্লাই ওভারের তলা দিয়ে পুলিন মহাত্মা গান্ধী রোডে এল। ক্ষেত্রনাথের ছবি বাঁধানোর দোকান বৈঠকখানার মোড়ে পূরবী সিনেমার উলটোদিকে। ফুটপাথে তরিতরকারি, সবজি নিয়ে বসে গেছে ফড়েরা।

এদের চাষি বলে শহরের লোক কিন্তু পুলিন তা মনে করে না। গ্রামের বাগান, খেত বা হাট থেকে মাল কিনে এনে কলকাতায় বসে গেলেই সে চাষি হয় নাকি! তাজা হয় বটে এদের জিনিসগুলো কিন্তু দামও বাজার থেকে কম নয় বরং বেশিই। একটা নারকেল সাড়ে তিন টাকা দিয়ে একবার সে কিনেছিল, তেমন পুরু শাঁসের নারকেলই গদাই সওয়া তিন টাকায় আনে বাগুইপাড়া স্টেশনের রাস্তার বাজার থেকে।

তবু দেখতে ভাল লাগে স্তূপ করে রাখা টাটটা কাঁচা পেঁপে, ঝুড়ি ভরা পেয়ারা, বেগুন, ওল, কাঁচকলা, শশা। পুলিন থলিভরা বাজার করে ফেলল মনে মনে। ইদানীং খাওয়ার ব্যাপারে তার জিভ একটু বিলাসী হয়ে পড়েছে। গদাইয়ের মা পরশু সর্ষে বাটা দিয়ে চাল-কুমড়োর তরকারি রেঁধেছিল তাব ফরমায়েশে। কচুরমুখি অনেকদিন খাওয়া হয়নি, এই কথাটা তার এইমাত্র মনে পড়ল।

"আরে পুলিনবাবু... কতদিন পর এলেন!"

ক্ষেত্রনাথ উবু হয়ে ফ্রেমের জন্য কাঠে পালিশ লাগাচ্ছিল। হাঁটু থেকে লুঙ্গিটা নামিয়ে দিল।

"অনেক দিন পরই এলাম।"

পুলিন বেঞ্চটায় বসল। লম্বা এক ফালি ছোট্ট দোকান। দেয়াল ঘেঁষে কাত করে রাখা কাচ, ফ্রেমের কাঠ। তিন দেয়াল জুড়ে বাঁধানো ছবি নানা রকম ফ্রেমে, মেঝেয় গোছা করে দাঁড় করানো কালী. রাধাকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের বাঁধানো রঙিন পট, দোকানের বাইরেও কয়েকটি ঝোলানো। দড়িতে ধুতি আব খদ্দরের রঙিন পাঞ্জাবি, অপরিচ্ছন্ন মেঝেয় পেরেক, ন্যাকড়া, কাঠের টুকরো, হাতুড়ি, একধারে পুরনো তিনটি টিন আর কৌটো।

"আছেন কেমন?"

"চলে যাচ্ছে, ব্যবসার অবস্থা তো বোঝেনই।"

"আপনার তো বড় কাঠের মাল, একটা বেচলেই তিন-চারশো টাকা লাভ।"

"তাই ভাবেন বুঝি, ভাল তাই ভাবুন।"

"জিনিসের দাম যা বেড়েছে, খদ্দের তো তা বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে এখনও চার টাকায় বুঝি ঠাকুরের পট পাওয়া যায়, ছবি বাঁধানো যায়। দশটা টাকা নিয়ে বাজার করতে যান আলু, কচু শাক কিনতেই শেষ। মাছটাছ কেনার কথা ভাবতেই পারি না।"

ক্ষেত্রনাথের বাবা এই দোকান দিয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। পুলিন তাকে দেখেনি। কলেজে পড়ার সময় ক্ষেত্রনাথের বড়ছেলেকে সে সন্ধ্যায় পড়াত। সাত মাস পড়িয়েছিল। টেনেটুনে ক্লাস সেভেনে তুলে দিয়ে পুলিন নিজেই বিদায় নেয়—একটা বেশি টাকার টিউশনি পেয়ে। ছেলেটি শান্ত স্বভাবের স্বল্পবাক এবং মাথাটি ছিল গোবরে ভরা।

পুলিন তারপরও সম্পর্ক রেখে গেছে। যখনই এই অঞ্চলে আসে ক্ষেত্রনাথের তারা-মা আর্ট গ্যালারিতে একবার বসে যায়। লোকটিকে বাইশ বছর আগে যেমন দেখেছিল আজও তাই আছে, অবস্থার কোনও উন্নতি বা অবনতি চোখে পড়েনি।'

"একটা কাজে এসেছি।"

হলুদ খাম থেকে সে সন্তর্পণে ছবি দুটো বার করল। "এই দুটো বাঁধিয়ে দিতে হবে। খরচের জন্য ভাববেন না, আপনার বেস্ট যে ফ্রেম আছে, ওই যে...ওই রকম চওড়া সোনালি।"

"কে হন, আপনার স্ত্রী? ...বিয়ে করলেন কবে?"

পুলিন লজ্জা পেল। পরিচিত কেউ এমন ভুল করলে এক ধরনের ছেলেমানুষি মজা পাওয়া যায়। বুকেব মধ্যে চিনচিন করে উঠল...সুখের অবস্থা। তুষারকণাকে স্ত্রী ভাবতেই মনোরম একটা চাঞ্চল্য ব্যোমকূপগুলোয় কেঁপে গেল।

ক্ষেত্রনাথের এমন ধারণা হল কেন? ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরিয়ে এল কেন? চারিদিকে দেবদেবীর ছবি। কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ সবাই যেন তার দিকেই তাকিয়ে! পুলিনের কনুইয়ের কাছে কাঁটা দেখা দিল। ক্ষেত্রনাথ কি দৈববাণী করল! ধীরে ধীরে সে বিহ্বলতার স্তরে পৌঁছেছে।

"অনেকদিন হল, তা প্রায়..."

"আপনার ছবিটা তো এখনকার, ওনারটাও কি?"

"হ্যাঁ?"

"ছেলেপুলে?"

ক্ষেত্রনাথ চোখে তারিফ নিয়ে তুষারকণার ছবির দিকে তাকিয়ে। হৃদয়ের এক কোনায় পুলিন গর্বের ছোঁয়া পেল। তা হলে অবিশ্বাস্য নয় তার পক্ষে এমন একজনের স্বামী হওয়া। সে বেমানান নয়।

"একটি ছেলে, সাত বছর বয়স।"

পুলিন আবাব দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকাল। দেবদেবী সে মানে না। কোথাও পুজো হচ্ছে দেখলে কাছে যায় না। হাত তুলেও প্রণাম করে না বিগ্রহ বা প্রতিমাকে। অথচ 'কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেব অদ্ভুত আবির্ভাব', এখন যেন বিশ্বাস করা যায় বলে তার মনে হচ্ছে।

"একটিই ভাল...আর বাড়াবেন না। ছেলে মানুষ করা যে কী ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার...।"

"ওকে ওর মা মানুষ করছে, আমি ওতে মাথা গলাই না।"

"শিক্ষিত? বি এ পাশ?"

"হ্যাঁ। চাকরি করে।"

দৈববাণীই। চোদ্দো দিনের মধ্যে এক হাজার ছাপিয়ে বিলি করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বোম্বাইয়ের একজন লটারিতে বারো লাখ পেয়েছিল। পুরোটাই কি মিথ্যে? এক হাজার ছাপতে ক'টা টাকাই বা লাগবে। এক হাজার খামের দামই বা কত আর। ডাঁকে পাঠাবারই বা দরকার কী? এক হাজার নাম ঠিকানা সে কোথা থেকে জোগাড় করবে দু' সপ্তাহে? পিওন যেমন চিঠি বিলি করে সেই ভাবেই বাড়ি বাড়ি দোকানে দোকানে বিলি করবে। রাত্রের অন্ধকারে, লেটার বক্সে ফেলবে, দরজার পাল্লার জোড়ের ফাঁক দিয়ে কি তলা দিয়ে গলিয়ে দেবে, খোলা জানলা দিয়ে ফেলে দেবে।

"আমি শ্রীকৃষ্ণের একটা ছবি নেব। আজ নয়, একটা কাজ আছে সেটা শেষ করার পর। কাছেই একটা ছাপার প্রেস রয়েছে, আছে না?"

"একটা কেন, অনেক রয়েছে। কী ছাপাবেন?"

"একটা ছোট হ্যান্ডবিল।"

"দোকানের জন্য? অনেকেই এখন এ-ভাবে বিজ্ঞাপন করছে, সস্তা হয়।"

পুলিন হঠাৎ একটা অস্থিরতা বোধ করতে শুরু করল। দোকানের সামনে দিয়ে ট্রাম, বাস,

মোটরগাড়ি, হাত-রিকশা, অটো-রিকশার চলাচল, তাদের সম্মিলিত আওয়াজ, ব্যস্ত পদচারী, এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ হবার তাড়না সে অনুভব করছে। এখন সে তার মানসিক পরিবেশটাকে ফুলের বাগান করে রাখতে চায়।

তুষারকণা ভিড়ের মধ্যে বেমানান।

"কাজ আছে ক্ষেত্রবাবু, এখন চলি। কবে আসব?"

"দিন সাতেক পরই আসুন। সন্দেশ হাতে করে আসবেন কিন্তু, বিয়েতে ফাঁকি দিয়েছেন।"

"নিশ্চয় খাওয়াব।"

খাওয়াবার জন্যই সে পকেটে টাকা নিয়ে সেদিন মৌলালির মোড়ে অপেক্ষা করেছিল ওদের সঙ্গে। ..শম্ভুর তারপব কী হল? আর তো আসেনি। যে-বকম ভয় পেয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা ও করছে। যদি ঘটত তা হলে নিশ্চয় ছুটে আসত। বলেছিল 'যা হয় আপনাকে জানাব।' আসেনি যখন বুঝতে হবে কিছু ঘটেনি।

তা হলেও একটা খবব নেওয়া দরকার। পুলিন ঠিক করল ফেরার সময় দমদমে নেমে ওদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবে। অনুর সঙ্গে সেদিন কোনও কথাই হয়নি। কিছুটা উদাসীন দেখাচ্ছিল। মনেব জোর না থাকলে ওই সময়ে, ওই পবিস্থিতিতে এত শান্ত থাকতে পারা যায় না। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, পাস কবেছে কি না সেটাও জানতে হবে।

শেয়ালদা স্টেশনে গিজগিজ ভিড়। আজ আবার কী হল? প্ল্যাটফর্মে একটাও ট্রেন নেই। পুলিন বিস্ময এবং বিরক্তি একই সঙ্গে প্রকাশ কবল—"ধ্যেৎ।"

প্রতি প্ল্যাটফর্মে শুধু মাথা। আগের দিনেব থেকেও লোক বেশি। নিরুপায অপেক্ষাব জন্য মুখগুলি বিরস। গরমে, ঘামে মুখেব চামড়া শুকনো, ছাই বঙা, চোখ বসা। তার মানে বহুক্ষণই ট্রেন বন্ধ।

"কী হযেছে ভাই, ট্রেন কি বন্ধ?"

সিগাবেটেব স্টলের পাশে দেয়াল ঘেঁযে দাঁড়ানো এক যুবককে পুলিন জিজ্ঞাসা কবল।

"কারেন্ট নেই বেলা চাবটের থেকে। টিটাগড়ের কাছে নাকি তার ছিঁড়ে গেছে।"

"এতক্ষণেও তাব জোড়া গেল না?... ট্রেন লাইন তো দুটো, তাব কি দুটো লাইনেই ছিঁড়েছে?"

"একটা দিয়েই চালাচ্ছে। এইমাত্র কৃষ্ণনগব ছেড়ে গেল।"

পুলিন প্ল্যাটফর্ম থেকে বেবিয়ে আসাব সময় শুনতে পেল লাউড স্পিকাবে বলা হচ্ছে—"অনুগ্রহ করে শুনবেন, টিটাগড ও ব্যাবাকপুবের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। একটি লাইন দিয়ে ডাউন ট্রেন চালাতে হওয়ায় ট্রেন এসে পৌঁছতে দেবি হচ্ছে। বিদ্যুৎ সংযোগেব কাজ সম্পূর্ণ হলেই ট্রেন চলাচল আবাব স্বাভাবিক হবে।"

দলে দলে মেয়ে পুরুষ ট্রেন ধবাব জন্য আসছে। এখন অফিস থেকে বাড়ি যাবার সময়। বড বেসময়ে এসে পড়লাম, ববং তখন ক্ষেত্রনাথেব দোকান থেকে সোজা প্রেসে গিযে যদি কথাবার্তা বলে নেওয়া যেত, তা হলে খানিকটা সময কাটিয়ে এখানে আসা যেত। কখন যে স্বাভাবিক হবে কেউ বলতে পারে না। এখন চুপ করে দাঁডিয়ে থাকা ছাড়া আর কী করার আছে।

পুলিন তাই করল। সে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল। টাইমটেবলের বোর্ডেব নীচে সে দাঁড়াল বাইবে যাবার গেটের দিকে মুখ করে। যারা আসছে তাদের মুখ তো দেখা যাবে...ব্যস্ত হয়ে আসতে আসতে হঠাৎ ভিড় দেখেই মুখে হতাশ প্রশ্ন ফুটে ওঠার ধবনটা।

অপেক্ষা করতে করতে, বাতাসহীন, বদ্ধ ঢাকা জায়গায় হাজার খানেক লোকের শ্বাস প্রশ্বাসের গন্ধ, অবিরাম বলা কথাব একটানা শব্দ, একই রকম অভিব্যক্তির মুখ ধীরে ধীরে তাব মস্তিষ্কের কোষগুলোকে অসাড় কবে দিতে লাগল। ক্লান্ত লাগছে তার, এখন কোনও ট্রেন এলে তাতে উঠবে কী করে? এত লোক তো ঝাঁপিয়ে পডবে।

পুলিন চোখ বন্ধ করে রইল। মাঝে মাঝে একটা রাগ মাথায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। তার ছেঁড়ে কেন? ছিঁড়েছে না চুরি হয়েছে। চোর ধরার জন্য লোক আছে, তারাও কি চোরদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে?

"অনুগ্রহ করে শুনবেন, ব্যাবাকপুর ও টিটাগড়েব মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়া বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধার হয়েছে।..."

একটা চাপা শব্দ প্ল্যাটফর্ম থেকে উপরে উঠে টিনের ছাদে ধাক্কা দিল। আশ্বস্ত হবার পর উদ্‌গ্রীব হওয়া। ট্রেন যে-দিক থেকে আসবে সব মুখ এখন সেইদিকে ফেরানো। পুলিনও মুখ ফেরাল এবং দেখল তুষারকণা দাঁড়িয়ে।

কাঁধে ব্যাগ, তার মধ্য থেকে ছাতার বাঁটটুকু বেরিয়ে, মেরুন খোলের শাড়িতে সবুজ পাড়, কপালের কাছে চুলের বিন্যাস ভেঙে রয়েছে, চোখে ক্লান্তি, আঁচল দিয়ে থুতনি মুছল।

বুকের মধ্যে থরথর করল পুলিনের। কী অদ্ভুত সব যোগাযোগ। প্রথমে সুকুমার কীসব বলে গেল... তুমি কী করছ? দিনের পর দিন দোকানে বসে... কে খাবে তোমার পয়সা? তার থেকে বরং একটা বিয়ে করো... ভালবাসা নেবার জন্য একটা লোকও তো চাই। কিন্তু ধকধকে সচল প্রাণ কি তুষারকণা।

ক্ষেত্রনাথ কেন বলল, আপনার স্ত্রী? অনেক সময় অনেক লোকের মুখ দিয়েই ভবিষ্যদ্বাণী বেরোয়। ক্ষেত্রনাথ হয়তো তেমনই একজন।

তাকে দেখতে পায়নি তুষারকণা। না দেখাই ভাল। সে শুধু ওকে দেখে যাবে, প্রাণভরে দেখে যাবে আড়াল থেকে। ওর মুখ ঘোরানো, হাত নাড়ানো, একপায়ে ভর রাখা, চোখ সরু করে তাকানো প্রতিটি ভঙ্গি সে শুষে নিয়ে জমা করে রাখবে স্মৃতিতে।

দুটো ট্রেন আসছে। ইলেকট্রনিক গন্তব্য-নির্দেশকে বনগাঁ আর নৈহাটির নাম জ্বলে উঠেছে। নৈহাটি দু' নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একটা ট্রেন ওই লাইন ধরেই ঢুকছে। নামার জন্য কামরাগুলোর দরজায় লোক দাঁড়িয়ে। ওরা নামার জন্য যে পা রাখবে সেই জায়গাটুকুও প্ল্যাটফর্মে নেই। সাত-আট সারি পুরু মানুষের লাইন প্ল্যাটফর্মের কিনারা বরাবর দাঁড়িয়ে ট্রেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ট্রেন এখনও থামেনি।

ও গেল কোথায়? পুলিন কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ ট্রেনের দিকে রেখেছিল আর তার মধ্যেই তুষারকণা হারিয়ে গেল। নিশ্চয় ভিড়ের মধ্যে ঢুকেছে। এখন ট্রেনে ওঠা অসম্ভব, এমনকী পুরুষদের পক্ষেও।

পুলিন ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে গেল দু' নম্বর প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে। প্রত্যেক কামরার দরজায় নামার লোকের সঙ্গে ওঠার লোকের ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। পুলিন ধাক্কা দিয়ে, সামনে থেকে দু' হাতে ঠেলে লোক সরিয়ে এগোতে লাগল। শুধু খোঁপা আর মুখের পাশটুকু ছাড়া আর কিছু এখন দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম কামরার দরজার সামনে জনা তিরিশ লোকের জমাট চাপ। তার মধ্যে তুষারকণার থাকা সম্ভব নয়। ভিতরের লোকেরা নামতে পারছে না, চিৎকার করছে পথ পাবার জন্য। দুটি লোক কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কামরার মধ্যে ভেসে গেল তোড়ে লোক ঢুকে পড়ায়। দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকারা চটকে পিষে যাচ্ছে। কাতর স্বরে অনুনয়, অনুরোধ, হুমকিতে ফল হচ্ছে না।

পুলিন একটু দূর দিয়ে মানুষের দলা পাকানো বেহুঁশ চাপটাকে এড়িয়ে দ্বিতীয় কামরার দরজার সামনে তুষারকণাকে খুঁজল। এখানে অবস্থাটা আরও নির্মম। কয়েকজন কামরার মধ্যে ঢুকে আর এগোতে পারছে না ভিতর থেকে পালটা ঠেলা পেয়ে। কয়েকজন কামরা থেকে নামতে পেরেছে বটে কিন্তু প্ল্যাটফর্মের লোকেদের ব্যগ্রতা আর ট্রেনে ওঠার মরিয়া ইচ্ছার দ্বারা যে সম্মিলিত বুদ্ধিভ্রংশ তৈরি হয়েছে সেটাকে আর ভেঙে বেরোতে পারছে না।

হঠাৎ একটি লোক পাগলের মতো তার দু' হাত ছুড়তে শুরু করল।

"বেরোতে দিন, বেরোতে দিন।" কোনওরকমে একটা পা তুলে লোকটি সামনে ছুড়ল। একজন "উহ্" বলেই কুঁজো হয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মতো ভিড়টা দরজার কাছে সামনের ও পিছনের ঠেলায় টলছে। কিছু লোক দরজার দিকে যাবার চেষ্টায় চেপটে রয়েছে ট্রেনের গায়ে।

পুলিন দেখতে পেল তুষারকণাকে। শুধু মাথাটুকু দেখা যাচ্ছে। দরজার সামনে পৌঁছে গেছে। কী করে পৌঁছল তাই নিয়ে অবাক হবার সময় নেই। ওর বেরিয়ে আসা উচিত নয়তো মারা পড়বে।

"তুষারকণা, তুষারকণা..."

পুলিন চিৎকার করে উঠল। বোকার মতন কেন যে চেঁচিয়ে উঠল তা সে জানে না। দাউ দাউ জ্বলন্ত

বাড়ির মধ্যে জানলায় দাঁড়ানো কাউকে দেখে তার উদ্দেশে নাম ধরে ডেকে লাভ নেই বরং ছুটে গিয়ে তাকে বার করে আনাটাই তখন একমাত্র করণীয়।

লোকটা এখনও বেরোতে পারেনি ভিড় ঠেলে। দু' হাত ছুড়ে যাচ্ছে। অ্যাটাচি ব্যাগ মাথার উপর তুলে একজন এগোতে চাইছে, তার বুকে ঘুসি লাগল, তার পাশেই তুষারকণা, পরের ঘুসিটা তার ডান কানের উপর পড়ল। কী একটা শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, মুখ বিকৃত করে সে ডান কান চেপে ধবল।

"তুষারকণা!"

পুলিন সামনে যে লোকটিকে পেল তার জামা ধরে টেনে সরিয়ে ভিতরে ঢোকার জায়গা বার করল। তুষারকণা ভিড়ের দোলায় দুলছে মাথাটা হাত দিয়ে ধরে। আর তিন-চারটি মানুষ পরেই তুষারকণা অথচ যেন তিন-চাব মাইল দূরে।

লম্বা-চওড়া এক যুবক জলে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে, একটা বীভৎস চিৎকার করে দু' হাত তুলে কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েই সামনের লোকেদের উপর দেহভার ছেড়ে দিল। ফলে কয়েকজনের অবস্থা যখন টলে গিয়ে পড়ো পড়ো, সেই সময়ই কামরা থেকে পালটা স্রোত বেরিয়ে এল প্রবল বেগে।

পুলিন দেখতে পেল তুষারকণা এবং তার সঙ্গে আরও দু'জন প্ল্যাটফর্মের মেঝেয় পড়ে গেছে।

দলবদ্ধ দিশাহারা কিছু লোক, যাদের দু' চোখে রাগ আর ক্ষোভ, মুখে গালাগাল, মানুষের চাপ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। তাদেরই কেউ মাড়িয়ে গেল তুষারকণার পায়ের পাতা। তার আর্তনাদে কেউ কান দিল না।

দুই বগল ধরে ওকে টেনে তোলার জন্য পুলিন নিচু হয়েছে, সেই সময় পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে সে তুষারকণার পিঠেব উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ল, ওকে জড়িয়ে ধরে। এরপর যা ঘটল সেটা পুলিনের কাছে অপ্রত্যাশিত।

ধাক্কাধাক্কি হুড়োহুড়িটা থমকে গেছল। পুলিন কোনওক্রমে উঠে দাঁড়াল, তুষারকণাকেও টেনে তুলল, আর তারপরই বাঁ গালে ঠাস করে চড়টা পড়ল।

"অসভ্যতার একটা সীমা আছে।"

রাগে টকটকে মুখ নিয়ে তুষারকণা তাকিয়ে। ঠোঁট কাঁপছে। চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। পুলিনেব সারা দেহ অসাড় হয়ে আসছে পর পর বিদ্যুৎতরঙ্গ শিরার মধ্যে দিয়ে বহে যাওয়ায়।

"চলুন, এগোন।"

পিছন থেকে ধাক্কা এসে সবাইকে ঠেলে দিল দরজার দিকে। বোধহীন দৃষ্টি নিয়ে পুলিন তার পাশের লোকেদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে যন্ত্রের মতো এগোল।

একটা মুখকে সে চিনতে পারছে। ত্রিদিবনগরের সেই লোকটি, যার কাছে সে চারশো টাকা পায়।

"আরে মশাই তাড়াতাড়ি করুন...চড় খেয়েছেন তো গালে, পায়ে তো নয়...পা চালান।"

"এই রকম ভিড় হলে কিছু লোকের সুবিধেই হয়।"

"ভদ্রমহিলা ঠিক ট্রিটমেন্টই করেছেন, এই রোগের এই ওষুধ।"

"বয়স তো যথেষ্টই হয়েছে।"

কামরাটা লম্বা। পুলিন উলটোদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। বনগাঁর ট্রেন ভরে গিয়ে দরজা থেকে মানুষের ডেলা বেরিয়ে এসেছে।

ও এই কামরাতেই কোথাও রয়েছে। হয়তো বসার জায়গাও পেয়েছে। তাকে কি দেখতে পাচ্ছে? দেখতে পাক বা নাই পাক চিরকালের জন্য একটা পর্দা তাদের মধ্যে টানা হয়ে গেল। দোকানের সামনে দিয়ে নিত্য যাতায়াত করবে কিন্তু সে আর দোকানের সামনে তখন বসে থাকতে পারবে না।

মুখ না ফিরিয়ে পুলিন আড়চোখে দেখার চেষ্টা করল। ছেলেটা তার দিকেই তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে কেমনভাবে হাসল। দোকানের সামনে দিয়ে ওকে যাতায়াত করতে দেখেছে।... কোথায় বাড়ি? ত্রিদিবনগর? কমলাপুরী? নাকি পিছনের কোনও পাড়ায়?... হাসল, হাসির অর্থটা কী? ...পাশের আর-একটি সমবয়সি ছেলেকে ফিসফিস করে কী যেন বলছে...কী বলছে?

শ্যামপুকুরেও ঠিক এইভাবে বাড়ির লোক, পাড়ার লোক তার দিকে তাকাত, নিজেদের মধ্যে মুখ টেপাটেপি করত।

বাগুইপাড়া, রথতলার আর কে রয়েছে এই কামরায়? এত দ্রুত হয়ে গেল, কম লোকই দেখতে পেয়েছে। সবারই চোখ তো ছিল দরজার দিকে। কিন্তু একজন, দু'জন দেখলেই তো যথেষ্ট।

কোর্ট থেকে ফিরে পাড়ার সেই লোকেরা কি বাড়ির মেয়েদের কাছে, চায়ের দোকানে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করত না? বিজিতবাবুই সারা অফিসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ছায়াকে উকিলের জেরার বিবরণ। তুষারকণার চড় মারার কথাও কেউ না কেউ রথতলায় চাউর করে দেবে।

সেই লোকটা কোথায় যে তাকে এখনও টাকা শোধ করেনি? পুলিন আবার আড়চোখে তাকাল। শ্রীময়ী টেলর্সে সলিলের কাছে মাঝে মাঝে আসে এমন একজনকে এবার সে দেখতে পেল। এও কি জেনেছে? সলিলের কাছে গল্প করবে?... কামরায় কেউ কি আর আলোচনা করছে? বোধহয় না। এই দমবন্ধ করা, গাদাগাদির মধ্যে প্রত্যেকেই ব্যাজার বিরক্ত, কাঁধের জামায় ঘাম মুছতে মুছতে রসালো বিষয়ে কথা বলা যায় না।

কিন্তু এ-রকমটা হল কেন? কী দোষ করেছি? পুলিনের মনে হল, জবাব সে কোনওদিনই খুঁজে পাবে না। শুধু পুরনো ঘা-টাকে খুঁচিয়ে দিল। জ্বালা করছে... এটা কতটা অসহনীয় হয়ে উঠবে এখন তা বোঝা যাবে না। চড়টা কত গভীরে বিঁধেছে সেটাও এখন বোঝা যাবে না। রাতের পর রাত ঘুমের জন্য যখন মাথা ঠুকবে, ছবির মতো চোখের উপর তুষারকণার ঘৃণা ভরা মুখটা ভেসে উঠবে, তখনই সে বুঝতে পারবে।

ওই রকম অবস্থায় অন্য কেউ যা করত সে-ও তাই করেছে... তুলে ধরার চেষ্টা, নইলে ওকে মাড়িয়ে আরও পাঁচ-সাতজন চলে যেত। কিন্তু এ-কথা কে বিশ্বাস করবে? মেয়েরা কি অকারণে চড় মারে? তার মনের অতলে যে বাসনা সেটা কি ভেসে উঠেছিল?

তার উপব কোনও কারণে কি বিরূপ হয়েছিল? তাকে প্রথম থেকেই কি অপছন্দ করেছে?. . বিরক্ত ছিল তাব সম্পর্কে?

কী করলাম, কখন করলাম, কীভাবে করলাম? বিশ্বাস কবা যাচ্ছে না... চড়টা কি সত্যিই মেরেছে! কাউকে কি জিজ্ঞাসা করবে?

কথাবার্তায়, আচরণে কোনও বকম আপত্তিকর কিছু? কোনও রকম নোংরামি? তাকানোর মধ্যে কোনও অশালীন ইঙ্গিত?

দুষ্ট চরিত্রের লোক ভেবেই চড়টা মেবেছে কিন্তু তার মধ্যে দুষ্টুমিব কী পেয়েছে? শুনেছে কি কিছু তার সম্পর্কে? এত বছব বথতলায় রয়েছে, তার সম্পর্কে একটি খারাপ কথাও, কি চরিত্র কি ব্যবসা, কোনও বিষয়েই আজ পর্যন্ত কেউ একটা কথাও বলেনি, আড়ালেও নয়। এখন কি তাকে প্রমাণ দিতে হবে তার খারাপ কোনও মতলব ছিল না।

তবে কি শিবানীর খুনের ব্যাপারে, ছায়ার ব্যাপারে কিছু জেনেছে? কী করে জানবে? ...কিন্তু সে নিজেই বা কী করে জানল ওর স্বামী ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করে এখন জেল খাটছে?

এইভাবেই হয়তো তার বিষয়ে জেনেছে আর একটা বাজে ধারণা গড়ে নিয়েছে। কিন্তু কেন নেবে? মানুষ অনেক কাজই এক সময়ে করে ফেলে, একটা কাজ করে ফেলে সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে আর-একটা ভুল করে বসে। ছায়া তার দ্বিতীয় ভুল। হয়তো এটা হত না যদি না তাদের সংসারে ও কাজ করতে আসত। কিন্তু এসে গেল...সহজেই পাওয়া ছায়া তার জীবনে না এলে শিবানী বেঁচে থাকত। ...সত্যিই কি বেঁচে থাকত!

কিন্তু দশ বছরে মানুষ তো বদলায়। পরিণত হয়। দশ বছর ধরে সে প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে, নিজেকে যাবতীয় সুখ থেকে দূরে রেখে কঠিন পরিশ্রম করে গেছে, নির্জনে, নিঃসঙ্গ। এর কি কোনও মূল্য নেই? এইভাবেই কি তাকে দণ্ড পেতে হবে,.. এত লোকের সামনে... আবার বদনাম, ব্যঙ্গবিদ্রূপের শিকার... আবার আর একটা দশ বছর।

পুলিনের চোখের উপর বাষ্পের আস্তরণ পড়ছে। কাছের মুখগুলোকে সে ঝাপসা দেখতে শুরু করল। একটা অভিমান তার গলার কাছে উঠে এসে নিশ্বাস চেপে ধরছে। মাথার মধ্যে গরম ভাপ।

শুকনো পাতায় আগুন লাগলে যেমন পড় পড় শব্দ হয়, তেমন একটা শব্দ ক্রমাগত সে শুনতে পাচ্ছে, শিখাটা পরে দেখতে পাবে।

"ভাই আপনি কি দমদমে নামবেন?"

পুলিন পিছনে তাকাল। শান্ত বিনীত স্বর। এক প্রৌঢ় তার মুখে তাকিয়ে।

"না।"

"আমি নামব, একটু জায়গা..."

পুলিন কুঁকড়ে, পাশে হেলে গিয়ে এগোবার জন্য যতটা সম্ভব একটা ফাঁক তৈরি করে দিল। লোকটি ঠেলেঠুলে তাকে অতিক্রম করে এগোল।

ওর পিছনে পুলিনও এগোল দমদম স্টেশনে নামার জন্য। কেন যে এখানে নামার সিদ্ধান্ত নিল তা সে জানে না। হয়তো লোকটির মিষ্টি স্বরে সান্ত্বনা ছিল।

দশ

শম্ভু আর খবর দেয়নি।

ওভারব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পুলিন ওর বাড়ির নম্বরটা মনে করার চেষ্টা করল। পূর্ব দিকে গিয়ে খাল, তার আগে মন্দির, উলটো দিকে একটা নার্সিং হোম, তারও আগে স্টেশনের দিকে, দ্বিতীয় গলিটা, কিন্তু বাড়ির নম্বরটা...।

দমদম রোড ধরে মিনিট ছয়-সাত হেঁটে সে গলির মুখে পৌঁছল। স্টেশনারি, হার্ডওয়ার, সিগারেট, ইলেকট্রনিক্স, মিষ্টি—দোকানগুলোর কোনও একটায় শম্ভুর নাম বললে কি বাড়ির হদিশ পাওয়া যাবে না?

"আচ্ছা এখানে শম্ভুনাথ সাহার বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?"

খদ্দেরের সামনে দু' রকমের শ্যাম্পুর শিশি রেখে লোকটি তফাত বোঝাচ্ছে। প্রশ্নটা কানে নিল না।

"এখানে শম্ভুনাথ...।"

"জানি না।"

পুলিন সিগারেটের দোকানটা বাদ দিল। শম্ভু সিগারেট খায় না। মিষ্টির দোকানেও খদ্দের। সে অপেক্ষা করল।

"আচ্ছা শম্ভুনাথ সাহা নামে একজন এই পাড়ায় থাকে, তার বাড়িটা বলতে পারেন?"

কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দোকানি মাথা নাড়ল, "বলতে পারব না।"

হার্ডওয়্যার দোকানের মালিক হিসাব কষায় ব্যস্ত। পুলিনের প্রশ্নে মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে দিল।

বিব্রত হয়ে সে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এবার কী করবে? এখানে কেউ বলতে পারবে না। শেষ উপায় গলির ভিতর ঢুকে কোনও বাড়ির লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়।

গলিটা কোথাও সরু, কোথাও চওড়া। পাশাপাশি দুটো রিকশা যেতে পারে। পুরনো কিছু বাড়ি থেকে বোঝা যায় অঞ্চলটা নতুন নয়। চারতলা নতুন বাড়ি তারপর টালির চালের একতলা বাড়ি। গলিটা প্রথম বাঁক নিয়েছে একটা মুদির দোকানের পাশ দিয়ে।

"ভাই এখানে শম্ভুনাথ সাহা বলে কেউ থাকে?"

"শম্ভুনাথ?... কী করেন?"

"মোজাইক টালি, লোহার গ্রিল, জানালা এইসবের দালালি করে।"

"আপনি কি তার আত্মীয়?"

পুলিন পাশে তাকাল। লুঙ্গি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, হাতে থলি, কাঁচাপাকা চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা, লোকটির গলার স্বরে সতর্ক কৌতূহল।

"আজ্ঞে না, ব্যবসাসূত্রে পরিচয়।"

"কতদিনের পরিচয়?... কিছু মনে করবেন না জিজ্ঞাসা করলাম বলে।"

"বছর পাঁচেক।"

"তিনি শয্যাশায়ী এখন। যান গেলেই দেখতে পাবেন। আর একটু এগিয়ে, থার্ড লাইটপোস্টের পরই, দরজায় সিঁড়ি আছে দু'ধাপ... দেয়ালে দেখবেন হাতে লেখা দু'-তিনটে পোস্টার সেটা পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

পুলিন পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্তম্ভিত হল। শম্ভু শয্যাশায়ী। তা হলে যে ভয়টা করেছিল তাই ঘটেছে। নিশ্চয় শঙ্করের বাড়ির লোকেরা গুণ্ডা দিয়ে কিছু করেছে।

পুলিন লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচ করার চেষ্টা করল। আরও কিছু বলতে গিয়েও যেন বলতে চায় না। থাক, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই।

থার্ড লাইট পোস্ট। পুলিন রাস্তা থেকে ওঠা দু'ধাপ সিঁড়ি দেখতে পেল। একতলা বাড়ি। রাস্তার দিকে দুটো জানলা। বন্ধ রয়েছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে প্রথমেই দরজার পাশে দেওয়ালে সাঁটা কাগজে তার চোখ পড়ল। মোটা আঁচড়ে লাল কালিতে লেখা: "এই বাড়ির মেয়ে অনুরাধা সাহা বেশ্যা। তার পেটে জারজ সন্তান রয়েছে।" তার লাগোয়া আর একটি: "পাড়া থেকে এদের তাড়ান। পাড়ার দুর্নাম হতে দেবেন না।"

এ-সব কী? এইভাবে কি পিছনে লাগা সম্ভব যদি না জানোয়ার হয়! পুলিন লেখা দুটো আবার পড়তে গিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। তার লজ্জা করছে।

দরজার কড়া নাড়ল। তার শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছে, গরম হয়ে উঠেছে। তারই যদি লজ্জা করে তা হলে অনুর কী হচ্ছে, শম্ভুর কী হচ্ছে! কাগজ দুটো ছিঁড়ে ফেলে দেয়নি কেন, সেটাই আগে জানতে হবে। এইভাবে কি ওরা বাধ্য করবে পাড়া ছাড়তে!

"কে?... কে কড়া নাড়ে?"

নারীকণ্ঠ। যেন ভয়, দ্বিধা, অনিচ্ছা থেকে জানতে চাইছে দরজার ওধারে কে?

"আমার নাম পুলিন, বাগুইপাড়া থেকে আসছি।"

পায়ের শব্দ সরে গেল এবং ফিরে এল। মাঝের সময়টুকুতে পুলিন দু'ধারে তাকিয়ে দেখল। স্বাভাবিক। এই সময় রাস্তা যেমন থাকে তেমনই, যেমনভাবে বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, টিভিতে শব্দ হয়, লোকজন হাঁটে, রিকশা চলে...

"আমি শম্ভুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনি ওর মা হন?"

"হ্যাঁ।"

পুলিন প্রণাম করল, শীর্ণ, ছোট চেহারা, মধ্যবয়সি। তার মুখের থেকে চোখ সরিয়ে উনি সামনের বাড়ির জানলা, বারান্দার উপর দিয়ে বুলিয়ে আনলেন।

"ভিতরে আসুন।"

দরজার পাল্লা দুটো একটু দ্রুতই বন্ধ করে দিলেন।

তা হলে ওরা যা চাইছে সেটা শুরু হয়ে গেছে। পুলিন দমে গেল। গালে চড় খাওয়ার থেকে এটা আলাদা ধরনের অপমান, লজ্জা। এটা তো সত্যিই অনুর পেটে বাচ্চা রয়েছে।

"শম্ভু ভিতরের ঘরে, আসুন।"

দালানের মতো জায়গাটার এক ধারে ভিতরের ঘরের দরজা। ভিতর থেকে শম্ভুর গলা ভেসে এল, "কে পুলিনদা নাকি, এসো।"

দরজা থেকে শম্ভুকে দেখেই সে ঘরে পা রাখতে ইতস্তত করল। পিঠে তিন-চারটি বালিশে ঠেস দিয়ে খাটে পা ছড়িয়ে বসে। বাঁ কাঁধ থেকে প্লাস্টার কনুইয়ের নীচে পর্যন্ত, বাঁ উরু থেকে প্লাস্টার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত। পায়জামার বাঁ দিকটা গুটিয়ে তোলা।

"কবে হল শম্ভু?"

পুলিন পাঁচ হাত দূর থেকে ফিসফিস করে বলল। কাছে যেতে তার ভয় করছে।

"এসো, খাটেই বসো... সেদিনই হল। স্টেশন থেকে হেঁটেই আসছিলাম আমরা, এই বাড়ির সামনেই..."

পুলিন খাটের কিনারে বসল। একদৃষ্টে শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে চেষ্টা করল তার প্রতি কোনও অভিযোগ ওর চোখে ফুটে উঠেছে কি না।

'তোমার বাড়িতে গিয়ে আজ রাতটা থাকব, অনুর জন্য।' এটাই ছিল ওর সেদিনের শেষ কথা। বোধহয় নয়। ওর শেষ কথা, জানলার ধারে দৌড়তে দৌড়তে 'কী বললেন?... কী বললেন?'

সেদিন একটা সময়ে সে বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল, রাতে থাকতে চায় কিন্তু আমার কাছে কেন, এইসব ঝামেলায় আমি কেন জড়াব?

তখন পর্যন্ত তুষারকণার চড়টা গালে পড়েনি।

"রাস্তার আলোটা নেভানো ছিল। মিনিট দুই-তিনেব মধ্যেই ব্যাপারটা হয়ে গেছে।"

শান্ত ধীর স্বর। পাখা ঘুরলেও শম্ভুর কপালে বিনবিনে ঘাম। ওর মা একধারে দাঁড়িয়ে।

"শম্ভু চেঁচিয়ে ডেকেছিল আশপাশের বাড়ির লোকেদের, খুন করছে .. বাঁচান, বাঁচান, কিন্তু একজনও বেরিয়ে আসেনি। অথচ কত বছবের আলাপ সবার সঙ্গে।"

অনুযোগ নয়, আক্ষেপ আর দুঃখ নিয়ে বলা মৃদু স্বরটা পুলিনের চেতনার উপর আলতোভাবে ছড়িয়ে গেল।

"কেউ বেরিয়ে আসবে না।" পুলিন ফিসফস করে বলল। "সবারই তো প্রাণ আছে।" হাত রাখল শম্ভুব হাতের প্লাস্টারের উপর।

"আমিও মাকে তাই বলেছি।... ঝামেলার মধ্যে কে পডতে চায়!"

পুলিনের বুকের মধ্যে একটা ধস নামল। 'ঝামেলার মধ্যে' বলল কেন? বাংলা ভাষায় আব কোনও শব্দ কি নেই?

"প্রাণের দাম সব কিছুর থেকেই বেশি। চেঁচিয়ে ছিলাম ইনস্টিংক্টবশে। বুদ্ধিশুদ্ধি তখন তো ঠিকমতো কাজ করে না.. অন্ধকাবে চার-পাঁচজন যদি হঠাৎ ঘিরে ধরে, ভয় তো করবেই। .. ওদেব মূল টার্গেট ছিল কিন্তু অনু। প্রথমেই ওব তলপেটে ঘুসি মারে, আমি তখন ওকে জডিয়ে ধবি। দু'জনেই বাস্তায় পড়ে যাই। ... কী যে তখন মা কালীর আশীর্বাদে মাথায় খেলে গেল, অনুকে দু'হাতে দু'পায়ে জডিয়ে ঢেকে নিয়ে বুকেব ওপব শুয়ে পড়লাম... পেটের ওটাকে তো বাঁচাতে হবে! সাকসেসফুল হতে পারেনি।"

জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ। সাফল্যেব আনন্দ ঝিলিক দিচ্ছে। পুলিন আঁকড়ে ধরল প্লাস্টার, তাবপর সংশোধন করে চেপে ধবল কবজিটা।"

"অনু কোথায?"

"টিউশানিতে গেছে।"

"পরীক্ষার ফল?"

"এগারো নম্বরেব জন্য ফার্স্ট ডিভিশন হল না।"

"আমি তো এতটাও আশা করিনি।"

"ওর শরীরেব কোনও ক্ষতি তো হয়নি?"

"আমিও সেই ভয় কবেছিলাম, যদি মিসক্যারেজ হয়ে যায় ওদের তো এটাই উদ্দেশ্য ছিল। কী যে লাক, কিছু হয়নি।"

"ডাক্তার দেখিয়েছে?"

"না। আমার তো এই অবস্থা, কে ওকে নিয়ে যাবে .. নিজেই যেতে চায় না, বলে ঠিক আছি মিছিমিছি কেন ডাক্তারকে পয়সা দেওয়া। কিন্তু একবাব ওকে পবীক্ষা করানো দরকার।"

"তোর চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে?"

"আমার আর চিকিৎসা কী? এইভাবেই দেড়-দু' মাস পড়ে থাকতে হবে। তবে পাড়ার লোকেরা তখন হেল্প করেছিল। এখানে এক ভদ্রলোকের গাড়ি আছে, তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। ...হাঁটু আর কনুই ভেঙে দিয়েছে।"

"ওই ভদ্রলোক তখন মোটরে ফিরছিলেন, গাড়ির আলো পড়তেই ওরা আমাদের বাড়ির পিছনের পোড়ো জমি দিয়ে পাঁচিল টপকে পালায়।" শম্ভুর মা বললেন সম্ভবত এটাই বোঝাতে, নিছকই দৈববশে ওবা রক্ষা পেয়েছে মোটরটা এসে পড়ায়।

"পুলিশে গেছলি?"

"আমি আর যাব কী করে। ...অনু গেছল থানায়। কোনও সাক্ষী নেই, কাউকে চিনিও না, যা অন্ধকার ছিল তাতে চেনা মুখও চিনতে পারতাম না। ওরা কেউ সারাক্ষণ একটা কথাও বলেনি, নিঃশব্দে কাজ করেছে। থানা থেকে এনকোয়ারিতে এসেছিল, আমাকেও জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করল, যা বলার বললাম। কারা এটা করিয়েছে, কী জন্য করিয়েছে তা তো আমি জানি। কিন্তু প্রমাণ কই? প্রমাণ ছাড়া আইন এক পা'ও নড়বে না।"

"দুটো গুণ্ডা থ্রেট করেছিল রাস্তায় সেটা বলেছিলি?"

"হ্যাঁ। লিখে নিল। ওই পর্যন্তই। এর বেশি আর কিছু ওদের দিয়ে করাতে হলে টাকা খরচ করতে হবে। আমার পক্ষে তা সাধ্যের বাইরে।"

শম্ভু হাসল। হাসিটার মধ্যে হতাশ, ভীত মানুষের কোনও চিহ্ন দেখতে না পেয়ে পুলিন অবাক বোধ করল। এই শম্ভুই বলেছিল, 'সবাইকে খুন করে, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই।'

"তোর তো এখন রোজগারপাতি বন্ধ থাকবে, হাতে টাকা আছে?"

"না। কিছু ধার দিতে পারো, শ' পাঁচেক?"

"আশি টাকা মতো এখন কাছে রয়েছে, বাকিটা দিয়ে যাব। ...এরপরে আর কিছু হয়েছে কি, ভয়-টয় দেখানো বা মারধোরের চেষ্টা?"

পুলিন পকেট থেকে কয়েকটা নোট বার করে গুনে শম্ভুর হাতে দিল। মুঠোয় ধরে রইল সে।

"না ও-সব আর হয়নি। অনু রোজই তো বেরোচ্ছে, দুটো বাচ্চাকে পড়াতে যায় নাগেরবাজারে। তবে নতুন যা হয়েছে, ঢোকবার সময় চোখে পড়েনি?"

পুলিন অস্বস্তিতে নড়ে বসল। প্রত্যেকটা শব্দ, অক্ষর থেকে এত নিচু পর্যায়ে মানুষের নেমে যাওয়ার সাক্ষ্য সে কখনও দেখেনি।

"মাসিমা একটু চা খাব।"

শম্ভুর মা কে সরিয়ে দিয়ে, পুলিন ঝুঁকে বলল, "এইসব পড়ার পর লোকজন কী ভাবছে বল তো?"

"আমি কী করে তা জানব! লোকেদের ভাবনা নিয়ে আমার কিছু করার নেই। লোক এখন আমার কাছে পোক।"

"ছিঁড়ে ফেলে দিসনি কেন?"

"না।"

পুলিন সিধে হয়ে বসল। ঠান্ডা নরমস্বরের একফোঁটা শব্দটা বাজ পড়ার মতো তার বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে। অস্ফুটে সে বলল, "কেন?"

"সবাই দেখুক। পাড়ার লোক দেখুক, রাস্তা দিয়ে যত লোক যাতায়াত করে দেখুক... আমাদের ঘাড় ধরে নুইয়ে দেবে ভেবেছে কিন্তু জিততে দেব না।

অপ্রত্যাশিতভাবে শম্ভু বদলে গেল। কণ্ঠস্বরের মতোই ওর গোটা শরীর কাঁপছে। শীর্ণ মুখ, অবিন্যস্ত চুল, কয়েকদিনের না কামানো দাড়িতে ওকে উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে।

"আমরা আমাদের মতো করে লড়ব পুলিনদা, আমি আর অনু। সামনের বাড়ির লোকেরা পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছিল, অনু নিজের হাতে লিখে আবার দেওয়ালে মেরেছে। তুমি যা দেখলে তা অনুর হাতের তৈরি। যতবার ছিঁড়বে ততবার ও লিখে সাঁটবে।"

"ভাইবোনে কি পাগল হয়ে গেলি!"

"হয়েছি। হতে বাধ্য হয়েছি। সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে অনেক আগেই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে অনুর অ্যাবোর্শন করিয়ে ফেলতাম, এইসব লাঞ্ছনা অপমান সইতে হত না। কিন্তু কেন করবে? কেন বিয়ে হবে না? পাড়ায় অনেকে এখন চোখের সামনে এই পোস্টার সহ্য করতে পারছে না। তাদের রুচিতে বাধছে, হয়তো বিবেকেও বাধছে কিন্তু যখন চেঁচিয়ে ছিলাম সাহায্য চেয়ে তখন কিন্তু একজনও ছুটে আসেনি। পুলিনদা মেরুদণ্ডহীনদের কাছে লজ্জা পাবার কিছু আছে নাকি।"

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ এল।

"কে?"

খিল তোলার এবং লাগানোর শব্দ হল।

"অনু এই দেখ পুলিনদা এসেছে।"

হাসল অনু। স্বচ্ছ স্বাভাবিক হাসি। ওর কত মাস যেন চলছে? রাত্রে বাড়ি ফিরল একা, এই গলি দিয়েই হেঁটে এল। এটা কোন পর্যায়ের সাহস? এত কম বয়সে প্রাণের ভয় থেকে বঞ্চিত হতে পারে দেশের জন্য যুদ্ধ করার সময় কিংবা প্রাণের থেকেও প্রিয়, এমন কাউকে রক্ষা করতে গিয়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য হুঁশ নষ্ট না হলে এই সাহস পাওয়া যায় না।

অনুর বা তার দাদার যুদ্ধ কার জন্য, কীসের জন্য? কতদিন এই যুদ্ধ চালাতে পারবে? পুলিনের কাছেও পরিস্থিতি এসেছিল। সে শ্যামপুকুরের বাড়িতে থেকে, অফিসে চাকরি করতে করতে যুদ্ধ করতে পারত। তা না-করে পালিয়ে গেল। বাগুইপাড়ায়। পালানো বলবে না সরে যাওয়া?

আবার পরিস্থিতি এসেছে। একটা চড় তার চরিত্রের উপর নোংরা আঁচড় টেনে দিয়ে গেল আজই। এখানকার কেউ না কেউ তো তখন ওখানে ছিলই। ঘটনাটা চাউর হবে, নানান রসালো গল্প এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যাপারটা ফাঁপিয়ে বিকৃত করা হবে।

কিন্তু সে নিজে তো জানে, কোনও বাজে মতলব নিয়ে তুষারকণার গায়ে হাত দেয়নি।

"পুলিনদা তুমি যে দেখছি ভাবনায় পড়ে গেলে, আরে অত ভাববার কী আছে! আমরা ঠিক মাথা উঁচু করেই এখানে থাকব। ... চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

"আমি অন্য কথা ভাবছি শম্ভু। সেদিন ট্রেনে ওঠার আগে তুই আমার বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলি। আমি কথাটা কানে তুলিনি। যদি কথাটা রাখতাম তা হলে তোর এই দশা হত না।"

"ওহ্‌হ্ এই নিয়ে তুমি ভাবছ? কে বলল এই দশা হত না? পরের দিন হত... তারপবেব দিন হত। মোট কথা হতই।"

"শম্ভু আজ এক মহিলা শেয়ালদায় ট্রেনে ওঠার সময় অত লোকের সামনে আমায় চড় মেরেছিল। তিনি রথতলাতেই থাকেন। ভিড়ে ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গেছলেন, লোকে মাড়িয়ে যাচ্ছিল আমি তাকে টেনে তুলতে গেছলাম।"

কেন যে বলে ফেলল পুলিন তাব ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। বুকটা এবার যেন হালকা লাগছে। একমাত্র এরাই তার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারবে, এমন একটা ধারণা থেকেই কি বলল? নাকি শম্ভু আর অনু তার মধ্যে আবেগকে উথলে দেওয়ায় সে স্বীকারোক্তি দিল।

"এই মহিলা আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন রোজ, এর সঙ্গে আলাপও হয়েছে। এই চড় মারার খবর রথতলা এলাকায় ছড়িয়ে পড়বেই।"

পুলিন থেমে গেল। বাকি কথাগুলো আব বলার দরকার নেই, শম্ভুর বুঝে নেওয়ার মতো বুদ্ধি আছে।

"আপনি কি নিজের কাছে পরিষ্কার?"

পুলিন ভ্রূ কুঁচকে অনুর দিকে তাকাল। হঠাৎ যে সে বড়দের কথার মধ্যে এমন ধরনের প্রশ্ন বাখবে পুলিনের ধারণায় ছিল না।

"নিশ্চয় পরিষ্কার।"

"তা হলে তো জটিলতা নেই। লোকে কী ভাবছে, লোকে কী বলছে এ-সব তো অনায়াসেই অগ্রাহ্য করতে পারেন।"

"অনায়াসেই?... কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ।"

"আমরাও।" অনু কথাটা বলে হাসতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ থেকে পুলিন বেরিয়ে এল। দেবু তার জন্য বসে থাকবে। ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া দরকার, শরীর এখনও দুর্বল। দরজা পর্যন্ত এসেছে অনু।

"এই লেখা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়াই ভাল।"

"থাক না, আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।" অল্প বয়সের অভিমান।

"তোমার একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়াই ভাল।"

"দেখাব।"

"আচ্ছা শঙ্করকে তুমি এখনও কি ভালবাস?"

"ছ' মাস আগে হলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারতাম।"

এখনই বা পারবে না কেন! জীবনের প্রথম পর্যায়েই ওর আবেগ জমে যাওয়া কি ভাল?

"আবার আসব।"

এগারো

দেবু আর অজিত কথা বলছে মধ্যবয়সি এক দম্পতির সঙ্গে। এক নজরেই বোঝা যায় পয়সাওয়ালা। অজিত মিস্ত্রি, সে যখন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হবে কিছু একটা তৈরি করানোর ব্যাপার। পুলিনকে দেখে ওরা মুখ ফিরিয়ে শুধু তাকাল।

"এখনও বাড়ি যাসনি?"

"যাচ্ছিলাম, এঁরা এসে পড়লেন, তাই... কয়েকটা চেয়ার করাবেন, ফ্যান্সি ধরনের।"

দম্পতির দিকে স্মিত হেসে পুলিন ভিতরে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো জোর আর নেই, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুমিয়ে পড়ে তবে তার আগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেবু চাবি রেখে যাবার সময় যা বলে গেল সেটা শুনতে পেয়েছিল। সুকুমার কার একটা ছবি দেখাতে এনেছিল আর কাশীনাথ বলে গেছে আবার কাল আসবে। আর কাশীনাথ এসেছিল, সঙ্গে ছিল একটা মেয়ে।

শেষ রাতে কিছুক্ষণের জন্য পুলিনের ঘুম ভেঙে যায়। চিত হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে সে গত কয়েকদিনের নানান ঘটনা, কথাবার্তা নিয়ে একটা নকশা বুনতে চেষ্টা করল। এত রকমের ঘটনার মধ্য থেকে কিন্তু একটা জিনিসই বারবার ভেসে উঠতে লাগল, খাটের চারকোণে গোছা করে বাঁধা রজনীগন্ধার স্টিক, ছড়ানো শ্বেতপদ্মের পাপড়ি, চন্দনের ফোঁটা, আলতা মাখানো পায়ের চেটো।

অন্ধকার ঘরে পুলিন হঠাৎ মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল, ভাবুকের মতো কোনও হেঁয়ালি ভরা ধারণা নয়। নিছকই বাস্তব হিসাবেই সে মৃত্যুকে দেখল।

মরতে একদিন হবেই। কোনও মৃতকে দেখলে বা মৃত্যুর কথা শুনলে মনের মধ্যে কথাটা একবার দপ করে ওঠে। তখন সে শুধু একটা জিনিসই কামনা করে, শেষ অসুখটা যতটা সম্ভব অল্পস্থায়ী যেন হয়। একা মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিনের রোগশয্যার মতো কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না।

শম্ভুর খুব অসুবিধা হবে না। ও নিঃসঙ্গ নয়। ওকে সঙ্গ দেবার মতো উত্তেজনা জানলা খুললেই পাবে। আমার ঘরের বাইরে কী আছে?... আলমারিটা!

সকালে তাকে ঘুম থেকে তুলল গদাই।

"একটা মেয়েলোক তোমাকে কী বলতে এসেছে, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে পুলিন দোকানে ঢুকে দেখল রাস্তায় একটি মেয়ে বাড়ির ঝি বলেই তার মনে হল।

"দিদি এটা আপনাকে দিতে বলল।"

ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ। পুলিন খুলল। কোনও সম্বোধন নেই—"আলমারিটা দয়া করে ফেরত পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব। যত শীঘ্র সম্ভব। তুষারকণা মুখার্জি।"

পুলিন অবাক হল না। রাগ, দুঃখ বা অনুতাপ কিছুই বোধ করল না। এমন একটা চিরকুট যে পাবে যেন ধরেই নিয়েছে। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবেনি।

"তোমার দিদিকে বোলো, আজই পাঠিয়ে দেব।"

মেয়েটি চলে যাবার পর সে গদাইকে বলল শ্যামসুন্দরকে খবর দেবার জন্য। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সে চা খেল দরজার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে। রাস্তা দিয়ে যেই হেঁটে যাক তাকে চোখে পড়বেই।

এক সময় তুষারকণাও তার সামনে দিয়ে স্টেশনে গেল। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে পুলিন কাগজের দিকে মাথা নামিয়ে রেখেছিল। তখন হাতটা একবার কেঁপে ওঠে, শ্বাস বন্ধ রাখে এবং

কোনওরকম চেষ্টা ছাড়াই শম্ভু আর অনুকে তার মনে পড়ে। তুষারকণা হেঁটে চলে যায়। হয়তো তার দিকে একবার তাকিয়েছিল। সে কি আশা করেছিল ও কাছে এসে কিছু বলবে?

শেষ। তার জীবনে তুষারকণা এখন থেকে শুধুই আর দশটা স্ত্রীলোকেরই একজন। এ-জন্য সে কোনওরকম বেদনা বোধ করছে না। একটা অসাড় অবস্থার মধ্যে তার মানসিক ক্রিয়া ডুবে রয়েছে।

সারাদিন সে যান্ত্রিকভাবে কাটাল। দোকানে নানান লোকের সঙ্গে কথা, খাওয়া, বিশ্রাম, আলমারিটা পাঠানো, স্বাভাবিকভাবেই করে গেল।

সন্ধ্যায় সুকুমার ব্যস্ত ভঙ্গিতে এল। তখন দেবু ছিল না।

"কাল এসেছিলাম... পিসিমাকে বলেছি। শুনে তো তখুনি আসতে চাইল। বারণ করলাম, আগে বুলির ছবি দেখাই, তারপর। জ্বরে পড়েছে বুলি তাই ছবি তুললাম না, সেরে উঠুক।... দু'-চার দিন দেরি হলে কিছু মনে করবে না তো?"

পুলিন মাথা হেলাল। না কিছু মনে করবে না। তাব মজা লাগল না, হাসিও পেল না। সুকুমার ধবেই নিয়েছে বিয়ে করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পডেছে। কিন্তু সে ব্যস্ত শুধু একটি ব্যাপার জানার জন্য, কবে রথতলায় ফিসফিস শুরু হবে।

ঘবে এসে শুয়ে পড়েছিল। গদাইকে বলে বেখেছে, কেউ এলে ডেকে দিতে। একসময়ে সে এসে ডাকল, "কাশীনাথদা এসেছে।"

"বল মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে।"

গদাই ফিবে এল সঙ্গে কাশীনাথ। দরজার কাছ থেকে লাজুক স্বরে বলল, "আপনাকে দেখাব বলে ওকে সঙ্গে কবে এনেছি। আটটা পর্যন্ত ওর ডিউটি ছিল তো।"

"আমি দেখে কী কবব?... আচ্ছা তুমি যাও আমি আসছি।"

পাঞ্জাবিটা গলিয়ে, চটি পরে পুলিন দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখল, একটা ড্রেসিং টেবলের সামনে ঝুঁকে একটি স্ত্রীলোক কাঠেব গায়ে হাত বোলাচ্ছে, পাশে গদাই দাঁড়িয়ে। কাশীনাথ কোথায়?

এ-দিকেব আলোগুলো নেভানো। খদ্দের এলে আলো জ্বেলে দেওয়াব কথাটা গদাই কি ভুলে গেল? কড়া আলোয রংচঙে ফার্নিচার, আয়না ঝকঝকে মনোহারী হয়ে ওঠে।

পুলিন নিঃশব্দে বোর্ডের কাছে গিয়ে পরপর দুটো সুইচ টিপল। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

ড্রেসিং টেবলের আয়নায়, হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায়, হকচকিয়ে যাওয়া মুখটার দিকে পুলিন তাকিয়ে রইল। আযনায় প্রতিবিম্বিত পুলিনের দিকে চেয়ে আছে স্ত্রীলোকটি।

রক্তমাংসের ছায়া! কী আশ্চর্য, হুবহু ম্যাগাজিনের ছবিটাই! বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু সত্যিই ও ছায়া।

পুলিন এগিয়ে যেতে ভয় পেল। শেষবার যে ছায়াকে দেখেছে.. সেই চোখ, চাহনিব সঙ্গে এব কোনও সম্পর্ক নেই।

অবাক হয়ে দেখছে। কেন? অন্য কেউ হলে তাকে এ-ভাবে একদৃষ্টে কি দেখত? গদাই কিছু বুঝতে পারেনি। কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় কেন তারা দু'জন পরস্পরের দিকে এমন চাহনি নিয়ে তাকিয়ে। কাশীনাথ কোথায়।

পুলিনের হাঁটুর পিছনটা তিরতির করল। বাঁ কানের পাশে লাল কাটা দাগটা তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। গাল গলা, চিবুকে চর্বির পরত পড়েছে। সেই চৌকো মুখ, পুরু ঠোঁট, ছড়ানো নাক।

ভূত দেখার মতো তাকিয়ে। তাই-ই হওয়া উচিত। সে নিজেও তো নিশ্চয় এইভাবেই... নিজেদেব সর্বনাশের দিকে দু'জনে কি দু'রকমভাবে তাকাবে?

"কাশীনাথ গেল কোথায় রে, দেখ তো।"

"এখুনি আসবে, পাশের রস্তায়..."

"বলছি গিয়ে দেখ..."

এত জোরে গদাই কখনও ধমক খায়নি। সে পুলিনের মুখের ভাব দেখেই ছুটে দোকান থেকে রাস্তায় নামল।

"বিশ্বাস করতে পারছি না, তুই কি... তুমিই কি ছায়া!"

"দাদা!"
"তোমায় চেনা যাচ্ছে না।"
"এখানেই...!"
"হ্যাঁ পেছনের ঘরটায় থাকি।"
"বাবু তোমাকে খুঁজছে আর তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে।"
গদাইয়ের সঙ্গে কাশীনাথ এল।
"খুব সুন্দর মেয়ে কাশীনাথ।"
মুখ নামিয়ে কাশীনাথ একবার মাথা চুলকোল। ছায়া নির্নিমেষে তাকে দেখে যাচ্ছে। নিশ্চয় অনেকদিনের অনেক কথার বাঁধ ভেঙে পড়ছে। স্মৃতির বন্যায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। দশ বছর পর তাদের দেখা হল। ...আরও সাত মাস কম, রায় বেরোবার দিন শেষ তারা পরস্পরকে দেখেছে।
কাশীনাথ ইশারা করছে প্রণাম করার জন্য। ছায়ার মাথায় সেটা ঢুকছে না।
"প্রণাম করো।"
পুলিন যেন স্লো-মোশান সিনেমা দেখছে। ছায়া হাঁটু ভেঙে বসল। আঁচলটা গলায় জড়াল। ধীরে কুঁজো হয়ে মাথাটা নামাচ্ছে।... চমকে উঠল সে। কপালটা পায়ের পাতার উপর। দশ বছর পর ওর প্রথম ছোঁয়া।
পুলিন ঝুঁকে ওর মাথায় হাত রাখল। দশ বছর পর তার প্রথম স্পর্শ। কী অদ্ভুত পরিস্থিতিটা! এখন দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা তৈরি হয়ে গেল কি? স্পর্শের মধ্য দিয়ে সে কি কোনও খবর পাঠাল? তুষারকণার মতো ছায়াও ভুল ব্যাখ্যা করবে না তো!
"থাক থাক, সুখী হও... কাশীনাথ, প্রথম বার ও এল, আমার তো মিষ্টি খাওয়ানো উচিত। বোস বোস, আরে লজ্জা পাওয়ার কী আছে, চেয়ারে বোস।... গদাই দৌড়ে যা তো..."
পুলিন পকেটে হাত দিয়ে দেখল টাকা নেই। "কালাচাঁদকে আমার নাম করে বল, আটটা রাজভোগ দিতে। দাম পরে দেব।"
ওদের সামনের চেয়ারে পুলিন বসল। ছায়া মুখ নিচু করে বসে, ঘামছে। অসম্ভব জেদি, একগুঁয়ে, এখনও কি তাই আছে?
"নাম কী?"
ছায়া চুপ।
"বলো না... নাম বলো।"
ছায়া নিজে কোর্টে বলেছিল, রাগের মাথায় কাটারি দিয়ে মেরেছে, ওর বাবাও সাক্ষীতে বলেছে মেয়ে ছোটবেলা থেকেই রগচটা। পুলিনও তাই বলেছে, কাচতে কাচতে শিবানীর শাড়ি দাঁত দিয়ে ফালা করে দিতে দেখেছে, শিবানীর চটি জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে দেখেছে।
ছায়া মুখটা আরও নামিয়ে নিল। রাগ যেন থমথমিয়ে ছেয়ে আসছে সারা মুখে। পুলিন দেখেছে রেগে ওঠার আগে ঠোঁট দুটি চেপে ঘনঘন কাঁপায়।
"ছায়া।"
মুখ তুলে তার দিকে সোজা তাকিয়ে। ওর অভিমানও পুলিন দেখেছে। দশ বছরে এটাও বদলায়নি। কপালের মাঝখানে সেই ভাঁজ ভুরু পর্যন্ত নামানো।
"সুন্দর নামটা তো।... খাট দেখলে? পছন্দ হল, না বানিয়ে দেব?"
"পছন্দ একটা করেছে, চারকোণে চারটে পদ্মের কলির মতো... ওই যে।"
কাশীনাথ উঠে গেল দেয়ালে হেলান দেওয়া খাটের কাছে।
"বিয়ে করেছ?"
"না।"
"এই যে, এইটে দেখুন।"
"একা থাকো?"
"হ্যাঁ।"

কাশীনাথ ফিরে এল। চেয়ারে আবার বসতেই ছায়া বলল, "আমি এবার যাব।"

বলেই উঠে দাঁড়াল। কাশীনাথ বিব্রত মুখে বলল, "বাবু মিষ্টি আনতে পাঠাল যে।"

সেই সময় গদাই পিছনের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "থালায় করে দোব তো?"

দোকানের পাশের গলি দিয়ে গদাই ঢুকেছে। সবার সামনে দিয়ে খাবার নিয়ে যেতে পুলিন একদিন বারণ করেছিল।

"তুই ভাঁড়টা এখানে নিয়ে আয়।"

"আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে... আমি যাচ্ছি।"

পুলিন জানে ওকে আটকানো যাবে না। কাশীনাথ কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। কাগজ ঢাকা ভাঁড় নিয়ে গদাই দাঁড়িয়ে। ছায়া সামনেব দরজার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

ওর এখন চলে যাওয়াই দরকার। পুলিন নিজের জন্যই এটা চাইছে। পরিবেশটা এমন হাস্যকর যে অসহনীয় হয়ে পড়ছে। তাদের দু'জনেরই এখন নির্জনতা চাই, ভাববার জন্য। দু'জনকেই অভিনয় আর ভান থেকে এখুনি বেরিয়ে নিজেদের মুখোমুখি হয়ে এই ধাক্কাটা সামলাতে হবে।

আট বছর জেলে কাটিয়ে, বিয়ে করতে যাওয়া অশিক্ষিত গ্রামের মেয়ে, কী ধরনের ভাবনা ভাবতে পারে? এখন ওর বয়স অবশ্য আর অল্প নেই। পুলিন নিজেই বা কী চিন্তাব মধ্যে এবার পড়বে? আশ্চর্য, যতটা ভয় সে দু'জনের দেখা হলে পাবে ভেবেছিল তা কিন্তু পাচ্ছে না।

"কাশীনাথ এটা বরং তুমি নিয়ে যাও। এখানে নাই বা খেলে, বাড়িতে খাওয়াও তো খাওয়া। আব একদিন ওকে এনো, কেমন। আর খাটটা আমি আলাদা সরিয়ে রাখছি। বিয়ের পর তো লাগবে।"

কাশীনাথ ভাঁড় হাতে দোকান থেকে নামল। তার পিছনে ছায়া। ওকে পৌঁছে দিয়ে কাশীনাথ ফিবে আসবে। পুলিন তাকিয়ে রয়েছে। পিছন থেকে ছায়াকে অচেনা লাগছে তার। ছাব্বিশ বছবেব শবীব থেকে মুখটা বাদ দলে কিছুই তার চেনা নয়। হাঁটার ধরনটাও বদলে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ছায়া পিছনে তাকাল। মন্মথ বস্ত্রালয়ের সাইনবোডেব আলো মুখের একধারে পড়া সত্ত্বেও পুলিন ওর চোখ দেখতে পেল না।

ছায়া আর একবার তাকাল কাশীনাথের বকবকানি শুনতে শুনতে। আপনা থেকেই পুলিনেব ডান হাতটা উঠে গেল। কেন যে উঠল, কেন যে সেটা নাড়ল, তার কোনও কাবণ তাব জানা নেই। তবে সে খুব হালকা বোধ করছে। শরীরের কিছু কিছু অংশের উপব তার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে।

রথতলার মোড় ঘুরে ওরা চলে যাবার পরও পুলিন দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাগাজিনেণ লেখাটা, এক জায়গায় আছে. জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য যেন আকুলি বিকুলি করছে লতিকার মন। আর-এক জায়গায়: মনে হল, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।

"গদাই বন্ধ করে দে।"

পুলিন শোবার ঘরে এল। আলমারি থেকে ম্যাগাজিনটা বার করে কোণ মুড়ে রাখা পাতাটা খুলল। ছায়ার ছবির দিকে তাকিয়ে সে জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার মানেটা ধরার চেষ্টা করল।

আট বছর শাস্তি পেয়েছে ছায়া। জেলে কত বকমের, কত বয়সের অপরাধী সে দেখেছে, তাদের কথাবার্তা শুনেছে আর পরিণত হয়ে উঠেছে। তার প্রতি ছায়ার ঘৃণা, শোধ নেবার ইচ্ছা হয়তো প্রথম দিকে ছিল। থাকা স্বাভাবিকই। তার এক একসময় মনে হত কোনওদিন তাদের দেখা হলে ছায়া কোমবে গোঁজা ছুরি বার করে পেটে ঢুকিয়ে দেবে কিংবা ঝাঁপিয়ে গলা টিপে ধরবে, চিৎকার করে গালাগালি দিতে থাকবে। অশ্লীল একটা নাটক দেখতে লোক জমে যাবে।

আজ সকাল থেকে কী ধকলটাই না তার মনের উপব দিয়ে দাপিয়ে গেল।

সুকুমার তার পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে আরও কয়েকবার জ্বালাতন করবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে ধমকই দিতে হবে।

ক্ষেত্রনাথ ছবি দুটোয় নিশ্চয় দিন দুয়েকের আগে হাত দেবে না। বাঁধিয়ে ফেলাব আগেই ফেরত নিয়ে আসতে হবে। তুষারকণার ছবিটা যদি বাঁধিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া যায়!... দরকার কী, ভাববে ওর সম্পর্কে এখনও দুর্বলতা রয়েছে।

শম্ভুকে কালই পাঁচশো কি হাজার টাকা দিয়ে আসতে হবে। অনেক দিনই এখন কাজে বেরোতে

পারবে না, মাসে মাসেই দিতে হবে, ও-ছাড়া রোজগেরে আর তো কেউ নেই।... অনুকে কলকাতায় কোনও বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে। পেটে ঘুসি মেরেছিল, ভিতরে কোনও গোলমাল হয়ে যেতে পারেই।

'ভাইবোন কি পাগল হয়ে গেলি!' হয়তো হয়েছে, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য নিগ্রহ বরণ করছে। ছায়াও বোধহয় বুঝতে পেরেছে পুলিনের বউ হওয়ার জন্য যে কাজটা করেছে তাতে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা যায় না।

রথতলা, এমনকী বাগুইপাড়ার বড়বাজারও, যদি তাকে নিয়ে কানাকানি করে তা হলে কি এখান থেকে সে পালিয়ে যাবে? শক্ত পাহারা থাকলে পালানো যাবে না।

পুলিনের ডান হাত নিজের বুকে উঠে এল।

'আপনি কি নিজের কাছে পরিষ্কার?'

'নিশ্চয় পরিষ্কার।'... 'কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ।' কিন্তু কখনও কখনও তো সাধারণের গণ্ডি ছাড়িয়েও...

"কীরে গদাই?"

"রাজভোগের দামটা।"

"এত রাতে দাম!... দাঁড়া।"

"বলেছি আজই দিয়ে যাচ্ছি।"

এটাও আত্মমর্যাদা!... এতটুকু ছেলের। যে পাঞ্জাবিটা পরে কলকাতায় গেছল তার পকেটে টাকা আছে। তারপর মনে পড়ল, যা ছিল সবই শম্ভুকে দিয়ে এসেছে।

"দোকানে চল, ড্রয়ারে খুচরো আছে। আট টাকা তো?"

"হ্যাঁ।"

চাবি দিয়ে ড্রয়াব খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল ভাঁজকরা একটা হলুদ কাগজ। ভাঁজ খুলল। 'কলি যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত আবির্ভাব।' কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে মেঝেয় ফেলল।

গদাইকে টাকা দিয়ে সে ঘরে এল। ম্যাগাজিনটা খাটের উপর, পাতা খোলা।

তার কি কোনও দুর্বলতা রয়েছে ছায়া সম্পর্কে?

এখনও কি ছায়াকে ঘিবে কামনা বাসনা... ওর দেহ!

'অসভ্যতার একটা সীমা আছে।'

পুলিন বাঁ গালে হাত রেখে বিস্ফারিত চোখে ছায়ার ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তীব্র ভর্ৎসনা কি ছায়ার চোখে? ও কি ভয় পাচ্ছে না? যদি ওর অতীতকে কাশীনাথ কিংবা নার্সিংহোমের মালিক জানতে পারে? জেলখাটা খুনির স্বামী কেউ হতে চাইবে... চাকরিতে কি কেউ রাখবে?

কে আব জানে ছায়ার অতীত! জানলেও তাকে প্রমাণ দিয়ে এতবড় অপরাধটার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে! একটা মেয়ের জীবন ধ্বংস করা সোজা কথা!

অনু হেসে বলেছিল, 'আমরাও।'

ছায়াব অতীত এখানকাব কেউ জানে না। দশ বছর আগে মামলার খবর বেরিয়েছিল, মাঝে মাঝে জেরার বিবরণ... কোথাও ওর ছবি বেরোয়নি। শ্যামপুকুরের পাড়ার লোকেরা ওকে দেখেছে, অফিসের দু'-তিনজন, কোর্টের লোক, ওর গ্রামের লোক... আর কে ওকে শনাক্ত করতে পারে?

কিন্তু দশ বছর পর ওকে তো আর চেনাও সম্ভব নয়। পুলিন নিজেও ওকে চিনতে পারত না যদি না ছবিটা আর লেখাটা...

হিম হয়ে এল পুলিনের বুকের মধ্যেটা। শুধু সেই জানে শুধু সেই পারে প্রমাণ সহ...।

মিনিট পনেরো পর পুলিন দালানে ঝাঁট দিয়ে ম্যাগাজিনের ছাইগুলো একধারে সরিয়ে রেখে স্নান করতে গেল।

বারো

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে পুলিন এগারোটা-দশের ট্রেন ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। কাল প্রায় মাঝ রাতে স্নান করে পাখা চালিয়ে ঘুমিয়ে মাথাটা ভার লাগছে। স্নান করার কোনও দরকারই ছিল না। সারাদিন ঘামলে সে মাথা বাদ দিয়ে গায়েই জল ঢালে। কিন্তু হঠাৎ কী যে তার মনে হল, সারা শরীর ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হবার একটা ইচ্ছা থেকেই সে হুড়হুড় করে মাথায় জল ঢেলে ফেলল। ইচ্ছেটা কি অতীতকে ধুয়ে ফেলার জন্য? জল ঢেলে যাবতীয় কালিমা সাফ করার চেষ্টা? এ-ভাবে ছায়াকে ধুয়ে নর্দমা দিয়ে বার করে দেওয়া?

পুলিন আপন মনে হাসল। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে কল্যাণী সীমান্ত লোকাল এসে দাঁড়িয়েছে। সে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল। এটা চলে গেলেই দেখতে পাবে কয়েকশো নারী ও পুরুষ সার দিয়ে মন্থর গতিতে সুশৃঙ্খলভাবে পায়ে পায়ে চলেছে। ভিড়ের কিছুটা বাঁ দিকে ওয়েটিং রুমের দিকে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে। বাকি ভিড় প্ল্যাটফর্ম প্রান্ত দিয়ে নেমে রেললাইন পার হয়ে ত্রিদিবনগর, কমলাপুরী, রথতলা অথবা আরও ভিতরে যাবার জন্য হাঁটবে বা সাইকেল রিকশায় বা বাসে উঠবে।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যেতেই পুলিন দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো নজর ফেলে, একটা অতিকায় সরীসৃপের ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার আভাস পেল। এই অজগরটা পোকামাকড় থেকে শুরু করে হরিণ, শুয়োর, সবই খায়। তুষারকণার চড় মারার খবরটা পেলেই গিলে নেবে। ছায়ার সঙ্গে তার যে ব্যাপারটা ছিল আর খুন করে ওর জেল খেটে আসার খবরটাও গিলে নেবে। অবিবাহিতা অনুব গর্ভবতী হওয়ার খবরটা গেলা হয়ে গেছে।

মাথার মধ্যে ক্রমশ একটা পাথর জমছে। ঠান্ডা লাগার জন্যই। ক'দিন পাখা বন্ধ রাখতে হবে, গবম জলে স্নান করতে হবে। নাক মুখ দিয়ে গরম জলের ভাপ টানলে সর্দিটা হয়তো আটকানো যাবে। পুলিন শূন্য চোখে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল শরীর স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যবস্থা নেবার কথা।

"এখানে দাঁড়িয়ে? কলকাতা যাচ্ছ?"

পুলিন চমকে উঠল। ঠিক তার পিছনেই ছায়া। পরনে ঘন নীল তাঁতের শাড়ি, গোলাপি ব্লাউজ, পায়ে চটি। চোখে কুণ্ঠা, যার আড়ালে উদ্বেগের একটা পর্দা। পর্দাটা সরালে হয়তো, স্মৃতি জর্জরিত এক কিশোরীকে দেখা যাবে।

তাকে ছেড়ে দেবে না। কোর্টের রায় শোনার পর ছায়া একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিল জমাট ঘৃণা নিয়ে। ধকধক করছিল চোখ। পুলিনের তখনই মনে হয়েছিল ছায়া আজীবন তাকে খুঁজে বেড়াবে। খুনের মাশুল গুনে নেবে। উকিলের জেরায় সে একবারও পুলিনকে জড়িয়ে যৌন ইঙ্গিতগুলোর ফাঁদে ধরা দেয়নি। যদি দিত তা হলে পুলিনও আসামি হয়ে যেত। সে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল। এখনও করে।

"তুমি এখানে কেন? কোথাও যাচ্ছ নাকি?" পুলিন অস্বস্তির থেকেও বেশি পেল ভয়। প্ল্যাটফর্মে লোক ভরে উঠছে। ট্রেন আসার সময় হয়ে এল। অপেক্ষমাণরা তাদের দিকে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

"রথতলা যাচ্ছিলুম। তোমাকে দেখলুম রাস্তা দিয়ে এদিক পানে আসছ। দাঁড়িয়ে পড়লুম।"

"সে তো অনেকক্ষণ, প্রায় দশ মিনিট আগে এসেছি। এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে? কোথায়?"

ছায়া মুখ নামিয়ে আবেগ চাপার চেষ্টা করল। পুলিনের মনে হল, এইবার হয়তো মোক্ষম কথাটা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। 'এখন তো বউ করতে আর কোনও বাধা নেই।'

"রথতলায় যাচ্ছিলে, কাশীনাথের কাছে?"

পুলিন দেখতে পাচ্ছে ট্রেন আসছে। আর-এক মিনিট, তারপরই সে ট্রেনে ওঠার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে।

"না।"

"তা হলে?"

"তোমার কাছে।" ছায়া চট করে পুলিনের মুখটা দেখেই চোখ নামিয়ে নিল।

"কেন? আমার কাছে কী জন্য!"

এখন প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের নড়াচড়া হচ্ছে। ওভারব্রিজ পেরিয়ে ট্রেন এসে পড়েছে। পুলিন পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটগুলো চেপে ধরে কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সামান্য ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই সে চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিল, ছায়া নিথর করুণ চাহনি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। পুলিনের আর কোনও অনিশ্চয়তা রইল না। ট্রেন ছাড়ার ঝাঁকুনিটায় টলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম দেখার চেষ্টা করল। ছায়া তাকে ছেড়ে দেবে না। ওর মুখে একটা দাবি বেরিয়ে আসছে মিনতির মুখোশ ভেদ করে।

দমদম স্টেশন থেকে সে হেঁটেই শম্ভুদের বাড়িতে পৌঁছল। বাড়ির কাছে একটা ছোট্ট গলির মুখে তিনটি ছেলে আড্ডা দিচ্ছে। পুলিন যখন কড়া নাড়ল, ওরা তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। দরজার পাশে দেওয়ালে সাঁটা পোস্টার দুটো নেই। ছিঁড়ে ফেলা নয়, সযত্নে তুলে ফেলা। একটুকরো কাগজও দেওয়ালে লেগে নেই।

"কে?"

"আমি, পুলিন...বাগুইপাড়ার পুলিন পাল।"

অনু দরজা খুলল এবং মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাকে দেখে।

"দাদা তো আপনার কাছেই আমাকে পাঠাচ্ছিল। আজ বিকেলেই যেতুম।"

"কেন?" নিশ্চয় টাকার জন্য। পুলিনের এ-ছাড়া আর কিছু মনে এল না।

"দাদার কাছে শুনবেন।"

শম্ভু পরশুর মতোই বালিশে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। দাড়িটা আজ কামিয়েছে। মুখে উদ্বেগটা কম।

"অনু চা কর পুলিনদার জন্য, আমাকেও দিস।"

"থাক, এই দুপুর বারোটায় আর চা খায় না।" শম্ভুর পায়ের পাশে খাটের উপর বসে সে বলল, "অনুকে আমার কাছে পাঠাচ্ছিলিস কেন?"

"বলছি। চা তা হলে খাবে না? আমাকেই তবে এক কাপ করে দে।"

অনু বেরিয়ে যেতেই পুলিন পকেট থেকে নোটগুলো বার করল। "কাল আর আসতে পারলাম না। এক হাজার, গুনে নে।"

"অ্যাতো! শ পাঁচেক হলেই চলে যেত।"

"শুধু সংসারের জন্যই তো নয়, তোর যা হয়েছে তাতেও চিকিৎসার জন্য লাগবে। বরং আরও দরকার হবে। ডাক্তারদের ব্যাপার তো জানিস না, এই লাগবে তাই লাগবে, এই করাতে হবে সেই করিয়ে আনো, তোকে নিংড়ে ছিবড়ে করে ছাড়বে।"

"পুলিনদা, শঙ্কর দেখা করেছিল অনুর সঙ্গে।"

"কে শঙ্কর?"

পুলিন প্রশ্নটা করেই অপ্রতিভ হল। নামটা সে মনে করে রাখতে পারেনি। বোধহয় তার কাছে নামটার কোনও গুরুত্ব নেই।

"সেই ছেলেটি যে অনুকে...।"

শম্ভু শেষ করল না বাক্যটি। তা হলে বলতে হত.. "প্রেগনান্ট করেছে।" বলতে বোধহয় লজ্জা করল।

"কেন দেখা করল?"

"দেখা ঠিক নয়, রাস্তায় ওর হাতে একটা চিঠি দিয়েই হনহন করে চলে যায়। চিঠিটা খুব ইন্টারেস্টিং।" শম্ভু বালিশের তলা থেকে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ বার করল। "পড়ে দ্যাখো।"

পুলিন ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল: অনু, আমার বাড়ির লোকেরা যে অপরাধ করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। পেটের সন্তানকে কোনওক্রমেই নষ্ট করা চলবে না। আমি গঙ্গার ওপারে সালকিয়ায় একটা স্কুটার সারাইয়ের দোকানে কাজ শেখার চেষ্টা করছি। দিনে সাত টাকা মজুরি এক টাকা টিফিন। দোকানেই রাতে শোব। এ-কথা কেউ জানে না, বন্ধুদের কাউকে বলিনি।

চুপিচুপিই এক দিন চলে যাব। ভালভাবে কাজ শিখে আমি নিজেই একদিন একটা সারাইয়ের দোকান খুলব। সে-জন্য টাকাও জমাতে হবে। হয়তো আট-দশ বছর সময় লাগবে। তাবপর তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধব। ততদিন তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে? তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কোরো, ততদিন কি তিনি বোনকে কাছে রাখবেন? শুধু তো তোমার নয়, যে-সন্তান আসছে তার খাওয়া পরাব, লেখাপড়ার ভারও তো তাকে নিতে হবে। অবশ্য তুমিও রোজগার করতে পারো। তোমার থেকে আমার যোগ্যতা অনেক কম। তোমাব মতো সাহসও আমাব নেই। নিজেকে এত ছোট মনে হয় তোমার কথা যখন ভাবি। ইচ্ছে কবছে তোমার তোমাদেব পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। কিন্তু তোমাদেব বাড়িতে যাওয়াব মুখ আমাব নেই। তোমার কিছু বলাব থাকলে শনিবার এই সময় এই জায়গায় আমি থাকব। চিঠি দিয়ে জানিযো। ইতি অনুতপ্ত, শঙ্কব।

পুলিন দ্বিতীযবার পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হাতের লেখা ভাল। বানান ভুল রয়েছে। চিঠি ভাঁজ করে শম্ভুর হাতে দিয়ে সে বলল, "ছেলেটারই লেখা কি?"

"হ্যাঁ। অনু তাই বলল, ওব হাতেব লেখা তো চেনে।"

"সালকিযা যাবার কথাটা সত্যি না মিথ্যে সেটা জানব কী কবে? নাও যেতে পাবে। ধাপ্পা দেবাব জন্য লিখেছে।"

"আমারও তাই মনে হযেছিল।"

"হয়েছিল মানে?... এখন মনে হচ্ছে না? এইসব ছেলে কুলিমজুবেব কাজ কববে বিশ্বাস কবতে হবে? খাটুনি কী বকম তা জানিস? সাত টাকা ডেইলি মজুবি মানে মাসে দু'শো টাকাব মতো, আজকের বাজাবে এতে একটা ভিখিবিরও চলবে না। এ-সব হচ্ছে হিন্দি ফিল্ম দেখাব ফল, এইসব চিন্তা, মানসিকতা ..তিন দিনেই পালিযে আসবে ছোকবা।"

পুলিন উত্তেজিত হয়ে গলাব স্বর তীব্র কবে তুলল। চা নিয়ে অনু ঢুকেছে, পিছনে তাব মা। শম্ভু তাকিয়ে অসহাযভাবে।

"তা ছাড়া বিযেব কথা লেখেনি কেন? আট দশ বছব একটা মেযে সন্তান নিযে অপেক্ষা কবে থাকবে কীসেব ভবসায়? বললেই কি অপেক্ষা কবে থাকা যায়! এটা কি মগেব মুল্লুক? যদি সিনসিযার হত তা হলে বিয়েব কথাটা আগে তুলত। আজই তো শনিবার ..." পুলিন অনুব দিকে তাকাল। "তুমি কি এই চিঠিব উত্তব কিছু দিযেছ?"

"বিকেলে দেবাব কথা অবশ্য যদি উত্তব দিই।"

"তা হলে এই পয়েন্টটা তুলে জানিয়ে দাও, আগে বিয়ে তারপব অন্য কথা। তাবপব জানা দবকাব, ও সত্যিই কাজ শেখাব জন্য সালকিয়া যাচ্ছে কি না?"

"পুলিনদা, শঙ্কর এমন একটা ব্যাপার কাল কবেছে যাতে মনে হয়েছে ও সিনসিযাব।" শম্ভু মৃদু স্বরে, গভীর চিন্তাব মধ্যে যেন ডুবে যেতে যেতে বলল।

"কাল সকাল ন'টা নাগাদ তখন রাস্তা লোকে ভরা। স্কুল কলেজ যাচ্ছে, অফিস যাচ্ছে, বাজার দোকান করে ফিবছে, সেই সময় শঙ্কর আমাদের দবজার পাশে একটা হাতে লেখা পোস্টার মারে সবার চোখেব সামনে। তাতে লেখা অনুবাধা সাহাব সন্তানেব পিতা আমি। তলায় নিজেব পুরো নাম আব ঠিকানা। ভাবতে পাবো?"

"সে কী!" পুলিন বিমূঢ় হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার সে বলল, "সে কী।"

"হ্যাঁ। আমিও প্রথমে তোমার মতো অবস্থায় পড়ি। বিশ্বাস করতে পাবিনি। দবজার কাছে একটা ঝগড়ার মতো আওয়াজ শুনে অনুকে বলি, দেখ তো। ও গিয়ে দেখে পাড়ার কয়েকটা ছেলে শঙ্কবকে বলছে পোস্টার তুলে ফেলার জন্য। শুধু ওরটাই নয, আগের দুটোও ছিঁড়ে ফেলতে হবে।"

পুলিন তাকাল অনুর মুখের দিকে। একটা ফিকে তাৎপর্যময় হাসি মেয়েটির ঠোঁট বেঁকিয়ে রেখেছে।

"অনু তুই বল পুলিনদাকে।"

"ছেলেরা তো শঙ্করকে এই মারে তো সেই মারে। এইসব নোংরা কথার পোস্টার তোব বাড়ির লোক মেরে এই পাড়াটাকে বেইজ্জত করেছে। আর এখন তুই আর-একটা পোস্টার মেরে আরও কাদা ছিটোবার ব্যবস্থা করছিস। ছেঁড় সব, নিজের হাতে ছেঁড়। আমি বলতে যাচ্ছিলাম তিনটেই থাকবে। যখন

গুণ্ডারা দাদাকে মারছিল তখন তো একটা পাড়ার লোকও তাকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসেনি আর এখন পাড়ার ইজ্জত বাঁচাবার জন্য দলবেঁধে সবাই হামলে পড়েছে। কিন্তু মুখ খোলার আগেই শঙ্কর পোস্টারগুলো নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ফেলতে শুরু করল। আমার তখন রাগে গা জ্বালা করছে, দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।"

"গা জ্বালা করল কেন?" পুলিন শান্ত গলায় জানতে চাইল। অনুকে তার এখন খুব সাধারণ মনে হচ্ছে, শম্ভুকেও।

"শঙ্কর যেন এই রকমই কিছু চাইছিল। ওগুলো ছিঁড়ে ফেলার এই সুযোগটা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।"

"ওকে প্রেশার দিচ্ছিল, যেটা আর সহ্য করতে পারছিল না।" শম্ভু বলল, "আব সে-জন্যই নিজের অপরাধ স্বীকার করে লিখেছিল, অনুর সন্তানের পিতা আমি। ছেলেটা অনেস্ট, সিনসিয়ার, তাই না?"

"প্রেশার থেকেই এই অনেস্টি, সিনসিয়ারিটি। নয়তো সেদিন রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়ার জন্য এল না কেন?" পুলিন হঠাৎ গলা চড়িয়ে ঘরের তিনজনের দিকে পরপর তাকাল। কিছু একটা ঘটছে তাব মধ্যে। টগবগিয়ে জল ফুটে ওঠার আগে বুদ্বুদের ওঠা-নামার মতো একটা রাগ মাথার মধ্যে নড়াচড়া শুরু করেছে। তাব মনে হচ্ছে সংগ্রাম নয় এরা এখন শান্তি স্থাপনার জন্য সূত্র খুঁজছে। সিনসিয়ার, অনেস্ট এইসব বলে এরা যেন তাকে বসিয়ে দিচ্ছে।

তা হলে কি সে সংগ্রাম করবে বলে ঠিক করেছিল। কার বিরুদ্ধে, কীসেব জন্য? ছায়ার আবির্ভাব বা পুনরাবির্ভাবে সে কি বিপন্ন? তাকে কি লড়তে হবার কথা ভাবতে হচ্ছে? নিজের সঙ্গে?

"নিশ্চয়ই ওকে আটকে রেখেছিল তাই সেদিন আসতে পারেনি।" এতক্ষণে শম্ভুর মা কথা বললেন।

"আমারও তাই মনে হয়েছিল।" শম্ভু বলল।

তুষারকণাব চড় মাবার খবরটা বথতলা কি বাগুইপাড়ায় এখনও রটেনি। যদি চাউর হয় তা হলে সে কী কববে? 'কী হয়েছিল বলুন তো?' বলে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করতে আসবে না। শুধু মুখের দিকে করুণাভবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এক সময চোখ সরিয়ে নেবে। কতদিন ধরে এই রকম চলবে? পুলিন আন্দাজ করাব চেষ্টা কবেছে। সাত দিন, কুড়ি দিন, এক মাস। তারপর স্টেশনেব কাছে দড়িতে টাঙানো স্কুলের কাপড়টার মতো ফিকে, ময়লা হয়ে যাবে। একদিন ছিঁড়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলতে থাকবে। শ্যামপুকুরেব লোকেদেব তাকে নিয়ে কৌতূহলটা শেষ পর্যন্ত তো ঝুলেই গেছল।

"শঙ্করের বিবেক তা হলে কামড দিয়েছে, এইটেই এখন তোমাদের মনে হচ্ছে?" পুলিন সতর্ক গলায় বলল। এবা একটা লোকালয়ে বাস কবে একটা সামাজিক ছাঁচের মধ্যে। সেটা ভেঙে দেবে বলে তার ধাবণা হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এরা সম্ভ্রম বজায় রেখে গেরস্ত হতে চায়। পুলিন বিরক্ত বোধ কবল।

"হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হয়। বিবেক আছে বলেই তো ওর ওপর ভরসা করা যায়।"

শম্ভু কৃতজ্ঞ চোখে পুলিনের দিকে তাকাল। বিবেক শব্দটা তো পুলিনই তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। শব্দটা আঁকড়ে আজীবন সে ভেসে থাকতে পারবে।

"আমি এবার চলি। খদ্দেরের বাড়ি যেতে হবে।"

"দুটি ভাত খেয়ে যাও।"

"না, দেরি হয়ে যাবে মাসিমা।"

ক্ষেত্রনাথের দোকানে বসে আছে একটা বছর পনেরোর ছেলে। মলাটছেঁড়া একটা বাংলা ম্যাগাজিন কোলে রেখে ঝুঁকে রয়েছে। পুলিনের গলা শুনে চমকে মুখ তুলল।

"ক্ষেত্রবাবু বাড়িতে খেতে গেছেন।" ছেলেটি যান্ত্রিক সুরে বলল পুলিনের জুতো থেকে চুল দেখে নিয়ে।

"কখন আসবেন? তুমি ওর কে হও?"

"ওর ছেলে। কখন আসবেন ঠিক নেই। তিনটের পর আসবেন। আপনার কী দরকার?"

"দুটো ছবি বাঁধাতে দিয়েছিলাম। কিন্তু আর বাঁধাবার দরকার নেই। ফেরত নিতে এসেছি। যদি হাত না দিয়ে থাকেন তা হলে যেন না বাঁধান। বলে দিতে পারবে?"

ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে দোকানে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে তাকাল। পুলিন তাকে অনুসরণ করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "না, এর মধ্যে আমার ছবি দুটো নেই। তুমি বোলো, পুলিন পাল এসেছিলেন। এক সময় আমি তোমাদের বাড়িতে পড়াতাম, তোমার দাদাকে। তখন তুমি জন্মাওনি।"

"একটা হলদে খামে কি ছবি দুটো ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"বাবা ওটা বাড়ি নিয়ে গেছে। মাকে দেখাচ্ছিল।"

"তা হলে তো এখনও বাঁধানো হয়নি। তুমি বলে দিয়ো যেন আর না বাঁধায়। আমি এসে নিয়ে যাব।"

ছেলেটি মাথা হেলাল। পুলিন ওর মুখে ক্ষেত্রনাথের আদল দেখতে পাচ্ছে না বরং যেন ওর দাদা, তার সেই ছাত্রটির নির্বোধ চাহনিই চোখে ভাসতে দেখল। এখনও তার মনে আছে, গ্রামার বা অঙ্কের সহজ নিয়মগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যখন সে বলত 'বুঝতে পারলে?' তখন এইভাবে তাকিয়ে মাথা নাড়ত। পুলিন সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিত, কিছুই মাথায় ঢোকেনি। সে আর বোঝাবার চেষ্টা করত না।

"আমি চলি।"

এখন সে কোথায় যাবে? পুলিন ঘড়ি দেখল। একটা পঁয়ত্রিশ। খিদে বোধ করছে না। সাড়ে ন'টায় সে চারখানা রুটি খেয়েছে। গদাইয়ের মা রুটি করত আটখানা। নিজের আর ছেলের জন্য চারখানা। রুটিগুলো আগে লুকিয়ে রাখত। পুলিনই একদিন বলে, 'কয়েকটা বেশি করে তৈরি করো, গদাইও খাবে।' এখন আর লুকিয়ে তৈরি করতে হয় না। গদাই বুদ্ধিমান সেটা ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু বহু মানুষের চোখই বিভ্রান্তিকর। ছায়ার চোখ দেখে কি সে বুঝতে পেরেছিল কত ভয়ংকর ইচ্ছা সে ঢেকে রেখেছে বোকার মতো চাহনির আড়ালে!

পুলিন কলেজ স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে শুরু করল। চওড়া রাস্তা, লোকজনের হাঁটা, ব্যস্ততা আর গাড়ির যাওয়া আসা বিশেষ করে ট্রামের। রথতলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানে বসে থাকার জন্যই এখন এইসব শব্দ, গতি, ব্যস্ততা তার কাছে প্রায় নতুনের মতো লাগছে। সে অনেকক্ষণ এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। জীবনের নড়াচড়ার সঙ্গে, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আয়ু ব্যবহার করার সঙ্গে এখন যোগ স্থাপনের জন্য তার মন ব্যাকুল হচ্ছে।

তার ব্যবসা, দোকান, কে খাবে তার টাকা? 'শ্যাল কুকুরে খাবে', এই ধরনের কথা তো হরদমই লোকে বলে! কিন্তু সত্যিই তো, সে মরে গেলে ইউনিকের কী হবে? একটা সময় ছিল যখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে দিনরাত খেটেছে। তার পুরস্কার আজকের এই একটুকরো জমিতে পাকা আশ্রয়, দু'বেলা ভাত কাপড়, দুপুরে অলস ঘুম, হাতে কিছু টাকা। নিশ্চিন্তি! তারপর কী? আরও টাকার জন্য, ইউনিককে বড় করে তোলার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া? কিন্তু কেন?

পুলিন দাঁড়িয়ে পড়ল। বইয়ের দোকানের সামনে ঝুড়িতে পেয়ারা নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে এক প্রৌঢ়। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। চুল কাঁচাপাকা। ঘন নীল লুঙ্গি, ময়লা গেঞ্জি। লোকটার চৌকো থুতনি, গাল দুটি চুপসে বসে গেছে। শীর্ণ হাতের লোমও সাদা। পুলিন চিনতে পেরেছে। ঘোলাটে চোখ দুটোর ভিতর থেকে একটা সরল লোভ উঁকি দিচ্ছে। 'ও মেয়েকে আমার আর দরকার নেই, আপনি আমাকে কিছু টাকা দিন। আমি আর আসব না।'

লোকটা কি তাকে চিনতে পেরেছে? পুলিন সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তোমার বাড়ি কি ক্যানিংয়ের দিকে খেজড়ি গ্রামে? জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সে করল না। আগে দু'-চারটে কথা বলে নেওয়া যাক।

"কত করে জোড়া?"

ঝুঁকে একটা পেয়ারা হাতে নিয়ে সে বুড়ো আঙুলের নখ বসাল। চমৎকারভাবে নখটা পেয়ারার নরম মাংসে ঢুকে গেল।

"টাকায় তিনটে, আশি পয়সা জোড়া।"

পুলিন চোখ তুলে লোকটার চোখের দিকে তাকাল। দেড় হাত ব্যবধান। মণিদুটো একটু ক'টা। চোখের কোণের চামড়া কুঁচকে কাকের পায়ের মতো। চিনতে পারেনি কিংবা হয়তো পেরেছে। চাহনি থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

"টাকায় চারটে দেবে?"

"না।"

মুখ ঘুরিয়ে পাশে তাকাল। মুখটা কঠিন করে ফেলেছে। সেই একগুঁয়ে ভাবটা, 'আপনি ওকে বিয়ে করবেন বলেছেন,' এখন ওর ঘাড়ের, গলার পেশিতে চেপে বসেছে। এটা আর বদলায়নি। পুলিন ইতস্তত করে সোজা হয়ে দাঁড়াল পেয়ারাটা হাতে নিয়েই।

"আর নখ বসাবেন না বাবু, নষ্ট হয়ে যাবে।"

পুলিনের মাথাটা ঝনাৎ করে উঠল। পেয়ারাটা ঝুড়িতে রেখে দিয়ে সে ওর মুখের দিকে তাকাল। চিনতে পারেনি। সে তা হলে কি এতটাই বদলে গেছে দশ বছরে! কিন্তু একই কথা বলল কেন? 'ওকে তো আপনিই নষ্ট করেছেন।' ওর মনের মধ্যে 'নষ্ট' শব্দটা হয়তো গেঁথে আছে। এরপর হয়তো বলবে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে এই ঝুড়িভরতি পেয়ারা নিয়ে যান।

পুলিন আচমকাই হন হন করে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার পাশ দিয়ে গতি, শব্দ প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু তাদের স্পর্শ করার ইচ্ছাটা আর নেই। একবার সে পিছন ফিরে তাকিয়ে পেয়াবাওলাটাকে দেখার চেষ্টা করেছিল। ক্ষেত্রনাথের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় সে ছেলেটিকে ম্যাগাজিন কোলে বসে থাকতে দেখেছিল। কিন্তু কিছুই তার চেতনায় ছাপ ফেলল না। দশ বছরে সে বদলে গেছে, তাকে আর চেনা যায় না! কিন্তু দেখামাত্রই ছায়া তাকে চিনে ফেলেছে।

ট্রেন থেকে বাগুইপাড়া স্টেশনে নেমে পুলিন প্ল্যাটফর্মের দু'ধারে তাকাল। কেউ তাকে লক্ষ করছে কি? বিরাট সরীসৃপটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। ওভারব্রিজে তাকিয়ে দেখে তাব মনে হল না কেউ অপেক্ষা করছে। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবল, ভিড়টা কি রথতলা পযন্ত থাকবে? থাকলেও কি কোনও সুবিধা হবে? ও তো তাকে পেয়ে গেছে।

ওভাবব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছে সে ডাউন লাইনেব দিকে তাকাল। একটা ট্রেন আসছে। লাউডস্পিকাবে স্টেশনঘর থেকে কেউ জড়ানো স্বরে বলে চলেছে, দু' নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সবে দাঁডাবেন এখনই মেলট্রেন পাশ করবে, লাইনেব ধার থেকে সরে দাঁড়াবেন।... লেভেল ক্রসিংয়ের মাস্তুলেব মতো কাঠের খিলটা ধীবে ধীবে নেমে রাস্তা আটকে দিল। মাথা নিচু কবে তার তলা দিয়ে একটা লোক গলে এল। কোনও ব্যস্ততা নেই। লাইন পার হবার আগে শুধু পাশের দিকে মুখ ফিরিযে একবার দেখল। লোকটা পেরিয়ে যাবার ছ'সাত সেকেন্ড পর ট্রেনটা ওই জায়গা দিয়ে চলে গেল। স্বস্তি ভবে, শক্ত হয়ে থাকা দুই মুঠো আলগা করে পুলিন নীচে নামতে শুরু করল।

সে কি আশা কবছিল লোকটা ট্রেনে কাটা পডবে! বহুদিন সে মেলট্রেন চলে যাওয়া দেখেছে কিন্তু মানুষ কাটা যাওয়ার দৃশ্য দেখার আশায় কখনও দাঁড়িয়ে পড়েনি। রক্তাক্ত মৃতদেহ থেকে ফিনকি দিয়ে জীবন সম্পর্কে ধারণা বেবিযে আসে যেটা রোগে ভুগে মরা দেহ থেকে পাওয়া যায় না।

ধারণাটা যে কী সেটা এখনও তার কাছে স্পষ্ট হয়নি। জীবনটা শুধু আক্রান্ত হবার একটা লক্ষ্যস্থল, বাঁচতে হলে আপস করে চলে হবে! নাকি বাঁচাব সুযোগ বার করার জন্য অন্ধকার অলিগলিতে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাওয়াই জীবন?

শিবানীব মাথাটা থেঁতলে গেছল। আঠার মতো ছ'ঘণ্টার বাসি রক্তে চুল লেপটে ছিল কপালে। 'দড়াম করে পাল্লা খুলে বেরিয়ে এলেন পুলিন বাবু। চোখমুখ উন্মাদের মতো।' 'কিছু বললেন কি তিনি?' 'হ্যাঁ। বললেন, চিৎকার করেই বললেন, খুন, খুন, ও খুন করেছে বউকে— আঙুল দিয়ে দেখালেন ওর কাজের মেয়েটাকে—- আমি করিনি। ও করেছে।'

জীবন একটা ভয়াবহ ঘটনা যাকে সর্বদা এড়িয়ে মরার ভান করে থাকাটাই বুদ্ধির কাজ!

"পুলিনবাবু যে, রাণাঘাট লোকালেই এলেন নাকি?"

চমকে উঠল পুলিন। লোকটির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সে ধীরে মাথাটা হেলাল। কোথায়, কবে এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল? আশ্চর্য, এই লোকটার থুতনিও চৌকো, মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, গাল দুটো চোপসানো, ঘোলাটে চোখ! তা হলে পেয়ারাওলাটাকেও কি সে ভুল চিনেছে? এই লোকটাও তো হুবহু ছায়ার বাবার মতোই দেখতে।

"শুনেছেন বোধহয় দাদা মারা গেছেন। পেটে ক্যানসার হয়েছিল। শ্রাদ্ধে একটা খাট দেব পুরুতকে, শ'চারেকের মধ্যে হবে কি?"

"হবে না কেন, দেড়শো টাকাতেও হবে।"

"না না অত কমে নয়। লোকজন দেখবে তো। দাদার কাছে আমরা পাঁচ ভাইবোন চিরঋণী। বিয়েথা' না করে উনি আমাদের বড় করে তুলেছেন, বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন। বাবা তো মারা যান যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। দাদার স্যাক্রিফাইস ভাবা যায় না!"

"লোককে যখন দেখাতে চান তা হলে আরও চাব-পাঁচশো দিয়ে ভাল খাটই দিন না।"

রাস্তায় বৃষ্টির জল এখনও শুকোয়নি। দধিকর্দমের মতো হয়ে থাকা জায়গাটা পা টিপে টিপে পার হয়ে পুলিন পিছনে তাকিয়ে দেখল লোকটি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। ওর পায়ে ববাবের হাওয়াই চটি। অশৌচ পালনের এই একটা চিহ্ন সারাদেহে।

"যদি নেন তা হলে বলবেন।"

"হ্যাঁ বলব, আগে ভাইয়েদেব জিজ্ঞাসা করেনি।"

পুলিন হন হন কবে বথতলাব রাস্তা ধরে এগোল। এই লোকটাব সঙ্গে কথা বলে ভালই হল। মাথাটা পরিষ্কাব কবে তাকে এখন ইউনিকের মালিক বানিয়ে দিয়ে গেল।

অরুণপ্রকাশ আসছেন। মেয়েব বিয়ে হয়ে গেছে, পুলিনকে নিমন্ত্রণ করেননি। পুলিনেব অবশ্য মনেও ছিল না। দেবুকে বলে রেখেছিল, পিছনের পাড়ার স্কুল মাস্টারেব বাড়িতে ড্রেসিং টেবলটা পাঠিয়ে দিতে। দোকানে জায়গাটা খালি দেখে বুঝে গেছল পাঠিয়ে দেওয়া হযেছে।

"পুলিনবাবু, খুব ব্যস্ত ছিলাম তাই...।"

"তাতে কী হযেছে। মেয়ের বিয়েতে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা তো হবেই।"

"আপনার প্রথম কিস্তিব টাকাটা এই হপ্তার মধ্যেই দিয়ে আসব।"

"দেবেন।"

পুলিন ভেবেছিল নিমন্ত্রণ না কবার জন্য বোধহয় ক্রটি স্বীকার কবছে। না করে ভালই কবেছে। কিছু খসে যেত। পঞ্চাশ-ষাট টাকাব শাড়ি দিয়ে বদলে ক'টাকার খাবাব সে খেত? অবশ্য এই সব খাওয়াদাওযাব জায়গায় গেলে লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয়, খদ্দেব ধরা যায়। কিন্তু লোকটা কিস্তিতে সকল পাওযাব উপকারটা পেযেও কৃতজ্ঞতাবশত নিমন্ত্রণটা তো কবতে পারত!

পুলিন খিটখিটে মেজাজ আব চায় না। অরুণপ্রকাশকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলাব জন্য সে রত্না স্টুডিয়োর সামনে থেমে চেঁচিয়ে বলল, "সুকুমাব, আজ সকালে বোম্বাই থেকে দেব আনন্দেব লোক এসেছিল। বলল, দাদা আপনার ছবিটা কে তুলে দিয়েছে নামটা একটু বলবেন? আমি বললাম জেনে কী কববেন? বলল, বোম্বাইয়ে নিয়ে যাব। আপনার এই জাম্বুবানের মতো চেহাবাকে যে কেষ্ট ঠাকুবের মতো দেখিয়ে দিতে পাবে তাকে ."

"ওহ পুলিনদা, বুলির জ্বর ছেড়েছে তবে খুব শুকনো, রোগা রোগা লাগছে। তাও আজ দুটো স্ন্যাপ নিয়েছি। কালই তোমাকে দেখাব।"

সুকুমারের রসিকতা করাব মেজাজ নেই। সিরিয়াস হয়ে গেছে পিসতুতো বোনের বিয়ে দেবাব জন্য। কিন্তু কেন? গরিব আত্মীয়ার উপকাব করতে না পাশের দোকানেব নিঃসঙ্গ একটি লোককে জীবন উপভোগের উপকরণ জুগিয়ে দিতে!

"আমি বিয়ে করব, এ-কথা কিন্তু একবারও বলিনি।"

"সে কী, করবে না?" সুকুমার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। কাউন্টারের উপব ঝুঁকে আবাব বলল, "কেন?"

"আমার দু'-দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। পরশু কলকাতায় গিয়ে ইসিজি করিয়েছি। ডাক্তার বলেছে খুব শান্ত ভাবে থাকতে। একটুও উত্তেজনার মধ্যে যেন না যাই।"

"তোমাব এমন অবস্থা, কই কখনও তো শুনিনি!"

"আমি কি জনে জনে বলে বেড়াব নাকি, ওগো আমার হার্টের অবস্থা খারাপ, তোমরা সব শুনে রাখো...কেউ কি অসুখবিসুখের কথা গাবিয়ে বেড়ায় নাকি?"

"কিন্তু স্ট্রোক হল কবে?"

"প্রথমটা দশ বছর আগে, এখানে আসার আগে।"

পুলিনের বুকের মধ্যে দপদপ করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। ছ' ঘণ্টার বাসি রক্ত যেন আঠার মতো চটচট করছে বুকের মধ্যে। তার মনে হল, মিথ্যা কথার মধ্যেও অনেক সময় সত্যি লুকিয়ে থাকে। হয়তো একটা হাওয়ার বুদ্বুদ শিরার মধ্য দিয়ে এখন তার হার্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কে জানে, সেটাই হয়তো তাকে এখুনি অজ্ঞান করিয়ে মাটিতে ফেলে দেবে। জ্ঞান ফিরে নাও আসতে পারে। সে ডান হাতের চেটো বুকের বাঁ দিকে চেপে ধরল।

"তোমার হল কী পুলিনদা। এসো এসো ভেতরে এসে বোসো। মুখটা কেমন কালো দেখাচ্ছে।" সুকুমার হাত বাড়িয়ে পুলিনের বাঁ হাতটা চেপে ধরে তাকে দোকানে ঢোকার সরু পথটার দিকে টানল।

"ঠিক আছি, ঠিক আছি।"

"এই জন্যই, তোমাকে দেখাশোনার, নজরে রাখার জন্য একটা লোক কাছে থাকা দরকার।"

সুকুমার বোধহয় বিশ্বাস করেছে। এত চালাক, ধূর্ত ছেলেটারও মনে হয়েছে তার হার্টে গোলমাল রয়েছে। তা হলে কি মুখে সত্যি সত্যিই ভয়, যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল? পুলিন আশ্চর্য বোধ করল। একবার কি তবে ডাক্তারের কাছে যাবে? বলা যায় না, সত্যিই হয়তো হার্টটা জখম হয়ে আছে!

"সেই জন্য কি বিয়ে করতে হবে? বউ তা হলে কাছে কাছে থেকে পাহারা দেবে?" পুলিন কাউন্টারে হাতের ভর রেখে ঝুঁকল। মুখটা সুকুমারের দিকে এগিয়ে মৃদুস্বরে বলল।

"হ্যাঁ। বউই সবথেকে বেশি যত্ন নেবে।" সুকুমারের বলার ভঙ্গিতে দ্বিধা নেই।

"ডাক্তার বলেছে কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না। একটা কচি বউ পেলে শরীর কী হয় সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার আছে। সেক্স বড় মারাত্মক জিনিস।"

"এখন যে-ভাবে আছ পুলিনদা, তাতেও তো তোমার উত্তেজনা কম নেই। সেক্স চেপে রাখলে তাতে উত্তেজনা বাড়েই। তাতে ফল খুব খারাপ হয়।"

"কী খারাপ হয়?"

"পারভারটেড হয়ে যায়। মনের বিকৃতি ঘটে। নিজের অজান্তেই অনেক কিছু করে বসে। দ্যাখো না, ট্রামে বাসে ট্রেনে বয়স্ক লোকেরা কী সব কাণ্ড করে?"

পুলিন স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সুকুমারের ভুরুর দিকে। একটা গোপন খবরের ঝাঁপ খোলার মতো উঠে রয়েছে। তা হলে জেনেছে। নিশ্চয়ই সেই ছেলেটা যে ট্রেনে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে কেমনভাবে যেন হেসেছিল। দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। সুকুমারকে চেনে। হয়তো এইভাবে কাউন্টারে হাত রেখে বলেছিল, 'আচ্ছা তোমার পাশের দোকানের, এই যে ইউনিক ফার্নিচার, এর মালিক লোকটা কেমন বলো তো?'

'কেন? পুলিনদা তো লোক ভালই।'

'ভাল লোক? জানো, সেদিন শেয়ালদায় ট্রেনে ওঠার সময় কী কাণ্ড করেছে?... এইখানকারই এক ভদ্রমহিলার...

"পুলিনদা চলো তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। আর দাঁড়িয়ে থেকো না, তোমার এখন শুয়ে থাকাই ভাল!"

"থাক, সাহায্যের দরকার নেই, নিজেই যেতে পারব। তবে... পারভারটেড আমি হইনি। জীবনকে আমি সুন্দর দেখি, শ্রদ্ধা করি, ইয়েস... নোংরামিকে ঘেন্না করি।"

পুলিন সোজা হয়ে, প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে ইউনিকের দিকে এগিয়ে গেল। দেবু টেবলে পা তুলে বসেছিল। তাকে দেখে দ্রুত পা নামিয়ে নিল।

"কেউ খোঁজ করতে এসেছিল?"

পুলিন বলতে চেয়েছিল, 'কোনও মেয়েছেলে।' তার বদলে বলল, 'কেউ'।

"না। তবে...।"

"আমি এখন ঘরে বিশ্রাম নেব। ডিসটার্ব করিস না।"

তেরো

পুলিন অপেক্ষা করছে।

ঘরের আলো নেভানো। দালানের আলো গদাই সন্ধ্যাতেই জ্বেলে দিয়েছে। চিত হয়ে শুয়ে সে মেঝে থেকে সিলিংয়ে ওঠা আলোর প্রতিফলন দেখছে। সিনেমা হলে ধীরে ধীরে আলো নিভে এলে সাদা পর্দাটা তখন এইরকম দেখায়। সে আশা করছে এবার সিনেমা শুরু হবে। ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে সে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে।

দোকানে একটা ডাইনিং টেবলের উপর গদাই ঘুমিয়ে রয়েছে। দোকানের পাশের সরু পথটা এসেছে পিছনের দরজায়। দরজাটা খুললেই উঠোন বা কারখানা। বন্ধ আছে কি? গদাই রোজ কাজ করে তালা দিয়ে দেয়। চাবির রিংটা দালানের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে।

পুলিন বিছানায় উঠে বসল। দালানে ডাইনিং টেবলের একটা কোণ, তার উপর ঢাকা দেওয়া খাবারের বাটি। খিদে পাচ্ছে না।

সন্ধ্যার পর ছায়া এসেছিল। দেবু তাকে বলে দেয়, দাদা ঘুমোচ্ছে, এখন তোলা যাবে না। ছায়া আবার এসেছিল দোকান বন্ধ করার সময়। পুলিন তখন দোকানে বসে। দেবু বাড়ি চলে গেছে, গদাই সামনের পাল্লা বন্ধ করছিল।

সেই নীল শাড়িটাই পরা ছিল। পার্টিশনের আড়ালে অফিসে বসে পুলিন গলার স্বর শুনে সামনের আলমারির আয়নার দিকে তাকায়। গদাই এমনভাবে আড়াল করেছিল যে মুখটা দেখা যাচ্ছিল না।

'দাদা এখন ঘুমোচ্ছে।' গদাই নিখুঁতভাবে নির্দেশ পালন করেছিল।

'এখনও? অসুখ করেছে কি?'

'না, এমনি।' সেকেন্ড চারেক ভেবে বলেছিল, 'মাথা ধরেছে। কাল সকালে এসো।'

গদাই 'আসুন' বলেনি। কাশীনাথের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে এটা সে জানে। ছায়াকে সে বিশেষ কোনও মর্যাদা দেবার দরকার বোধ করেনি। ছায়া যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে আয়নায় তাকিয়ে অফিসঘরের ভিতরটা দেখতে পাবে না। তবুও পুলিন চেয়ার থেকে উঠে পার্টিশন ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। শাড়ির একটুকরো নীল, কাঁধের কাছে ব্লাউজের সাদা হাতা আর মাগুরমাছের মতো পুরোবাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'গিয়ে দ্যাখো না, মাথাধরাটা যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে।'

'এইমাত্তর দেখেছি, ঘুমোচ্ছে। কী বলার আছে আমায় বলতে পারো, আমি বলে দেব দাদাকে। খাটের কথা তো?'

'হ্যাঁ থাক, আমিই বলব।'

ছায়া সরে গেল আয়না থেকে। গদাই এসে বলল, 'এই নিয়ে দু'বার এল। খাট আর পছন্দ হয় না।'

পুলিন বাটির ঢাকনা তুলে দেখল। আলু-ফুলকপির ডালনা করে রেখে গেছে গদাইয়ের মা। অসময়ের কপি। আঙুলের ডগা ঝোলে ডুবিয়ে জিভে ঠেকাল। গরমমশলার গন্ধ আর স্বাদ খিদে জাগিয়ে দিচ্ছে। চেয়ার টেনে বসে সে রুটি ঢাকা দেওয়া স্টিলের থালাটা তুলল।

এইভাবেই টেবলে ঢাকা দেওয়া ছিল। থালার কিনার ঘিরে এই রকমই পল তোলা। মাঝখানে উঁচু হয়ে ওঠা বৃত্ত। তার ভিতর কোম্পানির নাম। মাজামাজিতে নামটা অস্পষ্ট। ছায়া যখন অন্ধকারে জড়িয়ে ধরে তখন সে টলে যাচ্ছিল। হাতটা গিয়ে পড়ে টেবলে আর তখন থালাটা হাতে লেগে পড়ে যায় টেবলে।

তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে সে প্রথমেই পলকের জন্য টেবলের দিকে তাকিয়েছিল। ঢাকনা খোলা বাটিতে রুটি ভাঁজ করে রাখা। তার নীচের বাটিতে বোধহয় ডিমের ঝোল। এরপরই সে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে মেঝের রক্ত দেখতে পায়।

শিবানীর মাথায় কাটারি মেরে, তারপর সে রুটি তৈরি করেছে, ডিম রেঁধেছে। ওই হাতে! ছ'ঘণ্টা কেটে গেছল শিবানীর মৃত্যু আর পুলিনকে দরজা খুলে দেওয়ার মধ্যে। আর তারই ভিতর ঠাণ্ডা মাথায় ছায়া তার নিত্য কাজগুলো করে গেছল।

পুলিন থালাটা দিয়ে রুটি ঢেকে দিল। 'স্বচ্ছদৃষ্টি তুলে ধরে খুশিয়াল কণ্ঠে এই যুবতী বলল, সামনের মাসে আমি ছাড়া পাব।' ছায়া এখন যুবতী। তাকে 'তুই' বলতে গিয়েও পুলিন সারা অবয়ব দেখে দ্বিধায় পড়ে 'তুমি' বলে ফেলে। বলতে বাধ্য হয়। পরিণত শান্ততা ছিল ছায়ার চোখে। লেখাটার দুই লেখিকা কিশোরী ছায়াকে দেখেনি! একটা বোধবুদ্ধিহীন জানোয়ার ছাড়া তখন তাকে আর কী বলা যেত? অনেকগুলো ভাইবোনের একটা। দু'মুঠো ভাতও রোজ জুটত না। আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত আর মারধোর খাওয়া এই ছিল ওর জীবন।

খাওয়ার ইচ্ছাটা আর নেই। পুলিন উঠে পড়ল। দালান থেকে দোকানে যাওয়ার দরজাটা খোলা। আগে বন্ধ করে চাবি দিয়ে রাখত। গদাই দোকানে শোয়ার পর থেকে আর বন্ধ করা হয় না। জানলাগুলো বন্ধ থাকার জন্যই স্পিরিটের গন্ধে দোকানঘরটা ভরে রয়েছে। কাঠের আসবাবগুলো শরীর থেকে মানুষের মতোই গন্ধ বার করে! কিন্তু আলাদা আলাদা মানুষের মতোও কি ওদেরও গন্ধ আলাদা?

গদাই বুকের কাছে হাঁটু ছুঁইয়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরটার বাতাস স্থির, অস্বাস্থ্যকর। পুলিন একটা জানলা খুলে দিতেই টাটকা বাতাস তার মুখে ঝাপটা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। রাস্তার আলোটা জ্বলছে না। ব্যবসায়ী সমিতিটা গড়লে মিউনিসিপ্যালিটিকে চাপ দিয়ে আলোর ব্যবস্থাটা করা যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়া মানে সর্বসমক্ষে আসা। সেটা আর সম্ভব নয়। দশ বছর ধরে নিজেকে সে গুটিয়ে নিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে মুখ নামিয়ে চলে যাবে বাকি জীবন।

ওপারের শ্রীময়ী টেলর্সের শাটারের রুপোলি রং আবছা দেখাচ্ছে। তুষারকণাকে আর সে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সলিলের সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি। ও কি সত্যি ধরে নিয়েছে শেয়ালদা প্ল্যাটফর্মে বদ উদ্দেশ্যে সে তার উপর হুমড়ি খেয়ে জড়িয়ে ধরেছিল? তখন তার শরীরের অনুভব করার মতো কোনও সাড় ছিল না। ইন্দ্রিয়গুলো শুধু একটা উদ্দেশ্যেই ব্যস্ত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একটি বিন্দুতে— তুষারকণার নিরাপত্তা। এটা কি ও পরেও বুঝতে পারেনি? বোধহয় পারেনি। তা হলে আলমারিটা ফেরত চাইত না। ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বললে কি বুঝবে?

'দেখুন সেদিন আপনি যে-ভাবে ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তাতে আপনি মারা পড়তেন।'

'কী জানি, তখন মাথার মধ্যে কী যে হল, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ট্রেনটা অ্যাতো দেরি করে এল, তা ছাড়া বুলুর জন্যও ভাবনা হচ্ছিল। ছেলেটা কাল বঁটিতে আঙুল কেটেছে, পরশু চেয়ার উলটে মেঝেয় পড়ে কপাল থেঁতলেছে। এইসব কথা ভেবে তখন মরিয়া হয়ে গেছলাম। তার ওপর—'

'কী তার ওপর?'

'আপনি যে-ভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন।'

'আমি পারভারটেড নই। জীবনকে সুন্দর দেখি। শ্রদ্ধা করি। আপনাকেও শ্রদ্ধা করি।'

'আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। অত লোকের মাঝে আপনাকে চড় মেরেছি ভেবে আমার নিজেকে খুব বিশ্রী লাগছে। এখানকার অনেক লোক হয়তো তখন দেখেছে, তারা কী যে ভাবছে আপনার সম্পর্কে!'

'ভাবুক গে আমি কেয়ার করি না। আপনি যে কিছু ভাবছেন না এটাই আমার কাছে বড় জিনিস।'

'এক কাজ করুন। আপনি রোজ আমাকে ট্রেনে তুলে দেবেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকেরা সবাই দেখবে। ট্রেনে ভিড় থাকবেই, আপনি পিছন থেকে ঠেলে তুলে দেবেন। হ্যাঁ, পিঠে হাত দিয়েই ঠেলবেন। কালই-—'।

কালই! পুলিন হেসে উঠল শব্দ না করে।

কালই আসবে ছায়া, বদলে গেছে ওর বাইরেটা। দশ বছরে ষোলো থেকে ছাব্বিশ। একটা ঘেরা জায়গায়, সুশৃঙ্খল শাসনের মধ্যে আট বছর ছিল। সেখানে বয়স্ক গৃহিণী খুনি অপরাধীরাও ছিল। ছায়াকে ছবিতে দেখেছে এমব্রয়ডারির কাজ করতে। হয়তো মাজাঘষায় ওর আচরণ বদলেছে। কিন্তু মনের কাজ? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল কি? নিশ্চয় বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে। কিংবা নিজেই আর লজ্জার বোঝা টানতে না পেরে এখানে এসেছে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে। খুন করা আর চড় খাওয়ার লজ্জার মধ্যে ফারাক কতটা!

কয়েকটা কুকুর রথতলার মোড়ের কাছে ঝগড়া করছে। পুলিন জানলা থেকে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে আর একটা চেয়ারে পা দুটো তুলে দিল। গদাইয়ের ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে ছেলেটা বিড়বিড় করে উঠল। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে সে প্লাইউডের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, কাল নয়তো পরশু ও আসবেই।

কিন্তু কী জন্য? কাশীনাথের সঙ্গে তো বিয়ে পাকা হয়েই গেছে। করুক। খাট কিনে, ঘর গুছিয়ে, সংসার করুক, চাকরি করুক। ছেলেপুলে হবে। তাদের মানুষ করুক। একটা বাঁধাধরা মসৃণ জীবন ছায়ার সামনে, তাই ধরেই হেঁটে যাক! এখানে ওর অতীত জানে তো শুধু একজনই। যদি আমাকে উত্ত্যক্ত না করে তা হলে মুখে চাবি দিয়ে রাখব। হয়তো এইরকম একটা বোঝাপড়া করার জন্যই ও দেখা করতে চাইছে। মনে ভয় তো আছে! বিয়ে ভেঙে যাবে চাকরিটা তো খাবেই। বাগুইপাড়ায় কি রথতলায় বাস করাই ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কিন্তু মাত্র দুটো কথা ছায়া জিজ্ঞাসা করেছিল। কাশীনাথ যখন পছন্দ করা খাটটা দেখিয়ে দেবার জন্য দোকানের কোণের দিকে সরে গেছল তখন শুধু তারা দু'জনই নিঃসঙ্গ মুখোমুখি হল। দশ বছর পর প্রথম।

'বিয়ে করেছ?'

'না।'

'একা থাকো?'

'হ্যাঁ।'

দুই ষড়যন্ত্রীর মতো চাপা স্বরে, দ্রুত, ফিসফিস। শুধুই কি মেয়েলি কৌতূহল ছিল প্রশ্ন দুটোয়? উত্তর পেয়েই ওর চোখে নিশ্চিন্ত হবার মতো একটা ভাব কি ফুটে ওঠেনি? একটা নিভে যাওয়া পিদিমের সলতেয় আবার দেশলাই জ্বেলে দেওয়া। ওর রাগ, আর জেদের আড়ালে অভিমানের শিখাটিকে পুলিন দেখতে পেয়েছিল।

সে কি বিচলিত বোধ করেনি? না হলে ছায়ার প্রশ্নের জবাবে সে সত্যি কথা বলল কেন! বলতে পারত, 'হ্যাঁ বিয়ে করেছি,' 'না একা থাকি না।' কাশীনাথের সামনে যেমন অপরিচয়ের অভিনয় করল, তেমন ভাবেই ছায়ায় সঙ্গেও অভিনয় করে পিদিমটার জ্বলে ওঠার সুযোগ নষ্ট করে দিতে পারত।

তা হলে এখনও সে ছায়াকে কামনা করে!

পুলিন অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। পায়ের উপর পা তুলে, শরীরটা আর একটু এগিয়ে দিয়ে, সামান্য কাত হল। ঘুম আসছে না। চেষ্টা করে ঘুম আনা যায় না। আপনা থেকেই আসে। শিবানীর পোস্টমর্টেম হবার রাতে চেষ্টা করেও তার ঘুম আসেনি। ম্যাজিস্ট্রেটের রায় দেবার রাতেও এই রকম হয়েছিল। সারা শরীর শক্ত বোধ হচ্ছিল আর জ্বালা করছিল।

'আপনি ওকে বিয়ে করবেন বলেছেন।'

ছায়ার বাবা কিংবা ওই পেয়ারাওলাটা সেদিন বলেছিল। জেলে দেখা করেছিল মেয়ের সঙ্গে তখন নাকি ছায়া তাকে খবরটা দেয়। হ্যাঁ, পুলিন বলেছিল। মুখে ছিল কাঁচা পেঁয়াজ আর ভাতের গন্ধ, গায়ে সর্ষের তেলের গন্ধ। তখন ছায়া হাঁ করে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছিল। গোলাপি প্লাস্টিকের মতো মাড়ি বেরিয়ে, অসমান কিন্তু ঝকঝকে সবল দাঁত, পুরু ঠোঁট, নাকের মধ্যে শুকিয়ে থাকা কফ। পুলিন তখন ওর নগ্ন দেহের উপর উপুড় হয়ে নিজেকে শিথিল করতে করতে মুখ নামিয়ে আনছিল।

'বিয়ে করবে তো?'

'করব, করব, কতবার বলব এক কথা!'

'কবে? বউটা কবে মরবে?'

'শিগগিরই মরবে। হাঁপানি রোগে কি বেশিদিন বাঁচে?'

শিবানী শিগগিরই মরত কি না কে জানে তবে ছায়ার আর তর সয়নি। বিয়ের সময়টা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে নিজের বোধবুদ্ধি দিয়ে, তার পক্ষে যা সোজা উপায় মনে হয়েছিল, তাই করেছে। সে নিজেও কি তাই করেছিল? বিয়ে করব বলার সময় নিজের বোধবুদ্ধি হারিয়ে সে ছায়ার স্তরে কি নেমে যায়নি? ওর দেহটা তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্যই কি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়নি? এই সব কথাতেই মেয়েরা আবেগপ্রবণ হয়ে বুদ্ধি হারায়।

তখন অনুরও তাই হয়েছিল। অথচ মেয়েটি সবল, বুদ্ধি ধরে। পুলিনের মনে পড়ল দৃঢ় চোয়ালের পেশি স্থির রেখে বলা কথাগুলো: 'আপনি কি নিজের কাছে পরিষ্কার?' উত্তরে সে মুহূর্তে বলেছিল, 'নিশ্চয় পরিষ্কার।'

কিন্তু সত্যিই কি পরিষ্কার? তা হলে ছায়াকে আজ প্ল্যাটফর্মে দেখে সে ভয় পেল কেন? ছায়া কি তার চেতনায় আজও ছায়া ফেলে রয়েছে? অনুর মনে শঙ্কর? সব মানুষেরই কি একটা করে ছায়া থাকে?

আহ্‌হ্‌হ্‌। পুলিন আবার সিধে হয়ে পা ছড়াল এবং চোখের পাতা নামিয়ে আনল। যখন সে আবার চোখের পাতা তুলল তখন দোকানের জানলা দিয়ে রোদ এসে তার ঝুলে থাকা হাতের আঙুল ছুঁয়েছে। গদাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

"দাদা রাতে আপনি এইভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন?"

জবাব না দিয়ে পুলিন চেয়ার থেকে উঠে অপারেশন হওয়া রোগীর প্রথম হাঁটার মতো দুর্বল অনিশ্চিত পায়ে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এখন সত্যিই তার মাথা ধরেছে।

গদাই তার পিছন পিছন ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "জ্বর হয়েছে? রিকশা আনব, ডাক্তারের কাছে যাবেন?"

"কিছু হয়নি। আর শোন, কেউ খোঁজ করলে, কোনও মেয়েছেলে খোঁজ করতে এলে এখানে নিয়ে আসবি। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা। টেবলের খাবারটা খেয়ে নিস।"

অগভীর, অস্বচ্ছ, স্বাচ্ছন্দ্যহীন তন্দ্রার মধ্যে পুলিন বহুবার ডুবে যেতে যেতে ভেসে উঠল। বারবার সে এপাশ ওপাশ করে গেল। এই ডোবা আর ভাসার ফলে তার মাথার মধ্যে ক্রমান্বয় যে টান লাগছিল তাতে এক সময় সে ক্লান্ত বোধ করল। মিস্ত্রিদের কথাবার্তা, করাত ও বাটালির শব্দ অস্পষ্টভাবে সে শুনতে পেল। গদাইয়ের মা ঘর মুছে গেল, ফিসফিস করে ছেলের সঙ্গে কথা বলল, পুলিন তা-ও টের পেয়েছে। এ-সবই তার চেতনার উপর দিয়ে বহু দূরের রেলগাড়ির শব্দের মতো গড়িয়ে গেল।

এক সময় সে ঝিমিয়ে এল। ঘুমেব মধ্যে ডুবতে ডুবতে তার মনে হল, কেউ একজন বোধহয় আসছে তাকে হাত ধরে তুলে নেবার জন্য।

শিবানীর মুখটা সে দেখতে পেল ট্রেনের জানলায়। পুলিন জিজ্ঞাসা করল, 'কাল অফিসে আসছেন?' শিবানী মাথা হেলিয়েছিল খুকির মতো। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। শিবানীর ঠোঁট নড়ছে। কী যেন বলল। পুলিন শুনতে পাচ্ছে না। একদমই শুনতে পাচ্ছে না। সে জানলার পাশে ছুটতে ছুটতে বলল, 'কী বললেন?' শিবানীর চোখে গভীর প্রশান্তি, ঠোঁট মুচড়ে রয়েছে কৌতুকে।

'কী বললেন?'

ট্রেনটা চলে গেল। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে পুলিন ঘুমিয়ে পড়ল।

চোদ্দো

"হ্যাঁ, আমিই।"

পুলিনের হাতটা খোলা ড্রয়ারের মধ্যে। হাতে নোটের গোছা। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল ছেলেটির মুখের দিকে।

ত্রিদিবনগরের এক খদ্দের এইমাত্র দেড় হাজার টাকা দিয়ে গেল। জানলার ফ্রেমের জন্য প্রায় ছ'মাস বাকি পড়ে ছিল। দেবু প্রতিমাসের শেষ তারিখে গিয়ে তাগিদ দিত। নোটগুলো সে লোকটির সামনে গুনে নেয়নি। স্থানীয় লোকেরা, বেশি টাকার মাল নিলে সে এই রকম ভাবে তাদের মর্যাদা বোধ উসকে দেয়। 'আরে আপনি দিচ্ছেন যখন আবার গুনব কি! আমি কি লোক চিনি না?' কিন্তু নোটগুলো সে অবশ্যই পরে গুনে নেয়। কম দেবে, তা সে ভাবে না। ফাটা, ছেঁড়া, ময়লা নোট ভেতরে ঢোকানো থাকে যেগুলো চালাতে পরে তাকে নাজেহাল হতে হয়।

"কী দরকার?"

"আমি দমদমের শম্ভুনাথ সাহার কাছ থেকে আসছি। এই চিঠিটা তিনি—"

পুলিন ভাঁজ করা কাগজটা নেবার জন্য হাত বাড়াল। তখন দেখল ছেলেটির হাতে মুক্তোবসানো আংটি। সুশ্রী মুখ। গৌরবর্ণ, চুলের আদল ফিল্মের পোস্টারে দেখা নায়কদের মতো, ছিপছিপে গড়ন। শম্ভুর কাছ থেকে আসছে শোনামাত্রই বুঝে গেল ছেলেটি কে। এই তা হলে সেই শঙ্কর!

"বোসো।"

চিঠির ভাঁজ খোলার আগে পুলিন চাহনি দিয়ে বোঝাতে চাইল সে কড়াধাতের মানুষ। শঙ্কর কুণ্ঠিতভাবে চেয়ারের কিনারে পাছা রাখল। সামনের আলমারির আয়নাটা এমন ভাবে আড়াল করে বসল যে পুলিন নিজেকে এবং দোকানের ভিতরটা আর দেখতে পাচ্ছে না। সে চেয়ারটা ইঞ্চি দুই সরিয়ে দেখল আয়নার একটা কিনার দিয়ে শুধু নিজের আধখানা দেখতে পাচ্ছে।

চিঠিতে লেখা শ্রীচরণেষু, পুলিনদা। এই চিঠি নিয়ে শঙ্কর তোমার কাছে যাচ্ছে। কাল তুমি চলে যাবার পর আমার মনে হয়েছে, সালকিয়ায় যে-কাজটা করবে বলেছে, তা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ঝোঁকের মাথায়, এই পারব তাই পারব, এই বয়সে ছেলেরা বলেই থাকে। তোমার ব্যবসায়ের কোনও কাজে যদি ওকে ঢুকিয়ে দিতে পারো এই আশায় ওকে পাঠাচ্ছি। আশা করি আমাদের মুখ চেয়ে, অনুর কথা ভেবে তুমি একটা উপায় বার করবে। প্রণাম নিয়ো। ইতি তোমার ভাই, শম্ভু। পুঃ— টাকাটা আমার অশেষ উপকারে লাগবে। তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। প্রণত, শম্ভু।

চিঠিটা টেবলে রেখে পুলিন ভুরুটা একবার কোঁচকাল। শঙ্কর অবশ্যই চিঠিটা পড়ে নিয়েছে। সুতরাং ভণিতা না করেই প্রসঙ্গে আসা যায়। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত তার যাওয়ার অধিকার আছে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না। অনু যদি তার নিজের বোন হত তা হলে সে ছোকরার চুলের মুঠি ধরে প্রথমেই বলত, 'আগে চুলটা কেটে এসো।'

"শম্ভুর সঙ্গে দেখা করেছ?"

"হ্যাঁ, আজ সকালে।"

"দুটো কথা।" পুলিন চোখ নামিয়ে চিঠির উপর রাখল। নিজের অস্বস্তি কাটাতে না শঙ্করের উৎকণ্ঠিত চোখের দিকে না তাকাবার জন্য, পুলিন বুঝে উঠল না। আয়নায় আধখানা নিজেকে দেখাটা বন্ধ করার জন্য সে চেয়ারটা আবার আগের জায়গায় সরিয়ে নিল।

"তুমি কি জানো এইসব মোটর, স্কুটার মিস্ত্রিরা কেমন ধরনের লোক হয়? ওখানকার পরিবেশ কেমন? তুমি ভদ্রপরিবারের ছেলে, পারবে ওদের সঙ্গে কাজ করতে?"

"চেষ্টা করব।"

গলার স্বরে একটু বেশি জোর। পুলিনের মনে হল নিজের সম্পর্কে আস্থার জোরটা পোক্ত ভিতের উপর বসানো নয়। আর একটু ঠান্ডা স্বরে বললে সে ওর মুখের দিকে নিশ্চয় তাকাত।

"তোমায় আগে দেখিনি, আন্দাজেই শম্ভুকে বলেছিলাম তুমি পারবে না। যা ভেবেছ তা হয় না। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিকই আন্দাজ করেছি।"

"দেখেই আমাকে বুঝতে পারলেন?"

"হ্যাঁ।" পুলিন চোখ তুলল। ছেলেটার জড়তা কেটে গেছে। চাহনিতে আহত আত্মমর্যাদা।

"তুমি একটা মেয়েকে—" পুলিন থমকে একটা কম অশালীন শব্দ খোঁজার চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়ে, বলল, "তাকে বিয়ে করব বলে ভোগ করে, গা ঢাকা দিয়েছিলে। জানি জানি, বলবে বাড়ির লোক ঘরে আটকে রেখেছিল। কিন্তু তুমি পালিয়ে আসতে পারতে। যে মিস্ত্রি হতে চায়, তার মনে সাহস থাকা চাই, কষ থাকা চাই চরিত্রে। তাকে বাড়িতে বন্দি করে রাখা যায় না। সে দরজা ভেঙে, পাঁচিল টপকে বেরিয়ে আসবে তার প্রেমিকার সম্মান বাঁচাবার জন্য।" পুলিন সজোরে শব্দ করে কিল বসাল টেবলে। 'তুমি কি তা করেছ?"

শঙ্করের মাথা পিছনে হেলে গেল আচমকা এই বিস্ফোরণে। মৃদুস্বরে বলল, "তাই করব বলেই তো আমি বাড়ি ছাড়ব। হাতের কাজ শিখব।"

"হ্যাহহ।" নাক দিয়ে কফ ঝাড়ার মতো শব্দ বেরোল পুলিনের মুখ থেকে। "এখন এত কাণ্ড হয়ে যাবার পর তুমি মিস্ত্রি হবে বলছ। জানো শম্ভুর অবস্থা? বাড়ির একমাত্র রোজগেরে, তোমার বাবার

গুণ্ডারা ওর যা অবস্থা করেছে তাতে ও ছ'মাস বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। এই ছ'মাস কে ওদের খাওয়াবে? অনুকে তো মেরেই ফেলছিল। ও মরে গেলে তুমি কি আর মিস্ত্রির হবার কথা বলতে? দ্যাখো বাপু, এ-সব শখের প্রেমিক অনেক দেখেছি। বাপের হোটেলে থেকে, বাপের পয়সায় ফুটুনি মেরে কত ধানে কত চাল হয় তার তুমি বুঝবে কী? মিস্ত্রি হতে চাও, হও। তার আগে বিয়েটা করে নিতে হবে।"

"অনু আমায় তাই বলল। আমি রাজি।"

"কবে করবে?"

"আজ বললে আজই।"

"এই সন্ধেবেলায় তো আর পুরুত ডেকে জোগাড়যন্ত্র করে ওঠা যাবে না, নইলে আজই দিয়ে দিতাম। তুমি কখন যে অদৃশ্য হবে তার তো ঠিক নেই!"

"এ-ভাবে বলছেন কেন, আমাকে বিশ্বাস হয় না?"

"বিশ্বাস? তোমাকে? মৌলালিতে এক ঘণ্টা আমাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে। আবার যে এ-রকম ঘটবে না তার কোনও গ্যারান্টি আছে?"

"আমার সত্যিই কোনও উপায় ছিল না। ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। তালা ভেঙে বেরোনো সম্ভব নয়, জানলার গ্রিল ভাঙার মতো গায়ের জোর আমার নেই। তিন দিন আমায় খেতে দেয়নি।... আমি জানতাম না ওরা মার খেয়েছে, ওদের বাড়িতে পোস্টার মারা হয়েছে।" বলতে বলতে শঙ্করের গলা বন্ধ হয়ে এল। চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া লরির টায়ারের মতো পুলিনের ফোলানো রাগ ধীরে ধীরে সমান হয়ে গেল। ছেলেটা তার অর্ধেক বয়সি। কিন্তু আঘাত পাওয়াটা ওর দরকার। এ-ভাবে নিশ্চয় ওকে কেউ কথা শোনায়নি। পৃথিবীতে অনেক রকম কথা তৈরি হয়, সেগুলো শোনা দরকার। হয়তো অনুকে সত্যিই ভালবাসে। এই বয়সে জীবনের বাইরে থাকারই কথা। শঙ্কর একটু তাড়াতাড়িই ভিতরে এসে গেল।

"বিয়ে করে বউকে রাখবে কোথায়? ক'মাস পরেই তো বাবা হবে, আর একটা মুখ, খাওয়াবে কী করে?"

"অনু দাদার কাছে থাকবে বলেছে। চাকরি করবে।"

"আর তুমি বউয়ের পয়সায় খাবে?"

"না না, আমি ওদের বাড়িতে থাকব না। দমদমেই থাকব না। অনু বলেছে ছেলের খরচ ও যেভাবেই হোক জোগাড় করবে।"

"এই নিয়ে তা হলে তোমাদের মধ্যে কথা হয়েছে।"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়ে মুখ নিচু করল। ছেলের খরচ বলল কেন, মেয়েও তো হতে পারে! শিবানীর সঙ্গে তার কখনও এই ধরনের কথা হয়েছিল? বোধহয় নয়। তারা ধরেই নিয়েছিল, ছেলেপুলে হলে হবে, না হলেও দুঃখ পাবে না। সে বা শিবানী পরিকল্পনা মতো কখনও ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু ও গর্ভবতীও হয়নি। আশ্চর্য! শিবানী কি বাঁজা ছিল কিংবা সে নিজে!

"তুমি অন্য কোনও কাজ দ্যাখো, মোটর গ্যারেজ করার মতলব ছাড়ো। এ-সব লাইনে যাদের হবে তুমি সে-ধরনের নও। আর শ্বশুরবাড়িতে থাকাটাও ঠিক হবে না। শম্ভু যে কাজ করছিল, তুমি সেইটেই ধরো। দালালির কাজ। মোজাইক টালি, জানলার গ্রিলের অর্ডার যে-সব কোম্পানির হয়ে শম্ভু সিকিওর করত, ওর চিঠি নিয়ে তাদের কাছে যাও। গিয়ে বলো, এবার তুমিই ওর হয়ে কাজ করবে। পরিশ্রম করতে হবে, ঘোরাঘুরি করতে হবে, মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে। পার্টির যাতে বিশ্বাস হয় তোমার উপর এমন চালচলন দেখাতে হবে। পারবে?"

"পারব।" শঙ্কর মাথা হেলাল। মুখে স্বস্তি। বোধহয় মোটর মিস্ত্রি হতে পারা সম্পর্কে নিজের প্রতি সন্দিহান ছিল।

"কিন্তু সর্বাগ্রে বিয়ে। যদি বিয়ে না করো তা হলে কোনও হেল্পই আমার কাছ থেকে পাবে না। সততা না থাকলে জীবনে কোনও কাজেই উপরে উঠতে পারবে না। হ্যাঁ, অসৎ ভাবেও ওঠা যায়, বিরাট বিরাট

এত যে ব্যবসায়ী দেখছ এদের একজনও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে ট্যাক্স ফাঁকি দিইনি, ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করিনি। কিন্তু ওরা আলাদা জাতের। ওরা রাতে ঘুমোবার জন্য স্লিপিং পিল খায়, ওদের রোজ ব্লাডপ্রেশার চেক করাতে হয়। কিন্তু বউ-বাচ্চা নিয়ে আনন্দে, খাবার হজম করে, কোষ্ঠকাঠিন্য মুক্ত থেকে, মনের শান্তি নিয়ে যদি জীবন কাটাতে চাও তা হলে যতটা সম্ভব সৎভাবে তোমাকে চলতে হবে।"

পুলিন কথাগুলো বলতে বলতে অনুভব কবল তার নিজেকে খুব হালকা লাগছে। যেন তৈরিই ছিল, বলাব সুযোগ পেয়ে আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল। নিজেকে তাজা ঝরঝরে লাগার সুখটা সে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য চেয়ারে হেলান দিল। আর তখন আয়নার কোনায় একচিলতে বস্ত্র সে দেখতে পেল। নীল বঙেব।

"কে?... কে ওখানে?" পুলিন সোজা হয়ে চাপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে সে এগিয়ে গেল।

জড়সড়ো হয়ে ছায়া দাঁড়িয়ে। কুণ্ঠাভবে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

"কী ব্যাপার, কী দবকার?"

পুলিন তার স্বর যথাসম্ভব নিস্পৃহ, দোকানিসুলভ রাখার চেষ্টা করল। দোকানের বাইরে একটা টেম্পো দাঁড়িয়ে। কাঠ এসেছে। দেবু সেখানে দাঁড়িয়ে। গদাই আর একজন মিস্ত্রি কাঠ ঘাড়ে নিয়ে গলি দিয়ে পিছনে চলে গেল।

"কিছু বলবে আমায়?"

"হ্যাঁ।"

"এখন একজনেব সঙ্গে দরকারি কথা বলছি। একটু পবে এসো।"

মুখ না তুলে ছায়া মাথা হেলাল। মন্থর পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দোকানেব পিছন থেকে কাঠেব উপব কাঠ রাখার শব্দ হল। দেবু মুখ ঘুরিয়ে ছায়ার দিকে তাকিয়ে টেম্পোব দিকে সরে গেল।

"শোনো।" পুলিন চাপা গলায় ওকে থামাল। "এখানেই বোসো। আমাব কথা বলা এখুনি হয়ে যাবে।"

পুলিন আবাব এসে চেয়ারে বসল। শঙ্কবের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, "খদ্দেব।" কিন্তু কেন যে এটা তার বলার দরকার হল সে বুঝতে পারল না। ছায়া যে কিছু কিনতে আসেনি সেটা ভালই সে জানে। ওকে পরিচয়ের গণ্ডির বাইরে ঠেলে দিয়ে সে দূবত্ব বাড়াচ্ছে কি ভয়ে?

পুলিনকে প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে শঙ্কর বলল, "আপনি বলছিলেন মনের শান্তি নিয়ে থাকতে হলে...।"

"ও।...যাক গে ও-সব কথা। তোমায় যা বললাম সেটাই আগে করো।"

ছায়া বাইরে বসে। এখান থেকে কথা বললে শোনা যায়। নিশ্চয়ই শোনার চেষ্টা করছে।

"শম্ভুর চিঠি নিয়ে আগে ওইসব কোম্পানিগুলোতে যাও, তাবপর আমার কাছে এসো। ভাল অর্ডাব ধরিয়ে দেব। এই অঞ্চলে আরও বাড়ি হবে। হু হু করে জমির দাম যেমন বাড়ছে আর তেমনি বিক্রিও হচ্ছে। এখানেই তুমি দোকান দাও, মালের স্টকিস্ট হও। আমি টাকা দেব... অবশ্য যদি বুঝি তুমি পারবে।"

"আমি পারব।" চকচক করছে শঙ্করের চোখ। উত্তেজনায় মুখটা লালচে। ডুবন্ত মানুষের সামনে ছুড়ে দেওয়া লাইফবেল্ট দেখার মতো এখন তার অবস্থা। আঁকুপাঁকু করে উঠছে বাঁচার সন্ধান পেয়ে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পুলিনের মনে হল অনেকটা এই রকম চোখেই প্ল্যাটফর্মে ছায়া তার দিকে তাকিয়েছিল।

"আচ্ছা এখন এসো। দোকানের মাল এসেছে, দেখতে হবে।"

শঙ্কর চেয়ার ছেড়ে উঠে, টেবলটা ঘুরে এসে প্রায় হুমড়ি দিয়ে পড়ল পুলিনের পায়ের উপর। সে আপত্তি জানাল না, বাধাও দিল না। সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল।

যাবার আগে শঙ্কর কী যেন বলল। পুলিনের মাথায় তা ঢুকল না। সে ছায়াকে দেখতে পাচ্ছে। হাঁটু জড়ো করে একটু ঝুঁকে, মাথা নামিয়ে চেয়ারে বসে। দুই হাতের কর কোলের উপর। আঙুল নাড়ানাড়ি করছে আর গভীর মনোযোগে তাই দেখছে।

ও এখন কথা বলছে। নিজের সঙ্গে। কী কথা বলতে পারে? কথা তো ও তৈরি করেই এসেছে বোধহয় ঝালিয়ে নিচ্ছে। পুলিন ঠোঁটের দিকে নজর রাখল। নড়ছে না। ছায়া মুখ তুলে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল। ওর বাঁ কানের পাশে গালের কাটা দাগটা কি মিলিয়ে গেছে? বছর পনেরো আগের ব্যাপার।

পুলিন উঠে দাঁড়াল।

আট বছর বয়সে চোর-পুলিশ খেলার সময় পড়িমড়ি ছুটে বুড়ি ছুঁতে গিয়ে রকের কিনারে লেগে তার থুতনি কেটে গেছল। সেখানে আধ ইঞ্চি মতো দাগ হয়। ক্রমশ সেটা কমতে কমতে এখন ধানের মতো হালকা একটা আঁচড় মাত্র হয়ে আছে। দাড়ি কামাবার সময়ই শুধু নজরে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়াও বেড়ে ওঠে কিন্তু দাগ কি পুরোপুরি মিলিয়ে দিতে পারে?"

ছায়া উঠে দাঁড়াল।

"কী বলবে?"

"আমি এসেছি।"

কী জন্য? বিয়ে করবে বলেছিলে, এখন করো। এই জন্যই তো! পুলিন ওর চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে দেখে ছায়া চোখ নামিয়ে নিল।

"তুমি তো বিয়ে ঠিকঠাকই করে ফেলেছ। কবে তোমাদের বিয়ে?"

বাইরে গদাইয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে মিস্ত্রির। দেবুর হাতে চালানের কাগজ। টেম্পোর ড্রাইভারের সঙ্গে সে কথা বলছে। এবার ও দোকানের ভিতরে আসবে সই করাবার জন্য। খদ্দের আসার সময় এখনও রয়েছে। সাড়ে ন'টার ট্রেনে ফেরা অনেকেই বাড়ি যাবার পথে জিনিস দেখতে, দর জানতে দোকানে ঢোকে।

"বিয়ে করব না।" ছায়া মাথা নাড়ল।

"সে কী! কীরকম খাটে শোবে তাও পর্যন্ত পছন্দ করে ফেলেছ আর এখন বলছ করব না?"

"করব?"

প্রশ্ন নয়। যেন জানতে চায়, যদি অনুমতি দাও। যেন একটা গোয়েন্দা গল্পের শেষ পরিচ্ছেদ জানার ইচ্ছা ছায়ার কণ্ঠে। একটা জটিল গোলকধাঁধা, যেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছে। যেন সে বললে তবেই বিয়ে করবে নয়তো করবে না। ছায়ার চোখে কাতর আবেদন, যেন পুলিন বলে, কোরো না।

"আমি বলার কে? তুমি এখন বড় হয়েছ, নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, রোজগার করছ, বিয়ের পাত্রও ঠিক করে ফেলেছ...।"

তার কথার মধ্যে কি হতাশা ফুটে উঠল? পুলিন সন্ত্রস্ত হয়ে কথা অসম্পূর্ণ রাখল। তিক্ততা, জ্বালা, এমনকী ঈর্ষা? কাশীনাথকে ঈর্ষা!

"বিয়ে আমি যখন খুশি ভেঙে দিতে পারি। করব বললেই করতে হবে নাকি?" ছায়ার নাকের পাশে চামড়া কুঁচকে ভাঁজ পড়ল।

"হ্যাঁ, তা ভেঙে দেওয়া যায়। ভেঙে দিতে চাও নাকি?" পুলিন দেখল দেবু দোকানে ঢুকছে। "পরে কথা বলব, এখন এসো।" পুলিন এগিয়ে গেল দেবুর দিকে।

"দেখে নিয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

পুলিন চালানটা হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পার্টিশনের ভিতরে ঢুকে গেল। একটু সময় নিয়েই কলম খুঁজে সই করল। বেরিয়ে এসে দেখল দোকানে ছায়া নেই। সে দরজার কাছে গিয়ে দু'ধারে তাকাল। আবছা রাস্তার আলোয় মনে হল হনহন করে ছায়া চলে যাচ্ছে সিদ্ধেশ্বরীর গোডাউনের দিকে। কাশীনাথ কি এখন আস্তানায় আছে? ওখানে ছায়ার যাবার কী দরকার?

পুলিন হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করল। তার মনে হল সে নিজেই যেন ছায়াকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল। ছায়ারই বয়সি কিংবা ওর থেকে ছোটই হবে ছেলেটা। নির্জন গোডাউনে কাশীনাথের যদি বিশেষ কোনও বদ ইচ্ছা জাগে? ওদের মধ্যে শরীর ঘাঁটাঘাটি কি ইতিমধ্যে হয়নি? নিশ্চয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এই নিয়ে তার মাথা-ব্যথার কী আছে যখন ওদের বিয়ে ঠিক হয়েই গেছে!

রত্না স্টুডিয়োর ছবির শো-কেসের অর্ধেকটা পুলিন দেখতে পাচ্ছে। তুষারকণার বাঁ কাঁধ, ব্লাউজের চেপে-বসা হাতার প্রান্তে ফুলে ওঠা মাংস, কনুই। সামনে এক পা এগোলেই সে মুখটা দেখতে পাবে। পুলিন ইতস্তত করল। বহুদিন বহুবার ছবিটা দেখেছে। তবু আর একবার দেখার লোভ সে সামলাতে পারল না। পা বাড়িয়েই সে পিছিয়ে এল। কাউন্টারে সুকুমার কথা বলছে একটি লোকের সঙ্গে। দেখতে পেলেই জিজ্ঞেস করবে, হার্ট কেমন আছে? ও বিশ্বাস করেছে তার হার্টের অবস্থা খারাপ।

অনেকেই তার সম্পর্কে অনেক কিছু বিশ্বাস করে এক-একটা ধারণা বানিয়ে বসে আছে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারবে সে শিবানীর স্বামী, একটু আগে যে মেয়েমানুষটা দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সেই খুনি, জেল খেটে ফিরে এসেছে, আবার আসতে চাইছে তার কাছে! তখন সেই সব বিশ্বাস আর ধারণাগুলো মুহূর্তে বদলে গিয়ে ঘৃণা আর ভয়ের লাঠি উঁচিয়ে তাকে কি তাড়া করবে না?

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেও আবার কি তাকে ছায়ার মধ্যে ঢুকতে হবে? সারা জীবনই কি অনিশ্চিত ভয়ের কিনার ধরে হেঁটে যেতে হবে? বুকের মধ্যে একটা পাষাণ ভার চাপিয়ে নিজেকে কুঁজো করে ফেলার দরকার কী? শঙ্কর ছেলেটা নিজের হাতে পোস্টার লিখে অনুদের দেওয়ালে সেঁটেছিল। কিন্তু সেটা কি অনুকে কলঙ্কমুক্ত করতে নাকি পাষাণটা বুক থেকে নামিয়ে নিজেকে সোজা করতে?

"দাদা এখন কি আর আমার থাকার দরকার আছে?"

"যাবি? গদাইকে বল দোকান বন্ধ করতে।"

"এখুনি বন্ধ করবে! এত তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

তুষারকণা একদিন নিশ্চয় বুঝতে পারবে সে একটা ভুল ধারণা করে পুলিনকে চড় মেরেছিল। এটা বুঝলেই ওর বুকে একটা পাষাণ চেপে বসবে। কতদিন সে-ভার বইতে পারবে? তখন কি তুষারকণা অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে এসে বলবে...।

"খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় গদাই। ভেতরের দরজাটা বন্ধ করে দিস।"

তুষারকণার স্বামী জেল খাটছে। পাঁচ বছর পূর্ণ হতে আর নাকি এক বছর বাকি। ধরা যাক সেটা আরও কম, ছ'মাস। তার মধ্যে কি পাষাণভার ওর বুকে চাপবে? আপনা থেকে চাপবে কী করে, চাপিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিতে হবে তুমি নির্দোষ একটা সৎ লোককে অযৌক্তিকভাবে শাস্তি দিয়েছ...অপমান করেছ। কিন্তু কীভাবে সে বোঝাবে? ওর সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগই সে জীবনে আর পাবে না।

পুলিন থমকে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে সে কোথায় চলে এসেছে? ডান দিকের পাঁচিলটা তুষারকণাদের। রাস্তার টিউবওয়েলের হ্যান্ডেলটা উঁচু করে কেউ তুলে রেখে গেছে। পাঁচিলের উপর দিয়ে ভিতরে দেখার চেষ্টা করল। শোবার ঘরের জানলার পাল্লার জোড়ের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। পুলিন তাকিয়ে রইল বন্ধ জানলার দিকে। সাদা সুতোর মতো আলো কপাটে।

এখন যদি হঠাৎ জানলা খুলে তুষারকণা দাঁড়ায়! রত্নার শো-কেসে রাখা ছবিটার মতো মুখটা একটু বাঁ দিকে ফিরিয়ে, থুতনির নীচে ভাঁজ আর কানের উপর ঝুলে থাকা চুল। মনে হবে যেন স্কেচ করার জন্য দুটো আঁচড় কাটা হয়েছে। বাইরের অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ভেবে, দেখার জন্য চোখের মণি বড় করে তাকাবে।

এটা খস খস শব্দ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। পুলিন তাড়াতাড়ি টিউবওয়েলের হাতলটা নামিয়ে এনে পাম্প করতে শুরু করল। জল বেরিয়ে আসামাত্র চটি খুলে ডান পা বাড়িয়ে দিল ধোবার জন্য। এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কাউকে তার কৌতূহলী করে তোলার ইচ্ছা নেই।

একটা কালো রঙের গোরু তার পাশ দিয়ে চলে যেতেই পুলিন অপ্রতিভ হয়ে চটি পরে নিল। নিশ্চয় সে ভিতরে ভিতরে টান হয়ে উঠেছে। ছায়া সেই যে দোকান থেকে তখন বেরিয়ে গেল আর ফিরে আসেনি। আসার কথা। আসবেই। একটা অসম্ভব দাবি নিয়ে ও বাঘের মতো গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে তার সামনে নীরবে দাঁড়াবে। লক্ষ করবে তার চোখমুখের ভাব, গলার স্বর। তারপর শিকারকে পিছু হটতে দেবে। কিন্তু ঘুরে গিয়ে ছুটে পালাতে দেখামাত্রই লাফিয়ে এসে ঘাড় কামড়ে ধরবে। শিরদাঁড়ার

ঠিক উপরের একটা জায়গা আছে যেখানে আঘাত করলে সারা শরীর অবশ হয়ে যায়। ছায়া তাকে অবশ করে দেবে। ওর দেহটাকে আবার পাবার বাসনা কি তার হচ্ছে?

সিদ্ধেশ্বরীর গেটের লোহার চাদরের পাল্লা অল্প ফাঁক। একটা মানুষ গলে যেতে পারে। পুলিন থমকে দাঁড়াল। বটগাছের ছায়া পড়েছে গেটে। দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে ম্লান আলোর আভাস। ভিতরে আলো জ্বলছে। এই সময় গেট খোলা থাকার কথা নয়। পুলিন রাস্তা ছেড়ে ঢালু জমিতে নেমে এগিয়ে গেল।

পাল্লা ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বালির গাদা, তার পাশে ইটের আল দিয়ে ঘিরে রাখা আছে সুরকি। টিনের চালের খুঁটি আর একটা কোদাল ছাড়া পুলিন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কোনও শব্দ? সে কান পাতল। মনে হল গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। দু'জনের গলা। একজনের গলায় অনুযোগ, থেমে থেমে বলছে। অন্যজনের স্বরে সান্ত্বনা। পুলিন দুটি গলাই চেনে। সে পাল্লার ফাঁক দিয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল ভিতরে দেখার জন্য।

তিন কি চার সেকেন্ড মাত্র সে দেখতে পায়। খাটিয়ায় পা ঝুলিয়ে ছায়া বসে। খয়েরি ব্লাউজের বাঁ হাতার মধ্যে বাহু ঢোকাল, মুখটা নিচু করা, কনুই মুড়ে অন্য হাতার মধ্যে ডান বাহু ঢোকাচ্ছে, সাদা ব্রেসিয়ার, কালো সায়া, শাড়িটা খাটিয়ার একধারে ঝুলছে, পায়ের কাছে চটি জোড়া। হাত দুয়েক তফাতে খালি গায়ে উবু হয়ে বসে লুঙ্গি পরা কাশীনাথ। ডান বাহুটা ব্লাউজে ঢুকিয়ে ছায়া মুখ তুলল। পুলিন মাথাটা টেনে নিল।

তার সঙ্গে চোখাচোখি হল কি? ছায়া মুখ তুলেই সোজা তাকিয়ে ছিল গেটের দিকে। পুলিন দ্রুতপায়ে রাস্তায় উঠে এসে দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাওয়ায় ভেসে আসা মেঘের মতো তার মাথার মধ্যে এখন একটা রাগ সন্তর্পণে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তার শুধু মনে হচ্ছে সে ঠকে গেছে। ছায়া তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একদমই বদলায়নি। আটটা বছর জেলে থেকেও কিছুই ওর সংশোধন হয়নি। 'জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য যেন আকুলি-বিকুলি করছে লতিকার মন।' এই জন্যই আকুলি-বিকুলি!... 'মনে এক কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।' এই হচ্ছে দগ্ধ হওয়ার কাজ!

পুলিন দোকানের পাশের পথ দিয়ে ভিতরে এল। গদাই আলো জ্বালিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছে। শোওয়া মাত্র ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে। দোকানের ভিতরের দরজাটাও বন্ধ করেছে। খাবার ঢাকা রয়েছে টেবলে। পুলিন শোবার ঘরে ঢুকে পাখা চালিয়ে পাঞ্জাবি খুলল। ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে সে মনে করার চেষ্টা করল মিনিট পাঁচেক আগে সে কী দেখেছে।

ছায়ার অর্ধনগ্ন দেহটা তার চিন্তার কেন্দ্রে এসেই পিছলে সরে যাচ্ছে। সেখানে ফুটে উঠছে দশ বছর আগের ছায়া। কালো পুরু ঠোঁট, বড় বড় দাঁত, বেঁটে বেঁটে আঙুল, থ্যাবড়া পায়ের পাতা, নখে ময়লা, ফাটা গোড়ালি, মাড়ি বার করা বাসি ঘামের আর তেলের গন্ধ নিয়ে একটা মাংসালো দেহ পুলিনের চোখে ভেসে উঠছে। ওই মেয়েটাকেই সে চেনে। কোর্টের রায় শোনার পর চোখে ধকধকে আগুন নিয়ে তাকিয়েছিল ছায়া। যত ঘৃণা ষোলো বছরে জমিয়েছে তার সবটুকু যেন ওই কয়েক সেকেন্ডে সে বার করে দিয়েছিল।

হয়তো শোধ নেবে। গোঁয়ার, তেজি, বুদ্ধিহীনা। দখনো অঞ্চলের মেয়ে। ওইসব দিকে খুন করাটা জলভাতের মতো ব্যাপার। ছায়ার কাছে শিবানীর অস্তিত্বটা বিরক্তকর ঠেকেছিল বলে সরিয়ে দেয়। ও কি জানত না এ-জন্য তার জেল হবে? হয়তো জানত। কিন্তু আবেগের তাড়নাকে ঠেকাতে পারেনি। সেই আবেগ নিয়েই আবার ও আসবে।

খিদে বোধ করছে পুলিন। ঘর থেকে বেরিয়ে সে দালানে এল। হাত ধুয়ে খাবারের বাটির ঢাকনাটা খুলে টেবলে রাখার সময় কাগজ মাড়ানোর মতো একটা হালকা শব্দ শুনে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল।

ছায়া পায়ে পায়ে এগিয়ে দালানের দরজার কাছে এসে দ্বিধা করছে।

"ভেতরে এসো।"

ছায়া দালানের আলোর নীচে দাঁড়াল।

"বোসো চেয়ারটায়।"

স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠল ওর মুখে। পুলিন ওর গাল, গলা, বাহুর উপর দিয়ে চোখ বোলাল। সেখানে

কাশীনাথের প্রেমের কোনও চিহ্ন রয়েছে কি না বুঝতে পারল না। জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসে হাতের আঙুল খুঁটছে। পুলিন ওর হাতের নখে লাল রঙের পালিশ দেখল।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" পুলিন প্রশ্নটা করেই মুখোমুখি টেবলে বসল।

"এইখানেই।" ধীর উত্তর। প্রসঙ্গটা এড়াতে চায়।

"এখানে মানে তো সিদ্ধেশ্বরীর গোডাউনে।"

ছায়া উত্তর দিল না।

"কী বলবে যেন?"

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ও পুলিনের মুখের দিকে। খুঁজে দেখছে কিছু। চোখ নামিয়ে টেবলে রাখল। পুলিন নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলল।

"আমাকে আপনার কী মনে হয়?"

"আগের মতোই আছ।" কথাটা কীভাবে যে মুখ থেকে বেরিয়ে এল পুলিন বুঝতে পারল না। হাঁফ ছাড়ার সঙ্গেই বোধহয় বেরিয়েছে। তার টানটান অবস্থাটা একটু আলগা লাগছে। বিয়ে করতে হবে বলেনি।

"না নেই। আগের মতো আমি নেই।"

"তাই নাকি? একটু আগেই সিদ্ধেশ্বরীতে কী করছিলে কাশীনাথের সঙ্গে? আমি দেখেছি।"

"অ।" ছায়া বিচলিত বা লজ্জিত হল না। "কাশীর অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, তাই মিটিয়ে দিলুম।"

"তার মানে! মিটিয়ে দেওয়াটা কী? আর কখনও তোমরা কি...?"

ছায়া মাথা নাড়াল। "আর ওকে বিয়ে করতে পারব না। ওকে আজ বললুম আমি কী রকম মেয়ে, কী কাজ করেছি, জেলে কত বছর ছিলুম।"

"আমার কথাও বলেছ?" পুলিনের স্বর কেঁপে উঠল। সামনে ঝুঁকে সে পাথরের মতো জমাট বেঁধে গেল। বুকের মধ্যে গুরগুর করছে।

"এ-সব শুনেও আমাকে বিয়ে করতে চাইছিল।" ছায়া অগ্রাহ্য করল পুলিনের ভয় পাওয়া অবস্থাটাকে।

"আমার কথাও কি বলেছ?" তীক্ষ্ণ চাপা প্রায় ধমকের মতো হয়ে উঠল পুলিনের কথাগুলো। "আগে এটার জবাব দাও।"

"হ্যাঁ।" সহজভাবে ছায়া তাকিয়ে রইল।

অসাড় হয়ে গেল পুলিন। এই ভয়টাও সে করেছিল। মাথা থেকে ভয়ের নির্দেশ বহন করে স্নায়ু মারফত সেটা আঙুলে পৌঁছে গেছে। সে আঙুল মুঠো করে টেবলে ঘুসি বসাতে চেষ্টা করল। হাতটা উঠল না।

ছায়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করে যাচ্ছিল। মাথা নেড়ে বলল, "না, সে-সব কিছু বলিনি। বলেছি আপনাকে আমি শুধু চিনি। ভাল লোক। আমাকে ভালবাসতেন।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি বলছি।"

"হ্যাঁ, আমি ভালবাসতাম। তুমিও বাসতে, তাই না?"

ছায়া মাথা হেলিয়ে স্বীকার করল। পুলিনের মনে হচ্ছে শরীরের ভিতর এত জোরে রক্ত চলাচল করলে এখুনি তার কলিজার দম ফুরিয়ে যাবে। ছায়া এত পরিণত হয়ে গেছে!

"কিন্তু এখন আমি আপনাকে ঘেন্না করি, যেমন আপনিও আমাকে করেন।"

ছায়ার কথাগুলো বজ্রের মতো টেবলের উপর পড়ল। তাতে শুধু ঝলসে গেল পুলিনের মুখটা। কানের পর্দা ফেটে গেল। অন্ধের মতো সে তাকিয়ে রইল। কালো ঝাপসা একটা ছায়াকে সে টেবলের ওধারে আড়াই হাত দূরে দেখতে পাচ্ছে।

"আপনাকে যে আবার জীবনে দেখতে পাব, সে আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। জেল থেকে বেরিয়ে তাই খোঁজার চেষ্টাও করিনি। ভগবানের কী ইচ্ছে দেখুন, কীভাবে যে দেখা হয়ে গেল! তারপর থেকে আমি একটা রাতও আর ঘুমোতে পারিনি। কী যে যন্তনা! বিচুটি দিয়ে সারাক্ষণ কে আমায় যেন মারছে।

আমি আপনাকে দেখব বলে কতবার এই দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়ত করেছি। আপনি দেখেও দেখতেন না।"

"কই আমার চোখে তো পড়েনি।"

"আমার ভাগ্য। সেদিন ইস্টিশনে আপনাকে দেখে আর থাকতে পারিনি। কিন্তু আপনার চোখে মুখে যে ঘেন্না ফুটে উঠল...।" ছায়ার কণ্ঠে কেঁপে ওঠা আবেগ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। সে সময় নিল নিজেকে নিস্তরঙ্গ করতে।

"আমার খুব তাড়া ছিল। একজন বিপদে পড়েছে তাকে টাকা দিতে...।"

"আপনাকে দেখে কেন জানি ভয় করল। মনে হল আপনি আমাকে খুন করবেন।"

আবার বজ্রপাত হল টেবলে। ছায়া উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আমি বুঝতে পারি কে আমার ক্ষতি করবে, কে আমার প্রাণ নেবে। আমি লোক চিনি। আজ দোকানে আপনার দিকে তাকিয়ে দেখলুম ঘেন্নার সঙ্গে ভয়ও, আমাকেই। আমি আবার খুন করব এমন একটা ভাব যেন আপনার মুখে রয়েছে।"

ছায়া তার দিকে তাকিয়ে। পুলিন ফ্যাকাশে মুখে কিছু বলার চেষ্টায় ঠোঁট নাড়ল। গলার কণ্ঠাটা শুধু ওঠানামা করল।

"কিছু বলবেন কি?" ছায়া প্রায় ফিসফিস করে বলল। ক্ষীণ মিনতি ওর গলায়। কিছু একটা আশা পাবার মতো কথা যেন ও শুনতে চায়।

"আমি ভদ্রলোক। ভদ্রভাবে আমি বাঁচতে চাই।"

"আমি আর কখনও রেললাইনের এপারে আসব না।" মাথা নিচু করে বসে থাকা পুলিনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নিভে এল ছায়ার চোখ।

সকালে ঘুম ভাঙল গদাইয়ের ডাকে। কানের কাছে মুখ রেখে সে চেঁচাচ্ছে, "ও দাদা, এখানে কেন ঘুমোচ্ছেন, ঘরে গিয়ে খাটে শোন।"

পুলিন চোখ খুলেই বন্ধ করে ফেলল। কিছুক্ষণ পর টেবল থেকে মাথা তুলতে গিয়ে ভার ভার বোধ করল। তখন তার মনে পড়ল, বুকে একটা ব্যথা হবার কথা আছে সেটাই বোধহয় শুরু হল।

আবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সে নিশ্চিন্তে মাথাটা নামিয়ে দিল টেবলে।

দ্বিতীয় ইনিংসের পর

সাতই ডিসেম্বরের ভোরে, রাজধানী এক্সপ্রেসের তেরো নম্বর চেয়ার-কার থেকে কানপুরের প্ল্যাটফর্মে নেমেই সরোজ সাদা শালটা সোয়েটারের উপর জড়িয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে কামরার জানলার দিকে তাকাল। শালটি মেয়েদের তাই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোট। কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গকে একপাক ঘিরে রাখতে তার অসুবিধে হল না। সে ভেবেছিল পর্দা সরিয়ে এইসময় একজোড়া চোখ তাকে বিদায় জানাবে। সে-রকম কিছু হল না। পর্দাটা একই রকম টানা রয়েছে।

ঠান্ডাটা যে কেমন হাতের আঙুল কান আর নাক অসাড় হয়ে আসা থেকেই সে বুঝেছে। শুধু একটা ফুলহাতা সোয়েটারের বর্মে এমন শীতকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। শালটা যদি না দিত...।

সরোজের সঙ্গে যারা নামল তাদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে ট্রেনেই তার আলাপ হয়েছে। বছর কুড়ির ছেলেটি তার পাশেই জানলার ধারের চেয়ারে ছিল। নাম জানা হয়নি। কানপুর আই আই টি-তে ইলেকট্রিক্যাল পড়ছে। প্রথম বছর। কথা প্রসঙ্গে জেনেছে, ওরা কাতারে থাকে, বাবা তেলের ইঞ্জিনিয়ার। আগে থাকত দুলিয়াজানে। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য আই আই টি-তে কিছু আসন বরাদ্দ থাকে, সেই সুযোগ নিয়ে ও পড়তে এসেছে। একটা ইংরেজি খেলার সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে চোখ বোলাচ্ছিল। নিউজিল্যান্ড শুধু তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে অল্পদিনের সফরে এসেছে, মাদ্রাজে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলায় ভারত সাতাশি রানে জিতেছে। দ্বিতীয়টি কানপুরে। শুধু ক্রিকেটেরই ছবি আর কথায় সাপ্তাহিকটি ভরা। সরোজের মনে হল ছেলেটি ক্রিকেট পছন্দ করে না।

প্ল্যাটফর্মে নেমে ছেলেটি একবার শুধু তার দিকে তাকিয়েই বাইরে যাবার জন্য পুবের ফটকের দিকে দ্রুত চলে গেল।

সিগারেট ধরাবার জন্য হাতের গ্রিপটা মেঝেয় রেখে সরোজ আড়চোখে জানলার দিকে আবার তাকাল। পর্দাটা একই ভাবে। ছোট্ট একটু ফাঁক অবশ্য রয়েছে, তাতে ওধার থেকে কেউ তাকিয়ে থাকলেও বোঝা যাবে না।

প্ল্যাটফর্ম কোলাহল বর্জিত, শান্ত। শীতের এই ভোরে রিকশাওয়ালা, কুলি, হোটেলের টাউট, রেলের কর্মী আর ট্রেন থেকে নামা যাত্রী মিলিয়ে জনা চল্লিশ লোক। প্ল্যাটফর্মের চটির দোকানগুলো বন্ধ, চা-এর স্টলে ভিড় নেই। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি নেই। এত বড় স্টেশনটা শীতকাতুরে মানুষের মতো গুটিসুটি হয়ে রয়েছে।

"বাবু হোটেলে যাবেন?"

সরোজ হাত নেড়ে লোকটাকে জানিয়ে দিল সে কথা বাড়াতে ইচ্ছুক নয়। ট্রেনে আলাপ হওয়া দ্বিতীয় লোকটি কুলির মাথায় সুটকেস চাপিয়ে হাতের তালু ঘষতে ঘষতে কাছে এল। লাল পোলোনেক সোয়েটারের উপর কালো কোট। "আমাদের তো ওভারব্রিজ দিয়ে একদম ওধারে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ।"

জানলার দিকে শেষবার তাকিয়ে সরোজ গ্রিপটা তুলে নিয়ে ব্রিজের সিঁড়ির দিকে এগোল। চার বছর আগে শেষ কানপুরে এসেছিল। মোটামুটি শহরটাকে তার মনে আছে।

"শালটা ছোট বটে কিন্তু খুব কাজের।"

সরোজ জবাব দিল না।

"বলেছিলুম লেট মেক আপ করে নেবে, দেখলেন তো।"

কবজিতে আঁটা ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরে অসম্ভব তৃপ্ত দেখাল লোকটিকে।

"উনি কিন্তু দিল্লিতে মুশকিলে পড়বেন, ওখানে আরও ঠান্ডা...অবশ্য যখন পৌঁছবেন তখন ভালই রোদ উঠে যাবে। তবু যদি বাতাস চলে..."

"উনিটা কে?"

সরোজ তার গম্ভীর স্বরটা প্রয়োগ করল লোকটিকে নিরুৎসাহ করতে।

"উনি!" লোকটি বিব্রত হবার কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে বলল, "রাতে খাওয়ার পর যার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন, আর ওনার মেয়ে উঠে এসে ততক্ষণ আপনার চেয়ারে বসে রইল, সেই ভদ্রমহিলা!"

সরোজ এখনও লোকটির নাম জানে না। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও মনে হল থাক, নাম ধরে সম্বোধন ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এনে দেয়, তা হলে বকবকানি আরও বেড়ে যাবে।

ওভারব্রিজের মাঝামাঝি এসে সরোজ পিছনে তাকিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসকে শেষবারের মতো দেখে নিল। আর মিনিট কয়েক পরই ছাড়বে।

"ভদ্রমহিলা খুব কড়াধাতের অথচ মনের মধ্যে কত সফট। আপনার আত্মীয়া?"

এবার সরোজ কৌতূহলী হয়ে পড়ল। একদমই অপরিচিত, মাত্র কাল বিকেলে হাওড়ায় ট্রেনে উঠে লোকটির সঙ্গে প্রথম আলাপ এবং সেটাও প্রায়-ঝগড়ার মতো।

"সফট কেন মনে হল?"

"মেয়েকে দিয়ে শালটা আপনাকে পাঠিয়ে দিলেন, সফট মাইন্ড না হলে কি এই শীতে কেউ গরমকাপড় হাতছাড়া করে?"

"অ। আর কড়াধাত বুঝলেন কী করে?"

"কেন, পাঞ্জাবিটাকে কেমন ডেঁটে দিলেন দেখলেন না?"

কাল বিকেলে ট্রেনে ওঠার পর নিজের কয়েকটা ব্যবহার, কণ্ঠস্বর, ভঙ্গি, মনের অবস্থা সরোজের মনে পড়ল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে লোকটির মুখের দিকে এই প্রথম সে প্রসন্ন চোখে তাকাল। প্রায় বারো ঘণ্টা আগে তেরো নম্বর কামরায় বিরক্ত চোখে তাকানোর ব্যাপারটা ঝট করে মনে ভেসে উঠল।

হাওড়ায় নম্বর খুঁজে সিটটা পাওয়ার পর হ্যান্ড গ্রিপটা র‍্যাকে তুলে রাখতে গিয়ে সে দেখে একটা ঢাউস সুটকেস জায়গা দখল করে রেখেছে। রুক্ষস্বরে সে বলে উঠেছিল, "সুটকেস কার?"

লাল পোলোনেক সোয়েটারের উপর কালো কোটপরা তার পাশে দাঁড়ানো রোগা লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, "আমার।"

সরোজ আঙুল তুলে বলেছিল, "এত বড় সুটকেসের তো লাগেজ ভ্যানে যাবার কথা, চেয়ার-কারে কি এ-সব তোলে? কমনসেন্স বলে তো একটা কথা আছে, দেখেননি টিকিটে কী লেখা রয়েছে?"

"আমি বরং নামিয়ে রাখছি। এখন আবার বুক করাতে গেলে...," লোকটি হাতঘড়ি দেখে অসহায়ভাবে তাকাল, "ছাড়তে আর মাত্র চার মিনিট বাকি।"

"নামান।" সরোজ ধমকে উঠল। কিন্তু তখনই মনে হল, অত বড় সুটকেস একা নামাবার ক্ষমতা লোকটির নেই।

"সরুন আপনি।"

সুটকেসটা অবশ্য আকারের সঙ্গে মানানসই নয়। সরোজ স্বচ্ছন্দেই নামিয়ে নিল। সুটকেসে জিনিসপত্র কম বোধহয় দু'-চারদিনের জন্য কোনও কাজে যাচ্ছে। লোকটিকে দেখে এখন তার মায়া হচ্ছে। কোথায় যে সুটকেসটা রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। কামরার মাঝখানে যাতায়াতের পথ, তার একধারে তিনটি অন্যদিকে দুটি চেয়ার। পথটা সরু, ওখানে সুটকেস রাখা যায় না।

"রাজধানীতে এই প্রথম?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"সিটের নীচে লম্বালম্বি পেতে রাখুন। বসতে কিছুটা অসুবিধে হবে, তা আর কী করবেন...দিল্লি যাচ্ছেন?"

"কানপুর।"

কিছুক্ষণ ধরেই কামরার ওদিকে ভিড়ের আড়ালে একটা কথা কাটাকাটি চলছিল। সরোজ তাতে কান বা চোখ দেওয়ার আগ্রহ বোধ করেনি। ট্রেন ছাড়ার আগে এ-সব হয়ই। কিন্তু হঠাৎ ইংরেজিতে নারীকণ্ঠে তীক্ষ্ণস্বর শুনতে পেয়ে অন্যদের মতো সে-ও কামরার অন্য প্রান্তে তাকাল। মনে হল যে-কারণে একটু আগে তার স্বর রুক্ষ হয়েছিল ঠিক সেই কারণই ঘটেছে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের

ফাঁক দিয়ে সরোজ দেখতে পেল, ছেলেদের মতো ছাঁটা চুল, সাদা কার্ডিগান এবং মেরুন সিল্কের শাড়িপরা এক মহিলাকে যার মুখটি দেখা যাচ্ছে না। ডান হাতের তর্জনী তুলে মাথায় সবুজ পাগড়ি, এক বৃহৎবপু শিখকে তিনি ইংরেজিতে বোঝাচ্ছেন—"আগে এলেই কি বাঙ্কের সব জায়গা আপনার হয়ে যাবে, এ কেমন যুক্তি? আপনার সিট নাম্বার তো একুশ আর মালপত্র রেখেছেন সাত নম্বরের জায়গায়। এ কেমন করে হতে পারে? তা ছাড়া মানুষ-পিছু একটা মাত্র হাতব্যাগ এই হচ্ছে নিয়ম এবং তা নিজের সিটের উপরেই থাকা বাঞ্ছনীয় আর আপনি ছ'-সাতটা মাল...।"

"কে নিয়ম মানে? কেউ মানে না, এ দেশে নিয়মই নেই।" শিখ বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় মহিলার তুখোড় ইংরেজিতে। উদাসীনভাবে বাঙ্কের দিকে চোখ তুলে সে ইংরেজিতেই ধীরে ধীরে "নিয়ম" সম্পর্কে মতামত দিল। কাছের কয়েকজন যাত্রী তাকিয়ে আছে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখার জন্য। তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে না তারা শিখের বিপক্ষে। নিয়ম মেনে একটি হাতব্যাগ নিয়ে কেউ-ই ওঠেনি।

"তা হলে আপনি মালপত্র হটাবেন না? ঠিক আছে, কন্ডাক্টরকেই বলতে হচ্ছে। চেয়ার-কারকে যেন লাগেজ ভ্যান করে তুলেছেন।"

"জায়গা তো রয়েছে, আপনি রাখুন না আপনার জিনিস...দিন রেখে দিচ্ছি।"

শিখটি মহিলার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নিল প্রসাধনের চৌকো বাক্সটি। দুটো কার্ডবোর্ডের প্যাকেটের ফাঁকে জায়গা বার করে বাক্সটি গুঁজে দিল। জিন্‌স ও শার্ট-পরা, চোখে চশমা, লম্বা ছিপছিপে, শ্যামবর্ণা যে-মেয়েটি মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে, সে তার হাতে ঝোলানো নকশা-করা চামড়ার থলিটি শিখের প্রসারিত হাতের নাগাল এড়িয়ে জানলার পাশে হুকে ঝুলিয়ে দিল।

সরোজ হাতঘড়ি দেখে বিড় বিড় করে তখন বলেছিল, "আশ্চর্য, পাঁচ মিনিট হয়ে গেল এখনও ছাড়ল না। শিখটা ঠিকই বলেছে, নিয়ম কেউ-ই মানে না।"

"পথে লেট মেক-আপ করে নেবে।"

সরোজ কৌতূহলী চোখে কালো-কোটপরা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলছেন করে নেবে?"

"অর্ডিনারি মেল ট্রেনই দশ-পনেরো মিনিট লেট ইজি মেক আপ করে নেয়। আর লেট যদি হয়ই সেটা তো ভালই।"

লোকটি কোটের পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করে, একটা সিগারেটের মাথা টেনে সরোজের দিকে এগিয়ে ধরল।

"কম্পার্টমেন্টে খাওয়া বারণ।"

লোকটা অপ্রতিভ হয়ে চোরাই জিনিস লুকোবার মতো ব্যস্ততায় প্যাকেট সমেত হাতটা তাড়াতাড়ি কোটের পকেটে ভরে নিল।

"বাইরে টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে তো খাওয়া যায়।"

"তা যায়, কিন্তু এখন আমার খাবার ইচ্ছে নেই। আপনি খেয়ে আসতে পারেন।"

"না থাক।"

সরোজের পায়ের নীচে কামরার মেঝেটা নড়ে উঠতেই সে দুলে গেল। ট্রেন ছেড়েছে। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ও মানুষজনের দিকে সে তাকিয়ে রইল। পিছিয়ে যাওয়ার এই দৃশ্যটা বাল্যবয়স থেকেই তার ভাল লাগে। অবশ্য চার বছর আগে ছোটবোন শান্তাকে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাওয়ার সময় সে বলেছিল, "সবকিছু ফেলে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা অদ্ভুত সেনসেশন পাই।"

"দশ মিনিট লেটে ছাড়ল।"

সরোজ উত্তর না দিয়ে কামরার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাদের মুখগুলোয় চোখ বোলাল। একটি মুখও চেনা নয়। অনেকেই চেয়ারে বসে পড়েছে। তাদের মাথার পিছনটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। কামরার বাইরে যাবার জন্য তাদের প্রান্তের কাচের এক পাল্লার দরজাটা পাঁচ-ছয় মিটার দূরে। চেয়ারে বসতে হবে দরজার দিকে পিছন ফিরে। ধূসর ফিকে নীল উর্দিপরা রেস্টুরেন্টের কর্মীরা দরজার বাইরে ছোট্ট করিডরে কাজে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর ওরা চা দেবে।

হঠাৎ মনে পড়ায় সরোজ জানতে চাইল, "লেট হওয়াটা ভাল, এ-কথা বললেন কেন?"

"আর্লি ডিসেম্বরে নর্থ ইউ পি-র শেষরাত যে কী জিনিস...একটু দেরি করে সূর্য ওঠার পর পৌঁছলে তবু শীতটা কম লাগবে।"

সরোজ ভ্রূ এবং কাঁধ তুলে বোঝাল শীতকে সে খুব একটা গ্রাহ্য করে না। একটা ফুলহাতা সোয়েটার, আর একটা মাফলার ছাড়া তার সঙ্গে আর কোনও শীতবস্ত্রও নেই। হালকা হয়ে বেড়াবার জন্য দু'বছর আগে মাদ্রাজে বর্মা বাজার থেকে হাতে বা কাঁধে ঝোলানো যায়, এমন একটা জাপানি গ্রিপ কিনেছিল। এতে প্রায় এক সুটকেস জিনিস আঁটে। যখন বাইরে গেলে স্যুট পরত তখন সুটকেস সঙ্গে নিত। কানপুর থেকে দিল্লি হয়ে সে ফিরবে, আঠারো দিন কলকাতার বাইরে থাকার কথা। টেলেক্সে গতকালই দিল্লি অফিসকে কলকাতায় ফেরার একটা রাজধানীর টিকিট কেটে রাখতে বলেছে।

"আপনি তো কলকাতারই, কবে ফিরবেন?" সরোজ বলল।

"অফিসের কাজ, দিন চারেক লাগবে।"

"কোথায় উঠবেন?"

"হোটেলে, বুক করাই আছে। আপনি?"

"আমিও হোটেলে..."

দু'জনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সরোজের চোখে পড়ল সাদা কার্ডিগান মেরুন শাড়ির মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ওই প্রান্তের দরজার দিকে এগোচ্ছেন বাইরে যাবার জন্য। সেই সময় দরজা ঠেলে ঢুকল বাচ্চা-কোলে একটি লোক। মহিলা পাশ ফিরে দাঁড়ালেন পথ দেবার জন্য। সরোজের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

মুখটা চেনা, অত্যন্ত চেনা। কুড়ি-একুশ বছর পরও ভুল হবার কথা নয়। ঠোঁটের নীচে বাঁ ধারে তিলটি এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা গেল। একটু চাপা নাক, গালের উঁচু হনু। সরোজের বুকের মধ্যে বাতাসের চাপ তৈরি হচ্ছে, হাতের আঙুলগুলো ঢিলে হয়ে আসছে। মাথার মধ্যে থেকে একটা নির্দেশ মুহূর্তে তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ল— বসে পড়ো।

হঠাৎ তাকে বসে পড়তে দেখে কালো কোটপরা লোকটি আর কথা না বলে দরজার দিকে এগোল।

বীণা!

এত বছর পর কিনা একই ট্রেনে! এখন কোথায় থাকে?...কানপুর, দিল্লি? কী করে? ঘর সংসার...চাকরি? বিয়ে নিশ্চয়ই করেছে, সঙ্গের মেয়েটি কি ওরই? আশ্চর্য, এত বছর...কুড়ি না একুশ...অত হবে কি? কানহাইয়ের দু'শো ছাপান্ন কত বছর আগে হয়েছিল...আজ থেকে উনিশ বছর...তারপর এই! ওর সঙ্গে কথা বলা কি উচিত হবে? ওর বয়স এখন কত, চল্লিশ না উনচল্লিশ, নিশ্চয় বোধবুদ্ধি এখন অনেক ম্যাচিওরড, ইংরেজি আগেও বলতে পারত, বলার অভ্যাস রয়েছে, বাড়িতে সম্ভবত ইংরেজিতেই কথা বলে, মনে হয় অবস্থা ভালই...কালচার্ড বলা যায় এমন একটা ফ্যামিলির মাঝখানে রয়েছে। শিখের সঙ্গে যে-ভাবে কথা বলল তাকে ঠিক ঝগড়া বলা যায় না...উঁচু গলায় তর্ক একটু অ্যাগ্রেসিভ ভঙ্গিতে। ওর কাছে গিয়ে কথা বলা কি দরকার? বললে কীভাবে তাকে নেবে? দরকার কী দেখা হওয়ার, এত বছর তো দিব্যিই কেটে গেল, তার মধ্যে কতবার আর ওকে মনে পড়েছে?

সে এখন জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়া একটা জন্তুর মতো অবস্থায়। যতই জাল ছাড়াতে চায় ততই জড়িয়ে যাচ্ছে। তার মনে হল, বীণার চেয়ারের পাশ দিয়ে অন্যমনস্কের মতো বার দুই হেঁটে গেলে কেমন হয়? যদি মুখ তুলে চিনতে পারে, যদি নাম ধরে ডাকে তা হলে মসৃণভাবে ব্যাপারটা ঘটবে। সে প্রথমে অবাক হবে তারপর চিনতে পারবে। আর যদি দেখেও না-চেনার ভান করে তা হলেও ব্যাপারটা ঠিক থাকবে। সে-ও চিনবে না।

একটা মানসিক জড়তা তাকে গুটিয়ে রাখছে। এটা শুধু এখনই নয়, জড়তাটা বরাবরের। ব্যাপারটাকে সে কুনোমি বলতে রাজি নয়, লাজুকতাও নয়। ছোটবেলা থেকে কখনওই সে বেশি কথা বলায় বা আগ বাড়িয়ে অযাচিত কাজে নেমে পড়ায় নিজেকে নিয়োগ করেনি। তার থেকে অসফল, নিকৃষ্ট, বোকা এবং আকর্ষণরহিতরা চোখে পড়ার জন্য নানান কাণ্ড করেছে যখন, তখন সে চুপচাপ

থাকতে চায়। বরাবরই সে পিছনের সারির, ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেওয়ার দলে। চোখে পড়ার মতো কাজ করে ফেললেই অস্বস্তি বোধ করেছে। কখনও আক্রমণাত্মক নয়, চিন্তায় প্রথমেই সে ধরে নেয়—হবে না, করা যাবে না। উদ্যোগী হয়ে নতুন কোনও কাজে এগিয়ে যাওয়ার বা ছক কষে কিছু আদায় করার থেকে সে পছন্দ করে, যতটুকু পাওয়া যায় তাই সই।

সরোজ তার এই দুর্বলতাটা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু 'দুর্বল' শব্দটা কখনও নিজের সম্পর্কে সে মনে মনেও প্রয়োগ করে না। প্রথমে ধারণা হয়েছিল এটা তার মধ্যবিত্ত গড়বুদ্ধি থেকে পাওয়া শোভনতা এবং রুচির সঙ্গে যুক্ত। পরে তার মনে হয়েছে এর মধ্যে রুচিটুচি, শোভন-অশোভন আসে কী করে? স্কুল ছাড়ার কুড়ি বছর পর অঙ্কের মাস্টারমশায়কে একদিন দেখেছিল ওষুধের দোকানে তার পাশে দাঁড়িয়ে কী একটা কিনছেন। সে বলতে পারত 'কেমন আছেন স্যার, আমি সরোজ আপনার ছাত্র ছিলাম।' এই বলে তখন একটা প্রণাম। কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল যাতে স্যার তার মুখ না দেখে ফেলেন। তাড়াতাড়ি ওষুধটার দাম চুকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেই ভেবেছিল—পরিচয় দিয়ে দুটো কথা বললাম না কেন? উনি চিনতে পারেননি। সেটা স্বাভাবিকই। গম্ভীর, সুদর্শন, পরিশ্রমী ছিলেন, ছাত্রদের শ্রদ্ধা পেতেন। স্যারকে তার ভালই লাগত। বহু কাল পর দেখা হল অথচ সে মুখোমুখি হতে চাইল না! সে ইতিমূলক, উদ্যোগী নয়। স্যার যদি চিনতেন তবেই সে চেনা দিত। কী যেন একটা ভিতর থেকে তাকে টেনে রাখে, সে কুঁকড়ে থাকে।

আধ ঘণ্টা পরই সে নিজেকে বলেছিল, ঠিকই করেছি। কথা মানে তো— এখন কী করছ, ক'টি ছেলেপুলে, তারা কী পড়ছে, এইসব তো! অর্থহীন এ-সব কথাবার্তার মধ্যে না গেলে কোনও ক্ষতি হবে কি, আমাদের দু'জনেরই? আরও আধ ঘণ্টা পর সরোজ নিজেকে বলেছিল—অর্থহীনতার মধ্যে না যাওয়াটাই তো শোভনতা।

কিন্তু বীণাকে দেখেই এইরকম ধপ করে বসে পড়া বা মুখটা একটু নামিয়ে সামনের চেয়ারের আড়ালে রাখার চেষ্টাটার মধ্যে সে কাপুরুষতার ছোঁয়া পেল। এরমধ্যে কোনওরকম শোভনতা বা রুচি নেই।

"যাঁ কী বলছেন?" সরোজ মুখ তুলে তাকাল।

"কোন হোটেলে আপনি?"

"মধুছন্দা।"

"আরে আমিও তো! আপনিও কি অফিসের কাজে?"

"হ্যাঁ।"

সরোজ এবার রেগে ওঠার অবস্থায় পৌঁছচ্ছে। গায়েপড়াদের তার ভাল লাগে না।

"আমার ওষুধ কোম্পানি, বেকার অ্যান্ড লবেন্স, আমেরিকান, হেড অফিসে পার্সোনেলে আছি। একটা ইনভেস্টিগেশনে যাচ্ছি। আপনি?"

"চলুন সিগারেট খেয়ে আসি। বাইরে কথা হবে।"

বীণা সম্ভবত টয়লেটে গেছে। ফিরে আসার আগেই সে বাইরে যেতে চায়। প্রায় বারো ঘণ্টা তারা এই কামরায় থাকবে। বীণা সামনের দিকে সুতরাং সে যতক্ষণ পিছন ফিরে চেয়ারে বসে থাকবে তার মুখ দেখতে পাবে না। তা ছাড়া রাতের খাওয়ার পর আলো কমিয়ে কামরাটা অন্ধকার করে দেওয়া হবে আর ভোররাতে সে কানপুরে নেমে যাবে। এর মধ্যে তাকে দেখে ফেলার সুযোগ বীণা পাচ্ছে না।

প্যাকেটটা বার করে কী ভেবে আবার কোটের পকেটে রেখে মুচকি হেসে লোকটি বলল, "দাঁড়ান, ভাল সিগারেট খাওয়াব। ভাইপো হামবুর্গ থেকে পরশু এসেছে দু'মাসের জন্য। ভাল চাকরি করে।"

লোকটি নিচু হয়ে সুটকেসটাকে বার করার জন্য টানাটানি শুরু করল। সরোজ উঠে দাঁড়াল। বিলিতি সিগারেটের প্রতি তার কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। বরং সে দিশি নিজস্ব অভ্যাসেই আরাম পায়।

"আপনি বার করুন আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।"

প্যান্টের পকেটে সিগারেট প্যাকেট ও দেশলাইটা আছে কি না, চাপড়ে দেখে নিয়ে সরোজ সরু পথটায় বেরিয়ে এসে মুখ ফিরিয়ে একবার অন্য প্রান্তের দরজাটার দিকে তাকাল।

দরজা ঠেলে বীণা ঢুকছে। বড় জোর বারো মিটার দূরত্ব। সারি দেওয়া নিয়ন আলোয় উজ্জ্বল

কামরা। সোজা সামনের দিকে দেখা না-দেখার মতো চাউনি ফেলে বীণা পাল্লাটা ছেড়ে দিতেই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় ছাড়া পাওয়া একটা বাচ্চা টলমল করে পথ দিয়ে এগিয়ে আসছিল। ওকে ধরার জন্য সরোজ নিচু হল। একটি যুবক, সম্ভবত বাচ্চার পিতা, "বান্টি, বান্টি" বলে ডেকে চেয়ার থেকে উঠল। সরোজ হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে হাসি হাসি মুখে সামনে তাকাতেই সোজা বীণার চোখের সঙ্গে তার চোখের ধাক্কা লাগল।

এবার কী হবে।

প্রথমেই তার মনে এই ভাবনাটা জেগে উঠল। বীণার চোখ দুটো সামান্য বড় হয়ে উঠেই ছোট হল। চিনতে পেরেছে। মুখে কোনও ভাব ফুটে ওঠেনি। সত্যিই ম্যাচিওরড হয়েছে। নাটুকে হবার চমৎকার সুযোগটা নিল না। নিজেব ওপব ওর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনেকের থেকেই বেশি। বীণা ঝুঁকে মেয়েটির হাঁটু ঘষড়ে ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসল। একবারও এদিকে তাকাল না।

বাচ্চাটাকে তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে সরোজ ঘুরেই, চেয়ারের ওপর রাখা ডালাখোলা সুটকেস হাতড়ানোয় ব্যস্ত লোকটির পাছায় ধাক্কা দিয়ে এবং 'সরি' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেছল।

কয়েক ঘণ্টা আগে কাল বিকেলে সরোজ আবিষ্কার করেছিল বীণাকে।

'আবিষ্কার' শব্দটি সুপ্রযুক্ত হবে কি না সরোজ সেই খটকা মাথায় নিয়ে কানপুরের ওভারব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সরু একটা গেটে পৌঁছল। টিকিট নেবার জন্য একজনের দেখা এতক্ষণে পাওয়া গেল। স্টেশনের বাইরে পঁচিশ-তিরিশটি সাইকেল রিকশা অপেক্ষমাণ। এই শহরে বাস ছাড়া জনগণেব জন্য এটাই একমাত্র বাহন। রাজধানীতে ভোরে কম যাত্রী আসে বলেই রিকশা মাত্র এই ক'টি। অন্য সময় এদেব ভিড়ে হাঁটাচলা দায় হয়।

"কোথায় যাবেন, হোটেলে?"

"বাবু হোটেলে যাবেন, ব্যবস্থা করে দেব।"

রিকশাওলারা ছেঁকে ধরল। খদ্দের আনতে পারলে হোটেল থেকে কমিশন পাবে।

"হোটেলে আমাদের ঘর বুক করা আছে বাবা, তোমাদের অত আর উপকাব কবতে হবে না।" কালোকোট চেঁচিয়ে উঠে, মাছি তাড়াবার মতো কবে হাতটা মুখেব সামনে নাড়তে লাগল।

"দু'জনে দুটো বিকশা, কী বলেন?"

"তা ছাড়া কী! একটাতেই দু'জনে যাব ভেবেছিলেন নাকি?"

"না না তা নয়, এই কত নেবে মধুছন্দা হোটেল? সিভিল লাইন্সে?"

"দো রুপিয়া।"

"য়্যা!" তারপর সরোজেব দিকে ফিরে গলা নামিয়ে বলল, "কলকাতায় শুনে এসেছি এক টাকা...ধরে ফেলেছে আমরা নতুন লোক।"

"উঠুন, উঠে পড়ুন।"

সরোজ হ্যান্ড গ্রিপটা রিকশার পাদানিতে রেখে উঠে বসল। "ভীষণ খিদে পাচ্ছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।"

"দর না করেই...।"

"এক টাকা যদি বেশি নেয় তো নিক না।"

কাত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করে সরোজ রিকশাওলাকে রওনা হতে বলল। যতক্ষণ রিকশা চলেছিল সে আর পিছন ফিরে তাকায়নি।

কানপুর চার বছরে একই রয়েছে। সিগারেটে টান দিয়ে সে দু'পাশের বাড়িগুলোকে লক্ষ করল। আগের মতোই তার মনে হল কলকাতার বড়বাজার, জোড়াসাঁকো বা নিমতলার কোনও পাড়া দিয়ে সে চলেছে। সাইন বোর্ডের বয়ান, রাস্তার দু'ধারে খোলা নর্দমা, পথের মাঝে টাটকা গোবর, উনুনের ধোঁয়া, রাধাগোবিন্দের মন্দির, দাঁতনের জন্য বিছিয়ে রাখা নিমডালের গোছা, সিমেন্টের গাঢ় লাল নীল ফুল লতাপাতা বাড়ির দেয়ালে, রাস্তা দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে ফুটখানেক উঁচু সরু পাঁচিল, নিচু দোতলা পুরনো বাড়িগুলোব মাঝে হঠাৎ আধুনিক স্থাপত্যের লম্বা বাড়ি, পথচারীদের উদাসীন চলাফেরার মধ্য দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে স্কুটার এবং তার থেকেও বিপজ্জনক গতিতে অ্যাম্বাসাডর।

মল রোড পার হয়ে রিকশাটা ডান দিকে ঘোরার সময় সরোজ তাকিয়ে দেখল প্রায় পঞ্চাশ মিটার পিছনে রিকশা থেকে হাত তুলে কালোকোট তাকে মন্থর হবার নির্দেশ দিচ্ছে। সরোজ মুখ ফিরিয়ে নিল। এক ধরনের লোক আছে যারা আঠার মতো অন্যের গায়ে লেগে থাকতে চায়, নিজের চেনা গণ্ডির বাইরে গেলেই নার্ভাস হয়ে পড়ে, অন্যের মুখাপেক্ষী হয় ছোটখাটো প্রতি ব্যাপারে, এই লোকটাও তাই।

একটি মোটর যাবার মতো সরু ইট বাঁধানো গলি দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ মিটার ভিতবে গেলে হোটেল মধুছন্দা। তার চারতলার ছাদের উপর হোটেলের নাম লেখা বিরাট লাল-সাদা সাইনবোর্ডটা দূর থেকে দেখা যায়। রিকশাটা অফিসঘরের সামনে থামতেই গ্রিপটা হাতে নিয়ে সরোজ তিনটে সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকল।

রিসেপশন কাউন্টারে দাড়িওয়ালা যুবকটির চোখের কোলে ঘুমের তলানি এখনও পড়ে আছে। ভারীপাতা তুলে সে তাকিয়ে রইল সরোজের দিকে। সেই সময় কালোকোট রিকশা থেকে নামতে নামতে চেঁচিয়ে বলল, "স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক হবে, কী বলেন? ...ভাড়া কি দিয়ে দিয়েছেন?"

"ওহ্...হ্যাঁ দিচ্ছি।" সরোজ পকেটে হাত ঢোকাল মানিব্যাগের জন্য।

"রাখুন রাখুন আমি দিয়ে দিচ্ছি, অনেক খুচরো জমে গেছে।"

ব্যগ্র হয়ে কালোকোট হাত তুলে বাস থামাবার ভঙ্গিতে সরোজকে নিরস্ত কবল। যে-কোনও ধবনের আবেগ প্রকাশেব জন্য লোকটির দুটো হাতের যে খুবই দরকার হয় এটা সে এবাব বুঝে গেল। কথা না বাড়িয়ে সে রিসেপশনিস্টের দিকে ফিরে কাউন্টারে কনুই রেখে ঝুঁকে বলল, "আমাব একটা সিঙ্গল রুম বুকিং আছে...সরোজ বিশ্বাস, কলকাতা থেকে।"

বিসেপশনিস্ট হাত বাড়িয়ে মোটা রেজিস্টারটা টেনে এনে, তাব ভেতর থেকে ক্লিপে-আঁটা চিঠি আর চিবকুটেব একটা গোছা বার করে, মন দিয়ে সেগুলো উলটেপালটে দেখতে লাগল।

"না, কোনও বুকিং নেই এই নামে।"

"সে কী, আমি তো দু'সপ্তাহ আগে চিঠি দিয়েছি! ফিফটি নাইন বাই টোয়েন্টি, সিভিল লাইন্স, গ্রিন পার্ক .এই ঠিকানাই তো?"

"হ্যাঁ।"

আবাব চিঠিগুলো দেখে সে মাথা নাড়ল, "নেই। কলকাতা থেকে আছে শুধু রবীন্দ্রকুমার মান্না নামে. ."

"আমি আমি, আমার ন'ম রবীন্দ্রকুমার মান্না। . .সিঙ্গল রুম।"

উত্তেজিত স্বরে বলে উঠে কালোকোট জ্বলজ্বলে চোখে সরোজের গা ঘেঁষে এগিয়ে এল। নিজের নাম অন্যেব মুখে যেন এই প্রথম শুনল। কাউন্টারে হাত দুটি যে কীভাবে রাখবে বুঝে উঠতে পারছে না।

"আমাব চিঠি আপনারা পাননি?"

সবোজ আবাব জিজ্ঞাসা করল উদ্বিগ্ন স্বরে।

"পেলে তো এর মধ্যেই থাকত।"

সরোজ কয়েক সেকেন্ড মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করল রিসেপশনিস্ট সত্যি কথা বলছে কি না। অনেক সময় শাঁসালো বা বোকা লোকেদের বেশি রেটে ভাড়া দেবার জন্য ঘর আটকে রেখে বলে দেয়, নেই বা চিঠি পাইনি। মাঝারি স্বাচ্ছন্দ্যের হোটেল কানপুরে কয়েকটা মাত্র, পাঁচতারা হোটেল শুধু একটি। সব হোটেলেই ঘরের টানাটানি লেগেই থাকে আর এখন তো বেশি করেই হবে।

"কিন্তু আমার যে ঘর চাই।"

কণ্ঠস্বর কাতর, ধীর বিপন্ন করে সরোজ বুঝিয়ে দিতে চাইল নতুবা সে বিপদে পড়বে। এ-রকম পরিস্থিতিতে সে আগে কখনও পড়েনি। এখন কি আবার রিকশায় চড়ে তাকে হোটেলে হোটেলে ঘুরতে হবে! যদি সব জায়গাতেই বলে, খালি ঘর নেই!

"একটাও খালি নেই।"

সরোজ ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো শুধু তাকিয়ে রইল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এমন একটা বিপদের সম্ভাবনাকে সে একবারও ভাবেনি। অন্য হোটেলে খোঁজ করতে যেতে হবে কিন্তু ঘর

পাবে কি না সে নিশ্চয়তা নেই। এখানে হয়তো খালি ঘর আছে। দাড়িওলা কিছু টাকা কামাবার জন্য বোধহয় প্যাঁচ কষছে।

সরোজ আবার ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল, 'একস্ট্রা দোব...পাওয়া যাবে?"

রিসেপশনিস্ট ঠোঁট মুচড়ে মাথা নাড়ল।

"ঘর একদম নেই। দুটো ঘর আজ দুপুরে খালি হবে কিন্তু বুক করা আছে।"

রবীন্দ্রকুমার মান্না এবার নড়েচড়ে উঠলেন।

"উনি তো আমার সঙ্গে আমার ঘরেই থাকতে পারেন।"

"তা পারেন, একস্ট্রা চার্জ দিতে হবে।"

"দোব...কত?"

"পঞ্চান্ন টাকা প্লাস একস্ট্রা একটা খাট পঁচিশ টাকা।"

"ঠিক আছে। দু'জনকে তা হলে একঘরেই দিন।"

রিসেপশনিস্ট খাতাটা ঘুরিয়ে মান্নার সামনে ঠেলে দিল নাম, ধাম, পেশা, আগমন, সময় ও উদ্দেশ্য লিখে দেবার জন্য। রবীন্দ্র মান্না খাতায় লাইনটানা ঘরগুলো ভরতি করল প্রতিটির শিরোনাম দু'বার করে পড়ে নিয়ে।

"আপনার নামটা বলুন?"

মান্না কলম উঁচিয়ে সরোজের কাছে জানতে চাইল। একটা বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার স্বস্তিটা সরোজকে ইতোমধ্যে কৃতজ্ঞতায় নরম, ঢিলে করে দিয়েছে। মুখে হাসি ছড়িয়ে সে বলল, "দিন আমিই লিখছি।"

সরোজ যখন লিখছে তখন মান্না ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

"আপনি রিপোর্টার, য়্যাঁ কোন কাগজের?"

বিস্ময়, শ্রদ্ধা, তটস্থতা সবক'টির সম্মিলিত ধাক্কায় মান্না এক পা পিছিয়ে গেল।

"প্রভাত সংবাদ।"

"আমি আনন্দবাজার রাখি...এখানে কিছু রিপোর্ট করতে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ...টেস্ট ম্যাচ।"

মান্না হাঁ করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "টেস্ট ম্যাচ মানে ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ?...আমি অবশ্য ক্রিকেট খেলার কিছু বুঝি না, ছোটবেলায়, না ঠিক ছোটবেলা নয় কলেজে পড়ার সময় একবার একটা টেস্ট ম্যাচ একদিন শুধু দেখেছিলাম জামাইবাবুর টিকিটে। তবে খবরটবর কিছু কিছু রাখি।"

মুখ টিপে মান্না গভীর কোনও রহস্য যেন উন্মোচন করছে, এমনভাবে শেষ বাক্যটি বলল। সরোজ যথাসাধ্য চোখ দুটিকে অবাক করিয়ে তাকাল।

একতলায় ছোট উঠোনের তিনদিকে ঘর। আর একদিকে উপরে যাবার সরু সিঁড়ি। তিনতলায় ভিতরের বারান্দা ঘুরে কোণের দিকে নম্বর-আঁটা একটা দরজা। এগারো নম্বর ঘর। প্রৌঢ়-বেয়ারা চাবি দিয়ে দরজা খুলে মান্নার সুটকেস ভিতরে এনে রাখল।

সরু খাট, আয়না লাগানো পালিশ চটা ড্রেসিং-টেবল, চেয়ার, স্টিলের আলমারি যার হাতলে মরচে, প্লাস্টিকের জলের জাগ ও কাচের গ্লাস, সবই একটি করে। খাট ও ড্রেসিং-টেবলের মধ্যে চার হাত মাত্র খালি জায়গা। সরোজ আন্দাজ করল, ওখানেই বাড়তি খাট পড়বে। নিশ্চয় ফোল্ডিং লোহার খাট।

"এ যে অন্ধকূপ, জানলা কই?"

মান্না প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

"এই তো জানলা।"

বেয়ারা দেয়ালে ঝোলানো সবুজ একটা ফুলছাপ দেওয়া কাপড়ের টুকরো সরিয়ে জানালাটা খুলে দিল। দেখা গেল ভিতরের বারান্দা আর দুটো ঘরের দরজা বারান্দার কোণে বসানো কোমর সমান উঁচু জলের ড্রাম।

"ব্যস এই একটা জানলা তা-ও বাইরের দিকে নয়, ভেতরদিকে।" হতাশ মান্না দুটো তালু বেয়ারার

দিকে বাড়িয়ে পেতে রইল। বেয়ারার মুখে কোনও বিকার নেই, নিস্পৃহ স্বরে বলল, "কিছু কি খাবেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দাদার খিদে পেয়েছে, কী মিলবে?" মান্না ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বেয়ারা খাদ্য তালিকা মুখস্থ বলে গেল। মান্না জিজ্ঞাসু চোখে সরোজের দিকে তাকাল।

"চার বাটার টোস্ট, দুটো ডবল ডিমের অমলেট আর এক কাপ চা। দু'জনের এতে হবে তো?" সরোজের শেষের কথাটি মান্নার জন্য।

"নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে চারটের বদলে আটটা টোস্ট করুন, সকালে আবার আমি একটু বেশি...আর জ্যাম জেলিটেলি দেবে তো?"

বেয়ারা মাথা হেলাল। সরোজ ঘরসংলগ্ন স্নানের ঘরের দরজা খুলে উঁকি দিল। প্রায় অন্ধকার এবং ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। বেয়ারা সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল। ছোট একটা ঘষাকাচের বন্ধ জানলা যেটা হাত তুলে খুলতে হবে। মোজাইকের দেয়াল ও মেঝে। গিজার ও ঝারিসহ জলের কল, প্লাস্টিকের বালতি ও মগ, দেয়ালে কাপড় রাখার রড ও আয়না, বেসিনে মাকড়সার জালের মতো ফাটা দাগ আর হলুদ ছোপধরা একটি কমোড যাতে বসার জন্য গোলকাঠটি নেই।

সরোজ গিজারের চেহারা দেখেই বুঝল ওটি অচল তবু ঝারির কল খুলে জল না পড়ায় সে বেয়ারার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"ইলেকট্রিক তার খারাপ আছে তাই বন্ধ। বাইরে ড্রামে গরম জল পাবেন, বেয়ারাকে বললে বালতি করে এনে দেবে।"

এবার সে সিস্টার্নের হাতল মোচড়াল। জল বেরোল না। বেয়ারা এগিয়ে এসে হাতলটা দু'বার জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে মোচড়াল এবং হেঁচকি তুলে বমি করার মতো কিছু জল ওগরাল।

"এইটুকু জল!"

মান্না বিভ্রান্ত চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল। সরোজ কোনও মন্তব্য করল না। ভারতের বহু জায়গায় নানা ধরনের হোটেল-বাসের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, অভিযোগ করে কোনও ফল হয় না। বিনীতকণ্ঠে 'করে দিচ্ছি', 'বলে দিচ্ছি', 'এনে দিচ্ছি' শোনা যাবে কিন্তু করা, বলা বা আনা আর হয়ে ওঠে না।

"ট্যাপ ওয়াটার তো আছে।" সরোজ কলের মাথা ঘোরাতেই তোড়ে জল বেরোল।

"এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে আব এটা খাবার জলও।"

"কেন বাইরে থেকে আলাদা খাবার জল এনে দেবে না?"

"একই ট্যাঙ্ক থেকে তো সব কলেই জল আসছে। বাইরে থেকে যা এনে দেবে সেটা এই জলই।"

মান্না হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল।

"দুটো তোয়ালে আর দুটো সাবান দিয়ে যাও আর খাট পেতে দিতে বলো। ব্রেকফাস্ট দিতে কতক্ষণ লাগবে?"

"দশ-পনেরো মিনিটে হয়ে যাবে।"

"এ-ঘরের বেয়ারাকে পাঠিয়ে দাও। গরম জল চাই, কলিং বেল কোনটে?"

সরোজ নিজেই সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে কলিং বেল ছাপ দেওয়া সুইচটা টিপল। বাইরে বারান্দার কোথাও 'ৰঁ অঁ অঁ অঁ' শব্দ হল।

"যাক এটা তা হলে কাজ করে।"

লোকটি ঘর ছাড়তে ইতস্তত করছে। সুটকেসটা বয়ে আনার জন্য বকশিশের প্রত্যাশী। সরোজ তাকে একটা টাকা দিল। খুশি হয়নি, সেলাম দিল না। বয়ে গেল, সরোজ মনে মনে বলল, যেমন হোটেল তেমনই তো বকশিশ হবে।

"বিশ্বাসদা এ কেমন জায়গায় এলুম।"

"এর থেকে ভাল আর কী আশা করেন? ভারতের সব জায়গায়ই এই রেটের হোটেলে এইরকম ঘরই পাবেন।"

তিক্ত স্বরে সরোজ কথাগুলো বলে গ্রিপের চেনটা রাগী মেজাজে একটানে খুলে ফেলল। একে একে ভিতর থেকে জিনিসগুলো বার করে খাটে রাখতে রাখতে আক্ষেপভরে বলল, "কার মুখ দেখে যে কাল বেরিয়েছিলাম!"

"কিছু বললেন?"

"না বাথরুমে যাবেন তো যান, আমার কিন্তু সময় লাগে।"

"না না আপনি আগে যান। আমি শুধু দাঁত মেজে, দাড়ি কামিয়ে নেব। দশটায় অফিসের লোক আসার কথা তার সঙ্গে বেরোব। ফিরে এসে বাথরুমে ঢুকব।"

"চান করবেন না?"

"ওই তখনই সারব...শীতটা কিন্তু খুব একটা লাগছে না, বোধহয় রাতে পড়বে। আপনি কখন বেরোবেন?"

"দুপুরে। আশ্চর্য! দেখুন দু'জনেই কলকাতা থেকে চিঠি দিয়ে আসছি, আপনি ঘর পেলেন অথচ আমি পেলাম না। কতদিন আগে বুক করেছিলেন?"

"আমি তো করিনি। আমাদের এখানকার অফিস বুক করে রেখেছে, হোটেলের সঙ্গে এরিয়া ম্যানেজারের চেনাশোনা আছে।"

"তাই বলুন, ঘর পেতে গেলেও ব্যাকিং দরকার হয়। দাঁত মেজে নিন, ব্রেকফাস্ট এসে পড়বে।"

দুই

উনিশটা বছর নিমেষে পিছিয়ে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। যে-পথ ধরে পিছিয়ে যাবে, সেই পথে প্রচুর আবর্জনা, খানাখন্দ। সেগুলো ডিঙিয়ে আরও চার বছর পিছিয়ে গেলে বীণার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটায় পৌঁছনো যাবে। অন্য সময় এটা ক্লান্তিকর একটা কাজ কিন্তু এখন তা নয়। বীণা তার জীবনে একমাত্র সুগন্ধী ফুল আর দগদগে ক্ষত।

স্নান সেরে সরোজ বিছানায় চিত হয়ে মাথার পিছনে দু'হাত রেখে চোখ বুজিয়ে নিজেকে প্রায় সিকি-শতাব্দী পিছনে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

অফিসের লোকটি ঠিক দশটায়ই এসেছিল, তার সঙ্গে মান্না বেরিয়ে গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। বাইরেই সে খেয়ে নেবে। সরোজও তাই ঠিক করেছে। মল রোডে একটা চিনে খাবারের দোকান গতবার পেয়েছিল, কলকাতার রান্নারই মতো। সেখানেই খেয়ে নেবে। হোটেলের তেল ঝালমশলায় চোবানো স্বাদু খাদ্যের থেকে চিনা খাবার নিরাপদ। একটা টেস্ট ম্যাচ মানে আট-ন'দিন থাকা। শরীরের যাবতীয় নিরাপত্তার দিকে কঠিন নজর দিতে হয়। কলকাতার বাইরে প্রথম বেরিয়েছিল দিল্লিতে ডেভিস কাপের খেলা রিপোর্ট করতে। উঠেছিল কনট প্লেসের একটা হোটেলে। দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই বুঝতে পারে, কী মারাত্মক ভুলই না করেছে সে। গত রাত্রে হোটেলের রেস্টুরেন্টে বসে প্রবল আগ্রহে অচেনা দহি-মাটন আর পনির-পালকের সঙ্গে পাকস্থলীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে পরস্পরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে নিশ্চয় সারা রাত ধরে ওরা ঝগড়া করে গেছে। তারই ফলে দেহের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের জন্য খাদ্যবস্তুগুলির তাড়না সরোজকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। সে-দিনই প্রধানমন্ত্রীর সফদরজং রোডের আবাসে ছিল খেলার সূচি তৈরির লটারি। সরোজ সারাদিন বিছানায়, রিপোর্ট পাঠাতে পারেনি। পরদিন দিল্লি অফিসে তার জন্য কলকাতা থেকে বার্তা সম্পাদকের টেলেক্স আসে:

'যদি মনে করে থাকেন খেলার সূচি নির্ধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি রিপোর্ট করার মতো ব্যাপার নয় তা হলে পরের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে আসতে পারেন।' টেলেক্সটা হাতে নিয়েই সরোজ দেখেছিল কলকাতা থেকে বিমানে আসা সে-দিনের প্রভাত সংবাদের প্রথম পাতায় ডাবল কলাম শিরোনাম: 'কৃষ্ণনের আশা প্রেমজিত প্রথম ম্যাচ জিতবে।' নীচে বারো পয়েন্টে—সরোজ বিশ্বাস। এজেন্সির পাঠানো খবর থেকে ডেস্কে কেউ তৈরি করেছে, তার নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে। বরফের চাঙড়ের উপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো অনুভূতিতে তখন তার সর্বাঙ্গ যে-রকম অসাড় হয়ে গেছল অনেকটা সেই জিনিসই গত সন্ধ্যায় রাজধানী এক্সপ্রেসে সে পেয়েছিল যখন মেয়েটি তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে বলল, "মা আপনাকে ডাকছেন।"

সরোজ প্রথমে না-শোনার ভান করে পাশের ছেলেটির কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া ম্যাগাজিনটিতে

আরও মনোনিবেশ করল মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে। এই সময় মুহূর্তের জন্য তার মনে ভেসে ওঠে ওষুধের দোকানে অঙ্কের মাস্টারমশায়কে দেখে তার ঘুরে দাঁড়ানোটা। পাছে কথা বলতে হয়। সেই দুর্বলতা, সে-জন্য সে বরাবরই পিছনের সারির, ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেওয়ার দলে। সরোজের রাগ ধরল নিজের উপর। উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকিয়ে মুখ তুলে সে তাকাল।

নেহাতই কিশোরী। মুখটি লম্বাটে। ফিনফিনে কালো মেটাল ফ্রেমের চশমা। লেন্সের পাওয়ার মাইনাস পাঁচের কম তো নয়ই। তবু কৌতূহলে দীর্ঘ হয়ে ওঠা চোখের মণি দুটি দেখতে অসুবিধা হয় না। ওর নীচের ঠোঁট অবাক করায় সরোজকে। বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল একবার। ছোট্ট এবং পুরু, চিবুকটাও ঝোলানো। আয়নায় বা ছবিতে সরোজ নিজেকে সুযোগ পেলেই খুঁটিয়ে দেখে। নিজের মুখের গড়ন এবং যেগুলোকে তার খুঁত মনে হয়, সবই মুখস্থ রেখেছে। বহুবার মনে হয়েছে তার থুতনিটা আরেকটু চাপা হলে ভাল হয়, কান দুটো খুবই ছোট, নাকের আর একটু কাছে ভ্রূ দুটোর এগিয়ে আসা দরকার এবং কপালটা ঢিপির মতো উঁচু না হয়ে ঢালু হলে টিকলো নাক ও গালের সঙ্গে মানাত। কিন্তু তার নীচের ঠোঁট ঈষৎ মোটা হওয়াটাকে সে ত্রুটি বলে মনে করে না। মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে চুষতে বীণা বলেছিল, "বেশ লাগে।"

সরোজের মনে হল এই মেয়েটির নীচের ঠোঁট তারই মতো, চিবুকেও তার আদল আছে। বীণার গায়ের রংই পেয়েছে কিন্তু যথেষ্ট লম্বা, পাঁচ-সাত তো হবেই আঁটো জিন্‌সটা বোধহয় বিদেশি, ফ্যাকাশে হয়ে আছে দুই উরু, হাঁটু ও নিতম্বে। খয়েরি ডোরাকাটা ফুল শার্টটা খুবই কম দামি। মনে হল ব্রেশিয়ার পরেনি। এখন কমবয়সি মেয়েরা সাজসজ্জায় যে হেলাফেলা ভাব দেখায়। তাই মুখে প্রসাধন নেই। উজ্জ্বল চামড়া, পাতলা চুল টান টান হয়ে কপাল কান ঢেকে পিঠে নামানো। তিন-চার সেকেন্ডের মধ্যেই সরোজের ভাল লাগল মেয়েটিকে। এই চেহারার এবং এমনভাবে সাজা মেয়ে ভারতে এখন অন্তত হাজার দশেক, তবু মেয়েটি কী কারণে যেন তাকে আকর্ষণ করল, সজাগ করে তুলল।

"মা আপনাকে ডাকছেন।"

মেয়েটি আবার বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করল। স্বরে অধৈর্যতা নেই। মা একজন পুরুষকে ডাকতে পাঠিয়েছে, এটা যেন বেশ মজার ব্যাপার এমন একটা ভাব ট্রেনের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে ওর সর্বাঙ্গে ছড়ানো।

সরোজ অন্য সময় অন্য কেউ হলে অবাক হয়ে বলত, অবশ্যি ভ্রূ কুঁচকে, "কে তোমার মা?...হ্যাঁ হ্যাঁ...ওহ অনেক বছর পর, কোথায় বসেছে?...আশ্চর্য...আচ্ছা আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুমি ওর মেয়ে হও নাকি?" ইত্যাদি।

উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিনটা আসনের উপর রেখে সরোজ পথটা দিয়ে সামনের দিকে এগোল। সে নার্ভাস নয় কিন্তু অনিশ্চিত। কীভাবে কথা বলবে সেটা নির্ভর করছে কীভাবে বীণা শুরু করবে। যেমন ব্যবহার পাবে তেমনই তার আচরণ হবে এটাই তার সিদ্ধান্ত।

"বলো।"

বীণা মাথা নামিয়ে হাতের ঝোলাটার ভিতর কী যেন খুঁজছিল। সরোজ সিঁথিতে সিঁদুর দেখতে না পেয়ে গোলমালে পড়ল। বিধবা! অ-হিন্দু বিয়ে করেছে? নাকি কুমারীই রয়ে গেছে? কুমারী শব্দটা বীণার ক্ষেত্রে যে প্রযোজ্য নয় শুধু সরোজই তা জানে। বীণার কৌমার্য আর বিহারের বোলিং একই দিনে সে নস্যাৎ করেছিল জামসেদপুরে। একটি কিনান স্টেডিয়ামে অন্যটি টাটার গেস্ট হাউসের একটি ঘরে। বরং অবিবাহিতা শব্দটাই টেকনিক্যালি কারেক্ট। কিন্তু মেয়েটি যে 'মা' বলল! পালিতা নাকি?

ধীরে সুস্থে বীণা মুখ তুলল। মুখভাবে কোনও আড়ম্বর নেই। এতদিন পর দেখা, সেটা বোঝাবার জন্য কৌতূহল, আড়ষ্টতা, ব্রীড়া, স্বর পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্যে না গিয়ে ঝোলার দড়িটা টেনে মুখ বন্ধ করে বলল, "ব্যস্ত যদি না থাকো তা হলে বলব কিছুক্ষণ বসো।"

বীণা তার পাশে জানলার ধারের একমাত্র খালি চেয়ারটার দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখাল। সরোজ পিছনে তাকিয়ে দেখল তার চেয়ারে বসে মেয়েটি পাশের ছেলেটিকে কী জিজ্ঞাসা করছে।

"না ব্যস্ত নই।"

বীণার দিকে পিঠ ফিরিয়ে চেয়ারটায় পৌঁছবার সময় সরোজ সতর্ক হয়েছিল যাতে হাঁটুর সঙ্গে তার

স্পর্শ না ঘটে। সে এখন অপরিচিত এক ভদ্রলোক এবং বীণা অবশ্যই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী, এ-ভাবেই প্রথমে শুরু হোক।

চেয়ারের পিঠটা পিছনে হেলিয়ে দিল বীণা। সরোজও তাই করবে কি না ভেবে হাতটা আসনের পাশে নিয়ে গিয়েও তুলে নিল। ও যা করবে আমাকে এখনও তাই করতে হবে নাকি! উনিশ-কুড়ি বছর আগে এ-সব ব্যাপার হত। তখন সে ছিল প্রেমিক।

"হেলিয়ে নাও, তা হলে কথা বলতে সুবিধে হবে।"

সরোজ চেয়ারের পিঠ হেলিয়ে দিয়েও সিধে হয়ে বসে রইল।

"কানপুর যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।" প্রশ্নসূচক ভ্রূ তুলে সে তাকিয়ে রইল।

বীণার ঠোঁটে হাসি জমে উঠল। চেয়ারের দুই হাতলে ওর কনুই, হাতের দশটি আঙুল কোলে জড়াজড়ি করে রাখা অনুত্তেজিত অলসভঙ্গি।

"স্পোর্টস রিপোর্টার এই সময় এই ট্রেনে, এদিকে কানপুরে টেস্ট ম্যাচ...তাই মনে হল।"

"ঠিকই বলেছ।" সরোজের ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে, আমি স্পোর্টস রিপোর্টার তা জানলে কী করে? তারপরই মনে হল, নাম দিয়ে কাগজে তার অসংখ্যবার লেখা বেরিয়েছে, বীণা নিশ্চয়ই তা দেখে থাকবে।

"জ্যোতিষকে মনে আছে? এখন দিল্লিতে রেলভবনে ডেপুটি সেক্রেটারি র‍্যাঙ্কে রয়েছে। কথায় কথায় একদিন ও বলেছিল তুমি স্পোর্টস রিপোর্টারি করছ বাংলা কাগজে, কী নাম কাগজের?"

"প্রভাত সংবাদ।"

"ওহ, বেশ বড়ই কাগজ তো, বাবা পড়তেন।"

"তুমি দিল্লিতে থাকো নাকি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কলকাতার কাগজটাগজ আর পড়া হয় না। বাড়িতে টাইমস আর স্টেটসম্যান দুটো রাখা হয়।"

"দুটো!"

"কর্তার জন্য।"

বীণা ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তুলল। নখে গাঢ় খয়েরি রং। সরোজ নিশ্চিত হল দুটির উত্তর পেয়ে। বিধবা নয় এবং বিবাহিতা। কিন্তু সিঁদুর নেই কেন! কৌতূহল দেখানোটা কি ঠিক হবে?

"জ্যোতিষ বলল তোমার লেখা একটু রোমান্টিক, সাহিত্য ঘেঁষা, তাই খুব পপুলার।"

"ওর সঙ্গে দেখা হয়?"

জ্যোতিষের বেকবাগানের বাড়িতে সে আর বীণা বহুবার গেছে। জ্যোতিষের বোন নমিতা আর বীণা কলেজে একই ক্লাসে পড়ত।

"মাঝে মাঝে আসে বউ নিয়ে, দিল্লিতেই বিয়ে করেছে, পাঞ্জাবি মেয়ে। নমিতা এখন জার্মানিতে, ডিভোর্সের পর আর বিয়ে করেনি।"

"তুমি আমাকে দেখলে কখন? ঠিক চিনতে পেরেছ তো!"

বীণা হাসল। উত্তরটা সোজা না দিয়ে বলল, "আমাকেও তো তুমি দেখতে পেয়েছিলে।"

ভান করে বা মিথ্যে বলে আর লাভ নেই। সরোজ সহজ হবার চেষ্টায় একগাল হেসে বলল, "কখন দেখতে পেয়েছি বলে তোমার মনে হল?"

"ট্রেন ছাড়ার আগে, আমি ওই গাধাটার সঙ্গে যখন তর্ক করছিলাম।"

"তা হলে আমি খুব একটা বদলাইনি।"

"ভুঁড়ি হয়েছে, চুল পাতলা আর পেকেছেও, এ ছাড়া প্রায় একই রকম, চিনতে অসুবিধা হয় না।"

"আরও আছে, গলায় থাক পড়েছে, হাতদুটোও চর্বিতে গোল হয়ে গেছে আর লুকোনো একটা ছোট্ট টাকও মাথায় ঘাপটি দিয়ে আছে।"

"এবার তোমার পালা, বলো কী কী বদল আমার হয়েছে।"

"একতিলও বদলাওনি।"

"বাজে কথা রাখো, ফ্ল্যাটারি করে কোনও লাভ হবে না।"

সরোজ সামান্য অপ্রতিভ বোধ করলেও তা বুঝতে দিল না। হাসিটা ধরে রাখল। ফ্ল্যাটারি করে লাভবান হবার মতো সম্পর্ক আর তাদের মধ্যে নেই। কিছু একটা বলে তো কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে, তাই বলা নয়তো বীণার বাহ্যিক বদল অবশ্যই ঘটেছে। চল্লিশের কাছে পৌঁছে ভারতের ক'টা মেয়েই বা শরীরে কুড়ির পর্যায়ের বিভ্রম জাগিয়ে রাখতে পারে?

"মনে হচ্ছে কিছু বলবে, নাকি আমিই বলে দেব।"

"আমি বলেছি একতিলও বদলাওনি। আয়না থাকলে ধরে দেখাতাম, তিলটা সত্যি একই জায়গায় একই সাইজে একই রঙের আজও, কিচ্ছুই বদলায়নি।"

বীণা তার চোখের দিকে সোজা তাকাল এবং কয়েক সেকেন্ড দু'জনে চাহনি আবদ্ধ রেখে পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু কীই বা আর বোঝার আছে? সরোজ মনে মনে হিসেব কষল, আমাদের মধ্যে তো কোনও প্রয়োজনই আর নেই, না দেহের না মনের। এতকাল দেখা হয়নি কিন্তু দিব্যিই তো আমাদের দিন কেটে গেছে, এ-ভাবে বাকি জীবনটাও কেটে যেত। কয়েক ঘণ্টার জন্য বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, এটাও তেমনি। কিছু কৌতূহল তৈরি হওয়া, মিটিয়ে নেওয়া। তবে পার্থক্য এই যে আমরা পরস্পরের জীবনের চারটে বছরের কিছু কিছু খবর জানি। এখন যা-কিছু কথা তা সব ওই চার বছরের চোঁয়া ঢেকুর। ওকে খুশি মনে হচ্ছে, তা হলেই ভাল।

"ভীষণ মোটা হয়ে গেছলাম। গত চার বছর ভিগারাসলি এক্সাবসাইজ, জগ আব ডায়াট কন্ট্রোল করে একান্ন কেজি-তে এসেছি। এখন আমার ওয়েস্ট লাইন থার্টি টু।"

"নিশ্বাস বন্ধ করে ভেতরে টেনে ধরে?"

"মোটেই না মোটেই না, নর্ম্যাল ব্রিদিংয়েই থার্টি টু। এখন বসে আছি তাই বোঝা যাবে না।"

কোমরের একরাশ কাপড় থেকে চোখ তুলে সরোজ দেখল বীণার চোখে রীতিমতো উদ্বিগ্নতা। চার বছরে কষ্ট করে পাওয়া কৃতিত্ব কেউ নস্যাৎ করে দিক এটা যেন ও চায় না।

"একটা না হয় কমিয়েছ, আর দুটো?"

"কীসের আর দুটো?"

"ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের।"

বীণা কয়েক সেকেন্ড সময় নিল হৃদয়ঙ্গম করতে তারপরই ডান তালুটা আলতোভাবে সামনে ছুড়ে শব্দ করল, "অ স হ্ হ্...তোমার স্বভাব আজও বদলায়নি।"

সরোজ চকিত হল। কথাবার্তা পুরনো দিনে না ফিরে যায়! তা হলে কোণঠাসা হয়ে পড়বে সে। বীণা বিশ্বাস করত তাদের বিয়ে হবে, সেই বিশ্বাসেই জামসেদপুরে...।

কথা ঘোরাবার জন্য সে বলল, "তুমি দিল্লিতে থাকো?"

"হ্যাঁ। কানপুরের পর তো খেলা দিল্লিতে, এসো না আমার বাড়িতে। গ্রেটার কৈলাসে থাকি।"

"আমি চিনি না, চিনে যেতেও পারব না।"

"কোথায় উঠবে ঠিকানাটা দিয়ো, গিয়ে নিয়ে আসব, হয় আমি কিংবা রোজা..."

"রোজা কে?"

"আমার মেয়ে, তোমায় যে ডেকে আনল।"

শিরদাঁড়া সোজা করে গলাটা একটু উঁচিয়ে বীণা মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। সরোজও তাই করল। মেয়েটি ঝুঁকে কথা বলছে আর পাশের ছেলেটি মাথা কাত করে শুনছে।

"যে-জন্য ডাকা," বীণা গুছিয়ে বসে গলাটাকে গম্ভীর করে বলল, "রোজা একটা প্রচণ্ড ক্রিকেটপাগল। গত সাত-আট বছরে দিল্লিতে খেলে গেছে এমন কোনও নামী ক্রিকেটার নেই যে ওর অটোগ্রাফ বুক-এ সই দেয়নি। জ্যোতিষ যখন তোমার কথা বলছিল ও তো তখন লাফিয়ে উঠল, একজন স্পোর্টস রিপোর্টারকে আমি চিনি অথচ ওকে এতকাল সেটা বলিনি, এই নিয়ে তো আমাকে খুব এক হাত নিল। নতুন নতুন কারা যেন এখন খুব নাম করেছে বিশেষত একটি বাঙালি ছেলে..."

"ভি. এস. ঘোষাল, ভবানীশঙ্কর ঘোষাল...ভুবু বলেই সবাই ডাকে।"

"রোজা তো পাঁচটা দিন কলেজ কামাই করে সারাক্ষণই রেডিয়োয় কান লাগিয়ে বসেছিল মাদ্রাজে

আগের খেলাটার সময়। ডেবুতেই ডাবল সেঞ্চুরি ওর আগে ভারতের কেউ নাকি করেনি?"

"না, এই প্রথম...দারুণ খেলেছে। আমি অবশ্য মাদ্রাজ যাইনি তবে যা শুনেছি মনে হল জিনিয়াস। বাঙালিরা তো খুব বেশি টেস্ট খেলেনি, বহুকাল বাদে পঙ্কজ রায়ের পর একজনকে পাওয়া গেল। ভারতেও ভবানীর মতো এত বড় ব্যাটসম্যান কমই হয়েছে। প্রথম টেস্টেই দু'শো এক নট আউট!"

"কলকাতার ছেলে, তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ আছে।"

"হুঁ।" সরোজ দ্বিধা না করেই বলল। আলাপ বলতে যা বোঝায় তা একদমই নেই। বস্তুত ভবানীশঙ্করকে সে প্রায় চেনেই না, এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ম্যাচে ওকে ব্যাট করতেও দেখেনি। গত বছর রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলতে নেমে চারটে সেঞ্চুরি করেছে, সবই বাংলার বাইরের মাঠে। তার একটা দিল্লির, একটা কর্ণাটকের বোলিং থেকে। সরোজ তা দেখেনি। বোম্বাইয়ে ইরানি ট্রফিতেও সেঞ্চুরি করে, পুনেতে কোচিং কাম সিলেকশন ক্যাম্পেও বড় রান করেছে কিন্তু সরোজ তা-ও দেখেনি। কলকাতার ময়দানে লিগ বা নক আউটের খেলা সে দেখতে যায় না যেহেতু রবিবার তার ছুটির দিন। তা ছাড়া গণ্ডা গণ্ডা একদিনের ম্যাচের ফলটুকু ছাড়া আর কিছু তার কাগজে ছাপা হয় না। মাঠ থেকে ফলসংগ্রহ করে আনার কাজটা করে জুনিয়র রিপোর্টাররা। ভবানী গত বছর দশ-এগারোটা সেঞ্চুরি করেছে, বছরের সেরা ব্যাটসম্যান হয়েছে, এই পর্যন্তই সে জানে। তবে সি এ বি অফিসে সেক্রেটারির ঘরে একবার সে ভবানীশঙ্করকে দেখেছিল। হিলহিলে শরীর, রোগাই বলা যায়। অসম্ভব ফরসা, প্রায় ছ'ফুট, চওড়া কবজি, পাতাকাটা চুল, ঝকঝকে চোখের মণি, বোতামখোলা শার্টের ফাঁক দিয়ে বুকের চুল দেখা যাচ্ছে, থুতনিটা চাপা, ঈষৎ মোটা নাক এবং পাতলা ভ্রূদুটি জোড়া। সব মিলিয়ে আকর্ষণীয়।

"টিকিটটা তা হলে কাল দুপুরে কার্তিকদার কাছ থেকেই নোব, পরশু ফ্লাইট ক'টায়?"

সরোজ এত ভরাট কণ্ঠস্বর আগে কখনও শোনেনি। সে বাধ্য হয়েছিল ওর মুখের দিকে তাকাতে।

"মর্নিং ফ্লাইট, ঠিক ক'টায় সেটা জেনে নিয়ো।"

সরোজের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ভবানীশঙ্কর হেসে মাথাটা ঝোঁকাল এবং বেরিয়ে গেল।

"বোম্বে যাচ্ছে ইরানি ট্রফির জন্য?"

সরোজ জিজ্ঞাসা করেছিল সেক্রেটারিকে।

"হ্যাঁ। যদি ভাল রান পায় তা হলে টেস্টে এসে যাবে। টেকনিকটা ভাল, ফুটওয়ার্ক আছে, সব থেকে বড় কথা যেটা...টেম্পারামেন্ট, তা-ও দারুণ।"

ভবানীশঙ্কর আগে কখনও যা করেনি, ইনিংস ওপেন করে অষ্টআশি রান করেছিল আড়াই ঘণ্টায়।

"রোজাও তাই বলল, কলকাতার ছেলে যখন নিশ্চয় কলকাতার রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ আছে। আঙ্কলকে ধরব ভাল করে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। ওর খুব ইচ্ছে বড় কোনও প্লেয়ারকে বাড়িতে আনার। ওই বন্ধু-বান্ধবদের দেখানো আর কী, বোঝই তো।"

মেয়ের আবদারকে প্রশ্রয় দিয়ে বীণা হাসছে। মুহূর্তে সরোজ প্রায় সিকি শতাব্দী পিছিয়ে বীণাকে দেখতে পেল। তখন সে তার জীবনের দ্বিতীয় রঞ্জি ম্যাচে আসামের দ্বিতীয় ইনিংসে এক ওভারে চারজনকে সুবীরের বলে স্টাম্প করে খবরের কাগজে ছবি আর কয়েকটা লাইন পেয়েছে। একদিন ক্লাবের খেলায় লাঞ্চের পর তাঁবুর বাইরে বেঞ্চে বসে সে দাঁত খুঁটছিল তখন সুবীর দুটি মেয়েকে সঙ্গে করে তার কাছে আসে। পরিচয় দেয়—বোন সুজাতা আর বোনের বন্ধু বীণা সেনগুপ্ত, দু'জনেই আই এ সেকেন্ড ইয়ার, ওদের হাতে বই খাতা। সুবীরের বাড়িতে সে কয়েকবার গেছে। অনেকগুলি বোন, এই বোনটিকে সে দেখেছে কি না মনে করতে পারল না। বীণা একটা খাতা খুলে তার দিকে এগিয়ে ধরতেই সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সই অর্থাৎ অটোগ্রাফ! কেউ তার কাছে এই জিনিসটি কখনও চায়নি, কোনও মেয়ে যে চাইবে সেটা কল্পনা করার মতো সাহসও জোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্লাবের অনেকেই তখন না-দেখার ভান করে লক্ষ করছিল। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটারের সই নেওয়ার জন্য ময়দানে ক্লাব তাঁবুতে দুটি মেয়ের আসা রীতিমতো ঘটনা। সে বিব্রত হয়ে বলেছিল, "সই!...কী করলাম আমি যে...সুবীরের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হত, কষ্ট করে আবার এখানে আসার...!" সুবীরই জবাব দিয়েছিল, "তোকে দেখার জন্য এসেছে। কীরকম কিপ করিস স্বচক্ষে দেখবে বলেই...কিন্তু বীণা তোমরা দেরি করে এসেছ। আমাদের ফিল্ডিং তো হয়ে গেছে

তবে সরোজের ব্যাটটা দেখতে পাবে।" বীণা সপ্রতিভভাবে বলেছিল, "তাই দেখব, শুনেছি উনি নাকি খুব পিটিয়ে খেলেন।" সরোজ মনে মনে যতটা বিগলিত হয়েছিল ততটা কৌতূহলীও। মেয়েটি পেশাদার সই-শিকারি নয়, তা হলে বাঁধানো অটোগ্রাফ বুক সঙ্গে থাকত। তাকে দেখবে বলে এসেছে, এটাই যেন কেমন কেমন ঠেকছে!

"তার জন্য এতদূর আসা! বললেই পারতিস বাড়িতে গিয়ে দেখা দিয়ে আসতাম।" সরোজ মিটমিট হেসে বলেছিল।

"বাড়িতে নয়, বাড়িতে নয়, কলেজে একদিন আসুন তা হলে খুব ভাল হয়।"

সুজাতা ব্যগ্র হয়ে বলেছিল, "আমরা স্কটিশে পড়ি।" সরোজের কৌতূহল বেড়ে গেছল সুবীরের মুখটেপা হাসিতে।

"একবার ঘুরে আয় না ওদের কলেজ থেকে।"

কিছু একটা ব্যাপার আছে, পরে জেনে নেবে। সরোজ খাতার পাতার এককোণে ছোট অক্ষরে ইংরেজিতে সই করে দিয়েছিল।

"বা-রে, কাকে সই দিলেন সেটা তো লিখলেন না, আর শুধু সই কেন দু'-চারটে কথাও তো লিখে দেবেন।"

সুজাতা বলেছিল। "কী লিখতে হবে?" সরোজ জানতে চায়।

"চেনা পরিচিতদের জন্য যা লিখে দেয়, এ-সব কি বলে দিতে হয় নাকি?"

সুজাতাকে কিঞ্চিৎ মুখফোঁড় বলে তার মনে হল। দু'-চার কথা কী লিখবে সেটা ভাবতে ভাবতে সে বীণার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ-ই তার মনে হল মেয়েটিকে বেশ দেখতে। সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ আর দেহগড়নও উদ্দীপক। সে ইংরেজিতে লিখল: "বীণা সেনগুপ্তকে—তোমার বহু অনুরাগীর মধ্যে যে নিকৃষ্টতম ও অযোগ্য, সরোজ বিশ্বাস।" খাতাটা বন্ধ করে বীণার হাতে দিয়েই সে তাঁবুর মধ্যে চলে যায় প্যাড পরার জন্য। সেদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সে একশো এগারো করে তাতে ছিল ন'টা ওভার বাউন্ডারি!

"প্লেয়ারদের বিশেষত ক্রিকেটারদের জন্য মেয়েরা যে কেন এত উতলা হয় আজও বুঝি না। সিরিজের পর সিরিজ তো শুধুই হারে তবু এদের জন্য..."

সরোজ থেমে গেল। আর বেশি বলা ঠিক হবে না। বীণা তার মেয়ের জন্য টেস্ট ক্রিকেটার ধরে দিতে অনুরোধ করছে এবং এত বছর পর প্রথম সাক্ষাতে কিনা এটাই প্রাধান্য নিল! ব্যাপারটা কীরকম যেন হাস্যকর ঠেকছে। তাদের এত নিবিড় সম্পর্কটার কোনও রেশই যেন আর নেই। মানুষ সময়ের সঙ্গে বদলায় ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া কি সম্ভব!

"তোমার স্বামী কী করেন? বাড়ি কি নিজেদের?"

"হ্যাঁ নিজেদের। মিস্টার রাও এখন একটা ইলেকট্রিকাল বিজনেস গ্রুপের এরিয়া সেলস কন্ট্রোলার, এখন দিল্লিতে নেই একটা প্রোজেক্টের কাজে জয়পুর গেছেন।"

"রাও মানে তেলুগু?"

"না না না, তেলুগু নয় মারাঠি, এই ভুলটা সবাই করে।"

বীণা অনেকক্ষণ ধরে হাসল, তার সঙ্গে সরোজও।

"আমার কি দোষ বলো, রাও যে দু' জাতেই আছে...একবার এমন ভুল হয়েছিল নায়ার নিয়ে। কেরলেও নায়ার আছে আবার পাঞ্জাবেও আছে, একই বানান। জানতাম না পাঞ্জাবের উচ্চারণ নাইয়ার।"

দু'জনের মধ্যে পোশাকি ব্যবধানটা অনেক কমে এসেছে। সরোজ ঠিক করল বীণার বর্তমান জীবনের খবর নিতে আর একটু এগোনো যেতে পারে।

"মারাঠিদের বউয়েরা কি সিঁদুর পরে না?"

বীণার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সোজা জবাব দিল না।

"এ-সবও তুমি লক্ষ করো নাকি!"

চাপা ভর্ৎসনাটা ধরে ফেলে সরোজ প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল।

"দিল্লিতে বাড়ি করেছ মানে ওখানেই সেটল করবে বা করেছ?"

"হ্যাঁ। আমরা নিজেদের দেশে আর ফিরব না। ফিরে লাভই বা কী, রোজাই আমাদের সব, ও দিল্লিরই মেয়ে।"

"কলকাতায় কোথায় গেছলে?"

"দু'দিনের জন্য গেছলাম বড়দির বাড়িতে, ঠিক দুটো দিন। ওর সেজমেয়ের বিয়ে...সম্পর্ক-টম্পর্ক তো আর তেমন নেই, একদমই যাবার ইচ্ছেও ছিল না, উনিই জোর করে পাঠালেন। রোজাকে মামাবাড়ির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে রাখার খুবই ইচ্ছে ওঁনার, তাই গেলাম। বড়দির অবস্থা দেখলাম ভালই।"

সরোজ শুনে গেল আগ্রহ দেখিয়ে। এবার তার ব্যক্তিগত খবরাখবর নিতে বীণার প্রশ্ন করার পালা আসছে। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা শুরু হবার আগেই রোজাকে দেখা গেল বীণার পাশে।

"মা, তোমার কাছে আর বাবলগাম আছে?"

"নেই, কেন কী হবে, এ-সব জিনিস অত খাও কেন? দিনরাত শুধু মুখনাড়া..."

"আমার জন্য নয়, পাশের ছেলেটিকে...।"

"থাক এখন। শোনো, আঙ্কলকে বললাম তোমার হিরোর সঙ্গে দিল্লিতে খেলার সময় আলাপ করিয়ে দেবার জন্য আর বাড়িতেও একদিন ডিনারে যাতে আসে।"

"রি-য়্যা-ল্লি।"

রোজা দু'হাত মুঠো করে গোড়ালি তুলে শরীর ঝাঁকাল।

"উফফ কী দারুণ যে হবে। ভবানী ঘোষাল আমাদের বাড়িতে আসছে, ভাবাই যায় না!"

রোজার কণ্ঠস্বরে বা ভাবভঙ্গিতে আদিখ্যেতা নেই, অন্য কেউ হলে মনে হত প্রায় ন্যাকামি কিন্তু সরোজ ওর জ্বলজ্বলে চোখে আর শক্ত করা মুঠোয় অপ্রত্যাশিত বিস্ময় ও আনন্দের ধাক্কা ছাড়া কৃত্রিমতার ছিটেফোঁটাও পেল না।

"কিন্তু খেলার সময় প্লেয়াররা কারুর বাড়িতে যাবে কি না, সেটা আগে থেকে এ-ভাবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।"

"তুমি বললেও আসবে না, তা হতে পারে!"

সরোজ বিরক্ত বোধ করল, মাথাটাও গরম হয়ে উঠছে। টেস্ট ম্যাচ বা টেস্ট ক্রিকেটাররা এখন যে কত জমকালো ব্যাপার বীণাকে তা বোঝানো যাবে না। সাধারণ রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটারদের সঙ্গে মর্যাদায় বা আভিজাত্যে যে কত তফাত ওর কন্যাস্নেহে ভরা মাথার মধ্যে তা ঢোকানো যাবে না।

"আমি কে যে বললেই আসবে?" সরোজের গলায় ঝাঁঝ এসে পড়েছে। সামলে নিয়ে নরম স্বরে বলল, "কত স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনের মধ্যে যে ওদের থাকতে হয়। ম্যানেজারের পারমিশন ছাড়া কেউ এক পা-ও বাইরে যেতে পারে না, গেলেও কাঁটায় কাঁটায় ফিরতে হবে। না হলে বোর্ডের কাছে রিপোর্ট যাবে।"

লহমার জন্য ভেবে নিয়ে সরোজ যোগ করল, "টেস্ট কেরিয়ারই খতম হয়ে যেতে পারে।"

মুখ তুলে বীণা বিপন্ন চোখে মেয়ের দিকে তাকাল। রোজার চোখ নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। মুঠি শিথিল।

"আঙ্কল আপনি বললেও আসবে না?"

সরোজ ওর করুণ মুখ, মুষড়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরে কষ্ট পেল। এই রকম অনুরোধ জীবনে কখনও আসেনি। যদি আসত সে মুহূর্তেই নাকচ করে দিত। এখনই সে তাই করত, শুধু এই মেয়েটির জন্য সে সোজাসুজি না বলতে পারছে না। সারল্য ছাড়াও রোজার সারা অবয়বে এমন কিছু একটা ব্যাপার যার টান সে অনুভব করছে।

"আমি চেষ্টা করব, তবে বেশি আশা কোরো না, হ্যাঁ চেষ্টা করব।"

"মা, অটোগ্রাফ বইটা আঙ্কলকে দাও না...আপনি ইন্ডিয়া আর নিউজিল্যান্ড টিমের সইগুলো জোগাড় করে দিতে পারবেন তো?"

সরোজ আবার বিব্রত বোধ করল। এ-সব কাজ যে কী ভাবে করতে হয় তা সে বুঝে উঠতে পারে

না। ক্রিকেটারদের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বাচ্চা ছেলেরা অটোগ্রাফ বইটা বাড়িয়ে দিয়ে কাকুতি মিনতি করছে এমন একটা ছবি তার চোখে ভেসে উঠল। অসম্ভব। কিছু সাংবাদিককে সে দেখেছে ড্রেসিংরুমে বা হোটেলে গিয়ে বা নেট প্র্যাকটিসের সময় সই জোগাড় করে। তাদের মতো কাউকে কানপুরে পেলে রোজার বইটা গছিয়ে দেওয়া যাবে। আর না পেলে পরিষ্কার বলে দেবে হল না, সময় করে উঠতে পারিনি।

"দাও চেষ্টা করে দেখব।"

রোজা চেয়ারের সারির ভিতরে এসে ঝুঁকে হুকে ঝোলানো চামড়ার থলিটা নামিয়ে ছোট্ট বইটা বার করে সরোজের হাতে দিল।

"দিল্লিতে আমি আপনার কাছ থেকে বইটা নিয়ে নেব।"

"কী করে?"

"আমি তো খেলা দেখতে যাবই।"

"ওর বাবা যে কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পায়! বহু টাকার অ্যাড ওদের কোম্পানি স্যুভেনিরে দেয় তো। প্যাভিলিয়ন ব্লকের টিকিট পায়।"

"আপনাকে আমি ঠিক খুঁজে নেব।"

"নিউজিল্যান্ড টিমে দু'-তিনজন ছাড়া সই নেবার মতো এমন কে আর আছে?"

সরোজ অটোগ্রাফ বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হালকা স্বরে বলল। প্রথম পাতায় এক জনপ্রিয় গজল গায়কের সই, তারিখটা চার মাস আগের। দ্বিতীয় পাতায় কেন্দ্রীয় এক রাষ্ট্রমন্ত্রীর দস্তখত, একই তারিখ। অস্ফুটে বলল, "বইটা তো প্রায় নতুনই।"

"সই ভরতি চারখানা বাড়িতে পড়ে আছে।"

বীণা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল। চোখে উদ্বেগ। "বাড়িতে এসো দেখাব।"

সরোজ হাসিমুখে রোজার দিকে তাকাল বীণার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে।

"ম্যাকগ্রেগরের সই কেনবার মতো নয়? বারোটা সেঞ্চুরি!"

রোজা তার মায়ের চেয়ারের হাতলে বসল। তর্ক করার জন্য তৈরি সে। এই ধরনের আলোচনায় ঢুকতে সরোজের ভাল লাগে না। শুধু সংখ্যা দিয়ে বড়-ছোট মাপ কষা। ম্যাকগ্রেগরকে এখনও সে ব্যাট করতে দেখেনি, রোজাও দেখেনি।

"ক্রিস বয়েড? এখন তো ওয়ার্ল্ডের সেরা অলরাউন্ডারদের একজন! আটাত্তরটা উইকেট, সাতশো আটাশ রান। টোনি পিকার্ড? গত বছর ট্রেন্টব্রিজে একাই তো নিউজিল্যান্ডকে জিতিয়ে দিচ্ছিল, পাঁচ বলে তিন উইকেট! ওর মতো অফস্পিনার এখন ইন্ডিয়ার আছে কি?"

সরোজ হাসিসমেত মুখটা বীণার দিকে ফিরিয়ে বলল, "রোজা এখন কী পড়ছে?"

"ফার্স্ট ইয়ার আর্টস, ইকনমিক্স অনার্স...লেডি শ্রীরামে পড়ছে। বড্ড তর্ক করে...যে-কোনও সাবজেক্টে। আমার সঙ্গে তেমন জমে না, বাবাকে পেলে শুরু হয়ে যায় দু'জনের।"

"পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব, তবে ক্রিকেটটা বাদ দিলেই ভাল হয়।"

সলজ্জ মুখে রোজা উঠে দাঁড়াল। আবার সরোজের চেয়ারে সে ফিরে যাবার পর বীণা বলল, "প্লিজ একটু চেষ্টা কোরো, খুব আশা করে আছে।"

"করব। তবে বুঝতেই পারছ, নিশ্চিত করে তো এ-সব ব্যাপারে...।"

সরোজ বলতে চেয়েছিল, খেলোয়াড়রা যে-ভাষা পড়তে পারে, সেই ভাষার লোককেই সমীহ করে, তাদের অনুরোধ রাখার চেষ্টা করে। ভারতে বাংলা জানা বড় বড় খেলোয়াড় ফুটবলে ছাড়া আর কোথায়? বাংলা কাগজের লোক বললে বেশির ভাগই তো দেঁতো হাসি দেখিয়ে দেয়। বহুভাষী এই দেশে খেলোয়াড়দের কাছে কদর ইংরেজি কাগজের আর ম্যাগাজিনের, এই ভাষাটাকেই ক্রিকেটাররা খাতির করে, যেহেতু ভারতের সর্বত্র এইভাষার কাগজ ওরা দেখতে পায়। আমি বাংলা কাগজের লোক, একমাত্র ভবানীই হয়তো আগ্রহ নিয়ে কথা বলবে কিন্তু অনুরোধ রাখাটা অন্য ব্যাপার। শুনেছি ও বেপরোয়া উদ্ধত প্রকৃতির, উড়নচণ্ডে, লঘুগুরু জ্ঞানটা কম।

"গায়ে দেবার জন্য তুমি গরম কিছু আনোনি?"

সরোজ লঘুভঙ্গিতে বলল, "এ-ব্যাপারেও আমি একদম বদলাইনি।"

"সে কী! কী শীত এই ডিসেম্বরে কানপুরে-দিল্লিতে পড়ে তা কি জানো?"

"তিন-চারবার দিল্লিতে, একবার কানপুরে ডিসেম্বরে থেকেছি, শীত লাগেনি।"

"আমার কাছে একটা শাল আছে ওটা রাখো, বেশি বাহাদুরি কোরো না।"

রাত্রে আমিষ না নিরামিষ খাবে জানার জন্য রেস্টুরেন্টের লোক জিজ্ঞাসা করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছে। সরোজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। এবার সে নিজের জায়গায় যাবে।

"এখানে বসেই খেয়ে নাও।"

"আমি রেলের খাবার খাই না।"

সরোজ সরু পথটায় বেরিয়ে এল। তাকে দেখে রোজাও উঠে দাঁড়িয়েছে, সরোজ হাত নেড়ে ডাকল।

"এবার নিজের চেয়ারে বোসো, ডিনার সার্ভ করার সময় হয়ে গেছে। ভেজ না নন ভেজ?"

"আমরা দু'জনেই ভেজ।" বীণা বলল।

এরপর সরোজ নিজের চেয়ারে চলে আসে। কালোকোট পিছন থেকে ঘাড়ের কাছে মুখ এনে বলেছিল, "আমি বলে দিয়েছি আপনি নন ভেজ খাবেন...বাঙালি তো...ঠিক বলিনি?" সরোজ "হুঁ" বলে ঘাড় ফিরিয়ে যোগ করে, "আমি রাতে খাব না, ওটা আপনার জন্য।" পাশের ছেলেটি এক সময় তাকে বলেছিল, "অনেক খবর রাখে রোজা, ক্রিকেটের পোকা।"

সরোজ এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার আগে আধো ঘুম অবস্থায় সে যখন হালকাভাবে অচেতনার গভীরে নেমে যাচ্ছিল তখন বীণাকে বলতে শুনছিল, "সরোজ মনে হচ্ছে আমি প্রেগনান্ট, তুমিই করেছ, জামসেদপুরে। তোমাকে বিয়ে করতে হবে।"

"তা হলে আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জাতের অমিল বাবা মানবেন না, আমাদের ফ্যামিলি যে কী গোঁড়া তা তুমি জানো না। সব কিছু থেকেই বঞ্চিত করবেন। তা ছাড়া আমি চাকরিও করি না...তুমি অ্যাবোর্শন করিয়ে নাও।"

"আমি তো একটা চাকরি করছি...দু'জনের তাতে চলে যাবে। তুমি স্টেট ক্রিকেটার, গ্র্যাজুয়েট, যে-কোনও ফার্মেই পেয়ে যাবে এক সময়।"

"আমাদের বংশে বাপ-মায়ের মনোমতো পাত্রীকে ছাড়া বিয়ে করা যায় না। আমি নিরুপায়, একমাত্র ছেলে আমি..."

"সরোজ এইসব মধ্যযুগীয় কথা এ যুগে অচল। আসলে বিন্দুমাত্রও তুমি ভালবাসনি, ভালবাসার ক্ষমতাও তোমার নেই। বাপের সুপুত্তুর সেজে পালাবার গর্ত খুঁজছ... বিট্রেয়ার, ভুল করেছি আমি একটা মেরুদণ্ডহীনকে ভালবেসে। তুমি চিরকাল বুকে হাঁটবে, কোনওদিনই বড় হতে পারবে না, কোনওদিনই টেস্ট খেলতে পারবে না।"

তিন

গোঙানির মতো একটা আওয়াজ মুখ থেকে বেরিয়ে আসতেই সরোজ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। হাত ঘড়িতে সময় দেখেই সে প্যান্টটা টেনে নিয়ে পা গলাল।

প্রেসপাস আনতে হবে কমলা টাওয়ার থেকে। দরজায় চাবি দিয়ে দু'পা গিয়েই আবার ঘরে ফিরে এল। বীণার শালটা খাটের উপর পড়ে রয়েছে। ভাঁজ করে হ্যান্ড-গ্রিপের মধ্যে রেখে জিপটা টেনে দিয়ে ভাবল তালাটা লাগিয়ে দেবে কি না। হোটেলের ঘর থেকে কোথাও এখনও পর্যন্ত তার কোনও জিনিস চুরি যায়নি। তবু সে ছোট্ট তালাটা লাগাল। জিনিসটা বীণার!

রিসেপশন কাউন্টারে সকালের দাড়িওলা যুবকটিই রয়েছে। চাবিটা তার হাতে দিয়ে সরোজ জানতে চাইল, কোনও ঘর খালি হবার সম্ভাবনা আছে কি না। যুবক মাথা নাড়ল, তবে যদি কেউ ঘর ছাড়ে তা হলে সরোজকে জানাবে, এই আশ্বাসটুকু দিল।

"কমলা টাওয়ার এখান থেকে কতদূর? হেঁটে যাওয়া যাবে?"

"তা যাবে, তবে আপনি রিকশা নিন। নতুন লোক, চিনে বার করতে অসুবিধে হবে।"

আগের বার সরোজকে প্রেসপাস আনতে যেতে হয়নি। তার কাগজের ফোটোগ্রাফার নিরঞ্জন নিজের পাস আনার সময় তারটাও নিয়ে এসেছিল। এবার নিরঞ্জনের বদলে আসছে রামকুমার দাস। মাস দুয়েক হল বিয়ে করেছে। বউকে সঙ্গে আনবে, উঠবে সম্পর্কিত এক শালার বাড়ি। রামকুমারের সঙ্গে সরোজের ভাল আলাপ নেই। ছেলেটি বছরখানেক চাকরি করছে। পোশাকে ফিটফাট। স্যুট এবং টাই পরা অবস্থায়ই সরোজ ওকে বেশির ভাগ দিন দেখেছে। কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ক্যামেরা এবং টেলিলেন্সের ব্যাগটা বিদেশি। ছবির পিছনে ওর লেখা ক্যাপশন থেকে সরোজের মনে হয়েছে লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি তবে ছবি ভাল তোলে। সে শুনেছে রামকুমার উদ্ধত প্রকৃতির, ধরাকে নাকি সরা জ্ঞান করে।

রামকুমারের সঙ্গে মাঠে ছাড়া দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। বস্তুত টেস্টম্যাচের সময় ফোটাগ্রাফারদের সঙ্গে রিপোর্টারদের যোগাযোগ প্রায় থাকেই না। দু'জনের কাজের ধরন এবং বসার জায়গাও আলাদা। ছবি তোলা, স্থানীয় কোনও স্টুডিয়োর সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফিল্ম ডেভেলপ করিয়ে রোলটা কাউকে দিয়ে বা নিজে এয়ারপোর্টে বা এয়ারলাইন্স অফিসে গিয়ে কলকাতার প্লেনে রোলের প্যাকেটটাকে ধরিয়ে দেওয়া—এইসব কাজেই ফোটোগ্রাফাররা ব্যস্ত থাকে। প্লেনের সময় অনুযায়ী ওদের কাজের সময়। তবে সাধারণত লাঞ্চের পরের ছবি নেবার আর সময় থাকে না, ফিল্ম ডেভেলপ করার জন্য ছুটতে হয়। দিনের খেলার শেষ দিকে শুধু একবার ওরা রিপোর্টারের কাছে আসে এয়ারলাইন্সের চালান নম্বরটা ম্যাচ রিপোর্টের সঙ্গে কলকাতার অফিসে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। দমদমে নম্বরটা দিয়ে অফিসের লোক তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা হস্তগত করতে পারে।

মল রোড দিয়ে রিকশাটা কিছুটা গিয়েই ডান দিকের একটা রাস্তা ধরল এবং একটু পরেই বাঁ দিকে ঘুরে ঢুকল একটা নোংরা গলিতে। দু'ধারে জুতো, স্টেশনারি, মুদি, দর্জি, মিষ্টি আর পানের দোকান। গলিটা এক এক জায়গায় এমনই সরু দুটি মোটর মুখোমুখি হলে ছোটখাটো সংকট তৈরি হবে। একটা কবিরাজি দাওয়াখানা আর পাঠশালা পেরিয়ে, গর্তে চাকা পড়ার ঝাঁকুনিটা সামলে অবশেষে রিকশাটা থামল কমলা টাওয়ারের ফটকে। কমলাপৎ পদমপৎ সিংঘানিয়া প্রতিষ্ঠিত সারা ভারতে ছড়ানো বিশাল ব্যবসাবাণিজ্যের সদরদফতর কিনা এইরকম এক গলিতে! সরোজ অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে রিকশাওলাকে বিদায় দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে অনুসন্ধানের জায়গায় খোঁজ নিল। নাম ও আগমন উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে, সামনের ঘরে তাকে অপেক্ষা করতে বলে লোকটি ফোন তুলল।

দশ মিনিট পর পানের পিক-লাঞ্ছিত সিঁড়ির কোনাগুলি এড়িয়ে সরোজ দোতলায় একটি ঘরে ঢুকল। একটি লোকের মুখোমুখি হয়ে টেবলের বিপরীতে তিন-চারজন বসে। সরোজ ঘরে ঢোকার সময় সম্ভবত জোরালো তর্ক চলছিল, তার রেশটুকু সে শুনতে পেল।

"ওরা যদি দুটো পায়, তা হলে আমরাও দুটো পাব। এ-ব্যাপারে কোনও পক্ষপাতিত্ব হলে...।"

সরোজের মনে হল লোকটি স্থানীয় কাগজের। স্যুট-টাই পরা, ঠোঁটের কোণে পানের রস লাগা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এই লোকটিকে, সরোজের যতদূর মনে পড়ে, গতবার সাংবাদিকদের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া বাড়তি একটা লাঞ্চ বাক্স পাবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে দেখেছিল।

"হাই সরোজ।"

'বম্বে মনিটর'-এর সুদর্শন অভয়ঙ্কর—প্রেসবক্সে ডাকনাম অভয়—হাত তুলে জানান দিল। সরোজও ছোট্ট করে হাত তুলে টেবলের ওধারের লোকটিকে তার আগমন-উদ্দেশ্য বলতে যাচ্ছিল।

"এই নিন আপনার পাস, রেডিই আছে।"

সরোজ তার হাত থেকে সেফটিপিন লাগানো গোলাপি কার্ডটা হাতে নিয়ে, দেখে নিল তার এবং কাগজের নাম লেখা আছে কি না।

"আমাদের ফোটোগ্রাফার কি তার পাস নিয়ে গেছে?"

"আধঘণ্টা আগে এসেছিলেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

সরোজ তাকাল অভয়ের দিকে।

"কখন এসেছ, কোন হোটেলে?"

"আজই, যে হোটেলে তুমিও উঠেছ?"

"আমি ঘর পাইনি, আর একজনের সঙ্গে শেয়ার করে আছি।"

"কানপুরে এই এক সমস্যা, ভাল হোটেল..."

"তুমি মাঠে যাচ্ছ তো।"

সরোজ থামিয়ে দিল অভয়কে। কথা বলতে শুরু করলে, বিশেষত অভিযোগ সংক্রান্ত হলে, আর থামতে চায় না।

"যাব।"

"তা হলে ওখানেই দেখা হবে।"

নরম তীক্ষ্ণ রোদ্দুর। হাওয়া না থাকায় অত্যন্ত মোলায়েম লাগছে। গরম জামা পরার দরকারই হয় না। কমলা টাওয়ার থেকে বেরিয়ে সরোজ হেঁটে মল রোডে এল। এবার খেতে হবে। যতদূর মনে পড়ছে 'ফুটু' নামের চিনা রেস্টুরেন্টটা কাছাকাছি কোথাও। বড় টেলিগ্রাফ অফিসটা ছাড়িয়ে একটু এগোতেই সে ফুটু পেয়ে গেল।

ভিতরটা প্রায়ান্ধকার। জনা চারেক মাত্র লোক। সে ঢুকতেই তারা ফিরে তাকাল।

ডান দিকে দেয়ালের দিকে মুখ করে সবে বসেছে, তখন পিছন থেকে শুনতে পেল কে যেন বলল। "সরোজদা।"

মুখ ফিরিয়ে দেখল কোণের চেয়ার থেকে উঠে একটি ছেলে তার দিকে আসছে। জিন্‌স, সাদা পোলো গলা গেঞ্জি তাতে বড় লাল-সবুজ অক্ষরে "লাভ মি" লেখা। আলো কম হলেও কোঁকড়ানো চুলগুলো যে ঈষৎ বাদামি তা বোঝা যাচ্ছে। দীর্ঘকায়, প্রায় ছ' ফুট, বলিষ্ঠ বাহু, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। মুখটা লম্বাটে, টিকোলো নাক, দাড়িগোঁফ কামানো এবং গায়ের রং তামার সঙ্গে চুন মেশানো। প্রথম দর্শনেই মনে হবে সাহেব এবং খেলোয়াড়। সরোজ কলকাতায় একে দু'-তিনবার দেখেছে, স্টেট অ্যাথলেটিকস মিটে আর সাউথ ক্লাবে। আলাপ নেই। বয়স তেইশ-চব্বিশের মধ্যেই, নাম জানে না, কোন কাগজের তা-ও জানে না।

"সরোজদা কখন এলেন? প্রেসপাস কালেক্ট করেছেন?"

পরিষ্কার কলকাতার টানে বাংলা। সরোজ অবাক হল।

"হ্যাঁ।"

"কলকাতা থেকে আর কেউ নেই, শুধু আমরা দু'জন। বসতে পারি?"

"নিশ্চয়। ভালই হল, একা একা ভাল লাগে না।"

"আমারও।"

বয় মেনু কার্ড সরোজের সামনে রেখে গেল।

"আমার অর্ডার আমি দিয়ে দিয়েছি, শুধু আপনার বলুন।"

সরোজ কার্ডে চোখ বুলিয়ে দেখল সারা ভারতে চিনা রেস্টুরেন্টগুলোতে যা পাওয়া যায় এখানেও তাই। দামও প্রায় এক।

"সুপ, চিকেন অ্যাসপারাগাস আর মিক্সড চাওমিন।"

সরোজ পরিচিত খাদ্যের বাইরে রসনার অভিযানে যেতে রাজি নয়।

"আপনি বোধহয় আমার নাম জানেন না।"

সরোজ অপ্রতিভ হেসে মাথা নাড়ল।

"শঙ্কর সিং গ্রুয়াল। ড্রাইভিং শেখায় যে গ্রুয়াল স্কুল আমি কিন্তু তাদের কেউ নই। নিউজ ডে-র স্পোর্টস ডেস্কে আছি প্রায় দেড় বছর, এই প্রথম বাইরে বেরোলাম।"

"তোমাকে দু'-একবার দেখেছি।"

"টেনিসে?"

"হ্যাঁ, সাউথ ক্লাবে আর অ্যাথলেটিকসেও।"

"ও-দুটো আমার খুব ফেভারিট স্পোর্টস। স্পোর্টস এডিটারের কাছে চেয়ে নিয়ে কভার করেছিলাম।"
"ক্রিকেট করেছ?"
"না। ক্রিকেট জানি, স্কুল টিমে খেলেছিও কিন্তু খুব ডেপথে কখনও যাইনি।"
"তা হলে একেবারে টেস্টম্যাচ দিয়েই শুরু করছ।"
"হ্যাঁ।" শঙ্কর একগাল হাসল। "মাদ্রাজ টেস্ট করতে গিয়ে অরুণদা এমন পা মচকালেন...দু'জন ছুটিতে, ভোম্বলদা রাজি নন, ওঁর মেয়ের পরীক্ষা, তাই...তা ছাড়া আমি তো ঠিক ম্যাচ রিপোর্ট করব না, সাইড লাইটস, ড্রেসিংরুম রিজের ওপরই বেশি জোর দেব, গসিপ কলামে যেমন বেরোয়, আর ইন্টারভিউ এইসব...ভুবু আমার অনেক দিনের বন্ধু তো ভেতরের খবর ঠিক পেয়ে যাব!"
শঙ্করের সামনে বয় একপ্লেট চপসুয়ে রেখে গেল।
"আমি কি শুরু করে দেব...ঠান্ডা হয়ে গেলে...।"
"না, না, তুমি আরম্ভ করো। চিনে খাবারের এই এক ঝামেলা ঠান্ডা খেতে একদমই ভাল লাগে না।"
সরোজ এতক্ষণ কথা শুনতে শুনতে মেপে নিচ্ছিল ওকে। ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ, বাহাদুরি দেখাবার লোভ সামলাতে পারে না কিন্তু কাজের এবং খাটিয়ে। মনে হচ্ছে খোলা-মেলা আমুদে, সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না, ফর্ম্যালিটিজের ধার ধারে না।
"কবে এসেছ, উঠেছ কোথায়?"
"কাল রাতে, উঠেছি আপনার পিছনেই সঙ্গম হোটেলে। বাজে ঘর আর যত টিভি আর রেডিয়োর লোকে ভরা। সকালে গরম জলই পেলাম না।..."
"আমি কোথায় উঠেছি জানলে কী করে?"
"প্রেসপাস নিতে গেছি তখন মোটা বেঁটে একজন বোধহয় বোম্বের, আমি কলকাতা থেকে এসেছি শুনে বলল আপনি মধুছন্দায়।"
"অভয়, সুদর্শন অভয়ঙ্কর। যেখানেই যায় প্রথমেই খোঁজ নেয় কে কে এসেছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, রুম চার্জ কত, ঘর কমফর্টেবল কি না, ফুড কেমন?"
"না।"
"করবে।"
সুপ এসে গেছে। ধোঁয়া উঠছে। ঠান্ডা করার জন্য চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে সরোজ ভাবতে শুরু করল। রোজার অটোগ্রাফ বুকে সই করানো আর দিল্লিতে ওদের বাড়িতে ভবানীকে নিয়ে যাওয়া—এই দুটো কাজ একে দিয়েই করাতে হবে অবশ্য যদি রাজি হয়। তার থেকেও বড় কথা, ওর কথাবার্তার মধ্যে সত্যতা আছে কতখানি?
তবে একটা ব্যাপারে শঙ্করের প্রতি তার অবচেতনে বিতৃষ্ণা ঘনিয়ে উঠেছে। ছেলেটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের অর্থাৎ টেস্টমানের ক্রিকেট বোঝে না বলল এবং সে-জন্য কোনওরকম জড়তা বা কুণ্ঠা ওর মধ্যে নেই। ও এসেছে ঝগড়াঝাটি, রসালো কথাবার্তা, অপ্রীতিকর ঘটনা অর্থাৎ কেচ্ছা জোগাড় করার জন্য। যে-সব খবর তারিয়ে তারিয়ে পাঠকরা পড়বে, যে-সব খবরের সঙ্গে খেলার মূল উদ্দেশ্য বা প্রেরণার কোনও সম্পর্ক নেই। পাঠকদের মনের মধ্যে সুপ্ত নীচ প্রবৃত্তি খুঁচিয়ে তুলে একটা নোংরা আবহাওয়া তৈরি করে পাঠক সংগ্রহ করার, কাগজের বিক্রি বাড়ানোর এই পন্থা সরোজ কখনও মেনে নিতে পারেনি। ইদানীং এই পথে অনেকেই যাচ্ছে, সরোজের যাবার ইচ্ছা নেই। খেলার মাঠে খেলা হচ্ছে, তুমি দেখছ, খেলার দোষ ত্রুটি, ভালমন্দ যা বুঝলে সেটাই তোমার রিপোর্ট করার বিষয়। কিন্তু কী একটা হাওয়া যেন আসছে, শুধু মাঠের মধ্যের খেলা নয়, তার আড়ালে যে-জগৎ রয়েছে তার খবরও প্রকাশ্যে টেনে আনা দরকার হয়ে পড়ছে। এটাও নাকি জরুরি যেহেতু তা ঘটনা। 'সব কাগজেই বেরিয়েছে খেলার পর কোচের সঙ্গে ফুটবল সেক্রেটারির গালাগালি হয়েছে, টেন্টের মধ্যে হাতাহাতিও হয়েছে, একজন ফুটবলার কোচকে শুয়োরের বাচ্চা বলেছে আর তোমার লেখায় এ-সব কিছুই নেই...খেলার পর করো কী, মুড়ি চিবোতে চিবোতে অফিসে চলে আসো, টেন্টে যাও না কেন?' ক্রীড়া সম্পাদক রমেন গুহঠাকুরতা এই বলে গত ফুটবল সিজনে ধমকেছিল বিমলেন্দুকে। বিভাগের অন্যরা মুখ নামিয়ে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে কাগজ-কলম নিয়ে।

সরোজ এই ধরনের খবর সংগ্রহের বিরোধী। গুহঠাকুরতা তা জানে, তবে সিনিয়র রিপোর্টার বলে সাধারণত চুপ করে থাকে। মৃদু অনুযোগ 'এটা দিলে সরোজ লেখাটা ভাল খুলত' বা 'মিস করে গেলে অমন জবর ব্যাপারটা!'—এর বেশি কখনও বলেনি। তবে সরোজ শুনেছে আড়ালে তার সম্পর্কে 'মান্ধাতাপন্থী...নীতিবাগীশ...আধুনিক রিপোর্টিং-এর কিসসু জানে না' ইত্যাদি গুহঠাকুরতা বলেছে। আর একবার শুনেছিল, 'একটা অপদার্থ। বেঙ্গলের হয়ে একটু আধটু খেলেছে, দু-চারটে খেলার উপর লেখা বেরিয়েছিল এখানে সেখানে তাই চাকরিটা পেয়ে গেছল। তখন কাগজের যা চরিত্র ছিল আর এখন...দুনিয়াটা যে-ভাবে র‍্যাপিড বদলে গেছে তার সঙ্গে কাগজও বদলাতে বাধ্য। জার্নালিজম যেখানে এসেছে তাতে ও এখন হলে চাকরিই পেত না।...টোটালি মিসফিট।'

কথাগুলো মনে পড়লেই সরোজের হাত কাঁপতে শুরু করে উত্তেজনায়। তার ব্লাডপ্রেশার উঁচুর দিকেই, ডাক্তার উত্তেজিত হতে বারণ করেছে কিন্তু স্মৃতিকে কাজ করা বন্ধ করতে বললে শুনবে কেন? সে লক্ষ করল তার হাতে সুপের চামচটা থরথর কাঁপছে। মনে মনে সে বলে চলল 'কুল ডাউন, কুল ডাউন সরোজ... ঠান্ডা হও, ঠান্ডা হও।'

"কিছু বললেন?" শঙ্কর ঝুঁকিয়ে দিল মাথাটা।

"এখান থেকে কোথায় যাবে এখন?"

"বড় টেলিগ্রাফ অফিসটা পাশেই একবার টেলেক্স ব্যবস্থাটা দেখে নেব। ওখানে আসল লোকটা কে...এক প্যাকেট ডানহিল তার হাতে ধরিয়ে দিতে হবে তো।" শঙ্কর মুখ টিপে হাসছে। সরোজের মনে হল একে পেলে গুহঠাকুরতা খুশিই হবে।

শঙ্করের খাওয়া শেষ হচ্ছে তখন সরোজের জন্য চাওমিন টেবলে এল।

"আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন?"

"একবার মাঠে যাব।"

"আজ কিছু পাঠাবেন? কার্টেন রেইজার?"

"হ্যাঁ। একটা তো পাঠাতেই হয়।"

"আমি টেলেক্স ইনচার্জের সঙ্গে একবার মোলাকাতটা করে আসি। ওখানেই আপনার অপেক্ষা করব তারপর একসঙ্গে মাঠে যাব।"

সরোজ ঘাড় নাড়ল। শঙ্কর নিজের বিল চুকিয়ে অ্যাডিডাসের একটা নীল রঙের স্পোর্টস কিটব্যাগ বগলে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল। সরোজের মনে হল ওর জুতোটাও বিলিতি। জিজ্ঞাসা করতে হবে কখনও দেশের বাইরে গেছে কি না।

শঙ্করকে খুঁজতে সরোজ টেলিগ্রাফ অফিসে টেলেক্সের রিসিভিং কাউন্টারের কাছে দাঁড়াল। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে সে ঘুরতে লাগল নানান ঘরে উঁকি দিয়ে। অবশেষে ওকে দেখতে পেল সদর গেটের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় যেখানে টেলিগ্রাফ বাড়ির সীমানা-রেলিং ঘেঁষে ফুটপাথে ত্রিপলের চালার নীচে চায়ের দোকান। শঙ্করের সঙ্গে গলাবন্ধ খয়েরি গরম কোট ও ধুতিপরা এক গৌরবর্ণ মাঝবয়সি লোক চায়ের গ্লাস হাতে। এগিয়ে যেতে যেতে সরোজের চোখে পড়ল, লোকটির টিকিতে গিঁট বাঁধা এবং কপালে লাল ফোঁটা। এঁকে সে চেনে।

"সরোজদা আসুন আলাপ করিয়ে দি...মণীশ শুক্লা এখানকার একজন অফিসার মাঠে টেলেক্স ক্যাম্পে থাকবেন আর ইনি সরোজ বিশ্বাস, কলকাতার বাংলা কাগজ প্রভাত সংবাদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো আগে একবার এসেছেন আমার মনে পড়ছে...ই সুধনিয়া, বাবুকে চা দে।"

রেলিংয়ের ওধারে চায়ের দোকানের ছেলেটিকে উদ্দেশ করে মণীশ শুক্লা বললেন।

"আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না, আমি সারাক্ষণ মাঠে থাকব...রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের ক্যাম্প খোলা থাকবে আর এখানে তো সব সময়ই পাবেন। টেস্টম্যাচের জন্যই আমাকে স্পেশাল ডিউটি দেওয়া হয়েছে।

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে সরোজ কিঞ্চিৎ কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলল, 'শুক্লাজি আপনার মেমারি অদ্ভুত শার্প, ঠিক চিনতে পেরেছেন তো! জানো শঙ্কর ইনি হেল্প না করলে আমার একটা কপিও ঠিক সময়ে

অফিসে ল্যান্ড করত না। হয় কলকাতার লাইন জ্যাম নয় লাইন ডাউন, সে কী অবস্থা! আমি তো কপি এঁনার হাতে জমা দিয়ে নিশ্চিন্তে হোটেলে চলে যেতাম। তখন অবশ্য এত রিপোর্টারের ভিড়ও ছিল না।"

শুক্লাজি মৃদু হাসি দিয়ে প্রশংসাগুলি গ্রহণ করলেন। শঙ্কর চোখ টিপল। সরোজের স্পষ্ট মনে আছে, কিশোর পুত্রকে একদিন খেলা দেখাবার জন্য শুক্লা তাকে ধরেছিল কিন্তু সে মাঠে ঢোকার কোনওরকম পাসই জোগাড় করতে পারেনি। কীভাবে যেন অভয়ঙ্কর শেষদিনে ছেলেটিকে প্রেসবক্সে এনে খেলা দেখিয়েছিল। সরোজের মনে একটা অস্বস্তি ধরল, শুক্লা তার ব্যর্থতা বা গলদটাকে মনে রেখে থাকলে মুশকিলে ফেলতে পারে। তবে লোকটা সাদাসিধে হয়তো প্যাঁচ কষবে না।

"সরোজদা চলুন মাঠে যাই, ইন্ডিয়া টিম তিনটে পর্যন্ত নেট প্র্যাকটিস করবে, তারপর একবার হোটেলে যাব তারপর স্টোরি ফাইল করব।"

সরোজ চায়ের দাম দিতে যাচ্ছিল কিন্তু শুক্লাজির প্রবল আপত্তিকে অসম্মান করতে ভরসা পেল না। দু'জনে একটা রিকশায় রওনা হল গ্রিন পার্কের উদ্দেশে।

"ডানহিল দিয়েছ?"

"কখন দিয়েছি! পাওয়া মাত্রেই পকেটে চালান করে দিয়েছে, মনে হয় না খায়। হয়তো ওপরওলাকে ভেট দেবে।"

"শঙ্কর তুমি এত ভাল বাংলা বলো কী করে? দেখলে তো সাহেব মনে হয় তোমাকে!"

"আমি তো দু'বছর বয়স থেকে কলকাতায়। পড়াশুনো ভবানীপুরে মিত্র ইন্সটিট্যুশন আর সেন্ট জেভিয়ার্স...পাড়ার ছেলেরা তো সবই বাঙালি, রাস্তায় রবারের বলও খেলেছি বহুদিন।"

"কে কে আছেন বাড়িতে?"

"গ্র্যান্ডমাদার আর মেইড সারভেন্ট... কাজিনরা থাকে বেলুড়ে, ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা আছে... আত্মীয়টাত্মিয় আছে চণ্ডীগড়ে।"

"তুমি দু' বছর থেকে কলকাতায়, চণ্ডীগড়ে জন্মেছ?"

শঙ্কর হাসল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। উলটোদিক থেকে রিকশায় আসছে মহারাষ্ট্র ক্রনিকলের বাসু যোগলেকর আর প্রত্যহ কাগজের তরুণ লাহিড়ি। সরোজকে দেখে যোগলেকর হাত তুলল, শঙ্করকে এখনও কেউ চেনে না। বাসুর সঙ্গে সরোজের প্রথম পরিচয় কানপুরেই, একই হোটেলে 'সিধালোক'-এ তারা ছিল।

"ওরা কোথাকার, ইংরেজি কাগজের?"

শঙ্কর ইংরেজি কাগজের লোক, তাই সব ইংরেজি কাগজকে সে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।

"বাসু যোগলেকর, যে হাত তুলল, মারাঠি কাগজের আর তরুণের বাংলা।"

শঙ্কর নিরুৎসুক হয়ে গেল। সরোজ সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাইয়ের দুটো কাঠি নষ্ট করে রিকশার গতি কমার জন্য একটা মোড়ের অপেক্ষায় থেকে বলল, "বাড়িতে তুমি আর ঠাকুমা, বাবা-মা?"

"একজন মন্ট্রিয়েলে অন্যজন বারমিংহামে।"

শঙ্কর দুটো তালু ছড়িয়ে ব্যবধানটা বোঝাল। সরোজ মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। শঙ্করের মুখে ভাবের বদল হয়নি।

"বাবা পাঞ্জাবি মা ইংলিশ। ডিভোর্স হয়ে গেছে। বাবা কানাডায় চলে যাবার আগে আমাকে ঠাকুমার কাছে রেখে যায়, এখনও টাকা পাঠায়। রেস্টুরেন্ট বিজনেসে আছে, অবস্থা ওখানকার স্ট্যান্ডার্ডে ভালই। আমায় যেতে বলেছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি।"

"কেন, গেলে তো ভালই হত।"

"তা হত।"

শঙ্করের শুকনো স্বর আরও কৌতূহল থেকে সরোজকে নিরস্ত করল। হয়তো গূঢ় কোনও কারণ আছে।

ইস্পাতের চাদরে তৈরি সবুজ পাল্লার গেটটা অল্প ফাঁক। সেখানে কয়েকজন পুলিশ আর ছোটখাটো

ভিড়। নেট প্র্যাকটিসে ক্রিকেটারদের কাছের থেকে দেখার, অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য সর্বত্রই এই ঝামেলাটা তৈরি হয়। "নেহি নেহি, ভাগো ভাগো।" শুনতে শুনতে এবং ব্যাটন আন্দোলন দেখতে দেখতে ওরা ভিড়ের কাছে পৌঁছতেই কলরবটা আচমকা থমকে গেল। সবাই শঙ্করের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। পুলিশদের মুখে তটস্থ ভাব দেখা দিল।

ইতস্তত ভাব কাটিয়ে সাহসী একটি কিশোর অটোগ্রাফ বইটা শঙ্করের দিকে এগিয়ে ধরল।

"ন্যাও, ন্যাও, নট ন্যাও।"

নিখুঁত সাহেবি বিকৃত উচ্চারণে কথা ক'টা বলে শঙ্কর খুব ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকতেই পুলিশ ব্যাটন চালিয়ে তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করতে শুরু করল। সরোজের ভয় ছিল, এইসব ক্ষেত্রে মাথামোটা পুলিশরা ভিতরে যেতে দিতে চায় না, বিশেষত এই রকম শহরে যেখানে বড়মাপের খেলা ক্বচিৎ হয়। কড়াক্কড়ি দেখাতে এরা বদ্ধপরিকর। ওপরওলার নির্দেশ দ্বিগুন উৎসাহে পালন করে।

শঙ্কর মুখ ফিরিয়ে ইশারায় সরোজকে অনুসরণ করতে বলল। তখন সরোজের কানে এল, "এর নাম কী রে?" "কী জানি বোধহয় বয়েড হবে।"

ভিতরে ঢুকে শঙ্কর বলল, "বহু জায়গায় এই সুবিধেটা পাই, চেহারাটার জন্য মা'কে তখন মনে মনে ধন্যবাদ দিই।"

"হ্যাঁ, এখনও কটা চামড়া, কটা চোখ দেখলে এদেশের লোকে আলাদা খাতির দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পুলিশরা তো অশিক্ষিত গাঁইয়া, শিক্ষিতরাই আহ্লাদে গলে যায় যদি সাহেব তাদের সঙ্গে কথা বলে কি সাহেবদের সেবা করার সুযোগ পায়। সব টেস্ট সেন্টারেই দেখবে, সাহেব জার্নালিস্টরা কী খাতিরটা পায়!"

"আমাকে কী ভেবেছিল বলুন তো?"

সরোজ পা থেকে মাথা পর্যন্ত শঙ্করকে দেখে নিয়ে ওকে খুশি করার জন্যই বলল, "নিউজিল্যান্ড টিমের কেউ!"

শঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসির আভায়। "আপনার কি তাই মনে হয়?"

"নিশ্চয়। পাক্কা ক্রিকেটারের মতো তোমায় লাগছে।"

"আপনার সঙ্গে ভুবুর আলাপ আছে?"

"না।"

"করিয়ে দেব। চমৎকার ছেলে, হইচইয়ে, কোনও অহংকার নেই...।"

"শুনেছি একটুতেই মাথা গরম করে ফেলে, লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না।"

"সে আর এমন কী।" শঙ্কর কাঁধ দুটো উঁচু করল। "যে ক্লাস অফ ক্রিকেটার, যে লেভেলে ও পৌঁছেছে সেখানে যা টেনশন, খুব হাই স্ট্রাং হয়ে লড়তেই হয়।"

সদ্য চুনকাম করা দেয়ালে ইংরেজিতে 'প্রেসবক্স' এবং ব্লক ও গেট নম্বর লেখা। তির দিয়ে দেখানো একটা সবুজ লোহার গেট। ওরা সেটা অতিক্রম করে ছোট্ট একটা দরজায় দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছেন দেখল। এটা প্লেয়ার্স ড্রেসিংরুমে যাবার দরজা। ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে গ্যালারির পিছনে ফাঁকা জমি আর যাতায়াতের পথ। ওখানে নানাবিধ খাবারের স্টল বসবে কাল থেকে। ধুলোর ঝাপসা দেয়াল উঠেছে। ওরা আর এগোল না, কাঠের গ্যালারির মধ্য দিয়ে একটা সরু পথে ঢুকে পড়ল।

গ্রিন পার্ক মাঠের ঘাস দেখে সরোজ অবাক হল। গতবছর দেখেছে লালচে ঘাস, জায়গায় জায়গায় টাক, মাটি বেরিয়ে। আর এখন তার সামনে বেশিক্ষণ চোখ রাখা যায় না এমন দাউদাউ সবুজ। তার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "বাহ্!"

"সরোজদা, ফেন্সিং ডিঙিয়ে এখান থেকেই মাঠে নামতে হবে, পারবেন?"

"দ্যাখো না পারি কি না।"

ব্যস্ত হয়ে সরোজই আগে ডিঙোল। কোমর সমান উঁচু ফেন্সিংয়ের মাঝামাঝি একটা ফোকরে এক পা ঢুকিয়ে অন্য পা ঘুরিয়ে সে সাইকেলে চড়ার মতো উঠল এবং সাইকেল থেকে নামার মতোই পা ঘুরিয়ে সে অন্যধারে নামল। শঙ্কর শুধু ডান হাতে ফেন্সিংয়ের উপরটা ধরে হাইজাম্প দেওয়ার মতো শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে তুলে মাঠের মধ্যে পড়ল সাবলীল ভাবে।

"শঙ্কর, রিয়েলি তোমাকে ক্রিকেটারের মতোই লাগছে।"

"সরোজদা প্লিজ কল মি শঙ্কু।"

মাঠের অপর দিকে কয়েকটা কংক্রিটের থাম অসমাপ্ত অবস্থায়। নির্মাণের কাজ চলছে, পাকা স্ট্যান্ড আর প্যাভিলিয়ন হবে। দূরে বিরাট উঁচু, ইটের তৈরি একটা চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ওদিকটাকে মিল-এন্ড বলে রেডিয়োয় ধারাবর্ণনা দেবার সময়। মাঠের ওদিকেই নেট পড়েছে। মাঠের মাঝে দড়ি দিয়ে ঘেরা ধূসর পিচ। সবুজের মাঝে শুকিয়ে আসা পাঁচড়ার মতো। কয়েকটি লোক শল্য চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ চোখে পিচের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। দূর থেকে সরোজ চিনতে পারল দু'জনকে, ইউ এন আই-এর উন্নি আর ডেইলি মেলের রতন মেনন। পিচ দেখে কী যে ওরা বুঝছে! ভারতে সব টেস্ট সেন্টারে তো একই পিচ, স্লো টার্নার, পাঁচ দিনই ঝিমিয়ে থাকবে। ব্যাটসম্যান আর বোলারেরই নয় সাংবাদিক, দর্শকদেরও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় পাঁচ দিন ধরে। এই নিউজিল্যান্ড টিমটা মাদ্রাজে সাতাশি রানে যে কী করে হারল সরোজের কাছে তার একটাই কারণ মনে হয়—অতি বাজে ব্যাটিং সাইড। মধু ভাণ্ডারকরের স্পিন এমন কিছু ভয়ংকর নয় যে ম্যাচে বারোটা উইকেট পেয়ে যাবে। চিপক আর গ্রিন পার্ক ইডেন আর ফিরোজ শাহ কোটলা একই তো উইকেট! বয়স হয়ে গেছে, একান্নটা টেস্ট খেলে ফেলেছে। বাঁ হাতটা গত আট বছরে কত হাজারবার যে ঘুরিয়েছে! ওর বলে আগের মতো আর নীচ থেকে ছটকানি হয় না, বাউন্সও কমে গেছে। স্রেফ ফ্লাইটের চতুরালিতে উইকেট তো পেয়ে যাচ্ছে! আরও পাঁচটা উইকেট পেলেই দু'শো হবে, কোনও মারাঠি বোলার এখনও পায়নি। সেন্টিমেন্টাল কারণেই যে ভাণ্ডারকরকে খেলানো হচ্ছে এটা সবাই বোঝে। দু'শো না হওয়া পর্যন্ত টেস্ট খেলবেই। তার থেকেও বড় কথা, সিলেকটরদের এবং বোর্ড মেম্বারদের কেউ কেউ ওর প্রতি স্নেহপ্রবণ। হায়দরাবাদের লেগব্রেক বোলার ফরজন্দ আলি এখনও টেস্ট খেলেনি, মাদ্রাজের মতো এখানেও তাকে পনেরোজনে রাখা হয়েছে। ছেলেটি গতবছর থেকেই তৈরি টেস্ট খেলার জন্য।

শঙ্কর এগিয়ে গেছে ভারতীয় নেটের দিকে। সরোজের মনে হল, রাজীব তারিখ ব্যাট করছে। গত পাঁচ বছরে একুশটা টেস্ট, কখনওই পুরো সিরিজ খেলেনি, সর্বোচ্চ বাহান্ন রান। ল্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান হওয়াটাই নাকি ওর বড় ব্যাপার।

"হ্যালো সরো।"

উন্নি নিয়মরক্ষার মতো বলল।

"হ্যালো। কবে এসেছ?"

"আজ সকালে।"

"হ্যালো মেনন।"

"হ্যালো, সরোজদা আপনি মাদ্রাজে যাননি?"

"না।"

ওরা দু'জন আধময়লা প্যান্ট-বুশশার্ট পরা এক শীর্ণ প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলছিল। বোধহয় পিচ এঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি। আন্দাজে এরা কাজ করে মান্ধাতার ফর্মুলায়। যা বলে তার উলটোটাই ঘটে। নিশ্চয় বলছে থার্ড ডে থেকে বল দারুণ ঘুরবে! সরোজ গুড লেংথের কাছে জমির দিকে সরে গেল। সকালে জল দেওয়া হয়েছে, তারপর রোল। মাটি সামান্য ফাটাফাটা, মাকড়সার জালের মতো। ঘাস প্রায় কিছুই রাখা হয়নি, যা রয়েছে, গিঁটওলা, প্রায় মরা। স্পিনারদের বল ঘোরাতে নাকি সাহায্য করবে।

সরোজের মনে পড়ল, দিল্লির সঙ্গে ইডেনের খেলা ম্যাচটার কথা। ঠিক এই পিচ, এই ঘাস। বাংলার ড্রেসিংরুমে উত্তেজনা, ম্যাচ জিততে চলেছে। ফোর্থ ইনিংসে দিল্লিকে তিনশো চব্বিশ রান করে জিততে হবে হাতে পাঁচ ঘণ্টার মতো সময়। পারবে না। পিচ রোল করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এবার সুবীরের বল লাট্টুর মতো ঘুরবে। ক্যাপ্টেন অলোক দত্ত বলেছিল, "স্টেডি সরোজ, এবার ক্যাচ উঠবে হাত ভরে, আঁকুপাকু করার দরকার নেই, প্রত্যেকটা নিতে হবে, একটাও যেন স্টাম্প মিস না হয়।" পাঁচ ঘণ্টা নয়, তিন ঘণ্টাতেই খেলা শেষ হয়ে যায়। দিল্লি দু' উইকেটে তিনশো সাতাশ তুলেছিল। তাতে ছিল অনন্তরামের দু' ঘণ্টায় একশো তেষট্টি, রঞ্জিত শর্মার আধ ঘণ্টায় চুয়ান্ন। সুবীর উইকেট এবং মেডেনও পায়নি একত্রিশ ওভারে দেড়শোর ওপর রান দিয়ে। একটা ক্যাচও সরোজের কাছে আসেনি। গিঁটওলা

ঘাস কোনও সাহায্যে আসেনি, উইকেটও ভাঙার বদলে আরও জমাট বেঁধে যায় রোল করার জন্য।

আজকের কার্টেন রেইজারের প্রথমেই এই ঘটনাটা লিখলে কেমন হয়? সরোজ হালকা বোধ করল। বরাবরই, শুরুটা কীভাবে করবে, তাইতে সে ব্যতিব্যস্ত হয়। একই খেলোয়াড়, একই পিচ একই কথা বারবার লেখা! বিদেশিদের ভালমন্দর জন্য মাথাব্যথা ভারতীয় সাংবাদিক, পাঠক করবে কেন?

তা হলে কী লিখবে? মনে পড়ল রেস্টুরেন্টে শঙ্করের কথাগুলো। ইদানীং যে-ভাবে টেস্টম্যাচ খেলা হচ্ছে, নীরস বিরক্তিকর একঘেয়ে, শুধু ড্র আর ড্র, তাতে রসালো ড্রেসিংরুম-কেচ্ছা ছাড়া আর তো কিছুই লেখার থাকে না! সম্বল একমুঠো শব্দ, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতি টেস্টে প্রতিদিন খরচ করে যাওয়া। লিখতেও তার এখন ক্লান্তি লাগে। পাঠকরা কাগজ খুলে কী পড়বে? তাদেরও তো একঘেয়ে খেলার রিপোর্ট পড়ে পড়ে ক্লান্তি এসে গেছে। অন্য কিছু তারা এবার চায়। কন্ট্রোভার্সি, অবজ্ঞা, ঝগড়া, ঈর্ষা, দোষারোপ, হাতাহাতি, সিনেমার ম্যাগাজিনগুলোয় যে-রকম বেরোয়!

সরোজ মন্থরভাবে নেটের দিকে এগোল। স্লিপ ক্যাচিং প্র্যাকটিস করছে অর্ধচন্দ্র হয়ে পাঁচজন, বল মারছে ম্যানেজার মনোহরণ। শঙ্কর আর ভবানী একটু একান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ভবানীর হাতে বল, লোফালুফি করছে, আর শঙ্কর কিছু যেন মজার কথা শুনে হাসছে। সবাই কাজে ব্যস্ত অথচ ভবানী অলসভাবে সময় কাটাচ্ছে? ভ্রূ কুঁচকে উঠল সরোজের।

শঙ্কর হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। সরোজ এগিয়ে গেল।

"আপনার সঙ্গে তো ভুবুর আলাপ নেই?"

"অল্প মানে মুখচেনা আর কী?"

ঠোঁট ছড়িয়ে ভবানী হাত বাড়াল। সরোজ তালুটা ধরল। কড়া চেটো, আঙুলগুলো ইস্পাতের শিক মনে হল।

"এত তাড়াতাড়ি নাম করে বিখ্যাত হবে জানলে আলাপ করে রাখতাম।"

"আমি আর কী করলাম, আপনারাই তো লিখে বিখ্যাত করেছেন।"

সরোজ মাথা নাড়ল হাসতে হাসতে। খুবই বালকোচিত কথা শুনতে হল এমনভাবে সে ডান হাত তুলে ধরল যেন ভবানীকে থামাতে।

"তোমার বায়োডাটাটা যে একটু চাই।"

ভবানী কিছু বলার আগেই ব্যস্ত হয়ে শঙ্কর বলল, "ভাববেন না সরোজদা, আমি আপনাকে দিয়ে দেব। ওর লাস্ট পাঁচ বছরের সব আমার কাছে আছে।"

"সব মানে?" ভবানী কৃত্রিম ভয় পাওয়ার মতো চোখ করল।

"না না ও-সব ব্যাপার নয়। খেলার দিকের সব—কোন কোন ক্লাব, কে কোচ—"

'প্লিজ শঙ্কু, আমায় কেউ কোচ করেনি। এখন অনেকেই ক্লেম করছে কিন্তু আমি, সত্যি কথা বলতে, যা কিছু শিখেছি সবই দেখে দেখে।"

"আমি তো সরোজদাকে তাই-ই বলতাম, ভুবু সেলফ মেড ক্রিকেটার। আপনি তো এখান থেকে টেলিগ্রাফ অফিসে যাবেন ডেসপ্যাচ পাঠাতে, তারপর?"

"তারপর আর কী, সোজা হোটেল?"

"রাত্রে খাবেন কোথায়, ফুটু-তে?"

"তা ছাড়া আর যাব কোথায়?"

"এক কাজ করুন, আমি আপনাকে রাত আটটা না... ন'টা নাগাদ ডেকে নেব। দু'জনে একসঙ্গে খেতে যাব আর তখন আপনাকে ভুবু সম্পর্কে যা যা জানতে চান বলে দেব, কেমন?"

"ঠিক আছে। ভবানীর কি প্র্যাকটিস হয়ে গেছে?'

ভবানী আড়চোখে ক্যাচিং প্র্যাকটিসের দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোনা তাচ্ছিল্যে মুচড়িয়ে বলল, "একবার তো আপনাদের দেখিয়ে করতেই হবে, নয়তো লিখে দেবেন ঘোষাল অসুস্থ কি ইনডিসিপ্লিনড। ম্যানেজারটাও টিপিক্যাল ইডলি-সম্বরা, হোটেলের লবিতে কাল বসেছিল, ঘড়ি নিয়ে, কে কখন ফিরছে নোট করছিল।"

"মনোহরণ ভাল ফিল্ডার ছিল, ফিটনেস নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করা ছাড়া মানুষটা ভাল।"

"চেনেন নাকি? শঙ্কর বলল।

সরোজ মাথা নাড়ল

"ভুবু, যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছ...এবার এসো।"

মনোহরণের স্বরে হুকুম বা নির্দেশ নয়, অনুরোধ। ভবানী হাত তুলে মনোহরণকে "ওকে" এবং সরোজ আর শঙ্করকে হাসিমুখে "চলি" বলে মন্থর চালে ফিল্ডারদের দিকে এগোল।

"একদম সোবার্সের মতো হাঁটাটা।"

"সোবার্সকে দেখেছ?"

"না।"

"খুব হাসছিলে দেখলাম, ব্যাপার কী?"

"ব্যাপার কিছুই নয়। অটোগ্রাফের জন্য মেয়েরা হোটেলের লবিতে যা কাণ্ড করছে। যাকে পাচ্ছে তারই সই নিচ্ছে। ঠুকরালের ভাই দেখা করতে এসেছে তারও সইয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। যত বলছে আমি জীবনে ক্রিকেট ব্যাটই হাতে নিইনি ততই মেয়েরা অবিশ্বাস করছে। বেচারাকে সই দিয়ে তবে রেহাই পেতে হল। রবি আনন্দেব বউ এসেছে, তারও সই চাই! ভুবুর ঘরে লাস্ট কুড়ি ঘণ্টায় আটটা ফোন এসেছে মেয়েদের।"

"সইয়ের জন্য?"

শঙ্কর মুচকে হাসল। "ফোনে তো আর সই করা যায় না, ওরা সই নয় ভুবুকে চায়। রেস্ট ডে-তে ভুবু কি ফ্রি থাকবে তা হলে ওকে নিয়ে লখনউ বেড়াতে যাবে। একজন বলেছে, 'তুমি কি ঘরে একা তা হলে গল্প করতে যাব, ভীষণ এক্সাইটেড বোধ করছি তোমার ছবি দেখে, রাতে ঘুম হচ্ছে না।' তবে ক্লাস ব্যাপার হয়েছে আজ, একটা মেয়ে সোজা চলে গেছে ভুবুর ঘরে। তখন ও খালি গায়ে শুধু শর্টস পরা।... ঠাট্টা করেই এমনি বলেছিল, চুমু দিলে তবে সই দেবে। ব্যস, মেয়েটা ওমনি গলা জড়িয়ে...ভুবুর রুমমেট ফরজন্দ, তার তো ভির্মি লাগার মতো অবস্থা। ছেলেটা অত্যন্ত ভদ্র আর ঠান্ডা, দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে, মেয়ে দেখলে চোখ নামিয়ে নেয়, তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে এক মজার কাণ্ড।"

"তারপর?"

সরোজের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা পাথর জমে ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। সেটা তার হৃৎপিণ্ডের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করেছে। অনেকটা এই রকমই টাটার গেস্ট হাউসের ঘরে ঘটেছিল তার ব্যাপারটা। তবে বীণার সঙ্গে সম্পর্কটা তখন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছল।

"আপনি আবার এ-সব লিখে দেবেন না তো? দেখুন আপনাকে বিশ্বাস করে বলে ফেলছি তারপর...।"

"আরে না না, আমি এ-সব ব্যাপার নিয়ে কখনও লিখি না।"

"তারপর ভুবু মেয়েটাকে নিয়ে সবে বিছানায় ঝাঁপিয়ে...আর সেই সময়ই ঘরের বেল বেজে উঠল।" শঙ্কর হতাশার ভঙ্গিতে কাঁধ আর হাত দুটো ঝুলিয়ে মাথা হেলিয়ে দিল। সরোজ বুকের মধ্যে হালকা বোধ করল।

"লন্ড্রির লোক এসেছিল ফরজন্দের প্যান্ট ডেলিভারি দিতে। ও তো ওদিকে দরজা বন্ধ করে কমোডের ওপর বসেই আছে। ভুবু দরজা ধাক্কিয়ে বার করল। মেয়েটা চলে যাবার পর ও ভুবুকে বলতে লাগল, এ-সব কোরো না, এ-সব করলে খেলা নষ্ট হয়, তুমি ট্যালেন্টেড, সবে টিমে এসেছ এখন শুধু বড় রান পাবার জন্য কনসেনট্রেট করো, হেলথের দিকে নজর রাখো। ভুবু ওকে এক ধমক দিয়ে বলেছে, জ্যাঠামো করতে হবে না, আগে টেস্ট খেল তারপর উপদেশ ঝাড়বি।"

সরোজ শুনতে শুনতে তাকিয়েছিল নেটের দিকে। নাগাড়ে বল করে যাচ্ছে ফরজন্দ আলি। রিস্ট স্পিনার, ক্ল্যাসিকাল ডেলিভারি। বাঁ কাঁধটা ব্যাটসম্যানের দিকে, মাথাটা ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তোলা বাঁ হাতের পাশ দিয়ে তাকাচ্ছে, ডান হাতটা একটা চাকার বেড় নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে, পিচ থেকে বাউন্স পাচ্ছে ওর বল। ডেলিভারির পরই মুখে উদ্বিগ্নতা। বলটা তার উদ্দেশ্য মতো কাজ করেছে কি না তাই নিয়ে ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটার বয়স কম, মাত্র কুড়ি।

লেগস্পিনারকে এই বয়সে টেস্টে নামিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? যদি মার খায়? হয়তো ভেঙে পড়বে, চুরমাব হয়ে যেতে পারে। সারা জীবনের মতো। এইভাবে অকালে অনেকেই তো ঝরে গেছে!

সিলেক্টররা কি ঝুঁকি নেবে? ওকে খেলিয়ে যদি ম্যাচ হারে? সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র ত্রিবেদি অফস্পিনার ছিল, একটি মাত্র টেস্ট খেলেছে, ঝুঁকি নেয়নি কখনও, গতানুগতিক চিন্তা। কিন্তু একটা টেস্টে এগিয়ে, এখন হয়তো ওকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যায়! এদের দিয়ে সাবধানে কাজ করিয়ে নেওয়া, ঠিক সময়ে বল কবতে আসা, মার খেলে আড়াল করা ক্যাপ্টেনের এটা বিবাট দায়িত্ব। ববি আনন্দ কি তা পাববে? আনন্দ নিজেও বোলাব তবে স্পিনার নয়। এখনও পর্যন্ত এগারোটা টেস্ট ম্যাচে ভারত ওর অধিনায়কত্বে এই সবে একটা ম্যাচে জিতল। বড় দরের ট্যাকটিসিয়ান নয়, মৃদু চবিত্র, অত্যন্ত থিযোবি ঘেঁষা, বাঁধা গতে চলে, ব্যক্তিত্ব কম।

"যাক মেয়েটা তা হলে বেঁচে গেল নাকি আবার আসবে?"

"সরোজদা এরা জেনেশুনেই আসে. .বাজি ফেলে বলতে পারি আবাব আসবে।"

"কত বাজি? আমি বলছি আসবে না।"

"একশো টাকা। নাকি বেশি হয়ে যাচ্ছে. .বেশ তা হলে বড একটা বাম, হবে?"

"আমি হাবলে দেব। আর জিতলে...আচ্ছা দিল্লি যাচ্ছ তো?"

"নিশ্চয়।"

"ওখানেই নোব।"

"শেষকালে এমন একটা কিছু বলবেন যে আমার সাধ্যেব বাইরে হয়ে যাবে. "

"আরে না না টাকার ব্যাপাব নয়, একটা অন্য জিনিস, ভুবুকে নিয়ে একজনেব বাড়িতে একটু যেতে হবে।"

"ওহহ্ এই ব্যাপার, আমি ভাবলুম...সে হয়ে যাবে, নো প্রবলেম।"

সরোজ হাঁফ ছাড়ল। নিজেব চোখেই দেখেছে ভবানীব সঙ্গে ওব হৃদ্যতা, সুতবাং শঙ্কবকে খুশি বাখলে বীণাব বাড়িতে নিয়ে যাওয়ায় অসুবিধে হবে না। আজ দিনটা ভালই যাচ্ছে। হোটেলে এসে বিপদে পড়ে বেহাই পেয়েছে, প্রেসপাস পেতে ঝামেলা হয়নি। একটা কার্টেন বেইজাব গোছেব একঘেয়ে জিনিস পাঠাতে হবে, সেটাবও একটা ছক মোটামুটি মনে মনে তৈবি হয়ে গেছে— ফবজন্দকে খেলাবাব জন্য জোর সওয়াল কববে। অবশ্য সিলেক্টবদেব মধ্যে সুনীল কাঞ্জিলাল ছাড়া তো সিলেক্টরদেব কেউই বাংলা পডতে জানে না। সুতবাং সে কী লিখল বা না লিখল তাতে কিছুই যায় আসে না। কাঞ্জিলালের সঙ্গে একবার কথা বলতে পাবলে ভাল হত। ভবানীকে নাকি ও-ই ঝগড়াঝাটি করে টিমে ঢুকিয়েছে। ছেলেটাব আশাতীত পাবফরম্যান্স নিশ্চয় কাঞ্জিলালকে এখন তুঙ্গে তুলে বেখেছে।

সরোজ নেটেব পিছনে ডেকচেয়ারে বসা মুখগুলোর মধ্যে কাঞ্জিলালকে দেখতে পেল না। ফবজন্দ নেট থেকে বেবিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। ফেন্সিংয়ের ওধারে শ' খানেক ছেলে। আজ রাতেই প্রথম বারোজন ঠিক হয়ে যাবে। উইনিং কম্বিনেশনকে নাড়ানাড়ি হয়তো করবে না। তাই হলে ও এবাবও আসছে না টিমে।

"দু' একটা পয়েন্ট-ফয়েন্ট দিন সরোজদা, শুধু কি গসিপ পাঠাব?"

"কী আর পয়েন্ট দোব।" সরোজ সতর্ক হল। "পয়েন্ট তো তুমি দেবে। আসল জিনিস হল ভেতরের খবর, তোমার তো সোর্স রয়েইছে। উন্নি ভাল অ্যানালিসিস করে, তোমাব ডেস্ককে বলে দাও ইউ এন আই থেকে নিয়ে একটা কিছু বানিয়ে তোমার লেখাটার শুরুতে বসিয়ে দিক। বাতে টিমের নামগুলো বলবে, মনে হয় না বড় রকমের কোনও অদলবদল হবে।"

"রামিন্দারকে নাকি বসিয়ে দেবে যদি এবারও ফেল করে, ভুবু এইরকম একটা কানাঘুষো শুনেছে।"

সরোজ উৎকর্ণ হল। রামিন্দারের কথাটা তার মাথায় হালকাভাবে একবার এসেছিল। ইংল্যান্ডের সঙ্গে গত সিরিজে ফেল করেছে, ন'টা ইনিংসে একশো সত্তর রান। শেষ তিনটে সিরিজে একটা সেঞ্চুরি, দুটো ফিফটি। এবার মাদ্রাজে শূন্য আর তিন। সিনিয়র প্লেয়ার, পঞ্চান্নটা টেস্ট খেলেছে, এগারোটা সেঞ্চুরি। তিন হাজারের উপর রান। চট করে বসাবে না তবে ভবানী এসে যাওয়ায় নিশ্চয় বিপদ বোধ করছে।

"ভবানী আর কী বলল রামিন্দার সম্পর্কে?"

"ওর সঙ্গে তেমন কথা বলে না, নিজের ঘরে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে শুয়েই থাকে।"

"এগুলো তুমি লিখো। রামিন্দার খুবই ভাল ব্যাটসম্যান, ব্যাড প্যাচ সকলেরই আসে, ওরও এসেছে, আবার ঠিক বেরিয়ে আসবে।"

সরোজ দেখল তরুণ লাহিড়ী তার দিকেই আসছে। নাদুসনুদুস, ফরসা, বেঁটে, নস্যি রঙের স্যুট আর মেরুন টাই।

"সরোজদা কোথায় উঠেছেন, মধুছন্দায়? আমি ওর পিছনেই সঙ্গমে, আপনার ওখানে ঘর খালি থাকলে বলবেন।"

"শঙ্করও সঙ্গমে, ওকে চেনো তো?"

শঙ্কর হাত বাড়িয়ে দিল।

"শঙ্কর গ্রুবাল, নিউজ ডে।"

"তরুণ লাহিড়ী, প্রত্যহ। আপনাকে কোথায় দেখেছি যেন, বোধহয় স্টেট অ্যাথলেটিকস মিটে!"

তরুণের তালু থেকে হাতটা ছাড়িয়ে শঙ্কর হাসল মাত্র। নিজেকে ভারিক্কি দেখাবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

"কিছু পেলেন-টেলেন?"

"নাহ্, তুমি?"

"সবাই সুস্থ আছে। পারিখের ডান হাতের কড়ে আঙুলটা ফিল্ড করতে গিয়ে লেগেছিল, এখন ঠিক আছে। ওদের প্র্যাকটিসে আসার কোচটা দেরি করে হোটেলে গেছল, আর কী। ও হ্যাঁ, ভবানীশঙ্করকে মেয়েরা ছেঁকে ধরছে সই নেবার জন্য। ওহ্ বহুদিন পর একটা বাঙালি টেস্ট খেলছে, শুধু খেলাই নয়, রীতিমতো দাপটে. পিচটা দেখে আপনার কী মনে হল? গ্রাউন্ডসম্যান তো বলল থার্ড ডে থেকে বল ঘুরবে।"

"তোমার কী মনে হচ্ছে?"

"তাই মনে হল।"

"তা হলে তাই লিখে দাও।"

"ভুবু সম্পর্কে কী লিখবেন?"

শঙ্কর গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল তবে চোখ উদ্বিগ্ন। ও-যেন ভবানীশঙ্করকে ইজারা নিয়েছে, ভালমন্দ প্রচারের দায়টাও।

"এখানে রান পাবে।"

"বলছেন?"

তরুণ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বলল, "পাবে না মানে, আলবাত পাবে। দেখুন আবার ও সেঞ্চুরি করবে।"

"বাজি?"

"নিশ্চয়, দশ টাকা।"

"বেশ।"

শঙ্কর খুশি। বন্ধুর উপর আস্থা যে দেখাবে তাকেই ওর পছন্দ।

"রাতে কী করছেন, আসুন না আমার ঘরে, একটা ছোট্ট রাম আছে।"

"শঙ্কু আমি এবার টেলিগ্রাফ অফিসে যাব, ওখান থেকে হোটেলে, তিনতলার এগারো নম্বর, ঘরেই থাকব। তরুণ চলি।"

মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় দেখল, ভবানীশঙ্কর মাঠটা চক্কর দিয়ে জগ করছে। খেলার ব্যাপারে ছেলেটা সিরিয়াস। সরোজের ভাল লাগল।

ইংরেজি অক্ষরে বাংলা, তা-ও পরিচ্ছন্ন বড় হাতের, লিখতে একটু বেশিই সময় লাগে। টাইপটা জানলে সুবিধা হত। সরোজ প্রথমে বিব্রত বোধ করত, বিরক্তও। কয়েকবার ইংরেজিতেই রিপোর্ট পাঠিয়েছিল কিন্তু বার্তা সম্পাদক আপত্তি করেন। "রোমানে পাঠান। প্রত্যেকের নিজস্ব একটা লেখার

স্টাইল থাকে। ইংরেজি থেকে তর্জমা করলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।" এই ছিল তাঁর প্রধান যুক্তি। সরোজ বলেছিল, রোমানে রিপোর্ট পাঠালে অন্য ধরনের অসুবিধাও যে আছে। "ধরুন, কথাটা কাঠ হয়ে গেল। আমি কাঠ লিখলাম ইংরেজিতে কে এ টি। সেটা বাংলায় হল, কাত। ব্যাপারটা বোঝাই গেল না বা অন্য মানে হয়ে গেল।"

জবাব পায়, "ও-রকম একটু-আধটু তো হতেই পারে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।"

সরোজ প্রায় এক কলাম লিখল টেস্ট ম্যাচের নির্বাচকদের ও দল গড়ার, পিচের চরিত্র এবং ফলের সম্ভাবনা নিয়ে। নিউজিল্যান্ডের কারুর সম্পর্কে তার চাক্ষুষ ধারণা নেই। তাদের এড়িয়ে গেল। ফরজন্দ সম্পর্কে দুটি প্যারা আলাদাভাবে লিখল। লেগ স্পিনার চাই সাহেবদের বধ করতে আর এই ছেলেটির মধ্যে সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নির্বাচকরা কি সাহসী হবেন ওকে খেলাতে?

সম্ভাবনা শব্দটা বসিয়ে সে ভেবেছিল, এতটা বলা কি ঠিক হল! ফরজন্দকে সে কখনও ম্যাচে দেখেনি। তারপর ভাবল, সবাই বলছে, উইকেটও প্রচুর পেয়েছে। গত মরশুমে বোম্বাইয়ের তেরোটার মধ্যে, আটটা উইকেট ওরই ছিল। এলেম না থাকলে কি হয়? রামিন্দারের সম্পর্কে লিখল, নিশ্চয় রানে ফিরে আসবে। কানপুর পিচ ওর ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। এই মাঠে ওর দুটো সেঞ্চুরি আছে, ইত্যাদি।

ভবানীশঙ্করকে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়ল। কিছুই জানে না। বাঙালি সেন্টিমেন্টে যা সুড়সুড়ি দেবে এমন জিনিস লিখতে তার আগ্রহ নেই। ও-সব তরুণ লাহিড়িদের ব্যাপার। লোভ হল শঙ্করের কাছে শোনা ঘটনাটা লিখে ফেলার। কিন্তু নিরস্ত হল। এ-সব খেলো জিনিসের সঙ্গে খেলার কী সম্পর্ক?

সরোজের মাথা গরম হয়ে উঠল। এই সব আজেবাজে ব্যাপার লিখে লিখেই ওদের সিনেমা স্টারদেব পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খেলোয়াড়রা শ্রদ্ধা পাবে মাঠের মধ্যে তাদের কাজকর্মের গুণে। মচমচে তেলেভাজার মতো তাদের মাঠের বাইরের কীর্তি-কলাপগুলোকে খবরের কাগজ আব ম্যাগাজিনে সাজিয়ে খদ্দের ধরার যেন একটা হুজুগ এসে গেছে। এ-সব তার দ্বাবা হবে না।

লেখাটা জমা দিয়ে সরোজ যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন বিকেল প্রায় শেষ। সে হোটেলেব উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। টেস্ট ক্রিকেট খেলা হবে কিন্তু ঘরমুখো সাধারণ মানুষজনের মধ্যে তাব কোনও প্রতিক্রিয়াই নেই। ঠিকই, কেন থাকবে? সরোজ নিজেকেই জবাব দিল। ক্রিকেট সে ভালবাসে, নয়তো একসময় গভীরভাবে খেলেছিল কেন? কিন্তু এখন তার মনে হয়, এটা এদেশে বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। এখন যেন পাঁচ দিনের দুর্গাপুজোর মতোই পাঁচ দিনের এই টেস্টম্যাচ। হইচই ছাড়া আব কিছু নয়। পিকনিকের মতো ব্যাপারটা। খাবার নিয়ে সকালে বেরিয়ে পড়া, সারা দুপুর রোদে বসে কিছু একটা অঘটনের জন্য অপেক্ষা। তারপর ফিরে যাওয়া। এত বছর ভারত খেলছে অথচ একটা ফাস্ট বোলার বেরিয়ে এল না। বিদেশে গিয়ে পরের পর শুধু হেরে আসা। অথচ তাই নিয়ে এইসব হুজুগেদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কাজকর্ম ফেলে পাঁচ দিন ধরে মাঠে বসে কী পায়? সেই তো একঘেয়ে ঠুক-ঠুক। নিস্তেজ পিচে একই ধরনের বল। অবধারিত একটা ড্র। আর নানান বিশেষণে ভূষিত কবে তাকে প্রশস্তি গাইতে হবে যদি কেউ সেঞ্চুরি করে ফেলে বা পাঁচটা উইকেট পায়।

হোটেলে রিসেপশনে চাবি চেয়ে জানল মান্না চাবি নিয়ে উপরে গেছে আধঘণ্টা আগে। তিনতলায় এসে বন্ধ দরজায় টোকা দিল। ভিতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে, দরজার তালার হাতলটা মুচড়ে ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরে আলো জ্বলছে। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে মান্না, হয়তো ঘুমোচ্ছে। বাড়তি একটা লোহার ফোল্ডিং খাট, তাতে বিছানা।

সরোজ জুতো না খুলেই খাটের বাইরে পা দুটো বার করে রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট পাঁচেক পর খসখস শব্দ হতে মুখ ফিরিয়ে দেখল মান্না বগল চুলকোচ্ছে।

"আপনি বাইরে খেতে যাবেন নাকি ঘরে বসে হোটেলের খাবারই খাবেন?"

মান্না জবাব দিল না। চুলকুনি বন্ধ করে আবার নিথর হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর মান্নার গলা কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে এল, "শরীর ভাল নয়।"

"যে-কাজে বেরিয়েছিলেন হয়েছে?"

"অনেকটা।"

সরোজের মনে হল লোকটি কথা বলতে অনিচ্ছুক। আর কিছু সে জানতে চাইল না। টেবলে ইংরেজি খবরের কাগজ দেখে সে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে প্রথমেই খেলার পাতায় চোখ বোলাল।

বিমান থেকে নামা নিউজিল্যান্ডারদের গ্রুপফোটো, প্রত্যেকের গলায় মালা। ভারতীয়রা একদিন আগে এসেছে তাই আর গ্রুপফোটো নেই। নেটে ব্যাট করা ভবানীর ডাবলকলাম ছবি। ছেলেটাকে এখন খবরের কাগজ ধরেছে। বহু কাল পর একটা নতুন মুখ পেয়েছে, তা ছাড়া ওর আসাটাও নাটকীয়। ডেবুতেই ডাবল সেঞ্চুরি, ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম। বদ্ধ ডোবায় বড় একটা পাথর ফেলে যতটা তরঙ্গ তোলা যায়, ভবানী তা করেছে। রামিন্দরেরও একটা।

ছবি, ব্যাট হাতে চেয়ারে বসে। তলায় লেখা: এটাই কি ওর শেষ টেস্ট? নাকি গ্রিন পার্ক দেবে ওকে সবুজ জীবন? সরোজের মনে হল, রামিন্দরের চোখে উদ্বেগ আর শঙ্কা যেন লুকোনো নেই। সরোজ কাগজটা রেখে আবার পাশে তাকাল। মান্নার কপালটুকু কম্বল থেকে বেরিয়ে।

"হয়েছে কী?"

"কিছু না।...ঠান্ডা লেগেছে।"

"আচ্ছা আপনি কোনও গন্ধ পাচ্ছেন?"

সরোজ নাক কুঁচকে জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস নিল।

"না তো!"

কম্বল নামিয়ে রবীন মান্না হাসিমুখ বার করলেন।

"একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম...বিয়ার খেয়েছি তাব গন্ধ পান কি না।"

"য়্যাঁ!...কতটা? কখন খেয়েছেন?"

"দুপুরে, এক গ্লাস। ওবা ধরে পড়ল খেতেই হবে। বড্ড স্ট্রেস আর স্ট্রেইন যা কাজ আমার। তা হলে গন্ধ পাননি। ঠিক বলছেন?"

"একদম নয়।"

"আসলে কী জানেন, কলকাতায় একবার খেয়ে বাড়ি ফিরতেই বউ যা শুরু করে...কান্নাকাটি, আমার মাকে ডেকে এনে...সে এক এলাহি ব্যাপার। গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করালে আব ছুঁতে পারবে না। আরে মশাই আমি কি কচি খোকা? মাঝেমাঝে ঠিকই চালিয়েছি, ধরতে পারেনি।"

"নিজের পয়সায় খান না পার্টি খাওয়ায়।"

সরোজ অত্যন্ত স্বাভাবিক নিরুৎসুক স্বরে বলল যেন মান্না আহত না হয়। লোকটার কৃপাতেই তো ঘবে আশ্রয় মিলেছে!

"এমনভাবে ধরে-না কী বলব!" মান্না কম্বল ছুড়ে উঠে বসল উত্তেজিত হয়ে। "আমি জানি এটা অন্যায়। লোকগুলো সুবিধা নেবে বলেই খাওয়ায়। কিন্তু কী জানেন, খেতে বেশ ভালই লাগে। মনটাও বেশ ভাল হয়ে যায়। তবে ওই মাপা এক বোতল বিয়ার। গড়ের মাঠে কিছুক্ষণ কাটিয়ে, ছোট এলাচ দেওযা মিঠে পান মুখে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরি।"

"এখানে তো বউ নেই একটু বেশি খেতে পারতেন?"

"না না মাতালটাতাল হয়ে শেষে কেলেঙ্কারি করে ফেলব। তবে আমি একটা ব্যাপার ঠিক করে বেখেছি, যতদিন চাকরি করছি ততদিনই, তারপর আর ছোঁব না।"

"তার মানে খাওয়াবাব লোক যখন আর পাবেন না।"

"দ্যাটস ইট। নিজের পয়সায় এ-সব বিষ আর খাব না। উফফ ঠিক ধরেছেন তো, এই না হলে রিপোর্টার।"

সরোজ ঘড়ি দেখল। শঙ্কর কী বলেছিল সেটা মনে করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে গেল। ও আসবে না আমি যাব ওর হোটেলে? কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে স্মৃতির টুকরোগুলোকে জোড়া দিতে ব্যর্থ হয়ে সে উঠে পড়ল।

"খেতে চললেন?"

"হ্যাঁ। আপনি তো ঘরেই থাকবেন?"

"অম্বলের মতো হচ্ছে, বড্ড বেলা করে রুটি আর মাংস খেয়েছি।"

"যদি কেউ আসে তো বলবেন সঙ্গম হোটেল হয়ে ফুটু-তে গেছি। মনে থাকবে?"

"নিশ্চয়।"

মিনিট চারেক হেঁটে সরোজ সঙ্গমে পৌঁছল। দোতলায় উঠে শঙ্করের ঘরের দিকে যেতে যেতেই শুনতে পেল বন্ধ দরজার ওপারে খুব চড়া গলায় কথা হচ্ছে। কেউ যেন কিছু একটা বোঝাতে চাইছে, আর কেউ যেন তা মানতে চাইছে না।

দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে শঙ্করের গলায় "কাম ইন" শুনে সরোজ নব ঘুরিয়ে পাল্লা খুলল।

তিনটি লোক। শঙ্কর, তরুণ আর অভয়ঙ্কর। টেবলে রামের বড় বোতল তার তিন-চতুর্থাংশ খালি। টেবলে দুটি খালি গ্লাস এবং শঙ্করের হাতে একটি। দুটি প্লেটে কাবাব আর কাঁচা পেঁয়াজ, লঙ্কা, শশা।

"ইয়া সরোজদা, আসুন আসুন। সরি আপনার ওখানে যেতে পারিনি। দেখতেই পাচ্ছেন...গ্লাস নিন একটা।" শঙ্কর দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

"এত চেঁচাচ্ছিল কে, অভয়ঙ্কর?"

"সরোজদা আপনি তো প্রবীণলোক, অনেক প্লেয়ার দেখেছেন, রঞ্জি ট্রফিতেও খেলেছেন।" তরুণ চেয়ারে সিধে হয়ে বসল। "আচ্ছা বলুন তো রামিন্দর রান পাচ্ছে না কেন?"

"আমি জানি তাই বলেছি ওর মেন্টাল ডিজেস্টার ঘটেছে।"

"তুমি বোম্বাইয়ের লোক আর রামিন্দরের বাড়ি দিল্লি, ওর ঘরের এ-সব খবর পেলে কী করে?" তরুণের এই গলাই সরোজ বাইরে থেকে শুনেছে।

"আরে বাবা সব খবর সব জায়গায় পাওয়া যায় যদি ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে কান রাখতে পারো। লাস্ট ইয়ারে রঞ্জি ফাইনাল খেলতে বোম্বাই যখন দিল্লি গেছল তখন ওখানেই প্লেয়াররা সবাই জেনেছিল। রামিন্দার আর পারবে না।"

"ব্যাপারটা কী?"

সরোজের মনে হল কথাগুলো শোনা দরকার সে-জন্য এদের দলে ভিড়লে ওরা স্বচ্ছন্দ হবে। টেবলে দুটো বাড়তি গ্লাসের একটা তুলে নেবার সময় একটা কাবাব মুখে ফেলল। শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে গ্লাসে রাম ঢেলে দিল, একটু বেশিই। খালি গ্লাস দুটোতেও ঢালতে গেল। তরুণ আব অভয়ঙ্কর একসঙ্গে জানাল আর তারা খাবে না।

"তরুণদা আগাম সেলিব্রেট করছেন ভুবুর সেঞ্চুরির, সরোজদা জল না সোডা?"

"নিশ্চয়। হোক সেঞ্চুরিটা আবার খাওয়াব। একটা বাঙালি ছেলে কতদিন পর যে...সত্যি বলতে কী এইবার প্রেসবক্সে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারব। এতকাল তো দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজই শুধু জ্যাঠামশাই হয়ে থেকেছে।"

সরোজ জল ঢেলে গ্লাসটা ভরতি করে বড় চুমুক দিল। "রামিন্দারের কী হল, পারবে না কেন?"

"ও যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুরে তখন ওর বউ একজনের সঙ্গে অ্যাফেয়ার শুরু করে। এ বিগ সিন্ধি বিজনেসম্যান। ফিরে এসে রামিন্দার জানতে পেরে ভীষণ শক্‌ড হয়।"

অভয়ঙ্কর কাবাবের জন্য ঝুঁকল। সরোজ প্লেটটা তুলে এগিয়ে ধরল। দুটো তুলে নিয়ে অভয়ঙ্কর বলল, "আচ্ছা বানিয়েছে কিন্তু।"

"আনাচ্ছি আর একটা।"

শঙ্কর দরজা খুলে বেরোল। সরোজ জিজ্ঞাসু চোখে অভয়ঙ্করের দিকে তাকাল।

"বউকে ঘরে বন্ধ করে রাখল, হুইপ করল কিন্তু বউ আর বদলাল না, সে-মেয়ে গোঁ ধরেই রইল—রামিন্দারের সঙ্গে থাকবে না। জানোই তো কী রকম ক্রুড, রাফ, আনএডুকেটেড আর বদরাগি। কন্টিনিউয়াস সাত দিন বউকে না খেতে দিয়ে রেখেছিল, এক গ্লাস জল পর্যন্ত নয়।

"এ-সব খবর কোথা থেকে কী করে পেলে?" তরুণের চ্যালেঞ্জ জানাবার ভঙ্গিটা আসলে উসকানিই।

"আরে বাবা বলেছি না, দিল্লির ক্রিকেটার সার্কলে সবাই জানে। ..বউ একদিন পালিয়ে সোজা তার প্যারামারের কাছে চলে যায়, সে তাকে দিল্লির বাইরে একজায়গায় লুকিয়ে রাখে। এদিকে রামিন্দার

সেই বিজনেসম্যানের অফিসে গিয়ে রিভলভার দেখিয়ে বলে, বউকে বার করে দাও। অফিসে হইচই কাণ্ড, পুলিশ এসে রামিন্দারকে অ্যারেস্ট করে। সে মামলা এখনও মেটেনি। যাই হোক, লোকটা চেয়েছিল রামিন্দার ডিভোর্স করুক, ও একদমই রাজি নয়। এরপর দু'বার অ্যাটেম্পট হয়েছে ওর লাইফের উপর। প্রথমবার ওর দুটো পাঁজরা ভাঙে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে, আকবর রোডে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা মেরেছিল। দ্বিতীয়টা বিড়লা মন্দিরের কাছে রাত্রে গুণ্ডারা পিটিয়েছিল, কাগজে এ-সব বেরোয়নি, দু' মাস হাঁটুতে প্লাস্টার নিয়ে বিছানায় ছিল। এখন ও ভয়ের মধ্যে দিন কাটায়, কখন-যে আবার অ্যাটেম্পট হবে।"

"অভয়ঙ্কর বলছে এ-জন্যই ও খেলতে পারছে না, আর পারবেও না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ওর ব্যাটিং টেকনিকটাই ভুল।" তরুণ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে সরোজের দিকে তাকাল।

"তিন হাজারের ওপর রান পেয়েছে ভুল টেকনিকে?"

"তখন সাইড অন ব্যাট করত কিন্তু যখন থেকেই ও স্টান্স বদলাল, টু আইড, চেস্ট অন খেলতে শুরু করল তখন থেকেই ট্রাবলে পড়ল।"

সরোজ বিরক্ত বোধ করল। এইসব পণ্ডিতি কথাবার্তা তার কাছে হাস্যকর লাগে। মাদ্রাজ থেকে তরুণের একটা রিপোর্টে পড়েছিল, ম্যাকগ্রেগরের ব্যাটিং গ্রিপে ভুল আছে বলে স্লিপে দু'বারই ধরা পড়েছে। লোকটার ন'টা সেঞ্চুরি আছে টেস্টে।

গ্লাসটা শেষ করে টেবলে রাখা মাত্রই তরুণ সেটায় আবার ঢালার জন্য বোতলটা তুলে নিল। সরোজ স্মিত চোখে তাকিয়ে। শঙ্কর ঘরে ঢুকে বলল, "এখুনি আনছে।"

"সব থেকে ট্র্যাজিক ব্যাপার হল", অভয়ঙ্কর গলা নামিয়ে বলল, "রামিন্দার দিল্লি থেকে পালাতে চায়। বোর্ডের কাছে পারমিশন চেয়েছিল হায়দরাবাদে খেলার জন্য, পারমিশন পায়নি।"

সরোজ লক্ষ করল তরুণের মুখ। ওর কাছে এটা একটা খবর। নিশ্চয় কাল স্টোরি করবে।

"যে-জন্য এত ঝামেলা সেই ডিভোর্সটা দিয়ে দিলেই তো হয়, গণ্ডগোল আর থাকবে না। আমি হলে তাই করতাম।"

শঙ্কর এককথায় রামিন্দার সমস্যা মিটিয়ে দেবার পথ বাতলাল।

"তুমি এই পাঞ্জাবিকে জানো না শঙ্কু।" অভয়ঙ্কর নিচু গলাতেই বলল, "ভীষণ রিভেঞ্জফুল। ও একদিন বদলা নেবেই। বউকে যদি খুন করে তা হলে আশ্চর্য হব না।"

একসময় আলোচনা ভবানীশঙ্কর, ফরজন্দ আলি, ভাণ্ডারকর, রেডিয়ো কমেন্টেটর ইত্যাদি ছুঁয়ে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চলে আসতে তরুণ ঘুম পাচ্ছে বলে উঠে গেল। আর এক প্লেট কাবাব এল। অধিকাংশ শেষ করল সরোজ।

"সরোজদা আপনি একটু হুঁশ রাখবেন।" অভয়ঙ্কর হাসি টিপে রেখে বলল।

"কেন?" ভ্রূ কুঁচকে সরোজ বোঝার চেষ্টা করল।

"আপনার গ্রেট ফ্রেন্ড এসেছে... কমলা টাওয়ারে ঢুকতে দেখলাম... কামদার।"

"সেরেছে।" ভয় পাওয়া ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে সরোজ উঠে দাঁড়াল। এম এস কামদার একদা তিনটি সরকারি ও আটটি বেসরকারি টেস্ট খেলেছেন। বয়স এখন সত্তর। ছোট ছোট কাগজের জন্য টেস্টম্যাচ রিপোর্ট করার ইচ্ছায় প্রথমে তিনি কাগজের সম্পাদকদের জ্বালিয়ে মারেন এবং তিন-চারটি কাগজের বরাদ্দ নিয়ে প্রেসবক্সে এসে সাংবাদিকদের ব্যতিব্যস্ত রাখেন। যা টাকা পান তাতে টেস্ট কেন্দ্রে যাওয়া থাকা খাওয়ার খরচটা উঠে যায়। তবে অনেক জায়গাতেই চেনাশোনা লোকের বাড়িতে ওঠেন আর খাওয়াটা এর-ওর ঘাড় দিয়ে সেরে নেবার চেষ্টায় থাকেন। ওর প্রধান দুর্বলতা মদাপানে। সামান্য পান করেই মাতাল হয়ে চেঁচামেচি আর গালিগালিজ শুরু করে দেন। কেউ খাওয়াবে বললে এই বয়সেও মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে রাজি।

"কোথায় আছে কামদার?"

"জানি না।"

"আর নয়, এবার কেটে পড়ি।" সরোজের সঙ্গে সঙ্গে অভয়ঙ্করও বেরিয়ে এল।

সিঁড়ির কাছে এসে সরোজ "ওহ ভুলে গেছি, এক মিনিট।" বলেই শঙ্করের ঘরের ফিবে এল।

"তরুণ রাম এনেছে, কাবাব কিছুটা শেয়ার করব।"

সরোজ দুটো দশ টাকার নোট টেবলে রাখল।

"একী একী! না না সরোজদা..."

"কোনও আপত্তি নয়, দাদা দিলে নিতে হয়।"

সরোজ দ্রুত বেরিয়ে সিঁড়িতে অপেক্ষমাণ অভয়ঙ্করের কাছে এসে বলল, "ওর কলমটা আমার কাছে রয়ে গেছল।"

"ছেলেটা কেমন?"

"ভাল।"

"ঘোষালের খুব বন্ধু।"

"হ্যাঁ।"

হোটেলের ঘর অন্ধকার ছিল। আলো জ্বেলে দেখল মান্না গভীর ঘুমে। নিঃশব্দে সে পোশাক বদলে বিছানায় উঠল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে বীণার মুখটা চোখে ভেসে এল। একটু পরে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

চার

ভারত টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রবি আনন্দ ঝুঁকি নিয়ে বীরত্ব দেখাবার মানুষ নয়। তা ছাড়া, গ্রিন পার্ক উইকেটে নতুন বলে পনেরোটা ওভার কাটিয়ে দিতে পারলে একটু ধৈর্যবান প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলে যেতে পারবে এই নিউজিল্যান্ড বোলিংকে।

দুই আম্পায়ার, পুনার নন্দন অধিকারী আর আহমেদাবাদের ছটু পটেল মাঠে নেমেছে তাদের পিছনে জেরি মার্কস আর তার দল। অধিকারীর এটা প্রথম টেস্টম্যাচ।

ফুটবল টিমের মতো নিউজিল্যান্ডাররা মাঠে নামল। একসঙ্গে ছুটে উইকেটে পৌঁছে হাত তুলে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে, কেউ ছোটাছুটি, কেউ ব্যায়াম শুরু করল। ফিটনেসে যেন টইটম্বুর। সরোজের কাছে মজা পাবার মতো ব্যাপার এটা। এর আগে এমন করে কোনও টেস্ট দলকে সে নামতে দেখেনি। গুরুগম্ভীর চালে ক্যাপ্টেন আস্তে আস্তে হাঁটবে, হাতের বলটা বড়জোর সামান্য লোফালুফি করতে পারে! তার কয়েক হাত পিছনে টিমের অন্যান্যরা। এটাই রেওয়াজ ছিল। আর এখন? বদলে যাচ্ছে ক্রিকেটের হালচাল। অস্থির, অশান্ত, ছটফটে ভঙ্গির দ্বারা এখনকার ছেলেরা ব্যাপারটাকে উত্তেজক, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চেহারা দিচ্ছে। টিভি আর বিজ্ঞাপনের টাকা এটা করিয়েছে।

সরোজ এক্সারসাইজ বুক খুলে প্রথম পাতায়, তারিখ, বার, সময় লিখে অপেক্ষা করতে লাগল ভারতের দুই ওপেনারের মাঠে নামার জন্য।

প্যাভিলিয়নের দিকে সাইট স্ক্রিনের পাশে জমি থেকে চওড়া রকের মতো চার-পাঁচটা ধাপ, তাতে টেবল চেয়ার পাতা, মাথায় শামিয়ানা। টেবলে পিন দিয়ে আঁটা কার্ডে কাগজের নাম লেখা। এই হল প্রেসবক্স। দ্বিতীয় ধাপে সরোজের দু'পাশে স্থানীয় হিন্দি কাগজের দু'জন আর মাদ্রাজের ইংরেজি দৈনিক ও ত্রিবান্দ্রামের মালয়ালি সাপ্তাহিক। পিছনে সর্বোচ্চ ধাপে দুটি সাহেব আর বোম্বাই দিল্লির ইংরেজি দৈনিক। অভিজাত শ্রেণী হিসাবে ওই ধাপটা গণ্য হবে। লাঞ্চ এবং টি-এর পাঁচটি কুপন একজন নাম মিলিয়ে মিলিয়ে বিতরণ করে গেছে।

কে নামবে আলভার সঙ্গে? আজ প্রেসবক্সে পৌঁছে, অন্যান্যদের সঙ্গে "হ্যালো, হাউ আর ইউ"গুলো সারতে সারতে সরোজ শুনেছিল রামিন্দার নাকি ওপেন করতে চাইছে না। থ্রি ডাউন নামতে চায়।

"সরোজদা, শুনেছেন নাকি কিছু কেন রামিন্দার ওপেন করতে চাইছে না?" তরুণ উঠে এসে ফিসফিস করে জানতে চাইল।

"না, আমি তো এই প্রথম শুনছি। তুমি কিছু জানো কি?"

"না। শঙ্কুকে দেখছি না বোধহয় ভবানীর কাছে গেছে। ও এলে হয়তো ঠিক খবর পাওয়া যাবে।"

তরুণ পিছনের ধাপে ডান দিকে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল।

মাঠ ঘিরে তুমুল হাততালি, চিৎকার শুরু হতেই সরোজ গলা উঁচিয়ে দেখল আলভা আর রামিন্দার নামছে। শঙ্করও সেই সময় নিজের চেয়ারে এসে বসল।

প্রথম ওভার খেলবে রামিন্দার। মিল এন্ড থেকে বল করবে বয়েড। গরম রোদ, ফুরফুরে বাতাস। আমেজটা শীতের। মাঠের আলো যথেষ্টই। প্রেসবক্সের শামিয়ানাটা না থাকলে ভালই লাগত। এই সময় বীণার শালটা গায়ে জড়াতে পারলে মন্দ লাগত না। কিন্তু সে ঠিক করে ফেলেছে, ব্যবহার করে শালটাকে ময়লা করবে না। হাতাওলা সোয়েটারেই চালিয়ে নেবে।

বয়েডের প্রথম বল শর্ট লেংথ, অফের বাইরে এবং যথেষ্ট জোরে। রামিন্দার ছেড়ে দিল। লাইন এবং লেংথ খোঁজার সন্ধানটা বয়েড চালিয়ে গেল। মনে হচ্ছে তার সম্মতি ছাড়াই বলটা বেশি সুইং করে যাচ্ছে। রামিন্দারকে ঈষৎ অস্বচ্ছন্দ মনে হল। কোনও রান হল না প্রথম ওভারে।

মার্কস বলটা ছুড়ে দিল থার্ডম্যান থেকে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসা স্যান্ডার্সনের উদ্দেশে। সরোজ নড়েচড়ে বসল। ছেলেটি বাঁ হাতে জোরে বল করে। এখন নাকি বিশ্বের সবাথেকে দ্রুত। প্রথম বল ফুলটস। আলভা বলটা ঘুরিয়ে দিয়ে থার্ডম্যান থেকে একটা রান নিল। রামিন্দারও একইভাবে একটা রান পেল। ওভারটা শেষ। বয়েড এবার রামিন্দারকে। কিছুটা অনিশ্চিতভাবে রামিন্দার ওভারপিচ হওয়া বলগুলোকে খেলল। এবার স্যান্ডার্সনের সামনে আলভা। প্রথম বলেই একটা রান প্রথম ও দ্বিতীয় স্লিপের মধ্য দিয়ে। রামিন্দার এগিয়ে এসে গুডলেংথ জায়গাটায় ঝুঁকে দেখছে। দু'-তিনবার ব্যাট দিয়ে ঠুকল। স্যান্ডার্সন মাথা নেড়ে যেন কিছুর অনুমোদন জানাল। ওভারটা সে শেষ করল দশটা বলে।

পর পর তিনটে নো-বল ডাকল অধিকারী। তৃতীয় ডাকের পর স্যান্ডার্সন অধিকারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে নিয়ে বল করতে ফিরে গেল। রামিন্দার বল তিনটি খেলার চেষ্টা করেনি। চতুর্থটা এত বড় ওয়াইড হল যে সোজা থার্ড স্লিপ বলটা পেল।

গ্যালারিতে গুঞ্জন উঠল। পটেল যখন এগিয়ে ফলো-থ্রুর জমির উপর চোখ বুলিয়ে স্যান্ডার্সনের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। স্যান্ডার্সন দৃষ্টিটা অগ্রাহ্য করল।

পাশের হিন্দি কাগজের লোকটির সামনে টেবলে বাইনোকুলার পড়ে। সরোজ 'মে আই' বলে অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই তুলে চোখে রাখল। স্যান্ডার্সনের মুখটা রাগে থমথম লাগছে। মার্কস এগিয়ে এসে কী বলল। ওভারে চারটি অতিরিক্ত রান ছাড়া ব্যাট থেকে রান আসেনি।

এবার টেনশন দেখা দিয়েছে। আলভাকে একটা ঝোড়ো ওভার দিল বয়েড। আলভা স্টাইলিশ স্ট্রোক প্লের জন্য খ্যাত। বিবেচকের মতো সে ডিফেন্সিভ, সতর্ক চোখে ওভারটা শেষ করল। ব্যাকফুটে বলগুলোকে সামলেছে। ওভারে রান হল না।

এখান ওখান থেকে বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনি মাঠে ভেসে গেল স্যান্ডার্সন যখন আবার শুরু করার জন্য ক্যাপটা অধিকারীকে দিতে এগোল। বোলিং মার্কের থেকে একটু বেশিই সে হেঁটে গেল। রামিন্দার স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

সরোজের মনে হল ভুল করছে। অবশ্য ব্যাটসম্যানভেদে এটা নির্ভর করে, কিন্তু সে নিজে কখনও ফার্স্ট বোলার যখন বল করার আগে ফিরে যেতে থাকে তখন তার চলার দিকে তাকাত না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত বোলার যখন বল ছাড়ার আগে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছে তখনই সে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাত। ফাস্ট বোলারের দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী-রকম যেন সম্মোহক বোধ আবিষ্ট করে ফেলে।

স্যান্ডার্সন বলটা একবার নিজের কপালে ঠুকে নিয়েই ঘুরল। এবং ছুটতে শুরু করল। রামিন্দার আদৌ বলটা দেখতে পেয়েছিল কি না সরোজের তাতে সন্দেহ আছে। যদি সে কিছুমাত্রও নড়ে থাকে তা হলে নিশ্চিতই স্কোয়ার লেগের দিকেই। বলটা তার বুকে লাগতেই সে কুঁজো হয়ে বসে দু'হাতে চেপে আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। স্যান্ডার্সন তখন কোমরে হাত দিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে। চিৎকার তুমুলভাবে এবং গালিগালাজও।

"শালা রাতভোর ড্রিঙ্ক করেছে, খেলবে কী করে?"

সরোজ বিরক্তি চেপে বাইনোকুলারের মালিককে বলল, "কী করে জানলে? তুমি দেখেছ?"

"জানার কী আছে, রামিন্দার হেভি ড্রিঙ্কার সবাই জানে।"

মালয়ালাম সাপ্তাহিক বিড়বিড় করল: "ইন্টিমিডেটিং বোলিং...খুন করতে চায়।"

সরোজ মৃদু স্বরে বলল, "পুরো দোষটাই ব্যাটসম্যানের। এ-বল কোনও টেস্ট ব্যাটসম্যান যদি খেলতে না পারে তা হলে..."

রামিন্দারকে ঘিরে ভিড় এবং শুশ্রূষার তৎপরতা শেষ হল মিনিট দুয়েকেই যখন সে বুকে হাত বোলাতে বোলাতে পায়চারি করে আবার ক্রিজে দাঁড়াল। করতালি ধ্বনি তাকে দেওয়া হল উৎসাহ বর্ধনের জন্য।

কেমন যেন নড়বড়ে মনে হচ্ছে রামিন্দারকে। সরোজ ঝুঁকে ডান দিকে তাকাল। চারটে চেয়ার পরে অভয়ঙ্কর। চোখাচোখি হতেই সে মুখভাবে জানাল—কী বলেছিলাম? তারপর হাত নেড়ে বোঝাল—শেষ হয়ে গেছে।

স্যান্ডার্সনের পরের বলটা খাড়াই লাফিয়ে উঠল। রামিন্দারের গ্লাভসে অথবা ব্যাটের হ্যান্ডেলে লেগে স্লিপের মাথার উপর দিয়ে বাউন্ডারিতে পৌঁছে গেল। উচ্ছ্বাস জানাবার ব্যাপার নয়, কিন্তু জনতা জানাল। বাকি বলগুলো শর্ট, আঘাত করার জন্যই। প্রত্যেকটাই খেলতে গিয়ে সে ফসকাল এবং কোনওক্রমে টিকে গেল।

আলভাকে বিব্রত করার জন্য ফরোয়ার্ড শর্ট লেগকে একটু এগিয়ে আনা হল, স্লিপে এল আর একজন। গ্যালারিতে একটা জটলা পাকিয়ে উঠে হইচই শুরু হয়েছে, পুলিশের লাঠি দেখা যাচ্ছে। আলভা সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে স্টান্স নিল।

বয়েডের কাছ থেকে একটা শর্ট বল এবার প্রত্যাশিত। বস্তুত একটার জায়গায় তিনটে এল। চমৎকারভাবে পিছনে হেলে আলভা বলের গতিপথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। চতুর্থ বলে সে পিছিয়ে খেলল কিন্তু বলটা ব্যাট-প্যাডের ফাঁক দিয়ে গলে অফ স্টাম্পটাকে জমি থেকে উপড়ে উইকেটকিপারের কাছাকাছি পৌঁছে দিল। আলভা পিছন ফিরে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ব্যাটটা একবার ফাঁকা চালিয়ে ফিরে আসতে শুরু করল।

তিন নম্বর, বলাবাহুল্য, ভবানীশঙ্কর। দীর্ঘ ছিপছিপে, সপ্রতিভ। সরোজ একমত শঙ্করের সঙ্গে, গ্যারি সোবার্সের মতোই ওর চলন। দীর্ঘস্থায়ী হাততালি নিয়ে ভবানী ক্রিজে পৌঁছল। রামিন্দারকে এখন অনেকটা ধাতস্থ দেখাচ্ছে। এগিয়ে এসে কথা বলল, ভবানী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গার্ড নেবার পর কাছের ফিল্ডারদের উপর দিয়ে চোখ আলতো বুলিয়ে স্যান্ডার্সনের বাকি দুটি বল সহজভাবে খেলল।

মাত্র দুটি বল। সরোজের মনে হল, ছেলেটি সেই ধরনের যারা সংকটের মুহূর্তে নার্ভের ক্ষমতাকে গুছিয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে... ম্যাচের দিন সকালেও হয়তো উৎকণ্ঠায় ছটফট করে, কিন্তু মাঠে একবার পা দিলেই নিজের উপর পুরো কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়, রিফ্লেক্সে বিদ্যুতের গতি আনে। এরাই বড় ব্যাপারের ব্যাপারি। ওর দুটি বল খেলা থেকেই সরোজ বুঝে গেল, অন্যেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে মনটাকে তৈরি করে নিতে যত সময় নেয় ভবানীর যেন তার থেকেও বেশি সময় হাতে থাকে এমন একটা ধারণা দর্শকদের চেতনায় ঢুকে যায়। বড় খেলোয়াড়রাই শুধু এটা করতে পারে।

পরের ওভারে যথাসময়ে রামিন্দার ব্যাটটা নামাতে পেরেছিল বলেই বয়েডের পাজি ইয়র্কার সামলাতে পারল। দ্বিতীয় বল বুকের সামনে থেকে ঘোরাল লং লেগে। উইকেটের মধ্যে ওর দৌড়নোটা সরোজের কেমন যেন অপরিচ্ছন্ন লাগল। একদা শর্ট রান নেওয়ায় রামিন্দারকে অনেকে বিশ্বের অদ্বিতীয় বলেছে। দুটো রান সে পড়িমরি করে পেল। বয়েড বিড়বিড় করে মাথা ঝাঁকাল। তার পঞ্চম বল লেগ স্টাম্পে পড়ে অফ স্টাম্পের বেল তুলে নেবার পূর্বমুহূর্তে অধিকারীর চিৎকার "নো-বল" প্রতিধ্বনিত হল। বয়েড দ্রুত ঘুরে অধিকারীকে কিছু একটা, নিশ্চয় খারাপ কথা, বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল।

বয়েড বোলিং মার্কে ফিরল যেন খুশিয়াল মেজাজে। হবে নাই বা কেন। সরোজ ভাবল, ওর প্রত্যয়ের যথেষ্টই কারণ আছে। বয়েড এবং রামিন্দার, দু'জনেই বুঝতে পারছে ফিল্ডিং আর বোলিংয়ের মারমুখীন সামগ্রিক চাপটা একটানা বজায় রাখার প্রতিক্রিয়া এবার শুরু হয়েছে। অন্য খেলোয়াড়দের চোখে প্রত্যেক ব্যাটসম্যানের সাহসের একটা মাপ থাকে। তবে গাড্ডায় পড়লেও ভয়টা অনেকখানি

কাটিয়ে দিতে পারে পরিচিত পরিবেশ, এমনকী স্লিপ ফিল্ডারদের বকবকানিও ব্যাটসম্যানকে সহজ করে দিতে পারে। সরোজের ইচ্ছা হচ্ছে চেঁচিয়ে রামিন্দারকে বলে—তাড়াহুড়ো নয়, সময় নাও। চারপাশটা দ্যাখো, তাকাও। শুষে নাও তোমার বহু দেখা মুখ, চলাফেরা, রং, শব্দ, এমনকী ওই চিমনির ধোঁয়াও।

বয়েডের শেষ বলটা কোথায় পড়ল সরোজ দেখতে পেল না, রামিন্দার পা বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ায়। তবে ব্যাটের কানায় লাগার আওয়াজ এবং উইকেটকিপারের নিশ্চিত উল্লাস শুনতে ভুল হয়নি। রামিন্দার আউট।

ঝুঁকে ডান দিকে তাকাল সরোজ। অভয়ঙ্করের মুখ হাসিতে ভরা। পাশের লোককে বাঁ হাতের তালু উলটে ব্যাটের মতো করে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ আর ডান হাত দিয়ে বলটা কোথায় লেগেছিল দেখাচ্ছে।

"হি ইজ ফিনিশড।"

কথাটা কানে এল সরোজের। বুকের গভীরে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। সে দুঃখ পাচ্ছে রামিন্দারের জন্য। ব্যক্তিগত জীবন যদি সত্যিই ওর খেলার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে থাকে তা হলে শেষ হয়ে গেছে। হয়তো ওর শেষ টেস্টম্যাচটি সে দেখছে।

রামিন্দার সত্যিই কি ভীত? ওকে খুনের চেষ্টা হয়েছে অথচ জ্যামাইকায় দুটো বল বুকে একটা কপালে লাগা সত্ত্বেও সে সাড়ে ছ'ঘণ্টা ভারতীয় ইনিংসে প্রবেশের একটা দরজা বন্ধ করে রেখেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাস্ট বোলারদের কাছ থেকে। হারা ম্যাচ ড্র হয়। মাত্র দু'বছর আগের ঘটনা।

ধীরে ধীরে রামিন্দারের প্রত্যাবর্তনটি সরোজ মনে গেঁথে রাখল। ঠিক করে ফেলল আজ সে এইটাই বর্ণনা করবে। মাঠ ছাড়ার আগে ব্যাটটা চোখের সামনে ধরে সে কী যেন দেখার চেষ্টা করল তারপর অদ্ভুত একটা বোকার মতো কিংবা বলা যায় শিশুর মতো অর্থহীন হাসি হেসে সে দর্শকদের আড়ালে চলে গেল।

দীপক ঠুকরাল বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এখন দেশের সেরা। মাদ্রাজে একটা পঞ্চাশ করেছে। হাততালি বুঝিয়ে দিল, বড় রান তার কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা হয়েছে। ভবানী, নিশ্চয় ব্যাটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। গুরু যেন আর একটি শিষ্যের জন্য প্রতীক্ষারত। ঠুকরাল ক্রিজের কাছে পৌঁছতেই সে এগিয়ে গেল। কয়েক বার মাথা নাড়া, হাত দিয়ে ব্যস্ত না হবার ভঙ্গি এবং ভবানী আবার স্যান্ডার্সনের সম্মুখীন।

প্রথম বলটা সে কাট করল এবং থার্ডম্যানের তিন হাত দূর দিয়ে সেটা বেরিয়ে গেল তার নড়ার আগেই। পরের বলে কভারে মার্কস প্রস্তরীভূত হয়ে থাকল। তৃতীয় বলটা ওভারপিচ এবং ফলো-থ্রুতে ব্যস্ত স্যান্ডার্সন হাত দিয়ে থামাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। চতুর্থটি অফ স্টাম্পে ঠুকে দেওয়া এবং শর্ট মিড উইকেট বৃথাই হাত তুলে লাফাল। পঞ্চমটি গুড লেংথ এবং মিড্‌ল স্টাম্পে, ভবানী যেন জানতই এমন এক অলস ভঙ্গিতে এক পা বেরিয়ে এল এবং বলটি সাইট স্ক্রিনের দু'হাত সামনে জমিতে নামল।

ষষ্ঠটি সন্ত্রস্ত, ভীত, লেগস্টাম্পের বাইরে দিয়ে পালিয়ে গেল এবং ভবানী ফিরেও তাকাল না।

চার মিনিটের মধ্যে গ্রিন পার্ক দাউদাউ করে উঠল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো মাঠের বৃত্তটি খ্যাপা চিৎকারে ভেঙে পড়ার অবস্থায়। সরোজ কৌতূহলী চোখে দু'পাশে তাকাল। দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত মুঠো করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তরুণ চিৎকার করে যাচ্ছে কিন্তু আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ ছাড়া মুখ দিয়ে কিছু বেরোচ্ছে না। শঙ্কর দ্রুত উঠে এসে কানে কানে বলে গেল, "আজ অন্তত দু'ডজন ফোন আসবে।" সরোজ মাথাটা হেলিয়ে মেনে নিল। "সিক্সটাকে কী বলব, স্ট্রেট ড্রাইভ?" সরোজ একইভাবে মাথা আবার হেলাল।

নতুন বলের ঝোড়ো দাপট এখনও প্রাণবান তবে ধীরে ধীরে সেটা একসময় স্তিমিত হয়ে আসতই। কিন্তু তার আগেই ভবানী এক ফুঁয়ে ঝড়টাকে সরিয়ে নিশ্বাস ফেলার জায়গা বার করে আনল। পাঁচটা বলে কুড়ি রান। উঁচু পর্যায়ে ব্যাট করার সময় বল ধরে ধরে নির্বাচন করে মারার ব্যাপারটা অনেকটা পুষিয়ে দেয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটা সচেতনতা। সরোজ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, বড়দরের বোলার এরপর

কী করবে, সেটা ফর্মে থাকা ভাল ব্যাটসম্যান আন্দাজ করে নিতে পারে। এবং ভবানী ফর্মে রয়েছে।

মাথা নিচু করে সরোজ খাতায় লিখে যাচ্ছিল আগের ওভারে তার মনে যে-সব ছবি ফুটে উঠেছিল তার বিবরণ। দাবি জানানো একটা চিৎকার এবং সেটাকে ডুবিয়ে তার পিছনে বিরাট হতাশার ধ্বনিতে সে চমকে মুখ তুলে দেখে ঠকরাল ব্যাট ঘাড়ের কাছে তুলে পটেলের তর্জনীর বা মুখের দিকে অবিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে।

"কী হল?"

"এল বি ডব্লু।" পাশেব লোকটি বলল। পাঁচ নম্বরে অধিনায়ক রবি আনন্দ। হুঁশিয়ার ব্যাট। তিনটি উইকেট ৪১ রানে হারাবার পর এবার নাছোড়বান্দা কাউকে চাই ইনিংসটাকে পোক্ত ভাবে গাঁথার জন্য। আনন্দ যে সেই কাজের জন্যই নেমেছে সে বুঝিয়ে দিল বয়েডকে মেডেন দিয়ে।

স্যান্ডার্সনকে যে সরিয়ে নেওয়া হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। এবার আসবে রুটিনমাফিকই সিম বোলার ডন লোকাস্ট। চমৎকার লেংথ আর লক্ষ্য, বিপজ্জনক ওর জমি থেকে সরে গিয়ে ঢুকে আসা বলগুলো। ভবানীব কাছ থেকে জনতা আর একবার লঙ্কাকাণ্ড দেখার আশায় আগাম হাততালি দিতে শুরু করেছে।

ভবানীর প্রতিভা সম্পর্কে বাকি সন্দেহটুকু সরোজ কাটিয়ে উঠল পরের ছটি বলকে খেলার ধরন থেকে। প্রত্যেকটিকে সে জমি দিয়ে গড়িয়ে লোকাস্টের কাছে ফিরিয়ে দিল। জনতা এটা অনুমোদন না কবলেও হাততালি দিল বোলারকে। সরোজও তালি দিল। ভবানীর জন্য।

আর উইকেট না হারিয়ে লাঞ্চে ভারত ৭৮ রানে পৌঁছল।

সবোজ প্রেসবক্স থেকে নেমে বাইরে রঙিন কাপড়ে ঘেরা একটা জায়গায় এল। কুপনের বিনিময়ে সেখানে কাগজের বাক্সে নিবামিষ খাদ্য বিতবণ হচ্ছে সাংবাদিকদের জন্য—আলুর দম, পুরি আব কালোজাম।

"চমৎকার খেলল।"

স্থানীয় এক সাংবাদিক, সরোজ নামটা মনে করতে পাবল না। সে একটু হাসল মাত্র। কী লিখবে সেটা বোধহয় বুঝে নেবার জন্য এটা আলোচনার সূত্রপাত। সরোজ এড়িয়ে গেল। শঙ্করকে দেখতে পাচ্ছে না। নিশ্চয় প্লেয়ার্স ড্রেসিংরুমের কাছাকাছি রয়েছে। তরুণকে দেখেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে টেলেক্স ক্যাম্পেব দিকে যেতে। লাঞ্চ পর্যন্ত রিপোর্ট ওকে পাঠাতে হবে ডাক সংস্করণের জন্য।

সবোজ বাক্স হাতে ঘেরা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে একান্তে রোদ্দুরে দাঁড়াল। দু'ঘণ্টা খেলা হল। রিপোর্টের শুরুটা মাথায় এসে গেছে। এখন সে কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ভি আই পি, খবরের কাগজ, রেডিয়ো, পি অ্যান্ড টি আব পুলিশ ছাড়া এদিকে আর আছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কিছু লোক। খাবারেব কোনও স্টল নেই, ফলে ভিড় কম।

১৯৩৮ সিরিজে নটিংহামে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককেবের ২৩২ রানের ইনিসংটা সম্পর্কে নেভিল কার্ডাসের লেখার কিছু অংশ সরোজ বছর কুড়ি আগে একটা পত্রিকায় পড়েছিল। আবছা, ভাসাভাসা মনে আছে। আজ যদি ভবানীশঙ্কব তেমন কিছু একটা খেলতে পারে তা হলে কার্ডাসের থেকে যা মনে আছে লেখায় লাগিয়ে দেবে। সে খেতে খেতে চেষ্টা করল কয়েকটা লাইন ধরবার। 'আজ ম্যাককেব প্রথম টেস্টকে সম্মানিত করল বিশাল ও মহান একটা ইনিংসের দ্বারা।' সরোজ দুটো শব্দ বদলাল—'আজ ভবানীশঙ্কর দ্বিতীয় টেস্টকে...'

বাক্যটিকে সে সম্পূর্ণ করল না। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না কি? ৩০০ রানের মধ্যে ম্যাককেবেরই ২৩২। মারতে শুরু করে ছ'টা উইকেট পড়ে যাবার পর, তার আগে ইংল্যান্ড সাড়ে ছ'শো রানের একটা ইনিংস বসিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সামনে। কোনও মিলই নেই পরিস্থিতির সঙ্গে। সিরিজে ১-০ এগিয়ে, এটা দ্বিতীয় টেস্ট প্রথম ইনিংস, আর ছ'টা উইকেটও পড়েনি। বলা উচিত হবে কি, ভবানীশঙ্কর নিউজিল্যান্ড আক্রমণকে চূর্ণ করল অভিজাত বিনয়, সুরুচি এবং সংযম সহকারে?... তার স্পর্শের নিখুঁত সূক্ষ্মতা নান্দনিক বোধকে দোলা দেয়... প্রকাশ সৌষ্ঠবে, শক্তিতে উদ্‌ভাসিত এই হচ্ছে ক্রিকেট যাতে নেই কোনও লালসা, বীর্যবত্তা কিন্তু নেই কোনও বীভৎসতা, সুযোগ গ্রহণ—কিন্তু নেই কোনও নীচতা, সম্মুখ-সংগ্রাম কিন্তু নেই কোনও চোরাগোপ্তা, চোখ ধাঁধানো আলংকারিক ক্রিকেট। আর একটি কথাও প্যারাগ্রাফের শেষে ছিল—সব কিছুই হল নিবে আসার প্রহরে।

প্রথম দিনে ভবানীকে নেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, উঠবে বা হয়তো উঠেছে, রামিন্দারের জন্য তার ব্যর্থতাকে ঘিরে। যদি কার্ডাসকে নকল করতে হয় তা হলে রামিন্দারই ভাল বিষয়।

"হ্যালো বিসওয়াস সাব, একা একা?"

সরোজ ঘুরে গিয়ে দেখল কামদার। মোটা কাচের ওধারে বড় দুটো মণি, কলপ ফিকে হয়ে পিঙ্গল একরাশ চুল, গরমকোটের কলারের ভাঁজ ফাটা এবং জুতোর চামড়ায় অজস্র বলিরেখা—সব কিছুই কামদারের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে।

"কী লিখবে ভাবছ?"

"হ্যাঁ।"

"স্যান্ডার্সনের লাইন অফ অ্যাটাক একদমই ভুল ছিল। আমি হলে লেগ স্টাম্পে পিচ করাতাম, ফাস্ট ওভারেই তুলে নিতাম ছোকরাকে ব্যাকোয়ার্ড শর্ট লেগে। তুমি তো ইডেনে আমার বল দেখেছ, পারতাম না? কী হে বলো না?"

হেলাফেলা ভঙ্গিতে কামদার বলল কিন্তু তাকিয়ে রইল উৎকণ্ঠিত চোখে। সরোজ দুঃখ পাচ্ছে বৃদ্ধের জন্য। দু'দিক থেকে ভাল কাট করাত, কিছু নামী ব্যাটসম্যান ওর ঝুলিতে আছে। কিন্তু সেই গল্প প্রতিবার তাকে শুনতে হয়েছে, অন্যদেরও একই অভিজ্ঞতা।

"ঘোষাল তো তোমার ছেলে, বলে দিয়ো পা বাড়িয়ে যেন স্যান্ডার্সনকে খেলে।"

"বলব। আর রামিন্দারকে কী বলব?"

কামদার প্রথমে বুঝতে সময় নিল সেকেন্ড দশেক তারপর দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ভুল করবে, ওকে বাদ দিলে ভুল করবে। বর্ন ফাইটার, দেখবে ও ঠিক ফিরে আসবে। ভারতে এখন ওর থেকে টেকনিক্যালি পারফেক্ট ব্যাটসম্যান কেউ নেই। তোমার ঘোষাল ইনস্টিংটিভ, ভাল উইকেটে ভাল, ব্যাটে বলে হয়ে গেলে ভাল, রিল্যাক্সড সিচুয়েশনে ভাল।"

সরোজের হাতে খাবারের বাক্স। দুটো পুরি খেয়েছে আর খাবার ইচ্ছে নেই। বাক্সটা ফেলার জন্য এধার ওধার তাকাতেই দেখল তরুণ আসছে। কামদারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে চেঁচিয়ে বলল, "স্টোরি পাঠালে?"

"ক্যালকাটা লাইনে কী গড়বড় হয়েছে এখন বন্ধ, একটার আগে ঠিক হবে না। শঙ্কর কোথায়?"

"আবার শঙ্কর কেন?"

"ভবানী কী বলল-টলল ওর কাছ থেকে একটু জেনে নিতাম।"

"তুমি নিজে গিয়েও তো জেনে নিতে পারো।"

বাংলায় দু'জনের কথা হচ্ছে, কামদার শুনতে শুনতে বোঝার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বলল, "যদি কথা বলতে হয় তো রামিন্দারের সঙ্গে বলো। জিজ্ঞেস করো কী করে তুমি ওই বলে আউট হলে।"

ওর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে তরুণ বলল, "আমার ইন্টারেস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ারের খবরে। বাক্সে কী খাবার দিচ্ছে সরোজদা, খাওয়া যায়, অম্বল হবে না তো?"

"দ্যাখোই না মুখে দিয়ে।"

তরুণ কুপন হাতে ঘেরা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল।

"কামদারজি, কোন কাগজের হয়ে কভার করছেন?"

"একটা উর্দু ডেইলি একটা হিন্দি ম্যাগাজিন।" বৃদ্ধ নিজেকে উৎফুল্ল দেখাবার চেষ্টা করল। "আজ সকালে আমার কাছে এসেছিল লখনউয়ের এক ইংরেজি কাগজের, কী নাম যেন কাগজটার, লোকটা খুব ধরল রোজ হাফ কলাম কমেন্ট যদি দিই। বলল একশো টাকা দেবে। দিনে একশো, বলো আমার মতো লোকের পক্ষে এতে কি রাজি হওয়া যায়?"

"লিখছেন?"

"না।" প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার উদ্ধত ভঙ্গিতে চিবুক তুলে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিপত্নীক, ছেলেপুলে নেই, স্বভাবে উড়নচণ্ডী, কোনওদিন পাকা চাকরি করেনি, খুবই অনটনের মধ্যে জীবনের শেষ অধ্যায় কাটাচ্ছে।

"আমাদের খেলার সময়ে প্রেসবক্সে এত লোক হত না, আমাদের সম্পর্কে এত রকম কথাও কাগজে

বেরোত না। এখন তো সব কাগজ, ম্যাগাজিনই নিজের লোক পাঠাচ্ছে। বেশির ভাগই ক্রিকেট বোঝে না, বোঝার দরকারও মনে করে না। তারা চায় স্টোরি। ক্রিকেটের উপরে বসিয়েছে প্লেয়ারদের, খারাপ এটা খুব খারাপ, ...আচ্ছা।" আচমকা কথা বন্ধ করে বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

সরোজ তাকিয়ে থেকে কামদারকে দেখছিল। হাতের বাক্সটা পায়ের কাছেই নামিয়ে রাখল। দেখতে পেল ফোটোগ্রাফার রামকুমারকে, সে চা খেতে খেতে কথা বলছে দুটি লোকের সঙ্গে। সে প্রেসবক্সে ফিরে এল। লাঞ্চ শেষ হতে, এখনও পনেরো মিনিট।

যদি সেঞ্চুরি করে তা হলে ভবানীকে নিয়ে সব বাংলা কাগজ কাল উচ্ছ্বাসের বন্যা বইয়ে দেবে। সরোজ ঠিক করে ফেলেছে তার লেখায় প্রাধান্য দেবে রামিন্দারকে। বেচারা! বলটা কেমন ছিল সেটা দেখা হয়নি। ও নাকি ওপেন করতে চায়নি। উচিত হয়নি ওকে প্রথমে পাঠানো।

সরোজ হঠাৎ ভিতর থেকে নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে বসল। কার্ডাস তো বহু নামী বা অনামী ক্রিকেটারের মানসিক গঠনেব বা চরিত্রের নানান দিক, তাদের বাতিক, অভ্যাস, চলন বলনের ভঙ্গি, তাদের স্বগতোক্তি, মাঠে খেলার মধ্যে অন্যদের সঙ্গে তাদের সংলাপ তাঁর রিপোর্টের মধ্যে বসিয়েছেন এবং পরে স্বীকার করেছেন ওগুলো তার কল্পনাপ্রসূত। তবে কাল্পনিক হলেও ওই ক্রিকেটারদের মুখে বসানো এইসব কথা চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে যায়, তাদের পক্ষে এই কথাগুলো বলা খুবই সম্ভব।

যদি রামিন্দার বলে, সরোজ মনে মনে তৈরি করতে শুরু করল, নিয়তি আমাকে তাড়া করছে নয়তো অমন একটা সহজ বল কেন উইকেটকিপারের হাতে পাঠাব! 'তুমি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করো?' এর উত্তরে ও বলবে, 'করতাম না, এখন করি। বলটা খেলব না ভেবেছিলাম কিন্তু শেষ মুহূর্তে কে যেন বলল—প্লে। আমি অন্ধের মতো ব্যাট নিয়ে ঝুঁকলাম।'

কিন্তু রামিন্দার কি এ-ভাবে কথা বলে? হয়তো বলে না কিন্তু তাতে কী? যাকে বউ ছেড়ে গেছে, যাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে, যে অন্য রাজ্যে চলে যেতে চায় সে অদৃষ্টবাদী হতেই পাবে। কিন্তু ও কি ইনিংস ওপেন করতে সত্যিই চায়নি? টস হয়ে যাবাব পর ড্রেসিংরুমে যদি এমন একটা সংলাপ হয়!

'রাম, ব্যাটিং অর্ডারটা একটু বদলেছি, দেখে নাও।'

আনন্দ কাগজটা তুলে দিল রামিন্দারের হাতে। চোখ বুলিয়েই তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। 'এ কী! আমি থ্রি ডাউন?'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পারছি তোমার অসুবিধে হচ্ছে নতুন বলে, আগের মতো তোমার রিফ্লেক্স কাজ করছে না, তা ছাড়া মিডল অর্ডারে জোর বাড়াতে তোমার মতো অভিজ্ঞ একজনকে এখন দরকার। মাদ্রাজে সঞ্জীব আর রাতু দুটো ইনিংসেই যে-ভাবে ফেল করল...'

'তাই বলে আমাকে তুমি নামিয়ে দেবে পাঁচ নম্বরে!'

'তোমার ভালর জন্যই করেছি।'

'আমাকে সবাই জানে ফাস্ট বোলিংয়ের সামনে শের ব্যাটসম্যান। দুনিয়া জানে আমার সাহস, কী ভাবে আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের খেয়েছি। আর আমি এখন এই নিউজিল্যান্ডারদের বোলিংয়ে নীচে নেমে গেলে লোকে বলবে রামিন্দারটা ভয় পেয়েছে... শের থেকে বিল্লি বনে গেছে, আমাকে দেখে বাচ্চারাও হাসবে...অসম্ভব।'

'একটা ইনিংস অন্তত খেলে দ্যাখো।'

'একটাও না। চিরকাল ওপেন করেছি, আজও করব, ওপেনার থেকেই খেলা শেষ করব। প্লিজ রবি আমার এই অহংকারটুকু তুমি কেড়ে নিয়ো না।'

এই বলে ব্যাটটা তুলে নিয়ে রামিন্দার ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে আলভাকে ইশারায় ডাকল মাঠে নামার জন্য।

এরপর মাঠে রামিন্দার তার অহংকার পুনরুদ্ধারের খেলা শুরু করবে। বুকে বল লাগার পর সে যেন সত্যিই বাঘ—আহত বাঘ—হয়ে উঠল।

কিন্তু সত্যিই তো তা হয়নি! সরোজ মনে করতে পারছে তখন রামিন্দারের ফ্যাকাশে মুখটা। মৃত্যু যেন হাত বুলিয়ে দিয়ে গেছে।... কিন্তু সে একসময় তো সতিই বাঘের মতোই ব্যাট করেছে। লোকে ওইভাবেই তাকে জেনেছে, ওইভাবেই তাকে দেখতে চায়।

সরোজ খাতাটা খুলে বাংলায় লিখে রাখতে শুরু করল তার আজকের রিপোর্টের একটা অংশ। সংলাপটায় যাতে পাঠকরা অভিভূত হয় সেইভাবে রিপোর্টে বসাতে হবে।

"সরোজদা রামিন্দার সম্পর্কে কী লিখবেন।"

অভয়ঙ্কর নিজের চেয়ারে বসতে বসতে চেঁচিয়ে বলল।

"কী লেখা যায়?" সরোজ পালটা প্রশ্ন করল।

'ফিনিশড।"

"তাই লিখব।"

সরোজ খাতায় মন দিল।

লাঞ্চের পর ভবানী আর আনন্দ তিনটি ওভার স্বচ্ছন্দে খেলে গেল। মার্কস একসঙ্গে জোড়াবদল ঘাটাল। এল অফ-স্পিনার পিকার্ড আর ন্যাটা স্পিনাব ওয়ালেস। দু'জনে দুটো মেডেন ওভার পাবার পর বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো আনন্দ, শান্তনম, রাতুল পারিখ আর সঞ্জীব শর্মা ৩১ বলের মধ্যে ক্রিজে এসেই ফিরে গেল। ভারত সাত উইকেটে ৯১, ভবানী ৪৩ রানে।

গ্যালারিতে হতাশাজনিত আক্ষেপ ধীবে ধীরে নেমে এল বিস্মিত গুঞ্জনে। চোখের সামনে এ-সব কী ঘটছে! বল কি খুব ঘুরছে! পিচ কি ভেঙে গেছে নয়তো পিকার্ড তিন জনকে শর্ট লেগে ক্যাচ তোলাল কী করে?

তরুণ চেয়ারে বসছে। সরোজ লক্ষই করেনি ও প্রেসবক্সে ছিল না। শঙ্করের চেয়ারটা এখনও খালি। চোখাচোখি হতেই তরুণ হাতেব ইশারায় বোঝাল এতক্ষণ সে টেলেক্স ক্যাম্পে ছিল।

"লাইন খুলেছে?" সরোজ গলা চড়িয়ে জানতে চাইল।

"এই খুলল।"

উইকেটকিপাব জয়ন্ত রেগে এসেছে ভবানীর জুড়ি হয়ে। ব্যাটসম্যানের মতো দেখায় এমন একটা ভান সে করতে পারে, কিন্তু তার পরের দু'জন, মধু ভাণ্ডারকর আর অরুণ পিল্লাই তা-ও পারে না। পরিস্থিতিটা মনে হল ভবানীর কাছে স্বচ্ছ এবং সরল হয়ে গেছে। ইনিংসের পতন যে আসন্ন এটা বুঝেই সে ড্রাইভ আব কাটের উপর ভরসা করে এবং প্রতি ওভাবের শেষ বলে এক রান নিয়ে ষাট পেরিয়ে গেল বেগেকে একবারও ব্যাটে বল ছোঁয়াতে না দিয়ে। সকালের সেই প্রচণ্ড একটা ওভারের মতো রোমহর্ষক সাজে নামাব ইচ্ছা ভবানীর ব্যাটিংয়ে ধরা দিচ্ছে না। শান্ত, হিসেবি কিন্তু সন্ধানী মনোভঙ্গিই ফুটে উঠছে। সবোজের মনে হল ছেলেটি দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা রাখে এবং কঠিন সময়ে দিশাহারা হয় না। বড জাতের ক্রিকেটাব।

বেগে প্রথম যে বলটা ওয়ালেসের কাছ থেকে পেল সেটাকে মিড উইকেট বাউন্ডারির উপর দিয়ে ফেলাব বাসনায় লাফ দিয়ে বেরোল, ফসকাল এবং স্টাম্পড হল। ভাণ্ডারকরের আগমনই ভবানীর কাছে ভারতের ইনিংসে শেষের সংকেত। আট উইকেট ১১৩। সে ৬৭। এবার সংযমের খোলস থেকে বেরিয়ে আসার সময়। ওয়ালেসের বাকি বলগুলো ভাণ্ডারকর দৈব সাহায্যেই খেলেছিল আটজন দ্বারা ঘেবাও অবস্থায়!

২৫ বল পর খ্যাপা গ্রিন পার্কের চিৎকারের মধ্য দিয়ে ভবানী সেঞ্চুরিতে পৌঁছল। তিনদিক থেকে মাঠের মধ্যে ছুটে গেল কয়েকটি কিশোব, পিছনে তাড়াকরা পুলিশ। তরুণের ঠোঁটের কষে ফেনা দেখা গেল। সে চেয়ার থেকে উঠে দু'ধাপ নীচে বসা স্কোরারের টেবলে হুমড়ি দিয়ে পড়ল ভবানীর চারের ও ছয়ের সংখ্যা জানার জন্য। টুকে রাখার মতো অবস্থায় সে গত দশ মিনিট ছিল না। যখন চারটি ১, চারটি ৬ ও তিনটি ৪ স্কোর বইয়ে স্থান নেয়।

ব্যাটসম্যানরা ক্রিজে নিজেদের জায়গায়, বোলার তৈরি বল কবার জন্য, ফিল্ডাররা যে যার স্থানে। উচ্ছ্বাস অভিনন্দন থিতিয়ে এল। সরোজ তার চারপাশের মুখগুলোয় জ্বলজ্বলে আভা দেখতে পাচ্ছে। যাকে পেয়েছে তরুণ তারই হাত ধরে ঝাঁকিয়েছে। ভবানীর প্রাপ্য অভিনন্দনগুলো সে যেন কুড়িয়ে তুলে রাখল। একসময় সে সরোজেরও হাত ধবে গলা নামিয়ে বলে, "প্রাদেশিকতা ভাববেন না সরোজদা ...ক্রিকেট প্রেসবক্সে বাংলা একটু অধিকার পেল, লেখার মতো কিছু একটা তো হাতে এল!"

সরোজ ভেবে পাচ্ছে না কী লিখবে ভবানীর এই বিলম্বিত বিস্ফোরণ বিষয়ে। লংঅফে এবং ডিপ

স্কোয়্যারলেগে হাত থেকে তার ক্যাচ পড়েছে, ক্রিজ থেকে এক হাত বেরিয়ে গিয়ে বল ফসকে ফিরে এসেছে নিরাপদে। ভাগ্যবান তো বটেই! তবে তার নিজেকে ভাল লাগছে। উত্তেজনা নিজের মধ্যেও অনুভব করছে, হয়তো তার মুখেও জ্বলজ্বলে কিছু একটা ফুটে উঠেছে।

ভবানীর পক্ষে এ-ভাবে বেপরোয়া মেরে যাওয়া বেশিক্ষণ যে সম্ভব হবে না সরোজ তা জানে। তার নিজেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। এখন নিজেকে মারের ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া মানে বিপর্যয় ঘটানো।

চায়েব সাত মিনিট আগে ভারতেব ইনিংস শেষ হল ১৯৮ রানে। ভবানী রান আউট ১৪৫। পিল্লাই ০, ভাণ্ডারকর নট আউট ৪। স্কোর কার্ডটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। শুধু একটি লোকই দানবের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে।

"জীবনের প্রথম দুটো টেস্টে সেঞ্চুরি এর আগে ভারতের কেউ করেনি। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।" সরোজ পিছনের সারিতে কান পেতে রইল। রেকর্ডের খবর সে বিশেষ রাখে না। কিন্তু লেখায় দরকার হয়। তবে কলকাতায় ডেস্কের কেউ না কেউ ইতোমধ্যেই জেনে গেছে। হয়তো রেডিয়ো কমেন্টেটরদের বা অফিসেরই ছোকরা কারুর কাছ থেকে। তা ছাড়া এজেন্সিও পাঠাবে। না উল্লেখ কবলেও তার লেখার মধ্যে কিংবা আলাদা বক্স করে বসিয়ে দেবে। রমেন গুহঠাকুরতা এ-সব ব্যাপারে খুঁতখুঁতে হুঁশিয়ার।

তরুণ আবার উঠে গেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হয়তো টেলেক্স করতেই গেছে। কিন্তু লিখল কখন? সরোজ প্রেসবক্সের বাইরে এল। চায়ের পর থেকেই লেখা শুরু করা দরকার। টেলেক্স ক্যাম্পে গিয়ে মণীশ শুক্লাকে দেখতে পেল। একগোছা সাদা প্রেস ফর্ম চেয়ে নিয়ে জানতে চাইল কলকাতাব লাইন আবার ডাউন হবে না তো?

শুক্লা অবাক হয়ে বলল, "লাইন তো চালুই আছে আবার ডাউনের প্রশ্নই নেই!"

"সে কী! সকালে গড়বড় ছিল না? এই যে একজন..."

"কলকাতায় তো তরুণ লাহিড়ির দুটো রিপোর্ট গেছে। সকালে মাঠে এসেই একটা দিয়েছিলেন আব লাঞ্চে একটা, এই তো কপি রয়েছে দেখুন না।"

শুক্লা টাইপ করা লম্বা দুটো কাগজ এগিয়ে দিল। ছাপা হওয়ার আগে বিনা সম্মতিতে কারুব বিপোর্ট পড়া অনুচিত বলে সরোজ মনে করে। কিন্তু পেশাগত কারণে বিশেষত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কোনও বুদ্ধিমানই এ হেন ঔচিত্য মেনে চলে না। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে সে শুক্লার হাত থেকে টেলেক্স কপি নিল কৌতূহল দমন করতে না পেরে। তরুণও রোমানে লেখে। প্রথম বাক্যটি দেখেই জানল স্টোরি রামিন্দারের সম্পর্কে। তার ব্যক্তিগত জীবনে কী ঘটেছে তার উপরেই গল্পের মতো করে লেখা।

লিখল কখন? কাল রাতেই নিশ্চয়। তাই সে তাড়াতাড়ি উঠে গেল। আর আজ মাঠে এসেই টেলেক্সে ধরিয়ে দিয়েছে। অন্যটিতে তরুণ তার অফিসকে জানাচ্ছে—আউট হবার পর রামিন্দারেব সঙ্গে কথা বলেছি, সেটা পাঠাব, ওর স্টোরির সঙ্গে যেন এটা জুড়ে দেওয়া হয়।

এ-সব যা পাঠাচ্ছে সেটা গোপন রাখার জন্যই তরুণ মিথ্যা বলে যাচ্ছে। সরোজের হাসি পেল। পাঠাক যত খুশি স্টোরি, ইন্টারভিউ, সে তো অন্য কোণ থেকে লিখবে! হ্যাঁ রামিন্দারকে নিয়েই।

কোনও ব্যস্ততা না দেখিয়ে ইনিংস শুরু করল নিউজিল্যান্ডেব ওপেনাররা। দুটো মেডেন ওভারের পর শর্মার বলে স্কোয়্যার লেগ থেকে এক রান দিল ম্যাকগ্রেগর। সরোজ অতঃপর মাথা নামিয়ে লেখায় মন দিল।

দিনের শেষে নিউজিল্যান্ড ৬৬ বিনা উইকেটে। নিরাপদ ব্যাটিং, নেতিমূলক বোলিং এবং দর্শক জনতার বিরক্তি প্রকাশ ছাড়া শেষ দেড় ঘণ্টায় আর কিছু ছিল না।

"সরোজদা, বলুন তো ভুবুর ফোরস অ্যান্ড সিক্সেস ক'টা, মিনিটস, ক'টা বল ফেল করেছে?"

"শঙ্কু, সারাদিন ছিলে কোথায়?"

"প্লেয়ার্স এনক্লোজারে, ভি আই পি ব্লকে।"

"খাওয়া দাওয়া?"

"আরে ভুবুর বন্ধুর কি খাওয়ার অভাব হয়? ফ্লাস্কে আনা হুইস্কি-সোডা পর্যন্ত মিলেছে। চারটে ডিনারের ইনভিটেশন চার রাত্রে। অফ ডে'তে লাঞ্চের। মুশকিল শুধু একটাই, সবাই বলে ভুবুকে সঙ্গে

আনুন। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস না করে আমি কী করে কথা দেব? এরপর কানপুরে এলে আর হোটেলে উঠতে হবে না।"

"তুমিই তো দেখছি হিরো।"

"ভুবুর সৌজন্যে। দিন দিন।" পুলক চাপতে চাপতে শঙ্কর খাতাটা টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়েই বলল, "বাংলা ভাল পড়তে পারি না, মুখে বলুন।"

"বলছি বলছি। তা ভুবুকে আজ কত অটোগ্রাফ দিতে হল?"

"অফিসিয়ালদের ও বলে দিয়েছিল অটোগ্রাফ বুকগুলো আমার কাছে জমা দিতে। গোটা কুড়ি আমাকে ওরা দিয়ে গেছল। টি-এর সময় ভুবু সই করে দেয়। এইসব সেক্রেটারিয়াল কাজ করতে করতেই সময় চলে গেল খেলা আর দেখা হল না।... তবে লাভেব মধ্যে দুটো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, ভুবুকে বলতে হবে।"

সরোজ আলোচনা আর এগোতে দিল না। শঙ্কর যা জানতে চায় জানিয়ে দিল।

"এখন হোটেলে যাব। ঘরে বসে টাইপ করে দিয়ে যাব। আটটা পর্যন্ত তো খোলা থাকবে।"

শঙ্কব চলে গেল। তার হোটেল পাঁচ মিনিটের পথ। সরোজও একবার ভেবেছিল নিজের হোটেলে গিয়ে নিবিবিলিতে লিখবে। পরে মনে হয়, যদি কিছু জানার দরকার হয়, এখানে অনেকেই বসে লিখছে, জেনে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া প্রেসবক্স তো এখন প্রায় ফাঁকাই।

তরুণ উপরের দিকে একটা ফাঁকা টেবলে গভীর মনোযোগে লিখে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মাঠের দিকে শূন্যচোখে তাকিয়ে থাকছে। কয়েকটি অল্পবয়সি ছেলে কৌতূহল ভরে সাংবাদিকরা কী লিখছে জানাব চেষ্টায় চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাইরে দোকানপাটের জায়গায় ঝাড়ু শুরু হয়েছে, ধুলো উড়ছে। অদ্ভুত এক শান্ত পবিবেশ। মনেই হয় না কিছুক্ষণ আগে হাজার চল্লিশ লোক এখানে ছিল।

সবোজ তাব লেখা জমা দিয়ে বেবিয়ে এসে শ্রান্ত বোধ কবল। প্রায় সাড়ে ন' ঘণ্টা শুধু চেয়াবেই। শবীর টনটন কবছে, মাথার মধ্যে সাড়া দেবাব ব্যবস্থাটা ঢিলে হয়ে রয়েছে। একেবারে বাতের খাওয়া সেরেই হোটেলে ফিবৰে ঠিক কবল। শঙ্কবকে আজ আব পাওয়া যাবে না, তা ছাড়া একসঙ্গে কোথাও গিয়ে খাওয়া সম্পর্কে কিছু বললও না। হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ পেয়েছে। তরুণকে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। টেলেক্স অপাবেটরেব ঘাড়ের কাছে ওকে ঝুঁকে থাকতে দেখল। পুরো বিপোর্ট অফিসে না পৌঁছনো পর্যন্ত ও নড়বে না। কখন যে বামিন্দাবের সঙ্গে কথা বলে এল!

সবোজ বিকশায় মল রোডে এক পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্টে এসে রুটি-মাংস খেয়ে আবার বিকশায় হোটেলে ফিরল।

ববীন মান্না বেরোবার জন্য তৈরি। সরোজ ঘবে ঢুকতেই একগাল হেসে বলল, "দারুণ খেলল ছেলেটা.. না হলে ইন্ডিয়া পঞ্চাশের মধ্যেই তো অল আউট হয়ে যেত, কী বলেন?"

"পঞ্চাশেব মধ্যে কেন?"

"ওর রানটা বাদ দিলে তা হলে থাকে আর কত?"

"ত বটে।" সরোজ হাসি চাপল। "আপনাব কাজ চলছে কেমন?"

"কালকেই মনে হচ্ছে শেষ করা যাবে, তা হলে কাল রাতেই রাজধানীতে কলকাতা ফিরে যাব। টিকিটের জন্য বলেছি, বোধহয় পেয়ে যাব।"

"এখন কোথায় বেবোচ্ছেন?"

"ডিপো ম্যানেজাবের বাড়িতে।" মান্না হাতঘড়ি দেখাল। "সাড়ে আটটায় আসার কথা অথচ... বাইবে কি খুব শীত মনে হল?"

"না।"

সরোজ প্যান্ট থেকে লুঙ্গিতে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত হল। মান্না সুটকেস থেকে একটা শিশি বার করে, রুমালে সেটা উপুড় করেই রেখে দিল যথাস্থানে।

"খাওয়ার নেমন্তন্ন?"

"হ্যাঁ। মিস্টার দাশগুপ্ত আপনার নাম শুনেছেন বললেন। ... কিন্তু আপনার সঙ্গে তো দেখা হয়নি তাই আর বলতে পারেননি।"

মান্না যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে বিরাট অপরাধ ঘটে যাওয়ায়।

"আরে না না, আমাকে কেন বলবেন..."

খটখট আওয়াজের পর দরজাটা খুলে বেয়ারা উঁকি দিল। "এক সাহেব নীচে অপেক্ষা করছেন।"

"যাচ্ছি, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

মান্না ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। খবরের কাগজটা নিয়ে সরোজ বিছানায় গা ঢেলে দিল।

নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় দিনটা কাটিয়ে দিল পাঁচ উইকেটে ৩৭২ রানে পৌঁছে। সাদামাটা উইকেটে নিরুপদ্রবে তারা স্পিনারদের এখানে ওখানে ঠেলে ধীরগতিতে রান তুলেছে। মার্কসের পন্থাটা পরিষ্কার। যতক্ষণ পারো উইকেটে থাকো, থাকলেই রান আসবে। বোলারদের ক্লান্ত করে করে ক্ষইয়ে দাও, ফিল্ডাররা অপেক্ষা করে করে আর বলের পিছনে ছুটে ছুটে ব্যাজার হোক, ঢিলেমিতে পড়ুক। চিত্তাকর্যক ক্রিকেট, ভারতে পা দিয়েই যে-সব গালভরা কথা সে বলেছিল, আপাতত শিকেয় তোলা থাক। ম্যাচ জিততে হবে। প্রথমদিনেই ভারতকে দু'শো রানের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে ক্ষীণ আশা যখন দেখা গেছে সেটাকে তখন স্পষ্ট করে তোলার জন্য মার্কস খেলাটাকে বিস্বাদে ভরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। এই প্রথম সে অধিনায়ক হয়েছে। ম্যাকগ্রেগর হিসাব কষে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলছে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪২০ মিনিট ব্যাট করে সে ১২৯ রানে ক্রিজে রয়ে গেছে।

রবি আনন্দের বোলার বদল আর ফিল্ড সাজানো সরোজকে অবাক এবং বিরক্ত করেছে। আনন্দ যেন ধরেই নিয়েছে নিউজিল্যান্ড আড়াই দিন ধরে ব্যাট করবে সুতরাং যত কম রান ওরা তুলতে পারে সেই চেষ্টাই করা ভাল। একটা ম্যাচে এগিয়ে থাকা অধিনায়ক অবশ্য এ-ভাবেই চিন্তা করবে—জেতার সম্ভাবনা না থাকলে হারার সম্ভাবনা থেকে দূরে সরে যাওয়া। কিন্তু জিততে পারব না, এমন মানসিকতাই বা কেন তাকে চালনা করবে?

ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের কী বলবে, আনন্দ নিশ্চয় সেটা তৈরি করে ফেলেছে—বোলিংয়ে ধার নেই, উইকেটে প্রাণ নেই, ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা চিন্তা করা যায় না! অর্থাৎ ধারালো বোলিং, সতেজ উইকেট আর ঝুড়ি ভরা রান পেলে তবেই সে অধিনায়কত্ব দেখাতে পারে! ভাণ্ডারকর ৩৬ ওভার বল করে দুটি মাত্র উইকেট পায়। তারপর ওভারের মাঝে হঠাৎ বাম ঊরুর পিছন দিকটা চেপে ধরে খোঁড়াতে শুরু করে বুঝিয়ে দিল হ্যামস্ট্রিং মাসল টেনে ধরেছে। সে মাঠ ছেড়ে চলে আসে। সারাক্ষণ সে জোরের উপর অল্প শর্ট লেংথে বল ফেলে গেছে অফ স্টাম্প বরাবর। আনন্দ তাকে খুশিমতো বল করতে দিয়ে গেছে। সরোজ অবশ্য ভাণ্ডারকরের মাঠ ছেড়ে যাওয়াটাকে ভাল মনে নিতে পারেনি। তার ধারণা, ও পালিয়ে গেল বদনামের ভয়ে। এখনও ওর তিনটি উইকেট দরকার দু'শো ছুঁতে।

একটা ব্যাপারে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিল না অস্বাভাবিক নয় বলেই। রামিন্দার সারাদিন মাঠে নামেনি অসুস্থ বোধ করায়। বুকের এক্স-রে হয়েছে, কিছু পাওয়া যায়নি তবে সামান্য জ্বর। গতকাল অবশ্য ফিল্ড করেছে। রাতেই নাকি বুকে ব্যথা আর জ্বর দেখা দেয়।

আজ আর কার্ডাসকে অনুকরণ করার মতো কোনও ইচ্ছা বা প্রেরণা সে বোধ করল না। সোজা বর্ণনা এবং কয়েকটি বহু ব্যবহৃত বিশেষণ ছিটিয়ে বোলিং এবং অধিনায়কত্বের সমালোচনা করল।

শঙ্কর লাঞ্চের পর কিছুক্ষণ প্রেসবক্সে ছিল। তখন সরোজ খেলা দেখার বিরক্তি কাটাতে চেঁচিয়ে ওকে বলে, "কী হল বাজির? জিতেছি কি?"

"কীসের বাজি?"

"ভুলে গেলে? সেই যে আবার আসবে কি না ভুবুর কাছে!"

"ওহ্‌হ... না আপনিই জিতেছেন। আসেনি। ভুবুকেই কাল রাতে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গেছল বাড়িতে আর... এত লোকের মধ্যে বলা যায় না, পরে বলব।"

মিনিট পাঁচ পর সরোজ দেখল টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে তরুণ কী জিজ্ঞাসা করল শঙ্করকে। "সে একটা বাজির ব্যাপার," এই বলে শঙ্কর এড়িয়ে গেল।

রোজার অটোগ্রাফ বইটা আজ সে সঙ্গে এনেছে। দু'জন বাদে পুরো নিউজিল্যান্ড টিমটাকেই এখন পাওয়া যাবে। জলপানের জন্য খেলা বন্ধ হতে শঙ্কর উঠল। অনেক বন্ধুবান্ধবী সে সংগ্রহ করে ফেলেছে। এখন তাদের কাছে গিয়ে বসবে। সরোজ ইশারায় তাকে ডাকল।

"একটা রিকোয়েস্ট, রাখতেই হবে। নিউজিল্যান্ডারদের অটোগ্রাফগুলো যদি জোগাড় করে দাও... তুমি ছাড়া তো কেউ আর পারবে না।"

শঙ্কর বিনা বাক্যে বইটা হাত থেকে নিয়ে বলল, "ইন্ডিয়ানসদেরগুলোও তো চাই?"

"তা তো চাই-ই।"

"ঠিক আছে, এখন আমার কাছে থাক।"

শঙ্কর চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সরোজ বলল. "বাজি কিন্তু টেকনিক্যালি আমি জিতেছি।"

শঙ্কর মাথা হেলাল ঠোঁটে হাসি টেনে।

"দিল্লিতে ভুবুকে তা হলে...।"

"নিশ্চয়, বলেছি যখন...।"

চায়ের সময় প্রেসবক্সে লোক কম। তখন অনিল কাঞ্জিলালকে উঁকি দিতে দেখে সরোজ এগিয়ে গেল।

"আরে কাঞ্জি! ব্যাপার কী?"

কাঞ্জিলাল আর সবোজ একসঙ্গে রঞ্জিতে খেলেছে। ব্যাট ভালই করত... টেকনিক্যালি সাউন্ড। দুটো দলীপ ম্যাচও খেলেছে, সরোজ খেলেনি। দলীপ ট্রফি শুরু হবার আগেই সে বাংলা দল থেকে বাদ পড়েছিল। টেস্ট খেলেনি অথচ পূর্বাঞ্চল থেকে ওকে জাতীয় নির্বাচক করায় অনেকেই কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে লেখে। সবোজ ওর পক্ষ নিয়ে লিখেছিল—বহু বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড়ের থেকে কাঞ্জিলালের ক্রিকেট-জ্ঞান গভীব।

"বামিন্দাবকে নিয়ে তুই কী-সব উলটোপালটা লিখেছিস। ও নাকি ওপেন করতে চেয়েছিল, আনন্দ নাকি ওকে থ্রিডাউনে পাঠাতে চেয়েছিল... য়্যাঁ একদমই তো উলটো ঘটনা!"

কাঞ্জিলালের মুখে যত বিস্ময় তার থেকেও বেশি ফুটে উঠল সরোজের মুখে।

"তোকে কে বলল? কাগজে তো আজ কলকাতায় বেরিয়েছে। কানপুরে কি আজকের কলকাতার কাগজ এসে গেছে? আমাদের কাগজ তো এখানে বিক্রিব জন্য আসে না!"

"আরে আজ সকালে ছোটভাইপো ট্রাঙ্ককল কবেছিল। কে কী লিখেছে জানতে চাইলুম তখন বলল। তাডাহুডোয় টেলিফোনে তো লাইন বাই লাইন বলা সম্ভব নয়। বলল সরোজ বিশ্বাসের লেখার ভঙ্গিটা দারুণ। তবে তরুণ নাকি তোর উলটো কথাই লিখেছে। যাক গে ওরা কেউই বাংলা জানে না, হাতে পেলেও কী লেখা হয়েছে তা পড়তে পারবে না। আরে—" কাঞ্জিলাল মাথাটা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এই নিয়েই কালরাতে হাতাহাতি হয়ে গেছে রামিন্দার আর আনন্দে। ওকে তো আনন্দ জোর কবে ওপেন করিয়েছে। ওয়েস্ট জোন-সাউথ জোন প্যাক্ট হয়েছে, রামিন্দার ফেল করলেই বসিয়ে দিয়ে বোম্বের নিরু খাম্বাটাকে ঢোকাবে। এদিকে নর্থ আর সেন্ট্রাল আমাকে দলে টানার জন্য .. পরে বলব সব .. শঙ্কব ছেলেটা কোথায় বল তো, ওকে খুঁজতেই এসেছি। কী সব যা-তা লিখেছে, ভাই বলল কলকাতায় ডেফিনিটলি ভুবুকে নিয়ে কথা উঠবে... ওর ঘরের সামনে মেয়েরা নাকি লাইন দিচ্ছে, ও অটোগ্রাফ দিচ্ছে চুমুর বদলে, মেয়েরা ফোন করছে ওর সঙ্গে শোবার জন্য... আচ্ছা এইসহ গাঁজা গুলগপ্পোর কোনও মানে হয়? সম্ভব এ-সব? এতে ভুবুরই ক্ষতি হচ্ছে। তবু রক্ষে বাংলা কাগজে এ-সব বেরোয়নি।" আবার মাথা ঝুঁকিয়ে কাঞ্জিলাল ফিসফিস করল, "কাল রাত সাড়ে এগারোটায় ফিরেছে। মনোহরণ আজ সকালে আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলল, ভুবুকে নামিয়ে দিয়ে গেল একটা মেয়ে। স্লাইট নাকি টলছিল। কিন্তু কাল যা ব্যাট করল, এখন তো এই সিরিজেই ওকে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু ইডলি-দোসা তো জানিসই কীরকম স্ট্রিক্ট। আমাকে বলল, তুমি ওয়ার্ন করো নয়তো রিপোর্টে আমি এগেনস্টে লিখব। সবে টেস্ট কেরিয়ার শুরু করেছে এখনই যদি এ-রকম উড়তে শুরু করে...ওকি নিজেকে সোবার্স বা কানহাই ভাবছে নাকি? এরপর শঙ্করের ওইসব লেখা যদি চোখে পড়ে...বারণ করতে হবে আর যেন না লেখে, ভুবুকেও যেন বলে দেয় সমঝে চলে। আমার পক্ষে এ-সব ব্যাপার নিয়ে বাচ্চাছেলেদের সঙ্গে বলাবলি করাটাও মুশকিল, ফট করে ছোটবড় কী একটা বলে দেব। ...শোন ওকে তো দেখছি না। তুই বরং শঙ্করকে বুঝিয়ে বলিস। বলবি তো?"

সরোজ মাথা নাড়ল।

"তুইও অমন উলটোপালটা লিখতে গেলি কেন? রামিন্দার তো ইচ্ছে করেই আজ নামল না। তবে আমি ওকে ড্রপ করার বিপক্ষে, লড়তে হবে। শঙ্করকে বলিস।"

কাঞ্জিলাল চলে যাচ্ছে। সরোজ ওর দিকে শূন্যচোখে তাকিয়ে রইল। মাথার মধ্যে এলোমেলো লাগছে। কী বেরিয়েছে, কীভাবে বেরিয়েছে তার লেখাটা? সে তো স্পষ্ট ইঙ্গিতই দিয়েছে রামিন্দারের সঙ্গে আনন্দের কথাগুলো কাল্পনিক।

কাঞ্জিলালকে থামিয়ে অভয়ঙ্কর আর উন্নি কথা বলছে। তরুণ প্রেসবক্সের ধাপগুলোর পাশে সরু প্যাসেজটা দিয়ে ভিড় ঠেলে আসছিল। হাতে কয়েকটা প্রেস ফর্ম। কথা শেষ করে কাঞ্জিলাল ধাপ থেকে প্যাসেজে নামতেই তরুণ হেসে কাঞ্জিলালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পর খেলা শুরু হতেই কাঞ্জিলালের কথাগুলো কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে সরোজ খেলার দিকে মন দেয়। রিপোর্টের প্রথম ভূমিকা যা থাকবে সেটা লিখে ফেলতে থাকে। দু'-তিনবার মাঠের দিকে তাকিয়ে সে বুঝে যায় আর দেখার কিছু নেই। যে-কোনও পাঁচ দিনের খেলার প্রথম দু' দিনের পর ম্যাচটা দুলে ওঠে, হয় ক্যাঁচকোচ শব্দে নয়তো মসৃণভাবে।

লেখার মাঝে বারবার কাঞ্জিলালের কথাগুলো কামড় দিচ্ছিল। রামিন্দার সম্পর্কে ক্ষতিকর কিছু তো সে লেখেনি বরং তাকে বীর হিসাবে দেখাবারই চেষ্টা করেছে। রাতে হাতাহাতির ব্যাপারটা শঙ্করই ভাল জানবে ভুবুর কাছ থেকে। এইসব খবর জানার প্রধান উপায় খেলোয়াড়রাই, তাই অনেক সাংবাদিকই ওদের সঙ্গে দহরম পাতাতে চেষ্টা করে। সফলও হয়, কেননা খেলোয়াড়রাও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য খবরের কাগজের আশ্রয় চায়। তরুণও নিশ্চয় লাইন করেছে কারুর সঙ্গে। তবে ইংরেজি কাগজেই সুবিধাটা বেশি।

সরোজ মুহূর্তের জন্য লেখা থামিয়ে ভাবল, আমিও কি লাইন করব? যে ভঙ্গিতে এতকাল চলেছি সেটা কি বদলাব? 'টোটালি মিস ফিট'! জার্নালিজম এখন যেখানে এসেছে গুহঠাকুরতা সেইখানে পৌঁছতে চায়। কিন্তু সেখানে খেলাটা কোথায়?

রিপোর্ট জমা দেবার সময় তরুণকে গতদিনের মতোই দেখতে পেল টেলেক্স অপারেটরের ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে। পাছে অন্য কেউ পড়ে ফেলে তাই হয়তো পাহারা দিচ্ছে। কিংবা অন্যরা কী লিখছে সেটাও পড়ে নেবে এক ফাঁকে। কিন্তু হাতাহাতির খবরটা কি জেনেছে? কাঞ্জি বেরিয়ে যাবার সময় তরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দু'জনে কথা বলতে বলতে বেরিয়েছে। নিশ্চয় তখন কাঞ্জি ওকে ব্যাপারটা বলেছে।

"কী হে তরুণ, তোমার ডেসপ্যাচ পৌঁছেছে?"

"না, সরোজদা। ওপাশে দুটো নম্বরই এনগেজড।"

"তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি লাইন ফ্রি হয়ে যাবে?"

তরুণ বেরিয়ে এল।

"দাঁড়িয়ে থেকে না করালে কপি ফেলে রেখে দেবে।"

"পান সিগারেট খাইয়েছ?"

"ও-সবে আর হয় না, একদিনের জন্য খেলা দেখার পাস চেয়েছে তিনজন।"

"কেমন খেলা দেখলে আজ, রামিন্দার তো সারাদিন মাঠেই নামল না।"

"হ্যাঁ তাই তো দেখলাম।" তরুণ হুঁশিয়ার হয়ে গেল। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে।

"কাঞ্জি বলল রাতে হোটেলে নাকি আনন্দের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছে। ওপেন করার ব্যাপারে।"

"তাই নাকি, তা হলে খবর নিতে হয় তো!" তরুণের স্বরে ব্যস্ততা কিন্তু খবরের জন্য নড়ার কোনও চেষ্টা নেই। সরোজ বুঝে গেল খবর যা নেবার নেওয়া হয়ে গেছে।

"রামিন্দারকে এবার বাদ দেওয়া দরকার, এত ফেল করছে।"

সরোজও হুঁশিয়ার হল। এটা টোপ। সে উলটো মনোভাব পেশ করল। "আমারও তাই মনে হয়, আর ফিরতে পারবে না।"

বিশ্বাস করল না-ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাওয়াটা সরোজের চোখে ধরা পড়ল। তার কালকের রিপোর্ট

হয়তো পড়ে নিয়েছে এখানে। বড্ড খোলামেলা ব্যবস্থা। এই লোকগুলো ঠিক বোঝে না কী ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রিপোর্টারদের মধ্যে চলে। শুক্লা সকালে সরল মনে তাকে তরুণের রিপোর্ট পড়তে দিল, দেওয়া উচিত নয়।

"আনন্দের ক্যাপ্টেনসি কেমন বুঝলে?"

"এমন কিছু নয়, সো সো, বড্ড ডিফেন্সিভ।"

"কলকাতার কাগজ এখানে পাওয়া যায়? তোমার কাগজ পেয়েছ?"

"না সরোজদা, এখানে দিল্লি, লখনউয়ের কাগজই তো সকালে পাই। আর আমাদের অল্প কিছুই আসে একদিন পর।"

সরোজ আর কথা বাড়াল না। মান্না আজই রাতে হোটেল ছাড়তে পারে বলেছে। দ্রুত সে পা চালাল মধুছন্দার উদ্দেশে।

রিসেপশনিস্ট তাকে জানাল, রবীন মান্না এখুনি চেক আউট করবে জানিয়েছেন। সব বিল মিটিয়েই যাবেন এবং তাবপর থেকে ঘরটা সবোজেব নামে হবে। আশ্বস্ত হয়ে সে তিনতলার সিঁড়ি ধরল।

মান্না গোছগাছ সেরে তৈরি।

"এখানকাব কাজ শেষ, ট্রেনের টিকিটও পেয়ে গেছি, এখুনি বেরোব, যাক দেখাটা হয়ে গেল। আপনার সঙ্গে ভাল করে জমিয়ে আলাপই কবা গেল না, কলকাতায় ফিরুন, একদিন বাড়িতে নিয়ে যাব।"

"নিশ্চয় যাব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছেন? এখনও তো..." সরোজ হাতঘড়ি দেখল।

"ম্যানেজাবের বাড়ি হয়ে যাব তাই একটু... বিলটা নীচে গিয়ে মিটিয়ে দিচ্ছি।"

সবোজ পকেট থেকে ব্যাগ বার করতেই মান্না তাব হাত চেপে ধরল।

"না না, দিতে হবে না।"

"সে কী, পঁচিশ টাকা করে তো আমার দেবাব কথা।"

"কথাটথা থাক। কোম্পানিব পয়সায় আছি ওটা কোম্পানিব ঘাড়েই ফেলে দেব।"

সবোজ আব চাপ দিল না। মান্নাব সঙ্গে সে বিসেপশন অফিসে এল। সুটকেস সহ তাকে রিকশায় তুলে দিয়ে সে ভাবল কোথাও গিয়ে খেয়ে নেবে। আব যাবাব পথে সঙ্গম হোটেলে ঢুঁ দেবে। যদি শঙ্কবকে পাওয়া যায় তা হলে কাঞ্জির অনুবোধটাও জানিয়ে দেবে।

শঙ্কব ঘরে টাইপ করছিল, সরোজকে দেখে বলল, "এক সেকেন্ড... ততক্ষণ গ্লাসে ঢেলে নিয়ে বসুন।"

টেবলে বামের বোতল আব গ্লাস। সবোজ খাবে কি খাবে না ঠিক করতে পাবছিল না। শঙ্কর আড়চোখে দেখে আবদেরে ধমক দিল, "নিন বলছি।"

"আচ্ছা আচ্ছা।"

মিনিট তিনেক পর শঙ্কর ঘুরে বসল।

"আমার সঙ্গে অনিল কাঞ্জিলালের দেখা হয়েছে। ভুবু আমার লেখা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দিল। আচ্ছা সরোজদা, আজ যে টেস্ট পিছু বারো-চোদ্দো হাজার টাকা একটা প্লেয়ার পায় এটা কি কোনওদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন? পঁচিশ বছর আগে, মনোহরণের কাছেই শুনলাম, দিনে পঞ্চাশ টাকা প্লেয়াররা পেত, তা ও অনেক ধস্তাধস্তি করে আদায় করতে হত। এই বদলটা, এই যে টাকা পাচ্ছে, আপনি একজন এক্স-বঞ্জি ক্রিকেটার হিসাবে বলুন, এটা আপনি চান কি না?"

"নিশ্চয় চাই। যে-কোনও খেলায় প্লেয়াররা টাকা পাক এটা অবশ্যই চাই।"

"এত টাকা টেস্টম্যাচে আসছে যেহেতু কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট এর মধ্যে এসেছে, দর্শকও বেড়েছে, কোনও টেস্ট সেন্টারেই সিজন টিকিট আনসোল্ড থাকছে না। রেডিয়োয় বল বাই বল কমেন্ট্রি হচ্ছে, টি ভি-ও সারাক্ষণ দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা তা হলে গুরুত্ব পেয়েছে। টেস্ট প্লেয়াররা এখন ন্যাশনাল লাইম লাইটে এসেছে। তাদের সম্পর্কে ট্রিমেন্ডাস ইন্টারেস্ট পাবলিকের মধ্যে জন্মেছে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন, আচার-আচরণ, অভ্যাস, বদভ্যাস সব কিছু সম্পর্কেই জানার জন্য কৌতূহল জন্মেছে। খবরের কাগজ যদি সেই কৌতূহল মেটায় তা হলে তাদের কেন দোষ দেবেন, কেন নিন্দে করবেন? বলুন?"

সরোজ ওর মুখের দিকে শুধু তাকিয়েই রইল। শঙ্কর ঠান্ডা গলায় ক্লাসে ছাত্রদের গ্রামার বোঝাবার মতো ঢঙে বলে গেল।

"আমি যা লিখেছি সে-রকম লেখা নাকি ফিল্মি ম্যাগাজিনে বেরোয়। হতে পারে। টেস্ট প্লেয়াররা এখন ফিল্ম স্টারদের থেকে পপুলারিটিতে কম কীসে? উত্তমকুমার প্রথম তিনটে ছবি করে কি এতটা নাম পেয়েছিল যা ভুবু প্রথম তিনটে ইনিংস থেকে পেয়েছে? মাস মিডিয়ায় ক'দিন ধরে অবিরত শুধু ওর নাম, ওর ছবি, ওর মুখের কথা। যে ক্রিকেটের কিছুই জানে না বোঝে না, সে-ও এখন ভুবুর নাম জানে, দেখলে চিনতে পারবে। মাত্র দশ দিনের মধ্যে একটা ছেলে বিখ্যাত হয়ে গেল। ...সরোজদা সবই বদলাচ্ছে, রিপোর্টিংয়ের স্টাইলও বদলাচ্ছে, বদলে যেতে বাধ্য। ম্যাচ তো পাঠকরা টি ভি-তে দেখে ফেলেছে, যা শোনার রেডিয়োতে শুনে ফেলেছে। এরপর ওদের পড়াতে হলে অন্যভাবে অন্য কিছু আপনাকে লিখতে হবে পড়াবার জন্য! আপনি যদি পুরনো স্টাইলই আঁকড়ে থাকেন, কেউ আর তা হলে আপনাব লেখা পড়বে না, আপনার কাগজই তাতে সাফার করবে। তখন বাধ্য হয়েই আপনার ওপরওয়ালা আপনাকে সরিয়ে অন্য লোককে আপনার জায়গায় পাঠাবে। আমি প্রথমে ভাবব আমার কাগজের কথা, কাগজের ইন্টারেস্ট আগে দেখব, তারপর ক্রিকেট-ফ্রিকেট।"

সরোজ অস্বস্তি বোধ করল শঙ্করের 'আপনি' 'আপনাকে সরিয়ে' এই শব্দ ক'টিতে। তবে ওর যুক্তি সে মন থেকে মানতে পারছে না। স্টার প্লেয়ারদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা লিখুক কিন্তু পর্দা তুলে বিছানাতেও উঁকি দেওয়াটা কুরুচি ছাড়া আর কিছু নয়। বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও তো পড়ে। তাদের কাছে খেলার প্রেরণার, উদ্দীপনার, বীরত্বের দিকটাই তুলে ধরা উচিত।

কিন্তু তর্কে নামতে সরোজের ইচ্ছা করছে না। যে যা বোঝে সেইভাবেই চলুক। রামিন্দার ওপেন করতে চায়নি, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এই নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে—এটুকু লেখা উচিত। এরপর লেখক বিশ্লেষণ করুক ক্যাপ্টেনের এই জেদের পিছনে কোনও যুক্তি আছে কি না, ভাল একজন ব্যাটসম্যান ফেল করছে তাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, এ-সব না করে হাতাহাতির গল্পকেই বড় করে দেখানো, এ কেমন আধুনিক রিপোর্টিং! সরোজ আপনমনে মাথা নাড়ল।

"ভুবুর রাতে ফেরার ব্যাপারটা?" শঙ্কর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"হ্যাঁ।'

"তাতে কী হয়েছে?" শঙ্কর টাইপ করা কাগজগুলো ভাঁজ করে পকেটে রেখে জুতোয় পা গলাল। "ও যদি পারে করুক। কটকে গত বছর রঞ্জি ম্যাচে রাত আড়াইটেয় চুর হয়ে ফিরে পরদিন সকালে সত্তর থেকে শুরু করে একশো তিরিশে পৌঁছেছিল পঞ্চান্ন মিনিটে। ফ্রেশ দেখাচ্ছিল যখন আউট হয়ে এল। আজ ও কীরকম ফিল্ড করল বলুন? মনে হল কি লেট নাইট করেছে? ভেতো বাঙালির শরীরের ক্ষমতা দিয়ে ওকে মাপবেন না, বাঙালি মর‍্যালিটি দিয়েও নয়! হি ইজ এ ফেনোমেনা, অ্যান এক্সেপশনাল হিউম্যান।"

"হতে পারে!" সরোজ ধীরস্বরে বলল। "ক্রিকেট টিম গেম, টিমের অন্যদের উপর ওর আচরণের প্রভাব পড়তে পারে, ডিসিপ্লিন নষ্ট হতে পারে। একজনকে লাইসেন্স দিলে অন্যরাও চাইবে।"

"কেউই বাচ্চা ছেলে নয় সরোজদা, ইনফ্লুয়েন্সড হয় যদি হবে। আর ডিসিপ্লিন? রামিন্দার মা তুলে চিৎকার করে খিস্তি করল ক্যাপ্টেনকে, সেও গিয়ে রামিন্দারের মুখে ঘুসি মারল—দু'জনের মুখেই অশ্রাব্য ভাষা, জুনিয়র প্লেয়ার, হোটেলের বেয়ারা, আরও অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখেছে।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের মধ্যে গেঞ্জিটা গুঁজতে শুরু করল। তারপর আয়নার সামনে আঙুল দিয়ে চুল বিন্যস্ত করতে করতে শিস দিল। ডিসিপ্লিন সম্পর্কে আর একটি কথাও সে বলল না। যা বলার যেন বলা হয়ে গেছে।

"আপনি এখান থেকে তো সোজা দিল্লি যাবেন, আমি একটু এধার ওধার ঘুরে লখনউ, আগ্রা দেখে যাব। আর দিল্লিতে থাকার একটা ব্যবস্থাও করে ফেলেছি, চলুন বেরোই।"

রাস্তায় এসে গ্রিন পার্কের দিকে শঙ্কর হাঁটতে শুরু করল। সরোজের গন্তব্য অন্য দিকে।

"শঙ্কু এক মিনিট, কোথায় থাকবে সেটা জানিয়ো।"

"নিশ্চয়। একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির গেস্ট হাউসে, কনট প্লেসের কাছেই।"

পাঁচ

তৃতীয় দিন সকালে প্রথম এক ঘণ্টাতেই চারটে উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৩৩ রান তুলে। ভাণ্ডারকরের বলে প্রথম ওভারেই স্টাম্পড হল ম্যাকগ্রেগর। তারপর রান আউট আর দুটো এল বি ডব্লু। আবার চিৎকার, মাঠের মধ্যে কমলালেবু, কলা ছুড়ে দেওয়া, বিউগল বাজানো শুরু হয়ে গেল। নিউজিল্যান্ড ৪০৫ নয় উইকেটে।

এরপর, প্রায়ই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যা ঘটতে দেখা যায়, ব্যাট করতে পারে না বলে যাদের ধরে নেওয়া হয়, সেই শেষ উইকেট জুড়ির হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়া। লুইস আর মেনার্ড পাঁচটা ওভার প্রতি বলে ব্যাট চালিয়ে তিনটে ক্যাচ ফেলা, ওভার থ্রো, রান আউট ইত্যাদির সুযোগ থেকে পঁয়তাল্লিশ রান তুলে এবং ফিল্ডিংকে ছত্রখান করে হঠাৎ ডিফেন্সে মনোযোগ দিয়ে ওপেনারদের মতো সতর্ক ব্যাটিং শুরু করল। ৪০৫ থেকে ওরা ৪৭৫-এ ইনিংসটা নিয়ে যেতেই দিশেহারা আনন্দ ভবানীশঙ্করকে লং অন থেকে ডেকে এনে হাতে বল তুলে দিল।

স্লো মিডিয়াম পেসে দুটো লংহপ ও একটি ফুলটস দিয়ে এবং আটটি রান বাড়িয়ে ভবানী চতুর্থ বলে মেনার্ডকে বোল্ড করল। ২৮৫ রানে এগিয়ে থেকে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস শেষ করল।

খেল্যর আড়াই দিন এখনও বাকি। উইকেটে এমন কিছু ঘটেনি যা বোলারদের আশান্বিত করতে পারে। বরং প্রথম দিনের থেকে যেন মন্থরই হয়েছে। ধৈর্য ও সতর্কতা, এই দুটি জিনিস নিয়ে যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান আড়াইটে দিন কাটিয়ে দিতে পারে যদি না ক্লান্ত হয়ে মনোনিবেশ হারায়।

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে এল আলভা এবং সরোজকে আশান্বিত করে রামিন্দার। তার মনে হচ্ছে এবার রামিন্দার রান পাবে। উইকেট মন্থর হয়েছে, বাউন্সও আর প্রথম দিনের মতো নেই। ওরা ব্যস্ত হবে না রানের জন্য, সেটাই স্বাভাবিক।

প্রথন তিন ওভার মেডেন নিল। চতুর্থ ওভারে বামিন্দাব চমৎকার কভার ড্রাইভে বয়েডের বল বাউন্ডারিতে পাঠাল। মাঠের উচ্ছ্বাস গুঞ্জনে থিতিয়ে আসতে না আসতেই আবার সে একইভাবে চার বান নিল। এবারের উচ্ছ্বাস আরও তুমুল।

পাশের লোকটির দূরবিন সরোজ তুলে নিল। রামিন্দার তার মানসিক বাধাগুলো কাটিয়ে গুঁড়িয়ে পথ তৈরি করে বেরোবার চেষ্টা করছে। বেপরোয়া পন্থা। ফাটকায় টাকা খাটাবার মতো। যদি কিছুদূর এ-ভাবে এগোতে পারে তা হলে নিজের উপর ভরসা আসবে। রামিন্দারের কপালে বিজবিজে ঘাম। ঠোঁট চাটছে ঘনঘন। চোখে অনিশ্চয়তা। বিস্ময় আর উন্মাদেব মতো অর্থহীন বোধশূন্য চাহনি পরপর ভেসে উঠল।

তৃতীয় বলটা এবার শর্ট পিচ হবেই এবং হলও। বেশি উঠল না। রাইফেলের থেকে বুলেটের মতো শব্দে বলটা পয়েন্ট বাউন্ডারিতে পৌঁছল। রামিন্দার অবাক চোখে তাকিয়ে। ধীরে ধীরে চোয়ালটা শক্ত হয়ে এল। বিড়বিড় করে কিছু বলেই দু'হাত মুঠো করে জোরে ঝাঁকাল।

তিন বলে ১২ বান, টাইমিং নিখুঁত। রামিন্দার ফিবে আসছে। পরের দুটো বল লেগস্টাম্পের বাইরে। ব্যাট চালিয়ে ফসকাল। ষষ্ঠ বল গুড লেংথে রামিন্দার পিছিয়ে ফ্লিক করল স্কোয়্যার লেগে। ঢপ করে একটা শব্দ আর একসঙ্গে হাত তুলে বয়েডের সঙ্গে সাতজন ক্লোজ-ইন ফিল্ডার চিৎকার করে উঠল।

সরোজের গলার কাছে হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে। ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোনও সন্দেহ নেই। পৃথিবীর কোনও আম্পায়ারই, যতই পক্ষপাতিত্ব করুক, এল বি ডব্লু না দিয়ে পারবে না।

পটেলের আঙুল উঠেছে। সেই আঙুল বেয়েই রামিন্দারের চোখ আকাশের দিকে উঠে কয়েক সেকেন্ড থমকে থেকে কুঁকড়ে গেল। আম্পায়ারের দিকে সে স্থির চোখে তাকাল। আগুনঝরা চাহনি। বয়েডকে ঘিরে অভিনন্দনের জোয়ার বইছে। ব্যাটটা দু'হাতে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল রামিন্দার। এক ফিল্ডার সেটা তুলে ওর দিকে এগিয়ে ধরল। কী যেন রামিন্দার বলল, ফিল্ডারও জবাব দিল। আলভা এগিয়ে এসেছে। ব্যাটটা চেয়ে নিয়ে সে রামিন্দারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাহু ধরে টানল। ঝটকা দিয়ে আলভার হাত সরিয়ে সে দ্রুত পায়ে ফিরতে লাগল। তখন ভবানী ক্রিজের দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে।

"বাঁচানো গেল না। এরপর আর ওকে..."

অভয়শঙ্করের গলা শোনা যাচ্ছে। সরোজ খাতায় কয়েকটা কথা দ্রুত লিখে রাখছে মন থেকে হারিয়ে যাবার আগে। এমন সময় টেলেক্স ক্যাম্পের পিয়ন তার সামনে একটা কাগজ এগিয়ে ধরল।

"আপকা হৈ?"

কলকাতা থেকে স্পোর্টস এডিটর রমেন গুহঠাকুরতা জানাচ্ছে; দু'দিন ভাল রিপোর্ট হয়েছে। রামিন্দার সিংয়ের সঙ্গে ইন্টারভিউয়ে আর একটু বাড়তি যেমন, ওর বউ কি ডিভোর্স করেছে? ওর বর্তমান ফর্মের উপর বিবাহিত জীবনের সমস্যা কতটা প্রভাব ফেলেছে?— এই ধরনের খবর থাকলে ভাল হত। ভবানীশঙ্করের সম্পর্কে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ স্টোরি চাই। মেয়েদের চুমু তার ব্যাটিংকে ইনস্পায়ার করে কি; রাত করে হোটেলে ফেরা, গাঁজা আর মদের মধ্যে কোনটা সে পছন্দ করে, গার্ল ফ্রেন্ড আছে কি না? এই ধরনের গল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। নিউজ যে দারুণ খবর দিচ্ছে, প্রত্যহ পিছিয়ে নেই।

সরোজ কাগজটা মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলতে গিয়েও ফেলল না। রামিন্দারের সঙ্গে ইন্টারভিউ? ব্যাপার কী? আজ পর্যন্ত সে তো ওর সঙ্গে একবারও কথাই বলেনি!

চা-এ ভারত এক উইকেটে ৪২। আলভা জমাট বেঁধে গেছে ১১ রানে, ভবানীর ১৭ রান তার ধৈর্য পবীক্ষার ফল।

খেলা শেষের তিন ওভার আগে ভবানী প্রথমবার হাঁকাতে গেল ওয়ালেসকে। স্ক্রিনের সামনে ক্যাচটা লুফল লোকাস্ট। ভারতের ঠিক তখন ১০০ রান, ভবানীর ৬২। সে পঞ্চাশ পেরোতেই প্রেসবক্সে রেকর্ড খোঁজা শুরু হয়েছিল, প্রথম দুটো টেস্টে তিনটি সেঞ্চুরি করেছে এমন কেউ আছে কি না। পাওয়া গেল না। জীবনের প্রথম দুই টেস্টে দুটো সেঞ্চুরি পাওয়া গেল, অস্ট্রেলিয়ার ওয়াল্টার্স আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কালিচরণ, লরেন্স রো-র জীবনের প্রথম টেস্টেই দুটি সেঞ্চুরিকে এই রেকর্ডের মধ্যে গণ্য করা হবে কি না তাই নিয়ে দু'-তিনজন তর্ক করার চেষ্টাও করল। ভবানীকে নিয়ে চারজনই জীবনেব প্রথম দুটি টেস্টে দুটি সেঞ্চুরির রেকর্ড কবেছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে—এটাও রেকর্ড হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত, এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই ভবানী আউট হল।

হা-হুতাশ ধ্বনি একটু বেশি সময়ই রইল কেননা ভবানীব ব্যাটিংই দর্শকরা দেখতে চায়। ঠিক সেই সময়ই প্রেসবক্সে আসার পথটায় একজনের চড়া স্বরের কথাগুলো ডুবে যায় সারা মাঠের শব্দের মাঝে।

'হয়্যার ইজ হি?"

লাফ দিয়ে ধাপের উপর উঠে রামিন্দার প্রেসবক্সের সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

কে একজন আঙুল দিয়ে সরোজকে দেখিয়ে দিল। কাত হয়ে চেয়ারগুলোর পিছনের চিলতে জায়গা দিয়ে শরীরটাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে সে সরোজের পাশের লোকের পিছনে দাঁড়াল। ওর হাতে প্রভাত সংবাদের কপি দু' ভাঁজ করা, তাতে দেখা যাচ্ছে লাল পেনসিলে আঁকা বৃত্তের মধ্যে একটি খবর।

"আপনি এটা লিখেছেন?"

কপিটা সরোজ হাতে নিল। তার প্রথম দিনের রিপোর্টের মধ্য থেকে রামিন্দারেব সঙ্গে ড্রেসিংরুমে রবি আনন্দের কাল্পনিক সংলাপ অংশটুকু আলাদা কবে নিয়ে এবং 'আমি শের-ই থাকতে চাই— রামিন্দার সিং' এই শিরোনাম দিয়ে চারপাশে লাইন টেনে খবরটা বক্স করে ছাপা হয়েছে। এর সঙ্গে এমন কিছু বাক্য জোড়া হয়েছে যাতে পাঠকরা বোঝেন ওই খবরের লেখকের উপস্থিতিতেই দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

সরোজ হতবাক। এ-ভাবে জিনিসটা যে বেরোবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

"আপনার লেখা?"

রামিন্দারের গলার স্বরে সারা প্রেসবক্সই নয় দু'পাশের গ্যালারি থেকেও বহু লোক উৎসুক চোখে তাকিয়ে।

"হ্যাঁ আমারই কিন্তু ঠিক এ-ভাবে তো..."

"বাস্টার্ড, মিথ্যে কথা লিখে আমার ক্ষতি করার ফল এবার..."

বাঁ হাতে সে সোয়েটারের কলার মুঠোয় ধরে টান দিতে সরোজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানো মাত্র রামিন্দার পাশ থেকে ডান হাতে ঘুসি মারল তার ডান চোয়ালে। সরোজ টেবলে মুখ থুবড়ে পড়ল।

পিছনের সারিতে বসা দু'জন রামিন্দারকে জাপটে ধরায়, সে আর আঘাত করার সুযোগ পেল না। তুমুল হই চই আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে রামিন্দারকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু হল। হিন্দি ও ইংরেজিতে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে সে বেরিয়ে যাবাব আগে চিৎকার করে বলল: 'এই লোকটা চিট, মিথ্যে জিনিস আমার সম্পর্কে বানিয়ে লিখেছে, এ লোকটাব ক্যারেক্টার নেই, এর জন্মের ঠিক নেই..."

সরোজ কিছুক্ষণ মাঠটা, চারপাশের লোকজন ঝাপসা দেখল। ভোমরা ডাকার মতো একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। চোয়ালটা অসাড়। তারপর একসময় সবই সে ফিরে পেল—রং, গতিবিধি, আকৃতি, শব্দ এবং যন্ত্রণা তার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করতে পারল। একসময় তার মস্তিষ্কও সব কিছুকে একসঙ্গে মিলিয়ে বুঝে নিতে সক্ষম হল। সে সোজা মাঠের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। কৌতূহল, সহানুভূতি, প্রশ্ন কোনওকিছুই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে।

"রামিন্দার বাংলা জানে না, কেউ ওকে পড়ে শুনিয়েছে, উসকে দিয়েছে।"

"যাই লিখুক কিন্তু তাই বলে এ-ভাবে প্রেসবক্সে এসে জার্নালিস্টকে মারা... বোর্ড সেক্রেটারি তো এখানে আছে, ড্র্যাস্টিক অ্যাকশন নেবার জন্য আমাদের তরফ থেকে কিছু করা দরকার।"

"একটা চিঠি ড্রাফট করো আমরা সবাই সই করব।"

"ডাক্তাব দেখাতে হবে।"

কথাব বুদ্বুদ অনেক উঠল কিন্তু সে একবারও পিছনে বা পাশে মুখ ফেরাল না। শঙ্কর চেয়ারে নেই। তরুণ একবার উঠে এসে কথা বলার চেষ্টা করেছিল ইতিমধ্যে দিনের খেলা শেষ হয়ে গেছে। ভারতের ১০২ বান, দু'জনকে হারিয়ে।

সবোজ মাথা গুঁজে বিপোর্ট লিখল। টেলেক্স ক্যাম্পের কর্মচারী প্রেসবক্সেই অপেক্ষা করছিল। তাব হাতে কপি দিয়ে সে বেরিয়ে এল, কেউ আর তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেনি।

হোটেলে নিজেব ঘরে অন্ধকাবে খাটে বসে রইল দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। একসময় উঠে আলো জ্বালল। আয়নায় নিজেব সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে নিল। সোয়েটারটা খোলার সময় চোয়ালটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। দাঁত নড়ে গেছে, ভিতরের গাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছিল তখন সে গিলে নিয়েছে, আঘাত কাউকে দেখাতে চায়নি।

স্টিলের আলমাবিটা খুলে হ্যাঙার বার করাব সময় চোখে পড়ল একটা ছোট হুইস্কির বোতল। লেবেলে লাল কালিতে লেখা—'আপনার জন্য। ইতি রবীন মান্না।' ক্যাপটা খোলা। আলোর দিকে তুলে দেখল কিছুটা কম, বোধহয় মান্না নিজেই খেয়েছে। হঠাৎ সে বোতলটা মুখে লাগিয়ে ঢকঢক করে মুখে ঢেলে বিকৃত মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তখনও কিছুটা রয়েছে। সেটুকুও এক ঢোঁকে শেষ করে বোতলটা টেবলে রেখে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল। খিদে বোধ করছে না।

ঘণ্টা দুয়েক পর বাথরুমে যাবার জন্য উঠে আলো জ্বেলেই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। এবার আব সরে গেল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আয়নার কাচে কপাল ঠেকাল।

আমি কি বদলে গেলাম! সরোজ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাবার চেষ্টা করল। ওটা কি সরোজ বিশ্বাস? মুখটা দু'পাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখতে লাগল।

তার মনে হচ্ছে আয়নার লোকটাকে সে এই প্রথমবার দেখছে। এই লোকটা ধূর্ত, ব্যক্তিত্বহীন, চাটুকার, বিবেকহীন। এ সরোজ বিশ্বাসের মতো চেহারাটা পেয়েছে মাত্র। দৃষ্টি মাঝে মাঝে ঝাপসা লাগছে চোখের পাতা ঝুলে আসছে। সে প্রাণপণে চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করতে করতে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল, "কে তুমি?" তাবপব মাথা নেড়ে বলল, "চিট, ক্যারেক্টার নেই, জন্মের ঠিক নেই।"

হঠাৎ তার মাথার মধ্যে ক্ষীণভাবে একটা স্বর জেগে উঠল। কে যেন, কে যেন তাকে একসময় বলেছিল, 'বিট্রেয়ার ...ভুল করেছি মেরুদণ্ডহীনকে ভালবেসে ... চিরকাল বুকে হাঁটবে ...' কে বলেছিল?

পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠল সরোজের। বমি করার জন্য সে বাথরুমে ঢুকল। বেরিয়ে এসে দেয়াল, টেবল, চেয়ার ধরে ধরে বিছানায় পৌঁছেই গড়িয়ে পড়ল।

"আহ্, ঠিকই বলেছ বীণা।"

চিত হয়ে কথাগুলো বলে সে চোখ বন্ধ করল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। আলোটা আর নেভানো হয়নি।

ছয়

কানপুরে ভারত চতুর্থ দিনে চায়ের পরই ইনিংস ও ১৭ রানে হেরে যাবার তিন দিন পর পুরনো দিল্লি স্টেশনে সরোজ ট্রেন থেকে যখন নামল ভোর হতে তখনও ঘণ্টা খানেক বাকি। স্টেশনের ভিতরে গিজগিজে ভিড়। বাইরের রাস্তা হালকা ভিজে, রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ভিতরে একটু গুমোট কিন্তু আরামদায়ক। স্টেশন থেকে বেরোবার গেটে অটো রিকশা আর ট্যাক্সিওয়ালারা, যারাই লটবহর নিয়ে বেরোচ্ছে তাদের পিছু নিচ্ছে। ঠিক কানপুরেরই মতো। এমন অন্ধকারে ই আই এন এস-এর রিসেপশনিস্টকে ঘুম ভাঙিয়ে তোলাটা কি মানবিক হবে?

সরোজ স্টল থেকে চা কিনল। মিষ্টি গরম জল কিন্তু এখন ভাল লাগছে। সিগারেট ধরাল। একটা বেঞ্চে কোনওরকমে বসার জায়গা করে, নানাবিধ রেল বিজ্ঞপ্তি আর বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে সে ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আকাশে পুব থেকে আলোর আভা ছড়িয়ে যেতেই সে স্টেশন থেকে বেরোল। দু'জন অটো রিকশাওলা গন্তব্য শুনে তাকে প্রত্যাখ্যান করল, একজন জানাল রফি মার্গ চেনে না, এক ট্যাক্সিওলা অসম্ভব ভাড়া হেঁকে বসল এবং অবশেষে এক অটো রিকশাওলা তাকে তুলে নিল। দিল্লির অটো চালকদের সম্পর্কে সারা ভারতে বদনাম আছে, ওরা সওয়ারিকে নতুন বা অনভিজ্ঞ বুঝলেই মিটারে ভাড়া বাড়িয়ে তোলার জন্য পাঁচ মিনিটের পথকে পঁচিশ মিনিট করে দেয় নানা পথ ঘুরিয়ে। নতুন দিল্লির রাস্তা এমনই যে নবাগতের কাছে একই রকম ঠেকে। চেনা জায়গায় যেতে হলে সরোজ এখনও বুঝে উঠতে পারে না কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

ভোরের দিল্লি সরোজের মনোরম লাগল। অটোওলা যদি ঘোরাতে চায় তো ঘোরাক। জলকণা ভরা ঠান্ডা বাতাস মুখে ঝাপটা দিচ্ছে। বছরের দশ মাস ভ্যাপসা দরদরে গরমে কাটানো কলকাতাবাসীর কাছে শীতের জায়গা আরামেরই হয়। দোকানের বন্ধ শাটার ঘেঁষে ফুটপাথে অনেক লোক এখনও ঘুমোচ্ছে। শীত ঠেকাতে এমন মুড়ি দিয়েছে যে-জন্য তাদের এক একটা পুঁটলির মতো দেখাচ্ছে। মন্থর গতির কিছু পদচারী, সাইকেল আরোহী, হলুদ ট্র্যাফিক সংকেতের দপদপানি, চওড়া নির্জন রাস্তায় ট্রাকের টায়ারের চড়চড় শব্দ, দু'পাশে গাছের ডালপালায় হালকা কুয়াশার মতো ভোরের আলো। সরোজ মুখে বাতাস লাগিয়ে শরীরের ভিতরে শীত পাঠিয়ে দেবার কাজে মগ্ন রইল।

ইন্ডিয়ান ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি অর্থাৎ আই ই এন এস কথাটাই সরোজের কাছে একটা হেঁয়ালির মতো। ইস্টার্ন হলে তো পূর্ব ভারতের কাগজের জন্যই সোসাইটি, তা হলে দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারতের কাগজগুলো এর সদস্য কেন?

রফি মার্গে সোসাইটির পাঁচতলা বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় আছে কয়েকটি গেস্ট রুম। একতলায় অফিস, বোর্ডরুম আর একটা ক্যান্টিন যেটার কন্ট্রাকস্ট দেওয়া বাইরের লোককে। সদস্যদের কর্মীরা ভাড়া দিয়ে গেস্টরুমে থাকতে পারে হোটেলের মতো। টেস্টম্যাচের সময় ঘর পাওয়া দায় যদি না আগাম বুক করা থাকে। মাঝের তিনটি তলায় দেশের নানান জায়গার খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকার নিউজ ব্যুরো, আর নিজস্ব টেলেক্স, টেলিপ্রিন্টার নিয়ে অফিস।

অটো রিকশাটা আইফ্যাক্স বাড়িটা ঘুরে ডান দিকে মভলঙ্কর অডেটোরিয়ম আর এম পি-দের কোয়ার্টার ছাড়াতেই সরোজ ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে বাঁ দিকে একটা কাঠের গেট দিয়ে রিকশাটাকে ঢোকাতে বলল। পোর্টিকোয় রিকশাটা থামতে সে দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। অন্ধকার প্রায়। ডান দিকে

রিসেপশন কাউন্টারে লোক নেই। ভাড়া দেবার সময় তার মনে হল সোজা পথেই তাকে আনা হয়েছে, লোকটা সৎ। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল, সত্তর পয়সা ফেরত নিল না।

কাউন্টারের পিছনের ঘরে টেলিফোনের পি বি বক্স। সেখান থেকে মাঝবয়সি একটি লোক বেরিয়ে এল। চোখ দেখে মনে হচ্ছে একটু আগেই ঘুম ভেঙেছে।

হোটেলের মতোই প্রাথমিক কাজগুলো। সরোজের জন্য ঘর বুক করাই ছিল। রেজিস্টারের ঘরগুলো ভরতি করে, ঘরের চাবি নিয়ে লিফটের দিকে এগোতে যাবে, তখন লোকটি ডাকল। একটি খাম তার হাতে।

সরোজ অবাক হল। পা দেওয়া মাত্রই চিঠি? আত্মীয় কি বন্ধুদের চিঠি আসে এখানকার অফিসের ঠিকানায়। রিসেপশনিস্টের কাছে পৌঁছবে না। কলকাতা অফিস থেকে আসবে এয়ার প্যাকেট। ডাকে আসা চিঠি নয়। খামটা ছিঁড়ে সে একটা ছোট্ট চিরকুট বার করল।

ইংরেজিতে লেখা: "ডিয়ার আঙ্কল, আমাদের ফোন নম্বর দিলাম। এসেই ফোন করবে। আমি আবার খোঁজ নেব। সরোজা।" নামটা পড়েই সরোজের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সরোজা থেকে রোজা। কিন্তু তার নামের সঙ্গে এত মিল কেন! তারিখ দেওয়া নেই। বড় অক্ষরে ফোন নম্বর লিখে সেটার চারধারে মোটা লাইন টেনে চৌকো ঘর করে দেওয়া।

"কবে এসেছে?"

"কাল সন্ধ্যায়।"

"একটি মেয়ে দিয়ে গেল?"

"বলতে পারব না, আমি ডিউটিতে ছিলাম না।"

এখনই ফোন করা কি উচিত? হয়তো ওদের ঘুম ভাঙেনি। লিফটে ঢুকে সে চার নম্বর বোতাল টিপল। লম্বা বারান্দার একধারে ঘরগুলো, দরজার উপরে নম্বর লেখা। লিফট থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে গিয়ে কোণের ঘর। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরের যাবতীয় আসবাবে চোখ বুলিয়ে, কাঠের আলমারিতে হ্যান্ডগ্রিপটা ঢুকিয়ে বেলবাজানোর সুইচটা টিপল। লিফট থেকে বেরিয়ে বারান্দার ডান প্রান্তে প্যান্ট্রি। সরোজ কান খাড়া করে সেখান থেকে ক্ষীণ শব্দ পেল বাজারের। অমলেট, টোস্ট, চা-কফি ছাড়া আর কিছু এখানে পাওয়া যায় না। নীচের ক্যান্টিন সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায়।

আপাতত খিদেটা মিটিয়ে সে ঘুমোবে। তার আগে বাথরুম যাওয়া। আর.. টেবলে চিরকুটটায় চোখ পড়ল। সরোজের ভ্রূ আবার কুঁচকে উঠল। ফোন করাটা কি খুবই জরুরি? ক্রিকেটারদের সই জোগাড় করা আর ভবানীকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া—এই সব আবদার তার না রাখলেই কি নয়। তার থেকে ঘুমটা অনেক জরুরি। উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার লোকেরা ট্রেনে রিজার্ভেশন পাইয়ে দিয়েছিল তাই শুয়ে আসতে পেরেছে কিন্তু বন্ধ কামরার মধ্যে ঠান্ডাটা ক্রমশ জমাট বেঁধে তাকে এমন চেপে ধরেছিল যে সারারাত কুঁকড়ে থেকে সে শুধু প্রার্থনা করে গেছে একটি কম্বলের জন্য।

দরজায় টোকা পড়তেই সরোজ গোলাকার নবটা ঘুরিয়ে দরজা খুলল। পাজামা আর সোয়েটার পরা লোকটি মুখচেনা। আগের বারও একে দেখেছে। গাড়োয়ালি, নামটা মনে পড়ছে না।

"গুড মর্নিং সাব... কলকাতা থেকে এলেন?"

"না, কানপুর।"

"ক্রিকেটের জন্য?"

সরোজ মাথা নাড়ল।

"আরও তিনজন সাব কাল রাতে এসেছেন, পাঁচ, চার আর দু'নম্বর কামরায় আছেন।"

লোকটিকে খাবার আনতে বলে সে শেভিং ক্রিম, ব্রাশ, সেফটি রেজার, টুথব্রাশ, পেস্ট ইত্যাদি বার করে বাথরুমে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল। তখন চিরকুটটায় আবার চোখ পড়তেই তার মেজাজ সামান্য রুক্ষ হয়ে উঠল। ওদের দরকার যখন ওরাই ফোন করবে। এতকাল কোনও যোগাযোগ যখন ছিল না তখন ভবিষ্যতেও না থাকলে কিছু ক্ষতি বা লাভ হবে না। বীণার প্রতি তার আর আগ্রহ নেই, খুঁচিয়ে পুরনো সম্পর্ক আর এই বয়সে কবর থেকে তুলে আনা যায় না, সম্ভবও নয়। যে যার ছাঁচে ঢুকে গেছে, মনের উপর কঠিন আবরণ পড়েছে। শরীর অবশ্য নিজস্ব নিয়মেই সক্রিয় রয়েছে যাবতীয় চাহিদা

নিয়ে। ট্রেনে পাশে বসে কথা বলার সময় বীণা পায়ের উপর পা তুলতেই হালকা সিল্কের শাড়ির নীচে ওব উরুর গড়ন ভালমতোই আভাস দিয়েছিল। তখন তার মনোনিবেশ কিছুটা টাল খেয়েছিল এবং সারাক্ষণই সে বীণার শরীরের নানান জায়গার স্মৃতি হাতড়ে ছবি সংগ্রহ করে তখন আর এখনের মধ্যে যে তুলনার চেষ্টা করে গেছল, সেটা এই মুহূর্তে নিজের কাছে সরোজ কবুল করল। "এক তিলও বদলাওনি।" কথাটা বলার জন্য তখন উত্তেজিত স্মৃতি তাকে কি উসকে দেয়নি? কথাবার্তায় সে আদিরসের ছোঁয়া দিয়েছিল হালকা রসিকতার ছলে। বীণা তা গ্রহণ করে "বদমাইশ" বলেছিল। সরোজের হাসি পেল বদমাইশ শব্দটিতে। শালটা দিয়ে যাওয়ার মধ্যে কি বুঝিয়ে গেছে এখনও দুর্বলতা রয়েছে! ওটা ফেরত দিতে হবে।

"পেপার, পেপার।"

বাইরের বারান্দায় হকারের হাঁক। সরোজ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে লোকটিকে ডেকে দুটি ইংরেজি কাগজ কিনল। বলেও দিল রোজ যেন দিয়ে যায়। প্যান্ট্রি থেকে ট্রে নিয়ে বেয়ারা আসছে দেখে সরোজ দরজাটা খুলে রেখে ঘরে এসে চেয়ারে বসল।

প্রথম কাগজটা খুলেই সে খেলার পাতায় চলে গেল। বৃষ্টির জন্য নেট প্র্যাকটিসে বঞ্চিত ফিরোজ শাহ কোটলায় ড্রেসিংরুমে বসে থাকা ভারত দলের কয়েকজনের একটা তিন কলম ছবি। তিনজন তাশ খেলছে, একজন অটোগ্রাফ খাতায় সই দিচ্ছে আর দরজায় দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে যে তাকিয়ে আছে তাকে চিনতে সরোজের এক লহমাও লাগল না।

রামিন্দারের প্রতি সরোজের কোনও বিদ্বেষ নেই। অন্য কাগজকে টেক্কা দেবার জন্য ডেস্ক যদি তার রিপোর্ট থেকে কাল্পনিক সংলাপটা তুলে সেটাকে সত্যি সংলাপ হিসাবে আলাদা করে না ছাপাত তা হলে কিছুই ঘটত না। রামিন্দার-আনন্দ কথাবার্তা যে বানানো সেটা জেনেই এই কাজ গুহঠাকুরতা করেছে। রামিন্দার সম্পর্কে তার সহানুভূতি এখনও অটুট, সে মনে প্রাণেই চায় এই সরল ও সাহসী জাঠ এবং দর্শনীয়-না-হয়ে-প্রয়োজনীয় ব্যাটসম্যানটি ফর্মে ফিরে আসুক।

তবে রামিন্দার তাকে যে কিছু একটা করে দিয়েছে সরোজ তা বুঝতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কী জিনিস এখন সে জেনেছে আর বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে অন্য কাগজকে পিছনে ফেলে দিতে। খবরের জন্য, যে-কোনও পন্থা নিতে হয় নেবে, যতদূর যেতে হয় যাবে, যদি মিথ্যা লিখতে হয় তো লিখবে। 'টোটালি মিসফিট' বলার সুযোগ আর দেবে না। এখন সে মনে মনে তারিফ করে সেই ব্যক্তিটিকে যে রামিন্দারকে প্রভাত সংবাদ দেখিয়ে তাকে উত্তেজিত করে প্রেসবক্সে পাঠিয়েছিল। কে সেই ব্যক্তি তা সে এখনও জানে না। তরুণ হতে পারে, শঙ্করও হতে পারে এবং কাঞ্জিলালও, যেই হোক, ওই ভাবে সে-ও ঘায়েল করবে। মোট কথা, এখন সবাইকে প্রতিদ্বন্দ্বী ধরে নিয়ে সে চলবে।

কানপুরে কাঞ্জিলাল তার ঘরে রাতে এসেছিল ম্যাচ শেষ হবার পর। চায়ের সময় নির্বাচকরা বসেছিল দিল্লি টেস্টের জন্য দল বাছতে। রামিন্দারকে রাখা হবে কি হবে না শুধু সে-জন্যই দেড় ঘণ্টা তপ্ত বিতর্ক হয়েছে। কাঞ্জিলাল রাখার পক্ষে একাই প্রায় যুদ্ধ করেছে এবং জিতেছে। সাংবাদিককে ঘুসি মারার প্রসঙ্গ তুলে দু'জন নির্বাচক ওকে বাদ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল।

"তখন আমি বলি, সরোজ বিশ্বাসকে আমি চিনি, আমার বন্ধু, এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথাও বলেছি। ও বলেছে 'রামিন্দারের দোষ নেই আমিই মিথ্যে লিখেছি।' ... সরোজ, এটা আমাকে বলতেই হল নয়তো ওকে টিমে রাখা যেত না। বলেছি, মিথ্যে লেখার জন্য ক্ষমা চেয়ে রামিন্দারকে চিঠিও দিয়েছে। তা ছাড়া সাংবাদিক নিজে তো ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনেনি... সরোজ আমি বাধ্য হয়ে, মানে, আমি তো জানি তুমিও চাও রামিন্দার থাকুক টিমে। তাই তোমাকে ভাঙিয়ে ওকে ডিফেন্ড করলাম।"

সরোজের কানে, 'তোমাকে ভাঙিয়ে' শব্দ দুটো এঁটুলির মতো কামড়ে লেগে রইল। কাঞ্জিলালের কথায় সে একটুও বিব্রত, উত্তেজিত বোধ করেনি। তার মাথায় তখন শুধু একটি জিনিসই কাজ করছিল— এগুলো হচ্ছে ভিতরের খবর। এখন এ-সবই আমার চাই। কাঞ্জিলাল এবার তোমাকে আমি ভাঙাব।

কাগজে আলভারও একটা ছবি রয়েছে। কানপুরে ১০৪ করে, আউট হয় অষ্টম। ছাপোষা ইনিংস, বিপদের কারণ হবে না বুঝেই জেরি মার্কস ওর দিকে নজরই দেয়নি, চেষ্টাও করেনি ওর উইকেট নেবার। আপাতত আলভা এখন চোখ টেনে রেখেছে। আর একটা খবরে সরোজের চোখ পড়ল,

কলকাতা থেকে ঘোষাল আজ এসে পৌঁছয়নি, জানা গেছে কাল সকালের ফ্লাইটে আসছে।

পরের দিন ছিল রেস্ট ডে। সরোজ হোটেলের ঘর থেকে বেরোয়নি। সন্ধ্যায় ভবানীও শঙ্করের সঙ্গে মধুছন্দায় এসেছিল তাকে দেখতে। প্রেসবক্সের ঘটনা নিয়ে কোনও কথা তোলেনি। সরোজ তাতে হাঁফ ছেড়েছিল। তবে শঙ্কর তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিতে সে 'কিছু হয়নি' বলে প্রত্যাখ্যান করে।

"আপনার সেই অটোগ্রাফ বুকটায় ইন্ডিয়ান টিমের প্রায় সবারই করেছি। বাকিগুলো আর নিউজিল্যান্ডারদের, ভুবু করে দেবে বলেছে। দিল্লিতে পেয়ে যাবেন।" শঙ্কর ওর দিকে তাকাতে ভবানী সম্মতি জানিয়ে মাথা হেলাল।

"দিল্লিতে কোথায় যেন উঠছ?"

"জায়গাটা ঠিক এখনও জানি না, তবে ই আই এন এস-এর কাছেই। বলেছি তো ফোন করব। আর ভুবু, তুই কিন্তু একদিন সরোজদার... কে হয় আপনার?"

"ফ্রেন্ড।"

"হ্যাঁ ফ্রেন্ডের বাড়িতে যাবি।"

"নিশ্চয়। বলবেন কবে।"

"খেলার দিনগুলোয় তো আর..."

"কেন হবে না! আমি যে-কোনও দিন যেতে পারি।" তাচ্ছিল্য ভরে ঠোঁট মোচড়াল ভবানী।

"ভুবুর রেটিং এখন ভেরি হাই! এ-সব নিয়ে কথা বলার সাহস এখন কারুর হবে না। দুটো যা সেঞ্চুরি দেখাল!"

শঙ্কর মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল হাতের আঙুলের নখ পরীক্ষায় মনোযোগী ভবানীর দিকে। তরুণ এসেছিল ওরা চলে যাবার পর। আঘাত ও চিকিৎসা সম্পর্কে প্রথাগত খবর নেয়া এবং পরামর্শ দেয়ার পর বলেছিল, "কলকাতায় একমাত্র শঙ্করের লেখা ছাড়া আর কোথাও আপনার নাম বেরোয়নি। সন্ধেবেলায় টেলিফোন করেছিলাম অফিসে। এমন বিশ্রী একটা লজ্জাকর ব্যাপারে আপনার নাম জড়ানো থাকুক এটা কলকাতার পক্ষেও ভাল দেখায় না, এজেন্সিদেরও রিকোয়েস্ট করেছিলাম আপনার নামটা না দিতে, ওরা দেয়নি, শুধু লেখে 'এ ডিস্টিংগুইশড ভেটারেন জার্নালিস্ট।' শঙ্কর যে কেন দিল।"

তরুণ খুবই বিষণ্ণমুখে তার দিকে তাকিয়েছিল। ও বোঝাতে চাইছিল, সরোজের মান সম্মান শঙ্কর ডুবিয়েছে এবং সে চেষ্টা করেছে বাঁচাতে। শঙ্করের প্রতি তার বিদ্বেষ, ঘৃণা, রাগ জাগানোর সূক্ষ্ম প্রয়াসটা সরোজ বুঝতে পেরেছিল।

"তবে নিউজ ডে-র সার্কুলেশন এত কম, খুব কম লোকই জানবে।" তরুণ সান্ত্বনা দিয়েছিল।

চতুর্থ দিনেই ভারতীয় ইনিংস অপ্রত্যাশিত ভেঙে পড়ে ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারিতে দু' জায়গায় দাউ দাউ আগুন দেখা দিতেই পুলিশ ও দমকলের লোক আর দর্শকদের ছোটাছুটি শুরু হয়। প্যাভিলিয়নের সামনে উত্তেজিত জনতার থেকে স্লোগান ওঠে "রবি আনন্দ হায় হায়, রামিন্দার সিং হায় হায়। সিলেকশন কমিটি হায় হায়।"

প্রেসবক্সে যখন সে লিখছিল তখন কামদারের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই বৃদ্ধ উঠে আসেন।

"ফিলিং অলরাইট?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি ফিল করছি না। কীভাবে শেষ হয়ে গেল দেখলে? সাধারণ বোলিং, এত ভাল ব্যাটিং উইকেট, কেন এটা হল?"

"প্যানিক।"

"কেন প্যানিক?"

"রামিন্দার আর ভবানীর কাল উইকেটে থাকতে না পারায় গোটা টিমটারই নার্ভ ফেল করে গেছে।"

"এটাই আপাতদৃষ্টে মনে হয়। কিন্তু তুমি আর একটা ব্যাপার ভাবো, এই টিমটার মরাল বলে কিছু নেই। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে, নর্থ আর সাউথ, অবিরত খেয়োখেয়ি. আনন্দকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল রামিন্দারের ক্লেইম বরবাদ করে, ওখানেই টিমের মধ্যে একটা ধারণা এসে যায় ইন্ডিয়ান

ক্রিকেটে জাস্টিস বলে কিছু নেই। রামিন্দার পরের পর ফেল করেছে তার একটা কারণ, কাগজে কাগজে লেখা হয়েছে রামিন্দার ক্ষুব্ধ, আনন্দের সঙ্গে কো-অপারেট করবে না, ফলে কথাটা যে মিথ্যা এটা প্রমাণ করার জন্য ও দারুণ খেলবে ঠিক করে নিজেকে প্রেসারের মধ্যে ফেলে দেয় আর তাতেই ও ডুবছে। দেখলে তো রামিন্দার হায় হায় হচ্ছে, যেন আর সবাই মহাত্মা, পাপী শুধু একজনই। এই যে সেদিন দুই সিনিয়র গালাগালি হাতাহাতি করল টিমের বাচ্চাদের সামনে, তারই প্রতিক্রিয়া ওখানে হল।"

কামদার ডান তর্জনীটা ঘাড়ের পাশ দিয়ে পিছনে মাঠের দিকে নির্দেশ করলেন।

"লড়ে যাবার ইন্সপিরেশন যেখান থেকে আসে", তর্জনীটা বুকে ঠেকালেন, "ভেঙে গেছে জায়গাটা। ওরা ধরেই নিয়েছে ম্যাচটা শুধু ওই দু'জনের ব্যক্তিগত মর্যাদার ব্যাপার, তাদের কিছু করার নেই।"

"আলভাও অনেকটা দায়ী।" সরোজ বলেছিল। বৃদ্ধ হাসতে শুরু করলেন। "লিখবে নাকি? লিখো না, সেঞ্চুরি করেছে, সবাই তোমাকে পাগল বলবে। একটা সেলফিশ ইনিংস খেলল।"

"যদি বোলিংয়ের ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিত, ওর সে ক্ষমতা আছে, অন্তত এই উইকেটে তাই করা উচিত ছিল ফোর্থ উইকেট পড়তেই।"

"আমি হলে আজ ফোর্থ ওভার থেকেই করতাম। কোনও উইকেট পড়ুক বা না পড়ুক, দৃষ্টান্ত দিয়ে অন্যদের দেখিয়ে দিতুম ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। তার বদলে আলভা এমনভাবে ব্যাট করল যেন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে স্টিকি উইকেটে ভেরিটিকে খেলছে। আসল কালপ্রিট এই লোকটাই। শুধু নিজের জন্য খেলল। সামনেই ইংল্যান্ড ট্যুর, জায়গা পাকা করে রাখল।... যাই এবার, সন্ধ্যায় এক ফ্রেন্ডেব বাড়িতে বসব, ছোট্ট পার্টি, টোস্ট করব জাহান্নমে যাওয়া ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের নামে।"

কামদার চলে যাওয়ার পর সরোজ মিনিট দুয়েক ভাবল তারপর লিখে ফেলা দেড়খানা পাতা দলা-পাকিয়ে ফেলে নতুন কাজে নেয়। সারা দুপুর গভীর ঘুমের মধ্যে সরোজ কাটাল। দরজায় খটখট শব্দে ঘুম ভাঙে।

"আরে, এসো এসো।" দরজা খুলে দাশরথিকে দেখে সরোজ অবশ্য অবাক হয়নি। দাশরথি তাদেব দিল্লি ব্যুরোর রিপোর্টার, দেড় বছর আগে কলকাতা থেকে এসেছে।

"ঘুমোচ্ছিলেন! এই নিন আপনার প্রেসপাস, পেতে যা ঝামেলা! একবার বলে অমুকের কাছে যান, গেলাম তার কাছে। সে বলল আমি নয় তমুকে দেবে। গিয়ে দেখি সে নেই। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করে. . দিল্লিতে এই ভাবেই সব হয়, মজার কথা কী জানেন, প্রথমে যে লোকটা বলেছিল অমুকের কাছে যান সেই-ই শেষপর্যন্ত দিল।... যাক গে, এ-সব কথা, কানপুরে কী হয়েছিল দাদা? কাল কলকাতা থেকে রমেনদা ফোন করে আপনার খোঁজ নিতে বললেন, কানপুরে আপনার হোটেলের ফোন নম্বর জানেন না, তাই আমাকেই বললেন।"

"কিছুই হয়নি। তিলকে তাল করেছে। সামান্য কথা কাটাকাটি তাই নিয়ে... তুমি আছ কেমন?"

"ভালই, চলে যাচ্ছে... আপনার খাওয়া-দাওয়া কোথায় করবেন... এদের টাকা দিয়ে বলে দেবেন, নীচের ক্যান্টিন থেকে এনে রেখে দেবে।"

দাশরথি কলকাতার কিছু লোকের খবর নিয়ে, সরোজের প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে উঠে পড়ল যাবার জন্য।

"যাক তা হলে আপনার কিছু হয়নি। যাই একবার শরৎ হালদারের বাড়ি, ডেকেছেন, ক্যাবিনেট মিটিংয়ে ফরেন টুরিস্টদের কাছে দার্জিলিং প্রহিবিটেড থাকবে কি না সেটা ওঠার কথা ছিল।"

দাশরথি বেরিয়ে যাবার পরই বারান্দা থেকে ওর গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ হ্যাঁ ওই কোণের ঘরটা... হ্যাঁ আছেন।"

দরজাটা ভেজানো, সামান্য ফাঁক রয়েছে। সরোজ দেখতে পেল রোজাকে। তাড়াতাড়ি সে জামাটা টেনে পরতে শুরু করল।

"আঙ্কল আসব?'

"এসো। তোমার নোট পেয়েছি। বোসো... এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এত টায়ার্ড লাগছিল।"

সরোজ ঘড়ি তুলে সময় দেখল। প্রায় ছ' ঘণ্টা ঘুমিয়েছে দশটা থেকে। ট্রেনে যে পোশাকে রোজাকে

দেখেছিল, তাই-ই পরা তবে শার্টের বদলে পোলো গলা উলের গেঞ্জি, যেটা অত্যন্ত আঁটো হওয়ায় স্তনের গড়ন সম্পর্কে স্পষ্ট নিখুঁত ধারণা পেতে অসুবিধে হয় না। সরোজ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করল। উঠে গিয়ে বাজারের সুইচ টিপল।

"চা খেতে হবে, তুমি কফি না চা? অমলেট?"

"শুধু কফি, নো শুগার।"

"এখানে পটে চিনি দেয়। ...ফিগার ঠিক রাখছ?"

"ফিগারের জন্য নয়, চিনি খাওয়াটাই তো ক্ষতিকর। কেমিক্যালি রিফাইন্ড এই সাদা চিনিতে ভিটামিন, মিনারাল, প্রোটিন, ফ্যাট সবই তো নষ্ট হয়ে গেছে, এর কোনও ফুড ভ্যালুই নেই বরং নানান রোগের কারণ হয়। খাওয়া একদম ছেড়ে দেওয়াই বরং উপকারী।"

বেয়ারা এসেছে। সরোজ তাকে শুধু কফি দিতে বলল। রোজা যে হালকা, চপল, মাথায় ক্রিকেটের খবরে ঠাসা নিছকই ছেলেমানুষ নয় সরোজ তা বুঝতে পারছে।

"চিনিতে দাঁতও নষ্ট হয়।" চিনির বিরুদ্ধে সরোজ এইটুকুই জানে।

"মা খুব মিষ্টি খেত, এক সায়েন্টিস্টের একটা আর্টিকেল একদিন পড়তে দিয়েছিল ব্যস তারপর থেকেই বাড়িতে চিনি আসা টোটালি বন্ধ। সে কী মুশকিলের ব্যাপার, ড্যাডি তো ভীষণ চা খায়, চিনি ছাড়া চা মুখে দেয় আর কাপ নামিয়ে রাখে। পুডিং তৈরি বন্ধ, কেক তৈরি বন্ধ, সফ্‌ট ড্রিঙ্কস বন্ধ। চিনির বদলে শুরু হল কলকাতা থেকে টিনে করে আনানো গুড আর পাটালি খাওয়া। এ-সবে তো আর কেমিক্যালস নেই। উফ্‌ফ প্রথম প্রথম সে কী কড়াকড়ি। গেস্ট এলে তাকেও চিনি ছাড়া চা বা কফি। আর কেউ আসে না আমাদের বাড়ি। জ্যোতিষমামা তো একদিন পকেটে চিনি নিয়ে এল। শেষে আমি আর ড্যাডি মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শুধু গেস্টদের জন্য চিনির ব্যবস্থা করেছি আর ড্যাডির জন্য স্যাকারিন।"

"জ্যোতিষমামা কে?"

"আপনি চেনেন না? মা যে বলল চেনেন।"

"ওহ্‌হ হ্যাঁ চিনি, তোমার মায়ের সঙ্গে পড়ত, কলেজ ক্রিকেট টিমের কিপার ছিল।"

"আপনি ছিলেন বেঙ্গল টিমের।"

সরোজ হাসল শুধু।

"তাই ওকে মামা আর আমাকে আঙ্কল বলছ?"

রোজা অপ্রতিভতা সামলাবার জন্য হাসল। সরোজ হাসিটার মধ্যে একটি শিশুকে দেখতে গেল।

"তা হলে আপনাকে কী বলব বলুন তো?"

"কিছু না, যা বলছ তাই বলো।"

কফি রেখে গেল বেয়ারা। সরোজই দুটো কাপে ঢালল। নিজের কাপে চিনি দেবার সময় রোজার দিকে তির্যক চাউনিতে তাকিয়ে বলল, "এখন তোমার মা দেখলে কী করত?"

"কিছুই না। যদি ড্যাডি হতেন কফির কাপটা নিয়ে বেসিনে ঢেলে দিয়ে আসত।"

"ভাগ্যিস তোমার ড্যাডি নই।"

কাপে চুমুক দিল দু'জনেই। মুখটা নিচু করবার সময় রোজার চশমাটা নাক বেয়ে একটু নেমে গেল। আঙুল দিয়ে সে ঠেলে তুলে দিল। সরোজ ওর চিবুক আর ঠোঁট লক্ষ করল, তারই মতো প্রায়।

"তোমার পাওয়ার কত?"

"লেফট আই মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ, রাইট আই মাইনাস ফাইভ।"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল। বাড়িতে আর কার চশমা আছে?"

"ড্যাডির, মাইনাস সিক্স। মা তো আমাকে স্কুটার চালাতে দিতে চায় না, বলে লেন্সের এত পাওয়ার অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলবে। ড্যাডির সাপোর্ট আমার দিকে, ফ্লাইং ক্লাবে আমাকে ভর্তি করে দেবে বলে মাকে ভয় দেখায়।"

"তোমার স্কুটার আছে?"

"হ্যাঁ, তাতেই তো এসেছি।"

"তা প্লেন চালানো শিখলেই তো পারো।"

রোজার মুখে গাম্ভীর্য ফুটে উঠল, স্বরেও, "বড্ড খরচ, ড্যাডিকে ট্যাক্স করা হবে।"

ফোন বেজে উঠল। সম্ভবত দাশরথি বা তিনতলায় তার অফিস থেকে কেউ, এইভেবে সরোজ রিসিভার তুলল।

"আরে তুমি, কবে এলে? ...আজ দুপুরে... ভবানীও, কাগজে দেখলুম আজ সকালের ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছবে লিখেছে... আঁ্যা তোমার ওখানে... আবার আমাকে কেন, আমার ঘরে এখন অত্যন্ত মিষ্টি এক অতিথি এসেছে যে একদমই মিষ্টি খায় না... হ্যাঁ, আরে আমার চুলটুল পেকে গেছে ও-সব আর... অটোগ্রাফ বইটা এরই, এদের বাড়িতেই ভবানীকে নিয়ে যাবার জন্য বলেছিলাম... এখনই আলাপ হতে পারে, দাঁড়াও ওকে জিজ্ঞাসা করি, এক মিনিট।" সরোজ রিসিভারের মুখে তালুচাপা দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেখল রোজা তার দিকেই তাকিয়ে। "ভবানী এক জায়গায় আড্ডা দিতে এসেছে, যাবে নাকি সেখানে।"

"ওহ্‌হ্‌ নিশ্চয়।" রোজা স্প্রিংয়ের মতো উঠে দাঁড়াল। "এ জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি মনে করিয়ে দিতে আর দেখুন..."

"মেঘ না চাইতেই জল। ওরা কিন্তু ড্রিঙ্ক করছে আমাকে জয়েন করার জন্য ফোনটা করেছে।"

"করুক না ড্রিঙ্ক, আমাদের বাড়িতে তো সবাই খায়।"

"হ্যালো শঙ্কু, ঠিকানাটা বলো...দাঁড়াও লিখে নিই...য়্যাঁ লিখতে হবে না সোজা রাস্তা, বলো... শিবাজি স্টেডিয়ামের... হ্যাঁ ইউনাইটেড টেক্সটাইল সাইনবোর্ড তার পাশে ফলের দোকান, তার পাশে প্রাইভেট রাস্তা, গেট আছে সিমেন্ট বাঁধানো, লিফটের দরকার নেই দোতলায় অফিস আর তার সঙ্গেই ফ্ল্যাট, আলাদা দরজা আছে, বেশ... একেবারে ফাইভ স্টার হোটেলের মতো সাজানো .. দশ মিনিটের মধ্যে? আচ্ছা চেষ্টা করছি, রোজার স্কুটাব আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওর নামই, আচ্ছা, আচ্ছা।"

ফোন রেখে দিয়ে সবোজ একগাল হাসল।

"শুনলে তো, জায়গাটা বুঝতে পারলে? এখন তুমিই সারথি, কী লাক তোমার!"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দু'জনে নীচে নেমে এল। ঘরের চাবিটা জমা দিয়ে পোর্টিকোয় রাখা স্কুটাবটা দেখে সরোজ বলল, "নতুনই দেখছি, কবে কিনেছ?"

"এক বছর প্রায়।"

বোজা স্টার্ট দিয়ে উঠে বসল, সরোজ বিব্রত হল ওর পিছনে কী ভাবে বসবে তাই ঠিক কবতে গিয়ে। রোজা ছেলে হলে ঘোড়ায় চড়ার মতো দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসে কাঁধে হাত রাখত। কিন্তু ও প্রায় অপরিচিত একটা মেয়ে। শাড়ি পরা মেয়েরা একদিকেই দুটো পা রেখে যেমন বসে সে-ভাবেই বসবে কি না ভাবছিল। তখন রোজা তাড়া দিল, "উঠুন।"

সরোজ আর কিছু না ভেবে পা সিটের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে চড়ে বসল। আর দুটো হাত পিছনে নিয়ে আঁকড়ে ধরল কেরিয়ারটা। তার বুক বা উরু রোজাকে যেন স্পর্শ না করে, আড়ষ্ট হয়ে সেদিকে সজাগ থেকে একসময় সে বলল, "একটু আস্তে চালাও, ভবানী তো আর পালাচ্ছে না।"

পাশ থেকে সে রোজার গালের পেশি হাসিতে নড়ে উঠতে দেখল।

শঙ্করের দেওয়া নির্দেশমতো ওরা ঠিক জায়গায় পৌঁছল। চারতলা অফিস বাড়িটা একটু পুরনো। ছুটি সবে হয়েছে। অনেকেই ফিরে ফিরে রোজার দিকে অথবা ওর বুকের দিকে তাকিয়ে গেল। দোতলায় খোলা দরজা দিয়ে একটা অফিস দেখা যাচ্ছে। পাশের বন্ধ দরজার কলিংবেলে দু'বার চাপ দিল সরোজ। আধ মিনিটের মধ্যেই পাল্লা খুলে শর্টস পরা শঙ্কর বলল, "হাই সরোজদা, হাই রোজা।"

সাত

সোফার একধারে খয়েরি ট্রাকসুট পরা ভবানী বসে। হাতে একটা গ্লাস। পানীয়ের রং দেখে ওতে যে রাম রয়েছে বুঝতে সরোজের অসুবিধে হল না। ভবানী উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। প্রথমে সরোজ তারপর রোজা।

"সরোজদা কিছু মনে করছেন না তো।"

ভবানী গ্লাসটা তুলে দেখাল।

"আরে না না, এতে মনে করার কী আছে। আজই পৌঁছলে?"

"হ্যাঁ, আটটায় ল্যান্ড করার কথা করলাম দশটায়। ফগ-এর জন্য ডিলেড। নেটও হল না, কালরাত্রের বৃষ্টিতে আরও ভিজে গেছে। ঢেকে রাখতে পারত প্র্যাকটিস পিচটা, এখানকার ব্যাপারই কীরকম গেঁইয়াদের মতো।"

"ব্যাটিং প্র্যাকটিস না করলে তো আপনার অসুবিধে হবে।" রোজার স্বর উদ্বিগ্ন এবং সিরিয়াস।

ভবানী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা একফুট নামিয়ে আবার তুলল। সরোজ অস্বস্তি বোধ করে মুখ ঘুরিয়ে ঘরের কোণে গ্লাসে রাম ঢালায় মনোযোগী শঙ্করকে লক্ষ করার কাজ নিল।

"অসুবিধে আর কী, নিউজিল্যান্ড বোলিং মোটামুটি জানা হয়ে গেছে, কোনও সারপ্রাইজ নেই। আসাম-অন্ধ্রে এ-রকম বোলার তো প্রচুর আছে।"

সরোজ এহেন বাগাড়ম্বরে না তাকিয়ে পারল না। তখন ভবানীর অলস চাহনি রোজার দুই উরুর মধ্যে নিবদ্ধ এবং রোজা সেটা বুঝতে পারছে কিন্তু অগ্রাহ্য করছে। ঠোঁটেও পাতলা হাসি।

"সরোজদা জল না সোডা, রোজা তোমার?"

অন্যত্র তাকাবার সুযোগ পেয়ে সরোজ তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল।

"জল।"

"আমি সোডা।" রোজা ভবানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল। সরোজ অস্বস্তি বোধ করল। এতটুকু মেয়ে! ভিন্ন কালচারে মানুষ, কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে এদের বুঝে ওঠা শক্ত।

হঠাৎ-ই তার মনে পড়ল বহু বছর আগে রেস্টুরেন্টের ঘটনাটা। সুবীর বলেছিল, একবার ঘুরে আয় না ওদের কলেজ থেকে। সরোজ আগাম বলে রেখে এক দুপুরে কথামতো গিয়ে বসেছিল হেদুয়ার উত্তরে পেঙ্গুইন রেস্টুরেন্টে, অপেক্ষা করতে করতে দু'কাপ চা শেষ করে। তারপর সুবীরের বোন সুজাতা, বীণা, আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে এসেছিল একটি তরুণ। ওরা বসল পাশের টেবিলে অপরিচিতের মতো। কথা বলছিল ক্রিকেট নিয়ে। শুনতে শুনতে সরোজ জেনেছিল তরুণটির নাম জ্যোতিষ, কলেজ টিমে উইকেটকিপার, বাড়ি জামশেদপুরে এবং বিহার টিমে নাকি বাংলার বিরুদ্ধে রঞ্জি খেলেছে। গত বছর। সরোজ আড়চোখে জ্যোতিষের মুখটা দেখে নিয়েই জেনে গেল মিথ্যেবাদী।

"বাংলার কে যেন উইকেটকিপার?" সুজাতা তখন বলেছিল।

"সরোজ বিশ্বাস।"

"কেমন খেলে?" বীণা প্রশ্ন করে জ্যোতিষকে।

মুখটা তাচ্ছিল্যে বেঁকিয়ে জ্যোতিষ বলেছিল, "ব্যাক স্টপার। লেগ ব্রেকে একেবারেই খেই পায় না। গ্যাদারিংও ক্লামজি।"

"আপনার সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ আছে।" সুজাতা বলে।

"তা আছে। সরোজকে একবার তো দেখিয়েই দিয়েছিলাম পায়ে কীভাবে ভর রেখে বসলে লেগসাইড বল নিতে সুবিধে হয়।"

সরোজ তখন মেয়েদের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে কেন তাকে আসতে বলা হয়েছে। এবার মিথ্যাবাদী জ্যোতিষকে ওরা উলঙ্গ করে দেবে। প্রত্যেকের মুখে চাপা উল্লাস নিষ্ঠুর আমোদের একটা যেন শিকার-খেলা চলছে। খেলিয়ে খেলিয়ে ওরা জালের দিকে নিয়ে যাচ্ছে জ্যোতিষকে। বেচারা জানে না কী ভয়ংকর একটা ব্যাপার তার জন্য অপেক্ষা করছে। সরোজ আর

সহ্য করতে না পেরে প্রায় ছুটে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেছল। মেয়েরা অবাক এবং হতাশ হয়েছিল। জ্যোতিষকে ওরা কয়েকদিন পর বলে দেয় কী ঘটতে যাচ্ছিল সেদিন।

"কেন তোমরা বলতে গেলে? বেচারা বরং নাই জানত। কী লজ্জায় পড়ল বলো তো?" সরোজ একবার বীণাকে অনুযোগ করে বলেছিল।

"ওদের কোনও লজ্জাটজ্জা থাকে না। খালি আমার পেছনে ছুঁক ছুঁক, সিনেমা চলো, কোথাও খেতে চলো। হাসাহাসি শুরু হয়ে গেছল ওকে আর সেই সঙ্গে আমাকে নিয়ে। সুজাতারই প্ল্যান ছিল ওকে এক্সপোজ করার।"

"সরোজদা কী ভাবছেন?"

"সরোজদা কিছু ভাবছেন যেন গভীরভাবে।" শঙ্কর পাশে বসে গ্লাসটা তার দিকে এগিয়ে ধরে।

"ভবানীর উপর একটা লিখতে হবে। বলেছিলে ওর সম্পর্কে সব খবর দেবে, মনে আছে?"

"নিশ্চয়, পাঁচ বছর ধরে ওকে চিনি, অনেক কিছু জানি।"

"তা হলে এখনই দাও, রাতে লিখে কালই পাঠিয়ে দেব।"

"এখানে বসে হবে না, পাশের ঘরে চলুন। কাগজ কলম লাগবে তো! আর অটোগ্রাফ বুকটা..."

সরোজ উঠে দাঁড়িয়েছে। শঙ্কর পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল। ভবানী চেঁচিয়ে বলল, "শম্ভু সব কথা সরোজদাকে বলিসনি যেন।"

সরোজ ঘরে ঢোকার সময় রোজাকে বলতে শুনল, "কী বলবে না, গার্লফ্রেন্ডদের কথা?"

শঙ্কর পর্দা সরিয়ে বাঁধানো ছোট্ট বইটা রোজাকে ছুড়ে দেবার আগে বলল, "ক্যাচ।" তারপর একটা চোখ টিপে, "দু'জনকেই।"

ঘবে দুটো খাট। দামি বেডকভার, এয়ার কুলাব, পাখা এবং হিটার, ওয়ার্ড-রোব, ড্রেসিং টেবল, বন্ধ জানলায় সাদা লেসের পর্দা, বাথরুমের দরজা, পুরু কার্পেট, দুই খাটের মাঝে টেবল ল্যাম্প, টেলিফোন, একধারে প্রশস্ত খালি জায়গায় দুটি গদির চেয়ার এবং নিচু ব্রেকফাস্ট টেবল। চোখ বোলানো শেষ করে সরোজ চেয়ারে বসল। শঙ্কর একটা সাদা কাগজ আর ডটপেন দিল।

মিনিট কুড়ি পর ঘর থেকে বেরোবার সময় সরোজ আবার একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থমকে দাঁড়াল। রোজা জায়গা বদলে ভবানীব পাশে বসে। ভবানীর বাঁ হাত ওর ডান উরুর উপব আলতো রাখা। তিনভাগ খাওয়া একটা সিগারেট ভবানী এগিয়ে ধরে। রোজা সেটা তুলে নিয়ে পরপব দুটো টান দিযে ফিরিয়ে দিল। সরোজ যখন ওদের সামনে বসছে তখন রোজা নাক দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছে।

"আমাদের কলেজে একবার নোটিস দিয়েছিল ক্লাসে কী কী করা বারণ। তাতে একটা ছিল স্মোকিং স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড।"

"সে কী, মেয়েরা ক্লাসেই গাঁজা টানে নাকি!" ভবানী অবাক হয়ে গেল।

রোজা মাথা কাত করল।

"তুমিও টেনেছ নাকি?" শঙ্কর অনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করল।

"একবারই, সামান্য একটু।"

রোজা আবার মাথা কাত করল মুখে হাসি টেনে। ভবানী ও শঙ্করের মধ্যে চোখাচোখি হল।

"তা হলে ভেজাল। আসল হলে আব ক্লাসে বসে খাওয়া যেত না। এমনকী কলেজেও নয়।" ভবানী বলল।

"না না, রিয়্যাল গ্রাস।"

একটু আগে শঙ্কর যে কথাটা বলেছে সরোজের মাথার মধ্যে সেটা দপ করে উঠল: "ভুবু একবার বাজি ধরে পাইপে গাঁজা ভরে টেনেছিল, সামলাতে পারেনি, ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। দু'দিন ভাল করে হাঁটতে পারেনি।"

"শঙ্কু আমি এবার উঠব রে, দুটো লোকের আসার কথা আছে। রোজা আমাকে লিফ্‌ট দেবে হোটেল পর্যন্ত, সরোজদা চলি।"

"আঙ্কল, মাকে কী বলব, কবে আসছেন আমাদের বাড়ি?"

"যাব'খন, ভবানী কবে যাচ্ছে?"

"এখানে অদ্ভুত কাণ্ড, চারদিন খেলার পর রেস্ট ডে। আমি ফোর্থ ডে খেলার পরই যাব। রোজা হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যেয়ো।"

"অদ্ভুত কেন! দু'দিন খেলার পর, এমনকী একদিন খেলার পরও তো রেস্ট ডে দেওয়া হয়েছে। দু'পক্ষ রাজি হলেই হল। তা হলে আমিও ওইদিন যাব।"

ভবানী ও রোজা সিঁড়ির দিকে এগোল। সরোজ তাদের পিছনে।

"পুলোভারটা পরে নিয়ে আসছি। সিগারেট কিনতে হবে।" শঙ্কর ঘর থেকে চেঁচাল।

"সরি আঙ্কল, পৌঁছে দিতে পারলাম না।" রোজা স্টার্ট দিয়ে স্কুটারে উঠে আন্তরিক স্বরে বলল।

"তাতে কী, এইটুকু তো। হাঁটা তো প্রায় ভুলেই গেছি।"

রোজার পিছনে ভবানী। ওর বসাটা সরোজের অনুমোদন পেল না। বড্ড বেশি এগিয়ে, দুই উরুর মধ্যে রোজাকে প্রায় ভরে ফেলেছে।

"সাবধানে যেয়ো।"

রোজা ঘাড় কাত করে স্কুটার ছেড়ে দিল। ভবানী হাত তুলে বিদায় জানাল। স্কুটার মোড় ঘোরার সময় সরোজ দেখল ভবানী দু'হাতে রোজার কোমর জড়িয়ে ধরল।

বিশ্রী লাগছে সরোজের। এত তাড়াতাড়ি এ-ভাবে যে ওরা ঘনিষ্ঠ হবে সেটা ধারণার বাইরে। তাকে অবাক করছে। শঙ্করের কাছে যা শুনল তাতে অবশ্য অশিক্ষিত ভবানীর পক্ষে মেয়েদের সঙ্গে এ হেন আচরণ স্বাভাবিকই। কিন্তু রোজার মতো মেয়ে কেন ওকে এত এগোতে দেবে! গদগদ হয়ে যাবার মতো কাজ কি ভবানী করেছে! ওর ব্যাটিংয়ে যেমন নার্ভ নেই, সবসময় কেতাব মতো খেলে না, মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। শোভনতা, সাবলীলতার পরোয়া নেই আর তাতেই বোধহয় ও সফল হয়। ওর অমার্জিত, বন্য, অবাস্তব কাজগুলো মেয়েদের বিশেষ করে গুণমুগ্ধা, বীরপূজারিণীদের অবরুদ্ধ ইচ্ছাগুলোকে উত্তেজিত করে দেয়। মনেরও অগোচরে সরোজ ঈর্ষান্বিত হল।

"চলুন, অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম।"

"চলো। যতটা পড়বে ভেবেছিলাম ততটা ঠান্ডা পড়েনি।"

"নাহ্।" কয়েক মিটার চলার পর শঙ্কর বলল, "দরজা খুলেই আমি ভেবেছিলাম আপনার মেয়ে বোধহয়। মুখের মধ্যে এত মিল!"

"আমিও প্রথম রোজাকে দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম।"

"খুব স্মার্ট। ওকে ভুবুর খুব ভাল লেগেছে।"

"তোমাকে বলল?"

"বলবে কী, দেখেই বুঝতে পেরেছি। আপনারা আসার আগে ও জিজ্ঞাসা করেছিল, সরোজদার কেউ হয়টয় না তো?"

"হলে কী হত?" সরোজ কৌতূহল চাপতে পারল না।

জবাব না দিয়ে শঙ্কর হাসিটা টিপে রাখল। সিগারেটের দোকান দেখে এগিয়ে গেল।

"কোথাও খেতে যাবে?"

"না সরোজদা না, বেলা করে খেয়েছি, রাতে কিছু খাব না।"

কনট প্লেসে এক নিরামিষ খাবারের জায়গায় সরোজ ত্রিশ টাকার থালি নিয়ে আহার সেরে, সংসদ মার্গ ধরে হেঁটে ফেরার সময় ভবানীর 'কেউ হয়টয় না তো' কথাটাকে মাথায় নাড়াচাড়া করল। যদি তার মেয়ে হত, ভবানী তা হলে অন্যরকম ব্যবহার করত। কিন্তু যে শিক্ষা, রুচি, বা যে কালচারের মধ্যে রোজা বেড়ে উঠেছে তাতে এইসব গায়ে হাত দেওয়া, সিগারেট টানার মতো ব্যাপারগুলো মেনে নেয় কী করে? বাহাদুরি দেখানো! কিংবা হয়তো ওরা এমন ভাবেই অভ্যস্ত হয়ে বেড়েছে যেটা তার অভিজ্ঞতার বাইরে। সরোজ রেগে উঠে হাত ঝাঁকাল, আমার মেয়ে হলে এ-রকম অন্তত হত না। বীণা এ-ভাবে কেন মানুষ করেছে? ও তো সাধারণই ছিল।

বীণাকে বহুক্ষণ পরে তার মনে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সে-ও যেন অনেকটা মেয়ের মতো এই রকমই ছিল আর সে নিজে ভবানীর মতো না হলেও তফাতটা শুধু একজন কয়েক মিনিটে যতটা এগিয়েছে, অন্যজনের সে-জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। সরোজ হেসে ফেলল। তারা দু'জন কি একই জাতের!

নিজের ঘরে ফিরেই সে রোজার চিরকুট থেকে নম্বরটা অপারেটরকে শুনিয়ে রিসিভার রেখে দিল। কী ভাবে কথা বলা যায়? গম্ভীর, আটপৌরে, সামাজিক, নাকি তরল, ফাজিল, পূর্ব সম্পর্কের সুতো ধরে টানাটানি?

ফোন বেজে উঠতেই রিসিভার কানে দিয়ে শুনল ওদিকে রিং হচ্ছে। সরোজ অপেক্ষায় রইল।

"মিসেস রাও?"

"স্পিকিং?"

"সরোজ।"

চার সেকেন্ড লাগল তার নামটি বীণার মগজে ঢুকতে।

"আহ্হ্, রোজা কালই তোমার ওখান থেকে ঘুরে এসেছে। খালি বলছে আঙ্কল কবে আসবে কবে আসবে। ভি এস ঘোষালকে আনতে পারবে তো..., ছেলেটি তো আরও নাম করল কানপুরেও সেঞ্চুরি করে। রোজার বন্ধুরাও ওর সঙ্গে মিট করার জন্য ফোন করছে। তা আনতে পারবে তো? কী গো, রোজা রিডিকিউলড হবে না তো? বড় মুখ করে ও আঙ্কলের কথা সবাইকে বলেছে।"

বীণার স্বরে ব্যাকুলতার মধ্যে মাখানো রয়েছে আবেদন, যেটা প্রায় ভিক্ষা চাওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে।

"রোজা কোথায়?"

"এখনও ফেরেনি।"

"এত রাত পর্যন্ত বাইরে? দিল্লির মতো জায়গা।"

"ওর বাবার আদর আর আশকারায় যা হয়েছে না, আমার কোনও কথাই শোনে না। বন্ধুর বাড়ি যাবে বলে স্কুটার নিয়ে তো বেরিয়েছে।"

নাটকীয় ভঙ্গি আনার জন্য সরোজ কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বলল, "সেই বন্ধুটি হচ্ছে ঘোষাল! আজই আলাপ করিয়ে দিয়েছি আর দু'জনের বন্ধুত্বও হয়ে গেছে।"

"যাঃ, সত্যি!"

"ও ফিরলেই জিজ্ঞাসা কোরো।... আমাকে তো বিশ্বাস করো না।" স্বরটা ভাবী করে হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এল এমন একটা ভাব শেষ বাক্যটিতে সে ঢেলে দিল।

"তুমি আমার এখানে কবে আসছ?" বীণার স্বর মৃদু হয়ে এসেছে।

"খেলার ফোর্থ ডে-র রাতে, স্টোরি পাঠিয়ে দিয়ে যাব। সেদিন শঙ্কর আর ভবানীও যাবে।"

"তার আগেই এসো, কাল?"

"বলতে পারছি না, তবে সময় যদি পাই যাব। বাড়ি তো চিনি না, রোজাকেই এসে নিয়ে যেতে হবে। ভালকথা, তোমার শালটা খুব কাজে দিয়েছে। ভাবছি ওটা নিয়েই নেব আর ফেরত দেব না।"

"কেন?"

সরোজ জবাব দেওয়ার আগেই বীণা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "ওই এসে গেছে রোজা। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব, কেমন?"

ফোন রাখার শব্দে অপ্রতিভ হয়ে সরোজ রিসিভারটা কিছুক্ষণ হাতেই রেখে অবশেষে বিরক্তিভরে ক্র্যাডলে শুইয়ে রাখল।

পরের দিন সরোজ দুপুরে এই উদ্দেশ্যে কোটলায় গেল যে, প্র্যাকটিস দেখার আর যদি খবর কিছু থাকে বিশেষ করে কাঞ্জিলাল কিছু যদি দিতে পারে!

ফিরোজ শাহ কোটলা ছোট মাঠ। পাঁচিল ঘেরার বাইরে সংলগ্ন খোলা জায়গায় নেট প্র্যাকটিস চলছে ভারতীয়দের। মাঠের মধ্যে ক্যাচ ধরার মহড়ায় ব্যস্ত নিউজিল্যান্ডাররা। উইলিংডন প্যাভিলিয়নের দিকের স্ক্রিনের পাশে প্রেস এলাকা। হুবহু কানপুরেরই মতো ব্যাপার। সেই জমি থেকে কয়েকটা ধাপ, তাতে একটি করে ছোট ফোল্ডিং টেবল ও চেয়ার, উভয়ই নড়বড়ে। জমিতেও কিছু টেবল-চেয়ার। মাথার উপর আচ্ছাদন নেই। পাশে এবং পিছনে ভি আই পি এবং অতিথিদের জন্য ভাড়া করা চেয়ার যাতে ধুলো, কাদা এবং শুকনো পক্ষী পুরীষ লেগে রয়েছে।

সরোজ মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল। মাঠ ভিজে, প্লেয়ারদের দৌড়ের সঙ্গে মাটি উঠছে। পিচ ঢাকা

দেওয়া পলিথিন চাদরে। যেহেতু আকাশ মেঘলা যে-কোনও সময় বৃষ্টি হতে পারে। অপর প্রান্তে স্ক্রিনের পিছনে আম্বেদকর স্টেডিয়ামে সুব্রত কাপ ফুটবলের খেলা চলছে। মাঝে মাঝে হই হই রব ভেসে আসছে। কিছু লোক কোটলা মাঠের স্ট্যান্ড থেকে ফুটবল মাঠের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। শ'খানেক ছেলে ছড়িয়ে রয়েছে প্যাভিলিয়নের কাছাকাছি।

বগলে প্যাড এবং হাতে ব্যাট নিয়ে ভবানী নেটে যাবার জন্য ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। কিছু ছেলে তার দিকে এগিয়ে গেল, অনেকের হাতে অটোগ্রাফ বই। সরোজ অবাক হল রোজাকে দেখে। ভবানীর আশে পাশে হাঁটছে। সেই বিবর্ণ জিন্‌স, হলুদ হাফ শার্ট, নীল কেডস। চুল পিঠে ছড়ানো। এতক্ষণ কোথায় ছিল রোজা? প্যাভিলিয়নে!

কাঁধে ব্যাগ, হাতে ক্যামেরা, রামকুমার আসছিল নেটের দিক থেকে। হাত নেড়ে সরোজ তাকে ডাকল।

"কোথায় উঠেছ?"

"চিত্তরঞ্জন পার্কে মাসিমার বাড়িতে।"

"একটা ছবি দরকার, এই যে মেয়েটা যাচ্ছে ওকে আর ভবানীকে একসঙ্গে।"

"দাঁড় করিয়ে পাশাপাশি নেব?"

"না,না, একদম ওদের জানতে দেবে না।"

রামকুমার দ্রুত দু'জনের পিছু নিল। রোজাকে এই সময় এখানে যে দেখতে পাবে, সরোজের তা চিন্তার বাইরে। হঠাৎ একটা বিমর্ষতা সরোজকে আচ্ছন্ন করল। রোজার তাকে আর দরকার নেই।

"হ্যালো দাদা, একা চুপচাপ যে, কবে এলেন?"

এখানকার হিন্দি কাগজের রিপোর্টার। সরোজ যথাযোগ্য জবাব দিল। দু'-চার কথার পর লোকটি চলে গেল। আর তার ভাল লাগছে না। বেবোবার জন্য গ্যালারির কয়েকটা ধাপ উঠতেই দেখল তরুণ নেমে আসছে।

"টিকিট একদমই বিক্রি হচ্ছিল না। যেই কানপুরে ইন্ডিয়া হারল অমনি হুড়হুড় করে সব শেষ। এখন টিকিট টিকিট হাহাকার। ...নেট দেখে এলেন নাকি? ...রামিন্দারকে বোধহয় থ্রি ডাউন নামাবে, শান্তমনকে নতুন বলে প্র্যাকটিস করিয়েছে।"

তরুণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে পা বাড়াল। সরোজও উত্তর দেবার চেষ্টা করল না। অফিসে গিয়ে একটা কিছু লিখে ফেলতে হবে। শান্তনম রঞ্জিতে কর্ণাটকের হয়ে কয়েকটা ম্যাচ ওপেন করেছে কিন্তু কাদের বলে? টেস্ট খেলাব টেনশন আব কেরল বা অন্ধ্রের সঙ্গে খেলার প্রেসার কি এক? সদ্য টেস্ট হেরে সারা টিমটাই এখন টেনশনে রয়েছে। সাউন্ড স্টার্ট দরকার, শান্তনমকে দিয়ে তা সম্ভব নয়, হয়তো ভবানী পারে।

ভবানীর উপর লেখাটা বেয়ারার কাছে রেখে এসেছে, টেলেক্স অপারেটর দুপুরে এলেই যেন হাতে দেয়। রমেন গুহঠাকুরতা যা যা চেয়েছিল তাই সে লিখেছে। ভবানীর সঙ্গে রোজার ছবি যদি লেখাটার সঙ্গে দেওয়া যায় তা হলে খোলতাই হবে। কিন্তু রামকুমারের ফিল্মরোল আজই কলকাতায় পাঠাবার উপায় নেই। এয়ার প্যাকেট ইতিমধ্যেই চলে গেছে। তা হলে লেখাটা ধরে রাখার জন্য গুহঠাকুরতাকে বলতে হয়। ভবানী বড় রান করলে এবং মনে হয় করবে কেননা ওর ব্যাটিংয়ের যা ধরন তাতে কোটলা পিচ সহায়কই হবে, তখন লেখা আর ছবি একসঙ্গে বার করলে লেখাটা খুলবে।

সরোজ অফিসে এসেই কলকাতায় গুহঠাকুরতাকে টেলেক্সে তার কথাগুলো জানিয়ে, লিখতে বসল।

"দাদা এই টেস্টে কী হবে মনে হয়, ইন্ডিয়া জিততে পারবে তো?"

দাশরথি নিজের টেবল থেকে উঠে এসে সরোজের সিগারেট প্যাকেট তুলে নিল।

"ব্যাটিং যদি ফেল না করে তা হলে হারব না। জেতার কথা বলতে পারছি না।"

"আমাদের ছেলেটাকে কেমন দেখলেন, ভবানী?"

"ভালই।"

"রামিন্দার সিংকে রাখাটা উচিত হয়নি, এতবার যে ফেল করেছে! নতুন নতুন ছেলেদের চান্স তো এখনই দেওগা উচিত!" দাশরথি প্রথম ধোঁয়া ছাড়ল।

"হোম গ্রাউন্ড তাই একটা সুযোগ দিল।"

সরোজ বিরক্ত বোধ করছে। দাশরথি বোধহয় বুঝতে পেরে নিজের টেবলে ফিরে গেল আর কথা না বাড়িয়ে।

লেখার মধ্যেই গুহঠাকুরতার বার্তা এল: ছবির জন্য সে লেখাটা ধরে রাখছে। লেখাটা ভাল হয়েছে, এইরকমই চাই।

নিজের ঘরে এসে সরোজ চা-টোস্ট খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বিছানায় টানটান হল। পড়ার মধ্যেই বারবার তার মনে উঁকি দিল একটা আশা, বীণা ফোন করবে কিংবা সোজা এসে তাকে নিয়ে যাবে তাদের বাড়িতে। কেন যে মনে হল বুঝতে পারল না।

ঘণ্টাখানেক পর তার ইচ্ছা করল বীণাকে ফোন করতে। রোজা যে আসবে না, এটা সে এখন ধরেই নিয়েছে। ভবানীর সঙ্গে হয়তো এখন হোটেল লবিতে বা অন্য কোথাও সে বসেছে কিংবা কোনও বন্ধুর বাড়িতে ওকে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছে তার ট্রফিটিকে। নিশ্চয় তাকে আর কোনও দরকার নেই! আর হয়তো দরকার হবে না। যা পাবাব তা তো পাওয়া হয়েই গেছে।

কিন্তু বীণাব? কাল ওর স্বরে কেমন যেন পুরনো দিনের রেশ ফুটে উঠেছিল। নাকি শুনতে তাব ভুল হয়েছে? এত বছব পর একদমই ভুলে যাওয়া সম্পর্কটা ফিরে পাওয়া কি সম্ভব। বীণা খেপে গিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়ে সেই যে চলে গেছল তারপর ওকে প্রথম দেখল রাজধানী এক্সপ্রেসে।

অদ্ভুতভাবে প্রায় ভোজবাজির মতোই বীণা কলকাতা থেকে উবে গেছল। প্রথমেই তার মনে হয়েছিল বোধহয় আত্মহত্যা করেছে। বীণা তখন চাকরি করছে, থাকত বহু দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে। সেখানে খোঁজ নিতে সাহস পায়নি সরোজ। যদি মর্মান্তিক কিছু শুনতে হয়? বীণার বাবা-মা, বোনেরা থাকত জামশেদপুরে। বাবা সেখানেই চাকরি করতেন, অবসব নেবার পর ওখানেই বাড়ি করেন। সরোজের সঙ্গে তাদের একবারই পরিচয় হয়েছিল যখন জামশেদপুবে খেলতে গেছল। সেখানে খোঁজ নেবার চেষ্টা সে করেনি।

বাকি ছিল অফিস। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের নিজস্ব দপ্তরে বীণা বসত, ফোন করেছিল কথা বলতে চেয়ে। সে শুনতে পাচ্ছিল অপারেটার মেয়েটি প্রশ্ন করছে, য়্যাঁ, বীণা সেনগুপ্তর কল বয়েছে... চাকবি ছেড়ে দিয়েছে, কবে? ...ও আচ্ছা। হ্যালো, উনি তো চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন, তিন সপ্তাহ হল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় গেছে? আমরা জানি না।

সরোজ আর কোথাও খোঁজ নেয়নি। সুজাতার বিয়ে হয়ে গেছল, স্বামীর সঙ্গে জার্মানি চলে যায়। সুবীর চাকরি নিয়ে নাগপুরে। বীণা প্রসঙ্গ তোলার মতো শুধু এরাই ছিল। এরপর মাস, বছর গড়িয়ে গেছে। 'আমি প্রেগনান্ট' বলে বীণা সেই যে উধাও হল আর কোনও খবর সে পায়নি। যে ভয়টা তার হৃৎপিণ্ডকে মুঠোয় নিয়ে কচলাচ্ছিল যতই সময় পেরিয়েছে সেই মুঠো ক্রমশ শিথিল হতে হতে এক সময় খুলে যায়। সরোজ ভুলে গেছল বীণার অস্তিত্বকেই। পরে তার মনে হত, বীণা মিথ্যা কথা বলে, চাপ তৈরি করে তাকে বিয়েতে বাধ্য করার জন্য প্রেগনান্ট হওয়াটা বানিয়েছিল। না হলে জীবনের এত বড় ব্যাপারটায় কোনও মেয়ে দু'-চারটে কড়া কথা বলে আর অভিশাপ দিয়েই এমন সহজে পুরুষটিকে ছেড়ে দিতে পারে না।

তার এই মনে হওয়াটাকেই সে এক সময় দৃঢ় বিশ্বাসে নিয়ে যায়। রাজধানী এক্সপ্রেসে বীণাকে দেখেই সে আঁতকে উঠেছিল যেমন, তেমনি একটা ঝড় তার মধ্যে বয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেয় এতকাল সে শেকল আঁটা ছিল এখন মুক্ত। বীণা বিয়ে করেছে, একটি মেয়ে রয়েছে—কৌতূহল তৈরি করবেই। কবে, কীভাবে, কার সঙ্গে বিয়ে, বীণার অতীত ওর স্বামী কতটা জানে—এমন সব প্রশ্ন গত কয়েকদিন মাঝে মাঝেই তার মনে উঁকি দিয়েছে।

উত্তর পেতে বীণাকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে। ভেবে রেখেছে, ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তেমন অবস্থা তৈরি হলেই জিজ্ঞাসা করবে।

সরোজ অপেক্ষাই করে গেল, ফোন বাজল না। একসময় তার মনে হল, বীণারও আর তাকে দরকার নেই।

আট

টস করে আনন্দ আর মার্কস মাঠ থেকে যখন ফিরে আসছে তখন সরোজ প্রেসবক্সে পৌঁছল। আই ই এন এস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে যখন ট্যাক্সি বা অটো রিকশা, যা পাওয়া যায়, খুঁজছিল তখন ওপারে একটা অটো থেকে হাত বাড়িয়ে 'দাদা আইয়ে' বলে ডেকে নিয়েছিল এলাহাবাদের হিন্দি কাগজের এক রিপোর্টার। নয়তো পৌঁছতে আরও দেরি হত। টেবলগুলোয় ছোট ছোট কাগজ পিন দিয়ে আঁটা, তাতে খবরের কাগজের নাম লেখা। সরোজের টেবল পড়েছে জমি থেকে তিন ধাপ উপরে এবং কিনারে। তার পাশেই লোহার জালের বেড়া। ওপাশে ভি আই পি আর অতিথিরা।'

মার্কস টস জিতেছে। আম্পায়ার বিহারের মোহন ঘোষ আর তামিলনাড়ুর ইব্রাহিম সৈত ক্রিজে পৌঁছবার আগেই আনন্দ তার লোকেদের নিয়ে মাঠে নামল। হালকা রোদ এবং হালকা মেঘ, বাতাস মৃদু। বল শুরু করল আনন্দ এবং প্রথম ওভার খেলল ম্যাকগ্রেগর। মেডেন ওভার। বল যতটা নিচু হওয়ার কথা তার থেকেও নিচু হয়ে এল। মাত্র একটি বল স্টাম্পে ছিল, বাকিগুলি এল রেগের গ্লাভসে। সরোজের মনে হল আনন্দ আক্রমণাত্মক হতে চায় না। কানপুরে হারের ধাক্কায় যেন খোলসে ঢুকে গেছে।

তবে মাত্র ছটি বল থেকে এত শীঘ্র ধাবণায় না আসাই উচিত। অন্তত পাঁচটি ওভার যাক, পেসারের সব ক'টি সিলিন্ডার ততক্ষণে চালু হয়ে যাবে। শর্মার প্রথম ওভারে তিনটি আলগা বল পড়ল তার একটিকে স্কোয়্যার কাট কবে বেকাব তিন রান পেল।

আনন্দের তৃতীয় ওভার শেযে স্কোবেবোর্ডে ১১ রান। ম্যাকগ্রেগর গুড লেংথের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পিচ দেখতে লাগল। বেকারও এগিয়ে এসেছে। দু'জনের মধ্যে কয়েকটা কথা হল। শর্মা তার ইনসুইং বাগে আনতে পাবছে না। রেগে দ্বিতীয় স্লিপের সামনে ঝাঁপিয়ে ল্যাটা বেকারের মিডল স্টাম্প থেকে সরে-আসা বলগুলো ধরল। ওভারের শেয বল স্ল্যাশ কবে সে চার রান পেল থার্ডম্যান বাউন্ডারিতে।

ছয ওভাব, আধ ঘণ্টা এবং ১৫ রান। সচরাচর পাঁচ দিনের ম্যাচের প্রথমদিনের মতোই খেলা প্রায় রুটিন ধরেই। আনন্দ প্রান্ত বদল করে নিজেকে প্যাভিলিয়নেব দিকে আনতে চেয়ে ভাণ্ডারকরকে সপ্তম ওভাবটা দিল। তাব তৃতীয বলে ম্যাকগ্রেগর ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলতেই ব্যাকোয়ার্ড শর্ট লেগ ঠুকরাল ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতের বলটা তুলে সে এবং আরও ছয়জন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠতেই সৈত ডান হাত তুলল।

ম্যাচেব সপ্তম ওভারে স্পিনার উইকেট পেল। সরোজ বুঝতেই পারেনি বলটা আদৌ ঘুরেছিল কি না। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতোই যেন উইকেটটা পেয়ে গেল ভাণ্ডারকর, এখন তো ওকে কয়েক ওভাব বাখতেই হয়। শর্মাকে সবিয়ে আনন্দ বল নিল। বেকার ও নবাগত ওকোনর চারটি সিঙ্গল নিল স্বচ্ছন্দে।

ভাণ্ডাবকরের দ্বিতীয় ওভারে প্রথম বলটিই ওকোনরের কপাল ছুঁয়ে শর্ট স্কোয়ার লেগের হাতে গেল। এ-ভাবে গুড লেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠায় প্রথমদিনে লাঞ্চের আগেই, ভারতীয়রাও অবাক হয়েছে মনে হল। রেগে কথা বলল, প্রথম স্লিপে রামিন্দারের সঙ্গে। ভাণ্ডারকর লোক চেয়েছে সিলি মিড-অনে। আনন্দ নিজে সেখানে দাঁড়াল। ওকোনর শান্ত চোখে ফিল্ড দেখে নিয়ে আক্রমণে নামল। তিনটি বাউন্ডারি নিল বাকি পাঁচ বল থেকে। ওর উদ্দেশ্য পরিষ্কাব—ভাণ্ডাবকর হঠাও। খেলা এতক্ষণে ঝাঁকুনি দিয়ে একটা গতি পেল।

হঠাৎ সরোজের দৃষ্টি ডান দিকে পড়ল। রোজা এবং বীণা চেয়ারের সারির মধ্যে ঢুকে এগোচ্ছে। রোজার হাতে কার্ড, নম্বর মিলিয়ে দেখে নিয়ে দু'জনে বসল।

নিশ্চয় কার্ড দুটো ভবানীরই দেওয়া। কয়েকদিন আগে যার শুধু একটা সই পাবার জন্য তাকে ধরাধরি করছিল এখন তারই অতিথি হয়ে টেস্টম্যাচ দেখছে। সরোজ ভাগ্য সম্পর্কে উদাস কোনও সিদ্ধান্তে অবশ্য পৌঁছল না। শুধু স্থির করল, ওদের থেকে দূরে থাকবে। কেন যে স্থির করল নিজেও তা জানে না।

ভাণ্ডারকর বদল হয়ে আবার শর্মা এসেছে। এবার বলের উপর সে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ রাখছে।

ভাণ্ডারকরকে সরিয়ে নেওয়াটা সরোজের মনঃপূত হল না। আনন্দ যে উইকেট পাওয়ার চেষ্টায় সাহসী হবে না এবার সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। নিশ্চয় ওর লক্ষ্য প্রথমদিনে আড়াইশো রানের মধ্যে নিউজিল্যান্ডকে বেঁধে রাখা।

বস্তুত ২৪৭ রান উঠল এবং দুই উইকেটে। বেকার উইকেটকিপারকে ক্যাচ দেয় লাঞ্চের পরই আনন্দের বলে। বলটা লাফিয়ে উঠে বেকারকে চমকে দিয়েছিল। ব্যাটের হাতল থেকে বলটা রেগের কাছে যায়। দুটো তারকা চিহ্ন দিয়ে সরোজ খাতায় লিখল: কিছু গোলমাল আছে পিচে। বৃষ্টির জল কি একদিকের গুড লেংথ স্পটে বসেছে? আন্ডার প্রিপেয়ার্ড?

ওকোনর ১০৯ আর মার্কস ৮০ রান নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে এল পরদিন আবার নামার জন্য। খেলা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সরোজ ডান দিকে তাকিয়েছিল। রোজার পরনে হালকা নীল শালোয়াব-কামিজ আর গাঢ় নীল ওড়না। চোখে পড়ার জন্য তাকে বেশিক্ষণ খুঁজতে হয় না। ট্রেনে যে সাজে দেখেছিল, বীণা সেই সাদা কার্ডিগান আর মেরুন সিল্কটাই পরেছে। বয়স অনেক কম দেখাচ্ছে, রোজার দিদি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। রোজা হাত তুলে নাড়তেই সরোজের সামনের দিকে চেয়ারে বসা শঙ্করও হাত নাড়ল। রোজা ইশারায় জানাল বাইরে অপেক্ষা করবে। শঙ্কর মাথা হেলিয়ে দিল। ঠিক এইভাবে লাঞ্চের সময়ও বাইরে যাবার আগে ওরা হাত নেড়েছিল।

ভিড়ের সঙ্গে চলতে চলতে বীণা কৌতূহল ভরে এদিকেই তাকাচ্ছে। হয়তো তাকেই খুঁজছে ভেবে সরোজ মাথাটা নামিয়ে নাকটা প্রায় টেবলে ঠেকিয়ে দিল, ওরা যেন না তাকে দেখতে পায়। সে আর ওদের মুখোমুখি হতে চায় না। তাকে যেমন ওরা ভুলে গেল, সে-ও তেমনি ওদের অগ্রাহ্য করবে।

তবে ফোর্থ ডে রাতে ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই যাবে। তাকে নিয়ে যাবার জন্য রোজা যদি স্কুটারে না আসে তা হলেই ভাল। পিছনে বসার কথা ভাবলেই ওর কোমর জড়িয়ে ধরা ভবানী চোখে ভেসে ওঠে।

ভিড় পাতলা হবার জন্য অপেক্ষা করে সরোজ মাঠ থেকে বেরোল। বাহাদুর শাহ জাফর মার্গের দিকে যাবার জন্য বাঁ দিকের রাস্তা ধরে যেতে যেতে বড় মাঠটায় রাখা শ'খানেক মোটরের মধ্যে সরোজ নীল কামিজ আর মেরুন শাড়ি দূর থেকে চিনতে পারল। একটা কালো অ্যাম্বাসাডরে শঙ্কর, রোজা আর বীণা উঠছে। আজ দু'বার শঙ্করের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে, হেসেছে দু'জনে কিন্তু শঙ্কব আগের মতো দাঁড়িয়ে গিয়ে কথা বলেনি।

সরোজ তার রিপোর্টে গুরুত্ব দিল পিচের কয়েকবার অস্বাভাবিক আচরণকে। লেখাটা টেলেক্স অপারেটরের হাতে দিয়ে সে নিজের ঘরে এল। গতকালের মতো আজও সে অপেক্ষা করল ফোন বেজে ওঠার। গতকালের মতোই ক্যান্টিন থেকে আনিয়ে রাখা খাবার খেয়ে সে শুয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের আগের ওভারে আউট হল ওকোনর। আজ সে পঞ্চাশ রান যোগ করেছে। মার্কস আজও নট আউট থাকল ২০২ রানে। দিনশেষে নিউজল্যান্ড পাঁচ উইকেটে ৫১১। দু'দিনে ছ'শোর কাছে পৌঁছনোর মতো অবস্থা ছিল। ঝুঁকি নিতে চায়নি। কাল সকাল থেকে অবশ্যই পিটিয়ে যাবে। বোলারদের কারুর যে ভেদক্ষমতা নেই সেটাই এবং তার সঙ্গে আনন্দের কল্পনাবহিত অধিনায়কত্ব, দুটোই আবার ঘোষিত হল। ম্যাচটা যে ভারতের হাতে আর নেই, চায়ের পর থেকেই তা স্পষ্ট হতে শুরু করে। ভি আই পি বা অতিথিদের অনেকেই চা খেয়ে আর ফিরে আসেনি, অবশ্য বীণা ও রোজা ফিরে এসেছে।

গতদিনেরই পুনরাবৃত্তি। রোজা হাত নেড়েছে, মেরুনের বদলে বীণার সবুজ সিল্ক, চুল ফোলানো, সাদা কার্ডিগানটাই রয়েছে। ওরা বেরিয়ে যাবার মিনিট পাঁচেক পর সরোজ বেরিয়ে আর ওদের দেখতে পায়নি। রাতে সে অপেক্ষা করল ফোনের জন্য। একসময় রিসেপশনে ফোন করে জিজ্ঞাসাও করল বাইরে থেকে তার জন্য কোনও কল এসেছে কি না। একটা ফোন করতে কতটা পরিশ্রম হয়? সেটুকুও বীণা করতে চায় না। সরোজ অনেক রকম যুক্তি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তৈরি করল। তার মধ্যে—বীণার তো উচিতই নয় তার মুখদর্শনের! এবং তারই বা এত কাঙালেপনা কেন বীণার সান্নিধ্যের জন্য? এই দুটির সদুত্তর সে খুঁজে পায়নি।

তৃতীয় দিনে প্রত্যাশা মতোই নিউজিল্যান্ড দ্রুত রান তোলায় মন দিল। মার্কস একঘণ্টায় ৪৫ জুড়ল, বয়েড নিল ৩০। ভাণ্ডারকর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠের বাইরে যেতেই প্রেসবক্সে হাসি-ঠাট্টার দমকা

লাগল। মার্কস ২৫১ এবং বয়েড ৪১ করে যথাক্রমে লং অন ও স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরে আসার পর সাত উইকেটে ঠিক ৬০০ রানে মার্কস ইনিংস ছেড়ে দিল। নট আউট রইল গ্রে পাঁচ রানে। আনন্দ পেয়েছে চার উইকেট ১৩২ রান দিয়ে।

আলভার সঙ্গে কে নামবে? উন্নির সাহায্যকারী ছেলেটি খবর আনল আর এক ওপেনার শর্মা। সরোজ আজ বীণাকে দেখতে পেল না। তার বদলে রোজারই বয়সি একই রকমের পোশাক, জিন্স্ আর টি শার্টের উপর জিপ খোলা জ্যাকেট পরা একটি মেয়েকে বীণার চেয়ারে বসা দেখল। ইনিংস শুরুর আগে শঙ্কর আর রোজা ফেন্সিংয়ের কাছে এসে কথা বলল। রোজা তাকে চকোলেট দিল। কথা বলতে বলতে রোজা উপরের দিকে তাকিয়ে সরোজকে দেখতে পেয়ে ডান হাত তুলে নাড়ল। হেসে মাথাটা কাত করল সরোজ। রোজা তখন কী যেন বলল শঙ্করকে।

মন্থর কিন্তু নিশ্চিতভাবে আলভা ও শর্মা চা পর্যন্ত একসঙ্গে রইল, ভারতের রান ৯৮। দিনের শেষ ওভারে ওয়ালেসের বলে আলভাকে সিলি পয়েন্টে ধরে নিল মার্কস। প্রায় আড়াইশো মিনিটে এই প্রথম আলভার মনে অন্য কোনও ভাবনা মাথা গলিয়ে তাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল। নাইট ওয়াচম্যান নামল পাবিখ এবং বাকি বলগুলো আটকাল। শর্মার ৭০ রান, আলভাও আউট হয়েছে ওই রানেই। প্রথম ইনিংসে ভারত ১৪৪ এক উইকেটে। বাকি রইল দুটো দিন। আরও আড়াইশো রান দরকার ফলো-অন বাঁচাতে।

অভয়ঙ্কর তর্কের সুরে কৃষ্ণমূর্তিকে বোঝাচ্ছে, মার্কস দ্বিতীয় দিনেই রান তোলার গতি বাড়িয়ে যদি ইনিংসটা সাড়ে পাঁচশো রানে ছেড়ে দিত। তৃতীয় দিনে ব্যাট করে সময় যদি নষ্ট না করত তা হলে ম্যাচটা ড্র হত না।

"ড্র হয়ে গেছে! এখনও তো দু'দিন খেলা রয়েছে।"

"তুমি কি ভেবেছ নিউজিল্যান্ড এই অ্যাটাক নিয়ে ইন্ডিয়ার উনিশটা উইকেট দু'দিনে ফেলে দেবে? মাথা খারাপ।"

সরোজ দেখল রোজা ও তার বান্ধবীকে বেরিয়ে যেতে। সে ভিড়ের মধ্য দিয়ে খুঁটির বেড়া দেওয়া সরু পথ ধরে গেটের বাইরে আসতেই কোটটা হাতে ঝোলানো, টাই-পরা এক সুদর্শন পুরুষ হেসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

"বীণার কাছে আমার নাম শুনে থাকবেন, জ্যোতিষ।"

সরোজ স্বভাবতই বিস্মিত হল। বয়েস চল্লিশ সদ্য ছাড়ানো, গৌরবর্ণ, গালে গলায় এবং কোমরে চর্বি জমতে শুরু করেছে। সাবধান না হলে ভুঁড়ি হবে। কোঁকড়া এলোমেলো চুল। খুব কাজ আর ব্যস্ততার মধ্যে আছে এমন একটা ভাব অবয়বে।

"হ্যাঁ শুনেছি। এই সেদিন ট্রেনে অদ্ভুতভাবে ওর সঙ্গে দেখা হল অনেক বছর পর।"

"অফিস যাবেন তো, চলুন গাড়ি আছে। আমিও অফিস যাব।"

সরোজ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"আমার অফিস রেল ভবন, আপনার কাছেই।"

জ্যোতিষের ফিয়াট ভিড়ের মধ্য দিয়ে বার করতে সময় লাগল। চালানোটা একটু সহজ হতেই জ্যোতিষ বলল, "আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি, রামিন্দারের সঙ্গে ওর বউয়ের যে ব্যাপারটা চলছিল সেটা মিটে গেছে। মহিলা ফিরে এসেছেন। এখন রামিন্দারের বোনের বাড়িতে।"

"জানলেন কী করে?"

"আমার বউ পাঞ্জাবি। রামিন্দারের বোনের সঙ্গে স্কুল থেকে আলাপ। কাল সন্ধেবেলায় রামিন্দার হোটেলে খবর পেয়ে বোনের কাছে ছুটে এসেছিল। শুনলাম খুব আবেগ-টাবেগের স্রোত বয়ে গেছল, কান্নাকাটিও হয়েছে, যা হয় আর কী।"

"ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং তো! শুনেছি রামিন্দারের লাইফের উপরও অ্যাটেম্পট হয়েছে?"

"ঠিকই শুনেছেন। ভয়ও পেয়েছিল, পাবার মতোই ব্যাপারটা। এখন ওর বউ কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়ল। স্বামীকে ছেড়ে যার কাছে চলে গেছল সে তো এবার ছাড়বে না... লোকটা অতি খারাপ, মাফিয়া টাইপের, খুন-টুন অনেক নাকি করিয়েছে। অত্যন্ত ভিন্ডিক্টিভ। ...পালিয়ে ননদের বাড়িতে এসে উঠেছে, কেউ জানে না।"

সরোজ উত্তেজনা বোধ করল, কেউ জানে না এমন একটা ব্যাপার জেনে ফেলার জন্যই হয়তো জ্যোতিষ 'একটু চা খেয়ে নিলে হত না' প্রস্তাবটা দিতেই সে সাগ্রহে রাজি হয়ে গেল।

কনট প্লেসে ছোট ঝকঝকে রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে সরোজ বলল, "ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস, দু'জনেরই জীবন বিপদের মধ্যে, মাথার উপব খাঁড়া ঝুলছে... আপনি ব্যাপারটা বলে কি ভাল কবলেন?"

"কেন?" জ্যোতিষ সচকিত হয়ে উঠল।

"লোক জানাজানি হওয়া কি উচিত?"

"ওহ্।" জ্যোতিষ যেন নিশ্চিন্ত হল, "আপনাকেই শুধু বলেছি আর কাউকে বলবও না।"

"শুধু আমাকেই বললেন, কেন?"

জ্যোতিষের মুখে হালকা হাসির ছায়া ভেসে এল। কাপে চুমুক দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

"দুটো কারণে। কানপুরে রামিন্দার যে কাণ্ডটা করেছে তা কাগজে পড়েছি। তারপরও আপনি ওর সম্পর্কে যা লিখেছেন তা-ও পড়েছি। আমার মনে হয়েছে ওর উপর আপনার অগাধ আস্থা, আপনি ওর ভাল চান। আমি কি ঠিক?"

সবোজ মাথা নোয়াল।

"আপনার দ্বাবা ওর ক্ষতি হবে না এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। অনেকেই ওর এই খারাপ খেলার পিছনেব কাবণ নিয়ে লিখেছে, তাতে ওর লজ্জা আর যন্ত্রণা আবও বেড়েছে। লেখাপড়া প্রায় কবেইনি, একদিক দিয়ে বোকাই। লাইফ রিস্ক করে ওর বউয়ের ফিরে আসার ঘটনাটা রামিন্দাবকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে মনে হচ্ছে। আমার বউ তখন ওখানে ছিল যখন রামিন্দার আসে। ওর কাছ থেকেই শুনলাম একসময় হঠাৎই কেমন ধীর শান্ত হয়ে শুধু বাইবের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। বার কয়েক শুধু বিড়বিড় কবেছে, ব্যস। আপনি ওকে চিনেছেন, এই ব্যাপারটা লিখবেন কি লিখবেন না সেটা আপনিই ঠিক কববেন।"

"বেশ। আর একটা কারণ?"

"বহু বছর আগেব কথা।" জ্যোতিষ সিগাবেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। সরু ধোঁয়া উঠছে, কাপেব তলানিটা ঢেলে ধোঁয়া বন্ধ কবল। "ব্যাপারটা আপনি জানেন। রেস্টুরেন্টে মেয়েদের সঙ্গে বসে, এক অল্পবয়সি ছোকরা ক্লাসের একটি মেয়েকে ইমপ্রেস কবতে লম্বা লম্বা কথা বলছিল, যে-সব কথার থ্রি ফোর্থই মিথ্যে, মনে আছে?"

"আছে।"

"আপনাব চলে যাওয়াটা সেদিন ওই মুহূর্তে আমাকে যে কী লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, ...অপমানিত হয়েছি পরে, নিজের কাছে, যখন আমাকে একটি ছেলে গোটা ব্যাপারটা বলল। আমি ট্রান্সফার নিয়ে বিদ্যাসাগরে চলে আসি। মিথ্যা কথা বলে আমি বোকামি করেছি ঠিকই কিন্তু আপনার সই এনে বীণা ক্লাসের কয়েকজনকে দেখিয়ে বলেছিল—সরোজ বিশ্বাসের গ্লাভস বইবার যোগ্যতাও যার নেই সে আবাব প্রেম করতে চায়, এই দেখ সরোজ বিশ্বাস কী লিখেছে। আমাকে তারপর... আপনাকে রেস্টুরেন্টে এনে... আমি কৃতজ্ঞ আপনি ওখানে আর বসে থাকেননি।"

সরোজ দেখল কথা বলতে বলতে জ্যোতিষের ফরসা মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে। কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথা, কিন্তু ভোলেনি। হৃদয়ে একটা জায়গা আছে যেখানে কিছু বিঁধলে সারাজীবনেও উপড়ে ফেলা যায় না।

"আমার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, খুবই।"

"জানি। অনেকেই জানত।"

"বিয়ে হল কীভাবে জানেন কি?"

"না। এখানে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টিতে। মিস্টার রাও অদ্ভুত একটা অত্যন্ত ভাল, প্রগ্রেসিভ, কালচার্ড মানুষ। এখন বয়স পঁয়ষট্টির মতো। হাজার বারো মাসে পান। কলকাতায় বীণা ওর পি. এ. ছিল। তখনই গোপনে বিয়ে আর মিস্টার রাও কিছু পরেই চাকরি ছেড়ে মাদ্রাজে একটা কোম্পানিতে জয়েন করেন তারপর দিল্লিতে।"

"ওদের মধ্যে সম্পর্কটা তা হলে বিয়ের অনেক আগে থেকেই ছিল।" সরোজ নিশ্বাস চেপে রইল উত্তর শোনার জন্য।

"বলতে পারব না। তবে ওদের অফিসের একজনের সঙ্গে পরে আলাপ হয়, কথায় কথায় বলেছিল বিয়ের আগে দু'জন প্রায়ই মোটরে বেড়াত, এখানে ওখানে খেতেও দেখা গেছে। আমি আর বেশি জিজ্ঞাসা করিনি। চলুন এবার যাওয়া যাক। দেখা হয়ে ভালই হল।"

সরোজ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ার থেকে উঠল। মোটরে বেড়াতে বা এখানে ওখানে খেতে দেখা গেছে তখন যখন তার সঙ্গে ব্যাপারটা চলছে। অপমানের একটা সূক্ষ্ম জ্বালা তাকে রাগিয়ে তুলল। বীণা তাকে বিশ্বাস করেনি। খেলো, পলকা, ভরসার অযোগ্য হিসাবেই ধরে নিয়েছিল, এদিকে তলায় তলায় খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল শক্ত অবলম্বনের।

কিন্তু ওকে কি দোষ দেওয়া যায়? যখন বলল বিয়ে করো তখন কি সে বিয়ে করেছে বা করবে বলে কি কথাও দিয়েছে? বীণা কোনও ভুল করেনি।

"জানেন কি কাল বীণাদের বাড়িতে ভবানী ঘোষাল আসবে?"

"তাই নাকি।" সরোজ অন্যমনস্কের মতো বলল।

"হ্যাঁ, আজ সকালেই আমাকে ফোন করেছিল, যেতে বলল। ঘোষালের সঙ্গে যে ওদের এত আলাপ আছে আগে কিন্তু কখনও বলেনি।"

"এখানেই রাখুন। বাকিটুকু হেঁটে যাব।"

লিফটে ওঠার আগে সরোজ রিসেপশনিস্টকে বলল, 'খুব ব্যস্ত থাকব, কোনও ফোন এলে আমার ঘরে দেবেন না?"

ঘরে এসে তার মনে হল, মিছিমিছিই বললাম কোনও ফোনই আসবে না।

এখনও ২৫৬ রান দরকার ফলো অন থেকে রেহাই পেতে। চতুর্থ দিনে প্রথম ওভারেই স্যান্ডারসনের প্রথম বলটিকে শর্মা গালি দিয়ে পাঠাল। একটা রান সহজে নেওয়া যায় এবং নিল। কিন্তু পারিখকে বোলিংয়ের সামনে দাঁড় না করাবার জন্য নিতে গেল দ্বিতীয় রানও। পৌঁছবার আগেই থার্ডম্যান পিকার্ডের নিখুঁত থ্রো গ্রে-র গ্লাভসে পৌঁছে গেছে। নিজের মূর্খামির জন্য শর্মা আফসোসে মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে এল।

ভবানী নামছে। শঙ্করের কথাটা সরোজের মনে পড়ল, ঠিক যেন গ্যারি সোবার্স। হাততালি এবং স্বাগত কলরব অন্যদের থেকে বেশিই সে পাচ্ছে। রোজা এবং সরোজ দেখল, নতুন একটি মেয়ে, দাঁড়িয়ে মাথার উপর হাত তুলে তালি দিচ্ছে আর চিৎকার করে যাচ্ছে।

আজকের প্রথম ওভারের পাঁচ বল এখনও বাকি। ভবানী গার্ড নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে সাজানো ফিল্ডের উপর দিয়ে চোখ বোলাল। সিলি মিড অনে লোক এনেছে মার্কস, সিলি পয়েন্টে নিজে। অবহেলায় ফরোয়ার্ড খেলল সে দুটো বল। বাঁ পা সামান্য এগোল, অল্প ঝোঁকানো মাথা। প্রচণ্ড আস্থা বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওর অলস নড়াচড়ার মধ্যে। গড়িয়ে বল দুটো ফিরে গেছে স্যান্ডার্সনের কাছে। সরোজ গভীর মনোযোগে দেখতে দেখতে তারিফ জানিয়ে মাথা নাড়ল, তৃতীয়টি বাউন্সার। মুখ সরিয়ে কোমরের উপর থেকে শরীরটা পিছনে হেলিয়ে দিল। বলটা কপাল ঘেঁষে চলে গেল। ভবানী তাকিয়ে রইল বোলারের দিকে। চতুর্থটি অল্প ওভারপিচ। শেষ মুহূর্তে বলটা সুইং করল, জমিতে পড়ে সরে এল ভিতরে। ভবানী ড্রাইভ করবার জন্য পা বাড়িয়েছে, লিফট করা ব্যাটটা নামছে। বলের শেষ মুহূর্তের সরে আসাটা লক্ষ করেই ব্যাটটাকে থমকিয়ে সে বলটা কভার পয়েন্টের মাথার উপর দিয়ে তুলে ফেলে দিল। পারেখ রান নিতে চেয়েছিল ভবানী ফিরিয়ে দেয়।

ক্যাচ উঠেছিল ভেবে স্বস্তির গুঞ্জন উঠল। সরোজের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অনায়াস ব্যাপারটায়। ওভারের শেষ বল। ভবানী দৌড়ের ভঙ্গি দেখিয়ে পারেখকে তৈরি থাকতে বলল। সে যে এক রান নেবে ঔদ্ধত্যভরে তা ফিল্ডারদের জানিয়ে রেখেই স্টান্স নিল।

অফ স্পিন করিয়ে স্যান্ডার্সন বলটা তুলে দিল। ভবানী ক্রিজ থেকে ঝটিতি বেরিয়ে এসে বলটাকে ধীরে ফাঁকা মিড অফে ঠেলে দিয়ে রান নেবার জন্য দৌড়তে গিয়েই হড়কে পড়ল। স্যান্ডার্সনই দৌড়েছিল বলটা ফিরিয়ে আনতে। যখন বলটা সে তুলেছে ভবানীও তখন জমি থেকে কইমাছের মতো

ছিটকে লাফিয়ে উঠে বোলার প্রান্তের দিকে দৌড় শুরু করেছে। স্যান্ডার্সন প্রায় পনেরো মিটার থেকে বলটা ছুড়ে যখন স্টাম্পে মারল ভবানী তখন ঝাঁপ দিয়েছে। চিৎকার করে চারজন ফিল্ডার হাত তুলে ছুটে গেল মোহন ঘোষের দিকে।

আঙুল উঠল।

নিউজিল্যান্ডাররা রণনৃত্য শুরু করেছে স্যান্ডার্সনকে ঘিরে। মাঠ ঘিরে বিস্ময়ের স্তব্ধতা। ভবানী বুটের তলায় ব্যাটটা ঠুকে মুখে হাসি রেখে শূন্য করে ফিরে আসছে। প্রথম ওভারেই দুটো রান আউট। দুটো ভাল উইকেট ভারত হারাল। রামিন্দরের প্রবেশ সংবর্ধিত হল ক্ষীণ কয়েকটি করতালিতে। সরোজ দেখল রোজা দু'হাতে মুখ ঢেকে কুঁজো হয়ে।

কী একটা ভয় ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যে ভর করল, যার ফলে তারা এলোপাথাড়ি ব্যাট চালাতে শুরু করল। পারিখ শূন্যতেই ফিরে গেল। ঠুকরাল আর শান্তনম দ্বি-অঙ্কে পৌঁছল না। আনন্দ দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। ওয়ালেসের একটা আর্মার তার প্রতিরোধ ভেঙে দেয়। সে এগারো করেছে। ১৪৪ থেকে ১৮৪, আজ চল্লিশ রান ওঠার মধ্যে ছয়জন আউট। রামিন্দার অচঞ্চলভাবে ১৮ রান নিয়ে লাঞ্চে এল। রেগে দোসর রয়েছে এক রানে। এগারোটা মেডেন নিয়েছে ওয়ালেস, সঙ্গে তিনটি উইকেট।

সরোজ লাঞ্চের সময় তরুণের মুখোমুখি হতেই সে বিষণ্ণ স্বরে বলল, "দাদা এটা কী হল? শুকনো মাঠে আছাড়! ভুবুর কপালে লেখা টেস্ট রেকর্ড ওর বাঁধা, আমি শঙ্কুর সঙ্গে বাজি ধরেছি দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরির। তিন টেস্টে চারটে হত তা হলে।"

"রেকর্ডের জন্য আর একটা ইনিংস তো ওর হাতে রয়েছে। প্রথম তিন টেস্টে তিনটি সেঞ্চুরি আর কারুর নেই তো?"

"কারুর নেই, কারুর নেই।"

অভয়ঙ্করকে সামান্য ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কথা না বলে চোখ দিয়ে আকাশ দেখিয়ে ঠোঁট ওলটাল। রোজা চেয়ারে নেই।

লাঞ্চের পরই মার্কস বহু আগে প্রাপ্য দ্বিতীয় নতুন বল নিল, সঙ্গে সঙ্গে রামিন্দারের অন্য মূর্তি। তার শান্ত নিষ্কম্প শীতল ব্যাট থেকে এবার হলকা বেরোচ্ছে। মহাদেবের তাণ্ডব নাচ যেন বাইশ গজের স্টেজে শুরু করল। কাট, ড্রাইভ আর হুকে সে নিউজিল্যান্ড বোলিং ছিন্নভিন্ন করার কাজে মেতে উঠল। ৪০ মিনিটে পৌঁছল পঁচাত্তরে, রেগে এক থেকে দুইয়ে। অপ্রত্যাশিত সহায়তা দিয়ে ছোট্ট চেহারার এই মারাঠি উইকেটকিপার একটা প্রান্ত ধরে রেখেছে। সাতটা বল পরেই রামিন্দার নব্বুইয়ে। প্রতিটি মার নিখুঁত, ব্যাটের কানা দিয়ে একটি রানও সে সংগ্রহ করেনি, পরিচ্ছন্ন হিসেবি ফুটওয়ার্ক, সময় বিচারে নির্ভুল। রামিন্দারের মন, মস্তিষ্ক আর শরীর, এক তালে এক ছন্দে মিলে কাজ করছে।

রামিন্দার সাতানব্বুইয়ে, তখনই বয়েডের বল গুডলেংথ থেকে খাড়াই দাঁড়িয়ে উঠল। ড্রাইভ করার জন্য তখন সে বাঁ পা বাড়াতে যাচ্ছে। বলটাকে উঠতে দেখেই পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারেনি। বাঁ চোখের পাশে হনুর হাড়ে বলটা যখন লাগল মাঠের সর্বত্র 'খট' শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। পিছোতে গিয়ে ডান পায়ের বুট স্টাম্পে লেগেছিল। প্রায় একই সঙ্গে বেল ও রামিন্দার জমির উপর পড়ল।

নয়

রাত্রে ভাল ঘুম হল-না। ছটফট করেছে অস্বস্তিতে, চটচটে ঘামে বিছানা ভিজেছে। একবার ঘুম ভেঙে গেছল ঘরে আগুন লেগেছে স্বপ্ন দেখে। বিছানায় উঠে বসে হিটারের গাঢ় কমলা রঙের কয়েলগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার শুয়ে পড়ে। রামিন্দারের জ্ঞান হারানো দেহটা বহন করে আনার দৃশ্যটা তখন সরোজকে তাড়া করেছিল।

ভারতের ইনিংস শেষ হয়েছে ৩০৪ রানে। শেষ দুটি উইকেট নিতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিউজিল্যান্ডারদের। প্রায় তিনশো রানে পিছিয়ে ফলো-অন করে আলভা ও শর্মা ম্যাচে

দ্বিতীয়বার চমৎকারভাবে ইনিংস পত্তন করেছে। দেড়ঘণ্টায় ৫৫ রান তুলেছে দু'জনে। তাদের ব্যাটিং থেকেই বোঝা যাচ্ছিল ব্যস্ততা, দ্বিধা বা ভয় থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। পঞ্চম দিনটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হবে না সবক'টি উইকেটই যখন অটুট রয়েছে।

রমেন গুহঠাকুরতা বার্তায় জানিয়েছে, ছবিগুলো রামকুমার ভাল তুলেছে। ভবানী সম্পর্কে লেখাটা ও সঙ্গে ছবি দেওয়ার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে লেখাটায় সে আর কিছু যদি সংযোজন দরকার মনে করে তো করতে পারে।

সরোজ জবাব দেয়নি। লেখা শেষ করে ঘরে এসেছে। বীণার বাড়িতে এখন নিশ্চয় ভবানী আর শঙ্কর মিলে হইচই শুরু করেছে। রোজার বন্ধুরা, বীণার প্রতিবেশীরা জানতে পারছে এখন দেশের সবথেকে পরিচিত যুবকটি কোথায়। এতে হয়তো রাওদের খাতির বাড়বে।

বেয়ারাকে দিয়ে তন্দুরি মুরগি নান আর বিয়ার আনিয়ে সরোজ একাই পার্টি দিল নিজেকে। খাওয়ার মাঝে ফোন এল। ওধারে শঙ্কর।

"সরোজদা কচ্ছেন কী ঘরে বসে, লিখে যাচ্ছেন নাকি এখনও? চলে আসুন চলে আসুন, দারুণ গ্যাদারিং, রোজা, মিসেস রাও আপনার কথা বারবার বলছে। আসলে দোষটা আমারই, আপনাকে নিয়ে আসার কথা ছিল আমারই আর আমি একদমই ভুলে গেছি।"

সরোজ শুনতে শুনতে দ্রুত ভেবে যাচ্ছিল কী বলবে।

"আসছেন তো, প্লিজ আসুন, নইলে এরা আমায় ক্ষমা করবে না।"

"মিসেস রাওকে বরং ডেকে দাও।"

"দিচ্ছি।"

কয়েক সেকেন্ড পরে বীণার গলা ভেসে এল।

"কী ব্যাপার, আসছ?"

"বীণা একদমই ভুলে গেছি বলতে, আজ একজনের বাড়িতে যাওয়ার কথা, নিয়ে যাবার জন্য ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আজ মাপ করে দাও।"

"তা হলে আসছ না?"

"না। এখানে অনেকদিন আগেই যাব বলে রেখেছি। শঙ্কু বলল দারুণ জমায়েত, রোজা কী করছে?"

"ও খুব মরোজড, ভবানী যে-ভাবে আউট হল!"

"আরে ক্রিকেটে এ-সব ঘটেই...আচ্ছা পরে কথা হবে'খন... গুড নাইট।"

ফোন রেখে সরোজ গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে খাওয়া শেষ করেই শুয়ে পড়ে। সে এটাকে তার খাঁটি রাগ না অভিমান, কীসের প্রকাশ হিসাবে গণ্য করবে তা ঠিক করতে পারেনি। নিশ্চিন্ত গাঢ় হয়নি তার ঘুম।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা দমকলের ঘণ্টার শব্দ তার মাথার মধ্যে বেজে যাচ্ছিল। তাইতে ঘুম ভেঙে যায়। শব্দটা কিন্তু থামল না, মাঝে মাঝেই বেজে যেতে থাকে। চেতনা থেকে ঘুমের রেশ কেটে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। শব্দটা ফোন বাজার।

"হ্যালো।"

"সরোজ? রোজা কোথায়?" বীণার স্বরে আর্তনাদ।

"মানে?" সরোজ অবাক বীণার গলা শুনে এবং প্রশ্নটিতে।

"কাল রাতে ভবানী আর শঙ্করের সঙ্গে বেরোল, শেরাটনে ভবানীকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার কথা কিন্তু এখনও ফেরেনি।" কান্নাচাপা উদ্বিগ্ন স্বরে বীণা বলল।

সরোজ টেবলে রাখা ঘড়িটা তুলে সময় দেখল সাতটা-পঁয়ত্রিশ।

"জানো কোথায় ওরা?"

"আমি কী করে জানব।" সরোজের গলায় ঝাঁঝ এসে গেল, "শেরাটনে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল প্রথমেই, তারপর পুলিশে।"

"শেরাটনের রিসেপশনিস্ট খবর নিয়ে বলল ভবানী কাল হোটেলেই ফেরেনি। ওরা কি কাল রাতে অন্য কোথাও...", বীণার গলা থেকে এরপর ফোঁপানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল।

"শঙ্কর কোথায় রয়েছে বলতে পারো?"

"পারি।"

"আমাকে ঠিকানাটা দেবে?"

"ঠিকানা জানি না তবে জায়গাটা চিনি।"

"তা হলে আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি, আমাকে একটু জায়গাটা চিনিয়ে দিয়ো।"

বীণা ফোন রাখল। হতভম্ব বোধটা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরোজ বেরোবার জন্য তৈরি হতে লাগল। ব্যাপারটার গুরুত্ব এবং আকস্মিকতা তার চিন্তাক্ষমতাকে ঘেঁটে দিয়েছে। গুছিয়ে ভাবাব মতো অবস্থা ফিরে পেতে পেতেই দরজায় খটখট শব্দ হল।

"ভেতরে এসো।" দরজার পাল্লাটা সরোজ মেলে ধরে রইল। বীণা ভিতরে এল। সবোজ প্যান্ট্রিব দিকে তাকিয়ে একটি লোককে দেখে ইশাবায় চা পাঠাতে বলল।

"বোসো, চা খাও।"

"না না না, তুমি আগে নিয়ে চলো।"

সরোজ খাটে বসে পায়ের উপর পা তুলল।

"চা না খেয়ে সকালে নড়তে পারি না।" সরোজ পা দোলাতে শুরু করল। বীণা কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। তবে বাগ চাপার লক্ষণ মুখে ফুটে উঠল।

"ওদেব সঙ্গে বোজাব আলাপ যদি না করিয়ে দিতে তা হলে এটা ঘটত না।"

"তোমরা, মা-মেয়ে তো পাগল হয়ে উঠেছিলে ভবানীকে বাড়িতে আনার জন্য।"

"পাগল কেন হব।" বীণা ভ্রূ কুঁচকে বলল।

"আমি তোমাব বাড়ি চিনি না, কথা ছিল কেউ এসে আমাকে নিয়ে যাবে। যদি কাল নিয়ে যেতে তা হলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হত না।"

"শঙ্কর নিজে থেকেই বলেছিল ও তোমাকে নিয়ে যাবে।"

"আমাকে তুমি ফোন কবে এটাও যদি জানাতে তা হলে আমিই শঙ্করকে তাগাদা দিয়ে কিন্তু তুমি একে তাকে ফোন করে নেমন্তন্ন করতে সময় পাও শুধু আমাকেই.."

"একে তাকে মানে?"

দরজায় টোকা। চা নিয়ে এসেছে। সরোজ দু' পেয়ালা চা তৈরি করছিল, বীণা বলল, "আমি খাব না। তুমি একটু তাড়াতাড়ি করো।"

কথাটা গ্রাহ্যে না-আনা বোঝাতে সবোজ মন্থরভাবে চামচ নাড়তে লাগল। তারপর ধীরে সুস্থে পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে এনে চুমুকের জন্য সময় দিল।

"প্লিজ, তাড়াতাড়ি।"

"এত উতলা হচ্ছ কেন, রাতে ফেরেনি তো কী হয়েছে?"

"বলছ কী! একটা অল্পবয়সি মেয়ে সারারাত বাড়িব বাইরে দুটো বদমাইশের সঙ্গে কাটাচ্ছে আব তার মা উতলা হবে না?"

"এখন ওরা বদমাইশ হয়ে গেল আর ওদের দেওয়া টিকিটে যখন সেজেগুজে খেলা দেখতে গেছলে তখন কি ওদের দেবদূত মনে হচ্ছিল?"

বীণা রাগে আর বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে বাখল। ঠোঁট থরথর করছে, মুঠো বন্ধ, দৃষ্টি জ্বলন্ত। সবোজকে শুনিয়ে আপনমনে বলল, "ট্রেনে দেখা না হলেই দেখছি মঙ্গল ছিল।"

"কোনওকালে দেখা না হলে আরও মঙ্গল হত, রোজা জন্মাত না, আজকের এই ঝঞ্ঝাটেও পড়তে হত না।"

"হোয়াট ডু ইউ মিন? রোজা জন্মাত না মানে?"

"সরল কথার আবার মানে? রোজা তো আমার মেয়ে।"

বীণা দাঁড়িয়ে উঠল লহমায়।

"কে বলল তোমার মেয়ে? রোজা আমার স্বামীর।" বীণার স্বর চিরে গেল।

সরোজ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। সে যেন প্রত্যয়ের অভাব দেখতে পেল বীণার মুখে। বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ঠোঁট। চাহনির ঔজ্জ্বল্য স্তিমিত।

"মিথ্যা কথা বোলো না। সরোজের মেয়ে সরোজা, দু'জনের মুখের মিলও অদ্ভুত।"

বীণা মাথা নাড়তে লাগল।

"রোজা আমার স্বামীর।"

"তা হলে যে বলেছিলে প্রেগনান্ট হয়েছ?"

"মিথ্যে বলেছিলাম তোমাকে প্রেশার দেবার জন্য, বিয়েতে বাধ্য করার জন্য।"

"তুমি রোজাকে পেটে নিয়েই বিয়ে করেছ?"

"কী আবোলতাবোল বকছ। ওঠো এবার। এ-সব কথা রোজার কানে গেলে ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।"

"নাহ্। যতক্ষণ না সত্যি বলছ আমি উঠব না। যদি নিজে ওকে খুঁজে নিতে পারো তো নাও।"

"পুলিশেব হেল্প নিয়ে বার কবব। তুমি কি ভেবেছ আমি পারি না?"

বীণা দরজার দিকে এগোল। পেয়ালায় আবার চা ঢালতে ঢালতে সরোজ বলল, "পুলিশ বার কবে দেবে ঠিকই। কিন্তু তারপর। বিখ্যাত একটি ছেলে এতে ইনভলভড। খবর চাপা থাকবে না। ছবিসমেত কাগজে খবর বেরোবে। মিস্টার রাওয়ের মানসম্মান..."

সরোজ থেমে গেল এবং দ্রুত উঠে এগিয়ে গেল। বীণা মেঝেয় বসে পড়েছে, ডান হাতটা দেয়াল থেকে বেয়ে বেয়ে নামছে, বাঁ হাত বুকে চেপে ধরা। মুখ কোলেব মধ্যে ডুবে গেল। বীণার পাশে উবু হয়ে বসে সরোজ দু' হাতে কাঁধ ধবে নাড়া দিল।

"কী হয়েছে? কী হল?"

"আমি কী করব, কী তখন কবতে পারি। সহায় সম্বল নেই, একা. .আব কী করার ছিল? তুমিও প্রত্যাখ্যান করলে।"

বীণা কাঁদছে।

অটোবিকশায় পনেবো মিনিটের মধ্যে ওরা পৌঁছল। দবজাব বেলের সুইচ টিপে দু'জনে অপেক্ষা কবল। সাড়া না পেয়ে আবও কয়েকবার ঘনঘন টিপল।

দরজার ওপাশে মৃদু গজগজানি, পায়ের শব্দ। দরজা খুলে খালি গা, শর্টস পরা শঙ্কর ভারী চোখে তাকিয়ে রইল। ওকে ঠেলে সরোজ তার পিছনে বীণা ভিতরে ঢুকল।

আলো জ্বলছে। মাংস পোড়াব মতো বিশ্রী গন্ধে বাইরের বসার জায়গাটা ভরে আছে। সরোজ বুঝতে পারল এই গন্ধ গাঁজার। শঙ্কর চোখ খুলে তাকাবার চেষ্টা কবছে। অবশেষে সোফাটায় বসে পড়ল। হাত তুলে শোবাব ঘরের দরজাটা দেখিয়েই সে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল।

পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে কিছুই দেখতে পেল না সবোজ। তবে অনুমান করল কেউ একজন শুয়ে। বীণা তার পিছন থেকে উঁকি দিল।

হাতড়ে সুইচ বোর্ড পেয়ে সরোজ একটা সুইচ টিপতেই একটা পাখা ঘুরে উঠল। যে ক'টা সুইচ সব ক'টিই সে টিপল এবং আলোয় ঘর ভরে যেতেই সবোজের পিছন থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে বীণা ছুটে গেল।

রোজা কার্পেটে কাত হয়ে শুয়ে। শঙ্কবের "লাভ মি" ছাপমারা গেঞ্জিটা গায়ে জড়ানো। জিন্‌সেব ট্রাউজার্সটা কোমর থেকে নামানো। খাটে চিত হয়ে পা ছড়িয়ে খালি গায়ে শুয়ে ভবানী। বুকটা হাপরেব মতো ওঠানামা করছে। সারা ঘর ভরে আছে গাঁজার গন্ধে।

রোজার বুকে কান চেপে বীণা স্পন্দন শোনার পর ট্রাউজার্সটা টেনে তুলতে লাগল। সরোজ জানলা খুলে পাখা চালিয়ে দিল। রোজাকে টেনে বসিয়ে সরোজ ধরে রইল আর বীণা গেঞ্জিটা পবিয়ে দিল।

"এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, এখুনি।"

"চলার ক্ষমতা নেই। ট্যাক্সি ডেকে আনি।"

রাস্তায় বেরিয়েই সরোজ ট্যাক্সি পেল। রোজাকে পাঁজাকোলা করে যখন বেরোল, শঙ্কর এবং ভবানী তখন বেঘোরে। ট্যাক্সিতে তাকে তোলার সময় পথচারী অনেকেই তাকিয়ে গেল। ট্যাক্সিওলা সন্দেহের চোখে রোজার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"মেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেছে জ্বরে। নার্সিং হোমে নিয়ে যাব।" সরোজ কথাটা বলে বীণার দিকে তাকাল। "চেনা নার্সিং হোম আছে? সেখানেই আগে যাব।"
"আছে।"

শেষ দিনে টেস্ট ম্যাচটি অকল্পনীয় মোড় নিল। লাঞ্চের পনেরো মিনিট আগে পিকার্ড হ্যাটট্রিক করল আলভা, ঠুকরাল ও শান্তনমকে আউট করে। প্রথম উইকেট পড়তেই ভবানীর বদলে ঠুকরালকে নামতে দেখে প্রেসবক্সে বিস্ময় দেখা দেয়। ঠুকরালের পরও ভবানী মাঠে নামল না। একজন বলল, ক্রাইসিস দেখা দিলে তা সামলাতে ঘোষালকে নীচের দিকে রাখা হয়েছে।

শান্তনম বোল্ড আউট হবার পর ভবানী মাঠে এল। অনিশ্চিত পদক্ষেপ, বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে, শরীর যেন আর বইতে পারছে না। সে ওয়ালেসের তিনটি বলের সম্মুখীন হয়। প্রথম দুটি ফসকায় এবং স্টাম্প ঘেঁষে চলে যায়। তৃতীয়টিতে বিরক্ত হয়ে দু' পা বেরিয়ে মারতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং স্টাম্পড। ফেরার সময় ওর মুখ দেখে সরোজের কষ্ট হল। দুই ইনিংসেই শূন্য করার জন্য ভবানীর মুখে যে লজ্জা বা হীনতা বোধ প্রত্যাশিত ছিল তার কোনও চিহ্ন সে দেখতে পেল না; কেননা, ওর স্নায়ুর কাজ করার ক্ষমতা এখন অসাড় হয়ে আছে। ঘোলাটে চাহনিতে তাকাতে তাকাতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল প্যাভিলিয়নের মধ্যে।

রামিন্দারের গালের হাড়ে চিড় দেখা গেছে। ডাক্তার জানিয়েছে দু' সপ্তাহ তার খেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। লাঞ্চে চার উইকেটে ১২৫ রান। আর একটি উইকেট পড়ল ১৩৩ রানে যখন আনন্দ বোল্ড হল বয়েডের ইয়র্কারে।

ড্র হবার ম্যাচ হঠাৎ পরাজয়ের ম্যাচে রূপান্তরিত হল। পরের ব্যাটসম্যান রেগে। হঠাৎ তুমুল উচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখা গেল রেগে নয় রামিন্দার মাঠে নামছে। দু' ঘণ্টা আর কুড়ি ম্যান্ডেটরি ওভার তখনও বাকি। যে-ভাবে উপরের দিকের ব্যাটসম্যানরা আউট হল তাতে শেষের প্রতিরোধ সম্পর্কে কারুরই ভরসা থাকার কথা নয়।

গালে তুলোর উপর প্লাস্টার আঁটা, ওটাই রামিন্দারের সারা অস্তিত্বের মধ্যে প্রথমেই চোখ টেনে রাখল দর্শকদের। চ্যালেঞ্জের সংকেত ওর উঁচু করে তুলে ধরা চিবুকে, হালকা পদক্ষেপে বা শান্ত চাহনিতে। মনে হচ্ছে যেন একটা বাঘ শিকার ধরতে এগোচ্ছে।

সেদিন সরোজ অফিসে ফিরে এসে প্রথমে গুহঠাকুরতাকে একটা টেলেক্স করে। তাতে সে জানায়, 'ভবানী সম্পর্কে যে লেখাটা পাঠিয়েছিলাম সেটা ছাপবেন না। তাতে যে মেয়েটির কথা লিখেছি আদপে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। পরে ভবানী সম্পর্কে লিখব। তার বদলে রামিন্দার সম্পর্কে লেখা পাঠাচ্ছি। কীভাবে সে হারের কিনার থেকে দলকে টেনে আনল এবং তার নিজের প্রত্যাবর্তনের কথা। একটু বড় হবে। আশা করি, জায়গার অকুলান হবে না।'

এর পর সরোজ রাশি রাশি শব্দের মধ্যে ডুবে গেল রামিন্দারের ইনিংসটা তুলে আনার জন্য। তার মধ্যে কয়েকবার সে আনমনা হয়েছিল এবং আপনমনে হেসে মাথা নেড়েছিল।

ভালো ছেলে

অনন্তের ক্লাস নাইনের এবং অমরের ক্লাস এইটের এগারো দিন পর অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাসে উঠতে গিয়ে শক্তিপদ পিছলে চাকার তলায় চলে যায়। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। হাতে ছিল তাঁর দু' ছেলে অনন্ত আর অমরের জন্য দু' জোড়া চটির বাক্স।

"যদি ও-দুটো হাতে না থাকত তা হলে শক্তিদা হ্যান্ডেলটা ভাল করে ধরতে পারতেন।"

মাস ছয়েক পর এক সন্ধ্যায় শক্তিপদের অফিসের সহকর্মী অবিনাশ কথাটা বলেছিল তাদের ঘরে বসে। অনন্ত আর অমর পরস্পরের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে পাংশু হয়ে যায় তাদের মুখ। মৃত্যুর তিন দিন আগে শক্তিপদ কয়েক আউন্স উল আর বোনার কাঁটা অনিমার জন্য আর এক বাক্স রং পেনসিল অলকার জন্য কিনে এনেছিলেন। ওরা ক্লাসে উঠেছে ফাইভে আর ফোরে।

শীলা বলেছিল, "মেয়েদের দিলে, আর ছেলেরা বুঝি ক্লাসে ওঠেনি?"

অনন্ত আর অমর চোখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল।

"মাকে বল না আমাদের চটি নেই।" অনন্ত বলেছিল। অমর একটু গোঁয়ার, মুখ আলগা। সে চেঁচিয়েই শীলাকে জানিয়ে দেয়, "আমার আর দাদার জন্য চটি চাই।"

সেই চটি কিনে বাসে উঠতে গিয়ে... অবিনাশ তাই বলেছিল, "বাক্সদুটো হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সামলাতে গিয়ে রড থেকে হাতটা পিছলে গেল।"

"বাক্স দুটোর কী হল, আমরা তো চটি পাইনি!" অমর ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছিল।

অমরটা বোকা, ওর প্রথম চিন্তাই চটি। ভিড় আর উত্তেজনার মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ তুলে নিয়েছিল রাস্তা থেকে। কিন্তু অনন্ত একটা কথাই তখন ভেবেছিল, 'যদি ও-দুটো হাতে না থাকত' তা হলে বোধহয় বাবার মৃত্যু হত না।

সেই সময় রেকাবিতে পরোটা আর বেগুন ভাজা নিয়ে অনিমা ঘরে ঢোকে। অবিনাশ আপত্তি জানাবার জন্য রান্নাঘরের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলেছিল, "এলেই যদি এইরকম খাবার দেন বউদি তা হলে কিন্তু আর আসব না।"

"এ আর কী এমন।"

শীলা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে জানায়।

অবিনাশ তখন প্রায় অভিভাবক হয়ে উঠেছিল। রোজই আসত। সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারও তার পরামর্শ ছাড়া চলত না। পাঁচজনের পরিবার একসময় তার অনুগ্রহনির্ভর হয়ে চলেছিল।

শক্তিপদর মৃত্যুর দিন শীলার হাতে ছিল বত্রিশ টাকা। মাইনের টাকা শক্তিপদ নিজের কাছে স্টিল আলমারির লকারে রাখত, চাবিও থাকত তার কাছে।

চাবির রিংটা ছিল প্যান্টের পকেটে, হাসপাতালের কেরানি সেটা শীলাকে দিতে অস্বীকার করে। মৃত শক্তিপদর সঙ্গে পাওয়া জিনিসগুলো যেমন রুমাল, নস্যির ডিবে, চটির বিল, চশমার খাপ, মানিব্যাগ, পাঁচটি চাবিসহ রিং আর একটা ডাকঘরের খাম পুলিশের হাতে তুলে দেয়। খামটির এক ধার ছেঁড়া ভিতরে একটা চিঠি। পুলিশের এস আই বলেছিল পরদিন থানা থেকে মৃতের জিনিসগুলো প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যেতে।

অবিনাশের এক আত্মীয় পুলিশের পদস্থ অফিসার। তাকে সে অনুরোধ করেছিল জিনিসগুলো বিনা ঝামেলায় ফেরত পাবার জন্য। পরদিন শক্তিপদকে দাহ করে ফেরার সময় অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশ থানায় যেতেই জিনিসগুলো কিঞ্চিৎ খাতিরসহই ফেরত পায়। অনন্ত একটা খাতায় সই করে জিনিসগুলো নেয়। তখন সে জানত না খামের মধ্যে চিঠিটা কার লেখা এবং তাতে কী লেখা। বাড়ি ফিরে প্রথমেই টাকার জন্য আলমারি খোলা হয়। তারপর সে বাবার জিনিসগুলো ও খামটিও লকারে রেখে চাবি বন্ধ করে দিয়েছিল। এরপর নানা কাগজপত্র বার করার জন্য লকার খোলা হয়েছে কিন্তু

এককোণে প্লাস্টিকের মোড়কে সুতো দিয়ে বেঁধে-রাখা ওই জিনিসগুলো বা খামটিতে হাত আর দেওয়া হয়নি।

সাকসেশন সার্টিফিকেট বার করা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, এগারো দিন চাকুরির মাইনে, এ ছাড়াও জীবনবিমার তিন হাজার টাকা, সবই অবিনাশ সংগ্রহ করে দিয়েছিল। শীলাকে সঙ্গে নিয়ে কখনও-বা অনন্তকে নিয়ে সে ট্রামে, বাসে, ট্যাক্সিতে আদালতে এবং অফিসে অফিসে ঘুরেছে নিজের খরচে, ঘুষ দেবার প্রয়োজন হলে নিজের পকেট থেকেই দিয়েছে।

"আপনার ঋণ কীভাবে যে শোধ করব ঠাকুরপো... আমার ছেলেমেয়েদের উপর ভগবানের কী যে অসীম দয়া, না হলে এমন বিপদের দিনে কি আপনাকে পেতাম! তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে।"

প্রভিডেন্ট ফান্ডের তেরো হাজার টাকার চেক নিয়ে নামার সময় শীলা যখন কথাগুলি বলছিল, প্রৌঢ় লিফটম্যানের মুখে তখন এক চিলতে হাসি দেখেছিল অনন্ত। জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত একটা ধারণায় পৌঁছবার পর মানুষ এমন বৈরাগীর মতো হাসতে পারে। অবিনাশের মুখেও একটা হাসি ফুটে উঠেছিল-- কিছুটা আত্মসুখ, কিছুটা বিনয় ও উদ্বেগ মেশানো।

"ও-সব পরে শুনব, আগে এই চারটে নাবালকের কথা তো ভাবতে হবে।"

এবার হাঁটতে হাঁটতে তারা সার্কুলার রোডে আসে।

"চা খাবেন বউদি?"

"আপনি খান, আমি দোকানের ছোঁয়াছুঁয়ি..."

বিধবা জীবনে শীলা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক সপ্তাহেই।

অবিনাশ চায়ের বদলে কোকাকোলা খেয়েছিল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। অনন্ত জীবনে সেই প্রথম এই পানীয়ের আস্বাদ পায়। তার ভাল লেগেছিল এবং তিন ভাই-বোনের কথা মনে পড়ে বিষণ্ণ বোধ করে।

"শক্তিদার তো আরও বেশি থাকার কথা।"

"হবে, আমি তো এ-সব খবর রাখতুম না। সংসারের টাকা আমার হাতে কখনও দিতেন না। ঝিয়ের মাইনেটাও নিজে হাতে দিতেন। আমি বরং কখনও-সখনও..."

অনন্ত জানে মা কেন থেমে গেছল। বাবা পাইখানা গেলে মা তার পকেট হাতড়ে বা মানিব্যাগ থেকে দু'-তিন টাকা সরাত। একদিন সে দেখে ফেলেছিল। কাউকে সে-কথা সে বলেনি। বাবার নিশ্চয় সন্দেহ হত। মানিব্যাগ খুলে একদিন বাবাকে ভ্রূ কোঁচকাতে দেখেছিল। অনন্ত ভয়ে ভয়ে থাকত, হয়তো বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, ব্যাগে টাকা কমে গেল কেন? কিন্তু করেনি।

টাকা নিয়ে মা কী করত। অনন্ত স্কুল থেকে ফিরে একদিন দেখেছিল রাস্তায় সদর দরজার সামনে তিন-চারটি লঙ্কা-নুন-মাখা শালপাতা। কেউ আলুকাবলি বা ফুচকা খেয়েছে। কে খেয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই মা থতমত খেত।

"ওপরের মেজবউ কি রত্না বোধহয়, প্রায়ই তো ডেকে ডেকে কিনে খায়।"

আর একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখল মা বাড়ি নেই। অমর তার আগে স্কুল থেকে পৌঁছে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

"মা কোথায় রে?"

"অনু আর অলুকে নিয়ে সিনেমা গেছে।"

"পয়সা পেল কোথায়? তুই জানলি কী করে?"

"কে জানে কোথায় পেয়েছে, ওপরের জেঠিমা বলল।"

অলুর স্কুল সকালে, দশটার মধ্যেই সে বাড়ি ফিরে আসে।

"অনু স্কুলে যায়নি?"

"বোধহয় হাফ-ছুটি করে চলে এসেছে।"

"তালা দিয়ে গেছল?"

"ওপরে চাবি রেখে গেছে।"

ওপরে আছে বাড়িওয়ালার আত্মীয় এক পরিবার। বিশেষ মাখামাখি নেই। বাড়িওয়ালা থাকে

শিলিগুড়ি। অনন্ত তাকে কখনও দেখেনি। ওপরের জ্যাঠামশাই আর তার ভাই বাড়িওয়ালার ভূমিকা নিয়েই বসবাস করে। তবে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে বাবা মানিঅর্ডারে ভাড়ার পঁয়ষট্টি টাকা শিলিগুড়িতে পাঠিয়ে দেয় জনৈক সুখরঞ্জন পোদ্দারের নামে। একবারের জন্যও পাঁচ তারিখের নড়চড় হয়নি। নামটা সে জেনেছে যেহেতু পোস্ট অফিসে গিয়ে মানিঅর্ডার করার ভার ছিল তার উপর। দু' বছর পর বাবা মারা যাবার তিন মাস আগে পঁয়ষট্টি হয়েছিল সত্তর।

বাবা পছন্দ করত না পাড়ার লোক বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা। কলকাতায় বউবাজারে আর জামশেদপুরে থাকে দুই মামা, কিন্তু সম্পর্ক নেই। যাদবপুরে কাকার রেস্টুরেন্ট আছে, অবস্থা ভাল, তার সঙ্গেও বাবার মুখ দেখাদেখি নেই। ঠাকুমা আর ঠাকুর্দা ছিল কাকার সঙ্গে। দু'জনেই মারা গেছে। ভাইয়ের সঙ্গে বাবার যে কেন ঝগড়া, অনন্ত তা জানে না।

মা সিনেমা দেখত বা এটাসেটা কিনে খেত এবং সে-জন্য কোথা থেকে পয়সা পেত, শুধু অনন্ত নয় তার ভাইবোনেরাও তা বুঝে গেছল। শীলা হয়তো সেটা জানত কিংবা জানত না। সে প্রায় নিরক্ষর এবং সরল আর অসম্ভব পরিশ্রমী। কিন্তু ছেলেমেয়েরা বাবার কানে তোলেনি। তারা মাকে ভালবাসে।

কোকাকোলা খাবার পর সেদিন ট্রামে উঠে ওরা লম্বা সিটে পাশাপাশি বসেছিল। মাঝখানে শীলা।

"দু' মাস আগে চার হাজার টাকা পি এফ থেকে তুলেছিলেন, ওরা খাতা থেকে আমায় দেখাল। কী জন্য, কিছু জানেন কি?"

শীলা মাথা নাড়ল।

"দু' বছর আগে তিন হাজার।"

শীলার বিভ্রান্তি অব্যাহত। সে তাকাল অনন্তর দিকে।

"কিছু জানিস?"

অনন্ত মাথা নাড়ল। বাবা খুব খরচে লোক নয়। ছেলেমেয়েদের জন্য কেনাকাটার বা খাওয়া-দাওয়ার বা বেড়ানোর জন্য খরচ করত না। নিজের জন্যও নয়। একজোড়া প্যান্ট আর একজোড়া হাওয়াই শার্ট, সারা বছর অফিসের জন্য ওই পোশাক। ফিতেওলা জুতো তিন বছর তো চলতই। মোজা থেকে সব ক'টা আঙুল বেরিয়ে থাকত।

বাবার এত টাকা তোলার কেন দরকার হল? ধার-দেনা ছিল কি?

অনন্তের কাছে সেটা তখন রীতিমতো রহস্যময় মনে হয়েছিল এবং বাড়ি ফিরে চেকটা আলমারির লকারে রাখতে গিয়ে প্লাস্টিকের মোড়কটা দেখে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল বাবার পকেটে খামের মধ্যে যে চিঠিটা ছিল সেটা আজও দেখা হয়নি।

মোড়ক থেকে খামটা বার করে পকেটে রাখার সময় সে পিছন ফিরে দেখে ঘরে কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না। ঘরে তখন অনু আর অলু ছাড়া কেউ ছিল না।

কেন যে তার মনে হয়েছিল চিঠিটা সবার সামনে পড়া উচিত নয়, তা সে আজ একুশ বছর পরও জানে না। কিন্তু অদ্ভুত অন্যায় খবর পাওয়া যাবে যেটা কাউকে বলার নয়, এমন একটা ধারণা সেই মুহূর্তে হয়েছিল। অন্যের চিঠি পড়া উচিত নয় এই বোধটাও তখন কাজ করছিল প্রবলভাবে।

বাড়ির কোথাও বসে সবার চোখ এড়িয়ে পড়ার জায়গা নেই। সন্ধ্যার পর পার্কের মাঝে আলোর নীচে গিয়ে বসল চিঠিটা পড়ার জন্য। দুটি তাসের আসর গোল হয়ে। তাদের থেকে কিছু দূরে সে বসেছিল। খামের উপর ঠিকানা ইংরেজিতে, অক্ষরগুলো মেয়েলি ছাঁদের। শেষবারের মতো সে ইতস্তত করেছিল চিঠিটা বার করার আগে।

চার ভাঁজ করা ছোট চিঠি।

"শক্তি,

আজও তোমার অফিসের সামনে রাস্তার ওপারে ছুটির সময় অপেক্ষা করেছি। এই নিয়ে পরপর চারদিন। তুমি বেরোলে দেখলাম, নিজের মনে হেঁটে স্টপে গিয়ে বাসে উঠে বাড়ি চলে গেলে। একবার মুখ তুলে তাকালেও না কোনওদিকে। তা হলে দেখতে পেতে এক অভাগিনীকে। আমি কী দোষ

করলাম যে গত এক মাসে একবারও এলে না। লক্ষ্মীটি এসো। যদি অপরাধ করে থাকি পায়ে ধরে মাপ চাইব। এসো এসো এসো। ভালবাসা নিয়ো। প্রণাম নিয়ো।

ইতি
মিনু (১১ ডিসেম্বর)

এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফ্যালফ্যাল করে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল মিনিট দুই। তারপর প্রথমেই সে ভেবেছিল, কে এই মিনু? বাবার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

চিঠিটা সে তিনবার পড়েছিল আর ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারল এই পত্র-লেখিকার সঙ্গে তার বাবার কিছু একটা গোপন সম্পর্ক রয়েছে যার সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও তারা কিছু জানে না। 'মিনু' নামটি কখনও তাদের সংসারে উচ্চারিত হতে সে শোনেনি। চিঠির বিষয় থেকে মনে হয় দু'জনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক। এটা ভাবতেই সে মনে মনে অপরাধীর মতো কুণ্ঠায় জড়সড় হয়ে যায়। বাবার ব্যক্তিগত জীবনের একটা আড়াল করা দিক হঠাৎ পর্দা সরিয়ে দেখে ফেলার মতো লজ্জায় সে ভরে গেছল। আর সেই কুণ্ঠা এবং লজ্জার কারণ, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও সে কিন্তু ছিঁড়তে পারেনি। সে ভাবতে পারছিল না তার মা ছাড়াও আর কোনও মেয়েলোক বাবার জীবনে থাকতে পারে। তার মনে হয়েছিল বাবার এটা জঘন্য কাজ।

চিঠিটা তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছল। পার্কে বসে তাসুড়েদের চেঁচামেচির মধ্যে বাবাকে দুশ্চরিত্র ভাবতে তার বাধছিল অথচ মন থেকে সায়ও পাচ্ছিল না। তখন তার কৈশোর বয়স। সে বার বার বাবার আচরণ, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে খুঁজতে চাইল কোনও অসঙ্গতি, অযৌক্তিক কাজ কিংবা মা'র সঙ্গে ঝগড়া, মনোমালিন্য পাওয়া যায় কি না।

কিছুই পায়নি। মা'র সঙ্গে কোনওদিন উঁচুস্বরে বাবা কথা বলেছে বা বিরক্তি প্রকাশ করেছে বা অবহেলা দেখিয়েছে এমন কোনও উদাহরণ সে সংগ্রহ করতে পারল না। খুব রেগে উঠলে তার চোয়ালের পেশি দপদপ করত কিন্তু মা'র জন্য একবারও করেনি। অনন্ত কোনওদিন মৃদু বা গাঢ়স্বরে দু'জনকে কথা বলতে বা চোখে চোখ রাখতে দেখেনি অথচ পরস্পরের প্রতি আচরণে তাদের খুঁত নেই। যন্ত্রের মতো নিখুঁত ছিল সম্পর্ক।

রাত্রে আঁচাবার সময় অনন্ত মাকে উনুনের আঁচ শিক দিয়ে খুঁচিয়ে নামাতে দেখে সাধাবণভাবেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "মিনু বলে কাউকে চেনো?"

শীলা একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "না।" কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলেছিল, "কেন?"

অনন্ত জবাব দেয়নি।

একুশ বছর পর চল্লিশের দিকে ঢলে-পড়া বয়সে মধ্যরাত্রে বিছানায় শুয়ে সে সেদিনের মতো আবার নিশ্চিন্ত হল একটা ব্যাপারে। চটির বাক্স হাতে ছিল বলে বাবা বাসের হাতল ধরতে পারেনি এই যুক্তিটা ঠিক নয়। বাবার সম্পর্কে একটা রহস্য জেনে যাওয়ার পর সেই রাতে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়েছিল চিঠিটা সম্ভবত সেইদিনই বাবার হাতে এসেছিল যেদিন মারা যায়। হয়তো বাবা মিনুকে এড়াবার জন্যই চলন্ত বাসে ওঠার চেষ্টা করেছিল কিংবা চিঠিটা পড়ে এতই চঞ্চল বা অন্যমনস্ক হয়ে গেছল... আর যাই হোক চটির বাক্সে হাতজোড়া হয়ে থাকার কারণটা, যা অবিনাশকাকা প্রায়ই বলেন এবং প্রতিবার শুনে বুকের উপর সে পাষাণভার বোধ করে, সেটা ঠিক নয়।

সেই রাতে পাষাণভারটা মন থেকে নেমে তাকে হালকা করে দেয়। চিঠিটা পড়ার জন্য সে আর নিজেকে অপরাধী মনে করেনি এবং সেটা আজও সে নষ্ট করেনি।

বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বেলে ঘরের কোণে জলচৌকির উপর থাক দিয়ে রাখা স্টিলের দুটো ট্রাঙ্কের উপরেরটা খুলল। ডালার খোপে গোঁজা কয়েকটি কাগজ থেকে সে চার-ভাঁজ করা একটি চিঠি বার করল।

চিঠিটি অনন্তের স্ত্রীর। বহুবার পড়েছে গত দু'দিনে। আবার সে পড়ার জন্য ভাঁজগুলো খুলতে লাগল।

দুই

অনন্তের স্ত্রীর নাম রেবতী। তার কথা ভাবতে ভাবতেই কিছুক্ষণের জন্য একুশ বছর পিছনের দিকে তাকিয়েছিল। যথেষ্ট উপরে উঠে পাখি-নজরে সে নিজের পিছন দিকে তাকাবে এমন ক্ষমতা তার নেই। জমির উপর দাঁড়িয়ে গিরিশ্রেণী দেখার মতো সে উঁচু-নিচু জীবনের কয়েকটা চূড়ামাত্র দেখতে পায়। তারই একটি, বাবাকে লেখা চিঠিটা।

এরপরের চূড়া ক্লাস টেন-এ তার ফেল হওয়া। এই নিয়ে স্কুল-জীবনে সে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল। প্রথমবার ক্লাস ফোর-এ। অমর তৃতীয় হয়ে ক্লাস টেন-এ ওঠে। ও ভাল ছাত্র। সবাই বলে অমর কিছু একটা হবে। হয়েওছে। সে এখন দিল্লিতে থাকে। বড় একটা চামড়া-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সংযোগ রাখার দায়িত্বে আছে।

বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের তেরো হাজার টাকা, অবিনাশকাকার পরামর্শে পোস্ট অফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেটে রাখা হয়েছিল অনু আর অলুর বিয়ের জন্য। ব্যাঙ্কে সাতশো এগারো টাকা আর অফিস থেকে সাহায্য বাবদ দু' হাজার টাকা। পুরো একটা বছর ঘর ভাড়া আর চারজনের স্কুল খবচ দিয়ে সাতাশশো টাকায় সংসার চলেছে, অনন্ত এখন তা ভাবতে পারে না। তখন দু' টাকা সের মাংস ছিল। টাকা ফুবিয়ে যাবার ভয়ে তারা একদিনও কেনেনি।

পরামর্শটা অবিনাশকাকার দেওয়া— অনন্ত কোনও কাজে ঢুকে যাক। সংসারে এবার টাকা বোজগারেব লোক দরকার। ঘষতে ঘষতে বি এ, এম এ পাশ করে তো বড়জোর কেরানি হবে, তার থেকে, যেহেতু ওর মাথাটা অমরের মতো পরিষ্কার নয় তাই এখনই যে-কোনও ধরনের কাজে অনন্ত লেগে পড়ুক। পঞ্চাশ-ষাট, যত টাকাই আনুক সেটা সাহায্য করবে। পাঁচ-পাঁচটা লোকের খাওয়া-পরা, সহজ কথা নয়।

শীলা আপত্তি করেনি। দিনযাপনের চিন্তায় ও অভাবে ধীরে ধীরে তার বাস্তববুদ্ধি বেড়েছে সেই সঙ্গে অবিনাশ-ঠাকুরপোব উপব নির্ভরতা। অনন্তকে কাজে ঢুকিয়ে দেবার কথায় শুধু একবারমাত্র সে বলেছিল, "এখন তো ওর খেলাধুলো করার বয়স।"

"তা বললে তো হয় না, ওর বয়সি কত ছেলে দেখুন গে কত কাজ করছে। ট্রেনে জিনিস বেচছে, দোকানে কাজ করছে, মোট বইছে . .ওর থেকেও কম বয়সি।"

অবিনাশকাকা মাথা নিচু করে বসে-থাকা অনন্তেব পিঠে হাত রেখেছিলেন। কথাগুলো খুব স্বচ্ছন্দে বলতে চেষ্টা করেও পারছিলেন না। গলায় আটকে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে খাঁকারি দিতে থামছিলেন।

"বড়ছেলেরাই তো এক সময় সংসারে বাবার জায়গা নেয়। স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলো, আড্ডা এ-সবেব দরকাব আছে কিন্তু ভাগ্য যদি অন্যরকম অবস্থায় ফেলে দেয়, তা হলে আর কী করার থাকতে পারে। মা'কে দেখা, ভাই-বোনেদের মানুষ করে তোলা, নিজেকে নিজে বড় করা এ-সব তো এবার তোকেই করতে হবে। জীবনে ত্যাগ করতে হয় নানাভাবে, সবাইকে করতে হয়।... কী আর করবি, ভাগ্য যাব যেমন দেবে...।"

শুনতে শুনতে অনন্ত নিজেকে বাবার ভূমিকায় কল্পনা করে অভিভূত হয়ে গেছল। বাবা গ্র্যাজুয়েট, বয়সে তার থেকে অন্তত তিরিশ বছরের বড়, চাকরি করছিলেন প্রায় কুড়ি বছর, একটা সংসার তৈবি করেছেন, অনেক ঝাপটা সামলে তাদের নিয়ে এগোচ্ছিলেন, এমন একটা লোকের জায়গা সে নেবে কী করে?

অমর, অনু, মা সবার মুখের দিকে সে তখন তাকিয়েছিল। ওরা ঘরে ছড়িয়ে বসেছিল। চল্লিশ ওয়াটের বাল্‌বে ওদের ভয় ভাবনা দুঃখ আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ওরা মাঝে মাঝে মুখ নামাচ্ছে আর সন্তর্পণে তার দিকে তাকাচ্ছে। যেন বিচারসভায় বসে ওদের হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনছে এমন একটা ভাব চোখেমুখে।

নিজেকে বিরাট একটা মানুষ হিসেবে দেখার ইচ্ছা অথবা লোভ অনন্তের মাথার মধ্যে তখন ঢুকে যায়। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আরাম বিশ্রাম সুখ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে সে ভাই-বোনেদের বড় কবে প্রতিষ্ঠিত করছে, নিজে যাপন করছে সামান্য জীবন। ভাল জামা-প্যান্ট পরে না, সিনেমা দেখে না,

রেস্টুরেন্টে খায় না, ট্যাক্সি চাপে না, কারুর কাছে হাতও পাতে না। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী শ্রদ্ধাভরে তার দিকে তাকাচ্ছে, তার সম্পর্কে প্রশংসা করছে—কল্পনা করতে গিয়ে সে ঘরের সবক'টি মানুষের জন্য ভালবাসা আর করুণাবোধ করছিল।

"আমি সবাইকে দেখব।"

"য়্যা!" অমর হঠাৎ অবাক হয়ে শব্দ করে ফেলেছিল।

"তোদের আমি দেখব।"

ওরা তিনজন কী বুঝল কে জানে, মা'র চোখ শুধু জলে ভরে উঠেছিল।

"তুই সুখী হবি, দেখিস আমি বলছি, ...জীবনে তুই কখনও কষ্ট পাবি না।"

রেবতীর চিঠিটা আবার ডালার খোপে রেখে অনন্ত হাসবার চেষ্টা করল। রেবতী গত পরশু তাকে ছেড়ে চলে গেছে খবরটা কেউ এখনও জানে না।

মা'কে দেড় বছর আগে দিল্লি নিয়ে গেছে অমর। অনুর বিয়ে হয়েছে কটকে এক স্যাকরার সঙ্গে। তাকে সে সাত বছর দেখেনি। পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত। অনুর বিয়েতে সবাই অমত করেছিল, কিন্তু সে জেদভরেই বোনের বিয়ে দেয়। শান্তনু পড়ত অলুর সঙ্গে কলেজে। বেকার ছিল। আজও প্রায় তাই। শান্তনু দু'-বার চাকরি খুইয়েছে মাতলামো করে। এখন চাকরি খুঁজছে। অলু ফুড কর্পোরেশনে চাকরি করে। তাদের দুটি ছেলে।

কারুর সঙ্গেই অনন্তের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। দায়সারা বিজয়ার প্রণাম সে পায় বটে, সকলের ঠিকানায় জবাবও দেয় কিন্তু ওই পর্যন্তই। অলু কলকাতায় থাকে অথচ তার সঙ্গে তিন বছর দেখা হয়নি। অবিনাশকাকা রিটায়ার করে তাঁর দেশের বাড়িতে চলে যান, সেখানেই আছেন। ব্লাডপ্রেশারের রোগী, মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে শেষবারের মতো দেখে যেতে বলেন।

রেবতীর চলে যাওয়ার খবরটা জানাবার মতো লোক আছে শুধু মা। তার বিয়ের ব্যাপারে মা ছাড়া কেউ আর আগ্রহ দেখায়নি। অবশ্য ছেলেকে গৃহী দেখতে কোন মা না চায়!

আলো নিবিয়ে অনন্ত খাটে পা ঝুলিয়ে বসল।

অন্যরা শুনলে কী বলবে? বোনেদের না জানিয়েই সে বিয়ে করেছে। তবু কীভাবে যেন ওরা জেনে গেছল। অলু একদিন ঘণ্টাখানেকের জন্য এসেছিল রেবতীকে দেখতে। বাসে তুলে দিতে যাবার সময় অলু বলেছিল, "বউয়ের বয়স হয়েছে। পছন্দ করেই যখন বিয়ে করলে, কমবয়সি করলে পারতে।"

"কত আর বয়স, তিরিশের নীচেই।"

আড়চোখে সে দেখেছিল, অলুর ঠোঁট মুচড়ে গেল।

"তিরিশের নীচে! আমার থেকে অন্তত দু'-তিন বছরের বড় বই কম নয়।"

অলুর জন্মসাল ধরে অনন্ত হিসেব করল।

"তোর এখন একত্রিশ?"

"হ্যাঁ। তিন মাস পর বত্রিশে পড়ব।"

"আমারও তো উনচল্লিশে পড়ার কথা। বয়সের ফারাক খুব একটা কি?"

"আর দু'দিন বাদেই তো বুড়ি হয়ে যাবে।"

"হোক, শরীরই কি স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সব? তা ছাড়া আমিও তো বুড়ো হয়ে যাব।"

তার কথার ভঙ্গিতে ও স্বরে গভীর শান্ততা এবং জীবনের উপর সহজ ভরসা প্রকাশ পেয়েছিল।

"ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।"

অলু চুপ করে থাকে।

"তোর বোধহয় পছন্দ হয়নি বউদিকে।"

"না না, পছন্দ হয়নি কে বলল? বেশ সুন্দরী, ফিগারটিও চমৎকার। আমি তো প্রথমে দেখে অবাকই হয়ে গেছলুম। তুমি এমন সুন্দরী মেয়েব সঙ্গে ভাব করলে কী করে? চিরকালই তো মেয়েদের দেখলে কুঁকড়ে সরে যেতে।"

অনন্ত অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। অলুর দিকে তাকিয়ে গালভরা হাসি নিয়ে বলেছিল, "তোরা তো আমাকে বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবিস না।"

"মোটেই না। ছোড়দা আর অনু ভাবতে পারে আমি কোনওদিন ভাবিনি। ...তুমি ওদের কোনও খবর পাও?"

"না।"

"ভাবছি একবার দিল্লি যাব। ছোড়দা যদি ওর একটা কাজকম্মের ব্যবস্থা করে দিতে পারে।"

"শান্তনু এখন খায়টায়?"

"ও জিনিস কি আর ছাড়া যায়।"

"ওর স্বাস্থ্য এখন কেমন?"

"ভাল না, রক্ত আমাশায় ভুগছে।"

"খুব খারাপ রোগ।"

"দাদা অনেকের জন্য তো অনেক করেছ, আর একটু করো না।"

"আমি আবার কার জন্য কী করলুম। ভাগ্যে যা আছে তা ই হয়েছে।"

"শ' পাঁচেক টাকা আমায় দেবে?"

"পাঁ-চ-শো, কোথায় পাব!"

"ওরা তোমায় কিছু দেয়নি?"

"শ্বশুরবাড়ি? আরে দূর, দেবার মতো কেউ থাকলে তো দেবে। তিন বোন একটা ছোট ভাই, আমাদেব মতোই বাবা নেই।"

"তোমাব কাছে নেই?"

"এখনই ...খুবই দরকাব? কবে চাই?"

"আজ পেলে আজই।"

"জোগাড় কবতে হবে।"

অলুকে বাসে তুলে দিয়ে ফেরার সময়, 'চিরকালই তো মেয়েদের দেখলে কুঁকড়ে সরে যেতে' কথাটি নিয়ে সে মনে মনে খুব হেসেছিল। কেউ জানে না, সতেরো-আঠারো বছর আগে সে একজনকে দারুণ ভালবেসেছিল। গৌবী নাম। এখন সে কোথায় থাকে কে জানে।

বাড়ি ফিবতেই রেবতী বলেছিল, "কিছু বলল কি তোমাব বোন?"

"কী বলবে?"

"আমার সম্পর্কে। নতুন মানুষ দেখলে মেয়েরা মন্তব্য না করে কি থাকতে পারে?"

"তোমার ওকে পছন্দ হয়নি?"

"যে-ভাবে হাঁড়ির খবব নিচ্ছিল ...তোমার আব-এক বোনের নাকি অবস্থা খুব ভাল, কটকে থাকে?"

"শুনেছি, আমি ঠিক জানি না।"

রেবতী 'তোমার বোন', 'তোমার মা', 'তোমার ভাই' এইভাবেই বলে। কখনও 'মা', 'ঠাকুরঝি', 'বা 'ঠাকুরপো' ওর মুখ থেকে বেরোয়নি। অনন্ত একবার বলেছিল, "আমাব মা এখন তোমারও মা।"

"আগে তো দেখি তারপর মা ডাকব।"

রেবতীর শুকনো নিস্পৃহ স্বব বুঝিয়ে দিয়েছিল সে সহজে সম্পর্ক পাতাতে অনিচ্ছুক। অনন্ত কখনও জোর দেয়নি। সে নিঃসঙ্গতা থেকে রেহাই পেয়েছে, এতেই সে খুশি এবং সুখী।

এখন তার সুখ ধ্বংস হয়ে গেছে। জানাজানি হলে সে মুখ দেখাবে কী করে? যে শুনবে প্রথমেই সে বলবে, 'কার সঙ্গে বেরিয়ে গেল?' কিংবা 'কোথায় গিয়ে উঠেছে?'

অনন্ত জানে কোথায় গেছে। চিঠিতে কিছু বলেনি বটে কিন্তু সে অনুমান করছে রেবতীর পিছনে আছে দিলীপ ভড় নামে সেই লোকটি যাকে বিয়ের আগে রেবতী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, "এই হচ্ছে দিলীপদা, অনেক উপকার করেছে আমাদের। দিলীপদা না থাকলে আমাদের পরিবারটা ভেসে যেত। ...আর ইনি হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক কাগজে 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।"

"ওহ্ আপনি!"

অনন্ত নমস্কার করেছিল, লোকটি না-দেখার ভান করে সিগারেটের বাক্সটা এগিয়ে দেয় তার দিকে। অনন্ত হাত জোড় করে বলে, "মাফ করবেন, খাই না।"

সিগারেট কেন সুপুরিও সে খায় না। অবিনাশকাকা বলেছিলেন, "এখন থেকে টাকা জমানো অভ্যেস কর। আজেবাজে সিনেমা দেখে, রেস্টুরেন্টে খেয়ে, প্যান্ট-জামা-জুতোয় কি পান-সিগারেটে টাকা ওড়াসনি। মনে রাখিস তিনটে ভাইবোন, মা তোর জিম্মায়।"

অনন্তের বয়স তখন আঠারো। অবিনাশকাকা প্রথম দিন তাকে বই বাঁধাইয়ের দোকানটায় পৌঁছে দিয়ে মালিক প্রসাদ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর, কথাগুলো বলেন।

"কিছুই তো কাজ জানে না, তবে শক্তিবাবুর ছেলে বলেই নিচ্ছি, এখন পঁয়ত্রিশ টাকা দোব, শিখুক, কাজ শিখলে তখন বাড়াব।"

"পঁয়ত্রিশ, বড্ড কম। একটু বাড়ান, পঞ্চাশ করুন।"

অবিনাশকাকা আধ ঘণ্টা কষাকষি করে চল্লিশ টাকায় প্রসাদ ঘোষকে রাজি করান।

"আপনার অফিস তো আর সে-রকম কাজকম্ম দিচ্ছে না। সেই কবে ছ' মাস আগে একটা চার হাজার টাকার কাজ শেষ পেয়েছিলুম তারপর হাঁটাহাঁটিই সার হল। স্টোরকিপারকে তো ফাইভ পার্সেন্ট দিয়েছি, আরও একটা পার্সেন্ট বাড়াতে রাজি।"

"আমি কালই কথা বলব সুনির্মলবাবুর সঙ্গে। শক্তিদার ছেলের উপকার হবে শুনলে নিশ্চয় কিছু কাজ করবে।"

চার দিনের মধ্যে দু'-হাজার টাকার কাজ পেয়েছিল কমলা বাইন্ডার্স। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ। প্রথম দিন অনন্ত মুশকিলে পড়েছিল দুপুরবেলায়। খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছিল কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। পাঁচজন দফতরিই বাড়ি থেকে রুটি ভাত এনে খায়। যেদিন আনে না কাছেই রাস্তার চায়ের দোকানে পাঁউরুটি আলুর দম খেয়ে নেয়।

অনন্তকে কাজ দেওয়া হয়েছিল পরেশ দাস নামে প্রৌঢ় কারিগরটির সঙ্গে। শীর্ণ, কুঁজো লোকটির বিরাট এক কোরণ্ড। মালকোঁচা দিয়ে ধুতিতে সেটি আঁট করে বাঁধা, পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি। সে লক্ষ করেছিল অনন্ত বাড়ি থেকে খাবার আনেনি। দুটি রুটির উপর আলুছেঁচকি রেখে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "খাও। পেট ভরবে না জানি তবু সারাদিন খালি পেটে থাকা ভাল নয়।"

সে লজ্জায় পড়ে গেছল। নিতে রাজি হয়নি। পরেশ দাস দু'-বার অনুরোধ করে নীরবে রুটি চিবিয়ে খায়।

"মালিক কত দেবে বলেছে।"

"চল্লিশ টাকা।"

"বাড়িতে খেতে গেছে। এলে আট আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে খেয়ে নিয়ো। লজ্জা কোরো না, আগাম বলে চাইবে।"

প্রসাদ ঘোষ ফিরে এল আধ ঘণ্টা পর। কিন্তু সে আট আনা চাইতে পারেনি। সে ভেবে দেখেছে সকাল থেকে ঝাঁট দেওয়া, টিউবওয়েল থেকে কলসিতে জল ভরা ছাড়া শুধু কয়েকটা পুরনো পাঠ্য বইয়ের মলাট খুলেছে আর কয়েকটা বোর্ডে লেই মাখিয়েছে। এই কাজের জন্য হয়তো আট আনা প্রাপ্য হয় কিন্তু এখুনি হাত পাতলে মালিক কী ভাববে তার সম্পর্কে তাদের পরিবার সম্পর্কে? হাঘরে ভিখিরি। আট আনাও পকেটে রাখার সামর্থ্য নেই!

সে আর চাইতে পারেনি। সারাদিন কয়েকবার জল খেয়েছিল। রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফ্রকপরা একটি মেয়েকে সে চা তৈরি করতে দেখে। সর্বাগ্রে তার নজরে পড়ে আঁটো ফ্রকের ভিতর থেকে স্তনের দৃঢ়তা ফুটে রয়েছে। আবলুস রঙের চামড়া। ঘাড় পর্যন্ত চুল। মুখটি মিষ্টি। চাহনিতে চঞ্চলতা। দু'দিন পর দুপুরে বেঞ্চে বসে আলুর দম কিনে রুটি দিয়ে খেতে খেতে সে চাওয়ালাকে বলতে শুনল, "গৌরী, উনুন কামাই যাচ্ছে, মটরগুলো সেদ্ধ কর।"

সেদিন মধ্যরাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারেনি। শরীরে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি চলাফেরা করেছিল।

অনন্ত আজ রাতেও আর এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছে তবে শুধুই মাথার মধ্যে ইঞ্জিনের পিছনে মালগাড়ির মতো সার সার চিন্তা মাঝে মাঝেই লাইন বদলে অন্য লাইনে চলে যাচ্ছে। সে রেবতীর কথাই ভাবতে চায় কিন্তু তার কৈশোর আর প্রথম যৌবন বারবার তার চিন্তাকে থামিয়ে দিচ্ছে লাল সিগন্যালের মতো।

দিলীপ ভড় রেবতীদের ঘরের তক্তাপোশে পা ছড়িয়ে একটা বালিশ বগলে রেখে কাত হয়ে শুয়েছিল। সিগারেটের ছাই পড়ছিল মেঝেয়। রেবতীর ছোটবোন শাশ্বতী ওর পায়ের কাছে বসেছিল, একটা হাত দিলীপ ভড়ের পায়ের উপর আলতো করে রেখে অনন্তকে দেখছিল কৌতূহলে। অনন্ত তখন ভাবছিল এই লোকটা কে? নিকট আত্মীয়?

"কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন কেন?"

"তা ছাড়া উপায় ছিল না।"

"সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবার মতো কেউ নেই?"

"না।"

অনন্ত হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কেউ নেই বলাটা ঠিক হল কি? দুটো বোন, একটা ভাই আব মা থাকা সত্ত্বেও তার কেউ নেই। সবাই দূরে দূরে। তাকে ফেলে মা যেতে চায়নি। কিন্তু থেকেও কোনও লাভ হত না। পেটের যন্ত্রণায় কাতরাত আর বিড়বিড় করত: "ভগবান, ভগবান, আর পারছি না গো। এবার নিয়ে যাও আমায়।" দেখাশুনো করার লোক রাখারও সামর্থ্য নেই। রান্না, বাসনমাজা, কাচাকাচি সংসারের যাবতীয় কাজ অনন্ত নিজেই করত। মাঝে-মধ্যে অলু এসে কিছুক্ষণ থেকে চলে যেত। পাড়ায় ছিল মেয়ে ডাক্তার মাধবী দত্ত। তিনি দেখে বলেছিলেন, "হাসপাতালে ভরতি করান, মনে হচ্ছে ক্যানসার।"

অনন্ত সেইদিনই অমরকে চিঠি দিয়েছিল। চার দিনের মাথায় অমর দিল্লি থেকে উড়ে এসে উঠল অফিসের গেস্ট হাউসে। মা-কে সে পরদিনই বড় ডাক্তার দেখিয়ে এক্স-রে করায়। "মা-কে নিয়ে যাব ট্রিটমেন্ট দিল্লিতেই করাব।"

"থাক না এখানে।"

"অপারেশন করে একটা চেষ্টা করা যাক। এখানে থেকে লাভ কী? দেখার লোক নেই, তা ছাড়া খরচও অনেক।"

"শুনেছি এ রোগে কেউ বাঁচে না।"

অমর জবাব দেয়নি। সন্ধ্যার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে কথা বলছিল। অমরেব মুখ থেকে সে হালকা মদের গন্ধ পাচ্ছে। মা ভিতরে দালানে বসে রয়েছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

"মরবেই যদি তা হলে এখানেই মরুক না। আবার টেনে হিঁচড়ে অত দূরে নিয়ে গিয়ে কী লাভ!"

"অপারেশন করলে আরও কিছুদিন কয়েক মাস কি একটা বছর টিকে যাবে। পারবে তুমি? ওষুধপত্তর ধরে কম করেও হাজার আষ্টেক টাকা, পাববে?

অনন্ত অসহায় বোধ করল। ব্যাঙ্কে তার সাড়ে সাত হাজারের মতো টাকা জমেছে। ক্যানসার রোগীর জন্য টাকা খরচ আর ভস্মে ঘি ঢালা একই ব্যাপাব। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় মা মারা যাবে? হতে পারে না। জীবনবিমা করেছে কুড়ি হাজার টাকাব। তার মাইনে এখন কেটেকুটে ছ'শো একানব্বুই টাকা। অমর কত টাকা রোজগার করে তা সে জানে না। হয়তো সাত-আট হাজার মাইনে পায়। বার চারেক তো বিদেশ ঘুরে এসেছে।

"চেষ্টা করে দেখি। অফিস কো-অপারেটিভ থেকে নয় লোন নেব।"

"ভাল। পরশু সন্ধের ফ্লাইটে আমি চলে যাব।"

পরশু সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে সে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে। তার পায়ের শব্দে দোতলা থেকে কাকিমা চেঁচাল, "কে?"

"আমি অনন্ত।"

"চাবিটা নিয়ে যাও।"

অনন্ত দোতলায় উঠে এল। জেঠিমা পুজোর ঘরে। কাকিমা, ঠিকে-ঝি আরতি, পাশের বাড়ির দু'জন গৃহিণী দালানে টি ভি দেখছে।

"ওই পেরেকে টাঙানো রয়েছে। বিকেলেই ওরা গেল। দিদি খুব কাঁদছিলেন, তোমার সঙ্গে আর দেখা হল না।"

শোবার ঘরে টেবলে চিরুনি চাপা দেওয়া এক টুকরো কাগজ। তাতে বড় অক্ষরে লেখা: "দাদা,

মা-কে নিয়ে যাচ্ছি, আমার কাছে শেষ ক'টা দিন থাকবে। রাগ কোরো না। ইতি—অমর।"

বারকয়েক পড়ে সে থম হয়ে বসে থাকে। মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বাচ্চাছেলের মতো কেঁদেছিল। দেড় বছর আগে লিখে রেখে যাওয়া অমরের চিঠিটা ট্রাঙ্কের মধ্যে এখনও রয়েছে। মা এখন জীবিত।

অনন্ত বিছানায় পাশ ফেরার সময় মুখে একটা শ্রান্তির শব্দ করল। সারাটা জীবন শুধু খাটুনি আর খাটুনি। এইবার সে একদমই একা। রেবতী পরশু চলে গেছে। কোনও ঝগড়া হয়নি, সামান্য তর্কাতর্কিও নয়। এমনিই চলে গেছে। পাঁচ মাস আগে তাদের বিয়ে হয়েছে।

কীভাবে সে পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাবে! জেঠিমা আজ সকালে জিজ্ঞাসা করেছিল, "বউমা কোথায়, বাপের বাড়ি গেছে?"

"হ্যাঁ।"

অমরের মতো ছোট্ট কাগজে অল্প কয়েকটা অক্ষর: "আমার আর ভাল লাগছে না। চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। রেবতী।"

মা বলেছিল, "তুই সুখী হবি, দেখিস ...আমি বলছি। জীবনে তুই কখনও কষ্ট পাবি না।"

কবে বলেছিল, মা কবে বলেছিল কথাটা? ভাবতে ভাবতে অনন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন

মাইনের দিনে শক্তিপদ তারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কচুরি কিনে বাড়ি ফিরত। গোনাগুনতি মাথাপিছু চারটি অর্থাৎ চব্বিশটি। একবার সবাইকে ভাগ করে দিয়ে দেখা গেল একটি বেশি। পকেট থেকে খুচরো নোট ও পয়সা বার করে শক্তিপদ গুনে দেখল চব্বিশটির দামই সে দিয়েছে। দোকানি তা হলে ভুল করে একটি বেশি দিয়ে ফেলেছে। "ফেরত দিয়ে আসি।" কচুরিটা কাগজে মুড়ে সে তখনই রওনা হয়ে গেছল। শীলা তখন বলেছিল, "পরে যেয়ো, আগে খেয়ে নাও।" শক্তিপদ জবাব দেয়নি। অমর অস্ফুটে বলেছিল, "ফেরত দেবার দরকার কী? মিষ্টিওলাও তো কত লোককে ঠকায়।"

প্রথম মাইনে পেয়ে বাড়ি ফেরার সময় অনন্ত তারার দোকানের সামনে দাঁড়াল। দোকানের ভিতরে কয়েকজন খাচ্ছে। ক্ষীণ গন্ধ আসছে কচুরি ভাজার। ফুলকো গরম কচুরিতে আঙুলের টোকা দিয়ে গর্ত করছে একজন। কচুরি নিয়ে বাবা যখন বাড়ি পৌঁছত তখন ঠান্ডা হয়ে যেত। বেশিরভাগই চোপসানো। অনন্ত কানে কানে মা-কে বলত, "ফুলোগুলো কিন্তু আমার।" আঙুল বসিয়ে গর্ত করে সে তারমধ্যে তরকারি ভরে দিত।

অনন্ত পায়ে পায়ে কাচের শো-কেসের সামনে এল। পকেটে চারটে দশ টাকার নোট মুঠোয় চেপে ধরে সে গলা থেকে স্বর বার করতে পারল না। দোকানি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী দোব?"

"কচুরি।"

"ক'টা?"

"চব্বিশটা।" আপনা থেকেই সংখ্যাটা তার মুখে এসে গেল।

"দু' মিনিট দাঁড়াতে হবে, ভেজে আনছে।"

অনন্ত অপেক্ষা করতে করতে রোমাঞ্চ বোধ করল। ব্যাপারটা ঠিক বাবার মতোই হচ্ছে। বাড়িতে নিশ্চয় সবাই অবাক হয়ে যাবে। বাবাকে তখন সবার মনে পড়বে। ভাববে, সংসারের শূন্যস্থানটা এবার পূর্ণ হল। সবাই অন্যরকমভাবে তাকে দেখবে।

তার বুকের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস ঠেলে উঠছে। রাস্তার যানবাহন, লোকের চলাচল, কোলাহল, নানান শব্দ, ভঙ্গি, সব তখন অনন্তের ইন্দ্রিয়ের পরিধি থেকে সরে গেছে। সে শুধু দেখতে পাচ্ছে বাবাকে, একহাতে তরকারির ভাঁড় অন্যহাতে কচুরির ঠোঙা, ঈষৎ ঝুঁকে, শুধুমাত্র রাস্তার দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সামনে মানুষ থাকলে একবার মুখটা তুলেই পাশ কাটিয়ে নিচ্ছে।

"চব্বিশটা কচুরি।"

"চব্বিশটা, ঠিক গুনেছেন তো?"

"কম নেই।"

দশ টাকার নোট কাচের উপর রাখল। তার প্রথম উপার্জন, প্রথম খরচ। খুচরো নোটগুলো পকেটে রাখার সময় তার মনে হল সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো উচিত।

"পাঁচটা কড়াপাক সন্দেশ দিন।"

"আট আনার না এক টাকার?"

"আট আনার।"

বাবা কোনওদিন সন্দেশ আনেনি। তা হলে কি নেওয়া ঠিক হবে? অনন্ত দ্বিধায় পড়ল। বাবাকে কি ছোট করা হবে? তা তো সে চায় না। প্রথম চাকরির প্রথম মাইনে পেয়ে বাবা কি বাড়ির লোকেদের মিষ্টিমুখ করায়নি? জীবনে তো শুধু একবারই। এতে নিশ্চয় দোষ হবে না।

পকেটে সন্দেশের ঠোঙা, দু'হাতে কচুরি ও তরকারি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার তার হাসি পেল। ইচ্ছে করেই অল্প কুঁজো হয়ে রাস্তার দিকে মুখ নামিয়ে সে কিছুটা হাঁটল। এখন তার পকেটে যে-ক'টা টাকা, তার অন্তত কুড়িগুণ থাকত বাবার পকেটে। বাবার সমান হতে কি তার কুড়ি-বাইশ বছর লাগবে?

রাস্তার উপর চুন দিয়ে গোলাকার বৃত্ত আঁকা। রবারের বল খেলা হয়েছে বিকেলে। গোলকিপারের এলাকা চিহ্ন করেও দাগ টানা। সে মাঝেমাঝে গোলকিপার হয়েছে। কোনও খেলাতেই তার দক্ষতা নেই। অমরকে সবাই দলে চায়। অন্য পাড়াও তাকে ফুটবল বা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নিয়ে যায়।

সদর দরজা ভেজানো। পা দিয়ে ঠেলে খুলতেই আবছা অন্ধকার উঠোনে দেখতে পেল পিছন ফিরে মা সাবান কাচছে। ডাকতে গিয়েও ডাকল না। পা টিপে সে মা'র পিছনে এল। ঝুঁকে ঘাড়ের কাছে মুখ নামাল।

"হাল-লুম্।"

"বাবা গো!"

শীলা কেঁপে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখল অনন্ত ঠোঙা আর ভাঁড় তুলে হাসছে।

"এরকম-করে ভয় দেখায়।"

"আমি তো হালুম করেছি! বাঘ এখানে আসবে, তাই ভেবেছ? এই দ্যাখো।"

শীলা ভ্রূ কুঁচকে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

"কী রে?"

"বাবা যা আনত।"

"আজ মাইনে দিল বুঝি! ঘরে রাখ আসছি। ঠাকুরপো তোর জন্য অনেকক্ষণ বসে রয়েছে।"

অনন্ত ঘরে ঢুকতেই সবাই তার হাতের জিনিস দুটোর দিকে চোখ রাখল। পাতলা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ঠোঙা আর ভাঁড়টা কোথায় সে রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। মেঝেয় বই নিয়ে অলু আর অমর। তক্তাপোশে অনু। অবিনাশ চেয়ারে বসে মন দিয়ে অমরের ভূগোল বইটা পড়ছে।

"কাল অফিসে এসেছিল তোদের মালিক। আস্ত ঘুঘু... হাতে কী?"

"কচুরি।"

"মাইনে দিয়েছে? মহা ধড়িবাজ, বলে কিনা আমার তো লোকের দরকার নেই, আপনি বললেন তাই ছেলেটাকে রাখলুম, খরচ বেড়ে গেল। আসলে মতলব এইসব বলে যদি আরও কিছু কাজ পাওয়া যায়। সুনির্মলবাবুকে বললুম সব। তিনি তো রেগে উঠে বললেন এখান থেকে যথেষ্ট কাজ পেয়েছে, শুধু শক্তিবাবুর ছেলের জন্যই ওকে কাজ দিয়েছি নইলে দিতুমই না। তোর সঙ্গে ব্যবহার করে কেমন?"

"ভাল।"

"কাজ শিখেছিস কিছু? এক মাস তো হল।"

"অল্পস্বল্প, শক্ত কাজ তো নয়।"

ঘরে ঢুকল শীলা। তার চোখ ঝকঝক করছে। ঠোঙাটা তুলে নিয়ে বলল, "কী দরকার ছিল এ-সব আনার, আজেবাজে পয়সা নষ্ট।"

মায়ের আনন্দ কারুর কাছেই চাপা রইল না। শীলা একটা কাঁসার থালায় তরকারির বেশির ভাগ

ঢেলে চার ভাগ করল, আর একটা প্লেটে বাকিটা তুলে অবিনাশের হাতে দিল। কচুরির ঠোঙাটা অনন্ত বাড়িয়ে দিল অমরের সামনে, "চারটে। সবার জন্য চারটে করে।"

ঠিক এইভাবেই তার বাবা বলত। ঠোঙা থেকে চারটে কচুরি তুলে সে অবিনাশের প্লেটে রাখল।

"তোর কই?"

"আমার আর মা'র আছে। আগে বরং একটু মিষ্টিমুখ হোক।"

ম্যাজিসিয়ানের মতো হাত নেড়ে অনন্ত পকেট থেকে এক ঝটকায় সন্দেশের ঠোঙা বার করল।

"জীবনের প্রথম রোজগার। তবে এরপর আর এ-ভাবে খরচ করা নয়।"

অবিনাশ স্মিত হেসে বললেও স্বরে কিছুটা ভর্ৎসনা ছিল।

"হ্যাঁ, আর নয়।" শীলা প্রতিধ্বনি করল। "তোরটা এখুনি খেয়ে নে, রেখে দিলে আর থাকবে না। যা সব... আমার ক'দিন ধরেই অম্বল হচ্ছে ভাজাটাজা আর খাব না।"

"তা হলে আমায় দাও।" অমর হাত বাড়াল। অনন্ত তার হাতে একটা কচুরি দিল, দুই বোনকেও। অবিনাশ হাতটা তুলে তাকে দিতে নিষেধ করল।

অনন্ত ভাই-বোনেদের মুখের দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে সারা ঘর স্থির একটা নিশ্চিন্তিতে ডুবে গেছে। সবার মুখেই সুখের বুড়বুড়ি। অমর কচুরির সামান্য একটু ছিঁড়ে তরকারির ঝোলে বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিবোচ্ছে, মাঝে মাঝে দু'-চোখ বুজে আসছে। অনু আঙুলের ডগায় ঝোল মাখিয়ে জিবে ঠেকাচ্ছে। অলুর চোখ দ্রুত চিবোনোর জন্য বড় হয়ে উঠেছে আর ঢোক গিলছে। বহুদিন পর তাদের ঘরে কিছুক্ষণের জন্য বাবা ফিরে এল। 'বড়ছেলেরাই তো একসময় বাবার জায়গা নেয়', আজ থেকে সে বড় হয়ে গেল। এখন তার আঠারো চলছে।

অনন্ত রাত্রে স্নান করে জলকাচা পাজামাটা উঠোনের তারে মেলে দিচ্ছিল। শীলা কাছে এসে নিচুস্বরে বলল, "ওরা আজ ভাড়া চেয়েছে, একসঙ্গে চার মাসেরই।"

অনন্ত চুপ করে রইল।

"একগাছা চুড়ি বিক্রি করলে ভাড়াটা মেটানো যায়।"

"অনু অলুর বিয়ের জন্য রাখবে বলেছিলে।"

"ওদের বিয়ের বয়স হতে এখনও সাত-আট বছর বাকি। ততদিনে টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। তেরো হাজার টাকা তো রয়েইছে।"

"ততদিনে সোনার দামও তেরোগুণ হয়ে যাবে।"

"তা হলে? উনি প্রতি মাসে ঠিক সময়ে ভাড়া পাঠিয়ে দিতেন, কোনওবার দেরি করেননি। এই প্রথম বাকি পড়ল তাও চারমাসের।"

"এ রকম দু'-চার মাস বাকি সব ভাড়াটেদেরই পড়ে।"

"আমাদের কখনও পড়েনি।"

দু'জনে চুপ করে রইল। দোতালায় রেডিয়ো থেকে পল্লীগীতি ভেসে আসছে। নর্দমা থেকে একটা ছুঁচো উঠোনে লাফিয়ে উঠে শীলার পা ঘেঁষে ছুটে গেল। দূরে কোনও বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে।

"একটা কথা বলব, রাগ করবি না?"

"কী কথা?"

"খোকার মা আজ বিকেলে বলল, বলাই মিত্তির লেনের দাসেদের বাড়িতে রান্নার লোক খুঁজছে।"

"রাঁধুনি হবে!"

অনন্ত চাপা চিৎকার করে উঠল। তার হাতের আঙুলগুলো থরথর কাঁপছে।

"তুমি চিন্তা করতে পারলে?...শেষকালে এমন একটা কাজের কথা...বাবা বেঁচে থাকলে তুমি এ-কথা বলতে পারতে?"

"উনি তো আর নেই।"

"আমাদের বংশ, মান-সম্মান?"

"খেতে পরতে হবে, বাড়ি ভাড়া, এটা-ওটা, স্কুলের মাইনে...তুইও কি কখনও ভাবতে পেরেছিলিস পড়া ছেড়ে চল্লিশ টাকার কাজ নিবি?"

"আমি ব্যাটাছেলে, আমার সব মানিয়ে যায়...না, তোমাকে রাঁধুনি হতে হবে না।"

অনন্ত প্রায় ছুটেই ঘরে এল। দেয়াল ঘেঁষে অমর ঘুমোচ্ছে মেঝেতেই। তার পাশে বালিশটা ছুড়ে, আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ল। কিছু পরে সে পাশের ঘর থেকে মা'র কণ্ঠস্বর পেল, "কী বিচ্ছিরি শোয়া বাপু...ওদিকে পা সরা।"

অনন্তের ঘুম আসছে না। অজস্র রকমের চিন্তা তার মাথায় যাওয়া-আসা করছে। প্রত্যেকটাই ভয়ের আর হতাশার। মা রাঁধুনি এ-কথা শুনলে পাড়ার লোকে কী বলবে, ওপরের লোকেরাও? অলু, অনু, অমরের স্কুলে যে-ভাবেই হোক অনেকেই জেনে যাবে। ঝি-চাকর-রাঁধুনি মোটামুটি তো একই পর্যায়ের। কেউ যদি ওদের আঙুল দেখিয়ে বলে 'রাঁধুনির ছেলে...রাঁধুনির মেয়ে'! ভাগ্য যাকে যেমন দেবে তা মেনে নিতেই হবে, কিন্তু তাই বলে মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে নাকি?

গত এক মাসে সে বন্ধুদের বা পাড়ার লোকের সঙ্গে কথা বলেনি। পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে ব্যস্ততার ভান করে হনহনিয়ে এড়িয়ে গেছে। স্কুলের অশোকবাবুর সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা। এড়িয়ে যেতে গিয়েও পারেনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পড়া ছেড়ে দিলি? করছিস কী এখন?"

ইতস্তত করে সে বলেছিল, "অ্যাপ্রেন্টিস, কাজ শিখছি কারখানায়।"

"কীসের কারখানা?"

অনন্ত তৈরি ছিল না প্রশ্নটার জন্য। সামনে নারায়ণ মেডিক্যাল হল-এর সাইনবোর্ডে চোখ পড়তেই বলেছিল, "ওষুধের কারখানা।"

"কত দিচ্ছে?"

"একশো চল্লিশ টাকা।"

"অমরকে ভাল করে পড়াশুনো করতে বলিস, একটু খাটলেই ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে যাবে।"

"আমি তো সারাক্ষণই বাইরে থাকি স্যার। আপনারা যদি ওকে বলেন...বাড়িতে তো বিশেষ পড়তে দেখি না।"

"মাথা আছে ওর, একটু খাটলেই পেয়ে যাবে, আমার কোচিং-এ ওকে আসতে বলিস...না না টাকা লাগবে না।"

অমর ক'দিন ধরে সকালে স্যারের কোচিং-এ যাচ্ছে। অমর বোধহয় জানে না সে কত টাকা পায় কমলা বাইন্ডার্স থেকে। কিন্তু সে ওষুধের কারখানায় যে অ্যাপ্রেন্টিস নয় এটা অমর জানে। কথায় কথায় যদি অশোকবাবুকে বলে ফেলে দাদা কোথায় কাজ করে। খুঁটিয়ে বাড়ির খবর নেওয়ার অভ্যাস স্যারের আছে।

ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করেছে। ঘুম ভেঙে যাবার পর বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। অনু স্কুলে যাবে। মা বাসি রুটি আর তরকারি ওকে খেতে দিয়েছে। অমর এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। উঠোনে বাসন রাখার শব্দ হল। কাল কচুরি আর সন্দেশ কেনার পর যে-টাকা ক'টা ছিল সে মাকে দিয়েছে। মা'র কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে এবার সে বাজার যাবে। খুব সহজে এবং দ্রুত তার বাজার করা হয়ে যায়। আলু, ডাল আর একটা আনাজ। মাছের বাজারের দিকেই সে যায় না। মাছ তারা শেষ কবে খেয়েছে? মাসতিনেক আগে। হঠাৎ খুব ইলিশ ওঠে, পাঁচ টাকা কেজি পর্যন্ত দাম নেমেছিল। রাত্রে একটা আধ কেজি ইলিশ এনেছিলেন অবিনাশকাকা। পরদিনের জন্য গোনাগুনতি তুলে রাখা হয়েছিল। সকালে রাঁধতে গিয়ে মা একটা মাছ কম পায়। কেউই স্বীকার করেনি তবে সবাই সন্দেহ করেছিল এটা অমরেরই কাজ।

"আর ঘুমোয় না, ওঠ এবার, বেলা হয়ে গেল।" অনন্ত চোখ খুলে জানলা দিয়ে তাকাল। সামনের বাড়ির দোতলার বারান্দায় উৎপলের দাদু চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। ওদের সদরের পাশেই আঁস্তাকুড় ছিল। দিন-সাতেক হল দাদু ঝিয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে জঞ্জাল ফেলা বন্ধ করেছে। রোজ সকালে দাদু বারান্দায় বসে লক্ষ রাখে কেউ ওখানে কিছু ফেলছে কি না। আরও তিনটে বাড়ি পেরিয়ে জঞ্জাল ফেলতে হওয়ায় ঝিয়েরা প্রথমে গজগজ করে এখন মেনে নিয়েছে। সকালে অনন্তদের জঞ্জাল ফেলে অনু। ওর স্কুল সাড়ে দশটা থেকে। ভাঙা-কলাইয়ের থালা হাতে দূরে গিয়ে ফেলতে অনু লজ্জা পায়। তাই ও ঘরের জানলা থেকে প্রথমে দেখে নেয় দাদু বারান্দায় আছে কি না। না থাকলে ছুটে গিয়ে

ফেলে দিয়ে আসে। পাতের এঁটো-কাঁটা কিছুই প্রায় থাকে না, আনাজ খোসাসমেতই রান্না হয়, শুধু উনুনের কিছু ছাই ছাড়া তাদের সংসারে প্রতিদিনের কোনও জঞ্জাল হয় না।

অনন্ত বাজারে বেরোবার আগেই অমর কোচিং-এ চলে গেছে। খোকার মা উঠোনে নিচু গলায় শীলার সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে দেখে ওরা কাজ বন্ধ করল। অনন্ত না-দেখার ভান করে পেরেক থেকে থলিটা তুলে নিয়ে, চেঁচিয়ে বলল, "টাকা দাও।"

দুটো টাকা শীলার আঁচলে বাঁধা ছিল। খুলে দেবার সময় বলল, "খোকার মা-কে না বলে দিলুম। চাল শুধু এ-বেলার মতোই আছে।"

অনন্ত অসহায়ভাবে তাকাল। বাবা মারা যাবার পর এক বছর কেটে গেছে। যে-ক'টা টাকা ছিল তা-ও ফুরিয়েছে। এখন তার চল্লিশটা টাকাই সম্বল। সে ভেবে পাচ্ছে না তাদের পাঁচটা পেট কীভাবে ভরবে।

"এবার থেকে দু'বেলা রুটি খেতে হবে।"

"আটা কিনতেও তো পয়সা লাগবে। মেয়েদের জামা না কিনলেই নয়, সেলাই করে করে কত আর পরবে, অমরের জুতোটাও ফেলে দেওয়ার মতো হয়ে গেছে..."

"তা আমি কী করব, শুধু আমায় বলছ কেন?" অনন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। শীলা অবাকচোখে তাকিয়ে। এ-ভাবে কখনও ওকে চেঁচিয়ে উঠতে দেখেনি। দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। দু'জনেই জানে উত্তর দেবার কিছু নেই, উত্তর হয় না। অনন্ত চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

বাজার থেকে ফেরার সময় সে অমরকে দেখল বইখাতা হাতে তিনটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওর পায়ের কাবলি জুতোটার গোড়ালির চামড়ার পটিটা উলটোনো, বকলেস নেই। জুতোর কালো রং ধুলো-কাদায় ফ্যাকাশে। ডান পাটির একধারের সেলাই ছিঁড়ে আঙুল বেরিয়ে গেছে। অমরের বুশ-শার্টটা ময়লা। ফুলপ্যান্টটা ঢলঢলে। দেখেই বোঝা যায় বহুদিন সাবানে কাচা হয়নি।

অনন্ত এবং অমর যে ফুলপ্যান্ট পরে আছে সে-দুটি তাদের বাবার। দুই ভাইয়ের মাপ একই। চার মাস আগে বাবার দু'জোড়া জামা-প্যান্ট দর্জিকে দিয়ে ছোট করিয়ে নিয়েছিল। এখনও একটা প্যান্ট রয়েছে। সেটা ছোট করিয়ে অমরকে দেবে। বাবার একজোড়া ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি আলমারিতে পড়ে আছে। অনেকদিনই সে ভেবেছে প্যান্টগুলো অমরকে দিয়ে সে ধুতি পরবে। পাঞ্জাবি তার দরকার নেই। ওটা দিয়ে মায়ের ব্লাউজ হয়তো হতে পারে।

অমরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা কথা বন্ধ করল। দু'জন তার মুখ চেনা, অমরের ক্লাসেই পড়ে। তৃতীয়জনকে সে চেনে না। মুখে আলতো হাসি ফুটিয়ে সে একবার শুধু তাকাল মাত্র, যে-ভাবে বয়স্করা ছোটদের দিকে তাকায়।

যাতে উনুন কামাই না যায় সে-জন্য অনন্ত বাজারে যাবার পর শীলা উনুনে আঁচ দেয়। উনুন ধরে উঠতে উঠতে বাজার এসে যায়। দু'বেলার রান্না সে সকালেই সেরে নেয় কয়লা খরচ কমাতে।

অনন্ত যখন ফিরল শীলা তখন হাঁড়িতে ফুটন্ত জলে চাল ঢালছে।

"বাবার একটা ধুতি বার করে দাও তো।"

"কী করবি?"

শীলা বাষ্প থেকে মুখ সরিয়ে তাকাল।

"পরবি?"

"হ্যাঁ।"

"তুই বার করে নে না।"

ধুতি-পাঞ্জাবি কাচিয়ে তোলা ছিল। পুরনো হলেও ব্যবহার কম হয়েছে। অনন্ত পাট ভেঙে ধুতিদুটো তক্তাপোশের উপর ছড়িয়ে দিল। দু'-তিন জায়গায় ফুটো বোধহয় পোকায় কেটেছে।

অমর ঘরে ঢুকল। ধুতির দিকে একবার তাকিয়ে সে পিছন ফিরে তাক-এ বইখাতা গোছাতে লাগল। অনন্তের মনে হল সকলেরই জামা ফ্রক প্যান্ট থানকাপড় দরকার আর সে কিনা আস্ত দুটো ধুতি পেয়ে যাবে!

"দুটো রয়েছে, তুই একটা নিবি নাকি?"

"নাহ্ ধুতি আমার চলবে না তা ছাড়া কেমন যেন বুড়োটে দেখায়।

অনন্ত অপ্রতিভ বোধ করল। তাকে কি সত্যিই বুড়ো দেখাবে? তার বয়সি কেউ ধুতি পরে এমন কাউকে তার মনে পড়ছে না।

"তোর জুতোটা একদম গেছে।"

অমর জবাব দিল না। চেয়ারে বসে সে একটা বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ল।

"জুতো কেনার মতো টাকা তো হাতে নেই, আমি যা পাই তাতে একমাসের চালও কেনা যাবে না।"

অমর বই থেকে চোখ সরাল না। অনু ঘরে ঢুকল।

"দাদা, আমার পেনসিলটা নিয়েছিস?"

"হ্যাঁ, এই নে।"

অনু বেরিয়ে গেল। ওর ফ্রকের পিঠের বোতামগুলো নেই, একটিমাত্র সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। অনন্ত পাট মিলিয়ে ধুতিদুটো ভাঁজ করতে লাগল।

ভাত খাবার সময় শীলা বলল, "চুড়িটা বিক্রি না করলে তো আর চালানো যাচ্ছে না, কয়লাওলা এসেছিল, দু'মাস ওকে কিছু দেওয়া হয়নি, বলে গেল আর কয়লা দেবে না।"

"কত পাবে?"

"সাড়ে আট টাকা।"

"তোমার কাছে যা আছে তাই থেকে দিয়ে দাও।"

"বাকি দিনগুলো যে কী করে..."

মালকোঁচা দিয়ে ধুতি তার উপর নীল শার্ট। অনন্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করল তাকে বুড়োটে দেখায় কি না। শীলার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কেমন যেন দেখাচ্ছে!"

"কেন ঠিকই তো আছে।"

"জামাটা ময়লা, ধুতির সঙ্গে মিলছে না।"

"রাতে সাবান দিয়ে কেচে দোব।"

"ওদের জন্য এবার কিছু কিছু কেনা দরকার...চুড়িটা থেকে কত পাবে?"

"আটগাছা চুড়ি, হার, তোর বাবার আংটি, বোতাম নিয়ে চারভরি সোনা বিয়েতে দিয়েছিল। চুড়িগুলোয় আছে ছ'আনা করে।"

"এতে কতদিন আর চলবে, অমর রোজগেরে হতে হতে এখনও পাঁচ-ছ'বছর তো লাগবেই।"

"ভগবান ঠিক চালিয়ে দেবেন।"

বেরোবার সময় শীলা তাকে চার আনা আর কাগজে মোড়া চারখানা আটার রুটি দিল। ট্রামে-বাসে না চড়ে অনন্ত প্রায় একমাইল পথ হেঁটেই যাতায়াত করে। গলি দিয়ে যাবার সময় তার মনে হল সবাই যেন তার দিকে তাকাচ্ছে। পাড়ার কোনও লোকের সঙ্গে তার কথাবার্তা বলার মতো আলাপ নেই। সমবয়সিদের সঙ্গেও দরকার না হলে সে কখনও কথা বলে না। সবাই জানে সে কুনো, মুখচোবা, অমরের ঠিক উলটোটি।

দূর থেকে অনন্ত দেখল গৌরী সুলভ পুস্তক ভাণ্ডারের কাউন্টারে দু'গ্লাস চা রেখে ফিরে যাচ্ছে। তার বুকের মধ্যে হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। চায়ের দোকানের বেঞ্চে সেই ছোকরাটাও বসে রয়েছে যাকে সে সকাল-সন্ধ্যা যাতায়াতের সময় প্রায়ই দেখে। বছর পঁচিশ বয়স হবে। ডিগডিগে, লম্বা, ফরসা চেহারা। চোখা নাক। চুলে তেল নেই, সামনের দিকটায় ঢেউতোলা। ঘাড় কামানো। টেরিলিনের কালো প্যান্ট, ছুঁচলো জুতোটায় পিতলের বকলেস। গায়ে লাল গোলগলা ঝকমকে গেঞ্জি। কোনওদিন পরে সাদা ফুলশার্ট। একদিন তার কানে এসেছিল ছোকরাটি গৌরীর বাবাকে বলছে, "কাকাবাবু, একদিন খিদিরপুরে আমার সঙ্গে চলুন, মাল দেখুন..."

ছোকরা এখানে কেন বসে থাকে? গৌরীর জন্য? অনন্ত একটু দমে গেল। ছোকরার জামাপ্যান্ট জুতো ঝকঝকে দামি, পরিপাটি, দেখতেও ভাল, কথা বলে ঝরঝরে। অনন্ত নিজের সঙ্গে তুলনা কবার কোনও চেষ্টাই করল না। চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে আড়চোখে দেখল ছোকরাব

দিকে তাকিয়ে গলার সবুজ পাথরের মালাটা বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে ধরে গৌরী হাসছে... "বাবা বাজাব থেকে কিন্তু এখুনি এসে যাবে, খুলে রাখি?"

অনন্ত সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটে গেল। চাওয়ালার মেয়েকে নিয়ে আর সে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু মনের মধ্যে একটা জ্বালা সে অনুভব করছে।কিছু একটা যেন সে চেয়েছিল অথচ সেটা তাকে দেওয়া হল না। কারুর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার মতো দাবি বা অধিকার তার কোথাও নেই। গৌরী সম্ভবত ভাল করে কখনও তাকে লক্ষও করেনি। তার ভাল লেগেছে মানেই যে গৌরীরও ভাল লাগবে এমন কোনও কথা নেই।

দুপুরে আলুর দম নিয়ে সে মাথা নিচু করে রুটি দিয়ে খাচ্ছিল। বেঞ্চে তার পাশে মোটর গ্যারাজের দু'জন। তারা পাঁউরুটি কিনে এনেছে। এখন রাস্তায় লোক চলাচল কম। লোকদুটো কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে খাড়া-করা ত্রিপলের ছায়ায় একটা টুলে গৌরী বসে। খেতে খেতে অনন্ত একবার মুখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হল। হাতায় আলুরদমের ঝোল নিয়ে গৌরী উঠে এসে তার প্লেটে ঢেলে দিল।

"না না, আর দরকার নেই।"

"দুটো রুটি খেতে খেতেই তো ঝোল ফুরিয়ে গেল, বাকি রুটিগুলো কি শুকনো চিবোবে?"

অনন্ত হাসবার চেষ্টা করল। ওর গলায় সবুজ মালাটা নেই দেখে তার ভাল লাগল। মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্বস্তি পাচ্ছে।

"ওব্যেস নেই দুপুরে রুটি খাওয়ার।"

"তা হলে ভাত নিয়ে আস না কেন? অনেকেই তো আনে টিফিন কেরিয়ারে।"

"ভাত আমি খেয়েই আসি।" অনন্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বলল, "আমাদেব টিফিন কেবিয়ার নেই।"

"দশরথের ভাতের হোটেলে তো খেতে পাবো।"

অনন্ত চুপ করে খেয়ে যেতে লাগল। হোটেলে ভাত খাবার পয়সা নেই বলতে তার কুণ্ঠা হল। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য সে বলল, "তোমার বাবা খেতে গেছে?"

"আমি খেয়ে এলে বাবা খেতে যায়। বাবা ফিরে এলে আমি ঘরে যাব। আজ অবশ্য সিনেমায় যাব।" গৌরী হাসল। অনন্তের মনের মধ্যে গুমোট জমে ভারী হয়ে উঠল। নিশ্চয় সেই ছোকরাটার সঙ্গেই যাবে। ওর বাবার কি এতে সায় আছে? থাকতে পারে। হয়তো ওর সঙ্গে গৌরীর বিয়েও দেবে।

"একা যাবে?"

কথাটা বলেই অনন্ত লজ্জা পেল। সামান্য এইটুকু আলাপে এমন প্রশ্ন করা উচিত হয়নি। মুখ থেকে হঠাৎ-ই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু গৌরী এমন গায়েপড়া কৌতূহলে যেন খুশিই হল।

"একা একা সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না।"

"আমারও। অবশ্য সিনেমা আমি খুব কমই দেখি, যুদ্ধের বই দেখতেই ভাল লাগে।"

লোকদুটো দাম চুকিয়ে চলে গেল। দর্জির দোকান থেকে হাঁক শোনা গেল, "একটা চা দিয়ে যাস গৌরী।"

"আমার ভাল লাগে রগড়ের বই দেখতে।"

"চার্লি চ্যাপলিনের বই দেখেছ? আমাদের স্কুল থেকে একবার দেখাতে নিয়ে গেছল, দারুণ হাসির।"

"স্কুলে পড়তে?" গ্লাসে লিকার ঢালতে ঢালতে গৌরী বলল।

"হ্যাঁ।"

"পড়া ছাড়লে কেন?"

"সংসার চালাতে হবে তো। বাবা হঠাৎ বাসচাপা পড়ে মারা গিয়ে...দুটো বোন একটা ভাই আর মা রয়েছে।"

গৌরী চামচ নাড়া বন্ধ রেখে ওর দিকে তাকাল। ও-চোখে সহানুভূতি, দরদ। অনন্তের গুমোট কেটে যাচ্ছে।

"তুমিই বড়?"

"হ্যাঁ। বড়ছেলেরাই তো বাবার জায়গা নেয়।"

ভারী গলায় কথাটিকে কেটে কেটে বলল। বলার সময় গৌরীর মুখের ভাব লক্ষ করছিল। কিছু বুঝতে পারল না।

দর্জির দোকানে চা দিয়ে ফিরে এসে গৌরী বলল, "বাবা টাকাকড়ি রেখে যায়নি?"

"কিচ্ছু না শুধু তেরো হাজার টাকা পেয়েছি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে, বোনেদের জন্য তোলা আছে, আর মায়ের ভরিচারেক গয়না।"

গৌরীর বাবাকে আসতে দেখে অনন্ত বেঞ্চ থেকে উঠল। পয়সা দেবার জন্য শার্টের পকেটে হাত ঢোকাতেই গৌরী চাপাস্বরে দ্রুত বলল, "দিতে হবে না।"

অনন্ত কয়েক সেকেন্ড বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে কমলা বাইন্ডার্সের দিকে এগোল। বলতে গেলে গৌরীর সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয় অথচ এত কথা সে যে বলতে পারল, এটাই তাকে অবাক করছে। মেয়েটার চাহনিতে কী যেন একটা আছে যা তাকে সাহসী করে দিল। কিন্তু তাই বলে বিনি পয়সায় আর সে খাবে না, একবারই যথেষ্ট বরং কিছু একটা উপহার দিয়ে সে শোধ দেবে।

সন্ধ্যায় অনন্ত বাড়ি ফেরার সময় হাতিবাগানে একটা রেস্টুরেন্টে গৌরী আর সেই ছোকরাকে দেখতে পেল। টেবলে পাশাপাশি ওরা। ছোকরা প্লেটের দিকে মুখ নামিয়ে কাঁটা চামচে মাংসখণ্ড গাঁথায় ব্যস্ত। রাস্তার দিকে একবার যেন তাকাল। অনন্তকে বোধহয় দেখতে পায়নি কিন্তু সে ওর গলায় সবুজ মালাটা দেখতে পেয়েছে। গৌরীর পরনে হলুদ রঙের শাড়ি।

ক্লান্ত, মন্থর পায়ে যখন সে বাড়ি পৌঁছোল তখন নিজেকে তার মনে হচ্ছিল বুড়ো হয়ে গেছে।

কে বা কারা যেন বলেছিল, 'অনন্ত খুব ভালো ছেলে।' তখন তার বয়স কত ছিল? সাত, আট, হয়তো নয়। তখন তার চারপাশের জগৎ ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মানুষজন সম্পর্কে সচেতনতা শুরু হচ্ছিল, তাদের সে আলাদা আলাদা করে বুঝে প্রত্যেককে নিজস্ব ছকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল। এখন থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা মনে করতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে স্মৃতি যেন তার সঙ্গে চালাকি করছে। বহু মানুষ, বহু ঘটনা ধূসর হয়ে গেছে, কিছু কিছু মানুষ চেতনায় রয়েছে আলোকিত কুয়াশার মতো।

একা নির্জন অন্ধকার ঘরে অনন্ত তার অতীতের দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে মানুষ, ঘটনা, দৃশ্য, শব্দ, রং এখন আর আলাদা করতে পারছে না। রেবতীর চলে যাওয়াটা তাকে যতটা নাড়া দিয়েছে একদা গৌরীর জন্য তার হৃদয় কি এইভাবেই মুচড়ে উঠেছিল? অমর যেদিন বলল, "আমি আর এখানে থাকব না" সেদিনও কি এমন করে অসাড় হয়ে গেছল তার অনুভব ক্ষমতা!

অমরকে সে চড় মেরেছিল। কারণটা আজও তার মনে আছে। স্কুল ফাইনালে প্রথম পঁচিশজনের মধ্যে অমর স্থান পেয়েছিল। অবিনাশকাকা এক বাক্স সন্দেশ কিনে এনেছিল। শীলা উপরে জেঠিমাদের কয়েকটা দিয়ে আসে, সামনে উৎপলদের বাড়িতেও অনন্ত নিজে গিয়ে পাঁচটা সন্দেশ দেয়। উৎপলের দাদু অবাক হয়ে বলেছিল, "তিনটে লেটার পেয়েছে, বলিস কী!"

তার এক সপ্তাহ পরেই দাদু মারা যায়। হাই ব্লাডপ্রেশার ছিল, হৃৎপিণ্ডও বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছল। বিকেলে বারান্দায় চেয়ারেই ঢলে পড়ে। দামি খাটে, প্রচুর ফুলে সাজিয়ে, সংকীর্তন করে ওকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। অমরও সঙ্গে গেছল। শ্রাদ্ধে অনন্তদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে গেছল উৎপল। পরিবেশনকারীদের অন্যতম ছিল অমর। প্রায় আটশো লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। কাপড় দিয়ে রাস্তার অর্ধেকটা ঘিরে টেবলে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিন অনু মায়ের পুরনো সিল্কের শাড়ি পরেছিল। অলু উপর থেকে ইস্ত্রি এনে বাড়িতে কাচা ফ্রকটাকে মোটামুটি কাজের বাড়িতে যাওয়ার যোগ্য করে তুলেছিল। অনন্ত নিজেদের সদরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, খাওয়া শেষ করে একদল বেরিয়ে এলে নতুন পাত পড়ামাত্র গিয়ে বসে পড়বে। তখন অমর তার পাশ দিয়েই বাড়িতে ঢোকে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী রে, চলে এলি যে?" অমর অস্পষ্ট স্বরে কী যেন বলেছিল।

নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফিরে সে মায়ের কাছে কীভাবে তার সামনের লোকটি বাজি ধরে চল্লিশটা রসগোল্লা টপাটপ খেয়ে গেল সেই গল্প করছিল, "ভাবতে পারবে না, লোকটা এই টিংটিঙে। বাজি ছিল তিরিশটা, দশটা বেশি খেল!"

অনু বলল, "কী বাজি ছিল?"

"এক টাকা!"

"মা-স্ত-র!"

তখন মা হঠাৎ বলে ফেলে, "অমর অনেকগুলো সন্দেশ এনেছে।"

সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। তারপরই খটকা লাগতে জিজ্ঞাসা করে, "কীভাবে আনল? ওরা কি অমরকে দিয়েছে?"

"দেবে কেন। এমনিই এনেছে।"

"এমনি, এমনি মানে? নিশ্চয় লুকিয়ে এনেছে...চুরি করে এনেছে।"

মা-কে চুপ করে থাকতে দেখে অনন্ত রাগে দাউদাউ করে উঠেছিল।

"চোর! আমার ভাই চোর! সামান্য ক'টা সন্দেশের লোভ আর সামলাতে পারল না?"

সে লাফিয়ে উঠেছিল। ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে বাসন ছুড়ে ছুড়ে খুঁজছিল।

"নিশ্চয় কেউ না কেউ ওকে সন্দেশ সরাতে দেখেছে।...আমাদের সবাইকে চোর ভাবছে...চোরের ফ্যামিলি..."

"তুই অমন কচ্ছিস কেন...পাগল হলি নাকি?"

শোবার ঘরের তাকে কাগজে মুড়ে রাখা ছিল প্রায় গোটা কুড়ি সন্দেশ। চাপ খেয়ে দলা পাকানো। মা সেটা অনন্তের হাতে তুলে দিতেই সে ছুটে বেরিয়ে যায় উৎপলদের বাড়িতে।

"কাকাবাবু এগুলো নিন, অমর বাড়িতে নিয়ে গেছল।"

উৎপলের বাবা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"কী ব্যাপার?"

"অমর এগুলো বাড়িতে নিয়ে গেছল।"

'চুরি' শব্দটা বলতে গিয়েও বেধে গেল গলায়। কাঁধে হাত রেখে উৎপলের বাবা মৃদুহেসে বলেছিল. "আরে দূর, ছেলেপুলেরা এ-রকম একটু-আধটু করে থাকেই ফেরত দেবার কী দরকার। ও তুমি নিয়ে যাও।"

"না, আমরা নিতে পারব না।"

টেবলে তখন কাগজ বিছানো হচ্ছে, অমর কলাপাতা হাতে অপেক্ষা করছিল। অনন্ত ছুটে গিয়ে সন্দেশমোড়া কাগজটা টেবলে রাখল। দলাপাকানো কাগজটার ফাঁক থেকে সন্দেশ দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়েই অমরের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। সে ফ্যালফ্যাল করে তার আশেপাশের কৌতূহলী মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে হাতের কলাপাতাগুলো টেবলে নামিয়ে দিল।

"ছেলেটা সত্যিই ভাল।"

কে যেন তখন বলছিল। অনন্ত কোনওদিকে আর তাকায়নি। বাড়িতে এসে গুম হয়ে দালানে বসে থাকে। একটু পরেই অমর আসে।

"ভাল ছেলে সার্টিফিকেট নেবার জন্য আমাকে এ-ভাবে ডোবালে কেন? আমি পাড়ায় মুখ দেখাব কী করে?"

অনন্ত উঠে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড পর বিরাজমান নৈঃশব্দের মধ্যে চড়ের শব্দটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অমর কোনও কথা না বলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। একটু পরে অনন্ত ওর পাশে গিয়ে শোয়।

অমর দু'দিন ঘর থেকে বেরোয়নি। তৃতীয় দিন দুপুরে কোথায় যেন যায়, ফিরে আসে অনেক রাতে যখন পাড়া নিশুতি হয়ে গেছে। মা শুধু বলেছিল, "ভাত তোলা আছে খাবি?"

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই অনন্ত শুনতে পায় দালানে কথা বলছে মা আর অমর।

"আমি এখানে আর থাকব না. চলে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাবি?"

"ব্যবস্থা করে এসেছি।"

"ব্যবস্থা?"

"এন্টালিতে একজনের বাড়িতে থাকব, তার দুটো বাচ্চা ছেলেকে পড়ানো, দেখাশোনার কাজ করতে হবে।"

"তোর নিজের পড়াশুনো?"

"করব।"

অনন্ত শুনতে শুনতে অসাড় হয়ে গেল। তার মনে হল অমর আর কোনওদিনই এই সংসারে ফিবে আসবে না, চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কেন? বরাবরই ও আলগাভাবে ছিল এই সংসারের সঙ্গে। কিছুটা স্বার্থপর, কিছুটা উদাসীন। সবাই বলে ট্যালেন্টেড। ওকে বই নিয়ে পড়তে বিশেষ কেউ দেখেনি, অথচ ভাল রেজাল্ট করেছে। অনন্তের আশা ছিল, অমর ভাল চাকরি করে সচ্ছলতা আনবে, অন্তত বাবার থেকে বেশি রোজগার করবে।

সন্দেশগুলো ফিরিয়ে না দিলে অমর থেকেই যেত। সে কি অন্যায় কাজ করেছে? অনন্ত দু'দিন ধরে উত্তর খুঁজেছে। অমরের ধারণা ভালো ছেলে সাজার জন্য সে কাজটা করেছে। ভগবান জানে, মোটেই তা নয়। এই রকম কিছু দেখলে তার ভিতরে অসহ্য একটা চাপ তৈরি হয়, অস্থিরতা জাগে। সেটা বার করে না দিলে তার মনে হয় দম ফেটে মরে যাবে।

তাব তখন দশ-এগারো বছব বয়স। পাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় তারা কয়েকজন সমবয়সি ভলান্টিয়াব হয়েছিল। প্যান্ডেলের একধারে সাবিত্রী-সত্যবানেব মূর্তি রাখা ছিল। প্রতিমা দেখার পর মেয়েরা সরায় রাখা সিঁদুর সাবিত্রীর মাথায় ছুঁইয়ে নিজেদের সিঁথিতে দিত। সামনে রাখা থালায় পয়সা ফেলত। নানান আকারের রেজগিতে থালাটা ভরে উঠত দু'-তিন ঘণ্টাতেই। দশ পয়সা থেকে সিকি-আধুলি, দু'টাকা, এক টাকার নোটও থালায় পড়ত। যুগলদা থালাটা তুলে নিয়ে নতুন একটা থালা রেখে যেত।

নবমীব দুপুবে অরবিন্দই বলেছিল, "পার্কে নাগরদোলা বসিয়েছে চাপবি?"

"পয়সা নেই।"

অরবিন্দেব মামাতো ভাই পুজোয় বেড়াতে এসেছিল পাটনা থেকে। নাম ছিল নন্দন। তার কাছে ছিল একটা সিকি।

"দশ পয়সা এক-এক বাবে। আবও তো পয়সা চাই।"

অরবিন্দ আব নন্দন নিজেদেব মধ্যে ফিসফিস করে অনন্তকে বলল, "তুই এইদিকটা আড়াল করে দাড়া।"

"কেন?"

"যা বলছি শোন।"

তিনদিক ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটা ঘরে দু'হাত লম্বা সাবিত্রী হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে ভগবানকে ডাকছে, তাব পাশে শোয়ানো সত্যবান। সামনে বাঁশের বেড়া। দুপুরে ভিড় প্রায় নেই-ই। চৌকিতে রাখা ক্যাশবাক্সে মাথা রেখে অন্যদিকে মুখ করে কোষাধ্যক্ষ যুগলদা আধশোয়া। দুটি ছেলে রেকর্ড বাজাচ্ছে।

"পিছন ফিবে বাঁশে হেলান দিয়ে এদিকে মুখ করে দাঁড়া।"

অনন্ত ওর কথা-অনুযায়ী দাঁড়িয়েছিল। নন্দন তার পাশে দাঁড়াল। অরবিন্দ বাঁশেব উপর ঝুঁকে খুব মন দিয়ে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে। ওব হাতে একটা রুমাল। অনন্ত দেখল, রুমালটা হাত থেকে হঠাৎ থালার উপর পড়ল। অরবিন্দ দু'পাশে তাকিয়ে নিচু হয়ে এক লহমায় রুমালটা মুঠো করে তুলে প্যান্টের পকেটে রাখল।

অরবিন্দ মন্থরভাবে প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কর্পোরেশনের খাবার জলের ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তাদেব দু'জনকে ডাকল।

"চল।"

"না, যাব না।"

"নাগরদোলায় চাপবি না?"

"না। আমি দেখেছি অরবিন্দ রুমালের সঙ্গে পয়সাও তুলল।"

"আমরা ওমলেটও খাব। তাড়াতাড়ি আয়।"

অনন্ত যায়নি। ওরা দু'জন দূর থেকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। সে মাথা নেড়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। তখন তার ভয় করছিল। যদি কেউ দেখে থাকে? সারা

পাড়ার লোক জেনে যাবে, রাস্তায় বেরোলেই লোকেরা আঙুল দিয়ে দেখাবে, কী রকম চোখে যেন তাকাবে। তার থেকেও বড় কথা বাবা, মা লজ্জায় পড়বে।

প্যান্ডেলের সামনের বাড়ির ঝি দোতলার জানালা থেকে দেখেছিল। সে বলে দেয় যুগলদাকে।

"পয়সা সরিয়েছে ওরা?"

"কী জানি, আমি দেখিনি।"

"তুই তো ওদের সঙ্গেই দাঁড়িয়েছিলি।"

"হ্যাঁ, তবে আমি দেখিনি।"

পুজো কমিটির তিন-চারজন তখন হাজির ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে আলোচনা করছিল। একবার তার কানে এল— "না না এ-ছেলেটা ভালো... দলে নেই।"

পরদিন অরবিন্দ আর তার মামাতো ভাইকে ডাকিয়ে এনে প্যান্ডেলে কান ধরে ওঠ-বস করানো হয়। তার দু'দিন পর ওরা দু'জন অনন্তকে সন্ধ্যার সময় ধরেছিল গলির মুখে।

"তুই বলে দিলি কেন?"

"না বলিনি।"

"বলিসনি?"

অরবিন্দ তার পেটে এক ঘুসি মারল। সে পেট চেপে ধরে কুঁজো হতেই, ওরা দু'জনে এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাল তার বুকে-পিঠে-মাথায়। সে দু'হাত তুলে যতটা সম্ভব আটকাতে চেষ্টা করে। একবারও পালটা আঘাত করার চেষ্টা করেনি বা পালাতে চায়নি।

"ভালো ছেলে সাজা হচ্ছে? বলিসনি... তুই বলিসনি?"

"না, আমি বলিনি।"

ওরা আবার ঘুসি চালিয়েছিল। সেইসময় পাড়ারই একজন দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ধমক দেয়। ওরা দু'জন সরে যাবার সময় শাসায়, "আচ্ছা, পরে আবার ধরব, যাবি কোথায়?"

অরবিন্দ আব তাকে কিছু বলেনি। তার ঠোঁটের কোণের রক্ত দেখে মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে কারণটা বলেনি।

"হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছি।"

"দেখে চলবি তো?"

অনন্ত তখন হেসেছিল। মানসিক আনন্দের প্রতিচ্ছায়ার মতো এমনই অস্পষ্ট যে লক্ষই করা যায় না হাসিটা। সেইদিন থেকে তার হৃদয়ের অন্তস্থলে দ্রুত একটা কী যেন পরিবর্তন ঘটে গেছল। পাড়ার বা স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সে আর মিশত না। স্কুল থেকে ছেলেরা ছোট ছোট দলে বাড়ি ফিরত। সে ফিরত একা। যা তার চোখে পড়ত, বাসে ঝুলন্ত মানুষ, বৃষ্টি, বারান্দায় ঝোলানো খাঁচায় পাখি, নর্দমার নোংরা জল সব দেখত।

'ভালো ছেলে'। সেদিন পুজো প্যান্ডেলে কে যেন বলেছিল। কিন্তু সে 'ভালো ছেলে' কেন? অরবিন্দের মতো সে পয়সা চুরি করতে পারেনি। সততার জন্য জন্য নয়, আসলে তার ইচ্ছা হয়নি কিংবা সাহসে কুলোয়নি বলেই।

অরবিন্দই স্কুলে তার সম্পর্কে চাউর করে দেয়— ভালো ছেলে। তার মতো আরও অনেকে তখন বলতে শুরু করে। সে শুধু হাসত আর সেখান থেকে সরে যেত।

"অনন্ত সাধু হয়ে যাবে। বাজি ধরে বলছি।"

ক্লাসে একদিন ছেলেরা তার পিছনে লেগেছিল। সে মুখে হাসি ফুটিয়ে শুধু শুনে গেছল। হয়তো তার হাসিটা খাঁটি ছিল না কিন্তু শান্ত নিরাসক্ত একটা ভাব তাতে ছিল।

"ওকে চড় মেরে দেখ, কিছছু বলবে না।"

একজন তার গালে আলতো করে চড় মারে। সে তখনও হাসছিল।

অমরও তাকে 'ভালো ছেলে' বলল, কিন্তু সত্যিই কি সে তাই? সে ভিতু আর মুখচোরা বলেই কি সবার আগে নিরাপদ হবার জন্য ভালো ছেলে সাজে?

ঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখল মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে উঠানের দিকে তাকিয়ে।

অনন্ত অপরাধীর মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কলতলায় গেল মুখ ধুতে। ফিরে এসে দেখল মা একইভাবে বসে।

"আমি কি অন্যায় করেছি?"

মা একবার মুখ তুলে তাকাল। অনন্তের মনে হল সেই চাহনিতে যেন বলা রয়েছে— ন্যায়-অন্যায় বিচার করে কী লাভ?

"ও চলেই যেত, আজ নয়তো কাল।"

কয়েক ঘণ্টা পর অনন্ত চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল সেই ছোকরা, পরে জেনেছে ওর নাম রমেন, বেঞ্চে বসে সিগারেট খাচ্ছে, হাতে চায়ের গ্লাস ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তমুখে লোক-চলাচল দেখছে। দোকানে গৌরী নেই। এই নিয়ে গত এগারো দিন গৌরী অনুপস্থিত।

দুপুরে একটা ছোট ছেলেকে সে দোকানে দেখল। মুখের আদল আর গায়ের রং থেকে তার মনে হল বোধহয় গৌরীর ভাই। তবু নিশ্চিত হবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকে আগে দেখিনি তো, তোমাদের দোকান?"

"হ্যাঁ।"

"গৌরী কে হয়?"

"দিদি।"

"ও আজ এল না যে?"

"দিদির বিয়ে।"

অনন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "কবে?"

অপরিচিতের সঙ্গে ছেলেটি যেন এই বিষয়ে কথা বলায় অনিচ্ছুক। অনন্ত আর কৌতূহল দেখাল না। তার মনে হল, রমেনের সঙ্গে নয়, অন্য কোথাও গৌরীর বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তা যদি হয় তা হলে ভালই। রমেনকে তার ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তবে সে বিষণ্ণবোধ করল, গৌরীকে আর দেখতে পাবে না। এইরকম বিষণ্ণতা অমর সম্পর্কে তার হয়নি। এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত অন্যটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বার্থ। অমর রোজগার করে তার বোঝা হালকা করে দেবে এ ছাড়া আর কোনও প্রত্যাশা ওর কাছে নেই।

চার

দু'দিন পর বৃষ্টি হচ্ছিল সন্ধ্যাবেলায়। অনন্ত আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটা গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছিল ভিড়ের একধারে। রাস্তার কিনারে জল জমে গেছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জলে ফুটপাথ, রাস্তা এবার ডুবে যাবে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বৃষ্টির ছাট আসছে আর মানুষগুলো পিছিয়ে এসে জমাট হচ্ছে। রাস্তায় আলো কম, গাড়িও কম, লোকজন নেই বললেই চলে। স্টপে বাস এসে দাঁড়ালে এখান ওখান থেকে ছুটে এসে লোক উঠছে।

সেই সময় গৌরীকে ছুটে গাড়ি বারান্দার নীচে আসতে দেখে তার বুকটা ধক করে উঠল। বোধহয় বাস থেকে নামল। অনন্তকে দেখতে পায়নি। ওর কপাল, গাল, বাহু, থুতনি বেয়ে জল ঝরছে। আঙুল দিয়ে টেনে কপাল থেকে জল মুছে গৌরী পিছনে তাকাল।

"আরে!"

অনন্ত হাসল। সামান্য ইতস্তত করে গৌরীর পাশে এল। চোখে পড়ল গলার সবুজ মালাটা। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত ফ্রকটা লেপটে রয়েছে। স্তনের ডৌল এমনকী বোঁটাও ব্রেসিয়ারের মধ্য দিয়ে এত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে অনন্তের মনে হল ওর সর্বাঙ্গে যেন কোনও আবরণ নেই।

অনুও বড় হয়ে উঠেছে। তেরো বছরের হল। গৌরীর মতো এমন ভাপিয়ে ওঠা শরীর নয় তবু ওর বুক চোখে পড়ে। কয়েকদিন আগে সে ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল। অনুর পরনে তখন শুধুমাত্র সায়া, একটা হাত সবে ব্লাউজের মধ্যে গলিয়েছে। তাকে দেখেই কুঁকড়ে তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে যায়। ছি ছি কী ভাবল। অপ্রতিভ হয়ে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে মা'র সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

"এখানকার কাজটা ছেড়ে দেব ভাবছি।"

"কেন।"

"দূর, এ-সব কাজ শিখে কি উন্নতি করা যায়! পঁচিশ-তিরিশ বছর কাজ করছে এক-একজন আর মাইনে কিনা দু'শো-আড়াইশো।"

"তা হলে কী করবি?" ভয়ে ভয়ে মা বলেছিল। "তবু কয়েকটা টাকা তো আসছে।"

"চল্লিশ আবার টাকা নাকি? গয়নাগুলোর কিছুই তো আর রইল না, এরপর..."

"পোস্টাপিসের কাগজ না ভাঙালে আর তো কোনও উপায় নেই। দাসেদের বাড়িতে কাজটা নিলে তবু... এখন আর অত মানসম্মান দিয়ে কী লাভ? ভগবান যখন যে-অবস্থা দেবেন সেইভাবেই তখন চলতে হবে।"

"টাকাটা অনু-অলুর বিয়ের জন্য।"

"বারবার তুই ওই বলিস। খেতে-পরতে পাচ্ছি না আর বিয়ের জন্য টাকা রেখে দেওয়া। রাখ তো ও-সব কথা। যেমন ভাগ্য করে এসেছে তেমনি বিয়ে হবে। কবে তুই আয় করবি, অমর করবে, তার জন্য অপেক্ষা করে কি সংসার চলবে? অনুকে স্কুল ছাড়িয়ে দেব, মিছিমিছি টাকা নষ্ট করা। ও নিজেও আর পড়তে চাইছে না।"

"সে কী, ছেড়ে দেবে পড়া?"

অনন্ত মর্মাহত হয়েছিল। অনু তখন শাড়ি পরে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আর পড়বি না?"

"না।"

অনুর স্বরে জেদ ছিল। সংসারকে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু ক'টা টাকাই বা তাতে বাঁচবে? ভাল ঘর-বর পাবার কোনও যোগ্যতাই ওর নেই। সাদামাটা, স্বাস্থ্য নেই, চটক নেই, লেখাপড়াও ক্লাস সিক্স। শুধু অনু নয়, অলুরও বিয়ে দিতে হবে কিন্তু কীভাবে যে পারবে তা সে জানে না। অমর নাকি দুটো টিউশনি করছে। ষাট-সত্তর টাকা নিশ্চয় হয়। কাউকে কিছু বলেনি, কিছু চায়ও না। কলেজের মাইনে, বইপত্র, বা জামাপ্যান্ট কেনার জন্য হাত পাতে না। কিন্তু তাতেও কি কোনও সাশ্রয় হচ্ছে। শুধু আধ-পেটা খেয়ে থাকতেই তো কম করে মাসে দেড়শো-দু'শো টাকা দরকার। সার্টিফিকেটগুলো না ভাঙালে উপোস দিয়ে মরতে হবে।

দমকা বাতাস গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়ানো লোকগুলোকে বৃষ্টির ছাঁট ভিজিয়ে দিল। গৌরী সরে এল তার গা ঘেঁষে।

"তুমি এখানে কোথা থেকে?"

"একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, পেলুম না।"

"মনে হল তুমি বাস থেকে নামলে।"

"না তো, এতক্ষণ ওধারে মুদি দোকানের সামনে একটা ছোট্ট বারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখেছ কী রকম ভিজে ঢোল হয়ে গেছি!"

"জ্বর হতে পারে।"

"আমার অভ্যেস আছে ভেজার।"

অনন্ত আড়চোখে দেখল কয়েকজনের নজর গৌরীর বুকের উপর গেঁথে রয়েছে। সে একটু সরে গৌরীকে আড়াল করল।

"তোমাকে আর দোকানে দেখি না যে?"

"ভাল লাগে না তাই যাই না।"

"তোমার নাকি বিয়ে?"

"কে বলল?"

"তোমার ভাই।"

"অ।"

দু'জনেই চুপ করে রইল। রাস্তার আলোয় বৃষ্টিকণা বরফের মতো ঝলসে উঠছে। অনন্তের গায়ে কাঁটা দিল ঠান্ডা বাতাসে। গৌরী লেপটানো ফ্রক দেহ থেকে ছাড়ানোয় ব্যস্ত। রাস্তার মাঝে গোছ ডুবে

যাওয়ার মতো জল জমে গেছে। গাড়ি চলে যাওয়ামাত্র ঢেউ এসে ফুটপাথের উপর ভাসিয়ে দিচ্ছে। ওরা পিছিয়ে বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

"জোর করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।"

"এত তাড়াতাড়ি?"

"আমিও তো তাই বলেছি। বাবা-ই শুনছে না... বোধহয় আঁচ পেয়েছে।"

"কীসের?"

"রমেনদার সঙ্গে আমার ব্যাপারটা।"

"কী ব্যাপার?"

"থাক, আর ন্যাকামোয় দরকার নেই। ব্যাপার কাকে বলে যেন উনি জানেন না!"

অনন্ত কথা বলল না। গৌরীর ভিজে চুল থেকে সে নারকেল তেলের গন্ধ পাচ্ছে। তার কনুইয়ের সঙ্গে দু'বার ছোঁয়া লাগল গৌরীর বাহুর। মা বা বোনেদের ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ের এত কাছে সে দাঁড়ায়নি। অদ্ভুত ধরনের একটা প্রফুল্লতা আর সাহস তার ভিতরে তৈরি হয়ে যাচ্ছে অথচ সে জানে গৌরীর মনে তার জন্য আলাদা কোনও জায়গা নেই। নেহাতই রোজ দেখা হতে হতে যতটুকু আলাপ। তাদের বয়সটা কাছাকাছি। গৌরী স্বভাবে খোলামেলা, কথা বলতে ভালবাসে। বোধহয় লেখাপড়া একদম করেনি।

বৃষ্টি ধরে আসছে। অনেকেই হাত বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে কতটা কমেছে। কয়েকজন গাড়িবারান্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। জায়গাটা ফাঁকা হয়ে আসছে দেখে অনন্ত অস্বস্তিবোধ করে বললে, "তুমি তো এবার বাড়ি যাবে?"

"হ্যাঁ যাব, তুমিও তো যাবে।"

"আমার খুব একটা তাড়া নেই। আমি এ রাস্তা ও-রাস্তা করে বাড়ি যাই।"

"বাড়িতে কে কে আছে?"

"মা আর দুই বোন। একটা ভাই ছিল সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তোমায় তো বলেইছি আমার বাবা নেই.. বাস চাপা পড়ে মারা গেছে।"

"আহ্।"

অনন্তের মনে হল গৌরীর মুখ থেকে শব্দটা স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এসেছে।

"চলো এবার হাঁটি, তুমি তো এখন সোজা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে যাবে, আমি যাব একেবারে উলটোদিকে, বিবেকানন্দ রোড হয়ে. হেদোর পাশ দিয়ে।"

"আগে একটু গরম চা খেয়ে নিলে বেশ হত, খাবে?"

"আমি দিনে দু' কাপের বেশি খাই না।"

"আমার জন্য নয় আজ এক কাপ বেশিই খাবে। চলো, একটু এগোলেই ঘোষ কেবিন।"

"তুমি দেখছি এখানকার সব চেনো, আস বুঝি?"

গৌরী হাসল। ওরা ফুটপাথ দিয়ে জল ভেঙে চলতে শুরু করল। দু'জনেই হাতে চটি তুলে নিয়েছে। বৃষ্টি এখন গুঁড়ি গুঁড়ি। ফুটপাথ কোথায় শেষ হয়ে রাস্তা শুরু হয়েছে সেটা জলে ডুবে থাকায় বোঝা যাচ্ছে না।

"দাঁড়াও আমি আগে রাস্তায় নামি।"

অনন্ত পা টিপে টিপে ফুটপাথের কিনারে এসে সন্তর্পণে রাস্তায় নেমে হাত বাড়িয়ে দিল: "হাতটা ধরে নামো।"

গৌরী তার হাত ধরে নামার সময় গর্তে পা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েই হাত সরিয়ে নিতে গেল। গৌরী আঁকড়ে ধরে রেখেছে তার হাত।

"ধরে থাকো, আবার কোন গর্তে যে পড়ব কে জানে।"

অনন্তের মনে হচ্ছে হাতটা তার দেহের অংশ নয়। বুকের মধ্যে ধকধকানিটা এবার কানে তালা লাগিয়ে দেবে। লোমকূপগুলো এক একটা আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। এই প্রথম নারীদেহের কোমলতা সে অনুভব করল। নিজের অজান্তে সে গৌরীর কবজি অস্বাভাবিক জোরে চেপে ধরতেই মুখ তুলে গৌরী তাকাল, চোখে বিস্ময়। অনন্তের চোখ জ্বালা করছে, সে পরিচ্ছন্নভাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

"হাতটা ছাড়ো।"
সে দ্রুত হাতটা টেনে নিয়ে নিজের দেহের সঙ্গে চেপে ধরল।
"আমি চা খাব না, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"
"আমার কাছে আছে।"
ঘোষ কেবিনে পাশাপাশি ওরা বসল। দু'জনেই ভিজে সপসপে। গৌরী ইশারায় দোকানের ছেলেটাকে ডাকল।
"দুটো ডবল হাপ।"
"আর কিছু দোব, ওমলেট, মটন চপ, মটন কাটলেট, মটন দোপেঁয়াজি, ফিশ ফ্রাই?"
গৌরী তাকাল অনন্তের দিকে। সে মাথা নাড়ল।
"দুটো ফিশ ফ্রাই।"
ছেলেটি সরে যেতেই ফিসফিস করে অনন্ত বলল, "আমার কাছে সত্যিই পয়সা নেই।"
"বললুম তো আমার কাছে আছে।"
"তুমি পেলে কোথায়?"
"যেখান থেকেই পাই না।"
"কেউ দিয়েছে তোমায়?"
গৌরী চুপ করে রইল।
"তোমার রমেনদা?"
এক চিলতে হাসি ওর মুখে ফুটে উঠল। সাদা পাথরের টেবলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে মুখটা ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।
"মালাটাও ওর দেওয়া।"
"দেখতে ভাল নয়?"
"বাবা তো বিয়ে ঠিক করেছে, তা হলে কী করবে?"
"করুক না ঠিক, আমি আমার ব্যবস্থা করব।"
"কী ব্যবস্থা?"
"সে এখন বলব না।"
"তোমার রমেন এখানেই কোথায় যেন থাকে।"
"হ্যাঁ আর একটু এগিয়ে বাঁ দিকের গলিটায়। ওদের বাসাতেই এসেছিলুম, বেরিয়ে গেছে কোথায়।"
"তুমি প্রায়ই আস?"
"হ্যাঁ।"
"লোক কেমন, কী করে?"
"ফরেন মাল খিদিরপুর থেকে এনে বিক্রি করে, আমাকে একটা আমেরিকান জর্জেট দিয়েছে, দারুণ শাড়িটা।"
"তুমি আমার কাছে একটা আলুর দমের দাম নাওনি, মনে আছে? আবার আজকেও খাওয়াচ্ছ। তোমার কাছে আমার দেনা রয়ে গেল।"
"শোধ দেবে বুঝি!"
"হ্যাঁ, তবে এখন নয়। আগে হাতে টাকা আসুক।"
"এরা কত দেয়?"
"চল্লিশ টাকা।"
"য়্যা, মোটে চল্লিশ।"
গৌরীর মুখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখে অনন্ত লজ্জা পেল। মুখ নিচু করে আঙুল দিয়ে টেবলে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। ছেলেটা টেবলে প্লেট নামিয়ে রাখতেই সে মুখ তুলল। আড়ষ্ট হাতে ছুরি দিয়ে ফ্রাইটা খণ্ড করতে করতে বলল, "যা জুটে গেল তাই করছি, চাকরির যা বাজার। শুধু শুধু বসে থাকার চাইতে তবু তো... তবে চেষ্টা করে দেখছি।"

ফ্রাইয়ের একটা খণ্ড মুখে দিয়ে আরামে সে চিবোতে লাগল। স্বাদটা বড় ভাল, খিদেও পেয়েছে খুব। গৌরীর ছুরি-কাঁটা ধরা দেখে সে বুঝতে পারছে তার মতো আনাড়ি নয়। হঠাৎ তার মনে পড়ল অনু-অলুকে। সে আজ বাজার থেকে যা এনেছে তাই রান্না হয়েছে। সকাল থেকে ভাত আর আলু-ঝিঙে-পোস্ত ছাড়া এখনও পর্যন্ত কিছু ওদের পেটে পড়েনি। মা পেট ভরে কখনই খেতে পায় না। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে কিছুই তো প্রায় থাকে না।

ফ্রাইটা আর তত স্বাদু মনে হচ্ছে না। পর পর মুখগুলো ভেসে উঠছে। ওরা যখন জানবে সে রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসেছে তখন মনে মনে কিছু একটা নিশ্চয় ভাববে। যদি ভাবে সংসারের টাকা থেকে সরিয়ে সে খেয়েছে! গৌরী নামে একটা মেয়ে যে তাকে খাইয়েছে, এ-কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

তার বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। একটু আগেও তার মনে হচ্ছিল আজকের দিনটা জীবনে মনে রাখার মতো একটা দিন। যতদিন বাঁচবে সে গৌরীর প্রত্যেকটি কথা, দেহের যাবতীয় নড়াচড়া, ওর চুলের গন্ধ, ওর চাহনি, হাসি, বিস্ময় সব স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রেখে দেবে। তাই সে উদগ্রভাবে প্রতিটি মুহূর্তকে শুষে নিয়ে জমা করে রাখছিল তার চেতনার প্রতিটি কোষে। কিন্তু হঠাৎ কোষগুলোকে ফাটিয়ে দিল কতকগুলো শুকনো অবসন্ন মুখ।

"আচ্ছা, এই যে খাচ্ছি। মুখে গন্ধ হবে?"

"হবেই তো। পেঁয়াজ, রাই সর্ষে...গন্ধ হবে না?"

অনন্ত দমে গেল। সে ঠিক করল মশলা দেওয়া পান খাওয়াবার জন্য গৌরীকে বলবে।

"তুমি ধুতি পরো কেন? এখনকার ছেলেরা তো প্যান্টই পরে।"

"এটা বাবার ধুতি।"

"মরা মানুষের জিনিস ব্যবহার করতে নেই।"

"করলে কী হয়?"

"কিছুই হয় না, তবে লোকটার কথা মনে পড়ে যায়। তোমার মনে পড়ে না বাবাকে?"

"কই না তো! বাবা আমাদের সঙ্গে খুব কমই কথা বলত, আমরাও কাছে ঘেঁষতুম না।"

"এক-একজন লোক ওই রকম হয়, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে না; আমার বাবাও ওই রকম।"

অনন্তের খাওয়া হয়ে গেছে। প্লেটে পড়ে আছে শুধু স্যালাড। খুঁটে খুঁটে সে বিট আর গাজরের কুচি মুখে দিতে লাগল পেঁয়াজ বাদ দিয়ে। গৌরী দু' আঙুল তুলে ছেলেটাকে বলল "চা।"

অন্য টেবলগুলো ভরে আছে। তাদের টেবলেও মুখোমুখি অফিসফেরত দু'জন দু'কাপ চা নিয়ে বসে। তারা বৃষ্টি, রাস্তায় জমা জল নিয়ে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে নিরাসক্তচোখে, গৌরীর দিকে তাকাচ্ছে।

"আমার ছাদটা ফাটা, শোবার ঘর বোধহয় ভেসে গেছে।"

লোকটিকে উদ্বিগ্ন মনে হলেও ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে না বাড়ি যাবার জন্য। মনে হয় রোজই এই সময় এখানে এসে চা খায়।

অনন্ত গরম চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে কাপ সরিয়ে নিল।

"জিব পুড়ল তো?"

"এত গরম বুঝতে পারিনি।"

সে প্লেটে চা ঢেলে ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে নিয়ে খেল। গৌরী তাই দেখে শুধু হাসল।

দরজার কাছের টেবলে দোকানের মালিক বসে। গৌরী ফ্রকের গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ব্রেসিয়ারের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ বার করল।

"তিন টাকা চল্লিশ।"

অনন্ত কৌতূহল সামলাতে না পেরে আড়চোখে দেখল ব্যাগটার মধ্যে ভাঁজ করা কয়েকটা দু'টাকার নোট। পাঁচ টাকার নোটের রংও দেখতে পেল। দুটো দু'টাকার নোট গৌরী টেবলে রাখল। মৌরি রাখা প্লেটে মালিক একটা আধুলি আর দশ পয়সা রাখল। ছেলেটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী আধুলিটার সঙ্গে খানিকটা মৌরিও তুলে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ইতস্তত করে অনন্তও দু'আঙুলের চিমটেয় মৌরি তুলল।

"দশ পয়সাটা নিলে না যে, বকশিশ?"

"হ্যাঁ।"

"সেলাম করল না তো!"

"দশ পয়সায় আবার সেলাম দেবে কী!"

রাস্তায় জল, ফুটপাথেও পায়ের গোছ ডুবে যাচ্ছে। জলের মধ্যে পা টেনে টেনে সাবধানে গর্ত খুঁজে খুঁজে লোকেরা হাঁটছে। বৃষ্টি-ধোওয়া গাছের পাতাগুলো ছাড়া আর সব কিছুই ম্লান। ঘোষ কেবিনের নিওন আলোয় গৌরীর গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ভিজে চুল মাথায় বসা। ফ্রকটা ন্যাতার মতো শরীরে ঝুলছে।

"কোনদিকে যাবে, বাড়ি?"

"হ্যাঁ। তুমিও?"

"চলো তোমার সঙ্গে খানিকটা যাই।"

অনন্ত একবার ভাবল, চটি হাতে তুলে নেবে কি না। সাত মাস আগে চার টাকা দিয়ে ফুটপাথের দোকান থেকে কেনা। স্ট্র্যাপ ঢিলে হয়ে গেছে, জল ঠেলে যেতে যেতে যদি খুলে যায়! গৌরীর পায়েও চটি কিন্তু হাতে তুলে নেয়নি। সে আর চটির কথা ভাবল না। ধুতিটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে গৌরীর পাশাপাশি হেঁটে চলল।

"তোমার সঙ্গে বোধহয় কারুর ভাব নেই।"

অনন্ত বুঝতে পারল না গৌরী কী বলতে চায়। সে মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মিশি না।"

"ছেলে নয় মেয়ে। কারুর সঙ্গে তোমার ভাব নেই?"

অপ্রতিভ হল অনন্ত। ভাব থাকাটা ভাল না মন্দ, উচিত কি অনুচিত, সে বুঝতে পারছে না।

"নাহ্, ও-সব আমার নেই।"

"কী নেই?"

গৌরী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওর চোখে হাসি। একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে আসছে জল ছিটিয়ে। তাদের সামনে যে-লোকটি যাচ্ছে সে ধমক দিয়ে উঠল। বোধহয় ছেলেটা শুনতে পেল না বা অগ্রাহ্য করল। গৌরী কাছে সরে এল। অনন্ত থমকে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে ধরতে গিয়ে পারল না।

"তুমি খুব ভালো ছেলে।"

"কী করে বুঝলে!"

"সে বুঝতে পারি। তুমি একদমই চ্যাংড়া নও।"

"আমার ঘাড়ের উপর একটা সংসার। তাদের দেখতে হবে তো।"

ওরা কিছুক্ষণ কথা বলল না। যত এগোচ্ছে ফুটপাথের জল ক্রমশই কমে আসছে। ট্রাম বন্ধ। স্টপে এক-একটা বাস থামছে আর ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষ। গাড়ি আর পথচলতি লোকে রাস্তাটা বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। দু'ধারে জল জমে থাকায় রাস্তার মাঝখান দিয়ে রিকশা আর লোক চলছে। বাস, ট্যাক্সি বা বাড়ির মোটরের গতি মন্থর স্রোতের মতো মানুষ হেঁটে চলেছে শিয়ালদার দিকে।

দু'জনে ফুটপাথের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাস্তাটার জটপাকানো অবস্থা দেখছিল।

"তোমাকে একটা কথা বলব, কাউকে এ-পর্যন্ত কিন্তু বলিনি।"

"কী কথা?"

গৌরী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "রমেনদার সঙ্গে আমি চলে যাব।...দমদমায় ঘর দেখে এসেছে।"

"সে কী!"

"কেন, মেয়েরা কি ভালবেসে ঘর ছাড়ে না?"

"তোমার বয়স কত?"

"বয়স দিয়ে কী এসে যায়?"

"তোমার বাবা রেগে যাবে।"

"যাবে তো যাবে, আমার তাতে বয়েই গেল।"

"তোমার বিয়ে ঠিক করেছে।"

"কে করতে বলেছে? হাওড়ায় কোন এক গ্রামের ছেলে চাষা না কুলি কে জানে... রমেনদাকে বাবা কেন যে দেখতে পারে না জানি না।"

"যদি পুলিশে খবর দেয়?"

"দিক না, খুঁজে পেলে তো! তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না।"

"না।"

অনন্ত নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। গৌরী তাকে বিশ্বাস করেছে। নিশ্চয় কিছু একটা তার মধ্যে পেয়েছে বলেই। এই রকম আস্থা তার উপর এখন পর্যন্ত কেউ তো রাখেনি। কিন্তু রমেন লোকটাকে তার ভাল লাগেনি। গৌরীর উচিত হবে না ওর সঙ্গে চলে যাওয়া। তার মনে হল কথাটা বোধহয় এখন বলা ঠিক হবে না। সাহস করে ঘর ছাড়ছে, অমরও তাই করেছে।

মা কালকেও অমরের কথা বলেছে: 'ছেলেটা কোথায় গেল একটু খোঁজ কর।' সে বলেছিল, 'কচি-খোকা নয়, ঠিকই আছে কোথাও, এখানের থেকে হয়তো ভালই আছে।

গৌরীর বাড়িতেও এইভাবে কথা হবে নিশ্চয়।

"তোমার মা কষ্ট পাবে।"

"তা পাবে। আমি চিঠি লিখে যাব।"

"কবে যাবে?"

"এখনও দিনটিন ঠিক করিনি, টাকাপয়সা ব্যবস্থা করার ব্যাপার আছে তো, সংসার পেতে বসার জন্য সবই তো কিনতে হবে।... তোমায় যাবার আগে বলব। এখন যাই, আর আসতে হবে না।"

"আমায় বলবে কী করে?"

"ভাইয়ের হাতে চিঠি দোব, যখন খেতে আসবে তোমায় দেবে... চলি।"

গৌরী রাস্তা পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে তার নিতম্বের দোলা, আর ফ্রকের গাঢ় নীল ফুলছাপ আর ভিজেচুল যতক্ষণ দেখা যায় অনন্ত দেখার চেষ্টা করল। আশা করেছিল একবার অন্তত পিছন ফিরে তাকাবে, কিন্তু গৌরী তাকায়নি। এতক্ষণ যে মৃদু আঁচ তার মনকে তাজা ঝরঝরে করে রেখেছিল গৌরী চলে যাওয়ামাত্র সেটা নিবে আসছে। ওর চলে যাওয়ার মধ্যে কেমন একটা নিষ্ঠুর ভঙ্গি রয়েছে যাকে বলা যায় কাঠিন্য। তবে ওর মায়া-মমতাও আছে। একবার আলুর দমের দাম নেয়নি, আজও ফ্রাই খাওয়াল। অথচ কী এমন তার সঙ্গে পরিচয়? পাঁচ মাস ধরে দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হওয়া আর কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তা! কত সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলল আজ। কত তাড়াতাড়ি তাকে বিশ্বাস করেছে নয়তো বাড়ি থেকে পালাবার কথা কি বলত?

একটা গুপ্ত খবর জেনে যাওয়ার এবং সেটাকে কোনওমতেই প্রকাশ না করার সংকল্প থেকে তৈরি হওয়া চাপ তার মধ্যে উত্তেজনা এনে দিয়েছে। বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে হাঁটতে অনন্তের মনে পড়ল পান খাওয়াবার জন্য গৌরীকে আর বলা হল না। মুখে কি গন্ধ হয়েছে? নিজের মুখের গন্ধ টের পাওয়া যায় না। হাতের চেটোয় ভাপ দিয়ে সে শুঁকল, কিছু বুঝতে পারল না। তাইতে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। সে ঠিক করল আজ সবার সঙ্গে দূর থেকে কথা বলবে। মুখটা অন্যদিকে ঘোরাবে মা যখন ঝুঁকে থালায় কিছু দিতে থাকবে।

কিংবা বলেই দেবে গৌরী তাকে খাইয়েছে। কে গৌরী? চাওয়ালার মেয়ে, রোজ ওর সামনে বেঞ্চে বসে আলুর দম দিয়ে রুটি খাই, তখন কথাবার্তা বলি। নানান রকমের কথা, সিনেমা, জামাকাপড়, হাঁটার স্টাইল, পুরুষদের কত রকমভাবে মেয়েদের দিকে তাকানো, বাড়িওয়ালাদের বদমাইশি, আরও অনেক রকম কথা। খুব ভাল মেয়ে একদমই গায়েপড়া নয়। বয়স? প্রায় সমান-ই কিংবা দু'-এক বছরের ছোট।

মা কী ভাবে নেবে? খারাপ কিছু ভাববে কি? সন্দেহ করার মতো মন মায়ের নয়। তা যদি হত তা হলে নিশ্চয় জেনে যেত মিনু নামে একজনের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিল।

অনন্ত যখন বাড়ি পৌঁছল শীলা তখন অবিনাশের সঙ্গে কথা বলছে। অনু ঘরে নেই বোধহয় পাশের বাড়িতে কিংবা দোতলায় আর অলু তক্তাপোশের এককোণে কাত হয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। ভিজে

শার্ট আর ধুতি উঠোনের তারে মেলে দিয়ে অনন্ত ঘরে আসতেই অবিনাশ বলল, "রাস্তার জল কমেছে?"

"এদিকে বিশেষ জল জমেনি। আমাদের ওদিকটায় খুব জমেছে।"

"ঠাকুরপো অনেকক্ষণ এসেছেন, অফিসে নাকি লোক নেবে, তাই বলছিলেন...

"কিন্তু ও তো স্কুল ফাইনালটাও পাশ করেনি, টাইপও জানে না।... তাই বলছিলুম প্রাইভেটে পরীক্ষাটা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আর সেইসঙ্গে টাইপটাও শিখে নিলে ভাল। এমপ্লয়ির ছেলে, ধরাধরি করলে হয়ে যাবে ইউনিয়নও এ-সব ক্ষেত্রে বাগড়া দেবে না, আমি কথা বলেছি। তুই সামনের বছরই পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হ। এখানে না হোক অন্য কোথাও চেষ্টা করা যাবে। কোয়ালিফিকেশন না থাকলে তো কোথাও কিছু পাবি না। দপ্তরির কাজ করে কত টাকা আর পাবি, নিজে কারবার খুলেও যে কিছু করবি তা-ও সম্ভব নয়।"

"না, আমি দপ্তরিখানা ছেড়ে দেব, এখানে আমার ভবিষ্যৎ নেই।"

অনন্ত ভারী গলায় বিজ্ঞের মতো তার সিদ্ধান্ত জানাল। শীলা চকিতে একবার অলুর দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "মেয়েদের বিয়ের টাকা ভাঙিয়ে খাচ্ছি। তা-ও তো একদিন শেষ হয়ে যাবে, তারপর?"

অবিনাশ মেঝের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হল। অনন্ত একদৃষ্টে দেয়ালে চোখ রাখে, কোলের উপর হাতদুটি। শীলা এই নীরবতাকে ভাঙার চেষ্টা করল না।

"অমরকে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি।"

দু'জনে অবিনাশের মুখে জিজ্ঞাসু চোখ রাখল।

"ওকে ওইভাবে অপদস্থ করা অনন্তর উচিত হয়নি... জীবনে এ-সব জিনিস বহু ঘটে, সামান্য ব্যাপার, তাই নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি... ছেলেটার মনে খুবই লেগেছে।"

অনন্ত মাথা নামাল। তারও একসময় মনে হয়েছিল, সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। অনুতপ্ত বোধ করে ভেবেছিল অমরের খোঁজ নেবে পাড়ায় ওর বন্ধুদের কাছে অথবা কলেজে। কিন্তু কিছু সে করেনি।

"কোথায় গেছে?"

"জানি না।"

"ও থাকলে, চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই সংসারটাকে মোটামুটি নিশ্চিন্ত করে দিতে পারত।"

অনন্তের মনে হল, আর একটা বোঝা তার ঘাড়ে এসে পড়ল। সংসারের নিশ্চিন্ত হওয়ার একটা পথ ছিল কিন্তু তার জন্যই সেই পথ হারিয়ে গেল। এখন তার উপরই দায়িত্ব পড়ল আবার পথ বার করে নিশ্চিন্তি এনে দেওয়ার। নিশ্চিন্তি মানে টাকা রোজগার করতে হবে কিন্তু কীভাবে করবে?

"আমাকে তা হলে স্কুল ফাইনাল পাশ করতে হবে?... কিন্তু আমি তো সব ভুলে গেছি।"

তার করুণ স্বর অবিনাশের গম্ভীরমুখে হাসি ফোটাল। অলু একবার বই থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

"বই জোগাড় কর। পারিস তো একটা কোচিংয়ে ভরতি হয়ে যা। রোজ যদি ঘণ্টাচারেক করেও বই নিয়ে বসিস তা হলে ছ' মাসেই তৈরি হয়ে যাবি, পারবি না?"

অনন্ত শুধু তাকিয়ে রইল। ঠিক এইভাবে এই ঘরেই সে একদিন শুনেছিল, 'ভাগ্য যদি অন্যরকম অবস্থায় ফেলে দেয় তা হলে আর কী করার থাকতে পারে। মা'কে দেখা, ভাইবোনদের মানুষ করে তোলা, নিজেকে নিজে বড় করা...'

সে মুখ নামিয়ে বুকের মধ্যে আটকে রাখা বাতাস নাক দিয়ে বার করার সময় বলল, "দেখি।"

"দেখি আবার কী? তোর মতো ভালো ছেলের না পারার তো কথা নয়!"

"পারবে না কেন, খুব পারবে।"

শীলা এমন এক সরল প্রত্যয় নিয়ে বলল যে ভয় পেয়ে অনন্ত রেগে উঠল। তীক্ষ্ণ-চোখে সে তাকাল।

"আমার পড়াশুনোর ব্রেন নেই, থাকলে কি ফেল করতুম?"

"তোকে তো ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে হবে না, শুধু পাসটা করতে হবে চাকরি পাবার জন্য। খাটলেই পাশ করা যায়।"

অনন্ত আবার মুখ নামিয়ে ফেলল। তাকে আবার বই নিয়ে বসতে হবে। আবার অঙ্ক, গ্রামার, এসে, সংস্কৃত, লেটার রাইটিং, মুখস্ত আর মুখস্ত। ভালো ছেলেরা পারে, পারতেই হয়, তাদের বড় হতে হয়, সবাইকে দেখতে হয়।

ক্লান্তচোখে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকিয়েই যেন বলল, 'ঠিক আছে।"

পাঁচ

ছ'মাসে নয়, অনন্ত প্রথমবার ফেল করে পরের বার কোনওক্রমে পাশ করেছিল। কিন্তু তারই মধ্যে জীবন একটা বাঁক নিয়ে কিঞ্চিৎ স্বস্তি এনে দেয় তাদের সংসারে। সে আড়াইশো টাকার একটা চাকরি পেয়ে যায়।

সেদিন অশোকবাবুর কোচিং থেকে ফিরতে তার রাত হয়ে গেছল। তাকে আটকে রেখেছিলেন একটা প্যাসেজ ইংরেজিতে নির্ভুল অনুবাদ করাবার জন্য। একসময় বিরক্ত হয়ে তিনি বলে ওঠেন, "বাড়ি যা, তোর দ্বারা এ-সব হবে না। তোর ভাইয়ের পেছনে এর ওয়ান-টেন্থও খাটতে হয়নি অথচ কী রেজাল্ট করল, আর তুই..."

অনন্ত বিষণ্ণমনে বাড়ি ফেরার সময় ঠিক করে ফেলে প্রত্যেকদিন ভোরবেলায় সে একপাতা করে গ্রামারও মুখস্থ্ করবে।

বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র শীলা ব্যস্ত হয়ে বলল, "উৎপলদের চাকরটা তোকে ডাকতে এসেছিল, ওর বাবার কী যেন দরকার তোকে। এলেই যেতে বলেছে, কীজন্য তা আর বলল না।"

অনন্ত অবাক হয়ে বলল, "আমাকে! ব্যাপার কী? আমার সঙ্গে তো ওনার জীবনে কখনও কথা হয়নি।"

তারপরই মনে পড়ল সন্দেশগুলো সে ওঁকেই ফেরত দিয়েছিল তখনই প্রথম দু'-চারটে কথা বলেছিলেন। উৎপলের বাবা সাধন বিশ্বাস পেশায় অ্যাটর্নি। কাঁচাপাকা চুল, কখনও ইস্ত্রিবিহীন পাঞ্জাবি বা পাজামা পরেন না। গালদুটি সর্বদা মসৃণ, পায়ে চটি। একটা ভক্সহল মোটরে অফিসে বেরোন। সন্ধ্যাব পর একতলার ঘরে ওঁকে দেখা যায়। চামড়ামোড়া গদির চেয়ারে বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে। ঘরের এককোণে পিছন ফিরে একটা লোক টাইপ করে যায় রামকৃষ্ণদেবের ছবিটার নীচে চেয়ারে বসে।

"গিয়ে দেখ না একবার, ঘরে তো আলো জ্বলছে।"

শীলার মতো অনু-অলুও উদ্গ্রীব চোখে তাকিয়ে। সে নিজেও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ওদের মতো।

সাধন বিশ্বাসের ঘরের দরজা থেকে সে সন্তর্পণে উঁকি দিল। টাইপিস্ট তার কাজে ব্যস্ত। সাধন বিশ্বাস চেয়ারে হেলান দিয়ে মনোযোগে কী একটা পড়ছেন। সে বুঝে উঠতে পারছে না এখন তার কী করা উচিত।

উনি মুখ তুললেন এবং দ্রুত আড়ালে সরে-যাওয়া অনন্তের উদ্দেশে বলে উঠলেন, "কে ওখানে?" সাড়া না পেয়ে আবার বললেন, "ওখানে কে?"

"আমি সামনের বাড়ির অনন্ত।'

চেনার জন্য কয়েক সেকেন্ড মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ও, এসো।"

অনন্ত পা টিপে ঘরে ঢুকল। মোজাইকের ঝকঝকে মেঝেয় ফুলের নকশা, মাড়াতে অস্বস্তি হয়। চেয়ারের পিঠ ধরে সে দাঁড়াল।

সাধন বিশ্বাসের ঠোঁটে হাসি দেখে সে বিভ্রান্ত হল, কোনও ধারণায় আসতে পারছেন না কেন তাকে ডেকেছেন!

"দেরি করলে যে?"

"কোচিং থেকে ফিরতে ফিরতে..."

"কী পড়তে যাও?"

"প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দোব...দেবার ইচ্ছে আছে।"

"সারাদিন কী করো?"

"একটা দপ্তরিখানায় কাজ শিখতে যাই।"

"অ্যাপ্রেন্টিস?... কত পাও?"

অনন্তর চোখে ভেসে উঠল গৌরীর মুখটা আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল, "য়্যাঁ, মোটে চল্লিশ!" টাকার পরিমাণটা অসম্মানজনক যে কেউ শুনলেই তার সম্পর্কে ধারণা নীচে নামিয়ে দেবে।

"কমই দেয়...একশো চল্লিশ।"

একবার মুখের দিকে তাকিয়ে সাধন বিশ্বাস কলমটা টেবলে ঠুকতে শুরু করলেন। অনন্ত ভয় পেল, মিথ্যাটা কি ধরে ফেলেছেন? হয়তো কোনওভাবে শুনেছেন কত পায়।

"একটা চাকরি আছে সৎ আর বিশ্বাসী লোক দরকার, তোমার কথা মনে পড়ল। করবে?"

"কী কাজ?" অনন্তের শ্বাসকষ্ট শুরু হল।

"আমার বন্ধু আবার ক্লায়েন্টও, কলকাতায় অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে, বস্তি আছে একটা, বাড়ি আছে গোটাচারেক, নতুন একটা ফ্ল্যাটবাড়িও তৈরি করছে পার্ক সার্কাসে, শিবপুরে পেট্রল পাম্প, দেশে জমিজমা সিনেমা হল আছে, তা ছাড়া কয়লার ব্যবসা ওষুধের দোকান... নিজে কিছুই দেখে না, বনেদি বড়লোক হলে যা হয়, কর্মচারীরাই সব দেখে আর দু'হাতে চুরি করে... সে থাক গে, ওর এস্টেটে একটা চাকরি খালি আছে, করবে?"

"কী চাকরি?"

"ভাড়া আদায় করার। এতকাল যে করত তাকে সরিয়ে ওষুধের দোকানে বসাচ্ছে, বাবার আমলের লোক তাই আর ছাড়ায়নি। কাজটা টাকাপয়সা নিয়ে। ভাড়া কালেকশন করতে টেনান্টদের ঘরে ঘরে যাওয়া, ভাড়াটেদের দেখাশোনা, বাড়ির মেরামতি, ট্যাক্স দেওয়া, আদায়ের হিসাবপত্তর রাখা, টাকা জমা দেওয়া, এই হল কাজ। কিন্তু চুরির সুযোগ আছে তাই একজন সৎ বিশ্বাসী লোক এখুনি চাই। আজই কথা হচ্ছিল, আমি বলেছি আমার জানা একটি ভালো ছেলে আছে, সামনের বাড়িতেই থাকে।... করবে?"

উনি কী করে জানলেন আমি ভালো ছেলে? অনন্ত অবাক হল। বোধহয় সন্দেশ ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা থেকেই ওঁর ধারণা হয়েছে। বহুদিন সে মনে মনে আক্ষেপ করেছে, অমরকে ও-ভাবে চোর প্রতিপন্ন না করালেও হত, হাজার হোক ভাই তো কিন্তু এখন তার মনে হল শাপে বরই হয়েছে।

"হ্যাঁ করব।" কোনওক্রমে কথাটা সে বলতে পারল। হাঁটুদুটো মাখনের মতো লাগছে হয়তো সে দুমড়ে পড়ে যাবে। চেয়ার আঁকড়ে থাকা আঙুলগুলোর গাঁট টনটন করে উঠল।

"এখন যা পাচ্ছ তার থেকে বেশিই যাতে পাও দেখব। বোসো, একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কালই কি যেতে পারবে? সকাল দশটার পর...তার আগে ঘুম থেকে ওঠে না।"

অনন্ত মাথা হেলাল কিন্তু চেয়ারে বসল না। সাধন বিশ্বাস কলমদানি থেকে লাল কলমটা তুলে তাঁর নাম ছাপা প্যাডে যতক্ষণ ধরে চিঠি লেখায় ব্যস্ত রইলেন ততক্ষণ নিজের হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না, চোখে একটা ঝাপসা পর্দা নেমে এসেছে যার ওধারে সাধন বিশ্বাসকে ছায়ার মতো লাগছে।

চিঠিটা চার ভাঁজ করে এগিয়ে দিলেন।

"দেরি কোরো না কালই যাও।"

টেবলটা দ্রুত ঘুরে গিয়ে অনন্ত নিচু হল প্রণাম করতে। হরিণের চামড়ার চটির মাথায় পা ঢোকানো। গোড়ালিদুটো যেন শ্বেতপাথরের। চামড়ার উপর আঙুল বোলানোর সময় শিরশির করে উঠল তার মেরুদণ্ড।

"থাক থাক... ভাল করে কাজ কোরো।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"খুব বেশি দূরে নয়, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে পরেশনাথ মন্দিরের কাছেই, ঠিকানা লিখে দিয়েছি... সমীরেন্দ্র বসুমল্লিক, ফটকে লেখা আছে অঘোর এস্টেট...ওর ঠাকুরদার নাম।

সদর দরজায় অনু দাঁড়িয়ে, তার পাশে শীলা। তার জন্যই অপেক্ষা করছে। সাধন বিশ্বাসের ঘরটার আধখানা এখান থেকে দেখা যায়।

"দাদা, তোকে কী লিখে দিল রে?"

অনন্ত দু'জনের মুখের দিকে বিহ্বলচোখে তাকিয়ে শুধু বলল, "ভগবান আছে।"

তিনজনে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সে প্রত্যেকের মুখের দমবন্ধ কৌতূহল তারিয়ে তারিয়ে চাখল।

"বললেন একটা চাকরি আছে, করবে?"

"কী বললি?"

"করব বললুম।"

"কোথায়, কীসের চাকরি, কত দেবে?"

সেদিন রাতে অনন্ত ঘুমের মধ্যে বারবার ছটফট করল। সকালে ঘুম ভেঙে যেতেই সে পাশের ঘরে কথাবার্তার শব্দ পেল।

"ইস্ত্রি না করলে এই পরে যাবে নাকি? চেয়ে আন ইস্ত্রিটা। চটি জোড়ায় কালি দিয়ে দে।"

রাতে উঠোনে ধুতি আর শার্ট নিয়ে মা সাবান দিতে বসে। দোতলা থেকে তখন জেঠিমা চেঁচিয়ে বলেছিল, "এত রাতে কাচাকুচি করছ যে?"

"অনন্ত কাল নতুন চাকরিতে জয়েন করবে।"

চিত হয়ে অন্ধকার ঘরে সে হেসেছিল। চাকরিই হোল না আর কি না জয়েন?

"কোথায় গো?"

"এক জমিদারের আপিসে।"

অঘোর-এস্টেট খুঁজে নিতে অনন্তর অসুবিধা হয়নি। লোহার ফটক থেকে মাটির পথ অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে বারান্দার নীচে পৌঁছেছে। টানা তিন ধাপ সিঁড়ি, ডান দিকে বেলেপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে, বাঁ দিকে পরপর কয়েকটা ঘর, সামনে পাথরের উঠোন আর ঠাকুর দালান।

সিঁড়ির পাশে একটা বেঞ্চে দুটি লোক বসে। চাহনি আর বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় বাইরের লোক, কোনও কাজের জন্য এসেছে। বাঁ দিকের ঘরগুলো থেকে লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। অনন্ত উঁকি দিয়ে দেখল প্রথম ঘরটার অর্ধেক জুড়ে নিচু তক্তাপোশ, তাতে শতরঞ্চি পাতা। জানলার কাছে বাবু হয়ে বসে এক প্রৌঢ়, কোলের কাছে রাখা ডেস্কে ঝুঁকে একটা কাগজ থেকে দেখে দেখে খাতায় লিখছে। ঘরের কড়িকাঠ থেকে লোহার শিকে আটকানো দু' সারি কাঠের তাক ঝুলছে, মোটা মোটা ধুলো লাগা খাতা আর কাগজপত্রে সেগুলো ঠাসা। পাশের ঘরটায় কয়েকটা টেবল-চেয়ার। নানান রকমের কাগজে আর খাতায় টেবলগুলো ভরা। দেখে মনে হয় না ওগুলো কখনও নাড়াচাড়া করা হয়েছে। দুটো স্টিলের আলমারি ছাড়াও কাঠের র‍্যাক তিনদিকের দেয়াল ঢেকে ফেলেছে। এখানেও খাতা আর কাগজ। পুরনো একটা পাখা কিচকিচ শব্দ করে ঘুরছে। পিছন ফিরে একটি লোক চেয়ারে বসে।

অনন্ত বুঝতে পারছে না সমীরেন্দ্র বসুমল্লিকের সঙ্গে সে কীভাবে দেখা করবে। কোনও চাকর বা দারোয়ানকে দেখতে পাচ্ছে না। এত বড়লোক এত বিষয়সম্পত্তি, সে ভেবেছিল দেখবে ঝকঝকে সাজানো অফিস, লোকজন গিজগিজ করছে। তার বদলে এমন নির্জন পুরনো একটা বাড়ি, যার মেঝেয় সিমেন্টের চটা ওঠা, দেয়ালে নোনা, জানলা দরজার কাঠ ময়লা, সার্সির কাচ ভাঙা— দেখে সে দমে গেল।

"কী চাই?"

অনন্ত ঘরে ঢুকল। প্রৌঢ় চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠেলে নাকের উপরে তুলে তার দিকে তাকিয়ে।

"সমীরেন্দ্র বসুমল্লিকের সঙ্গে দেখা করব।"

"কী দরকার?"

"একটা চিঠি এনেছি।"

"কার কাছ থেকে?"

"সাধন বিশ্বাস, অ্যাটর্নি।"

প্রৌঢ় হাত বাড়াল।

"দেখি।"

অনন্ত চিঠিটা দিতে চটি খুলে তক্তাপোশে উঠল। চিঠিটা ইংরেজিতে। তাতে অল্প কথায় লেখা, যে-ছেলেটির কথা বলেছি তাকে পাঠালাম। অনেকক্ষণ ধরে পড়ার পর প্রৌঢ় তার আপাদমস্তক দেখে হাঁক দিল, "যুগল"। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই শুধু দোতলা থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। প্রৌঢ় এবার গলা চড়িয়ে ডাকল।

"কী বলছেন?"

দরজায় দাঁড়িয়ে ধুতি-গেঞ্জি পরা একটি লোক, প্রৌঢ়রই বয়সি। বোঝা যায় পুরনো চাকর।

"দেখা করতে এসেছে, অ্যাটর্নিবাবু চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

যুগল চিঠিটা নিয়ে দোতলায় উঠে গেল। মিনিট দুয়েক পর নেমে এসে বলল, "যান।"

সিঁড়িটা বাঁক নিতেই সামনের দেয়ালে মানুষ প্রমাণ একটা আয়না। কাচের বহু জায়গায় কালো ছোপ পড়েছে। সোনালি চওড়া ফ্রেমটা বিবর্ণ। অনন্ত নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পেল। এই প্রথম সে জানতে পারল নিজের পুরো চেহারাটা কেমন।

সিঁড়িটা পৌঁছেছে লম্বা একটা দালান ঘরের প্রান্তে যার অপর প্রান্তে কয়েকটা সোফা এবং গদি আঁটা পুরনো চেয়ার ও নিচু টেবল। পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরা গৌরবর্ণ, সুদর্শন একটি লোক সোফায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন, পায়ের উপর পা তোলা। একটা অ্যালসেশিয়ান কার্পেটের উপর দেহ ছড়িয়ে দু'পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে, অনন্তকে সে চোখ তুলে একবার দেখল মাত্র।

টেবলে সাধন বিশ্বাসের চিঠিটা একটা অ্যাশট্রে দিয়ে চাপা। অনন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একসময় কাগজটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে তাকালেন, চোখের মণিদুটো বিষণ্ণ, গভীর ও বড়। ঘুমের বেশ তখনও জড়িয়ে রয়েছে।

অনন্ত ঠিক করে রেখেছিল প্রণাম করবে। করতে পারল না। কী যেন একটা নিস্পৃহ দূরত্ব মানুষটির অচঞ্চল ভঙ্গি থেকে তৈরি হয়ে রয়েছে, যা ভেদ করে এই ঘর, আসবাব, এমনকী বাইরের পৃথিবীও লোকটির কাছাকাছি যেতে অক্ষম। সে বুকের কাছে দুই মুঠি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এই লোকটির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তার জীবনের ধারা বদলাবে।

"বয়স কত...কুড়ি?"

অনন্তের ভরসা হল না কথা বলতে। শুধু হাসল।

চিঠিটা তুলে চোখ বোলালেন, একবার তাকালেন অনন্তের দিকে। কয়েক সেকেন্ড কী ভাবলেন।

"নীচে গিয়ে বোসো, আর অজয়বাবুকে পাঠিয়ে দাও।"

কে অজয়বাবু সে জানে না, নীচের ঘরের প্রৌঢ়ই সম্ভবত। সিঁড়িতে সে মুখ ফিরিয়ে আয়নায় আবার নিজেকে দেখল। এই কয়েক মিনিটে তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হল না। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে তার মনে পড়ল নমস্কার করে আসা হয়নি।

প্রৌঢ়ই অজয়বাবু। পরে জেনেছে ওর পুরো নাম অজয় হালদার। দোতলায় উঠে গিয়েই তাকে প্রায় তখুনি নেমে আসতে দেখে অনন্তের বুক কেঁপে উঠল। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল, তার মানে, বিদায় করে দাও! বেঞ্চে বসা লোকদুটিকে ইশারায় উপরে যেতে বলে অজয়বাবু গম্ভীরমুখে নিজের জায়গায় বসে বলল, "তোমার নাম কী?"

"অনন্তকুমার দাস।"

"বাবার নাম?"

"ঈশ্বর শক্তিপদ দাস।"

"বড়ছেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কে কে আছে?"

"মা, এক ভাই, দুই বোন। আমি বড়।"

"কদ্দুর লেখাপড়া?"

"স্কুল ফাইনাল দোব, প্রাইভেটে...রাতে কোচিং-এ পড়ি। বাবা হঠাৎ বাস অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন, তাই স্কুল...টাকাপয়সা কিছু রেখে যাননি।"

"ঘটি না বাঙাল?"

"ঘটি।"

"এখানে বসে কাজ করার মতো ব্যাপার খুব কম। যখন জমিদারি ছিল তখন এখানে কাজ ছিল, অনেক লোকও ছিল। এখন যা-কিছু ব্যবসার কাজটাজ ধর্মতলা স্ট্রিটের অফিস থেকে হয়। বুলুবাবু ওখানেই বসেন।"

অজয়বাবু চশমায় ঠেলা দিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। অনন্ত মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ধান ভানতে শিবের গীত গাইছে, কাজটা হবে কি হবে না সেটা আগে বলুক। প্রৌঢ় জানলা থেকে চোখ ঘরের মধ্যে এনে তাকের উপর দিয়ে বিষণ্ণ চাহনি বুলিয়ে অনন্তের মুখে বসাল।

"তুমি কাল থেকে কাজে এসো। যা করার সব কাল বুঝিয়ে দেব।"

"এই সময়ে আসব?"

"তাই এসো। আসল কাজ বাইরে, ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়। অনেক টাকা মার গেছে, বছরের পর বছর ভাড়া বাকি, আদায় হয়েছে জমা পড়েনি...ভাড়াটে আছে কিন্তু আমাদের খাতায় নাম নেই অথচ তার কাছ থেকে ভাড়া আদায় হচ্ছে...এইসব। ভাল ভাড়াটেও আছে। রাজাবাজারের বস্তিটা গণিকে লিজ দেওয়া, গণির ভাড়ার টাকা মাসে মাসে ঠিক এসে যায়। এন্টালি আর আহিরিটোলার বাড়ি দুটোতেই যত ঝামেলা। সব পুরনো ভাড়াটে, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে এক-একজন বাস করছে। আর দুটো বাড়ি টেরিটি বাজারে, সবই অফিস, ঠিক সময়ে দিয়ে দেয়।"

অজয়বাবু নিচু স্বরে ধীরে ধীরে যা বললেন তার বেশির ভাগই অনন্তের কানে পৌঁছল না। সে বুঝে গেছে কাজটা সে পেয়েছে, সত্যিকারের একটা চাকরি। সংসারের মাথার উপর এবার একটা চালা বসল।

ধীরে ধীরে তার চোখ জলে ভরে এল। কার কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানাবে? সমীরেন্দ্র বসুমল্লিক...অজয়বাবু.. সাধন বিশ্বাস নাকি অমর?

"এস্টেটের নিয়ম হয়েছে ধর্মতলা অফিসের মতো এখানেও একই স্কেলে মাইনে দেওয়া হবে। ..প্রথম ছ'মাস প্রোবেশনার, থোক আড়াইশো পাবে।"

"কত?"

অজয়বাবু আবার বলল, অনন্তের কানে এল মা যেন বলছে, 'আর একটু ভাত নে।'

"কাঁদছ কেন?"

"রাতে আমার ঘুম হত না। কী করে সংসারটা চালাব ভেবে পেতাম না। সবাই আমার মুখ চেয়ে আছে,-বড়ছেলেই তো বাবার জায়গা নেয়।"

"ছ'মাস পর যদি পাকা হও তখন হাতে তিনশো টাকার মতো পাবে।"

ছয়

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেদিন চারপাশের বাড়ি, মানুষ, যানবাহন, দোকান, ফেরিওয়ালা এমনকী রাস্তার জঞ্জালও তার কাছে নতুন এবং বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। অসহায়ভাবে সে বুঝতে পারছিল না তার পৃথিবীটা হঠাৎ বদলে যাচ্ছে কেন! তার বোধের আয়ত্তে থাকছে না কেন? সে কোথাও কোনও ত্রুটি দেখতে পাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে মানুষ এবং বাড়িগুলো একটু ছোট হয়ে গেছে, অথচ সবই রয়েছে পুরনো শৃঙ্খলা মেনে।

সেদিন হাঁটতে গিয়ে তার পদক্ষেপ বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। লোকে কি মাতাল ভাববে? সে আপনমনে হেসে ইচ্ছে করে আরও এলোমেলো পা ফেলছিল। জামার হাতায় চোখের জল

মুছেছিল। কী অদ্ভুতভাবে একটা নতুন রাস্তা তার সামনে এসে গেল। এই রাস্তা ধরে তাকে সাবধানে এগোতে হবে, সংসারটাকে সঙ্গে নিয়ে।

ছ'মাস না হলে চাকরিটা পাকা হবে না। ছ'মাস সে খুব ভাল কাজ দেখাবে, খাটবে আর কোনও প্রলোভনেই টলবে না। এই কাজে নাকি চুরির সুযোগ আছে, নিশ্চয় তার উপর লক্ষ রাখা হবে। রাখুক।

অনন্ত নানান অজানা রাস্তায় সেই দুপুরে হেঁটেছিল, বহুক্ষণ। সে জানে হারিয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। প্রত্যেকটা গলি তাকে এক সময় চেনা রাস্তায় পৌঁছে দেবেই। এক সময় সে পৌঁছেও গেছল বাড়িতে। মা তখন মেঝেয় ঘুমোচ্ছিল। নিঃশব্দে জামা খুলে আলনায় রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল মা'র চোখ খোলা, চাহনিতে ভয়। ফিসফিস করে বলল:

"কী হল রে?"

"হয়েছে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শীলা। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ভগবানকে সকাল থেকে ডাকছিলুম, মন বলছিল হয়ে যাবে। কত টাকা দেবে?"

বিকেলে অনন্ত রকে বসে বহু দিন পর ছেলেদের রবারের বল খেলা দেখল। নিজেকে তার হালকা লাগছে। কী বিরাট চাপে এতদিন কুঁকড়ে ছিল আজ সে বুঝতে পারছে। পাড়ার লোকেদের মুখোমুখি হতে এবার তার আর সংকোচ নেই। এখন সে মোটামুটি রোজগেরে-জীবনের সঙ্গে জড়ানো কিছু কিছু পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার হয়েছে। তবে এটুকু জানে, প্রথম মাসের মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত তাকে আগের মতোই টেনেটুনে চলতে হবে।

প্রসাদ ঘোষকে তার জানিয়ে আসা উচিত ছিল. আর সে কমলা বাইন্ডার্সে যাবে না। অঘোর এস্টেট থেকে বেরিয়ে প্রথমে ওখানেই যাওয়া দরকার ছিল অথচ তখন তার একদমই মনে পড়ল না! আঠারো দিনের কাজের টাকা পাওনা হয়েছে। কাল ন'টার মধ্যে গিয়ে জানিয়ে আসবে। টাকা নিশ্চয় তখুনি দেবে না, ঘোরাবে। কোনও পাওনাদারকেই একবারে টাকা দেয় না।

তা ছাড়া, গৌরীর কাছেও খবরটা পৌঁছনো দরকার। আড়াইশো টাকার চাকরি পাবার যোগ্যতা যে তার আছে এটা ও জেনে যাক। ওর অবাক হওয়া মুখটা কেমন দেখাবে কে জানে! কিন্তু ও তো আর দোকানে আসে না, ভাইকে বলে দিলেই হবে। গৌরী বলেছিল, ভাইয়ের হাত দিয়ে চিঠি দেবে। সে চিঠি আর পাওয়া হবে না, হয়তো আর কোনওদিন তাদের দেখাই হবে না।

সে বিমর্ষ হয়ে থেকেছিল কিছুক্ষণের জন্য। গৌরীর সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধুত্বই, এমন আলাপ যে-কোনও ছেলের সঙ্গেও হতে পারত। অনন্ত মন থেকে গৌরীকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল। জীবনের এই সময়টায় কোনও মেয়ের কথা ভাবলে তার চলবে না, তাকে উন্নতি করতে হবে। তা ছাড়া, গৌরী তো ভালবাসে আর একজনকে। দরকার কী ওকে নিয়ে আজেবাজে ভাবনায়।

অনন্ত তার পরবর্তী সতেরো বছরে সংসার আর চাকরি ছাড়া, আর কিছু ভাবেনি। কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, সে নাড়া খেয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু তার জীবনধারায় কোনওটিই বাঁক ফেরাতে পারেনি কিংবা হয়তো সে বাঁক নিতে চায়নি। তার নিজস্ব জগতের বাইরে যেতে সে ভয় পায়। একটা নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে সে জীবনকে ঢেলে দিয়েছিল এবং বছরের পর বছর খাতটাকে শুধু গভীরই করেছে, কখনও উপচে পড়ার বা বদলাবার চেষ্টা করেনি। সে শুধু ভালো ছেলে হয়ে থাকার চেষ্টা করেছে।

এন্টালিতে অঘোর ভবনের ভাড়া আদায় করতে গিয়ে প্রথম দিনে তার বুকের মধ্যে কাঁপন ধরেছিল। প্রত্যেকেই তাকে দেখে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। এ আবার কে? অনন্ত জানত প্রথমটা এ-রকমটা হবেই।

"পরিমলবাবু কোথায়? আপনি কে?"

"আমি পরিমলবাবুর জায়গায় কাজ করছি, তাকে এখন অন্য কাজে দেওয়া হয়েছে।"

রাস্তার উপর কাচ ও আয়নার দোকানের মালিক নারায়ণ দত্ত যেন ভাবনায় পড়ে গেল এমনভাবে মাথা চুলকে অনন্তর দিকে তাকাল।

"পরে আসবেন।"

"কখন?"

"এই তো দোকান খুললুম, অন্য এক সময় আসুন, এখনও ক্যাশে কিছু জমা পড়েনি।"

"অন্য এক সময় মানে কখন?"

অনন্ত নাছোড়বান্দা। যত বিরক্তই হোক সে লেগে থাকবে। নারায়ণ দত্ত অবশ্য ভাড়া ফেলে রাখে না। ভাড়াটেদের ভাড়া দেওয়ার তারিখ খাতা থেকে দেখে সে বুঝে নিয়েছে কার কাছে কবে যেতে হবে।

"পরশু বিকেলে আসুন।"

ভাড়ার বিলবই তার সঙ্গেই আছে। ন্যাশনাল গ্লাস স্টোরের বিলের পিছনে সে তাগিদায় আসার তারিখটা লিখে রাখল। পাশেই হিন্দ মোটর পার্টসের দোকান। মালিক এক পাঞ্জাবি। এখানেও প্রায় একই কথা, পরের হপ্তায় দেব।

অঘোর ভবনের ফটকের লাগোয়া একটা পান-সিগারেটের দোকান। দেয়ালে কাঠের পাটা লাগিয়ে ফুটপাথের দিকে দেড় হাত বেরিয়ে থাকা জায়গাটুকুতে বাবু হয়ে বসে, পরিষ্কার ধুতি গেঞ্জি পরা, কপালে সিঁদুর ফোঁটা, পাকানো গোঁফ, টেরিকাটা, হৃষ্টপুষ্ট লোকটির বা দোকানের নামে বিল লিখেছে বলে অনন্তর মনে পড়ল না। খাতায় নাম থাকলে নিশ্চয়ই বিল লেখা হয়েছে! সে তন্নতন্ন করে বিলবইটার প্রত্যেক পাতা দেখল। অঘোর ভবনের দেয়ালেই যখন দোকান, তা হলে অবশ্যই তাদের ভাড়াটে। কিন্তু পান-সিগারেট দোকানের নামে একটিও বিল নেই!

অস্বস্তিভরে সে দোকানের সামনে দাঁড়াল। লোকটাকে শক্তধাতের মনে হচ্ছে। পান সাজছে যন্ত্রের মতো হাত চালিয়ে। চুন, খয়ের, সুপুরি, জর্দা, দশ সেকেন্ডের মধ্যে পান তৈরি! সার সার নানা ব্র্যান্ডের সিগারেট প্যাকেট। বলা মাত্রই আঙুলের ডগা দিয়ে প্যাকেট টেনে নিয়ে সিগারেট বার করে দিচ্ছে।

অনন্ত অপেক্ষা করল খদ্দেরদের বিদায় হওয়ার জন্য। এক সময় লোকটি ভ্রূ তুলে তাকাল, "কী দেবে?"

"আপনার দোকান?"

"হ্যাঁ।"

সন্দিগ্ধ এবং বিস্মিত চোখে তাকে দেখছে। অনন্ত এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, "আপনি ভাড়া দেন?"

"নিশ্চয়।"

"আমি ভাড়া আদায় করতে এসেছি।"

"কী নাম আপনার, কে পাঠিয়েছে?"

"এস্টেট থেকে আসছি, আমার নাম অনন্ত দাস।"

বিল বইটা সে দেখাল। লোকটার কথায় সামান্য বিহারি টান না থাকলে বাঙালিই মনে হত।

"আপনি যে বাড়িওয়ালার লোক তা বুঝব কী করে? বিল তো ছাপাখানা থেকে যে কেউই ছাপিয়ে আনতে পারে।"

অনন্ত ফাঁপরে পড়ল। একটা চিঠি বা ছবিওলা আইডেন্টিটি কার্ড থাকলে ভাল হত। এমন প্রশ্ন যে উঠতে পারে তা একবার ভেবেওছিল। অজয় হালদার বলেছিল: "ও-সব লাগবে না, সবাই একবার চিনে গেলে আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।" অনন্ত দ্বিতীয়বার আর বলেনি। নিজেকে চিনিয়ে নিতে না পারাটা হয়তো তাকে অযোগ্যতার পর্যায়ে ফেলে দেবে।

"আমার ভাড়া পরিমলবাবু নিয়ে যেত।"

"তিনি আর নেই।"

"জানি। আমাকে বলে গেছে। এস্টেটের পেট্রল পাম্পে কাজ করছে।"

"তা হলে ম্যানেজারবাবুকে বলব ভাড়ার জন্য আপনাকে চিঠি দিতে।"

"চিঠিমিঠি কেন দেবেন"...লোকটা বিব্রত হয়ে বলল। "আপনাকেই ভাড়া দেব। পরিমলবাবু তো বিলটিল দিত না, আপনিও দেবেন না।"

"সে কী! বিল দেব না?"

খদ্দের এসে পান চাওয়ায় লোকটা ব্যস্ত হল। অনন্ত এইবার বুঝতে পারছে ভাড়াটেদের লিস্টে কেন এর নাম নেই। এস্টেটকে গোপন করে দোকান বসানো হয়েছে, ভাড়াটাও গোপন রাখা হয়েছে। পরিমল চাটুজ্জেই একমাত্র লোক আদায়ের দায়িত্বে ছিল। সে যা জমা দিত তাই জমা করা হত। খাতাপত্র সেই লিখত, হিসেবও রাখত। কেউই ভাড়াটে সম্পর্কে খোঁজখবর নিত না। এ-ভাবে কত টাকা যে পরিমল চাটুজ্জে পকেটে পুরেছে কে জানে।

"তিন হাজার টাকা সেলামি দিয়েছি, মাসে সত্তর টাকা ভাড়া। আজ দু'বছর হল দোকান করেছি।"

লোকটা হাসছে। হাসিটা খুব স্বচ্ছ নয়।

"আগের লোক কামিয়েছে, আপনিও কামান। ভাড়ার টাকা তো আমি দেবই। টাকা কে নিচ্ছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এ-বাড়িতে অনেকভাবে টাকা কামাতে পারবেন।"

"অনেক ভাবে?"

"হ্যাঁ অনেকভাবে। আপনাকে পরে বলব।"

"এখনই বলুন না।"

"বাড়ির উঠোনটা তো দেখেছেন, কত রকমের লোহালক্কড়, বস্তা, বাক্স, পেটি পড়ে আছে, ওমনি ওমনি কি আছে? ভাড়া দিচ্ছে। বিলটিলের ধার ধারে না।"

"কারা দিচ্ছে?"

"কাচের দোকানের মাল থাকে, মোটর পার্টসের দোকানেরও থাকে, বাইরের প্লাইউড দোকানের, বড় বড় বোর্ড, রাতে রেডিমেড জামাকাপড়ওয়ালার চৌকি বাক্সও থাকে। জলের পাম্প খারাপ বলে, নতুন পাম্প পরিমলবাবু কিনল, পাম্পটা কিন্তু ভালই ছিল, সেটা বিক্রি করে দিল, টাকা কি জমা দিয়েছে? দেখুন আমি সব জানি, বুঝতে পারি। এখানকার দারোয়ান নিতাই ওরই লোক...বাঙালি। একে আগে তাড়ান, চোট্টা আছে। রাতে এসে দেখবেন কত লোক ঘুমোয়, সকালে স্নান করে, পায়খানা সারে, সবার কাছ থেকেই পয়সা নেয় নিতাই। আমি আপনাকে ভাল লোক দিব, আমার ভাইয়ের ছেলে।"

লোকটা এতক্ষণ ঝুঁকে চাপা স্বরে দ্রুত কথা বলছিল। খদ্দের আসতেই সোজা হয়ে বসল। অনন্ত উত্তেজিত বোধ করছে। এতভাবে বাড়িটা থেকে টাকা ওঠে অথচ এক পয়সাও জমা পড়েনি। আজই সে গিয়ে ম্যানেজার অজয়বাবুকে বলবে। রাতে সাধন বিশ্বাসকে তো জানাবেই। প্রথম দিনেই এই সব খবর পেয়ে যাওয়া, তার কল্পনার অতীত।

"ওকে আসতে বলি?"

"কাকে?"

"আমার ভাইয়ের ছেলেকে।"

"আগে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথা বলব। লোক রাখা না-রাখার মালিক তো আমি নই। এখন আপনার ভাড়াটা দিন।"

"কাল পাবেন, দোকানে তো টাকা রাখি না, ঘর থেকে আনতে হবে। আপনি ম্যানেজারবাবুকে বলুন...এখানে যা চলছে তাতে এস্টেটেরই লোকসান হচ্ছে। ভাল লোক রাখা চাই। আমার ভাইয়ের ছেলেকে রাখলে চোরা কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাকে সব তো বললুম, এবার আপনি ম্যানেজারবাবুকে বলুন।"

"বলব। আপনার নামটা কী?"

"নন্দকিশোর তেওয়ারি। আর যদি বলেন, আপনারও যাতে দু'-চার টাকা আসে তা-ও ব্যবস্থা করতে পারি।"

"আমি চোর নই।"

"আহ্‌হা, আমি কি চুরির কথা বলছি। আপনাকে দেখেই বুঝেছি ভালো লোক আছেন। উপরি রোজগার তো ভাল-মন্দ সব মানুষই করে। টাকার কি দরকার নেই? সবার দরকার।"

"আমার দরকার নেই। আমি কাল তা হলে আসছি।"

ফটক দিয়ে ঢুকে ডান দিকে সিমেন্ট বাঁধানো বড় চৌকো উঠোন আর সিঁড়ির পাশ দিয়ে ঢাকা লম্বা একটা পথ। নন্দকিশোর যা বলেছিল সেই রকমই, প্রায় গুদামের মতো হয়ে আছে জায়গাটা। একধারে

স্তূপ হয়ে আছে কাঠের ভাঙা বাক্স। তার পাশে বস্তায় ভরা কাপড়ের ছাঁট, মোটর গাড়ির স্প্রিং পিনিয়ন, শরবতের ঠেলা গাড়ি, মোবিলের ড্রাম, দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির পাশে বান্ডিল করে রাখা চটের বস্তা।

সে নিতাইকে খুঁজল। একতলায় একটা ঘরে থাকে, এইটুকুমাত্র সে জানে। ওকে সে একবারমাত্র অঘোর এস্টেটে দেখেছে। অজয় হালদার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল: "দারোয়ান কাম কেয়ারটেকার। বছর দশেক কাজ করছে।" চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। কালো, রোগা, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। নিতাইয়ের বিনীত কৃতার্থ ভঙ্গি তার ভাল লাগেনি।

ঢাকা পথটায় সে উঁকি দিল। পথের শেষে তালা দেওয়া কলঘর, তার পাশে পাইখানা ও পাম্পঘর। বাঁ দিকে তিনটে ঘর, বসবাসের জন্য নয়। মাত্র একটি জানালা প্রতি ঘরে, সম্ভবত মালপত্র রাখার জন্যই ঘরগুলো। একটা ঘরের জানালা এবং দরজায় গেরুয়া রঙের পর্দা। অনন্ত এগিয়ে এসে পর্দা সরিয়ে দেখল, দরজায় তালা দেওয়া। এখানেই কি নিতাই থাকে? সে কি জানালা-দরজায় পর্দা টাঙানোর মতো লোক?

অনন্ত ফিরে আসার সময় সিঁড়ির কাছে তাকে পাশ কাটিয়ে পথটার দিকে চলে গেল একজন মহিলা। যাবার সময় কৌতূহলে তাব দিকে একবার তাকিয়েছিল। ডান গালে আঁচিল, হাতে ছাতা আর ব্যাগ, ছোটখাটো ফরসা চেহারা। কালো ফ্রেমের চশমা। দ্রুত ছোট পদক্ষেপ, পরনে কালো সরু পাড় সাদা মিলের শাড়ি। তার মনে হল, ইনিই বোধ হয় ঘরটায় থাকেন। ভাড়াটে? কিন্তু একতলায় দোকান ছাড়া আর তো কোনও ভাড়াটে নেই।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে অনন্ত ঘরটার কাছে ফিরে এল। আলো পাওয়ার জন্য জানলার পর্দা অল্প সরানো, দবজাব পর্দাও। কিন্তু তাতেও ঘরের ভিতবটা আবছা। অনন্ত কিছুই দেখতে পেল না। বাসন নাড়ানোর শব্দ এল।

মহিলা প্লাস্টিকের একটি বালতি হাতে হঠাৎ বেরিয়ে আসতেই অনন্ত এক পা সবে গেল। মহিলা তাব দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাউকে খুঁজছেন কি?"

"হ্যাঁ, মানে আমি ভাড়া তুলতে এসেছি, নতুন, আজই প্রথম। আপনি কি টেনান্ট?"

"টেনান্ট বললে টেনান্ট, নয়তো নয়।"

"তার মানে!"

"আপনি একটু দাঁড়ান, আমি জলটা ধবে নি। ছাদের ট্যাঙ্কে মাঝে মাঝে জল থাকে না, খুব অসুবিধায় পড়তে হয়...আপনি বরং ঘবে বসুন।"

"না না এই তো বেশ আছি। আবার কেন...।"

কথা না বাড়িয়ে উনি কলঘবেব দিকে গেলেন। চাবি দিয়ে কলঘরের তালা খুললেন। দরজা ভেজিয়ে দিলেন ভিতরে ঢুকে। অনন্তের মনে হল, এটাও পরিমল চাটুজ্জের আর একটা রোজগারের ব্যবস্থা। লোকটাকে তার দেখাব ইচ্ছা হচ্ছে। শুনেছে বাগুইহাটিতে জমি কিনে একতলা বাড়ি তৈরি করেছে।

জলভরা বালতি নিয়ে উনি ফিরতেই অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, "চাবি কি আপনার কাছেই থাকে?"

"এটা ডুপ্লিকেট। দোকানের ওদের কাছেও একটা করে আছে।"

পর্দা সরিয়ে উনি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকেই বললেন, "আপনি ভেতরে এসে বসুন।"

অনন্ত সামান্য দ্বিধা করে ঘরে ঢুকল। ঘরটা বেশ বড়ই। দড়িতে পর্দার কাপড় ঝুলিয়ে ঘরটা দু'ভাগ করা। উনি পর্দার ওধারে গেছেন হয়তো বাইরের কাপড় বদলাতে।

পর্দার এধারে অর্থাৎ দরজার কাছাকাছি খুবই পুরনো একটি কাঠের গোলাকার টেবল আর দুটি হাতলবিহীন চেয়ার। টেবলে কয়েকটি পুরনো বাংলা খবরের কাগজ সযত্নে ভাঁজ করে রাখা। শুধুই তারিখ দেওয়া একটা ক্যালেন্ডার দেয়ালে। ঘরের কোণে এইমাত্র ছেড়ে রাখা জুতোর পাশে হাওয়াই চটি। ছোট একটা জলচৌকিতে কুঁজো আর কাচের গ্লাস। জানলার কাছে নিচু একটা জালের আলমারি, তার উপরে কেরোসিন স্টোভ। জলের বালতিটা ওখানেই রাখা। আলমারিটাই বোধ হয় ভাঁড়ার এবং রান্নাঘরের কাজ করে। পর্দার ওধারে কী আছে অনন্ত তা জানে না। কিন্তু এধারে এত কম আসবাব এবং সেগুলি এত পরিচ্ছন্ন, গোছানো যে তাই থেকে এর মালিকের মানসিক গঠনটা যেন আঁচ করা যায়... নির্বিরোধী এবং কল্পনাপ্রবণ। অনন্তের মনে হল এই মহিলার সঙ্গে ঘরের চেহারাটার খুবই মিল আছে।

"বসুন। বলুন কী বলছিলেন?"

একটা চেয়ারে উনি বসলেন অনন্তের মুখোমুখি। পর্দার ওধারে হালকা একটা ধোঁয়ার শিষ লতিয়ে উঠেছে। ধূপ জ্বালিয়েছেন। শাড়ি বদলে একটা সাদা থান পরেছেন। চশমার কাচ কাপড়ে মুছতে মুছতে হাসি মুখে তাকিয়ে। চোখের কোলে কালো ছোপ। বয়স বোধ হয় চল্লিশের এধার ওধারে।

"আপনি কদ্দিন আছেন।"

"তিন বছর।"

"ভাড়া কত?"

"সস্তাই, চল্লিশ টাকা।"

"আপনার নাম কিন্তু আমাদের খাতায় নেই।"

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ভ্রূ কুঁচকে সন্দিহান গলায় বললেন, "নাম নেই...কেন?"

"কাকে ভাড়া দিতেন?"

"পবিমলবাবুকে, তিনিই তো মালিকের লোক!"

"হ্যাঁ। বিল দিতেন?"

"নিশ্চয়, দাঁড়ান আপনাকে দেখাই।"

উনি উঠে গেলেন। দড়িতে কড়া লাগানো পর্দাটা সরিয়ে ভিতর মহলে যাবার সময় অনন্ত ওঁর দিকে তাকিয়েছিল। তাই সে সবানো পর্দার ফাঁকা জায়গা দিয়ে দেখতে পেল দেয়ালে প্রায় এক হাত চতুষ্কোণ, সাদা ফ্রেমে বাঁধানো একটা ফোটো। একটি পুরুষের মুখ, গলা ও কাঁধ দেখা যাচ্ছে। ফোটোব নীচে কাঠের ব্র্যাকেট, সেখানে ধূপদানিতে তিন-চারটি জ্বলন্ত ধূপ।

ধীরে ধীরে অনন্তের ঘাড় থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে চলন্ত পোকার মতো একটা বিস্ময় নেমে গেল কোমর পর্যন্ত। বাবা! কোনও সন্দেহ নেই। ডান দিকের রগের কাছে কাটা দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওটা নাকি স্কুলে পড়ার সময় কংগ্রেসেব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের লাঠিতে হয়েছে। বাবা এব বেশি তাদেব কিছু বলেনি।

এখানে এমন অকস্মাৎ বাবার ছবি দেখতে পেয়ে অনন্ত প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল। তার বোধ ও যুক্তিব শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার মতো দশায়। টেবলে বাখা আঙুলগুলো থবথর কবছে, গলা শুকিয়ে এল। মাথায় একটা চিন্তাও স্থির থাকছে না।

ইনি তা হলে কে? বাবার ছবি এত যত্নে টাঙানো, ধূপ জ্বালানো...কে হন? মনের মধ্যে হঠাৎ ঝলসে উঠল বাবাকে লেখা কে এক মিনুর চিঠিটা।

"এই যে পাঁচ মাস আগের একটা বিল।"

অনন্ত অসাড় হাতটা বাড়িয়ে বিলটা নিল। হুবহু তার কাছে যে বিল রয়েছে সেই রকমই। এস্টেটেব স্ট্যাম্পটা আসলই কিন্তু সইটা কেমন জড়ানো, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মিনতি করের নামে বিল। ডাকনাম মিনু হওয়াই সঙ্গত।

"মিনতি কব আপনাব নাম?

"হ্যাঁ।"

"পরিমলবাবুর সই?"

"বলতে পারব না, উনি লিখেই আনতেন, শুধু তারিখটা বসাতেন ভাড়া নেবার সময়।"

ছবিটা কবে তোলা? সতেজ যুবকের মতো দেখাচ্ছে। চাহনিটা জ্বলজ্বলে, তীক্ষ্ণ অথচ হালকা হাসিতে ছাওয়া। বাবার এমন মুখ সে কখনও দেখেনি। ঘন থাক থাক চুল কপাল থেকে পিছনে ওলটানো। চুল উঠে কপালটা চওড়া হয়ে গেছল শেষ দিকে। চোয়ালে চর্বি জমেছিল কিন্তু এই ছবিতে গালদুটো মসৃণ, সমান। বাবার বয়স তখন কত, পঁচিশ-আঠাশ? ছবিটা কি বিয়ের আগে তোলা? অনন্ত কখনও তার বাবার এই ছবি দেখেনি।

সে কথা বলছে না। উনি অবাক হয়ে অনন্তেব দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালেন। ছবিটার দিকে সাবাক্ষণ চোখ স্থির হয়ে রইল।

"এটা তো পাঁচ মাস আগের, তারপর আর ভাড়া দেননি?"

পাংশু হয়ে গেল ওর মুখ। শিশুর মতো মাথা নাড়তে লাগলেন।

"চার মাস দেননি, এইটে নিয়ে পাঁচ মাস।"

"হ্যাঁ। আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি, এখনও সম্ভব নয়। অ্যাঞ্জেল কেমিক্যালসে কাজ করতুম, আজ ছ'মাস সেখানে লক আউট চলছে। জানি না অফিস আর কখনও খুলবে কি না।...আমাকে কি তুলে দেবেন?"

অনন্তের বড় করুণ লাগল ওর শেষের কথাটি। কিন্তু বাবার সঙ্গে এর কোথায় পরিচয়, কেমন করে পরিচয়? এই রকম একটা ছবি তাদের সংসারে নেই কেন? গত ছ'মাসের মধ্যে একবারও কি কেউ বাবার সম্পর্কে কোনও কথা বলেছে...অনু, অলু, মা? সে নিজে?

প্রশ্নগুলো একসঙ্গে তার মাথাটাকে কামড়ে ধরছে আর যন্ত্রণাটা বুকের দিকে এগোচ্ছে।

সে কি নিজের পরিচয়টা এবার দেবে? ওঁর সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা আগে জানা দরকার। ধূপ কি রোজ জ্বালেন? বাবার কোনও ছবি সে আজ পর্যন্ত দেখেনি। তাদের ঘরে মানুষের কোনও ছবি নেই।

"তুলে দেওয়ার মালিক তো আমি নই। তবে আপনি বেআইনিভাবে রয়েছেন।"

"আমি তো ভাড়া দিয়ে গেছি। ভাড়া বাকি তো পড়তেই পারে।"

"কিন্তু আমাদের খাতায় আপনার নাম নেই, আপনার ভাড়াও জমা পড়েনি। সবই পরিমলবাবু নিজে গাপ করেছেন।"

"সে কী! আমি তা হলে ভাড়াটে নই? পরিমলবাবু এই রকম লোক তা তো বুঝতে পারিনি! আমাদের অফিসে ওর ভাই কাজ করেন তার মারফত ওর সঙ্গে পরিচয়। খুব দরকার শুনে ঘরটা আমাকে দিলেন। ওঁকে ছাড়া আর কাউকে চিনিই না।"

অনন্ত মাথা নাড়ল।

"বাইরে পানওলারও একই ব্যাপার।"

"আমাকে আপনারা তা হলে রাস্তায় বার করে দিতে পারেন?"

"আপনি অত ভাবছেন কেন? আর কোথাও কি থাকার জায়গা আছে?"

"আমার কোথাও কেউ নেই।"

আর্তনাদের মতো অনন্তের কানে ঠেকল। অবিনাশকাকা বলেছিল বাবা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দু'বারে সাত হাজার টাকা তুলেছে, সে কি এনারই জন্য? কীভাবে খরচ হল?

চিঠিটায় একটা লাইন ছিল: 'গত এক মাসে একবারও এলে না।' এখানে কি বাবা আসত! কিন্তু মিনতি কর তিন বছর এই ঘরে, তার মানে বাবা মারা যাওয়ার পর এসেছেন। আগে তা হলে কোথায় থাকতেন?

"আপনার আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়ে...!"

"নেই।"

"আপনি অবিবাহিতা?"

প্রশ্নটা করেই শ্বাসবন্ধ করে সে উত্তরের অপেক্ষায় রইল। জিজ্ঞাসা করাটা বোধ হয় গর্হিত হয়ে গেল।

মিনতি করের চাহনিটা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল নিবিয়ে দেওয়া সলতের আগুনের মতো। চোখের মণিদুটো গাঢ় হয়ে উঠল। মাথাটা একটু নুয়ে পড়ল।

অনন্ত আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। উত্তেজনার আধিক্যে সে বলে ফেলল, "ওই ছবিটা কার, আপনার স্বামীর?"

প্রশ্ন করেই মায়ের মুখটা একবার তার চোখে ভেসে উঠল। বাবার গোপন জীবনের মধ্যে সে ঢুকতে যাচ্ছে। উচিত কি অনুচিত, বুঝতে পারছে না। সে অঘোর এস্টেটের কর্মচারী, ভাড়া আদায় করতে এসেছে। তার সামনে এমন একজন যিনি আইনত ভাড়াটে নন। সেইভাবেই তার আচরণ, কথাবার্তা হওয়া উচিত নয় কি? কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার তার নেই।

তবে ওঁকে অঘোর এস্টেটের একজন কর্মচারী এমনভাবে ঠকিয়েছে যেটা ধরা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দোষটা ওঁর নয়। অনন্ত তার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বুঝতে পারছে তার তরফ থেকে বলার কিছু নেই।

কিন্তু সে বাবার জীবনেরই একটা অংশ। ওই ছবিটায় তারও এক ধরনের অধিকার আছে। সুতরাং সে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না কেন?

"উনি আমার কেউ না অথচ সব।"

মৃদু স্বরের কথাগুলো চন্দনের গন্ধের সঙ্গে ভেসে অনন্তের রোমকূপগুলোয় ধীরে ধীরে থিতিয়ে বসল। অযথা একটা ভার তার শরীরকে ক্লান্ত করতে শুরু করল। সে চুপ করে থাকল।

"জীবনটা এক সময় বড় ছোট মনে হত, সময় কীভাবে যেন হু হু করে চলে যেত।"

মিনতি কর আবার মুখ ফিরিয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে রইলেন। অনন্ত, ওঁর ডান চোখের কিনারা বাষ্পে চকচক করছে, দেখল।

"পাশের বাড়িতে ওঁরা থাকত, ছোট থেকে আলাপ। আমাদের বিয়ে হবে ঠিক ছিল, হয়নি।"

"কেন?"

"আমার নামে অনেক কিছু রটনা করেছিল ওর ভাই, উনি তা বিশ্বাস করেছিলেন। তখন আমার উপর রেগে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলেন।...পরে অবশ্য ভুল বুঝতে পারেন।"

"আপনি বিয়ে করেননি?"

মিনতি কর ধীরে মাথা নাড়লেন।

"মেয়েরা একজনকেই ভালবাসে।"

"ওর বউকে দেখেছেন?"

"না।"

অনন্ত ইতস্তত করে বলল, "ওর পরিবার সম্পর্কে কিছু জানেন না?"

"খুব বেশি নয়। দুটি ছেলে দুটি মেয়ে জানি, তারা স্কুলে পড়ে। বড়টি হয়তো এখন কলেজে।"

"তারা কি আপনার কথা জানে?"

"বোধ হয় না।"

মিনতি কর উঠে ছবিটার কাছে গেলেন। দু'-তিনটে ধূপ নিবে গেছে, দেশলাই জ্বেলে ধরালেন।

"এখন ধূপগুলো যা হয়েছে, একটা গোটা দেশলাই খরচ হয়ে যায়।"

"রোজ জ্বালেন?"

"প্রতি শুক্কুরবার জ্বালি, এই বারেই উনি মারা গেছেন।"

বাবার মৃত্যুর তারিখটা তার মনে আছে কিন্তু বার কী ছিল মনে নেই। তারিখটা এলে বাবাকে মনে পড়ে। ছড়ানো এলোমেলো কিছু ছবি, কিছু ভঙ্গি,...থালায় ভাত মাখার, জুতোয় ফিতে বাঁধার, রাস্তা দিয়ে হাঁটার। কিছু কথার...'পায়ের আঙুলে ময়লা কেন?'; পেনসিলটা দু'আধখানা করে দু'জনে নাও' 'রান্নাঘরটা এত নোংরা থাকে কেন?' সেদিন অন্যদের কীভাবে বাবাকে মনে পড়ে তা জানে না, কেউ বাবার প্রসঙ্গ তোলে না। তাদের জীবনে আর যেন মানুষটির কোনও দরকার নেই। মা'ও কখনও কিছু বলে না।

অথচ এই ঘরে বাবাকে মনে রাখা হয়েছে। কিছু একটা দিয়েছেন যা মিনতি করের জীবনে গভীরভাবে শিকড় ছড়িয়েছে। কী সেটা? ভালবাসা! বাবাও নিশ্চয় ওঁর কাছ থেকে পেয়েছেন। ব্যাপারটা সে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটাও উচিত হবে না।

"চাকরি নেই তা হলে ভাড়া দেবেন কী করে, এখন চালাচ্ছেন কীভাবে?"

"টিউশানি করছি, সকাল বিকেল রাত, খাওয়াটা চলে যায়।"

"কিন্তু ভাড়া?'

"আমি জানি না।...কীভাবে যে দোব! উনি থাকলে আজ এ-সব চিন্তা করতে হত না।"

অনন্ত উঠে দাঁড়াল।

"যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। আমাকে আর আপনি করে বলবেন না, লজ্জা পাব।"

"আমাকে তুলে দেওয়া হবে কি? আমি তো জানতাম না পরিমলবাবু এ-ভাবে ঠকাবেন!"

"দেখি কী করা যায়।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিতাইকে সে খুঁজে পেল না। নন্দকিশোর তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "দেখবেন বাবু, আমার ভাইয়ের ছেলের কথাটা মনে রাখবেন।"

অঘোর এস্টেটে ফিরে এসে অনন্তকে অপেক্ষা করতে হল। ম্যানেজার অজয় হালদার ব্লাডপ্রেশারের রুগি, দুপুরে ঘণ্টা দুই ঘুমোন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে অনন্ত জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাল। তখন সে গোপন একটা ব্যাপার জেনে ফেলার ধাক্কা সামলে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যায়। সে ঠিক করে ফেলে মিনতি করের কথা বাড়িতে কাউকে বলবে না।

তার আজকের অভিজ্ঞতার কথা সে অজয় হালদারকে বলল। তিনি চোখের ইশারায় দোতলার বৈঠকখানাকে ইঙ্গিত করে বললেন, "ওনাকে জানাতে হবে। নিতাইকে সরিয়ে অন্য কাউকে রাখা না-রাখার মালিক উনি। তবে এ-রকম যে চলছে সেটা আঁচ করে ঠারে ঠোরে ওনাকে বলেওছি কয়েকবার। যাই হোক পরিমলকে শেষ পর্যন্ত অ্যাটর্নিবাবুর পরামর্শে সরানো হল। এটা এমনি এক চাকরি প্রলোভন পদে পদে। সৎ মানুষকে অসৎ করে দেয়, দশ বছরে তিনজনকে সরানো হল। তুমি যে-সব কথা খুলে জানালে এটাই দরকার। সৎ থাকবে তা হলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনন্তের বুকের মধ্যে কাঁপন লাগল। সে-সব কথাই বলেছে শুধু একটি ঘরের কথা বলেনি যেখানে বাস করে এমন একজন যে তার বাবাকে ভালবাসত, আজও ভালবাসে।

সে বিমর্ষ হয়ে বাড়ি ফিরল। জেনেশুনে এই প্রথম সে অসাধু হল। কেউ জানতে পারলে তাকে আর ভাল বলবে না। কাউকে বোঝাতেও পারবে না কেন সে মিনতি কর নামটা খাতাপত্রের বাইরে রাখতে চায়।

রাত্রে সাধন বিশ্বাসকে সে এন্টালির বাড়ির কথা বলল। তিনি যে ঠিক লোককেই কাজটার জন্য সুপারিশ করেছেন, লোক চেনার সেই বিরল ক্ষমতার গর্ব তাব চোখেমুখে প্রতিফলিত হল। এবারও একতলার ঘরের কথাটা সে বলতে পারল না।

রাতে খাওয়ার পর হঠাৎই সে মাকে বলল, "বাবার কোনও ছবি নেই?"

"আছে তো।"

"কই দেখি?"

শীলা ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় ঘাঁটাঘাটি করে ছবি বার করে আনল।

অনন্ত অবাক হয়ে দেখল সেই ছবিটাই যা আজ সকালে সে দেখেছে, তবে এটা আকারে অনেক ছোট পোস্টকার্ড মাপের।

"কবেকার তোলা?"

"বিয়ের পর।"

"রেখে দাও।"

সে দ্বিতীয়বার আর ছবিটার দিকে তাকায়নি।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে মনের মধ্যে একটা খচখচানি অনুভব করেছিল। সে তখন জানত না আজীবন এটা তাকে অস্বস্তি দেবে।

সাত

পরের মাসেই অনন্তের চাকরি পাকা হয়ে গেল। যে উদ্বেগে সে এবং তাদের সংসার কাঁটা হয়ে থাকত, সেটা আর নেই। এখন তারা নিরাপদ, এই বোধ তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে পরিচিতের সঙ্গে মেলামেশায়।

অজয় হালদারের অবসর নেবার সময় হয়ে এসেছে, ব্লাডপ্রেশারের জন্য প্রায়ই কামাই করে। বাবার আমলের লোক, সমীরেন্দ্র তাই ওকে বসিয়েই মাইনে দেন। ওর কাজগুলো একে একে অনন্তের উপর এসে পড়তে লাগল। এতে সে খুশিই। অবসর সময় কীভাবে কাটাবে সেই সমস্যা অনেকটা মিটিয়ে দেয় বাড়তি কাজগুলো।

কর্মস্থল থেকে সে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। সে সিনেমা দেখে না, আড্ডাও দেয় না যেহেতু তার বন্ধু নেই। মায়ের সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া আর তার অবসর কাটাবার কিছু নেই।

ধুতি-শার্টের মতোই অঘোর এস্টেট থেকে বাড়ি প্রায় দেড়মাইল রাস্তা হেঁটে যাতায়াতের অভ্যাসটা সে ছাড়েনি।

আহিরিটোলা বাড়ির ভাড়া আদায়ে বা কর্পোরেশন অফিসে ট্যাক্স, ইলেকট্রিক আপিসে বিল জমা দিতেও সে হেঁটে যায়। হাঁটা তার কাছে নেশার মতো।

"শরীর ফিট থাকে।"

"তাই বলে রোজ রোজ এত হাঁটবি? এখন তো আর ট্রাম বাসের খরচ বাঁচাবার মতো অবস্থা নয়।"

"না হলেই বা, খরচ না করলে যখন চলে তখন করব কেন, এ তো আর চাল নুন তেল নয়? হিসেব করে দেখেছি হাঁটলে আঠারো থেকে কুড়ি টাকার মতো সেভ হয়, বাড়িভাড়ার প্রায় ওয়ান-ফোরথ।"

শীলা দালানে রুটি সেঁকছিল। অনন্ত খালিগায়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। তার পাশে থালায় গরম রুটি আব বেগুনভাজা।

"সেদিন ওপরে গেছলুম, বড়গিন্নি এ-কথা সে-কথার পর বলল, এবার কিছু বাড়াও, অনেকদিন ধরেই তো সত্তর রয়েছে...গোটা একতলা, এখন এর ভাড়া কমকরে আড়াইশো, সেলামিও হাজার চারেক হবে। অনন্ত তো রোজগার করছে..."

"ভাড়া বাড়াও বললেই যেন বাড়াতে হবে। আমাদের আহিরিটোলার বাড়িতে তিনখানা ঘর, ছাদ, আলাদা কল-পায়খানা নিয়ে রয়েছে, ভাড়া দেয় কত জানো? উনচল্লিশ টাকা বারোআনা। রেন্টকন্ট্রোলে এই মাসেই সাধনবাবু ভাড়া বাড়ানোর জন্য মামলা তুলবেন। এন্টালির বাড়িতে এক-একটা ফ্ল্যাট, কেউ দেয় পঁয়তাল্লিশ, কেউ দেয় পঞ্চান্ন, সব পঞ্চাশ-ষাট বছরের ভাড়াটে।...উঠে যাক, এখুনি ছ'শো টাকার ভাড়া হয়ে যাবে। এদের বলে দিয়ো একআধলাও বাড়াব না।"

অনন্ত ক্রমশই হিসেবি হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রখর হয়েছে বাস্তববুদ্ধি। সে এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে অনুর বিয়ের কথা। অনু বড় হয়েছে। ওর শরীরের দিকে আগের মতো আর অসংকোচে তাকানো যায় না।

কয়েকদিন ধরেই তার চোখে পড়ছে উঠতি বয়সি কিছু ছেলে, তাদের জানলার উলটোদিকে উৎপলদের রকে বসে একটু বেশি জোরে কথা বলছে, নিজেদের পরাক্রম সম্পর্কে জোরালো দাবি রাখছে, ঘনঘন তাদের জানলার দিকে তাকায়। ওদের বেশিরভাগই তার থেকে মাত্র তিন-চার বছরের ছোট কিন্তু তাকে দেখলেই গলা নামিয়ে কথা বলে। এটা তাকে অদ্ভুতভাবে তৃপ্ত করে। সে অভিভাবক, সংসারের কর্তা এবং মানী। বাবা বেঁচে থাকলে এমনভাবেই লোকে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করত! অথচ তখন তার বয়স পঁচিশও নয়।

খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থেকে সে অনুর জন্য সম্বন্ধ খুঁজতে শুরু করে। তিন-চার জায়গায় চিঠিও দেয়। উত্তরও আসে।

"সবাই টাকা চায়।"

"এই তো আঠারোয় পড়ল আর দুটো বছর থাক না।"

"না না, ছোটতেই বিয়ে দেওয়া ভাল। তুমি বোঝো না, অল্পবয়সি কাঁচা মন সহজে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে তাতে সুখীই হয়। আগেকার দিনে সাত-আট বছরেই বিয়ে দেওয়া হত, খুব ভাল নিয়ম ছিল।"

"যা ভাল বুঝিস কর। গয়নাগুলো থাকলে ভাবনা ছিল না... দু'-চার ভরি তো দিতেই হবে, একেবারে খালি গলা-হাতে কি মেয়ে দেওয়া যায়!"

"ব্যাঙ্কে তো হাজার ছয়েক রয়েছে এখনও, তাই থেকে..."

"অলুর জন্য লাগবে না?"

"অর্ধেক টাকা ওর জন্য থাকবে।"

"বিয়ের খরচ তো আছে... কিছু কেনাকাটা, লোক খাওয়ানো, নমস্কারি, ফুলশয্যার তত্ত্ব, দানের বাসন নমোনমো করে দিলেও তো হাজার দু'-তিন, তার ওপর গয়না, অর্ধেক টাকায় এত সব হবে?"

অনন্ত চুপ করে থাকে। একটা প্রবল বিরক্তির মধ্যে তাকে হাত-পা বেঁধে যেন জোর করে শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাত-পা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেই বাঁধনগুলোয় টনটন করে ওঠে। এ-সব দায় বাবার।

কিন্তু এখন সে বাবার জায়গায়, সে বড়ছেলে। অনেক টাকার দায় তার ঘাড়ে, অনেক বছর এটা থাকবে। তাকে টাকা রোজগার করে যেতে হবে শুধু এদের জন্য। অমর থাকলে সাহায্য করত কি?

এন্টালি থেকে মৌলালির দিকে হেঁটে যাবার সময় দু'-তিনদিন সে একটা চায়ের দোকানে সকালে অমরকে দেখেছিল খবরের কাগজ পড়ছে। সামনের প্লেটে টোস্ট। পরনে লুঙ্গি আর হলুদ পাঞ্জাবি। কাছাকাছিই কোথাও থাকে। দেখা করে কথা বলতে ইচ্ছে করলেও সে জড়তা কাটাতে পারেনি। কী ব্যবহার করবে?

অবশেষে দোকানটার সামনেই একদিন সকালে তারা মুখোমুখি হয়ে গেছল। ন'টার মধ্যে সেদিন এক ভাড়াটের সঙ্গে দেখা করার কথা। অনন্ত ব্যস্ত হয়ে হাঁটছিল, অমরকে সে দেখতে পায়নি।

"এদিকে কোথায় যাও?"

অনন্ত চমকে উঠেছিল। অমরের দিকে প্রথমে সে অবিশ্বাসীর মতো তাকিয়ে হঠাৎ ডান হাতটা ওর কাঁধে রেখে বলেছিল, "তুই তো বেশ মোটা হয়েছিস।"

অমরের ভ্রূটা কুঁচকে উঠল। কথাটায় আমল না দিয়ে বলল, "বাড়ির সবাই ভাল আছে?"

"হ্যাঁ, মা তোর কথা বলে।"

"অ।"

ওদের দু'পাশ দিয়ে মানুষ চলাচল করছে। ফুটপাথের মাঝখানে পথজুড়ে থাকার জন্য কেউ কেউ বিরক্তি ভরে তাকিয়ে গেল।

"চা খাবে... এসো তা হলে।"

অনুরোধ নয়, প্রশ্ন নয় যেন নির্দেশ। উত্তরের জন্য পরোয়া না করে অমর চায়ের দোকানের দিকে এগোল। ওর সঙ্গে অনন্তও ঢুকল। মুখোমুখি বসল। জীবনে এই দ্বিতীয়বার সে রেস্টুরেন্টে বসল। প্রথমবার গৌরীর সঙ্গে। ছোট্ট দোকান, চারটে মাত্র টেবল। দরজাবিহীন রান্নাঘর থেকে ডিম আর সেঁকারুটির গন্ধ আসছে।

"ওমলেট খাবে?... অ্যাই এদিকে আয়।"

যতক্ষণ না ওমলেট এবং মাখন লাগানো টোস্ট এল, অমর খবরের কাগজের পাতা উলটে দ্রুত উপর-নীচের হেডিংগুলোয় চোখ বোলাল। দু-তিনবার ঝুঁকে পড়ল।

ততক্ষণ অনন্ত ওকে দেখছিল। মসৃণভাবে কামানো গালদুটো ভরন্ত। গায়ের রং একটু তামাটে হয়েছে। পাঞ্জাবির বোতাম খোলা, বুকের লোম ঘন, দু'হাতেও রোম, বাঁ-হাতে কালো ডায়ালের ঘড়ি। চুল এলোমেলো, কিছুটা যেন লম্বাও হয়েছে। গলার স্বর আগের থেকে ভারী। অমর একটা পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছে। ওকে দেখে অনন্তের ভাল লাগল।

কাগজ নামিয়ে অমর চায়ে চুমুক দিয়ে একটা টোস্ট তুলে নিল।

"সবাই তা হলে ভাল আছে।"

"মা তোর কথা প্রায়ই বলে, গিয়ে দেখা করলেই তো পারিস।"

অমর কাগজ পড়ায় মন দিল। টোস্টে কামড় দিয়ে চিবোতেই মড়মড় শব্দে অপ্রতিভ হয়ে অনন্ত চিবোনো বন্ধ রেখে টুকরোটা মুখের মধ্যে রেখে দিল ভেজাবার জন্য। অমর তার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। কিছুই ভোলেনি তা হলে।

"তুই এখন কী কচ্ছিস, থাকিস কোথায়?"

"একটা ফার্মে আছি, রাত্তিরে পড়ি।"

"বি এ-টা পাশ করেছিস?"

"হ্যাঁ। তুমি কি এখনও বই বাঁধানোর কাজে আছ?"

"না অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। এই কাজটা... ।"

অনন্ত থেমে গেল। ওকে বলা যাবে না। অমর জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে।

"... বছর চারেক করছি। একটা এস্টেটে, এখন আর জমিদারি নেই, ওদের কলকাতার বাড়িগুলোর দেখাশোনা ভাড়া আদায় এই সব করি।"

"অনু-অলুর কোন ক্লাস হল, পড়ছে ওরা?"

"অনু ছেড়ে দিয়েছে পড়া, অলুর এবার প্রি-ইউ।"

"ছাড়ল কেন, পড়া কি ছাড়তে আছে। এবার তা হলে বিয়ে দিয়ে দাও।"

নিজের বোন নয়, যেন দূরসম্পর্কের কোনও আত্মীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে অমর বলল। অনন্তের ভিতরটা ক্রমশই বসে যাচ্ছিল। ফিকে হেসে ওমলেটের শেষ টুকরোটা চামচেয় তোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, "তাই ভাবছি। টাকা পয়সা তো নেই হাতে... ।"

অনন্তের আশা জাগল, অমর এবার বলবে সে সাহায্য করবে। কিন্তু তার বদলে সে ওমলেটের টুকরোটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ও-ভাবে উঠবে না, হাত দিয়ে তুলে নাও।"

অপ্রতিভ হয়ে অনন্ত তাই করল। অমর টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না এটা সে বুঝে গেছে। কিংবা হয়তো চাইছে হাতজোড় করে দাদা তার কাছে টাকা চাক।

কিন্তু সে চাইবে না। ক'টা বছর একাই সংসার চালিয়ে গেল, একাই সে বোনেদের বিয়ে দেবে। যেমন ভাগ্য করে এসেছে তেমন পাত্রই পাবে।

"উঠব এবার।"

অমর ইশারায় ছেলেটাকে ডেকে বুকপকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে দিল।

"তুই তা হলে আর আসবি না।"

"না।"

"খোঁজখবরও করবি না?"

"এই তো খোঁজ নিলুম, এইভাবেই নেব। ...দূরে থাকাই তো ভাল।"

"তুই কি আমার ওপর রেগে আছিস এখনও?"

অমর হাসল। স্বচ্ছ উদার। তাতে একছিটেও মালিন্য নেই।

"একদমই না। হ্যাঁ, তখন রেগে ছিলুম তো বটেই। এখন বুঝতে পারছি ভালই করেছি। সবাই মিলে ও-ভাবে একসঙ্গে, কোনওক্রমে আধপেটা খেয়ে বেঁচেবর্তে শুধু দিন কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হত না। জড়াজড়ি করে এখন আর কিছু করা যায় না। বড়জোর ভেসে থাকা যায় কিন্তু সাঁতার কাটা যায় না।"

"সবাইকে দেখা, ভরণপোষণ... দায়িত্ব আছে সেটা তো পালন করা উচিত বিশেষ করে যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। নয়তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে। ... মা দাসেদের বাড়ি রাঁধুনির কাজ নেবে বলেছিল আমি নিতে দিইনি... না খেয়ে থাকব সে-ও ভাল তবু মানসম্মান খোয়াব না।"

অনন্ত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রইল। অমরের মুখে বিরক্তিটা প্রকট হয়ে উঠেছে। খুচরো পয়সাগুলো পকেটে রেখে বাঁ হাতের তালুতে মৌরি তুলে নিল।

"মানসম্মান বাঁচিয়ে রেখে কী পেয়েছ? চার বছর আগে যা ছিলে এখনও তো তাই আছ... ভবিষ্যতেও তাই থাকবে... লোকে বলবে তোমরা মানী, সৎ ভাল... তাই দিয়ে কি অনুর বিয়ে দেওয়া যাবে?"

"সেটা আলাদা কথা, যা চলে আসছে, যা নিয়ম সেইভাবেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্মান একটা আলাদা ব্যাপার।"

"কীসে আলাদা?"

অনন্ত এই মুহূর্তে কোনও জবাব খুঁজে পেল না। সে উঠে দাঁড়াল।

"তুই তা হলে আমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবি না?"

"রাখারাখির কী আছে। তোমাদের কি কোনও অসুবিধা হয়েছে আমি না থাকায়?

"না।"

অস্বাভাবিক জোর দিয়ে সে 'না' বলল। অমরের যে আদৌ কোনও গুরুত্ব নেই তাদের সংসারে এটাই সে বোঝাতে চাইল।

"তা হলে? কী দরকার সম্পর্কের ডালপালা ছড়িয়ে?"

"তাতে সাঁতার কাটায় সুবিধা হয়।"

"ঠিক।"

অমরের সঙ্গে এরপরও কয়েকবার দেখা হয়েছে রাস্তায়, এই চায়ের দোকানের সামনে। 'ভাল আছিস?' 'বাড়ির সবাই ভাল?' 'মা তোর কথা বলছিল, দেখতে চায়।' 'যাব একদিন।' এইভাবেই হাঁটা থামিয়ে তারা কথা বলেছে। অমর কোথায় থাকে, কোথায় কাজ করে কিছুই বলেনি, অনন্তও জানাতে চায়নি। প্রথমদিন দেখা হওয়ার কথাটা সে মা'কে বলেছিল, তারপর আর বলেনি। মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অমর সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিল তার কাছে।

অনুর বিয়ের জন্য অর্থ ও পাত্র জোগাড় করার ভাবনা মাঝে মাঝেই তাকে বিব্রত করত। মাঝে মাঝে মনে হত অমর ঠিকই বলেছে, জড়াজড়ি করে সাঁতার কাটা যায় না। কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটাও শেখেনি। অমর বেরিয়ে গিয়ে শিখেছে। হয়তো পাড়ে উঠতে পারবে।

বিজ্ঞাপন দেখে নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাচ্ছিল অনন্ত। কটক থেকে একটি জবাব তাকে আশান্বিত করল। মাকে চিঠি দেখাল। ছোট চিঠি, পাত্রপক্ষ একপয়সাও নগদ নেবে না, একরতি সোনাও চায় না। মেয়ে পছন্দ হলে তারাই বিয়ের খরচ দিয়ে মেয়ে নিয়ে যাবে।

শীলা অবাক হয়ে বলল, "শুনেছি এ-রকম অনেক বিয়ে হয়েছে, বরপক্ষই খরচ দিয়ে মেয়ে নিয়ে গেছে। সে-সব পরমাসুন্দরী মেয়ে... অনু তো দেখতে পাঁচপাঁচি!"

"বলি না মেয়ে দেখে যেতে।"

"অতদূরে, খোঁজখবর নেওয়া তো সোজা নয়। কেমন ঘর, কেমন লোক, ঠগ কি না কিছুই তো জানি না। ঠাকুরপোকে বল না একবার। ওর তো চেনাশোনা কেউ কটকে থাকতে পারে, খোঁজ খবর নিয়ে জানাবে।"

অবিনাশের চেনালোক ছিল ভুবনেশ্বরে। সে প্রায় রোজই কটকে যায় ব্যবসা সূত্রে। তাকে দিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল; তিনপুরুষ তারা কটকের বাসিন্দা, সম্পন্ন একান্নবর্তী বিরাট পরিবার। দুটি দোকান আছে গহনার। পাত্রের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, বিয়ে হয়েছিল, বউ মারা গেছে একটি এক বছরের ছেলে আছে। পাত্র ক্লাস সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়েছে।

ওরা তিনজন বিভ্রান্ত বিষণ্ণ হয়ে সন্ধ্যায় দালানে বসে ছিল। অবিনাশকে লক্ষ্য করে অনন্ত বলে, "কাকা কী করব বলুন? পরে সবাই আমাকে বলবে, হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে দাদা জলে ফেলে দিল, তা হতে দেব না।"

"এমন ঘর, জল ভাবছিস কেন?"

"বয়সের পার্থক্যটা? অনুর প্রায় দ্বিগুণ!"

"এমন পার্থক্যে কি বিয়ে হয় না? আমার মা আর বাবার মধ্যে পার্থক্য তো একুশ বছরের, কোনও অসুবিধা হয়নি... বাহান্ন বছর দিব্যি কাটিয়ে গেছে একসঙ্গে।"

"সে আমলে ও-সব হত এখন কি আর হয়?"

শীলা অস্ফুটে বলল, "গিয়েই ছেলে ধরতে হবে। লেখাপড়ার কথা নয় ধরছি না, পুরুষমানুষের রোজগারই আসল গুণ।"

অনন্ত বুঝতে পারছে না সে রাজি হবে কি হবে না। শীলার খুঁতখুঁতনি বিপত্নীক হওয়ার জন্য। অবিনাশের মত আছে।

"আমার মনে হয় অনুকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত... ওর মতামতটাই আসল। ও যদি রাজি থাকে তা হলেই আমরা এগোব।"

অনু ঘরে ছিল। সব কথাই তার কানে গেছে। অনন্তর কথাগুলো শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড পরই ঘর থেকে তার গলা শোনা গেল।

"আমার অমত নেই, তোমরা যেখানে বিয়ে দেবে সেখানেই বিয়ে করব।"

ওরা স্বস্তিবোধ করেছিল। কিন্তু অনন্তের বুকের মধ্যে শুরু হয়ে যায় নতুন একটা খচখচানি। সে মুখ নামিয়ে বসে থাকে।

তখন অবিনাশ মৃদুকণ্ঠে বলেন, "যার যেখানে অন্ন বাঁধা সেখানেই পাত পাততে হবে।"

এক মাসের মধ্যেই অনুর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রের দাদা ও সম্পর্কিত মামা এসে মেয়ে দেখে পছন্দ করে যায়। অনু বলেছিল, তার কোনও বন্ধুকে সে নিমন্ত্রণ করবে না। প্রায় নিঃসাড়েই বিয়ে হল। সদরে বাড়তি একটি বাল্ব ছাড়া বিয়েবাড়ির কোনও চিহ্ন ছিল না। বরের সঙ্গে এসেছিল চারজন। উঠোনে উনুন পেতে রান্না হয়, খাওয়া হয় দালানে। পাড়ায় কাউকেই তারা বলেনি, শুধু সাধন বিশ্বাস আর তার ছেলে উৎপলকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তিনি আসেননি শরীর ভাল না থাকায়, উৎপল এসে একটা তাঁতের শাড়ি দিয়ে গেছে। দোতলার জ্যাঠামশাই বাদে আর সবাই খেয়ে গেছে। দু'-তিনজন কাঙালি সদরের সামনে অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

পরদিন বর-বউ বাড়ি থেকেই হাওড়া স্টেশনে যায়। ওদের ট্রেনে তুলে দিতে সঙ্গে গেছল অনন্ত। অনু ট্যাক্সিতে ওঠার সময় কাঁদেনি। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে কেঁদে উঠবে এমন একটা ব্যাপারের জন্য সে তৈরি ছিল। ট্রেন ছেড়ে দিল। অনন্ত দেখল হাজার বছরের পুরনো কাঠের মতো শুকনো মুখ নিয়ে তার বোন একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে বসে। মুখটাকে চিরকালের মতো অনন্তের বুকে খোদাই করে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল।

আট

অনন্ত ঠিক করেছিল অলুর বিয়ে এমনভাবে দেবে যাতে ওর মনে কোনও খেদ না থাকে।

বি এ পাশ করার দু'বছর পর অলু ফুড কর্পোরেশনে চাকরি পায়। নিজের চেষ্টাতেই জোগাড় করেছে। অনন্ত শুনে থ হয়ে গেছিল। তাদের বাড়ির মেয়ে চাকরি করবে দশটা-পাঁচটা! বিস্ময়টা ক্রমশ ভয়ে রূপান্তরিত হয়ে তাকে কিছুদিন নানান অশুভ ভাবনায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। প্রায়ই তার মনে হত, অলু বাবার মতো বাস চাপা পড়ে মরে যাবে। এই পরিবারের মধ্যে অলু একটু আলাদা ধরনের। অমরের সঙ্গে ওর মিল আছে। কলেজে পড়ার সময় কিছু ছেলেমেয়ে ওর সঙ্গে দুপুরে বা বিকেলে আসত। বাড়ি ফিরে অনন্ত সে খবর পেত শীলার কাছে।

"অলুর বন্ধুরা বেশ মিশুকে। মুড়ি খেতে চাইল, আমি বললুম দোকানে যাবার লোক নেই, ওদেরই একজন মুড়ি, বেগুনি কিনে আনল। চা করে দিলুম। ছেলেগুলো বেশ।"

"ছেলে?"

"ওর সঙ্গেই পড়ে।"

অলু কলেজ ইউনিয়নের সহ-সম্পাদিকা হয়েছিল। অনেকদিনই সে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরত। অনন্তের সেটা ভাল লাগত না।

"ওকে বলে দিয়ো বিকেল থাকতে থাকতেই যেন বাড়িতে ঢোকে। এ-বাড়ির মেয়েরা সূর্য ডুবলে বাড়ির বাইরে থাকে না।"

"বিকেলে টিউশানিতে যায়, হয়তো কোনও কারণে দেরি হয়েছে।"

একদিন শীলা একটি পাতলা পত্রিকা অনন্তকে দেখাল। "অলু কেমন পদ্য লিখেছে দেখ।"

অনন্ত অবাক হয়ে পত্রিকার পাতাটার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। ছাপার অক্ষরে তাদের কারুর নাম সে জীবনে এই দ্বিতীয়বার দেখল। বাবার বাসচাপা যাওয়ার খবরটার সঙ্গে 'শক্তিপদ দাস' নামটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

যোলো লাইনের পদ্যটা তিন-চারবার সে পড়ে। একদমই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেনি। কিন্তু 'স্তন' আর 'চুম্বন' শব্দদুটি তাকে রীতিমতো ভয় পাইয়ে দেয়। অলুর হাত দিয়ে এইসব নোংরা জিনিস বেরোয় কী করে? একটা মেয়ে! তাদের বাড়ির মেয়ে এইসব অসভ্য চিন্তা করছে আর পাঁচজনকে তা জানাচ্ছে, লোকে কী ভাববে! তারই বোন, তার সম্পর্কে কী ধারণা হবে? পাড়ার কেউ পড়েছে কি না কে জানে।

অলুর পদ্যটা কয়েকদিনের জন্য তাকে সন্ত্রস্ত রেখেছিল। সে আবার ভয় পায় যখন শীলা বলল, "অলু দু'দিনের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে যাবে।"

"কী দরকার যাবার?"

"মানুষ বেড়াতে যায় না? এই তো ওপরের ওরা পুরী-টুরি ঘুরে এল।"

"ঘুরুক গে, পয়সা আছে তাই গেছে।"

"তোরও তো পয়সা আছে, সেদিন তো বললি এখন সাড়ে ছ'শো টাকা মাইনে। আমায় নিয়ে চল না, কাশীটা একবার দেখে আসি।"

"শুনতেই ওই সাড়ে ছ'শো। হাতে আর একটু জমুক। জিনিসপত্রের দাম কত বেড়েছে জানো? একজোড়া কাঁচকলা চল্লিশ পয়সা, শুনেছ কখনও?"

অলু দিঘা ঘুরে এল। তাদের বাড়ির মেয়ে দুটো দিন বাইরে কাটাচ্ছে, এটা সে ভাবতেই পারে না। অলু যখন তখন বাড়ি থেকে বেরোয়, ফেরারও ঠিক নেই, এটাও সে মানতে পারে না। সে-জন্য মা'র কাছে বিরক্তি প্রকাশ করে, রাগও। কিন্তু অলু তা গ্রাহ্য করে না।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে অলু শীলার হাতে দু'শো টাকা দেয়। অনন্ত তখন ঘরে। ওদের কথা তার কানে যাচ্ছিল।

"আমাকে দিচ্ছিস কেন, দাদার হাতে দে।"

"তুমিই দাও।"

"আমি না, তুই দিলেই ভাল দেখায়। সংসারের সব খরচ-খরচা তো ওই করে।"

অলুর মুখটা খুশিতে, লজ্জায় আর উত্তেজনায় টসটস করছিল। দেখতে সুশ্রীই, আলগা চটক সারা অবয়বে। কথাবার্তায় চোখা, অনুর মতো কুনো ভোঁতা নয়। এই বোনটিকে নিয়ে অনন্তর যত দুর্ভাবনা ততই নিশ্চিন্তি।

"দাদা।"

অলুর বাড়ানো হাতে কড়কড়ে দুটো একশো টাকার নোট। অনন্ত ভেবেছিল পুরো মাইনেটাই তার হাতে দেবে। তাই তো উচিত। এতকাল যেমন টাকা চেয়ে নিয়েছে, সেইভাবেই চাইবে। অবশ্য টিউশনি শুরু করার পর অলু আর টাকা চায়নি।

"আমায় দিচ্ছিস কেন, জমা, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোল।"

"অ্যাকাউন্ট আছে, এটা সংসারের খরচের জন্য।"

অ্যাকাউন্ট আছে শুনে অনন্ত ধাক্কা খেল। তার পরামর্শ না নিয়েই অলু ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে শুরু করে দিয়েছে। নিজেই হিসেব করে দু'শো টাকা দিচ্ছে সংসারের জন্য। অথচ এমন দিনও গেছে টিপেটিপে ষাট টাকায় মাস চলেছে। তার মনে হল, সংসার থেকে অমরের মতো অলুও বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। তাকে আর ধর্তব্যের মধ্যে রাখছে না।

অনন্ত টাকাটা হাতে নেয়নি। অলুকে বলেছিল টেবলে রাখতে। আর বলেছিল পরের বার থেকে মা'র হাতেই যেন দেয়।

একদিন অলু তার মাকে জানাল সে বিয়ে করবে। ছেলেটির নাম শান্তনু। কলেজে তার দু'বছরের সিনিয়র ছিল। আধুনিক গান লেখে, রেডিয়োয় আর অ্যামেচার থিয়েটার দলে অভিনয় করে, খবরের কাগজে এটা-ওটা লেখে, ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ি, অবস্থা ভাল। তবে চাকরি করে না।

রাত্রে অনন্ত খেতে বসলে শীলা ফিসফিস করে জানাল,

"অলু বিয়ে করবে, ছেলে চাকরিবাকরি করে না।"

"কী করে তা হলে?"

"তুই ওকেই জিজ্ঞেস করিস। বেকারকে বিয়ে করবে, ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"পরে চাকরি পাবে।"

"যখন পাবে তখনই বিয়ে করবে। তুই বারণ কর।"

"আমাকে তো অলু বলেনি কিচ্ছু, যেচে বলাটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া ছেলেকে তুমিও দ্যাখোনি আমি দেখিনি।"

পরদিন অফিস যাবার আগে অলু তাকে বলেছিল। অনন্ত চুপ করে শুনে যায়।

"রেজিস্ট্রি করব। গাদাগুচ্ছের খরচ করার মতো টাকা আমার নেই।"

আমার নেই মানে? অলু কি নিজের বিয়ের খরচ নিজেই করবে? অনন্ত আর একটা ধাক্কা খেল। নিজের দায় নিজেই বইবে, ভাল। তাকে যদি অগ্রাহ্য করতে চায় করুক।

"তুই ভেবেচিন্তে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের বংশে কেউ রেজিস্ট্রি বিয়ে করেনি।"

"করেনি, এবার হবে।"

অনন্ত একবার শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আলনা থেকে শার্টটা তুলে নিয়ে বলল, "আমরা কেউ কিন্তু দায়ী থাকব না যদি কিছু ঘটে।"

"কী ঘটবে?"

"ভালবাসার বিয়ে তো... দেখলুম না তো কাউকে সুখী হতে।"

"তুমি আবার দেখলে কবে?"

অলু তীক্ষ্ণ স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল। "তুমি তো লোকজনের সঙ্গে কোনওদিন মেলামেশাই করোনি। কোনওদিন তোমার একটা বন্ধু দেখলাম না, একটা বই পড়তে দেখলাম না... সিনেমা, গান, নাটক, বেড়ানো কিছুই না। শুধু কাজে যাওয়া আর ঘরে বসে থাকা... তুমি ভালবাসার বিয়ের কী বোঝ আর কী জানো, শুধু তো ভালো ছেলে হয়েই জীবন কাটিয়েছ।"

অনন্ত হতভম্ব হয়ে, শার্টের মধ্যে দু'হাত গলানো অবস্থায়, তাকিয়ে থেকেছিল। দরজার কাছে শীলা দাঁড়িয়ে।

"অলু কাকে কী বলছিস তুই! তোর দাদা সতেরো বছর বয়স থেকে সংসারের হাল ধরেছে, তোদের মানুষ করেছে, আর তুই কিনা চাকরি পেয়ে সব ভুলে গেলি?"

অলুকে বিচলিত দেখাল কিন্তু রাগ পড়েনি।

"ভালবাসার বিয়ে নিয়ে দাদা বাজে মন্তব্য করল কেন? আমি অসুখী হব এমন ইঙ্গিত দেওয়ার কী দরকার ছিল? আমি তো অনু নই যে সবাই মিলে যেমন তেমন একটা বিয়ে দেবে আর মেনে নেব।"

"যেমন তেমন? ওকে জিজ্ঞেস করে মত নিয়ে তবেই বিয়ের কথা বলেছি।"

"মতামত দেবার মতো বুদ্ধি তখন ওর হয়নি, হলে বিয়ে করত না। তোমরা ওর জীবনটা নষ্ট করেছ।"

অলু দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওর জুতোর শব্দ সদরে না পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ কথা বলেনি।

"অনুর জীবন কি নষ্ট হয়েছে, মা?"

"পাঁচটা ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছে, সতীনের ছেলেকে নিজের পেটের ছেলের থেকে আলাদা করে দেখে না, অনু আমার কত ভালো মেয়ে। ও সুখী হবে না তো কে হবে! জামাই বাড়ি করবে বলে জমি কিনেছে..."

অনন্ত আর শোনেনি। সে কাজে বেরিয়ে গেছল। সারাদিন তার মাথার মধ্যে ঘুরেছে অলুর কথাগুলো। সত্যিই সে মেলামেশা করেনি। সত্যিই তার কোনও বন্ধু নেই। ভালবাসার কিছুই সে জানে না। অলুর প্রত্যেকটা কথাই সত্যি, ভালো ছেলে হয়েই তার দিনগুলো কেটে গেল।

রাত্রে অনন্তের ঘুম এল না। এন্টালির বাড়িতে ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, রাজমিস্ত্রি নিয়ে আজ গেছল কাজ বুঝিয়ে দিতে। ফেরার সময়, প্রতিবারের মতো, মিনতি করের ঘরে যায়।

"রোজই অপেক্ষা করি এই বুঝি দারোয়ান এসে জিনিসপত্র ছুড়ে ছুড়ে ফেলে আমায় বার করে দেবে। রাতে ঘুম হয় না।"

"আপনাকে তো বলেছি, এ-সব চিন্তা করবেন না। যদি তুলেই দিত, তা হলে দশ-বারো বছর আগেই দিত। আমি যতদিন আছি আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"পেটের ছেলেও এত করে না, তুমি যা করছ আমার জন্য।"

ঘরের মধ্যে লম্বা পর্দাটা আর নেই। অনন্ত যখনই আসে দরজার কাছে চেয়ারটায় বসে। ছবিটা একই জায়গায়, একই রকম উজ্জ্বল। শুধু ফ্রেমের রংটা ধূসর হয়েছে।

"এখনও আপনি আগের মতোই ভালবাসেন?"

চোখ পিট পিট করলেন মিনতি কর। আরও শীর্ণ, চোয়ালের চামড়া শিথিল, চোখের কোণে ভাঁজ, পিঠটা একটু বাঁকা কিন্তু হাসিটা বাচ্চা মেয়ের মতো।

"এই নিয়ে কতবার জিজ্ঞাসা করলে বলো তো?"

"চারশো তিয়াত্তরবার।"

"ঠাট্টা নয়, ঠাট্টা নয়... তোমার ভীষণ কৌতূহল ছবিটা সম্পর্কে, ...নেবে ওটা?"

অনন্তর বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠেছিল। আচমকা তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল কথাটা, "নেব।"

"আমি মরে গেলে, তার আগে নয়।"

মিনতি কর চা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় প্রসঙ্গটা বন্ধ হয়ে যায়।

ভোররাতে অনন্তের চোখে ঘুম নেমে আসে।

তিনদিন পর সন্ধ্যায় অলুর সঙ্গে একটি যুবক এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে অনন্ত তখন খালি গায়ে ভিজে গামছা রগড়াচ্ছিল। যুবকটিকে দেখামাত্র তার মনে পড়ল রমেনকে। দাঁড়ানো, তাকানো ছাড়াও অসম্ভব মিল রয়েছে শরীরের গড়নে। আপনা থেকেই তার দৃষ্টি অলুর গলায় পড়ল। গৌরীর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে এলেও সবুজ পাথরের মালাটা জ্বলজ্বলে রয়েছে। এত বছরে একবারও ওর সঙ্গে দেখা হল না।

"শান্তনু... এই হচ্ছে আমার দাদা।"

হাত তুলে নমস্কার করল শান্তনু। অনন্ত কোনওরকমে হাতের মুঠি দুটো বুকের কাছে তুলল। কোনও কথা বলল না।

"তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলে এসেছে।"

"কী কথা।"

নিজের গম্ভীর, নিস্পৃহ স্বরে অনন্ত অবাক। তার যে কোনও আগ্রহ নেই সেটা ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে।

"বিয়ের কথা বলতে এসেছি।"

"মা'র সঙ্গে।"

শান্তনুকে নিয়ে অলু মা'র ঘরে ঢুকল। একটু পরেই অনন্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। পার্কে একটা রাজনৈতিক সভা চলছিল, সভার পিছনে বসে বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার মনে হল পনেরো বছর আগে সে ঠিক এই কথাগুলিই শুনেছে এই পার্কে। লোকগুলোর বক্তৃতার স্বর এবং ভঙ্গি একটুও বদলায়নি। শ্রোতারাও পনেরো বছর আগের মতোই হাততালি দিল।

অলু বিয়েতে সাক্ষী হবার জন্য অনন্তকে বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হয়ে যায়। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করছে কারুর মতামতকে গ্রাহ্য না করে। সুতরাং ভবিষ্যতে অলুর কিছু বলার মুখ থাকবে না।

শীলার কাছ থেকে অনন্ত শুনল, বিয়ের পর অলু শ্বশুরবাড়ি যাবে না। শান্তনুর মা, বউদি আর দাদার আপত্তি আছে এই বিয়েতে।

"নগদ, গয়না, আলমারি, খাট এইসব আশা করেছিল।"

"ছেলের তো কোনও রোজগারই নেই।"

"তা হলেই বা বড় বংশ, নিজেদের বাড়ি, বড় বড় নামী আত্মীয়-স্বজন...ওরা ঠিক করেছে ঘর ভাড়া নিয়ে আলাদা থাকবে।"

"তার মানে অলুকেই সব খরচ টানতে হবে। এ-রকম বিয়ের কী যে দরকার...যাক গে ওরা যা ভাল বোঝে করুক।"

"তুই সেদিন আর শার্ট পরিস না, পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে যাস।"

অনন্ত পাঞ্জাবি পরেই রেজিস্ট্রারের অফিসে হাজির হয়েছিল অলুর সঙ্গে। সে বাসে ওঠার কথা বলেছিল, অলু হাত তুলে ট্যাক্সি থামিয়ে বলেছিল 'আজ আর বাসে নয়।' ট্যাক্সি থেকে নামার পরই তার মনে পড়ে জীবনে এই দ্বিতীয়বার সে ট্যাক্সিতে উঠল। খুব আশ্চর্য হয়ে সে মুখ ফিরিয়ে গাড়িটাকে বারবার দেখে চিনে রাখার চেষ্টা করে। ফান্ড তোলার জন্য প্রথম ট্যাক্সি করে গেছল।

শান্তনু আর তার দুই বন্ধু তখনও আসেনি। অলু অধৈর্য হয়ে কয়েকবার তার হাতঘড়ি দেখল।

"ক'টায় আসবে বলেছে?"

"একটায়।"

দেয়াল ঘড়িতে তখন একটা-দশ। রেজিস্ট্রারের বন্ধ ঘরের মধ্যে দু'জন নারী-পুরুষ। তারা বিয়ের ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছে।

"বোধহয় ট্র্যাফিক জ্যামে পড়েছে।"

আরও দশ মিনিট পর শান্তনু এল। ঝোলা কাঁধে চাপদাড়িওলা সঙ্গে একজন। অলুকে দেখে পরিচিতের হাসি হাসল।

"আরে প্রশান্তর জন্য বারোটা থেকে অপেক্ষা করে করে...দাদা ভাল আছেন...শেষকালে আর দাঁড়ালাম না। অরুণ ইনি অলুর দাদা, আর এ হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু অরুণ সেন।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিয়ে শেষ করে, রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে ওরা বেরিয়ে পড়েছিল। অলুর হাতে গোলাপের স্তবক, অরুণের দেওয়া। বুকের কাছে রেখে মাথা নামিয়ে মাঝেমাঝে গন্ধ শুঁকছিল। শীলা একটা সিঁদুরের কৌটো অনন্তকে দিয়ে বলেছিল, "বিয়ের পর অলুর সিঁথিতে শান্তনু যেন দেয়।"

অনন্ত ভুলে গেছল। রেজিস্ট্রারই বললেন, "সিঁদুর এনেছেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে।"

অনন্ত পকেট থেকে বার করে কৌটোটা। শান্তনু নস্যির টিপের মতো সিঁদুর তুলে অলুর সিঁথিতে মাখিয়ে দেয়। অলুর চোখদুটো মুদে এল, চামড়া ভেদ করে আলতো একটা আভা মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল। নতুন সিল্কের শাড়ি পরেছে, হালকা গোলাপি জমিতে, রজনীগন্ধার ঝাড় উঠেছে পায়ের কাছ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আজ পরবে বলেই কিনেছে।

অনন্ত মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ভাবল, অলুর যে এত রূপ তা তো কখনও জানতুম না!

অরুণ হঠাৎ উলু দিয়ে উঠল। অনন্ত সভয়ে তাকাল রেজিস্ট্রারের দিকে, তিনি হাসছেন।

"এ আর কী, টেপরেকর্ডার এনে সানাইও বাজায়।"

অলু প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই অনন্ত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ছলছল করছে ওর চোখ।

"অনেক কথা বলেছি, মাপ করে দিয়ো।"

"আরে ও কিছু নয়, কিছু নয়।...ও-রকম হয়ই...ভাল করে সংসার কর, সুখে থাক..."

অনন্তর গলা ধরে গেল। সে বোকার মতো হাসল সকলের দিকে তাকিয়ে। শান্তনু প্রণাম করল।

ঝোলা থেকে সন্দেশের বাক্স বার করে অরুণ এগিয়ে ধরল।

"এবার মিষ্টি মুখ...এই নিয়ে এগারোটা বিয়ের সাক্ষী-হলুম, এখানেই দু'বার হল। দেখছি প্রফেশনাল উইটনেস হয়ে যাচ্ছি...এবার থেকে ফী নিতে হবে।"

পরিবেশটা হালকা হয়ে গেল। কিন্তু অলু কখন যে তার হাত ব্যাগ থেকে টাকা বার করে রেজিস্ট্রারের টেবলে রেখেছে, অনন্ত বুঝতে পারেনি। তার পকেটে তিরিশ টাকার বেশি নেই। বেরোবার সময়ও সে ভাবেনি রেজিস্ট্রারকে টাকা দিতে হবে। অন্যরা নিশ্চয় লক্ষ করেছে মেয়ের দাদা টাকা বার করল না। অলু কি আশা করেছিল, এই খরচটা দাদা দেবে?

সে অপ্রতিভ বোধ করল অন্তত এই টাকাটা তারই দেওয়া উচিত ছিল। কিছুই তো সে অলুকে দেয়নি, শাড়ি পর্যন্ত নয়। বিয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে অলুই খরচ করেছে। জেদি মেয়ে।

অনন্ত বিমর্ষ বোধ করেছিল রাস্তায় বেরিয়ে। তার মনে হচ্ছে কী যেন একটা সে হারাচ্ছে। এক সময় বাবা, মা, সে, তিনভাইবোনে পরিবারটা ভরা ছিল। একে একে লোক কমে যাচ্ছে। এখন তো সে আর মা। যখন প্রচণ্ড অর্থাভাব তখন এতটা নিঃসঙ্গ বোধ হয়নি। কী করে পরের দিনটায় খাওয়া জুটবে সেই ভাবনাটা তাকে ব্যস্ত রাখত। ধীরে ধীরে ভাবনাটা মেঘগর্জনের মতো আকাশে গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে মিলিয়ে গেছে। এখন অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য।

"আমি যাই এখন।"

"সে কী, আমরা যে এখন কোথাও বসে খাব ঠিক করেছি, আপনিও থাকবেন আমাদের সঙ্গে।"

"না ভাই," শান্তনুর কাঁধে হাত রাখল অনন্ত। "অলু জানে আমি ভাত খেয়েই এসেছি। তা ছাড়া অম্বলটা আবার একটু বেড়েছে, বাইরের খাবার খাব না।"

"কিন্তু আমরা যে..."

"তাতে কী হয়েছে। অলু এদের নেমন্তন্ন কর, রোববার আসতে বল।"

অলু দু'জনের উদ্দেশে বলল, শুনলে তো অরুণ, রোববার নিশ্চয় আসবে?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, খাওয়ার ব্যাপারে ফেল করি না।"

অলু জানিয়ে রাখল সে অফিসের দু'-তিনজনকেও বলবে।

বাসে রড ধরে দাঁড়িয়ে আসার সময় অনন্তের মনে হল, বোধহয় এরা সুখীই হবে। ভালবাসার কিছুই তো সে জানে না। অলু এখন বাপের বাড়িতেই থাকবে যতদিন না কোথাও ঘর পায়।

বাপের বাড়ি। অনন্ত অবাক হয়ে ভাবল, অলুর বা অলুদের বাড়ি আর নয়, আজ থেকে তাদের বাড়ি ওর বাপের বাড়ি। মেয়েটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই সংসার থেকে। অবশ্য হতই।

অসম্ভব শ্রান্তি নিয়ে অনন্ত বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল। আজ সে কাজেই যাবে না। এই বছরের প্রথম কামাই, গত বছরে একদিনও নেই, তার আগের বছর ইনফ্লুয়েঞ্জায় দশ দিন।

শীলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে যাচ্ছে তক্তাপোশের পাশে দাঁড়িয়ে। অনন্ত কপালের উপর হাত রেখে চোখ বুজে।

"শুধু একজন, বন্ধু!"

"আবার ক'জন আসবে? একি টোপর পরে বিয়ে যে সঙ্গে পঞ্চাশ-একশো বরযাত্রী আসবে।"

"দুটো মালা কিনে নিয়ে গেলি না কেন?"

অনন্ত উত্তর দিল না।

"মন্তর পড়েছিল?"

"না।"

"তা হলে! এ-সব বিয়ে কি শুদ্ধ?"

অনন্ত চুপ।

"ও কখন ফিরবে কিছু বলেছে?"

কোনও উত্তর নেই।

"অলু কী করল, শুধু সই?"

"হ্যাঁ।"

"সিঁদুরটা শান্তনুই দিল তো?"

জবাব না পেয়ে শীলা আধ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কপাল থেকে হাত নামিয়ে অনন্ত তীব্র চাহনিতে তাকাল।

"এবার শুধু আমরা দু'জন এই সংসারে।"

শীলা অপ্রত্যাশিত এই কথাটার কোনও তাৎপর্য খুঁজে পেল না। শুধু বলল, "ফাঁকা ফাঁকা লাগবে এরপর।" কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে যোগ করল, "এবার তুই বিয়ে কর।"

"কেন?"

"ছেলেপুলে না থাকলে কি ঘর মানায়! বংশরক্ষা করতে হবে তো।"

"অমর আছে।"

"থাকলেই বা, পুরুষমানুষের বিয়ে না করলে কি চলে? এবার আমি মেয়ে দেখব।"

"না।"

"তুই নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবি?"

"না।"

"তা হলে?"

অনন্ত চোখ বন্ধ করে হাতটা আবার কপালে রাখল।

"আর টানতে পারব না, আর ভাল লাগে না, আমি এবার জিরোব।"

"তা জিরো, এত বছর ধরে কম পরিশ্রম করেছিস, তাই তো সবাই বলে..."

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো অনন্তের দুটো হাত ছিটকে গেল দু'ধারে। চিত হয়ে শোয়া শরীরটা এক ঝাঁকুনিতে উঠে বসল। মুঠো করা দুই হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, "সবাই বলে আমি ভালো ছেলে. ভালো ছেলে, ভালো ছেলে...সবাই খুশি তো? কথা দিচ্ছি আমি ভালো ছেলেই থাকব।"

ধীরে ধীরে সে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা তার দুই চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

নয়

পাঁচ বছর পর অনন্ত বিয়ে করল।

শীলার ক্যানসার ধরা পড়া, দিল্লি থেকে অমরের আসা এবং শীলাকে নিয়ে যাওয়ার ছ'মাস পরেই সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। বয়ানটা কেমন হবে তাই নিয়ে সে দিন চারেক চিন্তার মধ্যে কাটায়। পাত্রী চাই কলমের থেকে শব্দ বাছাই করে প্রথমে সে বিজ্ঞাপনের খসড়া করেছিল: দঃ রাঢ়ী কায়স্থ (৩৫), স্বাস্থ্যবান, একা, মাঃ আয় ১০০০্। গৃহকর্মনিপুণা রুচিশীলা নম্র পাত্রী চাই। অন্য জাত বা বিধবাতেও আপত্তি নাই।

দুটো মিথ্যা কথা সে লেখে। বয়সটা প্রায় চারবছর কমিয়েছে, মাসিক আয় বাড়িয়েছে প্রায় দেড়শো টাকা। তারপর আয়নার সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ নিজেকে খুঁটিয়ে দেখেছিল। পঁয়ত্রিশ বছরের মতো তাকে মনে হয় কি?

আয়নার খুব কাছে মুখটা এনেও সে বয়স বুঝতে পারছিল না। সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটাকে চওড়া করে দিয়েছে। সেখানে দুটো রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভুরুতে কয়েকটা চুল খোঁচা হয়ে উঠে রয়েছে। কানদুটো ছোট, পাশে ছড়ানো; কিছু চুল খুব ভালভাবেই কানের গর্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে; চোখদুটো গোল, ভিতরে বসা; নীচের ঠোঁটটা পুরু, কাঁধটা সরু, বুকের খাঁচাটা ছোট, পেটটা ঝুলে থলথলে। মোটা কোমরের দু'ধারে চর্বির ভাঁজ। বাহুদুটি শীর্ণ, মেয়েদের মতো নরম।

অনন্ত একটি একটি করে নিজের দেহের ত্রুটি বার করে খসড়া থেকে প্রথমে স্বাস্থ্যবান কথাটা বাদ দিয়েছিল। তবে পঁয়ত্রিশ বছরটা এমনই, শোনামাত্র মনে হয় পরিণত যুবক, বয়সটা যেন ত্রিশের থেকে একটু বেশি অথচ চল্লিশের কাছাকাছি নয়। কিন্তু সে সাহস পায়নি নিজেকে ত্রিশের দিকে নিয়ে যেতে।

তবু নিশ্চিত হবার জন্য তার কাছাকাছি বয়সিদের সে লক্ষ করে গেছে দু'দিন ধরে। রাস্তায়, বাজারে, বাসে সর্বত্রই তার চোখ ছুঁকছুঁক করেছে। যাকেই মনে হয়েছে মধ্য-তিরিশ তন্নতন্ন করে তার গড়ন, হাবভাব, চলনের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, আর মনে হয়েছে পঁয়ত্রিশে যা হওয়া উচিত তার সেই রকম শরীর নয়। সে ঊনচল্লিশই লেখে।

খসড়ায় হাজার টাকা আয় বসাবার সময় সে দ্বিধায় পড়েছিল। হাজার কথাটা শুনতে ভাল, মনেও গাঁথে। তা ছাড়া সে তো মাইনের টাকা গুনেগুনে বউয়ের হাতে তুলে দেবে না।

তবে পাত্রীদের তরফ থেকে খোঁজখবর নিশ্চয়ই করবে। নিশ্চয় অঘোর এস্টেটে কেউ যাবে, কে কত মাইনে পায় সেটা বার করে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। তারা জেনে যাবেই সে একটা মিথ্যাবাদী। হাজার টাকাটা সে কেটে দেয়। বিজ্ঞাপনের ফর্ম ভরতি করে, টাকা দিয়ে দুপুরে খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পরই অদ্ভুত একটা উত্তেজনা তাকে গ্রাস করে। সারাদিন তার শরীরের তাপ এমন অবস্থায় থাকে যে রাত্রে হোটেলে ভাত মুখে দিতে পারে না। দু' গ্রাস কোনও রকমে চিবিয়েই উঠে পড়ে।

"কী হল অনন্তবাবু, রান্নায় কিছু..."

মালিক অবনী দত্তর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "শরীরটা ভাল নেই।"

"তাই বলুন। এতদিন খাচ্ছেন, এমন তো কখনও দেখিনি। অম্বলটা বোধহয় বেড়েছে।"

"হ্যাঁ।"

রাতে ঘুম এল না। সারা একতলায় সে একা। বিজ্ঞাপনেও 'একা' শব্দটা বসিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা সে দিল কেন? তার কি বিয়ে করার বা কোনও স্ত্রীলোককে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার খুবই দরকার? এতটা বছর তা হলে কাটল কী করে!

ঘর পেয়ে অলু চলে যাবার পর, যখন সে আর মা একই কথা, একই অভ্যাস, একই গণ্ডির মধ্যে দিন, হপ্তা, মাস, বছর কাটিয়ে গেছে তখন সে কিছু বোধ করেছিল কি?

কীভাবে তার দিন কেটেছে? অনন্ত গত পাঁচ বছরের এমন কোনও স্পষ্ট ছবি দেখতে পেল না যা দিয়ে সে কোনও তারিখ, কোনও ঋতু, কোনও মানুষকে শনাক্ত করতে পারে। তার ইন্দ্রিয়গুলো এমন কোনও আবেগ ধরে রেখে দেয়নি যা তাকে ভাল কোনও স্মৃতি দিতে পেরেছে। দেখা শোনার সব কিছুই তার কাছে অর্থপূর্ণ আবার অর্থহীন মনে হয়েছে।

একঘেঁয়ে দিন, ভ্যাপসা অথবা ভিজে। ছোটবেলা থেকে সে একই গন্ধ পেয়ে আসছে বিছানা, আলমারি, বাসন, কলঘর সবকিছু থেকেই। বাজার যাওয়া, অঘোর এস্টেটে যাওয়া...খাতা, বিল-বই, তাগিদ, মামলা, ভাড়াটেদের হাজার অভিযোগ। আর হাঁটা, যেটা তার একমাত্র বিলাস।

গৌরীদের চায়ের দোকানটা উঠে গেছে, কমলা বাইন্ডার্সের প্রসাদ ঘোষ মরে গেছে, তার ছেলে এখন বসছে। পুরনো লোকদের মধ্যে আছে শুধু ল্যাংড়া গুরু দাস। অন্য কোথাও কাজ জোটাতে পারেনি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, একটা ছেলে কিছুদিন কাজ করেছিল...সে তো বহু বছর আগে, পরেশদা তারপরই কোরগুটা অপারেশন করাতে গিয়ে মরে গেল।"

একদিন সে সিনেমা দেখতে টিকিট কেটে হলে ঢুকেছিল। হিন্দি ছবি, কিছুক্ষণ পরই বিরক্ত বোধ করতে থাকে। বিরতির সময় বেরিয়ে আসে। এতগুলো লোক টানটান হয়ে চেয়ারে বসে দেখছে অথচ তার ভাল লাগল না।

সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে গেছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। পার্কে বসে তাস খেলা দেখেছে। মা চুপ করেই থাকে, ইদানীং আর বেশি কথা বলত না। সাধন বিশ্বাস একরাতে থ্রম্বসিসে মারা গেলেন। সে শ্মশানে গেছল। উৎপল এখন বাবার চেয়ারটায় বসে। পাড়ার দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি ছিল গত বছর।

অনু বছর সাতেক আগে কটক থেকে এসেছিল ওর স্বামীর গলব্লাডার অপারেশন করাতে। সঙ্গে আসে শুধু ভাসুরপো। সারাদিন খুব চিন্তায় থাকত। এখন সে নতুন বাড়িতে থাকে, বারবার যেতে বলেছে। চিকিৎসায় হাজার দশেক টাকা খরচ করে গেছে।

অলুর সঙ্গে দেখা নেই সাড়ে তিন বছর। বেহালায় থাকে। মা দিল্লি যাবার দিন দশ আগে বিকেলে এসেছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়নি। শান্তনুকে এক সন্ধ্যায় নীলরতন হাসপাতালের গেটের কাছে দেখেছিল কথা বলছে একজনের সঙ্গে। শান্তনু টলছিল। লোকটিকে বারবার জড়িয়ে ধরছিল। সে দূর দিয়ে চলে যায়।

মাসে দু'-তিনবার যখন সে এন্টালির বাড়িতে যায় মিনতি করের সঙ্গে তখন দেখা করে কিন্তু আর ভাল লাগে না কথা বলতে। আর ভাল লাগে না ছবিটার দিকে তাকাতে। নন্দকিশোরের ভাইপো একতলায় ওর ঘরের সামনে লম্বা প্যাসেজটায় সন্ধ্যার পর চোলাই মদের কারবার ফেঁদে বসে। এলাকায় এখন সে নামকরা মস্তান। অনন্ত সাহস পায় না কিছু বলতে। নন্দকিশোর পানের দোকান একজনকে ইজারা দিয়ে কসবায় চলে গেছে। সে মাসে মাসে পাঁচশো টাকা পায় দোকান থেকে। নন্দকিশোর চারটে গোরু কিনে কসবায় খাটাল করেছে, রেশন দোকানও দিয়েছে। মাসে একবার দু'বার আসে। চোলাইয়ের কথা বলতেই, ম্লান মুখে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, "সবই এই। দিনকাল কীরকম করে যে বদলে গেল। কত ভালো ছেলে ছিল। আমার কথায় ওকে কাজ দিলেন...আমার লজ্জা করে।"

মিনতি কর এখন আর উচ্ছেদের ভয় দেখেন না। ওষুধ কোম্পানিটা উঠে গেছে। সেখান থেকে চব্বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন। অনন্ত বলেছে দরকার কী, যেমন চলছে চলুক।

"সন্ধের পর বড্ড ভয় করে। ঘর থেকে বেরোতে পারি না, কলঘরেও যেতে পারি না...আর কী বিশ্রী গন্ধ। দরজা জানলা বন্ধ করে রাখি, হাঁপিয়ে যাই।"

অনন্ত চুপ করে শোনে। বৃদ্ধা হয়ে গেছেন কিন্তু যথেষ্ট সমর্থ। টিউশনি করে যাচ্ছেন, দোকান, বাজার, রান্না, জল তোলা নিজেই করেন। কিন্তু কতদিন করবেন? সে বিষণ্ণ হয়ে যায়। ওর ভালবাসা এখনও কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের মতো তীব্র আছে কি? ছবি আগলে থাকতে থাকতে ব্যাপারটা কি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়নি? এখন তার মনে হয় বাড়াবাড়ি, দেখানেপনা।

সন্ধ্যায় অনন্ত বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে শুয়ে থাকে। একটা ট্রানজিস্টর কিনেছে। মাঝেমাঝে শোনে। গান, বাজনা, কথিকা শোনার কোনও বাছবিচার নেই। নাটক হলে মা দরজার কাছে এসে বসে। দোতলায় টিভি এসেছে। সে এখনও টিভিতে কোনও অনুষ্ঠান দেখেনি।

পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপনটা কেন দিল তার কোনও কারণ অনন্ত খুঁজে পায়নি। অমর হঠাৎ মাকে নিয়ে চলে যাবার পর আচমকা নিঃসঙ্গতার যে গর্তে সে পড়ে গেছে তাই থেকে উঠে আসার জন্যই কি একজন সঙ্গী চাইছে? কিন্তু সে ছোটবেলা থেকেই তো নিঃসঙ্গ।

তিরিশ হাজার টাকার কাছাকাছি ব্যাঙ্কে জমেছে। ভাবলে তার অবাক লাগে। কী করবে টাকাগুলো! কোনও শখ, কোনও বাবুয়ানি নেই ফলে তার কোনও খরচ নেই। মিনতি করের মতোই কি দিন কাটাতে হবে? যদি কঠিন অসুখ করে, সেবা শুশ্রূষার দরকার হয়, কে তাকে দেখবে!

রাত্রে অনন্তর ঘুম হল না। তার মনে হল, স্ত্রীর থেকেও তার বেশি দরকার একটা মানুষ, যে কিছু একটা করবে তার নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে।

রবিবারের কাগজে তার বিজ্ঞাপনটা বেরোবার সাতদিন পর সে খবরের কাগজের অফিস থেকে এগারোটি চিঠি আনল। রাত্রে চিঠিগুলো মন দিয়ে পড়ল। সবগুলোই কলকাতার এবং স্বয়ং পাত্রীদেরই লেখা। তিনটি চিঠি বেছে নিয়ে সে স্থির করল উত্তর দেবার আগে লুকিয়ে এদের একবার দেখে নেবে।

ঊর্মিলা দেব স্কুল-শিক্ষিকা। তার চিঠিতে দেওয়া ঠিকানা মতো সে স্কুলে বেরোবার সময় আন্দাজ করে জীর্ণ একটা বাড়ির দিকে চোখ রেখে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে সেই বাড়ি থেকে একজনকে বেরোতে দেখল যাকে তার মনে হল স্কুল-শিক্ষিকা। সামনে দিয়ে যাবার সময় একবার অনন্তের দিকে চাইল। তাদের চোখাচোখি হল। অনন্তের মনে হল বিনা অনুমতিতে তার দিকে তাকানোর জন্য যেন কৈফিয়ত চাইল চাহনি মারফত। এ-সব মেয়েমানুষ খাণ্ডারনি হয়। সে নাকচ করে দিল ঊর্মিলা দেবকে।

তার দ্বিতীয় অভিযান সত্তরের-বি রাধিকাপ্রসন্ন মিত্র লেনে। একতলা টিনের চালের বাড়ি। রাস্তার দিকে সামনের ঘরে দুটি জানালা। পিছনে একটা বটগাছ। চাকুরে নয় সুতরাং বাড়ি থেকে বেরোবার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। দু' দিন বাড়িটার সামনে দিয়ে সে হেঁটে গেল। জানলায় একটা মুখটা দেখতে পেল না, দরজাটাও বন্ধ।

তৃতীয় দিন বিকেলে সে কড়া নাড়ল। মিনিট দুয়েক পর ভিতর থেকে নারীর কণ্ঠে প্রশ্ন এল, "কে?"

"আমি, একবার কথা বলতে চাই।"

দরজা খুলে আটপৌরে ঢিলেঢালা বেশে, ঘুম-ভাঙা ফুলো চোখে যে দাঁড়াল তার নাম রেবতী সেনগুপ্ত। মাজা গায়ের রং, দীর্ঘাঙ্গী, ভ্রূ-র চুল তুলে চোখদুটি সাজানো, চোখা নাক, ডিম্বাকৃতি মুখ এবং মুখে বিস্ময়।

"কাকে চাই!"

"এখানে কি রেবতী সেনগুপ্ত থাকেন?"

"আমিই।"

"আপনি কি কাগজের একটা পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের কোনও জবাব দিয়েছেন?"

রেবতী বিব্রত হল। শাড়ির আঁচলটা কাঁধে তুলে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, দিয়েছি...আপনি?"

"বিজ্ঞাপনটা আমি দিয়েছি, আমার জন্যই।"

রেবতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "একটু দাঁড়ান।"

দরজা ভেজিয়ে ভিতরে চলে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটি তরুণী দরজা খুলে তাকে ভিতরে আসতে বলল। মুখের আদল থেকে মনে হল রেবতীর বোন।

দরজার পাশেই ঘর। তক্তাপোশে লোটানো তোশক আর বালিশ একটা রঙিন নকশাদার বেডকভারে ঢাকা। অনন্তের মনে হল, এখুনি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ঘরের দরজায় এক প্রৌঢ়া বিধবা দাঁড়িয়ে।

"রেবতী আমার বড়মেয়ে। আমার তিন মেয়ে, তারপর এক ছেলে। ওদের বাবা সাত বছর আগে মারা গেছেন। বিজ্ঞাপনটা রেবতীই প্রথম দেখে।"

"আমার নাম অনন্ত দাস। চিঠির জবাব না দিয়ে নিজেই চলে এলুম। বিজ্ঞাপন বা চিঠি থেকে সবকিছু বোঝা যায় না তো। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাওয়াই ভাল, আমারও বাবা নেই, বছর কুড়ি হল মারা গেছেন।"

সেই প্রথম তার রেবতীদের বাড়িতে যাওয়া। এরপর বাকি চিঠিগুলো নিয়ে তাকে আর মাথা ঘামাতে হয়নি।

সেদিন ঘণ্টাখানেক সে ছিল। রেবতী তাকে চুম্বকের মতো টেনেছে, তাকে উত্তেজিত করেছে, রাত্রে ঘুম হয়নি।

এরপরও তিনবার সে গেছে। পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার নিজের কথা, ভাই বোন মায়ের কথা, কষ্ট করে সংসার চালানো, অঘোর এস্টেটে অপ্রত্যাশিত চাকরি পাওয়া, বোনেদের বিয়ে, অমরের চলে যাওয়া, মা-র ক্যানসার—সবই সে বলেছে।

ওদের নিজেদের বাড়ি, দু'খানি ঘর। তিন দিনের মধ্যে দু' দিনই সন্ধ্যার সময় রেবতী বাড়ি ছিল না।

"এইমাত্র বেরোল এক বন্ধুর সঙ্গে, কখন আসবে ঠিক নেই। আপনি কি বসবেন?"

অনন্ত কিছুক্ষণ বসে থাকে। দু'-একটা কথাও বলে। চা খায়, সঙ্গে দুটি সন্দেশ।

তৃতীয় দিনে রেবতী বেশির ভাগ সময়ই অন্য ঘরে ছিল। অনন্ত ছটফট করছে ওকে দেখার জন্য। পাশের ঘর থেকে রেবতীর কণ্ঠস্বর পেয়ে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারছে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছে।

রেবতীর মা বিয়ের কথা তুললেন। "রেবতীর বাবা মারা গেলেন তখন ও বি-এ পড়ছিল, আর পড়া হয়নি। আমরা কিন্তু কিছুই দিতে-থুতে পারব না শাঁখা সিঁদুর ছাড়া।"

অনন্তের মনে পড়ল অনুর বিয়ের কথা। সে বলল, "দিলেও আমি কিছু নোব না। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। আমি কোথায় থাকি, ঘরদোর কেমন সেটাও তো একবার দেখবেন।"

ঠিক হয় রেবতীকে নিয়ে গিয়ে অনন্ত তার একার সংসার দেখিয়ে আসবে। সন্ধ্যা নাগাদ সে রেবতীদের বাড়ি যায়। তখন ঘরের তক্তাপোশে বালিশ বগলে রেখে কাত হয়ে শুয়ে একটি লোক সিগারেট খাচ্ছিল। রেবতীর বোন শাশ্বতী আদুরে ভঙ্গিতে লোকটির পায়ের ওপর হাত রেখে বসে। রেবতী জানলার ধাপে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

অনন্ত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। ওকে দেখেই ঘরের সবাই চুপ করে তাকিয়ে রইল। অবশেষে শাশ্বতী বলল, "আসুন।"

"আজ দেখতে যাবার কথা ছিল।"

রেবতীর পায়ের দিকে তাকিয়ে অনন্ত বলল।

"আজকেই, কিন্তু আজ যে..."

অনন্তর বুক কেঁপে উঠল। রেবতী কি যাবে না? সকালে সে ঘর-দালান জল দিয়ে ধুয়েছে, কাচানো ওয়াড় বালিশে পরিয়েছে, ঝুল ঝেড়েছে, তাকের জিনিসপত্র গুছিয়েছে, স্টোভে কেরোসিন ভরে রেখেছে, যদি চা খেতে চায়! ভেবে রেখেছে ট্যাক্সিতে রেবতীকে আনবে এবং পৌঁছে দেবে।

"যাও না, কতক্ষণ আর সময় লাগবে।" লোকটি অনুমতি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

"আপনি বসুন, আমি কাপড়টা বদলে আসি...ওহ পরিচয় করিয়ে দিই, এই হচ্ছে দিলীপদা, অনেক উপকার করেছে আমাদের, দিলীপদা না থাকলে আমাদের পরিবারটা ভেসে যেত...আর ইনি হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক কাগজে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।"

"ওহ্ আপনি।"

অনন্ত নমস্কার করল, লোকটি প্রতিনমস্কার না করে সিগারেটের প্যাকেটটা তার দিকে এগিয়ে ধরে।

"মাফ করবেন, খাই না।"

তক্তাপোশের নীচ থেকে একটা মোড়া বার করে দিল শাশ্বতী। অনন্ত দেয়াল ঘেঁষে বসল। তার ভিতরে অস্বস্তি। কয়েকবারই সে দিলীপদা নামটা ওদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় উচ্চারিত হতে শুনেছে। আজ সে চোখে দেখল। মাঝারি আকৃতি, ফরসা,.মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বুশশার্ট ও প্যান্টটা দামি কাপড়ের। এদের আত্মীয় নয়, তা হলে কে? উপকারী বন্ধু। কী উপকার করেছে যাতে ভেসে যাওয়া বন্ধ হয়!

"কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন কেন?"

"তা ছাড়া উপায় ছিল না।"

"সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবার মতো কেউ নেই?"

"না।"

"কোথায় চাকরি করেন?"

"জমিদারের এস্টেটে, সম্পত্তি দেখা শোনার কাজ।"

"অ।"

দিলীপদা নিস্পৃহ হয়ে শাশ্বতীর দিকে মনোযোগ দিল।

"মাসিমা কোথায় রে?"

'ও ঘরে শুয়ে আছে, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাকব?"

"থাক। তাঁতীকে পাঠিয়ে দেব তা হলে, কখন আসবে?"

"দুপুরে পাঠিয়ো।"

"ভাস্বতী এই শনিবার আসবে?"

"মেজদির কোনও কথার ঠিক নেই। আসতেও পারে।"

দিলীপদা উঠে বসল রেবতী ঘরে ঢুকতেই। হালকা টিয়া পাখি রঙের সিল্কের শাড়িটা ওর শরীরের উঁচু-নিচু জায়গাগুলোর উপর আলতো করে বিছানো। লিপস্টিকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, হাতকাটা ব্লাউজে বাহুর ডৌল বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু অনন্ত চোখ নামিয়ে নিল।

"আমার সঙ্গেই চলো, ওদিকে একটা কাজ আছে সেরে নেব।"

বাদামি অ্যাম্বাসাডারটা অনন্ত গলিতে ঢোকার সময় দেখেছিল। সেটা যে এই লোকটিরই বুঝতে পারল যখন চাবি দিয়ে দরজা খুলে ড্রাইভারের সিটে বসল। রেবতী পিছনের দরজা খুলে দাঁড়াল।

"উঠুন।"

"আপনি উঠুন।"

"উঠব।"

অনন্ত গাড়িতে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে রেবতী সামনের দরজা খুলে দিলীপের পাশে বসল। অনন্ত আশা করেছিল অন্যরকম।

তাদের গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে বার করা কঠিন। তাই অনন্ত ঢোকাতে বারণ করল।

"আমি এখানেই থাকছি, তুমি দেখে এসো।"

দিলীপদা সিগারেট ধরাল। রেবতীকে নিয়ে গলি দিয়ে হেঁটে আসার সময় সে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করল, "উনি কে হন?"

"দিলীপদা? উনি ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, ওর নাম দিলীপ ভড়। বিরাট বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর।"

আর প্রশ্ন না করে অনন্ত বাড়িতে ঢুকল, তালা খুলে রেবতীর দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে পারল না। দালানের আলো জ্বালল।

চোখ ঘুরিয়ে মুখ তুলে রেবতী দেয়াল, মেঝে, কড়িকাঠ দেখছে। অনন্ত প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছে ওর প্রতিক্রিয়া।

"রান্নাঘরটা দেখুন।"

প্রায় ছুটে গিয়ে সে রান্নাঘরের দরজা খুলল।

"মা এই জায়গাটা বসে রাঁধত।"

রেবতী দূর থেকে দেখে ফিকে হাসল।

"দুটো ঘর।"

অনন্ত দরজা খুলে আলো জ্বালল। রেবতী দরজার কাছ থেকে উঁকি দিল।

"চলি এবার।"

"চা খাবেন?"

"না, না, চা নয়।"

রেবতী সদরের দিকে এগোচ্ছে, অনন্ত পিছু নিল।

"খুব পুরনো বাড়ি।"

"হ্যাঁ, শুনেছি আশি-নব্বুই বছরের। পাড়াটা খুব বনেদি।"

"ভ্যাপসা একটা গন্ধ রয়েছে। জানলাগুলো ঠিকমতো বন্ধ হয়?"

"হয়। মেজেটা নতুন করে করাব ভাবছি, দেয়ালের পলেস্তরাও...এ-সব করবার দরকার এতকাল হয়নি তো।"

কথাটা রেবতীর কানে গেল কি না সে বুঝল না। রাস্তার লোকেরা ওর দিকে তাকাচ্ছে। রকে যারা বসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। বারান্দা থেকে ঝুঁকে আছে কয়েকটা মুখ।

দিলীপ ভড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। "দেখা হল?"

"হ্যাঁ।"

কোনও কথা না বলে ওরা গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিয়ে মাথা নিচু করে দিলীপ ভড় তাকাল।

"চলি তা হলে, আবার দেখা হবে।"

ফিরে এসে অনন্ত গুম হয়ে বসে রইল। রেবতী কিছুই বলল না। ঘর নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি। ওর মতো ঝকঝকে মেয়ের পক্ষে এটা বসবাসের উপযুক্ত জায়গা নয়।

এই প্রথম সে তার বাসস্থানকে ঘৃণা করল। প্রত্যেকটা পরিচিত বস্তু, যেগুলোকে সে কখনও লক্ষ্যই করত না, তার চোখে কুৎসিত হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অনন্ত ফাঁপরে পড়েছিল বিয়ের ব্যাপারে। সে একা, বিয়ের কাজকর্ম দেখার, করার কেউ নেই। উপরের জেঠিমা, কাকিমাদের বলা যায়, কিন্তু সে রাজি নয়। অলুকে জানানোর ইচ্ছে নেই, অনু হয়তো আসতে পারবে না, মার পক্ষেও আসা সম্ভব নয়।

"এই নিয়ে এত চিন্তার কী আছে, আমার ওখান থেকে হবে...আমার ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটটা তো খালিই পড়ে আছে। ওখান থেকেই বর যাবে, কনে নিয়ে ফিরেও আসবে।"

দিলীপ ভড় নিমেষে সমস্যাটার সমাধান করে দেয়। অনন্ত রাজি হয়। বিয়ের দিন সকালে ক্যামাক স্ট্রিটে 'মধুবন' বাড়ির সাততলায় অনন্তের পৌঁছনোর কথা। দালানের দরজায় তালা দিয়ে বিয়ের জন্যে কেনা জুতো, পাঞ্জাবি, ধুতিতে ভরা নতুন সুটকেসটা হাতে নিয়ে বেরোবার সময় তার মনে হল দোতলায় খবরটা দেওয়া উচিত। জন্ম থেকে ওরা তাকে দেখছে।

কাকিমা রান্নাঘরে ছিলেন, অনন্তকে দেখে কৌতূহলে বেরিয়ে এলেন খুন্তি হাতেই।

"কাকিমা আজ আমার বিয়ে।"

"য়্যাঁ...ওম্মা, কোথায় বিয়ে হচ্ছে? জোগাড়যন্তর কই, ও দিদি শুনে যাও অনন্তের আজ বিয়ে।...এ বাড়ি থেকে হচ্ছে না?...আজকেই!"

জেঠিমা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অনন্তকে লাজুক দেখাচ্ছে।

"হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল জেঠিমা। আপনাদের জানাবার পর্যন্ত সময় পাইনি...এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বিয়েটা হচ্ছে। এখানে কে করবে-টরবে, তাই বন্ধুর বাড়ি থেকে।"

"কেন রে আমরাই করতুম।"

"আবার কেন আপনাদের ঝামেলায় ফেলব।"

"বিয়ের কাজ কি ঝামেলার কাজ বাবা? আমাদের তুই পর ভাবলি।"

"না না সে কী কথা। আপনাদের সাহায্য ছাড়া কি আমাদের চলত।"

"খুব ভাল করেছিস। এই সেদিনই বলাবলি করছিলুম অনন্তর এবার বিয়ে করা উচিত। রোজগেরে ছেলে, এ-ভাবে বাউন্ডুলের মতো থাকবে কেন, রেঁধে দেবারও কেউ নেই!"

"দিদি তো বলছিল জোর করে তোর বিয়ে দিয়ে দেবে। মেয়ের বাড়ি কোথায়...কে কে আছে মেয়ের, অবস্থা কেমন, বল সব।"

"আমারই মতো অবস্থা, বাবা নেই। দুই বোন এক ভাই আর মা।"

"চাকরি করে?"

"মেজবোন স্কুলে পড়ায় বাইরে থাকে। এরা থাকে সিমলেয়। কাউকে নেমন্তন্ন করিনি, বউভাতে করব।"

'আগে যদি বলতিস, আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিতুম।"

দু'জনকে প্রণাম করে সে বেরিয়ে পড়ল। ট্যাক্সি থেকে নেমে, মধুবনের সাততলায় পৌঁছে যখন সে কলিংবেল টিপল তখন বেলা প্রায় এগারোটা। পাজামা শার্ট পরা এক ছোকরা দরজা খুলে হেসে তাকে ভিতরে আসতে বলল।

"আপনার নামই তো অনন্ত দাস?"

"হ্যাঁ।"

"বাবু সকালে টেলিফোনে বলে দিলেন, আপনার গায়ে হলুদ ছুঁইয়ে মেয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। ড্রাইভার হলুদ দিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি জামা খুলুন।"

বড় দালানের মতো বসার জায়গায় মোটা কার্পেটে মেঝে ঢাকা, সাদা দেয়াল, এককোণে দুটো বড় সোফা তার বাঁ দিকে বারান্দা। দেয়ালেব ধারে একটা শূন্য টেবল ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। তিনটে বন্ধ দরজা সে দেখতে পাচ্ছে, বোধহয় শোবার ঘরের। অনন্ত কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। এমন একটা নির্জন পরিবেশ সে আশা করেনি। সুটকেস টেবলে রেখে সে জামা খুলল। ছোকরা তার শরীরের যত্রতত্র হলুদ ছুঁইয়ে পেতলের রেকাবিটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, "আপনি কি উপোস দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কিচেনে বিস্কুট আছে, বাদাম আছে, খেতে ইচ্ছে করলে খাবেন। বেডরুম খোলা আছে। আমি গায়ে হলুদ পৌঁছে দিয়ে টোপর, মালাটালা কিনে নাপিত, পুরুত সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসব।"

অনন্ত সোফায় বসে রইল অনেকক্ষণ। একবার বারান্দায় গিয়ে নীচের রাস্তা দেখল। তিনটে দরজার একটা রান্নাঘরের। জলতেষ্টা পেয়ে যাচ্ছে। বেসিনের কল থেকে গ্লাসে জল নিয়ে খেল। মেঝেয় একধারে চারটে মদের খালি বোতল। ফ্রিজের পাল্লা খুলে দেখল একদমই ফাঁকা।

সে শোবার ঘরে এল। দেয়াল ঘেঁষে চওড়া খাট। ছোট নিচু টেবলের উপর টেলিফোন। দেয়াল আলমারি ছাড়াও রয়েছে ছোট একটা স্টিল আলমারি, ছোট দুটি চেয়ার, মেঝেয় কার্পেট, লাগোয়া বাথরুমের দরজা। বিপরীত দেয়ালে মদের রঙিন ক্যালেন্ডারে আলস্য ভাঙছে আড়মোড়া দিচ্ছে এক নগ্ন বিদেশিনী। ছবিটা দেখেই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল তার দুটো কান। পেটের মধ্যের যাবতীয় বস্তু কুঁকড়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে সে টানটান হয়ে সোফায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নের মধ্যে কাটাতে কাটাতে অনন্ত বিয়ের রাত পেরিয়ে এল। সকালেও তার মনে হল অবাস্তব এক জগতের মধ্যে সে বাস করছে। সন্ধ্যার সময় বর-বউ দিলীপ ভড়ের মোটরেই মধুবনের ফ্ল্যাটে এসে উঠল। রাতটা সে কাটাল সোফায়, রেবতী ঘরে শুয়েছিল দরজায় চাবি দিয়ে।

অদ্ভুত সময়, অদ্ভুত জীবনের মধ্যে অনন্ত নেমে যাচ্ছে যে-ভাবে মানুষ চোরাবালিতে নামে। শেষবারের মতো দুটো হাত বার বার মুঠো করে একটা শক্ত অবলম্বন পাবার জন্য যেমন আঁকপাঁকু করে, রেবতীকে আঁকড়ে অনন্ত তেমনি চেষ্টা শুরু করল। সে জানে তার দেরি হয়ে গেছে, তার গলা মুখ চোখ ডুবে গেছে, বাকি আছে উঁচু করে তোলা হাতদুটো। সে জানে জীবনকে শুষে নিতে যত বেশি ব্যগ্র হবে তত দ্রুত তলিয়ে যাবে। রেবতীকে তাই সে সমীহ করে।

তারা একই শয্যায় শোয় কিন্তু অনন্তের মনে হয় রেবতী বহু মাইল দূরে, তারা কথা বলে কিন্তু পরস্পরকে যেন বোঝাতে পারে না। বিয়ের এগারো দিন পর অন্য দিনের থেকে একটু আগেই বিকেলে বাড়ি ফিরে অনন্ত দেখল দরজায় তালা দেওয়া। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। আলুর দম-রুটি খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে সময় কাটাতে লাগল।

রেবতীকে দূর থেকে সে দেখতে পেল দ্রুত হেঁটে আসছে। ওর মেরুন-সবুজ তাঁতের শাড়িটা তারই কেনা। হাতে চামড়ার ছোট ব্যাগটা। কিন্তু একটা কালো অ্যাম্বাসাডার থেকে যে রেবতী নামল সেটা তার চোখ এড়ায়নি। সে চেষ্টা করল দেখতে মোটরে কে আছে, কিন্তু দেখতে পেল না। গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আশেপাশে না তাকিয়ে রেবতী হাঁটে। ও ঠিকই জানে বহু চোখ তাকে দেখছে। গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে সে চলে গেল। তখন বাড়িমুখো চা-পিপাসু এক অফিস ফেরত অশ্লীল শব্দ করে হাই তুলল। অনন্ত মাথাটা নামিয়ে দিল কাগজে।

হাতঘড়িতে সে দেখল পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে রেবতী চলে যাওয়ার পর। ঘড়িটা সে বিয়ের দু'দিন পর কিনেছে। বাবার কেনা ওয়াল ক্লকটা আজও নিখুঁত সময় দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে সময় জানতে তার অসুবিধা নেই বাইরে প্রায় প্রত্যেকের হাতেই ঘড়ি। দরকার হলে সে জিজ্ঞাসা করে নেয়। তাই ঘড়ি কেনার জন্য 'বাজে খরচের' দরকার তার হয়নি। এখনও দরকার হয় না, তবু কিনেছে। উপরের কাকিমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শ্বশুরবাড়ি থেকে কী কী দিল?"

প্রথমেই সে বলে ফেলেছিল, ঘড়ি। তাই সে ঘড়িটা কিনে ফেলল। রেবতীর ঘড়ি আছে। তবু সে তিনশো টাকায় তাকে একটা কিনে দেয়।

অনন্ত যখন ফিরল রেবতী তখন চা করছে। শার্টটা খোলার পর গেঞ্জিটা খুলতে গিয়েও খুলল না। বাড়িতেও গেঞ্জি পরে থাকা সে শুরু করেছে বিয়ের পর।

"চা আমাকেও একটু দিয়ো।"

"এই ফিরলে?"

"হ্যাঁ।"

কেন যে মিথ্যা কথাটা বলল তা সে জানে না। আপনা থেকেই মুখে এসে গেল।

"কী করলে সারা দুপুর?"

রেবতী উত্তর দেবার আগে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চাউনিটা তুরপুনের মতো, ঘুরতে ঘুরতে তার মনের মধ্যে গর্ত করে যাচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে প্রশ্নের পিছনের উদ্দেশ্যটা দেখা যাবে। অনন্ত তার মুখটাকে নির্বিকার করে রেখে দিল, হাতে চায়ের কাপ নেবার সময়।

"কিছুই তো করবার নেই। তাই একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম। মা'র মাথার যন্ত্রণাটা খুব বেড়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে মনে হচ্ছে।"

"স্পেশালিস্ট দেখানোই ভাল।"

"অনেক টাকার ধাক্কা।"

"টাকার জন্য ভাবতে হবে না।"

রেবতী তাকাল এবং মিষ্টি করে হাসল। অনন্ত উত্তেজনা বোধ করে অথবা বহুদিন পর সাংসারিক দায়িত্বের স্বাদ পেয়ে, যেটাই হোক, বলল, "মাথার ব্যথার কখনও অবহেলা করতে নেই। স্পেশালিস্ট কত আর নেবে...পঞ্চাশ, একশো, দু'শো? অবহেলা যদি না করা হত তা হলে আমার মায়ের ক্যানসার

গোড়াতেই ধরা পড়ত। কালই আমি খোঁজ নেব। আমাদের মালিক সমীরেন্দ্র বসুমল্লিককে যে ট্রিটমেন্ট করেছিল তার কাছেই বরং যাব।"

"এত তাড়াহুড়োর দরকার কী...একটু বাজারে যাবে, ঘি, গরম মশলা ফুরিয়েছে। কপিটা আজই রেঁধে ফেলি।"

রাতে অন্যদিনের মতো রেবতী আজ বাঁ দিকে না ফিরে অনন্তের দিকে কাত হয়ে শুল। কিছুক্ষণ পর তার বাঁ হাত অনন্তের বুকের উপর পড়ল। সে নিশ্বাস চেপে শক্ত হয়ে শুয়ে রইল। এই প্রথম রেবতী তাকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করল, এটা কীসের আভাস দিচ্ছে?

সে প্রায় চুপিসারে তার ডান হাত বিছানা থেকে এমনভাবে বুকের দিকে আনতে লাগল যেন রেবতীর হাতটা একটা পাখি, সামান্য নড়াচড়া টের পেলেই উড়ে যাবে।

ধীরে ধীরে সে তা রাখল রেবতীর আঙুলের ওপর। মুঠিতে চাপ দিল এবং হাতটায় টান দিয়ে কাছে আসার জন্য ইঙ্গিত করল।

বাহুতে ভর দিয়ে মাথাটা সামান্য তুলে রেবতী ঝুঁকে পড়ল এবং অনন্তের ঠোঁটের উপর আলতো চুমু দিল।

অনন্ত সংবিৎ হারানোর আগে বুকের মধ্যে প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পেল। একটা অস্থিরতা তার শরীরটায় দাপিয়ে যাচ্ছে। একটা দুর্লভ চূড়ায় সে উঠবে। সেখান থেকে তার জীবনের পিছন দিকে একবার মাত্র সে তাকাবে।

রেবতী মাথাটা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অনন্ত দু'হাতে তাকে জাপটে ধরল।

"নাহ্।"

"হ্যাঁ।"

রেবতী চেষ্টা করল অনন্তর মুঠি আলগা করতে। অনন্ত হুড়মুড় করে তার বুকের উপর ভেঙে পড়ল, এলোপাথাড়ি চুমু দিতে লাগল ওর গালে, গলায়, বুকে।

"না আ আহ্, কী ছোটলোকমি হচ্ছে!"

রেবতীর নখ বসে গেছে অনন্তের ঘাড়ে। সে কিছুই বোধ করছে না শুধু একটা অন্ধ রাগ ফুঁসে উঠছে তার মাথার মধ্যে।

"আমি তোমার স্বামী।"

"তাতে কী হয়েছে!"

"তা হলে বিয়ে করলে কেন?"

"শুধু এই জন্যই বিয়ে করা?"

"এটাও একটা কারণ।"

"একটা নয়, তোমার কাছে এটাই একমাত্র কারণ।"

রেবতীর স্বরে তাচ্ছিল্যের ছোঁয়া রয়েছে। অনন্তের ইচ্ছা করছে ঘুসি মেরে মেরে ওর মুখটাকে থেঁতলে দিতে।

"তোমার একটা মেয়েমানুষের শরীর দরকার, যে-কোনও, যেমন তেমন, মেয়েমানুষ।"

অন্ধকারে মুঠো করা অনন্তের হাতটা উঠেছিল, সেটা দেখতে পেলে রেবতী হয়তো কথাগুলো বলত না। কয়েক সেকেন্ড পর হাতটা মন্থরভাবে নেমে গেল।

মাত্র এগারো দিন তাদের বিয়ে হয়েছে। অনন্তের মনে হচ্ছে, তারা আর মিলতে পারবে না। বোকার মতো সে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। চল্লিশটা বছর কেটেছে যে-ভাবে বাকি জীবন সেইভাবেই নয় কেটে যেত।

জীবনকে সে কিছু কি দিয়েছে যে আজ প্রতিদান আশা করছে? ভাই বোন মা সবাই একে একে সরে গেছে। তাদের জন্য সে সতেরো বছর বয়সে বাবার জায়গা নেওয়ার দম্ভে বলেছিল, "আমি সবাইকে দেখব।" মা বলেছিল, "তুই সুখী হবি।"

সুখ।

রেবতী ওপাশ ফিরে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে।

পরদিন যথারীতি সে বাজারে গেল, স্নান করল, ভাত খেল এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অন্যদিনের মতো সন্ধ্যার সময় ফিরল।

অন্ধকার ঘরে রেবতী শুয়েছিল। আলো জ্বালতেই চোখ বন্ধ করল।

"শুয়ে যে! শরীর খারাপ নাকি?"

"না...ভাল লাগছে না তাই।"

"রান্না করবে না?"

"যাচ্ছি।"

অলু একদিন এসেছিল ঘণ্টাখানেকের জন্য। তাকে বলেছিল: 'এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ভাব করলে কী করে?' আর পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। দু'দিন পর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় দোতলার কাকিমার সঙ্গে রাস্তায় মুখোমুখি হতেই তিনি এ-কথা সে-কথার পর গলা নামিয়ে বলেন, "তোকে তো ন্যাংটো বয়স থেকে দেখছি, তুই তো আমার ঘরের ছেলে, বল তো প্রায়ই গাড়ি নিয়ে একটা লোক তুই বেরিয়ে যাবার পরই আসে আর বউমা সেজেগুজে তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়...কে লোকটা?"

"গাড়ি নিয়ে!"

"ওই মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে, আমি অবিশ্যি দেখিনি, রেডিয়োয় গান গায় প্রোফেসরের বউ সঙ্ঘমিত্রা—ওদের ঝি দেখেছে। তোর কাকাবাবুও দু'দিন দেখেছেন। দুপুরে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে দু'জনকে গাড়ি করে যেতে।"

শুনতে শুনতে অনন্তের বুকটা খালি হয়ে যেতে লাগল। একটা নোংরা সন্দেহ পাড়ায় ছড়িয়েছে। তার নিজেরও ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। তা ছাড়া একবারের জন্যও রেবতী তাকে বলেনি সে দিলীপ ভড়ের সঙ্গে বেরিয়েছিল। গোপন করা কেন? মাকে স্পেশালিস্ট দেখাবার জন্য আর তো একবারও বলল না। মা'র কাছে সেদিন সত্যিই গেছল কি!

"ওহো, দিলীপদা, উনি তো রেবতীর মাসতুতো দাদা।"

কাকিমার মুখের ভাবের বিশেষ কোনও বদল ঘটল না। রেবতীকে দোতলার কেউ পছন্দ করে না। সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

"হোক দাদা, লোকে তো পাঁচকথা বলে, তুই একটু বারণ করিস।"

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে অনন্ত একসময় জিজ্ঞেস করল, "দিলীপদা আসে?"

সে টের পেল পাশের শরীরটা টানটান হয়ে শক্ত হল।

"পাড়ায় অনেকে খারাপ ভাবে নিয়েছে।"

"কী নিয়েছে?"

"ওর সঙ্গে তোমার বেরোনোটা।"

হঠাৎ অনন্তের চোখে ভেসে উঠল মধুবনের খালি ফ্ল্যাট আর শোবার ঘরের দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবিটা। বুকটা তার দুরদুর করে উঠল। একটা বাজে সন্দেহ তার মনে ঝিলিক দিল।

"আমি কার সঙ্গে বেরোই না বেরোই তাতে পাড়ার লোকের কী?"

"তাদের কিছুই নয়, কিন্তু আমার কিছু।"

"তোমার।"

"কেন বেরও?"

এত কঠিনস্বরে অনন্ত কখনও কথা বলেনি।

"বেরোলেই বা, কিছুক্ষণ মোটরে ঘুরলে কী হয়েছে?"

অনন্ত বলতে যাচ্ছিল, বেরিয়ে কোথায় যাও? জিবের ডগা থেকে সে কথাটা প্রত্যাহার করল।

"বিয়ে করাটা উচিত হয়নি।"

"কার, তোমার?"

"তোমার...কোনও দরকার ছিল কি?"

"ছিল।"

"ছিল?"

"বলা যাবে না। ওর কাছে আমরা অনেক কৃতজ্ঞ, অনেক ঋণী।"

"তার জন্য আমাকে বলি হতে হবে?"

তাদের মধ্যে আর কোনও কথা হয়নি। রেবতী হাত বাড়িয়ে অনন্তর বাহু স্পর্শ করল। সে কোনও উত্তেজনা অনুভব করল না।

শান্তভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর, বাড়ি ফিরে অনন্ত দেখল দরজায় শিকল তোলা, তালা ঝুলছে না। ঘরে যাওয়ামাত্র টেবলে রাখা চিরকুটটা তার চোখে পড়ে।—"আমার আর ভাল লাগছে না। চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। রেবতী।"

রান্নাঘরে রাতের খাবার ঢাকা দেওয়া। তার দেওয়া কোনও কিছুই নিয়ে যায়নি। ঘড়িটা টেবলে রাখা।

খাটে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে থাকতে অসম্ভব একটা শ্রান্তির শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আবার সে একা। পাঁচ মাসের জন্য সে অন্য একটা জগতে ঘুরে প্রত্যাবর্তন করল।

একদিন পর জেঠিমা বলল, "বউমাকে দেখছি না যে! বাপের বাড়ি গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কদ্দিনের জন্য?"

"মাসখানেক থাকবে।"

এক মাস সময় পেল। এর মধ্যে কেউ কৌতূহল দেখাবে না। কিন্তু তারপর? জানাজানি হবেই। মুখ দেখাবে কী করে? যে শুনবে প্রথমেই বলবে—কার সঙ্গে বেরিয়ে গেল? কিংবা----কোথায় গিয়ে উঠেছে?

খবরটা রেবতীর বাড়ির লোকেরা কেমন ভাবে নেবে? তারা কি ওকেই সমর্থন করবে?..কোথায় গিয়ে উঠেছে? বাড়িতে না মধুবনের ফ্ল্যাটে!

নানান অনুমান, প্রশ্ন এবং দ্বিধা কাটিয়ে চার দিন পর রাত্রিবেলায় সে রেবতীদের বাড়িতে হাজির হল। তাকে দেখে প্রত্যেকের মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠল। সে বুঝল, এরা তা হলে জানে।

"রেবতী কি এখানে?"

ওর মা ইতস্তত করে বলল, "বিকেলেও তো ছিল...বলে যায়নি কোথায় গেছে।"

"তা হলে আমি একটু ঘুরে আসি।"

"একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও বাবা।"

অনন্ত ওখান থেকে বেরিয়ে এল মধুবনের সাততলায়। দরজা খুলল দিলীপ ভড়ই।

"আসুন।"

যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। অনন্ত সোফায় বসল। সামনের সোফায় দিলীপ ভড়। হাতে আধভরতি মদের গ্লাস। ছোট্ট করে চুমুক দিল।

"রেবতী এখানে নেই। এসেছিল। আমি ফিরে যেতে বলি, ও রাজি হয়নি। ওকে তাই পাঠিয়েছি আমাদের দেশের বাড়িতে।"

"ফিরে যেতে...কোথায় ফিরে যেতে?"

"আপনার কাছে।"

"আমি তো ওকে গ্রহণ নাও করতে পারি, তখন যাবে কোথায়?"

দিলীপ ভড় বড় করে হাসলেন। গ্লাসটা শেষ হয়ে গেছে।

"আমার কাছে।"

"আপনি ওকে ভালবাসেন?"

"নিশ্চয়।"

"তা হলে বিয়ে দিলেন কেন? আমারও তো একটা জীবন আছে।"

"সেই জন্যই ওকে ফিরে যেতে বলি। ঠিক এই কথাটাই ওকে বলেছি। ও শুনল না।"

"পরিচিতদের কাছে এবার মুখ দেখাব কী করে।"

"বলে দিন বাস চাপা পড়ে মারা গেছে, কিংবা কলেরায়।"

"তা হয় না, পরে ওকে কেউ দেখে ফেললে আরও জানাজানি হবে।...অবশ্য আমার এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই...বউ যদি দুশ্চরিত্রা হয়, স্বামী কী করতে পারে?"

"আপনাকে কেউ দোষ দেবে না?"

"না, সবাই জানে আমি ভাল ছেলে।"

কথাটা বলেই অনন্তের বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা শুরু হল। ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এল তার মুখ। ফ্যালফ্যাল করে সে দিলীপ ভড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটে বলল, "কিন্তু সত্যিই কি আমি তাই!"

এগারো

প্রায় তিন ঘণ্টা হয়ে গেল অনন্ত এলোমেলো হাঁটছে। রাস্তায় ট্র্যাফিক কমে গেছে। একটা ট্রামের সামনে লাল বোর্ডে "লাস্ট কার" লেখাটা চোখে পড়েছে। পথচারীরা প্রায় নেই। দু'-একটা আধ ভেজানো দোকান, ভিতরে আলো জ্বলছে। বগলে চট নিয়ে দু'-তিনজন শোবার জায়গা খুঁজছে ফুটপাথে। অনন্ত আলোজ্বলা গির্জার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে তারপর নিজের হাতঘড়ি দেখল। বন্ধ হয়ে আছে।

"ইস্‌স্‌ একদম ভুলে গেছি।"

ঘড়িতে দম দিতে দিতে সে আরও জোরে হাঁটা শুরু করল। হাঁটুর কাছে টান ধরেছে। কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁটুর পিছনে শিরাটায় হাত বুলোল, কিন্তু সে গতি কমাল না। জলতেষ্টা পাচ্ছে অসম্ভব। থুতু ফেলতে গিয়ে শুকনো জিবটা টাগরায় আটকে গেল।

দরজায় আস্তে টোকা দিল। জায়গাটায় আলো নেই, তখনও চোলাইয়ের গন্ধ ভাসছে। আবার সে টোকা দিল।

"কে?"

"আমি।"

দরজা খুলে একটা ছায়া দুই পাল্লার ফাঁকে ভেসে উঠল। তখন সে কাতর অনুনয়ে বলল, "আমি শক্তিপদর ছেলে, আমার এবার ভালবাসা দরকার...দেবে?"

মালবিকা
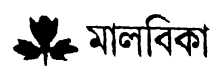
ঘটনাটার শুরু এই বাড়ি থেকেই, তাই গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীকে আগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক।

সুধাংশুকুমার গাঙ্গুলি বাংলা খবরের কাগজে চিফ সাব-এডিটরের চাকরি করেন। পঁয়ত্রিশ বছরের সাংবাদিক জীবনে তিনটি কাগজে কাজ করেছেন। খুব ছোটই তাঁর সংসার। স্ত্রী উমা, তিনমাস-বিয়ে-হওয়া একমাত্র ছেলে প্রভাংশু আর ছেলের বউ সুচিত্রা। অবশ্যই একটি চাকর আছে, কল্যাণ। ইতিহাসের এম এ সুধাংশু সাবধানী এবং হিসেবি কিন্তু কৃপণ নন। একটু রক্ষণশীল কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল রেখে উদারও। ঔদার্যের চরম সীমা এখন পর্যন্ত ছুঁয়েছেন ছেলের বিয়েতে। প্রভাংশু সুবর্ণবণিকের মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে তিনি আপত্তি করেননি। সুচিত্রা রূপবতী, ধনী কন্যা এবং বাংলা অনার্সসহ গ্র্যাজুয়েট। প্রায় পনেরো ভরি সোনার গহনা সে বাপের বাড়ি থেকে এনেছে। সুধাংশু এটা রোধ করতে না পারলেও রঙিন টি ভি সেট ও রেফ্রিজারেটর কিছুতেই নিতে রাজি হননি। ওগুলো তাঁর আছে। কিন্তু থাকলেও অনেক ছেলের বাপ তো লোভ সামলাতে পারেন না কিন্তু তিনি পেরেছেন। নিজের সম্পর্কে সুসভ্য ও শিক্ষিত বলে তাঁর চাপা একটা গর্ব আছে।

চাকরি-জীবন শুরু করে বড়দার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে সুধাংশু কলকাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুরে তিন কাঠা জমি কিনে ফেলেন। কলকাতা অদূর ভবিষ্যতে বাড়বে এবং পাতিপুকুর কলকাতার মধ্যে ঢুকে যাবে এটা তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগেই বাস্তব হালচাল থেকে বুঝে গেছলেন। দাদার ঋণ তিন বছরেই শোধ করে, তিনতলার ভিত গেঁথে প্রথমে একতলা একটি বাড়ি তৈরি করেন। এ-জন্য দু'বছর ধরে নানান জায়গা থেকে সস্তায় গৃহনির্মাণ-সামগ্রী তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

যতটা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় নিয়ে সুধাংশু একতলা বাড়িটাকে দোতলায় পরিণত করেন ঠিক ততটা যত্ন ও নিষ্ঠা নিয়েই তিনি প্রতিদিন প্রভাংশুকে পড়াতে বসতেন। ছেলের শিক্ষার ভিতটা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত গেঁথে দেওয়ায় সে শিবপুর থেকে উচ্চ প্রথম শ্রেণী পাওয়া ধাতুবিদ্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানায় এখন মোটা বেতনের চাকুরে।

ছেলের সম্পর্কে সুধাংশু যতটা নিশ্চিন্ত, উমা সম্পর্কে ঠিক ততটা নন। গ্রামের স্কুল থেকে কোনওক্রমে মাধ্যমিক পাস করা, সাদাসিধা সরল উমা, একজন চিফ সাব-এর বউয়ের পক্ষে যতটা চৌকশ হওয়া উচিত, সুধাংশুর ধারণায় ততটা নয়। উমা বাইরে একা চলাফেরা করেন, দোকানে বাজারে যান, দর করে দামও কমাতে পারেন, কম তেল মশলায় সুস্বাদু করে রাঁধতে পারেন, সর্বোপরি একত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে একবারও গলা চড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেননি। ঠান্ডা, নরম, ভালমানুষ বিশেষণগুলো যেন গহনার মতো উমার অঙ্গে শোভা পায়।

কিন্তু সুধাংশুর চাপা একটা খেদ রয়ে গেছে। বাইরের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে, সাংসারিক বিষয়ের বাইরে কথাবার্তা হড়কে গেলেই উমা হাবুডুবু খায়। পৃথিবীতে কত কী ঘটছে, ভারতেও কত কী ওলটপালট হচ্ছে তার কোনও খবরই উমা রাখে না। মণ্ডল কমিশন, রামজন্মভূমি, বোফর্স, গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকা, খোলা বাজার, রুশদি, তেন্ডুলকর, ম্যান্ডেলা এইসব বেশি তলিয়ে বোঝার হয়তো দরকার নেই কিন্তু ব্যাপারটা কী বা লোকগুলো কেন বিখ্যাত সেই সম্পর্কে তো ওপর ওপর কিছু জেনে রাখা দরকার। ইংরেজি বাংলা দুটো খবরের কাগজ বাড়িতে আসে। বাংলা কাগজের হেডিংগুলো পড়লেও তো কিছু জানা যায়। কিন্তু উমার প্রবল আলস্য কোনও কিছু পড়ায়। গল্প-উপন্যাসও পড়ে না।

তাই সুধাংশু প্রায়শই সকালের বাজার এনে রান্নাঘরের দরজার কাছে চেয়ারে বসে, উমার জানা দরকার এমন সব হেডিং কাগজ থেকে পড়ে শোনান। ইংরেজি কাগজ হলে ইংরেজির সঙ্গে বাংলা তর্জমাও করে দেন। কুটনো কোটা আর দুনিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার কাজ উমা একসঙ্গেই চালান।

আজ রবিবার। সকাল প্রায় দশটা। একটু আগে বউকে নিয়ে প্রভাংশু চন্দননগরে শ্বশুরবাড়ি গেল। সেখানে রাত্রিবাস করে কাল বিকেলে ফিরবে, পরশু সে বউকে নিয়ে বিশাখাপত্তনমে চলে যাবে। উমা আজ দুপুরে বকুল আর তার মেয়ে মালবিকাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। মালবিকার বিয়ে আর আট দিন পরেই, উমা তাকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াবেন। ঠিক করেছেন, কাঁচালঙ্কা সর্ষেবাটা দিয়ে চিংড়ি মাছের ভাপা রাঁধবেন, এটা তাঁর খুবই পছন্দের। ইঞ্চিচারেক সাইজের চিংড়ি রোজ পাওয়া যায় না, আজ ভোরে বাজারে গিয়ে সুধাংশু পেয়ে গেলেন। দিনটা তা হলে ভাল যাবে, এমন এক আনন্দের বশবর্তী হয়ে চল্লিশ টাকা দিয়ে আধ কেজি চিংড়ি কিনে ফেললেন।

সুধাংশু তিন সপ্তাহ আগে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা ভেঙেছিলেন বাস থেকে নামার সময় পড়ে গিয়ে। আঙুলের প্লাস্টার কাটা হয়েছে বটে কিন্তু কলম ধরে লিখতে পারছেন না। আশা করছেন এক মাসের ছুটিটা ফুরোবার আগেই বোধহয় পারবেন। আঙুলের জোর পরখ করার জন্যই চিংড়ি ও রুই মাছ ভরা আটশো গ্রামের থলিটি তিনি ডান হাতে ধরে বাড়ি ফিরলেন, পিছনে আর একটি থলি হাতে কল্যাণ।

ঘটনাটির কেন্দ্রে রয়েছে মালবিকা, অতএব তার এবং তার মা বকুলের কথা এবার বলা যাক।

পিতৃমাতৃহীন বকুল লালিত হয়েছে মামার বাড়িতে। মামারা ছাপোষা গেরস্ত। ভাগ্নিকে তাঁরা গলগ্রহ মনে করতেন। কোনওক্রমে ক্লাস নাইন পর্যন্ত বকুলকে পড়িয়ে আর তাঁরা পড়াননি। লাস্যে ভরা, চপল প্রকৃতির বকুল এ-জন্য মোটেই দুঃখ পায়নি। ভাঙাচোরা, স্যাঁতস্যাঁতে, অপরিচ্ছন্ন বাড়িতে স্থানাভাব তাই সুযোগ পেলেই সে পাড়ার এবাড়ি-সেবাড়ি করে বেড়াত। তাই করতে করতে সে একসময় পাড়ার বাইরেও পা বাড়াল। সিনেমায়, রেস্টুরেন্টে, ট্যাক্সিতে তাকে দেখা গেল পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে। অচিরেই বকুলের গতিবিধি সম্পর্কে নানান মুখরোচক খবর মামিদের মারফত মামাদের কানে পৌঁছল। তাঁরা বকুলের বিয়ের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হলেন।

মামাদের নিষ্কৃতি দিয়ে হঠাৎই এক সন্ধ্যায় সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দেওয়া বকুল বাড়ি ফিরল। বাড়ির লোকেরা প্রথমে ঠিক করতে পারেননি, কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তাঁরা প্রকাশ করবেন। একটা বড় খরচ বেঁচে গেল, এই স্বস্তিটা চেপে গিয়ে কেউ রাগ দেখালেন, কেউ বললেন বেশ করেছে। বকুল মিনিট দশেকের বেশি বাড়িতে থাকেনি।

দেড়শো বছরের পুরনো বিশাল এক বাড়ির, বহু শরিকের অন্যতম দিলীপরঞ্জন দত্তকে বকুল রেজেস্ট্রি বিয়ে করে। সুশ্রী, গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী এবং বাকচতুর দিলীপরঞ্জন বাড়ির একটিমাত্র ঘরের অধিকারী, ইস্টার্ন রেলওয়ের কেরানি এবং পেশাদার মঞ্চে অনিয়মিত ক্ষুদ্র এক অভিনেতা। তার সঙ্গে দিলীপরঞ্জনের বয়সের তফাত পনেরো বছরের হলেও বকুল মনে করেছিল সে লটারির প্রথম পুরস্কার জিতেছে। পরে সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে লটারির টিকিটটি ছিল জাল। আভিজাত্যপূর্ণ চালচলন, কথাবার্তা ও চেহারাটাই শুধু সে দেখেছিল কিন্তু এইসবের আড়ালে দিলীপরঞ্জনের বৈষয়িক অবস্থা বা তার চরিত্রের দৈন্যদশা সে লক্ষ করেনি। বিয়ের চার মাস পরই তার স্বামী সাসপেন্ড হয় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে। যে-ভাবেই হোক দিলীপরঞ্জন সেটা সামাল দেয়। মেয়ে মালবিকা জন্মায় বিয়ের পর অষ্টম মাসে। তাই নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ও মামার বাড়িতে যে-সব অশ্লীল মন্তব্য ও হাসাহাসি হয় তার অধিকাংশই বকুলের কানে আসে এবং সে নীরবে তা হজম করে, কেন না ঘটনাটা সত্য। দিলীপরঞ্জনকে বিবাহে বাধ্য করার জন্য তাকে দিয়ে কৌমার্য ভঙ্গের কাজটি সে করিয়ে নিয়েছিল, এই তথ্যটি মালবিকা বারো বছর বয়সে একদিন বাবা-মায়ের তিক্ত ঝগড়ার মধ্য দিয়ে জেনে গিয়েছিল।

মালবিকা বড় হয়ে ওঠে এমনই পরিবেশে যেখানে বাবা মাঝেমধ্যে রাতে বাড়ি ফেরে না, মাঝেমধ্যে মাতাল হয়ে ফেরে, বাবার হাতে মা মার খায়। বাড়ির অন্যান্য অংশে বসবাসকারী জ্যাঠা, কাকা, তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাকে এবং তার মাকে ঠারেঠোরে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, হেয়জ্ঞান করে এটা সে বাল্য থেকেই দেখে এসেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ভর করে জীবন সম্পর্কে একটা অনিশ্চিত বোধ, আশ্রয়চ্যুত হবার ভয়, নিরাপদ স্থিতি পাওয়ার ব্যাকুলতা এবং নিছকই জৈব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দরদভরা অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা আর এইগুলো থেকেই তার মধ্যে গড়ে উঠেছে ফলাফলের পরোয়া না করা, বাস্তববোধ বর্জিত, অন্ধ আবেগে ভরা এমন এক মানসিকতা যার সঙ্গে

তার মা বকুলের বহু জায়গায় মিল রয়েছে। যেমন মিল আছে দু'জনের প্রায় একই ধরনের পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠার। মায়ের থেকে স্কুলে দুই ক্লাস বেশি পড়ে মেয়ে পড়া ছেড়েছে।

মালবিকা তার মাকে পছন্দ করে না এবং অবহেলাও করে না, একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে সে ভালবাসে বকুলকে। তবে বাবাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমনকী বাবার মতো গৌরবর্ণ, লম্বা চেহারার পুরুষদের দেখলে তার ভিতরটা কুঁকড়ে শক্ত হয়ে যায়। সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে যতক্ষণ না লোকটি চোখের সামনে থেকে সরে যায়।

হয়তো এই প্রতিক্রিয়া থেকেই সে আকৃষ্ট হয় সমীরণ মিত্রের প্রতি।

বকুল বুঝে গেছল লেখাপড়া মালবিকার দ্বারা হবে না। কিন্তু সে লক্ষ করেছে মালবিকার গানের গলাটি খুব সুন্দর। সুরেলা এবং মধুর। লতা মঙ্গেশকর বা আশা ভোঁসলের গাওয়া ফিল্মের গানগুলো হুবহু অবলীলায় গেয়ে দেয়। সে স্থির করে মেয়ে যেন তার মতো একটা অকেজো, রান্না-খাওয়া-ঘুমসর্বস্ব গৃহপালিত জন্তু না হয়ে ওঠে। জীবনে তার যা-সব আকাঙ্ক্ষা ছিল—একটা মোটরগাড়ি, খরচ করার জন্য হাতে প্রচুর টাকা, নিজস্ব একটা বাড়ি, তাতে সাজানো ঘর, রোমান্টিক অনুগত স্বামী এবং স্বাধীনতা, এ-সব তার কাছে স্বপ্নই রয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের ভাগ্যে যেন স্বপ্নটা সম্ভব হয়, যেন বিরাট গায়িকা হয়ে প্রচুর বিত্ত অর্জন করতে পারে এই আশা সে মনে লালন করতে থাকে। সে জানে, শুয়ে বসে শুধুই আকাশকুসুম দেখলে, যেটা সে নিজে করেছে, কোনওদিনই সেই কুসুম পৃথিবীর মাটিতে ফুটিয়ে তোলা যাবে না।

মেয়েকে গান শেখাবার জন্য উদ্যোগী হল বকুল। সেজজায়ের মেয়েকে গান শেখাতে আসত এক মহিলা, বকুল তাকেই মালবিকার শিক্ষিকা রাখল। মাস দুয়েক পর সে বুঝল এই মহিলা বারো বছরের মেয়েকে গান শেখাতে পারবেন, উনিশ বছরের মেয়েকে নয়। এই সময়ই একদিন বকুলের আলাপ হল উমা ও সুধাংশুর সঙ্গে।

কাগজের সিনেমা-নাটক বিভাগের সম্পাদকের সঙ্গে সুধাংশুর হৃদ্যতা আছে। ম্যাজিক, নাচ, যাত্রা, অফিসের নাটক, জলসা ইত্যাদির কার্ড প্রায়শই সে চেয়ে নেয়, অনুষ্ঠান দেখে দু'-চার প্যারাগ্রাফ লিখে দেবার বিনিময়ে। মহাজাতি সদনে একটা ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাচ-গান ও নাটক অনুষ্ঠানের দু'খানা কার্ড সুধাংশু চেয়ে নিয়েছিলেন একটি কারণেই, সমীরণ মিত্র গান গাইবে।

বৈঠকি চালে টপ্পা, খেয়াল ঢঙের পুরাতনী আর থিয়েটারের গান গেয়ে সমীরণ আসরের পর আসর মাত করে এখন জনপ্রিয়তম গায়কদের একজন। ইতিমধ্যেই তার বারোখানা গানের ক্যাসেট বাজারে বিকোচ্ছে। শুধু কলকাতায়ই নয় গৌহাটি, পাটনা, কটক তো বটেই দিল্লি বোম্বাই বাঙ্গালোর থেকেও বাঙালি সমাজের ডাক তার কাছে আসে। আমেরিকার নিউ জার্সির বাঙালিদের আমন্ত্রণও এসেছিল কিন্তু সেই সময় জন্ডিস হওয়ায় যেতে পারেনি। কিন্তু সমীরণ মিত্রর সংগীত-ভক্ত হিসাবে সুধাংশু বা উমা এই অনুষ্ঠানে আসেননি। সমীরণ তাঁদের পাড়ার ছেলে।

তাঁদের তিনখানা বাড়ির পরই থাকত সমীরণরা। ভাড়া দু'খানা ঘরে আটজন লোক। ওর বাবা ছিল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে কম্পাউন্ডার। সমীরণকে তার কৈশোর থেকেই তাঁরা চিনতেন। একটু বাউন্ডুলে স্বভাবের, লেখাপড়ায় কলেজ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল বাবার জুতোপেটার জোরে, ছোট বয়সেই ভাল তবলা বাজাত আর জোড়াসাঁকোয় তখনই কোনও এক ওস্তাদের কাছে তালিম নিতে শুরু করেছিল। তাঁদের বাড়িতেও সে আসত, উমাকে ডাকত মাসিমা বলে। ক্রমশ নামডাকের সঙ্গে এল প্রচুর অর্থ এবং ব্যস্ততা। সমীরণ বিয়ে করল তারই ছাত্রী শিঞ্জিনীকে এবং মানিকতলার কাছে বাড়িভাড়া নিয়ে পাতিপুকুর ছেড়ে চলে যাবার পর যোগাযোগটা এখন ক্ষীণ হয়ে গেছে।

সমীরণ সেদিন গাইল আটখানা গান, প্রতি গান পাঁচ মিনিটের। তৃতীয় গানটি যখন গাইছে উমা তখন চাপা গলায় স্বামীকে বলেন, "যে ক্যাসেটটা আমাদের দিয়েছিল তাতে এই গানটা আছে।" সুধাংশু তখন বলেন, "ওর আগমনী গানের একটা ক্যাসেট আছে, সুন্দর নাকি গেয়েছে, ভাবছি টেলিফোন করে একটা চাইব।"

ওঁদের এই কথোপকথন উমার পাশের আসনে বসা বকুল শুনেছিল। তার পাশে ছিল মালবিকা।

সমীরণের তৃতীয় গানটি শেষ হতেই সে উমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বিনীত স্বরে বলে, "ওঁকে কি আপনি চেনেন?"

"কাকে, সমীরণকে? ওকে তো ছোটবেলা থেকেই চিনি! আমাদের প্রতিবেশী ছিল।" উমা চাপা গর্বে কিঞ্চিৎ ফেঁপে উঠে অতঃপর বলেন, "আমাকে মাসিমা বলে।"

দ্রুত চিন্তা করে নিয়ে বকুল বলে, "খুব নাম ওনার, খুব ভাল গান। আমার মেয়ের খুব ইচ্ছে ওঁর কাছে গান শেখার।"

"শিখুক না।" যেন একটা ছাড়পত্র দিলেন উমা এমন ভাঙ্গতে বলেন।

"শুনেছি খুব খুঁতখুঁতে, যাকে মনে করবেন কিছু হবে শুধু তাকে ছাড়া আর নাকি কাউকে শেখাতে চান না।"

"ওর স্কুলে অত ছেলেমেয়ে সবাই কি সন্ধ্যা মুখুজ্জে না লতা মঙ্গেশকর হবে?"

"না না স্কুলে নয়, পার্সোনালি আলাদা করেও উনি শেখান।"

"তাই নাকি!"

"আপনি একটু ওঁকে বলবেন দিদি?" ঝুঁকে উমার হাত চেপে ধরে বকুল।

"আপনার মেয়ে কেমন গায় তা না জেনে কী করে বলব?" উমা হঠাৎ সাবধানী হয়ে যান।

"সে তো নিশ্চয়। তবে একবার পরীক্ষা করে যদি দেখেন... দিদি আপনি একটু ওঁকে বলুন না।" বকুল মিনতি করে হাতটা উমার হাঁটুতে ছোঁয়ায়।

"আচ্ছা বলব, তবে কথা রাখবে কি না জানি না। খুব বড় হয়ে গেছে তো।"

সমীরণের অষ্টম গানটি শেষ হতেই সুধাংশু ওদের নিয়ে আসেন গ্রিনরুমে। কিছু লোক ঘিরে রয়েছে তাকে। সমীরণ কাকে যেন বলছিল তার নিজস্ব সঙ্গতকারদের গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। একজন জুঁই ফুলের গোড়ে তার হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করল। চার রকমের বৃহদাকার মিষ্টির প্লেট নিয়ে দাঁড়ানো লোকটি অনুনয় করল, "অন্তত একটা", সমীরণ তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে, "একটাও নয় ভাই। চল্লিশে পা দিয়েছি, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ।" এই বলেই সে উমা ও সুধাংশুকে দেখতে পেল।

"আরে মাসিমা!... মেসোমশাই।" সমীরণ এগিয়ে এসে প্রণাম করল। উমা গর্বে আপ্লুত হয়ে পিছনে দাঁড়ানো বকুলের দিকে মুখ ফেরালেন, মুখের ভাবখানা, দেখলে তো! বকুল বিশ্বাস করল, এই মহিলার অনুরোধ সমীরণ ফেলতে পারবে না।

"তোমার গান শুনতে এসেছি।" উমা বললেন।

"তা হলে এই মিষ্টিগুলো আপনার। এতক্ষণ কান তেতো করেছেন এবার মুখটা মিষ্টি করে নিয়ে বলুন কেমন লাগল।" সমীরণ লঘুস্বরে কথাগুলো বলে প্লেটটা লোকটির হাত থেকে নিয়ে উমাব সামনে ধরল।

"তোমার গানের সুখ্যাতির জন্য আমার জিভ মিষ্টি করার দরকার হয় না।" উমা প্লেটটা নিয়ে বকুলের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "নাও, তুলে নাও।" নিজেও একটা তুলে নিলেন।

বকুল একটা সন্দেশ তুলে নিল বিনা বাক্যব্যয়ে। উমার খুশির সঙ্গে তাল রাখতে সে এখন বদ্ধপরিকর। উমা প্লেটটা ধরলেন মালবিকার সামনে। সে একটা রসে ভেজা চিত্রকূট তুলে নিল। সুধাংশুও বাদ পড়লেন না।

মালবিকা একদৃষ্টে সমীরণের মুখের দিকে তাকিয়ে। লোকটার মধ্যে কী রকম যেন এক সম্মোহন ক্ষমতা রয়েছে যে-জন্য তার উনিশ বছরের হৃৎপিণ্ডটার স্পন্দন হঠাৎই বেড়ে গেল! মাঝারি উচ্চতা, মাঝারি গড়ন। ফুলহাতা গরদের পাঞ্জাবির আড়ালে একটা বলিষ্ঠ শরীরের আভাস। সমীরণের গায়ের রং মালবিকাকে তাদের বাড়ির পুরনো মেহগনি কাঠের টেবলটাকে মনে পড়াল। টেবলটার পালিশ উঠে গেছে কিন্তু এই লোকটার মুখের চামড়ায় যেন ঘাম তেল মাখানো।

এত কালোর উপর এত সুন্দর মুখ সে কখনও দেখেনি। কপালটা সামান্য চওড়া, মাথাটা ছোট কিন্তু অবিন্যস্ত চুল দিয়ে সেটা মানানসই করে নেওয়া, তাতে জুলফি নেই লম্বাটে ডিমের মতো মুখের আকৃতি, লম্বা কান, পাতলা ঈষৎ গোলাপি ঠোঁট, ঠোঁটের উপরে ডান নাকের নীচে একটা তিল, বাঁকা ভুরু দুটি যেন পেনসিল দিয়ে আঁকা। আর চোখ!

সমীরণের চোখ দুটোই মালবিকাকে সম্মোহিত করেছে।

মণি দুটো ঈষৎ পিঙ্গল এবং সাদা অংশের থেকে বেশি জায়গা নিয়েছে। বুলবুলির মতো মণি দুটো ছটফট করে যাচ্ছে সারাক্ষণ। কথা বলতে বলতেই ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, চাহনিতে মজা পাওয়া বাচ্চাদের মতো চঞ্চলতা। উমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সমীরণ দু'-তিনবার মালবিকার দিকে তাকাল। চাহনিটা হালকা বাতাসের মতো কপাল থেকে নেমে বুকের উপর কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়েই ঝরে পড়ল। শিরশির করে উঠল মালবিকার সারা দেহ।

প্রতিবারই কেঁপে উঠল তার বুক। চুন্নিটা বুকের উপর থেকে সামান্য সরে রয়েছে সেটা বিছিয়ে দেবার জন্য সে কোনও চেষ্টা করল না।

"এ কী তুমি খাচ্ছ না যে! আমার মতো মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছ নাকি?" সমীরণ কথাটা বলে হাসল। সবলভাবে মাড়িতে বসানো ঝকঝকে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল আর গালের পেশি কুঞ্চিত হয়ে ভাঁজ ফেলল। চোখের মতো মুখটাও নড়াচড়া করে।

বকুল চাপা কঠিন স্বরে বলল, "খেয়ে নে।"

"না।" মায়ের নির্দেশ অমান্য করে মালবিকা জেদি গলায় বেপরোয়ার মতো বলল, "আমিও মিষ্টি ছেড়ে দিয়েছি।"

"এত কম বয়সেই! কবে ছেড়েছ?"

"এই মাত্র।"

সমীরণ কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে অবাক চোখে তাকাল। চিত্রকূটটা প্লেটে রেখে দিল মালবিকা।

"তা হলে অভিনন্দন। এই নাও।" জুঁই ফুলের গোড়েটা সে এগিয়ে দিল। গোড়েটা নেবার সময় সমীরণের আঙুল সে মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে করেই স্পর্শ করল। ভ্রূ তুলে সমীরণ তাকাতেই মালবিকার গৌরবর্ণ মুখটা গরম হয়ে উঠল, চোখ আনত হয়ে এল। মালাটা আলতো করে বুকে চেপে ধরল।

বকুলের চোখে কিছুই এড়ায়নি। তার শুধু মনে হল, কথাটা পাড়ার জন্য এখনই মোক্ষম সময়।

"দিদি, বলুন না কেন এসেছি।"

উমা এতক্ষণ মুখে হাসি ফুটিয়ে মালবিকা আর সমীরণের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। প্লেটটা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা সুধাংশুর হাতে তিনি ধরিয়ে দিলেন, "এটা শেষ করো।"

সমীরণ হাত-ঘড়ি দেখল। একটি লোককে, বোধহয় ড্রাইভারকে বলল, "গাড়িটা এনে গেটের কাছে রাখুন।"

"তোমার কি তাড়া আছে, কোথাও যাবে?" উমা বললেন।

"হাওড়ায় যাব।"

"সমীরণ তো এখন দিনে দু'-তিনটে ফাংশান করে।"

সুধাংশু এতক্ষণ কথা বলার একটা উপলক্ষ খুঁজে বার করলেন।

"না মেসোমশাই, বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে যেতে হবে। আর দিনে দু'-তিনটে ফাংশান কোনওকালেই আমি করিনি।"

"কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম—" অপ্রতিভ সুধাংশু থেমে গেলেন।

"তোমার ছেলে কত বড়টি হল? বউমা কেমন আছে, গানটান করে?"

"ছেলে এখন ক্লাস সিক্সে পড়ছে, ক্যালকাটা বয়েজে। আর শিঞ্জিনী মাঝে মধ্যে তানপুরা নিয়ে বসে বটে তবে সে কিছু নয়। এখন গানের স্কুলটা দেখাশোনাতেই ব্যস্ত থাকে।"

"দিদি—"

"বলছি, বলছি। যাব যাব করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠে না, সমীরণ এবার তোমার বাড়িতে একদিন যাব।"

"গেলে তাড়াতাড়ি আসুন। পার্ক সার্কাসে একটা ফ্ল্যাট পাওয়ার কথা হচ্ছে। পেলে স্কুলটা মানিকতলায় রেখে পার্ক সার্কাসে আমরা গিয়ে থাকব। কালোয়ারপটিতে থাকতে আর ভাল লাগছে না।"

"স্কুল না হয় রয়ে গেল কিন্তু তুমি যে স্পেশাল করে শেখাও তার কী হবে?"

সমীরণ একটু অবাক হয়ে বলল, "আপনি জানেন দেখছি! তেমন বুঝলে স্পেশাল ক্লাস পার্ক সার্কাসেই তখন করব।"

"তোমাকে এই মেয়েটিকে স্পেশালে শেখাতে হবে। খুব ভাল গায়। তোমার কাছে ছাড়া কারুর কাছে শিখবে না, মেয়ের একেবারে ধনুক ভাঙা পণ! তুমি কিন্তু না বলতে পারবে না। তোমাকে বলার জন্য ওর মা, এই যে ইনি আমার বোনের মতো, আমাকে খুব ধরেছে।"

উমা এই রকমই। কিছুক্ষণ আগে মাত্র আলাপ, একদমই জানেন না মেয়েটির গলায় গান না মেশিনগান কোনটা রয়েছে অথচ তদবির শুরু করলেন এমনভাবে যেন নিজের মেয়ের জন্য বলছেন।

সমীরণ মিটমিট চোখে মালবিকার দিকে তাকাল। কী যেন সে মুখটায় দেখল। ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে বলল, "কিন্তু মাসিমা, আলাদা করে যাদের শেখাই আগে তাদের গান শুনি, নিষ্ঠা আছে কি না দেখি। আমি যে পরিশ্রম করব সেটা যে বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো হবে না সেটা তো আগে আমায় বুঝে নিতে হবে। এ-রকম ঘটেছে, ভস্মে ঘি ঢেলেছি।... তোমার নাম কী?"

মালবিকার গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইল না। ঢোঁক গিলে কোনওরকমে বলল, "মালবিকা দত্ত।"

"বাহ, বেশ নাম। থাকো কোথায়?"

"রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে, গৌরীবাড়ির কাছে।"

"তা হলে তো খুব কাছেই। কারুর কাছে গান শেখো?"

"একজনের কাছে বাড়িতে কিছুদিন শিখেছিলুম। কয়েকটা ভজন আর রবীন্দ্রসংগীত।" কুণ্ঠিত স্বরে মালবিকা বলল।

উমা মনের জোর পেয়ে গেছেন। এত জিজ্ঞেস করছে যখন তা হলে স্পেশালে মেয়েটাকে নেবেই। "কবে যাবে গান শোনাতে?"

সমীরণ যাকে গেটের কাছে গাড়ি আনতে বলেছিল, সেই ধুতিপরা প্রৌঢ় লোকটি এসে বলল, 'গাড়ি এনেছি, গেটের সামনেই আছে।"

"গাড়িতে থাকুন, আমি যাচ্ছি।" সমীরণ এবার উমার দিকে ফিরে বলল, "আপনারা কি নাটকটা দেখবেন না বাড়ি যাবেন? যান তো তা হলে—" সমীরণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি যুবকের দিকে তাকাল। "তা হলে গাড়ির ব্যবস্থা হতে পারে।"

"মালি কবে কখন যাবে?" বকুল তার উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারল না। ব্যাপারটা সে আধপাকা করে রাখার পক্ষে নয়।

"ডাক নাম বুঝি মালি?... আসুন তিন-চারটে দিন বাদ দিয়ে। কাল জামশেদপুর যাব। সকাল দশটা-এগারোটা নাগাদ আসুন, আমার ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়।... মাসিমা?"

"আর নাটক দেখে কী হবে বলো?" উমা প্রশ্নটাকে সিদ্ধান্তের আদলে বকুলের দিকে পাঠাল।

"ও আর দেখার কী আছে।" বকুল সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানিয়ে দিল।

"মিহির।" সমীরণ দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটিকে ডাকল। দ্রুতপায়ে প্রায় কৃতার্থের মতো সে সমীরণের কাছে এল।

"আমার ছাত্র মিহির, মিহিরচাঁদ শীল। ওর গাড়ি আছে, ও আপনাদের পৌঁছে দেবে। মিহির, ইনি আমার মাসিমা। এঁদের সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দাও।" প্রায় হুকুমের সুরেই সমীরণ নির্দেশ দিল। মিহির অনুগৃহীতের মতো মাথা নেড়ে গেল।

"তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো?" নিছকই ভদ্রতাসূচক একটা অপ্রয়োজনীয় কথা বলল সমীরণ।

"না না, একদমই না।" মিহির শশব্যস্তে উত্তর দিল।

সমীরণ দরজার দিকে এগোল। "আপনারা একটু দাঁড়ান আমি আসছি।" বলে মিহির পিছু নিল সমীরণের। ঘরে এখন নাটকের লোকেদের ভিড়। পোশাক, মেকআপ ইত্যাদির ব্যস্ততার মধ্যে ওরা চারজন দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে।

"তোমার নামটি তো এখনও জানলুম না।" উমা জিজ্ঞাসা করলেন বকুলকে।

"বকুল দত্ত।"

"ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"এই মালিই, আর হয়নি।"

"হয়নি না হওয়াওনি।" উমা মুখ টিপে হেসে বললেন, "আমারও এক ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার। এই তিন মাস হল বিয়ে হয়েছে। আগে থেকেই ওদের ভাবসাব ছিল। উনি খবরের কাগজে চিফ সাব-এডিটার—" মিহিরকে দেখে তিনি থেমে গেলেন।

"সমীরণদাকে তুলে দিয়ে এলুম। আসুন আপনারা।"

মাখন রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। মিহিরের সঙ্গে তার এক বন্ধু রয়েছে। পিছনের সিটে মেয়েরা তিনজন, সামনের সিটে চালক মিহির ছাড়া তার বন্ধুটি ও সুধাংশু।

"আমার বন্ধু বেলেঘাটা যাবে, ওকে যদি আগে নামিয়ে দি তা হলে কি আপনাদের অসুবিধে হবে?" মার্জিত, নম্র বাকভঙ্গি, গলার স্বর সরু। ঘাড় ফিরিয়ে মিহির তাকাল পিছনে, আসলে তাকাল উমার দিকে।

মালবিকার ভাল লাগল না এটা অর্থাৎ তাদের দু'জনকে অগ্রাহ্য করে উমার দিকে অনুমতি চাওয়ার মতো করে তাকানোটা। এর আগেও সমীরণ যখন বলল 'মিহির, ইনি আমার মাসিমা?' তখনও তারা দু'জন উপেক্ষিত হয়। তখন সে রাগেনি, দুঃখও পায়নি। শুধু একটা অকারণ অভিমান বুকের মধ্যে ফেঁপে উঠেছিল। বাড়িতেও বাইরের কেউ এলে বলা হয়, 'আমার সেজজায়ের মেয়ে।' ব্যস, নামটুকু পর্যন্ত নয়।

মালবিকা আন্দাজ করতে পারে কেন তারা যথেষ্ট মনোযোগ লোকেদের কাছ থেকে পায় না। সব জায়গাতেই তাদের ভূমিকাটা থাকে অনুগ্রহপ্রার্থীর। মায়ের বাপের বাড়ির তরফে বংশগৌরব নেই, পরিচয় দেবার মতো মান্যগণ্য, ধনী কোনও আত্মীয় নেই। মা বা সে নিজে লেখাপড়া করেনি।

তার বাবা দিলীপরঞ্জন রেলের কেরানি এবং সবাই তাকে দুশ্চরিত্র বলেই জানে।

একটা মিষ্টি সুশ্রী মুখ আর ধারালো দেহ ছাড়া সে জানে তার আর কোনও সম্পদ নেই। সে আরও জানে, এই সম্পদ ভাঙিয়েই তাকে জীবন গুছিয়ে নিতে হবে। তার গলায় সুর আছে কি নেই, বড় গাইয়ে হবে কি হবে না, সে-সব পরের কথা, এখন তাকে সমীরণ মিত্রর গানের স্পেশাল ক্লাসে জায়গা করে নিতেই হবে। গান এবং সমীরণের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই বন্ধ গলি থেকে রাজপথে যাওয়ার।

মিহির তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে উমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কোনও অসুবিধে হবে না বাবা, আমাদের এখন কোনও তাড়া নেই। কী গো বকুল, তোমার কি তাড়া আছে?"

"না দিদি। যখন হোক পৌঁছলেই হল।" বকুল শুধু খুশিই নয় তৃপ্তও।

কতদিন পর যে সে মোটরগাড়িতে চড়ল! বাড়িতে বড়ভাসুরের মোটর আছে, মেজ ভাসুরের ছেলের স্কুটার আছে। আজ কুড়ি বছর প্রায় বিয়ে হয়েছে কিন্তু বড়ভাসুরের গাড়িতে দু'-তিনবার ছাড়া তার চড়া হয়নি। মোটরে চড়ার দুর্নিবার আকর্ষণটা বকুলের ছোটবেলা থেকেই। দিলীপরঞ্জনের একটা মরিস মাইনর ছিল। চার হাত ফেরতা ছোট্ট গাড়ি। রংচটা, জানলার কাচ ওঠে না, সিটের স্প্রিং বসে যাওয়া গাড়িটাতেই বকুল বিয়ের আগে দিলীপরঞ্জনের সঙ্গে ঘুরেছে। যতই পুরনো ঝরঝরে হোক মোটরগাড়ি তো বটে! চড়লেই নিজেকে রাস্তার লোকেদের থেকে যথেষ্ট আলাদা বোধ হয়। কিন্তু বিয়ের মাস কয়েক পরই গাড়িটা আর রইল না। ঘুষ নিতে গিয়ে দিলীপরঞ্জন ধরা পড়ল, গাড়িটা সে তখনই বিক্রি করে দেয়।

"শ্বশুরবাড়িতে কে কে আছেন?" উমা তাঁর কৌতূহল মেটাবার কাজ শুরু করলেন।

"শ্বশুর শাশুড়ি নেই, তা ছাড়া সবাই আছেন। খুবই বনেদি, বড় পরিবার।" বকুলের উত্তরের মধ্যে ঝোঁকটা পড়ল 'বড় পরিবার' শব্দ দুটোয়।

"আলাদা হাঁড়ি?"

"হ্যাঁ। শাশুড়িই আলাদা করে দিয়ে গেছেন।"

"ভায়ে ভায়ে সদভাব নেই বুঝি?"

"না না, ঠিক তা নয়। খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন তো! বলতেন, যতদিন আমি আছি ততদিন সদ্ভাব থাকবে, এক হেঁসেলে চলবে কিন্তু আমার মরার পর কে কীরকম হয়ে যাবে তা তো জানি না, দিনকাল তো আর একরকম থাকে না।"

"ভালই বলেছেন। দিনকাল যে কীভাবে বদলেছে, কত রকমের কাণ্ড যে চারদিকে ঘটছে। চোর ডাকাত খুনিতে দেশটা ভরে যাচ্ছে। হুট হুট করে কত বড়লোক এখন গজাচ্ছে আর গরিবরা আরও গরিব হচ্ছে।"

উমার কথাটা শুনে সামনের সিটে সুধাংশু হর্ষ এবং আশ্বস্ত বোধ করলেন। একটু-আধটু রাজনীতির হালচাল মেয়েদের জানা থাকা ভাল। খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ে শোনানোটা যে বৃথা যায়নি সেটা বুঝতে পারছেন।

মেট্রো রেলের জন্য মহাজাতি সদনের সামনের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মাঝখানটা খোঁড়া রয়েছে প্রায় দশ বছর। দু'পাশের সরু পথ ধরে বাস ট্রাক মোটর চলাচল করে। সেই পথের দুর্দশা বর্ণনার অযোগ্য। এর উপর রয়েছে ট্র্যাফিক জ্যাম। মিহিরের মোটর এখন জ্যামে পড়েছে। একহাত-দু'হাত করে গাড়ি এগোচ্ছে মহাত্মা গান্ধী রোড মোড়ের দিকে।

"এই যে দু'পাশের বাড়ি দেখছ," সুধাংশু তাঁর স্ত্রীর কথারই জের টেনে বললেন, "এগুলো সব মারোয়াড়িরা কিনে নিয়েছে। একটাও আর বাঙালির নেই, বিক্রি করে দিয়ে কলকাতার আশেপাশে চলে গেছে।"

"একটাও নেই বোলো না, তোমার জটুদারা তো থাকে বিডন স্ট্রিটের মোড়ে।"

"ওই দু'-তিনটে বাড়ি পাবে। ব্ল্যাকমানির জোরে এমন লোভ দেখায় যে পড়তি অবস্থার বাঙালিরা আর লোভ সামলাতে পারে না। আসলে বাপ-ঠাকুর্দার জমানো টাকা পায়ের উপর পা তুলে খেয়ে খেয়ে এমন একটা কুঁড়েমির অভ্যাসে—"

"এটা কিন্তু ঠিক কথা নয় মেসোমশাই।"

বকুল ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে মেয়ের উরুতে একটা রামচিমটি কাটল। সেটা অগ্রাহ্য করে মালবিকা বলল, "সব বাঙালিই কুঁড়ে নয়। ব্যবসা করে সবাই বড়লোক হতে চাইলে গানটা তা হলে গাইবে কে? সমীরণ মিত্র নিশ্চয়ই কুঁড়ে নন। খেটেছেন বলেই আজ এমন উঁচু জায়গায় পৌঁছেছেন। কলকাতার ক'টা মারোয়াড়ির অটোগ্রাফ নিতে মানুষ ভিড় করে?"

মিহির সন্তর্পণে মুখ ফিরিয়ে মালবিকার মুখটা একবার দেখার চেষ্টা করল আর উমা দ্বিগুণ উৎসাহে বলে উঠলেন, "বাঙালি যদি কুঁড়েই হত, তোমার কথাই ধরো না, অত খেটে কি বাড়িটা করতে পারতে? ছেলেকে নিয়ে যে রোজ পড়াতে বসতে, কুঁড়ে হলে কি বসতে? মালবিকা ঠিকই বলেছে।"

সুধাংশু নীরব রইলেন এবং এই নীরবতা অনুধাবন করে বকুল বুঝে নিল ভদ্রলোককে নয় তার স্ত্রীকেই পাত্তা দিতে হবে। সমীরণ মিত্র একে প্রণাম করে, মাসিমা বলে।

"ঠিকই বলেছেন দিদি, দাদা যদি কুঁড়ে হতেন তা হলে ছেলে কি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত?"

সুধাংশু এবং উমা উভয়েই প্রীত হলেন। এবং বকুলকে পালটা প্রীত করার জন্য উমা বললেন, "তুমিও বাপু কুঁড়ে নও। মেয়েকে গান শিখিয়ে বড় করার জন্য ঠিক ঠিক লোককে ধরার কাজে তো তুমি গাফিলতি করোনি। ...এটা কিন্তু ভালই। যাকে দিয়ে করিয়ে নিলে কাজ হবে, তুমি তাকে দিয়ে নিশ্চয় করিয়ে নেবে, চক্ষুলজ্জা করলে চলবে না!"

বকুল ঠিক করতে পারল না সে হাসবে না গম্ভীর হবে। তাকে কতটা ঠেস দেওয়া বা প্রশংসা করা হল এটা সে বুঝতে পারছে না। মাঝামাঝি পথ ধরে সে বলল, "আপনি ঠিক আমার শাশুড়ির মতোই কথা বলেন।"

"বলবই তো! কত বয়সে উনি মারা যান?"

"ছিয়াত্তর বছরে।"

"আমার এখন পঞ্চান্ন। কত আর পার্থক্য, আমরা একই রকমের কথা তো বলবই!"

অবশেষে গাড়ি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে বাঁ দিকে মহাত্মা গান্ধী রোডে মোড় নিল। খানিকটা স্বচ্ছন্দে গিয়েই আটকা পড়ল কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে।

"উমা দ্যাখো, এই ডান দিকে ইউনিভার্সিটি. স্যানসক্রিট কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কফি হাউস, হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল সব এই জায়গাটায়।" সুধাংশু স্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহের দায়িত্বটা পালন করলেন। তাঁর ধারণা, কলকাতার কোথায় কী রয়েছে সেটা মেয়েদের জেনে রাখা দরকার। উমা ঝুঁকে জানলা দিয়ে তাকালেন ডান দিকে, আর পাঁচটা অপরিচ্ছন্ন, ভাঙাচোরা বড় রাস্তার মতো কলকাতার একটা ট্রাম রাস্তা দেখলেন মাত্র।

মিহির এখনও পর্যন্ত চুপচাপ, তার বন্ধুটিও। উমার মনে হল, যার গাড়িতে চেপে যাচ্ছি, ভদ্রতা বা কৃতজ্ঞতাবশতও তার সঙ্গে কিছু কথা বলা উচিত।

"হ্যাঁ বাবা, তুমি কতদিন সমীরণের কাছে গান শিখছ?"

"বছর চারেক।" মিহির বলল।

আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে পুলিশ হাত তুলে রয়েছে। শেয়ালদার দিকে যাবার রাস্তাটা খোলা। মোড়টা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাওয়া দরকার, তাই সে উমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, "কতটা শিখেছ"-র উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারল না। রাস্তার দু'ধারের ফুটপাথে কাঁচা সবজি আনাজের বাজার বসেছে। উমার চোখ ইতিমধ্যে সেই দিকে নিবদ্ধ হল।

"অল্প দিনই শিখছি।" সামনে দাঁড়ানো বাস-এর পিছনে গাড়ি থামিয়ে মিহির বলল। গোটা পনেরো ওল-এর একটা টিলার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা উমাব কানে বোধহয় কথাটা ঢোকেনি। বকুলেরও কিছু জানার আছে তাই সে শুরু করল কথাবার্তা।

"রোজ শিখতে যাও?"

"হপ্তায় একদিন, রবিবার।"

"কতক্ষণ শেখান?"

"ঘণ্টাখানেক।"

"কত করে দাও?"

"মাসে দু'শো।"

বকুল চুপ করে রইল। মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব করে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস চেপে সিটে হেলান দিল। মেয়েটার বোধহয় আর সমীরণ মিত্রর কাছে শেখা হল না। হঠাৎ তার মনে হল, উমা নামের তার পাশের এই প্রৌঢ়া যদি অনুরোধ করে তা হলে সমীরণ কি তা ফেলতে পারবে? অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কেউ যদি অর্ধেক মাইনেতে শেখে তাতে সমীরণের মতো পয়সাওলার কিছু যাবে আসবে না।

কিন্তু সে পুরোপুরি হতাশও হচ্ছে না। সমীরণের চোখ দুটো যখন মালির মুখের দিকে তখন কি মুখটাই শুধু দেখছিল? আর ওর নজরের মধ্যে বার কয়েক যে-জিনিসটা ফুটে উঠছিল, মালির এই বয়সের বকুল বহু পুরুষের চোখে একদা তা দেখেছিল। বকুল সে-সব অগ্রাহ্য করেও শেষ পর্যন্ত দিলীপরঞ্জনের পুরনো মরিস মাইনরের, বাকপটুতার আর গৌরকান্তির কাছে হার মেনেছিল।

গাড়ি শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের দক্ষিণ দিকে এসে বাঁ দিকে ঘুরল। রেলব্রিজ পেরিয়ে এখন ঢুকেছে বেলেঘাটার ঘিঞ্জি রাস্তায়। গাড়িতে কথাবার্তা আর হচ্ছে না। বকুল বুঝতে পারছে না গাড়ির অন্যান্যরা মনে মনে এখন কী চিন্তা করছে? জুঁইয়ের মালা হাতে মেয়েটা ঠায় সামনের দিকে তাকিয়ে। কী ভাবছে সে জানে! সমীরণের চাহনির জবাবে ওর চোখ যে সংকেত পাঠাচ্ছিল বকুলের কাছে তার অর্থ খুবই স্বচ্ছ। আর সেইজন্যই সে অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। তবে মালি বোকা মেয়ে নয়, শুধু এইটাই তার ভরসা।

মিহিরের বন্ধু নেমে গেল রাসমণির মোড়ে। সুধাংশু হাত-পা শিথিল করে বসার সুযোগ পেয়ে মিহিরের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন।

"গাড়ি কতদিন চালাচ্ছেন?"

"আপনি নয় তুমি বলুন।"

"বেশ। কতদিন শিখেছ?"

"বারো-তেরো বছর।"

"খুবই অল্প বয়সেই। গাড়িটা তোমাদেরই?'

"হ্যাঁ। বাবার।"

"তোমার বাবা কী করেন?" পিছন থেকে উমা বললেন।

"আমাদের একটা প্রেস আছে। এন্টালিতে, বাড়ির কাছেই। পঞ্চান্ন বছর আগে বাবাই শুরু করেন, খুব অল্প বয়সে, ছোট্ট একটা ঘরে। অসম্ভব পরিশ্রম করে প্রেসটাকে বড় করেন। সাতটা ভাষায় কম্পোজ আর ছাপার কাজ হত।"

"এখন হয় না?" আবার উমার প্রশ্ন।

"হয় না কারণ সময় বদলেছে। একটু আগে আপনি বললেন, দিনকাল যে-ভাবে বদলেছে, টেকনোলজির ব্যাপারেও তাই। এত অবিশ্বাস্য উন্নতি ঘটে গেছে যে তার সঙ্গে তাল দিয়ে না চললে আপনি পিছিয়ে যাবেন। আমরাও পুরনো মেশিনপত্র বিক্রি করে পি টি এস কিনেছি, চার কালারের অফসেট মেশিন কিনেছি।"

"আমাদের অফিসেও পি টি এস-এ কম্পোজ হয়।" সুধাংশু এই বলে পিছনে মাথা ঘুরিয়ে উমাকে তারপর জানালেন, "টাইপরাইটারের মতো ছোট ছোট মেশিন। আগে যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরে লাইনো অপারেটররা কম্পোজ করত, পি টি এস-এ তা করতে হয় না। অনেক মেয়েও কাজ করে। একেবারে অফিসের টাইপিস্টের মতো কাজ। তবে ঘরটাকে ভীষণ ঠান্ডা রাখতে হয়, কম্পুটার আছে তো!"

সুধাংশুর মনে হল, এখন এর বেশি স্ত্রীকে আর কিছু তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। টেকনোলজির গূঢ় কাজকর্মের ব্যাপারগুলো মোটরগাড়ির থেকে বাড়িতে বসে জানিয়ে দেওয়াই ভাল। অবশ্য তার আগে পি টি এস সুপারভাইজারের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিতে হবে।

"আপনাদের প্রেসে কী কী ছাপা হয়?" প্রশ্নটা এল মালবিকার কাছ থেকে। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ তার এই কৌতূহলে একমাত্র অবাক হল বকুল।

গাড়ি তখন ফুলবাগান, কাঁকুড়গাছি ছাড়িয়ে উল্টোডাঙা মোড়ের কাছাকাছি। গাড়ি মন্থর করে, ট্র্যাফিক সামলাতে ব্যস্ত মিহির থেমে থেমে বলল, "অনেক কিছুই হয়। টেক্সট বই, গল্প, উপন্যাস, তার মলাট, ম্যাগাজিন, অফিসের ফর্ম, চালান, বিল, স্যুভেনির। আমাদের একটা বাইন্ডিং সেকশানও আছে।"

"কে দেখাশুনো করেন?" বকুলের প্রশ্ন।

"আমিই মেইনলি তবে বাবাই সব দেখেন। পঁচাত্তর বয়স কিন্তু রোজ দু'ঘণ্টা এসে বসেন।"

"ভাইবোন ক'টি?" উমা জানতে চাইলেন।

"দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। ভাই নেই। ছোটবোন আমেরিকায় পেনসিলভানিয়ায় ডক্টরেট করছে।"

'আমেরিকা' শব্দটা শুনেই গাড়িটা সমীহতায় তটস্থ হয়ে গেল। গাড়ি লেকটাউনে ঢুকল। মিহির বলল, "এখানকার রাস্তা কিন্তু আমি একদম চিনি না, পাতিপুকুর পর্যন্ত গাইড করতে হবে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, এই আর একটু এগিয়েই বাঁ দিকের রাস্তাটা।" সুধাংশু নড়েচড়ে সোজা হলেন।

দু'-তিনটি বাঁক ঘুরে সুধাংশুর নির্দেশমতো মিহির গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নেমে সে পিছনের দরজা খুলে ধরে রইল। উমা নামলেন এবং তার পিছনে বকুলও।

"এই আমাদের বাড়ি। ভেতরে এসো, এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যাও।" মিহিরকে বলে উমা বকুলের দিকেও তাকালেন।

"না মাসিমা আজ থাক।" মিহির নম্রভাবে জানাল। "বাড়িতে দিদি জামাইবাবুর আসার কথা, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আর একদিন এসে বরং চা খেয়ে যাব, বাড়ি তো চিনে গেলুম।"

"মিহির ওই যে বাড়িটা দেখছ", সুধাংশু তার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া প্রায়ান্ধকার সরু গলিটা লক্ষ্য করে আঙুল তুললেন। "ওই যে পর্দা দেওয়া জানলাটা, ওটাই সমীরণদের। ওখানেই ও থাকত, এখন থাকে ওর ভাইয়েরা, বাবা-মা তো অনেকদিনই গত হয়েছেন।"

সবাই গলিটার ভিতরে কিছুক্ষণ চোখ রাখল। এরপর উমা বললেন, "মিহিরের দেরি হয়ে যাবে, নয়তো বকুল আর মালবিকাকে বলতুম চা খেয়ে যেতে।"

বকুল সংকটে পড়ল। দ্রুত ভেবে নিল উমার সঙ্গে আলাপটাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলা দরকার এবং চা খেতে খেতে সেই কাজটা মসৃণভাবে করা যায়। মালিকে সামনের দিকে ঠেলে নাম করিয়ে দেওয়ার

জন্য উমা যদি অনুরোধ বা আবদার জানায় তা হলে সমীরণ কতটা তা রক্ষা করবে, সেটা সম্পর্কে কোনও দৃঢ় ধারণায় আপাতত সে আসতে পারেনি। তবে সমীরণের মাসিমার স্নেহের বোন হওয়ার জন্য অবশ্যই তাকে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সেই চেষ্টা এখন করতে গেলে গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফেরার এই সুযোগটা তাকে তা হলে হারাতে হবে।

সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সে নিমেষেই সিদ্ধান্ত দিল, মেয়ের ভবিষ্যৎ অনেক গুরুত্বপূর্ণ গাড়ি চড়ার থেকে।

"দিদির বাড়িতে প্রথমবার এসে বোন চা খাবে না তাই কি হয়?" বকুল চেষ্টা করল গদগদ স্বর গলায় আনার।

"মা।" মোটরের ভিতর থেকে মালবিকার তীব্রস্বর বেরিয়ে এল। "বাবা ন'টায় ফিরবে। এখন সাড়ে আটটা।"

"ও হ্ হ্ দেখেছ, একদমই ভুলে গিয়েছি। মালির বাবাকে ঘড়ি ধরে ন'টার সময় খেতে দিতে হয়। ডাক্তারের কড়া হুকুম, তারপর খাওয়াতে হয় ক্যাপসুল। না দিদি আজ থাক, আর একদিন এসে চা খেয়ে যাব।"

"অসুখবিসুখ?" উমা উদ্বেগ জানালেন, হঠাৎ পাওয়া বোনটিকে তাঁর মন্দ লাগেনি। মুখটি ভারী মিষ্টি, কথাবার্তাও তেমনি। কেমন যেন সরল আর ঘরোয়া ভাব পাচ্ছেন বকুলের মধ্যে।

"মাথায় বহুদিন ধরেই একটা যন্ত্রণা হয়। মাঝে মাঝে সেটা বাড়ে। ডাক্তার অনেক দেখানো হয়েছে কিন্তু কেউই ঠিক ধরতে পারছে না।" করুণ স্বরে বকুল বলল।

"এক্স রে করানো হয়েছে?" সুধাংশু জানতে চাইলেন।

"হয়েছে, কিছু পাওয়া যায়নি।"

"মা।" এবার মালবিকার স্বরে চাপা বিরক্তি।

মিহির চুপ করে শুধু দেখে ও শুনে যাচ্ছিল। এবার কুণ্ঠিত স্বরে সে বলল, "আমার কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"ওহ্ হ্ তাই তো! দেখেছ ভুলেই গেছি।" বকুল ব্যস্ত হয়ে গাড়িতে উঠল। মিহির দরজা বন্ধ করে গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এল। আর তারই মধ্যে মালবিকা চাপাস্বরে তার মাকে বলল, "কী আজেবাজে কথা বলে গেলে? দরকার কী এ-সব বলার?"

মিহির গাড়িতে উঠেছে। বকুল মেয়েকে উত্তর না দিয়ে জানলা দিয়ে হাত বার করে নাড়ল।

"এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের প্রথম রাস্তাটা ধরবে, তারপর সোজা গিয়ে যশোর রোড।" সুধাংশু জানিয়ে দিলেন মিহিরকে। সে মাথা কাত করে গাড়িকে প্রথম গিয়ারে দিল।

পঞ্চাশ-ষাট মিটার যাবার পরই মিহির শুনতে পেল মা ক্ষুব্ধ স্বরে মেয়েকে বলছে, "দরকার আছে কি না তা তুই বুঝবি না।"

"না বোঝার কী আছে?"

"আছে, আগে তুই মা হ তারপর বুঝবি মায়ের কী জ্বালা আব অশান্তি।"

"ডায়ালগ এখন থামাও তো। আমাকে নিয়ে তোমার কীসের অশান্তি হল শুনি? এখন চুপ করে থাকো।"

"তোর বাবার মতো যদি—", বকুলের কথা অর্ধ সমাপ্ত রয়ে গেল।

"আচ্ছা মিহিরবাবু, আপনি কি ফাংশানে গান করেন?"

মালবিকার প্রশ্নটা এল তার মায়ের কথা শেষ না হতেই।

"না।"

"চার বছর ধরে তা হলে কী শিখলেন?"

"বলতে পারেন কিছুই শিখিনি।"

"য়্যা!" এবার স্তম্ভিত বকুলের কণ্ঠস্বর, "চার বছরেও কিছু শিখতে পারলে না। তা হলে নাম করবে কবে?"

"নামটাম করার ইচ্ছা নিয়ে শিখছি না। প্রাচীন বাংলা গানের কথা আমার ভাল লাগে, বিশেষ করে

নিধুবাবুর গান। সমীরণদার কাছে গানের প্রচুর স্টক রয়েছে আমি তার থেকে কিছু কিছু তুলে নিচ্ছি।"
"তুলে নিয়ে কী করবেন?" মালবিকার জিজ্ঞাসা।
"গাইব, তবে পাঁচজনের সামনে নয়। নিজের মনেই গাইব।"
"অদ্ভুত তো!"
"অদ্ভুত কেন হবে?" বকুল মেয়ের কথার মৃদু প্রতিবাদ করল। "অনেকেই তো আপন মনে গায়। যার টাকার দরকার সে ফাংশান করে, ক্যাসেট করে—"
"থামো তো। সবাই শুধু টাকার জনাই গায় না।" ছোট্ট ধমকটা দিয়ে মালবিকা জুঁইয়ের গোড়েটা মায়ের নাকের কাছে ধরে বলল, "শুঁকে দ্যাখো, গন্ধটা কিন্তু ভারী মিষ্টি।"
"সমীরণ মিত্তিরের টাকার অভাব নেই। গাড়ি করেছেন, পার্ক সার্কাসে ফ্ল্যাট কিনছেন. গানের স্কুল থেকেও যথেষ্ট আয়। উনি এখন কি শুধু টাকার জন্যই গান?" মিহির আর জি কর হাসপাতাল পেরিয়ে খালের ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, "একটা জায়গায় উঠে গেলে আর তখন নামা যায় না। বলতে পারেন নেশার মতো তখন গান গাওয়াটা পেয়ে বসে।"
"ঠিক বলেছেন।" মালবিকা তারিফ না জানিয়ে পারল না।
বকুলের মনে হল, তাই যদি হয় তা হলে মালিকে তো ফ্রি-তেই স্পেশ্যালে ভরতি করে নিতে পারে!
"সমীরণের ওখানে মাইনেটা বড় বেশি।" কথাটা বলামাত্রই পাঁজরে একটা কনুইয়ের ধাক্কা পেল বেশ জোরেই।
"সমীরণবাবু বলো।" ফিসফিসিয়ে মালবিকা বলল।
"হ্যাঁ একটু বেশি, এটা ভিড় এড়াবার জন্য। আলাদা করে না শিখলে পঞ্চাশ টাকা।" গাড়িটাকে বাঁ দিকে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে ঢুকিয়ে মিহির চট করে একবার পিছনের সিটের দিকে তাকিয়ে নিয়ে যোগ করল, "আপনাদের কাছে দু'শো চাইবেন না।"
"কেন", মালবিকা উত্তর দাবি করল। মিহির উত্তর দিল না, শুধু তার মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেল।
"এ-কথা বললেন কেন?" মালবিকার স্বর এবার কৌতূহলে নরম।
"সমীরণদা ভাল গলা পেলে আর যদি সুন্দরী হয় তা হলে কমেতেও শেখান।"
"এখানে এখানে, এই বাঁ দিকের রাস্তাটায়।"
বকুলের ব্যস্ত গলা মিহিরকে ব্রেক কষাল। দেশবন্ধু পার্কটা তারা ছাড়িয়ে এসেছে। পাশাপাশি দুটো মোটর যাবার মতো একটা রাস্তা বাঁ দিকে।
"আপনি ভালই কথা বলতে পারেন।"
মিহির পুরো মুখ ফিরিয়ে মালবিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যবসা করে খাই তো।"
"আপনার বাড়িতে সত্যিসত্যিই কি দিদি জামাইবাবু আসার কথা?"
"দিদি কাল এসেছে। জামাইবাবুর আসার কথা নেই।"
"তা হলে মিথ্যে কথা?"
"বলেইছি তো ব্যবসা করে খাই। আমার তখন চা খাবার ইচ্ছে ছিল না। সে-কথা না বলে এই কথাটা বললুম, একই ব্যাপার।"
"এই যে, এই যে।"
বকুলের কথায় মিহির গাড়ি দাঁড় করাল একটা লোহার ফটকের সামনে। ফটকের ধারেই রাস্তার ইলেকট্রিক ল্যাম্প পোস্ট। জায়গাটায় যথেষ্ট আলো। ফটক থেকে সোজা একটা পথ ভিতরে গেছে। তার শেষে একটা কাঠের পাল্লা দেওয়া মোটর গ্যারেজ। বাড়িটা পথের ডান দিকে। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল মিহির। ওরা দু'জনও নেমেছে।
"কী দেখছেন? খুব পুরনো বাড়ি, দেড়শো বছর বয়স। একতলার দেয়ালগুলো আমার হাতের দু' হাত চওড়া।" মালবিকা তার দু' হাতের আঙুলের ডগা বেঁকিয়ে হাতটা সমান্তরাল করে দেখাল।
"আমাদের বাড়ির দেয়াল আড়াই হাত চওড়া। দিদিদের শ্বশুরবাড়ির দেয়ালও তাই।"

বকুল বাড়ির দোতলার বারান্দা আর খড়খড়ি দেওয়া জানলাগুলোর দিকে দু'-তিনবার তাকাল। ট্যাক্সিতে নয় একটা প্রাইভেট গাড়িতে চড়ে এসেছে অথচ বাড়ির কেউ সেটা দেখল না তা তো হতে পারে না।

"আচ্ছা, সমীরণবাবু মালিকে কী টেস্ট করবে বলতে পারো?" বকুল রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করল, গাড়িটাকে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য। খড়খড়ি তুলে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখবে আর সারা বাড়িতে চাউর করবে, এটাই সে এখন চায়।

"একটা দুটো গান গাওয়াবেন, তাল টাল নিয়ে দু'-চারটে প্রশ্ন করবেন—"

"তাল! মালি তুই জানিস তো?" বকুল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। "তবলার সঙ্গে তো ও গান শেখেনি।"

"আমাদের বাড়িতে তবলা নেই। তবলার আওয়াজ আমার জ্যাঠারা পছন্দ করেন না।" মালবিকার স্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষ।

"অনেকটা আমার বাবার মতোই। উনি গানবাজনাটাই পছন্দ করেন না, অথচ মা করেন।"

"তা হলে আপনি যে শিখছেন?"

"বাবা জানে না। বাড়ির সামনেই আমাদের পুরনো প্রেসবাড়িটা। ওর তিনতলায় পিছন দিকে একটা ঘরে সময় পেলে বসি। আচ্ছা মাসিমা এবার আমি যাব।"

হেলমেট পরা একজন স্কুটারে বসে ফটক দিয়ে ঢোকার সময় তাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে গেল। বকুল হাঁফ ছাড়ল। তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। ভটু নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে বলবে, দেখলুম ছোটকাকিমা আর মালি মোটরে কোথা থেকে যেন ফিরল।

"তুমি তো বাবা চা খাও না, নইলে বলতুম একটু বসে গিয়ে এককাপ চা খাওয়ার জন্য।"

"আর একদিন এসে খেয়ে যাব মাসিমা।"

"এটা কি ব্যবসাদারের কথা?" মালবিকা ঠোঁট ছড়িয়ে দিল। তার মনে হয়েছে, অতি সাধারণ দর্শন এই যুবকটি রসিকতা যখন করতে পারে তখন নিতেও পারে।

"এতে একটুও ব্যবসা নেই। আবার তো দেখা হচ্ছে সমীরণদার ওখানে, তখন নয় চা খাওয়ার দিন ঠিক করে নোব।"

"তুমি কি বাবা টেস্টের সময় থাকবে?" বকুল আর একবার উদ্বিগ্ন হল।

"বলেন যদি থাকব, তবে সমীরণদা ওকে নিয়ে নেবেন।"

"তুমি থেকো বাবা! আর মাইনের ব্যাপারটা, কমসম করবে কি?"

"বলে দেখুন না। আপনারা শনিবার দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ যাবেন।"

মিহির গাড়িতে উঠল। বকুল মালবিকা ফটকের দিকে এগোল। গাড়িতে স্টার্ট সবে দিয়ে মিহির দেখল, মালবিকা দ্রুত তার দিকে আসছে।

"কী ব্যাপার!"

জানলায় মাথা ঝুঁকিয়ে চাপা স্বরে মালবিকা বলল, "আচ্ছা তখন একটা কথা বললেন, সমীরণদা ভাল গলা আর সুন্দরী হলে কমেতে শেখান, এ-কথা কেন বললেন?"

"কেন মিথ্যে বলেছি নাকি? আপনি সুন্দরী নন?"

মালবিকাকে এই প্রথম, প্রায় অপরিচিত একজন, আচমকা সুন্দরী বলল। রমণীয়ভাবে সে অপ্রতিভ বোধ করল।

"বেশ তাই নয় হলুম কিন্তু আমার গলা ভাল এটা জানলেন কী করে? আমি তো কখনও আপনার সামনে গাইনি।"

"এটা নিছকই অনুমান করে বললুম। গলা আপনার হেঁড়ে নয় আর আপনি গান শেখায় আগ্রহী, ব্যস। ভাল গাইয়ে হওয়ার জন্য এটাই তো যথেষ্ট।"

রিভার্স গিয়ার দিয়ে মিহির ক্লাচ ছেড়ে দিল। গাড়ি পিছু হটে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মালবিকা তাকিয়ে রইল।

"ছেলেটার পয়সাকড়ি আছে, বড়লোক, মনটাও ভাল।"

মালবিকা প্রায় চমকে উঠে পিছনে তাকাল। বকুল কখন যেন তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

"তাতে কী হল, অত্যন্ত বেঁটে।"
"তাতেই বা কী হল! টাকার উপর দাঁড়ালেই লম্বা হয়ে যায়।"
"কিছুই হয় না, চলো ভেতরে যাই। ওর ঘাড়ে, গেঞ্জির গলার কাছে বোতামের সাইজের একটা সাদা স্পট দেখলুম, বোধহয় শ্বেতি।"

যে ঘটনাটার কথা বলা হবে তাতে মিহিরেরও একটা বড় অংশ আছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবকটি লোকেরই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা এতক্ষণ করলাম। ঘটনাটি ঘটবে কিন্তু বিরানব্বই সালের ছয় ডিসেম্বর। দিনটা ছিল রবিবার। সুধাংশু গাঙ্গুলি সেদিনই বাজারে গিয়ে চার ইঞ্চি সাইজের হাফ কেজি চিংড়ি কিনে ফেলবেন।

কিন্তু এখন মা ও মেয়ে প্রসন্ন ও কিঞ্চিৎ উত্তেজিত মনে বাড়িতে ঢুকল। দোতলায় উঠেই সিঁড়ির মুখে দেখা হল বকুলের বড়জা পার্বতীর সঙ্গে। বয়স ষাটের কাছাকাছি। স্থূলকায়া, রাশভারী চালচলন, কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেন হাঁড়ি আলাদা হলেও এই পরিবারের তিনিই প্রধানা।

"কীসের মালা রে?"

"দিদি, ওকে সমীরণ মিত্র নিজের হাতে দিয়েছে।" বকুলের চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"কে সমীরণ মিত্র?" পার্বতী স্থির ঠান্ডা চোখে ও গলায় বুঝিয়ে দিলেন নামটা এই প্রথম শুনলেন। বকুল বাকরহিত হয়ে রইল।

"গান করেন। খুব নাম এখন।" মালবিকা জানিয়ে দিল।

"অ। তোকে মালা দিল কেন, চেনে?"

"আজই প্রথম আলাপ হল। মহাজাতি সদনে একটা ফাংশান ছিল, আমি আর মালি শুনতে গেছলুম। সেখানে আমার এক দিদি গান হয়ে যাবার পর আমাদের গ্রিনরুমে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতেই কী ভেবে জানি না মালিকে উনি মালাটা উপহার দিলেন!" এক নিশ্বাসে বকুল কথাগুলো বলল। "আমি তো অবাক। পরিচয় হতে না হতেই... আর বললেন, আমার গানের স্কুলে এসো, স্পেশাল ক্লাসে গান শেখাব।"

"ভাল।" পার্বতী পাশ কাটিয়ে নেমে গেলেন।

বকুলের শেষের কথাটা সেজজা অর্চনা শুনতে পায় ঘর থেকে। বেরিয়ে এসে সে ডাকল বকুলকে।

"মালি গান শিখবে বুঝি সমীরণ মিত্তিরের কাছে?"

"হ্যাঁ। স্পেশালে শেখাবে... শেখাবেন।"

"কত করে নেবে?"

"ওইটেই তো সেজদি মুশকিলে ফেলেছে... দুউউশো! তোমার দেওরকে তো জানোই, মাসে মাসে এতগুল্লো টাকা বাড়তি খরচ!"

"নামী লোকের কাছে গান শেখাতে গেলে খরচ তো করতেই হবে। অবুকে ভাবছি ভাল কারুর কাছে শিখতে দেব, তুমি একটু দ্যাখো না?"

অর্চনার অনুরোধটা অনুনয়ের ধার ঘেঁষে গেল। ঘর থেকে অবু অর্থাৎ অবন্তি এইসময় বেরিয়ে এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। বিয়ের এগারো বছর পর বহু ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে ঠাকুর দেবতার দোর ধরে মানত করে অর্চনার অবশেষে কন্যালাভ হয়। অবু মায়ের মতোই কৃশ, লম্বা, বছর বারো বয়স। মুখটি খুবই মিষ্টি। এরই গানের শিক্ষিকার কাছে মালবিকা কিছুকাল গান শিখেছে।

বকুল দ্রুত চিন্তা করে নিল: সেজদির ঘরে ফোন আছে। যদিও আজ পর্যন্ত তাকে ফোন করতে বা ধরতে ওই ঘরে যেতে হয়নি কিন্তু এবার যদি কেউ তাকে করে? উমা বা মিহির কিংবা কোনও কারণে সমীরণ মিত্র যদি তাকে বা মালিকে ফোনে ডাকে? কাউকে ডেকে ফোন দেওয়ার ব্যাপারে তার এই সেজজা-টি খুবই বিরক্ত হয়। বহু সময় বলে দেয়, 'বাড়ি নেই।' এ-জন্য তো বটেই তা ছাড়া এই বাড়িতে পুরুষ-মেয়ে মিলিয়ে সবার মধ্যে অর্চনাই একমাত্র এম. এ, দর্শন শাস্ত্রে। তাকে সবার অপছন্দের অন্যতম কারণ, এই তথ্যটি সুযোগ পেলেই সে জানিয়ে দেয়। বড়জা পার্বতীও তাকে এড়িয়ে চলেন। সেজভাসুর কেমিক্যালসের ব্যবসায়ী, রোজগার ভাল।

সেজজা-কে হাতে রাখা দরকার, বকুলের দ্রুত চিন্তার সেটাই শেষ কথা। "নিশ্চয় বলব সেজদি। এখনও তো অবুর গলা তেমন তৈরি হয়নি, ওকে স্পেশালে দেবার দরকার কী? পঞ্চাশ টাকার ক্লাসে ভরতি করিয়ে দাও না। ওখানেও খুব মন দিয়ে শেখায়। তবে এত ভিড় যে নতুন ভরতি করছে কি না জানতে হবে।"

"তবু দ্যাখো না একবার। গুণী লোকের কাছে প্রথম থেকেই শেখা ভাল।"

বকুল তিনতলায় যাবার সিঁড়িতে যখন পা রেখেছে পিছন থেকে তখন অর্চনা বলল, "তুমি কার গাড়িতে এলে গো?"

"তোমায় কে বলল?" বকুল প্রশ্নটা পেয়ে খুশি হল।

"শুনলুম ভটু বড়দিকে বলছিল ছোটকাকি মোটরে করে বাড়ি এল।"

"এই দ্যাখো, সামান্য একটা ব্যাপার সেটাও বাড়িতে খবর হয়ে গেল। আচ্ছা সব লোক বাবা! সমীরণ তো, ইয়ে সমীরণবাবু তো তাঁর নিজের খাবারের প্লেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'সবই আপনার। শেষ করতেই হবে।" এই অ্যাত্তো বড় বড় তিন টাকা চার টাকা দামের গোটা ছয়েক মিষ্টি।' হাত দিয়ে মিষ্টির আকার দেখাবার সময় সে আড়চোখে একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। মালবিকার মুখের বিরক্তি সে গ্রাহ্য করল না।

"তা দু'জনে মিলে তো শেষ করলুম। লোকটা কী ভদ্র আর বিনয়ী দ্যাখো সেজদি। এই তো সবে প্রথম আলাপ, তারপর বলল... বললেন, 'আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে আমার এক ছাত্র।' ছেলেটির নাম মিহির, দু'শো টাকা দিয়ে গান শেখে। বিরাট প্রেসের মালিক। কলকাতায় সাত-আটটা বাড়ি, গাড়িই দু'খানা, এক বোন আমেরিকায় ডাক্তারি করছে। খুবই শিক্ষিত, গান শিখছে শখ করে। দিদিকে পাতিপুকুরে পৌঁছে দিয়ে সে আমাদের নামিয়ে দিল।"

"তোমার দিদি আছে জানতাম না তো!"

"বলিনি, পিসতুতো দিদি। আমার কে কোথায় আছে সে খবর তো এ বাড়ির কেউ জানতে চায় না, তাই আর বলিও না।" বকুলের চোখেমুখে সামান্য অভিমান ফুটে উঠল। "দিদি একবার ফোন নম্বর চেয়েছিল আমি বলেছিলুম আমাদের বাড়িতে ফোনটোন নেই।"

"সে কী, নেই বললে কেন?" অর্চনা বিব্রত হল, বাড়িতে টেলিফোন নেই, এমন এক লজ্জাজনক মিথ্যা খবর ছোটজায়ের পিসতুতো দিদির কাছে পৌঁছে গেছে, এতে সে ক্ষুব্ধ হল। "এক্ষুনি ওনাকে ফোন করে আমার নম্বরটা বলে দাও।"

ফাঁপরে পড়ল বকুল। উমার বাড়িতে ফোন আছে কি না সেটা তার জেনে নেওয়া হয়নি। মায়ের মুখ দেখেই মালবিকা বুঝে নিল বাড়াবাড়িটা রাশছাড়া হয়ে গেছে।

"মাসির বাড়িতে ফোন করবে কি, আজ এগারো দিন হল ডেড হয়ে রয়েছে না? তুমি তা হলে তখন শুনলে কী?" মালবিকা মাকে ছোট্ট ধমক দিল। "এখন চলো, বাবা এসে পড়বে।"

"হ্যাঁ চল। সেজদি, আমি অবুর কথা বলব।"

তালা খুলে ঘরে পা দিয়েই বকুল সিল্কের শাড়ি খুলতে খুলতে বলল, "মালি, চট করে রুটিগুলো বেলে দে। দেরি হয়ে গেছে বড্ড।"

শাড়িটা খাটের উপর ছুড়ে দিয়েই সে আলনা থেকে আধময়লা তাঁতের শাড়ি তুলে নিল। ঘরের উত্তরের দেয়ালে মালবিকার ছোট্ট ঘরটার দরজা। দরজায় এসে উঁকি দিল বকুল। মালবিকা জুঁইয়ের গোড়েটা তার বালিশের উপর বিছিয়ে রাখছে। ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত স্বরে বকুল বলল, "আদিখ্যেতা এখন রাখ। আটা মাখাই আছে, বেলে দে, আমি তাড়াতাড়ি রুটি করে ফেলছি। ইস্‌স্ বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

দু'বেলার রান্না সকালেই সেরে রাখে। রাতে শুধু রুটি করা, আর রান্নাগুলো গরম করে নেওয়া। ঘরের বাইরের বারান্দা দিয়ে যেতে হয় রান্নাঘরে ও কলঘরে। মা ও মেয়ে দু'জনেই যখন রান্নাঘরে তখন শোবার ঘর থেকে দিলীপরঞ্জনের ডাক শোনা গেল।

"শুনে আয় তো কেন ডাকছে।"

"তুমি যাও, আমি এগুলো করে ফেলছি। আর মাইনের কথাটা বোলো। দু'শো টাকা শুনেই যেন না লাফিয়ে ওঠে।"

বকুল শোবার ঘরে ঢোকামাত্র খাটে পা ঝুলিয়ে পাজামা পরা, খালি গায়ে বসা দিলীপরঞ্জনের চোখ কুঁচকে গেল। চাপা গলায় সে বলল, "গাড়িটা কার?"

"কার মানে!" বকুল বুঝে উঠতে পারল না প্রশ্নের আড়ালে কী জমা রয়েছে।

"কার মানে কার। এর থেকে সোজা বাংলা আর কী হতে পারে। কার গাড়িতে চেপে এলে?"

"তোমাকে তো বলেই ছিলুম, মায়া আর তার বর অফিসের ফাংশান দেখতে যাবে না বলে কার্ড দুটো আমাদের—।"

বকুলকে থামিয়ে দিয়ে দিলীপরঞ্জন বলল, "কার্ডের কথা নয় গাড়ির কথা জানতে চেয়েছি।" কিছুক্ষণ বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে আবার বলল, "ছোকরা কে, যার গাড়ি চড়ে এলে?"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি। মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলুম। দেখলুম গাড়িটা ঢুকল গলিতে। দূর থেকে দেখলুম খুব গল্প হচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা কী?"

বকুলের মনে হল তার স্বামী অল্পই খেয়ে এসেছে। এখন আর টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই, দেশি চোলাই দিয়েই নেশাকে সন্তুষ্ট রাখে। খুব বেশি খেয়ে দিলীপরঞ্জন তিনতলা পর্যন্ত টলমল অবস্থায় পৌঁছে গেলে বকুলের উদ্বেগ ও শারীরিক যাতনাটা কিছু কমে। নিয়ন্ত্রণ হারানো দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে, ঠেলেঠুলে খাটের উপর ফেলে দিতে পারলেই কাজ চুকে যায়। এতে মালিও তাকে সাহায্য করে।

কিন্তু অল্প খেয়ে সামান্য নেশা নিয়ে বদমেজাজ তৈরি করে ফিরলে বকুল প্রমাদ গনে। আজও সে প্রমাদ গুনল।

"নিজে মোটরে চড়ছ চড়ো, আমার এখন তো আর মোটর নেই, অন্যের মোটরে তো চড়বেই। তাই বলে মেয়েটাকে চড়তে শেখাচ্ছ কেন?" দিলীপরঞ্জনের ধীরে ধীরে শান্ত কঠিন গলায় বলা কথাগুলো বকুলের রক্ত হিম করে দিল। নিশ্চয় পুরনো কথা তুলে চিৎকার করবে।

"ফাংশানে সমীরণ মিত্রের সঙ্গে একজন আলাপ করিয়ে দিল, তিনিই তাঁর এক ছাত্রকে গাড়ি করে আমাদের পৌঁছে দিতে বললেন, এঁদের কাউকেই কখনও আগে দেখিনি, আলাপও ছিল না। বিশ্বাস করো।" বকুল ক্ষমাপ্রার্থীর মতো স্বরে বলল।

"চোখে দ্যাখোনি, আলাপও ছিল না আর অমনি অমনি সমীরণ মিত্তির গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল? কেন? তার কীসের অত আঠা যে মা আর মেয়েকে দেখেই রসে চপচপে হয়ে পড়ল।

বকুল এ-সব কথার কী জবাব দেবে। সে চুপ করে রইল। রান্নাঘরে মালি রুটি সেঁকছে না বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছে, সেটাই তাকে ভাবনায় ফেলল। স্বামী বহুদিন, বহুভাবে মেয়ের সামনে তাকে হেনস্থা করেছে, মারধোরও। কিন্তু মালি এখন উনিশ বছরের। এ-সব এখন বন্ধ করা উচিত। বয়স্ক বাবা-মার কুৎসিত কথাবার্তা আচরণের প্রভাব যতটুকু মালির উপর পড়েছে তাতেই ওর যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু আর এটাকে বাড়তে দেওয়া যায় না।

কিন্তু কী করে সে বন্ধ করবে। তার অত ক্ষমতা কোথায়? সে তো স্বামীর হাততোলা! পালটা সে-ও যদি চিৎকার করে? তাতে তার স্বামী লজ্জা পাবে না, মুখও বন্ধ করবে না। বরং সারা বাড়ি তার বিরুদ্ধে যাবে। এই বাড়িতে সে বাইরের লোক। মারধোর করলে পালটা মার দেবে? তার অত গায়ের জোর কোথায়? বরং বাধা না দিয়ে মার খেলে অল্পক্ষণেই তার স্বামীর প্রহারের উৎসাহটা কমে যায়।

কোনও কোনও গভীর রাতে চেতনায় অপমান আর শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে বেঘোরে ঘুমোনো স্বামীর পাশে শুয়ে বকুল তার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে, 'আমাকে বিধবা করে দাও। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আর কোনও উপায় আমার সামনে নেই।' মনে মনে সে বহুবার তার স্বামীর মৃতদেহ দেখেছে। বাসের তলায়, জলে ডুবে, সাপের কামড়ে, চারতলার ছাদ থেকে পড়ে, ভেজাল চোলাই খেয়ে দিলীপরঞ্জন মারা যাচ্ছে, এমন ছবি তার চোখে ভেসে উঠেছে। দেখতে দেখতে উত্তেজিত মাথা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে ভয়ে কাঁটা হয়ে তারপর ভেবেছে, আমার আর মালির তখন কী হবে? আমাদের খাওয়াবে পরাবে কে? দিন চলবে কী করে? ভাসুরদের দয়ায়? সংসারে ঝি হয়ে?

বেঁচে যাওয়ার একমাত্র উপায় হিসাবে অতঃপর সে দেখতে পায় নিজের মেয়েকে। যদি তার মেয়ে রোজগার করতে পারে সে ঠিক করে রাখল, তা হলে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে এই বাড়ি ছেড়ে।

কখনও না কখনও তার দিন আসবেই, এই চিন্তাটাই তাকে আশা দিয়ে সব অত্যাচার সহ্য করিয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে যে লক্ষ্যপূরণ হবে সে সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। মালবিকার লেখাপড়ায় মাথা নেই কিন্তু সুন্দর একটা গানের গলা আছে। এই সংক্ষিপ্ত জানাটুকুর সঙ্গে তার বাস্তববোধ যুক্ত করে সে বুঝেছে, গান ছাড়া তার মেয়ের বড় হয়ে ওঠার মতো আর কোনও সঙ্গতি নেই। অপ্রত্যাশিতভাবে সমীরণ মিত্রর সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়াটাকে সে ভগবানের দান হিসাবে গণ্য করেছে। এই দান সে দু'হাতে আঁকড়ে ধরবে, সে-জন্য যত অত্যাচার সহ্য করতে হয় সে করবে।

বকুল ও দিলীপরঞ্জনের মধ্যে কথাবার্তার মাঝে, কাহিনীর প্রবাহ বন্ধ করে এত যে কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হল, তার কারণটি খুবই প্রাঞ্জল। বকুল তার অসহায় অস্তিত্বের মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং মেয়েকে কোথাও একটা শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে নিজে ভেসে থাকতে চাইছে। এই দুই বিপরীত অবস্থার সংঘাত তার মধ্যে আলোড়ন তুলছে এবং তার ফলে তার আচরণে ও কথায় মরিয়া ভাব এসে যাওয়া যে স্বাভাবিকই, সেই কথাটাই বলে দেওয়া হল।

দিলীপরঞ্জন যখন তাকে বলল, 'তার কীসের অত আঠা যে মা আর মেয়েকে দেখেই রসে চপচপে হয়ে পড়ল!' তখন বকুলের দীন করুণ ভাবটা নিমেষে বদলে কঠিন হয়ে উঠল।

"কেউ যদি আমাদের দেখে চপচপে হয়, তা হলে আমরা কী করতে পারি।"

"কী করতে পারি মানে?" ধমক দিয়ে উঠল দিলীপরঞ্জন। "তুমি কি জানো লোকটা কেমন? জানো না বোলো না, বহু লোক একসময় চরিয়েছ লোক চেনো না বোলো না। সমীরণ মিত্তির একের নম্বরের ক্যারেক্টারলেস, শুয়োরের বাচ্চা, অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে। ওর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। বউ তো দু'বার ওকে ছেড়ে চলে গেছল। ওর এক ছাত্রী রেপিংচার্জ এনেছিল ওর নামে, পুলিশকে খাইয়ে শেষ পর্যন্ত কেস ভণ্ডুল করে দেয়। লম্পট মাতাল কোথাকার।" খাট থেকে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল দিলীপরঞ্জন। ঘৃণায় তার মুখের পেশি বিকৃত।

"তুমি অন্য লোককে মাতাল বলো কী করে? তোমার নামেও তো ঘুষ নেওয়ার চার্জ তোমার অফিস এনেছিল। তুমিও তো গাড়িটা বিক্রি করে টাকা খাইয়ে চাকরি বাঁচিয়েছ।" বকুল জানে তার কথার প্রতিক্রিয়াটা মারাত্মকভাবে হবে। তাই হোক, তবু সে আজ কথা বলবে।

দিলীপরঞ্জন অদ্ভুত চোখে তার বউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। দরজায় দাঁড়িয়ে মালবিকা বলল, "খাবার গরম করেছি, দিয়ে যাব?"

"নিয়ায়।" বকুল উঠে গেল একধারের দেয়াল ঘেঁষে রাখা টেবলটায়। শোবার ঘরের মধ্যেই তাদের খাওয়া সারতে হয়। একসময় যে ঘরে তারা খেত সেটা এখন মালবিকার ঘর।

"সমীরণের হয়ে ওকালতি করছ যে, ব্যাপাব কী?"

"কোথায় আবার ওকালতি করলুম!"

"আমি মদ খাই ঠিকই কিন্তু পরের বউ-মেয়ের দিকে হাত বাড়াই না। ও আর আমি এক জিনিস নই।"

. দুটো বড় বাটিতে ডাল আর ডিমের ঝোল হাতে নিয়ে মালবিকা ঘরে ঢুকে টেবলে রেখে বেরিয়ে গেল। বেরোবার সময় একবার বাবার মুখের দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, তুমি শুধু নিজের বউয়ের দিকেই হাত বাড়াও, তফাতটা শুধু এই।"

"চুপ কর হারামজাদি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব।"

দিলীপরঞ্জন দু'পা এগিয়ে গেল। বকুল একপা পিছিয়ে চেয়ারের পিঠ আঁকড়ে ধরল। সে খুন দেখতে পাচ্ছে স্বামীর চোখে। বোকার মতো কথাটা সে বলে ফেলেছে তো বটেই। মালির গান শেখার জন্য টাকা এই লোকটার কাছ থেকেই পেতে হবে।

"আমাকে গালাগাল দিয়ে, মারধোর করে তুমি যেন কী একটা জ্বালা জুড়োও, কীসের জ্বালা?"

একটা ডেকচিতে রুটি নিয়ে মালবিকা আবার ঘরে এল। টেবলের উপর সেটা রেখে বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি।"

"এই হচ্ছে আমার আর-একটা জ্বালা।" দিলীপরঞ্জন দাঁত চেপে আঙুল তুলে মালবিকার ঘরের দরজাটা দেখাল। "মায়ের থেকেও এককাঠি ওপরে যাবে।"

"যাক না। মায়ের মতো ভুল যদি না করে—"

"কীসের ভুল? ভুল তো আমি করেছি।" দিলীপরঞ্জন দু'হাতে বকুলের কাঁধ আঁকড়ে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে শাড়ির আঁচলটাকে টেনে মেঝের উপর ফেলে দিল।

বকুল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। স্বামীকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টা তার মধ্যে নেই। আঁচলটাও কাঁধের উপর তুলল না। দিলীপরঞ্জন কর্কশ দৃষ্টিতে বকুলের বুকের উপর চোখ রেখে বলল, "সমীরণকে পটাবার জন্য দেখছি খুব তুলে দিয়েছ, বুঝি না কিছু ভেবেছ?"

এইসব কথা বকুলের কাছে নতুন নয়। দিলীপরঞ্জন একদিন একটু মত্ত হয়ে দু'হাতে ব্লাউজের গলা ধরে হ্যাঁচকা টানে হুকগুলো ছিঁড়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর হেসে উঠে হাঁ করে একটা স্তন মুখে পুরে জোরে কামড়ে ধরে। বকুল চিৎকার করে উঠতে গিয়েও করেনি, পাশের ঘর থেকে মেয়ে তা হলে বেরিয়ে আসবে। এখন তার মনে হচ্ছে দিলীপরঞ্জন ওই রকম কিছু একটা করতে চাইলে এতক্ষণে তা করে ফেলত। করেনি যখন তার মানে নেশার ঘোরটা কেটে গেছে।

"আমি তো বলেইছি, সমীরণের সঙ্গে আলাপ হবে তা আমি জানতুমই না। হঠাৎ-ই হয়ে গেল।"

"আর অমনি মুখখানি দেখেই গাড়িতে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দিল!"

"ওঁর এক ছাত্রর এদিকেই বাড়ি। তাকে বললেন আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে। আমি ঠিক করেছি মালিকে ওঁর কাছে গান শেখাব।" কথা বলতে বলতে বকুল আঁচলটা তুলে নিল। টেবলে গিয়ে থালা পেতে ডেকচি থেকে ঢাকনা তুলে বলল, "ক'টা রুটি দোব?"

"ওই দুশ্চরিত্রের কাছে মেয়েকে গান শিখতে পাঠাবে?"

"আমার তো মনে হল উনি ভদ্রলোক।"

"ভদ্দরলোকের তুমি কী জানো? ক'টা ভদ্দরলোক তুমি আজ পর্যন্ত দেখেছ?"

"একজনকেও নয়।" বকুল চারখানা রুটি থালায় রাখল। দিলীপরঞ্জন এক ঝটকায় থালাটা মেঝেয় ফেলে দিল।

"আমাকে অপমান করার সাহস কোথায় পেলে?"

মেঝে থেকে থালা আর রুটি টেবলে রেখে বকুল বলল, "খাওয়ার ইচ্ছে আছে না নেই?"

"আগে আমার কথা জবাব দাও।"

"মালিকে আমি সমীরণ মিত্রের কাছে গান শেখাব। ওকে বড় করব, পাঁচজনের একজন হবে, ভাল বিয়ে দেব। আমার মতো দুর্ভাগ্য যাতে ওর না হয় সে-জন্য আমি সব করব, সব করব, সব করব", দাঁত চেপে, দু'হাতের মুঠো ঝাঁকিয়ে বকুল জানিয়ে দিল সে বদ্ধপরিকর।

দিলীপরঞ্জন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল তার বউয়ের দিকে। বকুলের এমন মূর্তি কখনও সে দেখেনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল, "খেতে দাও।"

টেবলে দু'হাত রেখে দিলীপরঞ্জন গোঁজ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, "টাকা আমি দোব না।"

"লোকের বাড়ি বাসন মেজে আমি টাকা তুলব।"

"তাই কোরো।"

পরদিন সকালে মালবিকা তার মাকে জানাল, "বাবার টাকার দরকার নেই, তোমাকেও বাসন মাজতে হবে না। গান আমি শিখব না।"

কিন্তু বকুল ও মালবিকা শনিবার সকাল দশটায় সমীরণ মিত্রর বাড়িতে পৌঁছল। একতলায় স্কুল, দোতলায় সে স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে থাকে। সকালে স্কুল বসে না। একতলার দুটো ঘরে তালা দেওয়া। ওরা দোতলায় উঠে এল।

সিঁড়ি থেকেই সামনে একটা ঘর। বড় বড় গোলাপ ফুলের প্রিন্ট করা ভারী পর্দা দরজায়। ডান দিকে দালান চলে গেছে। সেখানেও পরপর দুটো খোলা দরজায় একই প্রিন্টের হলুদ আর আসমানি রঙের পর্দা ঝুলছে। বকুল সামনের ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। ঘরে একমাত্র লম্বা সোফাটায় জড়সড় হয়ে দুটি লোক বসে। বকুলকে দেখেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করল। বকুল হতভম্ব।

চট করে ঘরের চারপাশটা সে দেখে নিল। আর কেউ নেই। বেশ বড়ই ঘর। তিনটে ফোম রাবার

আসনের বেতের চেয়ার, বেতের সেন্টার টেবল। দেয়ালে সোনালি পাড় দেওয়া গোল একটা ঘড়ি, যার কাঁটা দুটি রুপালি। ঘরের আধখানা জুড়ে শতরঞ্জির উপর সাদা চাদর, তাতে দুটি গেরুয়া ওয়াড় দেওয়া মোটা তাকিয়া। হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, তানপুরা, অ্যাশট্রে। নিরাভরণ, অগোছালো, অযত্নে রাখা। দেয়ালে দু'-তিন জায়গায় পলেস্তারা ফাটা। মেঝে থেকে এক মানুষ সমান লম্বা জানলা, যার তলার অর্ধেকটার খড়খড়ি দেওয়ালে আঁটা, খোলা যায় না। উপরের ভাগের পাল্লা হেলে পড়েছে কবজা থেকে, বহুকাল জানলায় রং করা হয়নি। এমন এক বিমর্ষকর ঘরে খুবই বেমানান লাগে এক ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ীর বিরাট ক্যালেন্ডারটা। উজ্জ্বল হাসিভরা দুটি শিশু লোমশ একটা কুকুর ছানা নিয়ে বাগানে খেলছে, অবশ্যই একটা ট্রানজিস্টর ঘাসের উপর রাখা। নতুন সিলিং ফ্যানটাও কড়িকাঠের সঙ্গে খাপ খায় না।

লোক দুটিকে কী বলবে বকুল ভেবে পেল না। মালবিকাই এই অপ্রতিভকর অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করল।

"আমরাও কিন্তু সমীরণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" মালবিকা ঠেলে বকুলকে ঘরের ভিতরে পাঠাল।

লোক দুটি লজ্জায় পড়ল। ওদের মধ্যে কমবয়সিটি আবার সোফায় বসে পড়ে বলল, "আমরা গোবরডাঙা থেকে আসছি। আমরা ভেবেছিলুম আপনি বোধহয় সমীরণ মিত্রের স্ত্রী। লোকটা আমাদের বসিয়ে বলল, 'মাকে ডেকে দিচ্ছি', তারপরই আপনি উঁকি দিলেন। তাই আমরা ভাবলুম—।"

"না, না, আমি ওনার স্ত্রী নই, আমরাও একটা দরকারে ওঁর কাছে এসেছি।"

বকুল একটা বেতের চেয়ারে বসল, তার পাশেরটায় মালবিকা। পর্দা সরিয়ে একটি লোক তাদের দেখে নিয়েই চলে গেল। এত বড় একজন নামী গাইয়ে পুরনো বাড়িতে আর এমন একটা বসার ঘর নিয়ে বাস করে, এটা দেখে বকুল একটু দমে গেল। সিনেমায় বা টিভি-তে বড় বড় লোকেদের বসার ঘবেব সঙ্গে একফোঁটা মিলও সে খুঁজে পাচ্ছে না।

মালবিকা মুখটা বকুলের কানের পাশে এনে ফিসফিসিয়ে বলল, "মা কে?"

"বোধহয় ওর বউ।"

বয়স্কজনটি কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, "কমার্শিয়াল ব্যাপারটা ওঁর স্ত্রী শিঞ্জিনী দেবীই তো দেখেন। যা কিছু কথাবার্তা উনিই বলেন, উনিই টাকাপয়সা ঠিক করে দেন।"

লোকটিব কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা সরিয়ে একজন ঘরে ঢুকল, যাকে দেখামাত্র ওরা বুঝে নিল, এই হচ্ছে শিঞ্জিনী। মাথা ঘুরিয়ে চারজনের দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব প্রয়োগের একটা ঔদ্ধত্য বয়েছে। শিঞ্জিনী ভ্রূ কুঁচকে বকুল-মালবিকাকে দেখে নিয়ে গোবরডাঙার দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে বিকাশ মুখোপাধ্যায়?"

"আ-আমি।" কমবয়সি উঠে দাঁড়াল।

"আপনি মল্লিকার চিঠি নিয়ে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বউ।"

"কিন্তু ভাই টাকা তো আমি কমাতে পারব না ওঁর যা রেট—"

"না, না, না টাকা কমাবার কোনও প্রশ্নই নেই। উনি যা নেন তাই নেবেন। আমার অনুরোধ প্রোগ্রামটা শনিবারের বদলে রবিবার হচ্ছে, উনি যদি রবিবারে আসেন তা হলে আমরা ধন্য হব।" বিকাশ করজোড়ে তাকিয়ে রইল শিঞ্জিনীর দিকে।

দুই ভুরুর মাঝখানটা চুলকিয়ে একটু বিব্রত গলায় শিঞ্জিনী বলল, "রবিবার তো একটা ঘরোয়া আসরে ওঁর গাইবার কথা। সাহিত্যিক, ফিল্ম ডিরেক্টর, আই এ এস, আই পি এস-দের বউয়েরা দুয়েকজন জার্নালিস্টও আসরে থাকবেন। সমীরণের তো এখানে কথাও দেওয়া হয়ে গেছে।"

"কথা কি পাকাপাকি দেওয়া হয়ে গেছে? ডেটটা চেঞ্জ করা যায় না?"

"প্রায় একরকম পাকাপাকিই বলা যায়।"

"একটু ওঁদের বলে দেখুন না যদি অন্য দিনে হয়। আমরা তা হলে দশ হাজার দেব যদি উনি রবিবারে আসেন।"

"দেখুন ওঁর শরীরটা খুব খারাপ। কাল রাতে জামসেদপুর থেকে ফিরলেন কী যে শরীর নিয়ে! এতটা লং জার্নি মোটরে করাই উচিত হয়নি।"

"আমরা ওঁকে ট্রেনে গোবরডাঙা নিয়ে যাব। বিটি রোড, যশোর রোডে ওঁর গাড়ির চাকাই পড়বে না। ম্যাডাম, আপনি কিছু ভাববেন না, ট্রেনে কলকাতার রাস্তার মতো গর্তটর্ত, ঝাঁকুনি নেই।"

শিঞ্জিনী তৃতীয় বেতের চেয়ারটায় বসে ভ্রূ কুঁচকে কপালে আঙুলের কয়েকটা টোকা দিল। লোক দুটি জলে পড়েছে, কী করে তাদের উদ্ধার করা যায়, এমন একটা সমস্যা তার মুখে ফুটে উঠল। "দশ নয় ওটা বারো করুন। তা হলে রবিবারের ওই আসরটা থেকে সমীরণকে তুলে আনা যেতে পারে। টাকাটা কিন্তু আগাম পুরোই চাই, ক্যাশে।"

"তা হলে আপনি দায়িত্ব নিন ওঁকে নিয়ে যাবার। বারোতেই আমরা রাজি। কাল কি পরশু এসে কন্‌ট্রাক্ট করিয়ে টাকা দিয়ে যাব।"

"আমি আর ওঁকে নিয়ে যাব না, উনি নিজেই যাবেন। দুটো গাড়ি ঠিক সময়ে পাঠাবেন আর এগারোটার মধ্যে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু খেতেটেতে চাইলে দেবেন না। ঠিক দু'ঘণ্টা গাইবেন।" শিঞ্জিনী ফর্দ পড়ার মতো বলে গেল।

ওরা দু'জন উঠে দাঁড়াল। মুখে বিগলিত হাসি। নমস্কার করে তারা চলে যাবার পর শিঞ্জিনী বকুল ও মালবিকার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"আমাদের, সমীরণবাবু আসতে বলেছেন। এই আমার মেয়ে মালবিকা, ওর গান শেখার ব্যাপারেই আসা।"

মালবিকা প্রণাম কবল শিঞ্জিনীকে। বকুল একবার ভাবল সে ও করবে কি না, কিন্তু প্রায় সমবয়সি বা ছোটই হবে বিবেচনায় শুধু স্মিত মুখে সে তাকিয়ে রইল।

"তা হলে তিনটেব পব আসুন তখন স্কুল খুলবে।" শিঞ্জিনী তীক্ষ্ণচোখে মালবিকার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"ওকে স্পেশালে শেখাবেন বলেছেন, তাব আগে গান শুনবেন। সে-জন্যই আসা।" বকুল নম্রস্বরে বলল।

"কার কাছে গান শেখে?"

'কারুর কাছে নয়। বহু আগে একজনের কাছে শিখেছে, সে না-শেখারই মতো।"

"হারমোনিয়াম বাজাতে পারে তো?"

"তা পারে।"

দু'জনের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে, কোনও কথা না বলে শিঞ্জিনী ঘর থেকে বেবিয়ে গেল। যাওয়াব ভঙ্গিতে প্রকট ছিল অবহেলা, মালবিকার সেটা ভাল লাগল না।

"বেশ সুন্দরীই।" বকুল মাথা হেলিয়ে চাপা গলায় বলল।

"এককালে ছিল।" মালবিকা কথাটা বলেই যোগ করল, "মেক-আপ করেছে বলে অমন দেখাচ্ছে।"

"তা কেন, মুখখানি বেশ সুন্দবই তো। শরীরের গড়নও ভাল। রং ফরসা, কোমর-টোমর সরু বেখেছে। শুধু চোখদুটোই যা ছোট ছোট।"

"তুমি একে ভাল ফিগার বলো কী করে? কেমন একটা কাঠ-কাঠ ভাব, গায়ের চামড়াটাও খসখসে। গালে ব্রণর দাগগুলো লক্ষ করেছ?"

"আস্তে বল।"

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে থাকার পর উসখুস শুরু করল। সেন্টারটেবলের নীচের তাকে কয়েকটা ম্যাগাজিন দেখে মালবিকা একটা তুলে নিল। বাচ্চাদের ম্যাগাজিন, বোধহয় সমীরণের ছেলের। কয়েক পাতা উলটে সে রেখে দিল।

"আমরা যে এসেছি সেটা বোধহয় ওকে জানানো হয়নি।" মালবিকা বলল।

"নিশ্চয় জানিয়েছে। দেরিতে ওঠেন তো বলেই দিয়েছিলেন। মিহির আসবে বলেছিল, কই এখনও তো এল না।"

"রেখে দাও ও-সব আসা-টাসার কথা। বলার জন্যই বলা।"

'ছেলেটি কিন্তু বেশ।"

' তোমাব সব কিছুতেই 'বেশ'। এটা বলা থামাও তো।"

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে বইল। ক্রমশ ব্যাজাব হতে হতে বকুল কথা শুরু কবল।

'বাবো হাজাব টাকা নেন মাত্র দু'ঘণ্টা গাইতেই।"

"বাবো হাজাব না আবও কিছু। ওবা তো ডেট বদলাতে চেয়ে দশ হাজাব অফাব কবল। তাব মানে আগে আবও কমে কথা হয়েছিল। এখন ইনি গবজ বুঝে মোচড দিয়ে ওটাকে বাবোয তুলল। ববিবাবে কোথায যেন গাইবাব কথা আছে বলল না? সব ফল্স্। খুব জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ।"

"তোব দেখছি ওকে একদমই ভাল লাগেনি।"

"না। ভাবভঙ্গিটা দেখলে না? প্রণাম কবলুম, একটা কিছু তো লোকে বলে। অথচ যেন দেখতেই পাযনি এমন একটা ভাব কবল। নিজে অত সেজেছে আব ঘবটা কী কবে বেখেছে?"

"গাইয়ে বাজিযেদেব ঘব এই বকমই হয।"

'মোটেই তা নয। আসলে দবকাব ইচ্ছে, সেটা থাকলে ঘবটা পবিচ্ছন্ন কবে বাখা যায। পদাগুলো কত দামি আব দেয়ালটা দ্যাখো।"

বকুল চাবদিকেব দেযালে চোখ বোলাল। সেই সময় বাস্তা থেকে কযেকবাব মোটবেব হর্ন বাজল। পাশেব ঘবেব জানলা থেকে শিঞ্জিনীব গলা শোনা গেল, "যাচ্ছি, একমিনিট।"

মালবিকা উঠে গিয়ে জানলা থেকে দেখল বাডিব সামনে একটা সবুজ বঙেব মারুতি দাঁড়িয়ে। গাড়িব পাশে দাঁডিয়ে থাকা লোকটি নিশ্চয ড্রাইভাব।

ঘবেব সামনে ব্যস্ত চটিব শব্দ হল। পর্দা সবিয়ে শিঞ্জিনী বলল, "আপনাবা বসুন, আসছেন।" পর্দা পড়ল। চটিব শব্দ একতলায নেমে গেল। মালবিকা জানলা থেকে শিঞ্জিনীব গাডিতে ওঠা দেখল।

'মাবতি গাডি।" মালবিকা চেযাবে ফিবে এসে বসল। "ওউই চডে বেডায।"

কত দাম?"

'লাখ দুযেক দেডেক হবে।"

"অ্যাতো! তুই পাববি অমন একটা গাডি কিনতে?" গলায ক্ষীণভাবে আবদাবেব মতো সুব ফুটে গেল।

মালবিকা মুখ ফিবিয়ে মাযেব দিকে তাকাল। হালকা একটা বিষণ্ণ হাসি তাব চোখে ভেসে এল। মাইনেব টাকাটা কত বলে সেটা আগে জেনে নাও। আকাশ কুসুম দেখতে শুরু কোবো না।"

দবজাব পদা সবিয়ে ঘবে ঢুকল সমীবণ মিত্র। আদ্দিব পাঞ্জাবি আব ঢোলা পাজামা, সাদা বাবাবেব চটি। চুলে চিরুনি পডেনি। ফুলো ফুলো দুই চোখ। ঘডিব দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কিন্তু খুব দেবি কবিনি, আপনাবাই আগে এসে পডেছেন। আসলে হযেছে কী, কথা ছিল ট্রেনে ফেবাব। সঙ্গে ছিল তিনজন তবলা আব খোল বাজাবাব দু'জন আব তানপুবো ছাডাব মেয়েটি, আমাবই ছাত্রী প্রতিভা। টাটাব এক অফিসাব কলকাতায আসছিলেন গাডি কবে। আমি দেখলুম ভোববাতে উঠে স্টিল এক্সপ্রেস ধবা আমাব দ্বাবা হবে না। তাব থেকে ববং—" ,সমীবণ সোফায বসে গা এলিযে দিল।

তখনই মালবিকা তাকে প্রণাম কবতে এগিয়ে গেল। হাঁটু গেডে বসে সমীবণেব দুই পাযেব পাতা দু'হাতে ধবে সে নুযে পডল। কপাল ঠেকল পাতায।

"আবে আবে।" সমীবণ সোজা হযে বসে মালবিকাব দুই কাঁধ ধবে "থাক থাক" বলে তাকে তোলাব চেষ্টা কবল। মালবিকা তখন অনুভব কবল, আঙুলগুলো তাব ঘাডটাকে বাব দুই যেন হালকাভাবে কচলাল। সহজাত বোধ তাকে জানিযে দিল, এই কচলানিটা কিছু একটা ইঙ্গিত দেবাব জন্য। সে চোখ তুলে সমীবণেব চোখে বিহ্বল দৃষ্টি বেখে ধীবে ধীবে চোখ নামিযে নিল।

"বোসো বোসো।" সমীবণ হাত ধবে মালবিকাকে তাব পাশে বসাবাব সময় সামান্য একটা টান নিল। মালবিকা তাব গা ঘেঁষে বসল। বকুল এত নামী গাযকেব এমন সাবল্য দেখে পুলক বোধ কবল। তাব মনে আশা জাগল, বোধহয মেয়েটাব একটা হিল্লে হবে। এখন মাইনেব ব্যাপাবটায যদি একটু বিবেচনা কবেন।

"মালিব গান শুনে বলুন, ওব কিছু হবে কি না।" বকুল নডেচডে বসল।

সমীরণ তার ঝকঝকে চটুল চাহনি মালবিকার চোখের উপর রেখে বলল, "হবে না কেন? যদি পরিশ্রম করে, খাটে, আমার কথামতো যদি রেগুলার সাধনা করে তা হলে নিশ্চয় হবে। কী বলো, হবে না?" কথাটা বলে সমীরণ মালবিকার ডান হাতের মুঠি বাঁ হাতে চেপে ধরল।

মালবিকা মাথা নামিয়ে অস্ফুটে বলল, "আপনি যদি আমাকে গাইড করেন।"

সমীরণ কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, "আচ্ছা তোমার গলাটা একটু শুনি। যে-কোনও একটা গান গাও, খালি গলায় কিন্তু।"

গান গাইবার জন্যই আসা সুতরাং কয়েকটা গান সে স্থির করেই এসেছে। মালবিকা কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে থেকে গান শুরু করল। 'সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা এ কি আর ভাল লাগে।'

রেকর্ড থেকে হুবহু তোলা, শুধু গলাটাই যা মিহি এবং তীক্ষ্ণ। কয়েকবার স্বর কেঁপে গেল, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ায় ভুল করল, সুরচ্যুতি ঘটল এবং অবাক চোখে সমীরণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। গান শেষ হবার পর ঘর নীরব রইল কিছুক্ষণ। মালবিকা উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে রইল সমীরণের বন্ধ চোখের দিকে।

"তুমি যে এইরকম একটা গান শোনাবার জন্য বেছে নেবে, সেটা আমি ভাবতে পারিনি। গলায় এখনও সুর বসেনি তবে মোটামুটি তুমি উতরে গেছ তোমার ভগবান-দত্ত মিষ্টি গলাটার জন্য। আমি রবীন্দ্রসংগীত জানি না, গাইও না, কিন্তু তোমারও এটা লাইন নয়। তুমি অন্য ধরনের গান শেখো।"

"বেশ তো আপনিই ঠিক করে দিন কোন লাইনে ও যাবে।" বকুল ব্যগ্র স্বরে বলল।

"সা রে গা মা থেকে ওকে শিখতে হবে। এখন যা শুনলেন সেটা অশিক্ষিত পটুত্ব, বেশিদূর যাওয়া যাবে না। রোজ তিন-চার ঘণ্টা চর্চা করতে হবে।... কী গো মালি ভয় পাচ্ছ নাকি?"

মুখ নামিয়ে মালবিকা শুনছিল। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। গান শেখাবে কি শেখাবে না, সেটা স্পষ্ট করে ওর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে না। কিছু উপদেশ দিয়ে হয়তো বলবে, যাও বাড়িতে বসে গলা সাধো। "ভয় পাচ্ছ নাকি", বলে সমীরণ তার পিঠে ছোট্ট একটা চড় বসিয়ে হাতটা আর তোলেনি। তার এই একটিই ব্লাউজ এবং এটি এমনই, পরিধান করলে পিঠটা অর্ধেক প্রায় খোলা থাকে আর কাঁধ থেকে স্তনের উপরিভাগ পর্যন্ত অনাবৃত রয়ে যায়। বাড়িতে ব্লাউজটা সে কখনওই পরে না। বাইরে বেরোবার সময় পাড়ার মোড় পর্যন্ত আঁচল দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ জড়িয়ে রাখে। আজ সে ইচ্ছে করেই পরে এসেছে।

সমীরণের আঙুলের ডগা পিঠের ছয় ইঞ্চি জায়গা জুড়ে আলতো ঘোরাফেরা করছে। শিরশির করছে পিঠ এবং সারা শরীরে সেটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। মালবিকা চট করে একবার বকুলের দিকে তাকাল। বকুলের দ্রুত চোখ সরিয়ে নেওয়া দেখে তার মনে হল, সম্ভবত মা ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। কিছু কি ভেবে নিচ্ছে?

"প্রতিভা আমার স্কুলে গান শেখায়। গান শেখেও আমার কাছে। ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এই সামনের মাসেই। বলেছে গান ছাড়বে না তবে আমার সঙ্গে এখানে ওখানে যাওয়াটাও আর সম্ভব হবে না, স্কুলেও শেখাতে পারবে না। কনজারভেটিভ শ্বশুরবাড়ি, আপত্তি করবে বলেছে। গান নিয়ে যদি কেউ সারাক্ষণ পড়ে না থাকে তার কিছু হবে না। আমার ছাত্রীদের মধ্যে ওই ছিল সেরা।" সমীরণের স্বর আফসোস আর দুঃখেই বোধহয় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। মালবিকার পিঠে আলতো বোলানো আঙুল এখন আঁচড় কাটছে নখ দিয়ে।

"তানপুরো ছাড়ার জন্য আমার একজন কাউকে এখন চাই।" সমীরণ তাকাল মালবিকার দিকে, মালবিকা মায়ের দিকে। বকুল মনে মনে বলল ভগবান, উনি যেন মালির হাতেই তানপুরাটা তুলে দেন।

"আমার তো মনে হয়, শিখিয়ে নিলে মালির কাছে এটা শক্ত ব্যাপার হবে না। আসরে আমার পাশে বসেই অনেক কিছু শিখতে পারবে। অবশ্য মা-বাবার যদি আপত্তি না থাকে—।" সমীরণ জিজ্ঞাসু চোখে বকুলের দিকে তাকাল। "এখানে ওখানে যেতে হবে, রাতেও হয়তো থেকে যেতে হতে পারে।"

ভগবান তা হলে শুনেছেন! চেয়ার থেকে হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল বকুল। "প্রণাম কর, প্রণাম কর। এত ভাগ্যি তোর! আপত্তি করব কী!"

মালবিকা কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। তার পিঠের উপর সমীরণের পাঁচ আঙুল মাংস খাবলাবার চেষ্টা করছে। চর্বি না থাকায় জুত করতে পারছে না। সোফা থেকে নেমে মালবিকা আবার পায়ের দুটো পাতা

দুই মুঠোয় ধরল এবং কী একটা ভেবে নিয়ে পাতাদুটোর ওপর আলতো চিমটি কাটল।

"বারবার প্রণাম কেন, বসো বসো।" সমীরণ দুই বাহু ধরে মালবিকাকে পাশে বসাল। মুখ টিপে হেসে বোঝাবার চেষ্টা করল, চিমটি কাটা সে উপভোগ করেছে।

এই সময়ই ঘরে ঢুকল মিহির। তাকে দেখে সমীরণ মালবিকার বাহুধরা হাতটা সরিয়ে নিল।

"আয় আয় মিহির, বোস। প্রতিভার তো বিয়ে, তাই ঠিক করলুম মালিই এবার থেকে তানপুরো নিয়ে আমার সঙ্গে বসবে। পারবে না?"

"পারতে চাইলেই পারবে।" মিহির একটা চেয়ারে বসল। পাশে বসা বকুলকে নিচু গলায় বলল, "বলেছিলুম আসব, এসেছি।"

"জানো বাবা, মালির গান শুনে উনি বললেন, খাটলে হবে, গলাটা খুব মিষ্টি।"

"সমীরণের মুখে প্রশংসা! সহজে তো উনি এটা করেন না। কোকিল ডাকলে উনি বলেন কাক ডাকছে। তাও আবার 'খুউব' মিষ্টি বলেছেন? আমি কিন্তু মাসিমা, গান না শুনে আগেই বলেছি।"

মিহির মুখ টিপে মালবিকার দিকে তাকাল।

"ঠাট্টা নয় মিহির, গলাটা সত্যিই মিষ্টি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে দুটি পুরুষমানুষ মুখ টিপে তার দিকে তাকিয়ে হেসেছে। মালবিকার মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা ঘোর লাগছে। তার মনে হচ্ছে, এরা তার কাছে কিছু যেন চায়। কিন্তু তার আছে কী দেবার মতো? সে নিজেই তো সকলের অনুগ্রহ চায়!

"সমীরণদা বউদি কোথায়?"

"পার্ক সার্কাস গেছে, ইলেকট্রিক ফিটিংসের কাজ দেখতে।"

মিহিরের গাড়িতে সেদিন ওরা দু'জন বাড়ি ফিরেছিল। ফেরার পথে মিহির বলে, "তানপুরা নিয়ে গান গাওয়ার অভ্যাসটা আপনার দরকার, হারমোনিয়াম দিয়ে ওটা হবে না।" মুখ ফিরিয়ে সে পিছনে বসা মালবিকার মুখটা দেখে নিল।

"মালিকে আবার 'আপনি' বলছ কেন বাবা, ও তোমার থেকে অনেক ছোট।"

"আপনি আমার বয়স জানেন?" মিহির মজা করেই বলল। ফাঁপরে পড়ল বকুল, সে মেয়ের দিকে তাকাল। মালবিকা মিহিরকে শুনিয়ে চাপা গলায় বলল, "বলো একশো।"

"উঁহু, হল না। বয়স ষোলো।" মিহির স্বাভাবিক গলায় বলল।

"অ্যাতো বয়স?" মালবিকা গলা অবাক করে ভ্রূ তুলল। "আমার থেকে তো অনেক বড়, আমি তো সবে আটে পড়েছি।" সে মিহিরের মুখ দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল গাড়ির সামনের কাচের উপর দিকে চালে আঁটা পিছন দেখার আয়নাটা দিয়ে মিহির তাকে দেখছে। ঠোঁট মুচড়ে হেসে মালবিকা একটু সরে বসল। মিহির বাঁ হাত তুলে আয়নাটা সামান্য ঘোরাল। আবার ওর মুখ মালবিকা দেখতে পাচ্ছে। সে এবার সরে এল বকুলকে ঘেঁষে। মিহির আয়নাটা আবার ঠিক করে নিল।

অসমান রাস্তার জন্যই গাড়িটা অস্থির, আয়নাটা কাঁপছে, মিহিরের মুখটাও। উঁচু কলারের হাওয়াই শার্ট। মালবিকার মনে হল, ঘাড়ের সাদাটা ঢাকার জন্যই এমন একটা জামা পরেছে। তাদের পাড়ার স্টেশনারি দোকানের রাজেনদার দুই চোখের কোণে প্রথমে ফুটকির মতো সাদা দাগ হয়। ক্রমশ সেটা বড় হতে হতে সারামুখে ছড়াতে থাকে। তিন-চার বছরের মধ্যে রাজেনদা পুরো সাদা হয়ে যায়। ছোটরা ওকে সাহেবদা বলে ডাকতে শুরু করে। ওকে দেখলেই মালবিকা কী রকম যেন একটা অস্বস্তি বোধ করত। সে শুনেছে এটা কোনও রোগ নয়, ছোঁয়াচেও নয়। তবু সে রাজেনদার দোকান থেকে জিনিস কেনা বন্ধ করে।

মিহিরের ঘাড়ের দাগটা চামড়া পুড়ে যাওয়ার জন্যও হতে পারে। মালবিকা মনে মনে বলল, তাই যেন হয়। নয়তো তিন-চার বছর পর ধবধবে মিহিরের চেহারা যে কেমন দেখতে হবে, সে কল্পনাও করতে পারল না। জানলা দিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে রইল। যে উত্তেজনা নিয়ে সে সমীরণের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, আপ্লুত আশায় যে গড়াগড়ি তার মনের মধ্যে চলেছে সেটা ক্ষণেকের জন্য স্তিমিত মৃদু হয়ে পড়ল। বেচারা! তারপরই সে ভাবল, ও তো মেয়ে নয়! প্রচুর টাকা আছে কোনও অসুবিধে হবে না।

পথটা একেবারে চিনে গেছে মিহির। বাড়ি পর্যন্ত ঠিকই চলে এল। গাড়ি থেকে নামবার আগে মালবিকা বলল, "আর একদিন এসে চা খেয়ে যাবেন বলেছিলেন। নিশ্চয়ই সেই আর একদিনটা আজ নয়?"

"এই দুপুরবেলায় চা খেতে বলছেন?"

"না, বলছি না।" মালবিকা গাড়ি থেকে নেমে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিল। চোখ তুলে তিনতলায় নিজেদের ঘরের জানলাটাও দেখে নিল। পর্দাটা গুটিয়ে তুলে রাখা। জানলায় তার বাবার মুখটা নেই।

"দুপুরে লোকে ভাত খায়, কই ভাত খাওয়ার কথা তো বললেন না?"

"খাবে বাবা?" বকুল ঝুঁকে জানলাটা ধরে মিহিরকে অনুরোধ জানাল।"

"না মাসিমা, আর একদিন...এই দেখুন আবার বলে ফেললুম আর একদিন! আমার মা বসে থাকবেন ভাত নিয়ে, এক ছেলে হওয়ার এই এক প্রবলেম। আর শুনুন।" একটু জোরেই মিহির ডাকল বাড়ির ফটকে পৌঁছে যাওয়া মালবিকাকে।

"তানপুরা নিয়ে গলা সাধতে হলে আগে একটা তানপুরা চাই, সেটা আছে কি?"

"নেই।" মালবিকার হঠাৎই খেয়াল হল সমীরণের মতো মিহির তানপুরাকে 'তানপুরো' বলে না।

"আমার একটা আছে, সেটা দিয়ে যাব।"

"আর একদিন এসে, তাই তো?"

"আজই, সন্ধেবেলায়। চা-ও খাব।"

"তানপুরাটা দিয়ে দিলে আপনি কী নিয়ে গাইবেন?"

"আমার দুটো আছে।"

মিহির গাড়ি ছেড়ে দিল।

একটি দিনেই প্রধান চরিত্রগুলোকে নিয়ে কাহিনীটি পৌঁছল আর এক পর্যায়ে। আরও দু'-তিনটি পর্যায় পেরিয়ে পৌঁছবে মালবিকার আইবুড়ো ভাত খাওয়াবার সেই রবিবারে। তার মধ্যে দ্রুত সম্পর্কের হেরফের ঘটে যাবে, তার কিছু কিছু অংশ এবার বলা যাক।

যেমন শনিবার সন্ধ্যায় মিহির তানপুরাটা দিতে এল। হঠাৎ একজন অপরিচিত একা লোকের পক্ষে বাড়ির মধ্য দিয়ে তিনতলায় উঠে আসা, এ-বাড়িতে সম্ভব নয়। অসুস্থ মেজভাসুরের অফিসের লোক একবার উঠে এসেছিল না বলে। পার্বতী ডেকে মেজজাকে বলে দেন, "এটা ফ্ল্যাট বাড়ি নয়।"

মালবিকা আর বকুল পালা করে সন্ধে থেকে তিনতলার জানলা দিয়ে রাস্তায় চোখ রাখে। দিলীপরঞ্জনকে বলে রেখেছিল বকুল, "সেই ছেলেটি আসবে যে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে।"

কী যেন ভেবে দিলীপরঞ্জন বলেছিল, "আমাদের স্বজাতি?"

"হ্যাঁ, শীল। বিকেলে যদি বেরোও তা হলে রাত করে ফিরো।"

রেগে খেঁকিয়ে ওঠার বদলে স্বাভাবিক গলায় দিলীপরঞ্জন বলেছিল, "শরীরটা ভাল লাগছে না, আজ বেরোব না।"

বকুল অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। শনি-রবি পরপর দু'দিন অফিসের ছুটি, অথচ মদ খেতে বেরোবে না! তখন সে বলেছিল, "বিকেলে তা হলে একটু বাজারে যেয়ো।"

গাড়িটা ফটকের সামনে থামতে দেখেছিল মালবিকাই। "এসেছে।" বলেই সে ছুটে নেমে যায় মিহিরকে উপরে আনতে। দিলীপরঞ্জন তখন পাঞ্জাবিটা ট্রাউজার্সের উপর ঝুলিয়ে আয়নায় দাঁড়ায় চুল আঁচড়ে নিতে। বকুল কলঘর থেকে ভিজে শরীরে কোনও রকমে শাড়ি জড়িয়ে ছুটে এসে মালির ঘরে ঢুকল, ঢোকার আগে লন্ড্রি থেকে আনা শাড়িটা আলনা থেকে তুলে নেয়।

মিহির প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল। তার মধ্যে সে বুঝে নিল এদের তিনজনের পারস্পরিক সম্পর্কটা কেমন। দিলীপরঞ্জন জেনে নিল মিহিরের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর খবর ও পারিবারিক অবস্থা। বকুল খোঁজ করল, মালবিকার বড় গাইয়ে হবার জন্য কতদিন সময় লাগবে আর মালবিকার মনে হল মিহিরের তাকে ভাল লেগেছে এবং সেটা কিছু জটিলতা তৈরি করবে।

তানপুরা কীভাবে বাঁধতে হয়, কীভাবে সুর ছাড়তে হয় মিহির খাটের উপর বসে পদ্ধতিগুলো

শিখিয়ে দিল। শেখাবার সময় অবশ্যই কয়েকবার সে মালবিকার করস্পর্শ করল। তার আঙুল ধরে, যার কোনও দরকারই ছিল না, মিহির যখন দেখিয়ে দিচ্ছিল কীভাবে তারের উপর দিয়ে পরপর টেনে নিয়ে যাবে তখন সে ওর ঘাড়ের সাদা দাগটা দেখার চেষ্টা করেছিল। উঁচু কলারের পাঞ্জাবি এবং বোতামগুলো তৃতীয় ঘর পর্যন্ত আঁটা থাকায় দেখতে পায়নি। সে স্বস্তি পেয়েছিল।

"বাবা, একটু বলে দাও তো তানপুরা দিয়ে ও কীভাবে গলা সাধবে?" বকুল জানতে চায়।

"আহহ্ মা! যার কাছে শিখব তিনিই বলে দেবেন। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বলো তো।" মালবিকা বিরক্ত হল। বকুল অপ্রতিভ।

"ঠিকই বলেছেন। " মিহির সায় দিল।

"আমাকে 'বলেছেন' 'করেছেন' বলবেন না, শুনলে বয়স বেড়ে যায়।" মালবিকা এবার মিষ্টি ধমক দিল। খুশি হল মিহির।

"আচ্ছা আচ্ছা আর বলেছেন নয়। মাসিমা, মালি যা বলল সেটাই উচিত। সমীরণদার কাছে শিখবে, অথচ আমি বলে দেব, তা হয় না। জানতে পারলে সমীরণদা ওকে আর ও বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তা ছাড়া আমি তো সবে শিখছি, মাস্টারি করার বিদ্যে এখনও হয়নি।"

"ওরে বাবা, না না তোমাকে আর বলেটলে দিতে হবে না। সমীরণবাবু যা শিখিয়ে দেবেন তাই করবে। আমি চা নিয়ে আসি।" বকুল ত্রস্ত হয়ে উঠে গেল।

খাটের আর একদিকে বসে দিলীপরঞ্জন শুনছিল ওদের কথা। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, "সমীরণ মিত্তির লোকটা কেমন বলো তো? শুনেছি খুব মদ খায়, মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারিও আছে।"

মিহিরকে হুঁশিয়ার দেখাল। কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "আমি গান শিখতে যাই, ঘণ্টা দেড়-দুই থেকে চলে আসি। আমরা তিন-চারজন শিখি। এর মধ্যে কিছু আমি দেখিনি।"

"আহা তা কী করে দেখবে, এ-সব কি দেখিয়ে কেউ করে। শুনেছ কিছু?"

মিহির ইতস্তত করে চুপ রইল। সমীরণদা সম্পর্কে যা শুনেছে সেগুলো বলতে তার বাধছে। অশোভনও হয়ে যাবে। বললে হয়তো মেয়েকে গান শেখাতেই পাঠাবে না। তাতে ক্ষতি হবে মালবিকারই।

মাথা নেড়ে সে বলল, "আমি তো কিছু শুনিনি।"

দিলীপরঞ্জন তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে ছিল। বুঝে নিল ছেলেটি চেপে যাচ্ছে।

"তুমি শোনোনি ছাত্রীকে সমীরণ রেপ করেছিল। কেস হয়। প্রমাণ না হওয়ায় খালাস হয়ে গেছল। অবশ্য বছর দশেক আগের কথা। আমাদের অফিসের একজনের পাড়ার মেয়ে। মেয়েটার আজও বিয়ে হয়নি।"

"হ্যাঁ, এ-রকম একটা কথা শুনেছিলুম বটে। মেয়েটি নাকি রেগুলার ওর কাছ থেকে টাকা নিত। টাকা দেওয়া বন্ধ করতেই নাকি কেস করে।"

"অ। বউয়ের সঙ্গে সমীরণ মিত্তিরের সম্পর্ক কেমন?"

"কেন, ভালই তো!" মিহির আবার হুঁশিয়ার হল।

"স্বামীকে ছেড়ে ক'বার চলে গেছল? জানো কি সেটা?"

"না তো। আপনি জানলেন কী করে?"

"হুঁ হুঁ, বহু জায়গায় আমার আড্ডা, কানে খবর ঠিকই আসে। ওই কেসটা হওয়ার পর থেকে ওদের রিলেশনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। টাকাপয়সা সব তো এখন বউয়েরই কন্ট্রোলে। বউ তো একসময় ওরই ছাত্রী ছিল। বাপের বাড়ির অমতে অনেক লটঘট করে বিয়েটা করেছিল। এখন পস্তাচ্ছে।" দিলীপরঞ্জন বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে মেয়ের দিকে তাকাল।

মাথা নামিয়ে মালবিকা আদরের মতো করে আঙুল বোলাচ্ছিল তানপুরায়। এই সময় চকিতে তার মনে পড়ল, অনেকটা এই ভাবেই তার পিঠে একটা আঙুল নড়ে বেড়িয়েছিল। শিরশির করেছিল পিঠ। তানপুরা থেকে আঙুলটা তুলেই বাবাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, "বউয়ের সঙ্গে সমীরণ মিত্রের সম্পর্ক দিয়ে আমার কী আসে যায়। আমি তো যাব গান শিখতে।"

কিছু একটা ভেবেই মালবিকা আর বলল না, 'এখানে ওখানে যেতে হবে, রাতেও হয়তো থেকে

যেতে পারে।' এতসব কথার পর এই কথা আর বলা যায় না। বাবাকে সে ভালই জানে।

"হ্যাঁ. শুধু শিখতে, শেখা হলেই বাড়ি চলে আসবে।"

"ওঁর সঙ্গে ফাংশানেও যেতে হবে, বলে দিয়েছেন।"

দিলীপরঞ্জনের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। "কেন?"

মিহির তাড়াতাড়ি বলল, "ছাত্রছাত্রীরা গুরুর গান শুনতে তো যায়ই, আমিও তো যাই। এই যে গোবরডাঙায় সমীরণদা গাইতে যাবেন, আমিও তো যাব।"

"সত্যি! আমাকে নিয়ে যাবেন?" মালবিকা প্রায় লাফিয়ে ওঠার মতো ভঙ্গি করল।

মিহির তাকাল দিলীপরঞ্জনের দিকে। তার মনে হল লোকটা কী যেন ভেবে নিল।

"আর কে সঙ্গে যাবে?"

"দু'-তিনজন মিউজিক হ্যান্ডস, আর প্রতিভা তো যাবেই।" একটি মেয়ে যাবে শুনে হয়তো মেয়েকে যেতে দিতে পারে ভেবেই মিহির প্রতিভার নাম জুড়ে দিল।

"ওর না বিয়ে?" মালবিকা বলল।

"এখনও দিন পনেরো তো বাকি। হয়তো এইটেই ওর শেষবারের মতো তানপুরা নিয়ে বসা হবে।"

মালবিকা মনে মনে বলল, "তারপর আমি।"

"যাবে-আসবে কীসে, মোটরে?" দিলীপরঞ্জন আরও জানতে চাইল।

"দুটো মোটর যাবে, তাই না মিহিরদা?" মালবিকার মুখ থেকে আপনা থেকেই 'মিহিরদা' বেরিয়ে এল। মিহির হাসল।

"সমীরণদা তো মোটরে একাই যান, বরাবরই। অন্য মোটরে হারমোনিয়াম, তবলা, তানপুরা আর হ্যান্ডসরা।

"আমি কিন্তু আপনার মোটরে যাব, যাব বাবা?" মালবিকা আদুরে গলায় বলল। মনে মনে কিন্তু সে জানে, বাবা রাজি না হলেও সে যাবে। তাকে সমীরণ মিত্রর কাছাকাছি হতেই হবে।

প্লেটে গরম লুচি আর বাটিতে রান্না মাংস নিয়ে বকুল ঘরে ঢুকল। টেবলে ওগুলো রেখে বলল, "এসো বাবা, আজ প্রথম দিন এলে, কিছু রাঁধার তো সময়ই পেলুম না। একটু মুখে দাও। চা পরে দোব। মালি, রান্নাঘর থেকে সন্দেশের প্লেটটা এনে দে।"

মিহির কোনও ওজর আপত্তি না তুলে উঠে টেবলে এল। সে বুঝে গেছে নাছোড়বান্দা এই মহিলা সত্যি দুঃখ পাবে যদি সে কিছু না খায়। শুধু বলল, "যা দিয়েছেন এটা আমার দু'দিনের খাদ্য। অর্ধেক তুলে নিন।"

বকুল তুলল না এবং মিহির সবটাই খেয়ে নিল যেহেতু মাংসের রান্নাটা উপাদেয় লাগায়। বিদায় নেবার সময় বকুল বলল, "একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমার মার সঙ্গে আলাপ করে আসব।"

"যাবেন। আমি এসে নিয়ে যাব।" মিহির কথাটা বলে মালবিকার দিকে তাকাল।

"আমিও মার সঙ্গে যাব।" মিহিরের চোখে অনুরোধ দেখে সে নিরাশ করল না।

দিলীপরঞ্জন বলল, "তোমাদের প্রেসটা একদিন দেখে আসব। নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি, কালিঝুলি, ঘটংঘটং শব্দের কোনও ব্যাপারই নেই! একবার তো দেখতেই হয়।"

তিনতলা থেকে মিহিরের সঙ্গে মালবিকাও নামল। দু'-তিনটি ঘর থেকে কৌতূহলী মুখ উঁকি দিয়ে মিহিরকে দেখল। জানলা থেকে দিলীপরঞ্জন দেখল গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ওরা দু'জন কথা বলছে।

"ছেলেটাকে ভালই মনে হল। ব্যবসা-ট্যাবসা কেমন চলছে সেটা বোঝা দরকার। গাড়ি থাকলেই তো আর বড়লোক হয় না! প্রেসটা দেখে আসতে হবে।" খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বকুলকে ইশারা করে বলল, "ওটা এবার আনো।"

রান্নাঘর থেকে বকুল দিশি মদের বোতলটা এনে টেবলে রাখল, সঙ্গে কাচের গ্লাস। বিকেলে বাজার থেকে ফেরার সময় পান সিগারেটের দোকান থেকে দিলীপরঞ্জন এটা কিনে এনে বকুলকে রান্নাঘরে রাখতে দিয়েছিল।

"মালি তো গানের টিউশনিও করতে পারবে।"

বকুল চেয়ারে বসল স্বামীর মুখোমুখি হয়ে। গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে মুখবিকৃতি করে দিলীপরঞ্জন বলল, "নামী গাইয়ের ছাত্রী হলে দরটা বাড়বে।"

বকুল আশ্বস্ত হল। মিহির সম্পর্কে তো নয়ই এমনকী সমীরণ সম্পর্কেও দুশ্চরিত্র, মাতাল বলে তার স্বামীর এখন আর কোনও আপত্তি নেই। হঠাৎই তার বুকের মধ্যে ক্ষীণ একটা কষ্ট এই লোকটির জন্য তৈরি হল।

সেই সময় গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে মালবিকা বলল, "তা হলে সত্যি সত্যিই আর একদিন আর হল না।"

"হত, কিন্তু দেখলুম বেশিদিন দেরি হয়ে গেলে আমাকে তোমরা আর মনে রাখবে না। মনে রাখার মতো তো আমার চেহারা নয়, গুণও কিছু নেই।"

"কে বলল নেই?" মালবিকার স্বর মৃদু গাঢ় হয়ে এল।

"তানপুরাটা দিলেন, আমার উপকারই করলেন। কিনতে হলে বাবাকে খুবই অসুবিধেয় পড়তে হত। আপনার হৃদয় আছে আর পুরুষমানুষের রূপ তো তার হৃদয়, এটা ক'জনের থাকে?"

"পুরুষদের থাকে কি না জানি না তবে সুন্দরী মেয়েদের বোধহয় থাকে না।"

"আপনি জানেন?" মালবিকা মুখ টিপল। এখন সে বেশ সহজ ঝরঝরে বোধ করছে। মিহিরকে তার ভাল লাগছে ওর কথাবার্তা আর আচরণের জন্য। তবে এটাই তার কাছে ভাল লাগার শেষ কথা নয়। সে পুরুষদের কাছ থেকে আরও কিছু চায়।

"জানার চেষ্টা করছি।"

"করে কী বুঝছেন?"

"আরও চেষ্টা করতে হবে।" মিহিরের চোখে ঝিলিক দিল প্রত্যাশা।

"কী চেষ্টা করবেন সুন্দরীদের হৃদয় বুঝতে?"

"নিজেকে তুমি তা হলে সুন্দরী স্বীকার করলে!"

"কে বলল? আমি তো একজন সুন্দরীর কথা বলিনি, বলেছি সুন্দরীদের কথা।" মালবিকা গাড়ির জানলায় হাত রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। উপরে তাকিয়ে দেখল তিনতলার জানলায় কেউ নেই। রাস্তা দিয়ে অল্প লোক চলাচল করছে। দু'বার কেউ তাকাল না তাদের দিকে।

"আমি তো একজনকেই সুন্দর জানি।" মিহিরও গাড়ির জানলায় হাত রাখল।

"খুব হয়েছে, উঠুন এবার।"

"সুন্দরী মেয়েদের যে হৃদয় থাকে না নিজেই কিন্তু তা প্রমাণ করে দিলে। 'উঠুন এবার', এমন একটা কুচ্ছিত কথা কার পক্ষে বলা সম্ভব?"

"আমি তা হলে কুচ্ছিত?"

"অবশ্যই।"

"দূর হও আমার সামনে থেকে।" মালবিকা মিহিরের হাতের উপর চড় মেরে ঠোঁট ওলটাল।

মিহির অবিশ্বাস ভরে মালবিকার দিকে তাকাল। 'হও' বলল। দূর 'হোন' নয়। মালবিকার আঙুলগুলো মুঠোয় রেখে সাহস পেয়ে ধরা গলায় মিহির বলল, "তোমাকে আমার ভাল লাগে মালি।"

"হাত ছাড়ো, বাড়ি থেকে দেখছে।" মালবিকার ফিসফিসিয়ে বলার ধরনে মিহির দ্রুত হাত সরিয়ে নিল। তিনতলার জানলায় অবশ্য কেউ ছিল না।

"কাল যেয়ো সমীরণদার ওখানে, আমিও যাব।" দরজা খুলে মিহির গাড়িতে উঠল।

"যাচ্ছ তো? গোবরডাঙায়?"

"হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে গেলে সমীরণদা কিছু মনে করবে না তো।"

গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। "মনে করার কী আছে! বরং খুশিই হবেন। তখন তোমার বাবাকে বললুম সমীরণদা গাড়িতে একাই যান। মোটেই যান না, ওঁর সঙ্গে আর একজন যায়। প্রতিভা।" প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মিহির অপেক্ষা করল না।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর মালবিকার মনে হল সে যেন মিহিরের ঘাড়ে সাদা একটা দাগ দেখল।

সমীরণ খুশি হয়েছিল। কেন হয়েছিল সে-কথা এবার বলা দরকার কেন-না গোবরডাঙা থেকে ফেরার সময় মালবিকা বুঝে যায় তার জীবন এবার অন্য একটা খাত ধরে বইবে এবং সেই খাতটা শুধুই কাদায় ভরা।

আসরটা মূলত গানের নয়, যাত্রার। টিন দিয়ে ঘিরে হাজার আষ্টেক লোক বসার ব্যবস্থা হয়েছে। যাত্রা হচ্ছে তিন দিন ধরে। সমীরণ মিত্রের গানের পর রাত ন'টায় "তোমার মতো বউ হয় না" পালা শুরু হবে। মিহিররা পৌঁছে দেখল টিকিট ঘরের সামনে প্রায় যুদ্ধ চলছে। চাউমিন, ঘুগনি, রোল, ওমলেট ইত্যাদির দোকান বসে গেছে। যাত্রাকে ঘিরে একটা মেলা-মেলা ভাব। মিহির একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানল, দলবল নিয়ে সমীরণ একটু আগে পৌঁছেছে, বিশ্রাম নিচ্ছে ক্লাবের সেক্রেটারির বাড়িতে। সেই লোকটিকেই গাড়িতে তুলে নিয়ে মিহির সেক্রেটারির বাড়িতে পৌঁছল এক মিনিটেই।

ঘরে সোফায় বসেছিল সমীরণ, তার পাশে প্রতিভা। অন্য সোফায় বসে বিজনবাবু, সোমনাথবাবু। তবলা আর সারেঙ্গি নিয়ে সঙ্গত করেন। তাদের দেখেই সমীরণ বলে উঠল, "আয় আয় মিহির, বোস এখানে।" মালবিকাকে বলল, "ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে, বসো।"

মালবিকা সবাইকেই গানের স্কুলে দেখেছে। প্রতিভা অল্পবয়সিদের গান শেখায়। সমীরণ ওর কাছেই মালবিকাকে গান শিখতে বলেছে। "যতদিন প্রতিভা রয়েছে, ওর কাছেই প্রাথমিক শেখাটা শিখে নাও। ক্ল্যাসিকাল জানে, শেখাবার কায়দাটা খুব ভাল। যে-রকম বলবে, দেখিয়ে দেবে সেইভাবে বাড়িতে করবে।" মঙ্গল আর বুধবার প্রতিভা ক্লাস করে। মালবিকা দু'দিন ক্লাস করেছে। দিলীপরঞ্জন অফিসে যাবার পর গত চারদিন সে নিজের ছোট ঘরটায় প্রবল উৎসাহে তানপুরা নিয়ে বসেছে।

প্রথম দিন ক্লাসের শেষে প্রতিভা তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

"কাছেই, এই গৌরীবাড়িতে। আপনার?"

"আমারও কাছেই বাড়ি তবে তোমার উলটোদিকে, রাজাবাজারে।"

"ওটা তো মুসলমান পাড়া?"

"হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?"

"ভয় করে না?"

প্রতিভা হেসে উঠে মাথা নাড়ে। "আজ চব্বিশ বছর ওখানে আছি। রাজাবাজারের মোড়ে বড় মসজিদটা দেখেছ? তার পাশেই আমরা ভাড়া থাকি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও দাঙ্গা বা গোলমাল হতে দেখিনি। শুনেছি চৌষট্টি সালে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ওখানে বাধেনি। বেশ, তুমি চলো আমার সঙ্গে, নিজের চোখে দেখে আসবে। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই তো?"

"চলুন, আমার কোনও তাড়া নেই।"

মালবিকার খুব ভাল লেগে গেছে প্রতিভাকে। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের থেকে লম্বা এবং আনুপাতিক হারে চওড়া। মোটা কবজি, চওড়া কাঁধ। ঘাড়ে পিঠে মেদ জমেছে, তলপেটের পেশি আর টানটান নেই। শান্ত চোখ, কথাও বলে শান্ত ভাবে। প্রথম দিনেই ধৈর্য ধরে সে মালবিকার অপটুত্বকে যত্ন নিয়ে শোধরাবার চেষ্টা করেছে।

মালবিকার শুধু একটাই ভয় ছিল, তাচ্ছিল্য বা বাঁকা মন্তব্য যেন না তাকে সইতে হয়। হয়নি। প্রতিভাকে সত্যিই তার দিদি বলে মনে হয়েছে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট অর্থাৎ রামমোহন রায় সরণি ধরে দক্ষিণ দিকে ওরা হাঁটছিল। মালবিকা কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল, "প্রতিভাদি, সামনের মাসেই আপনার বিয়ে?"

"কে বলল?"

"সমীরণদার কাছে শুনেছি। উনি দুঃখ করে বলেন আপনার বোধহয় আর কিছু হবে না। সারাক্ষণ গান নিয়ে পড়ে না থাকলে তার কিছু হয় না। আপনাকে ওর সেরা ছাত্রী বললেন।"

"শুধু ছাত্রী, আর কিছু নয়?"

প্রতিভার স্বরে কেমন যেন একটা বিদ্রুপের মতো স্পর্শ ছিল যেটা মালবিকাকে আরও কৌতূহলী করে দেয়।

"আর কিছু মানে?"

প্রতিভা জবাব দেয়নি। মালবিকা হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে দেখল নরম মুখটা হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে গেল।

"যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তিনিও কি গান করেন?"

"একদমই না। ভদ্রলোক বর্ধমান জেলার কোনও এক থানার ছোটবাবু। বউ গায়ে আগুন দিয়ে মরেছে। সম্বন্ধটা এনেছে আমার দূর সম্পর্কের এক বউদি। ভদ্রলোকের ছেলেপুলে নেই, বর্ধমান শহরের ধারে দোতলা বাড়ি করেছেন, বয়স বিয়াল্লিশ, মাসে উপরি হাজার পাঁচেক টাকা। এমন পাত্র ভারতবর্ষে ক'টা পাবে? বাবা, মা দিনরাত শোনাচ্ছে, এখনই আমার বিয়ে করা ফেলা উচিত। আমার ছোট দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মালবিকা, আমার বয়স এখন বত্রিশ, ওদের মতে এই বয়সে চার সন্তানের মা হয় মেয়েরা আমি কেন এখনও হইনি? এ তো এক বড় বিদঘুটে সমস্যা।"

প্রতিভার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। মালবিকাও হাসল। "আপনি তো লেখাপড়া শিখেছেন?"

"বি এ, ইতিহাসে অনার্স ছিল।"

"এত ভাল গান জানেন!"

"তাতে কী হল? এত গুণ আছে যখন চাকরিও তখন পেতে পারি, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে পারো?"

মালবিকা চুপ করে পাশাপাশি হেঁটে চলল, বাঁ দিকে একটা পার্ক। সেটা ছাড়িয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা, তার উলটোদিকে সিটি কলেজ।

"লোকের মুখে সবসময় শুনবে, লেখাপড়া জানে তা হলে চাকরি করে না কেন? আরে বাবা চাকরি করতেই তো চাই, পাচ্ছি কোথায়? এখানে গান শিখিয়ে, দুটো গানের আর একটা মাধ্যমিক ছাত্রীর টিউশানি করে, সমীরণদার সঙ্গে তানপুরায় বসে গড়ে মাসে আট-ন'শো টাকা হয়। এতে কি চলে?"

"ছোটখাটো ফাংশান তো কতই হয়, গাইতে পারেন তো?"

"আমাকে নেবে না। পাবলিসিটি, ব্যাকিং, গ্ল্যামারাস সাজ, এখন এ-সব খুবই বড় ফ্যাক্টর। ভেবেছিলাম সমীরণদা আমায় দেখবেন।"

প্রতিভা চুপ করে মাথা নামিয়ে মন্থরভাবে হাঁটতে লাগল। মালবিকার মনে হল প্রতিভাদির আরও কিছু বলার কথা আছে, কিন্তু সদ্য পরিচিতের কাছে সেগুলো বলতে চান না।

"'জয় মা মনসা' ফিল্মটা দেখেছ?"

"না।"

"সমীরণদা মিউজিক দিয়েছেন। আমাকে একটা গান দিয়েছিলেন। ওই পর্যন্তই। ছবিটা মফস্বলে খুব চলেছে। গানটা ভালই গেয়েছিলুম। দু'-তিনটে জলসায় আমাকে গাওয়ার চান্স করে দিয়েছিলেন। রেডিয়োয় অডিশনের ব্যবস্থা করেছেন, বছরে পেয়েছি তিনবার প্রোগ্রাম। একটা ক্যাসেট বার করে দেবেন বলেছিলেন, চেষ্টা করলে পারতেন কিন্তু করেননি। এইভাবে কি দিন চলে? সবটাই ভাগ্যের ব্যাপার মালবিকা, নাম করা, টাকা রোজগার করা এ-সব ভাগ্য না থাকলে হয় না।"

"আপনাকে কেন সংসারের কথা ভাবতে হবে?"

"একটা ভাল কথাই বলেছ। আমিও নিজেকে এই প্রশ্নই করি। আমি অনেক কিছু করেছি, এখনও করছি।"

প্রতিভা এত জোরে 'এখনও করছি' বলে উঠল যে মালবিকা ওর হাত চেপে ধরল। রাস্তার দু'-তিন জন তাকিয়ে দেখে গেল।

"আস্তে প্রতিভাদি।"

গলা নামিয়ে প্রতিভা বলল, "বলির পাঁঠা কিন্তু আমি হব না। আমি এখনও ঠিক করিনি বিয়েটা করব কি না। ভাবতে পারো, ছেলেব বাড়ি থেকে কিছু চাই না বলেও নগদ মাত্র আট হাজার শুধু চেয়েছে বউভাতের খরচের জন্য। এই টাকা আমাকেই জোগাড় করতে হবে! কোন দেশে কোন সময়ে আমরা রয়েছি? লেখাপড়া শিখে এ-সব আমি মেনে নেব?"

"আস্তে প্রতিভাদি।"

"কেন আস্তে হব? সবাই জানুক, পণপ্রথা তুলে দাও, জাতপাত তুলে দাও, বিচ্ছিন্নতাবাদ ঠেকাও, অপসংস্কৃতি ধ্বংস করো বলে মিছিল, মিটিং, সেমিনার প্রবন্ধ লেখা হয়। সব বাজে সব বাজে। মালবিকা, তুমি বাচ্চা মেয়ে, জানো না কী ভণ্ডামিতে দেশটা ছেয়ে গেছে। আর এরই ধাক্কায় আমি— আমিও নিজেকে নীচে নামিয়েছি।"

প্রতিভা আর কথা না বলে জোরে হাঁটতে শুরু করল। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মালবিকাকে আধা-দৌড় দিতে হচ্ছে।

"আস্তে প্রতিভাদি।"

প্রতিভা মন্থর হয়ে হেসে ফেলল, "খুব জোরে হেঁটে ফেলেছি, না? মোটা হয়ে গেলেও আমি কিন্তু হাঁটায় তোমায় হারিয়ে দিতে পারি। এইবার বাঁ দিকে কেশব সেন স্ট্রিটে।"

ওরা বাঁ দিকের রাস্তা ধরে রাজাবাজারের মোড়ের কাছাকাছি এসে বড় মসজিদের আগের গলিটায় পৌঁছল।

"কী, ভয় করছে?" প্রতিভা দাঁড়িয়ে পড়ল।

মালবিকা দু'ধারে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "না।"

কলকাতার যে-কোনও একটা বড় রাস্তার মোড় যেমন হয় এই মোড়টা তার কাছে তেমনই লাগল, শুধু দারিদ্র্যের ছাপটাই প্রকট। দোকানগুলোয় ঔজ্জ্বল্য নেই, ভিড়ে রাস্তায় চলা বিরক্তিকর, ফুটপাথ আছে কি নেই বোঝা যায় না। পোশাক বা দোকানের সামগ্রী থেকে বোঝা যায় এখানে অভাবী মানুষই বেশি। অনেকগুলো খাওয়ার হোটেল। কাঠের টেবল আর বেঞ্চ ছাড়া হোটেলে আসবাব নেই। হিন্দু নামের সাইনবোর্ড লাগানো কয়েকটা মিষ্টির দোকান দেখে মালবিকা বলল, "প্রতিভাদি এইসব হোটেলে, মিষ্টির দোকানের মিষ্টি কখনও খেয়েছেন?"

প্রতিভা গলির মধ্যে ঢুকল। সরু গলি। পাকা বাড়িগুলোর সঙ্গে টালি ও টিনের ছাদওলা কাঠের দোতলা বাড়িও রয়েছে। একটা ঠেলাগাড়ির জন্য দেয়ালে প্রায় লেপটে গিয়ে প্রতিভা বলল, "না, একদম বাজে খাবার। তবে বাড়ির থেকে হোটেলে খাওয়াটা সস্তায় হয়, রুটি আর গোরুর মাংস। একটু পরে দেখবে হোটেলগুলোয় কী ভিড়!"

রাস্তা থেকে একহাত উঁচুতে সদর দরজা। দরজার কাঠের অবস্থা শোচনীয়। একফালি পথ, দু'ধারে ঘর, ঘরগুলোয় একটি মাত্র ছোট জানলা, তারপর দোতলার সিঁড়ি যেটা চওড়ায় দু'হাত।

"দেখে উঠো, সিঁড়িতে নানান জিনিস পড়ে থাকে অনেক সময়।"

দোতলায় সরু শিক লাগানো বারান্দা। পর পর দুটি ঘর প্রতিভাদের। দ্বিতীয় ঘরটায় থাকে সে। দরজায় নীল রঙের পর্দা। ঘরের একধারে তক্তপোশ। অন্যধারে একটা তানপুরা আর হারমোনিয়াম। প্রতিভার বাবার বৈঠকখানায় একটা লন্ড্রি আছে, এখন তিনি দোকানে। ওর মা-র সঙ্গে আলাপ করে মালবিকার ভাল লাগল।

প্রতিভার মা দুর্গা ঘর দুটো পরিষ্কার ফিটফাট রেখেছেন। চারিদিকের নোংরা অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে এদের সংসারটা যেন একটা বাগান।

"আমি চা করে আনছি।" দুর্গা রান্নাঘরে যাবার জন্য খাট থেকে উঠলেন। চারটে কাঠ দিয়ে উঁচু করা খাটটা বোধহয় ওনার বিয়েতে পাওয়া। খাটের নীচে সংসারের নানান জিনিস রাখা।

"শুধু চা কিন্তু মাসিমা।" মালবিকা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিল।

"কেন! একটু মিষ্টিমুখ করবে না? প্রথম দিন এলে।"

"মিষ্টি আমি একদম খাই না।"

"একটু আগেই আমি ওকে বলেছি এখানকার খাবারগুলো বাজে।" বলেই প্রতিভা জোরে হেসে উঠল।

"না না, সে জন্য নয়। সত্যিই আমি মিষ্টি খাই না।" কথাটা বলে মালবিকার হাসি পেল। মহাজাতি সদনে সমীরণের দেওয়া মিষ্টি সে খায়নি, বলেছিল, 'খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।' বলেছিল, 'এইমাত্র ছেড়েছি'। কী রকম অবাক চোখে সমীরণ তার দিকে তাকিয়ে জুঁই ফুলের মালাটা তাকে উপহার দিয়েছিল। মালবিকার মনে হয়েছে ওইটেই সেই মুহূর্ত যখন সে সমীরণের চোখ টেনেছিল। পরে

সংশোধন করে নিজেকে সে বলে, সমীরণের মন টেনেছিল, তা যদি না হত, তা হলে সমীরণ কেন তার পিঠে আঙুল দিয়ে—।

"কী ভাবছ অত? বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে?" প্রতিভা জিজ্ঞাসা করল।

"আমার বাবা একটু ভিতু ধরনের। মেয়ের বাড়ি ফিরতে দেরি হলে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।" মালবিকা কথাটা বলে মজা পেল। বাবা তার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে, ভাবা যায়!

চা-এর সঙ্গে দুটো বিস্কুট খেয়ে সেদিন মালবিকা বেরিয়ে আসে। প্রতিভা তাকে বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে বারণ করে।

সমীরণ ঠিক দু'ঘণ্টাই গাইল। দেড় হাত উঁচু আসর ঘিরে জমি ও গ্যালারিতে কয়েক হাজার শ্রোতা। যাত্রার জন্য সাত-আটটা মাইক্রোফোন আসরের উপর ঝুলছে। মালবিকা আর মিহির জমিতে ফরাসের উপর বসে। তাদের মুখোমুখিই আসরের মাঝখানে বসেছিল সমীরণ আর তার সামান্য পিছনে, বাঁ দিকে ছিল প্রতিভা।

সমীরণের আসরে এসে বসা, গান গাইবার সময় শ্রোতাদের দিকে তাকানো, তবলচির দিকে মুচকি মুচকি হাসি, মাথা নাড়া, চোখ বন্ধ করা ইত্যাদি ওর প্রত্যেকটি সঞ্চালনই যেন মেপে করা এবং দেখতে ভাল লাগে। ওর জনপ্রিয়তার পিছনে এইগুলিরও অবদান রয়েছে।

মালবিকা প্রথম গান থেকেই লক্ষ করল সমীরণ গাইছে তার দিকেই তাকিয়ে। মাথার দোলানি, ভ্রূ তোলা, মুখ টিপে হাসা সবই যেন তার জন্য। নিধুবাবুর একটা গানের শেষ দুটো পঙ্‌ক্তি ছিল—'ছলে বলে কৌশলে, মালিনীরে ফাঁকি দিলে। উভয়ের মন অন্তঃশিলে, বহে ফল্গু নদী যেমন।' সমীরণ মালিনী শব্দটাকে দু'ভাগ করে শুধুই 'মালি' শব্দটাকে গলায় খেলাতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। উর্ধ্বাঙ্গ দুলিয়ে, কখনও চোখ টিপে, সাজানো দাঁতগুলোর ঝলসানি দিয়ে বারবার সে 'মালি' শব্দটাকে সুরের বাহারে সাজিয়ে তুলতে লাগল এবং মালবিকার দিকে তাকিয়ে।

ব্যাপারটা যে সে বুঝেছে সমীরণকে তা জানাবার জন্য মালবিকা ভ্রূকুটি করে নাক কুঁচকে কয়েকবার হাসল। তারপর পাশে বসা মিহিরকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে আর গম্ভীর। ব্যাপার কী? সমীরণ তার নামটা নিয়ে এমন করে গাইছে বলে মিহিরের কি পছন্দ হচ্ছে না? এত লোক শুনছে অথচ মিহির ছাড়া কেউ জানে না সমীরণের এই 'মালি'টি কে! এটা ভেবে মালবিকা মজা পেল।

"সমীরণদার কাণ্ডটা দেখেছ?" মালবিকা ফিসফিসিয়ে বলল। মিহির কথা বলল না। কিছুক্ষণ পব অস্ফুটে মিহির বলল, "ড্রিঙ্ক করেছে।"

মিহিরের সঙ্গে দু'-তিনবাব কথা বলার চেষ্টা করল মালবিকা। হুঁ, হ্যাঁ ছাড়া জবাব পেল না। এবার মালবিকা বিরক্ত হয়ে ভাবল, তানপুরা দিয়ে আর মোটরে চড়িয়ে কি ভাবছে আমি ওর কেনা বাঁদি হয়ে গেছি? হঠাৎ-ই সে মিহিরের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করল আর মনে পড়ল ওর কাঁধে একটা সাদা দাগ আছে।

মালবিকা গোনেনি সমীরণ ক'টা গান গাইল। নিধুবাবু, নজরুল, নিজের দেওয়া সুরে রাগপ্রধান, দ্বিজেন্দ্রলাল, নানান জনের লেখা বোধহয় পনেরোটি গান।

"ক'টা গাইল গুনেছ?" সে মিহিরকে জিজ্ঞাসা করল।

"না। গোনার জন্য আসিনি, শোনার জন্য এসেছি।"

মিহিরের বলার ভঙ্গিতে মালবিকা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইল।

"এগারোটার মধ্যে পৌঁছে দেব বলে এসেছি। আমি গাড়িতে আছি তুমি তাড়াতাড়ি এসো।" মিহির তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আসর থেকে বেরিয়েই সমীরণদের গাড়িতে ওঠার কথা। একটু হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হবে। বাইরে আসামাত্রই অটোগ্রাফ নেবার জন্য একটা ভিড় সমীরণকে ঘিরে ফেলল। কখনও দাঁড়িয়ে কখনও চলতে চলতেই সে সই করে যাচ্ছিল।

কাঁধে একটা টোকা পড়তেই মালবিকা পিছনে তাকাল।

"প্রতিভাদি।"

"তুমি আমাদের গাড়িতে এসো।"

"সে কী! আমি তো মিহিরদার গাড়িতে এসেছি।"

"ফেরাটা নয় আমাদের গাড়িতেই হোক। এসো না।"

কীরকম একটা কাতর আবেদনের মতো শোনাল 'এসো না'। মালবিকা ইতস্তত করে বলল, "মিহিরদা কী মনে করবেন।"

"কিছু মনে করবে না। বলবে প্রতিভাদি অনেক করে বলছেন।"

"সমীরণদাকে বলা দরকার।"

"বলো। তবে আমার নাম কোরো না।"

মালবিকা প্রায় ছুটেই সমীরণের কাছে গেল। কয়েকজন কর্মকর্তা তখন ওর সঙ্গে চলেছে তাকে গাড়িতে তুলে দিতে।

"সমীরণদা একটা কথা।"

মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল সমীরণ। মালবিকা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, "আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

"আমার গাড়িতে? কিন্তু মিহির কিছু মনে করবে না?"

"করুক। আমি আপনার সঙ্গে যাব।" গলায় আবদার ছাড়াও মালবিকা অনুরোধকে আন্তরিক করতে সমীরণের কনুই আঁকড়ে ধরল। মদের গন্ধ সে চেনে, সমীরণের মুখ থেকে ক্ষীণভাবে সে গন্ধ পেল। বোধহয় আসরে আসার আগে সেক্রেটারির বাড়িতে অপেক্ষার সময় খেয়েছে। প্রতিভা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে।

"বেশ, চলো।" সমীরণ গাড়ির দরজায় হাতলে হাত রাখল। "মিহিরকে বলে এসো।"

একটু দূরে মিহির তার গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে। মালবিকাকে হনহনিয়ে আসতে দেখে সে ইঞ্জিন চালু করল।

"আমি সমীরণদার গাড়িতে যাব।"

"সে কী!"

"সমীরণদা বললেন একপিঠ তো মিহিরের গাড়িতে এলে এবার ফেরাটা আমার গাড়িতে। এমনভাবে বললেন যে না করতে পারলুম না।"

"সে কী!" মিহিরের স্বরে এবার বিস্ময়ের বদলে ফুটে উঠল অধৈর্যতা। "যার সঙ্গে এলে তার সঙ্গেই তো ফেরার কথা! আর তুমি হ্যাঁ বলে দিলে?"

"কী করব। বললুম তো, এমনভাবে উনি বললেন যে—", মালবিকা থমথমে মুখটা দেখে কথা অসমাপ্ত রাখল।

"এমনভাবে বললেন! কীভাবে বললেন? ওর মুখে গন্ধ পাওনি?"

"পেয়েছি। মদ খেয়েছেন। তা কী হয়েছে? উনি কি গাড়িতে আমায় রেপ করবেন? ড্রাইভার রয়েছে, প্রতিভাদি রয়েছে। এত নীচ কেন তোমার মন?" কথাটা বলেই তার মনে হল, না বললেই ভাল হত। মিহিরকে তার আরও অনেকবার দরকার হবে। কিন্তু সমীরণকে দরকার আরও বেশি। তার ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেবার লোক তো ওই একজনই। বকুলও তাই বলে।

"এটা ভদ্রতারও ব্যাপার। যার সঙ্গে আসা, উচিত তার সঙ্গেই যাওয়া। ঠিক আছে, যাও তুমি।" মুখটা কালো হয়ে বসে গেছে। মিহির দাঁত চেপে নিজেকে সামলে রাখল।

"রাগ করলে?" জানলা গলিয়ে মিহিরের কাঁধে হাতটা রেখেই সে তুলে নিল। মিহির গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়িতে বসে সমীরণ আর প্রতিভা অপেক্ষা করছে। অন্য গাড়িটা বিজনবাবু, সোমনাথবাবু আর বাজনাগুলো নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। প্রাইভেট ট্যাক্সি, অবাঙালি হিন্দিভাষী ড্রাইভার, গ্যারেজ কলকাতায়। ওধারের জানলায় প্রতিভা, মাঝখানে সমীরণ। মালবিকা গাড়িতে উঠে সমীরণের ডান দিকে বসল।

গাড়ি গোবরডাঙা থেকে বেরোবার পরই সমীরণ ক্লান্ত শরীরটা পিছনে হেলিয়ে, নাগরা জোড়া খুলে পা দুটো ছড়িয়ে বলল, "এতগুলো গান গাওয়া সত্যিই কষ্টের।"

একটা পা মালবিকার বাঁ পায়ের পাতার ওপর রাখা। টেনে নিতে গিয়েও সে নিল না। বলল, "তা হলে কম গাইলেই তো পারেন।"

"পারি না। প্রতিভা জানে কেন পারি না।"

"আমি? আমি কী করে জানব!" প্রতিভা এতক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। মুখ ফিরিয়ে সে কথাটা বলার সঙ্গেই, মালবিকার মনে হল, ডান পা টেনে নিয়ে বাঁ দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

"তুমি জানো না? ন্যাকামো কোরো না। আমার বউ কী জিনিস তুমি জানো না?" সমীরণ মাথাটা পিছনের গদিতে চেপে মুখ তুলে বড় একটা শ্বাস ফেলল। আড়মোড়া ভাঙার মতো করে দু'হাত তুলল। ডান হাত নামাল, বাঁ হাত প্রতিভার কাঁধের পিছনে সিটের উপরে রাখল।

প্রতিভা জবাব দেয়নি। সমীরণ আবার বলল, "আমার অসুবিধেটা তুমি জানো প্রতিভা।"

মালবিকা ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকিয়ে। অন্ধকার রাস্তা। বাড়ির আর দোকানের ছাড়া কোনও আলো নেই। একঘেয়ে একঘেয়ে অন্ধকার। কিন্তু তার বাঁ দিকে একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা একঘেয়ে নয়।"

"হ্যাঁ জানি। আর জানি বলেই—।"

"তোমাকে কি বিয়েটা করতেই হবে? না করলেই নয়?"

"করতে হবে। না করলেই নয়।"

"কিন্তু কেন? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?"

এবার নীরবতা। কিছুক্ষণ পর প্রতিভার গলা মালবিকা শুনল, "আর করি না।" স্বরটা খুব নরম।

"ওহহ।"

কিছুক্ষণ পর সমীরণ ডান দিক ফিরে মালবিকাকে বলল, "অর্ধেকটা খেয়েছি, বাকিটা যদি এখন খাই তোমার অসুবিধে হবে?"

"না। আমার বাবাও তো খায়।"

ডান দিকের পকেট থেকে সমীরণ হুইস্কির পাঁইটটা বার করল। বোতলটা ডান হাতে মালবিকার সামনে ধরে বলল, "ছিপিটা খুলে দাও।"

ছিপির প্যাঁচ ঘোরাবার সময় মালবিকার হাত কেঁপে গেল। সমীরণ কাঁচা মদ ঢক ঢক গিলে নিয়ে গুম হয়ে রইল চোখ বন্ধ করে।

"কেন যে খাই লোকে তা বোঝে না, তুমি কখনও খেয়েছ?"

"না।" মালবিকার গলা থেকে কোনওক্রমে শব্দটা বেরোল। এমন প্রশ্ন কখনও সে শোনেনি। এখন যদি খেতে বলে?

বোতলটা প্রতিভার মুখের সামনে ধরে সমীরণ বলল, "নাও।"

"কী হচ্ছে কী?" তিক্তস্বর প্রতিভার। "একটি অল্পবয়সি মেয়ে, একেবারে নতুন, তার সামনে এইসব বলে তুমি নিজেরই মান খোয়াচ্ছ।"

'তুমি'? মালবিকা অবাক হল। তা হলে তলায় তলায় এদের সম্পর্কটা তুমির! সম্পর্ক যে একটা আছে সেটা সে আন্দাজ করেছিল, এখন নিশ্চিত হল এবং উত্তেজিতও।

"নতুন তো একদিন পুরনো হবে, জানবে আমি লোকটা কেমন। কিন্তু পুরনো মদের কি তুলনা আছে। আর লজ্জা করতে হবে না। নাও, নাও।" অমার্জিত কর্কশ স্বরটা আদেশের মতো। কথাটা বলেই বাঁ দিকে কাত হয়ে সমীরণ বাঁ হাতে প্রতিভার গলা জড়িয়ে ঠোঁটের উপর হামলা চালাল।

কাঁটা হয়ে রইল মালবিকা। বাঁ দিকে তাকাবার সাহসও সে হারিয়ে ফেলেছে। ডান হাতে ধরা বোতলটা কাত হয়ে যাওয়ায় সমীরণের পাঞ্জাবির উপর অনেকটা মদ পড়ে গেল। মালবিকা বোতলটা আস্তে তুলে নিল নিজের হাতে। এক বার আড়চোখে সে তাকাল। ধস্তাধস্তির মতো একটা ব্যাপার চলেছে। সমীরণ দু'হাতে প্রতিভাকে জড়িয়ে ওর বুকে মুখ ঘষছে। প্রতিভা একহাতে ঠেলে মুখটা সরাবার চেষ্টা করছে। কারুর মুখে কথা নেই, শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের ভারী শব্দ। মালবিকার বুঝতে অসুবিধে

হল না ব্যাপারটা প্রতিভার মোটেই পছন্দের হচ্ছে না। অবশেষে চওড়া কবজিওয়ালা হাতের মুঠোয় সমীরণের চুল ধরে প্রতিভা মাথাটা সোজা করে দিল হ্যাঁচকা টানে। সমীরণ চাপা স্বরে "উহহ্" করে উঠল।

মুঠি থেকে চুলের গোছা ছেড়ে দিয়ে প্রতিভা গুম হয়ে জানলার দিকে বাইরে তাকিয়ে রইল। সমীরণ মালবিকার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বোতলটা মুখে ধরে উঁচু করল। আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি না মালবিকা বুঝতে পারল না তবে বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে সমীরণ বোতলটা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল।

প্রতিভা নিশ্চয়ই অনুমান করেছিল এইরকম কিছু ঘটতে পারে আর সে-জন্যই বোধহয় তাকে সঙ্গে যেতে বলেছে। নতুন ছাত্রীর সামনে সমীরণ অসভ্যতা করবে না, এটাই সে ভেবে নিয়েছিল। মালবিকা বুঝে উঠতে পারছে না এখন সে কী করবে। কিন্তু তার করারই বা আছে কী? ব্যাপারটা সম্পূর্ণতই ওদের দু'জনের মধ্যে, এ-ক্ষেত্রে তার নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। বাড়ি থেকে অনেক দূরে, অন্ধকারের মধ্যে ছুটন্ত মোটরগাড়িতে, অল্প পরিচিত দুটো মানুষ আর একদমই অপরিচিত ড্রাইভার, পরিস্থিতিটা থমথমে এবং বিস্ফোরক। এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে তার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। দেহ শক্ত করে কাঠের মতো বসে থাকা আর প্রতিভার জন্য সহানুভূতি জড়ো করা ছাড়া তার আর কী করার আছে? এখন তার মনে হচ্ছে মিহিরের গাড়িতে উঠলেই ভাল হত।

বুকের কাছে মুখ ঝুলিয়ে দিয়ে সমীরণ বসে। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। মালবিকা শোনার চেষ্টা করল।

"এত করেছি, তবু আরও চাই... বিয়ে করতে হবে, কেন?... ফুঃ, বিয়ে করলে মুটকিটাকে কেন করব! উঁ, এই ধুমসিকে?"

মালবিকার বাম ঊরুর উপর সমীরণের হাত এসে পড়ল। চমকে উঠে সে প্রথমেই ভাবল, হাতটা সরিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মদ খেয়ে বাড়ি ফেরা দিলীপরঞ্জনকে। যখন চড়চাপড় মারে, মা না চেঁচিয়ে, ঝগড়া না করে বাবাকে ধরে শোয়াবার চেষ্টা করে। উত্তেজনা উসকে দেবার মতো কোনও বাধা না পেয়ে বাবা ঝিমিয়ে আসে। সমীরণের হাতটা সে সরাল না। চড়চাপড় হয়তো মারবে না তবে গাড়ি থামিয়ে এখন যদি বলে "নেমে যাও!" তা হলে সে কী করবে!

সমীরণের মাথাটা আর একটু ঝুলে পড়েছে। চাকা গর্তে পড়ে গাড়ি যখন লাফিয়ে উঠছে সমীরণের তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছে। একবার সামনের সিটে মাথা ঠুকে গেল।

"মালবিকা ওকে সিধে করে বসিয়ে দাও তো।"

প্রতিভা মুখ বাইরের দিকে রেখেই বলল। স্বরের মধ্যে নিস্পৃহতা ছাড়া আর কিছু নেই। মালবিকা দুটো কাঁধ ধরে সমীরণকে টেনে তুলে সিটের পিছনে হেলান দেওয়াল। সবল, পুষ্ট কাঁধ আব বাহুর পেশি। সে দু'হাতের আঙুল ছড়িয়েও আঁকড়ে ধরতে পারছে না।

"আমি ঠিক আছি।" বলে সমীরণ সিধে হয়ে বসতে চেষ্টা করল। "ওইটুকু খেয়ে সমীরণ মিত্তিরের কিছু হয় না।"

মালবিকা জোর করে চেপে ধরে রইল। সমীরণ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ কী যেন দেখার চেষ্টা করল। গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে আসা হালকা কুয়াশার মতো অস্বচ্ছ আলোয় মালবিকা দেখল পাতলা ঠোঁট, একটা তিল, বাঁকা দুটি সরু ভুরু আর স্থির দৃষ্টিতে থাকা দুটি হালকা ধূসর চোখের মণি। মহাজাতি সদনে এই চোখের চাহনিতে তার বুক কেঁপে উঠেছিল।

"তুমি ভাল। দেখামাত্রই তোমাকে ভাল লেগেছে।" ফিসফিস করে সমীরণ বলল। "প্রতিভাও ভাল।"

"হ্যাঁ প্রতিভাদি ভাল।"

"কিন্তু যেমনটি চাই ও তা নয়।"

মালবিকা দেখল মাথা নিচু করে কপালে হাত দিয়ে রয়েছে প্রতিভা। মুখ দেখা গেল না। সমীরণের ডান হাত এখনও তার ঊরুর উপর। একবার জোরে আঁকড়ে ধরেই শিথিল করল আঙুলগুলো। কাঁধ ধরা হাত দুটো এবার সরিয়ে নেবে কি না মালবিকা বুঝতে পারছে না। যদি আবার সামনে ঝুঁকে পড়ে!

সেই সময় উরু থেকে হাতটা উঠে এল মালবিকার মাথার পিছনে। মাথাটাকে সামনের দিকে আলতো করে হাতটা ঠেলল। তার মুখটাও নিয়ে গেল সমীরণের মুখের দিকে। মদের কটু গন্ধ তার মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাত্র তিন-চার ইঞ্চির ব্যবধান। দূরত্বটা ঘুচিয়ে দেবে কি দেবে না? তার শরীর, মন আর যেন নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারছে না। আড়চোখে সে দেখল, প্রতিভা একইভাবে কপালে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে স্থির রয়েছে। মিহিরকে তার মনে পড়ল। 'ঠিক আছে, যাও তুমি।' ওর ঘাড়ের কাছে একটা সাদা—।

মালবিকা সদ্য যুবতী, বোধ অপরিণত। বয়সকালের আবেগ সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সে বড় হয়ে উঠেছে শিক্ষা ও রুচিবর্জিত, জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাবিহীন। তরল মানসিকতাসম্পন্ন অভিভাবকদের আওতায়। সময় এখন একটা ছুটন্ত নেকড়ের মতো, তার থাবার আঁচড় সে দেগে দিচ্ছে মানুষের চেতনায়। মালবিকা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়েছে সময়ের দাগানো নির্দেশ মেনে নিয়ে। তার অনেক কিছুই চাই এবং খুবই তাড়াতাড়ি। তার কোমল একটি হৃদয় আছে এবং সময়বিশেষে সেটি কঠিন, স্বার্থপর হয়ে যায়। তার শিক্ষা নেই, ধৈর্য নেই। গুণাবলীও কিছু নেই। অথচ প্রচারমাধ্যমগুলি নিয়ত যে রাশি রাশি স্বপ্ন তৈরি করে চলেছে সেগুলি থেকে নিস্তার পাবার মতো মানসিক জোরও তার নেই। তার বয়সিদের মধ্যে ক'জনেরই বা তা আছে? মালবিকা স্বভাবজাত বাস্তববোধ থেকে এইটুকু বুঝে গেছে, তার তারুণ্য, তার চাপল্যই তার সহায়, পুরুষদের হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা এবং পুরুষদের প্রতিরোধশক্তি খুবই ক্ষীণ, তাতে বহু রন্ধ্র আছে। তার একজন পুরুষ দরকার ছিল নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য। সে পেয়েছিল সমীরণ মিত্রকে। সে দেখতে পেয়েছিল সমীরণের রন্ধ্রগুলোকে তার দুর্বলতাকে। চার ইঞ্চির ব্যবধানটা সেদিন ঘোচানোমাত্রই সে চূর্ণ করে দিয়েছিল বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গায়কটিকে আর সেই সঙ্গে পা বাড়িয়ে দেয় বেপরোয়াভাবে কর্দমাক্ত পথে চলার সাহস। নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নেবার জেদ তাকে পেয়ে বসে। সে জানে তাকে শক্ত হতে হবে, দ্বিধা সংকোচ মানেই পতন।

উদ্ভট ও অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখা গেছল গোবরডাঙা থেকে ফেরা মোটরগাড়িটার মধ্যে। দু'পাশে দুই নারী মধ্যে এক পুরুষ। পুরুষটির জীবন থেকে এক নারী অস্তাচলে। অন্য নারী উদীয়মানা। পাশাপাশি বসে তারা বিচিত্র একটা পরিস্থিতি তৈরি করল। এর মধ্যে কে যে নির্মম, কে যে করুণ, কে যে সজীব সেটা বিচার করার দায় আমার নয়।

গোবরডাঙা থেকে একা মোটরে ফেরার সময় মিহিরও অসহ্য এক জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ভেবেছিল, তার ঘাড়ে একটা দায় চাপল। এই আচরণ, এই প্রত্যাখ্যান আর অপমানের শোধ নেওয়ার দায়। সে শিক্ষিত, মার্জিত ও আর্থিক দিক থেকে সম্পন্ন এবং সে জানে মেয়েদের আকর্ষণ করার মতো চেহারা অথবা বিশেষ কোনও গুণ তার নেই। কিন্তু সে চেয়েছিল কারুর কাছ থেকে সাড়া পেতে। হৃদয়ের সাড়া। সে জানে চেহারাটাকে বদলানো, কান্তিমান করে তোলা, আরও দীর্ঘদেহী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একটা কোনও গুণ অর্জন, চেষ্টা করলে হয়তো সম্ভব। সে খেলাধুলা করেনি, অভিনেতা হওয়ার যোগ্যতা নেই, গল্প-কবিতা লিখতে পারে না, ছবি আঁকতে জানে না। জনপ্রিয় হবার কোনও পথই তার সামনে নেই। শুধু গানের পথটাই সে দেখতে পায় এবং ক্রমশ সে বুঝে যায় এ-পথেও তার সাফল্য আসবে না। অতি সাধারণ এক গায়ক হওয়া ছাড়া সে আর কিছু হতে পারবে না। সে কোনও মেয়েরই হৃদয় জয় করতে পারবে না। হীনম্মন্যতায় সে আক্রান্ত হয়।

মালবিকাই তাকে প্রথম আশার আলো দেখিয়েছিল। মহাজাতি সদন থেকে গাড়িতে বকুল ও মালবিকাকে রাত্রে বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবার পর মালবিকা তার সঙ্গে আলাদা দু'-চারটে কথা বলেছিল। মিহিরের সেটা ভাল লাগে। দ্বিতীয় দিন ওদের নিয়ে সমীরণের বাড়ি থেকে ফেরার সময় তার মনে হয়েছিল মালবিকা তার সম্পর্কে কৌতূহলী। সেদিনই সন্ধ্যায় তানপুরাটা সে দিয়ে আসে। ফেরার সময় মালবিকা তার সঙ্গে তিনতলা থেকে নেমে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে চটুল আলাপের মধ্যে টেনে নেয়। 'দূর হও' বলে মালবিকা তাকে আকাশে ওড়ার জন্য পাখা লাগিয়ে দিয়েছিল। গোবরডাঙায় আসার সময় মিহিরকে সে কয়েকবার হাত ধরতে দেয়।

আমাকে নিয়ে খেলা করার জবাব ওকে আমি দেব, এই চিন্তাটাই মিহিরকে পেয়ে বসে। এক

একসময় সে নিজের উপরও রেগে ওঠে। কেন সে চিনতে পারেনি মালবিকাকে। কেন শুধু ওর প্রখর যৌবন, সুন্দর মুখ আর বঙ্গভরা আলাপে নিজের বোধবুদ্ধি হারাল? যতই সে ভেবেছে ততই বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলেছে অপমানের আগুন। আর একজন হল ওই সমীরণ মিত্তির। তার সামনে থেকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার মধুর ভবিষ্যৎ, তাকে উপহাসের স্তরে নামিয়ে দিয়ে।

কিন্তু কীভাবে সে শোধ নেবে? ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল মালবিকাকে আগে মুঠোয় আনতে হবে। সে ওকে বিয়ে করবে। তারপর ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘোচাবে। বাড়ি থেকে এক পা-ও যদি বেরোয় তা হলে হাত-পা বেঁধে চাবকাবে। যতই সে এইভাবে ভেবেছে ততই একটা তপ্ত শলাকা তার হৃৎপিণ্ডের গভীরে ধীরে ধীরে ঢুকে গেছে। রক্তাক্ত করেছে তার প্রতিশোধ বাসনাকে।

মিহিরের মতো স্থিরবুদ্ধির যুবক যে ভুল চিন্তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ যড়রিপুর তাড়নায় দিগ্বিদিক বোধ হারায়, মনের ভারসাম্যতা নষ্ট করে। মিহিরেরও তাই ঘটল। সে মালবিকাদের বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করল না। আগের মতোই রসিকতা করে সে কথা বলে, মোটরে বকুল আর মালবিকাকে সে কয়েকবার নিয়ে গেল পাতিপুকুরে। উমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করল। সুধাংশুর পরামর্শ: ডেস্কটপ পাবলিশিং অর্থাৎ ডিটিপি তার প্রেসে চালু করার যৌক্তিকতা মেনে নিল। দক্ষিণেশ্বরে উমা ও বকুলকে নিয়ে পুজো দিয়ে এল। আর একটা কাজ সে করেছে, সমীরণ মিত্রর কাছে আর সে গান শিখতে যায় না। আরও একটা কাজ করেছে, বকুল, দিলীপরঞ্জন ও মালবিকাকে বাড়িতে এনে তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

পুত্রবধূ করায় মায়ের আপত্তি নেই, মালবিকাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে। ছেলের পছন্দ যখন, বাবা তা মেনে নিতে আপত্তি তুললেন না। এরপর মিহির প্রস্তাবটা দেয় বকুলের কাছে।

ইতিমধ্যে আমরা মালবিকা ও সমীরণের সম্পর্কের খোঁজ নিতে পারি।

গোবরডাঙা থেকে ফেরার সময়কার ঘটনার পর প্রতিভা আর গানের স্কুলে আসেনি। মালবিকা একবার ভেবেছিল খোঁজ নিতে রাজাবাজারে যাবে। কিন্তু কী এক কুণ্ঠা তাকে বাধা দেয়। কপালে হাত দিয়ে সেদিন মুখ ঢেকে থাকলেও কান তো খোলা ছিল। প্রতিভা এখন তাকে কী চোখে দেখবে, কী ধরনের কথা বলবে তা বুঝে উঠতে না পারায় সে আর যায়নি। সমীরণ এখন নিজে তার সঙ্গীত শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক।

মালবিকা সমীরণের সঙ্গে নানান ধরনের আসরে এখন বসছে তানপুরা নিয়ে। দূরদর্শনেও সমীরণের পিছনে তাকে দেখা গেছে। ফলে দত্তবাড়িতে তাকে এখন যে-নজরে দেখা হয়, সেটাই সে চেয়ে এসেছে—গুরুত্ব! সমীরণ প্রতিভাকে টাকা দিত, মালবিকাকে দিল তার থেকে বেশি, তিনশো টাকা।

দোতলায় ছাত্রছাত্রীরা চলে যাবার পর মালবিকাও যখন যাওয়ার উদ্যোগ করছে, তখন সমীরণ তাকে অপেক্ষা করতে বলে পাশের শোবার ঘরে যায়। ফিরে এল তিনটি একশো টাকার নোট নিয়ে।

"এই নাও, তোমার পরিশ্রমের জন্য।"

জীবনে তার প্রথম রোজগার। মালবিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে কথা বলতে গিয়ে। কথার বদলে চোখ ভরে ওঠে জলে। সে তা হলে একটা কিছু হয়েছে, একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে। সমীরণের পায়ের উপর সে ভেঙে পড়ে। আঁকড়ে ধরে পাতা দুটো।

সমীরণ দুই বাহু ধরে তুলে শুধু একদৃষ্টে মালবিকার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী সে দেখছিল, খুঁজছিল মালবিকা তা বুঝতে পারল না।

"কী দেখছেন?"

"হালকা লাইট গান গাও, ভারী গান তোমার হবে না। সুরেলা গলা দিয়েছেন ভগবান, তাড়াতাড়ি উঠে আসবে তুমি।"

"শুধু এইটুকুই দেখলেন, আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?" মালবিকা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল।

সমীরণের দু'হাত মালবিকার কাঁধে। কাছে টানল সমীরণ। সে পিছিয়ে গেল।

"বললেন না তো কী দেখতে পেলেন?"

"বলব, সন্ধেবেলায় এসো।"

"বউদি?"

"থাকবে না।"

তিনশো টাকা হাতে নিয়ে বকুল আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল। এই তিনশো হবে তিন হাজার, তিন হাজার হবে তিন লাখ। সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল একটা বাড়ি, যেখানে থাকে শুধু মা আর মেয়ে। সদর দরজার বাইরে কৃপা-ভিক্ষুকের মতো বসে আছে দিলীপরঞ্জন। অনেক কষ্ট অনেক অপমান বকুল সহ্য করেছে।

সন্ধ্যাবেলায় আসে মিহির। মালবিকা নেই, বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি। এখন বলে যাওয়ার দরকার আর হয় না। বকুল প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলে, "মালির প্রথম রোজগারের টাকায় কেনা, সব তোমায় খেতে হবে বাবা।"

"নিশ্চয় খাব।" মিহিরের হাসিতে উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ল। তার চোয়াল শক্ত হওয়াটা বকুল লক্ষ করল না।

"মাসিমা, একটা কথা।"

"কী?"

"মালিকে আমি বিয়ে করতে চাই। বাবা-মার এতে অমত নেই। আপনারা মত দিলেই—।" মিহির শুধু 'হ্যাঁ' শোনার জন্য তাকিয়ে রইল। সে এদের মানসিক ও আর্থিক দৈন্যের আদ্যোপান্ত জেনে গেছে।

"আমাদের মত! বলছ কী বাবা, এ তো আমাদের পরম ভাগ্যি, মালিরও ভাগ্যি।"

কথাটা বলার পর বকুলের চোখ দিয়ে টসটস জল পড়ল। "এত বড় ঘর! এত ভাল ছেলে! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বাবা তুমি সত্যি বলছ তো?"

ঠিক সেই সময় সমীরণের শোবার ঘরে খাটের উপর শিথিলভাবে মালবিকা শুয়ে। সমীরণ বসে তার পাশে।

"সত্যি বলছ?" মালবিকার চোখে গাঢ় আবেগ।

"সত্যি বলছি।" সমীরণ ঝুঁকে মুখ নামিয়ে আনল। কপালে, গালে, চোখে তারপর আলতো চুমু দিল ঠোঁটে। চোখ বন্ধ হয়ে এল মালবিকার। দু'হাতে সমীরণের মুখটা ধরে ফিসফিস করল, "আমিও ভালবাসি, সত্যি বলছি। তোমাকে ছুঁয়ে।"

মালবিকার বুকে মুখ চেপে ধরল সমীরণ। ওর চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মালবিকা বলল, "সারাজীবন ভালবাসবে?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও বাসব। সারাজীবন তোমার থাকব।"

"আমিও থাকব।"

"আমাকে ছুঁয়ে বলো।"

সমীরণ মুখ তুলল। মালবিকা আকুল দৃষ্টিতে উত্তরের অপেক্ষায়। তার মনে হল, মেয়েটা সত্যিই ছেলেমানুষ। ছুঁয়ে বললেই ও বিশ্বাস করে নেবে নাকি এই সময় এই ধরনের কথাই বলতে ভাল লাগে!

"কোথায় ছুঁয়ে বলব? এখানে ছুঁয়ে?" সমীরণ ওর বুকের উপর হাত রাখল।

"হ্যাঁ, ওখানে ছুঁয়ে।"

"ব্লাউজটা না খুললে ছোঁব কী করে?"

"পাজি কোথাকার। যত বদ বুদ্ধি!"

"তা হলে ব্লাউজ ছুঁয়েই বলি?"

"না।" মালবিকার স্বর খসখসে হয়ে এল। চোখ আধ খোলা। সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে ঠোঁট। কপাল ঘেমে উঠেছে। "ওরা এসে পড়বে না তো?"

"থিয়েটার ভাঙতে এখনও অনেক দেরি। রবীন্দ্রসদন থেকে আসতেও সময় লাগবে।"

ব্লাউজের হুকে হাত দিয়ে মালবিকা বলল, "আলোটা নিভিয়ে দাও।"

প্রায় এক ঘণ্টা পর শিঞ্জিনীর ড্রেসিং টেবলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুঁচির পাট ঠিক করতে করতে মালবিকা বলল, "দেরি হয়ে গেল। বলে এসেছি আটটার মধ্যে ফিরব। এখনই আটটা বাজে।"

"কেন, কেউ কি অপেক্ষা করবে?" সমীরণ বিছানায় আধ শোওয়া হয়ে দেখছে কত দ্রুত মালবিকা নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে। "চুলটা আঁচড়ে নাও।"

শিঞ্জিনীর চিরুনিটা তুলে নিয়ে মালবিকা বলল, "কে আবার অপেক্ষা করবে? আমার জন্য তো ভাবে শুধু আমার মা।" আড়চোখে সে সমীরণের দিকে তাকাল। "আর কেউ না।"

সমীরণ চোখ মিটমিট করে হাসল। "তবু তোমার মা আছে ভাববার জন্য, আমার তো কেউ নেই।"

"কেন তোমার বউ?"

"ভাবে না। আলাদা থাকতে চায়।"

"ডিভোর্স করবে?" মালবিকার অজান্তেই তার গলায় প্রত্যাশার ছোঁয়া লাগল। সমীরণের কানে সেটা ধরা পড়ল। মনে মনে সে হাসল।

"এখনও তো ওর শরীর ভালই রয়েছে, বিয়ে করতে পারবে।" মালবিকা আয়নায় নিজেকে শেষবারের মতো দেখে নিল। সমীরণ উঠে বসল।

"তা পারবে, আমিও পারব।" ইঙ্গিতে ভরা হাসি সমীরণের মুখে খেলে গেল। মালবিকার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হল। 'আমিও পারব' বলে সমীরণ কী বোঝাতে চাইল?

নীচের থেকে "সমীরণদা আছেন নাকি?" বলে কার ডাক শোনা গেল। সমীরণ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "কে ভব নাকি? আয় আয়, ঘরে গিয়ে বোস, আমি আসছি।"

ঘরে ফিরে এসে সে মালবিকাকে বলল, "আমি ও-ঘরে যাচ্ছি, তুমি চুপচাপ বেরিয়ে যেয়ো।" পাশের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও সে ঘুরে এল। মালবিকাকে দু'হাতে বুকে টেনে নিয়ে পিষে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ গভীর চুমু দিল। সমীরণ ছেড়ে দিয়ে মুখ তোলামাত্র মালবিকা বলল, "আমি কিন্তু সবসময় তোমার জন্য ভাবব।"

সমীরণ মনে মনে আর একবার হাসল।

মালবিকা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী আবার যথেষ্ট বোকাও। তার মায়ের মতোই আবেগ, অনুভব, হর্ষ, বেদনা সে চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। পার্থিব সুখগুলি পাওয়ার জন্য তার ব্যাকুলতা যে-কোনও চতুর লোকের কাছেই ধরা পড়ে যায়। সে মিহিরকে অপছন্দ করে যেহেতু তার রূপ নেই, গুণ নেই, পরিচিতি নেই। আছে শুধু বিত্ত, যেটা মালবিকার বয়সের চোখে পছন্দের তৃতীয় সারিতে। এর উপরে কাঁধের চামড়ায় রয়েছে একটা সাদা দাগ। আবার মিহিরের মোটরে বেড়াতে, চিনা বা মোগলাই রেস্টুরেন্টে মিহিরের অর্থে খেতে, বাড়ির এবং পাড়ার লোকেদের দেখিয়ে মিহিরের মোটরে চড়তেও তার ভাল লাগে। তার চরিত্রের দুটো বিপরীত দিক রয়েছে এবং তাদের মধ্যে এতকাল কোনও সংঘাত ছিল না। কিন্তু এবার সেটা শুরু হল সমীরণের শোবার ঘর থেকে।

মালবিকা বাড়ি ফিরে দেখে ঘরে কেউ নেই। এই সময় বাবার থাকার কথা নয়, কিন্তু মা? বকুল তখন দোতলায় বড়জায়ের ঘরে। মেয়ে ফিরেছে খবর পেয়ে তিনতলায় ছুটেই উঠে এল।

"খবরটা বড়দিকে দিতে গেছলুম।"

"কী খবর?"

"দারুণ খবর।" বকুল খাটে বসেই আবার উঠে দাঁড়াল। "তোর বিয়ে! মিহির এই সন্ধেবেলায় বলে গেল তোকে বিয়ে করতে চায়।"

"ধ্যাত, কী আজেবাজে কথা বলছ!" মালবিকা শাড়ি বদলাবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকল। বকুল তার পিছু নিল।

"আজেবাজে বলছিস কেন, তোর মত নেই নাকি?"

"মত-অমতের কথা নয়। এখন বিয়েটিয়ে করা সম্ভব নয়, একদমই নয়। তা হলে গান শেখার বারোটা বেজে যাবে।"

"সে কী কথা! বিয়ে করে কেউ গাইয়ে হয়নি নাকি! ও-সব বাজে কথা ছাড়। আমি রাজি, তোর বাবার ইচ্ছেটাও জানি। দোতলার ওরা তো বলল, মালি ভাগ্য করে এসেছে বটে। উঁচু ঘর, বাপের এক ছেলে, এত ভাল ব্যবসা!"

"ব্যস, তা হলেই খুব সুপাত্র।" মালি রেগে উঠল। "আমার ওকে পছন্দ নয়।"

বকুল স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে রইল মেয়ের কথা শুনে। বলছে কী? মিহির সুপাত্র নয়!

"মিহিরকে তোর পছন্দ নয় কেন? বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা, বয়সও কম, দেখতে কুচ্ছিত নয়, লেখাপড়া করেছে, বংশ ভাল। বোন আমেরিকায় পড়ছে—।"

"থাক থাক। তোমার আর ওকালতি করতে হবে না। কেন পছন্দ নয় তা অত বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার মোট কথা ওকে ভাল লাগে না।"

"এটা কি একটা কথা হল? আমাদের সবাইয়ের পছন্দ, তার কি কোনও দাম নেই?"

"না নেই। বিয়ে করব আমি, আমার পছন্দেরও কি কোনও দাম নেই?"

"তুই এখনও ছোট, অভিজ্ঞতা নেই। দামাদামির কী বুঝিস।"

"ছোট বলেই তো এখন বিয়ে করতে চাই না। অভিজ্ঞতা আর একটু হোক। ততদিন বিয়ের কথা তুলো না।"

"এ-সব কী বোকার মতো বলছিস। অভিজ্ঞতা হতে হতে তো বুড়ি হয়ে যাবি। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, মিহিরকে বিয়ে করতে হবে তোকে। আহ্লাদিপনা দেখলে গা জ্বালা করে। পেটে ধরলুম, মানুষ করলুম, আর আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দাম নেই?" বকুলের গলা চড়ে উঠল। চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। মালবিকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাওয়ার টেবলে একটা চেয়ারে গুম হয়ে বসে রইল।

সমীরণের কাছ থেকে জীবনে প্রথম পাওয়া মাদকীয় সুখ দেহে বহন করে, একটা রমণীয় ভবিষ্যতের স্বপ্ন চোখে ধরিয়ে, উছলে ওঠা রোমাঞ্চের ধকল সামলাতে সামলাতে বাড়ি ফিরেই এ কী অবস্থার মধ্যে পড়তে হল! মালবিকা নিজের ঘরে খাটে বসল। মাথার মধ্যে এলোমেলো বাতাস আর শনশন শব্দ। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে সে কপালের উপর দুই বাহু রেখে চোখ বন্ধ করল। এখন তার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

আধ ঘুম, আধ জাগরণের মধ্যে সে টের পেল বাবা ফিরল। মদ খেয়ে আসেনি। দু'জনের কথা হচ্ছে তাকে নিয়েই। বিয়েরই কথা। একবার বাবা চেঁচিয়ে উঠল, "চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দোব।"

"আস্তে আস্তে।"

"বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দাও। গান শিখতে যাওয়া?...অত বাইরে বেরোলে বিগড়োবে না?...অপছন্দ! বাবা-মা যাকে পছন্দ করে দেবে তাকেই বিয়ে করতে হবে।...এ-সব হয়েছে তোমার জন্য।"

"আমার জন্য?"

"তবে না তো কী। যেমন বিদ্যেধরী মা তেমনি তার মেয়ে।"

"মেয়ে তো তোমারও।"

"হ্যাঁ আমারও। আর সেই জন্যই বলছি বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। নিজের কথা মনে নেই? কত ছেলে চরিয়ে বেড়াতে? আমাকে ফাঁসিয়ে তো বিয়েটা করলে, দ্যাখো গে মেয়ে এবার কাকে ফাঁসাচ্ছে।"

শুনতে শুনতে মালবিকার মনে হচ্ছিল, বাবা যদি মদ খেয়ে এসে মাকে দু'ঘা দিত তা হলেও ভাল ছিল। রাগটা বেরিয়ে গেলেই ঘুমিয়ে পড়ত। এ-ভাবে নোংরা নোংরা কথা তা হলে আর শুনতে হত না।

কিছুক্ষণ পর তার মনে হল, সমীরণকে সে কি ফাঁসাচ্ছে? সে-ও কি প্রেগনান্ট হবে! শিউরে উঠে মনে মনে বলল, না, না, না, এ-ভাবে নয়। তা হলে মায়ের মতো দশা হবে তার। বরং সমীরণের সঙ্গে কথা বলবে, ওর পরামর্শ চাইবে...পরামর্শ নয়, একটা আশ্বাস।

"মিহিরের বাড়িতে গিয়ে ওর বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে দিন পাকা করব। তুমিও যাবে। দেনা-পাওনার কথা কিছু বলেছে?"

"শুধু শাঁখা-সিঁদুর। ওরাই গয়না দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাবে, বরযাত্রী খাওয়ানোর খরচও দেবে।"

"খরচ তো আমাদেরও আছে। টাকার জোগাড় করতে হবে। খেতে দাও।"

পরদিন দুপুরে মালবিকা সেজজেঠি অর্চনার ঘর থেকে সমীরণকে ফোন করল। অবুকে মালবিকাই সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গানের ক্লাসে ভরতি করিয়ে দিয়েছে। চাকরের সঙ্গে সে বাসে যায় ও ফেরে। মালবিকার প্রতি অর্চনা প্রসন্ন।

ফোন ধরল সমীরণের চাকর অবনী।

"কে বলছেন?"

"আমি মালবিকা, সমীরণদাকে একবার ডেকে দেবে?"

"দাদা বাইরের ঘরে কথা বলছেন, লোক এয়েছে।"

"বলো এক মিনিটের জন্য আসতে।" মালবিকা আড়চোখে অর্চনার দিকে তাকাল। পিছন ফিরে বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছে। সমীরণের ফোন শোবার ঘরে। নিশ্চয় শিঞ্জিনী এখন ঘরে নেই, থাকলে ফোনটা সেই ধরত।

"হ্যালো, আমি মালি। একটু কথা বলার ছিল।" আড়চোখে সে অর্চনাকে দেখে নিল। ওয়াড় পরানো আর শেষই হচ্ছে না।

"খুব জরুরি কি?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়িতে কিছু কি বলেছে দেরি হওয়ার জন্য?" সমীরণের স্বরে উৎকণ্ঠা।

"না, অন্য ব্যাপারে কথা বলব।"

"কাল বললে হবে?"

"হবে।" গলা নামিয়ে মালবিকা বলল, "বাড়িতে নয়।"

ওদিকে কিছুক্ষণ চুপ। "সিরিয়াস কিছু?"

"হ্যাঁ।"

"কাল একটায় কলামন্দিরের সামনে থেকো, তুলে নিয়ে ক্লাবে যাব। ওখানেই লাঞ্চ। ঠিকমতো চিনে যেতে পারবে তো?"

"পারব। ঠিক আছে।"

ফোন রাখতেই অর্চনা বলল, "তোর মার কাছে কাল শুনলুম। মিহিরের বাড়িতে কবে কথা বলতে যাবে?"

"আজ-কালের মধ্যেই যাবে।"

"মিহিরও তো গান শেখে, এবার দু'জনে একসঙ্গে শিখবি। স্বামী-স্ত্রীর একই রকমের হবি থাকলে মন কষাকষি হয় না।"

"দেখি হয় কি না হয়।" মালবিকা পা বাড়াল লাজুক সুরে কথাটা বলে।

"দেখিস তোদের মনের মিল হবে, ছেলেটা ভাল।"

"আর মেয়েটা ভাল নয় বুঝি?"

মালবিকা উত্তর পাওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করেনি।

পরদিন একটার আগেই মালবিকা থিয়েটার রোডের মোড়ে মিনিবাস থেকে নামল।

সার্কুলার রোড পার হয়ে কলামন্দিরের ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। হাতঘড়ি দেখে মনে মনে সময়ের একটা হিসেব করল। সমীরণের সঙ্গে কথা বলা, খাওয়া, বাড়ি ফিরে যাওয়া চারটের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। সকালে দিলীপরঞ্জন চাঁচাছোলা ভাষায় তাকে জানিয়ে দিয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোলে ঠ্যাং ভেঙে দেবে। মালবিকা বিশ্বাস করে তার বাবা এই কাজটা করতে পারে। বকুল বারণ করেছিল। চারটের মধ্যে ফিরে আসবে কথা দিয়ে সে বেরিয়েছে। শুধু বলেছিল, "সমীরণদাকে বলে আসব, এবার থেকে আর গান শিখতে যাব না।"

ট্যাক্সিটা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়াল। রোদ-চশমা পরা সমীরণের মুখ জানলা দিয়ে একটু বার হয়ে তার দিকে তাকিয়ে। মালবিকা বুঝতে পারেনি। হাতছানিটা দেখে সে দ্রুত গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

"চিনতেই পারিনি।"

"চলিয়ে ভাই।" ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর সমীরণ বলল, "সে-জনাই পরা। মানুষের চোখ ঢেকে দিলে তাকে চেনা শক্ত।"

ট্যাক্সিওয়ালাকে সমীরণ বলেই রেখেছিল কোথায় যেতে হবে। ফটক দিয়ে ঢুকে ক্লাবের দরজায় ট্যাক্সি থামল। বাড়িটার জীর্ণ অবস্থা। কয়েক ধাপ উঠে সামনেই কাউন্টার। বাঁ দিকে কাঠের সিঁড়ি

দোতলায় উঠে গেছে। ধাপগুলো ক্ষয়া। ইংরেজ আমলের ক্লাব। কাউন্টারে টাই পরা মাঝবয়সি একটি লোক বসে। দেখে মনে হয় পুরনো কর্মচারী। সমীরণকে দেখে হাসল। খাতায় সই করে সমীরণ বলল, "সুইমিং পুলের ধারেই বসা যাক।"

মালবিকা কখনও এমন জায়গায় আসেনি। একটা হলঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে অন্য পাশে একটা ঘরে চড়া মেক আপ করা কয়েকজন বয়স্ক মহিলাকে তাস খেলতে দেখল। পুলের ধারে সার সার সাদা রং-করা টেবল ও কাঠের চেয়ার। প্রায় টেবলেই লোক বসে খাচ্ছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও রয়েছে। ওরা যে টেবলে বসল তার পাশেরটিতে এক মাঝবয়সি মহিলা। মুখটা ভাল, শরীর ভারী। দু'জন পুরুষের সঙ্গে বসে। ওরা সবাই বিয়ার খাচ্ছে। মহিলাটি সমীরণের দিকে তাকিয়ে হাসল।

"তোমায় চেনে।"

"আগে থিয়েটার করত এখন যাত্রায় গেছে। অনেকদিন পরে দেখছি।" কথাটা বলে টেবলে এসে দাঁড়ানো ওয়েটারের সেলাম নিয়ে সমীরণ বলল, "একটা বিয়ার, একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ, এই দিয়েই শুরু করা যাক। খাবারটা পরে হবে নাকি এখনই বলব?"

মালবিকার কাল থেকেই খিদে পাচ্ছে না। উত্তজনা, উদ্বেগ, ভয় সব মিলিয়ে খাওয়ার ইচ্ছেটা লোপ পেয়ে গেছে।

"আমার খিদে নেই।"

সমীবণ অপেক্ষমাণ ওয়েটারকে বলল, "ঠিক আছে আগে এটাই আনো।" তারপব মালবিকার দিকে তাকিয়ে রইল কোনও কথা না বলে।

মালবিকাব বুকটা কেঁপে গেল একবার। কালো কাচের চশমা পরা একটা নিথর মুখ কথা না বলে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন একটা মুখোশ। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না। আর তা না কবতে পাবলে সে আশ্বাস পাবে কী করে? তার মনে হচ্ছে সমীরণ তাকে কাছে আসতে দিতে চায় না।

'আমার...আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।" মালবিকা চোখ নামিয়ে আবার তুলল। সমীরণেব মুখে কোনও ভাবান্তর হতে সে দেখল না। শুনে চমকে উঠল না কেন সমীরণ!

"কী কবব?" আকুল স্বরে জানতে চাইল মালবিকা।

জবাব পেল না।

"শুনতে পাচ্ছ?"

"আজ সকালে টেলিফোন করে মিহির আমাকে বলেছে।" সমীরণের কণ্ঠ শীতল তাতে বিচলন নেই।

"কী বলেছে?" মালবিকা টেবলে হাত বেখে ঝুঁকে পড়ল।

"অনেক কথাই বলেছে। সবই আমার সম্পর্কে, তোমার তা শুনে কাজ নেই। শুয়োরের বাচ্চাকে আমি শিক্ষা দেব।"

মুখোশে কোনও ভাঁজ পড়তে দেখল না মালবিকা। ক্রোধ চাপার চেষ্টায় যে বিকৃতি ঘটে তার লেশমাত্র নেই। স্বরেও কোনও বৈকল্য নেই।

"বিয়ে তুমি করবে না। করলে তোমাব সর্বনাশ হবে। ওর কথা শুনে মনে হল, কোনও মতলব এঁটে বিয়েটা করতে চাইছে। একবার গোবরডাঙার কথাটা বলল। ওর গাড়ি থেকে আমার গাড়িতে, আমি নাকি জোর করে তোমাকে তুলিয়েছি।"

"সে কী! প্রতিভাদির অনুরোধেই তো আমি তোমার গাড়িতে গেছি।" মালবিকার সাহস হল না, মিহিরকে সে আসলে তখন কী বলেছিল, এখন সে-কথা বলতে।

"তাই বলেছিলে না আমার অনুবোধে বলেছিলে?"

মালবিকার বুক ধড়াস করে উঠল ভয়ে। মিথ্যা একবার যখন বলেইছে তখন সেটাই আঁকড়ে থাকা ভাল।

"মিহিরকে আমি প্রতিভাদির কথাই বলেছি। হয়তো ও ধরে নিয়েছে—", সমীরণের হাত তোলা দেখে সে কথা থামাল। বেয়ারা এসে গেছে টেবলে। কমলারঙের পানীয় মালবিকার সামনে রাখল। গ্লাসে বিয়ার ঢেলে বোতলটা রেখে বিলে সই করাল। সমীরণ তাকে বলল, 'দু' প্লেট ফিশ ফিঙ্গার দিয়ো।"

"আমি তোমার নামই করিনি। কিন্তু এ-সব কথা ফোনে তুলল কেন?" বেয়ারা চলে যেতেই মালবিকা বলল।

"জানি না। পুরনো একটা ঘটনা তুলে বলল রেপ করার জন্য আমি মেয়েদের গাড়িতে তুলি। ও নাকি আমাকে এক্সপোজ করবে। আমার খপ্পর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবে...শুয়োরের বাচ্চা, গাধার মতো একটা গলা, গান গেয়ে কিনা নাম করবে! সমীরণ মিত্তিরের রাইভাল হবে!" সমীরণ একচুমুকে গ্লাসের তিনভাগ শেষ করে আবার বোতল থেকে ঢেলে পূর্ণ করল।

মালবিকা মুখোশটায় এবার ফাটল দেখছে। গলার স্বরে উত্তাপ। "বিয়ে তুমি করবে না। করলেও মিহিরকে নয়।"

"মাকে আমি তাই বলেছি। ওকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাবা বলেছে বিয়ে করতেই হবে, মা-ও তাই চায়। আমি এখন কী করব?" মালবিকার অভ্যন্তরে ধস নামছে। কিছু একটা আঁকড়ে ধরার জন্য সে হাতড়াচ্ছে।

"আমার বিরুদ্ধে বাড়ির সবাই। আমার কোনও সহায় নেই। আমাকে তো বাবার আশ্রয়েই থাকতে হয়!" মালবিকার হঠাৎ-ই প্রতিভার একটা কথা এখন মনে পড়ল: 'লেখাপড়া শিখে এ-সব আমি মেনে নেব না', 'বলির পাঁঠা আমি হব না।' মনে মনে সে বলল, কিন্তু প্রতিভাদি আপনি তবু লেখাপড়া আর গান শিখেছেন, আমি যে কিছুই শিখিনি। আমাকে তো মেনে নিতেই হবে। মালবিকা মাথা নিচু করে রইল।

বিয়ার শেষ করে সমীরণ মুখ ঘুরিয়ে একটা আঙুল তুলে বেয়ারাকে ইশারা করল আর একটা বোতল আনার জন্য।

"আমাকে কিছু বলো।"

"বলেইছি তো। এ-বিয়ে তুমি করবে না।"

"বাবা লাথি মেরে বার করে দেবে বাড়ি থেকে।"

"দিলে বেরিয়ে আসবে।"

"যাব কোথায়, থাকব কোথায়?"

"চট করে এখনই বলা সম্ভব নয়। ভেবে বলতে হবে। রিস্‌ক আছে।"

পাশের টেবলে হাসির শব্দ উঠল। মালবিকা মুখ ঘুরিয়ে দেখল মহিলার আঙুলে সিগারেট। বুকের আঁচল সরে গেছে। টেবলের পাশে মেঝেয় পাঁচ-ছ'টা খালি বিয়ারের বোতল।

ফিশ ফিঙ্গার আর বিয়ার এল। বিলে সই হল। সমীরণ গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "খাচ্ছ না যে?"

"খেতে ইচ্ছে করছে না, আচ্ছা খাচ্ছি।" মালবিকা এক চুমুকে স্কোয়াশ শেষ করল। একটা ফিশ ফিঙ্গার তুলে কামড় দিল। চিবিয়ে গলা দিয়ে নামাবার জোর পাচ্ছে না। টুকরোটা মুখের মধ্যে রেখে দিল।

গ্লাস শেষ করে সমীরণ একদৃষ্টে পুলের জলের দিকে তাকিয়ে। মালবিকা চিবোতে শুরু করল। তারপর আর একটা তুলে সেটা হাতে ধরে বসে থাকল। মিনিট পাঁচেক পর দ্বিতীয় বোতলটা শেষ করে সমীরণ মুখ ফেরাল। মুখ লালচে দেখাচ্ছে।

"বিয়ের তোড়জোড় কতদূর?"

"কালই তো সবে কথা হল। এখনও তো বিয়ের দিনই ঠিক হয়নি, তারপর পাকাদেখা, কেনাকাটা, নেমন্তন্ন করা।"

"অ। তা হলে এখনও অনেক দেরি আছে।"

"অনেক আর কোথায়? দিন ঠিক হলে সাত দিনেও বিয়ে হয়।"

মালবিকার মনে হল কালো কাচের আড়াল থেকে একজোড়া তীব্র দৃষ্টি তাকে লক্ষ করছে। তার অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

"মন শক্ত করতে পারবে?"

"পারব।" মালবিকা অচঞ্চল স্বরে জানাল।

"বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?"

"পারব।" মালবিকার গলা এবারও কাঁপল না।
"আর কিন্তু ফিরতে পারবে না।"
"জানি।" মালবিকার গলা কঠিন হল।
সমীরণ কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক দু'হপ্তা পর তোমাকে ফোন করব। আজ কুড়ি তারিখ, চোদ্দো দিন পর চার তারিখ। দুপুর একটা থেকে সওয়া একটার মধ্যে ফোনের কাছে থাকবে। নম্বরটা আমার কাছে আছে।"
"ফোনের কাছে সেজজেঠি থাকে।"
"আমি সেইভাবেই কথা বলব।"
"কী বলবে তুমি ফোনে?"
সমীবণের মুখে হাসি ফুটল। পাতলা ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে গেল। সাদা দাঁতগুলো ঝলসানি দিল। তিলটা সরে গিয়ে ফিরে এল। ভ্রূ দুটো বেঁকে রয়েছে। মালবিকা বিমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল। তার ইচ্ছে করছে ঝাঁপিয়ে ওর পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে বুকে মুখটা ঘষতে। আর তার ভয় করছে না। কিছু একটা সমীরণ করবে তার জন্য। তাকে বাঁচাবে। মিহিরকে আর বিয়ে করতে হবে না। ওর ঘাড়ের সেই সাদাটা ওত পেতে রয়েছে। আমাকে সমীরণ বাঁচাবে।
মালবিকার মুখের উপর যা কিছু ফুটে উঠল সমীরণ তা লক্ষ করে যাচ্ছিল। ঝুঁকে মালবিকার মুখের দিকে মুখ এগিয়ে এনে গোপন কথা বলার মতো করে বলল, "বলব, আমি তোমাকে ভালবাসি।"
সমীরণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মালবিকার দুই চোখের কোণ বেয়ে জল নামল। সে মোছার চেষ্টা করল না।
"তোমাকে কখন বাড়ি ফিরতে হবে?"
"চারটের ভেতরে যেতেই হবে, মাকে কথা দিয়ে এসেছি। যদি বাবা এসে পড়ে? এখন তো আমায় চোখে চোখে রাখবে।"
"আমার মনে হয় মিহির তোমার মুভমেন্টের ওপর নজর রাখবে।"
"মতলব এঁটে বিয়ে করতে চাইছে বললে, কী মতলব?"
"সেটা কি ও খুলে আমায় বলবে? ওর কথা বলার ঢং থেকে মনে হল। হয়তো প্রতিভা ওকে কিছু বলে থাকতে পারে।"
প্রতিভা আর গান শেখাতে আসে না, মিহিরও আসে না গান শিখতে তা হলে ওদের দু'জনের দেখা হবে কী করে? মালবিকা দ্রুত ভেবে নিল। যদি ওদের দেখা হয়ে থাকেও তা হলে প্রতিভা যা বলবে তা শুনলে মিহিরের তো তাকে বিয়ে করতে চাওয়া উচিত নয়! মালবিকা নিশ্চিন্ত বোধ করল, প্রতিভার সঙ্গে মিহিরের দেখা না হওয়া সম্পর্কে। কিন্তু মিহিরের উপর সমীরণ এত রেগে গেল কেন? কী বলেছে সে যে-জন্য সমীরণ 'শুয়োরের বাচ্চা' বলল!
"এখন থেকে তুমি বাধ্য মেয়ের মতো বাড়িতে থাকবে। যে যা বলবে করবে। বিয়ে করতে রাজি নও, এ-সব কথা একদম বলবে না কেমন? দেখি কী করা যায়।"
"করবে তো?"
সমীরণ জবাব দিল না। শুধু তাকিয়ে রইল মালবিকার মুখের দিকে। ছমছম করে উঠল মালবিকার বুক। জীবনে এই প্রথম সে এমন একটা সংকটের মধ্যে পড়েছে, যেখানে সে পুরোপুরি অন্য একজনের নিয়ন্ত্রণেব আওতায় চলে গেছে। এমন একটা কাজ তাকে করতে হবে যার ফলাফল সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। নিজের ভাগ্য নিজে গড়ার মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের উত্তেজনা, ছমছমে ভয়, রহস্যে ভরা ভবিষ্যৎ, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তার কাছে জুয়া খেলার মতো লাগছে। যদি হার হয়? তা হলে কী যে তার অবস্থা হবে সে জানে না। মনে মনে সে বলল, ভগবান তুমি আমাকে দেখো।
সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় মিহির এল। তার গাড়িতেই বকুল ও দিলীপরঞ্জনকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। ঘণ্টা দুই পরে তাদের সে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তিনতলায় আর উঠল না।
উচ্ছ্বসিত বকুল মালবিকাকে বলল, "ওরা তো এইমাসেই বিয়ে দিতে চায়। মিহিরের মা বলল, পৌষ

মাস পড়ে গেলে আরও প্রায় দু'মাস দেরি হয়ে যাবে। অঘ্রানের আজ চার তারিখ। আঠাশ তারিখই ঠিক হল। মাঝে চব্বিশটা দিন। কীভাবে যে কী হবে!"

মালবিকা চুপ করে রইল। তার কথা বলার কিছু নেই। বকুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। মুখে প্রতিবাদ না দেখে সে আশ্বস্ত হল। "আর না বলিসনি মালি। বিয়ের দিন পর্যন্ত পাকা হয়ে গেছে, এরপরও যদি এ-বিয়ে না হয় তা হলে আমাদের মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। না ওদের কাছে, না এই বাড়িতে। তোর বাবার তো টাকাকড়ি বলতে কিছুই নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে হাজার পঁয়ত্রিশ হয়তো তুলতে পারবে, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি তো সোনাদানা নিয়ে এ-বাড়িতে আসিনি, শাশুড়ি দিয়েছিল সাড়ে তিন ভরির একটা গলার হার। তোর জেঠিরা যদি হাতে কানে গলায় একটা করে দেয়। উনি তাই কথা বলতে গেলেন দাদাদের সঙ্গে কিছু যদি পাওয়া যায়।" মেয়ের হাত ধরল বকুল তারপর হাতটা কাঁধে রাখল।

"তোমরা দিন যখন ঠিক করে ফেলেছ তারপর আর না বলি কী করে।" মালবিকা নম্র করে চোখে মুখে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে বলল। বাবার জন্য তার কষ্ট হচ্ছে জীবনে এই প্রথম।

বকুলের বুক থেকে যেন পাষাণ ভার নেমে গেল। খুশি চাপতে চাপতে বলল, "দেখিস এ বিয়েতে তোর ভালই হবে। বাপ-মা কি হাত পা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে চায়? টাকা না থাকলে সুখ শান্তি আসে না। মিহির ছেলে ভাল, টাকাকড়িও আছে। দেখতে শুনতেও তো খারাপ নয়।"

মালবিকার এ ক্ষেত্রেও কথা বলার কিছু নেই। তবু বলার জন্য বলল, "আমার বিয়ের জন্য বাবা ধারদেনায় জড়িয়ে পড়বে সেটা ভাবতে আমার খারাপ লাগছে। বড়জেঠিকে তো চিনি, তারপর চিমটি কেটে ঠেস দিয়ে কথা শোনাবে।"

"শোনাক। ওর নাতনিদেব বিয়ে তোর থেকে ভাল ঘরে হয় কি না দেখব। এই চব্বিশটা দিন তুই আর বাড়ি থেকে বেরোসনি। কথা দে।"

"দিলুম।"

"বাঁচালি আমায়।"

চারশোর মতো লোককে নেমন্তন্ন করা হবে। মালবিকা জানিয়ে দিয়েছে পাড়ার বা স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই, সুতরাং বলার মতো কেউই তার নেই। সমীরণ মিত্র আর শিঞ্জিনী বউদিকেও বলবে না। আত্মীয়-স্বজন বলতে জেঠিদের বাপের বাড়ি, বড়জেঠির বেয়াই বাড়ি, তিন পিসি আর বাবার দুই মামা। বাবার অফিসে, পাড়ার কয়েকটা বাড়িতে আর বরযাত্রীরা সব মিলিয়ে ধরা হয়েছে চারশো লোক।

বকুলের অ্যাডভোকেট বড়ভাসুর লিস্টিটা কাটছাঁট করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়: "অ্যাতো লোককে বলার দরকার কী, খরচের দিকটাও তো দেখতে হবে? দিলুর যা সঙ্গতি তাতে এই বাজারে চারশো লোককে খাওয়ানো, ওর পক্ষে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

বকুলের আপত্তিতে লিস্টি ছাঁটাই হয়নি।

দিলীপরঞ্জনকে সে বলে দিয়েছে, "দশটা নয়, দুটো নয় আমার একটাই মেয়ে। হোক খরচ। ওনার মেয়ের বিয়েতে বারোশো লোক খাইয়েছেন আর তোমার মেয়ের বিয়েতে চারশোও তুমি খাওয়াতে পারবে না? খরচ তো উনি দিচ্ছেন না।"

"তুমি চটছ কেন। আমার মুখের দিকে চেয়েই বড়দা কথাটা বলেছে। উনি বললেই আমি রাজি হব নাকি? আত্মীয় বাড়ি, বেয়াই বাড়ি না বললে হয়? এদের বাদ দিয়ে আমাদের বংশে কখনও কোনও বিয়ে হয়েছে? আমার বিয়ের কথাটা বাদ দাও, ওটা একসেপশন।" দিলীপরঞ্জনের শেষ বাক্যটি কোনও জ্বালা বা তিক্ততা নিয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে এল না। বরং বংশের ঐতিহ্য ভাঙা এই দুঃসাহসিক কাজটার জন্য প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব যেন রয়েছে।

"আজকাল কত মেয়ে যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করছে।" কথাটা বকুল বলল নিশ্চিন্ত স্বরে। মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে এখন স্বামীর সঙ্গে তার সখ্য গড়ে উঠছে। জীবনে এই প্রথম।

বকুলের লিস্টিতে শুধু তার মামারা আর দাদা-দিদি অর্থাৎ সুধাংশু এবং উমা। নিমন্ত্রণের কার্ড ছেপে আসার পর সে সন্ধ্যাবেলায় অর্চনার ঘর থেকে উমাকে ফোন করল।

"দিদি আপনার কাছে এই রোববারেই যাচ্ছি একটা ভাল খবর নিয়ে।"

"কী ভাল খবর?"

"বলুন তো কী হতে পারে!"

"ছেলেপুলে হবে নাকি?"

"ধ্যেত, কী যে বলেন না। এই বয়সে আবার ও-সব—", হর্ষে, পুলকে বকুলের বাকরোধ হল।

"এই বয়সে মানে? তোমার আর বয়স কত? তোমাকে দেখলে তো বিয়ে হয়েছে বলে মনেই হয় না। ভাল খবরটা কী? দিলীপবাবুকে তালাক দিয়ে আবার বিয়েটিয়ে করছ নাকি?"

সুখের সায়রে বকুল আবার অবগাহন করল। "আমি নয়, বিয়ে করছে আমার মেয়ে আর পাত্রটি হল মিহির।"

"বলো কী! সত্যিই ভাল খবর। রোববার আসছ? মালিকেও নিয়ে এসো, ওকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াব। এদের যে বিয়ে হতে পারে সেটা কিন্তু বকুল, আমি আঁচ করতুম। মিহির যে-ভাবে মালির দিকে তাকাত টাকাত, মুখচোখের ভাব যে-রকম হয়ে যেত তাতেই বুঝে গেছলুম একটা কিছু হতে পারে।'

"বিয়েব কথা মিহিরই পাড়ে।"

"পাড়বেই তো, মালি তো মায়ের মতোই সুন্দরী।"

"দিদি আপনি বড্ড আমাব পেছনে লাগেন।"

"আহা আমি যেন বাজে কথা বলছি। মালির গড়নপেটন, মুখশ্রী তোমার মতো কি নয়?"

"নিজের মেয়ে বলে বলছি না দিদি, মালি আমার থেকেও দেখতে ভাল, আমার থেকেও লম্বা, আব," ফোনে ঠোঁট প্রায় লাগিয়ে বকুল বলল, "আর ভীষণ সেক্সি। সে-জন্যই তো ওকে নিয়ে আমার ভয় ছিল। বিয়েটা হয়ে গেলে আমি বেঁচে যাই।"

"রোববার তা হলে ওকে নিয়ে আসছ তো?"

"হ্যাঁ, এগারো-বারোটা নাগাদ যাব।"

মালিব চারিদিকে ব্যস্ততা, সে কোনও কিছু নিয়ে ব্যস্ত নয়। কোনও ব্যাপারেই আগ্রহ দেখায় না আবাব উদাসীনতাও নেই।

তিনতলা থেকে সে প্রায় নামেই না। সেজজেঠির কাছ থেকে কয়েকটা সিনেমা ম্যাগাজিন নিয়ে এসেছে, তাবই পাতা ওলটায়। টেপরেকর্ডারে ফিল্মের গান শোনে। মিহিরের দেওয়া তানপুরাটা তার ছোট ঘরের এককোণে ফেলে রেখে দিয়েছে। নিজের অজান্তেই সে দিনে দু'-তিনবার ক্যালেন্ডারের দিকে তাকায়।

সত্যিই কি সমীরণের ফোন আসবে? নিশ্চয় আসবে। না আসবে না। আশায় এবং নিরাশায় দোলাদুলি কবতে করতে মন ঠিক এইরকম অবস্থাটাই বেছে নেয়। ঝোঁকটা তখন বেশি পড়ে নৈরাশ্যের দিকেই। যতই তার মনে হতে থাকে সমীরণের ফোন আসবে না ততই তার ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়ে উঠতে শুরু করে, নিজেকে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা বাড়ে। বহুবার সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, "ভুল করছি না তো?" উত্তর খুঁজতে গিয়ে সে অনেক রকমের উত্তর পায়। তাইতে সে ধাঁধায় পড়ে যায়।

বাড়িতে এখন উৎসবের মতো পরিবেশ। সবাই কোনও না কোনও ভাবে খুশির উত্তেজনা নিয়ে চলাফেরা করছে, কথা বলছে। সব থেকে বড় কথা, দিলীপরঞ্জন তার ভবিষ্যৎ পুঁজির অর্ধেকেরও বেশি ভাঙিয়ে এই উৎসবটা তৈরি করছে। বকুল তার অপমানিত জীবনকে সম্ভ্রম দেবার চেষ্টা করছে। এগুলোকে ধ্বংস করতে হবে ভাবতে মালবিকা বেদনা বোধ করে।

আবার সে এটাও ভাবে, যাকে ঘিরে ওরা আনন্দের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোনও দামই ওরা দিল না। উৎসবে বলি হবার জন্য তাকে রেওয়াজ করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কেন আমি পাঁঠা হব। প্রতিভাদি বলেছে, সে মেনে নেবে না। ভাল কথা। কিন্তু মেনে না নিয়ে সে কী পাচ্ছে এই ত্রিশ বছর বয়সে? সমীরণ মিত্তিরের কাছ থেকে অনেক পাবে ভেবে প্রতিভাদি, নিশ্চয় ওর সঙ্গে শুয়েছে। কিন্তু ভালবেসে শুয়েছে কি? সমীরণের মধ্যে ভালবাসা পাবার জন্য একটা কাঙাল রয়েছে। প্রতিভাদি কি সেই কাঙালটাকে ভুরিভোজ করাতে পেরেছে? সমীরণ ভীষণভাবে শরীর চায়। প্রতিভাদি কি ভীষণভাবে শরীর দিতে পেরেছে? আমি সেটা পারব।

মালবিকার এক একসময় চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—নেমন্তন্নর কার্ডগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। ডেকরেটারকে অ্যাডভান্সের টাকা দিয়ো না। ভিয়েনের বামুনের সঙ্গে কথা বোলো না। বেনারসি শাড়ি, পাঞ্জাবির তসরের কাপড়, জুতো, সোনার বোতাম, আংটি, নমস্কারির শাড়ি এ-সবের জন্য টাকা খরচ কোরো না। তোমরা কেউ জানো না আমি কী এক ভয়ংকর কাজ করতে চলেছি। আমার ইচ্ছা, আকাঙক্ষা পূরণের জন্য আমি জীবনকে বাজি ধরেছি।

মালবিকা এ-সময় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল। কাজটা সে করবেই। মায়ের মতো আমি হব না। একটা বাজে লোককে বিয়ে করার জন্য মা আমাকে পেটে ধরেছিল। আমি এই ভুল করব না। সমীরণকে বিয়েতে বাধ্য করাতে চাই না। যেমন স্বামী হয়ে রয়েছে তেমনই শিঞ্জিনীরই থাকুক। ও শুধু আমাকে ভালবাসুক, ওর মন আমার দখলে থাকুক। সমীরণ খুব সুন্দর, আমি পছন্দ করি সুন্দর পুরুষকে। আমি চাই নিজের মতো করে জীবনকে ভোগ করতে। কেন ভোগ করব না? জীবনটা তো আমারই। তোমরা কেন তাকে ঘাড় ধরে খাঁচায় পুরতে চাও? আমার স্বাধীনতা আমারই হাতে থাকবে।

"প্রায়ই দেখি তুই আপনমনে বিড় বিড় করছিস, ব্যাপার কী?" বকুল একসময় বলল। মালবিকা তখন তার ঘরে শুয়ে।

"কই, কিছু তো নয়! বিড় বিড় করেছি নাকি?" উঠে বসল মালবিকা।

"তোর মনে এখনও বোধহয় এ-বিয়েতে আপত্তি রয়ে গেছে।"

"না না, আমি তো রাজি বলেইছি।"

বকুল তীক্ষ্ণ চোখে মেয়ের মুখ লক্ষ করল। অবশেষে কঠিন হয়ে গেল তার দৃষ্টি।

"মনকে ঠিক করে নে মালি। এ-বিয়েতে সবার ইচ্ছে রয়েছে এটা ভুলে যাসনি।"

"আমি মনকে ঠিক করেই নিয়েছি।"

"তোর মুখে হাসি নেই, কেন?"

"হাসতেই হবে এমন কোনও কথা আছে?"

"লোকে দেখলে বলবে কী? আজ বাদে কাল বিয়ে হতে যাচ্ছে যার, তার মুখে হাসি নেই, দৃষ্টিকটু লাগে।"

"আচ্ছা হাসব।" মালবিকা শুয়ে পড়ল।

"রোববার পাতিপুকুরে মুখে যেন হাসি থাকে।"

সমীরণের বলে দেওয়া চোদ্দো দিন এল শুক্রবারে। মালবিকা একটার মিনিট পাঁচেক আগেই অর্চনার ঘরে একটা ম্যাগাজিন হাতে হাজির হল।"

"কী রে এই সময়ে?" অর্চনা আলমারির পাল্লায় আঁটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতে মুখে ময়েশ্চারাইজার লোশন ঘষা বন্ধ রেখে বলল। স্নান সেরে এইমাত্র সে ঘরে এসেছে।

"এটা ফেরত দিতে এলুম।" একটু থেমে মালবিকা বলল, "গানের স্কুলের প্রতিভাদিকে বলেছিলুম একটা নাগাদ ফোন করতে, এখানে।" সে ফোনের এমন কাছাকাছি দাঁড়াল যাতে বেজে ওঠামাত্র হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিতে পারে।

"উনি তো গানের স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, অবু কবে যেন বলল।"

"হ্যাঁ, কী নিয়ে যেন শিঞ্জিনী বউদির সঙ্গে খটাখটি হতেই ছেড়ে দিয়েছেন। প্রতিভাদি মানুষটি খুব ভাল, যত্ন নিয়ে শেখান, আমাকে তো উনিই শেখাতেন। ওঁকে বলে রেখেছি আমার বিয়েতে আসতেই হবে।"

"এলে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিস তো। বাড়িতে এসে যদি অবুকে শেখাতে রাজি হন, তা হলে রাখব।"

"বলব। তবে বিয়ের দিন আসতে পারবেন কি না সেটাই ফোনে জানিয়ে দেবেন। প্রতিভাদির শিরদাঁড়ায় কী যেন একটা হয়েছে, এই মাসেই অপারেশন হবার কথা।"

"শিরদাঁড়ায়? তা হলে তো মেজর অপারেশন। তোর বিয়ের আগে হলে আর আসতে পারবেন না।"

এই সময়েই ফোন বেজে উঠল এবং ঝটকা দিয়ে মালবিকার হাত তুলে নিল রিসিভারটা।

“হ্যালো কে, প্রতিভাদি? আমি মালবিকা।”
“তোমার সেজজেঠি কি পাশেই?”
“হ্যাঁ, তোমার অপারেশন কবে?”
“পরশু রোববার, গানের স্কুল সাতটায় বন্ধ হবে। তারপরই তুমি চলে এসো। শিঞ্জিনী পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে যাবে, অবনীও ওর সঙ্গে যাবে। আমাদের খাট-বিছানা, আলমারি এমনকী টিভি, ফ্রিজও ওখানে পরশু চলে গেছে। সোমবার সকালে তোমায় কল্যাণীতে একজনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব। কোনও ভয় নেই। ও কে? তুমি আসছ?”
“হ্যাঁ। আটাশে অঘ্রান মানে চোদ্দোই ডিসেম্বর বিয়ের দিন তুমি তা হলে আসতে পারবে না?”
“দিন পাকা হয়ে গেছে?”
“হ্যাঁ। কী করে আর আসতে বলব, ডাক্তার যখন দিন ঠিকই করে ফেলেছে।”
“তা হলে পরশু। ভয় করছে?”
“না, একদমই না।”
ওধারে সমীরণ ফোন রেখে দিল। অর্চনা খাটের উপর পড়ে থাকা সেদিনের খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে। মালবিকা বলল, “প্রতিভাদির অপারেশনের ডেট পরশু।”
“কী যে হচ্ছে এই রাম জন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ নিয়ে, পরশু আবার করসেবা করবে।...হ্যাঁ, কী বললি, প্রতিভাদির অপারেশন হবে পরশু? তা হলে তোর বিয়েতে আসছেন না।” বলেই অর্চনা খবরের কাগজটা তুলে নিল।
“রাম জন্মভূমি নিয়ে পরশু কী হবে?” মালবিকা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল। সমীরণ বলেছে পরশু সন্ধ্যা সাতটায়।
“অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি ঘিরে একর তিনেকের একটা জমি নিয়ে মামলা হচ্ছে এলাহাবাদ হাইকোর্টে। রায় বেরোবে এগারো তারিখে। সেই জমিটায় মন্দির করতে চায় হিন্দুরা। পরশু লাখ লাখ লোক গিয়ে সেখানে ঝাঁট দিয়ে, গর্ত টর্ত বুজিয়ে, জল ঢেলে পরিষ্কার করবে। লিখেছে, প্রায় দেড়লাখ করসেবক দেশের নানা জায়গা থেকে অযোধ্যায় হাজির হয়ে গেছে। তার মানেই ঝামেলা, একটা বড় রকমের গণ্ডগোল হবে। অবশ্য দু'জন নেতা প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছে সংঘাত হবে না। কিন্তু নেতাদের কথা আজকাল কি কেউ আর মানে?” অর্চনা খবরের কাগজ থেকে খুঁটে খুঁটে খবর তুলে তার সঙ্গে জুড়ে দিল নিজের মন্তব্যটা।
“অযোধ্যায় সেদিন গণ্ডগোল হলে কলকাতায়ও কি হবে?” মালবিকার অস্বস্তি লাগছে। রবিবারে এই গণ্ডগোল সম্ভাবনার কথাটা শুনে। রবিবারেই সমীরণ তাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেছে।
“কলকাতায় কখন যে কী হয় কেউ কি বলতে পারে? এই তো আড়াইমাস আগে ফুলবাগান থানায় কী হল? তার আগে বানতলা? কিছু বলা যায় না। ইন্দিরা গান্ধী যখন মারা গেলেন তুই তখন অবুর বয়সি। তোর মনে আছে কি না জানি না, দুপুর থেকে কলকাতায় সে কী হাঙ্গামা, গণ্ডগোল। ট্রাম বাসে আগুন, লুটপাট, বাচ্চাদের স্কুল বাসকেও রেহাই দেয়নি, ট্রেন বন্ধ।”
“ও-সব তো গুণ্ডাদের কাজ।”
“তবে না তো কী! চারিদিকে গুণ্ডারা ওত পেতে রয়েছে, একটা ছুতো পেলেই হল। শুধু তো রাম নয় তার সঙ্গে বাবরিও রয়েছে। অযোধ্যায় কিছু একটা ঘটে গেলে সারা দেশে আগুন লেগে যাবে। অবু বড় হচ্ছে, এইবার আমার দুর্ভাবনা শুরু হল।”
মালবিকা হেসে বলল, “আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনা হয় না?”
“হয় না আবার!”
কাহিনী যেখান থেকে শুরু হয়েছিল এবার আমরা ফের সেখানে চলে যাব। সুধাংশু এবং উমার বাড়িতে। রবিবার মালবিকা তার মায়ের সঙ্গে সেখানে আসছে আইবুড়ো ভাত খেতে। সুধাংশু বাজার থেকে চিংড়ি এনেছেন। রান্নাঘরের ভিতরে কল্যাণ চিংড়ির খোসা ছাড়াতে বসেছে। ঘণ্ট করবেন বলে উমা গতকাল একটা মোচা কিনে রেখেছেন আর কিনেছেন দেড়শো টাকা দিয়ে মালবিকার জন্য একটা ছাপা শাড়ি।

রান্নাঘরের দরজা থেকে একটু দূরে চেয়ারে বসে সুধাংশু খবরের কাগজ থেকে দেশের হালচাল সম্পর্কে স্ত্রীকে ওয়াকিবহাল করার জন্য একটু গলা চড়িয়ে খবর শোনাচ্ছেন। উমা তখন চা তৈরি করায় ব্যস্ত।

"শুনছ, আজ অযোধ্যায় করসেবা। সরযূ নদী থেকে হাতে করে, চাদরে করে বালি এনে জন্মভূমি পরিসরে তৈরি কংক্রিট প্ল্যাটফর্মের আশপাশের গর্ত ভরাট করবে। এক হাজার এক হাজার করে এক একটা ব্যাচে আসবে বালি দিয়ে গর্তটর্ত ভরিয়ে চলে যাবে। এর পাশাপাশি চলবে প্ল্যাটফর্মটা সাফাইয়ের কাজ। তোমায় তো কাল বলেই ছিলুম হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে যতক্ষণ না তারা রায় দিচ্ছে ততক্ষণ কোনও নির্মাণ কাজ করা যাবে না। বি জে পি-আর এস এস বলেছে, প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছে আদালতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে তারা পালন করবে। গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়ে পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেদিকে নজর রাখবে।"

"তা হলে বলছ ভালয় ভালয় করসেবা হয়ে যাবে?" রান্নাঘর থেকে উমা জানতে চাইলেন।

"হয়ে যাওয়া তো উচিত। নেতারা তো ছেলেমানুষ নয় যে প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে।"

"প্রধানমন্ত্রী তো সাধুদের সঙ্গেও কথা বলেছেন।"

"তাইতেই তো জ্যোতিবাবু রেগে গেছেন। কাল তোমায় শোনালুম না, ময়দানের একটা মিটিংয়ে উনি বলেছেন—প্রধানমন্ত্রী সাধুসন্তদের সঙ্গে কথা বলছেন কেন? স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছর পরও সাধুরা দেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবেন নাকি?"

"ঠিকই তো বলেছেন...হ্যাঁ গো, জ্যোতিবাবু ঠিক বলেছেন তো?" উমা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলেন, জ্যোতিবাবুকে সমর্থন করাটা তার ঠিক হয়েছে কি না।

সুধাংশু স্ত্রীর উদ্বেগ প্রশমনের চেষ্টা না করে অন্য খবরে চলে গেলেন। "জ্যোতিবাবুর নির্বাচনী কেন্দ্র সাতগাছিয়ায় কাল মমতা ব্যানার্জি মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে এসেছে।"

"সত্যি!" উমা রান্নাঘরের দরজায় প্রায় ছুটে এলেন। "যাই বলো বাপু, মেয়েটা করে দেখাল বটে। জ্যোতিবাবুর ঘণ্টাও বাজিয়ে দিয়ে এল? এবার কোথাও ঘণ্টা বাজালে আমাকে বোলো তো, শুনে আসব।"

"আচ্ছা বলব তোমায়।" সুধাংশু মৃত্যুঘণ্টার পাশের খবরটায় চলে গেলেন এবং কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লেন। চায়ের কাপ টেবলে রেখে উমা ফিরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হল সুধাংশু যেন বললেন, "সর্বনাশ!"

"কীসের সর্বনাশ? কার সর্বনাশ?"

"লরি, টেম্পো, ট্রাক, ম্যাটাডোরে মড়া নিয়ে যেতে দেবে না কর্পোরেশন। কারণ ওই সমস্ত গাড়িতে করেই ফলমূল, শাকসবজি, মাছ নিয়ে যাওয়া হয়। বলছে, সংক্রামক রোগের জীবাণু মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে মানুষের শরীরে, যেমন যক্ষ্মার জীবাণু। তার মানে লরি টেম্পোয় রোগের জীবাণু রয়ে যায় আর সেগুলো সংক্রামিত হয় কলমি-পালং, আলুপটল, টিংড়ি, ট্যাংরা, তেলাপিয়ায়। সাংঘাতিক। এগুলোই তো খাই।"

উমা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। সুধাংশুর দিশাহারা দৃষ্টি স্ত্রীর মুখে।

"এখান থেকে নিমতলা ঘাট কতদূর জানো?"

"টেম্পো ম্যাটাডোর বন্ধ করে দিলে আমাদের জন্য খোকার কত কষ্ট হবে ভাবো তো," উমা বিপন্ন স্বরে বলল।

"চিংড়িমাছ, মুলো, পালং এই যে বাজার থেকে আনলুম এগুলো লরি কি ম্যাটাডোরেই তো বাজারে এসেছে।" সুধাংশু চিন্তায় পড়ে গেলেন। খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বসার ঘরে গিয়ে টিভি সেট খুলে সোফায় বসলেন। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য তখন দূরদর্শনে কনসার্ট বাজছে! উমা রান্নাঘরে গিয়ে বঁটি পেতে বসলেন মোচাটা নিয়ে।

ওরা বারোটা নাগাদ এসে পৌঁছল। সন্দেশের বাক্সটা উমার হাতে দিয়ে বকুল ইশারা করল মালবিকাকে প্রণাম করার জন্য। "আর বলবেন না দিদি, বেলগাছিয়ার মোড়ে যা ট্র্যাফিক জ্যাম!"

প্রণাম নিয়ে মালবিকার চিবুক নেড়ে উমা বললেন, "সুখী হও মা। স্বামীর ভালবাসা পাও, শতপুত্রের জননী হও—"

"গান্ধারী হতে বলছেন মাসিমা?"

উমা থতমত হয়ে হেসে ফেলেন। "হ্যাঁ তাই হতে বলছি।"

"আপনাদের দু'জনেরই কিন্তু একটি করে। বাকি নিরানব্বইটি এখনও ডিউ রয়েছে।"

উমার হাসির শব্দে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুধাংশু।

"মেয়ের কথা শোনো। বলে কিনা বাকি নিরানব্বইটা কই?" উমা হাসি থামিয়ে হাসির কারণটা বলতেই সুধাংশুও হেসে উঠলেন।

"তোমার তো আর বয়স নেই, নইলে চেষ্টা করে দেখতে পারতে, তবে বকুল কিন্তু ইচ্ছে করলেই নিরানব্বইকে নব্বুই করতে পারে।"

"ধ্যাত, কী যে বলেন, আপনার জিভের কোনও আড় নেই।"

বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য মালবিকার মনে হল তার মা শুধু সুন্দরীই নয়, তারই সমবয়সি। তারপরই বিষাদ তাকে স্পর্শ করল। তার হাতব্যাগে কয়েক লাইনের একটা চিঠি রয়েছে। মাকে লেখা। সেই চিঠি পড়ে মায়ের এই সুখের উচ্ছলতা আর কয়েক ঘণ্টা পর কীসে যে রূপান্তরিত হবে মালবিকা আন্দাজ করতে ভয় পেল।

এখন তাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। সবার চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে তো যেতেই হবে, তাই নয়, তার বাসে ওঠার আগে পর্যন্ত কেউ যেন না বুঝতে পারে সে বেরিয়ে গেছে। এ-জন্য কম করে দশটা মিনিট তার চাই। খোঁজ করতে নিশ্চয় বাস-স্টপ পর্যন্ত ওরা ছুটে আসবে, তার আগেই তাকে বাসে উঠে পড়তে হবে। প্রচুর বাস শ্যামবাজারের দিকে যায়। যে-কোনও একটায় উঠে পড়া। শ্যামবাজার থেকে মানিকতলা মোড়। সেখান থেকে হেঁটে আমহার্স্ট স্ট্রিট।

সমীরণ বলেছে স্কুল বন্ধের পর সাতটায় যেতে। কিন্তু তাকে তো অনেক আগেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বেরিয়ে সে সাতটা পর্যন্ত সময় কাটাবে কী করে? রাস্তায় ঘোরাঘুরি তো কোনওমতেই নয়, চেনা লোকেরা তাকে দেখে ফেলতে পারে।

বসার ঘরে মালবিকা আর সুধাংশু টিভি-তে একটা তামিল ফিল্ম দেখছিল। ইংরেজি সাব-টাইটেলের সব কথা বুঝতে না পারলেও ছবিটা মালবিকাব মজারই লাগছিল। তখন উমা আর বকুল ঘরে ঢুকল।

"মালি এই নে, তোর আইবুড়ো ভাতের কাপড়।"

উমা সেলোফোনের মোড়ক থেকে ছাপা শাড়িটা বার করে মালবিকার হাতে দিলেন। সে জানত একটা কাপড় পাবেই তাই অবাক হল না বা হবার ভান করল না। শাড়ির প্রিন্ট দেখেই তার ভাল লাগল। বড় বড় লাল ফুল তার খুব পছন্দের।

"পছন্দ হয়েছে?"

মালবিকা হাসল। তিনজনকে প্রণাম করল, আর তখনই একবার মিহিরকে তার মনে পড়ল। বেচারা! শুধু বাড়ি গাড়ি, টাকাপয়সা আর শিক্ষাই একটা মেয়ের কাছে সব নয়। আবও কিছু তার দরকার। দরকার শরীর আর মনকে মাতিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। তুমিও হাত ধরেছ, সমীরণও হাত ধরেছে কিন্তু শরীর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল একজনের ধরাতেই। এটা একটা মেয়ের কাছে কম কথা নয়।

"হবে না কেন, আমারই তো পরতে ইচ্ছে করছে।" বকুল বলল। শুনে উমার মুখে খুশি ফুটল। বকুল এটাই চেয়েছিল।

'দুটো প্রায় বাজতে চলল। আর দশ মিনিটের মধ্যেই খেতে দিচ্ছি। এসো বকুল আমাকে একটু সাহায্য করো", বকুলকে নিয়ে উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুধাংশু ও মালবিকা কিছুক্ষণ টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকার পর একটা গানের দৃশ্যে ঘাসে চিতপাত নায়কের বুকের উপর নায়িকার শরীরঘর্ষণ সুধাংশুকে অস্বস্তিতে ফেলল। তিনি উশখুশ করে আড়চোখে দেখলেন মালবিকা মন দিয়ে দৃশ্যটা দেখছে, চোখদুটি উজ্জ্বল।

"সমীরণের কাছে গান শিখছ?" সুধাংশু চাইলেন দৃশ্যটাকে কথা দিয়ে আড়ালে পাঠিয়ে দিতে।"

"না।" মালবিকা চোখ ফিরিয়ে আনল স্ক্রিন থেকে।

"সমীরণ শেখাচ্ছে না?"

"আমিই আর শিখতে যাই না।" সুধাংশু পরের প্রশ্নের আগেই মালবিকা বলল, "শিখে আর কী হবে, বিয়ে তো হয়েই যাচ্ছে।"

"হোক না বিয়ে, তাই বলে শেখা বন্ধ হবে কেন!"

"মিহির পছন্দ করে না সমীরণ মিত্রকে। ওনার সম্পর্কে মিহিরের ধারণা খুব খারাপ, স্বভাবচরিত্র নাকি ভাল নয়।"

সুধাংশু অপ্রতিভ বোধ করলেন। সমীরণকে তিনি ওর বালক বয়স থেকে চেনেন। পাড়ার ছেলে। বাড়িতেও আসা যাওয়া ছিল। তাকে শ্রদ্ধা করে। তার সম্পর্কে মন্দ কথা শুনতে ভাল লাগল না। "মিহির তো ওর ছাত্র, সে এমন কথা বলল! তোমার কী মনে হয় সমীরণ সম্পর্কে?"

"মিহির ওর কাছে শেখা ছেড়ে দিয়েছে। আমার নিজের মনে হয় সমীরণদার চরিত্র খুব ভাল। কেন জানি মিহির ওকে হঠাৎ-ই অপছন্দ করতে শুরু করেছে। বিয়ের পর মিহির নিশ্চয়ই ওর কাছে আমায় গান শিখতে দেবে না।" মালবিকা সহজ সুরে বলে গেল। মুখে যে বিমর্ষতা থাকা কথা তা নেই।

"এবার এসো তোমরা, ভাত দিয়েছি।" ভিতর থেকে উমার গলা ভেসে এল। ওরা দু'জন টেবলে গিয়ে বসল।

"বেশি কিছু করিনি। সুক্তো, ডাল, বেগুনভাজা, দু'রকম মাছ আর দই মিষ্টি। বকুল বসে পড়ো।"

"দিদি আপনি?"

"আমি পরে বসছি।"

খাওয়ার সময় হাসিঠাট্টা হল। সবার সঙ্গে মালবিকাও হাসল। সর্ষে-চিংড়ি চেয়ে নিয়ে খেল। মিহিররা শুধু শাঁখা সিঁদুর ছাড়া আর কিছু নেবে না শুনে উমা জানিয়ে দিলেন, প্রভাংশুকে টিভি সেট, ফ্রিজ দিতে চেয়েছিল শ্বশুর, কিন্তু তাঁরা নেননি। এর পর সুধাংশু কথাটা তুললেন, "মিহির নাকি সমীরণকে পছন্দ করে না, মালিই বলল। ওর নাকি স্বভাব চরিত্র ভাল নয়।"

"কেন, ও তো ভাল ছেলে!" উমা অবাক হলেন। "মিহির এটা ঠিক বলেনি। কবে থেকে ওকে চিনি।"

"তুমি যখন চিনতে তখন ভাল দিল, এখন হয়তো বদলে গেছে। মানুষ কি চিরকাল একরকম থাকে?" কথার সুরে বুঝিয়ে দিলেন সুধাংশু আলোচনাটা বন্ধ থাক।

খেয়ে উঠে বেসিনের কলে হাত ধোবার সময় বকুল চাপাস্বরে মেয়ের কাছে জানতে চাইল, "মিহির তোকে সমীরণ মিত্র সম্পর্কে কী বলেছে?"

"মিহির তো বলেনি। সমীরণদাই আমাকে বলেছেন।"

"কবে তোকে বলেছেন?"

"তা দিয়ে তোমার কী দরকার?" বিরক্তি জানাল মালবিকা। ভাল মেয়ে হয়ে সে ক'টা দিন কাটিয়েছে, সব কথায় সায় দিয়ে গেছে। এখন আর কীসের পরোয়া?

"এ-সব কথা এখানে বলার কী দরকার।"

"বেশ করেছি বলেছি, চুপ করো তো।"

শোবার ঘরের খাটটা বেশ বড়। উমা আর বকুল পাশাপাশি শুয়ে কথা বলছে। সুধাংশু ছেলের ঘরে খাটে শুয়ে খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরে রবিবারের গল্পটা পড়ছেন। মালবিকা বসার ঘরে সোফায় কাত হয়ে, টিভি-তে চোখ রেখে শুয়ে আছে। ইংরেজি খবর হয়ে গিয়ে ফিল্মের শেষ অংশটা এবার শুরু হয়েছে।

চোখ টিভি-র স্ক্রিনে থাকলেও মালবিকা ফিল্ম দেখছিল না। এই সময় তার মাথায় ঘুরছে একটা ফিল্ম প্রোজেক্টার যন্ত্র। তার মনের পর্দায়, সারি দিয়ে চলছে টুকরো টুকরো ঘটনা, কথা। সে কখনও ঝাপসা, কখনও স্পষ্টভাবে দেখতে পেল তার শৈশব, বাল্য, কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত। এইগুলোর মধ্য থেকে সে সহানুভূতি দরদ আর ভালবাসা শুধু সমীরণ ছাড়া আর কারুর মধ্যেই দেখতে পেল না। সে বারবার বকুলকে খোঁজার চেষ্টা করল তার বিশ্বাস, আস্থা সমর্পণ করার মতো একটা মানুষ হিসেবে। সে পারল না।

একসময় সে ঘড়িতে সময় দেখল। উঠে বসল। সাতটা বাজতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকি। টিভি বন্ধ

করে নিঃসাড়ে সে শোবার ঘরে এল। বকুল পাশ ফিরে আর উমা চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাস দেখে সে বুঝল ওরা ঘুমের গাঢ় অবস্থায়। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল সুধাংশু গভীর ঘুমে, খবরের কাগজটা মেঝেয় পড়ে রয়েছে। কল্যাণকে সে দেখতে পেল না।

এইটেই সময়। আর দেরি করলে ওরা উঠে পড়বে। মালবিকা সেলোফেন মোড়কে ভরা আইবুড়ো ভাতের শাড়িটা সাবধানে তুলে নিল। বকুলের কাশ্মীরি শালের নীচে তার হাত-ব্যাগটা চাপা রয়েছে। ব্যাগটা বার করে চেইন টেনে খুলল। ছোট্ট একটা চিঠি বার করে চারধারে তাকাল। কোথায় রেখে যাবে?

ডাইনিং টেবলের উপর? এই শালটার নীচে। আয়নার সামনে চিরুনি চাপা দিয়ে? ঘুম থেকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে যেন না চিঠিটা পায় এই ভেবে সে ঘরের বাইরে এল। পাম্প শু্য পরল। বসার ঘরে টিভি সেটটা চোখে পড়তেই তার মনে হল ওর উপর রাখলে টিভি চালাতে গিয়ে একসময় চোখে পড়বে। চিঠিটা সেটের উপর রেখে মালবিকা অ্যাশট্রে চাপাল তার উপর।

আর কী তার করার আছে? আছে, উর্ধ্বশ্বাসে এবার বাস স্টপের দিকে যাওয়া। সন্তর্পণে সদর দরজার ছিটকিনি খুলে মালবিকা বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। রাস্তায় লোক চলছে, তবে কম। এখন তাকে কেউ দেখল কি না দেখল তাতে তার কিছু আসে যায় না। সে দ্রুত পা চালাল বাস রাস্তার দিকে।

বাসনমাজার ঝি সদরের বেল বাজাতে ওদের ঘুম ভাঙে। দরজাটা যে খোলাই রয়েছে সে বুঝতে পারেনি। উমা প্রথম খাট থেকে নেমে রান্নাঘরে যান। এই সময় তাঁকে চা করতে হয়। বকুল ঘুমোচ্ছে কিন্তু মালি কোথায়? মিনিট তিন-চার পর বকুল যখন ডাইনিং টেবলে বসে মাথায় হাত দিল, মালবিকা তখন শ্যামবাজারে নেমে আর একটা বাসে উঠছে। যখন সে মানিকতলায় নামবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে তখন সুধাংশু চিঠিটা দিচ্ছেন বকুলের হাতে।

"দিদি, মালি চলে গেছে।...এবার কী হবে।" বকুল চিঠিটি উমার দিকে বাড়িয়ে ধরে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে উমা পড়তে এবং শোনাতে লাগলেন সুধাংশুকে। "মা, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও দাম তোমাদের কাছে নেই। এই বিয়েটা নিজেদের তৃপ্তির জন্য দিচ্ছ। তোমাদের ইচ্ছার কাছে আমি বলির পাঁঠা হব না। আমি চলে যাচ্ছি কলকাতার বাইরে। খোঁজ করার চেষ্টা কোরো না। তুমি কষ্ট পাবে জানি কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রণাম নিয়ো, ইতি হতভাগিনী মালি।"

চিঠিতে অনেকগুলো বানান ভুল। উমা হাত রাখলেন টেবলে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদা বকুলের মাথায়। তার চোখে অসহায় বেদনা। সুধাংশু বসার ঘরে গিয়ে সোফায় আশ্রয় নিলেন।

"দিদি ওদের সবাইকে আমি এবার কী বলব? মালির বাবার সামনে আমি দাঁড়াব কী করে? আমায় বলেছিল মেয়ে যেন বাড়ির বাইরে না যায়, এখন আমি কী জবাব দোব, বলে দিন আমায়।" বকুল মুখ তুলে তাকাল উমার দিকে। উমার মুখ পাংশু হয়ে গেল। তাদের বাড়িতেই ঘটনাটা ঘটল। এর দায় তাদের ঘাড়েও এসে পড়ছে।

"বলুন, বলুন দিদি, এবার গঙ্গায় ডুবে মরা ছাড়া আমার আর কী করার আছে?"

"শান্ত হও বকুল। এখন ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। শক্ত করো নিজেকে। বাড়ি গিয়ে সবাই মিলে বসে একটা উপায় বার করতে হবে।"

"না না দিদি, বাড়ি গিয়ে এ মুখ আমি দেখাতে পারব না।" বকুল ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বালিশে মুখ চেপে ধরে দু'হাতে ঘুসি মারতে লাগল বিছানায়। একটা গোঙানি শুধু তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

"ওকে এইভাবে থাকতে দাও।" দরজায় দাঁড়িয়ে সুধাংশু বললেন উমাকে। "শান্ত হোক, তারপর বাড়ি পৌঁছে গিয়ে আসব।"

বাস থেকে নেমে মালবিকা ঘড়ি দেখল। এখনও ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটাতে হবে। গানের স্কুল বন্ধ হবে সাতটায়। তিনটে ঘরে তালা দিয়ে অবনী চাবির তোড়াটা দোতলার দালানে পেরেকটায় ঝুলিয়ে দেবে, নয়তো শিঞ্জিনীর হাতে দেবে। তারপর ওরা চলে যাবে পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে। সদর দরজা

খোলা রেখেই কি যাবে নাকি তালা দেবে। সমীরণ বাড়িতে রয়েছে কি না বোঝা যাবে তালা দেখে।

মালবিকা এখন বাড়িটার সামনে যাবে না, সামনে দিয়ে হেঁটেও নয়। দূর থেকে সে দেখতে পেল সমীরণের মারুতি গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। ওটা যতক্ষণ থাকবে বুঝতে হবে শিঞ্জিনী বাড়িতেই রয়েছে। সে আবার মানিকতলার মোড়ে এল। এখন সময় কাটানোই তার কাছে একটা জরুরি সমস্যা। এ-ভাবে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। বাড়ির না হোক পাড়ার কত লোক তো বাসে ট্রামে এখান দিয়ে যায়। তাদেরই কেউ বলে দেবে, 'বিকেলে তো ওকে মানিকতলার মোড়ে দেখলুম।'

সময় কাটাবার একটা জায়গা আছে, খুবই ভাল জায়গা, প্রতিভাদির কাছে যাওয়া। ওর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সময় কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু ওর যে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেটা কি হয়ে গেছে? হয়ে গিয়ে থাকলে ফিরে আসতে হবে। তাই বা কেন, ওর মার সঙ্গে এটা-ওটা বলে তো সাতটা বাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

মালবিকা দ্রুত পা চালাল দক্ষিণে রাজাবাজারের উদ্দেশে। সায়ান্স কলেজ ছাড়িয়েই তার মনে হল কিছু একটা যেন সে অনুভব করছে। ফুটপাথে তিন-চারজনের জটলা দেখল অনেকগুলো। লোকগুলোর মুখ গম্ভীর, কথা বলছে গলা নামিয়ে। কিন্তু রাজাবাজারের মোড়ে পৌঁছে তার মনে হল আর পাঁচটা দিনের মতোই রয়েছে জায়গাটা। ওপারে রাস্তার ধার ঘেঁষে থাকা ফলের, প্লাস্টিক আর রবারের জুতোর সারি দেওয়া দোকানগুলো যথারীতি খোলা। ট্রাম, বাস, অন্যান্য গাড়ি বিকট শব্দে চলাচল করছে। এমনকী রবারের বলে ক্রিকেটও খেলা হচ্ছে। অস্বাভাবিক লাগল, রাস্তার ওপারে একটা বেঞ্চে সাদা উর্দি পরা সাত-আটজন পুলিশ দেখে। সবার হাতে রাইফেল। একটা ভ্যানও দাঁড়িয়ে।

মালবিকার বুক কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে। এত পুলিশ কেন? অমঙ্গল কি ওর দিকে এগিয়ে আসছে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে কি ভুল করল? ভাবতে ভাবতে সে মসজিদ ছাড়িয়ে গলির মধ্যে ঢুকল। তখন একবার তার মনে হল, ফিরে যাই। তারপর মনে হল এত দূর এগিয়ে আর ফেরা যায় না। সমীরণ তাকে ভালবাসে কিন্তু সমীরণ যদি বাড়িতে না থাকে? যদি দরজায় সে তালা ঝুলতে দেখে? তা হলে কী করবে? রাস্তায় শুয়ে থাকবে? সমীরণ তাকে ডোবাবে না। ও খুব ভাল, ও নিশ্চয় ভেবেচিন্তেই তাকে সাতটায় আসতে বলেছে। কাল কল্যাণীতে নিয়ে যাবে। কোথায় রেখে আসবে, কার কাছে? কলকাতায় কি তাকে রেখে দিতে পারে না?

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। মালবিকা ধাক্কা দিল। ভিতর থেকে বন্ধ। অন্যান্য বাড়ির দরজার সামনে বাসিন্দারা, বেরিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে উর্দুতে যার কিছুই সে বুঝছে না। ডিসেম্বরের সন্ধে নেমে আসছে। হাতের ব্যাগ আর শাড়িটা আঁকড়ে ধরে দরজায় আবার ধাক্কা দিল। প্রতিভাদিদের বারান্দায় কেউ নেই। সে ভাবল চেঁচিয়ে ডাকবে কি না।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে একটি মাঝবয়সি লোক তাকে দেখছে। গায়ে হাওয়াই শার্ট আর লুঙ্গি।

"আমি উপরে যাব।"

লোকটি কথা না বলে পাল্লা খুলে সরে দাঁড়াল। একটি স্ত্রীলোক আর কয়েকটি শিশু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাকে দেখছে। মালবিকা অন্ধকার সরু সিঁড়িটা ধরে দোতলায় উঠে এসে দেখল বারান্দায় কেউ নেই।

"প্রতিভাদি।" মৃদু স্বরে সে ডাকল।

"কে?" প্রতিভার ঘর থেকে তার মা বেরিয়ে এলেন। বারান্দার আলো জ্বেলে মালবিকাকে দেখে বললেন, "তুমি! এই সময়ে। ঘরে এসো, প্রতিভার তো খুব জ্বর। আজ সকালেও ছিল একশো তিন এখন একশোয় নেমেছে।"

মালবিকা নিশ্চিন্ত বোধ করল। বিয়ে তা হলে হয়নি। প্রতিভার বুক পর্যন্ত একটা ধূসর আলোয়ান, চোখ মুখ টসটসে, তক্তপোশের নীচে একটা বাটিতে জল আর তাতে ডোবানো এক ফালি কাপড়। বালিশের পাশে দুটো ক্যাপসুল। ক্ষীণ স্বরে বলল, "এসো মালবিকা।"

মালবিকা বসল, প্রতিভার পাশে। "এদিকেই এসেছিলুম, ভাবলুম যাই তোমাকে দেখে আসি।"

"ভাল, তবে আজ না এলেই পারতে।"

"কেন?" মালবিকার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল।

"শুনছি তো অযোধ্যায় বাবরি মসজিদটা ভেঙে দিয়েছে করসেবকরা। বাবা বললেন, বি বি সি নিউজে নাকি বলেছে। মুসলমানরা ভয় পেয়ে গেছে।"

"ভয় কেন?"

প্রতিভার মা উত্তর দিলেন, "চারদিকেই তো হিন্দু। অবাঙালি হিন্দুরা তো মসজিদের সামনের ফুটপাথে গাছতলায় একটা মন্দির তৈরির চেষ্টা বহুদিন ধরেই করে যাচ্ছে। বন্দুক নিয়ে পুলিশ সব সময়ই বসে থাকে। এবার ওরা চেষ্টা করবে মন্দির তৈরির জন্য হাঙ্গামা বাধাতে। ওর বাবা তো তাই বললেন, রায়ট যদি বাধে তো রামের নাম করে ওরাই বাধাবে। চা খাবে?"

"হ্যাঁ।"

প্রতিভার মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মালবিকা ঝুঁকে প্রতিভার মুখের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসা করল, "মিহিরদা তোমার কাছে এসেছিল?"

প্রতিভা বিস্মিত হল। ভুরু কুঁচকে উঠল। "এ-প্রশ্ন কেন?"

"এমনিই, বলুন না, এসেছিল কি না?"

"এসেছিল।"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল আমার আর সমীরণদা সম্পর্কে?"

"করেছিল। অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিল।"

"কী জানতে চেয়েছিল, সেই একসঙ্গে গাড়িতে আসা?"

"হ্যাঁ। আমি যা দেখেছি শুনেছি তাই বলেছি ওকে, রং চড়াইনি। আমার মনে হয়েছে তুমি সমীরণদার খপ্পরে চলে যেতে পারো।"

"আমাকে বাঁচাবার জন্য তাই মিহিরদাকে সব বলে দিলেন?"

"আমি পাশে বসে আর তোমরা যা শুরু করে দিলে, মালবিকা, আমার অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার করে তোমরা যা করছিলে তাতে একটু মর্যাদাবোধ যার আছে সে অপমানিত বোধ করবে। মদ খেলে সমীরণের বোধবুদ্ধি লোপ পায়, যা খুশি বলে, যা খুশি করে। কিন্তু তুমি তো মদ খাওনি! তা হলে তুমি কেন অসভ্যতা করবে, তাও আমার পাশে বসে। মনে করে দ্যাখো, সেদিন তুমি ওর কোলে বসে—", প্রতিভা থেমে গেল। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। স্বরে যতটা না ঘৃণা তার থেকেও বেশি আহত মর্যাদার যন্ত্রণা। শুকনো ঠোঁট চেটে নিল। হাঁফাচ্ছে। বালিশ থেকে মাথাটা তুলে ফেলেছে।

"আপনি এ-সব বলেছেন?" প্রতিভার কাঁধে চাপ দিয়ে মালবিকা মাথাটা বালিশে ফিরিয়ে দিল।"

"না। নোংরা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গা ঘিন ঘিন করে। সমীরণ মিত্তিরের নাম তুমি আমার কাছে কোরো না। আমার যে সর্বনাশ করেছে, তা তোমায় বলতে পারব না। তবে মিহির বোকা নয়, সে সমীরণদার স্বভাবচরিত্রটা জানে, অনুমান করে নেবার মতো বুদ্ধি আছে। ও ছ্যাবলা নয়। প্রখর ওর মান-অপমান বোধ। তিন বছর ওকে দেখেছি তো।"

মিহিরের সঙ্গে তার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে মালবিকা বলতে গিয়েও তা বলতে পারল না। চায়ের কাপ হাতে প্রতিভার মা ঘরে ঢুকলেন।

"চা-টা খেয়ে মা তুমি আর থেকো না। রাস্তায় নাকি লোকজন কমে যাচ্ছে। নীচের রুকিয়ার মা বলল গোলমাল হতে পারে।"

মালবিকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটা চুমুক দিয়ে সে কাপ রেখে দিল মেঝেয়। "প্রতিভাদি, মাসিমা, আমি এখন চলি, পরে একদিন আসব।"

মালবিকা যখন হনহনিয়ে কেশব সেন স্ট্রিট থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে চলেছে তখন তার উকিল বড়জ্যাঠার একতলার সেরেস্তায় চলেছে এক বৈঠক। ওদের তিন ভাই আর সুধাংশু টেবল ঘিরে বসে। মেজভাই জামসেদপুরে টেলকোয় অ্যাকাউন্টট্যান্ট। বউ নিয়ে সেখানেই কোয়ার্টারে থাকে। তাদের এখানকার ঘর তালা দেওয়া। এই বাড়ির সাতেপাঁচে তারা থাকে না। দু'-তিন বছর অন্তর তারা আসে, তারা নিঃসন্তান।

জ্যাঠার ছেলে ভটু দরজায় দাঁড়িয়ে। এই বৈঠকে মেয়েদের থাকতে দেওয়া হয়নি। দোতলায়

অর্চনার ঘরে দেওয়ালে ঠেস ও কপালে হাত দিয়ে বসে থাকা বকুলকে ঘিরে তার দুই জা তখন মালবিকার সমালোচনায় ব্যস্ত।

"আগেই পুলিশ কেন? পুলিশ লাগানো মানেই লোক জানাজানি করা। আগে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে দ্যাখো ফিরে আসে কি না।" কথাটা বলল বড়জ্যাঠা।

"পুলিশের এখন এইসব মেয়ে-পালানোর মতো সিলি ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় হবে না।" ভটু গম্ভীর বিজ্ঞ স্বরে জানিয়ে দিল। বিকেলে সে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে ছিল। "ইউ এন আই-এ আমার এক বন্ধু আছে, সে বলল পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বাবরি মসজিদ একেবারে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়েছে।"

"পাঁচ ঘণ্টায় কী করে ধুলো করে? কামান নিয়ে গেছল?" ব্যবসায়ী সেজভাই সন্দেহ প্রকাশ করল। "তিন-তিনটে গম্বুজ আছে মসজিদটার, অমনি পাঁচ ঘণ্টায় ভেঙে দিল?"

"আমি যা শুনেছি তাই বললুম। পাঁচশো বছরের কাদামাটির স্ট্রাকচার, হাজার হাজার লোক যদি শাবল, গাঁইতি, হাতুড়ি, লোহার পাইপ দিয়ে ভাঙতে শুরু করে তা হলে পাঁচ ঘণ্টায় ধুলো হবে না?" ভটু তার কাকার অবিশ্বাসকে ভাঙার চেষ্টা করল।"

"আচ্ছা, এ-সব আলোচনা পরে হবে।" বড়জ্যাঠা তার ছেলের দিকে হাত তুললেন। 'পুলিশ-টুলিশ পরের কথা। তা ছাড়া ভটু যা বলল, তাতে এখানে কেন সারা দেশের পুলিশই তো এখন ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

"আমি এটাই বলতে চেয়েছি।" ভটু বলল।

"দিলু, তুই কিছু আন্দাজ করতে পারিস ও কোথায় যেতে পারে বা মালির সঙ্গে কারুর—", বড়ভাই শোভন হওয়ার জন্য থেমে গেল।

এতক্ষণ পাথরের মতো বসে থাকা দিলীপরঞ্জন মাথা নাড়ল।

"বউমাকে জিজ্ঞেস করেছিলি?"

"হ্যাঁ, ও কোনও হদিশই দিতে পারল না।"

"ইদানীং ওর চালচলনে কোনওরকম সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে?"

"সন্দেহজনক মানে?" দিলীপরঞ্জন তেরিয়াভাবটা কোনওক্রমে চেপে রাখল। মেয়ের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ তার ভাল লাগল না।

"এতে আর মানেটানের কী আছে?" ব্যবসায়ী দাদা সোজাসুজি কারবার ভালবাসে। "কোনও ছেলের সঙ্গে প্রেমট্রেম করছিল কি?"

"সে কি বলেকয়ে প্রেম করবে?" দিলীপরঞ্জন রাগ চেপে ঠান্ডা গলায় বলল, "না, আমার চোখে কিছু পড়েনি।"

"ওর চিঠিটা দেখি।" উকিল দাদা হাত বাড়াল। "কোথায় চিঠিটা?"

দিলীপরঞ্জন বুকপকেট থেকে বার করে দিল। বড়ভাই চশমা পরে নিল। খুঁটিয়ে চিঠিটা দু'বার পড়ে নিয়ে চশমা খুলল। মুখে হতাশা।

"সে-রকম কিছু তো পাচ্ছি না।"

"চেপে গেছে, বুদ্ধিমতী মেয়ে তো।" সেজভাই মন্তব্য করল। দিলীপরঞ্জনের ভ্রূকুটি তার নজর এড়াল না।

চুপচাপ বসে আছেন সুধাংশু। তিনি বাইরের লোক। এই ধরনের কথাবার্তায় তাঁর নাক গলানো উচিত হবে কি না বুঝতে পারছেন না। ঘটনাটা যদি না তাঁর বাড়ি থেকে শুরু হত তা হলে তিনি এখানে বসে থাকতেন না। এখন তাঁর নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু এরা যে-ভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছে সেটা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। তাঁর মনে হচ্ছে এই মুহূর্তের জরুরি বিষয়টাই কেউ তুলছে না কেন?

"বিয়ের আর আট দিন বাকি। কম করে অন্তত ষাট-সত্তরটা কার্ড বিলি হয়ে গেছে। তারা তো বিয়ের দিন হাজির হবে।" সুধাংশু নিজেও শিউরে উঠলেন দৃশ্যটা কল্পনা করে।

"আপনি কি বলতে চান মালি আর ফিরে আসবে না?" উকিলের প্রশ্ন।

"না না সে-কথা বলছি না।" সুধাংশু প্রায় আঁতকে উঠলেন। "নিশ্চয়ই চাই ফিরে আসুক। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাটাও মাথায় রাখা দরকার।"

"উনি ঠিকই বলেছেন।" দরজা থেকে ভটুর সমর্থন এল। "এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু। আগে এটার ফয়সালা হওয়া উচিত। সবাইকে এখনই বারণ করে না দিলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

"কী বলে বারণ করবি? আর সেটা করা হবেই বা কী করে?" সেজভাই জানতে চাইল এবং তার প্রশ্ন দুটির সারবত্তা ঘরটাকে চুপ করিয়ে রাখল।

সত্যিই তো এত লোককে কী কারণ দেখিয়ে বারণ করা যায়? মেয়ে পালিয়ে গেছে বললে শুধু দিলীপরঞ্জনেরই তো নয়, সারা পরিবারের মাথা কাটা যাবে। তাদের বংশে এমন কেলেঙ্কারি এই প্রথম। আত্মীয়স্বজন, কুটুম, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। কী আতান্তরে যে মেয়েটা সবাইকে ফেলে দিল!

এরপরও সমস্যা, এত লোককে এই অল্পদিনের মধ্যে বারণ করা। সেটা কি সহজ কথা!

"অলরেডি যাদের কার্ড দেওয়া হয়ে গেছে তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে বলে আসা। যার টেলিফোন আছে তাকে টেলিফোন করা নয়তো পোস্টকার্ড ছাড়া।" ভটু সাবলীলভাবে সমাধানের পথ দেখিয়ে দিল।

"পোস্টকার্ড নয়। পোস্টাল সার্ভিসের যা বহর, এখান থেকে বাগবাজারের চিঠি ড্রপ করলে দেখবি দশ দিনেও পৌঁছবে না। আর টেলিফোন? কালই সল্ট লেকে মামাশ্বশুরকে টেলিফোন করে পেলুম না। ডেড হয়ে গেছে। তার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলার কথাটাই ভাবো।" ভটুকে তার সেজকাকা পুরোপুরি নস্যাৎ করল না। একটা পথ খোলা রাখল।

"বাড়ি বাড়ি যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! বেলঘরিয়া থেকে পুটিয়ারি। ওদিকে উত্তরপাড়া। অফিসের লোকেদের নয় বলে দেওয়া যাবে। পাড়ায় সবাই বিয়ের কথা জানে। তবে এখনও কাউকে বলা হয়নি। কিন্তু আত্মীয়-কুটুমদের তো বলা হয়ে গেছে।" দিলীপরঞ্জনের দেহকাঠামো যতটা নয় তার থেকেও বেশি ভেঙে পড়েছে তার কণ্ঠস্বর। অস্ফুটে একবার বলল, "আমি যে এখন কী করি।"

"কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেই হয়, বিয়ে স্থগিত রইল অনিবার্য কারণে।" সেজভাই শেষ করামাত্র বড়ভাই খিঁচিয়ে উঠল, "কী বুদ্ধি তোর। যাবা কিছু জানত না তারাও এবার জেনে যাবে।"

"সেজকাকা, এখানেও একটা ব্যাপার আছে। কী কারণ দেখিয়ে তুমি স্থগিত রইল বলবে? অনিবার্য কথাটার কোনও মানে হয় না। এতে লোকে নানা রকমের সন্দেহ করবে। একটা কংক্রিট কোনও কারণ দেখানো দরকার।" ভটু চ্যালেঞ্জের সুরে সেজকাকার মগজের পরীক্ষায় নামল।

"এ তো খুব ইজি ব্যাপার, বলে দে মেয়ে মরে গেছে।"

দিলীপরঞ্জন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা তুলল। সুধাংশু বিস্ফারিত চোখে সেজভাইয়ের দিকে তাকাল। বড়ভাই ভ্রূকুটি করল। ভটু চাপা গলায় "হুঁ" বলল।

"মরে গেছে মানে, একটা কঠিন কোনও রোগ হয়েছে মরার সম্ভাবনা আছে আমি তাই মিন করেছি। ধরো টিবি হয়েছে যদি বলি?"

"টিবি?" বড়ভাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে কী ভেবে বসে পড়ল। "এ রোগ তো গরিবদের হয়। আমাদের বাড়িতে টিবি ঢুকবে কী করে?"

"তা হলে ক্যানসার। এটা বড় বড় লোকদেরও হয়। এইডসও হয়।"

"সেজকাকা! ভটু ধমকে উঠল। "এইডস কেন হয় তা জানো। মেডিক্যাল কলেজের গায়ে একটা বড় বোর্ডে তা লেখা আছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে যেতে গেলে চোখে পড়ে। মালির এইডস হয়েছে বললে কেলেঙ্কারির উপর ডবল কেলেঙ্কারি হবে।"

"তা হলে ছেলের এইডস হয়েছে বলো।"

"তুই চুপ কর।" সেজভাইকে মৃদু দাবড়ানি দিয়ে উকিল দাদা বলল। "ভটু তুই বললি বাবরি মসজিদ গুঁড়ো হয়ে গেছে। এতে তা হলে মুসলমানরা খেপে যাবে, কেমন? খেপে গেলে রায়ট হতে পারে, কেমন? মিহিররা এন্টালির যে-দিকটায় থাকে সেদিকে মুসলমানই বেশি তাই তো? ধর ও যদি রায়টে মারা যায়, তা হলে তো বিয়ে অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু রায়ট হলে তো মরবে।"

"যদি হয়। সে জন্যই তো গোড়াতেই বলেছি চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করো। তার মধ্যে মালি ফিরে

আসতে পারে, তার মধ্যে রায়টও লেগে যেতে পারে। এর যে-কোনও একটা হলে আমাদের মুখ রক্ষা হতে পারে।"

সুধাংশু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। স্বার্থপর এবং মূর্খের মতো কথাবার্তায় তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন। এইবার বললেন, "আপনারা যেমন নিজেদের অসুবিধার কথা ভাবছেন ঠিক তেমনি ছেলের বাড়িও তো এই অসুবিধার সামনে পড়বে। ওঁরাও নিশ্চয় অনেককে নেমন্তন্ন করে ফেলেছেন। ওঁদের কথাটাও ভাবুন। ওঁদেরও মানসম্মান বোধ আছে। ঘটনাটা ওঁদের জানিয়ে দিন।"

সারা ঘর চুপ। শুধু দিলীপরঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, এটা আমাদের কর্তব্য। আমি যেমন অনেক টাকা খরচ করে বসে আছি, তেমনই ওরাও যাতে খরচ আর না করে সেটা দেখা দরকার।"

"তা হলে তুই জানিয়ে দে, এক্ষুনি।" বড়ভাই টেলিফোনটার দিকে তাকাল। এ-বাড়িতে এটা দ্বিতীয় টেলিফোন কিন্তু ডায়ালে তালা দেওয়া। সকাল ও সন্ধ্যায় যখন ও সেরেস্তায় কাজে বসে তখনই শুধু টেলিফোনকে মুক্তি দেয়। অন্য সময় হাতকড়া লাগিয়ে রাখে।

দিলীপরঞ্জন মাথা নাড়ল। "না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ের এই অপকর্ম নিজের মুখে আমি বলতে পারব না।"

"তা হলে—"। সেজভাইয়ের দিকে তাকাল।

"আমার দ্বারা হবে না।"

"তা হলে—।" সুধাংশুর উপর চোখ রাখল মালবিকার বড়জ্যাঠা। "আপনি বাইরের লোক, আপনার তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া মিহিরের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে।"

"ওর নম্বরটা আমি জানি না।"

"মালির মায়ের কাছে আছে, এনে দিচ্ছি।"

দিলীপরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেজভাই তখন সুধাংশুকে বলল, "আপনি কি কিছু আন্দাজ করতে পারেন, মালি কোথায় যেতে পারে?"

"একদমই নয়।"

"অচেনা কোনও লোককে বাড়ির সামনে দেখেছেন?"

ভটু বলল, যে-ভাবে গল্পের গোয়েন্দারা বলে।

"না। তবে আমার মনে হয়, পুলিশের সাহায্য ছাড়া আর কোনওভাবে ওকে খুঁজে বার করা যাবে না। বোঝাই যাচ্ছে একটা প্ল্যান করে রেখেছিল। দুঃখের বিষয় শুরুটা করল কিনা আমারই বাড়ি থেকে। বকুল তো আত্মহত্যা করবে বলেছিল।"

"দেখা যাক।" বড়ভাই বলল, "মেয়েটা হুট করে এমন একটা কাজ যে করে বসবে কে জানত! দুষ্ট লোকের হাতে পড়ল কি না কে জানে! দেখতে শুনতে তো ভাল, চটকও আছে।"

আলোচনাটা কেউ বাড়াল না। গম্ভীর মুখে সবাই নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে গেল। একটু পরেই এক টুকরো কাগজ নিয়ে ফিরল দিলীপরঞ্জন। সেটা সে সুধাংশুর হাতে দিল।

"বউমা কী করছে? ওকে চোখে চোখে যেন রাখা হয়।" বড়ভাই চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে দিল।

"এই সময় সিডেটিভ খাইয়ে কাকিমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা দরকার।"

ডায়াল করে নম্বরটা পেল সুধাংশু। বয়স্ক ঘড়ঘড়ে গলায় একজন "হ্যালো" বলল। তাকে সে অনুরোধ করল মিহিরকে ডেকে দেবার জন্য। "বলুন পাতিপুকুরের সুধাংশু গাঙ্গুলি কথা বলতে চায়।"

এরপর অপেক্ষা। সবাই টানটান হয়ে উঠেছে। সুধাংশুর গলা শুকিয়ে আসছে। ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় ঘাম ফুটল তাঁর কপালে। এ কী বিদঘুটে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি পড়লেন! ফটকের সামনে বকুলকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিয়ে তিনি তো তখনই ফিরে যেতে পারতেন। তাই করলেই ভাল হত। কেন যে তাঁর মনে করুণার সঞ্চার ঘটল। উমা যদি এই রকম অবস্থার মধ্যে পড়ত তা হলে কী হত? ভাগ্যিস তাঁদের মেয়ে নেই। এখন কী বলবেন, কীভাবে বলবেন মিহিরকে? মেয়ের বাবা জ্যাঠারা কেউ অপ্রিয় কাজটা করতে চাইল না অথচ ওদেরই তো করার কথা।

"হ্যালো কে মিহির।" সুধাংশুর হাত কাঁপল, গলা কাঁপল। কীভাবে শুরু করবেন ঠিক করতে না পেরে বললেন, "শুনেছ কী ঘটেছে?"

"সত্যিই খুব দুঃখের। এটা পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতা হল। এমন কাজ যে হতে পারে ভাবাও সম্ভব নয়।"

মিহিরের গলায় যে ক্ষোভ, রাগ, তিক্ততা এবং স্বরগ্রাম সুধাংশু আশা করেছিলেন, সেটা না পেয়ে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হলেন।

"হ্যালো মেসোমশাই, আপনাদের ওদিকে অবস্থা কেমন? আমাদের এখানে সব নর্ম্যাল।"

"মিহির তুমি কী নিয়ে বলছ?"

"কেন বাবরি মসজিদের আজ যা সর্বনাশ হল! আপনি তা হলে কী ভেবেছেন?"

"বাবরির থেকেও বেশি সর্বনাশ হয়েছে মালিদের বাড়িতে, মালি নেই।"

"য়্যা, মারা গেছে?"

"না, না, মারা যাওয়া নয়। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না বাবা, মালি আর তার মা আজ দুপুরে আমার বাড়িতে আইবুড়ো ভাত খেতে গেছল, ওর মায়ের নয়, মালির আইবুড়ো ভাত। দুপুরে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই ফাঁকে দরজা খুলে ও বেরিয়ে গেছে এক কাপড়েই। না না, আইবুড়ো ভাতের শাড়িটা সঙ্গে নিয়ে গেছে। একটা চিঠি মাকে লিখে রেখে গেছে। পড়ব?" সুধাংশু হাত বাড়ালেন দিলীপরঞ্জনের দিকে। চিঠিটা নিয়ে তিনি পড়ে শোনালেন মিহিরকে। পড়ার মধ্যেই শুনতে পেলেন মিহির অস্ফুটে বলছে, "আবার আমায় অপমান করল।"

"হ্যাঁ বাবা, এবার কী করা যায়?"

"কী আর করা যাবে, মালির বাবা-মাকে বলুন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোতে।"

"তুমি রেগে যাচ্ছ। কিন্তু এটা কি রাগের সময়?"

"এতে রাগব না তো কীসে রাগব? কত লোক জানে আমার বিয়ে ওর সঙ্গে হচ্ছে। বাবার খুব একটা মত ছিল না কিন্তু আমার মুখ চেয়ে না বলতে পারেননি। এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে কী করে বলব, তোমার ভাবী পুত্রবধূটি সটকান দিয়েছে। ছি ছি ছি কী নোংরামি করল। বিয়ে যদি নাই করতে চায় তা হলে ভদ্র পরিচ্ছন্নভাবে আমাকেও তো বলতে পারত। সবার মুখে কালি মাখিয়ে দেওয়ার কোনও দরকারই ছিল না। বুঝলেন মেসোমশাই অশিক্ষিত বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েরা এই রকমই হয়। বাবাটা মোদো মাতাল, তাও আবার দিশি খায়। মেয়েও লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা, হিন্দি ফিল্মের সেক্স আর ভায়োলেন্স দেখে দেখে মাথার মধ্যে শুধু ওইসবই ঘুরছে, তার উপর জুটেছে আপনার আদরের, শ্রদ্ধার কেষ্ট ঠাকুরটি। শুনুন মেসোমশাই, এ কাজ মালি করেছে সমীরণ মিত্তিরের কথায়। আই অ্যাম ডেড শিওর।"

"তুমি বলছ কী মিহির?" সুধাংশু রিসিভারটা জোরে আঁকড়ে ধরলেন যাতে হাত থেকে পড়ে না যায়। বড়ভাই, শরীরটা হেলিয়ে দিয়ে ওধারের কথা শোনার চেষ্টা করছেন। কিছু কিছু শুনতেও পাচ্ছেন কেন না মিহির বেশ চেঁচিয়েই কথা বলছে। দাদার মতো একই উদ্দেশ্যে সেজভাই টেবলের উপর উপুড় হয়ে এগিয়ে এসেছে। ভটু দাঁড়িয়ে সুধাংশুর পিঠের কাছে। শুধু দিলীপরঞ্জন কপালে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সোজা হয়ে বসে। তার আর কোনও কিছুতে উৎসাহ নেই।

"ওদের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তার সাক্ষীও আছে। সব কিছুর মূলে কিন্তু আপনি আর মাসিমা। মহাজাতি সদনে আপনারাই ওদের গ্রিনরুমে নিয়ে গিয়ে সমীরণ মিত্তিরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে কি? যদি তা না করাতেন তা হলে আজকের এই ঘটনা ঘটত না।"

"মিহির, তোমার সঙ্গেও তা হলে মালির পরিচয় হত না। ঠিকই বলেছ, ঘটনা ঘটত না। এই বিয়ের প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু এখন তর্কাতর্কির সময় তো নয়। কিছু একটা তো করা দরকার।"

"করতে হয় আপনি করুন, মালির বাবা করুন। আমি কী করতে পারি বলুন? রাস্তায় রাস্তায় ওকে খুঁজে বেড়াব? পারলে একবার সমীরণ মিত্তিরের খবর নিন। ওর বাড়িতে যান। এখন বাবা-মার সামনে কী বলে যে দাঁড়াব—," রিসিভার রাখার শব্দ হল।

"কী বলল? সমীরণ মিত্রের নাম করল বলে মনে হল?" সেজভাই টেবল থেকে নিজেকে টেনে তুলে বলল।

"বলল, মালির সঙ্গে ওর একটা রিলেশন গ্রো করেছে। সমীরণ মিত্তিরের বাড়িতে যেতে বলল।" ভটু দরজার দিকে যেতে যেতে বলল।

"কিন্তু সব থেকে ভাইটাল পয়েন্ট হল, সুধাংশুবাবুই সব কিছুর মূলে।" উকিল বড়ভাই ত্যারচা চোখে তাকাল সুধাংশুর দিকে। "তাই তো মিহির বলল।"

বুক শুকিয়ে গেল সুধাংশুর। কথাটা তো সত্যিই। সমীরণের সঙ্গে আলাপ তো তারাই করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপর ওদের মধ্যে যদি কিছু হয়ে থাকে তা হলে কি তিনি বা উমা দায়ী হবেন?

"এটা আপনার করানো উচিত হয়নি। একটা বদমাশ লোকের সঙ্গে, ভাইঝি বলে বলছি না, সুন্দরী একটা মেয়ের আলাপ করিয়ে দেওয়ার আগে আপনার দু'বার ভেবে দেখা উচিত ছিল।" বড়ভাইয়ের গলা ভরাট এবং খুবই সূক্ষ্ম একটা হুমকিও যেন রয়েছে।

"তা হলে আমার এখন কী করার আছে?" কাতর স্বরে সুধাংশু বললেন। এখন তিনি সত্যিই ভীত।

"আপনি বরং সমীরণ মিত্তিরকে একটা ফোন করুন।" ভটু সুপারিশ করল। "আগে জেনে নিন লোকটা বাড়িতে আছে কি না।"

"কিন্তু ওর ফোন নম্বর তো আমার কাছে নেই. বাড়িতে রয়েছে।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, অবুর গানের স্কুলের বিলে ফোন নম্বর আছে। ওটা নিশ্চয় ওর বাড়িরই ফোন।" সেজভাই প্রায় ছুটেই দোতলার উদ্দেশে রওনা দিল।

কেশব সেন স্ট্রিট দিয়ে লাল পতাকা হাতে একটা মিছিল স্লোগান দিতে দিতে রাজাবাজারের দিকে আসছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। মালবিকা মিছিলটার পাশ দিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল। এবার আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটা পথসভা। ফুটপাথে মাইকের সামনে একটি লোক। তিনরঙা দুটো পতাকা ল্যাম্পপোস্টে বাঁধা। ভিড় করে লোকজন শুনছে। "সারা দেশের পরিস্থিতি এখন উদ্বেগজনক। যে ধর্মীয় উন্মাদনা দেশকে আজ অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আঘাত হেনেছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে..." সভার পাশ কাটিয়ে মালবিকা দ্রুত এগিয়ে গেল। স্লোগান বক্তৃতা কিছুতেই তার দরকার নেই, কানে ঢোকাতেও চাইল না। তাই নিজের পরিস্থিতিই উদ্বেগজনক হয়ে রয়েছে। বাবরি মসজিদ রইল কি ভেঙে পড়ল তাই নিয়ে এই মুহূর্তে তার মাথাব্যথা নেই। সমীরণের বাড়িতে ঢুকে পড়া ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে চায় না।

দূর থেকেই সে দেখতে পেল বাড়ির সামনে গাড়িটা নেই। তার মানে শিঞ্জিনীও নেই। সায়ন্তনও নেই, অবনীও তা হলে নেই। রাস্তার দিকে সরে এসে মুখ তুলে দেখল বসার ঘরে আলো জ্বলছে। মালবিকার বুকের মধ্য থেকে চাপটা সরে গেল। সে কলিংবেলের বোতাম টিপল।

জানলার পর্দা সরিয়ে অপরিচিত একটা মুখ উঁকি দিয়ে বলল, "কে?"

"সমীরণদা আছেন?"

মুখটা ঘুরিয়ে লোকটি কার সঙ্গে কথা বলে নীচে তাকিয়ে বলল, "দাঁড়ান।"

মালবিকা রাস্তার দু'দিকে তাকাল। একটা পুলিশের জিপ যাওয়াকে যদি 'উদ্বেগজনক' ভাবা না যায় তা হলে রাস্তাটা অন্য যে-কোনও দিনের মতোই। সে গভীর স্বস্তি বোধ করল।

"আসুন, উনি আছেন।"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় লোকটি বলল "সমীরণদার শরীরটা ভাল নেই, টেম্পারেচার উঠেছে একশোয়।"

মালবিকার স্বস্তি বোধটা নষ্ট হয়ে গেল সমীরণের জ্বর হয়েছে শুনে। হঠাৎ-ই তার মনে হল, এটা যেন অশুভ লক্ষণ। কেন যে মনে হল তা সে জানে না।

"কাল আবার কাঁচরাপাড়ায় ওনার একটা আসর আছে, কী যে হবে।"

লোকটির কথা বলার ধরন দেখে মালবিকার মনে হল কাঁচরাপাড়ার আসরের একজন উদ্যোক্তা এবং সমীরণের বশংবদদের একজন। একে সে কখনও দেখেনি। দোতলায় বসার ঘরের পর্দা সরানো। সমীরণ সোফায় পা তুলে বসে, গায়ে জড়ানো সাদা শাল। আরও লোক রয়েছে। স্বামী, স্ত্রী ও একটা বাচ্চা মেয়ে।

মালবিকাকে দেখে সমীরণের কোনও ভাবান্তর ঘটল না। বরং চোখটা দু'সেকেন্ডের জন্য কুঁচকে উঠল। মালবিকার চোখে সেটা এড়াল না। মলিন হয়ে গেল তার অভ্যন্তর।

"তুমি পাশের ঘরে বোসো, আমি এদের সঙ্গে কথা বলে নি।"

সমীরণের গলা শুকনো। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে জ্বর হয়েছে, শরীর দুর্বল। মালবিকা পাশের শোবার ঘরে এল। ঘরে আসবাব প্রায় কিছুই নেই। ড্রেসিং টেবল, স্টিলের আলমারি, কাঠের ওয়ার্ডরোব, দুটো ছোট টুল, টেবল, কাচের পাল্লার দেয়াল আলমারিতে রাখা সামগ্রী, টিভি সেট, টেপ রেকর্ডার, অজস্র ক্যাসেট, ভি সি আর সবই অদৃশ্য হয়েছে। কাঠের খাটটার জায়গায় রয়েছে লোহার খাট। হাসপাতালে যেমন দেখা যায়, মাথার ও পায়ের দিকে সারি দেওয়া সরু লোহার রেলিং। পুরনো রবার ফোমের তোশকটা খাটে পাতা, তার উপর নতুন রঙিন চাদর। খাটটায় নতুন রং। সিলিং পাখা, আর পর্দাগুলো শিঞ্জিনী নিয়ে যায়নি। আর নিয়ে যায়নি টেলিফোনটা।

মালবিকা খাটে বসল। ঘরটাকে এখন বড় মনে হচ্ছে, ফাঁকা লাগছে। কাপড়ের মোড়ক আর হাতব্যাগটা পাশে রাখল। ঘরে চোখ বুলিয়ে তার মনে হল সমীরণ পাকাপাকি এখানে থাকবে না। হঠাৎ প্রয়োজনে এক রাত বা এক দিন থেকে যেতে হলে, থাকার কাজ চালানোর মতো ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। বসার ঘরের কোনও জিনিস বোধহয় সরানো হয়নি।

সমীরণ ঘরে ঢুকল। ব্যগ্র চোখে মালবিকা প্রথমেই বলল, "আমি চলে এসেছি, একেবারে।"

বিব্রত ভাবটা চট করে লুকিয়ে ফেলল সমীরণ। চিন্তিত স্বরে বলল, "না এলেই ভাল করতে। হাঙ্গামা বাধার ভয় আছে। শুনছি কাল বাংলা বন্‌ধ, কংগ্রেস বামফ্রন্ট দু'দলই ডেকেছে। ওরা আজই ক্লিনা পার্ক সার্কাস গেল।...মুসলমান পাড়া, পাশেই বস্তি।"

অবশ হয়ে আসছে মালবিকার হাত-পা। ঠোঁট দুটো টেনে যে একটু হাসির ভাব ফোটাবে সে ক্ষমতাও যেন নেই। "তা হলে...তা হলে কি—"

"তুমি এসেছ যখন থাকো। আমার সকাল থেকেই কেমন জ্বর জ্বর ভাব।" সমীরণ এগিয়ে এসে মালবিকার দুই কাঁধ ধরে ঝুঁকে পড়ল চুমু খাবার জন্য। মুখে মদের গন্ধ। মালবিকা আকুলভাবে দু'হাতে গলা জড়িয়ে সমীরণের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঘষতে ঘষতে বলল, "আমাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না।...সমীরণ আমার সমীরণ। মরে যাব সমীরণ—", সে কামড়ে ধরল সমীরণের দুই ঠোঁট। মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে লাগল।

"উহ্‌।" মালবিকাকে ধাক্কা দিয়ে সমীরণ পিছিয়ে গিয়ে বিরক্ত চোখে তাকাল। কর্কশ স্বরে বলল, "থাক এখন। পাশের ঘরে লোক রয়েছে।" ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে একটি লোক দুড়দুড়িয়ে উঠে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "সমীরণদা, কাল বাংলা বন্‌ধ, বাজার-টাজার করে রাখুন। দিন আমায় টাকা দিন।"

"বাজার তো আনবি, রাঁধবে কে?"

"সে হয়ে যাবে, আমি এসে রেঁধে দোব।"

"তোকে আর আসতে হবে না , লোক আছে আমার। চাল, ডাল, মাছ, আনাজ সবই ফ্রিজে আছে। একটা দিন হয়ে যাবে তুই বরং---"

শোবার ঘরে এল সমীরণ। পিছনে এক যুবক। মালবিকা খাটে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। সমীরণ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল, "মাল প্রায় শেষ, আজ রাতের মতো শুধু আছে। তুই চট করে বড় দুটো বোতল এনে দে। দেরি করিসনি, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। কী খাই জানিস তো?"

সে পকেট থেকে পার্স বার করে তিনটে একশো টাকার নোট যুবকটির হাতে দিয়ে আবার বসার ঘরে ফিরে গেল।

"গৌরী, তোমরা আর দেরি কোরো না। বাচ্চা মেয়ে সঙ্গে রয়েছে, শুনলে তো কাল বাংলা বন্‌ধ...সুবোধের কাছেই শেখো। কীর্তনটা ও ভাল জানে, যত্ন করে শেখায়ও।"

মালবিকা বসার ঘর থেকে সমীরণের কথা শুনতে পাচ্ছে। একটু আগের কর্কশ গলাটা বদলে গেছে। স্নেহে ভরা স্বর। কাঁধে জোরেই ধাক্কাটা দিয়েছে সমীরণ। ধাক্কাটার মধ্য দিয়ে বিরক্তি অনিচ্ছুক ভাব বেরিয়ে এসেছে। অভিমানে ছেয়ে যাচ্ছে মালবিকা।

সমীরণ শোবার ঘরে এল।

"সবাইকে বিদেয় করা গেছে।" দেয়াল আলমারি থেকে একটা বড়মাপের বোতল বার করে সে চোখের সামনে ধরে দেখল কতটা আর বাকি আছে। একটা গ্লাসও বার করল। মালবিকা দেখতে পায়নি এগুলো আলমারিতেই ছিল। গ্লাসটা রাখার মতো শক্ত জায়গা ঘরে নেই।

"ধরো এটা।" গ্লাসটা বাড়িয়ে দিতেই মালবিকা ধরল। ঢাকনা খুলে বোতলটা উপুড় করে ধরল গ্লাসে। আধ গ্লাস ভরল। ঢাকনাটা লাগিয়ে সমীরণ গ্লাসটা হাতে নিল।

"জল এনে দোব?"

"ধেত জল।" বড় বড় দুটো ঢোঁকে সমীরণ মদের অর্ধেকটা পেটে চালান করে চোখ বন্ধ করল। মুখটা বিকৃত হয়ে রয়েছে। মুখে রক্ত ছুটে আসায় চামড়ার রং বদলে যাচ্ছে।

"জ্বরটা বোধহয় আবার বাড়বে।"

"তা হলে খেয়ো না।" মালবিকা গ্লাসটা নেবার জন্য হাত বাড়াল। সমীরণ হাত সরিয়ে নিয়ে আবার দুটি ঢোঁকে গ্লাস খালি করে দিল। খালি বোতল আর গ্লাস আলমারিতে রেখে সে খাটে বসল। পাশ বালিশটা টেনে কোলে তুলে নিয়ে, ঝুঁকে মালবিকার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। একটু একটু করে ঝিমিয়ে আসছে তার চাহনি।

মালবিকা যা আশা করেছিল তা ঘটল না। সে ভেবেছিল সমীরণ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠবে। দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধরবে, তাকে নিয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। আদরে আদরে বিধ্বস্ত করে দেবে। কিন্তু কোথায় কী? তার বাবার মতোই একটা মাতাল। ছাপোষা গেরস্ত। এর মধ্যে তার প্রেমিক সমীরণ কোথায়?

ফোন বেজে উঠল। মালবিকা উঠে ফোন ধরতে যেতেই হাত তুলল সমীরণ। "আমি ধরছি। ফোন তুমি ধরবে না।"

খাট থেকে নেমেই টলে গেল। সামলে নিয়ে সমীরণ রিসিভার তুলল।

"হ্যালো, কে শিঞ্জিনী? কোথা থেকে ফোন করছ...অ। ওখানে অবস্থা কেমন?.য়্যা গোলমাল হবার ভয় রয়েছে? শান্ত কোথায়? শিগগিরি ওকে ডেকে আনো। না না একতলার ফ্ল্যাটেও যাবে না, কোথাও যাবে না, ঘরে বসে থাকবে, বারান্দায় বেরোবে না। ...হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু একতলার লোকেরা চলে যাবে কী করে, কাল তো বাংলা বন্‌ধ, গাড়ি চলবে না।...তুমিই বা এখানে আসবে কী করে?...ফ্ল্যাট কেনার সময় আমি কি জানতুম বাবরি মসজিদটাকে ভেঙে দেওয়া হবে? এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ কেন, ইডিয়ট। তুমিই তো জেদ ধরেছিলে...গালাগাল আবার কী, এখনও তো মুখ খুলিনি। কিছু যদি ঘটে যায়, শান্তর যদি কিছু হয় তা হলে তোমাকে লাথি মেরে তাড়াব। সবই তো হাতিয়ে নিয়েছ। ছেলেকে আমি ছাড়ব না,...আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে। আমি মাগিবাজি করি কি ঠাকুরপুজো করি তাতে তোমার বাপের কী? যা বললুম, এখনই ওকে ঘরে নিয়ে এসো। ছটফটে ছেলে কখন রাস্তায় বেরিয়ে যাবে বলা যায় না। চোখে চোখে রাখবে। পরশু দিন ভোরেই ওকে নিয়ে চলে আসবে।"

রিসিভার রেখে সমীরণ ঘাড় নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। অল্প টলছে। দু' পা এগিয়ে মালবিকার থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করে দিল।

"কাল তো কল্যাণী যাওয়া হবে না।"

"জানি।"

"এখনও রাত হয়নি। তুমি বাড়ি চলে যাও।" স্বর বিকৃত জড়িয়ে যাওয়ার জন্য।

"কী বলছ তুমি!" মালবিকা উঠে দাঁড়াল।

"ঠিকই বলছি। কাল বন্‌ধ। পরশু ভোরেই বউ ছেলে এসে যাবে। তখন কী হবে? য়্যা, কী হবে? বড় খচ্চর মাগি, আমাকে ছাড়বেও না আবার ছাড়ারও ভয় দেখায়।"

"আমরা খুব ভোরে কল্যাণী চলে যাব।" মরিয়া হয়ে মালবিকা বলল, "ওরা আসার আগেই চলে যাব।"

সমীরণ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "হয় না। ভোরে আমার ঘুম ভাঙে না।"

"আমি ভাঙিয়ে দোব।"

"ধ্যাততেরি। জ্বরটা আবার বাড়ছে। ...তুমিও তো দেখছি আর একটা শিঞ্জিনী।"

ফোন বেজে উঠল। সমীরণ চমকে উঠে মাথা ঝাঁকাল। "আবার কেন?" বলে রিসিভার তুলল।

"হ্যালো, ...হ্যাঁ সমীরণ মিত্তির বলছি, আপনি কে. ...কী বললেন? জোরে বলুন...সুধাংশু গাঙ্গুলি? আরে মেসোমশাই! ...য়্যাঁ মালবিকাকে পাওয়া যাচ্ছে না? হারিয়ে গেছে? ...অ, আপনার বাড়ি থেকে। তা আমাকে ফোন করছেন কেন, আমি কি ওকে হরণ করে নিয়ে এসেছি?" সমীরণ আর দাঁড়াতে পারছে না, খাটে বসল। "মিহির বলল? শুয়োরের বাচ্চার তো গাধার মতো গলা। ও বলল আর অমনি আপনি আমাকে ফোন করলেন! মেসোমশাই, আপনিও একটা শুয়োরের বাচ্চা। মালবিকা কচিখুকি নয় যে বলামাত্র সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে। আপনি বিনা প্রমাণেই আমাকে ক্রিমিনাল বানিয়ে দিলেন? এটা কি কোনও ভদ্দরলোকের, শিক্ষিত লোকের পক্ষে সম্ভব না শুয়োরের বাচ্চার পক্ষে সম্ভব? বলুন, আপনিই বিচার করুন। ...আরে বাবা না না, মালবিকা অবলা বালিকা নয়, খুব বুদ্ধি ধরে। ...আমি ওকে পটাব কি ওই আমায় পটিয়ে দেবে। আপনি যে সন্দেহটা করছেন তার কোনও কি যুক্তি আছে? ওকে ভাগিয়ে এনে আমি করবটা কী? শুধু যৌবন দিয়ে তো চিরকাল চলে না! দেখুন পাড়ার কোনও ছোকরার সঙ্গে সটকান দিয়েছে...আরে দূর, গানফান ওর দ্বারা হবে না। ফুটপাথে যে-সব জলসা হয়, হিন্দি ফিল্মি গানার সঙ্গে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে মাইক হাতে নিয়ে, ওইসব গানেই ও নাম করতে পারবে। আপনি বরং পুলিশেই খবর দিন। ...কী বললেন পুলিশ এখন এ-সব কেস নেবে না? ...বাবরি মসজিদ? আরে মেসোমশাই ওই বাবরিই তো আপসেট করে দিল। কালকের বাংলা বন্‌ধটাও তা হলে হত না। কাল কাঁচরাপাড়ায় গান ছিল, কল্যাণী যাবার কথা ছিল। ...না না বিশ্বাস করুন, লেখাপড়া করেনি। গানের 'গ' জানে না, আমি ওকে নিয়ে কী করব...খারাপ কথা আপনাকে বলেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নোব। মাসিমা ভাল—"

হাত বাড়িয়ে রিসিভার রেখে দিয়ে আপন মনে বলল, "শালা কেটে দিল।" ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে টলে পড়ছিল। মালবিকার কাঁধ ধরে সামলে ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে গেল। যদি সে মালবিকার দিকে তাকাত তা হলে দেখতে পেত, অপমানে, লজ্জায় আর নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পারা কালো একটা নিথর মুখ। চোখের পলক পড়ছে না শুধু দু' চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

যুবকটি দু' বোতল মদ নিয়ে আসতেই সমীরণ বলল, "খোল। দুটো গ্লাস আন।"

"না না সমীরণদা আমি খাব না।"

"যা বলছি কর। গ্লাস আন, রান্নাঘরে দেখ গিয়ে।"

আধঘণ্টা পর সমীরণ শোবার ঘরে এল। পাথর হয়ে গেছে তার শরীর। খাড়া অবস্থায় দাঁড়াল মালবিকার সামনে। তার চাহনিতে মৃত অভিব্যক্তি।

"রান্না হয়েছে?"

মালবিকা শুধু তাকিয়ে রইল।

"এটা কী? হাটাও, আমি শোব।" সমীরণ শাড়িটা মেঝেয় ফেলে দিল।

"নীচের দরজায় খিল দিয়ে এসো। করসেবকরা ঢুকে পড়ে যদি?...কথা কানে গেল না। লাথি খাবি?"

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মালবিকা। দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সমীরণকে।

"আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি, আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার কোরো না, আমার কষ্ট লাগছে। আমি তোমায় সত্যিই ভালবাসি, ভালবাসি। সমীরণ তুমি আমার, আমার।"

"কে তোর? সমীরণ মিত্তির? আমি শালা কারুর নই, শুধু আমার ছেলের, শান্তর। ওকে চিনিস? সায়ন্তন মিত্তির, আমার দেওয়া নাম। তুই শালি কে? কী বললুম যেন, হ্যাঁ, সদর দরজায় খিল দিয়ায়। কাল বাড়ি চলে যাবি, বন্‌ধ তো কী হয়েছে, হেঁটে চলে যাবি।"

"সমীরণ তুমি আমায় এইভাবে বললে? তোমার জন্য আমি কী কাজ করেছি তা কি তুমি জানো?" মালবিকা হিংস্র চাপা গলায় বলল। "নিজেকে আজ সর্বনাশের মধ্যে টেনে এনেছি তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য।"

কথাগুলো বোধহয় সমীরণের কানে ঢুকল না। বিছানায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে কোনও ক্রমে বালিশটা মাথায় লাগিয়ে চিত হয়ে শুল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

মালবিকা একতলার দরজায় খিল দিয়ে এল। বসার ঘরের আলো নেভাল। বারান্দার আলো জ্বেলে রেখে শোবার ঘরের আলো নেভাল। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলো ঘরে আসছে একটা লম্বা সাদা লাঠির মতো। সিঁড়ির আলো পড়ছে ঘরের দরজার কাছে। একটা আবছা অন্ধকার ঘরটায়। মালবিকা খাটের কোণে পা ঝুলিয়ে বসে। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে সমীরণের মুখের দিকে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ভারী নিশ্বাসে বুকটা ওঠানামা করছে।

ভোর রাতে মালবিকা খাট থেকে নামল। আইবুড়ো ভাতের শাড়িটা নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বঁটিতে দু' টুকরো করল। আবার ঘরে ফিরে এল। কিছুক্ষণ সমীরণের নিথর শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইল। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

আবার দু'চোখ বেয়ে জল নামল মালবিকার। গাল থেকে চিবুক পর্যন্ত জলের ধারা। শুধু একবার ফুঁপিয়ে উঠেই মুখটা কঠিন হয়ে গেল। সন্তর্পণে সে সমীরণের দুটি হাত মাথার দিকে তুলে নিয়ে শাড়ির একটা টুকরো দিয়ে খাটের রেলিংয়ে বাঁধল। পা দুটি জড়ো করে শাড়ির অন্য টুকরোটা দিয়ে বেঁধে সেটা রেলিংয়ে বাঁধল।

সমীরণ একটা ন্যাকড়ার পুতুলের মতো চিত হয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। সে জানতেও পারল না কী ভয়ংকর অবস্থার দিকে সে চলেছে। মালবিকা পাশ-বালিশটা ওর মুখের ওপর রেখে বুকের উপর বসল সমীরণের দুই পাঁজরের পাশে দুই উরু রেখে এবং বালিশটা মুখে চেপে ধরল।

ছটফটিয়ে উঠল সমীরণ। হাত পা বাঁধা। টানাটানি করার সঙ্গে তলপেটটা তোলানামা করতে লাগল। বালিশটার তলায় গোঁ গোঁ একটা শব্দ হচ্ছে। মুখটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়াবার চেষ্টা চলছে।

একটা লোক মারা যাচ্ছে। মালবিকা অবাক হয়ে দেখছে। একটা লোককে সে নিজের হাতে মেরে ফেলছে। কিন্তু কেন?

মালবিকার হাতের চাপ আলগা হয়ে গেল।

কিন্তু কেন সে মারছে!

মালবিকা বালিশটা তুলে নিল। সে তো ঠিক করেছিল এই শাড়িটা গলায় বেঁধে পাখা থেকে ঝুলে পড়বে। তা হলে সে সিদ্ধান্তটা বদলাল কেন?

সে তো নিজেকেই শাস্তি দেবে বলে মরতে চেয়েছিল।

"আমায় খুন করছ মালবিকা?" ধীর শান্ত স্বরে সমীরণ বলল, যেটা প্রশ্ন নয়, অনেকটা বিবৃতি দেবার ধরন তার স্বরে।

বুকের উপর থেকে মালবিকা নামল। জানলায় গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। আবছা প্রভাতী আলোয়, ঠান্ডা মনোরম বাতাসে খুব সুন্দর একটা ভোর ফুটে উঠছে।

দু' মিনিট পর সদর দরজার খিল খুলে মালবিকা বেরিয়ে এল। দু' পাশে একবার তাকিয়ে দ্রুত পায়ে সে নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

নির্দিষ্ট দিনেই মিহির ও মালবিকার বিয়ে হয়েছে।

ছোটবাবু

ঘটনাটা প্রায়ই ঘটে।

ছুটির প্রথম ঘণ্টার পরই স্কুল ফটক থেকে প্রথমে স্রোতের মতো একটা দল বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড কলরব তুলে। এরা একেবারেই বাচ্চা, নিচু ক্লাসের ছাত্র। এদের অনেকের জন্য বাড়ির লোকেরা, ঝি চাকর বা মায়েরা ফটকে অপেক্ষা করে। জলের প্লাস্টিকের বোতল, বইয়ের বাক্স বা ব্যাগ তাদের হাতে তুলে দিয়ে বাচ্চারা বাড়ির দিকে রওনা হয় সমানে বক বক করতে করতে।

এরা বেরিয়ে যাবার পর দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজে। এবার হইচই করে বেরিয়ে আসে আর একটু বড় আকারের ছেলেরা। এরা তর্ক করে উঁচু গলায়, কখনও হাতাহাতিও করে তর্কের মীমাংসা ঘটাতে। কেউ অশ্লীল গালি দেয়, কেউ চুপচাপ গম্ভীর হয়ে পথ চলে।

স্কুলের ঘণ্টা তৃতীয়বার বাজলে বেরিয়ে আসে উঁচু ক্লাসের দীর্ঘকায় ছাত্ররা। থুতনিতে হালকা দীর্ঘ রোম, গোঁফের অস্পষ্ট কালো রেখা। অনেকেরই হাতে ঘড়ি বা চোখে চশমা। বেশির ভাগই ট্রাউজার্স পরা। দু'-তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বা একলাই হাঁটে। যার বাড়ি দূরে সে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে। কিশোরী বা তরুণীদের দেখলে এদের অনেকেই সামনে তাকিয়ে কাঠের মতো হয়ে যায়। কেউ কেউ বেপরোয়াব মতো তাকায়।

তৃতীয়ের পর আর কোনও ঘণ্টা বাজে না। আর কেউ বেরিয়ে আসে না শুধু একজন ছাড়া। সে ছোট ছোট দ্রুতপায়ে বইয়ের সুটকেসটি হাতে নিয়ে বাড়িগুলোর ধার ঘেঁষে, যেন কেউ তাকে না দেখতে পায় এমন একটা তাড়া-খাওয়া বেড়ালের মতো হেঁটে যাচ্ছে। অথচ রাস্তায় তখন খুব লোকজন থাকে না।

কপাল ও কানের উপর ঝুলে আছে কোঁকড়া চুল। ঘন ভ্রূর নীচে গোলাকার বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে কখনও ভয়ে কখনও কৌতূহলে ইতস্তত তাকাচ্ছে। একসঙ্গে দু'-তিনজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই মন্থর হয়ে যাচ্ছে। সন্তর্পণে, নিশ্বাস চেপে, চোখ নামিয়ে তাদের পার হয়ে আবার দ্রুত হাঁটছে। জামার মধ্যে থলথলে চর্বির নড়াচড়া হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে। ওর কাঁধ বুক পেট কোমর সমানভাবে বর্তুলাকার। বস্তুত ওর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনেকটা কাপড়ে আচ্ছাদিত ঢোলকের মতো দেখাচ্ছে। সে ওদের দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারে সকলের চোখ তার দিকে। না-তাকিয়েই বুঝতে পারে প্রতিটি চাহনিতে চাপা কৌতুক আর বিস্ময়।

বাড়িগুলো ঘেঁষে মিনিট দুই-তিন হাঁটার পর বাঁ দিকে একটা গলিতে তাকে ঢুকতে হবে। স্কুলের পাঁচ-ছ'জন ছেলে প্রায়ই এখানে তার জন্যে ওত পেতে থাকে। আজও তারা ছিল। দূর থেকে সে ওদের দেখতে পায়নি কেননা ওরা গলির ভিতরের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। গলির মুখে পৌঁছে ঘুরে ঢোকামাত্র ওরা তাকে ঘিরে ফেলে। পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে। একজন সামনে এসে গুটিগুটি এমনভাবে চলতে শুরু করে যে তার পক্ষে দ্রুত কেন ধীরে হাঁটাও অসম্ভব হয়ে পড়ল। তার গৌরবর্ণ লম্বাটে মুখটা তখন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে এল। সে জানে এখন পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে গেলেই দু'জন দু'পাশে এসে তার দুটি হাত চেপে ধরবে। পিছন থেকে কেউ চুল টানবে, নয়তো জুতো দিয়ে তার গোড়ালিতে ঠোক্কর মারতে থাকবে, হাঁটু দিয়ে তার পাছায় ধাক্কা মারবে।

তাই সে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না, কোনও প্রতিবাদও নয়। সে জানে কোনও রকমের বাধা দিলেই ওরা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। মুখে নানারকম তীক্ষ্ণ বিদঘুটে শব্দ করে রাস্তার লোকেদের দৃষ্টি তার দিকে ফিরিয়ে দেবে। এই ব্যাপারটিকেই সে সবথেকে ভয় পায়। কেউ তার দিকে তাকাক এটা সে কোনওমতে চায় না।

চুপ করে মাথা নামিয়ে সে হাঁটার চেষ্টা করে। সামনের ছেলেটি আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে এক পা পিছিয়ে আসে। ফলে সে ছেলেটির পিঠের উপর পড়ামাত্র ছেলেটি তার পিছনে এসে ধাক্কা দেয়। দু'জনের মাঝে সে চ্যাপটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর ওরা ঘেঁষাঘেঁষি করে তাকে ঘিরে এমনভাবে

হাঁটতে থাকে যে রাস্তার লোকেরা কয়েকটি ছেলের একটি জটলা ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সেই সময় তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। জামার হাতায় চোখ মুছে সে ওদের মাঝখানে থেকে প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় হেঁটে যেতে থাকে। অন্যমনস্ক পথিকরা ওকে তখন দেখতেই পেল না। উপরে বারান্দায় দাঁড়ানো কেউ কেউ এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখে হেসে ফেলে।

দুটি বড় রাস্তাকে সংযোগকরা গলিটা দৈর্ঘ্যে ছোট। আবার চওড়া বড় রাস্তায় পড়ে ওরা তাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে এনে দাঁড় করাল। এখানে এই সময় গরম শিঙাড়া ভাজা হয়।

"গোন তো রে আমরা ক'জন?"

"সাত। ওকে নিয়ে আট।"

"ওকে বাদ দিয়ে বল। ... হ্যাঁ রে, দুটো করে শিঙাড়া আর একটা করে অমৃতি, মাথাপিছু এক টাকা হবে তো?"

দলনেতা সবথেকে লম্বা ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। একজন দোকানিকে ইশারা করে শিঙাড়া দিতে বলল। দোকানি হাসছিল। সে এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত। এই ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

"কী গো ছোটবাবু, বন্ধুদের খাওয়াবে না?" দোকানি একগাল হাসির মধ্যেই চোখ টিপল লম্বা ছেলেটিকে। এদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই তার দু' ক্লাস নীচে পড়ে। বাকিজন তিন ক্লাস নীচে।

"আমার কাছে অত পয়সা নেই।"

এই প্রথম সে কথা বলল। ঈষৎ তীক্ষ্ণ অথচ ভরাট স্বর। আড়ালে শুনলে মনে হবে বয়স্ক কেউ যেন বলল।

"পয়সা নেই কী রে। সেই সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে এসেছি, খিদেতে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে... নে নে দিতে বল। কতদিন খাওয়াসনি বল তো?"

"লাস্ট শনিবারের পর আজ, তাই তো রে ভোলা?"

"কী গো ছোটবাবু, দোব?" দোকানি ফুঁ দিয়ে কাগজের ঠোঙার মুখ খুলে থালায় রাখা সদ্য-ভাজা শিঙাড়ার দিকে হাত বাড়াল।

"আমার কাছে আজ পয়সা নেই।" সে আবার বলল। ওর চোখে কাকুতি আর ভয়। চশমাপরা একটি ছেলে ওর কোমরের চর্বি ও চামড়া দু' আঙুলে চিমটি দিয়ে টেনে ধরে নির্বিকারমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

যন্ত্রণার একটা অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোল না ওর মুখ থেকে। ও জানে যে-কোনও প্রতিবাদ দ্বিগুণ অত্যাচারের কারণ হবে।

"কত পয়সা আছে তোর কাছে?" কথাটা বলেই লম্বা ছেলেটি ওর পিছনে দাঁড়িয়ে প্যান্টের দুই পকেটে দুটি হাত ভরে দিল। তার মুঠোয় উঠে এল কাগজে মোড়া হজমি, ইরেজারের টুকরো, গাওয়া ঘিয়ের হ্যান্ডবিল, বাসের টিকিট, লুডোর সবুজ ঘুঁটি আর কিছু খুচরো পয়সা।

"সুটকেসটা খুলে দেখ না।"

একজন ওর হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে সেটা খুলল তোলা-হাঁটুর উপর রেখে। বইখাতা হাতড়ে সে কিছুই পেল না। হতাশ হয়ে সে ডালা বন্ধ করে ফিরিয়ে দেবার সময় সুটকেসটা দিয়ে ওর পেটে গোঁতা মারল। ব্যথা লাগলেও ওর মুখে সেটা প্রকাশ পেল না।

"তা হলে?"

ওরা বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তখন একজন বলল, "ও তো ধারে খাওয়াতে পারে।"

দোকানি কথাটা শুনে বলল, "নাও না। ছোটবাবু তো কাল স্কুলে যাওয়ার সময়ই দিয়ে দেবে। তাই তো ছোটবাবু?"

"কী রে, কাল শোধ করে দিবি তো?"

"হ্যাঁ।"

"আরে ওর বাবা বেশ মালদার। ডেকোরেটিং ব্যবসা, অনেক টাকা আছে, নিজেদের বাড়ি, চাইলেই দিয়ে দেবে তাই না রে?"

"চল চল, ভেতরে বসে খাই। তুই খাবি?"

"না।"

"মাথাপিছু তা হলে এক টাকা নয় দু'টাকা কেমন? দশ দিন আর তোকে আমরা কিচ্ছু বলব না। আর শোন, কেউ যদি তোর পেছনে লাগেটাগে তা হলে আমাদের বলে দিবি।"

"তুই খুব ভাল ছেলে, কোনও ভয় নেই, আমরা আছি। যা এবার... কালকেই টাকা দিয়ে দিবি মনে থাকবে তো?"

সবাই দোকানে ঢুকে গেল। ওর চোখ থেকে ভয়ের ছায়া মিলাল না। দোকানের ভিতরে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে বাস-স্টপে এসে দাঁড়াল।

কয়েকটা বাস চলে যাবার পর তার গন্তব্যের বাসটি আসতেই সে হাত তুলল। আরও পাঁচ-ছ'জন বাসে ওঠার জন্য এগিয়ে গেল। ভিড় রয়েছে। ঠেলেঠুলে ভিড়ের মধ্যেই এক হাতে সুটকেস অন্য হাতে রড ধরে বাসের উঁচু পাদানিতে সে পা পৌঁছে দিতে পারছিল না। বাস ছেড়ে দিচ্ছে তখন কে একজন তাকে জাপটে সিঁড়িতে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ল। ভিড়ের চাপে প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় সে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেল না কে এই উপকারটি করল।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ির দু'ধাপ উপরে উঠে ভিড়ের মধ্য দিয়ে সে আড়চোখে দেখল বারো ক্লাসের সেই ফুটবলার যাকে স্কুলে সবাই 'রিভা' বলে ডাকে, পাদানিতে দাঁড়িয়ে শরীরটা বাইরে হেলিয়ে রাখা ডান হাতে, রড ধরা বাঁ হাতে দুটো বই আর খাতা। ভিতরে এসে দাঁড়াবার মতো জায়গা রয়েছে কিন্তু ও ঝুলেই চলেছে। ওর মুখে অদ্ভুত একটা প্রসন্ন বীরত্বের আভা। রিভা এগারো ক্লাসে একবার ফেল করেছে। গতবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেনি। রিভা নামে খুব নামী একজন ফুটবলার আছে ইতালিতে। তারই নামে ওর এই নাম।

রিভা একবারের জন্যও বাসের ভিতরের দিকে তাকাচ্ছে না। সে অবশ্য চাইল একবার অন্তত তাকাক তা হলে চোখ দিয়ে হেসে কৃতজ্ঞতা জানাবে। লোকেদের চাপে এবং ঠেলায় সে ক্রমশ বাসের ভিতরে ঢুকে যেতে যেতে আবার ভয় পেল। ধরে দাঁড়াবার মতো কিছু একটা সে পাচ্ছে না। সিটের পিঠে বা মাথায় হাত রেখে দাঁড়ানো ছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু নিকটতম সিটের কাছে যাওয়াই এখন দুঃসাধ্য। বাস থামা বা যাত্রা শুরু করলেই পাশের লোকের গায়ে সে হেলে পড়ছে। দুটো পা ফাঁক করে কন্ডাক্টরদের মতো যে দাঁড়াবে তেমন জায়গাও নেই। মেয়েদের সিটের সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। একজন নামবার সময় পিঠে চাপ পড়তেই সে হুমড়ি খেয়ে মাঝবয়সি এক মহিলার কোলের উপর পড়ল। তিনি 'আঃ' বলে উঠেই তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সে করুণমুখে মহিলার দিকে তাকিয়ে বোঝাতে চাইল, আমি নিরুপায়। মহিলা অবশ্যই বুঝলেন এবং মুখ জানলার দিকে ঘুরিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

বাস থেকে নামার সময় রিভা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। তাতে ও খুব খুশি হল। অনেকেই তাকে দেখে অনেকভাবে। হাসে কিন্তু সে তাতে দুঃখ পায়, লজ্জা পায় এমনকী রেগেও যায়। কিন্তু সে জানে তার দুঃখ, লজ্জা বা রাগ দিয়ে অন্যের কিছুই আসে যায় না। রিভার হাসিটার মধ্যে অন্য কিছু ছিল। সেটা যে কী তার ষোলো বছর বয়স দিয়ে সে বুঝতে পারছে না। বাবা-মা ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে এমন স্নেহ-মাখানো যত্ন বা হাসি সে পায়নি।

বাস থেকে সে যেখানে নামল সেই অঞ্চলটা নতুন।বছর পনেরো আগে কলকাতার এদিকটা আধা-গ্রাম ছিল। ঝোপজঙ্গল-বাগান-ডোবা-টালির ঘর আর মাঝে মাঝে একতলা পাকা বাড়ি। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট পাকা চওড়া রাস্তা বানিয়ে মাটি ফেলে জমির উন্নতি করে খণ্ডে খণ্ডে বিক্রি করেছে নিলামে। বাস রাস্তার ধারে বাড়ি উঠে গেছে। রাস্তা থেকে মিনিট পাঁচেক ভিতরে হাঁটলে পুরনো জীর্ণ পাকা বাড়ি, পুকুর, মন্দির, নারকেল বা কাঁঠালগাছ দেখা যাবে।

বাস-স্টপ থেকে গলিতে ঢুকে লোহার ফটকওয়ালা বাড়িটা এবং লাগোয়া আরও দুটি বাড়ি ছাড়ালেই অসমান, ভাঙা গর্তে-ভরা খোয়ার রাস্তা। ধাঙড়দের একটা বস্তি সেই রাস্তার শুরুতেই। বাঁয়ে এবং ডাইনে আরও দুটি রাস্তা চলে গেছে। সদ্য তৈরি হওয়া বা তৈরি হচ্ছে এমন কয়েকটা বাড়ি সেই রাস্তায়। এ-ছাড়া পড়ে আছে কয়েকটা ফুটবল মাঠ হয়ে যাবার মতো শুকনো আর জলা জমি।

ধাঙড়দের পোষা শুয়োর আর গোয়ালাদের মোষ প্রায় সারাক্ষণই এইসব জমিতে ঘুরে বেড়ায়, কখনও-বা রাস্তার উপরেও। এতে সে ভীত বা বিব্রত বোধ করে না।

তার একমাত্র ভয় ধাঙড় বস্তির কুকুরগুলোকে। সাত-আটটা থাকে ঠিক মোড়টায় যেখান থেকে তার বাড়ির দিকে যাওয়ার রাস্তাটা শুরু হয়েছে। ওর মধ্যে সব থেকে হিংস্র হৃষ্টপুষ্ট কালোটা যার দুই চোখের উপরে বাদামি ছোপ এবং কানদুটো খাড়া। ওরা কাল্লু বলে ডাকে। কাঁধে থলি বা হাতে ব্যাগ নিয়ে কাউকে দেখলেই কাল্লু ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়। কয়েকজনকে কামড়ে হাত-পায়ের মাংস তুলে নিয়েছে। পাড়ার লোকেরা কুকুরদের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ করে ফল পায়নি। বস্তির লোকেরা দলবেঁধে পুলিশকে শাসিয়েছে, কুকুরদের গায়ে হাত দিলে ভদ্রবাবুদের এখানে বাস করতে দেবে না।

সুটকেস হাতে সে থমকে দাঁড়াল। দূর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে মোড়ের উপর কাল্লু হাত-পা ছড়িয়ে বসে। আর এগোবে কি এগোবে না ভাবতে ভাবতেই দেখল কাল্লু তার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত বোঝার চেষ্টা করছে, লোকটা কে? ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিল।

একজন সাইকেলে তার পাশ দিয়ে এবং কাল্লুকে অতিক্রম করে সোজা চলে গেল। দুটি স্ত্রীলোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কাল্লুর প্রায় গা ঘেঁষেই হেঁটে এল। দেহটা মুচড়ে মুখ ঘুরিয়ে কোমরের কাছে দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে পোকা তোলায় কাল্লু ব্যস্ত। সে ভাবল এই সুযোগ, কুকুরটার এখন অন্যদিকে তাকাবার ফুরসত নেই তা ছাড়া ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক প্রৌঢ় তার পিছনদিক থেকে আসছে, তার সঙ্গে পাশে পাশে হেঁটে গেলে কাল্লু হয়তো কিছু করবে না।

সে লোকটিকে ডান দিকে রেখে প্রায় গা ঘেঁষেই হাঁটতে লাগল। দু'-তিনবার তার দিকে লোকটি তাকাল এবং হাসল। সে যে ভয় পেয়েছে এটা বুঝে গেছে লোকটি। সারা শরীরের স্নায়ু এবং পেশি টানটান। পা দুটি থরথর করছে, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ, আড়চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে কাল্লুর কাছাকাছি এসে গেছে।

"কুকুরকে ভয় পাও বুঝি?" লোকটি বলল।

ও মাথাটা অল্প নাড়ল। গলা শুকিয়ে গেছে।

"ভয়ের কী, আমি আছি।"

তখনই কাল্লু মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হল। কুকুরটির চাহনিতে সে সন্দেহপরায়ণ সজাগতা দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সুটকেসধরা মুঠিটা শক্ত হয়ে গেল, মুখ থেকে অস্ফুটে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল।

দ্রুতপায়ে সে কুকুরটিকে পেরিয়ে যাবার সময় লক্ষ করল ওর চোখ তার সুটকেসের উপর এবং শুনতে পেল চাপা একটা গরগরানি। এরপরই সে ছুটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

পিছনে কয়েকবার ক্রুদ্ধ ডাক এবং রাস্তার ইটের উপর নখের আঁচড়ের শব্দ থেকে সে বুঝে গেল কাল্লু তার দিকে ছুটে আসছে। সে ডান দিকে দুটো বাড়ির মাঝখানে ঘাসের সরু পথ দেখে ঢুকে পড়ল এবং কয়েক মিটার যেতে না যেতেই প্রায় পায়ের কাছে কাল্লুর মাথা দেখতে পেয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একতলায় লোহার গরাদ ঘেরা একটা বারান্দা, সে গরাদে পিঠ লাগিয়ে প্রাণভয়ে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সুটকেসটা মুখের কাছে তুলে ধরে।

কাল্লু থমকে গেছে। কুঁজো হওয়া ঘাড়ের রোঁয়া ফুলে রয়েছে। উপরের পাটির দাঁতগুলো বেরিয়ে। ওর পিছনে খর্বাকৃতি আরও দুটো কুকুর এসে গেছে। তারা অবিরাম চিৎকার করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এগিয়েও আসছে।

ও দু'ধারে তাকিয়ে দেখল। গরাদে পিঠ ঘষড়ে ডান দিকে এক পা এক পা করে সরে যেতেই কাল্লু তার জুতোর কাছে দাঁত নিয়ে এগিয়ে এল। 'না না না।' সে ভীত কান্না জড়ানো স্বরে কাতরে উঠে সুটকেসটা পায়ের কাছে নামিয়ে আনল।

"চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, একদম নড়বে না।"

ঠিক তার পিছনে কে বলে উঠল কথাটা।

ও পলকের জন্য পিছনে তাকাল। মনে হল একটি মেয়ে।

গরাদের ফাঁক দিয়ে একটা ক্রাচ বেরিয়ে এল।

"এটা হাতে নাও আর সুটকেসটা আমায় দাও।"

এক গাছি সোনার সরু চুড়িপরা হাত পিছন থেকে এগিয়ে এল। সে সুটকেসটা হাতে তুলে দিয়ে ক্রাচটা নিল।

"ওটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরো। কুকুরগুলো তা হলে ওটাকে কামড়াতে যাবে। আর তুমি সেই ফাঁকে আস্তে আস্তে ডান দিকে সরে এসো। দরজা খুলে দিচ্ছি, চট করে ঢুকে পড়বে।"

কথামতো সে কাঠের দণ্ডটি সামনে বাড়িয়ে ধরতেই কাল্লু একহাত পিছু হটেই হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে ক্রাচের ডগাটা কামড়ে ধরল। সে হ্যাঁচকা টানে সেটি ওর দাঁত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েই পাগলের মতো ঘোরাতে ঘোরাতে ডান দিকে পিছু হটতে হটতে খোলা দরজা পেয়েই ঢুকে পড়ে পাল্লা বন্ধ করে দিল।

হাঁফাচ্ছিল সে। শরীর থরথর করে কাঁপছে। কপাল থেকে চিবুক বেয়ে ঘাম টপটপ করে ঝরে পড়ছে। দরজার বন্ধ পাল্লা দু'হাতে চেপে ধরে সে বাইরে কুকুরদের চিৎকার শুনছে।

"আর ভয় নেই।"

ও ঘুরে দাঁড়াল। হাসিমুখে একটি মেয়ে তার থেকে পাঁচ-ছ' হাত পিছনে দাঁড়িয়ে। পরনে খয়েরি ও হলুদ প্রিন্টের সালোয়ার আর ছোট হাতা কামিজ। মাজা রং, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, শীর্ণ এবং লম্বা। বাঁ বগলে একটা ক্রাচ। মুখটি ডিম্বাকৃতি, চোখের মণিদুটো ঝকঝকে এবং গাঢ়।

ক্রাচটা ফিরিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে ধরল। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে ডান বগলের নীচে রাখল।

"খিলটা লাগিয়ে দাও। কিছুক্ষণ চেঁচাবে তারপর চলে যাবে।"

খিলটা ধরে ও লাগাবার জন্য তুলে নাগাল পেল না। মুখ ঘুরিয়ে বিপন্নদৃষ্টিতে তাকাল। মেয়েটি দুই ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে খিল লাগাল তার পিছু পিছু সে। বারান্দায় কাঠের ছোট টেবল আর একটা চেয়ার। টেবলে খোলা একটা বই উপুড় করে রাখা।

"এখন একটু বোসো।" মেয়েটি বারান্দার দিকে এগোল।

"এত কুকুর ডাকছে কেন রে মণি?"

পাশের বাড়ির দোতলার জানলায় এক মাঝবয়সি গৃহিণীর মুখ দেখা গেল।

বারান্দার গরাদের ধারে সরে এসে মেয়েটি মুখ তুলে বলল, "তাড়া করেছিল।"

"কাকে?"

"আমার এক বন্ধুকে।"

মণি হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। বন্ধু শব্দটি ব্যবহার করার জন্য যেন চোখদুটি অনুমোদন চাইছে। ও বাইরে তাকাল। কাল্লু হতাশ হয়ে তার দল নিয়ে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হল সে এখন নিরাপদ এবং ধীরে ধীরে একটা হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বরফের মতো ভয়টা ভেঙে গিয়ে শরীরে যেন রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

"বোসো এখন। একটু পরে যেয়ো।" বাধ্য ছেলের মতো ও চেয়ারে বসেই উঠে দাঁড়াল।

"না না, তুমি বোসো, আমি মোড়া আনছি।" সে আবার বসল।

বারান্দার লাগোয়া ঘরটায় মেয়েটি ঢুকে গেল পর্দা সরিয়ে। ওর ক্রাচের খটখট শব্দে সে কান পেতে রইল। দু' হাতে যদি ক্রাচটা বগলের নীচে ধরে থাকতে হয় তা হলে মোড়াটা আনবে কী করে। চিন্তাটা তার মাথায় আসামাত্র সে উঠে দরজার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে তাকাল। মাঝারি আকারের ঘর। ছিমছাম, বাহুল্যবর্জিত। জানলাগুলিতে পর্দা, একটা কাচের আলমারি। তাতে বই আর পুতুল। দেওয়ালে বড় আকারের হাস্যোজ্জ্বল যুবকের একটি ছবি টাঙানো। ছোট টেবলে দেওয়ালে হেলান দেওয়া গেরুয়া কাপড়ের খোলেভরা তানপুরা। মেঝেয় জলচৌকিতে লক্ষ্মীর পট। প্রথম নজরে এগুলিই তার চোখে পড়ল।

মণি খাটের তলা থেকে নিচু একটা মোড়া বার করে সেটাকে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। ওকে দরজায় দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাসল। ও এগিয়ে এসে মোড়াটা তুলে বারান্দায় এনে নিজে তাতে বসল। চেয়ারটা উঁচু, ওর মনে হল এ-জন্য মণির বসতে সুবিধা হবে।

"তোমাকে আমি অনেকদিন স্কুল থেকে ফিরতে দেখেছি. . এই চেয়ারটায় বসলে রাস্তার খানিকটা দেখা যায় তো। তোমরা নতুন এখানে তাই না?"

"হ্যাঁ, জানুয়ারিতে এসেছি।"

"আমরা দু'বছর প্রায়। তোমাদের নিজেদের বাড়ি?" ও মাথা হেলাল।

"আমরা ভাড়া। শোবার ঘর আর এই বারান্দা এরমধ্যেই আমার ঘোরাফেরা, প্রায় বন্দিই বলতে পারো।"

"বাইরে যাও না? যেতে তো পারো?"

"যাই, ওই রাস্তা পর্যন্ত। আর বেশি গিয়ে কী হবে, এখানে আমার সমবয়সি তো কেউ নেই।"

মণি হাসল। করুণ বিমর্ষ হাসি। দেখে ও দুঃখবোধ করল।

"স্কুলে যাও না?"

মণি মাথা নাড়ল।

"এখানে ধারে কাছে কোনও স্কুল নেই আর বাসে চেপে দূরে কোথাও..."

টেবলে হেলিয়ে রাখা দুটো ক্রাচের দিকে তাকিয়ে মণি মাথা নাড়ল।

দু'জনে আর কথা বলল না কিছুক্ষণ। ও মেঝের দিকে তাকিয়ে আর মণি বাইরে তাকিয়ে।

"আমারও বাসে খুব অসুবিধা হয়। ধরে দাঁড়াবার মতো কিছু তো হাতে পাই না।"

মণির সঙ্গে একটা ব্যাপারে নিজেকে সমান করে কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে ও স্বস্তি পেল।

"কুকুরটা মারাত্মক ফেরোসাস, ওকে মেরে ফেলা উচিত। অনেককে কামড়েছে।"

"না না, মেরে ফেলা ভাল নয়। জীবজন্তুকে মারতে নেই।'

মণির স্বরের কোমলতা, ভঙ্গির আন্তরিকতা ওকে অপ্রতিভ করল।

"যদি আমাকে কামড়াত তা হলেও এই কথা বলতে?"

মণি চুপ করে রইল। তাইতে ও একটু দমে গেল। এমন কিছু বলা ঠিক হবে না যাতে মণি বিব্রত হতে পারে।

"তুমি গান করো?"

মণি ওর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপব হাসি ছড়িয়ে বলল, "তানপুরাটা আমার নয়, মায়ের। তবে এখন আমিই শিখি। মা রেডিয়োয় গাইত। বাবাও গাইত, রেডিয়ো অফিসে ওদের প্রথম আলাপ।"

"কী নাম মায়ের?"

"রেবা দত্ত। অবশ্য খুব একটা নামী গাইয়ে ছিল না। বাবা মারা গেছে আট বছর। মাকে একবারের জন্য গুনগুনও করতে শুনিনি এই আট বছর।"

"কী গান গাইতেন?"

"কীর্তন। আর মাঝেমাঝে গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত।"

"আর তুমি?"

"মাস্টারমশায়ের কাছে এখন খেয়াল শিখছি।"

"পড়াশুনো করো না?"

"পড়ি, রাত্রে মা'র কাছে।"

"মা কোথায়?"

"অফিসে। বাবার অফিসেই চাকরি পেয়েছে। আসতে সন্ধে হয়ে যায়, ট্রেনে যা ভিড়।"

"ট্রেন!"

"শ্যামনগরে হনুমান জুট মিলের অফিসে মা কাজ করে। ওদের কোয়ার্টার আছে, মা চেষ্টা করছে পাবার জন্য।"

ওরা আবার কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল। নির্জন নিস্তব্ধ এই এলাকাটা। কোথা থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে। একটা শালিক বারান্দার গরাদের ফাঁকে খুব কাছেই উড়ে এসে বসল। দু'জনে শালিকটার দিকে তাকিয়ে হাসল।

"একটা শালিক দেখতে নেই।"

"ধারেকাছে ওর জোড়াটা নিশ্চয় আছে। রোজ আসে এই টেবলে এঁটোকাঁটা খেতে।"

"আমি এবার যাব।"
"মা ভাববেন?"
"হ্যাঁ।"
"আর কে কে আছেন?"
"বাবা।"
বলেই সে পাংশু হয়ে গেল। বাবা থাকাটা তার কাছে এই মুহূর্তে অস্বস্তিকর লাগল।
"আর কে আছে, ভাই, বোন, ঠাকুমা?"
"না, আর কেউ নেই। বাবা মা আর সেবক আমাদের চাকর। তোমার কেউ নেই?"
"আছে, ঠাকুমা, ঠাকুরদা, কাকারা। ওরা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, ওদের অমতে বাবা বিয়ে করেছিল তো।"
"আমার জ্যাঠা জয়পুরে থাকেন। কাকা আছে মিলিটারিতে, মেজর।"
"বাবা কী করেন?"
"ডেকোরেটিংয়ের ব্যবসা, সিমলেয় দোকান। জানো, কোথায় সিমলে?"
মণি মাথা নাড়ল।
"আমি কিচ্ছু চিনি না। আগে থাকতাম টালায়। সেখানেও বাড়ি থেকে বেরোতাম না।"
"তোমার কী হয়েছে?"
"ডান পাটায় পোলিও, চার বছর বয়স থেকে। একদম সরু কাঠির মতো।"
"ডাক্তার দেখাও না?"
মণি ম্লানভাবে হাসল। ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, "আমাকেও অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে, ওষুধ, ইনজেকশন অনেক নিয়েছি।"
"মা রোজ রাতে আমাকে মালিশ করে দেয়। কিছুই হয়নি, তবু মা হাল ছাড়েনি।"
"আমারও কিছু হয়নি।"
ও উঠে দাঁড়াল। সুটকেসটা মেঝে থেকে তুলল। মণি ক্রাচ দুটো বগলে লাগিয়ে দু'পা গিয়ে উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠল, "ওই দ্যাখো ওই দ্যাখো জোড়াটা।"
পাশের বাড়ির কার্নিশে পাশাপাশি দুটো শালিক। ও বলল, "এ-দুটোই কি রোজ খেতে আসে?"
মণি নিশ্চিত-ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দরজার খিল খুলে সে বলল, "চলো, রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিই।"
"কী দরকার?"
"কুকুরগুলো যদি কাছাকাছি থাকে?"
ও মেনে নিল। রাস্তায় এসে দেখল কোথাও কুকুরদের চিহ্নও নেই।
"মিনিটখানেক গিয়ে রাস্তাটা ডান দিকে যেখানে বেঁকেছে সেখানে একটা লাইটপোস্ট, তার পাশ দিয়ে সরু একটা ইট-বাঁধানো রাস্তা, একটু এগোলেই বাঁ দিকে আমাদের একতলা বাড়ি। তুমি আসবে?"
"আমি একা, কী করে যাব বাড়ি ফেলে রেখে। তুমিই ববং আবার এসো... তোমার নাম এখনও জানা হল না।"
"দীপাঞ্জন, ডাকনাম দীপ। তোমার ভাল নাম কী?"
"রতনমণি।"
"বাঃ, নামটা তো তোমার সুন্দর। কে রেখেছে?"
"আমার বাবা।"
"এবার আসি, কেমন?"
দীপ কয়েক পা গিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল মণি তার দিকে তাকিয়ে। কী ভেবে সে ফিরে এল।
"তোমাকে আমি একটা কথা বলব, হাসবে না?"
"না।"
"ঠিক বলছ?"

মণি মাথা কাত করল।

"তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল রয়েছে।" এই বলেই সে ছুটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। ঝাঁকড়া চুল আর চার ফুট উচ্চতার বামন ছেলেটির চর্বিভরা থপথপে দেহ নিয়ে অদ্ভুত দৌড় দেখতে দেখতে মণির মুখ একটা চাপা আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীপ কিন্তু একবারও পিছু ফিরে তাকাল না।

বাড়ির সদর দরজায় কলিংবেলের বোতাম মেঝে থেকে চার ফুট উপরে। দীপের জন্য নানান ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে সে সমস্যায় না পড়ে। বাড়ির সব খিল, ছিটকানি, বিদ্যুতের সুইচবোর্ড, জলের কল, লেটার বক্স দীপ যাতে হাতের নাগালে পায় এমনভাবে লাগানো। চৌবাচ্চার দেয়াল নিচু, খাবার টেবলে তার চেয়ারটি উঁচু এবং তাতে একটি ধাপ আছে পা রেখে উঠে বসার জন্য। দীপের জন্য আলাদা ঘর সেখানেও বাচ্চাদের মতো ছোট্ট খাট। চেয়ার, টেবল, আলমারি তো বটেই জানলাও নিচু। বস্তুত একতলা এই বাড়ির মধ্যেই যেন আর-একটা বাড়ি। বাড়ির সকলেরই উচ্চতা স্বাভাবিক শুধু একজনের ছাড়া।

অন্যদিনের তুলনায় আজ স্কুল থেকে ফিরতে দীপের দেরি হয়েছে। ওর মা উৎপলা উদ্‌বিগ্ন হয়ে সেবককে বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য বলছিল, ঠিক সেই সময়েই দীপ ফিরল। দৌড়ে আসার জন্য তখনও সে হাঁফাচ্ছে। মুখ লাল।

উৎপলা ওর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল। পাড়ার লোকের, প্রতিবেশীদের, এমনকী বাড়ির সহ ভাড়াটেদের উত্যক্ত করার, যেটা কখনও কখনও অত্যাচারে পরিণত হত বা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করার জন্যই তারা এখানে বাড়ি করে উঠে এসেছে। অঞ্চলটা ফাঁকা ফাঁকা, এখনও অনেক জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। লোকজন বিশেষ করে দীপের বয়সিদের সংখ্যা কম।

ওকে সব থেকে বেশি জ্বালাতন করে সমবয়সিরাই। দীপ যেন অন্য গ্রহের জীব এইভাবে সবাই তাকায়, ওর পিছু নিয়ে দেহ সম্পর্কে অপমানকর মন্তব্য করতে করতে হাঁটে, কেউ কেউ ঢিলও মেরেছে। বহুদিন দীপ বাড়ি ফিরে কেঁদেছে, স্কুল যেতে চায়নি, অসুখের ভান করে শুয়ে থেকেছে। তিনবার স্কুল বদল করেছে শুধু এইজন্যই।

কৃষ্ণচন্দ্র সকাল আটটায় বেরিয়ে দুপুরে খেতে আসে, আবার বিকেলে বেরিয়ে যায় এবং রাত্রে ফেরার কোনও ঠিক নেই। ব্যবসা খুব বড় নয় তাই পরিশ্রম প্রচুর। ছেলের সঙ্গে বাবার সারাদিনে অল্পক্ষণই দেখা হয়। দীপ বাড়ি থেকে বেরতে চায় না, বাড়ির বাইরে গিয়ে খেলতে চায় না। তাই একসময় কৃষ্ণচন্দ্র খেলনা, রেডিয়ো আর ঘরে বসে খেলার জন্য দাবা, ক্যারম প্রভৃতি কিনে দিয়েছে। এ ছাড়া গল্পের বই আর ম্যাগাজিনে দীপের ঘর ভরা। উৎপলা ছেলেকে নিয়ে ঘরে বসে খেলত। কিন্তু একসময় তা-ও একঘেয়ে হয়ে যায়। দীপ ছাদে উঠত কিন্তু পাঁচিল তার মাথার উপরে। টুলে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিকেল কাটাত। নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে সে স্বল্পবাক হয়ে গেছে। পরিচিতদেব দিকে সে সন্দিগ্ধচোখে তাকায়।

দীপ তাদের একমাত্র সন্তান। ওকে সুখে এবং নিরাপদে রাখার জন্য তাদের ব্যাকুলতা ও দুর্ভাবনা অপরিসীম। বহুদিন স্বামী-স্ত্রী কপালে হাত রেখে বিষণ্ণ মুখে বসে থেকেছে নির্বাক হয়ে। কেন এমন হল, এই প্রশ্ন একসময় পরস্পরকে করত এখন আর করে না। উৎপলা জাগ্রত দেবদেবীর কথা শুনলেই ছুটে গেছে। হত্যে দিয়েছে মানত করেছে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ জায়গায়। কৃষ্ণচন্দ্র চেয়েছিল আর একটি সন্তান হোক। উৎপলা রাজি হয়নি। যদি দীপের মতোই বামন হয়। তার থেকেও মারাত্মক যদি সে স্বাভাবিক আকৃতির হয়? দীপের পক্ষে সেটা মর্মান্তিক হবে। উৎপলা বলেছিল, "আমার একটিই ভাল। জানি না কী পাপ করেছিলাম যে-জন্য ভগবান এমন শাস্তি দিলেন!"

দীপকে লম্বা করার জন্য চার-পাঁচজন ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। কিছুদিন ইনজেকশন, ট্যাবলেট, অর্থব্যয় ছাড়া আর কোনও ফললাভ হয়নি। ওরা এখন মেনেই নিয়েছে দীপ এ-রকমই থাকবে। এক ডাক্তার বলেছিলেন, ইউরোপে হিউম্যানগ্রোথ হরমোন ইনজেকশন করে চিকিৎসা শুরু হয়েছে। এই হরমোন সদ্যমৃত মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে সংগ্রহ করা হয়। টানা দু'বছর চিকিৎসা করতে দরকার পঞ্চাশ থেকে একশোটা পিটুইটারি গ্রন্থি যেগুলো সংগ্রহ করতে হয় মানুষের মস্তিষ্ক থেকে। এই চিকিৎসায় দেখা গেছে বছরে উচ্চতা বাড়ে দুই থেকে ছয় ইঞ্চি।

শুনে ওরা একসঙ্গে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তারবাবুর পরের কথাটিতে ওরা ঢোঁক গিলে চুপ করে বসে থাকে।

"এই হরমোন কিনে চিকিৎসা করতে বছরে খরচ পড়ে ছ'লাখ টাকার মতো।"

"আজ আমাকে কাল্লু তাড়া করে কামড়ে দিচ্ছিল।" দীপ উত্তেজিত স্বরে বলল বাড়ির মধ্যে ঢুকেই।

"কে কাল্লু?" উৎপলা অবাক হয়ে দীপের জুতোর ফিতে খোলা বন্ধ রেখে তাকিয়ে থাকে।"

"একটা কুকুর, ওই মোড়ে বসে থাকে আর সবাইকে কামড়াতে যায়, বড়দেরও।"

"কী সর্বনাশ! তুই কী করলি?"

"একটা মেয়ে আমায় বাঁচিয়ে দিল।"

উৎপলা প্রশ্ন করে করে জেনে নিল কীভাবে সে বাঁচল। এক সময় মন্তব্য করল, "মেয়েটি খুব ভাল তো!" তারপর বলল, "কাল থেকে আমি বাস-স্টপে থাকব, সঙ্গে করে নিয়ে আসব।"

রাতে মশারি গুঁজে দিচ্ছিল উৎপলা। তখন দীপ ফিসফিস করে বলল, "আমার জন্য কালিকাপুরে পুজো দিতে যাবে বলেছিলে, কই গেলে না তো?"

উৎপলার মনে পড়ল দিন সাতেক আগে এক সকালে ঠিকে ঝি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, কালিকাপুরে শিব ও কালীর জোড়া মন্দির আছে। ওখানে মানত করে, হত্যে দিয়ে অনেকের অনেক মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। উৎপলা বলেছিল তাকে একবার নিয়ে যেতে। দীপ যে কথাগুলো তার ঘর থেকে শুনেছে তা জানত না।

"যাব।"

"তা হলে মণির জন্যও পুজো দিয়ো। কাল্লুকে মেরে ফেলতে ও বারণ করেছে, মনটা ওর খুব নরম।"

উৎপলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আলো নিবিয়ে দীপ ডাকল।

"দশটা টাকা দেরে।"

"কেন? ইদানীং প্রায়ই তুই পাঁচ-দশ টাকা নিচ্ছিস।"

"এমনি।"

"এইটুকু ছেলের এমনি এমনি টাকার দরকার হয়?"

"খাওয়াব।"

"কাকে?"

দীপ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "বন্ধুদের। ওরা আমাকে খুব হেল্প করে।"

"আচ্ছা।"

উৎপলা চলে যাবার পর চিত হয়ে বুকের উপর দুই হাত রেখে দীপ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় যখন ঘুমিয়ে পড়ল দুই চোখের কোল তখন ভিজে।

পরদিন দীপ বাস থেকে নামতেই উৎপলা তার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে নিল।

"থাক না আমার হাতে।" দীপ অনুযোগ জানাল।

উৎপলা কর্ণপাত না করে ওর কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করল। বাড়িগুলো পেরিয়ে কাঁচা রাস্তায় এসেই দীপ সুটকেসটা চেপে ধরল।

"আমায় দাও। আমাকে তুমি বাচ্চা ছেলে ভাবো কেন?"

ওর কণ্ঠস্বরে জেদ আর চাপা রাগ ছিল। উৎপলা তাইতে অবাক হয়ে বলল, "তুই তো বাচ্চাই।"

"কত বাচ্চা, সাত, আট, নয়? আমার হাইট তো ওদের থেকেও কম... চার, পাঁচ, ছয়? আমাকে কি অতটাই বাচ্চা ভাবো? আমার বয়স তো এখন ষোলো, তাই না?"

দীপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। এ-রকম বিশ্রী মেজাজে উৎপলা ওকে আগে দেখেনি। তার মনে হল, নিশ্চয় কিছু একটা আজ হয়েছে। শান্ত গলায় প্রায় অনুনয়ের সুরে সে বলল, "মায়ের কাছে ছেলে তো চিরকালই বাচ্চা, এ-জন্য তুই অমনভাবে বলছিস কেন!"

কথা না বলে সুটকেস থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দীপ বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে হাঁটতে শুরু করল উৎপলাকে পিছনে ফেলে। লম্বা পায়ে উৎপলা ওর পাশে পৌঁছে বলল, "কেউ কিছু বলেছে তোকে?"

দীপ জবাব দিল না।

"বল না, কিছু কি হয়েছে?"

"স্কুলে স্পোর্টস হবে, নাম দিতে গেছলুম। নিল না।"

"কেন!"

"সমরবাবু বললেন বড়দের সঙ্গে দৌড়ে আমি পারব না। আমি বললুম সবাই তো আমারই বয়সি, বড় আবার কে?... উনি বললেন, বয়সে নয় মাথায় বড়। ওদের এক পা নাকি আমার তিন পায়ের সমান, আমি হেরে যাবই তাই মিছিমিছি নেমে লাস্ট হয়ে কী লাভ!"

"ঠিকই তো বলেছেন উনি।"

দীপ মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল। ক্ষোভ জিজ্ঞাসা বিস্ময় মিলিয়ে অদ্ভুত হয়ে আছে মুখটা। ভিতরের অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় গালের পেশি কুঁকড়ে রয়েছে, দুই চোখে অভিযোগ এবং ভর্ৎসনা।

"আমি পারব না?"

ছেলে কী বলতে চায়, ওর মনের মধ্যে কী জ্বলছে সেটা উৎপলা ধরতে পারল না। সান্ত্বনা দেবার মতো ভঙ্গিতে বলল, "সব জায়গায় সব মানুষ কি পারে?"

"তা হলে আমি কোনওদিনই পারব না।"

দীপ সামনে তাকিয়ে আপনমনে কথাটা বলল কিছুটা হতাশ কিছুটা উদাসস্বরে। কাল্লুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দু'-তিনটি কুকুর ধাঙড় বস্তির ভিতরে ঘোরাঘুরি করছে। এখানে খোলা আকাশ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটা মুখপোড়া ঘুড়ি টাঙ্কির টানে আকাশে লাফাচ্ছে। দীপের চোখ ঘুড়িতে আটকাল। অনুমান করতে চেষ্টা করল কোন ছাদ থেকে ওটাকে ওড়াচ্ছে।

ঘুড়ি ওড়াবার শখ তার খুবই কিন্তু উৎপলা এই একটি ব্যাপারে ছেলের প্রতি বাৎসল্য দেখাতে শত কান্নাকাটিতেও রাজি হয়নি। ছোটবেলায় সে সামনের বাড়ির একটি যুবককে চোখের সামনে চারতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে রাস্তায় পড়ে যেতে দেখেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় কিন্তু তার আগে শরীরের খিঁচুনি এবং ফাটা মাথার রক্তে মাখামাখি মুখটির দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল। এর পর বহু রাতে ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে সে বিছানায় বসে থেকেছে। ঘুড়ির প্রতি তার আতঙ্ক আজও কাটেনি।

হাঁটার গতি কমিয়ে দীপ ডান দিকে তাকাল। এখন তারা মণিদের গলিটার সামনে। গরাদগুলোর ফাঁক দিয়ে বারান্দার ওপারে কী আছে বোঝা গেল না। একটু ইতস্তত করে সে বলল, "মা এক মিনিট, আমি আসছি।"

সে দৌড়ে বারান্দার কাছে গিয়ে দেখল কেউ নেই। আস্তে ডাকল, "মণি।"

ঘরের ভিতর থেকে হালকা একটা খটখট শব্দ আসার জন্য সে কান পেতে রইল।

ঘরের পর্দা সরিয়ে মণি উঁকি দিতেই সে পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা ডেলা বার করে গরাদের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

"কী ওটা?"

"দ্যাখোই না খুলে।"

মণি একপায়ে ভর দিয়ে ছোট্ট একটা লাফে বারান্দায় বেরিয়ে এল দেওয়াল ধরে। চেয়ারের পিঠ, টেবল তারপর গরাদে পৌঁছে গেল দু'-তিনটে লাফে। দীপের হাত থেকে নিয়ে কাগজ খুলেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "হইহই হজমি! দারুণ, আমার খুব ভাল লাগে।"

"কাল তা হলে, আবার।"

দীপের মুখ ঝলমল করে উঠল। সে এক দৌড়ে অপেক্ষমাণ মায়ের কাছে ফিরে এল।

"এই মেয়েটিই?"

"হ্যাঁ।"

সন্ধ্যায় রঞ্জনবাবু পড়াতে আসেন। প্রায় সত্তর বছর বয়সি, ধীর স্বভাবের এই প্রাক্তন স্কুলশিক্ষক যে-মমতায় ও যত্নে দীপকে গ্রহণ করেছেন তাতে কৃষ্ণচন্দ্র ও উৎপলা উভয়েই কৃতজ্ঞ। রঞ্জনবাবু পড়াতে শুরু করার পর থেকে স্কুল-পরীক্ষায় প্রথম চারজনের মধ্যে দীপ গত চার বছর ধরে রয়েছে।

সে মেধাবী নয় কিন্তু পরিশ্রমী। এই বৃদ্ধের সে অত্যন্ত অনুগত, ওকে খুশি করার জন্য সে পরীক্ষার ফল ভাল করার দিকে যত্নবান। গৃহশিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠে দু'জনকে আত্মিক ঘনিষ্ঠতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

দীপ পড়তে বসেই তার আজকের অভিজ্ঞতার কথাটা বলল।

"ওরা মাথায় বড় বলে কি ওদের সঙ্গে আমি পারব না?"

রঞ্জনবাবু হাসিমুখে এতক্ষণ দীপের কথা শুনছিলেন এবার গম্ভীর হলেন।

"তুমি দৌড়তে পারো?"

"নিশ্চয়ই পারি।"

"পড়াশুনোর মতো দৌড়টাও শিখতে হয়, প্র্যাকটিস করে করে উন্নতি ঘটাতে হয়, তুমি কি কখনও তা করেছ?"

দীপ চুপ করে রইল।

"দৌড়তে তো সবাই পারে কিন্তু ওলিম্পিকে কি সবাই প্রথম হয় ? যে হয় সে বছরের পব বছব কষ্ট করে ঘাম ঝরিয়ে দৌড় শিখে তবেই প্রথম হয়। স্কুলের মাস্টারমশায় ঠিকই তো বলেছেন।"

"উনি আমার হাইটের জন্য বলেছেন। ওরা এক পা ফেলে যতটা যাবে আমি নাকি তিন পা ফেলে ততটা যাব।"

"ভুল বলেননি।"

দীপ তাকিয়ে রইল মুখে তার একটা অভিমানী প্রশ্ন— আপনিও! রঞ্জনবাবুর সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। তিনি ওর কাঁধে হাত রাখলেন।

"তুমি যে ছোট মানুষ এটা অস্বীকার করে কোনও লাভ হবে না। এটাকে স্বীকার করো, মেনে নাও।"

"আমি মেনে নিয়েছি।"

"তোমার চারপাশে সবাই তোমাব থেকে লম্বা এবং সেটা এই জগতের সঙ্গে মানানসই।"

"আমি বেমানান!"

"হ্যাঁ।"

"আমি তা জানি।"

বঞ্জনবাবুব মনে হল বয়সের তুলনায় দীপের অনুভব ও চেতনা কখনও কখনও প্রবীণত্বের স্তরে উঠে আসে। এই কিশোর ছেলেটি জানে সে বামন, সে দৈহিক প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে তার পবিবেশেব সঙ্গে এবং এই জ্ঞানটুকু সে ইতিমধ্যে ধীবভাবে মেনে নিয়েছে। বঞ্জনবাবু কষ্ট পেলেন দীপের জন্য।

"তুমি কি জানো পৃথিবীটা শুধু উপবেব দিকেই লম্বা নয় পাশের দিকেও চওড়া।"

দীপ একদৃষ্টে বৃদ্ধের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার মনে হচ্ছে কথাগুলোর মধ্যে কিছু একটা গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে। অবশেষে সে বলল, "আমি দৌড় প্র্যাকটিস করব।"

বঞ্জনবাবু এমন কোনও কথা আর বললেন না, যাতে দীপ নিরুৎসাহিত হয়।

"নিশ্চয় করবে। আমি তো বলব ভাবছিলাম তোমার ওজন কমানো দরকার, তুমি দৌড় শেখো।"

পরদিন স্কুলে টিফিনের সময় দোতলার বারান্দা থেকে রিভাকে উঠোনে দেখতে পেয়ে দীপ নেমে এল। দুটি ছেলের সঙ্গে বিভা কথা বলছে। নিশ্চয় কোনও হাসির ব্যাপার কেননা, তিনজনেই হাসছে।

দীপ একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রইল, রিভাকে একা পাওয়ার জন্য। সেই সময় পিছন থেকে বিকৃতস্বরে চেঁচিয়ে 'এই যে আমার ছোটবাবু' বলে রবি তাকে জড়িয়ে ধরল।

আশপাশে প্রচুর ছেলে, তারা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। হাসল।

"খিদে পেয়েছে, খাওয়া।"

"পয়সা নেই।"

"রোজই বলিস পয়সা নেই, দেখি তো।" রবি ওর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু খুচরো বার করে আনল। গুনে দেখে হাসল।

"হয়ে যাবে।"

"এগুলো আমার বাস ভাড়ার পয়সা।"

"এইটুকু তো রাস্তা, বাসে না গিয়ে আজ হেঁটে যাবি। মাঝে মাঝে হাঁটবি চর্বি ঝরে যাবে।"

রবি দু'হাতে ওর বুকের চর্বি খামচে ধরে মুখে অশ্লীল শব্দ করল। অনেকে হেসে উঠল। ওকে ছেড়ে দিয়ে সে স্কুলগেটের দিকে এগিয়ে গেল। টিফিনের সময় ছাত্রদের বাইরে যাওয়া নিষেধ যদি না টিফিন পাস থাকে। কিন্তু রবি যে-কোনও সময়ই বাইরে যায় দারোয়ান কিছু বলে না।

দীপের চোখে জল এসে গেছে। হেঁটে বাড়ি ফেরার কথা ভেবে নয়। এত ছেলের সামনে এইভাবে হতমান হওয়ার লজ্জা লুকোতে সে ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

একটু পরে লক্ষ করল রিভা একা দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে শাঁখালুর খোসা ছড়াচ্ছে। গুটিগুটি দীপ এগোল।

"সেদিন আমায় হাত দিয়ে টেনে বাসে তুলে না নিলে আমি পড়ে যেতুম।"

বিভা শাঁখালুতে কামড দিয়ে এক চাকলা মুখে ভরে চিবোতে লাগল। দীপের কথার জবাব দিল না।

"তুমি ভাল ফুটবল খ্যালো শুনেছি সেই জন্য কি তোমাকে বিভা বলে ডাকে? তোমার নিজেব নাম কী?"

"প্রশান্ত। তোমাকে যে ছোটবাবু বলে ডাকল আসল নাম কী?"

"দীপাঞ্জন। আমি তোমাকে কিন্তু রিভাই ডাকব।"

"ডেকো। কিন্তু তোমাকে ছোটবাবু বলল কেন, চেনা?"

"আমাকে দেখে কি বুঝতে পারছ না?" একটু থেমে দীপ ফিকে হেসে আবাব বলল, "আমাকে দৌড়নো শিখিয়ে দেবে?"

প্রশান্তব মুখে কৌতূহল ফুটে উঠল। চিবোনো বন্ধ করে বলল, "মানে! দৌড়ে কী করবে?"

"দেখব আমাব থেকে অন্যরা কতটা এগিয়ে থাকে।"

"হুম্‌ম্‌। শুধু দেখার জন্যই।"

"হ্যাঁ, আমাকে দিয়ে আর কী হবে?"

"ছুটির পব এই সামনের চিলড্রেনস পার্কে এসো।"

চেনা কাউকে দেখতে পেয়ে প্রশান্ত হাত তুলে চেঁচিয়ে এগিয়ে গেল স্কুলবাড়ির দিকে। দীপও নিজেব ক্লাসে এসে অঙ্কেব খাতাটা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে দিল। তাব মাথায় এখন চিন্তা, হেঁটে বাড়ি ফিবতে দেরি হবে। মা বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে।

ওবা পার্কে এল একসঙ্গে। প্রশান্ত ছুটির পর অপেক্ষা করেছিল স্কুলের ফটকে। দীপ অন্য দিনের মতো আজও দেরি করে বেরিয়েছে।

"আমি ইচ্ছে করেই দেরি করি। ছুটির ঘণ্টা পড়লেই ছেলেদের মন-মেজাজ কেমন বদলে যায়, এটা কি তুমি লক্ষ করেছ?"

প্রশান্ত অবাকচোখে ওর দিকে তাকাল। তার মনে হল, এই বামনটি একটু বেশিই যেন মাথা খাটায় বয়সের অনুপাতে।

"সারা দুপুর স্কুলে যা একঘেয়ে লাগে। ছুটি হওয়া মানে যেন জেলখানা থেকে বেরোনো। তখন পেছনে লাগতে ওদের ভাল লাগে।"

"তোমার পেছনে লাগে দেখেছি।"

প্রশান্তর পাশাপাশি হাঁটার চেষ্টা করে দীপ প্রায় দৌড়চ্ছেই। প্রশান্ত হাঁটার গতি কমাল।

"ওদের খুব খিদে পায়, আমি বুঝতে পারি।" দীপ নরম স্বরে বলল। রবি বা তার সঙ্গীদেব সম্পর্কে কোনও উষ্মা সে প্রকাশ করল না। দু'ধাব দেখে প্রশান্তর সঙ্গে রাস্তা পাব হয়ে সে আবার বলল, "আমি ওদের সঙ্গে ভাব করতে চাই... সকলের সঙ্গেই চাই। সেটাই উচিত, তাই নয়?"

প্রশান্ত জবাব দিল না। পার্কটা ছোট। তিনদিকে বাড়ি দিয়ে ঘেরা। পার্কের ভিতরে কংক্রিটের রাস্তাব পাড়। মুখোমুখি চারটি সিমেন্টের বেঞ্চের উপরে পাকা ছাদ। রেলিংয়ের অনেকখানি অংশ অন্তর্হিত।

পার্কটি এমনিতেই নিরিবিলি। বিকেল সবে শুরু হয়েছে তাই লোক এখন যৎসামান্য। তবে ফেরিওয়ালারা এসে গেছে। ছ'-সাত বছরের কয়েকটি ছেলে চোর-পুলিশ খেলায় ব্যস্ত বেঞ্চগুলিকে ঘিরে। দীপের দিকে নজর পড়তেই ওরা থমকে তাকাল। নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে বলাবলি করল।

"আমি দৌড়চ্ছি, বডিটা কেমন কোমর থেকে সোজা রাখছি হাঁটু কতটা ভাঙছি, পায়ের পাতা কীভাবে পড়ছে, হাত দুটো কীভাবে রাখছি, মাথাটা কেমনভাবে রয়েছে, সব আগে লক্ষ করো, কেমন?"

পার্কটাকে তিন চক্কর দৌড়ে প্রশান্ত একাকী দৌড়তে বলল দীপকে। সুটকেসটা প্রশান্তর জিম্মায় রেখে জুতো খুলে সে যখন একা দৌড়তে আরম্ভ করল, বাচ্চা ছেলেগুলি খেলা বন্ধ রেখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করল।

এক চক্কর দিয়ে দীপ থেমে গেল।

"তোমার মতো হচ্ছে না জানি তবে প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে... কিছুটা হবে, তাই নয়।"

"কিন্তু আমি আর থাকতে পারব না, এবার যাব।"

"আর একবার।"

দীপ আবার দৌড় শুরু করল। এবার তার সঙ্গে বাচ্চারাও নেমে পড়ল। তারা ওর প্রায় গা ঘেঁষে দৌড়চ্ছে আর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। দীপও হাসতে শুরু করল। সে মুখ ভ্যাংচাল, বাচ্চারা জোরে হেসে উঠল। সে মজা পেল।

একটা সুখবোধ তার সারা অঙ্গে প্রবাহিত হয়ে তাকে ক্রমশ গ্রাস করছে। সে অন্যদের মজা দিয়ে আনন্দ দিতে পারে, এটা সে আবিষ্কার করছে।

দীপ মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল। লেফট-রাইট করার ভঙ্গিতে সে পা ওঠা নামা করতে লাগল। ওরাও তাকে নকল করল। সে জোরে হেসে উঠতেই ওরাও হাততালি দিয়ে উঠল। আবার সে দৌড় শুরু করল।

"ওরে ওরে দেখ একটা বামন কেমন দৌড়চ্ছে।"

প্রশান্ত মুখ তুলে দেখল বারান্দায় একটি বউ দু'হাতে একটি শিশুকে তুলে ধরে দেখাচ্ছে। আর একটি কমবয়সি বউ ছুটে বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। প্রশান্তর চোয়ালদুটি শক্ত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করল, "দীপ, দীপ... থামো আর দৌড়তে হবে না।"

সুটকেসটা তুলে নিয়ে প্রশান্ত পার্কের ভাঙা রেলিংয়ের ফাঁক গলে রাস্তায় এসে হাঁটতে থাকল।

"রিভা দাঁড়াও, রিভা..."

হাঁফাতে হাঁফাতে দীপ ছুটে তার পাশে এল।

"একটু আস্তে হাঁটো... বারণ করলে কেন ছুটতে?"

"মজা দেখছিল বারান্দা থেকে।"

"দেখুক না, তাতে কী হয়েছে!"

"তোমার অপমান লাগে না?"

প্রশান্ত সুটকেসটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পাশের রাস্তায় ঢুকল লম্বা পায়ে দীপকে পিছনে ফেলে।

"রিভা।"

দীপের ডাকটা আর্তনাদের মতো প্রশান্তর কানে ঠেকল। সে দাঁড়াল।

"না, আমার আর অপমান লাগে না, দুঃখও লাগে না। আমার এই শরীর আমি তো বানাইনি। ভগবান করে দিয়েছেন। অপমান যদি কারুর হয় তো তাঁরই হবে। আমি যেটা পারি..."

"কী পারো?"

"মজা দিতে। ছোটবাবু হয়ে আনন্দ দিতে। আমি তাই করব, সারা জীবন।"

দীপ থরথর কাঁপছে একঝোঁকে কথাগুলো বলে। মুখটা লাল, গোল চোখদুটি আরও বড় হয়ে উঠেছে। টসটস ঘাম ঝরছে চিবুক থেকে।

"আমার এক দাদা তোমার মতো। চার ফুট চার ইঞ্চি। তোমার মতো ষোলো-সতেরো বছর বয়সে বেলগাছিয়া রেলের লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করে।"

প্রশান্তর মুখ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল কথাগুলো বলতে বলতে। দীপের চোখে বিষণ্ণতা নেমে এল।

"তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি দীপ।"

দীপ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে। এক চিলতে হাসি তার পাতলা গোলাপি ঠোঁটদুটিতে হালকাভাবে লেগে রয়েছে।

"আমার ও-রকম কিছু হবে না।"

"ভাল।"

প্রশান্ত হনহনিয়ে চলে গেল। ওর দীর্ঘ সুঠাম দেহ-কাঠামোর দিকে যতক্ষণ পারল দীপ তাকিয়ে রইল। তারপর হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে, দীর্ঘ পথ।

উৎপলা বাস-স্টপে অপেক্ষা করে করে বাড়ি ফিরে আসার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দীপ ফিরল।

"এত দেরি হল?"

"পকেটে যা ছিল পুওর ফান্ডের বাক্সে ফেলে দিয়েছি। খেয়ালই ছিল না যে সঙ্গে আর পয়সা নেই। বাসে ওঠার আগে পকেটে হাত দিয়েই চক্ষু চড়কগাছ... হেঁটে এলুম।"

"আর আমি এদিকে ভেবে ভেবে... "

"এত ভাববার কী আছে, আমি তো বড় হচ্ছি। চিরকালই কি পুতুপুতু করে আমাকে আগলাবে?"

উৎপলা বিপর্যস্ত চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী করে তুই বড় হবি! বয়স বাড়লেই কি বড় হয়?"

দীপ কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। অসম্ভব ক্লান্ত সে। খাটে গা এলিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম আপনা থেকেই ভেঙে যায়। ঘরে আলো জ্বলছে, জানলার বাইরে অন্ধকার। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল রঞ্জনবাবু চেয়ারে বসে বই পড়ছেন।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে লজ্জিত স্বরে বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

রঞ্জনবাবু শুধু হাসলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দীপ বলল, "এবার থেকে ভোরে আমি দৌড়ব।"

"চোখে জল দিয়ে এসো আর খেয়ে নাও, স্কুল থেকে ফিরে না খেয়েই তো ঘুমোচ্ছ।"

পরদিন ভোরে হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি আর কেডস পরে দীপ যখন বেরোল তখন পুব আকাশ ছাই রং থেকে ফিকে হলুদে রূপান্তরিত হচ্ছে। সে ধীরে ধীরে ছুটতে থাকল যেদিকে কাঁচা রাস্তাটা ঘন গাছপালার ফাঁকে মাটির ঘর, ঝিরঝিরে বাতাস আর মাটির গন্ধের লোভ দেখিয়ে ক্রমশ মাঠ পেরিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। প্রশান্তকে যেমন দেখেছে চেষ্টা করল সেইভাবে দৌড়তে। লোক চলাচল শুরু হয়েছে। হাঁসের দল পুকুরে নেমে গেছে, মোরগের ডাক তখনও অব্যাহত, বাসনহাতে বউয়েরা পুকুরঘাট থেকে ফিরছে, ভ্যানরিকশায় আনাজের ঝুড়ির উপর বসা চাষি, সবাই তারা অবাক হয়ে তাকাল দীপের দিকে।

দম ফুরিয়ে হাঁফিয়ে পড়তেই সে দৌড় বন্ধ করে যখন হেঁটে ফিরে আসছে তখন মধুর এক বিস্ময়ের সামনে পড়ে গেল।

মণি দুই ক্রাচে ভর দিয়ে একটা পুকুরের ধারে পাঠশালার চালাঘরের পাশ থেকে আচমকা বেরিয়ে এল।

দু'জনের কেউই কথা বলতে পারল না বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে না ওঠা পর্যন্ত।

"তুমিও ভোরে বেরোও?" মণির মুখ ঝলমল করে উঠল।

"আজই প্রথম। কিন্তু তুমি তো বলোনি?"

"এই ভোরে বেড়ানোর কথা? বলব কী করে, তুমি তো আর আসোইনি।"

"যাব কী করে সময় কোথায়?"

"খুব কাজের লোক।"

মণির বলার ভঙ্গিটা দীপের ভাল লাগল। ঈষৎ অভিমান চেপে রাখতে পারেনি। ওরা দু'জন বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

"আমার রোজ একটু নড়াচড়া দরকার, সারাদিনই তো বাড়িতে বন্দি। মা এখন ঘরে রয়েছে তাই বেরিয়েছি। ডাক্তারও বলেছেন।

"আমারও রোজ দৌড়নো দরকার। যা মোটকা আমি, এ-জন্য আরও বেঁটে দেখায়। বড্ড চর্বি, এবার থেকে ব্যায়ামও করব।"

তার জন্য দীপকে মন্থরগতিতে হাঁটতে হচ্ছে লক্ষ করে মণি চলার গতি বাড়াতেই দীপ হাত দিয়ে ওর ক্রাচ চেপে ধরল।

"তাড়া নেই। জোরে চললে তোমার বগলে লাগবে।"

"একটুও লাগবে না। আমার অব্যেস হয়ে গেছে, দেখবে?"

মণি জোরে চলার জন্য ক্রাচ দুটো লম্বা পা ফেলার মতো দূরে ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেল। দীপ অবাকচোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে দৌড়ে ওর পাশে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল। এরপর ইচ্ছে করেই সে মণিকে ছাড়িয়ে গজ দশেক এগিয়ে গেল।

উপরের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরা, চোখে তীব্রতা, ক্রাচদুটো বড় করে সামনে বাড়িয়ে শরীরটা দোলাতে দোলাতে মণি তাকে ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। দীপ আবার কিছুটা ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনে তাকাল।

মণির চোখে জেদ। সে আরও বেশি দূরত্বে ক্রাচ বাড়িয়ে দ্রুত আসার চেষ্টা করতেই ডান ক্রাচটা হড়কে গেল একটা আলগা ইটের উপর পড়ে। মুখ থুবড়ে মণি পড়ে যেতেই, চাপা একটা চিৎকার করে দীপ ছুটে এল।

উবুড় হয়ে ডান হাতটা সামনে ছড়ানো, বাঁ হাতের ক্রাচটা শক্ত মুঠিতে ধরা। মুখ রাস্তায় ঘষড়ে গেছে। দীপ ওর বগলের নীচে দু' হাত রেখে টেনে তুলে বসাল। দৌড়ে গিয়ে ক্রাচটা কুড়িয়ে আনল।

মণির নাক কপাল আর কানের পাশে ছড়ে গেছে। কিন্তু ও হাসছে অপ্রতিভের মতো। দু'জন স্ত্রীলোক, সম্ভবত মজুর, ওদের পিছনেই আসছিল। তারা দাঁড়িয়ে পড়তেই মণি তাড়াতাড়ি বলল, "আমার কিছু হয়নি।"

সে ক্রাচ ধরে উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীলোক দু'জনের একজন চলে যেতে যেতে মন্তব্য করল: "রাস্তার যা মরণদশা।"

"রুমাল আছে? তোমার মুখে ধুলো লেগে রয়েছে।"

মাথা নেড়ে মণি মুখটা তার কাঁধে ঘষতে লাগল।

"উহুঁ দাঁড়াও, মুখটা নামাও তো।"

মণি গলা নিচু করে মুখ ঝুঁকিয়ে দিল। তার হাঁটুঝুল কামিজটা তুলে সন্তর্পণে ধুলো মুছিয়ে দিতে দিতে দীপ চোখ বন্ধ করা মুখের প্রতিটি অংশ অবাক হয়ে দেখল। মা ছাড়া আর কোনও মেয়েকে সে আগে কখনও এত কাছের থেকে দেখেনি। মণির ত্বক, রোমকূপ, চোখের পাতা, ঠোঁটের চামড়ার কুঞ্চন, নাকের নীচে ঈষৎ ঘন রোম এবং চিবুকের তলায় ছোট্ট তিল দীপকে নতুন ধরনের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করল। নিজের অজান্তেই সে মণির বুকের দিকে তাকাল এবং আড়ষ্ট হয়ে এক পা পিছিয়ে গেল।

"হয়েছে? কিছু বোঝা যাবে না তো?"

"মা কিছু বলবে?"

"যদি আর না বেরোতে দেয়।"

"মাকে ভয় করো?"

"কেন তুমি করো না?"

"না। তোমার পায়েটায়ে লাগেনি তো?"

মণি তার পঙ্গু পায়ের দিকে একবার তাকাল।

"হাঁটুর কাছটায়... ও কিছু না, চলো, মাকে সাতটায় বেরোতে হয়।"

আবার ওরা চলতে শুরু করল। রোদ লেগেছে গাছের মাথায়। ওদের ছায়া পড়েছে রাস্তায়। দীপ মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে মণির মুখের দিকে। চামড়া ছড়ে গিয়ে লালচে আভা ফুটেছে আঘাতের জায়গায়।

"তোমার বাড়িতে ওষুধ আছে, মলম?"

"আছে।"

"গিয়েই লাগিয়ে দিয়ো।"

মণিদের বাড়ির বারান্দার কাছে এসে দীপ থেমে গেল।

"আর যাব না।"

"কেন, এসো না।" মণি আন্তরিকভাবে বলল।

"মা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, অবশ্য মা এখন ব্যস্ত থাকে। অন্তত চা খেয়ে যাও।"

"চা খাই না।" দীপের অস্বস্তি হচ্ছে। মণির মুখের দিকে তাকালে যে-কেউ-ই বুঝে যাবে ও রাস্তায় পড়ে গেছল। মা নিশ্চয় ওকে বকবেন। তখন সামনে থাকলে বিশ্রী লাগবে।

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। দীপ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

স্কুল যাবার সময় দীপ রাস্তা থেকে যথাসাধ্য দেখবার চেষ্টা করল বারান্দাটা। কিছু বুঝতে না পেরে এগিয়ে এসে গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকাল।

"মণি।" প্রায় ফিসফিসিয়ে সে ডাকল।

"আসছি।" ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল।

মণি বেরিয়ে আসতেই সে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। আঘাতের জায়গাগুলোয় কিছু একটা লাগানো হয়েছে। তেলতেলা দেখাচ্ছে। চামড়া লাল হয়ে উঠেছে।

"মা কিছু বলেছেন?"

"বলবে না আবার! এবার একা বেরোনো একদম বন্ধ।"

দীপের বুকটা ভারী হয়ে গেল। সে বিষণ্ণমনে মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

"তোমার তো কোনও দোষ নেই, আমিই তো ব্যাপারটা করলাম।"

দীপ ম্লান হেসে বলল, "এখন কী করছ?"

"মা অঙ্ক দিয়ে গেছে। এত শক্ত লাগছে... একটাও বুঝতে পারছি না।"

দীপের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "অঙ্ক! কী অঙ্ক? কই দেখাও তো।"

"ঐকিক নিয়মের।"

"এ তো খুব সোজা অঙ্ক। আচ্ছা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

দীপ সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দিয়ে মণি প্রথমেই বলল, "তোমার স্কুল আছে না?"

"রোজই তো যাই। আজ যাব না। একদিন না গেলে কিছু হবে না।"

"না।"

মণির স্বরে এমন একটা দৃঢ়তা রয়েছে যা দীপকে কুঁকড়ে দিল। একা একটা মেয়ে সারা দুপুর একটা ছেলের সঙ্গে বাড়িতে থাকতে আপত্তি করতেই পারে। হঠাৎ তার মনে হল সে বড় হয়ে গেছে, পুরো একটা পুরুষমানুষ। বামন দেহটা খোলসের মতো খসে পড়েছে তার পায়ের কাছে। মণি তাকে লম্বা করে দিল শুধু একটি শব্দে। দেহের সীমা ছাড়িয়ে সে এখন একটা এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে সেখানে উচ্চতায় সে আর সকলের মতোই।

"আমি স্কুলে যাচ্ছি এখন, ফেরার সময় বুঝিয়ে দেব।"

দীপ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ঘুরে পিছনে না তাকিয়ে হেঁটে চলে গেল। বাসে যাবার সময় তার মনে হল, মণি কি তাকে নোংরা চরিত্রের ভেবেছে নয়তো 'না' বলল কেন? আবার সে ভাবল, মণির কি তাকে ভাল লেগেছে? কিন্তু ওর ব্যবহার আজও তো প্রথম দিনের মতোই! 'না' বলার সময় ওর মুখটা কি কঠিন হয়ে গেছল? মণি কি খুশি হবে স্কুল থেকে ফেরার সময় ওর কাছে গেলে? যদি না যাই? মণি কি জানে ওকে আমার ভাল খুব লাগে, ওর সঙ্গে কথা বলতে, ওর সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে? যদি জানে তা হলে কি অন্যরকম ভাববে?

দীপ আপনমনেই বারকয়েক উচ্চারণ করল র-ত-ন-ম-ণি।

ফেরার সময় দীপ বাস থেকে নেমে দেখল মা দাঁড়িয়ে। উৎপলা হাত বাড়াল সুটকেসটা নিতে, দীপ দিল না। কিছুটা এগোতেই দেখল রাস্তায় একটা জটলা সবার মুখই উত্তেজিত। কৌতূহলে সে একজনের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল।

"দুপুরে কুকুরে কামড়েছিল ওই ওদিকের পাড়ার একজনকে। তারপর দলবল এসে পাইপগান দিয়ে গুলি করে কুকুরটাকে মেরে ধাঙড়দের শাসিয়ে গেছে।"

"কোন কুকুরটা, খুব বড় কালো রঙের, চোখের ওপরটা বাদামি?"

"কে জানে কী রঙের?"

লোকটি কথা বলায় আর ঔৎসুক্য দেখাল না। একটি বাচ্চাছেলে, যাকে সে অনেকবার দেখেছে যাতায়াতের পথে, দীপ তাকেই জিজ্ঞেস করল, "কোন কুকুরটা?"

"সেই কাল্লু, যেটা সবাইকে তাড়া করত।"

দীপ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাক আর তোমায় বাস-স্টপে আসতে হবে না।" এবং কিছু পরে হাঁটতে হাঁটতে আপনমনে বলল, "জীবজন্তুকে মারতে নেই।"

মণিদের বাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময় ওর কানে এল গলা সাধার শব্দ। বোধহয় আজ মাস্টারমশায় এসেছে। দীপ ঠিক করল কয়েক দিন সে মণির সঙ্গে দেখা করবে না।

স্কুলের স্পোর্টসে দীপ অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতারণা করল। শেষ অনুষ্ঠান 'যে যেমন সাজো'। বেদে, ঝাড়ুদার, পাগল, মুটে, মুড়িওয়ালা, বৈষ্ণব, ভিখারি ইত্যাদি সাজা ছাড়াও একজন অজ্ঞান হয়ে পড়তেই ছুটে এল এক ডাক্তারবাবু। চার চাকার এক ঠেলা ধীরে ধীরে আনা হল তার উপর নিথর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিখ্যাত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা আকাশমুখী তোলা।

একটা মেলার মতো ব্যাপার। বেদে তার ঝাঁকা থেকে হাঁড়িকুড়ি বার করে কাঠ জ্বেলে রান্না চড়াল। সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটা কুকুর আর ছাগল। বৈষ্ণব করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে ঘুরছে। মুড়িওয়ালা ঠোঙায় ঝালমুড়ি নিয়ে শিক্ষকদের কাছে বিক্রি করছে। মুটে ঝাঁকাতে ঠিকানা লেখা কাগজ নিয়ে জনে জনে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে। পাগলের পাগলামি, ভিখারির ভিক্ষা চাওয়া ইত্যাদিতে গণ্যমান্যদের বসার শামিয়ানার সামনেটা যখন সরগরম তখন হঠাৎ ভিড়ের পিছন থেকে আর্তনাদের মতো চিৎকার শোনা গেল, 'ওমা, কোথায় তুমি... ওমা কোথায় তুমি!'

হঠাৎ কোলাহল বন্ধ হয়ে গেল। উৎসুক হয়ে সবাই খুঁজতে লাগল এমন আর্তস্বরের মালিককে।

"ওই তো, ওই তো।" কে একজন আঙুল দিয়ে দেখাল।

দর্শকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে একটি ছোটছেলে বেরিয়ে আসছে। তার পরনে বাচ্চাদের নেকার-বোকার। একটা ডলপুতুল বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা, চোখে কাজল, কপালে কাজলের টিপ, সিঁথি কাটা চুল পাট করে আঁচড়ানো, হাতে লোহার বালা, লাল মোজা, লাল জুতো।

"ওমা কোথায় গেলে?" কান্নাজড়ানো গলায় ছোট ছেলেটি ডুকরে উঠল। সে হারিয়ে গেছে। জনে জনে সে জিজ্ঞাসা করছে, "আমার মাকে দেখেছ? আমাকে পুতুল কিনে দিয়ে, দাঁড়াতে বলে কোথায় যে চলে গেল।"

হাসি চেপে সবাই মাথা নাড়ছে। ছেলেটি হেডমাস্টারমশায়কে, অনুষ্ঠানের সভাপতিকেও প্রশ্ন করল। ওরা মাথা নেড়ে নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করলেন।

অবশেষে বালকটি তার পুতুলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে বসে দুই উরুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

হাততালি আর সহর্ষ চিৎকারে জায়গাটা ফেটে পড়ল। পাথর হয়ে থাকা শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত সন্তর্পণে একবার মুখ ঘুরিয়ে বিমর্ষ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখে নিল। হারিয়ে-যাওয়া বালককে সান্ত্বনা দিতে মুড়িওয়ালা এক-ঠোঙা মুড়ি উপহার দিল। হঠাৎ কয়েকটি ছেলে রবির নেতৃত্বে ছুটে গিয়ে বালককে কাঁধে তুলে নিল।

"ছোটবাবু... ছোটবাবু।"

দীপের দুটি চোখ উত্তেজনায় ও আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। এখন সে সবার মাথা ছাড়িয়ে, সবার থেকে লম্বা।

"খাওয়াবি তো আজ?"

"খাওয়াব।"

বাড়ি ফেরার সময় দীপ ইতস্তত করে পায়ে পায়ে মণিদের বারান্দার কাছে গেল। কাউকে দেখতে পেল না। রঙিন কাগজে-মোড়া লাল ফিতেয় বাঁধা প্রথম পুরস্কারের স্টিলের বড় রেকাবিটা গরাদের ফাঁক দিয়ে সে মেঝেয় নামিয়ে দিল। সামান্য একটু শব্দ হয়েছিল। ঘরের ভিতর থেকে মণির গলা শোনা গেল, "কে?"

দীপ ছুটে পালিয়ে গেল। সে জানত না মণির মা হঠাৎ-ই শ্যামনগরে কোয়ার্টার পেয়ে তিন দিনের মধ্যেই মণিকে নিয়ে চলে যাবে।

দুই

দীপাঞ্জন রায় যখন বি এ পড়তে কলেজে এল প্রথম দিনেই আলাপ হল দেবুর সঙ্গে। বারান্দায় নোটিস বোর্ডে টাঙানো রুটিনে দেওয়া ছিল কোন ক্লাস কত নম্বর ঘরে, ক'টার সময়। ভিড় আর ঠেলাঠেলিতে দীপ বোর্ডের কাছাকাছি যেতে পারছিল না। ভিড়ের মধ্যে একবার ঢোকার চেষ্টা করে কপালে কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এসে লম্বা বারান্দার একধারে সে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় ভিড় থেকে খাতাহাতে বেরিয়ে এল একটি ছেলে। লম্বা, ছিপছিপে, চৌকো মুখ। পরনে ঢিলে পাজামা আর খয়েরি পাঞ্জাবি। বয়স সম্ভবত পঁচিশের কাছে; বি এ পড়তে আসার পক্ষে বেশিই।

সে একটু অবাক হয়েই দীপের দিকে তাকিয়েছিল। দীপ হেসে বলল, "ওখানে ঢোকা আমার পক্ষে অসম্ভব, বোর্ডটাও আমার পক্ষে যথেষ্ট উঁচু।"

"ফার্স্ট ইয়ার?"

গমগমে গভীর গম্ভীর গলা। বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে একটু গলা চড়ালে ও-প্রান্তের লোক শুনতে পাবে।

দীপ মাথা সামনে নেড়ে বলল, "বাংলা অনার্স।"

"তা হলে 'এ' সেকশান, আমারও তাই। আমার থেকে টুকে নাও।"

বারান্দার পাঁচিলটা দীপের পক্ষে উঁচু। খাতাটা কোথায় রেখে টুকবে তাই খুঁজতে এধার ওধার তাকাচ্ছিল।

"তুমি আমার খাতা দেখে বলো, আমি তোমার খাতায় লিখে দিচ্ছি।"

দীপ খাতার মলাটে নামটা পড়ে নিয়েছিল; দেবব্রত ঘোষ। তার মনে হয়েছিল দেবু ওর ডাক নাম, নিশ্চয় একটা ভাল নাম আছে। হয়তো ডাকনামেই পরিচিত হতে চায়।

খাতায় লিখতে লিখতে দেবু মৃদুস্বরে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, "কত নম্বর পেয়েছ?"

"পরীক্ষায়? ছ'শো একানব্বই।"

দেবু মাথা ঘুরিয়ে ওকে একবার দেখে মন্তব্য করে, "ভাল ছেলে।"

সেই সময় দুটি মেয়ে যেতে যেতে দেবুকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

"দেবু, রুটিন নাকি রে?"

"বোর্ড থেকে টুকে নে।"

"কী করে টুকব, অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখ।"

"হুঁ... বলো, শুক্রবার এগারোটা পঁয়তাল্লিশ স্পেশাল বেঙ্গলি, টি. কে. এস. তারপর?"

মেয়ে দুটি, দীপ যা ভেবেছিল, তার দিকে তাকিয়ে এবং নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে মুখ টিপে হাসল।

রুটিন লেখা শেষ হবার পর দীপই বলল, "চলো, চা খেয়ে আসি।"

"চা? বেশ। ক্যান্টিনে ভিড়, চলো বাইরে যাই।"

কলেজের কাছেই পাশাপাশি দুটো রেস্তোরাঁ। যথেষ্ট ভিড়। সব টেবলই ভরে আছে। মৌমাছি গুঞ্জনের মতো অবিরাম কথা বলার শব্দ। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠা বা হাসি। পাখা ঘুরছে তবু অনেকে ঘামছে। কাঠের সিলিংয়ের জন্য ঘরটা নিচু। দেড়তলায়ও বসার ব্যবস্থা আছে। কাঠের সিঁড়ি ক্যাশ কাউন্টারের পাশ দিয়ে উপরে উঠে গেছে। দেবু সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠে একবার তাকিয়েই নেমে আসছিল, তখন উপর থেকে মেয়ে গলায় কেউ ডেকে উঠল, "অ্যাই দেবু, অ্যাই দেবু।"

চোখে বিস্ময় নিয়ে দেবু উঠে গেল। দীপ নীচে অপেক্ষা করতে লাগল।

যে-মেয়েদুটি দেবুর কাছে রুটিন চেয়েছিল তারা এই সময় রেস্টুরেন্টে ঢুকল। ওকে দেখে তারা হাসি চেপে যে-টেবলে চারটি মেয়ে বসে সেইদিকে এগিয়ে গেল।

এ-সব তার গা সহা হয়ে গেছে। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রাস্তার ওপারের দোকানগুলোর সাইনবোর্ড পড়তে লাগল। হঠাৎ তার কানে এল, 'ডাক না, ডাক না।'

পিছনের ওই মেয়েগুলিরই কেউ বলছে। সে কান খাড়া করল।

"আমি পারব না, তুই ডাক।"

"বসবে কোথায়, চেয়ার কই?"

"জোড়া দিয়ে বসব।"

"আমার পাশে বসালে আমি কিন্তু হাসি চাপতে পারব না।"

দীপের মুখে পাতলা হাসি ফুটল। ভাবল, নিজে থেকেই ওদের কাছে গিয়ে আলাপ করলে কেমন হয়। তারপর মনে হল, দরকার নেই।

"আপনি যদি বসতে চান আমাদের সঙ্গে বসতে পারেন।"

কোনও ব্যস্ততা নেই এমনভাবে ঘুরে দীপ মেয়েটির দিকে তাকাল, হাসল। মেয়েটির মুখটি মিষ্টি, মাজা গায়ের রং, কথা বলার সময় গালে টোল পড়ে, চোখে কালো হালকা ফ্রেমের চশমা, সাধারণ স্বাস্থ্য। হলুদ তাঁতের শাড়িটিতে প্রায় আধ হাত সবুজ ও কালো পাড়।

"অসুবিধা হবে না তো?"

"না না কিচ্ছু হবে না আমাদের একজন এইমাত্র চলে গেল, ম্যানেজ করে ঠিক বসা যাবে।... আপনার কি আজই কলেজে প্রথম?"

"হ্যাঁ।"

"আমরাও।"

একদিকে তিনটি চেয়ার জুড়ে নিয়ে চারজন, টেবলের অন্যদিকে দুটি চেয়ারে দীপ ও সেই মেয়েটি যে তাকে ডেকে আনল।

"আমার নাম দীপাঞ্জন রায় সবাই ডাকে দীপ বলে।" সবার মুখের ভাব লক্ষ করে সে জুড়ে দিল, "হাইট চার ফুট এক ইঞ্চি, ওয়েট... ঠিক বলতে পারব না, এজ প্রায় কুড়ি, দেরিতে স্কুলে ভরতি হওয়ার জন্য বয়সটা বেশিই, বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।"

দীপ মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছে তাকে নিয়ে মজা করার জন্যই এই আমন্ত্রণ। তাই প্রথমেই জানিয়ে দিল সে-ও মজা চায়। অপরিচয়ের অস্তিত্বটা মেয়েদের মধ্যে থেকে সরে গেল ওর বলার ভঙ্গিতে।

"আমি জ্যোতি... জ্যোতির্ময়ী মল্লিক, দুই বোন, দুই ভাই। হাইট ওয়েট জানি না, বয়স উনিশ।"

দীপের পাশের মেয়েটি কথাগুলো বলল অতি দ্রুত হালকা স্বরে। এরপর সামনের মেয়েরা চটপট বলে গেল।

"তাপসী দে, পাঁচ বোন, বয়স..."

"উঁহুহু... মেয়েদের বয়স বলতে নেই, বললেও কর্ণপাত করতে নেই।" দু' হাত তুলে দীপ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল।

"কেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন মেয়েরা বয়স কমিয়ে বলে?"

"আপনি নয় তুমি, আমরা তো একই ইয়ারের সুতরাং আজ থেকে সবাই বন্ধু কেমন?"

সবাই ঘাড় নাড়ল ইতস্তত করে। এমন এক অস্বাভাবিক আকৃতির সঙ্গে চট করে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব পাতাতে ওরা আড়ষ্ট বোধ করছে।

"হ্যাঁ, যা বলছিলে, মেয়েরা বয়স কমিয়ে বলে এটা মোটেই বিশ্বাস করি না, একদমই বাজে কথা। পাজি পুরুষদের ছড়ানো গুজব, রটনা। আমার এক মাসিকে জানি। বিয়ের সম্বন্ধ এল, পাত্রপক্ষ চায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়সের মেয়ে কেননা দোজবরে পাত্রের বয়স পঞ্চাশের বেশি। বড়লোক। কলকাতায় সাত-আটটা বাড়ি, মোটরগাড়ি, জহরতের বড় ব্যবসা। কিন্তু মাসির বয়স পঁচিশ। ছ'বছর বাড়িয়ে একত্রিশ বছর বলে বিয়ে দেয়া হল এবং মাসির তাতে একশো একভাগ সায় ছিল।"

"তুমি কি বলতে চাও বাড়ি গাড়ি টাকার লোভে মেয়েরা বয়সের কারচুপি করতে পারে?" জ্যোতি বলল তীব্রস্বরে, তর্কে নামার ইচ্ছা নিয়ে। দীপের ভাল লাগল জ্যোতির এই ভঙ্গিটা।

"আমি কি তাই বলেছি?...ভাল কথা চা বলি?" প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই যেন সে চায়ের কথা বলল।

"এই তো খেলাম।" টেবলের ওদিকে মাঝেবসা লাল টিপ পরা, অত্যন্ত ফরসা, লম্বা নাক, চিবুকহীন মেয়েটি বলল।

"চা একবার কেন বারবার খাওয়া যায়।" দীপ হাত নেড়ে রেস্টুরেন্টের ছেলেটিকে ডাকল। কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, "কী খাবার পাওয়া যাবে?"

"ফিশ ফ্রাই, ভেজিটেবল চপ, মটন চপ, মামলেট, টোস্ট..."

"ফাউল কাটলেট আছে।"

"বিকেলে পাবেন।"

"আমি কিন্তু কিছু খাব না।"

"কেন খাবে না, তুমি তো নিজের নাম এখনও বলোনি।"

"লীনা মজুমদার। দুই দাদা, বাবা নেই, তিন দিদির বিয়ে হয়ে গেছে আর বয়স বলা তো বারণ। হাইট পাঁচ-এক, ওয়েট তেতাল্লিশ কেজি।"

"তেতাল্লিশ! তা হলে তো তোমার এখুনি একটা মটন চপ খাওয়া উচিত ওয়েট বাড়াতে।"

"এই কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছি।"

"সেই জন্যই তো দুটোর বদলে একটা বললাম।... তা হলে ছ'টা চপ ছ'টা চা।"

ছেলেটি চলে যেতেই দীপ বাকি দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা এখনও নাম বলোনি যখন, আমাকে নিশ্চয় তা হলে পছন্দ হয়নি।"

ওরা প্রায় একসঙ্গে প্রতিবাদ করে নিজেদের নাম বলল: বেহুলা ঘোষ আর হৈমন্তী পাইন।

বেহুলা কিঞ্চিৎ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলল, "মা আর আমি আলাদা থাকি...চেহারা দেখে বুঝে নাও বয়স, ওয়েট, হাইট। মা একটা ফার্মে রিসেপশনিস্ট।"

সকলের মধ্যে বেহুলা একটু আলাদা, তার সাজগোজে। দীর্ঘ চোখদুটি চঞ্চল, ব্লাউজটা তার স্বভাবের বেপরোয়া দিকটা উদ্‌ঘাটন করছে, দেহের ডৌলে ও গঠনে স্বাস্থ্য ভরে আছে কিন্তু লাবণ্য কম। জুতো, ঘড়ি বা হাতব্যাগটি দেখেই বোঝা যায় ভাল জায়গা থেকে কেনা। সবার মধ্যে একমাত্র তারই ঠোঁটদুটি রঙিন এবং চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। নিজের সম্পর্কে সে যে অতি সচেতন সেটা বুঝতে দীপের অসুবিধা হল না।

হৈমন্তী বলল, "কলকাতায় মাসির বাড়িতে থাকি, দেশ সুন্দরবনে। হাসনাবাদ থেকে এগারো মাইল ভিতরে, বাড়িতে ভাইবোন সব মিলিয়ে তেরোজন।"

"তা হলে তো সুন্দর...বোন তুমি।"

হৈমন্তীর হাসিতেই ধরা পড়ল সে অর্থ বোঝেনি। বুঝিয়ে দিল জ্যোতি: "বোন মানে সিস্টার, সুন্দর মানে সুন্দর।"

বেহুলা হাতঘড়িতে সময় দেখল। তাপসী চোখ টিপে বলল, "কী রে, সময় হয়ে গেছে?"

বেহুলা মৃদু হেসে ভ্রূ কোঁচকাল।

"কীসের সময়?" দীপ কৌতূহল জানাল।

"ওর বয়ফ্রেন্ডের আসার।" তাপসী হাসছে।

"তোমরা কি সব একই স্কুলের?"

"চারজন। বেহুলা, আমি...মানে জ্যোতি বাদে সবাই। জ্যোতি হল লীনার বন্ধুর বন্ধু, পরীক্ষা দেবার সময় আলাপ। একই ঘরে আমাদের সিট পড়েছিল।"

"আমার কোনও বন্ধুবান্ধব নেই।" কথাটা বলেই মণিকে তার মনে পড়ল। জুট মিলের কোয়ার্টারে এখন সে একা বসে কী করছে! সেখানে কোনও বারান্দা আছে কি না কে জানে।

একবার সে খুঁজতে গেছল। ট্রেন থেকে নেমে রিকশায় সে জুট মিলের ফটক পর্যন্ত আসে। ফটকের লোহার চাদরের মধ্যে একটা কাটা জায়গা, একজনমাত্র গলতে পারে। সেখানে খাকি পোশাকের বয়স্ক এক দারোয়ান তাকে আটকায়।

"কোয়ার্টারে যাব।"

দারোয়ান বিরক্ত হয়ে জানতে চায়, "কোয়ার্টারে কার কাছে?"

"রেবা দত্ত। এখানে অফিসে কাজ করেন।"

"কী কাজ করেন?"

দীপ বলতে পারেনি। সেই সময় একটি লোক ভিতর থেকে বাইরে যাবার জন্য বেরিয়ে আসতেই দারোয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যানার্জিবাবু, রেবা দত্ত বলে কই আপনার অফিসে কাজ করে?"

ব্যানার্জিবাবু নামক লোকটি দীপের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বলল, "করে। কিন্তু তিনি তো দু'হপ্তার ছুটি নিয়ে তার বাপের বাড়ি গেছেন, বোধহয় মায়ের অসুখ।"

"কেউ নেই তার কোয়ার্টারে?"

"মিসেস দত্ত আর তাঁর খোঁড়া মেয়ে ছাড়া আর কেউ থাকে বলে তো জানি না।"

"কোয়ার্টারটা কোন দিকে?"

"তুমি কে হও?"

দীপ ইতস্তত না করে বলল, "উনি আমার মাসি হন।"

"এই গেটে নয়, এই লম্বা পাঁচিল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আরেকটা গেট আছে। ভেতরে ঢুকলেই পরপর দুটো টানা দোতলা বাড়ি বাঁ দিকে পড়বে। প্রথমটার শেষদিকে একতলায়।"

ট্রেনে ফিরে আসার সময় তার মনে হল, ব্যানার্জিবাবুর কাছ থেকে যদি ঠিকানাটা চেয়ে নিত তা হলে সে চিঠি লিখতে পারত।

ওদের খাওয়া তখন প্রায় শেষ, তাপসী কনুইয়ের খোঁচা দিল বেহুলাকে। ফিসফিসিয়ে ওর কানে বলল, "এসেছে।"

মেয়েরা রাস্তার দিকে তাকাল। চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দীপ পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল রাস্তার ওপারে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর। তার সামনে দাঁড়িয়ে কালো কাচের চশমা পরা একটি লোক রাস্তা পার হবার জন্য দু'ধারে তাকাচ্ছে। সে বুঝে গেল এই হচ্ছে বেহুলার বয়ফ্রেন্ড।

বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স। রঙিন টি-শার্ট, একহারা শরীরে এঁটে রয়েছে। চুল ঘন এবং কোঁকড়া, রং শ্যামলা। মুখের গড়ন লম্বাটে, বাঁ গালে গভীর একটা প্রায় দু' ইঞ্চি কাটা দাগ। গলায় সোনার সরু চেন। হাতে চশমাটা আর চাবির রিং, আঙুলে বড় পাথর বসানো দুটো আংটি।

"কখন থেকে রাস্তার দিকে হাপিত্যেশ নয়নে বসে আছে বেচারা!" হৈমন্তী নাটুকে স্বরে যুবকটিকে বলল।

"হা-পিত্যেশ না আরও কিছু। আর পাঁচ মিনিট দেখতাম তারপর সোজা বাড়ি চলে যেতাম।" বেহুলার ঠোঁট অভিমানিনীর মতো ফুলে উঠল।

"সত্যিই দেরি হয়ে গেল। একটা পার্টির সঙ্গে দেখা করার জরুরি দরকার ছিল। হঠাৎ সকালে ফোন করে বলল, দুপুরের ফ্লাইটে বম্বে যাচ্ছি এয়ারপোর্টে দেখা করো।"

"দেখা করে কাজ হল?" তাপসীর ভঙ্গিতে উদ্বেগের আধিক্য ঘটল।

"তা কিছুটা হল।"

"তা হলে দেরি হওয়ার জন্য বেহুলার রাগ করার কোনও কারণ নেই।"

"রাগ করতে বয়ে গেছে আমার।"

দীপ সকলের মুখের দিকে পরপর তাকিয়ে যাচ্ছে। তার পাশে জ্যোতিও স্মিতমুখে চুপ করে আছে। জ্যোতি যে ওদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ নয় এটা সে বুঝে গেছে।

যুবকটি কয়েকবার সকৌতুকে দীপের দিকে তাকিয়েছিল। সেটা লক্ষ করে লীনা বলল, "আমাদের নতুন বন্ধু দীপাঞ্জন রায়, সদ্য আলাপ, বাংলা অনার্স নিয়ে ভরতি হয়েছে।"

দীপ নমস্কার জানাতেই যুবকটি জমকালোভাবে প্রতিনমস্কার করল কোমর থেকে কিছুটা ঝুঁকে।

"খুশি হলাম।"

"কী করে হলেন। আমি চার-এক, আপনাকে কতটা ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে জানেন?"

"একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ুন।" জ্যোতি বলল। অন্যরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

"না, আর বসব না।" বেহুলা উঠে দাঁড়াল।

"যাবি তো চল তোরা।" জ্যোতি বাদে অন্যরাও উঠে দাঁড়াল।

"নীরেনদা আজ ব্যান্ডেল চার্চ দেখাতে নিয়ে যাবে কথা ছিল।" তাপসী বলল জ্যোতি এবং দীপকে লক্ষ্য করে।

"পরে একদিন ভাল করে আলাপ করা যাবে।" নীরেনদা নামক যুবকটি নমস্কার করল।

"চলি রে জ্যোতি...চলি দীপ।"

ওরা বেরিয়ে যাবার পর রেস্টুরেন্টের ছেলেটি মৌরি ছড়ানো প্লেট টেবলে রেখে দাঁড়াল। "আগের পাঁচ কাপের দাম কে দেবেন?"

"আমি।" জ্যোতি তার হাতব্যাগ খুলতে যাচ্ছিল, দীপ হাত তুলে নিষেধ করল।

"না না, তুমি কেন দেবে। কত হয়েছে?"

"আড়াই টাকা।"

"আর আমার কত?" দীপ জানতে চাইল।

"বারো টাকা।"

দীপ লক্ষ করল জ্যোতির ব্যাগে নানান টুকরো কাগজ তার মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে সে রেজগি বার করছে। সে মানিব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট নিয়ে প্লেটে রাখল। ইশারায় ছেলেটিকে জানাল দু'জনেরই দাম ওই থেকে নিতে। ছেলেটি নির্বিকারভাবে কাউন্টারে চলে গেল। মেয়েদের বিল ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও ছেলেরাই যে মেটায়, এটা সর্বদাই সে দেখেছে।

জ্যোতি এবার কী কী বলবে দীপ সেটা অনুমান করতে পারছে।

কিন্তু ব্যাগ বন্ধ করে জ্যোতি সামনে তাকিয়ে রইল। কথা বলল না। মৌরির প্লেটে নোট ও খুচবো ফিরে আসতেই দীপ দু' টাকার নোটটি রেখে বাকি সব তুলে নিল। ছেলেটি এমন বহবের বকশিশে অভ্যস্ত নয়, অবাক হয়ে সে নোটটার দিকে তাকাল। দীপ আঙুল নেড়ে তুলে নেবার ইঙ্গিত জানাতেই একটা বড় দরেব সেলাম পেল।

"চলো এবার, তুমি কোথায় যাবে?" দীপ চেয়ারের কিনারে এসে প্রথমে বাঁ পা মেঝেয় ঠেকিয়ে তাবপব ডান পা রাখার সময় শক্ত কবে টেবলটা ধবল।

"বাড়ি যাব। তুমি?"

"আমিও।"

বেরোবার সময় দেড়তলা থেকে দেবুর গমগমে গলার স্বর শুনতে পেয়ে দীপ সিঁড়িব দিকে এগিয়ে গিয়েও ফিরে এল। রাস্তায় নেমে জ্যোতি জিজ্ঞাসা করল, "উপরে চেনা কেউ আড্ডা দিচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ, চা খাব বলে একসঙ্গে এলাম। আমাকে দাঁড় করিয়ে উপরে গিয়ে আমার কথা বেমালুম ভুলে গেল, অদ্ভুত না?"

"অদ্ভুত কেন। এই তো চা খেয়ে দিব্যি পয়সা দিতে ভুলে গিয়ে চারজন কেমন করে চলে গেল মোটরে করে বেড়াতে।"

জ্যোতিব গলায় বিরক্তি ক্ষোভ। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দীপ জিজ্ঞাসা করল, "লোকটা কে? কী করে?"

"কে জানে কী করে। শুনেছি দুটো বাস আছে, একটা ওষুধের দোকান আছে আর রাস্তা, ড্রেন, বাড়িটাড়ি তৈরি করার কন্ট্রাক্টরি করে।"

"পয়সা আছে।"

"তা আছে, খরচ করে। ক'দিন আগে পার্ক স্ট্রিটে সবাইকে নিয়ে গিয়ে চাইনিজ খাইয়েছে।"

"তুমিও গেছলে?"

জ্যোতির ঠোঁট মুচড়ে গেল তাচ্ছিল্যে। আঙুল দিয়ে নেমে আসা চশমাটা ঠেলে তুলে দিল।

"নাহ্‌হা। অল্প আলাপ...হইচই ভালবাসে, কালচার প্রায় নেইই।"

দীপ এবাব খানিকটা বুঝতে পারছে জ্যোতিকে। ওর জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্য কোনও গান শোনো কি না, বইমেলায় গিয়ে লেখকদের সই নাও কি না বা সত্যজিৎ কি মৃণালের ফিল্ম প্রথম সপ্তাহেই দেখে ফ্যালো কি না।

"আমি কখনও চাইনিজ খাইনি, খেতে খুব ইচ্ছে করছে।" ইচ্ছে করেই সে মিথ্যে কথা বলল জ্যোতির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

"তোমাকে তা হলে চৌরঙ্গি পাড়ায় যেতে হবে, এদিকে কোনও দোকান নেই।"

ওরা ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। স্টপেজে অপেক্ষমাণরা দীপের দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে জ্যোতিকে লক্ষ করতে লাগল। তাদের দৃষ্টি যেন ওকে বলছে, তুমি কী করে এই বামনটার সঙ্গিনী হলে? সে ট্রামের খোঁজে দূরে তাকিয়ে রইল, কথা বলায় আর কোনও উৎসাহ দেখল না।

"ঠিক জানো এদিকে দোকান নেই?"

"থাকতে পারে, আমি জানি না।"

এই সময় ওপারে থামা একটা বাস থেকে চিৎকার হল: "ছোটবাবু...অ্যাই ছোটবাবু...দাঁড়া।"

দীপ দেখল জানলায় হাত নেড়ে রবি দ্রুত সিট থেকে উঠতেই বাস তখন চলা শুরু করল।

চলন্ত বাস থেকে নেমে রবি একগাল হাসি নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এল।

"আরে ব্যাটা, তুই এখানে!...আমি ভাবলুম ভাল নম্বর পেয়েছিস পেসিডেন্সি কি কটিশে ভরতি হবি। বাদল বলল তুই নাকি আমেরিকা গেছিস লম্বা হবার জন্য ডাক্তার দেখাতে! খাওয়া, পাশ করার খাওয়াটা বাকি আছে।"

জ্যোতি চোখ সরু করে একবার তাদের দিকে তাকিয়েই পায়ে পায়ে সরে গেল। দীপ অপ্রতিভ হয়ে নিজেই অন্যদিকে সরে গিয়ে চাপাস্বরে বলল, "সব জায়গায় সবসময় ইয়ার্কি মানায় না। রবি।"

রবি ভ্যাবাচাকা খেয়ে দীপের দিকে এবং চারপাশে তাকিয়ে বলল, "এখানে আবার সভ্যতা দেখাবার মতো কে...হ্যাঁ রে, মেয়েটা তোর চেনা? বাস থেকে দেখলুম কথা বলচিস।"

"হ্যাঁ।"

"লাইন করেচিস?"

"ভদ্রভাবে বল...আজই আলাপ হল।"

"লাইন করিয়ে দোব, লজ্জা করিসনি...একটা জিনের প্যান্ট দিবি শুধু, বল, করিয়ে দোব?"

জ্যোতির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দীপ মানিব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে রবির তালুতে গুঁজে দিল।

"এখন যা।"

"পারবি পটাতে?"

"বলছি চলে যা।"

"যাচ্ছি। মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে আসব কিন্তু।"

ট্রাম এখনও আসেনি। দীপ পায়ে পায়ে জ্যোতির কাছে এসে দাঁড়াল।

"একই স্কুলের না পাড়াব ছেলে?" জ্যোতির বলার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল সে মজা পেয়েছে.

"স্কুলেরা। এরা ক'জন খুব জ্বালাতন করত।"

"ওকে টাকা দিলে যেন মনে হল। তোমার কি খুব টাকা আছে? রেস্টুরেন্টে টিপস্ই তো দিলে দু' টাকা।"

"মোটেই খুব টাকা নেই।"

"কী করেন তোমার বাবা?"

"ডেকোরেটিং ব্যবসা।"

জ্যোতির সঙ্গে কথা বলতে তার ভাল লাগছে। ওর সান্নিধ্যটা কী করে বাড়ানো যায়, দীপের মাথার মধ্যে এখন সেই মতলব ঘুরতে লাগল।

"যদি কখনও দরকার হয় বোলো, ব্যবস্থা করে দেব।"

"দিদির বিয়ে সামনের মাসেই, আঠাশে শ্রাবণ।"

"কোথায় তোমাদের বাড়ি?"

যথারীতি অপেক্ষারতরা তাদের দিকে তাকাচ্ছে। দেবু এবং তার সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন কথা বলতে বলতে তাদের দিকেই আসছে। ওদের মধ্যে একজন মেয়ে, বয়স একটু বেশিই, কাঁধে রঙিন ঝোলা।

ট্রাম আসছে। জ্যোতি কয়েক পা এগিয়ে গেল বাঁ হাত সামান্য তুলে।
"পরে তোমায় বলব, কেমন?"
দীপ ঘাড় নেড়ে "আচ্ছা" বলার আগেই জ্যোতি ট্রামের হাতল ধরে উঠে গেল।
ট্রামটা চলে যাবার পর সে ফিরে তাকিয়ে দেখল দেবু আর তার সঙ্গীরা ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে।
"শম্ভু মিত্তিরের মতো গলা করলেই তো আর শম্ভু মিত্তির হওয়া যায় না। পল্লবকে একদমই মানাচ্ছে না, তবু ওর অমন গলা করা চাই। এ-ধরনের একটা সাবমিসিভ ক্যারেকটারের রোলে অমন গলা একদমই মানায় না। ওকে এটা বন্ধ করতে বলো আরতি নয়তো ওকে বাদ দিতে বাধ্য হব।"
দেবুর গলার স্বর রাস্তার ওপারের লোকও শুনতে পাচ্ছে। দীপ কৌতূহলে তাকিয়ে থেকে ভাবল দেবুকে জিজ্ঞাসা করবে কি না, দাঁড় করিয়ে রেখে সেই যে উপরে গেলে, তারপর বেমালুম ভুলেই গেলে। কিন্তু সে দেবুর দিকে এগোল না। সবেমাত্র আলাপ, তাকে যে খুব মনে করে রাখতে হবে এমন কোনও কথা নেই। হয়তো এমন আড্ডায় বসে পড়েছে যেখানে একটা বামনের কোনও ভূমিকা নেই অপ্রতিভ হওয়া ছাড়া।
দীপ হাঁটতে শুরু করতে যাবে তখনই দেবু ভারী গলায় ডাকল, "শোনো।"
সে কাছে আসতেই ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।
"তুমি কোথায় চলে গেলে? আমি দেখতে পেলুম না।"
দীপ একটু অবাক হয়ে গেল। দেবু তাকে খুঁজেছে অথচ সে জানে না। অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে টেবলে বসেছিল সিঁড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে, কিন্তু তাকে দেখতে না পাওয়ার কথা নয়।
"তুমি নীচে এসে দেখেছিলে?"
"উপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলুম সিঁড়ির গোড়ায় নেই, ওখানেই তো তখন দাঁড়িয়েছিলে।"
"বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল, ওদের টেবলেই বসলাম।"
"ভাল।" দেবু তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, "বেশি দেরি তো আর নেই, এবার থেকে রোজই রিহার্সাল বসতে হবে, রঞ্জিত, অশোক, স্মৃতিকে বলে দিয়ো আর স্টেজ রিহার্সালের তারিখটা পাকা করে আসতে বোলো নন্তুকে।"
"বাচ্চাটা নেহাতই বাচ্চা হয়ে গেছে আর-একটু বড় হলে ভাল হত।" আরতি বলল।
"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"
দেবুকে লক্ষ করে একজন বলল। অন্যদের মুখে কথাটার সায় ফুটে উঠেছে। দীপ বুঝতে পারছে কোনও নাটকের ব্যাপারে ওরা কথা বলছে। সে ইতস্তত করছে চলে যাবার জন্য।
"আপনি কথা বলুন, আমি যাচ্ছি।"
দেবু তার বিদায় নেওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। দীপ হাঁটতে শুরু করল। বাড়ি যাওয়া ছাড়া আর কোথাও তার যাবার জায়গা নেই, প্রয়োজনও নেই। সে নিঃসঙ্গ থাকতে অভ্যস্ত। এতে তার কষ্ট হয় না। কলেজে প্রথম দিনেই অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়ায় তার ভালই লেগেছে। মোটামুটি সবাই পরিণত, এখানে কেউ অন্তত রবিদের মতো উত্ত্যক্ত করবে না।
বাস বদল না করে সোজা বাড়ি যেতে হলে যে বাসটা তার দরকার সেটার জন্য মিনিট বারো হাঁটতে হবে। দীপ হাঁটতে হাঁটতে সারা দিনের কথাবার্তা, মানুষগুলোর চেহারা, ভাবভঙ্গি মনে করতে লাগল। একটা ব্যাপারে সে খুশি, তাকে সবাই গ্রহণ করেছে। আরও খুশি হচ্ছে রেস্টুরেন্টের দাম মেটাতে পেরে। ক্লাস ভাল করে শুরু হোক, অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপের গণ্ডিটা বাড়লে সে বন্ধুত্ব কিনবে রেস্টুরেন্টে খাইয়ে। সে জানে দুপুরে বা বিকেলে কী ভীষণ খিদে পায়।
রাত্রে সে উৎপলাকে তার হাত খরচের টাকা বাড়ানোর জন্য বলল।
"কেন রে?"
"বন্ধুদের খাওয়াতে হবে।"
মায়ের মুখভাব লক্ষ করে সে মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, "আমাকে এখানে তিনটে বছর তো কাটাতে হবে।"
কিছুক্ষণ দু'জনেই নির্বাক রইল।

"কত টাকা লাগবে?"
"ঠিক জানি না, শ'-দুই দিতে পারবে?"
উৎপলা অনেকক্ষণ পর বলল, "আচ্ছা।"
ইংরেজি ক্লাস আট নম্বর ঘরে। থাক থাক গ্যালারি। পাশ ও অনার্স সব ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে বসে। গ্যালারি প্রথম দুই সারিতে বসে মেয়েরা। ক্লাসে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে যাবার সময় সামনের বেঞ্চে হৈমন্তী বসে আছে দেখে সে বলল, "কেমন লাগল ব্যান্ডেল চার্চ?"
"ভাল। তোমার কথা নীরেনদা যেতে যেতে বলছিল।"
"কেন!"
"চারটে মেয়ের সঙ্গে একজন পুরুষ সে-জন্য ওর অস্বস্তি হচ্ছিল। পার্টিটার ঠিক ব্যালান্স হচ্ছিল না।"
"আমাকে দিয়ে কি সেটা হত?" দীপ অবাক হলেও মিটমিট হাসতে লাগল। "এইটুকু মানুষ দিয়ে কি ব্যালান্স আনা যায়?"
অধ্যাপক ঘরে ঢুকেছেন। দীপ আর কথা না বলে গ্যালারির উপরের শেষ বেঞ্চে দেয়ালের দিকে বসল। সেখান থেকে অধ্যাপককে দেখা যাচ্ছে না এবং সে-ও দেখতে পাচ্ছে না। সে-জন্য তার কোনও অসুবিধা নেই। পড়ার ব্যাপারটা তো বাড়িতেই হয়।
শীর্ণ, কুঁজো এবং কর্কশ গলার অধ্যাপক ছাত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রোল নম্বর ডেকে যাচ্ছিলেন। কেউ সাড়া না দিলে তখন মুখ নামিয়ে খাতায় আঁচড় দিচ্ছিলেন।
"সিক্সটি ওয়ান।"
"ইয়েস প্লিজ।"
অধ্যাপকের ভ্রূ কুঁচকে গেল। তিনি আবাব ডাকলেন, "সিক্সটি ওয়ান।"
"ইয়েস প্লিজ।"
দীপ দাঁড়িয়েই ছিল। ঘরের পিছন দিকটা একটু অন্ধকার। বিদ্যুৎ না থাকায় পাখা বন্ধ আলোও জ্বলছে না। সে হাত তুলে আবার বলল, "ইয়েস প্লিজ।"
"কই দেখতে পাচ্ছি না, উঠে দাঁড়াও।"
পাশের ছেলেটি দীপকে বলল, "বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়াও।"
দীপ তাই করল। সারা ক্লাস তার দিকে তাকিয়ে। বিস্ময় কৌতূহল আর মুচকি হাসি তার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।
"ব্যাপার কী। তুমি..." অধ্যাপক থেমে গেলেন। সামনের বেঞ্চ থেকে একজন চাপা গলায় তাকে কিছু বলল।
"তুমি সামনে এসে বোসো।"
দীপ নেমে এল। অধ্যাপক খুঁজে খুঁজে মেয়েদের ঠিক পিছনের বেঞ্চের মাঝামাঝি এবং ওঠানামার পথের ধারে একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখালেন। ওরা সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। দীপ বসল ঠিক বেহুলার পিছনে।
পরের ক্লাসগুলিতে এমন ঘটনা না ঘটলেও দীপ মেয়েদের পিছনের বেঞ্চেই বসল।
কয়েকদিন পর অনার্স ক্লাস থেকে বেরিয়ে সে দেখল জ্যোতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
"দীপ একটা কথা ছিল।"
বারান্দায় তখন গিজগিজে ভিড়। ঘর বদলে অন্য ঘরে যাওয়ার ব্যস্ততা।
"এখুনি বলবে? আমার এখন পল সায়েন্সের ক্লাস রয়েছে। তোমার কি ক্লাস শেষ হয়ে গেছে?"
"হ্যাঁ, আমি তা হলে লাইব্রেরিতে আছি। দিদির বিয়ের ডেকোরেটিংয়ের ব্যাপারে..."
"ক্লাসটা করেই যাচ্ছি।"
তিনতলায় লাইব্রেরির রিডিংরুমে ভিড় নেই। কোণের দিকে টেবলে জ্যোতি একটা বই ওলটাচ্ছিল। দীপ ওর পাশের চেয়ারে বসল।
"বলো।"

"বাবাকে বললাম, আমার ক্লাসের এক বন্ধুর ডেকোরেটিংয়ের ব্যবসা আছে।"

"আমার নয়, আমার বাবার।"

জ্যোতি হেসে বলল, "ওই হল। বাবা বললেন, কী রকম খরচ টরচ পড়বে জেনে নিতে।"

"সেটা নির্ভর করছে কতটা এরিয়া কভার করবে, কী কী জিনিস লাগবে।"

"তুমি কি একবার বাবার সঙ্গে কথা বলবে, আসবে আমাদের বাড়িতে?"

"বেশ তো চলো। আমি কিন্তু এ-সবের কিছুই জানি না, বুঝিও না। যা কিছু সব বাবাই করেন।"

ট্রাম থেকে নেমে প্রায় দশ মিনিট হাঁটতে হল। একটা পুরনো, সরু গলির মধ্যে, কিছু ইট বেরিয়ে যাওয়া বাড়ি, কয়েকটি আঁস্তাকুড়, রোয়াক, একটি টিউবওয়েল পেরিয়ে জ্যোতিদের পৈতৃক বাড়ি। কেরানির চাকরি থেকে অবসর নেওয়া দীনেন মল্লিক শোবার ঘরে পালিশ ওঠা বড় একটা পালঙ্কে শুয়ে বই পড়ছিলেন। ওরা ঘরে ঢুকতেই উঠে বসলেন। দীপ কোথায় বসবে সেটাই সমস্যা। পালঙ্কটা ওর কাঁধ সমান উঁচু।

"ব্যস্ত হবেন না, আমি ঠিক আছি।"

নিছকই কথার কথা। জ্যোতির বাবা, মা বিব্রত হয়ে কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

"কাকার ঘরে চেয়ার আছে।"

জ্যোতি ছুটে বেরিয়ে গেল। দীনেনবাবু সাধারণ আলাপ শুরু করলেন। জ্যোতির মা রান্নাঘরে গেলেন। একটু পরেই জ্যোতি তার কাকার তিন বছর বয়সি ছেলের ক্যানভাসের চেয়ারটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

"দ্যাখো তো এটায় বসতে পারবে কি না।"

দীপ হেসে উঠে বলল, "আমার ওজন এর ওপর চাপালে ভেঙে পড়ে যাবে। তাও তো আগের ওজন এখন নেই, দৌড় আর ব্যায়াম করে কমিয়েছি।"

এই বলেই সে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসল দু' হাতের উপর ভর রেখে দেহটা পিছনে হেলিয়ে।

জ্যোতির বাবা বললেন, "ছাদেই ম্যারাপ হবে। জ্যোতি দেখিয়ে আন না।"

"পরে দেখবে, আগে চা খাক।"

"এ ছাড়া ভিয়েন হবে উঠোনে, সেটাও ঢাকতে হবে। টেবিল-চেয়ার, রান্নার, পরিবেশনের বাসনও লাগবে। বরের বসার জন্য গালচে, তাকিয়া, ফুলদানি, সদরের পর্দা। বরযাত্রী বসবে সামনের বাড়ির একটা ঘরে আর কিছু চেয়ার পেতে রাস্তায়। মোটামুটি এই আর কী।"

"আমি জেনে গেলাম। বাবাকে বলব, তিনি লোক পাঠিয়ে যা করার করবেন।"

"টাকা কত পড়বে সেটা জেনে নিতে পারলে ভাল হত। রিটায়ার করেছি, বড়ছেলে ফুড কর্পোরেশনে টাইপিস্টের চাকরিতে সবে ঢুকেছে, ছোটটা বেকার বসে আছে। মেয়ে তো আমার দুটো, বুঝতেই পারছ তো বাবা খরচ বুঝে সুঝে করতে হবে।"

"সে-জন্য আপনি ভাববেন না। কত লাগবে সেটা আমি বুঝব।"

"তবু—একটা আন্দাজ পেলে..."

তার দিকে প্রত্যাশা ভরা চাউনি মেলে খাটের বাজু ধরে জ্যোতি দাঁড়িয়ে। ওর বাবার চোখের মতোই চাইছে দীপ এমন কিছু একটা বলুক যা আশ্বস্ত করবে। ওর বড় সুখবোধ হল। এমন কিছু একটা সে বলবে যাতে ওরা অভিভূত হয়ে যায়, তার উচ্চতা বেড়ে যায় এদের কাছে।

"আমার একদমই ধারণা নেই তবে হাজার টাকার মধ্যেই হবে মনে হচ্ছে।"

ওরা চুপ করে রইল। এরপর কথাবার্তা অন্যদিকে মোড় নিল। জ্যোতির দিদির সঙ্গে আলাপ হল। ছোটভাই একবার ঘরে এসেই কী একটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে কেউ দীপের পরিচয় করাল না।

দীপ যখন উঠল তখন সন্ধ্যা নামছে। সদরে দাঁড়িয়ে জ্যোতি ওর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বলল, "যেখানে যতটুকু সাশ্রয় হয় সেই চেষ্টাই করি, যদি কিছুটা কমসমে হয় তা হলে সত্যিই উপকার হয়।"

ওর এই কাঁধে হাত রাখাটা দীপকে অসম্ভব নাড়া দিল। তার ইচ্ছা করল জ্যোতির মুঠো একবার নিজের মুঠোর মধ্যে নেয়। কিন্তু সাহস হল না।

"আমি কাল তোমায় বলব।"

রাত্রে সে পড়ার অজুহাতে খেতে বসায় দেরি করল যতক্ষণ না বাবা ফেরে। কৃষ্ণচন্দ্র সাধারণত রাত দশটায় ফেরে, আজও ফিরল। দীপ অপেক্ষা করে রইল খাওয়ার টেবলে বাবার বসার জন্য।

দু'জনে মুখোমুখি খেতে বসল। কৃষ্ণচন্দ্র দু' বেলা একাই খেতে বসে। আজ ছেলেকে দেখে সে খুশিই হল।

"কলেজ কেমন লাগছে?"

"ভালই।"

"সবার সঙ্গে আলাপ হচ্ছে?"

"হুঁ।"

দু'জনে চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল। এক সময় দীপ মুখ নিচু করে মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, "ক্লাসের একটি মেয়ের দিদির বিয়ে। আমি বলেছি ডেকোরেটিংয়ের যা যা দরকার আমি দোব।"

"দোব মানে?"

"টাকা নোব না।"

দীপ সন্তর্পণে মুখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। কৃষ্ণচন্দ্র অবাক হয়ে তার দিকেই তাকিয়ে।

"টাকা নোব না মানে?"

দীপ চুপ করে রইল। উৎপলা নীরবতা ভেঙে বলল, "তুই কি বলে দিয়েছিস টাকা দিতে হবে না?"

"হ্যাঁ।"

উৎপলা স্বামীর দিকে তাকাল। গম্ভীর মুখে কৃষ্ণচন্দ্র ভাত নাড়াচাড়া করছে।

"আমি বলতাম না বিনি পয়সায় করে দেবার জন্য। কিন্তু আমাকে তো লম্বা হতে হবে।"

দীপের গলার স্বরে ওরা দু'জনে সচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

"তোমরা তো আমার মতো বামন নও। তোমরা লম্বা লোক, তোমাদের চারপাশে তোমাদের হাইটেরই লোক, কী করে বুঝবে আমার অসুবিধেটা। সবার মধ্যে আমাকে আমার এই কুৎসিত বিসদৃশ দেহটাকে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়: আমার সঙ্গে কেউ মিশবে না, কেউ পাত্তা দেবে না যদি না আমি তাদের খুশি করি। সে-জন্য আমায় টাকা খরচ করতে হয়, উপকার করতে হয়। আমার এই শরীরটার জন্য আমি তো দায়ী নই...কেউই দায়ী নয়। ভগবান আমায় মেরে দিয়েছেন।"

দীপ তার চেয়ার থেকে নেমে বেসিনে গিয়ে হাত ধুল এবং নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

পরদিন সকালে উৎপলা চা দিতে এসে বলল, "তোর বাবা বলেছে করে দেবে টাকা নেবে না।"

কলেজে ঢোকার সময় ফটকের কাছে লীনা আর তাপসীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীপ এগিয়ে গেল।

"আর যে তোমাদের দেখতেই পাই না।" হালকা চটুল স্বরে দীপ বলল। "ঘোষ কেবিনে আর যাও না?"

"কেন যাব না, কালও তো গেছি। বরং তুমিই আস না।" তাপসী বলল।

"বটে! তা হলে আজ... একটা-পঁয়তাল্লিশে অফ আছে, তোমাদের?"

"আমাদের অফ থাকুক বা না থাকুক মোটকথা যাচ্ছি।" লীনা যথাসাধ্য প্রগলভ হবার চেষ্টা করল সুদর্শন একটি ছেলেকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে।

একটা-পঁয়তাল্লিশে বেরিয়ে দীপ ঘোষ কেবিনে ঢুকে দেখল লীনা, তাপসী এবং হৈমন্তী চা খাচ্ছে। তাদের সামনে খালি প্লেট, তাতে পেঁয়াজের কুচি আর সস লেগে রয়েছে।

"দীপ বড্ড খিদে পেয়েছিল, তুমি আসার আগেই আমরা তোমার কাজ এগিয়ে রেখেছি।"

"খুব ভাল খুব ভাল।" খালি চেয়ারটায় উঠতে উঠতে দীপ বলল।

"অ্যাই ওর জন্য চপ আনতে বল।" হৈমন্তী বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেলাম দিয়ে ছেলেটি দীপের পাশে দাঁড়িয়েছে।

"একটা চপ?"

দীপ ঘাড় নাড়ল। "তোমরা আজ তিনজন যে?"

"বেহুলা আসেনি, কাল বলেই দিয়েছিল আসবে না। আর জ্যোতিকে ইংরেজি ক্লাসে দেখেছিলুম, তুমিও তো দেখেছ।"

"দেখেছি। আর কিছু খাবে?" দীপ সবার মুখের দিকে পর পর তাকাল। ওরা ইতস্তত করছে। হঠাৎ হৈমন্তী বলল, "আমি আর একটা চপ খাব।"

"তা হলে আমিও।" তাপসী জুড়ে দিল।

"লীনা?"

"একটা মামলেট।"

দীপ তুড়ি দিয়ে ছেলেটিকে ডাকল। অন্যান্য টেবল থেকে আড়চোখে অনেকেই তাদের দিকে তাকাচ্ছে। অনেকের চোখে কৌতূহলের বদলে ঈর্ষা।

"তাপসী, কালই বেহুলাকে বলতে হবে আমরা যাব কি যাব না, তুই যাবি তো?" লীনা বলল।

"তুই আমার মাকে গিয়ে বলবি, নয়তো মা ছাড়বে না। রোববার না হয়ে অন্যদিন হলে কলেজে যাবার নাম করে চলে যেতুম।"

হৈমন্তী ঝুঁকে বলল, "দিন ঠিক হয়ে গেছে কি?"

"সেটাই তো কাল বলে দিতে হবে। নীরেনদা তো আমাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে।"

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছে। সামনে বসা দীপের যেন অস্তিত্বই নেই ওদের কাছে। অবশ্য সে-জন্য সে কিছুই মনে করছে না। জ্যোতি না থাকায় সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে কথা বলতে।

তবু এক সময় সে বলল, "মনে হচ্ছে তোমরা যেন কোথাও যাবার প্ল্যান করেছ।"

"নীরেনদার সঙ্গে আমরা পিকনিকে যাব। ওর বন্ধুর বিরাট বাগান আছে নৈহাটির কাছে।"

"আমরা মোটরে যাব।"

"ওহ্ তোমাদের হিংসে হচ্ছে। আমি কখনও পিকনিকে যাইনি।"

"তা হলে চলো-না আমাদের সঙ্গে।" হৈমন্তী কথাটা বলতেই তাপসী ওকে চিমটি কাটল।

"এটা নীরেনদার পিকনিক। তাকে না বলে কাউকে ইনভাইট করাটা ঠিক হবে না।"

"দীপ যাবে শুনলে আপত্তি করবে না।"

"তুই জানিস?"

"হ্যাঁ জানি। সেদিন কী বলল শুনিসনি! 'দীপের হাতে যে-কোনও মেয়েকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যায়, ছেলেটা খুব ভাল।' এমন কথা ক'টা ছেলে সম্পর্কে বলা যায়?"

দীপ হাসছিল কিন্তু তার বুকের মধ্যে একসঙ্গে দশটা ছুঁচ বেঁধার যন্ত্রণা হচ্ছে। তাকে পুরুষমানুষ রূপে নীরেনদা গ্রাহ্যই করে না এবং এই মেয়েরাও। তার কাছে মেয়েরা নিরাপদ, এ কথা যে-কোনও যুবকের কাছে লজ্জার। ওরা ধরেই নিয়েছে তার ইচ্ছা তার প্রয়োজন তার শরীরের মতোই ছোটখাটো এবং সেগুলো যথেষ্ট নয় পুরুষ হয়ে ওঠার জন্য।

"দীপ তুমি কি যাবে আমাদের সঙ্গে?"

"নিশ্চয় যাব। কিন্তু এখন আমার চণ্ডীমঙ্গলের ক্লাস রয়েছে সুতরাং...।"

বড় সেলাম নিয়ে দীপ বেরিয়ে এল তার সঙ্গে তিনটি মেয়েও। কলেজের দোতলার বারান্দায় সে জ্যোতিকে দেখতে পেয়ে হাসল, জ্যোতিও হাসল। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "টিকিট কেটেছিলাম সুবিনয় রায়ের একক অনুষ্ঠানের এক বন্ধুকে শোনাব বলে। হতভাগা আজ বলল যেতে পারবে না। টিকিটটা নষ্ট হবে না যদি তুমি যাও।" আজকের কাগজেই সে এই অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখেছে।

"আর কাউকে তো দিতে পারো।"

"দিতে ইচ্ছে করছে না। যে গান বুঝবে তাকেই তো দেওয়া উচিত।"

"কবে?"

"রোববার সকালে, রবীন্দ্রসদনে।"

"পরে বলব।"

"কাল বাবার সঙ্গে কথা বলেছি ওই ব্যাপারটা নিয়ে।"

জ্যোতি উৎসুক চোখে তাকাল। দীপ গম্ভীর হয়ে বলল, "হাজার টাকার কমে হবে না।"

"ওহ্।"

দীপ হাসতে শুরু করল। জ্যোতি বিভ্রান্ত হয়ে বলল, "হাসছ কেন?"

"বাবা বলল, তোর বন্ধুকে বলিস এক পয়সাও লাগবে না।"

রবিবার পর্যন্ত দীপ পালকের মতো হাওয়ায় ভাসল। জ্যোতি টিকিট নিতে রাজি হওয়ার পর সেই বিকেলেই, বিজ্ঞাপনে দেখা টিকিট বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলোর একটা, শ্যামবাজারের মোড়ের দোকানটা থেকে সে দুটি টিকিট কিনে নিল।

ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপারে দীপ জড়িয়ে পড়ল। দেবু তার জন্য ক্লাসের বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। ক্লাস থেকে বেরোতেই সে তাকে ধরল।

"কথা আছে। আমার সঙ্গে চারটের সময় যেতে পারবে?"

"কোথায়?"

"যেখানে আমাদের রিহার্সাল হয়। এখান থেকে হেঁটে মিনিট দশেক।"

"আমি কী করব?"

"কিছুই করবে না। চারটের সময় গেটে থাকব।"

দেবু লম্বা পা ফেলে চলে গেল। কৌতূহলে দীপ ছটফটাল চারটে পর্যন্ত। দেবু গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখেই হাতঘড়িটা চোখের সামনে তুলে "চলো" বলেই হাঁটতে শুরু করল।

"ব্যাপারটা কী?"

"আমি শুনেছি তুমি ভাল অভিনয় করতে পারো।"

"সে কী! জীবনে মাত্র দুই কি তিনবার আমি থিয়েটার দেখেছি, অভিনয় তো দূরের কথা।"

ওর কথাগুলো ধর্তব্যের মধ্যে না এনে দেবু বলল, "স্কুলের গো অ্যাজ ইউ লাইকে তুমি একটা হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলে হয়েছিলে, অসাধারণ নাকি করেছিলে।"

"কে বললে তোমায় ধ্যুৎ, বাজে কথা। ওটা কোনও অভিনয়ই নয়।"

"দেখা যাক। আমরা যে নাটকটা নামাচ্ছি জার্মান লেখক হার্মান গ্যোহরের ফরেস্টস অব ইডেন। নাম শোনোনি নিশ্চয়, অবস্কিওর লেখক। আমিই অ্যাডাপ্ট করেছি। তাতে একটা বাচ্চার ছোট্ট একটা রোল আছে।"

"আমাকে করতে হবে!"

"যে বাচ্চাটাকে দিয়ে কর'ব ভেবেছিলাম, কয়েকটা রিহার্সালও দিয়েছে, হঠাৎ সে পা ভেঙে শয্যাশায়ী। বছর আষ্টেকের ছেলে।"

"তার জায়গায় আমি?"

"অসুবিধেটা কী?"

দেবু প্রায় ধমকের সুরে বলল। দীপ আমতা আমতা করে আর কথা বাড়াল না। বড় রাস্তা থেকে তারা গলিতে ঢুকল। তারপর আবার একটা মাঝারি রাস্তায়। একটা মুদির দোকানের গা ঘেঁষে সরু পথ ধরে টালির চালের একতলা একটা বাড়িতে তারা পৌঁছল।

চারজন যুবক শতরঞ্চিতে বসে। তাদের দেখেই নড়েচড়ে বসল।

"বাবলুর রোলটা এ করবে।"

চারজোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দীপকে গেঁথে ফেলল। অবশেষে একজন বলল, "মুখটা তো কচি ছেলের মতো নয়। শরীরের মাসলগুলোও স্টিফ।"

দেবু অধৈর্য স্বরে বলল, "মেক আপে সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় সাত দিনও নেই এখন বাচ্চা খুঁজে বার করব কোথা থেকে?"

এরপর ওরা আর কথা বলল না। দু'জন সিগারেট ধরাল। বাসি খবরের কাগজ পড়তে শুরু করল তৃতীয় জন। বাকি জন চিত হয়ে শুয়ে পায়ের উপর পা তুলে নাচাতে লাগল।

দেবু সংক্ষেপে কাহিনীটা দীপকে বলেছিল, স্বামী, স্ত্রী আর এক বাচ্চার সংসার। নিত্য অশান্তি। স্ত্রীকে মারধোর করে স্বামী মদ খেয়ে এসে। বাচ্চাটা তখন বাবাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচায়: মেরো না মাকে

মেরো না বলে। এমন ঘটনা নাটকে দু'বার ঘটবে। অবেশেষে মা তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাবে। যাবার সময় বাচ্চা বলবে: মা এবার থেকে বাবাকে কে রেঁধে দেবে, কে জামা প্যান্ট ইস্ত্রি করে দেবে। এই রকম দু'-চারটে সেন্টিমেন্টাল ডায়লগ। ব্যস, এখানেই বাচ্চার রোল শেষ।

"না পারার কী আছে? আজই রিহার্সাল দিয়ে দ্যাখো।"

দীপ দ্বিতীয় কোনও কথা বলার সুযোগই পেল না। কিছু বলতে গেলেই দেবু তার গমগমে গলায় "আচ্ছা আচ্ছা" আর "হবে হবে" বলে থামিয়ে দেয়।

চিত হয়ে পা নাচানো লোকটিই বাবা। দীপ যখন তাকে জড়িয়ে ধরছে লোকটির ক্রুদ্ধ মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

"অমিয় সিরিয়াস, বি সিরিয়াস।" দেবু হুঁশিয়ার করে দেয়।

একসময় অমিয় বলল, "দেবু ভয়েসটা তো বাচ্চার মতো নয়।"

"চলে যাবে।"

ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে দীপ যখন বাড়ি ফিরছে তখন অদ্ভুত একটা উত্তেজনার ঘোরে সে আচ্ছন্ন। মঞ্চে উঠবে, কয়েকশো লোকের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হবে এটা সে জীবনে ভাবেনি। মাত্র তিন-চারটি ছোট বাক্য। মুখস্থ করারও দরকার লাগে না। মঞ্চে শুধু সামান্য ঘোরাফেরা, তাকিয়ে থাকা মাত্র দুটি দৃশ্যে। দুর্দান্ত দারুণ অভিনয় করে দর্শকদের চমৎকৃত করার বাসনা কোনওদিন তার ছিল না কিন্তু এখন তার হচ্ছে।

পরদিন ঘোষ কেবিনে বসে পাঁচটি মেয়েকে যখন জানাল সে নাটকে অভিনয় করছে তখন পাঁচজনই প্রায় বিমূঢ় হয়ে গেল। কতকগুলো বিস্ময়সূচক ধ্বনি একসঙ্গেই তার উপর আছড়ে পড়ল। অবশেষে জ্যোতিই বলল, "তা হলে তো দেখতে যাবই।"

"না না, এটাই জীবনে প্রথম। তোমরা গেলে নিশ্চিত ঘাবড়ে যাব।" দীপ যে-ভাবে বলল তাতে ওদের মনে হল সে ইতিমধ্যেই নার্ভাস।

"আমরা যাবই। বেহুলা টেবলে ছোট্ট কিল বসাল।

"আমরা টিকিট কেটে যাব, তুমি যাওয়া আটকাবে কী করে? বেহুলা তুই নীরেনদাকে বলিস তো। আমি দেবুকে বলে রাখব টিকিটের জন্য।"

"ও শিলিগুড়ি গেছে, বোধহয় রবিবারই ফিরবে।"

"ঠিক আছে আমরাই টিকিট কেটে নেব।"

"না না প্লিজ। যদি ভাল হয় তা হলে পরের বার তোমরা যেয়ো।"

"ওরে বাবা, প্রথম শো কি মিস করতে আছে!"

মেয়েরা যত জিদ ধরে দীপ ততই মনের গভীরে অদ্ভুত একটা সুখের গড়াগড়ি অনুভব করে। সে ভুলে যায় তার দেহের কথা। নিজেকে লম্বাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে-কোনও সুযোগই সে হাত বাড়িয়ে নিতে রাজি।

ওরা একসঙ্গে ঘোষ কেবিন থেকে বেরিয়ে আলাদা হয়ে গেল শুধু জ্যোতি আর দীপ ছাড়া। ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে দীপ বলল, "তা হলে রোববার সকালে?"

"আমার টিকিটটা দাও।"

"কেন থাক না, এসপ্ল্যানেডে মিট করে একসঙ্গেই যাব।"

"আমার ঠিক নেই বেরোবার, সকালে অনেক কাজ থাকে।"

"তোমার আবার কী কাজ, মা আছে দিদি আছে।"

"মা আছে কি দিদি আছে তা নিয়ে অত কথায় দরকার কী, টিকিটটা যদি সঙ্গে থাকে তা হলে দাও।" জ্যোতি ঝাঁঝালো স্বরে কথাগুলো বলে তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। দীপ মানিব্যাগ থেকে টিকিট বার করে ওর হাতে দিল। একটু ম্লান হাসলও। হঠাৎ ঝেঁজে ওঠার মতোই জ্যোতি মুহূর্তে নরম হয়ে গেল।

"সত্যিই রোববার আমার কাজ থাকে, অনেক রকমের।"

অনেক রকমের কাজটা যে কী তা আর বলল না। দীপের মনে হল জ্যোতি যেন চায় না প্রকাশ্যে

তার সঙ্গে থেকে লোকের চাউনি সহ্য করতে। এটা সে বহুবার অন্যদের সঙ্গে থেকেও লক্ষ করেছে। সঙ্গীরা অস্বস্তি বোধ করে, দূরে দূরে সরে থাকে অপরিচিতের ভান করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি দেখেছে। তার সঙ্গে যারা থাকে তারাও যেন হাসির পাত্র হয়ে ওঠে।

"তা হলে রবীন্দ্র সদনেই দেখা হবে। দশটায়।"

রবিবার সকাল এগোরাটা পর্যন্ত দীপ বিছানায় গড়াল। অভিমান নয় রাগও নয়, সেদিন ট্রাম-স্টপেই সে ঠিক করে ফেলেছিল রবিবার সে যাবে না এবং হঠাৎই তার মণিকে মনে পড়তে থাকে। তার সঙ্গে বেরোতে মণি অন্তত লজ্জা পেত না। সেদিন ভোরে মণির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার, ওর পড়ে যাওয়ার, দৃশ্যগুলো পরপর তার চোখে ভেসে উঠতে থাকল। স্টিলের রেকাবিটা দেখে মণি আর তার মা কীরকম অবাক হয়ে গেছল তা আর জানা হয়নি।

দুপুরে সে শ্যামনগর স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালা তাকে উঠতে সাহায্য করল। ব্যানার্জিবাবুর কথামতো জুট মিলের পাঁচিলের শেষ প্রান্তের গেট দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে দোতলা বাড়ি দেখে রিকশা থেকে নামল। 'বাঁ দিকে দুটো বাড়ির প্রথমটার শেষ দিকে, একতলায়' ব্যানার্জিবাবুর নির্দেশটা তার মুখস্থ হয়ে আছে।

রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে সে সন্তর্পণে এগোল শ্বাস বন্ধ করে, অ্যাডভেঞ্চারে যাবার মতো উত্তেজিত হয়ে। একতলার শেষের ঘর বা কোয়ার্টার। জাল দেওয়া ছোট্ট বারান্দা, তার পাশে ছোট সরু দরজা। দীপ জাল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাকাতেই দেখল মেঝেয় মাদুরে উপুড় হয়ে শাড়িপরা কে একজন খাতায় কী টুকছে বই থেকে।

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে সে মণিকে চিনতে পারল। সে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বড়জোর আড়াই বছর কেটে গেছে শেষবার দেখার পর। কত বড় হয়ে গেছে মণি, কত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। দেয়ালে হেলান দেওয়া ক্রাচ দুটো এইবার তার চোখে পড়ল। এখনও ব্যবহার করতে হয়, সারাজীবনই করতে হবে।

মিলের ভোঁ বেজে উঠল। মণি নড়েচড়ে কিছু একটা চিন্তা করতে করতে মুখটি তুলল এবং দীপকে দেখতে পেল। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকার পর হুড়মুড়িয়ে উঠে সে বিনা ক্রাচে লাফিয়ে এসে জাল আঁকড়ে ধরল দু' হাতে।

ওর আঙুলগুলোকে দীপ আঁকড়ে ধরল নিজের আঙুলে।

"আমি একবার এসেছিলাম। তোমরা তখন ছিলে না।"

"তোমার বাড়ির ঠিকানাটা নেই, নইলে চিঠি দিতাম।"

কথা নেই। দু'জনে নির্নিমেষে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে। দু'চোখ ভরা হাসিতে। মাঝখানে জাল। আঙুলগুলো কেউই সরাচ্ছে না।

"তুমি অনেক বড় হয়েছ.. সুন্দর দেখাচ্ছে আগের থেকেও।"

মণি কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। দীপের মনে হল তার সম্পর্কে কিছুই বলার নেই। সে যেমন ছিল তাই আছে। কিছু বলতে না পারায় মণির মুখে কষ্ট ফুটে উঠেছে দেখে দীপ বলল, "আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে কলেজে পড়ছি।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মণি।

"রেকাবিটা তুমি বারান্দায় রেখে গেছলে?"

"না তো!"

"মিথ্যুক। তুমি ছাড়া কে আর অমন হাঁদারাম আছে! যেমন দিয়েছিলে তেমনই ভাবেই ওটা রেখে দিয়েছি।"

দীপ বলতে যাচ্ছিল: বাইরেই কি দাঁড়িয়ে থাকব? কিন্তু এ-ভাবে ওকে ছুঁয়ে থাকা তা হলে আর হবে না। বরফির মতো জালের ফাঁকগুলো খুব ছোট। হাত গলাবার মতো বড় হলে সে মণির মুখে হাত বুলোত। কিন্তু তার হাত তো অত উঁচুতে পৌঁছবে না। ভীষণ লম্বা হয়ে গেছে ও।

"তুমি খুব লম্বা হয়ে গেছ।"

"সত্যি! তুমিও রোগা হয়েছ।"

দীপ হাসল। আঙুলে মৃদু চাপ দিল। মণি জালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

"এ-ভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে কেমন যেন লাগছে।"

"খারাপ লাগছে?" দীপ গম্ভীর হতে গিয়েও হল না।

"না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম আর আমাদের দেখা বোধহয় হবে না।"

"আমি জানতাম দেখা হবে।"

"জানতে? কী করে?"

দীপ অদ্ভুতভাবে হাসল। কথা বেরোল না মুখ থেকে। শুধু ঠোঁট দুটি নড়ল।

"আমি আর গান শিখি না। মাস্টারমশাইকে তো এতদূরে আসতে বলা যায় না, তা হলে অনেক টাকা দিতে হবে।"

দীপের মুখে দুঃখ ছড়িয়ে পড়ল। অস্ফুটে বলল, "গান ছেড়ো না, তা হলে কী নিয়ে থাকবে?"

"জানি না। প্রাইভেটে মাধ্যমিক দেব সামনের বার।"

"তাই পড়ছিলে বুঝি। অঙ্ক পারো?"

"একদম নয়।"

"আমি শিখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু শেখাব না।"

মণির চোখ বড় হয়ে উঠল অবিশ্বাসে তারপর কী যেন মনে পড়তেই মাথা নেড়ে বলল, "মনে করে রেখেছ। আচ্ছা এবার ভেতরে এসো।"

"মা কোথায়?"

"পাশেই একজনদের কোয়ার্টারে গেছে, এখনই আসবে।"

"জানো আমি একটা নাটকে অভিনয় করব পার্টটা অবশ্য খুব ছোট্ট।"

"সত্যিইই! ইস্‌স্ আমি দেখতে পাব না।"

দীপ ফিরে এল রাতের খাওয়া সেরে। মণির মায়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। গম্ভীর, ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দীপের বাড়ির খোঁজ নিলেন। মণি কোয়ার্টারের ফটক পর্যন্ত দীপের সঙ্গে এসেছিল। রিকশায় ওঠার জন্য দীপকে সাহায্য করতে সে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই হাত ধরেই সে ওঠে এবং কিছুক্ষণ ধরে রেখে তাকিয়েছিল গভীর দৃষ্টিতে। মণির মুখটিকে সে উজ্জ্বল দেখেছিল।

"তা হলে আবার আসব।"

রিকশা চলতেই সে চেঁচিয়ে বলেছিল। পরদিন জ্যোতির সঙ্গে মুখোমুখি হতেই দীপ কিছু একটা বলবার চেষ্টা করে। জ্যোতি শুকনো হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেছল।

তিন

এমন বিপর্যয় কেউ ভাবতে পারেনি। অথচ দীপ রিহার্সালে চমৎকারভাবে অভিনয় করে গেছে। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে তাকে প্রথম মঞ্চে ঢুকতে হবে। উইংয়ের পাশে দেবু তাকে শেষবারের মতো বুঝিয়ে দেয় কী তাকে করতে হবে। সেই সময় তার পা প্রথম কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গলা শুকিয়ে আসে। সে জলের জন্য ভিতরে এসে গ্রিনরুমের কাছে একটি কলসি আর গ্লাস পেয়ে জল গড়িয়ে সবে চুমুক দিয়েছে তখনই দেবুর চাপা গর্জন শুনল: "কোথায় বামনটা, স্টেজে ইন করার সময় চলে যাচ্ছে।"

দীপ বিষম খেল এবং কাশতে কাশতেই সে ছুটে বা দেবুর ধাক্কা খেয়ে স্টেজে ঢুকল। বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে কাঁদতে বলবে: মাকে মেরো না মেরো না।

তার বদলে সে স্টেজের মাঝে দাঁড়িয়ে কাশতে শুরু করল। স্টেজের উপর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রী হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে। কাশি সামান্য কমতেই সে ছুটে গিয়ে বাবার বদলে মাকে জড়িয়ে ধরে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "মাকে মেরো না, মাকে মেরো না।"

সারা হলঘর প্রথমে মুচকি হেসে উঠেছিল এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

দীপ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। অভিনেত্রীটি ওকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ছিটকে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে, "আমাকে নয় ইডিয়ট, ওদিকে ওদিকে।"

দীপ ছুটে গিয়ে এবার তার নাটকের বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সেই সময় দর্শকদের মাঝামাঝি জায়গা থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে এ যে আমাদের ছোটবাবু। শিং ভেঙে বাছুর সেজেছে।"

উটের পিঠে এটাই ছিল শেষ কুটো। দীপ দর্শকদের দিকে তাকাল এবং পরিচালকের নির্দেশমতো বাবার পা জড়িয়ে ধরে লাথি খাওয়ার ঘটনাটা না ঘটিয়ে পিছিয়ে গেল। বাবা তখন অগত্যা নাটক রক্ষার জন্য ছুটে গিয়ে ছেলের পিছনে লাথি মারল। লাথিটা ঠিক নাট্যসম্মত না হয়ে যথেষ্ট জোরালোই হয়। মায়ের মতো বাবাও তখন দাঁত ঘষছিল।

দীপ স্টেজের উপর পড়ে রয়েছে। দর্শকরা হইচই করে উঠল।

"মরে গেছে, মরে গেছে।"

"বল হরি হরি বল।"

"ওরে এবার ওঠ, খুব হয়েছে।"

"আরে মশাই, একটা দামড়া বামনকে দিয়ে কি বাচ্চার পার্ট হয়?"

দীপ কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দর্শকদের দিকে তাকাতেই তার মনে হল বেহুলা আর জ্যোতি যেন তৃতীয় সারিতে বসে।

স্টেজ থেকে সে বেরিয়ে এল। গ্রিনরুমে ঢুকে সে ড্রেসারের দেওয়া জামাটা খুলে নিজের জামা, জুতো পরল। ঘড়ি এবং মানিব্যাগ নিয়ে সে সোজা বেরিয়ে এল রাস্তায় মুখে রং মাখা অবস্থায়।

ট্যাক্সি পেল না। বাসের যাত্রীরা তার দিকেই তাকিয়ে ছিল যতক্ষণ না সে নেমে যায়। উৎপলা ওকে দেখেই আঁতকে উঠল। "একী রে? যাত্রাটাত্রা করে এলি নাকি?"

"নাটক ছিল।" দীপ জুতো খুলতে খুলতে হালকা গলায় বলল।

"বলিসনি তো, তা হলে দেখতে যেতুম।"

"ওইজন্যই বলিনি।"

"কেমন করলি?"

"লোকে খুব হাততালি দিয়েছে। মজা পেয়েছে।"

"কী পার্ট ছিল তোর?"

"ছোটবাবুর।"

রাত্রে কৃষ্ণচন্দ্র উৎপলাকে বলল, "বিজয়কে পাঠিয়েছিলুম দীপের সেই বন্ধুর বাড়িতে। কী লাগবে না লাগবে জেনে এল।"

কী ভাবে যেন সারা কলেজে নাটকের ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বাড়িতে হাসাহাসি চলছে। দীপকে শুনিয়ে "বাবা মেরো না বাবা মেরো না" বলে চেঁচিয়ে উঠছে বিকৃত গলায়। ক্লাসে ছেলেরা অভিনয় করে দেখাল কীভাবে দীপ স্টেজে ঢুকল, ধাক্কা খেল, লাথি খেয়ে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখে আঁচল বা রুমাল দিয়ে হাসতে লাগল।

দীপ কিন্তু রোজই ক্লাসে এসেছে। সে শুনেছে, দেখেছেও তাকে নিয়ে কীভাবে ভেংচি কাটা চলছে। হৈমন্তী, বেহুলারা তাকে দেখে এড়িয়ে যায়, সে দুঃখ পায়। প্রায়ই তার মনে হয়, কেন নাটক করতে গেলাম। সকলের কাছে সে হাস্যকর একটা ভাঁড় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

ক্লাসের পর কলেজ থেকে বেরোবার সময় পিছন থেকে জ্যোতি তাকে ডাকল।

"দিদির বিয়ে।"

লাল প্রজাপতি ছাপ দেওয়া হলুদ খাম সে এগিয়ে ধরল। দীপ সেটা নিয়ে হাসল।

"বুধবার। তুমি অতি অতি অবশ্য আসবে। বাবা, মা সবাই বিশেষ করে বলে দিয়েছে।"

জ্যোতির স্বরে আন্তরিকতা। দীপকে সেটা স্পর্শ করল। সে মাথা হেলিয়ে বলল, "যাব। আর কাকে বলেছ?"

"ওদের চারজনকেও বলেছি। তোমার বাবা-মাকেও বলব, কাল আমাকে নিয়ে যেয়ো।"

"মা এখানে নেই আর বাবা গ্যাস্ট্রিকের রোগী কোথাও খান না।"

দীপ মিথ্যা কথা বলল এবং ঠিক করে ফেলল সে নিজেও যাবে না।

জ্যোতি চলে যাবার পর তার মনে হল, এ-ভাবে মুখ নামিয়ে একা থাকার কোনও মানে হয় না। তাকে আবার সবার মাঝে ফিরে আসতে হবে আগের মতো হয়ে। তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টার জবাব দিতে হবে। পূর্ণদেহীর সব কাজ তাকে করে দেখাতে হবে সে করুণার পাত্র নয়।

বহুদিন পর সে ঘোষ কেবিনে এল দুপুরের ভিড় এখন নেই। বেহুলারা চারজন একটা টেবলে। ওকে দেখে তারা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

"কী ব্যাপার, তোমরা কি আমায় বয়কট করলে নাকি? আর কথাই বলো না।"

দীপ টেবলের পাশে দাঁড়াল। মেয়েরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

"আমিই নয় কেলেঙ্কারি করেছি, তোমরা তো করোনি। অথচ আমার থেকে দেখছি তোমরাই বেশি লজ্জা পাচ্ছ। আরে ধ্যাৎ, বসতে দাও আমায়।"

ওরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একসঙ্গে সবাই কলকল করে উঠল।

"খিদে পেয়েছে, আগে খাওয়া। বলো...?"

"দীপ আর চপ খেতে ভাল লাগে না, আজ ফাউল কাটলেট হোক।" তাপসী বলল।

"তথাস্তু।"

এরপর জ্যোতির দিদির বিয়েতে তারা সবাই মিলে কী দেবে এবং সে-জন্য বরাদ্দ কত সেই নিয়ে আলোচনাটা তর্কে পৌঁছতেই দীপ বলল, "আচ্ছা সেই যে পিকনিকে যাবার কথা হয়েছিল তার কী হল?"

প্রসঙ্গটা মুহূর্তে ঘুরে গেল। ওদের কথা থেকে সে জানতে পারল। কবে পিকনিক হবে তার দিন ঠিক করা আজও সম্ভব হয়নি। নীরেনদা বলেছেন রোববার হলেই ভাল শুধু চব্বিশ ঘণ্টার নোটিস চাই। এদিকে লীনা বলছে রোববারে ওর মা বেরোতে দেবে না। তাপসীরও এতদিন অসুবিধে ছিল কেন না মা হাসপাতাল থেকে বাচ্চা নিয়ে ফিরেছে। সংসার তাকেই দেখতে হচ্ছিল। এখন অবশ্য সে ঝাড়া হাত-পা। হৈমন্তীর অবশ্য যে-কোনওদিনে আপত্তি নেই।

"তোমরা আমাকে নেবে না?"

"ও মা তোমাকে তো সেই কবে বলা হয়েছে। মনে নেই আমি বললুম নীরেনদা বলেছে দীপ খুব ভাল ছেলে, যে-কোনও মেয়েকে ওর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, মনে আছে?"

"খুউব। তা হলে আমিও যাব। দিন আজই ঠিক করো।"

"সামনের রোববার।" এতক্ষণে বেহুলা কথা বলল।

"পাক্কা। নীরেনদাকে তা হলে জানিয়ে দাও।" দীপ বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধরল।

চার

"কী দীপাঞ্জন, সিগারেট চলবে নাকি?"

বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ডান হাতে লাইটার। ঠোঁটে ঝোলানো সিগারেটটা ধরাবার চেষ্টা করতে করতে নীরেন বলল।

"না।"

নীরেনের পাশে বেহুলা তার পাশে দীপ। পিছনের সিটে তাপসী, লীনা এবং হৈমন্তী।

"না কেন, তুমি অ্যাডাল্ট নও?"

বাতাসে লাইটার নিভে যাচ্ছে। নীরেনের ঠোঁট থেকে সিগারেটটা তুলে নিয়ে বেহুলা নিজের ঠোঁটে রেখে কুঁজো হয়ে সিগারেট ধরাল এবং লম্বা টান দিয়ে নাকমুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে নীরেনের ঠোঁটে গুঁজে দিল।

পিছনের তিনজন পরস্পরকে চিমটি কাটল।

"দীপ লজ্জার কী আছে, আমরা তোমার মা না মাসি।" লীনা বলল।

"কখনও খাইনি।"

"তা হলে আজ থেকে শুরু করো। বিলিতি বেনসন হেজেস টানলে কষ্ট হবে না।" বেহুলা বলল।

"তুই জানিস কষ্ট হবে কি না?" পিছন থেকে চ্যালেঞ্জের মতো কথাটা এল।

বেহুলা সিটের উপর রাখা প্যাকেট থেকে একটা বার করে ঠোঁটে রেখে ধরাল এবং পরপর টান দিয়ে গেল।

পিছনের তিনজন এবার মুষড়ে পড়ল। সিগারেট খাওয়ার মতো যথেষ্ট আধুনিকা না হওয়ার জন্য। ওরা জানে চিমটি কেটে কোনও লাভ নেই, মজাও নেই।

তাপসী হঠাৎ বলল, "আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ছাদে বসে দুপুরে লুকিয়ে খেয়েছিলাম।"

"ক'টা?" নীরেন জানতে চাইল।

"আধখানা।"

"তা হলে আজ একটা গোটা শেষ করো।"

"উরে বাবা।"

"খাবি তো খা।" বেহুলা প্যাকেটটা পিছন দিকে বাড়িয়ে দিল।

"না, না, কেমন মাথা ঘোরে।"

"আমাকে একটা দাও।" দীপ হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল। বেহুলা ধরিয়ে দিল।

"দীপ তা হলে অ্যাডাল্ট হল।" লীনা মন্তব্য করল। কেউ কথা বলল না। গাড়ি ব্যারাকপুর ছাড়িয়েছে। পলতা এবং ইছাপুর ছাড়াতেই দীপ উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল। শ্যামনগর আসছে। সিগারেটটায় কয়েক টান মাত্র দিয়েছে। ফেলে দিল।

জুট মিলের রাস্তা দিয়েই গাড়ি যাচ্ছে। গিজ গিজ করছে রাস্তাটা। অবিরত হর্ন, ব্রেক আর গিয়ার বদল করতে করতে নীরেন বিরক্ত। দীপ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে মণিদের কোয়ার্টারটা দেখার জন্য। যদি ও বাইরে থাকে তা হলে পলকের দেখাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঠিক ফটকের কাছেই নীরেন গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল এবং দীপের মুখ থেকে অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর একটা "আহ্‌" ধ্বনি বেরিয়ে এল।

"কী হল?" বেহুলা জানতে চাইল।

"কিছু না।" দীপের এখন ইচ্ছা করছে নেমে যেতে। পিকনিকের থেকে তার অনেক বেশি কাম্য মণির কাছে বসে কথা বলা। ফেরার সময় সে এখানে নেমে যাবে, এমন একটা চিন্তা মাথায় নিয়ে সে চুপ করে রইল।

নৈহাটির আগেই কাঁকিনাড়ার কাছে গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরে রেললাইন পার হয়ে চলতে থাকল। সরু মাটির রাস্তা এঁকে-বেঁকে ক্রমশ গ্রামের দিকে গেছে। একটা বাঁক পেরোনোর মুখেই হঠাৎ এক ছাগলছানা লাফিয়ে গাড়ির সামনে পড়ল এবং বাম্পারে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল।

ব্রেক কষে নীরেন শুধু বলল, "ঝামেলায় পড়লাম।"

ছানাটা পা ছুড়ে ছটফটাচ্ছে। মরেনি। কিন্তু কোথা থেকে যেন পিলপিল করে জনা কুড়ি মেয়ে পুরুষ হাজির হয়ে গাড়িটা ঘিরে ধরল।

বেহুলা ভয়ে আঁকড়ে ধরল নীরেনের বাহু। পিছনে তিনজন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে, চাপা দিলে গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, গাড়ির লোকেদের বেদম মারা হয় এ-সব কথা বহু শুনেছে দৃশ্য দেখেছেও। ওরা থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করল। দীপও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নীরেন গাড়ি থেকে নামল। দু' পা ফাঁক করে, বুক চিতিয়ে পেটাই স্বাস্থ্যটা জনতাকে দেখাল।

"মরেনি তো, তবে এত হুজ্জুত কীসের। আর মানুষও নয় একটা ছাগল ছানা।"

নীরেনের কর্তৃত্ববাচক কণ্ঠস্বরে ওরা চুপ করে থাকল।

"কার ছাগল?"

মাঝবয়সি একটি বউ এগিয়ে এল।

"ছাগল না ছাগলি ওটা।"

"ছাগল।"

নীরেন পিছনের পকেট থেকে জাঁদরেল একটা ওয়ালেট বার করে একশো টাকার একটা নোট বউটির হাতে দিল।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে বলে উঠল, "একশো নয় দু'শো দিতে হবে।"

নীরেন সে দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল। বউটিকে বলল, "ছাগল তোমারই রইল।"

গাড়িতে এসে স্টার্ট দিতেই ভিড় দু'ভাগ হয়ে পথ করে দিল।

কিছু পথ যাবার পর নীরেন শিস গিয়ে হিন্দি গানের সুর ভাঁজতেই, তাপসী বলল, "ওরা গাড়িটা জ্বালিয়ে দিলেও কিছু করার ছিল না।"

"তা ঠিক।" নীরেন বলল। "মারধোর করলেও কিছু করার ছিল না।"

"উফফ, বেঁচে গেছি। নীরেনদার কী সাহস!"

দীপ কাঠের মতো বসে আছে। কথা বলার ক্ষমতা তার নেই।

অল্প পরেই তারা পৌঁছে গেল। দোতলা ছোট্ট একটা বাড়ি। খোয়া ফেলা পথ ফটক থেকে বাড়ি এবং পুকুরঘাট পর্যন্ত। নারকেল, আম কাঁঠাল, সুপুরি গাছ পুকুরের চারধারে। একদিকে নিচু পাকা পাঁচিল। প্রায় পনেরো বিঘের বাগান। পুকুরের একধারে ছোট্ট একটা টালির চালের ঘর।

নীরেন বাজার করেই এনেছে। রান্নার সরঞ্জাম সব এখানেই আছে। পাশের গ্রামের মালির বাড়ি থেকে কাল রাতে খবর এসেছে তার ছেলে জলে ডুবে মারা গেছে। তাই মালি অনুপস্থিত।

রান্নার জন্য ব্যবস্থা করতে সবাই মেতে উঠল। সন্দেশের বাক্স হাতে হাতে ঘুরে শেষ হয়ে গেল। অনেকগুলো কলা পড়ে রইল। ডিম সেদ্ধ দুটোর বেশি কেউ খেতে পারল না।

সবাইকে ডাব খাওয়াবার জন্য নীরেন একটা হাফপ্যান্ট পরে খালিগায়ে একটা নারকেল গাছে ওঠার চেষ্টা করল। কুড়ি-বাইশ ফুট উঠে হাল ছেড়ে নেমে এল।

"বড্ড পিছল। মালির ছেলেটা এই সময়ই ডুবে মরল। থাকলে পেড়ে দিত।"

দীপ ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাগানে। রান্নায় ব্যস্ত হৈমন্তী আর লীনা। অন্যরা পুকুর ঘাটে বসে গল্প করছিল। কিছুক্ষণ পর আর গল্প জমল না। নীরেন চেঁচিয়ে বলল, "দীপাঞ্জন সাঁতার জানো?"

"একটু একটু।" দীপ ওপার থেকে সাড়া দিল।

"ওদিকে যেয়ো না, সাপ থাকতে পারে।"

কথাটা বলে নীরেন অন্যদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। প্রায় ছুটেই দীপ ফিরে এল।

হাফপ্যান্টটা নীরেন খুলে ফেলল। ভিতরে কস্ট্যুম। বেহুলা বাদে বাকি মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল এবং বার বার অন্যমনস্ক হল।

নীরেন কিছুক্ষণ জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে মেয়েদের ডাকতে লাগল জলে নামার জন্য।

ওরা বলল, কেউই সাঁতার জানে না।

"তাতে কী হয়েছে, আমায় ধরে সাঁতার কাটবে।"

তিনজনে শুধু হাসল। বেহুলা শাড়ি পরেই জলে নেমে গেল। তাকে পিঠে নিয়ে নীরেন সাঁতরাতে শুরু করল।

"বেহুলাটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে।"

"লোক দেখলে একটু বেশিই করে।"

"এখানে লোক আর কোথায়?"

"কেন আমরা। ও তো আমাদেরই বেশি করে দেখায়। সিগারেট কি না খেলেই চলত না?"

তিনজন যখন এই সব কথা বলে চলেছে, দীপ তখন সিঁড়িতে জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সাঁতার কাটা।

হঠাৎ তাপসী বলল, "অ্যাই দীপ, জলে নামো।"

"সেই কবে হেদোয় শিখেছি। তা-ও বেশিদূর যেতে পারি না। প্র্যাকটিসও নেই।"

"তাতে কী হয়েছে। নীরেনদা কেমন কাটছে আর তুমি প্র্যাকটিস নেই বলে পাশ কাটাচ্ছ।"

হঠাৎ লীনা ছুটে গিয়ে দীপকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল।

"এই বার প্র্যাকটিস করো গে।"

দীপ হাত-পা ছুড়ে হাঁ করে বাতাস টানছে। একবার ডুবছে আর উঠছে আর পাগলের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে "ওহ্ ওহ্" শব্দে চিৎকার করে যাচ্ছে।

মেয়েরা প্রথমে ভেবেছিল দীপ মজা করছে। তারপরই বুঝতে পারল দীপ ডুবে যাচ্ছে।

ওরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নীরেন সাঁতরে এসে দীপের চুলের মুঠি ধরে এবং বেহুলাকে পিঠে নিয়ে পাড়ে এল।

দীপ মুহ্যমানের মতো সিঁড়িতে বসে। বেহুলা নীরেন বাড়ির মধ্যে গেছে। মেয়েরা মুখে হাত দিয়ে অবাক বিমূঢ়।

"এই যে বলল সাঁতার শিখেছিল! শিখলে কি কেউ ভোলে?"

"গুল মেরেছে।"

ধীরে ধীরে দীপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। নীরেন আবার হাফপ্যান্ট পরে ফিরে এসেছে।

"দীপ কি ডুবে যাচ্ছিল নীরেনদা?"

"বোধ হয়।"

ওদের মুখ কিছুক্ষণের জন্য শুকিয়ে গিয়ে আবার বিরক্তিতে ভরে গেল।

লীনা বলল, "অপদার্থ।" হৈমন্তী সায় দিল। দীপ ক্লান্ত মুখটা তুলে ওদের দিকে তাকাল।

মাংস ভাত ছাড়া আর কিছু রান্না হয়নি। কলকাতা থেকে আনা হয়েছে দই। সব কিছুই পরিমাণে বেশি।

"এত পড়ে থাকবে! তা হবে না। ওরা না খায় না খাক, আমরা ভাগাভাগি করে, বুঝলে দীপাঞ্জন, শেষ করে দিতে হবে।"

মাংসের ডেকচিটা মাঝে বসানো ছিল। নীরেন হাতায় করে দীপের পাতে তুলে দিতেই সে আঁতকে উঠল।

"নীরেনদা আর পারব না।"

"আরে আমিও তোমার সঙ্গে জয়েন করছি।"

নিজের পাতেও সে প্রচুর মাংস নিল এবং স্বচ্ছন্দে খেয়ে যেতে লাগল। মেয়েরা দীপকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। পেটে হাত দিয়ে সে বলল, "বিশ্বাস করো আর পারছি না।"

"তুমি পারোটা কী বলো তো?"

দীপ করুণ মুখে তাকিয়ে হাসল।

খাওয়ার পর দোতলার বারান্দায় ওরা পা ছড়িয়ে গল্প করতে শুরু করল। নীরেন আর বেহুলা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে, ভ্রূকুটি করছে, জিভ দেখাচ্ছে আর মাঝে মাঝে গল্পে যোগ দিচ্ছে। হঠাৎ বেহুলা একতলায় নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর নীরেনও উঠল— "কী করছে দেখি তো" অজুহাত দিয়ে।

মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ঝিমিয়ে রইল।

"চল বাগানে ঘুরে আসি।"

"সাপ আছে।"

"ওদিকে যাব না।"

ওরা এবং দীপ একতলায় নেমে এল। বাগানে ছড়িয়ে পড়ে ঘুরতে থাকল। টালির চালের ঘরটার কাছে এসে হৈমন্তী থমকে দাঁড়াল। তালাটা নেই কিন্তু ভিতর থেকে বন্ধ। ছুটে সে লীনার কাছে এসে বলল, "ব্যাপার দেখবি আয়।"

দু'জনে ঘরের কাছে এসে দেয়ালে কান ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এল পাংশু মুখে।

"নীরেনদা আর বেহুলা।"

"আগে থেকেই বোধ হয় বলা কওয়া ছিল।"

"এ-রকম জায়গায় আমাদের আসার কোনও মানে হয় না।"

"দীপ ছাড়া আর একটা পুরুষও নেই।"

"ওটাকে পুরুষ বলিস?"

তাপসীকে ডেকে ওরা খবরটা দিল। দীপ পাঁচিলের ধারে একটা প্রায় তিনতলা উঁচু নারকেল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুড়ে ডাব পাড়ার চেষ্টা করছিল।

"দেখ বামনটার কাণ্ড দেখ।"

"চল তো ওটাকে একটু শিক্ষা দি।"

তিনজনে দীপের কাছে এল। ওদের দেখে লাজুক হেসে বলল, "এ-ভাবে পাড়া যায় না।"

"যায় না তো গাছে উঠে পাড়ো না।"

"বড্ড উঁচু।"

"নীরেনদা উঠতে গিয়ে ফেল করেছে। তুমি পারবে না?"

"দীপ পারবে না?"

"দীপ ডাউন দিতে হবে।"

"দীপ পারতেই হবে।"

"দীপ পুরুষমানুষ তুমি। না বোলো না।"

দীপের মুখে একগাল হাসি। বলল, "পেড়ে দিতে পারলে কী দেবে আগে বলো।"

"তা হলে।" হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে বলল, "আমাদের যাকে চাও ওই ঘরে নিয়ে যেতে পারবে।" আঙুল দিয়ে সে টালির ঘরটা দেখাল।

"না না।" দীপ মাথা নাড়ল। "আমি শুধু বন্ধুত্ব চাই।"

"তাই হবে। কিন্তু যদি না পারো?" তাপসী হাত চেপে ধরল দীপের।

"তা হলে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না। অন্য কলেজে ট্রান্সফার নেব।"

"না না, পারতেই হবে। হবে হবে হবে।" তাপসী অদ্ভুত গলায় বলল। দীপ অবাক হয়ে তাকিয়ে উত্তেজিত, হিংস্র, কাতর মুখগুলির থেকে কোনও অর্থ বার করতে পারল না।

খালি গায়ে পাজামাটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে দীপ ওঠার চেষ্টা শুরু করল। ওরা গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, কিছুটা উঠেই সে নেমে এল।

"পেটে বড্ড চাপ লাগছে।"

"জানতুম এই রকম একটা অজুহাত দেবে।" দু' হাত ঝাঁকিয়ে হৈমন্তী বলল প্রায় চিৎকার করে।

দীপ আবার ওঠার চেষ্টা করল। ধীরে ধীরে প্রায় দোতলা পার হয়ে গেল। মেয়েদের মুখে বিস্ময় ফুটল। ওরা হাততালি দিয়ে উঠল। দীপ গাছটা জড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। দুটো পা পিছলে যাচ্ছে বার বার। আঙুলগুলো বেঁকিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, পারছে না।

একটা ইটের টুকরো নিয়ে হৈমন্তী শাসানি দিল, "দীপ খবরদার, এক ইঞ্চি নেমেছ কি মাথা ফাটিয়ে দেব।"

হৈমন্তী ইটটা ছুড়ল। গাছে লেগে শব্দ হতেই দীপ ধড়ফড়িয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করল। কয়েক হাত উঠে আবার সে গাছটা জড়িয়ে রইল। শরীর থরথর কাঁপছে, নিশ্বাস নিতে হাঁ করল।

তিনজনে একসঙ্গে ইট ছুড়ল। তারপর আবার একঝাঁক।

"পারতেই হবে। পারতেই হবে।" উন্মাদের মতো লীনা চেঁচাল।

"আর একটু দীপ, আর একটু।" তাপসী আবার ছুড়ল। দীপের পাশ দিয়ে সেটা বেরিয়ে গেল। আর থরথর করে কেঁপে দীপ পড়ে গেল।

মাথাটা প্রথমে পাঁচিলে পড়ল সেখান থেকে ছিটকে এল হাত পাঁচেক দূরে। বার কয়েক পা দুটো খিঁচিয়ে দীপের শরীর স্থির হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে অ্যাম্বাসাডারটা শ্যামনগরের জুট মিল কোয়ার্টারের ফটক পেরিয়ে কলকাতার দিকে চলে গেল। পিছনের সিটে বসা-ভঙ্গিতে দীপের নিস্পন্দ দেহটা রাখা ছিল।

জীবন্ত
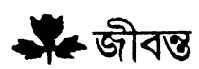
গত পাঁচ দিনে দ্বিতীয় এবং এগারো দিনে তৃতীয়বার সে এই দরজাটার সামনে দাঁড়াল ব্রিফকেসটা রেখে। বাঁ হাতে একটা সন্দেশের বাক্স।

দরজার ভারী চৌকাঠ আর পাল্লা দুটো এমন নিখুঁতভাবে জোড়ের সঙ্গে মেলানো যে প্রথমেই তার মনে হয়েছে খুব সন্তর্পণে এই দরজা ব্যবহৃত হয় এবং সারাদিনে খুবই অল্প। তারপর মনে হয়েছে আবশুলা রঙের ভারী, পালিশ-চটা পাল্লার ওধারে একজন এই পুরনো দরজাটার মতো শক্ত জমাট অনমনীয়তা নিয়ে সম্ভবত অপেক্ষা করছে...হয়তো তার জন্যই।

গতবার সে মালতী দত্তকে বলে গেছল: "ভাববার জন্য আপনি সময় নিন। আমি বরং দিন তিনেক পরে আবার আসব।"

আজই তৃতীয় দিন। মিহিরের মনে হল সেই একই কথা আবার তাকে শুনতে হবে।

"মাপ করবেন...অসম্ভব, কিছুই আপনাকে বলতে পারব না...মাপ করবেন, পাঁচজনকে এ-সব জানিয়ে কী লাভ! আমি এই এককোণে পড়ে আছি তাই থাকতে দিন। অনেকদিন তো বাঁচলাম, কখন ডাক আসে এবার তারই অপেক্ষা। যা ব্যক্তিগত তাকে সবার সামনে আনার কী দরকার।"

"দরকার আছে বইকী। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা উঠেছিল যাঁর সম্পর্কে, একজন অতবড় বৈজ্ঞানিক, তাঁর মন কীভাবে কাজ করত সেটা জানতে তো লোকের কৌতূহল হয়ই। রিসার্চ, এক্সপেরিমেন্ট, পেপার তৈরি করা এ-সব তো মনের একটা দিক, লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁর যে আর-একটা জীবন আর-একটা মন ছিল সেটাই তো...প্রতিভাধরদের মন কত বিচিত্র উদ্ভট কত অসহায় বুভুক্ষু যে হয় ..আজকাল এইসব নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা কত কাজ করছে, কত তথ্য বেরিয়ে আসছে।"

মিহির পরে ভেবে দেখেছিল, বিচিত্র ও উদ্ভটের পর 'কত বজ্জাত কত হিসেবি' বলতে গিয়ে সে অদ্ভুতভাবে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। তখনই মনে হয়েছিল অনন্তলাল মুখার্জির সম্পর্কে অসহায় বা বুভুক্ষু জাতীয় শব্দই এই বৃদ্ধার কাছে গ্রহণীয় হবে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এঁর গভীর প্রণয় ছিল শোনা যায়।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্কে সাদা চুল ভরা মাথাটি ডাইনিং টেবলের দিকে ঝুঁকিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে শুরু করেছিলেন তখনই মিহির সচেতন হয়েছিল টেবলটা সম্পর্কে। সন্তর্পণে সে আঙুল বুলিয়েছিল।

আর এক বৃদ্ধা, মালতী দত্ত যাকে পুষ্প বলে ডাকছিলেন, সম্ভবত ঝি বা রাঁধুনি হয়ে জীবন শুরু করে এখন যে মালতী দত্তর সারাদিনের একমাত্র সঙ্গী, সেই পুষ্প তখন অপরপ্রান্তে চেয়ারে বসে তারই মতো ডাইনিং টেবলটায় আঙুল বুলোচ্ছিল।

এই দরজার মতোই তক্তার জোড় নিখুঁত মেলানো, মসৃণ কিন্তু পালিশ-চটা ঘন বাদামি রঙের টেবলটায় অনায়াসে আটজন খেতে বসতে পারে।

ব্রিফকেসটা সে মেঝেয় নামিয়ে রেখে দরজায় তিনটি টোকা দিল। দরজা খুলবে পুষ্প। শীর্ণ ছোটখাটো দেহ, চুল আধপাকা, মুখের তুলনায় কপালটি উঁচু ও চওড়া, উপরের পাটির দুটি দাঁত সবসময়ই বেরিয়ে, শিরাগুলো জালের মতো হাতে ছড়ানো, গায়ের রং টেবলটার মতোই প্রায়। পুষ্পর ময়লা রঙিন শাড়িতে দীর্ঘ সেলাই। মিহির এইসব লক্ষ করার আগে প্রথম দিনই দালানটায় পা দিয়ে অনুভব করেছিল সে এক ধরনের নীরব আভিজাত্যপূর্ণ দারিদ্র্যের মধ্যে এসে পড়েছে।

মিহির আবার তিনটি টোকা দিল, একটু জোরে। জুনের ভ্যাপসা গরম। সিঁড়ির এই জায়গাটা তিনদিক দেয়ালে ঘেরা। একটা ছোট্ট জানলা রয়েছে যার উপরের কবজাটা ভেঙে যাওয়ায় পাল্লাটা ঝুলছে। নীচের কবজাটাও শীঘ্রই ভাঙবে।

সে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। একটু হাওয়াও নেই। আকাশের দিকে তাকাল। মেঘের পাত্তা নেই। তবে ক'দিন ধরে যে গুমোট চলছে, হয়তো দু'-তিনদিনের মধ্যেই বৃষ্টি হবে।

বাঁ পকেট থেকে রুমাল বার করার জন্য সে সন্দেশের বাক্সটা ডান হাতে নিল।

রুমালটা ঘাম মুছে মুছে ন্যাতা। ব্রিফকেসের মধ্যে আর একটা আছে, সেটা বার করবে কি করবে না এই নিয়ে দোনামনা করতে করতে সে জানলা দিয়ে আবার তাকাল।

অ্যামবাসাডরের নীল বনেট আর সামনের চাকাটা দেখা যাচ্ছে। আবদুল সম্ভবত গাড়িতে বসে নেই। ওকে একটা টাকা দিয়ে চা খেতে বলে এসেছে কিন্তু চায়ের দোকান এই পাড়ায় আছে কি? রাস্তাটা মোড় নেবার মুখে দেয়াল ঘেঁষে একটা উনুন, কিছু কাচের গ্লাস, কাঠের বাক্স, বিস্কুটের জার যেন চোখে পড়েছিল। নিশ্চয় আবদুলের চোখেও পড়েছে।

গাড়ি চালানোটা শিখে নিলে আবদুলকে সে ছেড়ে দেবে। হিরণ ভটচাজের আরও দুটো গাড়ি, একটা ভ্যান রয়েছে দরকার হলে তারই একটা চালাবে। এখনও ক্লাচ আর গিয়ারের সম্পর্কটা মিহির এক জায়গায় আনতে পারেনি। ক্লাচ না করেই গিয়ার বদলাতে গিয়ে যখন কর্কশ শব্দটা হয় তখন ভয়ে সে চেপে ধরেছিল ব্রেক। তার মনে হয়েছিল গিয়ারের কোনও কলকবজা বোধহয় ভেঙেছে।

আবদুল পাশে বসে শান্ত স্বরে বলেছিল, "দু'দিনেই কি হয়! তবে হয়ে যাবে, আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে স্যার। স্টিয়ারিংয়ের হাত তো আপনার ভালই।"

হয়ে যাবে। মিহির মুখ ফিরিয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাল। দু'দিন সে ঘুরে গেছে আজ তৃতীয় দিন। আজও কেউ বার করেনি, করতে পারেনি বা চায়নি স্যার এ. এল. মুখার্জির জীবনের এই দিকটার কাহিনী, অথচ অনেকেই নাকি জানে।

স্টিয়ারিংয়ের হাত তো ভালই। তাই কি? ত্রিকালের সার্কুলেশন চল্লিশ হাজারেই আটকে আছে গত সাতটা সংখ্যা।

"মিহিরবাবু একটু ভাবুন টাবুন। বলেছিলেন ছ'মাসেই পঁচাত্তর হাজারে তুলে দেবেন, কিন্তু প্রথম চারটে সংখ্যার পর আর তো কোনও ফল দেখছি না।...আমি যা যা দেব বলেছি দিয়েছি, আপনি যখন যা চেয়েছেন..."

"হিরণবাবু আর দু'-তিনটে সংখ্যা...চল্লিশ হাজার একটা ডিফিকালট জায়গা, এই ধরনের পাক্ষিকের পক্ষে...আর দু'-তিনটে ইস্যু।"

হিরণ ভটচাজ নীচের ঠোঁটটা সামান্য দোমড়ানো ছাড়া আর কিছু করেনি। মিহির আরও মিনিট দুয়েক বসে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, হিরণ ভটচাজ একটা ক্লিপে গাঁথা তিন-চারটে চিঠি আর ভাউচারে এমন ডুবে গেল যে সে আপনা থেকেই থেমে যায়।

"বিমলবাবুকে যাবার সময় আমার কাছে আসতে বলে দেবেন।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ। মিহির যখন বেরিয়ে আসে তার মাথার মধ্যে বোধক্ষমতার অংশটি তখন অসাড় হয়ে গেছল। স্নায়ুতে কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে যায় যে-জন্য হাতের আঙুল কাঁপছিল নিজের ঘরে এসে সিগারেট ধরাবার সময়।

বৃষ্টি হয়তো দু'-চারদিনেই আসবে, কিন্তু এই অসহ্য ভ্যাপসানিটা। জানলার কাছে এসে অন্যমনস্কে ভিজে রুমাল দিয়েই কপাল ঘাড় মুছতে মুছতে বিরক্ত হল।

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে বসতে পারলে, পাখার হাওয়াটা অন্তত পাওয়া যেত অবশ্য লোডশেডিং যদি না হয়ে থাকে। ঘড়ি দেখল সে। চারটে বাজতে দশ, কৃষ্ণেন্দু পাঁচটায় অপেক্ষা করবে অফিসে। অনন্তলালের জীবিত দু'-চারজন ছাত্রের টেপ করা ইন্টারভিউয়ের ভার দেওয়া আছে কৃষ্ণেন্দুকে। আর এক মাস পরই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা বার করবে ত্রিকাল।

"কে?"

মিহির ঘুরে দাঁড়াল। দরজাটা ইঞ্চি চারেক ফাঁক, পুষ্পর মুখ দেখা যাচ্ছে। মিহির হাসবার চেষ্টা করল।

"দিদির শরীর ভাল নয়, শুয়ে আছে। পরশু রাত থেকেই টানটা বেড়েছে, কথা বলতে কষ্ট হয়।"

"আহ্, আমি ভাবলুম আজ কিছুক্ষণ গল্প করব, পুরনোদিনের কথা শুনব...টান বেড়েছে যখন তা হলে তো ওঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। খেতেও বোধহয় পারবেন না।"

মিহির সন্দেশের বাক্সটা তুলে ধরল। কুড়ি টাকার দশটা সন্দেশ।

"এখন তো খেতে পারবেন না দিদি।" পুষ্প বাক্সটায় চোখ রেখে বলল। দরজার পাল্লা এখন

হাতখানেক খোলা। আগের দিন যে খয়েরি শাড়ি পরেছিল, আজও পরনে সেইটি। মিহিরের মনে হল বোধহয় বাইরের লোকের সামনে বেরোনোর জন্য পুষ্পর এই একখানাই শাড়ি। দরজা খুলতে দেরি হওয়ার কারণ, যেটা পরেছিল সেটা বদলাবার জন্য। মালতী দত্তরও কি এই অবস্থা!

"তা হলে এটা তুমিই রাখো।"

মিহির ভেবেছিল ইতস্তত করবে, আপত্তি জানাবে বা মুখে সংকোচ ফুটবে। কিছুই হল না। স্বচ্ছন্দে শিরাবহুল হাতটা এগিয়ে এল।

"আজ কী গুমোট, ঠান্ডা জল এক গ্লাস পাব?"

"আপনি ভেতরে বসুন না।"

দরজার থেকেই লম্বা দালান যার প্রান্তে ডাইনিং টেবল। তারপরই মালতী দত্তর শোবার ঘর। একটা বিবর্ণ সবুজ খাটো পর্দা দড়িতে ঝুলছে। দালানের একধারে কলঘর, রান্নাঘর। অন্তত ষাট বছরেব পুরনো একটা পাখা দালানে ঝুলছে। পাখাটা বন্ধ। মিহির আরও গরম বোধ করল।

"লোডশেডিং নাকি?"

মিহিরের দৃষ্টি অনুসরণ করে পুষ্পও পাখাটার দিকে তাকাল।

"না তো। এমনিই বন্ধ রাখা।"

পুষ্প সুইচ টিপতেই পাখা ঘুবতে শুরু করল। মিহির এখনই লক্ষ করল সুইচের ঢাকনাটা পিতলেব।

পাখাটা বন্ধ ছিল নিশ্চয় ইলেকট্রিক বিল কমাবার জন্য। এই দুই বুড়ির সংসার চালাবার টাকা দিয়ে গেছেন কি? দিয়ে গেলে, কত টাকা? মারা গেছেন তো তিরিশ বছর প্রায়। এদের দোকান, বাজার, ইলেকট্রিক, বাড়ির ট্যাক্স, কাপড়-চোপড়, অসুখ-বিসুখ এ-সবের খরচ কে দেয়? মালতী দত্ত তো চাকরি করত মাত্র অনন্ত মুখুজ্জের লেববেটারিতে, রিচার্সের কাজকর্ম বোধহয় জানতও না। সাধারণভাবে আই এস সি পাশ। কত টাকা ওর পক্ষে জমানো সম্ভব যা দিয়ে গত তিরিশ বছর টানা যায়।

"ডাক্তার দেখানো হয়েছে?"

"আমি ডাক্তারবাবুকে বলে এসেছি। ওষুধও দিয়েছেন। এসে আর কী দেখবেন, পুরনো রোগ।"

জল খেয়ে গ্লাসটাকে টেবলে রাখল। পুষ্প তুলে নিয়ে দালানের কোণে মেঝেয় রেখে দিল।

"কতদিনের পুরনো?"

"তা বছর কুড়ি-পঁচিশ ..ভুল বললুম, পঁয়ত্রিশ তো হবেই। আমার তখন এখানে চার-পাঁচ বছব হয়ে গেছে।"

"স্যাব তো তখন বেঁচে।"

"উনিই তো দিদিকে হোমিওপ্যাথি চিকিচ্ছের ব্যবস্থা করে দেন। নিজের কিছু হলেও হোমিওপ্যাথি করাতেন।"

এটা একটা খবর। বিশ্ববিখ্যাত বায়োকেমিস্ট কিন্তু অ্যালোপ্যাথিতে বিশ্বাস নেই। পুষ্পর কাছে অনেক কিছু জানা যেতে পারে, অনন্তলালের শেষ দশ বছর সম্পর্কে।

"চা খাবেন?"

"তা খেতে পারি, গরমে ভালই লাগে।"

টেবলে রাখা সন্দেশের বাক্সটা তুলে নিয়ে পুষ্প রান্নাঘরে ঢুকল।

পাখাটা থেকে খটখট একটা শব্দ আসছে। সেকেলে পাখায় বুশ বেয়ারিং হয়। হয়তো বেয়ারিং গেছে। এই একটি শব্দ ছাড়া আর যা কিছু তা হল রাস্তায় গাড়ি চলাচলের। লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে উত্তরে বেরোনো এক মাঝারি রাস্তায় প্রায় দেড় বিঘে পাঁচিল ঘেরা জমিতে এই বাড়ি যেটা অনন্তলাল মুখুজ্জের জীবৎকালে ছিল তাঁর গবেষণাগার। বাড়িটি তাঁকে দান করেছিল ওড়িশার এক সামন্ত অধিপতি, তার পুত্রকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময়ের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। বাড়িটিকে এক অছিমণ্ডলীর হাতে দিয়ে দেন অনন্তলাল। এই বাড়ির সংলগ্ন বাগানের একপ্রান্তে দোতলা ছোট্ট বাড়িটিতে থাকে মালতী দত্ত। এ-সব তথ্য মিহির সংগ্রহ করে ফেলেছে কাঠখড় না পুড়িয়েই।

ফটক থেকে ডান দিকের পাঁচিল ঘেঁষে সিমেন্টের একটা সরু পথ ধরে আসতে হয়। বড় বাড়ির

পিছনেই মালতী দত্তর বাস, যেটা ভৃত্যদের আবাস হিসাবে তৈরি হয়েছিল। অনন্তলাল মারা যাবার পর গবেষণাগার তুলে দিয়ে বিভিন্ন অফিসকে ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

এই বাড়িতে মালতী দত্ত এখনও রয়েছে কীভাবে? মিহির ভেবে রেখেছিল এটা বার করতেই হবে। এই দালান থেকে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা রক্তাক্ত কৃষ্ণচূড়ার শীর্ষদেশ, তার পাশে বেগুনিরং ফুলের পত্রবহুল দীর্ঘ একটি গাছ। এই দুটি গাছ প্রায় আড়াল করে ফেলেছে এই ছোট্ট বাড়িটাকে। একতলায় কোনও অফিসের গুদাম আর চেয়ার-টেবল নিয়ে বসা কয়েকটা লোক এবং টেলিফোন দেখেছে সে।

মিহিরের মুখে পাতলা হাসি খেলে গেল। বৈজ্ঞানিক চমৎকার নিরালা জায়গাটি বেছেছেন প্রণয়িনীর জন্য।

সে সামান্য নিচু হয়ে শোবার ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল পর্দার তলা দিয়ে। সিমেন্টের সাধারণ মেঝে, খাটের পায়া যার প্রান্তটা বাঘ বা সিংহের থাবার মতো। নিশ্চয় বার্মা সেগুনের। একটা কাঠের আলমারির তলার অংশও সে দেখতে পেল। হয়তো মালতী দত্ত এখন ঘুমোচ্ছে কিংবা তাদের কথাবার্তায় কানপেতে শুয়ে আছে। হাঁপানির টানের শব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিই হাঁপানি নাকি তাকে এড়াবার জন্য ভান করেছে।

"না, না, না..."

ঘাড়পর্যন্ত ছাঁটা ঝাঁকড়া সাদা চুলগুলো শনের ঝাড়ন থেকে ঝুল ঝেড়ে ফেলার মতো নাড়াতে নাড়াতে, একগুঁয়ে স্বরে বারবার বলেছিল আগের দিন। আজও জিজ্ঞাসা করার সুযোগ থাকলে হয়তো ওইভাবেই মাথা নেড়ে যেত টেবলের উপর ঝুঁকে।

আবার মিহির সচেতন হল টেবলটা সম্পর্কে। তার এইরকম একটা দরকার। নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার পর থেকেই প্রশস্ত খাওয়ার জায়গাটি তাকে পীড়া দিচ্ছে। এখন খাওয়ার টেবল হিসাবে যেটার ব্যবহার হচ্ছে আসলে তা বড় একটা টুল। অন্নদাচরণ লেনের বাসায় টুল ছাড়া রাখার মতো জায়গাও ছিল না। ওটা আরতি কিনে এনেছিল ফুটপাথ থেকে।

আশ্চর্য, আরতির স্মৃতি বহন করছে খাবার টুলটা, অথচ ওকে মনেই পড়ে না। সংসারে এইরকম আরও হয়তো দু'-চারটে জিনিস রয়ে গেছে গত দশ বছর ধরে অথচ মনে পড়ে না। রোজ দেখে দেখে এমন এক অভ্যাসে দাঁড়ায়, যা বিস্মৃতির আবহাওয়া তৈরি করে।

ছায়া একদিন পুরনো পত্রিকার স্তূপ পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা কার্ড পেয়েছিল।

"এটা কি দরকার লাগবে?"

ছায়া ক্লাস ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত পড়েছে কিন্তু কার্ডটায় কী লেখা তা দেখার কৌতূহল ওর হয়নি। সংসার ছাড়া আর কিছু ও বোঝে না। খবরের কাগজও পড়ে না।

"তুমি কি জানো, এই কার্ডটা কীসের?"

"না।"

ছায়া বিমূঢ় অপরাধীর মতো তাকিয়ে থেকেছিল তার মুখের দিকে। হঠাৎই মিহির রেগে ওঠে, পাংশু শীর্ণ বোকামি ভরা ওর সরল ভয় দেখে। সারাক্ষণ যেন স্বামীকে জুজু ভেবে কুঁকড়ে থাকে।

"এই কার্ডটা হচ্ছে থিয়েটারের। পড়ো।"

ছায়ার হাতে সে প্রায় জোর করেই ধরিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে ওকে লক্ষ করতে থাকে। ছায়া তার বড়-বড় চোখের নিথর দৃষ্টিতে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে পড়ে যায়। ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে নড়ছিল উচ্চারণ করার জন্য। অভ্যাস নেই পড়াশুনার। ইচ্ছে করেই এই নিষ্ঠুর কাজটি যে করছে, মিহির সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিল।

"একটা অফিসের সোস্যাল ফাংশানে বামুনের মেয়ে অভিনয় হয়েছিল তাইতে আরতি নায়িকার পার্ট করেছিল। এটা সেই ফাংশানের কার্ড। ফেলে দাও।"

ছায়া কিছুক্ষণ কার্ডটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল; "ভাল নাকি থিয়েটার করত, খুব নাম ছিল দিদির।"

"দিদির জন্য তুলে রাখলুম, দু'-চারদিনে নিশ্চয় নষ্ট হবে না।"

পুষ্প চায়ের কাপ রাখল টেবলে। মিহির ওর ঠোঁটের কোণে সাদা গুঁড়ো দেখতে পেল। গোটা দুয়েক সন্দেশ ইতিমধ্যে হয়তো সাবড়েছে।

"কড়াপাকের তো। থাকবে।"

চায়ে চুমুক দিয়ে সে নিশ্চিত হল এদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে। ধানমুড়ি থেকে প্রথম যখন সে কলকাতায় আসে বি এ পড়তে তখন দিন দশেকের জন্য মা'র পিসতুতো দাদা সাত পুত্র-কন্যার জনক বিশেমামার বাড়িতে উঠেছিল। সেখানে এই রকমই স্বাদের চা পেত। বিশেমামা ছিল সিনেমার অপারেটর।

"এই নিয়ে তিন দিন এলাম, কিন্তু লেখার মতো একটা কিছুই পেলাম না।...দেখলে তো আগের দু'দিন, শুধু মাথা নেড়ে গেলেন, অথচ স্যার সম্পর্কে উনি অনেক কিছুই তো জানেন।"

পুষ্প শোবার ঘরের দিকে আড়চোখে ইতস্তত তাকিয়ে নিয়ে, মিহিরের কানের কাছে ঝুঁকে বলল: "বলবে না। স্যার সম্পর্কে কোনও কথাই পেট থেকে বেরোবে না।"

মিহির অবাক হল। এই খবরটার জন্য নয়, পুষ্পর ফিসফিস স্বর এবং বলার ভঙ্গির জন্য। তার মনে হল, মালতী দত্ত নয়, পুষ্পকেই তার জিজ্ঞাসা করা উচিত। অনেক কথাই ও বলতে পারবে। অনন্ত মুখুজ্জ্যেকে তাঁর শেষ দশটা বছর পুষ্প এখানে দেখেছে।

কিন্তু পুষ্প বলবে কেন? অশিক্ষিত মনের প্রবৃত্তি বশে? কোনও বিদ্বেষ আছে মালতী দত্ত বা অনন্ত মুখুজ্জ্যে সম্পর্কে? আরও সন্দেশ খেতে চায় কিংবা টাকার গন্ধ পেয়েছে? যে কারণই থাক তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

"দেবতার মতো স্যারকে দেখত। তাই বলছি, কিচ্ছুটি বলবে না। স্যারের কোনও অসম্মান হোক চাইবে না।"

"অসম্মান কেন হবে। আমরা তো ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে খারাপ কিছু লিখব না।"

"আগের দিন আপনি চলে যাওয়ার পর দিদি বলেছিল, 'স্যারের গায়ে আমাকে দিয়ে কাদা মাখাতে চায়। তাই টাকার লোভ দেখাচ্ছে।' আপনি বুঝি টাকা দেবেন বলেছেন?"

"ছি-ছি, উনি আমাকে একদমই ভুল বুঝেছেন।"

মিহির উদ্বেগ ও ব্যস্ততার সঙ্গে আঘাত পাবার মতো ব্যাপারটা মিশিয়ে দিলেও অস্বস্তিটা তার অকৃত্রিম। একটু কাঁচা হয়ে গেছে গোড়াতেই টাকার প্রসঙ্গটা এনে। মালতী দত্তর ব্যক্তিত্ব বা গভীরতা মেপে নেওয়া উচিত ছিল।

"টাকা দেব সেই অর্থে আমি বলিনি। আমরা যাঁদের ইন্টারভিউ করি...মানে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখি, তাঁদের আমরা দক্ষিণা, প্রণামী যাই বলো, দিয়ে থাকি। এটাই বলেছি। এটা আমাদের রীতি। যিনি বলবেন, তাঁর তো সময়ের দাম আছে, তা ছাড়া মাথার কি মনের খাটুনিও তো আছে...নাহ্ উনি ভুল বুঝেছেন, ওঁকে এটা বুঝিয়ে বলা দরকার। কাদা মাখাব ওঁকে দিয়ে, ছিছি এমন ভাবলেন কেন যে!"

মিহির অসহায়ভাবে পুষ্পর দিকে তাকিয়ে প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করতে লাগল,

"না, অমনভাবে ঠিক দিদি বলেনি।"

"কীভাবে বলেছেন?"

"এই...স্যারের প্রাইভেট ব্যাপার নিয়ে এখন কেন এ-সব ছাপা হবে? কী উদ্দেশ্য, আমার কাছেই বা আসা কেন; আমার মুখ দিয়ে বলাতে চায় কেন, এই আর কী...?"

খুট খুট শব্দ হল ঘর থেকে। পুষ্প এক-পা পিছিয়ে গেল মিহিরের কাছ থেকে এবং একবার ঘরের ও একবার মিহিরের দিকে তীক্ষ্ণ চাহনিতে তাকিয়ে সে দ্রুত ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

পুষ্প যখন ওদের কথাবার্তা ফাঁস করতে চলেছে তখনই খুট খুট হুঁশিয়ারি। তা হলে সে ঠিকই ভেবেছে, জেগে কান পেতে ছিল।

মিহির কানপাতার চেষ্টা করল। ঘর থেকে ফিসফিসের মতো শব্দও সে শুনতে পেল না। ওরা কি ইশারায় কথা বলে!

সে অনুভব করল, অসম্ভব একটা অনমনীয় নৈঃশব্দ প্রায় বর্মের মতো এই দালানকে ঘিরে আছে

চারদিক থেকে। তাকে এই বর্ম ভেদ করতে হবে, যে-কোনও ভাবেই। হঠাৎ তার মনে হল, ভেদ করার জন্য সব থেকে পাতলা ও পলকা জায়গাটি হল পুষ্প।

"আপনি এখন যান। আমাকে একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে দিদির খবর জানিয়ে আসতে।"

"কখন যাবে?"

মিহির উঠে দাঁড়াল। ব্রিফকেসটা তুলে নেবার সময় টেবলে আঁচড়টানার শব্দটা হতেই, চট করে লক্ষ করল দাগ পড়েছে কি না।

"পাঁচটায় যেতে বলেছেন।"

মিহির ঘড়ি দেখল।

"কতদূরে?"

"এই তো থিয়েটার রোডে, মিনিট দশেকের রাস্তা।"

"দেরি হয়ে গেছে।"

দরজার বাইরে এসে সে আবার ঘড়ি দেখে বলল, 'পাঁচটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। আমার গাড়ি আছে পৌঁছে দিচ্ছি তোমায়।"

দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ হতে হতেই মিহির দেখতে পেল শোবার ঘরের পর্দা সরিয়ে মালতী দত্ত দালানে পা দিচ্ছে।

ফটক থেকেই দেখা গেল আবদুল গাড়ির এক জানলায় মাথা ও এক জানলায় পা তুলে সম্ভবত ঘুমোচ্ছে। সে আর এগোল না। ঘুমিয়ে পড়ার গুণটির জন্য ওকে অফিসের অনেকেই ঈর্ষা করে। হিরণ ভটচাজের বিশ্বস্ত এবং পুরনো লোক, হয়তো স্পাই। কে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় কতক্ষণ থাকছে, কার সঙ্গে কী কথা বলছে বা ফুর্তি মেরে সময় নষ্ট করছে কি না, এইসব খোঁজখবরও হিরণ ভটচাজ রাখে।

"এ মাসের পেট্রল বিলটা বেশি হয়ে গেল মনে হচ্ছে।"

"প্রাণগোপালকে ঘাটশীলা-ঝাড়গ্রামের দিকে পাঠিয়েছিলাম আদিবাসীদের ডেইলি লাইফের, কাজকম্মো নাচ-গান এইসবের ছবি তুলতে।

"একটা হোটেল বিল দিয়েছে কিন্তু ঝাড়গ্রামে প্রাণগোপাল ছিল তো ওর বন্ধুর বাড়িতে। তা ছাড়া ট্রেনেও তো যাওয়া যেত।"

জবাবের অপেক্ষা না করেই ফোন রেখে দিয়েছিল।

বুড়ো সব খবর রাখে। না রাখলে, একটা ট্রেডল মেশিন নিয়ে জীবন শুরু করে আজ তিরিশ লাখ টাকা দামের প্রেসের মালিক হয়ে তাকে ছ'শো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া আর আড়াই হাজার টাকা মাইনেতে রাখতে পারত না। প্রেস ছাড়াও ছাপার কালি তৈরির কারখানাও আছে। কলকাতায় ক'টা বাড়ি, সেটা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

পরিচ্ছন্নভাবে এত দ্রুত উপরে ওঠা যায় না। হিরণ ভটচাজ, শোনা যায়, এই প্রতিষ্ঠানের আসল মালিকের অংশীদার ছিল। মদ্যপ মালিককে মাঝরাতে সাততলা এক বাড়ির নীচে হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় মৃত পাওয়া গেল। ছ' তলায় রক্ষিতার ফ্ল্যাট থেকে নাকি মত্ত অবস্থায় ঝাঁপ দিয়েছে। শত্রুরা বলে হিরণ ভটচাজই লোক দিয়ে খুন করিয়ে ওখানে ফেলে রেখে দেয়। ঝাঁপটাপ সব মিথ্যে কথা। মালিকের নিঃসন্তান বিধবা নাকি আজও মাসে মাসে চার হাজার টাকা মাসোহারা পাচ্ছে।

এই সব মিহির বিশ্বাস করে না। সফলদের সম্পর্কে গুজব রটেই। তবে কোনও কোনও সময়ে সে বিশ্বাস করে, যেমন এই মুহূর্তে, যখন সে অনিশ্চয়তার মধ্যে ইতস্তত করছে, হতে পারে কি পারে না তা যখন জানতে পারছে না, এমন অতিরিক্ত বিব্রত অবস্থায় পৌঁছলেই সে রেগে ওঠে এবং তখনই যা মনে পড়ে তাই নিয়ে অদ্ভুত এক গজরানিতে ভুগতে শুরু করে। মনে মনে তখন ঝগড়া শুরু করে দেয় কারুর সঙ্গে—ছায়া, কৃষ্ণেন্দু, মা, প্রুফ-রিডার, দর্জি বা হিরণ ভটচাজ, যেই হোক। ব্যাপারটা কিছুক্ষণ তাকে বিশ্রী এক সময়ের মধ্যে রেখে দেয়। তখন তার হাত বা ঠোঁট নড়া দেখে অপরিচিতরা পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চয় চোখ-মুখের অবস্থাটা স্বাভাবিক থাকে না, হয়তো পাগল ভাবে। কিন্তু ওরা জানে না সার্কুলেশন তোলার ব্যাপারটা কী।

পুষ্পকে সে আসতে দেখল। সেই একই শাড়ি প্রখর আলোয় আরও ময়লা, রং-জ্বলা দেখাচ্ছে। চটির ফিতে যে-কোনও সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে বলেই বোধহয় সন্তর্পণে হাঁটছে। মিহির হাত দিয়ে গাড়িটা দেখাতেই ওর চোখে ছেলেমানুষের মতো কৌতূহল ফুটল।

আবদুল ধড়মড়িয়ে উঠল পিছনের দরজা খোলার শব্দে। পুষ্পকে আগে উঠতে দিল মিহির।

"থিয়েটার রোডের কোনদিকে, ব্রিটিশ কাউনসিলের দিকে না কলামন্দিরের দিকে?"

পুষ্প বিব্রত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, একটা দিশা খুঁজে নেবার চেষ্টা করে বলল: "এই তো ওপাশের রাস্তাটা দিয়ে তারপর বাঁ দিকে বেঁকে সোজা। চলুন দেখাচ্ছি।"

"আবদুল আগে ক্যামাক স্ট্রিট দিয়েই চলো।"

আবদুল গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল। মিহির কীভাবে শুরু করবে, সেটা ভাবতে লহমাও সময় নিল না।

"তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন যে দিদি ঘুমোচ্ছে।"

"সে কী, বলেছি নাকি!"

পুষ্প যে মিথ্যে বলেছে তাতে সন্দেহ নেই তার।

সম্ভবত এই রকমই নির্দেশ ছিল। তাকে এরা ভালভাবে নিচ্ছে না সুতরাং সাবধানে এগোতে হবে।

"তোমার দিদির মোটেই হাঁপানি নেই। দিব্যি তো উঠে বেড়াচ্ছেন।"

"সত্যিই আছে, আমি এসে থেকে দেখছি, সে কি আজকের কথা...এবার বাঁ দিকে।"

"আবদুল বাঁয়ে...তুমি তো অনেকদিন আছ, জানও অনেক কিছু, আমি কী জন্য আসছি তা-ও বুঝতে পারছ..."

গাড়ি ক্যামাক স্ট্রিটে ঢুকল। মিহির ঠিক করে ফেলেছে আর ধানাই পানাই করে সময় নষ্ট নয়। হাতে সময় কম, পুষ্প চালাক মেয়েমানুষ সুতরাং সরাসরি কথা বলাই ভাল।

"তুমি যদি সাহায্য করো।" ট্র্যাফিকের ভিড়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। পুষ্প মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে পাশের এগারোতলা বাড়িটার দিকে তাকাল।

"এখানে আমার ভায়ের ছেলে কাজ করত একটা আপিসে, ছ'তলায়।"

"করত।"

"হ্যাঁ, বেয়ারার কাজ করত। চুরি করে চাকরিটা গেছে। একপাল ছেলেমেয়ের সংসার। আসে আমার কাছে মাঝে মাঝে...আমি কোথা থেকে সাহায্য করব, আমার হাতে কি টাকাকড়ি আছে না মাইনে পাই?"

পুষ্প অসহায়ের মতো মিহিরের দিকে তাকাল, গাড়িটা ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে। ভাইপো এবং এই, গাড়িঅলা লোকটি দু'জনে তার সাহায্যপ্রার্থী এ ব্যাপারটি হয়তো এই অশিক্ষিত বৃদ্ধা ঝি-কে জমি থেকে কিছুটা উপরে উঠে যাবার তৃপ্তি দিচ্ছে কিন্তু ওর চোখের বিপন্নতাটাকে মিহিরের কৃত্রিম মনে হচ্ছে না।

"আমি তো বলেছি টাকা দেব...এবার কোন দিকে, ডাইনে না বাঁয়ে?"

"বাঁয়ে বাঁয়ে, দেরি হয়ে গেছে খুব।"

"আমি মাগনা সাহায্য নিই না।" বাঁ দিকে ঘুরে কুড়ি সেকেন্ড যেতেই দুই ফটকওয়ালা পুরনো এক বিরাট বাড়ির সামনে পুষ্প গাড়ি থামাতে বলল।

"ডাক্তারের কাছে বেশিক্ষণ তো লাগবে না আমি অপেক্ষা করছি তুমি এসো...টাকার কথাটা বলব।"

মিহির দ্রুত দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। পুষ্পকে আর কথা বাড়াতে দিতে সে চায় না।

"দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি যাও আমি এখানেই থাকব।"

পুষ্প কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই মিহির গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করেই হাত নেড়ে ওকে যেতে বলল। পুষ্প ফটকের মধ্যে ঢুকে গেল।

বহুক্ষণ সে সিগারেট খায়নি। ব্রিফকেস থেকে প্যাকেট বার করতে করতে অনুভব করল গলা শুকিয়ে রয়েছে। উদ্বেগ থেকে উত্তেজনা এবং তারই ফল এটা। এই সব ব্যাপারগুলোর মধ্যে যাওয়ায় ডাক্তারের বারণ আছে। কিন্তু ডাক্তার কি জানে পত্রিকা সম্পাদনের দায়দায়িত্বটা কেমন, সার্কুলেশন নেমে গেলে কি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে তার সঙ্গে হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের আপেক্ষিক সম্পর্কটা কেমন?

"আপনার উচিত যতটা সম্ভব রিল্যাক্স করা...সকালে ঘাসের উপর খালি পায়ে বেড়াবেন, মিনিট পনেরো শবাসনে থাকবেন তা হলে প্রেশারটা নর্ম্যাল হয়ে আসবে...সিঁড়ি ভাঙবেন না...সিগারেট খাওয়া ছাড়ুন, ড্রিঙ্ক করেন?..."

এই সব ছক বাঁধা কথা ডাক্তারেরা কবে যে বলা বন্ধ করবে। রিল্যাক্স করলে এই গাড়ি চড়া, ছ'শো টাকার ফ্ল্যাটে থাকা, চাকর-ঝি রাখা, নিয়মিত হাজার তিন-চার ক্যালোরির খাদ্য, এ-সব আর জুটত না। বাসন মাজতে হত মাকেই, আরতি নিজের টাকায় ঠিকে ঝি রেখেছিল।

মিহির আবার বোধ করল সে রেগে উঠছে। এইবার হয়তো ডাক্তারের কি ছায়ার কি হিরণ ভটচাজেব সঙ্গে কথোপকথন শুরু হয়ে যাবে। তার থেকে নেমে পড়ে কোলড ড্রিংকসের খোঁজ করা ভাল।

"আবদুল, পানের দোকান টোকান দেখতে পাচ্ছ কি? গলাটা শুকিয়ে গেছে।"

"আর দুটো বাড়ির পরেই আছে।"

"খাবে নাকি?"

"না।"

নামতে চাইল না, হয়তো আর একটু ঘুমিয়ে নেবে। ছায়াও বোধহয় দুপুরে ঘুমোয়। তার নিজেব যৎসামান্য ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। ডাক্তার বলেছে রিল্যাক্স করতে। সকাল দশটায় বেবিয়ে বাত দশটায় ফেরার মধ্যে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হবারও সুযোগ আসে না। পরিশ্রমী হিসাবে তার নাম আছে। পরিশ্রম ছাড়া কি...কিন্তু একটু ঘুমিয়ে নেওয়া রোজ দুপুরে দরকার। বয়স হচ্ছে .চুয়াল্লিশ হবে নভেম্বরে।

হিরণ ভটচাজের ঘরে একটা ইজিচেয়ার আছে। নিশ্চয় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। একটা থেকে দেড়টা ওর ঘরে যাওয়া বারণ, টেলিফোন করাও।

অনন্ত মুখুজ্জেও নাকি দুপুরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিত। লেবরেটরি থেকে বেরিয়ে, বুড়ো ঘুরঘুর করে হেঁটে নিশ্চয় চলে আসত। মালতী দত্ত হয়তো মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াত, তা ছাড়া আর কী করবে।

পানের দোকানের আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মিহির টান দিল স্ট্রয়ে। তার সঙ্গে ছায়ার বয়সের তফাত প্রায় পনেরো বছরের কিন্তু সে-জন্য ও কি কখনও অতৃপ্ত থেকেছে? তবে ওর কোনও দাবি নেই। গত দু'সপ্তাহ বাড়ি ফিরেই সে বিছানায় পড়েছে আর একঘুমে রাত কাবার করেছে। বিছানায় উঠে বসার ক্ষীণ শব্দটা উঠলেই সে খাবার জায়গা বা রান্নাঘর থেকে শুনতে পেয়েছে: "বুবাই, খবরে কাগজ দিয়ে এসো বাবুকে।" এরপরই গরম চা নিয়ে ঘরে আসবে ছায়া।

মিহির আবার আয়নায় তাকিয়ে খালি বোতলটা এগিয়ে ধরল দোকানির দিকে। থুতনির তলায় চামড়া আলগা হয়ে ঈষৎ ঝুলে পড়েছে। গলায় চর্বি জমেছে মুখ নামালে দু'-তিনটে থাক পড়ে, পেটটা অনেক বেড়ে গেছে, মোজা পরতে পা তুললে পেটে চাপ পড়ে।

অথচ হস্টেলে থাকার সময় সে আর প্রণব প্রতি ভোরে স্বাস্থ্য-সমিতিতে যেত। প্রতি সাতদিন অন্তর ফিতে দিয়ে বুক, কোমর, বাইসেপ মাপত দু'জনে। ফিগারের জন্যই সে সুহাসদার চোখে পড়েছিল রিহার্সালে।

"পারবে না কেন? আরতি এমন আর কী অ্যাকট্রেস যে তুমি ওর অপোজিটে পার্ট করতে ভয় পাচ্ছ? এত নার্ভাস কেন? ওঠো, আরতি তুমিও ওঠো, দেখা যাক মিহিরকে দিয়ে হয় কি না।"

মিহির পাশে তাকাল। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে গাড়িটা। আবদুল একটা কনুই জানলায় রেখে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে। পুষ্পর কাজ শেষ হয়নি ডাক্তারের সঙ্গে। ফি দেবে না, ওকে অপেক্ষা করতেই হবে।

কয়েক পা এগিয়ে রাস্তার অপর দিকে ব্রিটিশ কাউন্সিল। প্রণব তাকে প্রথম এখানে এনেছিল। তখন লাইব্রেরি বাড়িটা তৈরি হয়নি, পঁচিশ বছর আগে তো বটেই। বটানির ছাত্র প্রণবের অসম্ভব কৌতূহল ছিল গাছপালা সম্পর্কে। পাঁচিলের ধারে লাল পাতার গাছ দেখিয়ে বলেছিল: "তুই তো গ্রামের ছেলে, বল তো এটার নাম কী?"

মিহির পারেনি।

"ডাগর কুসুম। কচিপাতা খোল হয়। এর তেল চামড়ার রোগে কাজ দেয়। ল্যাটিন নাম সিলখেরা ত্রিজুগা।"

এখনও মনে আছে। মিহির বিড় বিড় করল "সিলখেরা ত্রিজুগা।"

একটা লিকলিকে, ফাটা ফাটা মোটা ছাল, কাঁঠালপাতার মতো পাতাগুলো সাদা ফুলের গাছ দেখিয়ে বলেছিল, "এটা তুই বলতে পারবি না...এর নাম সুলতান চাঁপা, ক্যালোফিলাম ইনো বিলাস।"

আশ্চর্য এটাও মনে আছে। মিহির রাস্তা পার হয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পুব দিকের ফটকের কাছে এল। মুখ তুলে যে-ক'টা গাছ রয়েছে তার মধ্যে খুঁজতে লাগল প্রণবের চেনানো কিছু আছে কি না। তারপর হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। প্রণবকে বলতে হবে, তোর গাছগুলো আছে কি নেই একবার দেখে আয়। পরশু ও ফোন করেছিল, পায়নি। আবার হয়তো করবে।

গাড়ির কাছে ফিরে আসছে তখন সে পুষ্পকে দেখতে পেল।

"কী বললেন ডাক্তারবাবু?"

"ডাক্তারবাবু নেই। রুগি দেখতে গেছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই। ভেতরে বড্ড গরম, লোডশেডিং।"

"তা হলে গাড়িতে বোসো, ডাক্তারবাবু এলে দেখতে পাবে।"

আগের মতো ওরা পিছনের সিটে বসল।

"তুমি মাইনে পাও না কতদিন?"

"অনেকদিন।"

"তবু?"

"প্রথম প্রথম, আমার বাপ যদ্দিন বেঁচেছিল চুপিচুপি এসে নিয়ে যেত,...পাঁচটা করে টাকা। তারপর আর দরকার হয়নি। কী হবে নিয়ে, কার জন্যই বা নেব।"

পুষ্পকে হতাশ দেখাচ্ছে। মিহির ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ওকে ঠেলে দেবার জন্য সহানুভূতি নিয়ে তৈরি হল। পুষ্পর নিশ্চয় কিছু দুঃখ আছে।

তোমার বিয়ে হয়েছিল?"

পুষ্প চুপ করে রইল। মিহির অপেক্ষা করতে লাগল ওকে অস্বস্তির মধ্যে রাখতে।

"একজনের সঙ্গে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলুম। মাসখানেক পর আমাকে ফেলে রেখে সে পালায়। বাড়ি ফিরলুম তো দাদারা তাড়িয়ে দিল, বাবা কত করে ওদের বোঝাল, দাদারা শুনল না।"

পুষ্পর গলা ভারী হয়ে আসছে। মিহির তাইতে সন্ত্রস্ত হল। এ-সব কথাবার্তার দিকে গেলে, আসল ব্যাপারের খেই পেতে অনেক সময় খরচ হবে।

"ওরা আমার খবর নেয়নি আমিও সম্পক্কো রাখিনি, আর এই মরার বয়সে বাখতেও চাই না। বাখা মানেই তো টাকা দিতে হবে।"

"তোমার নিজের তো টাকার দবকার। দিদি যদি কাল মরে যায় তোমার কী হবে?"

"বলেছে ঘরের সব জিনিসপত্তর আমার নামে লিখে দিয়ে যাবে।"

দ্রুত কিন্তু অনিশ্চিত স্বরে পুষ্প বলল, ওর চোখে মুখে এবার উদ্বেগ ফুটেছে।

"আমিই পাব সব।"

"কী আর এমন জিনিস আছে। শুধু তো টেবলটা। আর বোধহয় পুরনো পাখা, খাট, আলমারি এইসব তো; কত আব দাম হবে? গয়না টয়না কিছু আছে কি? স্যার কিছু দেননি?"

পুষ্প মাথা নাড়ল।

"একটা ঘড়ি দিয়েছিলেন, দিদির শোবাব ঘরে আলমারিতে তোলা আছে, চলে না।"

"নগদ টাকা? তোমাদের সংসার তা হলে চলে কী করে?"

"নীচের ঘরের ভাড়া চারশো টাকা, তাইতে চালাতে হয়। এ-বাড়ি তো দিদির নয়, তবে স্যার লেখাপড়া করে দিয়ে গেছেন; যদ্দিন দিদি থাকবে তদ্দিন বাড়ি দিদির...ভাড়াটেরা লোক ভাল, মাস মাস ঠিক সময়েই টাকা দেয়।"

"দিদি মারা গেলে তোমায় বাড়ি ছাড়তে হবে।"

পুষ্পর মাথাটা দুলে উঠল মাত্র। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে। মিহির ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল রাস্তা পার হবার জন্য পেরাম্বুলেটর নিয়ে একটি আয়া ফুটপাথের কিনারে দাঁড়িয়ে দু'ধারে তাকাচ্ছে অধৈর্য ভরে। কালো গায়ের রঙে সাদা শাড়িটা আরও সাদা দেখাচ্ছে। খোঁপায় হলুদ ফুল। পঁয়ত্রিশের মতো বয়স। পৃথুল গড়ন। পেরাম্বুলেটরে সাত-আট মাসের একটা ধবধবে বাচ্চা অপার বিস্ময়ে চলমান মোটরগুলির দিকে তাকিয়ে।

পর পর মোটর চলেছে কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা ফাঁকও রয়েছে। একটা বড় ফাঁক পেয়েই আয়া সামনে পেরাম্বুলেটরটি রেখে প্রায় ছুটেই রাস্তা পার হতে যেতেই একটা মোটর ব্রেকের কর্কশ শব্দ তুলে মন্থর হতে হতে পেরাম্বুলেটরের ফুটখানেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবদুল বিড়বিড় করে উঠল। মোটর থেকে পাংশু দুটো মুখ বেরিয়ে আয়ার উদ্দেশে কিছু বলে গেল।

কিছুই যেন ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে আয়াটি অপর ফুটপাথে এসে উঠল রাস্তা পেরিয়ে।

"বাচ্চার বাড়ির লোক দেখলে ওর চাকরি থাকবে না।"

মিহির স্বতঃস্ফূর্তই কথাটা বলল। অনেকটা এই ধরনের একটা ব্যাপার মনে পড়ল তার।

উনুন থেকে চাটু নামিয়ে মা রুটি সেঁকছিল। হঠাৎ টলমল করে বাটু ছুটে এসে তাতানো চাটুতে পা দিয়ে ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরতে গেছল। রাত্রে থিয়েটার থেকে ফিরে বাটুর পোড়া চেটোয় বীভৎস ফোসকা দেখে আরতি চিৎকার করেছিল।

"একটা বাচ্চাকে কি চোখে-চোখে রাখা যায় না? রুটি করা কী এমন বিরাট কাজ? ঝি-চাকর হলে এখুনি...।" কথাটা শেষ কবার আগেই রগচটা আরতির সংবিৎ ফিরে এসেছিল। মিহির যখন ওকে বিয়ে করবে জানায়, মা তখন বলেছিল: "আমাদের সঙ্গে মানাতে পারবে তো।"

"কেন পাববে না, ওদের অবস্থাও তো আমাদের মতো।"

"তা নয়...লেখাপড়া বেশি জানে, রোজগেরে।"

মিহির কী জবাব দিয়েছিল এখন তা আর মনে কবতে পারছে না। নিজেকে অসংলগ্ন লাগে এই সময়।

"স্যারের কিছু চিঠিপত্র, দু'জনের ছবিটবি, আছে কি?"

স্বরটা মিহিরের নিজের কানেও রুক্ষ শোনাল। ভ্যাপসা গরম, বাতাস নেই, তার উপর গাড়ির মধ্যে বসে থাকা। কপাল থেকে ঘাম ভ্রূ টপকে চোখের কোলে, থুতনিতে পৌঁছে গেছে।

পুষ্প কথাটার অর্থ বোঝার চেষ্টায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে। পকেট থেকে টাকার ব্যাগটা বার করে নোটের সারিগুলোকে নিয়ে চিন্তা করল। কোনটা বার করবে? প্রথমেই পুষ্পকে লোভী করে তুলতে হবে।

"তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম।"

পুষ্প জড়োসড়ো হয়ে গেছে। পঞ্চাশ টাকার নোটটা মিহির ওর হাতের দিকে এগিয়ে ধরল। এইভাবে ফ্যালফ্যাল করে কেউ তাকিয়ে থাকলে তার নিজেরও অস্বস্তি লাগে, বিরক্তি ধরে।

"আছে কোনও চিঠি কি ছবি, তোমার দিদির কম বয়সের ছবি কিংবা একসঙ্গে দু'জনের...স্যার তো বিলেতটিলেত যেতেন তখন নিশ্চয় চিঠি পাঠাতেন...স্যার মাঝে মধ্যে রাতেও তো থাকতেন, কী কথা হত ওদের?... দু'জনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায়, মানে খুব কাছাকাছি হয়ে গায়ে হাতটাত দেওয়া কি চুমু খাওয়া...।"

মিহির থুতনি চেঁছে জানলা দিয়ে হাত বার করে ঘাম ঝাড়ল। পুষ্প হতভম্ব। খুব দ্রুত কথাগুলো বলা হয়ে গেছে। কিন্তু এই ভ্যাপসানির মধ্যে বসে থাকতেও তার অসহ্য লাগছে।

"টাকাটা রাখো রাখো...লজ্জার কী আছে, যদি পারো তা হলে দিয়ো আর যদি মনে টনে পড়ে তা হলে বোলো।"

মিহির হঠাৎ পুষ্পর হাতটা টেনে নোটটা ধরিয়ে দিল। আঙুলগুলো নোটটাকে আঁকড়ে ধরল এটাই সে দেখতে চেয়েছে এবং তা দেখলও।

"এ-সব উচিত নয় বাবু। দিদির কাছে অ্যাতো বচ্ছর আছি, আমাকে ভীষণ বিশ্বাস করে।"

"তা তো করবেই।"

মৃদু মোলায়েম গভীর স্বরে মিহির বলল।

"কিন্তু এখন কি স্যারকে নিয়ে তোমার দিদি আগের মতো...মারা গেছেনই তো তিরিশ বছর, এখনও কি—।"

"স্যারের ছবির সামনে দিদি রোজ ঘণ্টাখানেক বসে থাকে, ফুল দেয়।"

"ছবিটা কেমন, দেখাতে পারো...একবার দিতে পারো?"

পুষ্প মৃদু যেন শিউরে উঠল। "আপনি কি পাগল নাকি। ওই ছবি আমি দেব আপনাকে? দিদি বলে ও-ছবির জুড়ি নাকি কোথাও নেই, ওই একটাই শুধু। স্যার বিলেতে যখন গেছলেন তখন একজন তুলে উপহার দেয়। একটা বাগানের বেঞ্চে বসে ফুলহাতে হাসছেন।"

দুর্দান্ত কভার হবে। মিহিরের চোখের ওপর ত্রিকালের স্যার এ. এল. মুখার্জি শতবার্ষিক সংখ্যার প্রচ্ছদ একটা বিরাট হাসিমুখ হয়ে ফুটে উঠল। খুব কিছু সুদর্শন ছিলেন না বরং লম্বাটে, চৌকো মুখে অতবড় হাঁ-মুখ হাসলে বিশ্রীই দেখাবে, দেখাক, অনন্তলালের মুখের আড়ালে হিরণ ভিটচাজের মুখটাও সে দেখতে পাচ্ছে। ছবিটা একসক্লুসিভ।

"একবারটি, শুধু একবেলার জন্য, আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাবখন।"

মিহির ঝুঁকে পুষ্পর হাতটা ধরতে গিয়েও পারল না। সরিয়ে নিয়েছে। ও কী করে বুঝতে পারল সে হাত ধরবে। গলার স্বরে, চোখে এমন কিছু একটা ফুটে উঠেছিল কি যাতে এই অশিক্ষিত মেয়েমানুষটাও তাকে অসহায় কিংবা ফেরেব্বাজ কিংবা দুর্বল চরিত্রের ভাবতে পারে?

"ও-সব আমি পাবব না। টাকা নিন। দিদি আমাকে বোনের মতো বিশ্বাস করে...আমি পারব না।"

অনেকটা সেই ভঙ্গি। টেবলের উপর সাদা মাথাটা নাড়তে নাড়তে..."অসম্ভব, কিছুই আপনাকে বলতে পারব না ..মাপ কববেন?"

"টেবলটা কী করবে দিদি মারা গেলে, বিক্রি করবে?...দিদি ওটা কত দিয়ে কিনেছে?"

"দিদি কিনবে কেন! স্যার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সায়েব বাড়ির নিলাম থেকে কিনে। তিনটে কুলিব মাথায় এসেছিল। তারপব কাণ্ড, অতবড় টেবল এই সরু সিঁড়ি দিয়ে আর ওঠে না। শেষে মিস্ত্রি এনে টেবিলেব পায়াগুলোকে খুলে ওপরে তুলে আবার লাগানো হল। এই নিয়ে দিদি কি হাসানটাই না হেসেছিল, স্যারকে খুব ঠাট্টাও করেছিল।"

উপহাব দেওয়া টেবলটার ছবি যদি ছাপানো যায় তা হলে কেমন হয় এই গল্পের সঙ্গে? মিহিরেব হাসি পেল। এই দিয়ে কি দু'জনের অন্তরঙ্গতা বোঝানো যাবে, সম্পর্কের গভীরতা রোমান্স বা সেক্সের আভাস? তক্তা আর পায়া সর্বস্ব ভারী একটা টেবলমাত্র, হত যদি রবীন্দ্রনাথ কি গান্ধীর টেবল তা হলে ববং...।

পুষ্পর মুখে তিরতির হাসি সেদিনের স্মৃতির ছোঁয়া লেগে শুকনো তোবড়ানো মুখের কুঞ্চিত চামড়া ভরাট মসৃণ হয়ে উঠেছে। মিহিরের পক্ষে এটা বিপজ্জনক। পুষ্পকে এ-ভাবে পিছনে হটতে দিলে সে এমন এক সুখের পিছল কিনারে চলে যাবে। সেখান থেকে বর্তমানের বাস্তবে ওকে টেনে আনতে অনেক সময় ব্যয় হবে।

"টেবলটা আমি কিনব, পাঁচশো টাকা দাম দেব।"

আবার সেই বিস্ময় ওর মুখে ফিরে আসছে। পাঁচশো টাকাব অনেক বেশি দাম কিন্তু ওর কাছে এটা অকল্পনীয়।

"তুমি ছবিটা দিতে পারবে না?" মিহির ব্যাগটা একটু ফাঁক করে স্থির দৃষ্টিতে ভিতরের নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

"চাও তো টেবলের দামটা আগামই তোমাকে দিতে পারি...না না দিদি একদমই জানতে পারবে না। টেবলটা তো তোমার কোনও দরকারেই লাগবে না, ছবিটবিগুলোও।"

"দিদি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন কোনও জিনিসই আমার নয়।"

"সে আর কদ্দিন। দিদি তো আর অনন্তকাল বেঁচে থাকবে না. .বড়জোর এক বছর, দু'বছর!"

মিহির প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করল। মুখটি ফ্যাকাশে। চোখের পাতা দ্রুত কয়েকবার পড়েই স্থির। রগের

উপর শিরা ফুলে উঠেছে। গলার নলি ওঠানামা করল। ভিতরে কিছু একটা শুরু হয়েছে যেটা ওর শীর্ণ ছোট্ট দেহটিকে আরও ছোট করে দিচ্ছে।

"তারপর তুমি কোথায় গিয়ে উঠবে? কপর্দকশূন্য হয়ে শেষ জীবনটা কোথায় কাটাবে? যা দেখছি, তাতে তো তোমায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে। বরং কিছু টাকা হাতে নিয়ে ভাইপোর কাছে গেলে সে তবু টাকার লোভে অন্তত শেষ জীবনটায় দেখাশুনা করবে, ঠিক কি না?"

পুষ্প একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে। মিহিরের মনে হল চিন্তাটা সে ওর মাথায় প্রথম আনল না, আগে কিছু কিছু ভেবেছে। হাতের নোটটা একইভাবে ধরা তবে আঙুলগুলো শুঁয়োপোকার মতো নড়ছে।

"না খেতে পেয়ে রোগে ভুগে রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে আর ডোমে তুলে নিয়ে গিয়ে পোড়াবে, এ-জন্যই কি সারা জীবন দিদির সেবা করে গেলে?...তোমায় তো চুরি করতে বলছি না, ছবিটবি কি চিঠি কি খাতা কি বই যদি পাই আমরা তার ছবি তুলে নিয়েই আবার চুপচাপ ফেরত দিয়ে দেব, ঘণ্টা দুয়েকের মামলা।"

"দিদি কিছুদিন আপন মনে একটা খাতায় কী সব লিখত, ছিঁড়ে ফেলে দিত, আবার লিখত।"

"কী লিখত?"

"তা জানি না বাপু।"

"দ্যাখো-না যদি জোগাড় হয়।"

"দিদির সব জিনিস তো দেরাজে, চাবি দেওয়া...স্যারের রুমাল, চটি, কলম, একটা ভাঙা চশমাও...ওটা দিদিই ভেঙেছিল।"

পুষ্পর মুখে আবার স্মৃতির ছোঁয়া. সম্ভবত চশমা ভাঙার পিছনে কোনও গল্প আছে। থাকুক।

"খাতাটা অনায়াসেই জোগাড় করতে পারো।"

"আছে কি না কে জানে। আর তো লিখতে দেখি না।"

"দিদির কম বয়সের ছবি আছে?"

পুষ্প ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, "একটা ছবি আছে তবে বড্ড ময়লা। তাতে মেলাই লোক। প্রায় জনা পঁচিশ, তার মধ্যিখানে স্যার বসে। দু'পাশে, পিছনে ওঁর ছাত্তর টাত্তর। এককোণে দিদি দাঁড়িয়ে। তার পাশে দারোয়ান রামবিলাস দিদিকে প্রায় আড়ালই করে দিয়েছে।

"মুখটা দেখা যাচ্ছে?"

"তা যাচ্ছে।"

"ছবিটা চাই।"

মিহির শক্ত হয়ে উঠল। রক্ত দ্রুত ছুটে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডের দিকে। স্যার অনন্তলালের প্রেমিকার ছবি, গ্রুপ ফোটোর মধ্যে ছোট্ট মুখ ব্লো-আপ করে নেওয়া যাবে'খন। পুরনো ছবি হয়তো আবছা আসবে; রিটাচ হয়তো দরকার হবে...ও কিছু নয়। কেউ জানে না, কেউ ভাবেওনি এমন একটা ব্যাপার ওই রসকষহীন লোকটার জীবনে থাকতে পারে। আমি ভেবেছি।

"তোমার কোনও ছবি আছে তখনকার?"

"নাহ্, আমার আবার এই চেহারায়...", পুষ্পর স্বর আবেগহীন শুকনো।

"ছবিটা জোগাড় করে দাও। কাল আমি গাড়ি নিয়ে তোমাদের গেটের কাছে থাকব। বলো কখন?"

"না বাবু, হবে না ও-সব।"

"আরও পঞ্চাশ দিচ্ছি।"

মিহির ব্যাগ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেবার মতো করে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করল। তার হাত কাঁপছে।

একটা ট্যাক্সি তাদের কিছু দূরে মুখোমুখি হয়ে থামতেই পুষ্প গ্রীবা তুলে সিধে হয়ে বসল।

"বোধহয় ডাক্তারবাবু এলেন।"

দীর্ঘদেহী, কৃষ্ণকায় ঘাড়ে গর্দানে একটি লোক নামল ট্যাক্সি থেকে। হাতে ব্যাগ এবং স্টেথোস্কোপ। পুষ্প দরজা খোলার জন্য হাতলটা ধরে কোনদিকে ঘোরাবে বুঝতে পারছে না।

"খুলে দিন, ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।"

"কাল কখন যাব? দিদি যখন ছবির সামনে বসে...তুমিই তো বললে এক ঘন্টা প্রায়...সকালেই নিশ্চয়...ক'টায়?"

মিহিরের গাড়িতে আলতো চোখ বুলিয়ে ডাক্তার ফটক দিয়ে ঢুকে গেল।

"খুলে দিন।"

"তা হলে আটটায়...আচ্ছা সাতটায় আমি থাকব।"

মিহির ওর হাতটা টেনে নোটটা মুঠোয় ভরে দিয়ে, ঝুঁকে দরজাটা খুলে দিল।

"টাকা তোমার খুব দরকার। এটা মনে রেখো।" পুষ্প যখন নেমে যাচ্ছে সে আবার বলল: "দ্যাখো-না চেষ্টা করে...তা হলে কাল যাচ্ছি।"

জবাব না দিয়ে বৃদ্ধা হনহনিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মিহির তাকিয়ে রইল, একবারও মুখটা ফেরায় কি না দেখার জন্য। কিন্তু পুষ্প পিছনে তাকায়নি।

কী পরিস্থিতির মধ্যে এখন তা হলে সে রইল। কাল সকাল সাতটায় গেলে এই বুড়িটাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখবে কি দেখবে না?

"আবদুল অফিস চলো।"

দুই

অপেক্ষা করছে কৃষ্ণেন্দু। করিৎকর্মা ছোকরা, নিশ্চয়ই ইন্টারভিউগুলো পেয়ে গেছে। অনন্তলালের গবেষণা এবং প্রকাশ্য জীবন সম্পর্কে অনেকগুলো লেখা জোগাড় হয়েছে। এ-সব এতই সাধারণ আর জানা ব্যাপার, সব পত্রিকাতেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু যেটা পাওয়া যাবে না...মিহির কুঁজো হয়ে সিটের মধ্যে গুটিয়ে গেল। ডান তালু দিয়ে মুখটা চেপে আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। একটা অশিক্ষিত বুড়িকে সে কায়দা করতে পারল না অথচ ওকে মুঠোয় আনার সব রকম সূত্রই—অসহায়, কপর্দকশূন্য, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং অদূরে মৃত্যু; সব জিনিসই সাজানো রয়েছে। সময় দিতে হবে। পুষ্পর মাথায় সবই সে ঢুকিয়ে দিয়েছে। নোট দুটো যদি ফিরিয়ে দিত তা হলে আর একটু চিন্তায় পড়তে হত। নিয়েছে যখন, একটা কিছু পাওয়া যাবেই।

রিল্যাক্স...ডাক্তার বলেছে সহজ স্বচ্ছন্দ হওয়া দরকার। তাই তো হতে চাই। মিহির প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে, আবার ভরে রাখল, ডাক্তার সিগারেট খাওয়া কমাতে বলেছে। বিজ্ঞাপনে তো বলে আরামে জিরোতে হলে সিগারেট খাও। ডাক্তার নিজেও খায়।

চৌরঙ্গি দিয়ে যাবার সময় মিহির লক্ষ করল মেট্রো রেলের জন্য খোঁড়া জমি থেকে তোলা মাটির ঢিপিতে রীতিমতো জঙ্গল। ওর মনে হল, এখানে জঙ্গল থাকা ভাল। কলকাতা তা হলে একটা মাত্রা পাবে। শহরের একঘেঁয়ে চরিত্রে নতুন সংযোজন দরকার। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কিছু এলোমেলো অনাসৃষ্টি ঘটিয়ে দেওয়া উচিত। গ্রামের কিছু ব্যাপার স্যাপার এখানে থাকা ভাল। জীবনেও। যেমন আরতির পর ছায়া।

পরস্পরবিরোধী ব্যাপারগুলো অহরহ আক্রমণ করছে। তার মনে হচ্ছে, সে নিজেও সমানমাত্রায় ধারাবাহিক থাকতে পারছে না। ধানমুড়ি থেকে কলকাতায় এসে গত তেইশ বছরে তার জীবন বহুবার স্তর পালটেছে। বহুধারা-উপধারায় তার জীবন ফেঁপেছে বা শুকিয়েছে, তার সঙ্গে-সঙ্গে মাত্রাচ্যুত হয়েছে। ধানমুড়িতেই থেকে গেলে হয়তো 'রিল্যাক্স' শব্দটা দরকার হত না। গ্রামে ক'জনের আর হার্ট-ট্রাবল হয়।

গাড়ি যখন ত্রিকাল অফিসের সামনে থামল মিহিরের তখন মনে পড়ল সে নানানভাবে লোকটির নাম ভেবেছে বা বলেছে—স্যার, অনন্তলাল, স্যার এ এল মুখার্জি, স্যার অনন্ত বা শুধুই অনন্ত এবং বুড়োটা।

ঘাড় নামিয়ে গভীর মনোযোগে কৃষ্ণেন্দু টেপরেকর্ডারে শুনে যাচ্ছে শ্লথ, ভারী, শ্লেষ্মাজড়ানো এক কণ্ঠস্বর। হাতে জটার কলম, টেবল প্যাড। মিহিরকে দেখামাত্র রেকর্ডার বন্ধ করল।

"ডক্টর প্রসাদ সিনহার ইন্টারভিউ।"

"কী বলল?"

"অনন্ত মুখুজ্জের গবেষণা সম্পর্কেই বেশি বলল।"

"জানে কিছু?"

"জানবে না কেন, অনেক বছরই তো অনন্ত মুখুজ্জের সঙ্গে কাজ করেছে।"

"করেছে তো সে-সব ছেড়ে ডাক্তারিতে পয়সা করার দিকে গেল কেন? গবেষণাতেই লেগে থাকল না কেন? জিজ্ঞেস করেছিলে?"

কৃষ্ণেন্দুকে অপ্রতিভ দেখাচ্ছে। মিহির চেয়ারে বসার আগে জানলার কাছে গিয়ে নীচের উঠোনে তাকাল। হিবণ ভটচাজের খুদে, রংচটা মরিস মাইনরটাকে দেখতে পেল না।

"ও-সব কথা জিজ্ঞেস করলে বুড়ো চটে যেত, তা হলে আর মুখ খোলাতে পারতাম না।"

"বয়স কত হল, এখন করে কী?"

"পঁচাত্তরে পড়েছে। রুগি আর দেখে না; ছেলেও এম আর সি পি, বাপের নাম ভাঙিয়ে পসার জমিয়ে ফেলেছে। ডক্টর সিনহা আর তার বউ এখন ধম্মোকম্মো গুরুদেব এইসব নিয়ে দিন কাটায়।"

"লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে ডাক্তারি করে, খুব নামকরা ছিল...অনন্ত মুখুজ্জের ফেবারিটদের একজন...শুনি কী বলল।"

বিরাট বাড়িটার পিছনের অংশে প্রেস। ত্রিকাল সম্পাদকের ঘর বাড়ির সামনের দিকে দোতলায়। মেশিনের শব্দ এখানে আসে না। বাড়িটার মাঝখানে সিমেন্টের বিরাট উঠোন। সেখানে লরি বা ভ্যানেব কিছু শব্দ ছাড়া বাইরে থেকে যেটুকু এই ঘরে আসে তা দূরে ট্রাম চলাচলের বা নীচের তলায় ভারী ড্রাম বা কাগজের রিল রাখাব জন্য।

মিহির ভিজে রুমালটা পাখাব তলায় রেখে পেপার ওয়েট চাপাল তার উপর। কৃষ্ণেন্দু টেপ গুটিয়ে নেওয়ার কাজ সেরে নিতে নিতে বলল: "আপনার ফোন এসেছিল। প্রণব দত্ত।"

"কী বলল?"

"জরুরি দবকার, আপনাকে যেতে বলেছে ব্লু মুনে, ডান দিকে কোণেব টেবলে অপেক্ষা করছে।"

মিহিরেব সর্বাগ্রে মনে এল, ব্লু মুন এয়ার কন্ডিশনড। তাবপর মনে হল, অপেক্ষা করছে মানে প্রণব মদ খেয়ে যাচ্ছে হয়তো ঘণ্টা দুই-তিন ধবে।

"জেনেটোট্রোফিক ডিজিজ কথাটাব যে কী বাংলা হবে আমি জানি না..."

কৃষ্ণেন্দু টেপ চালিয়ে যন্ত্রটা এগিয়ে দিল মিহিরের দিকে। ভালই বেকর্ডিং হয়েছে। এ-সব কাজে ওর জুড়ি নেই। গদ্যটাও মোটামুটি। নাদুসনুদুস বোকা মুখ, দেখে বোঝা যাবে না কতটা ধূর্ত। একদিন এই ধূর্তটাই হয়তো ত্রিকালের সম্পাদক হয়ে এই চেয়ারে বসবে।

"এই রোগে আক্রান্ত তাদেরই বলা হয় যাদের বোধবুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি, শবীরের ও মনের ক্রিয়াকলাপে অস্বাভাবিকত্ব রয়েছে। এই ধবনেব রোগ যাদের হয় তাদের দরকার বেশি পরিমাণে মিনারেল বেশি পবিমাণে ভিটামিন, কেমন...স্যারের গবেষণা হল এই জেনেটোট্রোফিক কনসেপ্টের বা ধারণার একটা ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা যা দিয়ে বোগীর বায়োকেমিক্যাল স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করা যাবে; কেমন. .ধারণা বলতে বোঝায়, রোগাক্রান্তের জেনেটিক ধরনটা কী সেটা বার করে নিতে পারলে সেইমতো তাকে পুষ্টি সবববাহ দেওয়া যাবে—কত বেশি ভিটামিন বা মিনাবেল তার দরকার সেটা তা হলে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে, কেমন . স্যার দেখিয়েছেন এইসব রোগ প্রতিরোধ সম্ভব যদি খাদ্যের সঙ্গে বাড়তি নিউট্রিয়েন্টস দেওয়া যায়।"

"তিনি কি এটা প্রমাণ করেছেন, মানে পরীক্ষা করে ফল পেয়েছিলেন?"

"বছব সাতেকের একটা বাচ্চা ছেলে সারের ট্রিটমেন্টে ছিল। কথা বলতে পারত না, নড়তে চড়তে পাবত না, আই কিউ ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ। দু' বছর ধরে স্যার ওকে ভিটামিন, মিনারেল, এইসব দিলেন। তারপর একেবারে আশ্চর্য ফল দেখালেন। বাচ্চাটা ক্রমশ নরম্যাল হতে শুরু করল। পড়তে শিখল, লিখতে শিখল, অল্প-অল্প হাঁটতেও শুরু করল। দুষ্টুমিও করত। তারপর সাইকেল চালানো শিখল, আই কিউ দাঁড়াল প্রায় নব্বুই। এই সময়েই স্যার মারা গেলেন।"

"আর কেউ তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে গেলেন না।"

চুপ।

"শোনা যায় ওঁর নাম নাকি নোবেল প্রাইজের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিল।"

"মানে কথাটা ঠিক...এ-রকম একটা তখন রটেছিল বটে,...তবে নোবেল প্রাইজ পাবার মতো অত বড় কাজ তো এটা নয়...আমাদের দেশ জানেনই তো, হইহই করার মতো কিছু পেলে...অতবড়, তেমন কিছু নয়। আসল ব্যাপার..." ফিসফিস হল কণ্ঠস্বব, "মেন্টাল ফাংশানের সঙ্গে পুষ্টিকর খাওয়া টাওয়ার কোনও যোগ আছে, এটার কোনও নির্ভেজাল প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। শুধুই স্পেকুলেশন চলছে।"

মিহির হাত বাড়িয়ে রেকর্ডারের বিড টিপল বন্ধ কবতে।

"এ-সব শুনে আমাব কোনও লাভ হবে না এখন। আব কিছু পেলে? যা বলেছিলাম জিজ্ঞাসা করেছ?"

"বুড়ো কিছু ভাঙতে চায় না মিহিরদা। তবে মালতী দত্তর নাম শুনেই মুখটা কেমন যেন মোচড়াল, 'ওহ্ দ্যাট উওম্যান'..বললাম উনি কে ছিলেন, কী কাজ করতেন, স্যারের যেন ওঁর প্রতি দুর্বলতার মতো ছিল, যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন কবেছি কিন্তু কী রকম কাটাকাটা নিরাসক্ত জবাব দিল, কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্য ঘৃণার ভাব।"

"মনে হল কি কিছু জানে-টানে? বলল কি?"

"যা বলল, তাতে বুঝলাম, মালতী দত্ত ওখানে শুধু চাকরি করতেন, স্যার অনন্তলাল সম্পর্কে অদ্ভুত এক দুর্বলতা ছিল যে-জন্য অন্য কোনও ছেলে-ছোকবা কাছে ঘেঁষতে চাইলেও উনি পাত্তা দেননি।"

"তাব মানে কেউ কেউ মালতী দত্তর সঙ্গে প্রেম করতে চেয়েছিল। তখন ওকে দেখতে কেমন ছিল?"

"তা আব জিজ্ঞাসা করিনি।"

"তোমাব কী মনে হল? ডক্টর সিনহাও ঘেঁষতে চেয়ে পাত্তা পায়নি বলেই কি মালতী দত্ত সম্পর্কে তাচ্ছিল্য দেখাচ্ছে?"

"হতে পাবে। আমাকে বলল, স্যাব অনেক উপরে উঠতে পারতেন কিন্তু ওই মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে কেমন গেঁতো হয়ে গেলেন, ওকে সারভেন্ট কোয়ার্টারে এনে রাখলেন, ওখানেই মন পড়ে রইল স্যারের কাজে ঢিলেমি এল।

"ডঃ সিনহা এর বেশি আব বলতে চাইল না। প্রশ্ন করতে গেছি, দেখি বিরক্ত হচ্ছে, তিরিশ-চল্লিশ বছব আগেব ব্যাপার তো, তাই আর এগোলাম না। শুধু একবার বলে উঠেছিল, "মালতী দত্ত তো শুনেছি বেঁচে আছে, তাকে গিয়েই জিজ্ঞেস করুন না স্যাবেব কথা..."

"ভাল স্টোরি হয় মিহিবদা। এ-সব কথা যখন হচ্ছিল তখন আমাকে টেপ রেকর্ডার বন্ধ রাখতে বলেছিল। বারবার তাকাচ্ছিল রেকর্ড কবছি কি না দেখতে।"

টেলিফোন বেজে উঠল। মিহিব রিসিভার তুলল।

"হ্যাঁ, মিহির বলছি।"

"প্রণব।"

সেকেন্ড পাঁচ দু' দিকেই চুপ। প্রণবের অবস্থাটা কেমন, ওই একটা শব্দে মিহির আন্দাজ করতে পারল না।

"ফোন করেছিলাম, বলেছে তোকে?"

"হ্যাঁ।"

"কী কচ্ছিস এতক্ষণ, চলে আয়।"

প্রণব একটা বড় কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সেলসে উপরের দিকের অফিসার। মিহিরের মতোই একদা কর্মজীবনে অসম্ভব পরিশ্রম করে ঠেলে ঠেলে উপরে উঠেছে। রাইটার্সের এক সেক্রেটারির মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে যখন ও বিয়ে করল তখন আরতি সদ্য ডিভোর্স নিয়েছে মিহিরের কাছ থেকে। নীপা চমৎকার মেয়ে, বেশ ইংরেজি বলে এবং জলের মতো সহজ মন। যে পাত্রে রাখা যাবে সেই

আকার নেবে। একটু আদুরে মনুষ্যাকৃতি মোমের পুতুলই বলা যায়। প্রণব ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে। প্রণব তখনও মদ খেত না। মাসখানেক আগে নীপা টেলিফোনে বলেছিল, প্রতি রাতে চুর হয়ে প্রণব ফেরে।

"ব্যাপার কী, নিশ্চয় দুপুর থেকে চলছে।"

"জাস্ট তিনটে খেয়েছি। চলে আয় অনেক কথা আছে, পারিবারিক।"

"সে আবার কী?"

"নীপা ফোন করেছিল?"

"শেষ বোধহয় দিন দশ আগে।"

"কিছু বলেছে কি আমাকে নিয়ে?"

"তেমন কিছু নয়তো, তুই বাত করছিস ফিরতে, ও দুশ্চিন্তায় থাকে অ্যাকসিডেন্ট হল কি না ..এইসব।"

"এখুনি আয়, জরুরি কথা আছে।"

বিসিভার রেখে মিহির দেখল কৃষ্ণেন্দু তার দিকে তাকিয়ে।

"মিহিরদা আপনি এখন বেরোবেন তো! আমি তা হলে ডক্টর সিনহার স্টোরিটা করে ফেলি।"

"করো। প্রাণগোপালকে মনে করিয়ে দিয়ো মালতী দত্তর আর ওর ঝি'র ছবি, ঘরের যাবতীয় আসবাব...ডাইনিং টেবলটা যেন ভাল করে নিতে না ভোলে, কালপরশুর মধ্যেই যেন সেরে ফেলে। এবারের আর্ট পুলটা দেখেছ...গোলমাল নেই তো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ব্রিফকেসটা তুলে নিল। কৃষ্ণেন্দু পাকা এ-সব ব্যাপারে।

মিহির গাড়ি নিল না। এইসব ক্ষেত্রে সে আর নেয় না। হিরণ ভটচাজ একবার কথা প্রসঙ্গে, নম্রস্বরেই বলেছিল: "আবদুলের বাড়ি ফেরার শেষ ট্রেন সাড়ে এগারোটায়। ওকে যদি সাড়ে দশটার মধ্যে ছেড়ে দেন...গাড়ি গ্যারেজ করে ওকে শেয়ালদায় যেতে হবে তো...আপনি তো ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরতে পারেন।"

আবদুলকে ওভারটাইম দিতে হয় রাত সাড়ে দশটার পর রাখলে। মিহির ওইদিনই ঠিক করেছিল নিজে গাড়ি চালানোটা শিখে নেবে। অবশ্য তা হলে মদ খাওয়া কমাতে হবে, কি বন্ধ করতে হবে। আবছা অসাড় বোধ নিয়ে গাড়ি চালানো উচিত নয়।

এখন সে অ্যাকসিডেন্টে যদি মারা যায়, তা হলে বুবাই, ছায়া আর মা কোথায় দাঁড়াবে? হিবণ ভটচাজ নিশ্চয় ফ্ল্যাটের ভাড়া গুনবে না। এক মাসের অ্যাডভান্স দেওয়া আছে, ওই এক মাসই ওরা থাকতে পারবে। ছায়াকে নমিনি করে পঁচিশ হাজার টাকার একটা লাইফ ইনসিওরেন্স আর ব্যাঙ্কে হাজার বারো বোধহয়। এইসব টাকা হাতে পেতে পেতেও তিন-চার মাস কি এক বছর।

মিহির সাবধানে রাস্তাগুলো পার হল। ফুটপাথ যতটা সম্ভব ব্যবহার করল এবং নিরুপায় না হওয়া পর্যন্ত হাঁটার জন্য বাস্তায় নামল না। সে মারা গেলে পরিবারের তিনজন—এক নাবালক ও দুই অসহায় অশিক্ষিত বুদ্ধিহীন স্ত্রীলোকের জীবন কীভাবে কাটবে, এটা অনুমান করাব চেষ্টা থেকে বিরত রইল।

মালতী দত্ত আর পুষ্পকে তার মনে পড়ল। মা বা ছায়ার ভবিষ্যৎ, পলকের জন্য তার মনে হল এই দুই বৃদ্ধার দশা পাবে। তবে ছায়ার বাবা, ভাই, সচ্ছল ও স্নেহশীল। মা তা হলে কী করবে?

ব্লু মুন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার কালে মিহির সারাক্ষণই তার পরিবারের ভাবনায় ডুবে রইল। এই ধরনের চিন্তায় থাকাকালে সে অদ্ভুত নিঃসঙ্গ বোধ করে। তখন যত লোকের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় ঘটেছে সবাইকেই তার শত্রু মনে হয়েছে। তাবৎ মানুষই নিঃসঙ্গ একা মানুষের শত্রু নয় কি?

তার সঙ্গে এই মুহূর্তে অন্য মানুষদের মিল নেই চেহারায়। সে যে একা এটা যেন রাস্তার লোকের চাহনির মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। সে তার নিজের ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে বাস করছে, রাস্তায় যত লোক, দোকান, পসরা, গাড়ি এ-সব ছায়ামাত্র।

হঠাৎ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ভাবনাটা তার এল কী করে? হিরণ ভটচাজ না মালতী দত্ত তার অবচেতনে কাজ করছে?

রিল্যাক্স করার আদেশ আছে তার উপর। কিন্তু কোথায় কীভাবে সেটা পালন করবে? এইসব ভাবনা চিন্তা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে কোথাও যাওয়া দরকার।

ব্লু মুন বৃহদাকারের একটা ঘর, যা কাঠের পার্টিশনে দেয়াল ঘেঁষা টেবলগুলোকে আলাদা খোপ করে রাখা। থিয়েটারের বক্সের মতো দেখায় খোপগুলো।

মিহির ডান দিকে তাকিয়েই প্রণবকে দেখতে পেল। একটা খোপের থেকে প্রণব হাত তুলে তাকে ডাকছে।

প্রণবকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে। নিশ্বাসে অ্যালকোহলের গন্ধ, চাহনিটা ঈষৎ তির্যক ঘোলাটে।

"অত দেরি করলি যে, কী দেবে?"

"বিয়ার।"

"ওয়েটার। সাব কে লিয়ে বিয়ার ঔর মেরে লিয়ে হুইস্কি।"

পানীয় না আসা পর্যন্ত প্রণব চুপ করে রইল। নরম আসনে গা এলিয়ে ছাদের দিকে মুখ তুলে মিহির অপেক্ষা করে গেল।

"ছেলে ভাল আছে? ছায়া?"

"ভাল।"

দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সময় প্রণব আপত্তি করে বলেছিল, 'করবিই যদি তা হলে গাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েকে কেন?' তারও আগে, আরতি বাপের বাড়িতে চলে গিয়ে যখন ডিভোর্সের মামলা আনল, তখন বলেছিল, 'খবরদার ডিভোর্স দিবি না, লড়ে যা...আমি খরচ দোব।'

"নীপা তোকে নিশ্চয় বলেছে আমি ডিভোর্সের চিন্তা কবছি।"

মিহির অকৃত্রিম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে দেখে প্রণব চোখ নামিয়ে নিল।

"একসময় নিশ্চয়ই ওকে ভালবাসতাম, কিন্তু সে তো বছর দশেক আগে। তখন বয়স দশ বছর কম ছিল, বোধবুদ্ধিও। কী রকম একটা বাচ্চা বাচ্চা ভাব ছিল ওর মধ্যে। তুই বলেছিলি যেন ডলপুতুল...মনে আছে?"

মিহির মাথা নাড়ল। প্রণব হাসল।

"এখন সেই পুতুলের ওজন প্রায় দু'মন বুকপেট সমান। সিঁড়ি ভেঙে একতলা থেকে দোতলায় উঠে শুয়ে পড়ে। ও চায় সন্ধ্যা থেকেই আমি বাড়িতে বসে টিভি দেখি। আমার যা কাজ তাতে সম্ভব নয় সন্ধেয় বাড়ি থাকা।"

মিহির একদৃষ্টে তাকিয়ে। প্রণব বোধহয় সন্দেহ করছে, বন্ধুটির যদিও তার মুখের দিকেই চোখ কিন্তু কিছুই দেখছে না।

"শুনছিস কি?" প্রণব স্বর চড়াল। "বিয়ের পর নীপাই আমায় টেনে বার করত বাড়ি থেকে। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও মদ খেত...বাড়িতেই অবশ্য, কনজারভেটিভ ঘরের মেয়ে তো। আর এখন একটা খেলেই বমিটমি করে মাথা ঘুরে একশো কাণ্ড।"

মিহির কী যে বলবে ঠিক করতে পারল না।

"ছেলে আর মেয়ে বড় হচ্ছে। হোক। বড় তো হবেই। আমিও তো বড় হয়েছি। নিজেকে বড় কবেছি নিজেই। এবার কি নিজেব সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকারটা আমার পাওয়া উচিত নয়? সারা জীবন শুধু খেটেছি আর খেটেছি। ওদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সহজ জীবন দিয়েছি।"

প্রণবের কথা জড়িয়ে আসছে। মুখটা ঝুঁকে পড়ছে টেবলে। আধভরতি গ্লাস পড়েই রয়েছে।

"অল্প বয়সে যে বিয়ে করে সে জানেই না, জানা সম্ভবও নয়, দশ, পনেরো, কুড়ি বছর পরে সে কী করবে। কী রকম সে হয়ে দাঁড়াবে তা-ও জানে না, জানা সম্ভব কি? তুই কি জানতিস যখন আরতির সঙ্গে প্রেম করছিলিস, তোর দুটো বিয়ে হবে? নীপার আর ইন্টারেস্ট নেই সেক্সে। অথচ আমি এখন ক্ষমতার তুঙ্গে।"

মিহির তাকিয়েই রইল। মন্তব্য করার কিছুই নেই। প্রণবকে কথা বলে যেতে না দিলে গলা চড়িয়ে হয়তো তর্ক শুরু কববে।

"নীপাকে নিশ্চয় আমার ভাল লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড কামনা কখনওই অনুভব করিনি। শরীর মন দাউদাউ জ্বলে ওঠার মতো ব্যাপারটা কখনওই ঘটেনি অন্তত মাস ছয়েক আগে পর্যন্ত নয়। এটা যে কেমন ব্যাপার...জানি না তুই জানিস কি না।"

"না।"

"ওর নাম বনানী হালদার, ঠিক তিরিশ। আমাদেরই ফার্মে কাজ করে, সামনের বিল্ডিংয়ে অ্যাকাউন্টসে। প্রায় রোজই যেতে হয় আমাকে ওর কাছে। বোজ আমি সকালে ওর জন্য অফিসেব সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকি। ওকে দেখামাত্র বুকের ভেতরটা কী রকম করে ওঠে, ধকধক আওয়াজ হয়, হাত কাঁপতে থাকে। ওকে ক্লান্ত দেখালে কি চিন্তাব ছাপ মুখে দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওকে কারণ জিজ্ঞাসা করি, জানি এর কোনও মানে হয় না তবু না জিজ্ঞাসা করে পারি না। ও বলে. 'কেন, কিছুই তো হয়নি। হয়তো আমাকে এ-বকমই দেখতে।' মানেটা বুঝলি?"

"না।"

ছায়াব মুখে ক্লান্তি কি চিন্তার ছাপ পড়েছে কি না দেখার জন্য সে খুঁটিয়ে তাকাচ্ছে, এমন কোনও ব্যাপার তার ঘটেছে কি? কখনও না। ও যেমন তেমনই। শুরুতে যেমন এখনও তাই। ওই ভাবেই তো সে ছায়াকে মেনে নিয়েছে।

"দিনে পাঁচ-ছ'বার নানা ছুতোয় ওর টেবলে যাই। ও হাসে। বলে, সবাই জেনে গেছে ব্যাপারটা, হাসাহাসিও করে কিন্তু আমি কেয়ার করি না। ওকে রোজ আমার দেখা দরকাব। ও যে আছে এটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ওকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ও যে সত্যি সত্যিই বনানী, ও যে আমাবই এটা আমি বুঝতে চাই। ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছি, হ্যাঁ...কিন্তু সকালে বিশ্বাস করতে পারি না ও সত্যিই আমাকে ভালবাসে। ব্যাপারটা মনে হয় না কি অসম্ভব, সত্যি হতে পারে না। এ-ভাবে আমাব দিকে তাকাসনি মিহির। তোকে সব কথা বলতেই হবে। তুই-ই আমার একমাত্র পুরনো বন্ধু, তুই অনেক দেখেছিস, বুঝেছিসও। আমার ব্যাপাব তুই শুধু বুঝতে পারবি, নিন্দে ঘেন্না অন্তত করবি না; মব্যালিটি নিয়ে সারমন দিবি না। নীপা নিশ্চয়ই সব জানে। ওর পক্ষে ধবে ফেলাটা কঠিন নয়। এক একদিন সন্ধেয় ও আমাকে আটকে বাখে ছুতোয়। তখন খাঁচায় বন্দি জানোয়ারেব মতো নিজেকে মনে হয়। ইচ্ছে করে টিভি সেটটা ভেঙে দিই। ঘরবাড়ি চুরমার করে দিই।

"সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে বোতল থেকে ঢালছি, নীপা বিরক্ত মুখে তাকিয়ে বয়েছে, তখন ওকে বললুম, 'শোনো নীপা, তোমাকে একটু খুব দরকারি কথা বলতে চাই।"

'অন্য সময় যখন কাণ্ডজ্ঞান থাকবে তখন বোলো।'

'এখন আমার পুরো জ্ঞান রয়েছে সুতরাং যা বলব তা ঠিকই বলব। তোমাকে আমি রেসপেক্ট কবি। দশ বছব ধরে তুমি আমাব বউ, দুটো বাচ্চাও আমাকে দিয়েছ।'

'বাচ্চাদের আর টেনো না এর মধ্যে।'

'প্রেমে পড়াটা এমন কিছু লজ্জাব নয়, মানহানিকরও নয়। আমার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না, এমন কারণও ঘটবে না। তোমাকে শ্রদ্ধা করি বলেই আর তোমাকে ঠকাতে চাই না। একজনেব সঙ্গে শুয়ে এসে আবার তোমার বিছানায় শোয়া, এটা তো উচিত নয়।'

'যথেষ্ট হয়েছে।'

'পরিণতবয়স্ক লোকের মতো আমাদের এটা নিয়ে ভাবা উচিত। নিবাসক্তভাবে ব্যাপারটা দেখা উচিত।'

'এবার শুয়ে পড়ো। আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে।"

প্রণব আধভরতি গ্লাসের হুইস্কিটা একচুমুক-এ শেষ করে মিহিরের মুখের দিকে ভ্রূ কুঁচকে চোখ সরু করে তাকাল।

"ওইভাবে নীপা আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। যখন ডিভোর্সের কথা তুললাম তখন তো শোবার ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দিল। ড্রইংরুমের সোফায় রাত কাটালাম। গত দশ দিনে তিনবার এমন হল। ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখে। ওয়েটার আউর এক দফে লাগাও।"

"আমি আর খাব না।"

"কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, শুধু মেরে লিয়ে।"

প্রণব চোখ বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণের জন্য। মনে হল যেন ঘুমিয়ে পড়বে। মিহির ঘরের মাঝের টেবলগুলোর দিকে তাকাল। ভনভনে ভিড় টেবল ঘিরে। কথাবার্তার শব্দ চড়ে উঠেছে।

"নীপাকে যদি ডিভোর্সে রাজিও করাই মুশকিল হবে অ্যালিমনি আর ছেলেমেয়েদের অ্যালাউন্স নিয়ে। ঝন্টু আর ঝিনিকে ওদের মায়ের কাছেই দেব।"

প্রণব কাশতে শুরু করল। চোখ দুটো চকচক করছে। সোডার বোতলে যতটা ছিল গলায় ঢালল।

"তোর এখন তো ভালই রোজগার, বাজে খরচও নেই, জমিয়েছিস নিশ্চয়।"

মিহির কাঠ হয়ে উঠল, জবাব দিল না।

"আমি জমাতে পারিনি। ফ্ল্যাটের জন্য এখনও সত্তর হাজার শোধ করতে হবে। গাড়ি আছে, একটা ছেলে একটা মেয়ে কিন্তু অ্যাডালটের থেকেও ওদের জন্য বেশি খরচা। আমার স্ট্যাটাস অনুযায়ী নীপাকে সাজসজ্জা করতে হয়, মাসে একটা দুটো নেমন্তন্ন, ঝি চাকর—মিহির হাতে কিছুই থাকে না...এইভাবেই তো চলবে নিরবধি।"

ব্লু মুনের ঘরে কাঠের প্যানেল দেওয়ালের অর্ধেক ঢেকে রেখেছে—। চিনা ম্যানেজার, হয়তো বা মালিকই, ভিতরে রান্নাঘরে যাবার গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে, দু'হাত পিছনে। ওয়েটারদের দিকেই ওব নজর। ঘরটা এতক্ষণ ঠান্ডা ছিল এবার গরম হয়ে উঠছে। খাবার আর অ্যালকোহলের গন্ধের সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া মিলে জায়গাটা দমবন্ধ করার মতো।

মিহির বুঝে গেছে প্রণব এবার কী প্রসঙ্গে আসবে। তার থেকে দ্বিগুণ মাইনে পায় প্রণব এবং চতুর্গুণ ঝঞ্ঝাট জড়ো করেছে জীবনে। হয়তো রিল্যাক্স করার এটাই ওর পন্থা।

"তুই বুঝবি না আমি কী রকম ওকে ভালবাসি, কী রকম হয়ে গেছি। এমন করে তুইও কাউকে ভালবাস এটাই আমি চাইব।...না, না, চাওয়াটা উচিত হবে না, ছায়া খুব ভাল মেয়ে। মিহির কী যে অদ্ভুত আর কী ভয়ংকর এটা, পৃথিবীতে আব কিছুর মূল্য আছে বলে মনেই হয় না। সব তুচ্ছ। যদি কেউ বলে বনানীর সঙ্গে ছ' মাস বাস করার পর আমি আত্মহত্যায় বাধ্য হব, তা হলেও পিছোব না। তুই একবার নীপার সঙ্গে দেখা কর, ওকে বুঝিয়ে বল, তোর কথা ও শুনবে, তোর ওপর কনফিডেন্স আছে। ওকে বল গোঁয়ার না হতে, এ-ভাবে আমাদের একসঙ্গে থেকে কোনও লাভ নেই।"

"না।"

"কেন?"

"আমি ডিভোর্স করেছিলাম। ও ভাববে ল্যাজকাটা শেয়াল অন্যকেও ল্যাজ কাটতে পরামর্শ দিচ্ছে।"

"তবু তুই যা একবার।"

মিহির হঠাৎ বিষণ্ণবোধ করল। আরতির তরফ থেকে কেউ তাকে বোঝাতে আসেনি। ও নিজেই নিজের জন্য সওয়াল করেছিল।

দু' বছরের বাটু বিছানায় অঘোবে ঘুমোচ্ছিল। বন্ধ ঘরের বাইরে দালানে মা শুয়ে। খাটের কিনাবায় বসে আরতি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো দু' হাত মুঠো কবে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিল: "অপদার্থ অযোগ্য, শুধু চেহারাটাই আছে...কী করতে পেরেছ এই আড়াই বছরে? লম্বা চওড়া শুধু কথাই। এই ঘুপচি ঘরে, এই রকম জীবন...আমি টাকা দিয়েছি তাই এবাবেব ঘরভাড়া দেওয়া হল...মিথ্যেবাদী ধোঁকাবাজ..."

চড়টা সে এত জোরে মেরেছিল যে, আরতি মেঝেয় পড়ে গেছল। গালে হাত রেখে অন্তত কুড়ি সেকেন্ড নিথর চোখে তাকিয়ে থেকে ও বলেছিল: "কাল সকালেই বাটুকে নিয়ে চলে যাব। আমি ডিভোর্স করব।"

অন্ধকার দালানে ঘুমন্ত মায়ের পাশ কাটিয়ে সে সদর দরজা খুলে রকে গিয়ে বসেছিল। তখন প্রায় মাঝরাত। দু'-তিনটে কুকুর ছুটে এসে তার দিকে মুখ তুলে ডাকতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর দরজার কাছ থেকে ফিসফিস একটা স্বর তার মাথায় আলতো ধাক্কা দিয়েছিল: মিরু ভেতরে আয়, ঠান্ডা লাগবে।"

সেই সময়, একটন ওজনের বোধরহিত একটা মাথাকে শরীরের উপর বসিয়ে রাখার জন্য যে যন্ত্রণা

সে পেয়েছিল এখন আবার তা পাচ্ছে। কীভাবে রিল্যাক্স করব। প্রণব কি জানে ডাক্তার তাকে কী কী নিষেধ করেছে।

কী লাভ প্রণবের জন্য এই কাজ করে? কেউ কোনও উপকার পাবে কি? আরতি যদি ডিভোর্স না করত, ওইভাবে অপমান যদি না করত তা হলে সে কি তেড়েফুঁড়ে অমানুষিক পরিশ্রমে সাফল্যের দিকে দৌড়ত? দৌড়ে দৌড়ে আজ সে এক জায়গায় পৌঁছেছে যেটাকে মধ্যবিত্তরা সফল হওয়াই বলবে। জনগণের একটা অংশ তার নাম জানে। রাজনীতি, ফিল্ম, পুলিশ, যাত্রা, থিয়েটার, আদালত এইসব মহলের কেউ কেউ তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে যেহেতু ওদের নিয়ে নানা লেখা তার সম্পাদিত পত্রিকাগুলোতে বেরিয়েছে।

সফল হওয়ার মাশুল দিচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। আরতি যদি না তাকে ছেড়ে চলে যেত তা হলে কি হৃৎপিণ্ডটা রক্ষা পেত? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছিল বাবার হার্টডিজিজ ছিল কি না। মিহিরের এটা যে স্বোপার্জিত তাতে সন্দেহ নেই, বাবা মারা গেছলেন কাকাদের গুণ্ডার হাতে ধানখেতের মধ্যে মার খেয়ে হাসপাতালে।

"কী ভাবছিস অত, আমার জন্য এই সামান্য কাজটুকু করতে পারবি না?"

"একটা শর্তে, নীপাকে অনুরোধ করতে পারব না।"

"আমি ওকে সব দিয়ে দেব। ফ্ল্যাট, গাড়ি, ছেলেমেয়ে...কিচ্ছু নিজের জন্য রাখব না। বনানী আমার টাকা পয়সা চায় না।"

মিহির নিষ্পলক তাকিয়ে। প্রণবকে সে দেখছে বা ওর কথা শুনছে কোনও অভিনেতার অভিনয় দেখার মতো করে। তার সন্দেহ নেই প্রণব প্রেমে মগ্ন। কিন্তু ব্যাপারটার অর্থ কী? এটাকে এত নাটকীয় করে তুলছে নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যই কি? ছ'মাস কি ছ' বছর পর ওর কী হাল দাঁড়াবে?

"প্রথম ক'টা মাস টানাটানিতে পড়ব দুটো সংসার চালাতে। বনানীর কাছ থেকে চাওয়া তো সম্ভব নয়। হাজার পাঁচেক টাকা আপাতত দরকার হবে। ধার দিবি?"

"না।"

প্রণব যেন অবশ হয়ে পড়ল রূঢ়স্বরের "না" শব্দটিতে।

"পারবি না? সুদ দেব।"

"না, পারব না।"

"কেন?"

"টাকা নেই।"

প্রণব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কথাটা অবশ্যই বিশ্বাস করেনি। হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল।

"এবার আমি উঠব।"

"আমাকে ঘেন্না করছিস, তাই না?"

"না।"

"তা হলে কী ভাবছিস আমার সম্পর্কে?"

"কিছুই ভাবছি না।"

"আমার যা ঘটেছে, তোরও তা ঘটতে পারে কোনওদিন।"

প্রণব আঙুল দিয়ে ওয়েটারকে খালি গ্লাসটা দেখিয়ে মাথা নাড়ল। ওয়েটারও মাথা নেড়ে চলে গেল।

"যেদিন ঘটবে দেখা যাবে।"

"তা হলে নীপার সঙ্গে দেখা করছিস।"

রাস্তায় বেরিয়ে মিহির কয়েকবার শ্বাস নিল। এইরকম পরিবেশে এতক্ষণ থাকা তার হার্টের পক্ষে বোধহয় ভাল হল না।

প্রণব নিশ্চয় গাড়ি আনেনি। ভালই করবে না এনে থাকলে। ওর প্রতি করুণা অথবা বাহবা, কোনটা সে দিতে পারে? নীপার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রণবের জীবনে এটা বিপর্যয় নিয়ে আসছে। বনানীকে সে দেখেনি, এবং সন্দেহ নেই বিপর্যয়টা ওই আনছে যদিও বিনা উদ্দেশ্যে।

তিন

মিহির একটা ট্যাক্সি পেল এবং বলামাত্র ফ্ল্যাগ নামাল। তাতে উঠে একশো মিটার যাবার পর বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে তার মনে হল, সত্যি সত্যিই ট্যাক্সিটা তা হলে সে পেয়েছে। সন্ধ্যার পর কী কঠিন যে এই পাওয়া এবং কাঁকুড়গাছির দিকে যেতে রাজি করা!

এই ট্যাক্সি পাওয়ার পরই সে আজ প্রথমবার কিছুক্ষণের জন্য সুস্থির আরাম অনুভব করল। ঝিমুনি আসছে। চোখবন্ধ করে সিটে একটা পা ছড়িয়ে কোণে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে সে তার ফ্ল্যাট বাড়িতে পৌঁছল।

ডাক্তার বলেছিল বেশি সিঁড়ি ভাঙবেন না। ফ্ল্যাটটা দোতলায়। একতলায় চমৎকার ভদ্র ভাড়াটে আছে, যাদের একমাত্র পুত্র এখন লন্ডনে পড়াশুনায় ব্যস্ত। এদের ফোনটাই সে ব্যবহার করে। ফোন এলে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে দেয়। সে না থাকলে ওরা লিখে রেখে দেয় নাম ও নম্বর।

ওপরে ওঠার আগে মিহির ওদের দরজায় টোকা দিল।

দরজা খুলল। টেলিভিশনের চাপা শব্দ আসছে ঘরের ভিতর থেকে।

মিহির যখনই এই মেয়েটিকে দেখে অস্বস্তি বোধ করে। এখনও সে ভাল করে জানে না মোনা এদেব ঝি না কোনও দুস্থ আত্মীয়ের মেয়ে। চালচলন ও পোশাক বাড়ির মেয়ের মতো। শাড়ি পরা উদ্ভিত কিন্তু এখনও ফ্রকে আটকে রেখেছে শরীরটাকে। মিহির পরিপূর্ণ দৃষ্টি ওব মুখে রাখতে পারে না বা ভরসা পায় না। চোখ অবধারিত পিছলে পড়বেই।

"কোনও ফোন এসেছিল?"

"না তো।"

"ঠিক জানো, অন্য কেউ ফোন ধরেনি তো?"

"জিজ্ঞাসা করি।"

মোনা ভিতরে গেল। এক মিনিটও সময় লাগল না কিন্তু মিহির বিস্মিত হল নিজেকে অধৈর্যভাবে ভিতরেব দিকে বারবাব উঁকি দিতে দেখে।

মোনার সঙ্গে ঘব থেকে বেবিযে এল বুবাই। বাবাকে দেখে সে ঘাড় গোঁজ করে বলল: "আমি এখন যাব না, টিভি দেখব।"

"কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, আব পনেরো মিনিট।"

"না, আধঘণ্টা। এই নাটকটা শেষ হলে।"

"এ-সব বড়দেব নাটক তোমার দেখা উচিত নয়।"

মোনা বলল: "না ছোটদের নাটক হচ্ছে।"

"বেশ, শেষ হলেই উপবে আসবে...ফোন এসেছিল।"

"না, আসেনি।"

"বাবা উপরে কে এসেছে জানো. .একটা ছেলে। দিদু বলল আমাব নাকি দাদা হয়। নাম বাটু।"

মিহিব প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না।

"কী নাম?"

"বাটু। গিয়ে দ্যাখো না।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে মিহির এক এক লাফে তিনটি করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় এসে কলিংবেল টিপল।

দরজা খুলে দিল বাদলের মা।

মিহির সর্বাগ্রে খাবার জায়গার দিকে তাকাল। কেউ নেই। ছায়া নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। মা-র ঘরে আলো জ্বলছে, কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মিহির অন্য দিনের মতো স্বাভাবিকভাবে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বাদলের মাকে জিজ্ঞাসা করল: "লোডশেডিং হয়েছিল?"

"বিকেলে হয়েছিল, একটু আগে আলো এল।"

তার গলার স্বরে রান্নাঘর থেকে ছায়া বেরিয়ে এল। মিহিরকে সে ইশারায় ঘরে যেতে বলল।

চোখ নামিয়ে জুতোজোড়া যথাস্থানে রেখে সে প্রবল বিস্ময় ও অধৈর্য চেপে ঘরে এল।

"বাটু এসেছে, বলছে এখানে থাকবে?"

"কে বাটু?"

ছায়া থতমত হল। প্রশ্নটা সে আশা করেনি।

"তোমার ছেলে...দিদির ছেলে গো, বেশ বড়সড়, বছর বারো তো হবে।"

"কখন এসেছে?"

"ঘণ্টা খানেকের উপর, তখন আলো ছিল না। আমি তো অবাক, কখনও তো দেখিনি। বলল, আমি বাটু। আমি তো নামও জানি না। মা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে হাত ধরে ভেতরে আনল। আমায় বলল তোমাব ও-পক্ষের ছেলে।"

"কী করতে এসেছে?"

মিহিব নিস্পৃহ হবার চেষ্টা করলেও উদ্বেগ ও বিরক্তি ঢাকতে পারল না।

"তুমিই জিজ্ঞাসা করো। মা-ব সঙ্গে কথা বলছে, ডেকে দিচ্ছি।"

মিহির খাটের কিনারে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। চিন্তা করার নেই। মাথার মধ্যে ওলটপালট না থামা পর্যন্ত সে কিছু ভেবে উঠতে পারবে না। এখন অসম্ভব কৌতূহল তার, দশ বছর পর বাটুকে কেমন দেখাবে!

মা-ব সঙ্গে একটি ছেলে ঘরে ঢুকল কুণ্ঠিত পায়ে মাথাটি সংকোচে হেলিয়ে।

ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত মিহির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ কবল। সারা দেহে অপুষ্টি। মায়ের মতোই মাজা গায়ের রং। শীর্ণ পা, শীর্ণ উরু, বাহু ও বুকের খাঁচা এবং মুখটি...সে চমকে উঠল। হুবহু তারই মতো। চৌকো চোয়াল, গালের উঁচু হনু, চোখ ড্যাবাড্যাবা, কান দুটি ঈষৎ ছড়ানো, তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা ঠোঁটেব কোল বঙ্কিম, কপালে চুলের "ইউ" আকৃতি। এ আব এক মিহির, জীর্ণ অল্পদামি ময়লা জামা ও প্যান্ট পরে তার সামনে।

"মিরু ঠিক তোর মতো দেখতে হয়েছে।"

বাটু তার ঠাকুমার আড়ালে সরে গেল। মিহির অজস্র ধরনের প্রশ্নের গোলমালের পাশ কাটিয়ে শুধু বলল: "এখানে কী জন্য?"

"বলছে মা'র কাছে থাকবে না। রোজ রোজ মারে, খেতেও পায় না ভাল করে, লেখাপড়াও হচ্ছে না, বইটই কিনে দেয় না—বল না তুই, বাপের কাছে লজ্জা কী?"

মাকে সস্নেহে বাটুর মাথায় হাত বুলোতে দেখে মিহির গম্ভীর হয়ে পাজামার জন্য আলনার কাছে গেল। ছায়া নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখে পরপর যা দরকার হবে।

"এখানে থাকবে কী করে, ও আছে কোর্টের হুকুমে আরতির হেফাজতে, আর জানোই তো কী ধরনের মেয়েমানুষ, হয়তো পুলিশে খবর দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবে। এখনও নাবালক তো।"

"তা হলে কি..."

"না, সম্ভব নয়। এখন থাকে কোথায় ওরা?"

"কোথায় থাকিস বললি রে?"

"গৌরীবাড়ি।"

অস্ফুট লাজুক স্বর। কয়েকটা বছর পর কর্কশ হয়ে উঠবে। মিহির কিছুটা নবম বোধ করল। আড়চোখে বাটুর মুখের দিকে বারকয়েক তাকালও। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য। সত্যিই ভাল করে খেতে পায় না।

"আমি এখানে থাকি কে বলল?"

"ও অন্নদাচরণ লেনের বাড়িতে প্রথমে গেছল। সেখানে পবিত্ররা ঠিকানা দিয়েছে এখানকা'র।"

"অন্নদাচরণ লেনের বাড়ির ঠিকানাই বা ও পেল কী করে। ওর তো সেটা মনে রাখার মতো তখন বয়স ছিল না?"

মিহির মা-কেই প্রশ্ন করল।

"মা-র কাছ থেকেই একদিন শুনেছিল, তাই তো বললি?"

বাটু ঘাড় নাড়ল। ছেলেটাও তার দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে। চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল। কী

অদ্ভুত বাপ-বেটায় দেখা হওয়াটা, মিহিরের হঠাৎ রাম আর লব-কুশের প্রথম দেখা হওয়ার মতো মনে হল ব্যাপারটাকে। কিন্তু ছেলেদুটো যখন অশ্বমেধের ঘোড়া ধরে তখন তো বাপের পরিচয় জানত না। বাটু জেনেশুনেই খোঁজ করেই এসেছে।

"খেতে দিয়েছ?"

"বউমা পরোটা করে দিয়েছে।"

"রাত হয়ে গেছে, একা তুই যেতে পারবি?"

বাটুর মুখে হতাশা তারপর বেদনা মেশানো ভয় ফুটে উঠতে দেখে মিহিরের মনে হল, আরতিকে না জানিয়ে ছেলেটা এসেছে। হয়তো ধরেই নিয়েছে এখান থেকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। এতক্ষণ ওকে না দেখে আরতি হয়তো ইতিমধ্যে পুলিশে খবর দিয়েছে। এখন ফিরে গিয়ে কি ও বলতে পারবে বাবার কাছে গেছলাম?

"মিরু ওকে কি রাখা যায় না? তোরই তো ছেলে। বড্ড কষ্টে আছে রে।"

"না মা, সম্ভব নয়। অনেক গোলমালে পড়তে হবে যদি ওর মা হাঙ্গামা বাধায়...। তোমার মা ছাড়া আর কে কে আছে বাড়িতে?"

"কেউ নেই, শুধু দু'জন আর কাজের লোক একজন।"

মিহির চেয়েছিল ঠাকুরমার বদলে বাটুই জবাব দিক। মা ইতিমধ্যে সব খবর নিয়ে ফেলেছে এটা অবশ্য স্বাভাবিকই।

"যদি আরতি রাজি হয়?"

মিহির নিরুত্তর রইল।

"একবার যাবি?"

হঠাৎ মিহিরের মধ্যে এক অদম্য ইচ্ছা হল আরতিকে দেখার জন্য। দশ বছরই সে ওকে দেখেনি। প্রথম দিকে ইচ্ছাটা প্রবলই হত। কোনও অফিস ক্লাবের কি অ্যামেচার দলের নাটকের বিজ্ঞাপনে আরতির নাম দেখলে সে উত্তেজিত হত। দু'-তিনবাব সে থিয়েটার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েও ছিল শুধু দেখার জন্য। দেখতেও পেয়েছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে অভ্যাসমতো কোনওদিকে না তাকিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল। মিহির জানে আরতি আগাম ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে রাখে। ট্রামে বা বাসে এসে কাছাকাছি কোথাও থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কয়েকটা টাকা বাঁচায়। টাকা জমানোর এবং কৃপণতার ঝোঁকটা হয়তো এখনও আছে। এগুলো বদলায় না।

আরতির খবর সে মাঝে মাঝে নানা জনের মুখে পেত। একবার শুনেছিল অভিনয় কমিয়ে দিয়েছে। আবার শুনল কোন এক ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সংস্থার হয়ে কেস জোগাড় করছে, শেষ শুনেছে কোন এক অফিসে টেলিফোন অপারেটর কাম রিসেপশানিস্টের চাকরি করছে। মিহির তখন ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য পথ ধরে ফেলে হনহনিয়ে চলছিল। আরতি আবছা হতে হতে একসময় মন থেকে মুছে যায়। ছায়াও ততদিনে অভ্যাসে এসে গেছে।

বাটুকে দেখে ছায়ার কী প্রতিক্রিয়া তা জানতেও কৌতূহল হচ্ছে। নরম স্নেহপ্রবণ মন নিশ্চয় স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলেকে বিষনজরে দেখবে না। ছায়াকে সে এক সপ্তাহেই পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছে।

মিহির উঠে দাঁড়াল।

"আর নয়। আমি ববং ওকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বাটু তার ঠাকুরমার কাপড়েব আঁচল অজান্তেই যেন মুঠোয় ধরল। ওর শরীর শক্ত দেখাচ্ছে।

"মা মারবে।"

স্পষ্ট এবং জোরে বাটু এই প্রথম কথা বলল, ঠাকুরমা কিংবা বাবার উদ্দেশে নয়, সকলের জন্যই।

"থাকুক ও।"

মিহির চমকে অবাক হল। ছায়া চেঁচিয়ে কথাটা বলেছে খাওয়ার জায়গা থেকে। ওকে দেখতে পাচ্ছে না মিহির কিন্তু নির্ভেজাল মিনতির সুরটা তার কানে বাজল। ছায়াকে তার মুখস্থ থাকলেও এতটা আশা করেনি।

"যা বোঝো না তাই নিয়ে কথা বোলো না।"

মিহিরের এই কথাটা স্ত্রী বা মায়ের জন্য নয় বাটু সমেত তিনজনকেই বলা।

"অনুমতি চাই ওর মায়ের। চল, আগে কথা বলে আসি।"

পাজামা পাঞ্জাবির সঙ্গে চটি পরে মিহির সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছে, পিছনে বাটু, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে মা এবং ছায়া, তখন বুবাই উঠে আসছিল। বাবাকে দেখে সে মিহিরের হাত ধরল।

"আমি যাব।"

"না, এখন না। তোমার দাদাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।"

"কোথায়?"

মিহির ইতস্তত করল। জবাবটা ওর মা-র কাছে বা 'ওদের বাড়িতে' হলে বুবাইকে আরও প্রশ্নের সুযোগ দেওয়া হবে।

"তোমার বড় মা'র কাছে...এবার এসো তো উপরে। অনেক টিভি দেখা হয়েছে।"

বুবাই ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, মিহির প্রসঙ্গ ঘোরাতে দ্রুত বলল: "আসবার সময় চকোলেট আনব, যাও ঠাকুমা দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বাটু আর বুবাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। পরস্পরকে ওরা তীব্র বিস্ময় দ্বারা পরিমাপ করছে। বুবাইয়ের এখনও বোঝার মতো বোধ হয়নি কিন্তু বাটু নিশ্চয় জানে তার মা ও বাবার মধ্যে কী ঘটেছিল এবং বাবা আবার বিয়ে করেছে। আরতিও তো করতে পারত।

বাটুর হাত ধরে মিহির ওকে প্রায় টানতে টানতেই সিঁড়ি দিয়ে নামল। নামার সময় কানে এল।

"বড়মা হচ্ছে আর একটা মা...তার ছেলে হচ্ছে দাদা..."

রাস্তায় বেরিয়েও মিহির হাত ছাড়েনি বাটুর। সরু হাড়, মাংস প্রায় নেই-ই। অদ্ভুত লাগছে তার। কোমল একটা অনুভব হাত বেয়ে উঠে আসছে, বাৎসল্য বা মমতা যাই হোক সে বুঝতে পারছে না। কিছু একটা করা দরকার ছেলেটার জন্য...নিজেরই ঔরসজাত, সেটাই হয়তো তাকে করুণায় দ্রব করছে। কিন্তু একঘণ্টা আগেও তো সে বাটু নামক এই বছর বারোর ছেলেটি সম্পর্কে অচেতন ছিল।

"তোর মা এখন কি বাড়িতে?"

"কী জানি।"

"কেন, এ সময় রোজ থাকে না?"

"মাঝে মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে চলে যায়।"

"কোথায় যায়, কতদিন?"

"জানি না কোথায় যায়। চার দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন আসে না।"

"কে দেখে সংসার?"

"মাধুদি।"

"সে কে! কাজের লোক?"

বাটু ঘাড় নাড়ল। এখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে, আড়ষ্টতা কেটেছে।

"লোকজন আসে বাড়িতে?"

"হ্যাঁ।"

"তারা কারা?"

বাটু চুপ। মিহিরের মনে হল এই নিয়ে ওকে প্রশ্ন করা উচিত হবে না। কারা আসে সেটা সে আন্দাজ করতে পারছে। স্ফূর্তিবাজ, অর্থবান লোকেদের সঙ্গে আরতির মেলামেশা তাদের বিবাহিত জীবনেও ছিল। নানারকম অশ্লীল মন্তব্য সে আরতি সম্পর্কে শুনত। আরতি হয়তো খুব পরিষ্কার জীবনযাপন করছে না, ওর টাকার দরকার।

"তুই স্কুলে যাস না?"

"হ্যাঁ।"

"মা মারে?"

বাটু চুপ। চোখটা নেমে গেল ফুটপাথের দিকে। মিহির ওর কাঁধে হাত রাখল। তারপর মাথায়।

"খুব মারে...রোজ?"

বাটু চুপ। মিহির আর প্রশ্ন করল না। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। বাটুকে নিয়ে সে উঠল। কিছুক্ষণ ওরা কেউ কথা বলল না। মিহিরের মনের পর্দায় চলচ্চিত্রের মতো ঘটনা আসছে আর সরে যাচ্ছে। তার ছেলেবেলা, কৈশোর ও ধানমুড়ির পটভূমিতে বাটুর বয়সটাকে সে খুঁজছে। এক-একটা ঘটনা আসছে আর সে বাতিল করে দিচ্ছে। ঠিক কোনটা যে সে এখন চায় বুঝে উঠতে পারছে না।

"আমার কথা বলে?"

"কে, মা?"

"হ্যাঁ।"

"না।"

এইটুকু ছেলের সঙ্গে ডিভোর্স করা স্বামী সম্পর্কে কী-ই বা কথা বলবে। আরতি স্নেহপ্রবণ নয়। তবু ওর তৈরি থাকা উচিত, বাটুর কৌতূহল মেটাবার জন্য। এই রকম বাবা-মায়েদের ছেলেমেয়েরা তীক্ষ্ণ অনুভূতি পায়।

"আমার সম্পর্কে তোকে কে বলেছে? তুই তো কিছুই জানিস না।"

"মাধুদি বলেছে। আমাকে তোমার কাছে আসতে মাধুদিই বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"বলেছে, 'এখানে থাকিস না, তোর কিছু হবে না, তুই নষ্ট হয়ে যাবি। চোর গুণ্ডা তৈরি হবি। তার থেকে বরং তোর বাবার কাছে যা।"

ট্যাক্সি উল্টোডাঙা রেলপুলের তলা দিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে অরবিন্দ সেতুর উপর উঠছে। মিহির নিশ্চিন্ত, বাটুর বয়সে সে চোর গুণ্ডা বা নষ্ট হবার মতো ভাবনায় পড়েনি। এই ভাবনাটা বাটুর শরীর ব্যবস্থাকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে? হার্টের অসুখ কিংবা রক্তচাপ বাচ্চাদের হয় কি? ওকে কি রিল্যাক্স করার পরামর্শ কেউ দেবে?

ট্যাক্সি সেতুর চূড়ায় উঠতেই দেখা গেল ওপারে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

"মাকে কী বলবে?"

সুস্পষ্ট ত্রাস বাটুর কণ্ঠে।

"যা হোক একটা কিছু বলব।"

"আমাকে একবার সারাদিন ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিল, কিছু খেতে দিতেও বারণ করেছিল মাধুদিকে।"

"কেন?"

"মাধুদির কাছে সেদিন শুতে চাইনি বলে।"

"মাধুদির কাছে কেন?"

"মার একজন বন্ধু ছিল। অনেক রাত হয়ে গেছল তাই আর যায়নি, লোকটার কিন্তু নিজের গাড়ি আছে।"

কূটনীতিকদের মতো বাটু বহুকথা না বলে বহু কথা বলল। এত অল্পবয়সেই এত পাকা হয়ে গেছে। এতক্ষণ মিহির স্তিমিত এক ধরনের দুঃখের মধ্য দিয়ে ভাসতে ভাসতে বাৎসল্য, মমতা, করুণা ইত্যাদি খড়কুটো ধরবার চেষ্টা করছিল। এখন সে হঠাৎ পায়ের নীচে ক্রোধের শক্ত জমি পেল। কার প্রতি, কী কারণে তা সে জানে না, তবে অন্ধ একটা রাগ তাকে গ্রাস করতে চলেছে।

"এখানে বাঁ দিকের রাস্তাটা।"

বাটু চেঁচিয়ে উঠতে সাবধান হল সে। এখন রাগের সময় নয়।

ট্যাক্সিওয়ালা বাটুর কথাতেই বাঁ দিকের অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি ঢোকাল। চার-পাঁচটি বাড়ির পর বাটু থামতে বলল।

একটা চারতলা বাড়ি। গড়ন দেখেই বোঝা যায়, প্রতিতলায় দু'পাশে দুটি করে ফ্ল্যাট। বাড়ির উলটো দিকে এক মনোহারী দোকানের হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল সদরের কোলাপসিবল গেট বন্ধ। বাটুর ডাক শুনে একটা লোক গেট ফাঁক করে মিহিরের মুখের দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল।

"আমাদের তিনতলায় ..মাকে কী বলবে?"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হাত আঁকড়ে ধরে বাটু বলল। ও ভয় পেয়েছে। ওকে যেন সে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।

"যাতে না মারে, তাই বলব।"

"তোমাদের কাছে আমায় থাকতে দেবার জন্য বলবে তো?"

অন্ধকার তিনতলায় পৌঁছে মিহির তার দ্রুতগতি পাওয়া হৃৎস্পন্দনকে বিশ্রাম দেবার জন্য চোখ বুজে নিথর হয়ে দাঁড়াল। উচিত হয়নি এতটা সিঁড়ি ভাঙা। কিন্তু তিনতলায় উঠতে হবে জানলে সে ওই ট্যাক্সিতেই কি ফিরে চলে যেত?

এইসব অসহায় অবস্থার মধ্যে কেন যে পড়া। এইসব মায়া মমতা স্নেহ তার হার্টকে তো রক্ষা করবে না। নিশ্চয় জখম হল, হয়তো আয়ু থেকে বছব খানেক কমে গেল। বাটুকে জবাব না দিয়ে সে বলল, "কড়া না কলিংবেল?"

"কলিংবেল। আমার হাত যায়, টিপব?"

উত্তরে অপেক্ষা না করেই বাটু দরজার দিকে এগোল।

"এখন লোডশেডিং কারেন্ট নেই, বাজবে না।"

আঙুলের গাঁট দিয়ে তিনবার দরজায় ঘা মারার সঙ্গে সঙ্গে মিহিরের মনে পড়ল আজ দুপুরে সে এইভাবেই মালতী দত্তদের দরজায় শব্দ করেছিল।

দরজার মাঝে কাঠের জোড় সরে গেছে তাই ম্লান হলুদ একটা রেখা দরজার ওপর ফুটে উঠল। ওধারে কেউ হ্যারিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"কে?"

মিহির মৃদু ঠেলা দিল বাটুর পিঠে।

"আমি মাধুদি।"

দরজা খুলতেই মিহির দেখল বিধবা ছোট্ট চেহারার মাঝবয়সি এক প্রৌঢ়াকে। তাকে দেখে ঘোমটা বাড়িয়ে, এখন যা-করাই স্বাভাবিক বিস্ময়ে পিঠোপিঠি দু'জনকে দেখতে লাগল। মিহির বুঝতে পারল এই মাধুদি। তার পরিচয় নিশ্চয় বুঝে গেছে দু'জনের মুখের মিল দেখে।

"কে এসেছে মাধু...বাটু?"

ভিতরের ঘর থেকে স্বরটা ভেসে এল। মিহির চিনতে পারল। আরতির 'ছ' উচ্চারণটা আলতো 'চ্ছ'-এর মতো হয়। স্টেজ থেকে স্বরনিক্ষেপের ভঙ্গিতে ও বাড়িতেও কথা বলে। এটা কৃত্রিম নয়। তার হৃৎস্পন্দন আবার দ্রুত হচ্ছে, মিহির অসহায় বিস্ময়ে তা অনুভব করল। তার কিছুই কবার নেই।

"হ্যাঁ।"

হ্যারিকেনটা মেঝেয় রেখেই মাধুদি ঘরের মধ্যে চলে গেল সম্ভবত মিহিরের আসার খবরটা দিতে। দরজার বাইরে বাবা ও ছেলে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

"ভেতরে আসতে বলো...আমার কোনও অসুবিধে হবে না, নিয়ে এসো।"

মাধুদি বেরিয়ে এসে পর্দা ফেলা একটা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে মিহিরকে উদ্দেশ করে বলল, "আপনি ঘরে আসুন।"

ঘরের দিকে যাবার সময় সে লক্ষ করল বাটুর ঠোঁট ফোঁপানির চাপে ফুলে উঠেছে এবং মাধুদি ডান হাত বাড়িয়ে।

টেবলে একটা ল্যাম্প, তার চিমনিতে ভুষো এবং মাথার দিকটা ভাঙা। বোধহয় কেরোসিন ফুরিয়ে এসেছে। ময়লা আলোয় খাটে পা ঝুলিয়ে বসা আরতিকে তার অপ্রাকৃত মনে হল। ওর মুখে এইমাত্র একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার মতো অস্থিরতা।

বহু বছর পর সে দেখছে। চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে হলুদ জমিতে বড় বড় লাল ফুলে ছাপা ম্যাক্সি। দুটি বাহু ও মুখটুকু ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা। মিহিরের চোখ ওর মুখ থেকে সরে যাবার আগে দেখে নিল আরতির চোখের পাতা ফুলে রয়েছে; চোখের নীচে চর্বির পুঁটলি।

স্বাস্থ্যে আর স্বাচ্ছন্দ্যে আরতি ভাল নেই। মিহির কয়েক সেকেন্ডের পর্যবেক্ষণেই আন্দাজ করল, মানসিক নির্যাতনের মধ্যে সম্ভবত ওর দিন কাটছে। নিরাপত্তাবিহীন একক জীবন, অস্তগামী যৌবন—

এই দুটো ব্যাপার যে-কোনও স্ত্রীলোকের পক্ষেই ভয়াবহ। হঠাৎ তার মনে পড়ল মালতী দত্ত ও পুষ্পকে। তবে আরতির মতো ছিন্নভিন্ন পারম্পর্যহীন অসংলগ্ন মালতী দত্ত নয়। আঁকড়ে থাকার মতো তার কিছু স্মৃতি আছে, আরতির কিছুই নেই, একটি পুত্র ছাড়া। বাটুকে নিশ্চয়ই ও ছাড়বে না।

"কী দেখছ অমন করে?"

"বহু বছর পরে তো।"

"তা বটে, অনেক কিছু বদলে গেছে।"

"কিন্তু তুমি বদলাওনি।"

হেসে উঠল আরতি নাটকীয় ভঙ্গিতে। ওর হাসিটা বদলায়নি। হাস্যকর কথায় বা ঘটনায় ও এ-ভাবেই হাসে।

"এমন মনজোগানো মিথ্যে বলে কী লাভ! দাঁড়িয়ে কেন?"

অপ্রতিভতা কাটাতে মিহির খাটের পাশে রাখা মোড়াটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে ভাবল, বোকার মতো কথাটা বলার কী দরকার ছিল। কিন্তু বলে যখন ফেলেছেই, মিহিরের কাছে চ্যালেঞ্জের মতো মনে হল কথাটাকে যুক্তি দেবার জন্য এবং হাসিটাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করতে।

"তোমার মন জুগিয়ে আমার সত্যিই কোনও লাভ হবে না, তবে বদলাওনি যে এটাও ঠিক, মানসিক বদল।"

আরতির মুখ ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠল। ঝুঁকে খাটের তলা থেকে হুইস্কির ছোট একটা বোতল বার করল। তাকে দেখাবার জন্যই যে এটা করতে হচ্ছে মিহির তা বুঝল। তবে বোতল থেকেই সোজা গলায় ঢালবে এটা সে ভাবেনি। বোতলে হুইস্কির পরিমাণ দেখে মিহির বুঝল বেশিক্ষণ আরতি শুরু করেনি।

"আমি কি বদলাইনি?"

"বাটু কেন আমার কাছে গেছল?"

"ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

"ও এখানে থাকতে চায় না, যেহেতু তোমার এই জীবনের সঙ্গে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কী আমার 'এই জীবন' যে ওই পুঁচকে ছেলের অসহ্য লাগছে?"

"সেটা কি যুক্তিতর্কের সাহায্যে তোমাকে বোঝাতে হবে। ওই পুঁচকে ছেলেও বুঝে গেছে ওর ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নেই, ও ঠিকঠিক মানুষ হচ্ছে না, ওর শারীরিক, মানসিক চাহিদা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না..."

"ব্যস ব্যস, ব্যস, যত্তো ছেঁদো কথা। দেখছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একই জায়গায় রয়ে গেছে। বাৎসল্য খুবই মহৎ রস। তাতে মাখামাখি হলে হাততালি পাওয়া যায়। আমি কি এখন হাততালি দেব—হে মিহিরকুমার বিশ্বাস...প্রখ্যাত সম্পাদক, মোটা মাইনে, ফ্ল্যাট গাড়ি পাওয়া, গ্রাম্য এক বালিকার স্বামী, একটি উজবুক।"

আরতির চোখ গনগন করছে। স্বর তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। মুখের লুকোনো পেশিগুলো বিদ্রূপের টানে বেরিয়ে এসেছে। দু' হাতের আঙুলগুলো বাঁকিয়ে একটা হিংস্র শ্বাপদের মতো কুঁজো হয়ে সে মিহিরের দিকে তাকিয়ে।

সেই একই রকম রয়ে গেছে। মিহির চোখ সরাল না আরতির মুখ থেকে। শরীরে মৃদু একটা কম্পন সে অনুভব করছে যেটা অপমানবোধ থেকে তৈরি নয়। আলাদা ধরনের, উত্তেজনার আঁচ লাগছে এবং সম্মোহনগ্রস্তের মতো ঝিমঝিমে স্পর্শ তার শরীরের উপর দিয়ে ওঠানামা শুরু করেছে।

মিহির উঠে দাঁড়াল।

"বোসো, বোসো, অনেককাল পর দেখা। কত বছর?"

"আমাকে অপমান করার কিন্তু কোনও কারণই নেই, তোমার কোনও ক্ষতিই আমি করিনি...করেছি কি?"

"বিয়ে করাটাই তো মস্ত ক্ষতি। অবশ্য আমিও সমান দায়ী। তোমার থেকে পয়সাওলা তোমার থেকে শিক্ষিত এবং সুদর্শনও আমার পাণিপ্রার্থী ছিল। তুমি বোধহয় তা জানতেও। তবু, কী যে

হল...অ্যাবোর্শনটা করিয়ে নিলে বিয়ে করার দরকার হত না। জীবনটা তা হলে অন্যরকম হত...যাক গে ও-সব কথা। বউ কেমন?"

"ভাল।"

"তুমি সুখী?"

"কথাটা বোকার মতো হল।"

আরতি হাসল। ঠোঁট দুটো সরে গিয়ে সাজানো দাঁতগুলি শুধু দেখা গেল। ইতস্তত করে মিহির আবার মোড়ায় বসল। মুখের কাছে বোতলটা তুলেই নামিয়ে নিয়ে আন্তরিক স্বরে আরতি বলল: "খাবে?"

"না।"

"ঠিকই বলেছ, বোকার মতোই..."

আরতি ছোট্ট করে গলায় ঢালল, সেই সময় মুখটি উঁচু করে তুলে ধরায় ওর মসৃণ দীর্ঘ গ্রীবা ও চিবুক মিহিরকে আবার উত্তেজনা এনে দিল।

"তুমি কি জানতে, আমি বিয়ের আগেও খেতাম?"

"হ্যাঁ।"

"কখনও কিছু তো বলোনি!"

"তখন ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম না।"

"আমারও তাই মনে হত, তুমি আমায় সত্যিই ভালবাসতে।"

হঠাৎ মিহিরের মনে হল, বলে: 'এখনও বাসি...বোধহয় বাসি' কিংবা 'এখনও তো বাসা যায়।'

এ-ভাবে বললে আবার সেই নাটকীয় হাসি শুনতে হবে। কিন্তু এ-সব কথা তার মনে উদয় হচ্ছে কেন? তার তো স্ত্রী আছে! আরতি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চাহনি সরল, মুখটি টিপে থাকায় টোল পড়েছে গালে। আগে অনেক গভীর হত, এখন চর্বিতে টোল ভরে উঠেছে।

"তুমি বাটুকে কিছু বোলো না।"

"ওর সম্পর্কে কি তোমার দুর্বলতা আছে?"

"কর্তব্য তো আছে, আমারই তো ছেলে। বাবার নাম করতে হলে আমার নামই তো করবে। ও মানুষ না হলে, কষ্টে থাকলে নিশ্চয় আমি ব্যথা পাব।"

আরতি চোখ সরু করে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। মিহির আশ্চর্য বোধ করল, সারা ফ্ল্যাটে কোনও শব্দ নেই। বাটু বা মাধুদি নিশ্চয় পাশের ঘরে। বাটু কি ঘুমিয়ে পড়ল? মিহির দরজার পর্দাটা তুলে দেবার কথা ভাবল, তা হলে কিছু হাওয়াও আসতে পারে। দুটো জানলার পর্দাই পাশে সরিয়ে রাখা। সামনের বাড়ি থেকে নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে ওই ঘরের যাবতীয় কোণ। কেউ হয়তো দেখছেও এখন।

"জানলার পর্দা বোধহয় টেনে দেওয়াই উচিত।"

আরতি চমকে কয়েক সেকেন্ড মিহিরের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। চোখের মধ্যে বোধহয় চর্বি জমে না। কিন্তু প্রচুর বিষণ্ণতা জমে রয়েছে।

"নাহ্, ওদিকে বস্তি, এটা তিনতলা। ...বাটুকে তুমি নেবে?"

"মা, ছায়া, ওরা রাজি।"

"ছায়া কে, বউ?"

মিহির ঘাড় নাড়ল।

"আমার সম্পর্কে তাকে কী বলেছ মানে কী বুঝিয়েছ?"

"তুমি কী জানো ওর সম্পর্কে...অশিক্ষিত গ্রাম্য এইসব ছাড়া?"

"কিছুই জানি না, তবে কে একজন বহুদিন আগে আমায় বলেছিল ও-সব কথা।"

মিহিরের মনে হল ছায়াকে তার রক্ষা করা উচিত এই কথাবার্তা থেকে। শুধুমাত্র সংসার, স্বামী-পুত্র ছাড়া বেচারা আর কিছুই জানে না। ভীরু, অবোধ, সর্বতোভাবে স্বামীর মুখাপেক্ষী। নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোনও দিনই খাটায়নি, খাটাবার মতো মানসিক ক্ষমতাও নেই। ওকে মায়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

"যা শুনেছ ঠিকই, তবে পুরুষরা যা চায তা ছায়া দিতে পাবে।"

আবতিব জিজ্ঞাসু চাহনি লক্ষ কবে মিহিবেব তীক্ষ্ণ একটা পাশব ইচ্ছা জাগল ওকে কষ্ট দেবাব।

"টোটাল ডেডিকেশন. সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। সেবা, যত্ন, নজব ..এক একসময় মনে হয় ওব নিজেব বুঝি কোনও সত্তাই নেই। শুধু আমাব জন্যই বুঝি ও জন্মেছে। কখনও ভাল লাগে না, মনে হয় বাড়াবাড়ি আবাব দারুণ ভালও লাগে। আমাব আঘাত লাগলে ওব মুখে যন্ত্রণা ফোটে, আমাব হাসি কি সুখে ওব মুখ ঝলমল কবে। ভাবতে পাবো৷ এ-বকম যে কেউ হতে পাবে আমাব ধাবণাই ছিল না।"

"কেন, হতে পাবে না কেন? এ বকম তো অনেক মেয়েই আছে যাদেব ব্যক্তিত্ব নেই। আমাব পক্ষে ছায়া হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে কি দুনিয়ায় আব কেউ নেই৷"

অসংকোচ স্বাভাবিক কণ্ঠ আবতি কি অভিনয় কবছে। প্রায় যেন ভর্ৎসনাই কবল। ওকে কষ্ট দিতে গিয়ে মিহিব নিজেই এবাব অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। ছায়াকে এ-ভাবে আবতিব সামনে প্রকাশ কবাটা ঠিক হযনি।

"ওকেই বোধহয আমাব দবকাব ছিল।"

মিহিব মবিযা হযেই বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

"বাটুব বিষযে আমি আব একটু চিন্তা কবে তোমায় এসে জানাব। সাধাবণত কখন থাকো?"

"সব সমযেই প্রায।"

"বাত হয়েছে।"

বলেও মিহিব পা বাড়াল না দবজাব দিকে। আবতিব সম্মতি বা অনুমতিব জন্য অপেক্ষা কবল।

আবতি মুখ তুলে তাব দিকে তাকিয়ে। কেবোসিন ল্যাম্পেব ম্লান আলো ওব চোখা নাকেব পাশ দিয়ে তবল হয়ে গড়িয়ে পড়ছে অন্য পাশে। সেদিকে অন্ধকাব আবর্তেব মাঝে জ্বলজ্বল কবছে চোখেব সাদা অংশটি। মনে হচ্ছে ভাসছে। বড় করুণ।

"তুমি গাড়ি এনেছ?"

"না। গাড়ি আছে জানলে কী কবে?"

"জানি। আগেব বাসা ছেড়ে দিযেছ তা ও জানি। বেশ ভাবী হয়ে গেছ, চুলেও পাক ধবেছে। আমিও মোটা হয়েছি।"

আবতি অনেকক্ষণ আব বোতলে হাত দেয়নি। তাব সম্পর্কে খোঁজ খবব বেখেছে অথচ সে ওব সম্পর্কে কিছুই জানে না। মিহিব অপবাধী বোধ কবল, যা না কবলেও তাব চলে।

"খুব মোটা হওনি।"

মিহিব ওব মুখ থেকে ধীবে ধীবে চোখ নামিয়ে আনল বুক তলপেট ও উরুব উপব দিয়ে এবং তাব মনে হল ম্যাক্সিব অন্তবালে আব কোনও আববণ নেই।

নগ্ন আবতিব কিছু স্মৃতি চমকে উঠল মিহিবেব মনে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডেব জন্য।

দু'হাতে তলপেটেব দু'পাশ চেপে ধবে আবতি হাসল। ম্যাক্সিব ওই জায়গাটা পুঁটলিব মতো ফুলে উঠেছে।

"বীতিমতো থলথলে ভুঁড়ি।"

তাবপবই হাত বাড়িয়ে মিহিবেব পেট খামচে ধবে তাব অদ্ভুত নাটকীয় স্ববে হেসে উঠল।

"প্রায় দশ বছব কেটে গেছে ছাযা কেমন?"

সেই সম্মোহিতেব অনুভব। উত্তেজনায় উষ্ণ হয়ে ওঠা, ঝিমঝিমে আবেশেব শবীব বেয়ে ওঠানামা। মিহিব ঢোঁক গিলে হাসল মাত্র।

"আমি এবাব যাই।"

আরতি উঠে দাঁড়াল। মিহির পর্দাটা সরিয়ে বেরোতেই দেখল পাশেব ঘবের দবজায় বাটু হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

"মা কিছু বলবে না। আমি আবার আসব।"

ছেলের মুখে ফিকে হাসি ফুটতে দেখে মিহিরের চোখ গাঢ় হয়ে উঠল। দরজার খিল খুলে বেরোবার সময় পিছনে তাকিয়ে সে দেখল দুই ঘরের দরজায় মা ও ছেলে দাঁড়িয়ে।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে নেমে রাস্তায় পা দিয়েই সামনের মনোহারী দোকানটা দেখে তার মনে পড়ল বুবাইকে কথা দিয়ে এসেছে, চকোলেট নিয়ে সে ফিরবে।

সোনালি মোড়কের চকোলেট বার-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে মিহির দাম জিজ্ঞাসা করল।

"দু' টাকা পঁচাত্তর।"

"একটা দিন।"

বলেই তার চোখে ভেসে উঠল বাটুর কথা।

"দুটো দিন।"

এবং তখনই মনে পড়ল, তাকে আবার সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠতে হবে। হৃৎপিণ্ডের অসুখ এবং হৃদয়ের ইচ্ছা, এই দুইয়ের মধ্যে কাকে সে প্রাধান্য দেবে। মিহির ফাঁপরে পড়ল মুহূর্তে ঠিক করে ফেলল, মাঝে মাঝে বেপরোয়া হওয়া দরকার। হৃৎপিণ্ড চোট পাবে, তার প্রতিক্রিয়ায় হয়তো আয়ু কিছু কমবে, কিন্তু বিনিময়েও কিছু পাওয়া যাবে। অপ্রত্যাশিত স্নেহ পাওয়ার জন্য বাটুর কৃতজ্ঞ চাহনি এবং তাব নিজের সুখ।

কিন্তু তিনতলায় আবার পৌঁছে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিহির জেনে গেল, সে নিজেকে মিথ্যা যুক্তি দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করছে। স্নেহ, সুখ, বাৎসল্য, এ-সবই বাজে কথা, সে আবার আরতিকে দেখার জন্যই উঠে এসেছে। চকোলেট দিতে আসাটা অজুহাত মাত্র। আরতি আবার নতুন করে তার মধ্যে কামনা সঞ্চার করেছে, শরীরকে আবিষ্ট করছে উত্তেজক ইচ্ছায়। প্রণব বলছিল: "ওকে দেখামাত্র বুকের ভেতরটা কীবকম করে ওঠে; ধকধক আওয়াজ হয়, হাত পা কাঁপতে থাকে...কী যে অদ্ভুত আর কী যে ভয়ংকব এটা.. আমার যা ঘটেছে, তোরও তা ঘটতে পারে কোনওদিন।"

কোনওদিন নয়, মাত্র তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই সে প্রণবকে অযৌক্তিকতা থেকে আবার যুক্তির গণ্ডিব মধ্যে ফিরিয়ে নিল। এখন সে আব প্রণব পাশাপাশি, দু'জনেই একই স্তরে, একই সমস্যার সামনে— দাউ দাউ কামনা। একে কি গ্র্যান্ড প্যাশন বলা যেতে পারে?

মিহিব ঠকঠক শব্দ কবল। আলোর রেখা ফুটল দরজায়।

"কে।"

"আমি, মিহির।"

কপাট খুলে দাঁড়াল আরতি। স্বভাবতই চোখে বিস্ময়। হাতের চকোলেট তুলে ধরল মিহির। "ও ম্মা! তুমি মনে রেখেছ!"

মিহিরের খেয়াল হল, আরতি চকোলেট ভালবাসে। ওর ব্যাগে প্রায়ই চকোলেট রেখে দিত। চকোলেট মুখে রেখে রিহার্সাল দেবার সময় একবার সুহাস মুখুজ্জে ওকে দারুণ ধমকেছিল।

এই অবস্থায় এই সময়ে চকোলেট নিয়ে ফিরে আসা উচিত হয়নি। কিংবা অবচেতনে এটাই ছিল। আরতি নিশ্চয় ধরে নিয়েছে, তার জন্যেই সে এনেছে ওর হাসিটায় সেই রকম ইঙ্গিতই রয়েছে।

"বাটুর।"

"হাঁপাচ্ছ এখনও, একটু বসে যাও।"

"না।"

"কেন, দোষটা কী। আমাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি তো আর নেই।"

আরতির পাশ দিয়ে সে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল। অনেকটা তার ফ্ল্যাটের মতোই ছকটা, কলকাতার সব ফ্ল্যাটেরই এক ধাঁচ। বাটু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। মাধুদি রান্নাঘর থেকে গামলায় কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে এসে যে টেবলে রাখল সেটা তার চোখেই পড়েনি। জনাচারেক বসে খাওয়ার মতো আয়তন। বাটুকে বোধহয় খেতে দিচ্ছে। ছায়া পরোটা করে খাইয়েছে। নিশ্চয় পেট ভরেই খেয়েছে।

"তোমার কেনা টেবলটা এখনও রয়ে গেছে...ওতেই আমরা খাই।"

"সেটা এখনও আছে আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্যের। কত যেন... পঁচিশ না তিরিশ দিয়ে ফুটপাথে বসা একজনের কাছে কিনেছিলাম। বাজে কাঠ, এতদিন তো থাকার কথা নয়। ওটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা এখনও কিনে নাওনি?"

মালতী দত্তর টেবলটাকে মনে পড়ল তার। বিরাট অভিজাত কিন্তু পালিশ-চটা।

"কিনব। একটা দেখে রেখেছি।"

দুটো রুটি আর ছেঁচকির মতো কিছু বস্তু স্টিলের থালায় মাধুদি রেখেছে। বাটু অসম্মতি জানিয়ে ঘাড় নেড়ে ফিসফিস করে কিছু বলল ওকে।

"বাটু বড্ড রোগা, ভাল পুষ্টিকর খাদ্য দরকার।"

"তুমি অনায়াসেই কিছুক্ষণ বসতে পারতে।"

"না এবার থাক। সারাদিনই... বড্ড টায়ার্ড লাগছে।"

হঠাৎ আরতি খপ করে মিহিরের ডান হাতটি ধরে ওকে জোরে সামনে টানল।

"এইখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরের লোকেরা ওঠানামা করে।"

মিহির এক পা এগিয়ে এসেছে টানের জন্য। এখন আরতির দেহ ছুঁয়ে তার দেহ। হুইস্কির গন্ধ এবং ওর চুলে মাখা কোনও তেলের সুগন্ধি মিশে বিদ্‌ঘুটে একটা গন্ধ মিহিরের নাকে এল। আরতি বাঁ হাতে বাহু আঁকড়ে ধরে আবার টানল। শিথিল বুকের নরম মাংসে বাহুটা লেগে রয়েছে। ম্যাক্সির নীচে কিছু যে পরেনি সে বিষয়ে মিহির নিশ্চিত এখন।

আরতির পাশ দিয়ে সে তাকাল। বাটু চট করে চোখ নামিয়ে পিছিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। মিহিরের বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ঘুসি আঘাতের জন্য উদ্যত। কী ভাবল বাটু।

"সত্যিই ওর নিউট্রিশন দরকার... কিছু টাকা দাও না।"

ফিসফিস আরতির স্বর। বাঁ হাতের আঙুলগুলো বাহুটাকে কচলাচ্ছে। হুইস্কির গন্ধ নাকের কাছে আরও তীব্র হয়ে এগিয়ে এসেছে।

চার

ফটকেব সামনে দাঁডিয়ে মিহিব তৃতীয়বাব ঘড়ি দেখল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সে অপেক্ষা করেছে। একটু দূবে গাডিতে আবদুল কাত হয়ে হেলান দিয়ে, সম্ভবত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। ফটক থেকে সে ভিতরে তাকাল। একটা লোক, সম্ভবত মালিই হবে, খালি গা, পরনে লুঙ্গি, একটা জলের ঝারি নিয়ে বাড়িটাব পিছন দিকে চলে গেল, তার সঙ্গে একটা কুকুর।

পুষ্প আসবে কি আসবে না, এই নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না এখন। সে জানে, হাতে যখন টাকা নিয়েছে পুষ্প আসবেই। কিন্তু কখন?

'স্যারেব ছবির সামনে দিদি রোজ ঘণ্টাখানেক বসে থাকে, ফুল দেয়।'

সেই বসে থাকাটা আজ কখন শুরু হবে। ছবিটা সরিয়ে ফেলা পুষ্পর পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়। এক হয় চুরি করাতে পারলে। আরও সহজ দুটো ছেলেকে দিয়ে ডাকাতি করালে।

বড়জোর শ'খানেক টাকা কিংবা আরও কমে। এই রকম সকালে। মিহির চারপাশে তাকাল। একটা সাইকেল ভ্যানে দুধওয়ালা যাচ্ছে, রাস্তার গঙ্গার জলের হাইড্রেনটে বাসন মাজছে এক দেহাতি স্ত্রীলোক। এক কিশোর খবরের কাগজের হকার, দূবে একটা খালি ট্যাক্সি, এ ছাড়া সন্ত্রস্ত হবার মতো কিছু তার চোখে পড়ল না।

দরজা খুলবে পুষ্প। ধাক্কা দিয়ে ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে, চেঁচিয়ে ওঠার আগেই মুখটা বেঁধে ফেলবে। বোমা বা পিস্তল পাইপগান দরকারই হবে না, সুতরাং শব্দটব্দও হবে না। ওদের বলা থাকবে কী কী জিনিস চাই। মালতী দত্ত ছবির সামনে ধ্যানে বসে তা হলে পিছন থেকে গিয়ে মুখ বেঁধে ফেলা।

বড়জোর মিনিট দুই কি তিন। ব্যাপারটা এত সহজ ও নিরাপদ যে ছেলেদুটো চা বানিয়ে খেয়ে নিতেও পারবে। আলমারি কি ড্রয়ার বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই; এটা বলে দিতে হবে। জিনিসক'টা নিয়ে, যাবার মতো আসবেও খুব ধীরেসুস্থে। যেন বুড়ি পিসিমা কি মাসিমাকে দেখে ফিরে যাচ্ছে। গাড়িটা নিয়ে সার্কুলার রোডে থাকব। ওরা এসে উঠবে।

পুলিশে খবর দিতে পাবে। পারে কেন, ধরে নেওয়া যাক দেবেই। পুলিশ তো যথারীতি তদন্তটদন্ত

করবে। ছেলে দুটোকে বলে দিতে হবে, ঘড়ি, গয়না কি দামি আর কিছু থাকলে দু'-একটা যেন নেয়। এ-সবের বেশি আর কী ওখানে পাবে। চুরির একটা উদ্দেশ্য তো জানাতে হবে।

এটা নিয়ে খবরের কাগজে যদি নিউজ করা যায়, তা হলে কেমন হয়। মালতী দত্ত নামে এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার হেফাজত থেকে অনন্তলালের চিঠি, ড্রয়ারে রক্ষিত চটি, রুমাল, ভাঙা চশমা, কলম...অপ্রকাশিত ছবি, সব ডাকাতি হয়ে গেছে। কথা উঠবে, কার উদ্দেশে চিঠি, কী আছে ওইসব চিঠিতে...মালতী দত্তই বা কে? এ-সব জিনিস ওর কাছে ছিল কেন? ব্যস, মালতী দত্ত কুঁকড়ে যাবে, মুখ খুলবে না।

ক'দিন ধরে বাজার সরগরম রাখতে পারলে স্টোরিটা খাবে। ত্রিকালে ছবিগুলো বা চিঠি কি ডায়েরি বেরোলেই কথা উঠবে, পেল কী করে? ওরাই কি ডাকাতি করিয়েছিল?

মোটেই না। ত্রিকাল সম্পাদক ওগুলো একটা আঁস্তাকুড়ের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছে পুঁটলি করা অবস্থায়, তার বাড়ির কাছে। পেয়েই ছবি তুলে রেখে জিনিসগুলো থানায় জমা দেয়। নিছকই অ্যাকসিডেন্ট!

পুলিশের কাছে পুষ্প হয়তো বলতে পারে: "ওই বাবুই আমার কাছে এই চুবি যাওয়া জিনিসগুলোই চেয়েছিল, বলেছিল ঘণ্টাখানেকের জন্য দাও ছবি তুলে নিয়ে ফেরত দেব।"

পুষ্প বলবে না। টাকা হাতে নিয়ে... মিহির তার চিন্তা বন্ধ করল। পুষ্প আসছে। ছোট দ্রুত পদক্ষেপ। চোখের উৎকণ্ঠা মিলিয়ে গেল মিহিরকে দেখামাত্র। ওর হাতে কিছু আছে কি না সেটাই সে দেখার চেষ্টা করল।

পুষ্প ফটক থেকে বেরিয়ে ডান দিকে কয়েক গজ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, পাঁচিল ঘেঁষে। মিহিব মন্থবগতিতে ওব দিকে এগোতেই পুষ্প দু'ধারে তাকাল ষড়যন্ত্রকারীর চোখ দিয়ে।

"কালকেই কিন্তু ফেরত দেবেন।"

পুষ্প তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, আঁচলেব মধ্য থেকে হাতটা বাব করে আনল। পুবনো কাগজে মোড়া সুতুলি দিয়ে বাঁধা পাতলা একটা খাতাব মতো কিছু। মিহিরের হাতে প্রায় গুঁজেই দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওব মনে পড়ল, এইভাবেই গা ঘেঁষে কাল আরতিও দাঁড়িয়েছিল, এইভাবেই পুষ্পব হাতে সে নোট ধবিয়ে দিয়েছিল।

"কাল নয় পরশু। এটা?"

"দিদি যা মাঝে মাঝে লিখত... যদি হঠাৎ খোঁজ কবে তা হলে কী বলব?"

কাতব অনুরোধ ও ভয় পুষ্পব চোখে। মিহির আঁকড়ে ধরল হাতেব জিনিসটা। এখন এটা তার।

"পবশুই কিন্তু নিয়ো, দিদি তো অসুস্থ। এখন কি আর লিখতে বসবে? ছবিব কী হল, সেই অল্প বয়সের গ্রুপ ফটোটা!"

"আগে এটা ফেবত দিন।...আমার কিন্তু কেমন ভয় হচ্ছে।"

"কিচ্ছু চিন্তা কোবো না। তোমাব টেবিল আমি কিনব। আর যা আছে তা-ও বিক্রির ব্যবস্থা করে হাজাব দু'-তিন টাকা যাতে পাও দেখব। তোমাব ভাইপোর জন্য কাজের ব্যবস্থাও করব। পবশু এই সময়...ছবিটা।"

পুষ্পব চোখে স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখার জন্য মিহির তাকাবার দরকার মনে কবল না। সে দ্রুত এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

সার্কুলাব রোড ধবে চৌবঙ্গি বোডে গাডি পৌঁছতেই মিহির বলল, "এত সকালে অফিস যাব না আবদুল; তুমি আমাকে বরং ভিক্টোরিয়ার সামনে নামিয়ে দিয়ে অফিস চলে যাও। আমি নিজেই ট্যাক্সি কি মিনিবাসে কবে চলে যাব।"

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেব উত্তর ফটকেব সামনে অরবিন্দর মূর্তির কাছে মিহির নেমে পড়ল, ব্রিফকেসটা নিয়ে ব্রিগেড প্যারেড মাঠটার পশ্চিমে মোটা গুঁড়ির বহু ডালপালায় ঝাঁকড়া কতগুলো গাছ আছে। তারই একটাব ছায়ায় কাত হয়ে একহাতের তালুতে মাথাটা তুলে রেখে সে দেখবে বা পড়বে পুষ্পর দেওয়া জিনিসটায় কী আছে।

রোদের ঝাঁঝ এখনও সহনীয়। মৃদু বাতাসও রয়েছে। ফুটবল হাতে কয়েকটি ছেলে, যাদের দেহের

ঘামশুকনো চামড়া ফ্যাকাশে, এবং চোখে গ্রন্থি, মিহিরের পাশ দিয়ে ক্লান্ত পায়ে চলে গেল। রাস্তা দিয়ে মোটর, ট্রাক ইত্যাদি অনর্গল ধেয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার শব্দ একাগ্রতায় বিঘ্ন না এনে বরং আবহসংগীতের কাজই করছে। পুবের কয়েকটা বহুতল বাড়ির গাম্ভীর্যে পরিবেশ প্রশান্ত।

লাইনটানা আলগা পাতার একটি খাতা যার নরম মলাটে ঘোড়সওয়ারের ছবি। বহু বছর আগে কৈশোরে, মিহির এমন মলাটের খাতায় লেখালেখি করেছে। খাতার সর্বাঙ্গে, ভিতরের লেখার বিবর্ণপ্রায় কালিতে এর বয়স ঘোষিত।

মলাটে বহু কাটাকুটি। অস্থির মনের কাজ বোঝাই যায়। "স্মৃতিকথা", "মহাপুরুষ সান্নিধ্যে" লেখা দুটো কেটে তলায় লেখা "ছিন্নসুখ"। তারপাশে "বিনীত নিবেদন— এই খাতা কেউ যদি পান, দয়া করে এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করে এক মহাপুরুষকে অবমাননা করবেন না।" এই নির্দেশটি চৌকো বাক্সের মধ্যে লেখা।

খাতা পড়ার আগে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাতাগুলোয় সে দ্রুত চোখ বোলাল। বহু পাতাই অর্ধেক সাদা, নানা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অনেক পাতায়, তারিখ দেওয়া আছে এবং সেগুলি দীর্ঘ ব্যবধানের।

মালতী দত্ত গুছিয়ে, মনস্থির করে সম্পূর্ণ নিটোল কোনও আত্মজীবনী বা স্মৃতি রোমন্থন করেনি। খাতার শেষ গোটা দশেক পাতায় আঁচড়ই পড়েনি। খাপছাড়াভাবে হঠাৎ লেখা বন্ধ হয়েছে। ঝোঁকের মাথায় শুরু করে হয়তো, বুঁদ হয়ে ডুবে গেছল অতীতের দিনগুলোতে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে আর হয়তো লিখতে ইচ্ছে করেনি। মিহিরের নিজেরও এ-রকম হত আরতি চলে যাবার পর কিছুদিন। অবশ্য সে-সব দিনের কথা লিখে রাখার কোনও স্পৃহা তার জাগেনি।

গোটা স্পষ্ট মেয়েলিছাঁদের পরিচ্ছন্ন অক্ষর। মালতী দত্তর লেখার হাত যে আছে, প্রথম পাতাটি পড়েই মিহির তা বুঝে গেল। কিন্তু শৈশব থেকে মালতী দত্তের জীবন জানার মতো সময় বা ইচ্ছা এখন তার নেই। সে পাতা ওলটাতে লাগল অনন্তলালের সঙ্গে ব্যাপারটা কোথায় আছে পাওয়ার জন্য।

খাতার এক-চতুর্থাংশ পর ১৯ জানুয়ারি তারিখের লেখায় মিহির প্রথম দেখতে পেল 'স্যার' শব্দটিকে।

"হাসপাতালে স্যারের অধীনে প্রায় আটজন ছাত্র-ছাত্রী লেবরেটারিতে কাজ করত। আমরা, জনাছয় পুরুষ ও মেয়ে সহকারীরূপে চাকরি করতাম। উড়িষ্যার এক রাজা তাঁর বাড়িটি স্যারকে দান করার পর লেবরেটারি এই বাড়িতে উঠে আসে। সেই সঙ্গে দোতলায় একটি নার্সিং-হোমও এখানে খোলা হয়। তাঁর দু'জন ছাত্র ডাক্তার তা দেখাশোনা করত। তাদের একজনের নাম প্রসাদ সিংহ। যাদের উপর গবেষণা করতেন তাদের তিনি এখানে রাখতেন। বেশির ভাগই ছিল শিশুরোগী, আমি ওদেরও দেখতাম। যাতে সারাক্ষণ ওদের কাছে থাকতে পারি সে-জন্যই স্যার এখানে আমায় থাকতে বলেন বাড়ি থেকে চলে এসে। আজ ভাবলে অবাক লাগে এত বছর তাঁর সঙ্গে কাটালাম কিন্তু কী নিয়ে যে তিনি গবেষণা করছেন তা আমি জানতাম না। জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। জানার মতো বিদ্যাবুদ্ধিও ছিল না। রোগী, যন্ত্রপাতি, খাতাপত্র, হিসাব, গিনিপিগ আর কয়েকটা বাঁদর দেখাশোনা, তদারকি ছিল আমার কাজ।" এরপর রয়েছে কাজের ফিরিস্তি, পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সযত্নে বর্ণিত। মিহির পাতা ওলটাল। এ-সব পরে লাগবে। হঠাৎ একটা পাতার মাঝামাঝিতে তার চোখ আটকে গেল।

তেসরা ফেব্রুয়ারি।

"প্রসাদ আবার আমায় চিঠি দেয়, সেই একই অনুরোধ করে, দেখা করো। ওর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা যে হয়েছিল তা আজ স্বীকার করতে ভয় পাই না। স্যার হয়তো কিছুটা আঁচ করেছিলেন। তখনও স্যার জানতেন না আমি তাঁর সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করি।

"প্রসাদের সঙ্গে আমি দেখা করিনি। ও তাতে চটেছিল, ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। যথাসম্ভব ওকে এড়িয়েই চলতাম। কিন্তু শুধু প্রসাদ কেন সকলেই ততদিনে সচেতন হয়ে গেছল, যদিও কেউ কোনও প্রমাণ পায়নি, স্যারের প্রতি আমার মনোভাবটা আমার কাজের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে গেছে। প্রসাদ খুব চটপটে, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান। ওর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, এটা স্যারও বলতেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিতেন। তখন কি আমার মনে হত, প্রসাদকে বিয়ে করে সংসারী হব? বোধহয় মনে হত না, তবে চিন্তাটা মনে এসেছিল

নিশ্চয়ই বিশেষত বাড়িতে যখন অসহ্য অবস্থা তৈরি করত বাবা আর ভাই এবং সেটা ওরা প্রায়ই করত।

"আমি জানতাম প্রসাদকে ভালবাসিনি, স্যারকেই বেসেছি। ওঁকে দেখার প্রথম দিন থেকেই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে আমার মনে হয়েছে উনি আমার নাগালের বাইরে। অনেকে ওঁকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করত। নামী অধ্যাপক, ডাক্তার, বিরাট গবেষক বলতে যে হামবড়াভাব মনে আসে উনি মোটেই তা ছিলেন না। কখনও গোমড়া হতে দেখিনি। স্কুলের উঁচু ক্লাসের দুষ্টু ছেলের মতো ওঁর মুখে সর্বদা একটা চনমনে ভাব খেলা কবত। অথচ কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। নোবেল প্রাইজ পাবার যোগ্যতা আছে বলে অনেকের কাছেই শুনেছি।

"কাজের সময় পাব হয়ে গেলেও আমি নানা ছুতোয় আরও কিছুক্ষণ থাকাব চেষ্টা করতাম ওঁর কাছাকাছি। একদিন সন্ধ্যার পরও আমায় দেখে বললেন· 'কী গো বাছা এখনও বয়েছ যে!'

"সব মেয়েকেই 'বাছা' বলতেন, কাবণ কিছুতেই নাম মনে রাখতে পাবতেন না। বললাম, 'কিছু নয় স্যাব এমনিই বয়েছি, যদি আপনার কোনও দরকার হয়।' উনি একটু যেন ত্যাবচা স্ববে বললেন, 'দবকাব, আমাব জন্য? মনে হচ্ছে বাড়ি যাবার ইচ্ছে টিচ্ছে যেন নেই।' বললাম, 'এখানে থাকতে ভাল লাগে।' বললেন, 'কী কাণ্ড! তা হলে প্রসাদের কী হবে! ওব সঙ্গেই তো তুমি...।'

"কী যে লজ্জায় পড়েছিলাম তখন। কোন দিকে যে তাকাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। উনি যে ইচ্ছে কবেই এ-সব বলেছিলেন তা আমার মনে হয়নি। ববং পরে মনে হয়, একধবনেব লাজুকতা থেকেই ওইভাবে বলেছিলেন যেন নিজেকে নিয়ে মজা করাব জন্য।

"তখন মনে হয় প্রসাদকে কি ঈর্ষা করেন? 'তোমাদেব কি ঝগড়া হয়েছে?' এমন প্রশ্নে হকচকিয়ে গিয়ে বলি, 'না, না, আপনি যা ভাবছেন তেমন সম্পর্ক আমাদের নয়। আমবা বন্ধুই ছিলাম।' বললেন, 'ছিলাম মানে? এখন আব নও?' বললাম, 'আমাদেব শুধু এখানেই দেখা হয়, অন্য কোথাও নয়।'

"আমাদের কথা হচ্ছিল লেবরেটোরির লাগোয়া ওনাব নিজস্ব ঘরে। ঘরেব একধাবে গদিমোড়া একটা উঁচু চওড়া বেঞ্চ, রোগীকে শুইয়ে পবীক্ষাব জন্য। আব একধাবে বেসিন।

"উনি হাত ধুলেন মন দিয়ে। যেন এইমাত্র অপাবেশন শেষ কবলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন অশান্তিতে পড়েছেন। অনেকক্ষণ আমাব এগিয়ে ধরা তোয়ালেতে হাত মুছলেন। টেবলে এটা-ওটা সবালেন, গোছালেন। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে দুটি হাত আমাব দু' কাঁধে রাখলেন, কেমন অপবিচিত ধরা গলায় বললেন, 'প্রেমে পড়েছ?' 'ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।' 'তুমি জানো আমি বিবাহিত?' 'হ্যাঁ।' 'তোমার বয়সি আমার ছেলে আছে।' 'অনেক ছোট, মাত্র কুড়ি বছব বয়স।' 'আই সি, আমাব সম্পর্কে তা হলে খবব রাখো দেখছি।'

"ওঁর বাড়িব সব কিছুই জানি। ওঁব স্ত্রী, ছেলে, এমনকী বাড়িটা কোথায় তা-ও জানি। বললেন, 'তুমি কী আশা কবো?' 'কিছুই না।' 'বেশ, তা হলে এইটুকুই। আমাব পক্ষে কিছু সম্ভব নয়।' উনি কি অনুভব কবেছিলেন আমার ভালবাসা কোন পর্যায়ের, আমাব আগ্রহ উদ্বেগ নিবেদনকে?

"'অদ্ভুত মেয়ে তুমি।' এই বলে অত্যন্ত কোমলভাবে দু'হাতে আমায় জড়িয়ে ধবলেন। কপালে চুমু খেলেন; তারপব ঠোঁটে।"

এরপব পাতাটায় আরও কিছু মালতী দত্ত লিখেছিল। কিন্তু সেই অংশটুকু ছিঁড়ে ফেলা। মিহিরের মনে হল সম্ভবত এরপর ওরা রোগী দেখার বিছানাটা ব্যবহার করেছিল; কিন্তু সে-কথা লিখেও মালতী দত্ত লজ্জাবশত রাখতে চায়নি।

এরপর ১২ *ফেব্রুয়ারি।*

"আমার সারা জগৎ উনিই। ওঁকে ছাড়া আমি কিছু ভাবিনি, জানিওনি। আমার এই মনপ্রাণ ঢালা ব্যাপারটায় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমনও হয়েছে, একটা গোটা সপ্তাহ উনি আমার দিকে না তাকিয়েই কাটিয়েছেন, যদিও জানতেন আমি ওঁর কাছেই থাকব, যেমনই আচরণ করুন না কেন।

"অন্যদের প্রতি যেমন ব্যবহার করতেন, আমার প্রতিও তাই, প্রায় বাবার মতো এবং হেলাফেলা ধরনের স্নেহভরে। কখনও কখনও মনে হত, মানুষের প্রতি ওঁনার কোনও আগ্রহ নেই। নিজের অমূল্য সময় এবং স্বাস্থ্য বিসর্জন দিয়ে তিনি তাদের ভাল করে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন। বিশেষ একটি মানুষের কোনও অস্তিত্বই যেন ওঁর কাছে নেই।"

পাতার কিছুটা সাদা রেখে আবার একটি লাইন: "আমি যে আইবুড়ো জীবন কাটাব তখনই সেটা জেনে যাই। সেই সম্ভাবনায় মোটেই কাতর হইনি। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না।"

এখন ওঠে না, কিন্তু তখন তো উঠতে পারত। মিহির চিত হয়ে মাথার নীচে ব্রিফকেসটা রেখে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশে তাকাল। আজও ভ্যাপসা গুমোট হয়তো থাকবে। বাতাস মাঝে মাঝে বন্ধ থাকছে। ঘষা কাচের মতো মেঘলা আকাশ যদিও পূর্বদিকে পরিষ্কার।

'ওহ্ দ্যাট উওম্যান' ডক্টর প্রসাদ সিনহা তা হলে চোট পেয়েছিল। এই বুড়ো বয়সেও সেটা ভুলতে পারেনি। 'স্যার অনেক উপরে উঠতে পারতেন কিন্তু ওই মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে কেমন গেঁতো হয়ে গেলেন... সারভেন্টস কোয়ার্টাসে এনে রাখলেন, ওখানেই মন পড়ে রইল স্যারের, কাজে ঢিলেমি এল।'

অনন্তলাল সত্যিই কি অনেক উপরে উঠতে পারতেন? গবেষণা অভ্রান্ত পথে যাচ্ছে, এমন প্রত্যয় কি ওঁর শেষদিকে ছিল? কাজে ঢিলেমি কি গেঁতো হয়ে যাওয়া কি শুধুই মালতী দত্তর জন্য?

মিহির তার প্রশ্ন বা সন্দেহগুলোকে নিয়ে কিছুক্ষণ মনের মধ্যে উত্তর খুঁজল এবং অচিরেই জট পাকিয়ে ফেলল। কোনও পুরুষের উপরে উঠতে না পাবার জন্য বিশেষ কোনও মেয়েমানুষ কি দায়ী হতে পারে? বিশেষত মালতী দত্তর মতো কায়মনোপ্রাণ যে সমর্পণ করেছে! বৃদ্ধ অনন্তলাল কি যৌনতার ফাঁদে পড়েছিল? এ-রকম তো কত সাধু-যোগী, রাজনৈতিক নেতা, কত ব্রহ্মচারী পালোয়ানের জীবনেও ঘটেছে। কিন্তু মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু কি ঢিলেমির জন্য দায়ী হতে পারে না? কান ফাটানো হর্নের শব্দে মিহির একবার ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল। দুটো মিনিবাস পাশাপাশি পাল্লা দিচ্ছে। অফিস টাইম এসে গেছে। খাতাটা সে চিত হয়ে দু'হাতে চোখের সামনে ধরল।

২৭শে ফেব্রুয়ারি

"দিনটা আমার মনে আছে। ২২শে মার্চ। স্যার দুপুরে এলেন। আমি ছুতো করে পুষ্পকে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাইবে পাঠালাম। পুষ্প জানে কেন পাঠালাম। যাবার সময় মুচকি হেসেছিল।

"শুধু যখন মনে মনে ওঁকে চিন্তা করি তখনই অন্তু বলে ওঁকে ডাকতাম। নয়তো আমাদের ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তেও উনি ছিলেন স্যার, আপনি বলতাম। উনি সব সময়ে কৌতূহলভরে আমার দিকে তাকাতেন, ভাবখানা যেন আমাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। 'এই জীবন নিয়ে তুমি কি সুখী?' আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলেন, 'খোলাখুলি বলতে কোনও সংকোচ কোরো না।' বলেছিলাম, 'আপনার কাছে থাকলে আমি সুখী।' 'আর অন্য কোথাও?' আমি চুপ কবে ছিলাম। 'তুমি কি নিজের ঘরসংসার, সন্তান চাও না?'

"ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট স্বরে বলেছিলাম, 'না।' স্যারের মুখে গভীর রেখা ছিল। যখন উনি এ-ভাবে কথা বলতেন তখনই ওঁকে অন্য রকম লাগত; মনে হত বাবা যেন মেয়েকে মনের কথা খুলে বলার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। আমার নিজের বাবা কখনও তা করেননি।

"ওঁর গলায় কেমন যেন একটা মিঠে বিদ্রূপের আভাস ছিল যখন বললেন, 'তার মানে তুমি আইবুড়ো রয়ে যেতে চাও।'

"উনি এটা বিশ্বাস করতে পারেননি। মনে মনে একটা সন্দেহ ছিলই, হয়তো কোনওদিন আকর্ষণীয় কমবয়সি কারওর সঙ্গে আমার দেখা হবে আর সবাই যা করে আমিও তাই করব। উনি জানতেন না, যদি চাইতাম তা হলে প্রসাদকে বিয়ে করতে পাবতাম; আর করিনি যে সেটা ওঁরই জন্য।

"ওইদিনই আমি স্থির করে ফেলি, আর সাজগোজ নয়, আর কোনও অল্পবয়সি পুরুষদের সঙ্গে অযথা কথাবার্তা নয়। শরীর থেকে যাবতীয় চটক তুলে ওঁর বয়সের সঙ্গে মানানসই হবার চেষ্টা এরপর শুরু করি।

"আমার এক স্কুল শিক্ষিকা মাসিমা ছিলেন। মায়ের মেজদি। তিনি একা থাকতেন একটি ঘরভাড়া নিয়ে। বিয়ে করেননি। তাঁর কথা তখন বার বার মনে পড়ত। শুনতাম কলেজে পড়ার সময় মেজমাসি নাকি এক তরুণ অধ্যাপককে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু সেই লোকটি পরে অন্য একজনকে বিয়ে করেন। বিয়ে করার বছর চার পরই অধ্যাপক আলসার অপারেশন করাতে গিয়ে মারা যান। মেজমাসি আমিষ খাওয়া ছেড়ে থান পরতে শুরু করেন।

"একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন মেজমাসি। সুখ কী জিনিস, তা কি উনি জেনেছেন? সুখে কি

জীবন কাটিয়েছেন? একবার রাস্তায় প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলাম। তখন ওঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। মাসিদের মধ্যে উনিই ছিলেন সুন্দরী। মাথা নিচু করে হাঁটছিলেন, আমায় দেখতে পাননি। রোগা হয়ে গেছেন ফলে এক ধরনের কাঠিন্য ওঁর শরীরে এসে গেছে। আমি মেজমাসিকে এড়িয়ে পাশ দিয়ে চলে যাই।

"স্যার সেদিন বলেছিলেন, 'মিলু তুমি কেমন যেন অদ্ভুত মেয়ে।' কদাচিৎ আমার ডাকনামটা ওঁর মুখ থেকে শোনার ভাগ্য আমার হয়েছে। ওঁর চোখ দুটো যথারীতি দুষ্টুমিতে ঝকঝক করছিল। বোঝা শক্ত, আমাকে নিয়ে মনে মনে হাসছিলেন কি না। তবে মনে হয়েছিল হাসছিলেন না; আমি বোধহয় প্রথম সেদিন ওঁর মন স্পর্শ করেছিলাম। 'ঠিক আছে, এবার তা হলে দেখা যাক ভবিষ্যৎ কী নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

"ওই সপ্তাহেই স্যার বাড়িটা সম্পর্কে দলিল করেন। তাইতে আমাকে এই কোয়ার্টাসে আজীবন বসবাসের স্বত্ব দিয়ে যান। ভাড়ার টাকা পাবারও।"

এরপর কিছু লাইন ফাঁকা। সম্ভবত কলমে কালি ফুরিয়ে যাওয়ায় লেখা বন্ধ করে দেন। অক্ষরগুলো শেষদিকে অস্পষ্ট এবং বার বার নিব ঘষার দাগ রয়েছে। পরে যে তার তারিখ নেই, হয়তো ভুলে গেছেন।

"প্রসাদ 'শুভ বিবাহ' লেখা খাম আমার হাতে দিয়ে, সে যে দারুণ সুখী এটা বোঝাবাব জন্য আমাব কাঁধে হাত বেখে বড় করে হেসে বলেছিল, 'তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে।' খুব শান্ত স্বাভাবিক স্বরে বলেছিলাম, 'বিয়ে নাকি, কাকে?' 'চিনবে না তুমি, স্যার জে সি গুহ'র মেয়ে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কবছে কেমিস্ট্রিতে।' অর্থ, বিদ্যা, সামাজিক পরিচয়ে যে আমার থেকে অনেক উঁচুতে ওর প্রতিটি উচ্চাবণে সেটা বেজে উঠছিল। আমার কিন্তু কোনও দুঃখ, ঈর্ষা বা অনুতাপ হয়নি। হালকাভাবেই বলেছিলাম, 'ভাবসাব করে না ঘটক দিয়ে?' প্রসাদ বলল, 'মাস দুয়েকেব আলাপ। প্রথম দর্শনেই যাকে বলে প্রেমে পড়া।'

"এটা ও মিথ্যা বলেছিল। স্যার জে সি গুহ স্যারের বন্ধু ছিলেন। তিনিই বিযের উদ্যোগ নেন। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় যখন, বিয়ে তখন এক রকম স্থির হয়েই গেছল। প্রেমে পড়া বা না-পড়ার কথাই তখন ওঠে না। প্রসাদ শ্বশুরের টাকায় সস্ত্রীক বিলেত যায় এম. আর. সি. পি. করতে। এ-সব পরে জেনেছি। কিন্তু সেদিন প্রসাদ আমার হতাশ ম্লানমুখ দেখতে চেয়ে কিন্তু ওকেই হতাশ হতে হয়েছিল। বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।' তাইতে বলি 'আমাদেব কথা কি ওকে বলেছ?' ও যেন নিভে গেল। বলল, 'পাগল হয়েছ, এ-সব কি বলা যায়? যাক গে, তোমাব খবব কী?' বললাম, 'আমার কী খবর?'

"'মহানপ্রেম, মহান আত্মনিবেদন, আজও চালিয়ে যাচ্ছ?' ওর গলায় বিদ্রূপ ছিল তো বটেই, আড়ালে কিন্তু বেদনাও ছিল। বললাম, 'কেন, এটা কি অদ্ভুত হাস্যকর কিছু?'

"প্রসাদ কিছুটা দমে গিয়ে বলে, 'তা বলছি না, ভালই তো। স্যার অসাধারণ ভাগ্যবান। তবে কি জানো, দশ কি পনেরো বছর পর কী হবে সেটাই ভাবছি।'"

মিহির অবাক হয়ে গেল কথাগুলো পড়ে। ঠিক এই বকম কথাই না সে প্রণব সম্পর্কে ভেবেছিল: 'ছ'মাস কি ছ' বছর পর ওর কী হাল দাঁড়াবে? মাত্র গতকালই ভেবেছিল।

কী উত্তর দিল মালতী দত্ত! সে উঠে বসল তীব্র কৌতূহল নিয়ে। প্রসাদের সঙ্গে তার নিজের কি কোনও মিল সে দেখতে পাচ্ছে? মালতী দত্ত'র সঙ্গে বনানীর? অন্তত চার দশকের ব্যবধান তাঁদের মধ্যে। তা ছাড়া মালতী একেবারেই আলাদা স্বভাবের। বনানীকে সে দেখেনি বটে তবে প্রণবের প্রতি এই ধরনের আবেগ কি আত্মনিবেদন নিশ্চয় নেই।

'আত্মনিবেদন' শব্দটা যে প্রসাদের সংলাপ থেকেই সে ধার করেছে সেটা মিহির সঙ্গে সঙ্গেই খেয়াল করল। বিরক্ত হল নিজের উপর। ঝুঁকে পড়ল খাতায়।

"মেজমাসির কথা মনে পড়ল। প্রসাদকে বললাম, 'আমার এক মাসি, বিয়ে না করে আলাদা পনেরো বছর জীবন কাটাচ্ছে। খুব অসুখী তো তাকে মনে হয় না।' ও বলল, 'তোমাকে বিয়ের কথা বলব বলব করেও পারিনি।' আমি স্বাভাবিক গলায় বলেছিলাম, 'কেন পারোনি?' বলল, 'মনে হয়েছিল তুমি না

বলবে। ঠিক কি না?' বললাম, 'হ্যাঁ ঠিকই।' হঠাৎ ও বলল, 'কেন?' বলেছিলাম, 'তা আমি জানি না। আমার নিজেকে কেন জানি মনে হয়, যেন সেই সন্ন্যাসিনী যে নিজেকে উৎসর্গ করার তাগিদ বোধ করেছে।' প্রসাদ শুকনো হেসে বলেছিল, 'তা হলে তোমার একজন ঈশ্বর দরকার।'

"জীবন কেমন নদীর মতো বয়ে চলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই প্রবাহে বিজবিজ করছে অথচ প্রত্যেকেই নিজস্ব এক একটা জগৎ বহন করে যাচ্ছে, যার কেন্দ্রে সে নিজে। চারপাশের জগতে কী ঘটছে না ঘটছে তাই নিয়ে সে তত ব্যস্ত নয়।

"আমিও তো ওদের মতোই। নিজের বাবা মা ভাইবোনদের কথা ভাবি। নিজের জন্যও ভাবি। সেই সময় ভাবতাম, মেজমাসির মতো একা থাকব নিজের নিঃসঙ্গ জগতের কেন্দ্রে। নিঃসঙ্গতা আমাকে কখনওই বিষণ্ণ করেনি বরং ভালই লাগে।

"আজও দেখতে পাই, স্যার বসে আছেন ডাইনিং টেবলের ধারে। হয়তো সন্ধ্যা কিংবা বিকেল। কথা বলতে বলতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ছেন মেঝেয়। পুষ্প অ্যাশট্রে এনে রেখেছে। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানেই মেঝেয় ছাই ফেলে যাচ্ছেন। টেবলেও ফেলছেন আর আমি আঁচল দিয়ে ঝেড়ে দিচ্ছি কিন্তু কখনওই ওঁকে অ্যাশট্রে-র কথা মনে করিয়ে দিইনি। অভ্যাসটা আছে যখন, থাক না।"

লেখাটা খাপছাড়াভাবে এখানে শেষ হয়েছে। এরপর কিছু পাতা খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। মালতী দত্ত আরও অনেক কিছু দেখেছিলেন নিশ্চয়ই যা অন্যকে দেখাতে চান না।

বহুদিন লেখা বন্ধ রেখে বোধহয় পরের অংশ লেখেন। কালির রং নীল থেকে কালো। কলমেরও বোধহয় বদল ঘটেছে, অক্ষরগুলো সরু। তারিখ অস্পষ্ট।

"বাচ্চাদের আমি ভালবাসি। যখনই মনে হত আমার ছেলেপুলে হবে না তখনই কেমন যেন কষ্ট পেতাম। এক একবার মনে হত স্যার যদি আমায় সন্তান দেন। চাইব কি ওঁর কাছে? প্রায় তো বলেই ফেলেছিলাম একবার। পরে মনে হয়েছিল তা হলে খুব ভুলই করতাম। আমি শুধু একজনের কাছেই নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি, আর তা করেছি ওঁর কাছেই, চিরকালের মতো।

"কখনও কখনও উনি আমার মাথায় হাত বুলোতেন। অদ্ভুত একটা হাসি ওঁর মুখে ফুটে উঠত। 'সোনা আমার সোনা।' কী বলতে চাইতেন সেটা আমি ধরতে পারতাম। ওঁর জীবনে আমি কিছুই দখল করিনি অবাঞ্ছিতের মতো। কিছুই আমি চাইনি। ওঁর যেন নজরেই আমি আসিনি। কিন্তু আমি ওঁর জন্য সব সময়েই আছি, সব সময়েই প্রস্তুত। উনি সেটা জানতেন, তাই আমার আবেগকে বুঝতে চেষ্টা করতেন।

"আমাদের একত্রে বসবাসের প্রশ্নই ছিল না। আমার থেকে উনি অনেক অনেক উপরের মানুষ। ওঁকে সমালোচনা করার কোনও অধিকারই আমার নেই। ওঁকে বোঝার চেষ্টাও কখনও করিনি। উনি উনিই। ব্যস। যদি অন্য কোনও মেয়ের প্রতি আকর্ষিত হতেন (ওঁর তো অনেক ছাত্রী ছিল, নার্সদের মধ্যেও অনেকে অনুরাগী ছিল), তা হলেও আমি দুঃখ পেতাম না। উনি যাতে খুশি হন, সুখী হন, তা যদি করেন তা হলে তো আমি তৃপ্তিই পেতাম। তবে যাই করুন আমার কাছেই যেন আবার ফিরে আসেন, এটাই চাইতাম।

"সন্ন্যাসিনীরা কি ঈশ্বরের সমালোচনা করেন, তাঁরা কি ঈর্ষা করেন ভক্তদের?"

"এ-ভাবে কারওর সঙ্গে কথা বললে সে নিশ্চিত আমায় পাগল ঠাওরাবে। কিন্তু আমি কী করতে পারি, এ-সব আমার যে শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রসাদ সম্ভবত তা বুঝেছিল।"

"প্রসাদ বুঝেছিল হয়তো কিন্তু ভুলেছিল কি?"

খাতাটা বন্ধ করে মিহির চিত হয়ে চোখ বন্ধ করল। খাতায় যতটুকু পড়েছে, তাতেই সে নিশ্চিত, মার মার পড়ে যাবে। ভাল করে বিজ্ঞাপন আর খবরের কাগজে নিউজ করতে পারলে, হিরণ ভটচাজকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো ব্যাপার হবে।

ডাকাতি করার ইচ্ছাটা আবার তার চিন্তায় উশখুশ করল। ছেলে জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়। অন্নদাচরণ লেনে একবার শুধু যেতে হবে। নিমাই কি হাবুর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া আর বাড়িটা চিনিয়ে দেওয়া। খবরের কাগজে বার করানোর জন্য এত কিছু করতে হবে না। ওরাই লাফিয়ে আসবে।

"বাবু চিড়িয়াখানা কৌন রাস্তামে যায়েগা?"

পাঁচ

চোখ খুলতেই দেখল উৎকণ্ঠিত এক বেহারি মধ্যবয়সির মুখ। কোলে বাচ্চা, পিছনে বউ। গড়ের মাঠের সুপরিচিত দৃশ্য। কিন্তু আজ তো ছুটির দিন নয়।

মিহির দক্ষিণে হাত তুলে রেসকোর্সের পাশ দিয়ে ওদের এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেবার সময় নিজের হিন্দির বহরে মজা পেল।

"সোজা যা কর ডাইনে ঘুমেগা। আউর থোড়া যা কর বাঁয়ে রাস্তামে যায়েগা। তব মিল যায় গা।"

লোকটি মাথা নেড়ে জানাল বুঝেছে, তারপর বিড়বিড় করে মিহিরের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করে বউকে ইশাবা করল অনুসরণ করতে। লোকটির পায়ে জুতো দেখে সে চলন লক্ষ করল। অভ্যাস আছে জুতো ব্যবহাবের।

কাল ঘুমিয়েছে দেরিতে, উঠেছেও ভোরে। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, ঘুমও পাচ্ছে। হাত তিরিশ দূরে পাশের গাছের ছায়ায় একটি লোক উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। মুখোমুখি বসে দুটি লোক কথা বলছে গম্ভীর মুখে। ভেড়ার পাল চরছে মাঠে। মেট্রো রেলের জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ বহুদিন শেষ হয়েছে, মাটির পাহাড়ের গায়ে নানান গাছ, পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভাল। ব্রিফকেসটার মধ্যে খাতাটা বেখে, সেটাব উপর মাথা দিয়ে মিহির ছোট্ট একটা ঘুম দেবার জন্য আবার চোখ বন্ধ করে প্রথমেই ভাবল, কলকাতাকে সুন্দর করা যায় কতভাবে এই নিয়ে ত্রিকালেব একটা সংখ্যা করবে, আর তার কভারে থাকবে, এই মাটিব টিলাটা। ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে এমন গাছ ওখানে লাগাবার কথাই সে বলবে।

সে নিজেও একটা ডোনেট করবে। ডাগর কুসুম. .সিলখেরা ত্রিজুগা।...প্রণবকে পবীক্ষা কবে দেখতে হবে ওর এখনও নামটা মনে আছে কি না।

সাহায্য চেয়েছে নীপাকে ডিভোর্সে রাজি করানোব জন্য। বিশ্রী কাজ এ-সব। কিন্তু ওবা দু'জনেই বেঁচে যাবে। সে নিজেও কি বেঁচে যায়নি?

আরতির সঙ্গে বসবাস করে কি আজকের এই অবস্থায় সে উঠে আসতে পারত? প্রণব আব কোন পর্যন্ত উঠবে? ওর যা বিদ্যাবুদ্ধি, কাজকর্মের সামর্থ্য তার তুঙ্গে এসে গেছে। বেশি আয় আব সম্ভব নয়, পদোন্নতিরও। হয়তো দেহ বা মনের অতৃপ্ত বাসনার কিছু স্তর ওঠা বাকি আছে। হয়তো আমাবও বাকি আছে। স্যার অনন্তলাল কি এটাই বুঝতে পেরেছিল!

মিহির অল্প খিদে অনুভব করছে। ছায়াব তৈরি গরম রুটি, বেগুনভাজা আর রাত্রে করে রাখা ক্ষীর খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। সূর্য ওঠার আগেই ছায়া উঠেছিল এইসব করাব জন্য। আবতিকে সে ছায়া সম্পর্কে ঠিকই বলেছে... সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। মালতী দত্তর আব-এক সংস্করণ।

কিংবা ঠিক তা নয়। মালতী আর ছায়ায় তফাতও আছে। ঝুঁকি নেওয়ার সাহসে, স্বাতন্ত্র্য বজয়া রাখার, দৃঢ় গোঁয়ার চরিত্রের ছিটেফোঁটাও ছায়ার নেই। আরতির এগুলো আছে। নীপার নেই। ওকে আজ গিয়ে প্রণবেব বক্তব্য জানাতে হবে। বাটু সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত সেটাও আরতিকে জানিয়ে আসতে হবে। তার আগে এখন একটু ঘুম।

চিনা রেস্টুরেন্ট থেকে মিহির প্রথম টেলিফোন করল ত্রিকাল অফিসে। কৃষ্ণেন্দু এখনও আসেনি, ফোন ধরেছে এক প্রুফ-রিডার।

"কৃষ্ণেন্দুকে বলে দিয়ো, আমি আজ নাও আসতে পারি। ও যেন আর্টপুলগুলো করিয়ে রাখে আর প্রাণগোপালকে বোলো ওকে যে ছবি তুলে আনতে বলা হয়েছে তা কভারের জন্য...কভার স্টোরি হবে স্যার অনন্তলাল সংখ্যার...য়্যা, তুলে এনেছে, এখুনি ফিরল? কোথায় ও? না, না ডাকতে হবে না, বোলো প্রিন্টগুলো আমি কাল দেখব।"

ফোনটা রাখতে গিয়ে তার হিরণ ভটচাজের কথা মনে পড়ল। আছি না গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছি জানার জন্য এটা ওটা ছুতোয় ফোন করবে নিশ্চয়।

"আর শোনো, কেউ যদি আমার খোঁজ করে, তা হলে বলে দেবে একটা স্টোরি চেজ করছি, কখন ফিরব ঠিক নেই। মনে থাকবে তো?"

রিসিভারটা রেখেই তার মনে দীর্ণতা জাতীয় একধরনের কালি পড়ল। সে সম্পাদক তবু অফিসে

একটা কৈফিয়ত রেখে দিল অনুপস্থিতির জন্য। হিরণ ভটচাজকে সে ভয় করে। মালিকের বিরক্তি বা বিরাগভাজন হবার এবং চাকরি হারাবার সম্ভাবনাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই নয়, অতি সামান্য থেকে লোকটি বটগাছের মতো নিজেকে বিস্তার করেছে যে অধ্যবসায় ও চারিত্রিক গভীরতায়, মিহির সেটাকেই সম্ভ্রম করে। সম্ভ্রম থেকে ক্ষুদ্রতাবোধ এবং ভয়।

পরের টেলিফোনটি নীপাকে।

"মিহিরদা বলছি, আছো কেমন?"

"ভাল, আপনি?"

স্বর ঈষৎ ক্লান্ত, উচ্ছ্বাসহীন।

"তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"বেশ তো, প্রণবের সঙ্গে দেখা হয়েছে বুঝি?"

মিহির আঁচ করতে পারল না স্বরে ব্যঙ্গ আছে কি না। নীপা সরাসরি প্রসঙ্গে এসেছে, সুতরাং সত্যি কথা বলাই ভাল।

"হ্যাঁ।"

"কবে?"

"কাল।"

"তখন কি মদ খেয়েছিল?"

"খাচ্ছিল, বার-এ দেখা হয়েছে।"

"আপনাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করেনি, বলেনি ওর দাউদাউ কামনার কথা?"

"তোমার সঙ্গে আজ দেখা হতে পারে?"

"সাড়ে ছ'টায় মণিকাকার কাছে যাব; আমাদের উকিল।"

"অনেক বাকি সাড়ে ছ'টা, তার আগেই পৌঁছে যাব আর কথা দিচ্ছি বেশিক্ষণ জ্বালাব না।"

"জ্বলবার মতো আর আমার কিছু অবশিষ্ট নেই।" অসহায় বিপন্ন কণ্ঠস্বর নয়। আপাতত দুর্বল মনে হলেও নীপা জানে সে কী চায়।

"মিহিরদা আপনাকে কি ও আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে?"

"হ্যাঁ। তোমাকে কিছু বলার জন্য বলেছিল। তবে আমি নিজেই যাব।"

"নিশ্চয় ডিভোর্সের জন্য বলতে আসবেন।"

"আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাচ্ছি।"

মিহির কথা বাড়াল না। টেলিফোনে এ-ভাবে কথা বলা যায় না কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। তার টেবলে বিয়ারের বোতল গরম হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে বসেই ওয়েটারকে ইশারায় খাবার দিয়ে যেতে বলল।

কলিংবেলের শব্দ শেষ হওয়া মাত্রই দরজা খুলল নীপা। মিহিরের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

"সোফায় কাল একটা ছারপোকা পেয়েছি, তাই ফ্লিট দিচ্ছিলাম, চলুন বেডরুমে বসি।"

মিহির একটু কুঁকড়ে গেল। বিবাহিত দম্পতির অন্তরঙ্গ জীবনে এ-ভাবে ঢোকা, এমনকী এদের মতো দম্পতিরও, এই তার প্রথম।

"প্রণব আপনাকে কী বলেছে তাই নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই না। ওর ভ্যানভ্যানানির সব আমি জানি। ও লোক খারাপ তা আমি বলব না, তবে উচ্ছন্নে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো স্বার্থপর। সব কিছু ওর ইচ্ছে মতো হোক এটাই ও চায়, আর তখুনি তখুনি যদি ওর দাবি না মেটানো হয় তা হলেই মেজাজ চরমে ওঠে। মেয়েদের কাছে অ্যাট্রাকটকিভ তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যে ও কোনও মেয়ের দিকে তাকাতও না। তারপর অফিসের এক মাদ্রাজি মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার শুরু করে। আমাকে বলল, 'ও কিছু নয় সামান্য ব্যাপার, দু'-চারদিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে।' তাই অবশ্য হল। কিন্তু পর পরই এ-রকম হয়ে যেতে থাকল। দু'-চার দিন কি দু' সপ্তাহ, বেশিদিন যেটা ছিল সেটা প্রায় এক মাস। সেইসময়ই ও প্রথম বাইরে রাত কাটায়। দু'বার। সকালে যখন বাড়িতে এল তখন যেন ল্যাজ গোটানো কুকুর মনে হচ্ছিল। আমার কাছে নাক কান মুলে মাপ চাইলও। বুঝতে পারছেন, ও যে কী ধরনের তা জানতে আমার বাকি নেই।"

"তা ঠিক।"

আর সে কী বলতে পারে।

"কিন্তু এবারেরটা অনেক সিরিয়াস। মাস পাঁচ-ছয় ধরে চলছে। প্রণব রাতে তো খেতেই আসে না। ছেলেমেয়েরা বলে: 'বাবা কি রাতেও অফিসে কাজ করে? আজ বাড়ি আসবে না?' আমি বলতে বাধ্য হই: 'জানি না।' সত্যি কথাই বলি। ওর হালচাল সম্পর্কে কিছুই তো জানি না।"

মিহির যে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল, তা এতক্ষণে ধুলোয় মিশে গেছে। শ্রোতার ভূমিকা নেওয়া ছাড়া এখন তার বিশেষ কিছু করার নেই। বহুদিন পর পরিচিত একজনকে পেয়ে প্রণব সম্পর্কে নীপা তার যাবতীয় বিশ্লেষণ ও ক্ষোভ যে বার করে দেবে, এটাই স্বাভাবিক।

"এ-সব ছেড়েছুড়ে, মন দিয়ে সংসারী হবার কথা বলেছে কি?"

"না।"

"তোমার কি মনে হয় আবার ফিরবে?"

"না। আমি ডিভোর্স না দিলে ও পাবে না। তাই তো আজ উকিলের কাছে যাচ্ছি। আমাদের দু'জনকেই তিনি চেনেন। কী যে করব। সত্যিই ভেবে ঠিক করতে পারছি না মিহিরদা। যদি ডিভোর্স দিই তা হলে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে। খরচে লোক, মাইনে পেলেও কিছুই জমায়নি। আমার তো সন্দেহ হয় এই ফ্ল্যাট কারুর কাছে বাঁধা দিয়েছে কি না। দুটো ছেলে মেয়ে আর আমার খোরপোষ দেবে কোত্থেকে? সেই মেয়েমানুষের ঘাড়ে বসে চলবে তেমন লোকও নয়! আমার এই বয়েসে ভাল কাজকম্মো পাওয়া সোজা নয়। তবু বাবা চেষ্টা করে হয়তো মোটামুটি চালাবার মতো কাজ জোগাড় করে দিতে পারবেন।"

মিহির মুখটাকে যতটা সম্ভব ভাবহীন করে শুনে যাচ্ছে। এ-সব সমস্যা আরতিরও ছিল। সে শুনেছে, কিছুদিন নানা ধরনের কাজ করে অবশেষে আর পারেনি। নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মালতী দত্তরও ভবিষ্যতের সমস্যা ছিল। ছায়ার এ-সব সমস্যা একদমই নেই, হবেও না।

নীপা ঠান্ডা হিসেবি গলায় বলে যাচ্ছে:

"অথচ আমি যদি ডিভোর্স না দিই, তা হলে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে ছাড়বে।

"এখন ও এমন দগ্ধে মানুষ হয়ে পড়েছে যে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা বোঝার ক্ষমতাই নেই। যতদিন আশায় আশায় থাকবে, আমি ওকে ছেড়ে দেব, ততদিন ও আমাকে ঘেন্না করবে না। কিন্তু যখন দেখবে একূল-ওকূল কোনওকূলেই পা রাখতে পারছে না, তখনই টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। এখন তো সকাল থেকে রাত শুধু খেয়েই চলেছে, এ-ভাবে চললে তো চাকরিটাই থাকবে না। আর এই মেয়েটা, কোনওদিন দেখিনি ওকে, দু'দিন পরই তো প্রণবকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কী করব বলুন এমন একটা ভাঙাচোরা মানুষকে নিয়ে? বলুন এবার, মিহিরদা। আমার করণীয় কী?"

মিহির মেঝের দিকে তাকিয়ে। নীপার বয়স হয়ে গেছে। প্রণব যা বলেছিল, শরীর সেই রকমই। মুখখানি অবশ্য শিশুর মতো রয়ে গেছে। বছর দশেক আগেও ছিপছিপে ছিল। বিয়ের পর মেয়েরা শরীরকে কেন এত অবহেলা করে?

"আপনারও তো ডিভোর্স হয়েছিল।"

"কিন্তু তার কারণ আর তোমাদের একজাতের নয়।"

"আমাদের অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন?"

"জানি না। তোমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করা সম্ভব নয়।"

"তা বটে। তা হলে আর এ নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। ভেবেছিলাম কিছু পরামর্শ অন্তত আপনার কাছে পাব।"

মিহির উঠে দাঁড়াল। নীপা মুখ ফিরিয়ে আবেগ এবং চোখের জল দমনের চেষ্টা করছে।

"তোমার তো উকিলের কাছে যাবার সময় হয়ে এল। আমি চলি।"

মিহির যখন বেরিয়ে এল তখনও নীপা মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বেলভেডিয়ার থেকে হাঁটতে হাঁটতে সে একসময় হেস্টিংসের পথ ধরে গঙ্গার কূলে এসে পৌঁছল। বেড়াতে আসা নরনারী শিশুদের ভিড় তার ভালই লাগল। সেই সঙ্গে সূর্যাস্তের দৃশ্যও। জলের ধারে নিচু পাঁচিলের ধারে কিছুক্ষণ সে দাঁড়াল। পারাপারকারী লঞ্চ বা নোঙর করা মালবাহী জাহাজগুলি তাকে কৌতূহলী করল। কিন্তু কোনও ধারণাই তার নেই এদের সম্পর্কে।

বাঁ দিকে তাকিয়ে গঙ্গার উপর নতুন সেতু তৈরির কাজের কিছুটা সে দেখতে পাচ্ছে। অজগরের মতো পাক খেয়ে বিরাট ফ্লাইওভার মোটামোটা কংক্রিট থামের উপর হামা দিয়ে গঙ্গার কিনার থেকে জলের দিকে তাকিয়ে।

বেঞ্চগুলোয় আর জায়গা নেই। যুগল অল্পবয়সি নরনারী নদী পাড়ের ঘাসে বসে গেছে অধীর আগ্রহে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার অপেক্ষায়। সে লক্ষ করলে, এরা ছাড়া আর যত বয়স্ক মানুষ তাদের অধিকাংশই অবাঙালি। স্ফূর্তিবাজ, প্রফুল্ল ও বিত্তবান।

তারও একটা গাড়ি আছে। কিন্তু এ-ভাবে কোনও দিন ছায়া-বুবাইকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরোয়নি। এই সময়টা ত্রিকালের কাজে ব্যয় হয়। ডাক্তার বলেছে: "বেড়াবেন! হালকা মেজাজে থাকা দরকার। ছেলের সঙ্গে গল্প করবেন। খেলবেন। বেড়াতে নিয়ে যাবেন; ছুটোছুটি করবেন। এতে আপনিও রিল্যাক্সড বোধ করবেন, ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটাও ভাল হবে।"

ছেলে আর একটা আছে। রুগ্‌ণ, পেট ভরে খেতে পায় না, পড়াশুনো হচ্ছে না, মারধোর খায়। বেপরোয়া হয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বাটুর কথা ভাবতেই সে কষ্ট বোধ করল। আর নীপার সঙ্গে কথাবার্তাগুলোও মনে পড়তে লাগল। ওর জায়গায় নিজেকে রেখে সে কী সিদ্ধান্তে আসতে পারে? ধরা যাক, ছায়াকে যদি সে ডিভোর্স করতে চায়।

মিহির অবাক হয়ে গেল, এমন একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় আসার জন্য। ছায়াকে ডিভোর্স! তার নিজের কি কিছু গোলমাল ঘটেছে? আজই সে মালতী দত্তর ঘরে ডাকাত পড়াবার কথাও ভেবেছিল! এ-সব ভাবনা একা থাকলেই আসে।

মিহির বাস স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করল এবং মিনিবাসে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়াবার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, বাটুর কাছে যাবে।

ছয়

দরজা খুলল বাটু।

অপ্রত্যাশিতের জন্য অবাক তো হলই, কী যে করবে বা বলবে ভেবে না পেয়ে সে ছুটে ভিতরে রান্নাঘরের দিকে গেল।

মিহির ফিসফিস শুনল। সম্ভবত মাধুদি কথা বলছে।

"বাবাকে বসতে বল... মা'র ঘরেই বসা।" মাধুদির গলা। বাটু গুটিগুটি কাছে এল মাথা হেলিয়ে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে।

"মা নেই?"

"না।"

একহাতে ব্রিফকেস অন্য হাতে দুটো প্যাকেট। মিহির পরিশ্রান্ত বোধ করছে।

"ঘরে চল, তোর জন্য এগুলো।"

বিদ্যুৎ রয়েছে। গতকাল হ্যারিকেনের আলোয় ঘরের সবটা নজরে আসেনি। এখন চোখ ফেলে তার মনে হল পরিচ্ছন্নতা, উজ্জ্বলতা সম্পর্কে আরতি তার উগ্র বোধটাকে আর টিকিয়ে রাখতে পারেনি। বেডকভারটা সম্ভবত দামি কিন্তু এখন জীর্ণ রংচটা। দেয়ালের ফিকে সবুজ ডিস্টেম্পারে জল বসার ছোপছোপ দাগ। সিলিং পাখার ব্লেডে শ্যাওলার মতো ঝুল লেগে। টেবল ল্যাম্পের কাপড়ের ঢাকনাটা বেঁকে রয়েছে। জোড়া লাগানো ইলেকট্রিক তার জট পাকিয়ে ঝুলছে। দু'জনে ব্যবহার করার মতো খাটের কাঠ ময়লা জমে কালো রং পেয়েছে।

বাটু একদৃষ্টে প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে। মিহিরের মনে হল, এই প্রথম ওর জন্য কেউ উপহার নিয়ে এল। শ্যামবাজারে দ্রুত, এলোমেলো কেনা জিনিসগুলো— দুটো হাফপ্যান্ট, দুটো রঙিন গেঞ্জি, রং পেনসিলের প্যাকেট, দুটো গল্পের বই, আপেল, চকোলেট, সন্দেশের বাক্স— একটার পর একটা বিছানায় রাখতে রাখতে মিহির লক্ষ করতে লাগল বাটুর চোখ আর শরীরের ভঙ্গি। বিষণ্ণবোধ করল সে। এগুলো পাবার ইচ্ছায় ওর চোখে লোভের ছায়া পড়েছে। বুবাই হলে এতক্ষণে ঝাঁপিয়ে, ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিত।

সন্দেশের বাক্স খুলে সে এগিয়ে ধরল। বাটু এক-পা পিছিয়ে মাথা নাড়ল।

"তোর জন্য, সব।"

বাটু কী করবে বুঝতে পারছে না। ডান হাত পিছনে রেখেছে। বার দুয়েক দরজায় তাকাল।

"খা এগুলো। বোস এখানে।"

বাটুকে হাত ধরে পাশে বসাল। একটা সন্দেশ ওর মুখে গুঁজে দিতেই বাটুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সন্দেশটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল তারপর সন্তর্পণে একটা কোণ ভেঙে অনেকক্ষণ ধরে চিবোল।

মিহিরের লজ্জা করতে লাগল, এইভাবে খাওয়া দেখতে। বাটুর প্রতি করুণ হওয়াটাই একধরনের নিষ্ঠুরতা। এই দৃশ্য দেখাটাই অমানবিক। অথচ তার ইচ্ছা করছে, বাটুকে তৃপ্ত করতে।

"এগুলো পর, দেখি গায়ে হল কি না, আন্দাজে কেনা তো।"

বাটু জামা আর প্যান্টগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সে ওকে থামাল।

"এ-সবই নিয়ে গিয়ে রাখ কোথাও।"

বাটু জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলছিল যখন, সে বলল, "বই পড়তে পারিস তো?"

মুখ নিচু করে বাটু মাথা হেলাল।

"আরও বই এনে দেব। আর আমার সঙ্গে যাবি জুতো কিনতে। ওটা তো আর আন্দাজে কেনা যায় না।"

মিহির লঘু বন্ধুতার স্বরে বলল বাটুকে ঘনিষ্ঠ করে পাবার জন্য। প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে পারল না।

"ওমা কত্তো জিনিস!" মাধুদির গলা ভেসে এল। "না না আমি খাব না, বলছি না... তুলে রেখে দে সকালের জন্য... বাবাকে জিজ্ঞেস কর চা খাবে কি না।"

"না খাব না।"

মাধুদিকে শোনাবার জন্য গলা চড়িয়ে সে বলল।

বাটু এল স্টিলের রেকাবে চারটি সন্দেশ নিয়ে। মাধুদি নিশ্চয় পাঠিয়েছে। গৃহস্থ সৌজন্য, আদব জানে। বাটুকে ভালবাসে। সম্ভবত এই একজনের কাছ থেকেই ও স্নেহযত্ন পায়।

মিহির কোনওরকম ভদ্রতা দেখাবার চেষ্টা করল না। একটি সন্দেশ তুলে নিল।

"মা কখন বেরিয়েছে?"

"দুপুরে।"

"বলে গেছে কখন আসবে?"

বাটু মাথা নাড়ল।

"তুই আমার কাছে গিয়ে থাকবি?"

"হ্যাঁ।"

ক্ষীণস্বর কিন্তু প্রত্যাশায় ভরা। মিহির সস্নেহে তাকিয়ে রইল।

"কই জামা প্যান্ট পরলি না তো।"

বাটু ঘরের বাইরে গেল। যাওয়ার ভঙ্গিতে স্ফূর্তি ছিল। আরতি সম্পর্কে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা না করাই উচিত। চেতনা মলিন করে এমন প্রসঙ্গে এতটুকু ছেলেকে ঠেলে দেওয়াটা অন্যায় হবে।

বাটু এল নতুন পোশাকে। জামা, প্যান্ট, দুটোই ঢলঢল করছে। দোকানিকে সে বলেছিল, বছর এগারো-বারো বয়সির জন্য। বাটু তার বয়স অনুযায়ী দৈহিক পূর্ণতা পায়নি। ওর শীর্ণতাকে আরও প্রকট করেছে এই জামা-প্যান্ট।

"বাহ্, সুন্দর মানিয়েছে তো। একটু ঢিলে হয়েছে, ও কিছু নয়, দরজিকে দিয়ে একটু-আধটু ছোট করে নিলেই হবে। থাক খুলতে হবে না।"

বাটু আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। বাঁ দিকের দেয়ালে আঁটা বড় আয়নাটার দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে।

"আর কী চাই।"

"একটা রবারের বল কিনে দেবে। সামনের দোকানেই পাওয়া যায়। আমি হারিয়ে ফেলেছি, ওরা দাম চাইছে।"

"ওরা!"

"পাড়ার ছেলেরা। রাস্তায় খেলি ওদের সঙ্গে।"

"বেশ, আর কিছু?"

"জুতো কিনতে কবে নিয়ে যাবে?"

"যাব। শিগগিরই। কাল চকোলেটটা খেয়েছিলিস?"

"হ্যাঁ। মা একটু খেয়েছে। মাধুদিকে দিলুম, খেল না।"

"খুব ভালবাসে মাধুদি।"

ঘাড় নাড়ল বাটু।

"মা?"

আবার ঘাড় নাড়ল। এটা বোধহয় প্রথারক্ষার জন্য। তার ইচ্ছে করছে বাটুর অঙ্গ স্পর্শ করতে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে।

"তোকে ভাল স্কুলে ভরতি করব, এ বছরটা থাক। মন দিয়ে পড়বি তো?"

"হ্যাঁ।"

খুবই আন্তরিক দেখাল ওর মাথা হেলিয়ে দেওয়াটা। আর কী বলবে সে? বাটুর কাছে এখন সবকিছুই ধোঁয়াটে অবাস্তব। তার কাছেও কি নয়? মৃদু একটা বাসি সুগন্ধ বিছানা থেকে আসছে। আরতির গায়ে এই গন্ধটাই লেগে থাকে। প্রথম দিন আলাপের সময়ও তার নাকে লেগেছিল; এখনও লাগছে।

অন্যমনস্কের মতো কয়েকবার সে বিছানায় হাত বুলিয়েছে। বুঝতে পারামাত্র বিছানা থেকে হাত তুলে নিয়েছে। কয়েকবার হাতটা নাকের কাছে এনে গন্ধ পাবার চেষ্টা করেছে। এ-সবই বাটুর সঙ্গে কথা বলার মধ্যেই।

প্রত্যেকেই তো অন্য মানুষকে ঠকায়, নিজেকেও। মিহির কি নিজেকেও ঠকায় না? একসময়, যখন আরতির সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে ওঠে তখনও সে বাইরে উৎফুল্ল ভাবটা বজায় রেখে চলত, যেন পৃথিবীতে একমাত্র সেই ভাগ্যবান।

আরতির জন্য তার হৃদয়ে কি সুপ্ত ভালবাসা রয়েছে? তার কি একাধিক হৃদয়?

ছায়াকে সে কখনওই আরতি সম্পর্কে কিছু বলেনি। কাউকেই বলেনি। মনের কোনও কথাই কাউকে সে বলেনি। কেউ জানে না তার হৃদয়ে কী ঘটছে। কী চিন্তা, কী অনুভব হচ্ছে। বোধহয় কেউ সেটা বুঝতে পারবে না বলেই সে মুখ খোলে না।

"বাটু আজ আমি আসি।"

বাটু শুধু তাকিয়ে রইল। এ-সব ক্ষেত্রে কী বলতে হয়, তা এখনও শেখেনি। জিনিসগুলো নিয়ে এখন নাড়াচাড়া করতে নিশ্চয়ই ওর ইচ্ছে হচ্ছে। কিছু কল্পনা করবে, স্বপ্ন দেখবে। ওর বয়সে সে অনেক কিছু আশা করত।

"বলটা কবে দেবে?"

"চল, এখুনি কিনে দিচ্ছি।"

বাটুকে নিয়ে সে নীচে নেমে এল। মিহির শুধু দাঁড়িয়ে রইল, দোকানির সঙ্গে যা কথা বলার বাটুই বলল।

"একটা কেন দুটো নে।"

বাটুকে আজকে সে খুশির পর খুশি করে যাবে। ওই বয়সে কিছুই সে পায়নি বাবার কাছ থেকে।
"এবার ওপরে যা।"
"কবে আসবে? আমাকে নিয়ে যাবে তো?"
"হ্যাঁ।"
বাটু ওপরে উঠে যাবার পর হেঁটে সে বড় রাস্তায় এসে, দুটো রিকশা ভাড়ার অপেক্ষায় রয়েছে দেখতে পেল। বহু বছর সে রিকশায় চড়েনি। প্রথম রিকশাওয়ালাকে গন্তব্য বলতেই তিন টাকা চাইল। দরাদরি না করে সে উঠে বসল।
আধ ঘণ্টার মধ্যে মিহির পৌঁছে গেল।
পথে মানুষ, দোকান, যানবাহন, পশু যা চোখে পড়েছিল সে খুঁটিয়ে দেখেছিল। বারবার তার মনে হয়েছে, এ-সব যে তার চারপাশে রয়েছে, নড়াচড়া করছে, কই তা তো জানত না!
রাস্তার দরজায় মোনা আর একটি স্ত্রীলোক, সম্ভবত এই বাড়িরই কোনও ফ্ল্যাটের কথা বলছিল। তাকে দেখে মোনা পরিচিতের হাসি হাসল। আপনা থেকেই চোখ ওর সারা শরীর ঘুরে অবশেষে মুখের উপর বসল।
"না, একটাও ফোন আসেনি।"
মিহির শুধু হেসে ভিতরে ঢুকে গিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগে একবার ফিরে তাকাল। মোনা তাকিয়ে রয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই দু'জনে হাসল।
এক সময় মিহির ভাবত কাউকেই তার কিছু দেবার নেই কেননা শুধু শুধু কেউ তাকে কিছু দেয়নি। কিন্তু না, সে ভুল ধারণা করেছে। মোনা তাকে এই হাসি আর চাহনি বিলিয়ে দিয়েছে বিনিময়ে কিছু না পেয়েই।
কেন?
সে যে-সব ব্যাপার কখনওই জানে না, মোনা বোধহয় তারই প্রতিনিধিত্ব করছে। ওর মতো তাজা সারল্য সে কখনও দেখেনি। কিন্তু এটা কি সারল্য না ইচ্ছাকৃত প্ররোচনা। এই বয়সি মেয়েরা পুরুষ দেখলেই তার সেক্স অ্যাপিল কতটা, পরীক্ষা করে নেয় না কি?
দরজা খুলে দিল ছায়া।
"বুবাই কোথায়?"
"ঘুমোচ্ছে, গা কেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে, বোধহয় জ্বর আসছে।"
মিহির উদ্বিগ্ন হল। ঘরে এসেই ঘুমন্ত ছেলের কপালে হাত দিয়ে তাপ দেখল।
"কত জ্বর, থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ।"
তারপরই মনে পড়ল ছায়া এটা পারে না।
"নিয়ে এসো।"
ছায়া থার্মোমিটার এনে দিল। বুবাইয়ের বগলে কিছুক্ষণ রেখে তাপের মাত্রা দেখে সে আশ্বস্ত হল।
"আটানব্বুই।"
"ডাক্তার ডাকতে হবে কি?"
"না। কিছুই হয়নি।"
বাটুকে তার মনে পড়ল। ওর জ্বরজ্বারি নিশ্চয় হয় কিন্তু এ-ভাবে উদ্বিগ্ন হয় কি আরতি? মাধুদি নিশ্চয় তখন দেখাশোনা করে। এখানে ওকে এনে রাখলে ছায়া কি এই গুরুত্ব দিয়ে বাটুকে দেখবে? সৎমা সম্পর্কে যত কথা বলা হয়, ছায়া সে ধরনের হবে না।
"কী করব বলো, বাটুকে আনব?"
সে ভালই জানে স্বামী যা চাইবে ও তাই বলবে, করবে। হয়তো ছায়াও তা জানে।
"মা তো আনতে বলছেন।"
"তুমি?"
"হ্যাঁ।"
ছেলেমানুষের মতো সুর টেনে ওর বলার ধরনে মনে হল এটা ওর কাছে বোধহয় মজা পাওয়ার মতো ব্যাপার।

"নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে পারবে? বুবাইয়ের সঙ্গে কোনও পার্থক্য করা চলবে না।"
ছায়া মাথা হেলাল।
"পরে কোনও অশান্তি হবে না তো?"
"না।"
মিহির ওর কাছে এসে মুখটি দুই তালুর মধ্যে ধরে গভীরভাবে ছায়ার চোখের দিকে তাকাল। ঘাম, হলুদ, তেল, সব মিলিয়ে যে-গন্ধটা এখন সে পাচ্ছে, একেই সংসার বলে বোধহয়। নির্ঝঞ্ঝাট, তরঙ্গহীন, সাদামাটা সংসার। একদিন শান্তভাবে বছর কুড়ি কি তিরিশ পর সে মরে যাবে। ছায়া বেঁচে থাকবে। মেয়েরা যে পুরুষদের থেকে দীর্ঘায়ু হয়, এটা তো জানা কথাই। তবে ব্যতিক্রমও আছে।
ছায়া মারা গেলে সে কি খুব অসুবিধায় পড়বে?
"খিদে পাচ্ছে, খেতে দাও।"
মিহির ভেবেছিল চুমু খাবে। ইচ্ছে হল না। ছায়াকে শেষ কবে চুমু খেয়েছে? ওর কোনও দাবি নেই এ-জন্য, অথচ ছায়া শীতলও নয়। সে অসুখী নয়। তবে সুখীও নয়। সংযোগহীন চাকার মতো শূন্যে ঘুরে চলেছে তার মন। এক রকমের ঝিমঝিমনি ছাড়া আর কিছু সে বুঝতে পারছে না।
খেয়ে উঠে, ব্রিফকেস থেকে মালতী দত্তর খাতাটা বার করে, বুবাইয়ের পাশে যখন সবে সে খাটে হেলান দিয়েছে তখনই কলিংবেল বেজে উঠল। প্রথমেই তার মনে হল বোধহয় বাটু! দরজা খুলে বাদলের মা অপরিচিত একটি লোককে দেখে প্রশ্ন করার আগেই লোকটি ঈষৎ জড়ানো স্বরে বলল, "মিহির আছে?"
ঘর থেকে শুনতে পেয়েছে সে। প্রণব। ঘড়িতে দেখল দশটা দশ। এত রাতে কেন?

প্রণব ওকে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দেওয়া শরীরটাকে সিধে করার চেষ্টা করল। ফলে বার দুয়েক টলমল করে দু'হাতে চৌকাঠ ধরে সোজা হল।
সোজা তাকাবার চেষ্টা করেও প্রণব পারছে না। চোখের পাতা ভারী ফুলোফুলো।
"এই যে মিহির, কথা আছে।"
"ভেতরে আয়।"
মদ খেয়ে কেউ এখানে তার কাছে আসেনি। তাও আবার এই অবস্থায়। প্রতিবেশীরা দেখে থাকলে তার সম্পর্কে কী ধারণা করবে! প্রণব যদি চেঁচামেচি শুরু করে?
প্রণব বসার ঘরে সোফায় শরীরটাকে আলগা করে ছেড়ে দিল। মিহির দরজা বন্ধ করে ওর সামনে দাঁড়াল। হেলান দিয়ে মুখ তুলল প্রণব।
"ঠিকই বলেছিস মিহির, আমাকে নীপার আর কোনও দরকার নেই।"
মিহির বলতে যাচ্ছিল, এ-কথা আবার কবে কখন তোকে বলেছি। বলল না, তা হলে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যাবে। মাথায় এখন একবগগা একটা চিন্তাই ঢুকে আছে।
মুখটা সিলিংয়ের দিকে তুলে প্রণব হা হা করে হাসল।
"আমাকে ল্যাং মেরেছে নীপা।"
আবার হা হা করে হাসল।
"তুই গাড়ি নিয়ে এসেছিস?"
"কোন গাড়ি?"
"তোর।"
"কেন, এখন কি আমি গাড়ি চালাতে পারি না ভেবেছিস? যত খাব, তত ভাল চালাব। প্রমাণ চাস? তা হলে চল, কলকাতার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো..."
প্রণব সোফা থেকে উঠবার চেষ্টা করল।
"...তোর কাছে হুইস্কি আছে? আর একটু খাব।"
"না, নেই।"
খানিকটা ব্র্যান্ডি আলমারিতে তোলা আছে। কিন্তু ওকে এখন দেওয়া সম্ভব নয়, উচিত নয়। এখন ও যদি সোফায় ঘুমিয়ে পড়ে সেটাই হবে মঙ্গলকর।

"থাকলে ভাল হত। আজ হচ্ছে আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। নিজেকে ঠিকঠাক করতে হলে আর একটু... তুই ব্যাটা কী বুঝবি এ-সবের। সম্ভ্রান্ত, মানী এখন। এ-সব সমস্যা তোর নেই, হবেও না।

"জীবনে তো শুধু দুটো মেয়েমানুষের সঙ্গে শুলি। দুটোই বিয়ে করা বউ।... দুটো নয়, অনেক অনেকের সঙ্গে আমি শুয়েছি, বুঝলি রে পাঁঠা, তাই নয়, একজনকে ভালও বেসেছি। কী বললুম শুনলি, ভালবাসা বললুম কেননা আমি জেনেছি এটা কী, আমি জেনেশুনেই এ-কথা বলেছি যদিও আমি কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ... ঠিক উচ্চারণও তো করলুম, তুই এখন পারবি?"

প্রণব আর একবার ওঠার চেষ্টা করল। মিহির বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। ওধারে এখন কে কে দাঁড়িয়ে শুনছে। বাদলের মা, ছায়া আর মা, তিনজনেরই কানে যাচ্ছে। জানলাটা রাস্তার দিকে, এই যা রক্ষে।"

"সত্যি বলছিস তোর কাছে একটুও নেই?"

"না।"

"উকিলের কাছে গেছলাম। নীপার মণিকাকা, অতএব আমারও কাকা। মাইডিয়ার লোক। কিন্তু আমাকে যেন চিনলই না, আর পাঁচটা মক্কেলের মতো ব্যবহার করল।

"ওর সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা হল, সেটা তোকে হুবহু সংলাপের মতো করে বলছি; শুনে যা:

"আমার ভবিষ্যৎ প্রাক্তন-স্ত্রীটির সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে?"

"উত্তর দিল ভুরু কুঁচকে:

"'এইরকম দিনে তোমার মদ খাওয়া উচিত হয়নি প্রণব।"

"বোঝ, বলে কিনা এইরকম দিনে?"

"'ডিভোর্সের কী হল' জিজ্ঞেস করলুম। 'ডিভোর্স কবে হচ্ছে?'

"এবার আমাকে একটা লম্বা লেকচার ঝাড়ল। নীপা দারুণ ভালমেয়ে, ও যেমন আত্মীয়, তেমনি আমিও। তারপর বলল, আমার দুটো ছেলেমেয়ে রয়েছে।"

মিহির একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। সে নিজে কখনও মাতাল হয়নি।

"কী রে বোবা হয়ে গেলি নাকি?"

"কিছু বলার নেই, যা-কিছু তুই-ই তো বলছিস।"

"অ। তার মানে আমায় চুপ করতে বলছিস? তুই চাস আমি নীরবে দগ্ধ হই। তুই কি জানিস উকিলের লেকচার থেকে শেষ পর্যন্ত কী বেরিয়ে এল? দু'জনে মিলে হিসেব কষেছে আমার আইনজীবী আর আমার আইনসঙ্গত বউটি মিলে। দু'জনে ফর্দ তৈরি করেছে। ছেলেমেয়ের জন্য মাথা পিছু কত আমায় দিতে হবে। ঝণ্টুর মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আর ঝিনির জন্য একটা পাত্র কিনতে কত টাকা লাগবে তারই ফর্দ। এর উপর তো বউয়ের খোরপোষ আছেই।

"উকিল বলল, 'নীপা যদি চাকরি পায়-ও, জজ তবু ওর খোরপোষের দাবি মেনে নেবে।'

"এইভাবে ওরা আমায় জব্দ করবে ঠিক করেছে। আমি না খেয়ে মরি, এটাই ওরা চায়। আর আমিই ছিলাম কুচক্রী, বদমাশ যে সাধ্বীপত্নী, নিষ্পাপ নিরপরাধ ছেলেমেয়েদের ত্যাগ করে ভিখিরিতে পরিণত করতে চাইছে। এই হল মোদ্দা কথা।"

"তুই গাড়িটা কোথায় রেখেছিস?"

"যেখানেই রাখি না কেন। নম্বর দেখে বাড়ি বার করতে হলে, গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে খুঁজতে হয়। কোথায় যেন রেখেছি, খুঁজে নেব'খন।... যা বলছিলাম, প্রায়শ্চিত্তের ফর্দ ওরা তৈরি করে ফেলেছে। চমৎকার পরিচ্ছন্ন টাইপ করা। ঝণ্টুর জন্য অ্যাতো, ঝিনির জন্য অ্যাতো... তুই বিরক্ত হচ্ছিস না তো, এ-রকম জব্দে আরতি তোকে ফেলেনি। ভাল মেয়ে, খুবই ভাল। ও থাকলে তোর ভাল হত। সুখী হতিস।"

প্রণব ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল। বন্ধ দরজার দিকে অপরাধীর মতো তাকাল।

"আমার বলা উচিত হয়নি। আমি তোর বউ সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলিনি, নিশ্চয় এও... কী নাম?"

"ছায়া।"

"ছায়াও ভাল মেয়ে নিশ্চয়। তবে আরতি ছিল আলাদা ধরনের। পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়? যার সঙ্গে যে খাপ খাবে। ভেবেছিলাম নীপার সঙ্গে খাপ খাবে। মুশকিল কী জানিস, আঙুল তো আর ছোট-বড় হয় না, বদলায় না। অথচ আমি বদলাচ্ছি। ভাবছিস মাতাল হয়ে এ-সব বলছি... তা নয়, কিছু একটা করবার জন্য তৈরি হওয়া যাকে বলে, তাই হচ্ছি।

"ওই যে ফর্দ। যা আমার আয় আর কত দিতে হবে, বিয়োগ করলে বড়জোর হাতে, থাকবে তিন-চারশো টাকা। আইন কী বলে জানি না, কিন্তু উকিল বলেছে।

"তিন-চারশো টাকায় আমি আর বনানী! একটা কুকুর পুষলেও তো বেশি লাগে। বনানী চাকরি করে কিন্তু আত্মমর্যাদা যার আছে সে কি সংসার চালাবার জন্য ওর কাছে হাত পাততে পারে?"

প্রণব কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আর একবার সে তাকাল চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে কোনও প্রতিবাদ মিহির করে কি না দেখার জন্য।

"দশটা আস্ত নিটোল বছর ধরে আমাদের দাম্পত্যজীবন কেটেছে। আর ওরা এখন হিসেব কষছে, ভেবে চিন্তে মনে করে বার করছে। ওই সময়ে কত টাকা আমি নীপার জন্য খরচ করেছি। ধর সব টাকা যদি জমিয়ে রাখতাম?"

পাশের ফ্ল্যাটে রেডিয়োতে আবহ সংবাদ পড়া হচ্ছে। মিহির শোনার চেষ্টা করল, বজ্রবিদ্যুৎ সহ কয়েকপশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না। আজও দিনটা গুমোট কেটেছে।

"বনানীর সঙ্গে দেখা করেছি।"

নাটকীয় করার জন্য থেমে রইল কয়েক সেকেন্ড।

"ওর ডিপার্টমেন্টের সবাই যেমন আমার দিকে তাকায় তেমনি তাকাচ্ছিল। ওর বসের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। ওকে বললাম: 'কথা আছে, চলো কোথাও গিয়ে বসি।' ও আমার হাবভাবে বুঝতে পারল, না বলাটা ঠিক হবে না। হয়তো ভেঙেচুরে কাণ্ড বাধিয়ে দেব।

"অফিস থেকে বেরিয়ে দু'জন বসলাম ম্যাডোনায়, বললাম: 'উকিলের কাছে গেছলাম।'

'তোমাকে এ-কাজ করতে বারণ করেছে নিশ্চয়।'

"'তুমিও কি ওদের দলে ভিড়লে?'

"ও টেবিলের নীচে আমার হাত চেপে ধরল। বলল, 'প্রণব শোনো, সবদিক থেকে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ভেবেছি, কথা বলেছি। তুমি জানো, আমিও জানি, আমাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া কী পাব আমরা বিয়ে করে? আমরা তো ইচ্ছে মতো দেখা করছি। বউ তো তোমায় বেঁধে রাখেনি।'"

মিহির একদৃষ্টে তাকিয়ে শুধু ভাবল তার এই বন্ধুটি যতটা মাতাল দেখাবার চেষ্টা করছে ততটা সত্যিই কি না।

"মিহির বুঝতে পারছিস? এর মানেটা হল নীপার অনুগ্রহেই যেন বনানীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। আমি ওকে উকিলের হিসেবের ফর্দটার কথা বললাম। তাইতে বলল, 'এখন বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

"ও আমার কথার পয়েন্টটাই ধরতে পারেনি। বললাম, 'ধরো যদি ডিভোর্স পাই।'

"'সেটাই তোমাকে বিয়ের কারণ হতে পারে না। প্রণব, যুক্তি দিয়ে দ্যাখো। আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি। এখন আমরা আমাদের কিছু সময় একসঙ্গে এনজয় করছি ঠিকই। কিন্তু তার দ্বারা বোঝায় না...'

"'কী বোঝায় না?'

"'বোঝায় না আমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হবে।'

"'তুমি রিফিউজ করছ?'

"'হ্যাঁ।'

"'তুমি রিফিউজ করছ যেহেতু আমার আর টাকা নেই বলে?'

"'রিফিউজ করছি যেহেতু দু'-এক মাসের মধ্যেই আমরা ভীষণ অসুখী হয়ে পড়ব বলে।'

"'তা হলে তুমি আমার থেকেও বেশি জানো, দু'-এক মাসের মধ্যে আমি কী হব? বেশ, তা হলে

তোমাকেও জানাচ্ছি। তুমি আর সবার মতোই একটা আস্ত বেশ্যা। এর আগেও তুমি তাই ছিলে।'

"'প্রণব, আর আমার কিছু বলার নেই। একদমই কিছু বলার নেই। তোমার সম্পর্কে আমার কোনও রাগ বা খারাপ ধারণা নেই। আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ। এবার তোমার সঙ্গে দেখা হলে অন্যদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করি কাল থেকে তাই করব।'

"বনানী উঠে পড়ল। টেবলগুলোকে এড়িয়ে বেরিয়ে যাবার আগে শুধু ফিসফিস করে বলে গেল: 'ভাল থেকো।' এবার কী বলবি বল।"

মিহির জবাব দিল মৌন দ্বারা; ভারী অপ্রতিভ মৌন। প্রণব বিরক্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াল।

"তোকেও মনে হচ্ছে ওদের দিকে। চলি এখন। তোর অনেক দামি সময় নষ্ট করলাম, আর করব না। তোর সামনে ন্যাংটো হলাম, নিশ্চয়ই লজ্জা পাচ্ছিস, ওই সব খুলেই ন্যাংটো হয়েছি... নৈতিক নগ্নতা... প্যান্টুল খুলে সত্যিকারের ন্যাংটো হওয়ার থেকে বেশি ন্যাংটো। এখনও বনানীকে আমি ভালবাসি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এ-কথা বলতে পারি। গুড নাইট।"

প্রণব একটু টলে উঠেই সিধে হয়ে দরজার দিকে এগোল। পা লেগে ছোট্ট টেবলটা পড়ে যেতেই নিচু হয়ে তুলতে গেল। কিন্তু সেটা বিপজ্জনক হয়ে পড়বে বুঝতে পেরে চেষ্টা ছেড়ে দিল।

"ঠিক আছে।"

"দরকার নেই। তোকে পরে টেলিফোন করব।"

সিঁড়িতে জোরে জোরে শব্দ হল ওর নেমে যাওয়ার। জানলা দিয়ে রাস্তায় দেখার চেষ্টা করল সে প্রণবকে। একবার বাঁ কাঁধের একটুখানি চোখে পড়ল। কাঁধটা সামনে ঝোঁকানো।

শুধু মা জিজ্ঞাসা করে তাও ব্যস্ত না হয়ে, সাদামাটা কৌতূহল এবং অভ্যাসবশত।

"হ্যাঁ প্রণব। বাড়িতে একটু গণ্ডগোল হয়েছে বউয়ের সঙ্গে।"

এটুকু জবাবেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। ছায়া কখনওই কৌতূহল দেখায় না আগন্তুকদের সম্পর্কে।

মালতী দত্তের খাতা বিছানাতেই পড়ে ছিল। আলো জ্বালিয়ে রাখলে বুবাইয়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে, তাই সেটা নিয়ে সে বসার ঘরে এল। পড়া শুরু করার আগে সিগারেট ধরিয়ে জানলায় দাঁড়াল। প্রণবের চিন্তা তাকে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে। তার মনের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য। অথচ সে নিজে কিছু অন্যায় তো করেনি, ওকে সাহায্য করার জন্য সে ব্যস্ত নয়, সম্ভবও নয়।

অথচ এসেছিল করুণ আবেদন নিয়ে। ও চেয়েছিল সহানুভূতি। মাতাল হোক বা যাই হোক, যে-ভাবেই কথা বলুক, কেউ একটা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিক এটাই প্রণব দাবি করেছিল।

ঠিক এই রকম অবস্থা একদিন তারও হয়েছিল। কিন্তু সে কারুর কাছে গিয়ে এ-ভাবে বলতে পারেনি। প্রণব দশ বছর আগে ডিভোর্স দিতে নিষেধই করেছিল। এখন ও ভিক্ষা করছে।

বেচারা! বছরের পর বছর মূর্খের স্বর্গে বাস করে গেছে। হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল, মমতাপরায়ণ, স্নেহবৎসল ছিল সবার প্রতি। তা সত্ত্বেও দুবলা চরিত্রের নিজের জীবনটাকেই সামলাবার ক্ষমতা হয়নি, বউ ছেলেমেয়ের তো নয়ই।

সিগারেটটা রাস্তায় ছুড়ে দিয়ে সে সোফায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল। দু'দিনের মধ্যে সে অনেক অপ্রিয় সত্য জেনেছে। সেগুলোকে ধীরে ধীরে হজম করে নিতে হবে।

ত্রিকালকে তুলতে হবে, নয়তো হিরণ ভটচাজ একে একে তার আরামগুলো কেড়ে নেবে। যা অভ্যাস হয়ে গেছে এখন তা বদলাবার ইচ্ছে তার নেই। বয়স কুড়ি বছর কম হলে সে লড়ে যেতে পারত!

যখন সে শিশু বা কিশোর তখন কতবার তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "বড় হলে কী হবি?"

যেন বললেই হওয়া যায়। ব্যাপারটা যেন তারই হাতে। ছোট থেকেই তার ধারণা হয়েছিল, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে হঠাৎ কিছুর উপর, কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার বা কোনও কথা হঠাৎ শুনে ফেলার উপর। এখানে ওখানে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে হবে না। প্রতিষ্ঠা আর অর্থের জন্য

তাকে কিন্তু দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে গত দশটা বছর। আর তারই ফলে হার্ট আজ যে-কোনও মুহূর্তে অচল হবার অবস্থায়।

"কখনও দুশ্চিন্তার মধ্যে যাবেন না। এমন একটা কিছুর মধ্যে থাকার চেষ্টা করুন যা প্রফুল্ল রাখবে।"

ডাক্তার বত্রিশ টাকার বদলে এইসব অমূল্য উপদেশ দিয়েছিল।

আলো নিভিয়ে, সদর দরজা ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না দেখে মিহির শোবার ঘরে এল। এখন আর মালতী দত্তর স্মৃতিচারণ দেখা সম্ভব নয়। ঘুম পাচ্ছে।

ছায়া ঘুমোচ্ছে। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ওর আছে। এ-ব্যাপারে আব্দুলের মতোই। কিছুক্ষণ বালিশে মুখটা রগড়াবে, বিছানায়, এপাশ-ওপাশ করবে, কুকুর বা বেড়াল যেমন আরামদায়ক অবস্থা তৈরি করে কুণ্ডলী হয়, ছায়াও অনেকটা সেইরকম তৈরি করে।

এইরকমভাবে ওকে দেখলে বড় কোমল লাগে, মায়া হয়। মিহির সন্তর্পণে ওর পাশে শুয়ে পড়ল রাত্রের জন্য মৃদু নীল আলোটা জ্বালিয়ে রেখে।

বিশেষ এক ধরনের শ্বাস-প্রশ্বাস আছে ছায়ার, যখন ও ঘুমোয়। হাওয়ায় বইয়ের পাতা ওড়ার মতো একটা ক্ষীণ শব্দ হয়। বিয়ের পর ঠাট্টা করে সে বলেছিল, "তোমার নাক ডাকে কিন্তু।" ছায়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কিছুটা ভয়ে, অধিকাংশটা উৎকণ্ঠায়। "তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না তো?" তাড়াতাড়ি সে জবাব দিয়েছিল, "না, না, এটা ঠিক নাক ডাকা নয়, খুব সামান্য একটা, মাছি ওড়ার মতো কি বইয়ের পাতা ওলটানোর মতো শব্দ। এতে বরং আমার..."

মিথ্যে বলেনি। শব্দটা তাকে ঘুম পাড়িয়েই দেয়। যেমন এখন।

সাত

ছবির প্রিন্টগুলোর উপর আবার ঝুঁকে পড়ে মিহির খুঁটিয়ে দেখল। প্রাণগোপাল পেয়েছে ভালই। মালতী দত্তকে ক্ষিপ্ত, অবসন্ন, কান্নায় ভেঙেপড়া, মিনতি ভরা, নানান মুডে ক্যামেরায় ধরেছে। ঠিক এই রকমই সে চেয়েছে।

"মনে হচ্ছে তোমাকে খুব ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল।"

শীর্ণ, লম্বা প্রাণগোপাল তার ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলের গোছা মুঠোয় ধরে গম্ভীর ধীর স্বরে বলল, "নামের সঙ্গে গোপাল কথাটা ছিল বলেই প্রাণটা নিয়ে ফিরতে পেরেছি...বাপস, কোথায় পাঠিয়েছিলেন মিহিরদা, একেবারে নেকড়ের গর্তে!... ছবি নেব বলামাত্রই তো খেপে উঠে দাঁড়ালেন।

মিহির আবার প্রিন্টগুলোর দিকে চোখ ফেরাল। ডাইনিং টেবলের ধারে চেয়ার থেকে উঠতে যাচ্ছে, চোখে অদ্ভুত ঘৃণা আর রাগ। কিন্তু মিহিরের দৃষ্টি টেবলের দিকে সরে গেল। ছবিতে চমৎকার দেখাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই টেবলটা এসেছে। কয়েকটাতে রয়েছে পুষ্প। সন্ত্রস্ত, ব্যাজার মুখ। একটা ছবিতে সে দু' হাতে ধরে আছে মালতী দত্তকে।

"আপনি বলেছিলেন, ঘরের মধ্যে একটা ফোটো আছে। সকালে একঘণ্টা তার সামনে ধ্যান করেন। ফোটোটা আর ওঁকে আপনি একসঙ্গে চেয়েছিলেন কিন্তু কী করে, যখন পৌঁছলুম তখন ধ্যানট্যান সারা হয়ে গেছে, বসেছিলেন ওই টেবলে।

"'কী জন্য এসেছেন? বেরোন, বেরোন নয়তো পুলিশ ডাকব।'

"আমি তো তৈরিই ছিলাম পরের পর মেরে যাচ্ছি আর উনিও সমানে বলে যাচ্ছেন 'আপনারা নোংরামি করবেন বলে শকুনের মতো ভাগাড় খুঁজছেন। কিন্তু এটা ভাগাড় নয়, এখানে প্রেম। এখানে ঈশ্বর নিয়ে আমি বাস করছি।'

"বুঝলেন মিহিরদা, যা চেঁচাচ্ছিলেন মহিলা, ভয় হল লোকজন না এসে পড়ে। ঘরের ভিতরের ছবি তুলব বলে এগিয়েছি তখন দু'হাত দিয়ে দরজা ধরে...এই যে এইটে...পাগলের মতো চিৎকার আর কান্না জুড়ে দিলেন।

"ভেবেছিলুম ভেতরে ফটোটটো থাকলে পেয়ে যাব, প্রিন্ট করে দেখছি কিছুই আসেনি। ওই সময় ঝিটাও আমাদের হাত ধরে টানছিল; এক ঝটকায় ঠেলে দিয়ে যেই মস্তান পোজে বলেছি, আমার ব্যাগে

বোমা-ছুরি আছে। আর এক পা নড়েছ কি... অমনি ঝি-টা ভয়ে মেঝেয় বসে পড়ল।"

প্রাণগোপাল হো হো করে হেসে উঠল। মিহির ফিকে হাসল। ডাকাতি করানোর চিন্তা থেকে এবার সে রেহাই পেল।

"আমার দরকার কাজ উদ্ধার...এবার থেকে সত্যিই বোমা-ছুরি সঙ্গে রাখতে হবে। যা চেয়েছিলেন এতে হবে তো?"

মিহির মাথা হেলাল। এই ছবিগুলোর ভিত্তিতেই এবার স্টোরি লাইনটা বদলাতে হবে। মালতী দত্তকে নিঃসঙ্গ কামবঞ্চিতা, উন্মাদিনী বৃদ্ধারূপে যদি লেখায় আনা হয় তা হলে স্যার অনন্তলালের প্রেমের দিকটা মার খাবে। বরং প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গের এক মহান নজির হিসাবে ওকে আনলে লেখাটা খাবে। বাঙালির প্রেমহীন জীবনে এই ধরনের নায়িকার চাহিদা, তাও সত্যিকারের নায়িকা, কোনওদিন কমবে না।

"ফোটোটা পেলে খুবই ভাল হত। দেখি অন্য কোনও ভাবে পাই কি না। তুমি বরং উনি যা যা বলেছেন আমাকে লিখে দিয়ো, স্টোরিতে লাগাব।"

"কালকেই পেয়ে যাবেন। মিহিরদা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ছবিগুলো পেয়েছি, একটু বড় করে দেবেন তো।"

হেসে মিহির আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত তুলল। এরপর সে ঘণ্টা দুয়েক ব্যস্ত রইল নানান লোকের আনাগোনা ও গল্পগুজবের মধ্যে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অফিসের কাজও চলছে। এই সময়টায় সে যেন অভ্যস্ত নিরাপদ কোটরের মধ্যে ঢুকে যায়। মগজটা পরতে পরতে ভাঁজ খুলে সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত গুছিয়ে দেয়। শরীরটা হালকা লাগে এবং নিজেকে প্রত্যয়ী বোধ হয়। শুধু হিরণ ভটচাজ এই বাড়ির চারতলায় একটা ঘরে সকাল সন্ধে বসে আছে মনে হলেই তার প্রত্যয়টা কেঁপে ওঠে।

মুখোমুখি বসা অল্পবয়সি ছেলেটি, যার লেখা এইমাত্র সে ফিরিয়ে দিল, অপ্রতিভতা কাটাতে হঠাৎই বলল, "বৃষ্টি নামতে পারে।" মিহির জানলা দিয়ে আকাশে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ এবং যথেষ্ট খুশি হয়ে মুখ ফেরাতেই দেখল দরজার কাছে আরতি এবং ওর থেকে কমবয়সি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

"আসতে পারি?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, কী ব্যাপার... আশ্চর্য!"

"হ্যাঁ তা হওয়ারই কথা।"

অল্পবয়সি লেখক তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ভানু তুমি বরং ওই চেয়ারটায়..."

"না মিহিরদা, আজ চলি, কাল পরশু নাগাদ ওটা একেবারে তৈরি করেই নিয়ে আসব।"

"বেশ।"

"বাণী তুই এখানে বোস, আমি ওইটায় বসছি।"

"আরতিদি তুমি বরং...।"

ঘরে আর একজন লোকও ছিল। প্রতি সংখ্যায় ওর লেখা রাশিফল বেরোয়। ম্রিয়মাণ হয়ে লোকটি বসে।

"অজিতবাবু আপনার ব্যাপারটা আমি হিরণবাবুকে বলব।"

"একটু ভাল করে বলবেন। তিরিশ টাকায় এই বাজারে হয় না। অন্তত পঞ্চাশের কম এইসব ফিচার কেউ করবে না। আপনি বলেছিলেন চার সংখ্যা দেখে তারপর বাড়াবেন।"

"মনে আছে আমার।"

"দয়া করে একটু বলবেন ওনাকে।"

মিহির মাথা হেলাল। সত্যিই সে বলবে। কিন্তু উপযাচক হয়ে নয়। খরচ কুড়ি টাকা বাড়বে এমন প্রস্তাব পেলে হিরণ ভটচাজ ভ্রূ তুলে তাকাবে। পাঁচ টাকা বাড়াবার ক্ষমতাও তার নেই, এই কথাটা অনেকেই জানে না।

অজিত নামক লোকটি ঘরত্যাগ করতেই মিহিরের জিজ্ঞাসু চোখ পড়ল আরতির উপর।

সেজেছে। দিনের আলোয় বহু বছর পর সে ওকে দেখছে। আরতি সাজতে জানে বয়সের সঙ্গে

মানিয়ে। তবে শাড়িটা কোমরের নীচে নামানোর মধ্যে নিশ্চয়ই স্থূল উদ্দেশ্য আছে। চোখের নীচে ধূসরতা। নাক থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত দু'ধারে দুটি হালকা রেখা, চিবুকের নীচে চামড়া সামান্য ঝোলা। পরিচ্ছন্ন সাদা সিঁথি।

"একটা উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি।"

মিহিরের চোখ অন্য মেয়েটির মুখে পড়ল। আমরা কেন?

"বাণী আমার বন্ধু, ওকে তোমায় একটু সাহায্য করতে হবে। তোমাকে সমৃদ্ধি ইনভেস্টমেন্টে একটা কেস করতে হবে।"

মিহির দু'জনের মুখে পরপর তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

"নাহ্, এ-সব করব না, করে লাভও নেই।"

"কে বলল নেই? পনেরো বছর কি কুড়ি বছর পর কত টাকা..."

মিহির দুটো তালু তুলে ধরে আরতিকে থামিয়ে দিল।

"জানি। অন্তত জনা চারেক আমাকে এ-সব বুঝিয়ে গেছে, তোমাদের সমৃদ্ধির কেউ নয় অবশ্য, কিন্তু তাদেরও যা বলেছি তাই বলব তোমাদেরও...টাকা জমানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই।"

"লোকে টাকা জমায় বুড়ো বয়সের জন্য, বংশধরদের দেখার জন্য, বিপদে আপদে সাহায্য পাবার জন্য।"

মিহির লক্ষ করছিল আরতির মুখভাব। কতটা পেশাদার, কতটা আন্তরিক? স্বরে যতটা হিতাকাঙ্ক্ষী, চোখেও তাই। মিহির অস্বস্তি ভরা বিস্ময় নিয়ে বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ ওর এই আসাটা কেন?

বাণীর উপকার করার জন্য মোটেই নয়। অনেকদিন আগে কানে এসেছিল আরতি এই রকম একটা প্রতিষ্ঠানে আছে। এই বাণীর মতোই কারুর তাঁবে থেকে লোক ধরে কেস করত। এতদিনে নিশ্চয় কিছুটা উঠেছে। বোধহয় বাণী এখন ওর তাঁবে এজেন্টের কাজ করছে। এর মতো আরও দল হয়তো আছে। এরা কেস পেলে আরতি কমিশন পাবে।

তার বুড়ো বয়সের কথা ভেবেও আরতি আসেনি। বংশধরদের... তার মানে বাটু!

"বাটুর দারুণ আনন্দ হয়েছে।"

তার মুখে চোখে কি চিন্তাটা ছাপা হয়ে গেছল। নয়তো পড়ে ফেলল কী করে! আরতি অনুসরণ করছে তার মনোভাব; এটা বুঝতে পেরে সে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

"জিনিসগুলো দেখাতে আমার জন্য জেগেছিল। তোমাকে ওর পছন্দ হয়েছে খুব।"

আরতি হাসছে। বাণী সাধারণ মুখ নিয়ে বসে আছে। জানে, তার কিছু করার নেই এখানে।

"তুমি যাবে বলেছ তাই সকাল থেকে খালি প্রশ্ন কবে আসবে কখন আসবে। আচ্ছা, আমি কি করে বলব বলো তো!"

"তোমার ফিরতে রাত হয়েছিল?"

কথাটা বলেই খেয়াল হল, একটু যেন কৈফিয়ত চাওয়ার সুর তার কণ্ঠে ছিল, কেন না আরতির কপালে দপ করে ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল। অনধিকার চর্চা। ও এখন বিবাহিত স্ত্রী নয়। প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারে।

"বন্ধুর মেয়ের জন্মদিন ছিল সেই রিজেন্ট পার্কে। সেখান থেকে গৌরীবাড়ি, কলকাতার এমাথা থেকে ওমাথা, ফেরা কি সহজ কথা?"

হয়তো মিথ্যাই বলল। কোনও লোকের সঙ্গে কোথাও হয়তো কাটাচ্ছিল।

"তা হলে কি কেস করবে না? বাণীকে আসার সময় বলেছি পঁচিশ হাজারের হবেই। এককথায়।"

কী একটা যেন আরতির চোখে সে দেখতে পেল এবার। মিনতি, অভিমান, হতাশা। স্বর যতটা সতেজ, তীব্র ছিল আর তা নেই। হয়তো সত্যিই বলেছে এককথায় হয়ে যাবে। কিন্তু এ-সবের তো অধিকার নেই, এটা ও ভালই জানে। তা হলে আস্থা পেল কোথা থেকে? আমার মধ্যে কিছু কি ও খুঁজে পেয়েছে।

মিহির নঞর্থক মাথা নাড়ল। একদৃষ্টে ও তাকিয়ে। চিন্তা বাড়ছে। বাইরে ঘোরা মেয়েদের এই ক্ষমতাটা হয়।

"পরে ভেবে দেখব। এখনই কি বুড়ো হয়ে গেলাম, নিরাপত্তা খোঁজার বয়স কি এসে গেল?"

প্রশ্নের আকারেই তার স্বর ও চাহনি গেল আরতির দিকে।

ও মুখ টিপে হাসল।

"বাণী তুই কী বলিস? এই লোকটা বুড়ো নয়তো কী?... চুল পেকেছে, ভুঁড়ি হয়েছে। তুই দেখিস, কোনও মেয়ে যদি হাত ধরে অমনি ভয়ে দৌড় লাগাবে।"

"না আরতিদি, তোমার কথা আমি মানতে পারলাম না। উনি দারুণ অ্যাট্রাকটিভ... অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।"

বাণীর গলাটি মিষ্টি। যতটা ভোঁতা মনে হচ্ছিল, মোটেই তা নয়। কথাগুলো বহুবার হয়তো ব্যবহার করেছে।

"কোনও মেয়ে হাত ধরলে যদি কেউ না দৌড়য়, তা হলে সে কী?"

"অন্তত পুরুষমানুষ।"

"মেয়েমানুষের সংজ্ঞাটা কী?"

চেয়ারে টান টান হয়ে আরতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আমি, এইরকম একটা দর্পিত ঘোষণা ওর সারা দেহে শেষবারের মতো যেন মুগ্ধতা দাবি করছে।

অজান্তে মুগ্ধ চোখে মিহির তাকিয়ে। এই মেয়েমানুষটিকে সে আগে কখনও দেখেনি।

"সংজ্ঞা হয় না।"

মিহির চোখ নামিয়ে নিল কথাটির কাছে বশ্যতা জানাতে।

"বাণী ওঠ,—আর দেরি করলে বাসে ওঠা যাবে না। ...ভাল কথা, বাটু সম্পর্কে ভেবে দেখলাম। ওকে ছাড়তে পারব না।"

হতভম্বের মতো সে তাকাল। আচমকা এ কী কথা। অথচ সেদিন রাতে বলেছিল, "বাটুকে তুমি নেবে?"

"ও নষ্ট হয়ে যাবে।"

"নাহ্।"

বিরক্তি আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ও 'নাহ্' বলল।

"ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত, সেটা তোমার কর্তব্য।"

"চেষ্টা করব, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী।"

"তোমার সামর্থ্য নেই।"

"কে বলল নেই? কতটুকু জানো আমার সামর্থ্যের?"

"ওকে মানুষ করার সামর্থ্য নেই এটা অন্তত বুঝি। ওকে আমার কাছে আনব।"

"কী ভাবে?"

মিহির হঠাৎ অসহায় বোধ করল। পাঁচিলের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছিল এতক্ষণ, এখন পাঁচিল শেষ, সামনে শূন্যতা।

"তোমার সঙ্গে গিয়ে কথা বলব, বাড়িতে থাকবে?"

আরতির গালের টোল এই প্রথম আজ তার চোখে পড়ল।

"বাণী ফর্মটা ওকে দে। যেখানে ক্রশ দেওয়া সেখানে সই করে নিয়ে যেয়ো।"

ব্যাগ থেকে বাণী একটা ছাপা ফর্ম বার করে, মুহ্যমান অবসন্ন মিহিরের সামনে টেবলে রেখে তার উপর একটা পেপার ওয়েট চাপা দিল।

"চলি।"

ওরা চলে যেতেই মিহির দুই তালুতে মুখ ঢাকল।

অনেকদূর থেকে একটা ক্ষীণ টেলিফোন ঘণ্টা বাজার শব্দ আসছে।

চলচ্চিত্রের পর্দায় একটি দৃশ্য গলে যেতে যেতে আর একটি দৃশ্য ফুটে ওঠার মতো তার মনে একের পর এক মুখ আর ঘটনার আসা যাওয়া চলছে। দূর বাল্যকালের ঘটনা থেকে সামনে রাখা ফর্মটা, এর মাঝে কাটা কাটা ছবি। সাদা পাতার গাছ সিলখেরা ত্রিজুগা... মালতী দত্তের সাদা চুল, থাবা দেওয়া

টেবলের পায়া... ঘোড়সওয়ার মলাটের খাতা... বাটুর কৃতজ্ঞ চাহনি... মোনার বুক... আরতির টান হয়ে বসা... ছায়ার ঘুমন্ত কুণ্ডলী দেহ... আর নীপা...।

"মিহিরদা আপনি রয়েছেন।"

চমকে ঘোর ভাঙল। পাশের প্রুফ-রিডারদের ঘর থেকে উঠে এসে জগবন্ধু বিস্মিত চোখে দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে।

"ফোনটা বেজে যাচ্ছে, তাই ভাবলুন..."

মিহির চোখ তুলল।

"হ্যালো, মিহির বিশ্বাস বলছি।"

"মিহিরদা আমি নীপা।"

উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত স্বর।

"ওকে কি আজ দেখেছেন? কাল আমার এখান থেকে রাত্রে বেরিয়ে গেছে।"

"আমার কাছে এসেছিল, রাত এগারোটা পর্যন্ত ছিল।"

"তারপরই বোধহয় বাড়িতে আসে। আমিই দরজা খুলে দি। এত খেয়ে এসেছিল যে দাঁড়াতে পারছিল না। হাঁপাচ্ছিল, চোখ লাল, পা দিয়ে জুতোর র‍্যাক ফেলল, অ্যাশট্রে ভাঙল, তারপর বলল, 'ছাড়া গোরু আবার গোয়ালে সুড়সুড় করে ফিরে এল।' এই বলে হো হো করে হেসে উঠল। একদম বেহুঁশ।

"বললাম, 'পাশের ঘরে বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে, চেঁচিয়ো না।' বলল, 'একদিন তো জানবেই বাবা কী ছিল। নয় দু'দিন আগেই জানল।'

"'চুপ করো', এই বলতেই বলল: 'নিজের ঘরেও কি কথা বলার অধিকার নেই? আমার টাকায়ই সব, এই ঘরদোর, এই টেবল সোফা, তোমার পরনে শাড়ি। জীবনভর তো শুধু দিয়েই যাচ্ছি, আর কথা বললেই কিনা চুপ করো।"

"বললাম, 'হয়েছে কী?"

"'হবে আবার কী? আমার আর ডিভোর্সে দরকার নেই। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উকিল এটা আমায় সমঝে দিয়েছে। তোমরা দু'জনে মিলে যে ফর্দ বানিয়েছ সেটা আমার গলার মধ্যে ঢুকে দমবন্ধ করে দিয়েছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমি মরে যাব।'

"মিহিরদা যতক্ষণ কথা বলছিল শুধু পাগলের মতো এধার ওধার তাকাচ্ছিল। আমার সত্যিই তখন ভয় করছিল। রাতে কিছু কি বলেছিল?"

"সারাক্ষণ তোমার, ছেলেমেয়েদের, নিজের আর সেই মহিলার কথাই বলেছে। বেশির ভাগ নিজের সম্পর্কেই। আমার শুধু ভয় হচ্ছিল গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে তো!"

"সে ব্যাপারে খুব স্টেডি। ঘুমিয়েও গাড়ি চালাতে পারে। কিন্তু তখন আমি ওর বকবকানি থামাতে পারিনি। 'মাত্র তিন-চারশো টাকা শুধু হাতে থাকবে', এই কথাটা দু'বার বলল। তারপর এমনভাবে হেসে উঠল যা ফোঁপানির মতো কানে লাগল। 'তুমি সবই তো জানো, তুমি আর উকিল মিলেই তো এই চক্রান্ত করেছ।' ওকে আমি বুঝিয়ে ঠান্ডা করতে গেলাম কিন্তু কোনও কথাই কানে নিল না। বলল: 'উকিল নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে, যে আমি গুটগুট করে বাড়ি ফিরে আইনসঙ্গত বিছানায় গিয়ে শোব... বনানীও তাই ভেবেছে।'

"মিহিরদা একবার মনে হল ও বুঝি মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠবে। এই সময় পাশের ঘর থেকে দরজায় এসে দাঁড়াল ঝন্টু। বড়ছেলে। চোখ কচলাচ্ছে ঘুম ভাঙার জন্য। আমি ওকে ঘরে চলে যেতে বলে প্রণবকে বললাম: 'দেখলে তো।'

"দেখলে তো কী? আমি অবাঞ্ছিত এই তো? তা তো জানিই। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে একটা টাকাও নেই।' আমার কাছে শ'দুয়েক টাকা ছিল। ওকে দিলাম।

"'ধন্যবাদ মিসেস দত্ত। তুমি খুবই দয়ালু মহিলা মিসেস দত্ত। কথা দিচ্ছি আর তোমায় জ্বালাতন করব না।'

"বললাম, 'এখন কোথায় যাবে, ওই ওর কাছে?'

"'আমার মনে হয়, এ বিষয়ে কথা বলার কোনও অধিকার তোমার নেই। কথা দিচ্ছি, যাই হোক না কেন ডিভোর্স হচ্ছে না। পুনর্বিবাহও হচ্ছে না। একবারই যথেষ্ট, তাই না মিসেস দত্ত?'

"বললাম, 'এত রাতে বেরিয়ো না।' কিন্তু শুনল না। 'গুড বাই' বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম প্রণব গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিয়েও থামিয়ে দিল ইঞ্জিন। একটু পরে নাইট গার্ডকে দেখলাম গাড়ির জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিচ্ছে। ওকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। ভীষণ মশা তাই ওকে বললাম গাড়ির কাচগুলো তুলে দিতে। আজ সকালে দেখি গাড়ি নেই। কেউ বলতে পারল না কখন চলে গেছে।

"আপনি একটু খোঁজ নেবেন মিহিরদা কোনও বারে-টারে যদি থাকে আমার কেমন যেন ভয় করছে।"

"কীসের ভয়!"

"যে-রকম মানসিক অবস্থায় দেখেছি, কিছু করে বসে যদি।"

"দু'শো টাকা হাতে পেয়েছে যখন...দেখি কোথায় ধরা যায়। পেলে সঙ্গে করে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"অ্যাকসিডেন্ট করল কি না কে জানে। ওকে ওইরকম ভাবে দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। বেহুঁশ হতে তো অনেকবারই দেখেছি কিন্তু এ-রকম কখনও দেখিনি। সারাক্ষণ কী যেন একটা বলতে চেয়েও বলতে পারল না।"

"আমি দেখছি, তুমি চিন্তা কোরো না। অ্যাকসিডেন্ট করবে না, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থেকো।"

মিহির রিসিভার রেখেই উঠে পড়ল। অত্যন্ত ব্যস্ততায়, বাণীর রেখে যাওয়া ফর্মটা ভাঁজ করে বুক পকেটে ভরে ব্রিফকেসটা হাতে ঝুলিয়ে সে একতলায় নেমে এল।

ওকে দেখেই ফটকের কাছেই গল্পরত আবদুল গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

"না থাক।"

আট

এখন বারগুলোয় খুঁজে বেড়াতে হবে সুতরাং হাঁটাই সুবিধার। এই অঞ্চলেই গোটা ছয়েক আছে। প্রণব সাধারণত এদিকটায় আসে না। তবু সে ঠিক করেছে একটার পর একটা দেখবে।

কাল রাতে প্রণব চলে যাওয়ার পর থেকেই যে অস্বাচ্ছন্দ্য শুরু হয়, নীপার টেলিফোন পাওয়ার পর সেটা অনুশোচনায় পরিণত হয়েছে। প্রণব সহানুভূতি চেয়েছিল। অর্থ নয়, আশ্রয় নয় কেউ হাতটা বাড়িয়ে দিক।

বৃষ্টির ফোঁটা হাতের উপর পড়তেই সে আকাশের দিকে তাকাল। মেঘে ছেয়ে রয়েছে। তারপর সে লক্ষ করল, রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। কয়েক পা এগোতেই বড় বড় ফোঁটায় দ্রুত বৃষ্টি নেমে এল। ছুটে সে একটা দোকানের সামনের চালার নীচে দাঁড়াল।

প্রণবের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই রাতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। নীপাও বুঝতে পারেনি, কেননা সে-কথা প্রণব কখনওই স্বীকার করবে না। ওর ব্যক্তিগত কিছু অহংকার আছে।

বৃষ্টি উত্তরোত্তর বেড়েই চলল আর মিহিরও ক্রমশ ডুবে যেতে লাগল নিজের ভাবনায়। প্রণব থেকে নীপা এবং অদেখা বনানী এই ত্রিভুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে ক্রমশই নিজেকে বিভ্রান্ত করে তুলল, কোন ভুজটির পক্ষ সে নেবে?

মিনিট কুড়ি পর বৃষ্টি টিপটিপ পর্যায়ে আসতেই সে মোটর, রিকশা, মানুষের ভিড়, কাদা, জঞ্জাল, গর্ত, ঢিপি, রাস্তার এই অসুবিধাগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

প্রথম যে-বারটায় সে ঢুকল, সম্ভবত বৃষ্টির জন্যই, অসম্ভব ভিড়। সে প্রত্যেক টেবলে খুঁটিয়ে লক্ষ করে বেরিয়ে এল। মানুষের মুখ যে কত রকমের হতে পারে এখন সে জানতে পারছে। একজনকে দেখে সে চমকে উঠেছিল, হুবহু বাবার মতো। রাস্তার উলটোদিকেই আর-একটি বার। এখানেও প্রতি চেয়ারে মানুষ, কিন্তু প্রণব নেই।

ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে, ডাইনে বাঁয়ে তিন-চার মিনিটের হাঁটার মধ্যে যতগুলি বার সে পেল,

প্রত্যেকটিকে ঢুকে সে খুঁজল। অবশেষে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে সে রওনা হল প্রণবের পছন্দের জায়গা ব্লু মুন-এ। অবশ্য প্রথমেই সে ওখানে গিয়ে খোঁজ করতে পারত কিন্তু কোনও সুযোগই সে ফেলে রাখতে চায়নি।

দূর থেকে সে চিনতে পারল গাড়িটা। নিচু, হালকা, সবুজ রঙের স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। অফিসেরই একজনের কাছ থেকে কেনা। পিছনের কাচে একটা মেম-পুতুল ঝুলছে।

এখন সে আশ্বস্ত। দুর্ঘটনা অন্তত ঘটেনি। এখানকার ম্যানেজার, ওয়েটাররা প্রণবকে চেনে। ওকে ধারও দেয়। নিরাপত্তাটুকু অন্তত পাবে।

সাধারণত যেখানে বসে, সেই খোপটায় চারজনের একটা দল। মিহির তার তিনদিকে তাকিয়ে প্রণবকে দেখতে পেল না। বরং দু'-তিনজন চেনা মুখ চোখে পড়ল। একজন হাত তুলে তাকে ডাকলও। সে হেসে প্রত্যাখ্যান করেই গম্ভীর হল।

একজন ওয়েটার এই সময় তাকে চিনতে পেরে এগিয়ে এল।

"সেই বাবুকে খুঁজছেন?... পাশের ঘরে একা বসে আছেন।"

পাশের ঘরটায় মিহির কখনও যায়নি। ওয়েটারের নির্দেশমতো কাউন্টারের পাশের দরজা দিয়ে যে ঘরে সে এল, সেটা ঘর না বলে গুদাম বলাই উচিত। স্তূপাকার বিয়ারের পেটি, খালি বোতল এবং ভ্যাপসা গন্ধে বোঝাই জায়গাটার একধারে ছোট্ট একটা স্টিলের টেবলে প্রণব বসে। মাথাটা বুকের দিকে ঝোঁকানো। মনে হয় ঘুমোচ্ছে।

"তুই এখানে বসে?"

ধীরে ধীরে প্রণব মুখ তুলল।

"এ-রকম জায়গায় দমবন্ধ হয়ে মারা যাবি যে!"

"একা থাকতে চাই তাই ওরা এখানে বসিয়ে দিল। আমি কমফর্ট চাই না, একা থাকতে চাই।"

হাত বাড়িয়ে বিয়ারের বোতল তুলে উঁচু করে আলোয় ধরে দেখল ভিতরে কতটা আছে। হাতটা থরথর করছে। কণ্ঠস্বরে সামান্য জড়তা। মুখে বিজবিজে ঘাম। জায়গাটা এয়ারকুলারের আলোর বাইরে।

"কতক্ষণ এসেছিস?"

মাথা নাড়ল। বোতলটা দেখাল আঙুল দিয়ে।

"থার্ড চলছে, বেশিক্ষণ না।"

"সকাল থেকে তা হলে ছিলিস কোথায়?"

ওয়েটার একটা লোহার চেয়ার এনে রাখল তার জন্য। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে।

"আমাকে একটা বিয়ার দাও, ব্ল্যাক লেবেল। ...নীপা ফোন করেছিল, তুই নাকি সকাল থেকে উধাও। খেয়েছিস কিছু?"

প্রণব শেষ কথাটি অগ্রাহ্য করে বলল, "বনানীর বাড়িতে গেছলাম, ওকে ধরব বলে।... ধরা গেল না।"

প্রবল তৃষ্ণার্তের মতো গ্লাসের বিয়ার এক চুমুকে শেষ করল। কষ বেয়ে গড়াচ্ছে। তালুর উলটোপিঠ দিয়ে মুছে নিল।

"ওর ভাই বেরিয়ে এল। বললাম, বনানীর সঙ্গে দেখা করব। ছেলেটা আমায় দু'-একবার আগে দেখেছে। আমায় দাঁড় করিয়ে ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পর এসে বলল: 'দিদি তো ভোরবেলায় দক্ষিণেশ্বর গেছে পুজো দিতে।' বুঝলুম মিথ্যে কথা বলল। বনানী বাড়িতেই আছে। কিন্তু যদি বলে বাড়ি নেই সেক্ষেত্রে কী করতে পারি?"

প্রণব কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল। জ্বলজ্বল করছে চোখ। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত। আঙুলে টিপে গুঁড়ো করছে পোটাটো চিপস।

"ঠিক করলাম ধরবই ওকে। অফিস যেতে তো বাড়ি থেকে বেরোবেই। গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা লাগালাম বাড়ির সামনে। অফিসে যাওয়ার ব্যাপারে খুব পাংচুয়াল কিন্তু ও বেরোল না। অফিসে কামাই করল। আমি দুপুরে আবার খোঁজ নিলাম। ঝি বলল, এখনও ফেরেনি। অফিসে গেলাম। সিটে ওকে দেখলাম না, আসেনি আজ।"

ওয়েটার বিয়ার এনে গ্লাসে ঢেলে মিহিরের সামনে রাখল। প্রণবের বোতলটা আধভরতি।

"তুই ওর আশা ছেড়ে দে।"
"এইসব বলতে এসেছিস?"
"হ্যাঁ।"
"তা হলে লাথি খাবি।"
প্রণব বোতল তুলে মুখে ঢালতে শুরু করল। শার্ট ভিজে যাচ্ছে। কণ্ঠার ওঠানামা লক্ষ করল সে। বোতল থেকে খেতে দেখেছে আরতিকেও। উত্তেজিত, অধৈর্য এবং রাগি মুহূর্ত এগুলো।
"আমার সত্যিই দমবন্ধ হয়ে আসছে মিহির। কোথাও গিয়ে নিশ্বাস নিতে হবে। কোথায় যাই বল তো?"
"গঙ্গার ধারে চল। পরিষ্কার বাতাস পাবি।"
"ওয়েটার... ওয়েটার। খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।"
প্রণব আর কথা বলেনি। দু'জনের বিল ও বকশিশ চুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মিহিরের জন্য।
"আর খাব না, চল উঠি।"
"না, না, খেয়ে নে। নষ্ট করিসনি।"
"না।"
মিহির ব্রিফকেস তুলে উঠে দাঁড়াল। কোনও দ্বিধা না করে এক নিশ্বাসে প্রণব তার বোতল থেকে বাকি বিয়ারটুকু খেয়ে নিল। প্রায় অর্ধেকই গড়িয়ে পড়ল থুতনি বেয়ে বুকে। চোখ বুজে উদ্গত ঢেঁকুর চাপল। তার মনে হল, প্রণব এখন বমি করে পাকস্থলীটা হালকা করে নিলে ভাল করবে।
বেরোবার সময় প্রণব যখন পেচ্ছাপ করতে গেল তখন সে লক্ষ করল, কাঠের মতো শক্ত হয়ে হাঁটছে।
"বাবু ওঁকে একটু দেখবেন। তাড়াতাড়ি নেশা পাবার জন্য বিয়ারের সঙ্গে মিশিয়ে চার পেগ হুইস্কি প্রথমে খেয়েছে। নেশা হয়ে গেছে।"
ওয়েটার ফিসফিস করে বলেই একটা টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। তার ইচ্ছে হল, ওকে কিছু বকশিশ দিতে। এরা প্রণবকে পছন্দ করে, সে-ও তো করে।
প্রণব ফিরে এসে কারুর দিকে না তাকিয়ে, দরজা দিয়ে রাস্তায় নেমে এল। অর্থ না জেনে মুখস্থ বলা ছাত্রের মতো গাড়ির কাছে পৌঁছল। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল। গাড়িতে বসে মিহিরের জন্য, হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল।
দু'জনের কেউ কথা বলছে না। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা প্রায় জনহীন। গাড়ি যত এগোচ্ছে নৈঃশব্দ বাড়ছে। রেড রোডে পড়বার সময় ট্রাম লাইন পার হবার আগে প্রণব গাড়ি মন্থর করে দু'দিকে তাকাল।
এ-সবই মুখস্থ থেকে করে যাচ্ছে। মিহির আড় চোখে ওকে লক্ষ করার জন্য সিগারেট ধরাতেই প্রণব একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওয়াইপারটা কটকট শব্দে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো কাচ ঘষছে। স্থির চোখে সামনে তাকিয়ে ও চালাচ্ছে।
দু'জনের কেউই কথা বলছে না। প্রণব আগে কথা বলুক এটাই সে চায়। প্রসঙ্গটা ওই ঠিক করে দিক। ওর মনের মধ্যে কী ঘটছে সেটা প্রথমে জানা দরকার।
রেড রোড থেকে গাড়ি বাঁয়ে রাস্তা নিল নেতাজি মূর্তি ডান দিকে রেখে। মোহনবাগান ক্লাবের পাশ দিয়ে এবার সোজা বাবুঘাট। নির্জন ফাঁকা রাস্তায় বৃষ্টির জলের উপর রাস্তার আলোর চকচকানি। দুটো হেডলাইট জ্বালিয়ে বাস আসছে। প্রণব বিব্রত মুখে চোখ কোঁচকাল।
ব্রিফকেসটা সে পিছনের সিটে রেখে জানলার কাচ আর-একটু নামাল বাতাস পাবার জন্য। বুক ভরে শ্বাস নিতেই ভেজামাটির সোঁদা মিষ্টি গন্ধে সে তাজা বোধ করল। এখন সিগারেট খাওয়ার মানে হয় না। তা ছাড়া ডাক্তার তো ছেড়ে দিতেই বলেছে।
স্ট্র্যান্ড রোডে পৌঁছে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি ডাইনে রেখে প্রণব দক্ষিণে আউটরাম ঘাটের পথ নিল। হু হু বাতাসে গাড়ির ভিতরটা ভরে গেল। মিহির লক্ষ করল প্রণব ঘামছে। ওর চোখের আকার স্ফীত। ঠোঁট দুটো অস্ফুট সংলাপে ব্যস্ত। কারুর সঙ্গে যেন বাদানুবাদ চালাচ্ছে।
"এখানে একটু রাখ।"
প্রণব তখুনি ফুটপাথ ঘেঁষে মোটর ভেড়াল। অজস্র শালপাতা ছড়ানো, হয়তো আলুচাট জাতীয়

খাবার জিনিস বিক্রি হয়েছে। সিগারেট, সফ্‌ট ড্রিংকসের একটা ছোট্ট দোকান এখনও খোলা। গঙ্গার দিকে বেড়াবার রাস্তায় দু'-চারজন হাঁটছে। কয়েকটা মোটরও দাঁড়িয়ে। ভিতরে মানুষ রয়েছে বোঝা যাচ্ছে। জাহাজে আলো জ্বলছে। বাঁ দিকে ফোর্ট উইলিয়ামের দু'-তিনটি আলো গাছপালার মধ্য দিয়ে।

আবার সেই স্তব্ধতা। ও সামনে তাকিয়ে দু' হাত স্টিয়ারিংয়ে।

"প্রণব।"

সাড়া এল না। মাথাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে স্টিয়ারিংয়ে কপাল ঠেকাল। সে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওর কাঁধে তালু ছোঁয়াল।

"প্রণব বাড়ি ফিরে যা।"

কপাল তুলল।

"তোর মতো ভেড়ার মুখের এ-কথা শোভা পায়।"

"যা বলছি শোন। সময়ের প্রলেপে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কত বড় বড় শোক দুঃখ মানুষ ভুলে যায়, কত গভীর..."

প্রণব দু' হাত তুলে তালু বাজিয়ে শব্দ করতে লাগল 'এনকোর' দেবার ঢঙে।

"করতালি, করতালি, দারুণ ডায়লগ, মোস্ট ওরিজিন্যাল ফিলজফি...বাংলা ফিল্মের হিট সংলাপ।"

"এখন ঠাট্টা নয় প্রণব।" ঝাঁঝালো স্বরে প্রায় ধমকে উঠল সে। "নীপার অপরাধটা কী?"

মুখ ফিরিয়ে তীব্র চোখে প্রণব তাকাল। দু'জনেরই চোখে এবং বসার ভঙ্গিতে হিংস্রতা আসছে। কাঁধ এবং পেটের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

"আমারই বা অপরাধ কী?"

"একটা সরল প্রাণে আঘাত, সামাজিক চুক্তি ভঙ্গ, রীতি বিরোধী কাজ...।"

"আমারও একটা প্রাণ আছে, সমাজটমাজ আছে কি না টের পাই না, সাংসারিক কর্তব্য করে গেছি কিন্তু আইনসঙ্গত কাজই আমি করতে চেয়েছি সেটা যদি রীতি বিরোধী হয় তা হলে রীতিই বদলে দেওয়া উচিত। শোন, বাঁচতে যদি চাস, আমার মনে হয় বাঁচাটাই জীবনের প্রথম আর বড় কথা, তা হলে এই মন যা চাইছে যা বলছে তাই কর। আর তা যদি না পারিস, মরে যা। তোকে দেখতে পাচ্ছি, তুই একটা মরা লোক। তোর সঙ্গে কথা বলব কী?"

প্রণব মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকাল। মরা লোক বলতে ও কী বোঝাতে চায়? জীবন নিয়ে তো অসুখী নই শুধু ঝামেলাগুলো ছাড়া।

কিন্তু বাটু কি ঝামেলা? বাটুর জন্যই কি আরতির ব্ল্যাকমেইলিংটা মেনে নিলাম।

হৃদয়ে কি নানা ধরনের ভাগাভাগি আছে, যার একটা রমণীর জন্য, একটা সন্তানের জন্য, একটা বাবা-মা'র, একটা আত আতুরের, একটা স্ত্রীর, একটা বন্ধু-বান্ধবের, একটা দেশের জন্য?

প্রণবের বোধহয় ভাগাভাগি নেই, সবই আস্ত একটা। যা করে তাই তীব্র সম্পূর্ণভাবে করে। বাটুর জন্য হৃদয়ের পুরোটাই কি আচ্ছন্ন? একটা ভাগ কি আরতির শরীরের দিকে নজর দিচ্ছে না?

মিহিরের মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা অন্ধ রাগ জমা হল। মরা লোক কেন হব, এ-সব কি মৃতের লক্ষণ? আমি নিখুঁত জ্যান্ত লোক।

"তুই একটা উন্মাদ জন্তু। যেটা চাস সেটা গ্রাস করে ফেলতে চাস। তোর ব্যালান্স নেই, এটাকে জ্যান্ত থাকা বলে না।"

"তা হলে কাকে বলে?"

"যার কাজের অর্থ আছে, একপেশেমি নেই, শৃঙ্খলাবদ্ধ, ব্যাপকতা..."

"থাম।"

দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠল প্রণব। সেল্‌ফ স্টার্টারের বোতামে আঙুল রাখল।

"খালি বড় বড় কথা। এ-সব শুনে কি জীবন বদলায়? তুই জীবনে কী করেছিস? একটা বউ লাথি মেরে চলে গেল অমনি আর-একটা বউ আনলি আর বগল বাজিয়ে বলে বেড়ালি 'আমি সুখী...আমি সুখী, সামাজিক গুড বয়, শৃঙ্খলাবদ্ধ...।' চামচাগিরি করে বেড়াতিস এখন চামচারা তোর চারপাশে অনুগ্রহপ্রার্থী।

বড় হয়েছিস কি মিথ্যে কথা না বলে, লোক না ঠকিয়ে? ...উন্মাদ জন্তু কাকে বলছিস? আমি স্বাভাবিক, অত্যন্ত স্বাভাবিক।"

মোটরের ইঞ্জিন শব্দ করে উঠল। হাতটা এল গিয়ারে।

"সামনে দেখ। সেকেন্ড ব্রিজের ফ্লাইওভারটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর মোটামোটা কংক্রিটের থামগুলো এদিক দিয়ে যাবার সময় নিশ্চয় দেখেছিস। গাড়িটা নিয়ে সত্তর মাইল স্পিডে ওর একটা থামে মারব।"

গিয়ার দেবার কর্কশ শব্দ হতেই মিহিরের মুখ সাদা হয়ে এল। হয়তো বাজে কথা ও বলছে না। ওর চোয়ালে জেদ। ডান হাত তার অজান্তেই প্রণবের বাঁ হাত চেপে ধরল।

"না প্রণব।"

সে তার নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল না। শুধু কাতরানির মতো শব্দটা নিজের কানেই অদ্ভুত লাগল। ভয় পেয়েছে, এটা গোপন করার সময়ই সে পায়নি।

একগাল হাসিতে প্রণবের মুখটা ভরে যাচ্ছে। শরীরটা দমকে দমকে ফুলে উঠছে। স্টিয়ারিংয়ে বুক কপাল ঠেকিয়ে প্রায় উবুড় হয়ে হাসছে শব্দ না করে। কিছুক্ষণ পর থিতিয়ে এল ওর শরীর।

"এ কাজ করিসনি প্রণব।"

"মিহির জীবন কী এবার বুঝলি তো? তোকে ভিতু বলব না, এটাই স্বাভাবিক।"

স্বর অসম্ভব কোমল প্রায় ফিসফিস মিনতির মতো। বহুদূর থেকে যেন কথা বলছে। হাসির চাপেই বোধহয় চোখে জল। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক। তার মনে হল, এটা ঝড়ের আগের প্রশান্তি।

"তুই নেমে যা। যে জীবনে সুখ আনন্দ পাব না, সেটাকে জ্যান্ত রাখার অর্থ হয় না। বনানী গেছে, অন্য কেউ আসবে। ঠিকই। হয়তো আরও ভাল কেউ আসবে। কিন্তু বুড়ো বয়সে স্মৃতি চিবোতে হবে ভাবলে... এ-রকম আসা-যাওয়া জীবনে তো কম হল না। আমি থামতে চাই, ...তুই নেমে যা এখন, এখুনি। নয়তো তোকে নিয়েই মরব।"

ক্লাচ ছেড়েছে। গাড়িটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে শামুকের গতিতে এগোতে শুরু করল। মিহিরের তলপেটের দিকে একটা ভার নামছে। ঘাড়ের কাছে কাঁটা উঠল চামড়ায়।

"প্রণব করছিস কী?"

"আমি জ্যান্ত।"

গাড়ির গতি একটু বাড়ল। চওড়া ফাঁকা রাস্তা। বৃষ্টি থেমে গেলেও পথচারী বা মোটরগাড়ির সংখ্যা বাড়েনি। শুধু মালবোঝাই ট্রাকগুলো পরের পর অবিরাম ছুটে যাচ্ছে উত্তরে। স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা বাতাসে প্রণবের চুল কপালে লেপটে। ওর চোখা নাকের পাশে গভীর ছায়া। আরতিকেও এই রকম দেখেছিল।

"প্রণব না।"

ওর হাত চেপে ধরে সে টানতেই গাড়ি থেমে গেল এবং ঝটকা দিয়ে ঘুরে বসে প্রণব বুক ফাটিয়ে চিৎকার করল, "নেমে যা শুয়োরের বাচ্চা, আই সে গেট আউট নয়তো লাথি মেরে ফেলে দোব... তোদের মুখে আমি মুতে দি। সবার সবার মুখে।"

দরজা খুলেই মিহির প্রায় হুমড়ি দিয়ে পড়ল রাস্তায়। দরজাটা বন্ধ করার ফুরসত পাবার আগেই গাড়িটা ঝাঁকুনি খেয়ে তিরগতি নেবার প্রথম ধাপে উঠে গেল।

প্রথমেই তার চোখে পড়ল, পিছনের কাচে রবারের দড়িতে ঝোলানো কাপড়ের ঘাগরা পরা, মাথায় টুপি, বড় বড় চোখ আর চোখের পাতা, গোলাপি গাল ইঞ্চি ছয়েকের মেম-পুতুলটা। সব সময়েই ও নাচে। প্রণব মজা পেতে ভালবাসে।

তারপরই চোখ পড়ল খোলা দরজাটায়। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে টেনে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য গাড়ি মন্থর করতে হবে কিন্তু সেটুকু বিলম্ব করার মতো সময়ও দিতে পারছে না তাই দরজাটা খোলাই রয়েছে। প্রণব বড় ব্যস্ততা নিয়ে কাজ করে।

এক ডানাওলা পাখির মতো প্রণবের স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড রাস্তা ধরে উড়তে উড়তে দূর অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। রাস্তার গর্তে লাফিয়ে ওঠায় খোলা দরজাটা গাড়ির শরীরের দিকে একবার সরে এসে আবার ফিরে গেল। এক পথচারী কৌতূহলে মাথা ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে।

পিছনের দুটো লাল আলো ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। ও কোথায় চলেছে? ভারী মোটা থামই কি ওর লক্ষ্য? এখন চিৎকার করে থামানো যাবে না, কোনও উপায়েই যাবে না।

সে অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখল লাল আলো দুটো অদৃশ্য হল। অল্প বাঁয়ে বেঁকে ওখানে রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে গেছে। মুহূর্তের জন্য আবার আলো দুটো সে দেখতে পেল। ডাইনে ঘুরবে এবার। তারপর সোজা গিয়ে...

এখন তার দৃষ্টি থেকে লাল আলো, মোটর, পথ ও পথচারী এমনকী তার চারদিকের প্রকৃতি পর্যন্ত লুপ্ত। শুধু ভয়ংকরভাবে সজাগ তার শ্রবণেন্দ্রিয়। অন্তত আধমাইল দূরের থেকে সে একটা শব্দের অপেক্ষায়।

সে প্রথমে যে শব্দটা পেল, গভীর রাতে মাঝে মাঝে সেটা পায় মানিকতলা ব্রিজের উপর দিয়ে যখন একটা শূন্যতা অতিক্রম করে ট্রেন যায়। সে তারপর পেল ধাতুর পাত দোমড়ানোর এবং সেকেন্ড তিনেক পর ক্ষীণ একটা বিস্ফোরণের শব্দ। হালকা কমলা একটা আলোর আভাস দপ করে উঠল রাস্তার বাঁকে।

তখন থরথরিয়ে কেঁপে উঠে সে ছুটে গিয়ে গজ দশেক দূরের আলোর খুঁটিটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল।

সত্যিই ও তা হলে এ-কাজ করল, এইভাবে নিজেকে থামাল! নিজেকে জ্যান্ত প্রমাণ করতে হয়তো ও এটা করত না যদি সে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে না দিত। মিহির নিজেকে দায়ী করল।

সে এবার কী করবে? ছুটে যাওয়া...

পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ডাকা... নীপাকে খবর দেওয়া। কিন্তু এখানে কোথায় থানা, কোথায়ই বা টেলিফোন তা সে জানে না। বুকের মধ্যে ধাক্কা পড়ছে। কেউ যেন খামচে ধরে কচলাচ্ছে। একটা চিনচিনে তীক্ষ্ণ ব্যথা উঠছে। দ্রুত রক্ত প্রবাহের ফলে হৃৎপিণ্ডটা এখন ব্যস্ত। মিনিটে কতবার যেন পাম্প করার কথা, এখন কি ওভারটাইম খাটছে?

"কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না। ওটা মারাত্মক হতে পারে। ...দূরে সরে থাকবেন।"

ঘামছে সে। বাঁ হাতটা বুকে উঠে এল। হৃৎপিণ্ডের কাছটা চেপে ঝুঁকে সে ভাবল, বোধহয় অ্যাটাক হবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু মুখ তার চোখে ভেসে উঠল। অসহায়, কাতর করুণ।

ওদের ভালবাসি। মিহির সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চারপাশে কোনও ব্যস্ততা বা চাঞ্চল্য নেই। একটা কিছু যে এইমাত্র কিছু দূরেই ঘটে গেছে, তা কোনওভাবেই বোঝা যাচ্ছে না। এই নির্জন, প্রায়ান্ধকার জায়গায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকবে? হতে পারে না।

ব্রিফকেসটা গাড়িতেই রয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়তো পুড়ো ছাই। ওর মধ্যে আছে মালতী দত্তর খাতাটা... ত্রিকালের চাঞ্চল্যকর কভার স্টোরির মূল উপাদান... সার্কুলেশন বাড়াবার বড় অস্ত্রটা। তিক্ত এক ধরনের বিমর্ষতা তার মুখে হাসি টেনে আনল।

দক্ষিণে তাকিয়ে সে ফ্লাইওভারটা দেখার চেষ্টা করল। রাতের কালো মেঘের পটভূমিতে কিছুই ঠাওর হয় না। আবার হাত দিল বুকে।

কিছু একটা পকেটে যেন রয়েছে। ফর্মটা। এটা টিকে গেল। পঁচিশ হাজার টাকার একটা কেস আরতি চায়। তা হলে খুশি হবে... বাটুকে ছাড়বে। আরতির বয়স বাড়ছে তাই ভয় পাচ্ছে স্বাভাবিকই।

প্রণব কিছু একটার তরফ থেকে তার ধারণাকে রূপ দিয়েছে। কী সেটা, বুঝতে পারছে না সে। নীপা বলেছিল, অহংকার। ঠিক নয়, প্রণবকে ধরতে পারেনি। পারা সম্ভব নয়।

মিহির ধীর গতিতে সন্তর্পণে পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলন্ত একটা ট্যাক্সিকে হাত তুলে দাঁড় করাল।

"গৌরীবাড়ি যায়গা, পাঁচ রুপেয়া একস্ট্রা দেগা।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। হয়তো ওই দিকেই গ্যারাজ। ট্যাক্সিতে বসে হেলান দিয়ে শেষবারের মতো পিছনে তাকিয়ে সে একবার নিজেকে বলল, "আমাকেও তো জ্যান্ত থাকতে হবে... আমিও স্বাভাবিক।"

গ্রন্থ-পরিচয়

দ্বাদশ ব্যক্তি। পাঁচটি উপন্যাস বই থেকে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯।
প্রথম প্রকাশ: বইমেলা । উৎসর্গ: গৌরকিশোর ঘোষ/শ্রদ্ধাস্পদেষু
প্রথম সংস্করণ: ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান। পাঁচটি উপন্যাস গ্রন্থ থেকে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশ: । উৎসর্গ: তারক চ্যাটার্জি লেনের পড়শিদের
প্রথম সংস্করণ: । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।

বারান্দা। পাঁচটি উপন্যাস গ্রন্থ থেকে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯।
প্রথম প্রকাশ: বইমেলা । উৎসর্গ: দিব্যেন্দু পালিত-কে
প্রথম সংস্করণ: জুলাই, । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।

বাওবাব। পাঁচটি উপন্যাস গ্রন্থ থেকে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯।
প্রথম প্রকাশ: বইমেলা । উৎসর্গ: বনানী ও মিহির রায়চৌধুরীকে
প্রথম সংস্করণ: । বিশ্ববাণী, কলকাতা।

ছায়া। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।
প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ । পৃ. ১৫২। মূল্য: ২০.০০। প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: সুহৃদবর সুব্রত বাগচী-কে

দ্বিতীয় ইনিংসের পর। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।
প্রথম সংস্করণ: জুন । পৃ. ১২৮। মূল্য: ১৫.০০। প্রচ্ছদ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
উৎসর্গ: শ্রীমান গৌতম ভট্টাচার্যকে/যে শ্রীলঙ্কা ও শারজায় ভারতীয়/ক্রিকেটারদের কাছের থেকে দেখেছে

ভালো ছেলে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।
প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি । পৃ. ৯৬। মূল্য: ১২.০০। প্রচ্ছদ: অনুপ রায়।
উৎসর্গ: বিজয়কুমার চক্রবর্তীকে/সঙ্গীত ও সাংবাদিকতায় যিনি সমান দক্ষতায় বিহার করেন।

মালবিকা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।
প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল । পৃ. ৮৪। মূল্য: ২৫.০০। প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: স্নেহাস্পদ/শ্রীমান রূপায়ণ ভট্টাচার্য-কে

ছোটবাবু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।
প্রথম সংস্করণ: বইমেলা । পৃ. ৭০। মূল্য: ৮.০০। প্রচ্ছদ: অনুপ রায়
উৎসর্গ: শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্ত ও/শ্রীমতী প্রতিমা সরকার-কে/প্রীতি সহকারে

জীবন্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯।
প্রথম সংস্করণ: ১ বৈশাখ । পৃ. ১২০। মূল্য: ১৫.০০। প্রচ্ছদ: অনুপ রায়
উৎসর্গ: প্রসন্নতা বিতরণে অদ্বিতীয়/দুলেন্দ্র ভৌমিককে